# ‘বাবু’-উনিশ শতকের সমাজে ও সাহিত্যে

পি.এইচ.ডি উপাধির জন্য প্রেরিত গবেষণাপত্র

কিশলয় জানা

**যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়**

বাংলা বিভাগ

কলকাতা ৭০০০৩২

# শিরোনাম: ‘বাবু’-উনিশ শতকের সমাজে ও সাহিত্যে

গবেষক: কিশলয় জানা

তত্ত্বাবধায়ক: অধ্যাপক ড. সত্যবতী গিরি

পি.এইচ.ডি উপাধির জন্য প্রেরিত গবেষণাপত্র

**যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়**

বাংলা বিভাগ

কলকাতা ৭০০০৩২

**Certified that the Thesis entitled**

'বাবু'-উনিশ শতকের সমাজে ও সাহিত্যে submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Prof. Dr. Satyabati Giri, Retired Professor, Department of Bengali, J. U. and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the Supervisor:

Candidate:
Dated

# ভূমিকা

বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনযাপনে বাবু, বাবুয়ানা, বাবুগিরি ইত্যাদি শব্দবন্ধগুলি বিশেষভাবে পরিচিত এবং তাৎপর্য বহ। উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই জনমানসে এবং বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনে ‘বাবু’ এবং তাঁর বাবুয়ানার নানান রকমফের একইসঙ্গে নিন্দা-প্রশংসা ও বিস্ময়ের সূচনা করে। যদিও ইতিহাসের সূত্র ধরে পিছনে তাকালেই আমরা দেখতে পাবো, এর জড় আরও গভীরে। ‘বাবু’ নামক অভিধার সূচনা যেভাবেই ঘটে থাকুক না কেন, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক থেকেই আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন বাঙালি পুরুষদের অনেকেরই জীবনযাপন ছিল পরবর্তীকালের বাঙালি বাবুদের অনুরূপ। উনিশ শতকের আগে অবশ্য বাবুদের রূপান্তরের বিশেষ সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু উনিশ শতকের সূচনাকাল থেকেই শাসক ইংরেজ এবং সামাজিক নানান ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে বাবুত্বের আদি ছকটি দ্রুত অদৃশ্য হতে থাকে। পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাবুরা নানানভাবে নিজেদের বদলে নিতে থাকেন। ফলে উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে দেখা যায়, যে আর্থিক মানদণ্ড ছিল বাবুদের একটি প্রধান নিয়ন্ত্রক, সেই মানদণ্ডটি বদলে যাওয়ায় বাবুরাও দ্রুত বদলে গিয়েছেন। কিন্তু বাবুত্বের কিছু সাধারণ লক্ষণ এর পরেও বাঙালি পুরুষদের মধ্যে রয়ে গেল। কারণ ততদিনে বাবুদের পরিধি বিশেষ থেকে নির্বিশেষে পরিণত হয়েছে। মধ্যবিত্ত বাঙালির মননে-চিন্তনে একই সঙ্গে বাবুত্বের অনুপ্রবেশ এবং তার দরুন অনুরাগ-বীতরাগের লীলাখেলা চলছে। শিল্পে-সাহিত্যে-প্রাত্যহিক সংবাদপত্রের পাতায় ক্রমশ নিন্দা-সমালোচনা-আত্মবিশ্লেষণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাঙালিবাবুরা তখন কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত। আমাদের আলোচ্য গবেষণা পত্র উনিশ শতকের কালপরিসীমায় বাঙালি বাবুদের এই রূপ-রূপান্তরের ইতিহাস অনুসন্ধান এবং সাহিত্যে তার অভিঘাতের পরিচয় জানার চেষ্টা করেছে। বাবুরা খাতায়-কলমে অদৃশ্য হয়েছেন, নাকি বাঙালি পুরুষের জীবনযাপনে তাঁরা ভস্মীভূত হয়ে ছড়িয়ে গেলেন, এই প্রশ্নটিও খোঁজা হয়েছে শিল্প-সাহিত্যের ভাঁড়ারে। শ্রদ্ধাস্পদেষু পণ্ডিত অবন্তীকুমার সান্যাল তাঁর মূল্যবান গবেষণামূলক প্রবন্ধ ‘বাবু’র গ্রন্থরূপের (প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন, জানুয়ারি ১৯৮৭) ভূমিকায় আক্ষেপ করেছিলেন এই বলে যে, ‘‘ সাম্প্রতিককালে ঊনবিংশ শতাব্দী এবং, বিশেষ করে, কলকাতা সংক্রান্ত প্রবল কৌতূহল জাগ্রত হওয়ায় অনুসন্ধিৎসুর কাছে ‘বাবু’ নতুন করে আকর্ষণের বস্তু হয়ে উঠেছে; কিন্তু নকশা-প্রহসনের গণ্ডি ছাড়ালেও বাবু আজও রম্যরচনার চৌহদ্দি ডিঙোতে পারেনি; আজ পর্যন্ত কেউ তাকে গুরুতর গবেষণার বিষয় বলে গণ্য করেনি।’’ তাঁর এই আক্ষেপ থেকেই এই গবেষক ‘বাবু’ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানে ব্রতী হন। পরলোকগত পণ্ডিত মানুষটির অসামান্য কাজটি এই গবেষণাকর্মের মূল অনুপ্রেরণা। তাঁকে প্রণাম।

একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে বাঙালি বাবুদের ইতিহাস এবং সাহিত্যে তাঁদের অভিঘাত অনুসন্ধানের লক্ষ্যে রচিত এই গবেষণাপত্রটি আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ড. সত্যবতী গিরি মহোদয়ার অকুণ্ঠ সাহায্য ব্যতীত অসম্ভব ছিল। আমার যাবতীয় অভাব-অনুযোগ-প্রত্যাশাকে তিনি হাসিমুখে পূরণ করেছেন। তাঁকে আমার প্রণাম। অধ্যাপক এবং প্রখ্যাত নট-নাট্যকার ড. সৌমিত্র বসু মহাশয় পঞ্চম অধ্যায়ে নাটক ও প্রহসন সংক্রান্ত আলোচনায় কিছু মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে বাধিত করেছেন। তাঁকে এই অবসরে প্রণাম জানাই। এছাড়াও ড. গোপা দত্ত ভৌমিক, ড. শম্পা চৌধুরী নানান প্রশ্ন করে ও পরামর্শ দিয়ে আমার কাজকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ এবং প্রণাম। এই গবেষণাকর্ম যখন শুরু হয় তখন আমি সুদূর ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজে অধ্যাপনা করতাম। সেই কলেজের অতুলনীয় গ্রন্থাগার এবং তুলনাহীন গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার-কর্মীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া এই গবেষণার কাজ

এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল। এছাড়া কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এবং গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের লাইব্রেরিও আমার গবেষণাকর্মের প্রতিটি পর্যায়ে সহায়ক হয়েছে। এই অবসরে তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগকে ধন্যবাদ যে, তাঁরা আমায় এই বিষয়ে গবেষণা কর্মের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন।

এই গবেষণাপত্রের উপাদান সংগ্রহ এবং রচনায় বহুজনের সক্রিয় সহযোগিতার কথা না উল্লেখ করলেই নয়। গবেষণা শুরুর প্রাথমিক পর্যায়ে থেকে বিভিন্ন সময়ে নিরন্তর তাগাদা ও উৎসাহ দিয়ে কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন আমার এককালীন সহকর্মী, দর্শন বিভাগের অধ্যাপক স্নেহভাজন সুস্মিতা সাহা। একই ভাবে বন্ধুবর স্নেহভাজন ড. কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রী কল্যাণাশিস ভট্টাচার্য, ড. অদিতি জানা, ড. সায়ন্তনী নাথ — এঁদের কথাও উল্লেখ করতে হয়। এঁদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কৃতজ্ঞতায় নয়, সেকারণে নীরব রইলাম। বেথুন কলেজ গ্রন্থাগার থেকে বইপত্র সংগ্রহ করে, হাতে তুলে দিয়ে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন ইতিহাসের অধ্যাপিকা জয়তী ঘটক মহোদয়া। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, বারাসত গভঃ কলেজের  বাংলা বিভাগীয় প্রধান মাতৃসমা ড. মঞ্জু মণ্ডল। নিরন্তর তাগাদা ও সস্নেহ তাড়ণা দিয়ে তিনি লেখাকে পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। তাঁকে প্রণাম বিভাগীয় সহকর্মী এবং সুলেখক ড. পারমিতা ভট্টাচার্য প্রথম থেকেই নানানভাবে সাহায্য করেছেন। কয়েকটি চিত্র নিজের সংগ্রহ থেকে দিয়ে এবং বাকি সমস্ত চিত্রগুলি যথাযথভাবে গ্রন্থনে তাঁর ভূমিকা, অবদান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। পারিবারিক দিক থেকে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় আমার পিতা শ্রী পবিত্রকুসুম জানা এবং মাতা মিনতি জানার নাম। গবেষণাপত্রটি রচনা করতে গিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে পারিবারিক দায়দায়িত্ব ও কাজকর্মের প্রতি আমার অবহেলা তাঁরা হাসিমুখে মেনে না নিলে আমার গবেষণাটি আজ শেষ হত না। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত বেশ কিছু বইপত্র আমার পিতৃদেবের সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত। এই কাজটি শেষ পর্যন্ত পি.এইচ.ডির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলে, তা তাঁদের উভয়ের নীরব আত্মদানের ফল। এই অবসরে তাঁদের প্রণাম জানাই। আমার অগ্রজ, পেশায় সফট্ওয়ার ইঞ্জিনিয়ার নিলয়কুমার জানা এবং  সহোদরা অজন্তা জানা তাঁদের যথাযথ কৌতূহল ও তাগাদা দিয়ে আমায় সাহায্য করেছেন। বন্ধুবর গৌতম দাস একইভাবে আমায় লক্ষ্যপূরণের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। পরিশেষে, কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ার স্নেহভাজন কেষ্ট এবং শান্তনুর কথা আলাদা করে উল্লেখ করতে হয়। অসংখ্য বইপত্র চাহিদামত তাঁরা যেমন সরবরাহ করেছেন, তেমনি বাংলাদেশ থেকে বাঞ্ছিত কিছু বইপত্র এনে দিয়ে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন। তাঁদের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। বর্ণনা প্রেসের কর্মীগণ, যাঁরা প্রভূত কষ্ট স্বীকার করে শব্দগ্রন্থনের কাজটি করেছেন, ক্ষুব্ধ হয়েও মুখের হাসিটি মিলিয়ে যেতে দেননি, তাঁদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ।

কাল নিরবধি, পৃথ্বী বিপুল। পাঠকসমাজ বিপুলতর। লোকরুচির পরিবর্তনশীলতার অমোঘ নিয়মকে মনে রেখেই বলি, এ কাজ যদি সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক ইতিহাস উদ্ধারের ক্ষেত্রে সামান্যতম সহায়ক হয়, তবে আমার কাজ সার্থক বলে মনে করব। আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতায় বাঙালি জীবনের একটি বিশেষ দিককে তুলে ধরবার এই ক্ষুদ্রতর প্রয়াস থেকে আশা রাখি বাঙালি পাঠকেরা মুখ ফিরিয়ে নেবেন না। যে কোনো সমালোচনা এবং ভুল-ভ্রান্তির দিকে নির্মম অঙ্গুলিনির্দেশ আমি মাথা পেতে নেব। এ সবের মধ্যে দিয়ে কাজটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠুক, এই কামনা।

এক ব্যাপ্ত সময়ের সমাজ-মানসিকতার একটি দিককে এত স্বল্প পরিসরে ধরার এই প্রচেষ্টা অনেকটা বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের সামিল। এই কাজে আদৌ, সফল হয়েছি কিনা তা বিদগ্ধজন বিচার করবেন। আমার তরফ থেকে আন্তরিকতার কোনো অভাব ছিল না, এটুকুই।

বারাসাত গভঃ কলেজ

বারাসত, কলকাতা-১২৮ কিশলয় জানা

# সূচিপত্র

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়:
প্রস্তাবনা ৮-১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়:
যুগ ও জীবন ১৭-৮৪

তৃতীয় অধ্যায়:
বাবু: রূপ ও স্বরূপ ৮৬-১৭৫

চতুর্থ অধ্যায়:
কাব্যে-কবিতায়-গানে বাবু ১৭৭-২৭৬

পঞ্চম অধ্যায়:
নাটকে বাবু ২৭৮-৩৬৪

ষষ্ঠ অধ্যায়:
নক্‌শায় বাবু জীবন ৩৬৬-৪৭৩

সপ্তম অধ্যায়:
গল্প-উপন্যাসে বাবু ৪৭৫-৫৪৪

অষ্টম অধ্যায়:
রম্যরচনা, স্মৃতিকথা, প্রবন্ধ ইত্যাদিতে বাবু ৫৪৬-৬০৩

নবম অধ্যায়:
বাবু-সাহিত্যের সাহিত্যিক ও সামাজিক ফল ৬০৫-৬৪৫

দশম অধ্যায়:
বাবু: ইংরেজ ও অপরাপর বিদেশি লেখকদের চোখে ৬৪৭-৬৬৫

একাদশ অধ্যায়:
উপসংহার ৬৭৭-৬৭৮

পরিশিষ্ট:
তথ্যপঞ্জী ৬৮০-৬৯৪

# প্রথম অধ্যায়:

# প্রস্তাবনা

বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে উনিশ শতকের ভূমিকা ও গুরুত্ব যেমন অপরিসীম, উনিশ শতকীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে বাবুদের ভূমিকা ও অবদান তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের সমাজ-ইতিহাস ও রাজনীতির জটিল সমীকরণে একদল সুযোগসন্ধানী বাঙালি পুরুষ ক্ষমতা ও আর্থিক সুবিধাভোগের শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন। ইতিহাস বলে, এঁদের অনেকেরই ছিল না কোনো প্রতিষ্ঠিত বংশকৌলিন্য বা আভিজাত্য-ধারা। তবুও সুযোগসন্ধানী ইংরেজ এবং রাজনৈতিক জট-জটিলতার আবহে আপাত ভুঁইফোঁড় এইসব বাঙালি পুরুষের দল নতুন কালের সামাজিক প্রভু হিসাবে দেখা দিয়েছিলেন। প্রাথমিকভাবে ইংরেজ-বেনিয়াদের ব্যাবসায়িক ঘাঁটি কলকাতাকে কেন্দ্র করে এঁরা প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেও, কালে বাংলার দূরতম স্থানেও এঁদের ভাব-ভাবনা, জীবনাচরণ ছড়িয়ে পড়ে এবং সার্বিকভাবে বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতি এঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। কলকাতার বিমিশ্র নাগরিক পরিবেশে তথাকথিত হিন্দুর সামাজিক স্তরবিন্যাসের চরিত্র অনেকটাই শিথিল ছিল। ধনতান্ত্রিকতার একটি নতুন পরিবেশে সম্মিলিত হয়েছিলেন নানা স্থানের নানা মানসিকতার নানা স্তরের একদল মানুষ, যাঁদের মধ্যে একটিই মিল, এঁরা সবাই ছিলেন প্রতিষ্ঠাকামী। কায়স্থ ও সুবর্ণবণিকেরা নতুন কালের যাত্রার ধ্বনি শুনতে পেয়েছিল। ফলে, শাসকশ্রেণিকে তোষণ ও সাহায্যের বিনিময়ে সেদিনের নতুন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে এঁরাই অগ্রগণ্য হয়ে ওঠেন। এঁদের অনেকেই নবাবি আমলে নানাভাবে রাজদরবারের সংশ্লিষ্ট ছিলেন, কেউ কেউ ব্যাবসাবাণিজ্যের কারণে কাশিমবাজার ও মুর্শিদাবাদে বসবাস করতেন। কিন্তু নানা কারণে তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যাবসায়িক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলে এঁরা কেউ কেউ নবাবি ব্যবস্থার প্রতি গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। সিরাজ-উদ্-দৌলার অপসারণ ও হত্যার পশ্চাতেও এঁদেরই ভূমিকা ছিল সর্বাধিক। পলাশির যুদ্ধ নামক প্রহসনে এঁরা অনেকেই ছিলেন ক্লাইভ তথা ইংরেজের প্রকৃত শক্তি। বিনিময়ে মিলেছিল উপঢৌকন, নবাবের কোষাগার লুণ্ঠনের ভাগ, খেতাব, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও আরও অনেক কিছু। নতুন গড়ে ওঠা কলকাতায় ইংরেজদের প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়ে এঁরা কেউ কেউ সমাজপতি হিসাবে দেখা দিয়েছিলেন। এইসব বাঙালি পুরুষদের মানসিকতায় সজীব ছিল মধ্যযুগীয় ফিউডাল-সংস্কৃতির ধ্যানধারণা। নবাবি দরবারি-সংস্কৃতির নঞর্থক বা সহজে অনুকরণযোগ্য রীতি-রেওয়াজগুলি, আবার ইংরেজদের সংস্পর্শে কিছু নতুন আদব-কায়দারও পক্ষপাতী হয়ে পড়েন তাঁরা। এভাবেই অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিলগ্নে বাঙালি ক্ষমতাবান পুরুষের একটি বিশেষ type নিয়ে আমাদের 'বাবু'কুলের আবির্ভাব। হুতোমের ভাষায়, 'কোম্পানির বাংলা দখলের কিছু পরে, নন্দকুমারের ফাঁশী হবার কিছু পূর্ব্বে আমাদের বাবুর প্রপিতামহ নিমকের দাওয়ান ছিলেন, সেকালে নিম্‌কীর দাওয়ানীতে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় ছিল; সুতরাং বাবুর প্রপিতামহ পাঁচ বৎসর কর্ম্ম করে মৃত্যুকালে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা রেখে যান— সেই অব্‌ধি বাবুরা বনেদি বড় মানুষ হয়ে পড়েন।'[১]

বাবু-ইতিহাসের প্রথম পর্বে সুযোগসন্ধানী বাঙালি উদ্যোগপতিরা ইংরেজ শাসকের আনুকূল্যে নিমক বা আফিমের দেওয়ানি, বেনিয়ানি কিংবা দালাল, মুৎসুদ্দি হিসাবে কেবল যে আর্থিক-প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তাই নয়, কলকাতার বিমিশ্র সংস্কৃতিতে এঁদেরই কেউ কেউ আদিবাবু হিসাবে সমাজপতির মর্যাদা পান এবং ব্রাহ্মণ সহ স্থানীয় সমাজের সর্বস্তরের নিয়ামক হয়ে ওঠেন। বলা বাহুল্য, শাসকশ্রেণি এঁদের বকলমে স্থানীয় সাধারণের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে চেয়েছিলেন। স্থানীয় স্তরে আর্থিক প্রতিপত্তি ও জনসংযোগের কারণে এঁরা হয়তো মান্যতাও পেয়েছিলেন। এঁদের বিলাসী জীবনযাপন, নীতি-নৈতিকতার তোয়াক্কা না করে প্রচলিত সংস্কারের বিপরীতাচরণ, উৎকট দেখানেপনা স্থানীয় সমাজ ভীতি ও বিস্ময়

নিয়েই দেখতেন। বিস্ময় ছিল কাঞ্চনমূল্যের চমকে, ভীতি ছিল ওই কাঞ্চনমূল্যেরই প্রভাব ও প্রতিপত্তিকে। তবে, তখনও বাবু এবং বাঙালি পুরুষের সংস্কৃতি ভিন্নগা ছিল। এক পুরুষ কী দু'পুরুষ চলবার পর বাবুত্বের এই প্রাথমিক রূপ ও লক্ষণ শাসকশ্রেণির কাছেই অসহ্য বোধ হল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগে ততদিনে ভুঁইফোঁড় বাবুদের আবির্ভাব ঘটেছে কয়েকগুণ। আদিবাবুদের নয়, নতুন 'হঠাৎবাবু'দেরকেই তখন শাসকের প্রয়োজন। কারণ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারাই অপ্রত্যক্ষভাবে বাংলার ভূমিব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন সম্ভব। উনিশ শতকের প্রথম দু'দশকেই প্রথমত ইংরেজি সংবাদপত্রগুলি, পরবর্তীকালে মিশনারিদের বাংলা কাগজ 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হলে তার পাতাতেও বাবুদের উৎকট দেখানেপনা, অবিমৃষ্যকারী আচার-আচরণ, লাম্পট্য ইত্যাদি সমালোচনার বিষয় হয়ে উঠতে থাকে। আদিবাবু এবং তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম নববাবুরা অতএব 'বিশেষ' হিসাবে দেখা দিয়েই চির-নিরুদ্দেশে গেলেন।

কিন্তু বাবু-ইতিহাসের জট-জটিলতা শুরু হল এখান থেকেই। সামাজিক সচেতনতা, নতুন রুচি এবং ধারাবাহিক সমালোচনার মাঝে আক্রান্ত হয়ে আদি ও নববাবুরা অদৃশ্য হলেন বটে, কিন্তু দেখা গেল, মদন-ভস্মের পর যেমন করে বিশ্বময় তার রেশ ছড়িয়ে পড়েছিল, তেমনি বাঙালি পুরুষের অস্থিতে-মজ্জায় কোথায় যেন সেই 'বিশেষ' বাবুরা এবং তাঁদের বাবুয়ানার সংস্কৃতি স্থায়িত্ব লাভ করেছে। বাঙালি পুরুষের সংস্কৃতি এবং বাবু-সংস্কৃতি কোনো এক সময়ের ক্রিয়ায় মানসিক সংগমে মিলিত হয়েছে। যদিও, ইংরেজি শিক্ষিত, পাশ্চাত্য মত ও পথগামী নব্যবাবুদের দল 'বাবুত্বে'র অন্যতর মার্গে বিচরণ করতে চাইলেন। এঁদের অধিকাংশই উঠে এসেছেন পড়তি বনেদিবংশ কিংবা মধ্যশ্রেণি থেকে। জ্ঞানে-চিন্তায়, দীক্ষায় এঁরা সাধারণ হিন্দু বাঙালির থেকে পৃথক হয়ে ওঠার চেষ্টায় রত, হয়তো রুচি ও মানসিক সংস্কারে পৃথকও, কিন্তু তখনও সংখ্যাবৃদ্ধি সত্ত্বেও তাঁরা 'বিশেষ'। আদি ও নববাবুরা নিজেদের প্রয়োজনে প্রচলিত সংস্কারের অন্যথা করতেন, কারণ তাঁরা জানতেন, কাঞ্চনমূল্যে নিজেদের পক্ষে সামাজিক বিধান রচনা নেহাতই তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু নব্যবাবুরা যেকোনো প্রকার দেশীয় সংস্কারকেই মান্যতা না দিতে চেয়ে বাঙালি জীবনের সংস্কারের ভিত্তিটাকেই দুর্বল করে দিলেন। বাঙালি মধ্যবিত্তকুল এই আপাতসরল, তথাকথিত বিধিবন্ধনহীন বাবুত্বকে সাদরে বরণ করে নিলেন। তবে আদি ও নববাবুদের মানসিক সংস্কৃতিকেও একেবারে বাদ দিলেন না। বস্তুত, উভয় সংস্কৃতিকেই গ্রহণ-বর্জন করে বাঙালি মধ্যশ্রেণি বাবুত্বকে 'বিশেষ' থেকে 'সাধারণে' পরিণত করলেন। উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছর যদি আদি, নব ও নব্যবাবুদের সম্মিলিত কাল হয়, তবে বাকি পঞ্চাশ বছর তথাকথিত মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত বাবুদের কাল, ইতিহাস যাদের 'ভদ্রলোক' বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছে।[২] বাবুত্ব ততদিনে আর ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্যমাত্র নয়, বাঙালি পুরুষের মানসিক লক্ষণে পরিণত হয়েছে। বস্তুত, বাবুত্বের সেই ইতিহাস উত্তরাধিকার হিসাবে আজও বাঙালি পুরুষ বহন করে চলেছে।

ইতিহাসের পাতা উলটালেই আমাদের চোখে পড়ে, 'বাবু' প্রথমে বিশেষ কিছু ব্যক্তিদের উদ্দেশেই ব্যবহৃত হত, পরে তা ব্যবহৃত হতে থাকে শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত রুচিমান ও বিশিষ্ট বাঙালি পুরুষদের সম্বোধন বা সম্মানজনক সামাজিক অবস্থান নির্দেশ করতে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই 'বাবু'ই হয়ে ওঠে বাঙালি পুরুষ মাত্রের নির্দেশকসূচক সাধারণ অভিধা। বাবুদের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম-বিস্ময়ের ভাবটি কেটে গিয়ে নিন্দা-সমালোচনা, ব্যঙ্গবিদ্রূপের ভাবটিও যে কারণে প্রাবল্য লাভ করে। 'বাবু' চিরকালই বাঙালি পুরুষের এক বিশেষ শ্রেণিকেই নির্দেশ করে এসেছে। নিম্নবিত্ত ও প্রান্তিক বাঙালি পুরুষেরা সচরাচর এর আওতায়

পড়েন না। কিন্তু মধ্য ও উচ্চবিত্ত বাঙালি পুরুষ উত্তরকালে 'বাবু'ত্বের কিছু নির্দিষ্ট ছকেই ঘোরাফেরা করেছে মনে হয়। উনিশ শতকের সাহিত্যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে উত্তরকালে বাবুদের নিন্দা-সমালোচনা কিংবা অন্য উপলক্ষ্যে এত বৈচিত্র্যময় নিদর্শন যে জমা হয়েছে, তার কারণ সম্ভবত নিহিত আছে বাঙালির তথাকথিত স্থবির সংস্কারপন্থী চিন্তাধারা ও জীবনযাপনের মধ্যে। বাবুত্ব যতদিন অর্থকৌলিন্যের ঘেরাটোপে ছিল, ততদিন বাঙালি সাধারণের চোখে 'বাবু' ছিলেন কৌতূহল ও বিস্ময়ের উপাদান। কিন্তু নব্যবাবুদের প্রচেষ্টায় 'বাবুত্ব' যখন সাধারণ মধ্যশ্রেণিরও অধিকারভোগ্য হল, তখন উক্ত 'বাবু'রাই হয়ে উঠলেন কটাক্ষের লক্ষ্য। উনিশ শতকের বাবু- ইতিহাস ফলে কেবলমাত্র উচ্চ ও মধ্যশ্রেণির সুবিধাভোগী বাঙালি পুরুষের মানসিক রূপ- রূপান্তরের হদিশই দেয় না, সাধারণ সামাজিকের মানসিক অবরোধেরও পরিচয় তুলে ধরে। ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক সূত্রে যে শিক্ষিত বাঙালি পুরুষ 'বাবু'দের সমাজের উপজাত 'অপর' হিসাবে প্রতিপন্ন করতে চান, দেখা যায়, তিনিও সাধারণের অবস্থানে দাঁড়িয়ে নেই। তিনিও কোনো-না-কোনো ভাবে 'অপর' (other)। কারণ, তাঁর নিজস্ব ভাবনার আনুকূল্যে যে আদর্শ বাঙালি পুরুষের ছাঁচটি নির্মিত হয়, 'বাবু'দের বিরুদ্ধ হিসাবে, আদতে তা-ও 'বিশেষ' হয়ে ওঠে এবং আপামর জনসাধারণের সাপেক্ষে স্বতন্ত্র আর এক 'বাবুত্বে'রই বিনির্মাণ করে। দেবীপুরের যে দেবেন্দ্রকে বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষে' 'বাবু' নামে চিহ্নিত করে[৩] নগেন্দ্রর প্রতি-অবস্থানে রাখতে চান, আদতে দেখা যায়, বাবুত্বের সাধারণ লক্ষণ বহন করে নগেন্দ্রও শেষপর্যন্ত সমগোত্রীয়ই হয়ে ওঠে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র গোবিন্দলালও সমরূপ চরিত্র। অতএব, উনিশ শতকের শেষদিকে পৌঁছে বাঙালি পুরুষের 'বাবু' হয়ে ওঠা তথা মানসিক লক্ষণ হিসাবে বাবুত্বকে অর্জন করা হয়ে উঠেছিল সাধারণ ব্যাপার।

'বাবু'দের বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে লক্ষ করেছি, সাধারণের চোখে উনিশ শতকের বাবু ও বাবু-সংস্কৃতি দু'টি সমান্তরাল অর্থ বহন করে। একটি— সম্ভ্রান্ত, ধনী এবং অভিজাত ব্যক্তি, অন্যটি— বুলবুল লড়াই, বাইজি-বিলাস, মদ-গাঁজা ইত্যাদি নেশাসক্ত আলালের ঘরের দুলাল। বাবু-সংস্কৃতি মাত্রেই অতএব একালের চোখে অনৈতিক, নিষিদ্ধ আমোদপ্রমোদের নামান্তর। পাশাপাশি অবশ্য অলস, কর্মবিমুখ, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাহীন, অমিতব্যয়ী ধনীর উচ্ছন্নে যাওয়া সন্তান অর্থেও 'বাবু'র একটি type বা ধারণা আমাদের মানসিক জগতে ধরা আছে। বলা বাহুল্য, এর সবকটিই 'বাবু'দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও, 'বাবু'মাত্রেই এই সংকীর্ণ ধারণায় আবদ্ধ এমনটি নয়। বরং উনিশ শতকের সমাজ ও সাহিত্যে বাবুর ভূমিকা বিষয়ে বিচার করতে গিয়ে চোখে পড়েছে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাবুরা প্রচলিত সাধারণ ছককে অস্বীকার করে বাবুত্বের এক নতুন সংরূপে দেখা দিয়েছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, শাসকের অনুগ্রহপুষ্ট এবং কৃপাপ্রার্থী এমন একদল বাঙালি পুরুষ যাঁরা শাসকের আশ্রয়ে থেকে দেশাত্মবোধ ও ছদ্ম-স্বাধীনতার কথা আওড়ান, অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন স্থানীয় স্তরে স্বায়ত্তশাসনের জন্য, আদ্যন্ত বিলিতি পোশাকে, বিলিতি ভাষায় স্বদেশানুরাগের ভাষণ দেন, প্রগতিশীলতার নামে নারী-পুরুষের অবাধ মিলনের সুযোগ গ্রহণের জন্য লালায়িত হন— এও একপ্রকার 'বাবু' সংস্কৃতি তো বটেই। ফলে দেখি, উনিশ শতকের শেষ কয়েক দশকে সাহিত্য-সংস্কৃতির পাতা জুড়ে এঁদেরই নিন্দাগাথা। অথচ এঁদের বাইরে যেসব বাবুরা সমাজ-সংস্কার, নারী স্বাধীনতা-জনহিতৈষী ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন, তাঁদের কথা সেভাবে উপস্থিত হয়নি, বাবু-সাহিত্যে। সমাজ কি এঁদের বাবুত্বের ছকে গ্রহণ করেনি? নাকি এঁরা সাধারণের পক্ষে অমঙ্গলজনক, ভীতিকর, অস্বস্তিদায়ক এক শ্রেণি, তাঁদের মধ্যে আলো নেই, কেবল আছে অন্ধকার— এই সত্যটিই জ্ঞাপন

করা বিরুদ্ধবাদীদের অভিপ্রেত ছিল? যদি তাই হয়, তবে বলতে হয় যে, বাবু সম্পর্কে আমাদের ধারণা একদেশদর্শী। সাধারণ বাঙালি পুরুষের ভাবনায়, চিন্তায়, কর্মে আপাতভাবে কোনো বৈচিত্র্য নেই, কিন্তু তথাকথিত বাবুদের চরিত্র ও কর্ম এমন বৈচিত্র্যময় ও রঙিন যে, তা পৃথকভাবে আলোচনার দাবি রাখে। সেই প্রয়াস থেকেই বক্ষ্যমান গবেষণাটির সূচনা। বাবুদের মানসিক ও চারিত্রিক বহুমাত্রিকতাকে বুঝতে এবং ধরতে চাওয়াই যার লক্ষ্য।

এবং এই কারণেই বাবুদের হয়ে ওঠার ইতিহাস ঘাঁটতে গিয়ে মুর্শিদকুলি খানের সময়কালীন বাংলা এবং মুর্শিদাবাদের রাজদরবারে বাঙালি সংস্কৃতি, সমকালে ইংরেজ বেনিয়াদের ক্রিয়াকর্ম এবং উচ্চাভিলাষ, বাংলার রাজনীতিতে বাঙালির পুনরাবির্ভাব, সেই সূত্রেই নতুন গড়ে ওঠা কলকাতা এবং তার নাগরিক সংস্কৃতির প্রভাবে দরবারি সংস্কৃতি থেকে দলছুট একদল অভিজাত এবং অনভিজাত কিন্তু সুযোগসন্ধানী বিত্তবান একদলের পাদপ্রদীপের আলোয় উঠে আসা— সব কিছুই বিস্তারিত আলোচনা করে দেখা প্রয়োজন। কারণ, মনে রাখতে হবে, বাঙালি পুরুষকুলের একটি শ্রেণির 'বাবু' হয়ে ওঠা সময়ের অনিবার্য প্রভাব ও তাগিদ ছাড়া সম্ভব ছিল না। অতএব বাবু-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট হিসাবে তাঁর পূর্বকালীন এবং সমকালীন ইতিহাস আলোচনা অনিবার্য হয়ে উঠেছে বক্ষ্যমান গবেষণায়। বাবুদের হয়ে ওঠার পিছনে নাগরিক কলকাতার গড়ে ওঠা ও বিকাশের পর্বটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে তার কথাও আলোচিত হয়েছে যথাপরিসরে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা 'বাবু' শব্দটির উৎসমূল নির্ণয় এবং সমাজজীবনে শব্দটির প্রয়োগগত এবং অর্থগত রূপান্তরের প্রেক্ষাপটটিকে বুঝে নিতে চেয়েছি। সম্ভ্রান্ত-অভিজাত কেন্দ্রিক ধারণা থেকে কেরানি ও সাধারণ মধ্যবিত্তের রূপান্তরিত 'বাবু'দের রূপ-রূপান্তরের পশ্চাতে যে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রভাব অনুঘটকের কাজ করেছে এই সত্যটিকে বিচার ও প্রতিষ্ঠা বা খণ্ডন করাই ছিল আমাদের লক্ষ্য। একইসঙ্গে কালগতভাবে বাবুদের ব্যবহারিক ও মানসিক জগতে যে সাধারণ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছিল, ইতিহাস ও সাহিত্যের সাক্ষ্য খুঁড়ে তাকেও আমরা সাজিয়ে দিতে চেয়েছি এই ধারণায় যে, এর মাধ্যমেই বাবুদের সামাজিক ভূমিকার বিবর্তনের রূপরেখাটি স্পষ্ট হবে। একইসঙ্গে সমকালের বাবুকেন্দ্রিক ধারণার পরিবর্তন ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা করলে বাবুদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিটিও বোঝা সম্ভব হবে। মনে রাখতে হবে, সাহিত্যের সত্যকে আমরা ইতিহাসের বাস্তবতা দিয়ে যাচাই করে নিতে চেয়েছি। কল্পনার ইমারতের মধ্যে থেকে খুঁজতে চেয়েছি প্রত্যক্ষ সময়ের চুন-বালিকে। উনিশ শতকের বাবু-সাহিত্য ও সংস্কৃতি যে নিছক সাহিত্যিক বোধের ফল নয়, সামাজিক Commitment-এর ফসল, সে সত্য যাচাই করাই আমাদের অভিপ্রায়।

সে কারণেই এরপর আমরা বাবুকেন্দ্রিক সংস্কৃতির বৃত্তে ঢুকে পড়েছি। প্রথমেই লোকজীবন থেকে উঠে আসা প্রবাদ-প্রবচন, লোকগীতি, বাইজি ও বেশ্যাদের গান মন্থন করে দেখতে চেয়েছি এ সকল পপুলার সংস্কৃতির বৃত্তে বাবুদের আনাগোনা ও প্রভাব কেমন ছিল। অশিক্ষিত কবিত্বের ক্যানভাসে বাবু কোন রূপেই বা ফুটে উঠেছেন। পাশাপাশি তথাকথিত শিষ্ট কাব্য-সংগীতেও বাবুদের বিবর্তনগত বৈচিত্র্য ও সমালোচনা কীভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তাকেও বুঝে নিতে চেয়েছি আমরা। প্রত্যক্ষতার ফল হিসাবে বাবুদের কেন্দ্র করে রচিত বিপুল কাব্য-সংগীতের অতি সামান্যই আমরা বিশ্লেষণ করে সমাজের মূল মানস-প্রবণতাকে ধরতে চেয়েছি। নতুবা এই বিষয়টিই পৃথক গবেষণার দাবি রাখে।

উনিশ শতকে সাহেব-প্রভুদের কাছ থেকে যে ক'টি নতুন সংস্কৃতি-বিত্ত আমরা গ্রহণ করেছি, তার মধ্যে পাশ্চাত্য ধরনে নাটক রচনা ও শখের মঞ্চে অভিনয় সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। আর এই ব্যাপারে খ্যাত-অখ্যাত অনেক বাবুর ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতা বাংলার সংস্কৃতিতে এক নতুন উন্মাদনা সঞ্চার করেছিল। স্বভাবতই বাবুদের সমালোচকেরা এই জনপ্রিয় মাধ্যমটি ব্যবহার করে বাবুদের নানা দিক সম্পর্কে সমাজের এক অংশের মনোভাব তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। যদিও পূর্ণাঙ্গ নাটকের বৃত্তে বাবুরা যতটা ধরা পড়েছেন, তার চেয়ে বেশি গৃহীত হয়েছেন প্রহসনের আলম্বন বিভাব হিসাবে। বটতলা জুড়ে সেদিন বাবুদের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি, স্বভাব-সংস্কার ইত্যকার নানান বিষয়ে শ'য়ে শ'য়ে প্রহসন লেখা হয়েছে। তার অনেকটাই হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির গর্ভে। কোনো-কোনোটির নামটুকু ছাড়া কিংবা পরোক্ষ সূত্র ছাড়া আজ আর কিছু লভ্য নয়। কিছু বা বিদেশের গ্রন্থাগারে সুরক্ষিত রয়েছে, যা আদৌ সুলভ নয়। ফলে প্রাপ্ত প্রহসন ও নাটকের জগতে বাবুদের চেহারা-চরিত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে যেমন প্রত্যক্ষ সূত্র থেকে, তেমনি যেখানে মূলগ্রন্থটি অপ্রাপ্য বা বিনষ্ট, সেখানে আমরা নির্ভর করেছি পরোক্ষ সূত্রের উপর। এক্ষেত্রে ড. জয়ন্ত গোস্বামীর 'সমাজচিত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন' (১৩৮১ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থটি আমরা 'প্রত্যক্ষ সূত্রে'র মতোই মূল্যবান বলেই অনুসরণ করেছি। শ্রদ্ধেয় গোস্বামীর গ্রন্থটি না থাকলে প্রহসনে বাবুদের রূপ ও স্বরূপ কেমনভাবে গৃহীত বা সমালোচিত হয়েছে, তা বোঝা সম্পূর্ণ সম্ভব ছিল না। গ্রন্থটি এবং গ্রন্থকারের প্রতি সেই ঋণ স্বীকার করি। পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা উনিশ শতকের সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যমের চোখে ধরা পড়া বাবু-ইতিহাসের কিছু আভাস দিতে চেয়েছি।

বাবুসমাজের সার্থক প্রভাব সম্ভবত নকশা জাতীয় রচনাতেই সর্বাধিক পড়েছিল। উনিশ শতকে সাহিত্যের এই বিশেষ সংরূপটি যেন জন্মই নিয়েছিল বাবুদের কথা ভেবে। ১৮২৫-এ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে সাহিত্যের নতুন সংরূপ হিসাবে নকশার জন্ম হয় 'নববাবুবিলাস' রচনা দিয়ে। বাবু-সাহিত্যেরও সেই দৃপ্ত সূচনা। এরপর তাবৎ উনিশ শতক জুড়েই, বিশেষ করে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নকশা রচনার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬১-৬৪) প্রকাশিত এবং বিপুলভাবে সমাদৃত হলে খ্যাত-অখ্যাত অনেক লেখকই এগিয়ে আসেন নকশার ডালি সাজিয়ে। বলা বাহুল্য, প্রায় সমস্ত নকশারই উদ্দিষ্ট বাবু এবং তাঁদের বিচিত্র জীবনচর্যা। বস্তুত, নকশা জাতীয় রচনা অনেকসময়েই বাস্তবের উপাদানকে হুবহু ব্যবহার করার ফলে, উনিশ শতকের সামাজিক ইতিহাস হিসাবেও এগুলির গুরুত্ব ঐতিহাসিক। শাসক ও শাসিতের দ্বন্দ্ব, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে বাবু-নামক শ্রেণিবিশেষের অবস্থান ও পরিণতি, নকশার আদলে তা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। প্রাপ্ত প্রায় সকল নকশা আমরা ব্যবহার করেছি এবং ধরতে চেষ্টা করেছি নকশার মধ্যে দিয়ে বহমান বাবু-সংস্কৃতির চেহারাটিকে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের মূল বিষয়ই হল নকশার প্রতিফলিত বাবুজীবন।

উনিশ শতকের আর একটি জনপ্রিয় সাহিত্য-সংরূপ হচ্ছে— নভেল ও উপন্যাস। এক্ষেত্রেও তথাকথিত শিষ্টধারার নভেল এবং জনপ্রিয় (পপুলার লিটারেচার) তথাকথিত অমার্জিত বটতলায় নভেল— এই দু'টি বিভেদ প্রচলিত ছিল দেখতে পাই। শিষ্টধারার নভেল যখন ইতিহাস ও পাশ্চাত্য রোমান্সের আদলে আদর্শ বাঙালি পুরুষের চরিত্র নির্মাণে ব্যস্ত, তখন সাধারণ জনপ্রিয় উপন্যাসগুলি বাবুদের নানান ভূমিকাকে উপজীব্য করে বাস্তবতার কাছ ঘেঁষে চলতে চেয়েছে। উত্তরকালে রিয়্যালিজ্‌মের পূর্বসংকেত বলতে বাংলা সাহিত্যে বাবুকেন্দ্রিক এ জাতীয় রচনাগুলিকে গ্রহণ করা যায় অনায়াসেই।

হয়তো এগুলির সাহিত্যমূল্য কম বা একেবারেই তুচ্ছ, কিন্তু সমাজ-ইতিহাসের চোখে এই উপাদানগুলিই মহার্ঘ বলে বিবেচিত হতে পারে। ছদ্ম-প্রগতিশীল বাবু থেকে শুরু করে ব্রাহ্মবাবু, ভণ্ড 'ভদ্রলোক'বাবু, অনাচারী কপট বাবু, বিলিতি আদবকায়দায় অভ্যস্ত নব্যবাবু— এ যেন বাবুদের বিচিত্র চরিত্র চিত্রশালা। সপ্তম অধ্যায়ে আমরা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শেষদিকের বাবুকেন্দ্রিক জীবনকে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছি মূলত গল্প-উপন্যাস-নভেল ইত্যাদির সাক্ষ্যে। বঙ্কিমের কটাক্ষ যেমন ছুঁয়ে গেছি, তেমনি রমেশচন্দ্র দত্তের অন্যতর বাবু-চরিত্র নির্মাণকেও গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করেছি। একটি সূত্র অনুসারে[৪] উনিশ শতকের সময়সীমায় প্রায় চারশোটি উপন্যাস লেখা হয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু জাতীয়বাদী ভাবধারার অনুক্রমে লেখা রোমান্স ইতিহাসাশ্রিত বা কল্প-ইতিহাসের কাহিনি। কিছু উদ্দেশ্যমূলক রচনা, কিছু আধ্যাত্মিক রচনাও রয়েছে। সামাজিক বিষয় সংবলিত কাহিনিতে সমসময়ের নারী সংস্কারমূলক আন্দোলনের ছায়া দুর্লক্ষ্য নয়। বাঙালি পুরুষ অপেক্ষা বাঙালি নারীর কথাতেই উনিশ শতকের নভেলের জগৎ, উপন্যাসের এলাকা জমজমাট। তবু তারই মধ্যে বাঙালি বাবুকেন্দ্রিক যে ক'টি নির্মাণ, এবং নারীর কথা প্রসঙ্গে বিপরীত পক্ষ হিসাবে বাঙালি পুরুষের যে অবস্থান, তারই সূত্রে আমরা বুনতে চেয়েছি উপন্যাসের পটে বাবু-চরিত্রের কথকতাকে।

এরই পাশাপাশি, উনিশ শতকের রম্যরচনা, স্মৃতিকথা ও বাবুকেন্দ্রিক প্রবন্ধাদি, গদ্যরচনাকেও আমাদের মূল্যবান বলে মনে হয়েছে। বিশেষ করে স্মৃতিকথার দু'একটি যেমন— রাজনারায়ণ বসু, দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের গ্রন্থ, গ্রন্থের অন্যান্য অধ্যায়েও আমরা যথেচ্ছ ব্যবহার করেছি। কম ব্যবহৃত মনোমোহন বসু, প্রিয়নাথ বসু এবং অমৃতলাল বসুর স্মৃতিসূত্রেও আমরা বাবুদের কাল ও স্বরূপকে বোঝবার চেষ্টা করেছি। দেখেছি, বাবু মাত্রেই সাদায়-কালোয় মেশানো, ভালো-মন্দের মিশেলে হয়ে ওঠা এক-একজন বাঙালি পুরুষও বোঝায়। সমালোচনার পাশাপাশি বাবুদের ঐতিহাসিক বিবর্তনের পার্থক্য ও রূপান্তর নিয়ে রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' এবং 'সেকাল আর একাল' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রচনা। অন্যদিকে, উনিশ শতকের আদি ও নববাবুদের প্রসঙ্গে রচিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩) কেবল এ জাতীয় ঐতিহাসিক বাস্তবতা চর্চার আদি নিদর্শন তাই নয়, উত্তরকালের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের আকর। উনিশ শতকের প্রথম দু'দশক পর্যন্ত বাবুদের চেহারা, চরিত্র-মানসিক স্বভাব সম্পর্কে এ জাতীয় গ্রন্থের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ হুতোমের রচনাতেও মেলে না। ফলে কেবল এই অধ্যায়েই নয়, এ রকম দু'একটি গ্রন্থের ঋণ সমস্ত গবেষণাপত্রের ক্ষেত্রেই আমরা স্বীকার করছি। এঁদের রচনাগুলি না হলে এই একবিংশ শতকে বসে দুই শতাব্দী আগের জীবনে প্রবেশ করা সম্ভব হত না একেবারেই। বাবু-বিষয়ক রম্যরচনার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাবু' নামক ক্ষুদ্র কিন্তু মূল্যবান রচনার কথাও অবশ্যস্মর্তব্য। উনিশ শতকের শেষদিকের এই মূল্যবান রচনায় প্রথম সরাসরি বাঙালি শিক্ষিত পুরুষের মানসিক চরিত্রে বহমান আদিবাবুত্বের ঐতিহ্য ও স্বভাবের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছিল। এই প্রবন্ধটির প্রভাবে উত্তরকালে আরও কয়েকটি রম্য প্রবন্ধে বাবুদের চরিত্র ও স্বভাবকে ধরবার চেষ্টা করেছেন জ্ঞাত-অজ্ঞাত কিছু লেখক। যথাসম্ভব তাঁদের রম্যরচনার জগতে আমরা প্রবেশ করবার চেষ্টা করেছি এবং তুলে আনতে চেষ্টা করেছি তথাকথিত বাবু-বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির সারাংসার। অষ্টম অধ্যায়ে সাহিত্যের প্রধান প্রধান শাখার বাবুদের প্রভাব ও পরিত্রাণের পর্যালোচনা আপাতভাবে সমাপ্ত হয়েছে বলা যায়।

কিন্তু বাবুরা যেমন সাহিত্য ও সমাজতত্ত্বের নিরবচ্ছিন্ন উপাদান জুগিয়ে এসেছেন, তেমনি বাংলার সংস্কৃতির বহুতর ক্ষেত্রেই তাঁদের প্রভাবের পরিচয় রেখেছেন। বিশেষ করে কালীঘাটের পটে পুরাণের

বিষয়ের পাশাপাশি বাবুজীবনের ছবি যেভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, তা থেকেই স্পষ্ট যে বাবুকুল কেবল সাহিত্য রচয়িতাদেরই মানসিক উজ্জীবক ছিলেন না, তাঁরা বাংলার শিল্পীদেরও প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। বাবুদের সাধারণ চরিত্র বৈশিষ্ট্য থেকে কেচ্ছা-কেলেঙ্কারিও তার ফলে পটুয়াদের কাছে পটের উপাদান স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তীকালে যা বাংলা গ্রন্থচিত্রণকেও প্রভাবিত করেছে। এমনকী বাঙালি হিন্দুর শ্রেষ্ঠ উৎসবে মা-দুর্গার সন্তান হিসাবে ময়ূরপৃষ্ঠে আসীন কার্তিক ঠাকুরটির রূপ, আদল, চরিত্রস্বভাব নববাবুদের হুবহু প্রভাব সঞ্জাত বলেই মনে হয়। পাশাপাশি, বাবুদের হাত ধরেই প্রাচ্য-পাশ্চাত্য রীতিমিশ্রিত স্থাপত্যেরও সূত্রপাত ঘটে। বাবুদের অট্টালিকা থেকে মন্দির, সর্বত্রই সেই ইন্দো-ইউরোপীয় প্রভাব দৃশ্যমান। এই প্রসঙ্গটিকেও আমরা যৎকিঞ্চিৎ আলোচনার মধ্যে নিয়ে এসেছি। কলকাতার ৩০০ বছর উপলক্ষ্যে প্রকাশিত এক সংকলনের অতি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসাদ গুপ্ত মহাশয় সর্বপ্রথম দু'এক লাইনে এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বাবু-সাহিত্য ও বাবু-সংস্কৃতির পারস্পরিক আদান- প্রদানের অতিসংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য ছিল। নবম অধ্যায়ে আমরা উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতিতে বাবুদের সেই সার্বিক প্রভাবের হাল-হকিকত তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বলা বাহুল্য, এটিও পৃথক গবেষণার দাবি করে। সে কথা মাথায় রেখেই আমরা আলোচনার সংক্ষিপ্ত পরিসরে মূল প্রবণতাগুলিকে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি বলা যায়।

কিন্তু যে বাবুদের নিয়ে বাঙালি জীবনে এত উত্তেজনা, এত সমালোচনা, এত আলোড়ন, যে বাবুদের হয়ে ওঠার পিছনে বিশেষ শাসককুলের প্রাথমিক সমর্থন ছিল, ঔপনিবেশিক প্রভুদের চোখে বেলাশেষে কেমন করে ধরা দিলেন বাবুরা? এই জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধান করতে গিয়ে আমরা দেখি, প্রয়োজনে যে বাবুদের ব্যবহার করে ঔপনিবেশিক শাসককুল এদেশের মাটিতে নিজেদের শক্তপোক্ত জমি তৈরি করেছে, একইসঙ্গে জনজীবনে অপ্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছে, সেই বাবুদের প্রতি তাঁদের কথনে ও পর্যালোচনায় দ্বন্দ্বের নানান আলো-অন্ধকার। বিষয়টিকে আমরা ছুঁয়ে গেছি এ কারণেই যে, তা না হলে বুঝতে পারব না, উত্তরকালে পাশ্চাত্য ধরনে শিক্ষিত একশ্রেণির স্বদেশীয় কেন বাবুদের অবিমিশ্র নিন্দাপঙ্কে নিমজ্জিত করতে চাইলেন। আলো নয়, কেবল অন্ধকারের মহিমা নিয়েই কেনই-বা বাবুরা হয়ে রইলেন কলঙ্কিত নায়ক। এও একপ্রকার ঔপনিবেশিক প্রকল্প এবং একইসঙ্গে সমাজে বাবুদের আপাত নিয়ন্ত্রণকে সরিয়ে নিজেদের প্রত্যক্ষ শাসনকে বলবৎ করার গোপন অভিপ্রায়। এ কারণেই ছদ্ম-স্বাদেশিকতা, দেশাত্মবোধ, ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রকল্প রচনা, শিক্ষার মারফত বাঙালির সার্বিক চরিত্র-স্বভাবে বশংবদ আনুগত্যের ভাব-রচনা। বস্তুত, বিষয়টি পৃথকভাবে উপনিবেশিক প্রভুদের শাসন ও শোষণের সাপেক্ষে বাঙালি পুরুষ চরিত্রের ব্যবহার্য হয়ে ওঠবার ইতিহাসের সত্যটিকেও ধরে দিতে সাহায্য করে। অতিসংক্ষেপে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই দশম অধ্যায়ের অবতারণা।

অবশেষে, একাদশ অধ্যায়ে আমরা আমাদের গবেষণালব্ধ প্রাপ্ত তথ্যাদির আলোয় উদ্দিষ্ট বক্তব্যকে যাচাই করেছি, বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে বাবুদের রূপ ও স্বরূপের প্রভাব ও পরিণামকে বুঝতে চেয়েছি। বাঙালি পুরুষের চরিত্র-স্বভাবে কীভাবে বাবুয়ানা বা বাবুগিরি সমার্থক হয়ে উঠল উত্তরকালের দৃষ্টিকোণে, তাকে ধরতে চেয়েছি। বস্তুত, সাধারণ বিচারে বাঙালি পুরুষের একটি শ্রেণিবিশেষের কথা মনে হলেও, উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে পরবর্তীকালের বাঙালি পুরুষের সাধারণ চরিত্রধর্মের মূলগত বৈশিষ্ট্যগুলিকেই

আমরা পর্যালোচনা করতে চেয়েছি, ধরতে চেয়েছি বাঙালি পুরুষের সাধারণ চরিত্রধর্মের জড়টিকে। বাবুরা বিশেষ সময়ে এলেন এবং হারিয়ে গেলেন, এত সহজ হলে বিষয়টি কৌতূহল উদ্রেক করত না। কিন্তু বাবুরা এলেন এবং উনিশ শতকের শেষাশেষি কিংবা বিশ শতকের প্রথম দু'-এক দশকের মধ্যে হারিয়ে গেলেন আপাতভাবে, কিন্তু বাঙালির জাতীয় চরিত্রের শিরায়-উপশিরায় বাবুরা রয়ে গেলেন তাঁদের চিরন্তন চরিত্র-স্বভাব দিয়েই, কেবল সময়ের সাপেক্ষে বাইরের চেহারা-চরিত্রে বুঝি কিছু বদল ঘটল। আমাদের বক্ষ্যমান আলোচনায় আমরা ধরতে চেয়েছি বাঙালির জাতীয় স্বভাবের উৎস ও স্বরূপকে। এ কারণেই এই বাবু-বৃত্তান্তের উপস্থাপনা।

বাবুদের বিচিত্র কথা শেষ হবার নয়। বিশ ও একুশ শতকের বাঙালি জীবনেও তার বেশ বহমান এবং হয়তো উত্তরকালেও সেই রেশ আমরা বয়ে নিয়ে চলব। আমাদের এই অতিক্ষুদ্র গবেষণায় বাঙালি জীবনে বাবুদের সেই ঐতিহাসিক ভূমিকাকেই পুনঃস্মরণ ও পর্যালোচনা করতে চেয়েছি আমরা। সময় ও সৃষ্টি মন্থন করে বাবুদের একটি নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনাই আমাদের অভীপ্সিত, যেখানে সমাজ ও সাহিত্য উভয়েরই মিলিত অবদান আমাদের সে প্রচেষ্টার সহায়ক হয়ে উঠেছে।

## টীকা ও সূত্রনির্দেশ


১. নাগ, অরুণ সম্পাদিত, 'সটীক হুতোম প্যাঁচার নক্শা', দ্বিতীয় পরিমার্জিত সং, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, পৃ. ৩০-৩১।

২. Mukherjee, S.N 'Bhadralok in Bengali Language and Literature', 'Bengal Past and Present, July Decmber 1976

৩. বাগল, যোগেশচন্দ্র সম্পা, 'বিষবৃক্ষ' বঙ্কিম-রচনাবলী, ১ম খণ্ড; দশম প্রকাশ, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, সাহিত্য সংসদ কলকাতা।

৪. হাসান, ড. বদরুল, 'উনিশ শতক : নবজাগরণ ও বাংলা উপন্যাস', জগৎমাতা পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ ১৯০, কলকাতা, পৃ. ১৭৩-১৮৮।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

# যুগ ও জীবন

বাংলার উনিশ শতকীয় সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসে সবচেয়ে কৌতূহলপ্রদ ও আলোচিত বিষয় বোধকরি 'বাবু'। ইংরেজদের হাত ধরে গ্রাম থেকে নগর, নগর থেকে মহানগর হয়ে ওঠা 'কলকাতা'কে কেন্দ্র করে অষ্টাদশ শতক থেকেই একদল বেনিয়া-মুৎসুদ্দি-ভুঁইফোঁড় দালাল-জমিদার ভিড় জমিয়েছিল অতিরিক্ত অর্থলাভের বাসনায়; কোনো কোনো বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েও ছিল। অর্থের পাহাড়চূড়ায় বসা এঁদের বংশজদের হাত ধরেই কালক্রমে 'বাবু' নামক এক কিম্ভূতকিমাকার সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটল বঙ্গদেশে। এ বঙ্গে ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের প্রথম পর্বে সবচেয়ে নির্মম, সবচেয়ে হাস্যকর উপজাত ফল হল 'বাবু'। ধর্মহীন, নীতিহীন, বিবেকহীন, মদ ও বেশ্যাসক্ত, দু'পাতা ইংরেজি পড়া না-পড়া এই 'বাবু'দের দল অর্থের গরবে ঘটা করে বিড়ালের বিয়ে দিতেন, মাতৃশ্রাদ্ধে বাইনাচের আসর বসাতেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দল পুষে ইচ্ছেমতো সমাজ ও ধর্মের বিধিবিধান উল্টে দিতেন, দু'চারটি ইংরেজি বুলি কপচিয়েই বিদ্যার গর্বে মদমত্ত হতেন, বুলবুল লড়াইয়ে লক্ষ টাকা ব্যয় করতেন, কোম্পানির নোট পুড়িয়ে সিগার ধরাতেন, আতর ও গোলাপজলে শৌচ সম্পন্ন করে বালাখানায় অর্ধশায়িত হয়ে মোসাহেবদের সঙ্গে গুলজার করতেন, নিজ ধর্মপত্নীর সঙ্গে ক্বচিৎ-কদাচিৎ সাক্ষাৎ না ঘটলেও উপপত্নীর প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলেন, ফলে উপপত্নীর শখ মেটাতে সর্বস্বান্ত হতেও দ্বিধা করতেন না। উনিশ শতকের কাব্য-কবিতায়, গল্প-গাথায়, নাটক-প্রহসনে, শিল্পে-সংগীতে যে কারণে 'বাবু'রই জয়জয়কার থুড়ি নিন্দাকীর্তন।

প্রদীপ জ্বালাবার আগে যেমন থাকে সলতে পাকানোর নিভৃত পর্ব, উনিশ শতকে 'বাবু'দের আবির্ভাবের পশ্চাতে তেমনি ইতিহাসের অনিবার্য ক্রমপরিণাম নিহিত ছিল। এই নিহিত ইতিহাসে যেমন বাঙালি জাতির বিশেষ চারিত্রিক গঠন সক্রিয় ছিল, তেমনি বাংলায় ইংরেজ বণিকদের আগমন এবং তাদের হাত ধরে ডিহি কলকাতা-সুতানুটি-গোবিন্দপুর মৌজার গ্রামীণ চরিত্র থেকে নাগরিক হয়ে ওঠার ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যবাহী বলেই উল্লেখের দাবি রাখে।

১৬০০ খ্রিস্টাব্দে রানি এলিজাবেথের সনন্দ লাভ করে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন প্রথম ভারতের মাটিতে পা রাখে, তখন এদেশে ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র কায়েমের কোনো রঙিন স্বপ্ন তাদের চোখে ছিল না। নিতান্ত ব্যাবসাবাণিজ্যের প্রয়োজনেই তাদের এদেশে আসা। বাংলাদেশও তাদের লক্ষ্য ছিল না; কলকাতার মতো নগণ্য গ্রাম তো নয়ই। কিন্তু মাদ্রাজ ও করমণ্ডল উপকূলে দারুণ দুর্ভিক্ষ ও ব্যাবসাবাণিজ্যে মন্দার কারণে অসহায় হয়ে প্রথমে মছলিপত্তন থেকে তারা সরে আসে ওড়িশার উপকূলভাগ হরিহরপুরে। সেখানে ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে তাদের প্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয়। পরের বছর বালেশ্বরে আরেকটি কুঠি তৈরি করে কোম্পানি। এইসময় থেকেই বাংলার উর্বর ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে রেশম, তুলো, মসলিন প্রভৃতি বস্ত্র ও সোরার দিকে তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তাছাড়া পর্তুগীজ জলদস্যু এবং ওলন্দাজ বণিকদের শত্রুতায় কোম্পানির বাণিজ্য ওড়িশায় তেমন জমে উঠতে পারছিল না। শাহ্-সুজা তখন বাংলার সুবেদার। সাধারণভাবে তখন বাংলায় শান্তি বিরাজ করছে, আর্থিক ক্ষেত্রে শ্রীবৃদ্ধি অব্যাহত, রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি নেই; মোগলদের শাসন সংক্রান্ত দলিলপত্রে বাংলাকে বলা হচ্ছে 'হিন্দুস্তানের বেহেশত্'। এ সমস্ত লক্ষ করে ইংরেজরা বাংলায় বাণিজ্য বিস্তারের জন্য সচেষ্ট হল। কথিত যে', জনৈক ডাক্তার গ্যাব্রিয়েল বৌটন (Gabriel Boughton) এ ব্যাপারে কোম্পানিকে যথোচিত সাহায্য করেন। শাহ্-সুজার সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল। সুজার সঙ্গে তিনি রাজমহলে এসেছিলেন। সেই সময় রাজমহল ছিল বাংলার রাজধানী। তিনি কোম্পানিকে বাণিজ্যের অনুমতি লাভে কিছু সাহায্য করে থাকতে পারেন।

১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে শাহ্-জাহান এক 'ফরমান' জারি করে ইংরেজ বণিকদের কোনোপ্রকার 'রাহাদারি' শুল্ক বা পথ-কর ছাড়াই অযোধ্যা, আগ্রা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সংগৃহীত বাণিজ্যদ্রব্য পশ্চিম উপকূলের বন্দর মারফত রপ্তানির অনুমতি দেন। ইংরেজরা এই ফরমানের ভিত্তিতে দাবি করে যে, বাদশাহ তাদের বিনাশুল্কে বাংলায় বাণিজ্য করবার অনুমতি দিয়েছেন। এই দাবি অযৌক্তিক জেনেও যৎপরোনাস্তি উপঢৌকনের বিনিময়ে বার্ষিক তিনহাজার টাকা করের বিনিময়ে বাংলায় অবাধ বাণিজ্যের সুবিধা লাভ করল ইংরেজরা, সুজার বদান্যতায়। এরই বলে ১৬৫১ সালে হুগলিতে কোম্পানির কুঠি স্থাপিত হল। তখন অবশ্য মোগল বাদশাহির দাবিকে কেন্দ্র করে শাহ্-জাহানের পুত্ররা পারস্পরিক কলহবিবাদে লিপ্ত। সুজা এইসময় বাংলার সুবেদার থাকলেও (১৬৩৯-১৬৫৯) তাঁর আসল লক্ষ্য ছিল দিল্লির মসনদ। কিন্তু এই লড়াইয়ে সুজার পতন হল এবং ইংরেজ কোম্পানির সাময়িক দুর্ভাগ্যের দিন আবার শুরু হল। সুজা বাংলার সুবেদার থাকাকালীন হুগলির কুঠি ছাড়া কোম্পানির আর একটি কুঠি স্থাপিত হয় ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে কাশিমবাজারে। বাংলার রেশম শিল্পের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে কাশিমবাজারের তখন খুব সুনাম। ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে কাশিমবাজারে ওলন্দাজদের কুঠির কথা জানা যায়।[২] সরস্বতীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় কাশিমবাজার তখন বাংলার নতুন বাণিজ্যক্ষেত্র হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে; সরস্বতীর স্রোত মন্দীভূত হওয়ায় সপ্তগ্রামের গৌরবসূর্য তখন অস্তাচলে। কাশিমবাজারে কুঠি স্থাপনের ফলে এই সময় থেকেই স্থানীয় অভিজাত মোগল ও হিন্দুদের সঙ্গে ইংরেজদের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। সুজার নবাবি 'নিশানে'র বলে বছরখানেক বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার পর কোম্পানির ঘোর সংকট উপস্থিত হয়। সুজার পতনের পর ঔরঙ্গজেব তখন মিরজুমলাকে বাংলার সুবেদার নিয়োগ করেছেন। যদিও আসামে যুদ্ধে ব্যাপৃত মিরজুমলা বাংলায় কখনো বসবাস করতে পারেননি। তবে তাঁর সময় থেকেই কিছুকালের জন্য কাশিমবাজার সুবেদারের জায়গিরে পরিণত হয়। ওই সময়ে কোম্পানি কোনো প্রকার 'রাহাদারি' ছাড়াই বাণিজ্য চালাত, ফলে ভারতীয় বণিকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হত। তাছাড়া ভিনদেশি অপরাপর বণিকেরাও এই ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এঁরা দিল্লিতে আবেদন করলে মিরজুমলা ভারতীয় বণিকদেরই সমর্থন করেন। ১৬৬২ সালের প্রথম দিকে ঔরঙ্গজেব হাজার গাঁটরি অবধি কাঁচা রেশম বিনা শুল্কে রপ্তানি করার আদেশ দেন। এর বিরুদ্ধাচরণ করলে মিরজুমলা সাময়িকভাবে ইংরেজদের বাণিজ্য বন্ধ করে দেন। অতঃপর স্থানীয় ফৌজদার বালচাঁদকে প্রচুর উৎকোচ দিয়ে ইংরেজরা আবার বাণিজ্যের অধিকার ফিরে পান। কিন্তু ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে শায়েস্তা খাঁ বাংলার সুবেদার হয়ে এলে আবার ইংরেজ কোম্পানি অসুবিধায় পড়ল। থাকাকালীন ইংরেজ কোম্পানি অসুবিধায় পড়ল। শায়েস্তা খাঁ সুদীর্ঘকাল প্রায় ২৩ বৎসর (১৬৬৪-৮৮) বাংলার সুবেদার থাকাকালীন ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে তাঁর বিরোধ বেধেছে এবং বার বার বাণিজ্যকুঠি পরিত্যাগ করে ইংরেজদের এলাকা ছাড়া হতে হয়েছে।

প্রথমে হুগলি, পরে কাশিমবাজারে অবস্থানকালে ইংরেজরা বাংলার লোকচরিত্র বিষয়ে গভীর অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তাঁরা বুঝতে পারছিলেন, এদেশের ভূমিজ সাধারণ মানুষ যেমন সরল, পরিশ্রমী, অল্পে সন্তুষ্ট ও নির্বিরোধী, উচ্চবর্গ তেমনি ক্রূর, উৎকোচলোভী, বিলাসী। উৎকোচগ্রহণ, নারীসঙ্গ, মদ্যপান প্রভৃতির বিনিময়ে এই সমস্ত অভিজাত মানুষ তাঁদের তথাকথিত চারিত্রিক ঔদার্য, সততা, বিশ্বস্ততা বিক্রয় করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না। এই সমস্ত শিথিল চরিত্র, আপাত অলস, বিলাসপ্রিয় উচ্চবর্গের মানুষের সঙ্গে ভবিষ্যৎ লাভের কথা ভেবেই ইউরোপীয় বণিকরা আপাত সুসম্পর্ক বজায়

রাখতেন। ইংরেজরাও সেই সুযোগ গ্রহণ করলেন এবং উচ্চবর্গের হাত ধরে বাণিজ্যের যাবতীয় বাধা অপসারণে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেন।

অবশ্য ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সাধারণভাবেই চারিত্রিক শৈথিল্য, উৎকোচপ্রিয়তা ছিল অভিজাত শ্রেণির স্বাভাবিক লক্ষণ। বাদশাহ স্বয়ং যে 'নজর' ও 'পেশকাশ' গ্রহণ করতেন, তা ছিল উৎকোচেরই নামান্তর। যেখানে স্বয়ং বাদশাহ এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারেন, সেখানে অমাত্য, সুবেদার কিংবা অন্যান্য কর্মচারীরা যে 'মহাজনো গত সঃ পন্থা' মত অনুসরণ করবেন, তাতে সন্দেহ নেই। মদ্যপান, স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি, ধর্ষণ প্রভৃতি অনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বাদশাহ মুখে কঠোর নীতি অনুসরণের কথা বললেও, কার্যক্ষেত্রে আশ্চর্যজনকভাবে শৈথিল্য প্রদর্শন করতেন।[৩] ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দূত উইলিয়াম নোরিসকে বলা হয়, বাদশাহের রাজত্বে বাণিজ্যের অনুমতির বিনিময়ে বাদশাহকে ২০০,০০০ টাকা এবং তাঁর কর্মচারীদের ১০০,০০০ টাকা প্রদান করতে হবে।[৪] মানুচিও একই কথা বলেছেন। পশ্চিম উপকূলে বিশেষ সুবিধার জন্য ইংরেজরা উক্ত অঞ্চলের তৎকালীন শাসনকর্তা বাহাদুর খান কোকালতাশকে প্রভূত উপহার (তথা উৎকোচ) প্রেরণ করেন, যদিও মধ্যবর্তী ব্যক্তিদের দ্বারা তাঁরা প্রতারিত হন। এইরূপ চরিত্রবৈশিষ্ট্য মোগল আমলের শেষদিকে রাজা, রাজন্যবর্গ, অভিজাত শ্রেণি সকলের মধ্যেই প্রায়শ দেখা যায়। দু'একজন অভিজাত মানুষই কেবল এ জাতীয় চরিত্রস্বভাব থেকে মুক্ত ছিলেন। টমাস বাউরী উল্লেখ করেছেন যে, বাংলার শাসনকর্তা শায়েস্তা খাঁ চীস্ খান নামক এক ব্যবসায়ীকে ৫০,০০০ টাকা উৎকোচ দিতে বাধ্য করেছিলেন।[৫] বাংলার আরেক শাসনকর্তা আজম খান কোকাও ব্যক্তিগতভাবে ২২ লক্ষ টাকা ও ১১২,০০০ মোহর সঞ্চয় করেছিলেন। এই তো ছিল তখন দেশের অবস্থা। 'বড়োর পিরীতি বালির বাঁধ' বলে ভারতচন্দ্র যে উক্তিটি করেছিলেন, উৎকোচের বিনিময়ে বাণিজ্যবৃত্তির অনুমতি দানের ঘটনায় তার সার্থকতা লক্ষ করা যায়। কখনো পুনর্বার উৎকোচের লোভে, কখনো অন্যপক্ষ থেকে অধিক পরিমাণ উৎকোচ পেয়ে, কখনো দুরভিসন্ধিপরায়ণ অমাত্যর উসকানিতে এই অনুমতি প্রত্যাহার করে নিতে দ্বিধা করতেন না বাদশাহ থেকে শুরু করে সুবেদারেরা পর্যন্ত সকলেই। বাংলায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজদের সেই অসুবিধাই দেখা দিল।

সুবে বাংলার শাসক হিসাবে শায়েস্তা খাঁ বাংলায় আসেন ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ মার্চ। এর পরেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে তাঁর বিরোধের সূত্রপাত হয়। শায়েস্তা খাঁ'র আমলে ফরাসি ও দিনেমার বণিকেরাও বাংলায় এসে ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করেছিল। ওলন্দাজরা তো আগে থেকেই ছিল। বাণিজ্যে এইপ্রকার প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়ে ইংরেজরা অধিক সুবিধালাভের জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু শায়েস্তা খাঁ সহ মোগল রাজকর্মচারীদের দাবি মেটাতে গিয়ে ইংরেজরা নাজেহাল হচ্ছিলেন। অন্যদিকে শায়েস্তা খাঁ'র মতে, ইংরেজ বণিকেরা ছিল 'নীচ, ঝগড়াটে এবং অসৎ'। এভাবেই সুবেদার এবং কোম্পানি উভয়পক্ষেই অসন্তোষ ক্রমে পুঞ্জীভূত হতে থাকে। এই সময়ই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রেকর্ডে কাশিমবাজার কুঠির চতুর্থ শ্রেণির সাধারণ কর্মচারী হিসাবে জোব চার্ণকের নাম প্রথম পাওয়া যায়, বেতন ২০ পাউন্ড। কিন্তু চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী হলেও চার্ণক ক্রমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিশেষ আস্থাভাজন হয়ে উঠছিলেন। চারিত্রিক নানান ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও চার্ণক ছিলেন উদাসী ও দূরদর্শী। তিনি তাঁর দূরদর্শিতা দিয়ে বাংলায় কোম্পানির বাণিজ্য সম্ভাবনার বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে চার্ণকের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ ফুরোনোয়, কোম্পানি নতুন চুক্তিবলে চার্ণককে পাটনা

কুঠিতে প্রেরণ করে। ১৬৮০ পর্যন্ত চার্ণক পাটনাতেই থাকেন। এইসময় পূজাপার্বণ, সামাজিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি উপলক্ষ্যে চার্ণক এদেশের সাধারণ জনজীবনের সান্নিধ্যে আসেন এবং নানাপ্রকার এদেশীয় বিশ্বাস-সংস্কারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। একইসঙ্গে কিংবদন্তী অনুযায়ী, সতীদাহের হাত থেকে উদ্ধার করে এক হিন্দু বিধবাকে তিনি বিবাহও করেন। ঘটনাটি সত্য-মিথ্যা যাই হোক না কেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে চার্ণকের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা যে গড়ে উঠেছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। এমনকী কলকাতায় বসবাসকালে থেলো হুঁকো হাতে বটগাছের তলায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলাপরত চার্ণকের যে কিংবদন্তী বাংলায় প্রচলিত, তা-ও আসলে সেই বিশেষ সত্যের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে যে, চার্ণক কোম্পানির সেই মুষ্টিমেয় কর্মচারীর মধ্যে একজন, যাঁরা বুঝেছিলেন বাণিজ্যে বাধাহীন অগ্রগতি পেতে গেলে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইংরেজরা এদেশে আসার বহু আগে থেকেই পর্তুগীজ ও ওলন্দাজরা বাংলার বুকে জমিয়ে বসেছিল। পর্তুগীজরা এসেছিল ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে। আরাকান ও চট্টগ্রামের বন্দর-উপকূলে তারা নোঙর ফেলেছিল। যদুনাথ সরকারের মতে,[৬] এরা ছিল জলদস্যু; পর্তুগাল রাজের 'অবাধ পলাতক প্রজা'। এদের স্থাপিত উপনিবেশগুলি গোয়ার পর্তুগীজ শাসনকর্তা কিম্বা পর্তুগাল রাজের আইনসঙ্গত উপনিবেশ ছিল না। পরবর্তীকালে এদের অনেকেই স্থানীয় মেয়েদের বিবাহ করে এদেশের মানুষের সঙ্গে মিশে যায়। তবে দস্যুতাবৃত্তি এরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত পরিত্যাগ করতে পারেনি। পর্তুগীজ জলদস্যু সিবাস্টিয়ান গঞ্জালেস টিবাও ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে সানদ্বীপ (সন্দ্বীপ) দখল করে নিজেকে স্বাধীন রাজা ঘোষণা করে। পরবর্তীকালে পর্তুগীজরা কেউ কেউ ব্যাবসাবাণিজ্যের দিকে মনোনিবেশ করে। সম্ভবত স্থানীয় শাসক ও মোগলদের প্রতিরোধের ফলে তারা দুস্যুবৃত্তি থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়। ১৫৩৭ থেকে ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এরা সপ্তগ্রামে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে, পরে নাব্যতা হ্রাসের জন্য ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে কুঠি সরে আসে হুগলিতে।[৭] এর প্রায় সত্তর বৎসর পর ১৬৫১-তে ইংরেজ কোম্পানি হুগলিতে তাদের কুঠি স্থাপন করে। কিন্তু ইংরেজদের আগে থেকে পর্তুগীজরা এলেও, তাদের সম্পর্কে এদেশের মানুষের মনে এক প্রকার শঙ্কামিশ্রিত দূরত্বের ভাব বজায় ছিল। তার কারণ বোধ হয় ব্যাবসাবাণিজ্যের পাশাপাশি দুস্যুবৃত্তি, বিশেষত জলপথে লুণ্ঠন ছিল পর্তুগীজদের অন্যতম পেশা। চৌধুরি পূর্ণচন্দ্র দেববর্মা তত্ত্বনিধি বলেছেন, 'চাটগাঁ-র ফিরিঙ্গিরা নৌকাযোগে আসিয়া বাংলায় ডাকাতি করিত এবং লোকদিগকে বন্দি করিয়া লইয়া যাইত।'[৮] এই সমস্ত লোকেদের মধ্যে বেশিরভাগ ছিল অল্পবয়স্ক যুবক, শিশু ও নারী; এদের দাস-দাসী হিসাবে বিক্রি করা হত দাক্ষিণাত্যে, তমলুকে, বালেশ্বরে। সেখান থেকে জলপথে এরা পাচার হয়ে যেত পশ্চিমের দেশগুলিতে। এ ছাড়া স্থানীয় মানুষদের উপর অকারণ অত্যাচার, নারীহরণ ও ধর্ষণ, জোর করে হিন্দুনারী বিবাহ ইত্যাদি গুরুতর কারণে পর্তুগীজদের সঙ্গে সাধারণ মানুষদের খুব একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। স্থানীয় মানুষদের কাছ থেকে তারা সাহায্যের প্রত্যাশাও করেনি, আরাকানরাজ ও দুর্ধর্ষ মগদের সাহায্যে (যে মগদের সম্পর্কেও বাংলার সাধারণ মানুষেরা বীতশ্রদ্ধ ছিলেন) তারা বলবান হয়ে উঠেছিল। পর্তুগীজদের অধিকৃত সন্দ্বীপ কিংবা ব্যাবসাবাণিজ্যের সূত্রে কুঠি স্থাপন করা সপ্তগ্রাম কিংবা হুগলি কোনো স্থানেই বন কেটে বসত গড়ার দিকে তারা মন দেয়নি। সুষ্ঠু নগর-পরিকল্পনা, কিম্বা বাংলার মানুষের দুর্দশা মোচনের ক্ষীণতম প্রচেষ্টার কথাও জানা যায় না। তা হলে হয়তো ইতিহাসের ধারাস্রোত অন্য খাতে বইত।

১৬৮০ সালে চার্ণক পাটনা থেকে পুনরায় কাশিমবাজার কুঠির দায়িত্ব নিয়ে এলেন। এইসময় মোগলদের অত্যাচারে এবং অপরাপর দেশি-বিদেশি বণিকদের বাধাদানের কারণে কাশিমবাজার কুঠির অবস্থা বিশেষ ভালো ছিল না। হুগলি কুঠির অবস্থা ছিল আরো সঙ্গিন। ১৬৮২ সালে বাংলায় কোম্পানির কুঠিগুলির পরিচালক হিসাবে উইলিয়াম হেজেস (William Hedges) এলে এই অবস্থা দূর করতে তিনি সক্রিয় হয়ে ওঠেন। প্রতিকারের আশায় ঢাকায় শায়েস্তা খাঁ-র সঙ্গে  সাক্ষাৎ করে মৌখিক প্রতিশ্রুতি নিয়ে এলেন হেজেস। কিন্তু 'রাহাদারি' শুল্ক কিংবা বাণিজ্য শুল্ক কোনোটিই না দিয়ে বাণিজ্য করার কারণে মোগল রাজকর্মচারীরা মালবোঝাই কোম্পানির নৌকা আটক করত। সম্ভবত এর পিছনে শায়েস্তা খাঁ-র প্রত্যক্ষ সমর্থন ছিল; যার ফলে হেজেসকে তিনি মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় করেন, কোনোরূপ 'ফরমান' বা 'নিশান' দেননি।

কোম্পানি প্রথম দিকে চেয়েছিল সাধারণভাবে মোগল শাসকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে, প্রয়োজনে উৎকোচ বা উপঢৌকন দিয়ে শান্তিতে বাণিজ্য করতে। কিন্তু মিরজুমলা বা শায়েস্তা খাঁ-র সুবেদারির আমলে বারংবার বাধা পেয়ে হেজেস বিরক্ত হয়ে উঠলেন এবং মনে মনে ঠিক করলেন, প্রয়োজনে মোগল শাসকদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে। এই ভেবে তিনি কোম্পানির লন্ডনস্থ কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মরক্ষার জন্য হুগলি নদীর মুখে সাগর দ্বীপে একটি সুরক্ষিত কুঠি নির্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু কোম্পানি এই অনুমতি দিলেন না, বরং বোম্বাই থেকে সমুদ্রপথে মোগলদের আক্রমণ করা কিংবা চট্টগ্রাম অধিকার করা আরো বেশি সুবিধাজনক এই মত জ্ঞাপন করলেন। ১৬৬৮ সাল থেকে বোম্বাই প্রত্যক্ষত কোম্পানির অধিকারে এসেছিল। বার্ষিক দশ পাউন্ড খাজনায় দ্বিতীয় চার্লস কোম্পানির হাতে বোম্বাইয়ের ভার তুলে দেন। এর পরেই বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কোম্পানির সঙ্গে মোগলদের যুদ্ধ বাধে। চার্ণকের এই সময়ের মনোভাব জানা না গেলেও তিনি যে হেজেসকেই সমর্থন করছিলেন, তা বেশ বোঝা যায়। চার্ণক তলে তলে কোম্পানির শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা শুরু করলে শায়েস্তা খাঁ হুগলির ইংরেজ কুঠি আক্রমণ করেন। ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৮ অক্টোবর শায়েস্তা খাঁ হুগলি কুঠি অধিকার ও ভস্মীভূত করেন। জোব চার্ণক লোক-লশকরসহ পালিয়ে গিয়ে হুগলির ২৪ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথীর পূর্ব তীরে সুতানুটি গ্রামে তাঁদের কুঠি সাময়িকভাবে সরিয়ে নেন। কিন্তু সেখান থেকেও বিতাড়িত হয়ে হিজলীতে তাঁরা  তাঁদের কুঠি স্থাপন করেন। কিন্তু মোগলদের বারংবার আক্রমণে এবং অস্বাস্থ্যকর জলহাওয়া ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপে সেখান থেকেও তাঁদের পালাতে হয়। ১৬৮৭ সালের জুন মাসে ইংরেজরা হিজলী ত্যাগ করেন।

অতঃপর মোগল শাসনকর্তা ও ইংরেজদের মধ্যে শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে সন্ধি হয় এবং ১৬৮৭-তে কোম্পানি সুতানুটিতে ফিরে আসে। সন্ধির ফলে ইংরেজরা কলকাতার ২০ মাইল দক্ষিণে উলুবেড়িয়ায় দুর্গ নির্মাণ এবং হুগলি বন্দরে বাণিজ্য করার অধিকার পান। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বোম্বাই উপকূলে মোগল নৌ-সেনাদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বাধলে শায়েস্তা খাঁ উক্ত অনুমতি প্রত্যাহার করে নেন। ইংরেজরা আবার সুতানুটি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এইরূপে বারবার নিরবচ্ছিন্ন বাণিজ্যে বাধা পড়ায় ইংরেজরা খোদ সম্রাটের  কাছ থেকে বাণিজ্যের ফরমান আদায়ের পরিকল্পনা করেন। ইতিমধ্যে ১৬৮৮-এর জুন মাসে শায়েস্তা খাঁ-ও বাংলা ত্যাগ করেন। কিছুকাল পরে ১৬৮৯-এর জুন মাসে ইব্রাহিম খাঁ বাংলা সুবেদারির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে ইব্রাহিম খাঁ পাটনার সুবেদার থাকার সময় চার্ণকের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা

জন্মেছিল। এদেশের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করবার যে গুণ চার্ণকের ছিল, তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। সেই সূত্রেই ইব্রাহিম খাঁ ইংরেজদের প্রীতির চোখে দেখতেন। ফলে বাংলার সুবেদারির দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি পুরাতন মিত্র চার্ণক ও তাঁর সহযোগীদের বাংলায় ফিরে আসার আমন্ত্রণ জানালেন। ক্যাপ্টেন হীথের অধীনে কোম্পানির লোকজন তখন মাদ্রাজে। জোব চার্ণক মাদ্রাজের কর্তৃপক্ষকে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করার পরামর্শ দিলেন, কারণ কোম্পানির পক্ষে এ এক অভাবনীয় সুযোগ। মিত্রপক্ষ যখন বাংলার সুবেদার, তখন বাংলায় অবাধে বাণিজ্য করার নানান অসুবিধাগুলি দূর করা সম্ভব হতে পারে সহজেই।

কোম্পানি যে বারবার বাধাপ্রাপ্ত হলেও ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূল বা অন্যত্র তাদের পাখির চোখ নিবদ্ধ করছিল না, বাংলাই ছিল সেই চোখ, তার কারণ আছে। সেটি হল এই, এশিয়া থেকে ইংরেজরা যে পরিমাণ পণ্য আমদানি করত, তার প্রায় ৬০ শতাংশই ছিল বাংলার পণ্য। কাজেই লসনের মতে[৯], বোম্বাই, সুরাট ও মালাবার তথা পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্যের চেয়ে বাংলাদেশের বাণিজিক স্বার্থ কোম্পানির কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে কাশিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ জন কেনের 'নোট' (Note) থেকে জানা যায়[১০] গম, চট, চিনি, মাখন, সাদা কাপড়, পিপুল, শুঁট, তিসিগাছের সূক্ষ্ম অংশের সুতোয় তৈরি কাপড়, চাল, তেল ইত্যাদি সংগৃহীত হয়ে কোম্পানি মারফত বিলেতে রপ্তানি হত। পরবর্তীকালে তুলো, নীল, লবণ ইত্যাদি এর সঙ্গে যুক্ত হয়। ফলে এই বিপুল পরিমাণ বাণিজ্যকে অব্যাহত রাখতে নিজেদের স্বার্থেই কোম্পানি চেষ্টা করল সম্রাটের কাছ থেকে অবাধ বাণিজ্যের 'ফরমান' আদায়ের।

ঔরঙ্গজেব তখন বৃদ্ধ, অশক্ত। দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের সঙ্গে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে রাজকোষে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। অন্যান্য অঞ্চল থেকে রাজস্ব সংগ্রহের হার ঠিক থাকলেও, ব্যয়ের তুলনায় তা নগণ্য। এমতাবস্থায় ইংরেজদের সঙ্গে পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্যাধিকার নিয়ে মোগলদের নিত্য অশান্তি তাঁর নির্দেশেই বন্ধ হল, সুরাটের ইংরেজ বণিকেরা তাঁকে সাড়ে চার লক্ষ টাকা দিলেন। অন্যদিকে তাঁর নির্দেশেই ইব্রাহিম খাঁ বাংলায় অবাধ বাণিজ্যের আমন্ত্রণ জানাল ইস্ট ইন্ডিয়া কেম্পানিকে। ঔরঙ্গজেবের তরফে এক নির্দেশনামা জারি করে (১৬৯০ খ্রি.) বার্ষিক মাত্র তিন হাজার টাকার বিনিময়ে নিঃশুল্ক বাণিজ্যের অধিকার দেওয়া হল বাংলায়, কোম্পানি যা সুজা'র আমল থেকে দাবি করে আসছিল। অতঃপর ঐ বছরই ২৪ আগস্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তরফে আরো ত্রিশজন ইংরেজ প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে মাদ্রাজ থেকে তৃতীয়বারের মতো ভাগীরথী তীরে সুতানুটি গ্রামে এসে যখন নোঙর ফেললেন জোব চার্ণক, সেদিনই বলা চলে ভারতবর্ষে ইংরেজ বেনিয়াদের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণে ইতিহাস রচনাও শুরু হল।

চার্ণক সুতানুটিতে কুঠি নির্মাণের অনুমতি পেলেও পরিকল্পনা সফল হওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয় (১০ জানুয়ারি, ১৬৯৩)। বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিও আচমকা অস্থির হয়ে ওঠে। মেদিনীপুরের অন্তর্গত চেতো-বরদার জমিদার শোভা সিংহ হঠাৎ বিদ্রোহ করে বসেন (১৬৯৫-৯৬) এবং প্রতিবেশীদের এলাকা লুণ্ঠন করেন। তাঁকে বাধা দিতে গিয়ে বর্ধমানের ইজারাদার রাজা কৃষ্ণরাম নিহত হন। শোভা সিংহ বর্ধমান নগর লুণ্ঠন করেন এবং কৃষ্ণরামের পরিবারস্থ লোকেদের বন্দি করেন। তাঁর সহযোগী হিসাবে ওড়িশার আফগান নায়ক রহিম খাঁ-ও বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এ সবই ঘটছিল কেন্দ্রীয় মোগল শাসনের দুর্বলতার সুযোগে। আপাত শান্ত বাংলার দিকে মোগল সাম্রাটেরা কখনোই সেভাবে নজর দেননি, প্রয়োজনও বিশেষ ছিল না। শান্ত, অলস, ভীরু বাঙালি মোগল সাম্রাজ্যের কাছে কখনোই মাথাব্যথার কারণ ছিল না। তখন আবার ঔরঙ্গজেব অতি বৃদ্ধ; তাঁর স্বাভাবিক ধীশক্তি, দূরদর্শিতা তখন তিরোহিত প্রায়। তবুও তিনি আশা

করেছিলেন, বাংলার সুবেদার ইব্রাহিম খাঁ শোভা সিংহ-করিম খাঁ-দের বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু যুদ্ধশাস্ত্রে নিতান্ত অপটু, বিলাসী ও আরামপ্রিয় ইব্রাহিম ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি না করতে পেরে তেমন কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় বিদ্রোহীদের সাহস বেড়ে যায়। কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম ঢাকায় ইব্রাহিমের কাছে সাহায্যের প্রত্যাশায় গেলে তিনি সামান্য এক ফৌজদারকে পাঠিয়ে দেন। উক্ত ফৌজদার শোভা সিংহের অতর্কিত আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পলায়ন করেন। কিছুদিনের মধ্যে কৃষ্ণরামের কন্যার সম্মানহানি করতে গিয়ে শোভা সিংহ তাঁর ছুরির আঘাতে প্রাণ হারান। তখন রহিম খাঁ 'শাহ্' উপাধি নিয়ে ১০,০০০ অশ্বারোহী এবং ৬০,০০০ পদাতিক সৈন্যদের নিয়ে নদীয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হন এবং মুখসুদাবাদ অধিকার ও লুণ্ঠন করেন, কাশিমবাজার থেকে মুক্তিপণ আদায় করেন (বাণিজ্যকেন্দ্র-অবরোধ মুক্তির বিনিময়ে), রাজমহল ও মালদা অধিকার করেন (১৬৯৭ খ্রি.)। ইংরেজরা সমস্ত পরিস্থিতির দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলেন। মোগল শাসনের দুর্বলতার সুযোগে এবং আত্মরক্ষার অছিলায় তাঁরা দ্রুত নিজেদের সুরক্ষার বন্দোবস্ত করতে চাইলেন। দুর্বল বন্ধু ইব্রাহিম খাঁ অনুমতি দিতে দ্বিধা করলেন না। সুতানুটিতে তাদের কুঠির চারদিকে ইংরেজরা প্রাচীর নির্মাণ করলেন, প্রাচীরের উপর কামান রাখার ব্যবস্থা করা হল, বাঁশের তৈরি গুদামের বদলে মাটি ও ইটে গাঁথা ঘরে মালপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র রাখার ব্যবস্থা হল। সুরক্ষিত স্থানটির নাম দেওয়া হল তৎকালীন ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নামে, ফোর্ট উইলিয়াম। সুতানুটিতে কুঠি নির্মাণ এবং ফোর্ট উইলিয়াম নামক আদতে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে গিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের সাহায্য অবশ্যই নিয়েছিল ইংরেজরা। এই সূত্রে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের একটি স্থায়ী আদান-প্রদানের সূত্র গড়ে ওঠে।

ইংরেজরা যখন এভাবে তাঁদের সামরিক ঘাঁটি সুরক্ষিত করছেন, তখন সুদূর দাক্ষিণাত্যে বসে ঔরঙ্গজেব অপদার্থ ইব্রাহিম খাঁ-কে পদচ্যুত করে নিজ পৌত্র আজিম-উশ্-শানকে বাংলার সুবেদার করে পাঠালেন। আজিমউদ্দিন বা আজিম-উশ্-শান বাংলায় পৌঁছে সৈন্য প্রেরণ করে ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে রহিম খাঁ-কে পরাজিত ও নিহত করে বাংলার বুকে সাময়িক শান্তি ফিরিয়ে আনলেন। অন্যান্য সুবেদার ও মোগল রাজপুরুষদের সাধারণ ধর্ম অনুযায়ী আজিমউদ্দিনও ছিলেন উৎকোচলোভী। মোগলদের দিল্লীর তক্ত নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং উত্তরাধিকার ঘটিত সমস্যা তাঁকেও পীড়িত করে রাখত। ইংরেজরা তখন শুধুমাত্র সুতানুটি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চাইছেন না। আশেপাশের আরো কয়েকখানি গ্রাম নিজেদের অধিকারে নিয়ে এসে সুপরিকল্পিত ভাবে নূতন বাণিজ্যবন্দর তৈরি করে সেখানে একচেটিয়া ব্যাবসার অধিকারী হবার স্বপ্ন তাঁদের চোখে-মুখে। মোগল অভিজাতদের স্বাভাবিক শিথিল চরিত্রের কথা তাদের অজানা ছিল না, আজিমউদ্দিনের স্বভাবও তাঁরা জানতেন। অতএব জন গোল্ড্‌সবোরোর (John Goldsborough) পরিকল্পনা অনুযায়ী গোবিন্দপুর, সুতানুটি ও ডিহি কলকাতার জমিদারি স্বত্বলাভের জন্য আজিম-উশ্-শানকে প্রভূত উপঢৌকন এবং আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। সেইসঙ্গেই দুর্গ তৈরির অনুমতি প্রার্থনা করা হল। এই তিন অঞ্চলের তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক বেহালার জমিদার সাবর্ণ রায়চৌধুরিদের ঐকান্তিক আপত্তি সত্ত্বেও ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ১৩০০ টাকার বিনিময়ে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দখলিস্বত্বে চলে যায় ওই তিনটি গ্রাম, যার আয়তন ছিল ৫০৭৬ বিঘা ১৮ কাঠার সামান্য বেশি।

পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখে ইংরেজরা অতিদ্রুত এই অঞ্চলে তাঁদের সুরক্ষার বন্দোবস্ত করতে থাকেন। ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা প্রেসিডেন্সি শহরে উন্নীত হয় এবং কলকাতায় তাঁদের বাণিজ্য পরিচালনার জন্য কোম্পানির তরফে একজন প্রেসিডেন্ট ও তাঁকে পরামর্শ দেবার জন্য চার সদস্যবিশিষ্ট

একটি কাউন্সিল গঠন করা হয়। এই কাউন্সিল ১৭০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে কাজ শুরু করে। এই সময় থেকেই পুরাতন অধিবাসীদের পাশাপাশি অন্যান্য সম্প্রদায় ও জাতিগোষ্ঠির লোকেরা কলকাতায় আসতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে জলা-জঙ্গল সমাকীর্ণ, অস্বাস্থ্যকর, বিপদসংকুল কলকাতার চরিত্রও বদলাতে শুরু করে। জনসংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা নিজস্ব আদালত ও আরক্ষা-বাহিনী তৈরি করেছিল। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হলে পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কলকাতাকে কেন্দ্র করে ইংরেজ বণিকেরা অতি দ্রুত একটি সমান্তরাল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এই বছরই নিকাশি ব্যবস্থার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সেইসঙ্গে পানীয় জলের আধার হিসাবে লালদিঘিকে সংস্কার করার পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়। ইউরোপীয়দের জন্য একটি হাসপাতাল গড়ে ওঠে। একজন ডাক্তারও নিযুক্ত হন।

মনে রাখা দরকার, মোগল আমলের রাজস্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী জমিদারিকে তিনটি প্রধানভাগে ভাগ করা হত : (ক) স্বরাট সর্দার, (খ) মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার এবং (গ) প্রাথমিক বা উপক্রমী জমিদার। স্বরাট সর্দার সরাসরি সম্রাটের কাছে নির্দিষ্ট রাজস্ব এবং অতিরিক্ত আদায় জমা দিতেন; তাঁরা মধ্যস্বত্বভোগী জমিদারের নিকট, প্রয়োজনে প্রাথমিক বা উপক্রমী জমিদারদের কাছ থেকে এই রাজস্ব সংগ্রহ করতেন। মধ্যস্বত্বভোগীদের মধ্যে ছিলেন তালুকদার বা ইজারাদারেরা। তাঁরা প্রাথমিক বা উপক্রমি জমিদারদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট কর ও অতিরিক্ত আদায় সংগ্রহ করে নিজেদের ভাগ রেখে স্বরাট সর্দারকে জমা দিতেন। প্রাথমিক জমিদারেরা ছিল ব্যবহারিক অর্থে কৃষি ও জমির মালিকানাভোগী বর্গ। ইজারাদার বা তালুকদারকে প্রাপ্য রাজস্ব দেওয়া ছিল তাদের কর্তব্য। অবশ্য মোগল আমলের প্রাপ্ত নথিপত্রে প্রায়শই বলা হয়েছে যে, বলপ্রয়োগ না করলে কেউ সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব দিতে চাইত না। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মোগল রাজস্ব ব্যবস্থার নিয়ম অনুযায়ী মধ্যস্বত্বভোগী তালুকদারি স্বত্ব লাভ করেছিল মাত্র, জমিদারি স্বত্ব নয়। কিন্তু প্রায় বিচ্ছিন্ন এই অঞ্চলে নবাবি ব্যবস্থা তেমন দৃষ্টি দিতে না পারায়, ইংরেজরা প্রকারান্তরে স্বাধীন ‘জমিদারি’ পত্তন করেছিলেন। তাঁদের স্থাপিত আদালতের বিচারক ছিলেন কোম্পানি কাউন্সিলের সদস্য ‘জমিদার’। প্রথম দিকে বিচার হত মোগল আইন অনুসারে। সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলায় বিচারে সন্তুষ্ট না হলে ‘জমিদারের’ রায়ের বিরুদ্ধে বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষই প্রেসিডেন্ট এবং কাউন্সিলের কাছে আপিল করতে পারত। পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় জর্জের দু’টি সনদ (১৭২৬, ১৭৫৩) অনুযায়ী মেয়র’স্ কোর্ট, কোর্ট অব রেকর্ড এবং কোর্ট অব রিকোয়েস্ট নামে আরো তিনটি আদালত স্থাপিত হয়। এই বিচারালয়গুলিতে ইংল্যান্ডের আইন বলবৎ ছিল। নবাবি শাসনের আওতায় থেকেও তাকে কার্যত উপেক্ষা করে স্বতন্ত্র প্রায়-স্বাধীন ভূখণ্ড গড়ে তোলার এই দৃষ্টান্ত যে অশনিসংকেত দিচ্ছিল, দুর্ভাগ্যের বিষয় তা বোঝা বা লক্ষ করার মতো সময় বা দূরদর্শিতা বাংলার তৎকালীন শাসকদের ছিল না। অথচ এই বিচারালয়গুলিতে স্থানীয় মানুষেরা নিজ উদ্যোগে কতটা বিচার চাইতেন, সে ব্যাপারে সন্দেহ থেকেই যায়। উনিশ শতকের শেষ দশকেও প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের ‘দারোগার দপ্তর’ থেকে জানা যায়, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বা ইউরোপীয়ানদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে পুলিশের তথা দেশীয় পুলিশের বিশেষ কিছু করার থাকে না কারণ, ‘এই মোকদ্দমার যদি কিনারা না হয়, তাহা হইলে আমাদিগের অনিষ্ট হইবার কোনরূপ সম্ভবনাই নাই; কিন্তু এই মোকদ্দমার কিনারা করিতে গিয়া যদি মিসের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদিগের পদে পদে বিপদ ও বিশেষরূপ অনিষ্ট হইবার সম্ভবনা আছে।’[১১] কাজেই অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় কিংবা মধ্যভাগে কলকাতায় ইংরেজ স্থাপিত বিচারালয়গুলিতে

একতরফা এদেশীয় মানুষদেরই বিচার হত। বিদেশি ডিহিদারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিচার চাওয়ার অধিকার বা সাহস কোনোটিই ছিল না।

তবে সাধারণভাবে কলকাতার কার্যভার সামালানোর জন্য ১৭০০ সালে কলকাতা কাউন্সিলে একজন অতিরিক্ত সভ্য নিয়োগ করা হল এবং তাঁকে 'জমিদার' আখ্যা দেওয়া হল। সেইসঙ্গেই তাঁর কার্য পরিচালনার সুবিধার জন্য একজন 'নেটিভ' কর্মচারী নিয়োগ করা হল, যাঁকে বলা হত 'কালা জমিদার' (Black Zamindar)। 'কালা জমিদার' বস্তুত কোম্পানি এবং স্থানীয় উদ্যোগপতি, সাধারণ মানুষদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের কাজ করতেন, রাজস্ব সংগ্রহের কাজে সাহায্য করতেন, কোম্পানির নানাবিধ কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন, এককথায় তিনি ছিলেন কোম্পানি নিযুক্ত দেশীয় দেওয়ান। হরিহর শেঠ জানিয়েছেন, 'জমিদার ও ব্ল্যাক জমিদার নামে সেকালে দুইটী সম্মানের পদ ছিল। তাহাদের কাজ ছিল কলিকাতা প্রভৃতি গ্রাম তিনখানি দেখা, বাজারগুলি পরিদর্শন ও তাহার হিসাবপত্র রাখা। হল্‌ওয়েল্ (Zaphaniah Holwell) ১৭৫২ হইতে ১৭৫৬ পর্য্যন্ত জমিদার এবং গোবিন্দরাম মিত্র কালো জমিদার ছিলেন ১৭২০ হইতে ১৭৫৬ পর্য্যন্ত।'[১২] গোবিন্দরাম ছিলেন প্রথম দিকের একজন 'বাবু'। সৎ এবং অসৎ উভয়পথে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত অক্টোরলনি মনুমেন্টের চেয়েও উঁচু 'ব্ল্যাক প্যাগোডা' নামক মন্দিরটি উনিশ শতকের প্রথম ভাগেও ধ্বংসাবশেষ আকারে সম্ভবত বর্তমান ছিল। হিকি বা ড্যানিয়েলের ছবিতে নবরত্ন বলে খ্যাত কিন্তু আদতে পঞ্চরত্ন এই মন্দিরটি[১৩] ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও ভূমিকম্পে ভেঙে পড়ে। বাবুত্বের গরিমায় গোবিন্দরাম উজ্জ্বল, সম্ভবত ভবিষ্যতের বাবুদের পথিকৃৎস্বরূপ। 'ব্ল্যাক জমিদার' গোবিন্দরাম মিত্র দিয়ে শুরু, এরপর কোম্পানির মধুভাণ্ডে মধুপান করতে উড়ে আসেন আরো অনেক দেশীয় পুরুষ-উদ্যোগপতি, নীতিজ্ঞানের বালাই যাঁদের বিন্দুমাত্র ছিল না।

কলকাতাকে ঘিরে এই যাবতীয় উন্নয়ন-পরিকল্পনা কিন্তু আদিপর্বে কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ ছিল ইউরোপীয়দের বসবাসের এলাকায়, পরবর্তীকালে যাকে বলা হত 'সাহেবপাড়া'। কলকাতার প্রকৃত নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের কাজ শুরু হয় অনেক পরে, ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে, ওয়েলেসলি কর্তৃক লটারি কমিটি গঠিত হওয়ার পর।[১৪] প্রথমদিকে প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য 'শহর'টিকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়: (১) বড়োবাজার; (২) 'শহর' কলকাতা; (৩) সুতানুটি; (৪) গোবিন্দপুর। তিনটি শহরের বাসিন্দাদের কাছ থেকে কোম্পানির আনুমানিক আয় ছিল: (১) ডিহি কলকাতা : ৪৬৮-৯-৯ টাকা; (২) সুতানুটি : ৫০১-১৫-৬ টাকা এবং (৩) গোবিন্দপুর: ২২৪-৫-২ টাকা। নবাবি ব্যবস্থা অনুযায়ী, প্রজাদের কাছ থেকে প্রতি বিঘায় তিন টাকা খাজনা আদায় করা যেত। কিন্তু মুনাফার অঙ্ক বাড়ানোর জন্য কোম্পানি প্রায়শই রাজস্ব বৃদ্ধির চেষ্টা করত। খাজনা দিতে অপরাগ প্রজাদের কাউন্সিলের 'জমিদার' কয়েদ করে রাখতেন, চাবুকও মারা হত হতভাগ্যদের। কলকাতায় ইতিমধ্যে বিচারালয় স্থাপিত হলেও কালেক্টর বা 'জমিদার'বৃন্দ তার ধার ধারতেন না। 'ব্ল্যাক জমিদারে'রা ছিলেন এসব কাজে তাঁদের সহায়ক। স্বনামধন্য গোবিন্দরাম মিত্র, নন্দরাম সেন প্রভৃতি পর্বের বাবুরা এই বৃত্তিতেই 'বনেদি বড়োলোক' হয়ে যান। ভূমিরাজস্ব ছাড়াও নেওয়া হত বাজার কর, গৃহ কর, চৌকিদারি কর, তৌলদারি কর, নগরশুল্ক, আবগারি কর, বহিঃশুল্ক, নৌকা ফেরিঘাট রাস্তা ও সেতুর কর, স্ট্যাম্প শুল্ক, কলকাতার সৌন্দর্যায়নের কর ইত্যাদি। তবে এ সমস্তই ধাপে ধাপে যুক্ত হয়েছে অষ্টাদশ শতক থেকে শুরু করে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত। প্রথম দিকে ভূমিরাজস্ব, বাজার কর, গৃহ কর, চৌকিদারি কর ইত্যাদি করই কেবল সংগৃহীত হত।

কিন্তু বলা বহুল্য, রাজস্ব সংগৃহীত হলেও কলকাতার সামগ্রিক এলাকার উন্নতিসাধনে ইংরেজদের অনীহাই ছিল। ১৭০০ থেকে কোম্পানি কাউন্সিল গঠন করে করারোপের ব্যবস্থা গঠিত হলেও কেমন ছিল 'সাহেব পাড়া' ব্যতীত বৃহত্তর কলকাতার চেহারা? রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর জানাচ্ছেন, 'তৎকালে কলিকাতা জঙ্গলময় ছিল; সুতরাং ওই স্থান যে সে সময়ে সুন্দরবনেরই একাংশ ছিল, একথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। কলিকাতা তখন একটা জলাময় স্থান ছিল। তৎকালে স্থানে স্থানে যে সকল জঞ্জাল আবর্জনা স্তূপাকার করা থাকিত এবং যে সকল জলকুঞ্জ নিঃসরণাভাবে পড়িয়া পচিত, তাহাতে যে স্থানীয় অস্বাস্থ্যকরতা শতগুণে বর্ধিত করিবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?... স্থানে স্থানে যে সকল পুষ্করিণী ছিল, সেগুলি রোগের আগারস্বরূপ ছিল। বনজঙ্গল, মৃত্তিকার আর্দ্রতা, সুন্দরবন হইতে অবিশুদ্ধ বায়ু, কলিকাতার সন্নিহিত লবণ জলের হ্রদ— এগুলি সমস্তই উহার অস্বাস্থ্যকরতার মূলীভূত কারণ ছিল। সুতরাং কলিকাতা তৎকালে অস্বাস্থ্যকরতার মূর্তিমান প্রতিরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হইত।'[১৫] এই বিবরণ ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দের দিককার কলকাতার। এ. কে. রায় 'কলকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে' জানাচ্ছেন, 'সে সময় (১৭৮০) কলিকাতা জলনিকাশি ব্যবস্থাহীন জলাভূমি মাত্র; তাহাকে ঘিরিয়া ছিল ম্যালেরিয়া পূর্ণ জঙ্গল'[১৬] সাধারণ মানুষ এর মাঝেই বসবাস করতেন। ইংরেজ বেনিয়ারা ১৬৯৮ সালে কলকাতাকে প্রেসিডেন্সি শহরে উন্নীত করলেও উনিশ শতকের মধ্যভাগের আগে অবস্থার ইতরবিশেষ ঘটেছিল মাত্র। ইংরেজরা 'Town' বা 'শহর কলকাতা' বলতে হয়তো ফোর্ট উইলিয়ামকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা ইউরোপীয় বসতিকে বুঝতেন। শহরের জন্মলগ্ন থেকে 'কলকাতা'য় তিনপ্রকার শ্রেণির উত্থান হল। বাস্টেডের মতে, 'The houses of the English inhabitants were scattered in large enclosures for about half a mile to the east of it. Beyond the English houses were closely clustered the habitations and huts of the natives; the better classes of them, including the "Black Merchants", dwelt to the north; the lower sont in the bazaars to the east and south.'[১৭] সাহেব, দেশীয় সাধারণ মানুষ এবং 'ব্ল্যাক মার্চেন্ট' অর্থাৎ দেশীয় বণিকশ্রেণি— এঁদের মধ্যে ছিলেন দালাল, বেনিয়া, মুৎসুদ্দি এঁরা সকলে। আমাদের আলোচ্য 'বাবু'দের উত্থান এই তৃতীয় শ্রেণির হাত ধরেই।

ইংরেজদের হাত ধরে 'শহর' কলকাতার যে উত্থান, তাতে 'শহরত্ব' কতটা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। এ. কে রায় জানিয়েছেন,[১৮] প্রথম যুগে যে গ্রামে একটি হাট বা 'বাজার' থাকত, সেই গ্রামই নিজেকে শহর বলে পরিচয় দিত। সরম্যানের নেতৃত্বাধীন কমিটি কলকাতার সংলগ্ন ৩৮টি 'শহর' কিনে নিতে চেয়েছিল, যেগুলি বস্তুত নদী তীরবর্তী গ্রামের তুলনায় অধিক উন্নত ছিল না। মুর্শিদকুলি খাঁ-র আপত্তিতে তা অবশ্য সম্ভব হয়নি। বাজার এবং শহরের যোগাযোগটি আসলে নবাবি অভ্যাসের অনুক্রম। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বকালে মোগল শাসক কিংবা সুবেদারের বসবাসস্থলের অনতিদূরে মুখ্যত নবাব বা সুবেদারের প্রচেষ্টায় বাজার গড়ে উঠত। আর এই বাজারের হাত ধরেই নানা শ্রেণির বেনিয়া-দালাল ও সাধারণ মানুষের ভিড় জমে উঠত নগরে। এইসব বাজার ছিল নগরের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক উভয় ক্ষেত্রেই চালিকাশক্তি। সেই অভ্যাসবশতই 'কলকাতা' ও তৎসংলগ্ন এলাকা তখন 'গ্রাম' পরিচয় মুছে ফেলে 'শহরে' উন্নীত, যদিও তার দেহে-মনে নাগরিকতার চিহ্নটুকু তখনও লাগেনি।

একথা ঠিক, ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে সম্পূর্ণ আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'তে আকবরের রাজ্যের অন্তর্গত সাতগাঁও সরকারের অন্যতম মহাল বা পরগণা হিসাবে 'কলিকাতা' মহাল বা পরগণার উল্লেখ

আছে। কিন্তু এর দ্বারা স্থানটির উৎকর্ষ প্রতিপাদিত হয় না। সুখময় মুখোপাধ্যায় আনুমানিক ১৫৯৮ শকাব্দ বা ১৬৭৬-৭৭ খ্রিস্টাব্দে রচিত কৃষ্ণরাম দাসের 'কালিকামঙ্গল'-এর সাক্ষ্য উদ্ধার করেছেন :[১৯]

সপ্তগ্রাম সরকার কলিকাতা নাম তার
পরগণা অনুপম ক্ষিতি।
সাবর্ণি চৌধুরী জায় সর্ব্বলোকে গুণ গায়
পশ্চিমে আপনি ভাগীরথী॥ ইত্যাদি।

এছাড়াও কৃষ্ণরামের সমসাময়িক কবি সনাতন ঘোষাল বিদ্যাবাগীশের কাব্যের 'আত্মপরিচয়' অংশ ব্যবহার করে তিনি মত প্রকাশ করেছেন যে,[২০] ইংরেজদের হাতে প্রেসিডেন্সি শহর হিসাবে গড়ে ওঠার আগেই কলকাতা একটি বর্ধিষ্ণু জনপদ (নগর নয়) ছিল। কিন্তু এই সাক্ষ্য এবং সিদ্ধান্ত কতদূর গ্রহণযোগ্য, সে বিষয়ে সংশয় থেকেই যায়। কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ বাস করলেই কোনো স্থান বর্ধিষ্ণু ও সুপ্রাচীন জনপদ হিসাবে স্বীকৃত হয় না, তা অনস্বীকার্য। অন্যদিকে, কলকাতার স্থানমাহাত্ম্যের জন্য কবি নিজেকে 'কলকাতা'স্থ সন্তান বলে পরিচয় দিয়েছেন, এমনটি নয়। কৃত্তিবাস যখন গৈলা ফুল্লশ্রীর কথা বলেন, কিংবা মুকুন্দ চক্রবর্তী যখন দামুন্যার উল্লেখ করেন, তখন উক্ত স্থানগুলির মাহাত্ম্য আছে বলে নয়; কবিদের পরিচয়েই উক্ত স্থানগুলি মাহাত্ম্যব্যঞ্জক হয়ে উঠবে বলেই। কৃষ্ণরাম কিংবা সনাতন ঘোষাল এভাবেই কলকাতার নামোল্লেখ করেন। এছাড়া ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে না স্থানমাহাত্ম্যে, না নূতন বাণিজ্য-বন্দর হিসাবে কলকাতা বিকশিত হয়নি। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে মানুচি দিল্লি থেকে বাংলায় পর্যটনসূত্রে আসেন। তিনি সেইসময় মোগলদের প্রধান প্রধান সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ করেন। মানুচি ঢাকা থেকে জলপথে হুগলি বন্দরে এসে পৌঁছোন। লবণের একচেটিয়া ব্যাবসা করে পর্তুগীজরা তখন প্রবল হয়ে উঠেছে। সে কথা উল্লেখ করলেও স্থানমাহাত্ম্য ছিল না বলেই 'কলকাতা'র কোনো উল্লেখ তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখিত হয়নি। স্থান হিসাবে কলকাতা যে জলাজঙ্গলপূর্ণ অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্র একখানি গ্রামমাত্র ছিল, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। ইংরেজ আসার পরেও তার অবস্থার উন্নতি হয়নি একশো বছরেও। তাদেরকে ম্যালেরিয়া, কলেরা কিংবা কালাজ্বরের সঙ্গে ভুগতে হয়েছে দীর্ঘদিন। নদীতীরগুলি তখন পশু আর মানুষের মৃতদেহ পড়ে পড়ে জমে উঠত। ১৭৬৯ পর্যন্ত পয়ঃপ্রণালীর কোনো বালাই ছিল না। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে চৌরঙ্গি অঞ্চলে বাঘ বেরোত, হাতি তো যত্রতত্র হামেশাই দেখা যেত। এমনকী ১৮২৫ সালেও কলকাতার অন্যতম নামি জায়গা চিৎপুরের আশেপাশে প্রকাশ্য দিবালোকে শেয়াল ঘুরতে দেখেছিলেন বিশপ হেবার। অতএব সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে কলকাতা যে সমৃদ্ধ ও বর্ধিষ্ণু জনপদ হিসাবে কেমন ছিল; তা সহজেই অনুমেয়। তাছাড়া কলকাতার প্রাকৃতিক সম্পদ ও স্থানিক মাহাত্ম্য যদি সত্যিই কিছু থাকত, তবে মোগল শাসকেরা এই অঞ্চলটির যথাযথ শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে তৎপর হতেন বলেই মনে হয়। কালীঘাট কিংবা সতীপীঠের কিংবদন্তীর প্রাচীনত্বও সংশয় চিহ্নিত। ফলে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, স্থান হিসাবে কলকাতার অস্তিত্ব থাকলেও, তাকে ঘিরে তখনও কোনো ঐতিহাসিক বা অনৈতিহাসিক মহিমা ছিল না। সে মহিমা অচিরে নয়, ধীরে ধীরে গড়ে উঠল ইংরেজদের হাত ধরেই। যদুনাথ সরকারের ভাষায়, 'ভারতের যে নব-জীবন ইংরাজ-যুগে আসিয়াছে, যাহার ফলে ভারতবাসী আজ বর্তমান সভ্য জগতের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছে, তাহার উদ্ভব কলিকাতায়।'[২১]

তবে ১৭৫৭-র আগে পর্যন্ত বাংলার তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভবিষ্যতে অংশগ্রহণ করার কোনো বাসনা ইংরেজের মনে সম্ভবত ছিল না। এমনকী পলাশির যুদ্ধ ও ষড়যন্ত্রও ছিল প্রধানত একচেটিয়া এবং নিরঙ্কুশ বাণিজ্যাধিকারের তাগিদে। কলকাতায় কোম্পানির নিজস্ব এলাকায় এবং পরবর্তীকালে উচ্চবর্গের অভিজাত এদেশীয় দালাল-বেনিয়া-মুৎসুদ্দিদের বসবাসের এলাকায় উন্নতিসাধনের যাবতীয় পরিকল্পনা সেদিকেই ইঙ্গিত করে। তখন ব্যাবসাবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটছিল অতিদ্রুত। এই সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রপ্তানি প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ৮ শতাংশ হারে বাড়ছিল। 'পলাশির যুদ্ধের অব্যবহিত পরে, ১৭৫৮-৫৯ খ্রিস্টাব্দে, বাংলাদেশ থেকে কোম্পানির মোট রপ্তানির মূল্যমান ছিল ৩১ লক্ষ টাকা, ১৭৮০ থেকে ১৮০৯ এই ত্রিশ বৎসরের রপ্তানির গড় মূল্যমান ছিল ১ কোটি টাকার মতো, আর ১৮১১-১২ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ৩ কোটি টাকা দামের জিনিসপত্র কোম্পানির উদ্যোগে রপ্তানি হয়েছিল।'[২২] এই বিপুল পরিমাণ রপ্তানি থেকে, সেইসঙ্গে সংগৃহীত রাজস্ব ও অন্যান্য শুল্ক থেকে কোম্পানির যে লাভ হচ্ছিল, তা অর্থের বহিঃস্রোতের আকারে ইংল্যান্ড ও ইউরোপের দেশগুলিতে লগ্নীকৃত হচ্ছিল। কলকাতাকে ব্রিটিশ উপনিবেশের রাজধানী বানানোর কোনো পরিকল্পনা থাকলে তার কিছুটা অন্তত কলকাতার উন্নয়নে ব্যয়িত হত বলেই মনে হয়। অথচ ১৭৫৬ সালের প্রাপ্ত বিবরণীতেও দেখা যায় কলকাতার সামগ্রিক জীবনযাত্রার মধ্যে সেই পূর্বেকার বিভাজন অব্যাহত। কোম্পানির এক কর্মচারী জানাচ্ছেন : 'The Bank of the Hooghly was lined on either side of the Fort, with large and handsome houses, built and inhabited by the chief among the English factors; and in the near were several equally large and imposing habitations belonging to opulent baboos, or native merchants; but the native town consisted of thatched huts– some composed of mud, and others of bamboos and mats, all un couth and mean; the streets were dirty, narrow and crooked whilst a pestilential swamp, close at hand, filled the air with sickly exhalations.'[২৩] বস্তুত, বাংলায় কোম্পানি আমলের প্রথম দিকে কোম্পানির নিজস্ব শ্রীবৃদ্ধি ছাড়া আর যাঁদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে, তাঁরা উপরে উল্লিখিত 'বাবু' (baboo) তথা এদেশীয় বণিকদের। বাবুত্বের সঙ্গে তখন থেকেই ব্যাবসাবাণিজ্য ও অর্থকৌলিন্যের যোগ। এদেশে বাণিজ্যকর্মে বাধাহীন অবস্থা বজায় রাখতে এই বিশেষ শ্রেণির আস্থা অর্জন আবশ্যক ছিল কোম্পানির। নিজেদের বসবাসের এলাকার বাইরের ঘনিষ্ঠ বৃত্তে এ কারণে এই বিশেষ শ্রেণির ঠাঁই হয়েছিল।

আসলে ব্যাবসার প্রয়োজনে কলকাতাকে কেন্দ্র করে ইংরেজরা বন কেটে যে নূতন বসতি গড়ে তুলছিল, সেখানে প্রয়োজন ছিল যেমন প্রাথমিক মূলধনের, তেমনি দেশীয় উদ্যোগপতি ও সাধারণ শ্রমিকদেরও। অতএব একদিকে চলল উদ্যোগপতি নিয়োগের কাজ, অন্যদিকে সেই উদ্যোগপতিদের সাহায্যে দেশীয় শ্রমিক জোগাড়ের কাজ। হরিহর শেঠের মতে,[২৪] শেঠ ও বসাকেরাই কলকাতার প্রাচীনতম বাসিন্দা। এঁরা ষোড়শ শতাব্দীতে সপ্তগ্রাম থেকে সুতানুটিতে হাট পত্তন করেন। এ ছাড়াও ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার পঞ্চানন কুশারি। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন কোম্পানির প্রথম যুগের 'দালাল'। ইংরেজদের ব্যাবসাবাণিজ্যের কাজে সাহায্য করা, লোক জোগাড় ও কাঁচামাল সংগ্রহ, প্রাথমিক মূলধন জোগাড় করা, প্রয়োজনে দৌত্য করা— সকল বিষয়েই এঁদের সহায়তা বাংলায় কোম্পানির আদিযুগে শ্রীবৃদ্ধিসাধনের কারণ হয়েছিল। স্বনামধন্য বৈষ্ণবচরণ শেঠের পিতা জনার্দন শেঠ ছিলেন কোম্পানির প্রথম যুগের বিশ্বস্ত দালাল। আবার প্রমথনাথ মল্লিক উল্লেখ করেছেন রাজারাম মল্লিকের কথা[২৫], যিনি মুর্শিদকুলী খাঁ-র সভায়

ইংরেজদের হয়ে দৌত্য করতে গিয়েছিলেন। ইংরেজদের সঙ্গে এঁদের ব্যাবসায়িক সম্পর্ক ছিল। ত্রিবেণী থেকে মোগলদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে কলকাতায় এলে এঁরা বিনা খাজনায় ইংরেজদের কাছ থেকে জায়গা পান। ঠাকুর পরিবারের পঞ্চানন কুশারির কাজ ছিল সাহেবদের জাহাজে মাল তোলা-নামানো এবং খাদ্য-পানীয় সরবরাহের ব্যবস্থা করা। এঁর অধীনে এইসকল কাজের জন্য একাধিক কুলি-মজুর ছিল। পরবর্তীকালে বড়োবাজারকে কেন্দ্র করে আরো নানান জাতের ও শ্রেণির দালাল, মুৎসুদ্দি ও বেনিয়াদের ভিড় জমে উঠল। কলকাতার প্রাচীন ছড়াতে তারই ইঙ্গিত—

পিরালি, কায়েত, তাঁতী আর সোনার বেনে
করলে আবাদ তারা দেশ বয়ে ধন এনে।

এঁদের আকৃষ্ট করতে ইংরেজ প্রথম দিকে দেদার অর্থ খরচ করেছে, সেইসঙ্গে ছিল অযাচিত কৃপা-উপঢৌকন দান (সাদা বাংলায় উৎকোচ বা ঘুষ), বিনামূল্যে বসবাসের জন্য জমি ইত্যাদি। অর্থাৎ সেদিন কলকাতার আকাশে-বাতাসে উড়ছিল অর্থ, যার অনেকটাই ইংরেজদের কৌশলী investment।

ইংরেজ চেয়েছিল কলকাতাকে কেন্দ্র করে একটি বাজার-শহর গড়ে তুলতে। পণ্য কেনা-বেচার আড়ত হিসাবেই প্রথম দিকে কলকাতাকে দেখেছিল তারা। উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কলকাতা যে সমগ্র ভারতবর্ষের রাজধানী হয়ে উঠবে, কোম্পানির স্বপ্নেও তেমন ভাবনা আসেনি। পলাশির যুদ্ধের পূর্বে কলকাতায় একাধিক বাজার গড়ে ওঠে।[২৬] এর মধ্যে বড়োবাজার সম্ভবত পূর্ব হতেই ছিল। শেঠ, বসাকেরা এই বাজারের নিয়ন্ত্রক ছিলেন। শোভারাম বসাক, যিনি পলাশির যুদ্ধের পর লুণ্ঠিত অর্থের থেকে ক্ষতিপূরণের বিপুল অর্থলাভ করেছিলেন, ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর সময় বড়োবাজার সন্নিহিত ৩৭টি বাড়ি, তিনটি বাগান এবং বৃহৎ পুষ্করিণী রেখে যান। বড়োবাজার ছাড়া ছিল শোভাবাজার, ধোবাপাড়া বাজার, হাটখোলা বাজার, বাগবাজার, চার্লস বাজার, শ্যামবাজার, নতুনবাজার, বেগমবাজার, ঘাসতলা বাজার, জননগর বাজার এবং গোবিন্দপুর গঞ্জটি। অন্যদিকে ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দের সরকারি দলিল অনুযায়ী মোট ২০টি বাজারের সন্ধান মেলে,[২৭] এই বাজারগুলির মধ্যে ১১টি ছিল কোম্পানির মালিকানাধীন এবং বাকি ৯টি ছিল ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। কোম্পানির মালিকানায় ছিল বড়োবাজার, বহুবাজার, লালবাজার, বৈঠকখানা বাজার, জানবাজার, কসাইটোলা, ধর্মতলা, কলিম্বা, আরকুলি, জননগর হাট এবং রাজনগর হাট। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বাজারগুলির মধ্যে ছিল গোপী ঘোষের বাজার, কাশীবাজার, রামবাজার, টিরেটার বগডেন বাজার, শেরবোর্ণের চাঁদনিচক বাজার, সিমলা বাজার, রাজা রাজবল্লভের বাগবাজারের গোলা, তালতলা এবং দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ব্রহ্মোত্তর বাজার। তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়। কারণ— সুতানুটির হাট, শোভাবাজার ও চার্লস বাজার, যা ছিল নবকৃষ্ণের মালিকানাধীন, সেগুলি এই তালিকায় অনুপস্থিত; কারণ সুতানুটির তালুকদারি নবকৃষ্ণ চিরদিনের জন্য লাভ করেছিলেন, এ কারণেই কোম্পানির তালিকায় এগুলির উল্লেখ নেই। এই বাজারগুলির মধ্যে অনেকগুলির মালিকানা ছিল তাঁদের হাতে, পলাশির ষড়যন্ত্রে যাঁরা ইংরেজদের অংশীদার ছিলেন এবং লুণ্ঠিত অর্থের দ্বারা ব্যাবসার গোড়াপত্তন করেছিলেন। প্রাচীন বনেদি বাবুদের জন্মও এই সকল বংশেই। সৎ-অসৎ উভয় উপায়ে অপরিমিত অর্থসঞ্চয়, নীতিহীনতা, চারিত্রিক অসততা, অপরিমেয় লোভ, অর্থমূল্যে আভিজাত্যকে কিনে নেওয়ার অহংকার ও আদি বাবুদের স্বোপার্জিত নয়, বংশগত স্বভাব।

মনে রাখতে হবে কলকাতায় সেদিন জনসংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছিল। এ. কে. রায়ের মোটামুটি গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী, সম্ভাব্য এই সংখ্যাটি হল[২৮]—

| | |
|---|---|
| ১৬৯৬ খ্রি. | ৮,০৭৩ জন |
| ১৭০৪ খ্রি. | ৫১,৬০০ জন |
| ১৭০৪ খ্রি. | ১,০৮,৭০০ জন |
| ১৭১০ খ্রি. | ১,৪৭,৪০০ জন |

লেখক স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ব্যাবসাবাণিজ্যের জন্য কলকাতা বহির্ভূত ৩৮খানি গ্রাম বা 'শহরে'র লোকজনও কলকাতায় আসতে থাকলে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। বুঝতে হবে, তখনও নবাবি শাসন বলবৎ। মুর্শিদকুলী খাঁ মুখসুদাবাদকে রাজধানী করে বাংলার সুবেদার হিসাবে দক্ষতার সঙ্গে বঙ্গশাসন করছেন (১৭১৭-১৭২৭)। তাঁর আমলে রাজস্ব আদায়ে নতুন নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে— উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ যা ঔরঙ্গজেবের আমলে ছিল উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ। 'সুবেদারি আবওয়াব' বা বাড়তি কর প্রবর্তন করে ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থাও বলবৎ হয়েছে। সুবেদারের অধীনে সরকারি কাজ পাচ্ছেন হিন্দুরা। মুসলমান কর্মচারীদের অনেকে তহবিল তছরূপ করত, রাজস্ব আদায়ে অসুবিধার সৃষ্টি করত, অতএব অনেক হিন্দু ইজারাদার তাঁর অনুগ্রহে এইসময় বংশানুক্রমিক ইজারাদারির অধিকার পেয়েছেন। এভাবে নতুন এক জমিদার শ্রেণির আবির্ভাব হল। নাটোরের জমিদার রঘুনন্দন, দীঘাপতিয়া জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম রায়, মুক্তাগাখর জমিদার শ্রীকৃষ্ণ আচার্য চৌধুরি, ময়মনসিংহ জেলার শ্রীকৃষ্ণ হালদার প্রমুখেরা এই নবীন জমিদার বংশ। পাশাপাশি অবশ্য বেশ কিছু পুরাতন জমিদার বংশ ধ্বংস হল, বড়ো জমিদারদের ক্ষমতা খর্ব করা হল। কিন্তু এর দ্বারা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরাই কেবল জমিদারি লাভ করেছিল। বৈশ্যদের সামাজিক মর্যাদা ও সুবিধা তেমন বৃদ্ধি পায়নি। উপরন্তু রাজস্ব ও বাড়তি আবওয়াব সংগ্রহে মুর্শিদকুলী যে নির্মমতা দেখাতেন, তা বণিকশ্রেণিকে ক্ষুব্ধ করেছিল। সাধারণভাবে তাঁর আমলে বাংলায় শান্তি ও সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ থাকলেও, এইসময় থেকেই বণিকেরা যেভাবে 'চলো কলকাতা' নীতি নিয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ উদ্রিক্ত হওয়া স্বাভাবিক যে, সিরাজ উপলক্ষ্য মাত্র, মুর্শিদাবাদ-ষড়যন্ত্র মুর্শিদকুলী খাঁ-র জীবদ্দশাতেই শুরু হয়েছিল। পলাশির ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই ইংরেজদের কৃপাপুষ্ট, বৈশ্য বা শেঠ। নবগঠিত কলকাতা গ্রামকে কেন্দ্র করে তাঁরা তখন অবাধ ব্যাবসাবাণিজ্যের স্বপ্নে বিভোর। পাশাপাশি, এইসময় কলকাতায় সন্নিহিত অঞ্চল থেকে যাঁরা আসছেন, তাঁরা কেউ গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন শিল্পবৃত্তিরত মানুষ কিংবা চাষাভুষো নন। সম্ভবত, ফারসি জানা, ব্যাবসাবাণিজ্যে আগ্রহী, সরকারি কর্মপ্রত্যাশী একদল মানুষ। কারণ, ইংরেজদের হাতে পুনর্গঠিত কলকাতা ব্যাবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র, চাষবাস বা শিল্পবৃত্তির সুযোগ এখানে নেই। ইংরেজদের জীবনযাত্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন কিছু নতুন কর্মজীবিকার উদ্ভব ঘটে, যার কিছুটা নবাবি আমলের পুনরাবৃত্তির রকমফের হলেও, বাজার-সরকার, খানসামা-আর্দালির মতো কাজগুলির সঙ্গে এই বঙ্গের মানুষেরা তেমন পরিচিত ছিলেন না, 'এ এক নূতন!' তাছাড়া ইংরেজদের হাতে ধীরে ধীরে রূপ নেওয়া প্রায় অচেনা জীবন-ছন্দের আকর্ষণেও অগ্নিমুখী পতঙ্গবৎ সেদিন মানুষেরা ভিড় জমিয়েছিলেন কলকাতায়।

ইংরেজ কর্তৃক নবগঠিত কলকাতায় মানুষের ভিড়ের আরেকটি কারণ, ১৭৪২ সাল থেকে ১৭৫১ সাল— এই এক দশক জুড়ে মারাঠাদের নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণ। এই বর্গি হাঙ্গামা ও তার ভয়াবহতা লৌকিক

ছড়ায়, ভারতচন্দ্রের রচনায়, গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্রপুরাণে' অমর হয়ে রয়েছে। বর্গি আক্রমণ দীর্ঘকালের জন্য বাংলার গ্রামজীবনের ভিত নষ্ট করেছিল, গ্রামীণ কৃষি ও শিল্পকাজকে বিনষ্ট ও স্তব্ধ করে দিয়েছিল, বহু উচ্চ অভিজাত বংশকে সর্বস্বান্ত করেছিল, একইসঙ্গে মারাঠা আক্রমণ প্রতিহত করতে না পারায় বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দির গ্রহণযোগ্যতা জনমানসে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। অন্যদিকে বর্গি আক্রমণ ইংরেজদের কাছে অভিশাপ নয়, আশীর্বাদ স্বরূপ দেখা দিয়েছিল। বর্গির সম্ভাব্য আক্রমণ ঠেকাতে ১৭৪৩ সালে কলকাতার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে ছোটো খাল যা মারাঠা ডিচ্ (Maratha Ditch) নামে খ্যাত, খনন করা হল। খরচ বাবদ স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে ২৫ হাজার টাকা জোগাড় করা হয়েছিল। এছাড়া রক্ষীদল গঠন করে এবং স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর মাধ্যমে কলকাতার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয়েছিল। বর্গিরা কলকাতা আক্রমণ করার ঝুঁকি নেয়নি, কিংবা কলকাতা আক্রমণ তাদের কাছে লাভজনক হবে না ধরে নিয়েই বিরত থাকে। এই ঘটনা বাংলার অধিবাসীদের মনে ইংরেজের শক্তি, সাহস, দৃঢ়তা এবং প্রজার নিরাপত্তা বিধানে সক্রিয়তার মোহজাল রচনা করে। বস্তুত বর্গি আক্রমণের অবশেষে কলকাতায় সম্ভ্রান্ত, সাধারণ, হৃতসর্বস্ব মধ্যবিত্ত বহু মানুষের ভিড় জমে যায়। একলাফে জনসংখ্যা বেশ কয়েকগুণ বেড়ে যায়। হোক খানা-খন্দে ভরা, অস্বাস্থ্যকর, তবুও কলকাতায় আছে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার আশ্বাস, এই ভাবনাতেও দেশীয় মানুষেরা অনেকেই সেদিন কলকাতামুখী।

নবাবকে কার্যত উপেক্ষা করে কোম্পানি নিজেদের ব্যাবসায়িক স্বার্থের প্রয়োজনে কলকাতাকে স্বীয় ব্যাবসার সুরক্ষিত স্বাধীন ঘাঁটি হিসাবে গড়ে তুলতে চাইছিল। বর্গি আক্রমণে বিপর্যস্ত অতি বৃদ্ধ আলিবর্দি তা বুঝতে পেরেও অবহেলা করেছিলেন। কিন্তু আলিবর্দির মৃত্যুর পর পৌত্র সিরাজ-উদ্-দৌলা রাজা হয়ে (এপ্রিল ১৭৫৬) কলকাতায় ইংরেজদের কাজকর্ম ভালো চোখে দেখলেন না। মোগল সম্রাটের 'ফরমান' অনুযায়ী কেবলমাত্র কোম্পানিই বাংলায় বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অধিকারী ছিল। এই উদ্দেশ্যে কোম্পানির পণ্যে করমুক্তির অনুমতিপত্র বা 'দস্তক' কোম্পানির স্থানীয় দপ্তরগুলি থেকে ছাড়া হত। কিন্তু কোম্পানি সম্পূর্ণ অবৈধভাবে তাদের কারবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশীয় দালালদের এই অনুমতিপত্র দিত। ফলে সরকারের প্রভূত পরিমাণ রাজস্ব ক্ষতি হত। এছাড়া, ১৭৫০ সালের পর কোম্পানির নিজস্ব ব্যাবসায় মন্দা চলছিল; অতএব কোম্পানি চাইছিল কলকাতা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে কেন্দ্র করে নিজেদের নিরঙ্কুশ-নির্বাধ ব্যাবসার ভিত্তি গড়ে তুলতে। এর ফলে দেশীয় বেনিয়ান-দালাল প্রমুখেরা যাঁরা কোম্পানির সঙ্গে কার্যসূত্রে যুক্ত; তাঁরাও লাভের গুড় ঘরে তুলতে পারতেন। সেইসঙ্গেই ছিল 'দস্তক'-এর অপব্যবহার করে কোম্পানির নিজস্ব কর্মচারীদের বেআইনি, অবৈধ ব্যাবসার চাপ। সিরাজ এইসব মাথাব্যথা দূর করতে চেয়ে কোম্পানিকে সতর্ক করলেও কোম্পানি তাতে কর্ণপাত করল না। পলাশির যুদ্ধের বীজ রোপিত হল। সিরাজ প্রথমে কাশিমবাজার, পরে কলকাতা দখল করে নেন (২০ জুন ১৭৫৬)। অবশ্য কলকাতা জয়ের পরে সেখানে নিজস্ব সুরক্ষার ব্যবস্থা না করায় অচিরেই মাদ্রাজ থেকে আসা রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে কোম্পানি কলকাতার পুনর্দখল নেয়। পরাজিত সিরাজ কোম্পানিকে বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল অধিকার ফিরিয়ে দেন, কলকাতাকে সুরক্ষিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতি দেন এবং নবাবের আক্রমণে কোম্পানি ও শহরের বাসিন্দাদের যে ক্ষতি হয়েছিল, তার জন্য প্রভূত অর্থ দেন।

কিন্তু এই ঘটনাতেই কোম্পানির মনোবল বেড়ে যায়। অস্থিরচিত্ত, অদূরদর্শী সিরাজকে সরিয়ে নিজেদের এবং সংশ্লিষ্ট দেশীয় বেনিয়ান, দালাল, মুৎসুদ্দিদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে কোম্পানি অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে।

সিরাজকে মেনে নিতে পারছিলেন না দরবারের অভিজাতবর্গও। এঁদের মধ্যে ছিলেন দালাল, পুঁজিপতি, ব্যবসায়ী, মহাজন, শক্তিশালী জমিদার প্রমুখেরা। দরবারে শক্তির সমীকরণ বদলে যাওয়ার আশঙ্কায় এবং নিজ নিজ ব্যাবসায়িক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভাবনায় তাঁরা ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে হাত মেলালেন। মিরজাফর ছিলেন এই ষড়যন্ত্রের ক্রীড়াণক মাত্র। এরই ফল পলাশির যুদ্ধে (জুন ১৭৫৭ খ্রি.) সিরাজের পরাজয় এবং ধরা পড়ে ইংরেজদের হাতে মৃত্যু। যদিও নবাব পক্ষের বেশিরভাগ সৈন্য প্রধান সেনাপতি মিরজাফরের নেতৃত্বে নিষ্ক্রিয় ছিল, ফলে একে পলাশির যুদ্ধ না বলে পলাশির প্রহসন বলাই সংগত। এরপর বাংলার মসনদে ইংরেজরা মিরজাফরকে বসায়। কিছুকাল পরে মতদ্বৈধ হওয়াতে তাঁর জামাতা মিরকাশিমকে মসনদে বসানো হয় (অক্টোবর ১৭৬০ খ্রি.)। তিনবছর পরে আবার মিরজাফর বাংলার নবাব হন। এভাবেই ধীরে ধীরে বাংলার অধিকার, ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতের অধিকার ইংরেজদের হাতে চলে আসে।

পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজ বাহিনী ও তাদের এদেশীয় সহযোগীরা অবাধে লুটপাট চালায়। নবাবের কোষাগার লুণ্ঠনের সময় রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ওয়াট্স, লুসিংটন, রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণ। লুঠ করা হয় এক কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ রূপোর টাকা, বত্রিশ লক্ষ সোনার মোহর, দুই সিন্দুক ভর্তি সোনা, চার বাক্স হিরে-জহরৎ, দু'বাক্স চুণী-পান্না ও অন্যান্য মূল্যবান রত্ন। ইংরেজ সেনাবাহিনী বিপুল পরিমাণ টাকা পায়— ২,৭৫,০০০ পাউন্ড। এ ছাড়াও ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোম্পানি মিরজাফরের কাছ থেকে পায় ২২,৫০০,০০০ টাকা। নিজের জন্য ক্লাইভ পেয়েছিলেন ৩৪,৫৬৭ পাউন্ড মূল্যের জায়গির (১৭৫৯ খ্রি.)। অন্যদিকে যাঁরা ইংরেজদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য করেছিলেন, তাঁরা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ লুটের ভাগ পান। এই ক্ষতিপূরণ প্রাপকদের মধ্যে ছিলেন গোবিন্দরাম ও রঘুনাথ মিত্র, শোভারাম বসাক, রতন সরকার, আলিভাই, নয়ন মল্লিক, শুকদেব মল্লিক, দয়ারাম বসু, হরকিষেণ ঠাকুর, দুর্গারাম দত্ত প্রমুখেরা। মনে রাখতে হবে, এইসব বিশ্বাসঘাতক, নীতিজ্ঞান বিবর্জিত, সুবিধাবাদী মানুষগুলিই হলেন আমাদের আলোচ্য 'বাবু'দের স্বনামধন্য পূর্বসূরী।

পলাশির যুদ্ধ ও তার অব্যবহিত পরের কর্মকাণ্ডের জেরে কলকাতার সমাজজীবনে দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। লুণ্ঠিত অর্থের ভাগ যেমন ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়, তেমনি কলকাতার নগরজীবনের পরিকল্পনাতেও কিছু পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়। সাহেবসুবো এবং কোম্পানির কর্মচারী, কাউন্সিলের প্রধান প্রভৃতিদের জন্য হর্ম্য-প্রাসাদ ইত্যাদি গড়ে ওঠে, প্রধান প্রধান রাস্তাঘাটগুলি দ্রুত গড়ে তোলার দিকে মন দেওয়া হয়। দেশি-বিদেশি মানুষদের আগমনে কলকাতা ক্রমশই সরগরম হয়ে উঠতে থাকে। ক্ষতিপূরণের অর্থের জেরে এবং কোম্পানির দেওয়ানি প্রভৃতি লাভ করে কলকাতার বুকে ভুঁইফোঁড় কিছু অভিজাতের জন্ম হয়। কলকাতার আকাশে বাতাসে তখন কাঁচা টাকা উড়ছে। এই অপরিমেয় অর্থ-সম্পত্তি লাভের বাসনায় গুড়ের কলসীর গায়ে মাছির মতো ইংরেজের চারপাশে একশ্রেণির সুবিধাভোগী, বিদেশি সাহেবদের কৃপাভিক্ষু দেশীয় সম্প্রদায়ের ভিড় জমে উঠল এসময় থেকে। এইসব মধুলোভী মক্ষিকাদের ভিড়ে বাঙালিই সর্বপ্রধান, অন্যান্য প্রাদেশিক লোক কিছু এলেও, 'বাবুত্বের' লক্ষণে তাঁরা কেউ উন্নীত হতে পারেননি। ইংরেজ সাহেব প্রভুদের ঘিরে এই যে সব কৃপাভিক্ষু বাঙালির ভিড় সেদিন, শখ-শৌখিনতার জন্মও সেই ভিড়ের মধ্য থেকেই। যেমন— বারাণসী শেঠ। কোম্পানির প্রথম দালাল জনার্দন শেঠ ১৭১২, খ্রিস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি মারা গেলে তাঁর ভাই বারাণসী সাময়িকভাবে কোম্পানির প্রধান দালালের পদ

পায়। জানা যাচ্ছে, ‘নিত্য ব্যবহারের জন্য বিলিতি জিনিসপত্র কেনার দিকে তাঁর নজরটা ছিল বেশ উঁচু। এবং তিনিই নাকি প্রথম পথপ্রদর্শক, বিদেশি আসবাবপত্র কিনে বাবুগিরি ফলানোর ব্যাপারে।’[২৯] অতএব উনিশ শতক যে ‘বাবুগিরি’র খোশবাইতে ভরপুর, তার শেকড় আরো অনেক গভীরে— অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে। দিন যত এগিয়েছে, ‘বাবুগিরি’ ততই সম্ভ্রান্ত ঘরের আওতা থেকে বেরিয়ে সর্বসাধারণের অর্জিত সম্পত্তি হয়ে উঠেছে। বিলাসী দিনযাপনের পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে বিড়ালের বে’, ‘বুলবুলস্য পক্ষীর যুদ্ধ’, বাইজিনাচ কিংবা নিজ নিজ বাগানবাড়িতে রক্ষিতা পোষার বিলাস।

প্রাথমিক পর্বে ‘বাবুয়ানা’র যে আভিজাত্য ছিল, পরে তা অনেকটাই বদলে যায়। বাবুয়ানা বংশগত না হয়ে বৃত্তিগত হয়ে পড়ে। গোবিন্দরাম মিত্র কিংবা জনার্দন শেঠ ব্যাবসা বা দালালি কিম্বা দেওয়ানির সূত্রে কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তাঁদের বংশগত কৌলীন্য ছিল প্রতিষ্ঠিত। তাঁদেরকে জাঁকজমক দেখিয়ে, অপরিমিত দানধ্যানের বাড়াবাড়ি করে কুলগৌরব প্রতিষ্ঠা করতে হয়নি। নবরত্নের নির্মাণ গোবিন্দরামের প্রতিপত্তির ইঙ্গিত দিলেও, এটি তাঁর প্রাত্যহিক ধর্মীয় কৃত্যের নিদর্শনও বটে। এ কারণেই গোবিন্দরাম প্রমুখ আদিযুগের বাবুরা পরবর্তীকালের ‘বাবু’দের মতো ‘বাবুয়ানা’ দেখিয়ে অর্থকৌলীন্য প্রদর্শন করেছেন, এমনটি শোনা যায় না। কিন্তু পলাশির প্রহসনের পর নানাসূত্রে অর্থলাভ করে যাঁরা রাতারাতি ‘বাবু’ বনে গেলেন, তাঁদের প্রয়োজন ছিল ভুঁইফোঁড় আভিজাত্যকে একটি পাকাপোক্ত সামাজিক ভিত্তি দেওয়ার। এ কারণেই উৎসবে-পার্বণে লাট বড়োলাটদের আমন্ত্রণ, মাতৃশ্রাদ্ধে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পুষে সমাজপতি হয়ে ওঠার প্রাণপণ ব্যাকুলতা। পলাশির যুদ্ধের পরবর্তীকালে জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় অর্থাৎ মহতব রাই ও স্বরূপচাঁদ, রায়বল্লভ অনেকেই মারা পড়েছিলেন মিরকাশিমের রোষে, ফলে পূর্বতন ষড়যন্ত্রকারী অভিজাতরা আর রইলেন না। নবকৃষ্ণ, শুকদেব মল্লিক কিংবা কৃষ্ণপান্তির মতো যাঁরা অভিজাত ‘হয়ে’ উঠলেন, তাঁদের পেশা কুলমর্যাদা কোনোটিই সুপ্রাচীন নয়, নিতান্ত অর্বাচীন। এ কারণেই এত বোলবোলাও, এ কারণেই এত দেখানেপনা।

‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’য় (১৮৬২) কালীপ্রসন্ন সিংহ জানিয়েছেন, ‘কোম্পানির বাংলা দখলের কিছু পরে, নন্দকুমারের ফাঁসি হবার কিছু পূর্ব্বে আমাদের বাবুর প্রপিতামহ নিমকের দাওয়ান ছিলেন, সেকালে নিমকির দাওয়ানিতে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় ছিল; সুতরাং বাবুর প্রপিতামহ পাঁচ বৎসর কর্ম করে মৃত্যুকালে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা রেখে যান— সেই অবধি বাবুরা বনেদি বড়ো মানুষ হয়ে পড়েন।’[৩০] কালীপ্রসন্ন কথিত ‘দাওয়ানির’ সময় ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তীকাল থেকে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। কারণ ১৭৭২ সালের পর হেস্টিংস ব্যক্তিগত মালিকানায় লবণ তৈরি বন্ধ করে দেন। ১৭৮০ সাল থেকে এই দায়িত্ব অর্পিত হয় শ্বেতাঙ্গ এজেন্টদের উপর। কর্ণওয়ালিস এই পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটিয়ে এজেন্ট কর্তৃক সংগৃহীত লবণ ‘কোম্পানি হৌসে’র থেকে নিলামে বিক্রির বন্দোবস্ত করেন। অর্থাৎ লবণের প্রত্যক্ষ দাওয়ানিতে এদেশীয় ব্যক্তিদের নিয়োগ ও সরাসরি আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যাওয়ার ঘটনা ১৭৭২ সালেই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু দেখা যায়, কোম্পানি কর্তৃক নিযুক্ত শ্বেতাঙ্গ এজেন্টরা অনেকেই দেশীয় হালচাল বিষয়ে অজ্ঞ হওয়ার কারণে, দেশীয় কর্মচারী নিয়োগ করতে বাধ্য হতেন। এঁরা ছিলেন নিমক মহলের দেওয়ান। সেইসঙ্গেই নিযুক্ত হতেন আমলা-গোমস্তা প্রমুখেরা, যাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন এদেশীয়। লবণ তৈরিতে নানাপ্রকার বাধানিষেধ থাকায় চোরাকারবার চলত, তাছাড়া আরও নানান উপায়ে টাকা রোজগার হত। এইসব কর্মচারী আমলারাও অচিরেই বিত্ত সম্পত্তির পাহাড় জমিয়ে তুলতেন।

গিরিশচন্দ্র বসু বলেছেন, 'ইহা কাহারও অবিদিত নাই যে, পূর্ব্বে নিমক মহলের আমলাদিগের খুব রোজগার ছিল এবং প্রকৃতপক্ষেও কলকাতার অনেকানেক ধনাঢ্য ঘরের মূল ভিত্তি সেকালের এই নিমক মহলের চাকরির টাকা। লোকে বলিত যে,

নূলে ভণ্ড, কাপাসে চোর।
দেখ্ তোর্, না দেখ্ মোর্।।

নিমক মহল ও কাপড়ের কুঠি উভয়ই সেকালে টাকার গাছ (Pagodatree) ছিল।'[৩১] সেকালে কোম্পানি নিমক এবং আফিমের ব্যাবসা থেকে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় করত। এই দু'টি কর্ম থেকে প্রত্যক্ষভাবে দেশীয়দের হটিয়ে দিলেও পরোক্ষভাবে তাঁরা কোম্পানি এজেন্টদের দেওয়ান বা আমলা বা কর্মচারী হিসাবে যুক্ত রইলেন এবং সৎ-অসৎ উভয় পথে বিত্ত অর্জন করে আভিজাত্যকামী হয়ে উঠলেন। অন্যদিকে গিরিশচন্দ্র যে 'কাপড়ের কুঠি'র কথা বলেছেন, তা ছিল পুরাতন বৃত্তি। নবাবি আমল থেকেই অনেকে দাদনি ব্যাবসা করত। এরা গ্রাম গ্রামান্তরে বস্ত্র বয়নকারীদের দাদন দিয়ে তাদের কাছ থেকে বস্ত্র সংগ্রহ করে আনত এবং ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সেই বস্ত্র সরবরাহ করত। এ ছাড়াও ছিল রেশমগুটি থেকে প্রস্তুত কাঁচা রেশম এবং রেশম বস্ত্র সরবরাহের ব্যাবসা। কোম্পানি আমলে অনেক জায়গায় রেশম কুঠি গড়ে ওঠে, সেখানেও দেশীয় আমলা-গোমস্তারা নিযুক্ত হতেন। আফিম চাষের ক্ষেত্রেও দাওয়ানি লাভের প্রতিযোগিতা চলত। ডিরোজিয়ান হরচন্দ্র ঘোষের পিতা এইরূপ একটি আফিম কুঠির দেওয়ানি করতেন। তাঁর মৃত্যু হলে উক্ত কর্মটি পাওয়ার জন্য ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উমেদারি করেন এবং সম্ভবত নবকৃষ্ণের শংসাতে উক্ত কর্মে নিযুক্ত হন।[৩২] ভবানীচরণ নিজে 'বাবুয়ানা' করেননি, কিন্তু বাবুমহলকে অন্তরঙ্গভাবে দেখার অভিজ্ঞতা থেকেই এই বিষয়ক সর্ব আদি গ্রন্থগুলি রচনা করেন। ফলে, সেকালে বাবু বৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গমে দেওয়ানি ছিল মুখ্য কর্ম। সাধারণত নিমক, আফিম এবং রেশম— এই তিনপ্রকার সামগ্রীর দেওয়ানি কর্মের আকর্ষণ ছিল বেশি। ব্যাবসা-বৃত্তি সচরাচর বংশগত হলেও, শেঠ, বসাক ছাড়া তেমন কোনো প্রাচীন ব্যাবসাজীবীদের সাক্ষাৎ আদি কলকাতায় মেলে না। পরবর্তীকালে নানান কর্মের সূত্রে অনেকেই কুলবৃত্তি ত্যাগ করে ব্যাবসায় মন দিয়েছেন। আবার, রামদুলাল দে-র (১৭৫২-১৮২৫) মতো কেউ কেউ ১০ টাকা বেতনের শিপ সরকার থেকে নিজের অধ্যবসায়, বুদ্ধি ও সততার কারণে মনিব মদনমোহন দত্তের সহায়তায় ভাগ্য পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, হয়ে উঠেছেন আঠারো শতকের শেষদিকের অন্যতম বাণিজ্যস্তম্ভ। পরবর্তীকালে নিজের ব্যাবসা পরিচালনার সঙ্গেই ফেয়ার্লি ফার্গুসন কোম্পানির বেনিয়ানের পদ গ্রহণ করেন, পরে ওই কোম্পানির দেওয়ানি স্বীকার করেন।[৩৩] রামদুলালের মৃত্যুর কয়েক বছর পর ডিরেক্টরদের ফাটকা ও অস্বাভাবিক মুনাফা করার ঝোঁক, ক্ষমতাবহির্ভূত ব্যাবসায় লগ্নি, অবিবেচনাপ্রসূত উদ্যোগ ও ব্যয়বহুল পরিকল্পনা গ্রহণ; সেইসঙ্গেই বিলাসবহুল জীবনযাপনের প্রয়োজনে বেহিসেবি খরচে আরো বহু ব্রিটিশ কোম্পানির মতো ফার্গুসন কোম্পানিকেও দুরবস্থার মুখে ঠেলে দেয় এবং ১৮৩৩ সালের নভেম্বরে আরো চার-পাঁচটি কোম্পানির মতো ফার্গুসন কোম্পানিও বন্ধ হয়ে যায়।[৩৪]

এই সময় বৃহৎ ব্যাবসায়ে এদেশীয় বিশেষ করে বাঙালির বিনিয়োগ অসুবিধাজনক ছিল। প্রথমত, ইংরেজ সরকার ব্যাবসার মুনাফা এদেশীয়দের সঙ্গে ভাগ করে নিতে রাজি ছিল না। এদেশীয়দের সততা ও অধ্যবসায় সম্পর্কে তাদের মূল্যায়ন খুব ভালো ছিল না। ফলে নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করে

বাঙালি উদ্যোগপতিদের অষ্টাদশ শতকের কালসীমায় দূরে সরিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই মনোভাব বজায় ছিল। দ্বিতীয়ত, বাঙালিদের মধ্যে পুঁজিপতির (Banker) অভাবও ব্যাবসায় বাঙালি অংশগ্রহণের অন্তরায় ছিল। ইচ্ছা থাকলেও পুঁজির অভাবের ফলে উপায় ছিল না। পলাশির পর ক্ষতিপূরণস্বরূপ এদেশীয় যাঁরা বিপুল অর্থ লাভ করেন, তাঁরা অনেকেই দেওয়ানি, মুৎসুদ্দিগিরি প্রভৃতি কর্মে আত্মনিয়োগ করেন; বৃহৎ ব্যাবসায় নিযুক্ত হওয়ার ইচ্ছা ও উদ্যম তাঁদের কারোর ছিল না। আবার রামদুলাল দে-র মতো প্রায় কপর্দকহীন মানুষ অন্নদাতার বদান্যতায় ঝুঁকি নিয়ে লাভবান হয়েছিলেন। তা-ও মনে রাখা প্রয়োজন, ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে বাণিজ্য-ব্যাবসায় যুক্ত হওয়ার পর রামদুলালের সঙ্গে যাঁদের বাণিজ্য সম্পর্ক সুদৃঢ়ভাবে গড়ে উঠেছিল, তাঁরা কেউ ইংরেজ কোম্পানির প্রতিনিধি নন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বণিকবর্গ। এঁদের সহায়তায় কলকাতায় টন টন বরফ আমদানি করে রামদুলাল লক্ষপতি হয়ে যান। ব্যক্তিগতভাবে রামদুলাল আড়ম্বরহীন জীবনযাপন করতেন, তাঁর জীবন আঠারো-উনিশ শতকের বাবুয়ানার উদ্ভবের ইতিহাসে সর্বার্থেই ব্যতিক্রম। কিন্তু তাঁর পুত্রদ্বয় আশুতোষ দেব (সাতুবাবু) এবং প্রমথনাথ দেব (লাটুবাবু) সখের থিয়েটার খুলে, বুলবুল লড়াইয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে 'বাবুয়ানা'র চরম করে ছাড়েন; পরিণামে সর্বস্বান্ত হন। হুতোম যে বলেছিলেন, 'সেই অবধি বাবুরা বনেদি বড়লোক' হয়ে পড়েন, সাধারণ দশা থেকে ধাপে ধাপে উঠে আসা রামদুলাল এবং তাঁর দুই বিখ্যাত 'বাবু' পুত্রের জীবন সেই নূতন বনেদিয়ানার সার্থক দৃষ্টান্ত।

অন্যদিকে বেনিয়ানরা অপরিমিত বিত্ত অর্জন করলেও তাঁদের স্থান ছিল দেওয়ানদের নীচে। শুকদেব মল্লিক, নিমাইচরণ মল্লিক, নকু ধর প্রমুখেরা বণিক বংশসম্ভূত এবং বেনিয়ান। ইংরেজদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক থাকলেও নবকৃষ্ণ, গোকুল ঘোষাল, কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রপিতামহ শান্তিরাম সিংহ প্রমুখেরা প্রত্যক্ষ দেওয়ানির সূত্রে ইংরেজ প্রভুদের বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠেছিলেন। নবকৃষ্ণ তো খোদ ক্লাইভের দেওয়ান ছিলেন। তবে বিত্তসম্পত্তি অর্জনে ইতরবিশেষ না থাকলেও, সামাজিক মর্যাদার বিচারে বেনিয়ানরা কোনোদিনই কুলপতি হয়ে উঠতে পারেননি। তবে বাবুত্বের খোশবাইয়ে বেনিয়ানরাও কম যেতেন না। কর্ণওয়ালিসের সময় (১৭৮৬-১৭৯৩) কোম্পানি এবং দেওয়ান বেনিয়ানদের পূর্বেকার সম্পর্কে কিছু শীতলতা দেখা দেয়। সেইসঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) সূত্র ধরে বাংলায় নূতন একশ্রেণির ভূস্বামীর জন্ম হয়, যাঁদের অনেকে হয়ে ওঠেন নূতন যুগের বাবু।

কর্ণওয়ালিস, হেস্টিংসের আমলে গৃহীত নানা সিদ্ধান্ত রদ করে, প্রয়োজনীয় সংস্কারসাধন করে কোম্পানির কার্যকলাপের খোলনলচে বদলে ফেলতে চেয়েছিলেন। হেস্টিংসের আমল পর্যন্ত দেশীয় ব্যক্তিরা কোম্পানির দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হতে পারতেন। কোম্পানির সমর্থন আদায় করে কর্ণওয়ালিস এই প্রথা রদ করে কেবলমাত্র ইংল্যান্ড থেকে চুক্তিবদ্ধ হয়ে আসা ব্যক্তিদেরই কোম্পানির কর্মচারী পদে নিয়োগ করলেন। দেশীয় মানুষদের আনুগত্য ও সততা সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ ছিল। কোম্পানির প্রথম দিকের দেওয়ান তথা ব্ল্যাক জমিদার গোবিন্দরাম মিত্রের বিরুদ্ধে হিসাবে গরমিল ও জালিয়াতির অভিযোগ ছিল। অন্যদিকে তৎপুত্র রাধাচরণ মিত্রও জালিয়াতির অভিযোগে কলকাতার আদালতের সিদ্ধান্তে মৃত্যুদণ্ড পায়। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তৎকালে কলকাতার ৯৫ জন অধিবাসীর স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদনপত্র ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়। পরবর্তীকালের অনেক সম্ভ্রান্ত ধনী এই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন,[৩৫] যেমন— শেঠ হজুরীমল, নবকৃষ্ণ মুনশি, শুকদেব মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত, শোভারাম বসাক, চূড়ামণি দত্ত,

কৃপারাম মিত্র, দুর্গারাম ঠাকুর, বাবুরাম পালিত, গোকুল মিত্র, রাধাচরণ মল্লিক, নিমাইচরণ শেঠ, পীতাম্বর শেঠ প্রমুখ। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে অবাঙালিও ছিলেন। এঁদের মতে দেশীয় ব্যক্তির জালিয়াতির অপরাধের বিচার ইংল্যান্ডীয় রীতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। যুক্তি না থাকলেও রাধাচরণের ফাঁসির সিদ্ধান্ত রদ হয়। এঁদেরকে তৎকালে কলকাতার সম্ভ্রান্ত এবং বিশিষ্ট নাগরিক বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু এইপ্রকার আভিজাত্য বংশানুক্রমিক না হয়ে যেহেতু অর্থকৌলীন্য নির্ভর, ফলে তা চিরস্থায়ী নয়। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকারের তদানীন্তন পারসি সেক্রেটারি এইচ. টি. প্রিন্সেপের অনুরোধে রাধাকান্ত দেব 'respectable and opulent Natives of the Presidency'-র নামের যে তালিকা প্রস্তুত করেন,[৩৬] তাঁদের কেউ কেউ পূর্ববর্তী স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে থাকলেও, বাকীদের বংশপরিচয় ও নাম রাধাকান্ত দেবের তালিকায় সম্পূর্ণ নতুন। হয় পূর্ববর্তী তালিকায় সকলেই অভিজাত ছিলেন না, বিশিষ্টজন কিংবা কার্যসূত্রে দেওয়ান বেনিয়ানদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন; নয়তো অল্পকালের জন্য আভিজাত্য অর্জন করলেও একপুরুষেই তা নিঃশেষিত হয়, ফলে ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তুত তালিকায় আর এঁদের নামের দেখা মেলে না। অবশ্য সম্ভ্রান্ত হোন বা বিশিষ্ট; কর্ণওয়ালিসের দৃষ্টিতে এঁরা কেউই প্রায় সন্দেহের ঊর্ধ্বে ছিলেন না। 'বাবুত্বের' গা থেকে সম্ভ্রমবোধ মুছে যাওয়ার প্রক্রিয়া এই সময় থেকেই নিঃশব্দে শুরু হল।

কর্ণওয়ালিস যে দেশীয় মানুষদের আনুগত্য ও সততা সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন, তার পিছনে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি সংক্রান্ত ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকতে পারে। আলোড়ন তোলা এই ঘটনায় কলকাতা তথা বাংলায় সাধারণ মানুষের মধ্যে যেমন কম্পনের সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনি কর্মকাল শেষে হেস্টিংস দেশে ফিরে গেলে হাউস অব কমন্সে তাঁর অপরাধের ট্রায়াল চলতে থাকে। কর্ণওয়ালিস তখন বাংলার গভর্নর। এ খবর তাঁর অজানা ছিল না। মহারাজ নন্দকুমার জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন এবং আদালতে অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁরও মৃত্যুদণ্ড হয়। অবশ্য অবধ্য ব্রাহ্মণ-সন্তানকে ইংরেজ ছলে-বলে-কৌশলে হত্যা করবার চক্রান্ত করলেও, দেশীয় পূর্বেকার অভিজাতবর্গ নিশ্চুপ ছিলেন। তাঁদের তরফ থেকে ফাঁসি রদের অনুকূলে কোনোপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহণের কথা শোনা যায় না। উপরন্তু হাজতবাসকালীন নন্দরামের জাতিচ্যুতি ঘটার আশঙ্কা উড়িয়ে দিলেন কোম্পানি ও অভিজাতবর্গের পোষ্য পণ্ডিতেরা। এইসব পোষ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ব্রাহ্মণ হয়েও অব্রাহ্মণ সমাজপতির তল্পিবাহক ছিলেন। হুতোমের মন্তব্য স্মরণীয়, 'বনেদি বড় মানুষ কব্‌লাতে পেলে বাঙ্গালী সমাজে যে সরঞ্জামগুলি আবশ্যক, আমাদের বাবুদের তা সমস্তই সংগ্রহ করা হয়েছে— বাবুদের নিজের একটি দল আছে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কুলীনের ছেলে, বংশজ, শ্রোত্রিয়, কায়স্থ, বৈদ্য, তেলী, গন্ধবেণে আর কাঁশারী ও ঢাকাই কামার নিতান্ত অনুগত— বাড়িতে ক্রিয়ে কর্ম্ম ফাক্ যায় না, বাৎসরিক কর্ম্মেও দলস্থ ব্রাহ্মণদের বিলক্ষণ প্রাপ্তি আছে।'[৩৭] নন্দকুমারের মৃত্যুর সঙ্গে সেকালের প্রতিষ্ঠাকামী অভিজাতদের ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত ছিল। নন্দকুমার বনেদি অভিজাত, তায় ব্রাহ্মণ, অন্যান্য অনেক গোষ্ঠীপতির মতো ভুঁইফোঁড় অভিজাত নয়। অতএব তিনি বেঁচে থাকলে অব্রাহ্মণ বিত্তশালী কারোর সমাজের শিরোমণি হয়ে ওঠার বাসনায় অন্তরায় হতে পারে। অতএব কুলপতিরা নিশ্চুপ হয়ে রইলেন। অন্যদিকে, নন্দকুমারের মৃত্যু রদ হলে হেস্টিংস অসুবিধায় পড়তেন, কারণ কাউন্সিলে তখন তিনি যথেষ্টই কোণঠাসা। অতএব মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করলে সাহেবের কৃপাভিক্ষু অভিজাতগণ ভবিষ্যতে কৃপালাভে বঞ্চিত হতে পারেন, এ কারণেও নন্দকুমারের ফাঁসি রদের ক্ষেত্রে তাঁরা উচ্চবাচ্য করলেন না, যাঁরা কিছুদিন আগেও রাধাচরণ মিত্রকে ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচাতে

তৎপর হয়েছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন। বাবু সম্প্রদায় তার জন্মলগ্ন থেকেই স্বার্থান্বেষী, সুযোগসন্ধানী, চারিত্রিক মাপকাঠিতে হীন, সেইসঙ্গেই 'দেশের ঠাকুর ফেলি, বিদেশের কুকুর' ধরতে সদা তৎপর। কর্ণওয়ালিস এই গোষ্ঠীকে রাশ পরালেন। যদিও তা সাময়িকভাবে। অচিরকালের মধ্যেই বাবুরা নতুনরূপে এসে আবির্ভূত হল বঙ্গদেশে।

প্রধানত কোম্পানির রাজস্বলাভ সুনিশ্চিত করতে এবং অলস অকর্মণ্য প্রজাপালনে অনাগ্রহী জমিদারশ্রেণিকে উৎখাত করতে কর্ণওয়ালিস ভূমিসংস্কার ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন একদল তরুণ, যোগ্য, কর্মশক্তিতে উজ্জ্বল জমিদারশ্রেণি তৈরি করতে, যাঁরা প্রজাপালনে যেমন আগ্রহী হবেন তেমনি কোম্পানির বার্ষিক রাজস্বের প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করবেন। কার্যক্ষেত্রে তা অবশ্য হয়নি। নতুন ব্যবস্থায় কর, আবওয়াব, বাজে আদায় প্রভৃতির সূত্রে প্রজাপীড়ন আরো বেড়ে গিয়েছিল, জমিদারেরাও প্রজাপালন অপেক্ষা রাজস্ব সংগ্রহ এবং নিজেদের মুনাফার পরিমাণ বাড়িয়ে নেওয়ার দিকেই অধিক মনোযোগী হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম চল্লিশ বছরে (১৭৯৩-১৮৩৩) বাংলার জমিদার এবং জমিদারির চরিত্রবদল হয়েছিল ব্যাপকভাবে। সেকালে জমিদারের অমিতব্যয়িতা ছিল মাত্রা ছাড়া। ২ নভেম্বর ১৮৩৩ তারিখের 'সমাচার দর্পণ' বলেছে, '... এতদ্দেশীয় জমীদারেরা কিঞ্চিন্মাত্র বিবেচনা না করিয়া কিঞ্চিন্মাম যশঃ প্রাপণাকাঙ্ক্ষী হইয়া অপরিমিতরূপে স্বীয় ধন অপব্যয় করিয়া ফেলেন। যে জমীদারীতে গবর্ণমেন্টের রাজস্ব   ধরা আছে এবং সে স্থানে জমিদারির উৎপন্ন উপস্বত্ব হইতে কর অল্প সেই স্থলে জমিদারের অনবধান না থাকিলে কখন রাজস্ব বাকি পড়িতে পারে না। কখন কখন অকারণ দুর্দশাতেও কোন কেরন বংশ যে বিলুপ্ত হইয়াছে তাহাও আমরা অপহ্নব করিতে পারি না কিন্তু অতিসাহসপূর্ব্বক আমরা কহিতে পারি যেস্থানে তদ্রুপ দৈবঘটনাতে এক জমীদারী নিলাম হইয়া থাকে সেই স্থলে জমীদারের অনবধানতাতে এবং অনিশ্চিত অপরিমিত ব্যয়প্রযুক্ত দশ জমীদারী অবশ্য নিলাম হইয়াছে।'[৩৮] পূজা, শ্রাদ্ধ, বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষ্যে বেহিসাবি ব্যয়, অযোগ্যতা, অতিরিক্ত সরকারি রাজস্ব, কঠোর বিক্রয় আইনের জন্য বন্দোবস্তের পর বাংলার সাবেকি জমিদারেরা অনেকেই জমিদারি হারান। যাঁরা নতুন জমিদার হন, তাঁরা ছিলেন অবশ্যই এক মিশ্র শ্রেণি। এঁদের মধ্যে ছিলেন নিলামে ওঠা জমিদারির বিদায়ি নায়েব, গোমস্তা, সরকারি কর্মচারী, ব্যবসায়ী, দেওয়ান, বেনিয়ান, ইজারাদার প্রমুখেরা। যে ক'টি পুরাতন জমিদারি টিকে রইল, তাদের জৌলুস গেল কমে। নতুন জমিদারদের মধ্যে ছিলেন পাথুরিয়াঘাটা ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার, শোভাবাজারের দেব, ভূকৈলাশের ঘোষাল, পাইকপাড়ার সিংহ, মেদিনীপুরের খাঁ, কাশিমবাজারে কান্তমুদির পরিবার, কান্দিতে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, বর্ধমানের তেওয়ারি, বীরভূমের সিংহ, উলার মুখার্জি প্রমুখেরা। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন একই সঙ্গে জমিদার, ব্যাবসায়ী, আইনজীবী, আবার ব্যাঙ্কার। যেমন জমিদার দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন নীল ও কয়লার ব্যাবসায়ী, একইসঙ্গে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর। 'এ পর্বে বাংলার আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য চলে যায় বিদেশিদের হাতে আর নতুন যন্ত্র শিল্প তখনও গড়ে ওঠেনি। এমতাবস্থায় বাংলার পুঁজিপতিরা জমির দিকে ঝোঁকেন।'[৩৯] কিন্তু জমি কিনেও এঁদের অনেকেই নিজ এলাকায় বাস করতেন না, অধিকাংশই ছিলেন শহরবাসী অপিচ কলকাতাবাসী। ঐতিহাসিক তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় এই নতুন জমিদারশ্রেণিকে তিনভাগে ভাগ করেছেন: (ক) রাজধানীতে বসবাসকারী; (খ) জেলা শহরে অবস্থানকারী এবং (গ) জমিদারিতে অবস্থানকারী অথচ রায়তের উন্নতিতে অনাগ্রহী।[৪০] এই নতুন জমিদার শ্রেণি শিক্ষিত,

বিলিতি সংস্কৃতিতে আস্থাবান, বিত্তশালী; এঁরাও প্রতিষ্ঠাকামী বাবু, তবে বংশধারায় সাবেকি আভিজাত্যের ছাপ নেই বলে দ্বিতীয় শ্রেণির বাবু। দেওয়ানি বা বেনিয়ানির মতো অর্থলাভ সীমাহীন নয়, ফলে লোকদেখানো জৌলুস বা বাহ্যাড়ম্বর কিঞ্চিৎ কম। তবে কলকাতার নাগরিক সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে, বিদেশি শাসকের পক্ষপুটে আসতে এঁরাও মরিয়া। এই নূতন শ্রেণির হাত ধরে উঠে এলেন আদিবাবুদের তুলনায় কিঞ্চিৎ পরিশোধিত বাবু, আদিবাবুদের তুলনায় শিক্ষায়-দীক্ষায়-রুচি-স্বাতন্ত্র্যে যাঁরা একটু অন্যরকম।

আসলে কলকাতাও তো বদলাচ্ছিল একটু একটু করে, কলকাতার বাসিন্দারা না বদলে যান কী করে? শহর কলকাতার সংস্কৃতিতে তখন অতীত ও অধুনার মিশ্র সুর বেজে চলেছে। নবাবি আমলের রীতিনীতি, আদবকায়দা পরিত্যক্ত হয়নি, বরং তা জাঁকিয়ে বসেছে মোসাহেব পরিবৃত বাবুদের বালাখানায়, বাগানবাড়িতে; অন্যদিকে সাহেবসুবোদের হাত ধরে ট্যাভার্ন কফি হাউস হোটেল, সংবাদপত্র, নাটক, সভা-সমিতিতে বদলে যাওয়া কালের রূপ ধরা পড়ছে এদেশের অনভ্যস্ত চোখে। কলকাতার আদিপর্বের বাবুবিলাস তখন মিশ্র এক সংস্কৃতিতে ধাতস্থ হচ্ছে কিংবা রূপান্তরের বন্যায় গা ভাসিয়ে দিয়েছে।

কলকাতায় ট্যাভার্ন কালচার শুরু হয়েছে ১৭৪৮ সাল নাগাদ। পাদ্রি লং তাঁর অপ্রকাশিত দলিলপত্রে উইলসন প্রতিষ্ঠিত অ্যাপোলো ট্যাভার্ন-এর উল্লেখ করেছেন। ১৭৫৮ সালে ট্রেশাম সাহেব (J. Tresham) মেরিডিথ লেনে তাঁর ট্যাভার্ন প্রতিষ্ঠা করে এই ‘Settlement’ অর্থাৎ কলকাতা শহরের ‘Ladies and Gentlemen’-এর জন্য নানাপ্রকার খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করতেন। পরবর্তীকালে হারমোনিক ট্যাভার্ন, ফ্রাঁসিস গ্যালের ট্যাভার্ন ইত্যাদি কলকাতার ইউরোপীয় জনসমাজে সুপরিচিত হয়ে ওঠে। নন্দকুমারের বিচারের সময় ফ্রাঁসিস গ্যালের ট্যাভার্ন থেকে খাদ্য-পানীয় সরবরাহ করা হত উকিল-বিচারক প্রমুখদের জন্য। অন্যদিকে হেস্টিংস পত্নী ছিলেন হারমোনিক ট্যাভার্নের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। বস্তুত এই ট্যাভার্নগুলি ছিল কোম্পানির উচ্চমর্যাদার কর্মচারী, ইউরোপীয় বণিকদের মিলিত হবার জায়গা। দেশীয় মানুষদের প্রবেশ তত্ত্বগতভাবে নিষিদ্ধ না হলেও, সাধারণ উচ্চবিত্ত এদেশীয়রা সেখানে যেতেন বলে মনেও হয় না। বিনয় ঘোষ বলেছেন, ‘বড় বড় সাহেবদের সঙ্গে এদেশের অভিজাত ধনীদের যথেষ্ট হৃদ্যতা থাকলেও, তাঁরা নাবিক সৈনিক বা ‘লোফার’ সাহেবদের সঙ্গে সাধারণত মেলামেশা করতেন না। বাঙালি নব্য অভিজাতদের বাড়িতে সাহেবসুবোদের নিয়ে ভোজসভার ও নাচসভার আয়োজন হত যথেষ্ট, কিন্তু ট্যাভার্ন বা পাঞ্চহাউসে গিয়ে তাঁরা কখনও গোরাদের বারোয়ারি নাচ-গান হল্লায় যোগদান করতেন না।’[৪১] কিন্তু যোগদান না করলেও ১৭৮০-র দশকেই রমরম করে চলা ট্যাভার্ন, পাঞ্চহাউসগুলির কার্যকলাপের খবর সম্পর্কে তাঁরা অজ্ঞাত ছিলেন, এমন বোধ হয় না। ১৭৮০ সালেই হিকি তাঁর ‘বেঙ্গল গেজেট’ পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। পত্রিকায় অন্যান্য খবরের পাশাপাশি কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির খবরও ছাপা হত। সেইসঙ্গে হারমোনিক ট্যাভার্নের কার্যকলাপ বিষয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ। স্বল্প ইংরেজি শিক্ষিত দেশীয় নাগরিক সমাজ সেসব মজার ভাগ কিছু নিতেন না কি? স্টার্নভেল সাহেবের কলকাতা কালেক্টরেটের ইতিহাস অনুযায়ী ১৮০০ সালে কলকাতার ৮টি হোটেল ১১টি পাঞ্চহাউস এবং আরও কতকগুলি ইউরোপীয়ানদের বোর্ডিং লজিং হাউস ছিল। স্টার্নভেল সম্ভবত হোটেল বলতে ট্যাভার্নগুলিকেই বুঝিয়ে থাকবেন। কারণ পরবর্তীকালে শিক্ষিত ’বাবু’ সম্প্রদায়ের হাত ধরে ইতিহাসে ঢুকে পড়া স্পেন্সেস হোটেল (স্থাপিত হয় ১৮৩০ সালে) কিংবা ‘সেকাল আর একাল’-এর বিখ্যাত উইলসন হোটেল (স্থাপিত হয় ১৮৩৫ সালে) তাদের ব্যাবসা

শুরু করে উনিশ শতকের চতুর্থ দশক থেকে। ততদিনে ইয়ং বেঙ্গলরা বাংলার সামাজিক জীবনে এসে পড়েছেন, রামমোহনের হাত ধরে শিক্ষিত 'বাবু'দের রুচিসম্মত একটি Model গড়ে উঠেছে, ধর্ম বিষয়ে জেগেছে সংশয় ও সংস্কারের প্রবল ইচ্ছা, যুগ বদলের ডঙ্কা বাজছে ইংরেজি শিক্ষায় সুশিক্ষিত 'বাবু'দের কণ্ঠস্বরে। এঁরা তৃতীয় পর্বের বাবু। খাদ্যাখাদ্য, ধর্মাধর্ম, জীবনযাপনের মান সব দিক থেকেই এঁরা আলাদা। 'বাবুত্ব' যে চিরধ্রুব কোনো সত্য নয়, তা যে পরিবর্তনশীল জীবনাচরণের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলে যাওয়া মাত্রাবিশেষ, সেটাও স্পষ্ট হচ্ছে। Yule যে উনিশ শতকের শেষার্ধে পৌঁছে 'Baboo' শব্দের অর্থ নির্দেশ করতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন তাতে আর আশ্চর্য কী!

অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে সংবাদপত্রের প্রকাশ এবং ছাপাখানার বিস্তার বাঙালি জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বাঙালি জীবন বলতে নাগরিক বাঙালি জীবন, গ্রামাঞ্চলে সংবাদপত্রের প্রসার উনিশ শতকের ষাট-সত্তর দশকের আগে ঘটেনি তেমন। উইলিয়াম হিকির 'বেঙ্গল গেজেট' (১৭৮০ খ্রি.) নাগরিক কলকাতার প্রথম সংবাদপত্র। হোক না ইংরেজি ভাষায়, তবুও সংবাদপত্র তো। প্রথম ছাপাখানাই প্রতিষ্ঠা হয়েছে ১৭৭৭ সালে। কিন্তু হিকির সংবাদপত্র ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলে একের পর এক প্রকাশিত হতে, থাকল 'খবরের কাগজ'। যেমন— লবণের গোলাদার পিটার রীড ও থিয়েটারওয়ালা বি. মেসিঙ্কের উদ্যোগে প্রকাশিত কলকাতার দ্বিতীয় কাগজ 'ইন্ডিয়া গেজেট' (১৭৮০ খ্রি.); হিকির সরকার বিরোধী খবর ও মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হেস্টিংস-এর উদ্যোগে প্রকাশিত সরকারি গেজেট তথা 'ক্যালকাটা গেজেট' (১৭৮৪ খ্রি.); ১৭৮৫-তে 'বেঙ্গল জার্নাল', 'ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন' এবং 'মাদ্রাজ কুরিয়ার'; ১৭৮৬-তে আর এক বিখ্যাত কাগজ 'ক্যালকাটা ক্রনিকাল' ভূমিষ্ঠ হল। শতক শেষ হওয়ার আগেই সরকারি ও বেসরকারি ইংরেজি কাগজে ছেয়ে গেল নগরজীবন; সেইসঙ্গেই সরকার বিরোধী আলোচনা-সমালোচনা। অতএব ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে চালু হয়ে গেল সংবাদপত্র শাসন আইন। দেশ থেকে বিতাড়িত হলেন হিকি, 'বেঙ্গল জার্নাল'-এর সম্পাদক উইলিয়াম দুনে প্রমুখেরা। বিদেশি শাসকেরা চাননি এদেশীয় মানুষেরা সংবাদপত্রের ব্যবহার শিখুন, কারণ তার সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে আত্ম-উদ্বোধনের ভাব, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, দাবিদাওয়া ইত্যাকার ঝঞ্ঝাট। কিন্তু তাঁরা না চাইলেও ক্ষুধা জেগে উঠেছিল গোপনে গোপনে। যে কারণে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকেই পুরাতন ছাপাখানা ও হরফ কিনে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দেই শুরু করে দিয়েছেন 'বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রকাশ। বাঙালির সংবাদপত্র কেন্দ্রিক ভাবনাচিন্তা সে সময় যতই অকিঞ্চিৎকর হোক না কেন, আত্মপ্রকাশের একটা উপায় খুঁজছিলেন তাঁরা। ফলে শ্রীরামপুরের মিশনারিরা যখন ১৮১৮-তেই বের করেন একে একে 'দিগ্‌দর্শন' ও 'সমাচার দর্পণ' তখন বোঝা যায়, কাল সমাগত, মধুমাস আসন্ন। ফলে ১৮২১-এ শিবপ্রসাদ শর্মার বকলমে রামমোহন রায় সম্পাদিত 'ব্রাহ্মণ সেবধি', কলুটোলা নিবাসী তারাচাঁদ দত্ত ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রকাশিত 'সম্বাদ কৌমুদী', পরের বছর প্রকাশিত 'সমাচার চন্দ্রিকা' ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রথম দিককার ইংরেজি কাগজগুলিতে ধরা পড়ত কেবল ইউরোপীয় জীবন এবং তার চাওয়া-পাওয়ার কথা; ইংরেজি কাগজগুলি সে অর্থে ফলত দেশীয় মানুষের দিকে পিঠ ফিরিয়েই রেখেছিল। ব্যতিক্রম একমাত্র জেম্‌স সিল্ক বাকিংহামের প্রতিষ্ঠিত আট পৃষ্ঠার অর্ধসাপ্তাহিক 'ক্যালকাটা জার্নাল' (অক্টোবর, ১৮১৮)। ১৮১৯ থেকেই দৈনিকে রূপান্তরিত এই কাগজের পৃষ্ঠপোষক শিক্ষিত, রুচিশীল বাবু রামমোহন রায়। এই কাগজের পৃষ্ঠাতেই ইংরেজিতে প্রথম স্থানীয় মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা পাওয়া গেল, পাওয়া গেল 'স্পিরিট অব দি প্রেস' শিরোনামে বাংলা কাগজের সংবাদ সার। অতএব তার মুখ বন্ধ করতে জন অ্যাডামের কুখ্যাত ১৮২৩-এর

প্রেস-অ্যাক্ট, অতএব ১৮২৩-এই বাকিংহামকে বিতাড়ন, কিন্তু ততদিনে বাঙালি বাবুদের ঘুম ভেঙেছে, 'সমাচার দর্পণে'র পাতায় ১৮২১-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি ও ৯ জুন তারিখে দুই কিস্তিতে প্রকাশিত হচ্ছে নকশাধর্মী, সমাজ সমালোচনাধর্মী রচনা— 'বাবুর উপাখ্যান'। রচনার সম্ভাব্য লেখক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যার অনুক্রমে লিখে ফেললেন 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩), 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫), 'দূতী বিলাস' (১৮২৫) , 'নববিবিবিলাস' (১৮৩১ ?)। 'বাবুত্ব' উনিশ শতকের তৃতীয় দশকেই ব্যঙ্গবিদ্রূপের বিষয়, অতীতগাথা। এই বাবুত্ব অবশ্য বনেদি বাবুত্ব। নতুন যুগের বাবুরা, যাঁরা পুরাতন ও নতুনের সংশ্লেষে নবরূপপ্রাপ্ত, তাঁদেরকে অপেক্ষা করতে হবে কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত এবং তৎসম্পাদিত উনিশ শতকীয় বাংলার দীর্ঘজীবী এবং সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ বাংলা সংবাদপত্র 'সংবাদ প্রভাকর'-এর জন্য (প্রাত্যহিক পত্র হিসাবে প্রকাশ ১৮৩৯ খ্রি.)। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই নতুন বাবুরা সকলেই সংবাদপত্রবিলাসী, কেউ কেউ সম্পাদক কিংবা পৃষ্ঠপোষক। বাবুত্বের রূপান্তরে সংবাদপত্র অন্যতম অনুঘটক।

উনিশ শতকের সূচনাতেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা (১৮০০) এবং কলেজের নিজস্ব প্রয়োজনে বাংলা পুস্তক রচনায় বাংলা গদ্যের ব্যবহার সামাজিক প্রগতিকে এগিয়ে দিয়েছিল সন্দেহ নেই। পুঁথির আওতা থেকে পুস্তকের অঙিনায় পা রেখে বাঙালি লেখকেরা বুঝতে শিখেছিলেন আধুনিকতার অর্থ। কলেজ প্রয়োজনের বাইরে রামমোহন রায় কিংবা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাই এগিয়ে আসেন পুস্তক রচনা করতে, বটতলার প্রকাশকেরা অন্তরালে প্রস্তুত হতে থাকেন জমাবেন বলে। ছাপার অক্ষর তখন আত্মপ্রকাশের বাহন। সংবাদপত্র এবং পুস্তকে যেকোনো প্রকার আত্মভাব প্রকাশের সুযোগ থাকে বলেই নির্দ্বিধায় আঠারো শতকের শেষের এক 'ক্ষুদ্র নবাব' সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে বলতে পারেন (১৭৯৩ খ্রি.)— 'আমার পায়ে কতকগুলি কড়া হওয়ায় বড়োই কষ্ট পাইতেছি। যে লোক এই কড়াগুলি আরাম করিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে এক হাজার সিক্কা টাকা পারিতোষিক দিব। ৮০ নং জিগ্‌জ্যাগ্ লেনে সংবাদ লউন।'[৪২] এই ক্ষুদ্র নবাবটি দেশীয় না বিদেশীয় জানা যাচ্ছে না। তবে অনুমান করা অসংগত হবে না যে, যেহেতু ইংরেজি সংবাদপত্রে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন, অতএব বিজ্ঞাপনদাতা বড়োলোক সাহেবই হবেন। সাহেব হয়ে তাঁর এই 'বাবুয়ানা' কি নিছকই ব্যতিক্রম, না কি সাহেবরাও সেদিন 'বাবুয়ানা'র স্রোতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত?

কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে যে কর্মচারীরা এদেশে আসতেন, তাঁদের বেতনক্রম ছিল নির্দিষ্ট এবং চাহিদার তুলনায় যৎসামান্য। পলাশির যুদ্ধের পর কলকাতার আকাশে-বাতাসে তখন টাকা উড়ছে, 'হঠাৎ নবাবে'রা ভিড় জমিয়েছে নূতন 'শহরে'। নবাবি আমল তখন অপসৃয়মান। 'হঠাৎ নবাব' এই বাবুদের জীবনাচারণে সেই অপসৃয়মান নবাবির ছায়া। ক্লাইভ কিংবা হেস্টিংস যেভাবে জীবনযাপন করতেন, তাতে আভিজাত্য ছিল, পরিমিত ছিল, কিন্তু তাঁদের অর্থলালসা এবং উৎকোচ, গ্রহণের মধ্যে কোনো পরিমিতি ছিল না। এদেশের সঙ্গে শাসক-শাসিতের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর সাহেব-মাত্রেই ধরে নিতেন, তাঁদের জীবনাচরণ এদেশীয় অভিজাত মানুষের সমতুল কিংবা তার চেয়ে বেশি হবে। অপসারিত নবাবদের বিলাসিতা, সম্ভোগপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত তাঁদের হাতের কাছে ছিল। অতএব সেই লক্ষ্যেই তাঁরা এগোতে লাগলেন। নিজেদের ভেবে নিলেন এক একজন ক্ষুদ্র নবাব। বিলাসিতার জন্য অর্থ প্রয়োজন। এই অর্থ কর্মসূত্রে সৎভাবে অর্জন করা অসম্ভব, অতএব উৎকোচ, উপঢৌকন কিংবা প্রচ্ছন্নভাবে ব্যাবসায়ের গোড়াপত্তন। প্রভূত অর্থ এবং নূতন রাজনৈতিক ক্ষমতার জেরে কোম্পানির বড়োকর্তারা যেমন, তেমনি

মেজো-সেজো-ছোটোকর্তারাও ধীরে ধীরে নবাবি চালচলনে অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন। ফ্যানি পার্ক্স হেস্টিংসের আমলে এ দেশে আসেন। তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন এদেশে ইউরোপীয়দের বিলাসী জীবনযাপনের বহর দেখে। তাঁর বিবরণে সাহেবদের এদেশের জীবনযাপনে চাকর-নফর নির্ভরতার যে ছবি পাওয়া যায়, তা বাস্তবিক বিস্ময়কর। এদেশে সাহেবদের গৃহস্থালীতে চাকর-নফরের সংখ্যা ৫৭ জনের মতো, যাদের পিছনে মাসিক খরচ হত তখনকার দিনে ২৯০ টাকার মতো।[৪৩] কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট জর্জ জনসন তাঁর 'The stranger in India' গ্রন্থে সাহেবদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। কেল্লার কামানের শব্দে ঘুম ভেঙে উঠে প্রথমের ১০০০-২০০০ টাকা মূল্যের দামি আরবি ঘোড়ায় চড়ে প্রাতঃভ্রমণ। এক কাপ গরম কফি চাই তার আগে। ফিরে এসে সিদ্ধ মাছ, মাংস, কারি, ডিম, কেক ইত্যাদি সহকারে এলাহি প্রাতরাশ, দামি সিলভার ও চায়না বৌলে প্রাতরাশ সারতে সারতে সংবাদপত্র পাঠ; বেলা ৯টার পরে কাজে বেরোনো। এই অবসরে মেমসাহেবের 'বাক্সওয়ালা'র কাছ থেকে দামি-অদামি নানা জিনিস খরিদকরণ, দ্বিপ্রাহরিক ভ্রমণ তা-ও দুই ঘোড়া বা চার ঘোড়ার গাড়ি চড়ে। মধ্যাহ্নে টানা পাখার তলায় সুখনিদ্রা। পাঁচটা বাজলে সাহেব ফেরেন। গোসলখানায় স্নান সেরে সাহেব-মেমের সান্ধ্যভ্রমণ। আটটার মধ্যে ফিরে এসে উৎকৃষ্ট নানান খাদ্যবস্তু সহযোগে ডিনার সারা। সঙ্গে কলকাতায় সেকালে দুর্লভ বরফ সহযোগে অঢেল পানীয়। কোনো কোনোদিন ডিনার পার্টি থাকত, সেখানে প্রভূত মদ্যপান ও নাচ-গান করে মধ্যরাতে সাহেব ফিরতেন। তাছাড়া জনসন যে জীবনের কথা আত্মগোপন করে গেছেন, সেই গোপন সম্ভোগবিলাস, সেসবও ছিল দৈনন্দিন জীবনচর্চার অঙ্গ। এরূপ জীবনচর্চার জন্যই কারোর কারোর ভাঁড়ে মা ভবানী হত, কেউ-বা দেনায় আকণ্ঠ ডুবে যেতেন, কেউ নানান রকম রোগে মারা যেতেন। জনসন তাই বলেছিলেন যে, কোনো মানুষই এরূপ অমিতাচার সহ্য করতে পারে না— 'Such a round of extravagance would ruin a Rothschild, and disorder the liver of a Hercules.' সাহেবদের এই জীবনাচরণের আদল আদিযুগের ধনিক বাবুদের জীবনযাপনের সঙ্গে বেশ মিলে যাবে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কলিকাতা কমলালয়ে' জানাচ্ছেন : 'যাঁহারা প্রধান প্রধান কর্ম্ম অর্থাৎ দেওয়ানি বা মুচ্ছদ্দিগিরি কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া সুখ প্রক্ষালনাদি পূর্ব্বক বহুবিধ লোকের সহিত আলাপ করিয়া পরে তৈল মর্দন করিয়া থাকেন নানা প্রকার তৈল যাঁহার যাহাতে সুখানুভব হয় তিনি তাহাই মর্দ্দন করিয়া স্নানক্রিয়া সমাপনানন্তর পূজা হোমদান বলিবৈশ্ব প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া ভোজন করেন, কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিয়া অপূর্ব্ব পোষাক জামাজোড়া ইত্যাদি পরিধান করিয়া পালকী বা অপূর্ব্ব শকটারোহণে কর্ম্মস্থানে গমন করেন, কর্ম্মানুযায়ি কাল বিবেচনা পূর্ব্বক তৎস্থানে থাকিয়া গৃহে আগত হইয়া সেসকল বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া হস্তপাদাদি প্রক্ষালনান্তর গঙ্গোদক স্পর্শে পবিত্র হইয়া সায়ংসন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করিয়া জলযোগানন্তর পূনর্ব্বার বৈঠক হয়, পরে অনেক লোকের সমাগম হইয়া থাকে— কেহ কোনো কর্ম্মোপলক্ষে কেহ বা কেবল সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আইসেন অথবা তিনি কখন কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন ইত্যাদি।'[৪৪] অবশ্য এঁরা সকলে আদি যুগের বাবু, যাঁদের ধন-বিত্ত অর্জন করতে হচ্ছে, সামাজিক বিষয়ী লোকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করার পথ সুগম করতে হচ্ছে। ধর্মকর্ম এঁদের জীবনাচরণের অঙ্গ, কতকটা সংস্কারবশত, কতকটা সামাজিক প্রভাব স্থাপনের অস্ত্র। সাহেবদের সঙ্গে ব্যাবসাদি কর্ম করে তাই এঁদের 'গঙ্গোদক' স্পর্শ করে 'পবিত্র' হতে হয়। কিন্তু যাঁরা পরবর্তীকালের বাবু— যাঁদের পিতৃপিতামহ অর্জিত

ধন রয়েছে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে যাঁরা কোনোরূপ কর্ম না করেও জমির স্বত্ব-উপস্বত্ব ভোগ করছেন, সেই সকল 'অসাধারণ ভাগ্যবান লোক'-এর কথা বলতে গিয়ে ভবানীচরণ বলেছেন, 'ভগবানের কৃপাতে যাঁহাদিগের প্রচুরতর ধন আছে সেই ধনের বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ হইতে কাহার বা জমীদারির উপস্বত্ত্ব হইতে ন্যায্য ব্যয় হইয়াও উদ্বৃত্ত হয়, তাঁহারা প্রায় আপন আলয়ে থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত রীত্যনুসারে সন্ধ্যা বন্দনাদিপূর্ব্বক মধ্যাহ্নকালে ভোজন করিয়া প্রায় অনেকেই নিদ্রা যান চারি বা ছয় দণ্ড বেলা স্বত্বে আপন বিষয়ে দৃষ্টি করেন কেহবা পুরাণাদি শ্রবণ করিয়া থাকেন।'[৪৫] ভবানীচরণ 'পুরাণাদি শ্রবণে'র কথা বলেছেন, অনেক ক্ষেত্রেই তা 'বেশ্যাকণ্ঠের সুমধুর গীত' ছিল। সাহেবদের কাছ থেকে 'বাবু'রা বিলিতি মদ্যপান এবং রক্ষিতাবিলাসের শখ পেয়েছিলেন। সেকালে অনেক ওদেশী প্রকাশ্যভাবে রক্ষিতা রাখতেন। হিকি এক জমাদারনির সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে বাগানবাড়িতে থাকতেন, উক্ত রমণীর গর্ভে হিকির সন্তানাদিও হয়, স্মৃতিকথায় এসব বলতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত নন। জেন্টুদের বাড়িতে দোল-দুর্গোৎসবের আমন্ত্রণে অনেকেই তখন বাইজিনাচ দেখতে যান, বারাঙ্গনা পল্লীতে এদেশীয় মানুষদের সঙ্গে সাহেব-কর্মচারী, সৈনিকরা ভিড় করতেন না এমন নয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এদেশে যেসব ভুঁইফোঁড় 'হঠাৎ নবাব'দের জন্ম হয়েছিল, তাঁরা কারণে-অকারণে ইংরেজ সাহেবদের অনুকরণ করতেন, অবশ্যই সাহেবদের চোখে Native Civilized বলে গণ্য হবার জন্য। অপস্রিয়মান মোগল রীতিনীতি গ্রহণ করে সেদিন ইংরেজ সাহেবরা 'নবাব' হয়ে উঠেছিলেন, আর তাঁদের অনুকরণ করে দেশীয় 'বাবু'রা 'হাপ্' দেশীয় 'হাপ্' বিদেশীয় সংকর চরিত্র বাঙালি হয়ে উঠলেন। সমাজতাত্ত্বিক তাই বলেন, 'সাহেব-নবাবরাই ছিলেন নতুন দেশি নবাবদের আদর্শ পুরুষ। উভয়েই স্বেচ্ছাচারী বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তার চেয়েও আশ্চর্য সাদৃশ্য হল, উভয়েই স্বদেশে মাটির প্রবল টানে সেকালের জমিদার-শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিলেন।'[৪৬] কর্ণওয়ালিসের নীতির ফলে যখন কোম্পানির সঙ্গে সরাসরি দেওয়ানি-বেনিয়ানির সুযোগ সঙ্কুচিত হয়ে এল, তখন এইসব দেওয়ান-বেনিয়ানরা কিংবা তাঁদের উত্তরপুরুষেরা সঞ্চিত বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করলেন ভূসম্পত্তিতে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সেই সুযোগ তাঁদের সামনে এনে দিয়েছিল। এঁরা দেওয়ান-বেনিয়ান থেকে 'জমিদার' বনে গেলেন। কিন্তু একইসঙ্গে দেশের ব্যবস্থাপরিষদের ও কাউন্সিলের 'সভ্য' হওয়াও তাঁদের কাম্য ছিল। নিজেকে একজন কেওকেটা বলে না প্রমাণ করলে গেঁয়োযোগী ভিক্ষে পাবেন না! আর এই তাগিদ থেকেই ইংরেজি শিক্ষার প্রতি নতুন প্রজন্মের বাবুদের আকর্ষণ জেগে উঠল। মনে রাখতে হবে, এই শ্রেণির মানুষের কাছে শিক্ষা জ্ঞানসাধনার মাধ্যম নয়, সামাজিকভাবে জাতে ওঠার (অপিচ ইংরেজদের কাছাকাছি আসার) উপায়মাত্র। এ কারণেই দু'চার পাতা ইংরেজি পড়েই কেউ কেউ নিজেদের সাহেব বলে ভাবতে শুরু করতেন। মধুসূদন-দীনবন্ধুর কিম্বা বটতলা প্রকাশিত একাধিক প্রহসনের বিষয়— বাবুদের ইংরেজিপ্রীতি তথা দু'পাতা ইংরেজি পড়েই নিজেদের 'বাবু' ভাবতে থাকা এবং তার ফলে অশেষ দুর্গতি। জে.এম.হোল্‌জ ম্যান ঠিক এমনটিই লক্ষ করেছিলেন ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়া কোম্পানি-কর্মচারীদের জীবনযাত্রায় ও চিন্তাভাবনায়।[৪৭]

সাধারণভাবে পলাশির যুদ্ধ পরবর্তীকালে কলকাতার বাসিন্দারা, অবশ্যই সম্ভ্রান্ত মানুষ এবং মধ্যবিত্ত বিষয়ী লোক, অনুভব করছিলেন ইংরেজি শিক্ষার কথা। প্রাথমিক পর্বে মনে হয়েছিল, ভাষার অন্তরায় দূর হলে পরস্পর আরও কাছাকাছি আসা যাবে। প্রায় তিনশো বছর থেকেও ইংরেজ এদেশের ভাষা শেখার তাগিদ অনুভব করেনি, কারণ তারা ছিল বিজয়ী, আমরা বিজিত। অতএব তাগিদ আমাদেরই। এই তাগিদ

আরো অনুভূত হল, যখন ১৭৭৪ খ্রি. কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হল। দেখা যায়, এরপর একের পর এক বাঙালি পরিচালিত ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হল। ইংরেজ সাহেবদের কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে অর্থের বিনিময়ে ইংরেজি শিক্ষা দিতেন। আঠারো শতকের শেষদিকে সংবাদপত্রের পাতায় মাসিক এক বা দুই স্বর্ণমোহরের বিনিময়ে অতি দ্রুত ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থার বিজ্ঞাপন প্রায়শই চোখে পড়ত। তবে বাঙালি পরিচালিত ইংরেজি স্কুল সম্ভবত ১৭৭৪-এর আগেই গড়ে ওঠে, রামরাম মিশ্র এই স্কুলে ইংরেজি শব্দ শেখাতেন, অবশ্যই বাংলা অর্থসহ। পরবর্তীকালে, রামরাম মিশ্রের ছাত্র রামনারায়ণ মিশ্র শোভাবাজারে ইংরেজি স্কুল খোলেন। শোভাবাজার ছিল বাংলার তৎকালীন স্বপ্রতিষ্ঠিত সমাজপতি নবকৃষ্ণের এলাকা। তার চৌহদ্দিতে রামনারায়ণ ইংরেজি স্কুল গড়ে তুললেন, সম্ভবত এর পশ্চাতে নবকৃষ্ণের সম্মতি থাকতে পারে। সেকালে অভিজাত এবং সম্ভ্রান্ত মানুষেরা প্রায় সকলেই ছিলেন কলকাতার উত্তরাংশের বাসিন্দা। ফলে এই অঞ্চলেই ইংরেজি স্কুল স্থাপনের রমরমা দেখা যায়। এক পুরুষেই অর্থবিত্তের পাহাড়চুড়ায় বসা দেওয়ান-বেনিয়ানরা যে অনুভব করছিলেন, উত্তরপ্রজন্মের ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, তাতে সন্দেহ নেই। অতএব ১৭৯১-এ কলুটোলায় রামজয় দত্ত-র ইংরেজি স্কুল, এ ছাড়া রামমোহন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু, ভূষণমোহন দত্ত, শিবু দত্ত প্রমুখেরা একের পর এক ইংরেজি স্কুল খুলে ফেললেন উনিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যেই। তবে অভিজাত শিক্ষালয় ছিল হাতে গোনা। এগুলি সবই ছিল ইংরেজদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্কুল। যেমন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ পড়তেন শ্যেবোর্ণ'স্ স্কুলে (Sherborne's School)। তবে সবচেয়ে নামকরা স্কুল ছিল ১৮১০ সালে ডেভিড ড্রামন্ড কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্মতলা একাডেমি। ড্রামন্ড-এর ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হেনরি ডিরোজিও (Henry Derozio)। ইংরেজি শিক্ষা সম্ভ্রান্ত কুলের মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা ও জীবনচর্চাতে বদল আনতে সক্ষম হয়েছিল। প্রথম পর্বের অমিতাচারী, আড়ম্বরসর্বস্ব, অপব্যয়ী বাবুরা যে একটি নির্দিষ্ট রুচি-শিক্ষা-সংস্কৃতির মানদণ্ডে নিজেদের বেঁধে নিলেন, তার ফলেই বাবু সমাজের ভাবগত বদল ঘটল। বলা হয়, ১৮২০-র মধ্যে প্রায় ১০,০০০ হাজার জন বাঙালি মোটামুটি ইংরেজি জানত। এর মধ্যেই রামমোহন রায় এবং রাজা বৈদ্যনাথ মুখার্জীর প্রত্যক্ষ সহায়তায়, ইউরোপীয়দের উৎসাহ ও সাহায্যে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কলেজ বা হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়েছে ১৮১৭-তে। অচিরেই এই কলেজ তার সুযোগ্য ছাত্রদের সহায়তায় বদলে দেবে বাংলার যুগযাপনের খোল-নলচে, বাবুত্বের সংজ্ঞা। ১৮৩০-এর পর তাই যেসব 'বাবু'দের দেখা মিলবে তাঁরা আর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বিড়ালের বিয়ে দেন না, মাতৃশ্রাদ্ধে সোনা-রূপার গিনি বিলোন না, মন্দির প্রতিষ্ঠায় তাঁদের আগ্রহ নেই তেমন, প্রকাশ্যভাবে বেশ্যা রাখার সাহস দেখান না; তার চেয়ে বরং সংবাদপত্র প্রকাশ, সভা-সমিতি স্থাপন করে ইংরেজদের মতন সামাজিক জীব (Social being) হয়ে ওঠায় তাঁদের উৎসাহ বেশি। বড়োলোক 'বাবু'দের বাইজি বিলাস এখনও একেবারে বন্ধ হয়নি, কিন্তু তার চেয়ে বেশি উৎসাহ রঙ্গালয় স্থাপনে। পাঁচালি-টপ্পা-যাত্রা কিম্বা আখড়াইয়ের সুরের চেয়ে তখন অনেক বেশি সুখশ্রাব্য পাশ্চাত্য অর্গানের সুর। পোশাক-পরিচ্ছদেও বিলিতি টান, চোগা-চাপকানের পরিবর্তে বিলিতি কোট-প্যান্টালুন। মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা থেকে সরে এসে 'বাবুত্ব' সেদিন এক নূতন যুগসন্ধিতে দণ্ডায়মান।

১৮২৬ সালে 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়। মন্তব্যটি অনূদিত হয়ে আগস্টের 'এশিয়াটিক জার্নাল'-এ প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয়েছে, 'এই বিস্তীর্ণ নগরে নগরবাসীদিগের উপকার ও উৎকর্ষের নিমিত্ত নানাবিধ জনহিতকর ও অভিনব প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের

চিত্তবিনোদনের কোন ব্যবস্থা হয় নাই এবং ইংরেজ সম্প্রদায়ের মত তাহাদের আমোদপ্রমোদের কোনো সাধারণ স্থান নাই। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের সভায় নটনটী থাকিত, তাহারা অভিনয় প্রদর্শন করিয়া এবং সুললিত কাব্য, সঙ্গীত ও অঙ্গভঙ্গী দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করিত। সম্প্রতি আমাদের সমাজেও সখের যাত্রা প্রদর্শিত হইয়াছে। এগুলি সর্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও লোকের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিল। কিন্তু সখের যাত্রাও কদাচিৎ হয়। সুতরাং ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যাহাতে একত্র হইয়া ইংরেজদের মতো 'শেয়ার' গ্রহণ করিয়া একটি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহাতে একজন কর্ম্মাধ্যক্ষের অধীনে বেতনভোগী যোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত করিয়া এতদর্থে বিরচিত গীতি ও কাব্যের মাসে একবার নূতন অভিনয় করেন, তাহা নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। এইরূপে শ্রেণী-নির্বিশেষে সমাজভুক্ত সকলেরই আনন্দবৃদ্ধি হইবে।'[৪৮] ১৮২৬ সালের এই মন্তব্য কলকাতার নাগরিক রুচি বদলের ঐতিহাসিক নজির। লেখক শুধুমাত্র ব্যক্তিগত চিত্তবিনোদনের উপায় অনুসন্ধান করছেন না, সামাজিকভাবে বহুলোক 'ইংরেজ সম্প্রদায়ের মতো' একত্রে উপভোগ করতে পারেন এমন বিনোদন-ক্ষেত্র আকাঙ্ক্ষা করছেন। লেখক অবশ্যই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, নতুবা ইংরেজদের মতো নাট্যশালা স্থাপন করে একত্রিতভাবে নাটক দেখার ইচ্ছা ব্যক্ত করতেন না। ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আহ্বান স্পষ্টত উক্ত সম্প্রদায়ের মানসিক রুচি বদলের ইঙ্গিত।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ অর্থাৎ আদিবাবুদের কালে কলকাতার নাগরিক সমাজ ভেসে গিয়েছিল আখড়াই-হাফ আখড়াই-খেঁড়ু গানের স্রোতে। মনে রাখতে হবে, ইংরেজ আসার আগে সুতানুটি-গোবিন্দপুর-ডিহি কলকাতা ছিল নিতান্ত গ্রাম, অতএব সেই অঞ্চলে সংস্কৃতি বলতে ছিল বাঙালির নিজস্ব চণ্ডীমণ্ডপ সংস্কৃতি। ইংরেজের হাত ধরে ধীরে ধীরে যখন স্থানটির চরিত্র বদল হতে থাকল, নাগরিক সমাজ গড়ে উঠল, নতুন যুগের প্রতিনিধিরা বড়ো বড়ো অট্টালিকা, মন্দিরাদি তৈরি করে রাজার হালে জীবনযাপন করতে লাগলেন, তখন গ্রামীণ সংস্কৃতিও অবক্ষয়ের মুখে দাঁড়িয়ে, ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে নিজেকে বদলে ফেলল। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে গঙ্গার দুই তীর ঘেঁষে তখন কবিগান-আখড়াই হাফ আখড়াইয়ের রমরমা। এসব গানের প্রেক্ষিত প্রায়শ পুরাণ কিংবা মহাকাব্য থেকে সংগৃহীত, কিন্তু উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক গানগুলিতে প্রায়ই তথাকথিত 'ইতর' বা অশ্লীল ভাবযুক্ত 'শ-কার' 'ব-কার' কিম্বা বিষয়ের সমাবেশ। আদি বাবুদের বৈঠকখানায় কিম্বা সম্ভোগালয়ে সেদিন এসবের আসর জমে উঠত। সেদিনের কলকাতার আদিবাবু নবকৃষ্ণ আখড়াই, হাফ-আখড়াই, কবিগানের একজন বড়ো পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হুতোম বলেছেন, 'রাজা নবকৃষ্ণ কবির বড়ো পেট্রন ছিলেন। ইংল্যণ্ডের কুইন এলিজাবেথের আমলে যেমন বড় বড় কবি ও গ্রন্থকর্ত্তা জন্মান, তেমনি তাঁর আমলেও সেইরকম— রাম বসু, হরু, নিলু, রামপ্রসাদ ঠাকুর ও জগা প্রভৃতি বড় বড় কবিওয়ালা জন্মান। তিনিই কবি গাওনার মান বাড়ান, তাঁর অনুরোধে ও দ্যাখাদেখি অনেক বড় মানুষ কবিতে মাতলেন।'[৪৯] পরবর্তীকালে অবশ্য সাধারণের আঙিনাতেও আখড়াই, হাফ আখড়াই, কবিগান পৌঁছে যায়। বারোয়ারি পুজো কিংবা উৎসব উপলক্ষ্যে অনেক ছোটোখাটো জমিদারও গানের 'বাওনা' দিতেন। কিন্তু সাধারণভাবে কবিগান প্রভৃতি ছিল কলকাতার নতুন নবাবদের সভাগীতি। প্রথম আমলে বাইনাচের প্রাদুর্ভাব তেমন ছিল না, খ্যামটা নাচও সচরাচর দেখা যেত না। ক্রমশ দুর্গাপুজো, দোল, স্নানযাত্রা প্রভৃতি উপলক্ষ্যে অনেক ক্ষেত্রে অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য এসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত। বাঙালি বাইজি কেউ ছিলেন না, লক্ষ্ণৌ, দিল্লি প্রভৃতি অঞ্চল যেখানে নবাবি মহল প্রচলিত ছিল, সেখান থেকে অনেক অর্থ 'বায়না' দিয়ে এঁদের আনা

হত। নবকৃষ্ণ কিম্বা সুখময় রায় দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে সাহেব-মেমসাহেবদের খাতিরে বাইনাচের আসর সাজিয়েছেন। পরবর্তীকালে শিক্ষিত, রুচিশীল, অভিজাত 'বাবু' রামমোহন মাসিক হাজার টাকা ব্যয়ে হিন্দুস্তানের অন্যতম সেরা বাইজি নিকি-কে 'রাখতেন'। ১৮২২ সালে শ্রীমতী ফ্যানি পার্ক্স এইরকম একটি নাচের আসরে 'a rich Bengalee Baboo' রামমোহন রায়ের আমন্ত্রণে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু নবকৃষ্ণ প্রমুখ আদিবাবুরা যে আখড়াই-হাফ আখড়াই-এর মতন ইতর ভাবালুতাপূর্ণ গানের রসে নিমজ্জিত ছিলেন, তার কারণ কী? দরবারি সংস্কৃতি চিরকালই ইতর ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে। মোগল আমলে নবাবরা যেমন, তেমনি স্থানীয় রাজা বা শাসনকর্তারাও এজাতীয় আমোদপ্রমোদের জন্য সভাসদ রাখতেন। কলকাতা পূর্ব বাঙালির সাংস্কৃতিক রাজধানী ছিল কৃষ্ণনগর। কৃষ্ণনগরের রাজার সভায় সম্ভবত খেড়ু গানের প্রথা ছিল। কারণ ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর পালায় বিদ্যার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন :[৫০]

আশ্বিনে এদেশে দুর্গাপ্রতিমা প্রচার।
কে জানে তোমার দেশে তাহার সঞ্চার।।
নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব।।

জানা যায়, কৃষ্ণচন্দ্র ও অন্যান্য রাজকুমারেরা শারদীয়া পূজার সময় নবমী কীর্তন উপলক্ষ্যে অশ্লীল-ইতর শব্দ ও ভাবযুক্ত খেউড় গাইতেন। এ ছিল ধর্মীয় কৃত্যের অংশ। ধর্মের সমর্থন আছে বলেই অশ্লীলতা আর অশ্লীল বলে বোধ হয় না। দরবারের উপযুক্ত সংস্কৃতিই বটে। নবকৃষ্ণ যখন নতুন কালের রাজা হয়ে বসলেন, তখন তিনিও সম্ভবত তাঁর পূর্বজ্ঞাত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুসরণে নিজ উমেদার, মোসাহেবদের নিয়ে কবিগান, খিস্তি, খেউড় শ্রবণকে অভিজাত সংস্কৃতি বলে গ্রহণ করে থাকবেন। যে নবকৃষ্ণ সেদিন সম্মানে ও ক্ষমতায় 'নেটিভ' নাগরিকদের মধ্যে সর্বোত্তম, 'জাত-কাছারি'র অধিপতি, মুনশি দফতর-আর্জবেগী দফতর, কোম্পানির তোষাখানা ইত্যাদির আধিকারিক, তিনিই আবার ব্রাহ্মণপত্নীকে বলাৎকারের অভিযোগে অভিযুক্ত, সাত-সাতজন পত্নী বা উপপত্নীর পোষক, পলাশির চক্রান্তের পর নবাবের তোষাখানা লুটের অন্যতম ভাগীদার, অগ্রদ্বীপের গোপীনাথকে ছলে বলে হাতিয়ে নিয়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রতারণা করেন নির্দ্ধিধায়; সেই নবকৃষ্ণ আবার তাঁর সভায় বাংলা (তথা নবদ্বীপ) ও পশ্চিমি ব্রাহ্মণদের 'দল' রাখেন। সে যুগের প্রখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদ্বয় জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ও বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার তাঁর সভাপণ্ডিত। দুর্লভ সংস্কৃত ও ফারসি পুঁথি সংগ্রহে অকাতরে অর্থব্যয় করেন। বাংলাদেশের সমস্ত বিগ্রহ জড়ো করে 'সভা-বাজার' স্থাপন করে নিজের প্রতিপত্তি জাহির করতে তৎপর নবকৃষ্ণের আচার-আচরণের পিছনে সাবেকি বড়োমানুষী নেই, আছে অর্থের দম্ভ, কায়স্থ কুলোদ্ভব হয়েও জাতির পতি হয়ে ওঠার অহংকার। নবকৃষ্ণ জানেন কোম্পানির কর্মচারীদের সমর্থন ও প্রশ্রয় তাঁর পিছনে। তাঁর কীর্তির ফলে বাংলার শাসনতন্ত্রে ওলটপালট ঘটে গেছে, এ সম্পর্কে কোনো অপরাধবোধ বা গ্লানি তাঁর মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। ধর্মকৃত্য তাঁর কাছে 'বড়োমানুষী কবলানো'র উপায়মাত্র। অতএব হরু ঠাকুরের মতো অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিওয়ালার পৃষ্ঠপোষক হতে তাঁর বাধেনি। কবিওয়ালাদের প্রশংসা, বিশেষ করে হরু ঠাকুরের খেউর ও লহর গানের পারদর্শিতার প্রশংসা করেও ঈশ্বর গুপ্ত আক্ষেপের সঙ্গে বলতে বাধ্য হন : 'কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অতি জঘন্য, অতি ঘৃণিত, অশ্রাব্য, অবাচ্য শব্দে পূরিত হইত, একারণ তাহা কোন

প্রকারেই প্রকাশ করা বিধেয় নহে। ... পূর্ব্বেকার অতি প্রধান প্রধান মহিমান্বিত অর্থাৎ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর, নবকৃষ্ণ বাহাদুর প্রভৃতি উচ্চ লোকেরা এবম্ভুত অদ্ভুত সকার বকারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন, আমোদের পরিসীমা থাকিত না। জ্ঞাতি, কুটুম্ব, স্বজন, সজ্জন, পরিজনে পরিবেষ্টিত হইয়া গদগদ চিত্তে শ্রবণ করিতেন।'[৫১] এই তো ছিল আদিবাবুদের সংস্কৃতির সীমা। কিন্তু উত্তরকালে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রুচি বদলাতে থাকে। সে রুচি কতখানি ভালো বা মন্দ সেটি আলোচনার বিষয়, কিন্তু অতি দ্রুত নব্যবাবুরা এই খিস্তি খেউড়ের আওতা থেকে যে বেরিয়ে এলেন, তাতে সন্দেহ নেই। ঈশ্বর গুপ্ত ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৫ সালের মধ্যে যখন কবিওয়ালাদের জীবনী সংগ্রহে 'যথা বিহিত পরিশ্রম এবং অনুসন্ধান' করেন, তখন এই সত্যই কি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না যে, উক্ত কালের মধ্যেই কবিগানের দল এবং তার প্রভাব মানুষের স্মৃতিতে ইতিহাস হয়ে গেছে? নব্যসম্ভ্রান্ত 'বাবু'দের মানসিক চাহিদা পূরণ করতে পারছেন না বলেই হয়তো উনিশ শতকের চারের দশক থেকেই কবিগানের প্রসার ও প্রকোপ ক্রমশ কমছিল, তার জায়গায় স্থান নিচ্ছিল 'সমাচার পত্রিকা' কথিত সম্মিলিত উদ্যোগে 'নাট্যশালা' স্থাপনের ইচ্ছা।

ইংরেজরা নিজেদের চিত্ত বিনোদনের ক্ষেত্র হিসাবে ১৭৭৫ সাল থেকে রঙ্গালয় স্থাপনে উৎসাহ দেখান। অবশ্য ইতিপূর্বে ১৭৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ক্ষীণজীবী এক রঙ্গালয়ের কথা জানা যায়, সেটি কলকাতা আক্রমণের সময় সিরাজ-উদ্-দৌলা ধ্বংস করেন (১৭৫৬ খ্রি.) বলে কথিত। পরবর্তী বছরগুলিতে প্রায় আটটি বিদেশি রঙ্গালয় স্থাপিত হয় এবং নানা কারণে বন্ধ হয়ে যায়। সবচেয়ে দীর্ঘজীবী ছিল চৌরঙ্গি থিয়েটার (১৮১৩-৩৯) এবং সাঁসুসি থিয়েটার (১৮৩৯)। বাঙালি অভিজাতবর্গেরও এসব নাট্যালয়ে প্রবেশাধিকার ছিল না প্রথম পর্বে। তাঁরা ইংরেজি বুঝতেন না বলে নয়, 'নেটিভ' বলে। একসঙ্গে দর্শকাসনে বসলে সাহেবদেরও 'জাত' খোয়ানোর ভয় ছিল। কিন্তু এসব নাট্যশালার বিবরণ এবং অভিনীত নাটকের সমালোচনাদি প্রকাশিত হত সেকালের ইংরেজি সংবাদপত্রগুলিতে। আঠারো শতকের শেষদিকে যখন ইংরেজি শিক্ষায় সুশিক্ষিত একদল সম্ভ্রান্ত 'বাবু' এসে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁরা আকৃষ্ট হলেন এইসব রঙ্গালয়ের প্রতি। তবুও অপেক্ষা করতে হল দীর্ঘদিন। সম্ভবত আদিবাবুদের কাল বিগত হওয়া পর্যন্ত। ১৮২৬ সালে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র রঙ্গালয় স্থাপনের 'ইচ্ছা'র বছর পাঁচেক পর ইচ্ছাপূরণ ঘটল প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নারিকেলডাঙার বাগানবাড়িতে শুরু হওয়া 'হিন্দু থিয়েটারে'র মধ্য দিয়ে (১৮৩১, ২৮ ডিসেম্বর)। নাট্য অভিনয়ের ইতিহাসে লেবেদেফের ১৭৯৫ সালের 'কাল্পনিক সংবদল' অনুষ্ঠিত হওয়ার গুরুত্ব থাকতে পারে, কিন্তু তা ছিল বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং প্রভাবহীন। কিন্তু দ্বিতীয় যুগের বাবুকুল যখন নাট্যশালা স্থাপন এবং শখের নাট্যাভিনয়ের উদ্‌যোগ শুরু করলেন, তখন তার সামাজিক প্রভাব হল সুদূরপ্রসারী। প্রসন্নকুমারের 'হিন্দু থিয়েটারে' 'জুলিয়াস সিজার' নাটকের অংশবিশেষ এবং 'উত্তররামচরিত'-র নাট্যরূপ অনুষ্ঠিত হয়— এটি আসল ঘটনা নয়, আসল ঘটনা হল 'স্যর এডোওয়ার্ড রায়ান্, কর্ণেল ইয়ং, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি অনেক মান্যগণ্যব্যক্তি অভিনয়কালে উপস্থিত ছিলেন।'[৫২] সাহেবদের কৌতুক ও কৌতুহল থাকা স্বাভাবিক দেশীয়দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও অভিনীত নাট্যালয় সম্পর্কে, আবার নবকৃষ্ণের দত্তকপুত্র, সমকালীন হিন্দুসমাজের প্রতিষ্ঠিত সমাজপতি রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের উপস্থিতিও লক্ষ করার মতো। 'বাবু'রা যে বদলাচ্ছেন, সন্দেহ নেই।

সচরাচর রঙ্গালয় স্থাপন, অভিনয় ইত্যাদির ব্যবস্থা অতিথিদের আপ্যায়ন প্রমুখ বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ বলেই ধনবান বাবুকুল এগিয়ে এলেন। দেখা যায়, এঁরা সকলেই আদিবাবুদের দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় পুরুষ।

এই বাবুরা পূর্বপুরুষের সঞ্চিত অর্থ কেউ ভাঙিয়ে খাচ্ছেন অপিচ বিলাসিতা করছেন, কেউ-বা নিজস্ব উদ্যোগে নানান দালালি, বেনিয়ানি কিম্বা ব্যাবসা করে আরও অর্থ সঞ্চয় করেছেন। নতুন যুগের বাবুরা এভাবেই নাগরিক বাঙালির রুচিকে বদলে দিলেন।— শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসু, জোড়াসাঁকোয় প্যারিমোহন বসু, আশুতোষ দেব বা সাতুবাবুর দৌহিত্ররা, পাইকপাড়ার সিংহ ভ্রাতৃদ্বয়, এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ, পাথুরিয়াঘাটার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এঁরা সবাই ১৮৩৫ থেকে ১৮৬৫— এই তিরিশ বছরে সাধারণ বাঙালিকে নাট্যমোদী বাঙালি করে তুলতে সচেষ্ট হলেন নতুন যুগের প্রেরণায়। এমনকী নবকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠার প্রায় একশো বছর পর শোভাবাজার রাজবাড়ির নববাবুরা ‘শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েটরিক্যাল সোসাইটি’ খুলে নিজেরাই অভিনয় করলেন মধুসূদনের প্রহসন ‘একেই কি বলে সভ্যতা?’ যে প্রহসনের বিষয় ইয়ং বেঙ্গলের মদ্যপান আসক্তি, বৈষ্ণব বাবাজীদের ভণ্ডামি, বাবুকুলের বেশ্যাপ্রিয়তা, অধর্মাচরণ, অন্দরমহলে বঞ্চিত সতী নারীদের দীর্ঘশ্বাস! অথচ এই রাজবাড়ি থেকেই অচিরে বাবুবংশের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির ইতর-অশ্লীল গল্পোপাখ্যান প্রকাশিত হবে ‘এই এক নূতন! আমার গুপ্তকথা’য় (১৮৭২-৭৩)। একে কি বলা যায়, দ্বান্দ্বিক সহাবস্থান নাকি কালের মধুর প্রতিশোধ?

ইংরেজদের দৃষ্টান্তে বাঙালি রঙ্গালয় স্থাপনের উৎসাহ দেখিয়েছে— এ যেমন সত্য, তেমনি এও সত্য যে দীর্ঘদিন পর্যন্ত এটি ছিল নিতান্ত ‘হুজুক’, যথার্থ প্রগতিচিন্তা তাঁদের ভাবনায় তখনও জাগেনি। তা জাগলে সমসময়ের সতীদাহ প্রথা রদ, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন কিম্বা স্ত্রীশিক্ষার সোচ্চার বিরোধিতা করতেন না তাঁরা। যে ‘সমাচার চন্দ্রিকা’ বাংলা রঙ্গালয় স্থাপনের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণের আবেদন জাগায়, সেই ‘সমাচার চন্দ্রিকা’ই প্রধানত রাধাকান্ত দেবের উদ্যোগে (যেহেতু রাধাকান্ত দেব বাহাদুরই ছিলেন ‘সমাচার চন্দ্রিকা’র প্রধান পেট্রন) বিলেতের প্রিভি কাউন্সিলে সতীদাহের পক্ষে আবেদন করে মামলায় হেরে গেলে শোক প্রকাশ করে, ‘এ প্রকার ধর্ম্মের প্রতি ব্যাঘাত হওয়াতে অবশ্য কহিতে হইবেক পৃথিবী হইতে বিচার মহাশয় লোকান্তর গমন করিয়াছেন। এক্ষণে হিন্দু সকল এই সম্বাদ পাইয়া হাহারবে ক্রন্দন করিবেন তাঁহারদিগের অক্ষি সলিলে যে নদী বহিবেক তাহা কে দৃকপাত করিবেক?’[৩] (১৪.১১.১৮৩২) সে যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলো এসে পড়েছে চোখে মুখে, সংবাদপত্রের আস্বাদ গ্রহণ করেছে বাঙালি, রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দর্শনের ক্ষিধে জেগে উঠেছে, সে যুগেই ভাগীরথীর দুই তীরে সতীদাহের অমানবিক উল্লাস। এই নৃশংস প্রথাতেও যাঁদের হৃদয় টলেনি, সেই ‘অমানবিক’ বাবুরা বিধবা বিবাহ বা স্ত্রীশিক্ষাকে যে সমর্থন করবেন না তা বলাই বাহুল্য। প্রদীপের তলায় এভাবেই বুঝি চিরকাল অন্ধকার থেকে যায়!

রাজা নবকৃষ্ণ যতদিন জীবিত ছিলেন, নগর কলকাতায় সমাজপতি হওয়ার দুঃসাহস কেউ দেখাননি। বাকি সবাই বিত্তে গৌরবে তাঁর চেয়ে নীচের থাকে ছিলেন। নবকৃষ্ণ ছিলেন খোদ ক্লাইভের দেওয়ান, কোম্পানির কৃপাপুষ্ট। অতএব তাঁকে অস্বীকার করা সহজ ছিল না। কিন্তু নবকৃষ্ণের মৃত্যুর পর নতুন ‘বাবু’দের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই শুরু হল। দেওয়ানি-বেনিয়ানি কিম্বা ভূসম্পত্তিতে বিনিয়োগ করে তখন আরো অনেকে বিত্তশালী হয়েছেন; অর্থকৌলিন্য দিয়ে বংশকৌলিন্য সহজেই অর্জন করা যেত। অতএব বাবুদের মধ্যে অর্থব্যয়ের হিড়িক পড়ে গেল, বাবুরা প্রত্যেকেই আপন আপন ‘দল’ তৈরি করে নিজের নিজের ‘যশঃ সৌরভ’ প্রচার করতে লাগলেন। আদিবাবুদের প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক দল ছিল। হুতোম অননুকরণীয় ভঙ্গিতে বলেছেন, ‘বনেদি বড় মানুষ কবলাতে গেলে বাঙ্গালী সমাজে যে সরঞ্জামগুলি আবশ্যক, আমাদের বাবুদের তা সমস্তই সংগ্রহ করা হয়েচে— বাবুদের নিজের একটি দল আছে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত,

কুলীনের ছেলে, বংশজ, শ্রোত্রিয়, কায়স্থ, বৈদ্য, তেলী, গন্ধবেনে আর কাঁশারী ও ঢাকাই কামার নিতান্ত অনুগত— বাড়িতে ক্রিয়ে কর্ম্ম ফাক্ যায় না, বাৎসরিক কর্ম্মেও দলস্থ ব্রাহ্মণদের বিলক্ষণ প্রাপ্তি আছে; আর ভদ্রাসনে এক বিগ্রহ, শালগ্রাম শীলে ও আক্‌বরী মোহর পোরা লক্ষ্মীর খুঁচীর নিত্য সেবা হয়ে থাকে।'[৫৪] বাংলার সমাজ-বিন্যাস অনুযায়ী দলে সব বর্ণবিভাগের লোক থাকতেন, এর ফলে সব শ্রেণির উপর দলপতির প্রভুত্ব 'কবলানো' যেত। দলস্থ লোকেরা কায়স্থ, শ্রোত্রিয়, কুলীন, বংশজ, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি প্রায় সকল শ্রেণির হলেও, এঁদের স্বভাবগত মিলে এঁরা এক ছিলেন,— এঁরা সকলেই ছিলেন চাটুকার, মোসাহেব বৃত্তির লোক। 'দল'গুলির অভিপ্রায় ছিল কলকাতা সমাজের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন এবং প্রয়োজনে নানা বিধি 'বিধান' দান। বিশেষ করে 'জাতি ও ধর্ম' বিষয়ে দলগুলি প্রায়শই খুব কঠোর অবস্থান নিত। একে অন্যের ত্রুটি নির্দেশ করে 'হাঙ্গামা' বাধাতে 'দল'গুলি ছিল খুব পটু। দলপতিবাবু অকাতরে অর্থব্যয় করে অন্য দলগুলির কাছে নিজের বড়োলোকি প্রকাশ করতে চাইতেন। বস্তুত বাবুদের মধ্যে কে কত বড়ো অমিতব্যয়ী, তার প্রতিযোগিতা চলত এবং ধূর্ত মোসাহেবরা তাঁদের সপ্তম স্বর্গে তুলে দিয়ে নিজেদের অভীষ্টসিদ্ধি করত। শোনা যায়, কলকাতার হাটখোলা দত্ত বংশের খ্যাতনামা মদনমোহন দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামতনু দত্ত ওরফে তনুবাবু এইরূপ অমিতব্যয়ের প্রতিযোগিতায় প্রায়ই অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে দিতেন। আদিবাবুদের মধ্যে নবকৃষ্ণের সঙ্গে প্রায়ই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হত চূড়ামণি দত্তের। সামান্য এক বাটি আতর দান উপলক্ষ্যে বড়োমানুষি দেখাতে গিয়ে চূড়ামণি এককালীন পাঁচ হাজার টাকা অযথা ব্যয় করে নবকৃষ্ণের 'দল'কে টেক্কা দেন।[৫৫] তবে চূড়ামণি 'বাবুয়ানা'র 'হদ্দমুদ্দ' করেন সম্ভবত নিজের মৃত্যুসময়ে গঙ্গাযাত্রাকালে নবকৃষ্ণ ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ নভেম্বর রাত্রে ঘুমের মধ্যেই পরলোকগমন করেন। সেকালে এই জাতীয় মৃত্যুকে অপঘাত মৃত্যুর তুল্য দেখা হত। নবকৃষ্ণের বাড়ির লোকেরা এ কারণে বিমর্ষ ছিলেন। কাছাকাছি সময়ে চূড়ামণির শারীরিক অবস্থার অবণতি হলে মৃত্যু আসন্ন জেনে তিনি বহুসংখ্যক ঢুলি এনে নিজে একখানি রুপোর চতুর্দোলায় চেপে গঙ্গাযাত্রায় বেরোলেন। শোভাযাত্রাটা বিবাহযাত্রার মতো সমারোহ সহকারে হয়। প্রচুর লাল রঙের পতাকা, নগরসংকীর্তনের জন্য বহু কীর্তনীয়ারা আগে আগে চললেন। চতুর্দোলায় নামাবলীর চন্দ্রাদপ, তুলসীমালার ঝালর, চারিদিকে তুলসীগাছের মধ্যে আসন করে বসা চূড়ামণি দত্ত; রক্তাম্বর পরনে, মাথার উপর শালগ্রাম শিলা, সর্বাঙ্গে হরিনাম ছাপ ইত্যাদি নিয়ে নবকৃষ্ণের বাটির সম্মুখে শোভাযাত্রা অনেকক্ষণ থেমে রইল। কীর্তনীয়ারা চূড়ামণির বাবুয়ানা বা শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করার জন্য চেঁচিয়ে গাইতে লাগল—[৫৬]

আয়রে আয় নগরবাসী দেখবি যদি আয়।
জগৎ জিনিয়া চূড়া জম জিনিতে যায়।।
জম জিনিতে যায় রে চূড়া জম জিনিতে যায়।
জপ তপ কর কিন্তু মরিতে জানিলে হয়।।

কাহিনিগুলির পিছনে পিছনে সামান্য সত্যতাও থাকলে বোঝা যায়, কোম্পানির পক্ষপাতপুষ্ট নবকৃষ্ণ 'বাজারসভা' করে যতই সমাজের মাথা হয়ে উঠুন না কেন, তাঁকে পদে পদে অপদস্ত করা বা অগ্রাহ্য করার মতো লোকের অভাব ছিল না। নবকৃষ্ণের চরিত্র, তাঁর অকুলীন বংশগৌরব এ সবই প্রতিষ্ঠিত বংশগৌরবসম্পন্ন কুলীন কায়স্থেরা মেনে নেননি মন থেকে।

বাবুদের এই 'দল' বাজিতে প্রবেশের জন্য সামান্য কিছু উমেদারির প্রয়োজন ছিল, তবে যে কেউ যেকোনো সময় অন্য 'দলে' গিয়ে ভিড়তে পারতেন। 'দলস্থ' হওয়ার সুবিধা হল, মোসাহেবদের বাড়ির বিভিন্ন কার্য উপলক্ষ্যে বাবুদের 'কৃপা' লাভ সহজ হত। এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণেরা নিয়মিত মাসোহারা পেতেন বলেই মনে হয়। দুর্গাপূজার সময় পাত্রবিশেষে বাবু নানান দ্রব্য দান করতেন। তবে দলপতি 'বাবু'র বিনা অনুমতিতে সামাজিক আচার-ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। কোনো ব্যক্তি কুকর্ম করে ধর্মভ্রষ্ট হলে দলপতি দলের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। 'পতিত' ব্যক্তিদের সঙ্গে দলের লোকেদের মেলামেশা বা যাতায়াত নিষিদ্ধ হয়ে যেত। তবে এক্ষেত্রে যদিচ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাই 'বিধান' দিতেন, তবে সবক্ষেত্রেই প্রভুর ইচ্ছায় কর্ম হত। 'দল'স্থ ব্রাহ্মণ দ্বারা 'বিধান' দিয়ে বাবুরা অনেক সময়েই প্রচলিত-অপ্রচলিত বিধিবিধান পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে উনিশ শতকের অগ্রগমনের প্রতিটি পদক্ষেপ রুদ্ধ হত এই প্রকার 'বিধিবিধানে'র কারণে। কিঞ্চিৎ 'তৈলবটে'র লোভে প্রায়শই দলস্থ ব্রাহ্মণেরা নিজের দেওয়া বিধিবিধান কেমন উল্টে দিতেন, 'বিধবা বিবাহ' সংক্রান্ত আলোচনায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তা দেখিয়েছেন।[৫৭] আবার 'বাবু'র অনুগ্রহে আছেন এমন 'কেহ যদি মিথ্যাপবাদে পতিত হয় তবে দলপতি আপন গণকে বল্যে তাহাকে উদ্ধার করেন, ইহাতে তাহার জাতি রক্ষা পায়।'[৫৮] মদনমোহন দত্ত ছিলেন হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্তবংশের সন্তান। মদনমোহন ছিলেন সেকালের সম্মানীয় জমিদার, পুঁজিপতি (banker) এবং অনেক জাহাজের মালিক। তাঁরই অনুগ্রহে রামদুলাল সরকার সামান্য অবস্থা থেকে সেকালের একজন প্রতিষ্ঠিত এবং বিত্তশালী ব্যবসায়ীতে পরিণত হন। বাবুদের আদিযুগে 'এই নগরমধ্যে দুই দল ছিল মাত্র অর্থাৎ স্বর্গীয় মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের এক দল আর বৈকুণ্ঠবাসী বাবু মদনমোহন দত্তজ মহাশয়ের একদল— এই দুই দলে প্রায় তাবৎ লোক বদ্ধ ছিলেন।'[৫৯] এরই বংশধর কালীপ্রসাদ দত্ত মুসলমান বাইজি তথা রক্ষিতার সঙ্গে বাগানবাড়িতে থাকতেন এবং 'অখাদ্য' ভোজন করতেন বলে শোভাবাজার রাজবাড়ি তথা নবকৃষ্ণের 'দল' দ্বারা পতিত হন। কালীপ্রসাদ মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে শহরে প্রবল গোলযোগ উপস্থিত হয়। এমতাবস্থায় রামদুলাল সরকার তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কায়স্থ প্রমুখ উচ্চবর্ণের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে সিমুলিয়ার বাড়িতে উপস্থিত হন এবং বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরির মতো সম্ভ্রান্ত ও প্রাক্তন ব্রাহ্মণ কুলপতি উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে কালীপ্রসাদকে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। বহুকাল পর্যন্ত এই সভার স্মৃতি মানুষের মনে জাগ্রত ছিল। ১৮৫৩ সালে 'পতিতোদ্ধার বিষয়ক ভূমিকা ও ব্যবস্থাপত্রিকা' পুস্তকে বলা হয়, 'স্বর্গত পরোপকাররত রামদুলাল সরকার মহাশয় কিঞ্চিৎ মুসলমান ধর্ম্মে বিগত পতিত হিন্দু ব্যক্তিকে উদ্ধারান্তে বৃহৎ সমারোহ পূর্ব্বক সমন্বয় দ্বারা হিন্দুজাতি মধ্যে পুনর্ব্বার চলন করেন।'[৬০] পরবর্তীকালে রামদুলাল সরকারের পুত্র আশুতোষ দেব বা সাতুবাবু পৃথক 'দল' গঠন করেন। দলাদলির এই জাতীয় ঘটনা থেকে পরিষ্কার যে সামাজিক ক্ষেত্রে নবকৃষ্ণ প্রবর্তিত শোভাবাজার রাজবাড়ির 'দল' ক্রমশই নতুন 'দল'গুলির দ্বারা প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়ছিল এবং কালান্তরে আরো অনেক ধনী ব্যক্তি টাকার জোরে নতুন নতুন দল গঠন করে সমতুল প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। যদিও কোম্পানির কাছে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত দেব পরিবারের গ্রহণযোগ্যতা ছিল প্রায় অটুট। নবকৃষ্ণের পৌত্র রাধাকান্ত দেবকে ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে দেখা যায় ভারত সরকারের তদানীন্তন পারসি সেক্রেটারি এইচ. টি. প্রিন্সেপের অনুরোধে respectable and opulent Natives of the Presidency নামের তালিকা প্রস্তুত করতে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তালিকায়

রামমোহন রায়ের অনুপস্থিতি। যদিও ইউরোপীয় মহলে রামমোহন তখন সুপরিচিত নাম, তিনি তখন নূতন যুগের রুচিশীল বিত্তশালী 'বাবু', তথাপি একেশ্বরবাদের প্রবক্তা রামমোহনকে গোঁড়া হিন্দুয়ানির সমর্থক রাধাকান্ত দেব যে প্রকারান্তরে সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের থেকে দলচ্যুত করতে চেয়েছিলেন এই ঘটনাই তার প্রমাণ।

সে সময় একমাত্র সুবর্ণবণিকরাই কেবল একদলভুক্ত ছিলেন। এই সকল দলপতি বাবুরা অনেকেই ছিলেন আদতে স্বেচ্ছাচারী, হৃদয়হীন, অসংস্কৃত, বিত্তলাভের চেষ্টায় সদৃচ্ছাচারী; বস্তুত ইংরেজ প্রভুদের সঙ্গে তাঁদের কোনো তফাত ছিল না। কলকাতার প্রাচীন সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে অর্জিত অর্থের কিছু তাঁরা ব্যয় করেছিলেন। তাঁরা যেমন বাগানবাড়িতে রক্ষিতা পুষতেন, তেমনি 'দল' গঠন করে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শ্রোত্রিয় গোত্রভুক্ত কিছু মানুষদেরও পুষতেন। এই পোষকতা সামাজিকভাবে সম্মান আদায়ের কৌশলমাত্র। দলগুলির কাজকর্ম, দলভুক্ত ব্যক্তিদের অধিকাংশের রুচি-সংস্কৃতি খুব উচ্চমানের ছিল না; যাঁদের ছিল, তাঁরাও নিজ নিজ স্বার্থে সেসবকে জলাঞ্জলি কিম্বা বন্ধক দিয়েছিলেন। দলপতি বাবুদের মতামতই তাঁরা 'শাস্ত্রীয়' ভাবে দাখিল করতেন। বিপুল অর্থব্যয়ে 'একজাই'-এর মাধ্যমে আপাত অকুলীন অথচ বিত্তশালী মানুষেরা দ্রুত উঠে আসতেন সম্ভ্রান্ত পদবাচ্যের তালিকায়। সেক্ষেত্রে 'দল'গুলি ছিল এই কাজের প্রধান সহায়ক। 'একজাই' করা অবশ্য বিশেষ সহজ কাজ ছিল না। বিভিন্ন গোত্রভুক্ত মানুষদের উপর আর্থিক এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ না থাকলে 'একজাই' করানো অসম্ভব ছিল। নবকৃষ্ণ, রাধাকান্ত, রামদুলাল সরকার, সাতুবাবু প্রমুখ যে ক'জন গোষ্ঠীপতি হবার লক্ষ্যে 'একজাই'-এর আয়োজন করেছিলেন, এসব কাজে তাঁদের লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এসব ব্যয়ের অনেকটাই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায়ের কাজে ব্যয়িত হত। সমাজ ঐতিহাসিকদের মতে, 'The ekjai recogzised the basic reality of change in the social power structure after a period of social and political turmoil and at the same time accorded full recognition to prescriptive status represented by purity of descent and interpreted by the custodians of genealogies.' [৬১] সাধারণভাবে 'গোষ্ঠীপতি' ছিল সম্মানীয় পদ, কিন্তু 'দলপতি' ছিল কার্যকরী পদ। দলপতি হওয়ার জন্য কেউ কেউ 'একজাই'-এর ব্যবহার করতেন। 'একজাই'-এর জাঁকজমক, আড়ম্বর সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করে সহজেই সম্মান-সম্ভ্রম আদায় করে নিত। তৎসত্ত্বেও বলা যায় 'দল' গঠন ও 'দলপতি' হওয়ার বাসনা ছিল তথাকথিত অশিক্ষিত-অল্পশিক্ষিত কিম্বা পুরোনো ভাবনার পরিচয়। প্রগতিশীল ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত 'বাবু'রা কেউ 'দল' গঠন করে 'দলপতি' হওয়ার চেষ্টা করলেন না তাই, তাঁরা বরং 'সভা-সমিতি' স্থাপন করে নূতন এক প্রকার সমাজ বদলের আন্দোলনে অংশ নিলেন।

নতুন যুগের সম্ভ্রান্ত বাবুরা অনেকেই যে পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে কিছু মুক্তচিন্তার অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। এই মুক্তচিন্তাকে সর্বক্ষেত্রে প্রগতিচিন্তা না বলা গেলেও, এই চিন্তার সামাজিক আদান-প্রদানের অভিপ্রায় তাঁদের মনে জেগে উঠেছিল সন্দেহ নেই। এ কারণেই তাঁরা পুরাতন 'দল' গঠন না করে 'সভা-সমিতি' স্থাপনের সংকল্প গ্রহণ করেন। পুরাতন 'দল'গুলির সঙ্গে এঁদের সভা-সমিতিগুলির পার্থক্য হল, দলগুলি মূলত জাতপাত, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, শুচিতা-অশুচিতার ব্যাপারেই ব্যস্ত ছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল— পুরাতন সংস্কার ও ধর্মভিত্তিকে যেনতেনপ্রকারেণ রক্ষা করা, যদিচ তাঁদের নিজেদের জীবনযাপন অনেকক্ষেত্রেই প্রচলিত ধর্মের বিপরীত ছিল। সভা-সমিতিগুলিও প্রথম কিছুদিন ধর্মাধর্ম ব্যাপারে মাথা ঘামিয়েছিল, কিন্তু তাঁদের মূল লক্ষ্য ধর্মের পুরাতন কাঠামোকে রক্ষা বা ভাঙা নয়।

এঁদের একদল যেমন চাইলেন প্রচলিত ধর্মের মূলগত উৎসে পৌঁছে নতুন ব্যাখ্যার দ্বারা ধর্মের বিশুদ্ধ রূপটিকে তুলে ধরতে, যেমন— রামমোহন, তাঁর অবলম্বন উপনিষদের একেশ্বরবাদী ব্রহ্মব্যাখ্যা। অন্য আরেক দল চাইলেন— ধর্মের সংস্কার সাধন করে প্রচলিত নানান রীতিনীতির বদল ঘটাতে। সরাসরি হিন্দুধর্মের কাঠামোকেই অস্বীকার করে ডিরোজিওপন্থী ইয়ং বেঙ্গলদের কেউ কেউ খ্রিস্টধর্মকে গ্রহণ করলেন এবং স্বজাতিচ্যুত হয়ে নতুন ধর্মভিত্তিকে কিছুদিনের জন্য হলেও আঁকড়ে ধরতে। এঁদেরকে 'সেক্যুলার' বলা সংগত নয়, এঁরা এক ধর্মকে ত্যাগ করে আরেক ধর্মের বন্ধন স্বীকার করে নিয়েছিলেন মাত্র। বস্তুত সভা-সমিতিগুলির অনেকেরই কৃত্য ছিল সামাজিক সংস্কার সাধন, নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধান এবং সেই সূত্রে বিদেশি শাসককুলের দৃষ্টি আকর্ষণ। একইসঙ্গে সদৃশ মননের সকলে একত্রে মিলিত হয়ে নিজেদের মত বিনিময়ের একটা ক্ষেত্রও (Social Platform) গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তাঁরা। তাঁদের এই প্রচেষ্টা উত্তরকালে বাংলায় রেনেসাঁস এনেছিল কী আনেনি, সে আলোচনা স্বতন্ত্র, কিন্তু এই প্রচেষ্টার হাত ধরে উনিশ শতক দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকেই যে ক্রমে সভা-সমিতির দশক হয়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

শিক্ষিত 'বাবু'দের এই উদ্যোগের প্রেরণা ইংরেজদের সূত্রে এসেছিল সন্দেহ নেই। আঠারো শতকের শেষদিকে ১৭৮৪ সালে প্রধানত 'Discourse on the Institution of a Society for enquiring into the History, civil and natural, the Antiquities, Arts, Sciences, and Literature of Asia' [৬২] -র তাগিদে স্যার উইলিয়াম জোন্‌স (Sir William Jones)-এর উদ্যোগে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' গড়ে ওঠে। সোসাইটির কাজকর্ম আলোকপ্রাপ্ত বাবুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরবর্তীকালে কৃষক সমাজের মতো আরও অনেক সভা-সমিতি ইংরেজদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলি যেমন শিক্ষিত মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তেমনি সভা-সমিতির অধিবেশন উপলক্ষ্যে স্ত্রী-পুরুষের একত্রে মেলামেশা, পান-ভোজন, নৃত্য-গীত প্রভৃতির টানও ছিল অপ্রতিরোধ্য। এ কারণেই বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কোনো কোনো শিক্ষিত নব 'বাবু' অতি উৎসাহবশত 'Hindoo Widow remarrying Club' গঠনের কথা ভাবেন।[৬৩] বাঙালিদের মধ্যে রামমোহন রায়ই সম্ভবত সর্বপ্রথম ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে 'আত্মীয়সভা' স্থাপন করে প্রাচীন 'দল' তন্ত্রের বিপরীত স্রোতে গা ভাসান। যদিও তাঁর একেশ্বরবাদী ধর্মমত আলোচনাই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল, তবুও সামাজিক নানান বিষয় সতীদাহ, বিধবাদের অবস্থা, দেশীয় অর্থনীতি প্রভৃতিও আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে থাকত। যদিও ১৮১৯ খ্রি.-এ সভাটি বন্ধ হয়ে যায়, তথাপি এই সভার সাদৃশ্যে একটি দু'টি করে সভা-সমিতি বাংলার সমাজজীবনে মাথা তুলে দাঁড়ায়।

রামমোহনের সভাটি ছিল নিতান্ত ব্যক্তিগত সভা; নিছক পরিচিত, বন্ধুবান্ধব ও সমমনস্কদের নিয়ে গঠিত একটি 'অ্যামেচারিস্ট' উদ্যোগ। ইংরেজি আদর্শে সভাপতি, সম্পাদক, সভ্যবর্গসহ এ জাতীয় সভার প্রথম দৃষ্টান্ত সম্ভবত 'গৌড়ীয় সমাজ' (১৮২৩ সাল)। এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল 'দেশবাসীর ভিতরে জ্ঞানের উন্নতি ও প্রসার'। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্তীর মতো সম্ভ্রান্ত বাবুরা ছিলেন এর সভ্য। জ্ঞান ও উন্নতি প্রসারের পাশাপাশি সম্ভবত 'খ্রিশ্চানি হুজুগ' থেকে তাঁরা প্রচলিত হিন্দুধর্ম ও সংস্কারকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। সভা-সমিতি মানেই প্রগতি এবং সবকিছু ভেঙে নতুন কিছু গড়া— এমনটি যে নয়, তা আগেই বলা হয়েছে। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার দশ বছর পার হতে না হতেই বাঙালিটোলা সভা-সমিতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। দেখা দিল একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন, সর্বতত্ত্বদীপিকা, স্কুল সোসাইটি, স্কুল বুক সোসাইটি, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, তত্ত্ববোধিনী সভা, সর্বশুভঙ্করী সভা, বিদ্যোৎসাহিনী

সভা, সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি, অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা, বামাবোধিনী সভা, বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা ইত্যাদি ইত্যাদি। ইতিমধ্যেই বেন্টিঙ্ক-এর সতীদাহ নিষেধক আইন পাস (১৮২৯) হলে গোঁড়া হিন্দুদের মধ্যে 'গেল গেল' রব উঠেছে এবং বাবু রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রচ্ছন্নভাবে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পাদক করে 'ধর্মসভা' স্থাপন করেছেন (১৮৩০)। নতুন যুগের অন্যতম বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরও পিছিয়ে নেই। 'হিন্দু ইউনিটারিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' নামে সভা স্থাপন করে সভ্যবৃন্দ রুদ্রপ্রসাদ রায়, রামলোচন ঘোষ, কালীনাথ চন্দ্র, শ্যামলাল ঠাকুর প্রমুখের সঙ্গে বসে সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন কোম্পানি কাউন্সিলকে 'of his humane regulation prohibiting the immolation of Hindoo Widows'. তবে এসব সভা ম্লান হয়ে যায় ১৮২৮ সালে স্থাপিত 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে'র কাছে। পরবর্তীকালে সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত মান্য 'বাবু'দের অনেকেই এই সভার সভ্য—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, মাধবচন্দ্র মল্লিক প্রমুখেরা। ডিরোজিও, ডেভিড হেয়ার প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয় সাহেবসুবোও থাকতেন এই সভায়। পরবর্তীকালের নানান সংস্কারে আন্দোলন ও আইনের পিছনে এই সভার অবদান অপরিসীম। এই সভার সভ্যরা হয়ে উঠেছিলেন ব্রিটিশ উপনিবেশের উপযুক্ত নাগরিক। আভিজাত্যে সম্মানে এঁরাও বাবু, কিন্তু এঁদের বাবুত্ব যেমন অর্থকৌলীন্যে নির্ভরশীল নয়, তেমনি এঁদের স্থাপিত 'সভা' জাতপাত, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বিচারের কাছারি নয়। এঁদের 'সভা' সমাজের মাথা হতে চায়নি, চেয়েছে সমাজের বেআব্রু কুশ্রীতাকে মোচন করতে। এঁরাও বাবু, কিন্তু শিক্ষিত-রুচিশীল বাবু; এঁরাও স্থলবিশেষে দাম্ভিক, কিন্তু সে দম্ভ জ্ঞানের দম্ভ।

আর এ কারণেই 'দলে'র সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে বেন্টিঙ্ক সতীদাহ নিষেধক আইন পাস করেন, কোম্পানি বিধবা বিবাহ আইন-সংগত করে। অন্যদিকে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত (১৮৩৮ জুলাই) 'ল্যান্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন' বা জমিদার সভাকে অনুমতি দেওয়া হয়, সভার বক্তব্য ডেপুটি গভর্নর সাহেবকে সরাসরি প্রেরণ করলে সরকার তা সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করবেন বলে।[৬৪] পুরাতন বাবুরাও যে এই নূতন 'হুজুগে' গা ভাসাচ্ছেন তা বেশ বোঝা যায়, ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের ৩১ অক্টোবর প্রধানত রামগোপাল ঘোষের উদ্যোগে 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপিত হলে। এই সভার প্রথম কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি ছিলেন রাজা রাধাকান্তদেব, সহ সভাপতি রাজা কালীকৃষ্ণ দেব; সভ্যদের মধ্যে ছিলেন রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু দিগম্বর মিত্র প্রমুখেরা। নতুন যুগের বাবুদের সঙ্গে তাল মেলাতে গোঁড়ামি সরিয়ে পুরাতন বাবুরাও যে 'সভা-সমিতি'তে ভিড় করছেন, তার ফলেই সভা-সমিতি করা এই সময় থেকে অনেকটা 'ফ্যাশন' হয়ে উঠল। মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনে কালীবাবু 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা'র কার্যকলাপ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আজ্ঞে আমাদের কালেজে থেকে কেবল ইংরাজী চর্চা হয়েছিল, তা আমাদের জাতীয় ভাষা তো কিঞ্চিৎ জানা চাই, তাই এই সভাটি সংস্কৃতবিদ্যা আলোচনার জন্য সংস্থাপন করেছি। আমরা প্রতি শনিবার এই সভায় একত্র হয়ে ধর্মশাস্ত্রের আন্দোলন করি।'[৬৫] যদিচ কার্যক্ষেত্রে সভার নামে মদ্যপান ও বেশ্যাবাজিই চলে সেখানে। আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষিত রুচিশীল বাবুদের সভা-সমিতির পাশাপাশি অর্ধশিক্ষিত বিত্তবান 'বাবু'দের ছদ্মসভা বিলিতি মদ ও মেয়েমানুষদের নিয়ে বেলেল্লাপনায়

উনিশ শতকের মধ্যভাগের আকাশ-বাতাস সরগরম করে রেখেছিল। শিক্ষাদীক্ষা যাই হোক, নূতন কালের ‘বাবু’দের আভিজাত্য তখন সভার ‘মেম্বারশিপে’-র উপর নির্ভরশীল। এসব দেখে এক রসিক আলোচক মন্তব্য করেছেন, ‘শহরময় তখন সভা আর সভা। কার কী কাজ নাম থেকেই অনেকটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে তার। এতকাল বাবুদের নেশা ছিল যদি তুড়ি-ঘুড়ি-বুলবুলি, আখড়াই-হাফ আখড়াই, এবার তবে আর এক নেশা এই সভা। জুড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে তিনি সভায় চললেন।’[৬৬]

নতুন যুগের বাবুদের যেমন ‘সভা-সমিতি’র নেশা, তেমনি নেশা মেয়েমানুষ এবং মদের। প্রথম নেশাটি বাবুত্বের বনেদি আমল থেকে চলে এলেও, দ্বিতীয়টি অর্থাৎ বিলিতি মদ্যপান কার্যত নূতন ‘হুজুগ’। বাবুত্বের ইতিহাসের সঙ্গে দু’টি বিষয়ের যোগই অতি ঘনিষ্ঠ। কলকাতার পুরোনো ছড়াতেই মেলে —

মিছে কাল করপত, মদ্যপানে হওরত
সুখ পাবে বিধিমত, বেশ্যাসক্ত হও।

মদ্যপানের নেশা ভারতবর্ষে অপ্রচলিত ছিল না। সুরাপান আর্যপূর্বকাল থেকেই এদেশে প্রচলিত। রাজা প্রমুখ অভিজাতবৃত্তে সুরাপানের বিধি থাকলেও, সাধারণ সামাজিক জীবনে নেশা হিসাবে সুরাপানের তেমন প্রচলন ছিল না। মোগল বাদশাহরা সকলেই সুরাপানে প্রমত্ত হতেন। ব্যতিক্রম— ঔরঙ্গজেব। সুরাপান শরিয়ত-বিরোধী বলে তাঁর আমলে দরবারি অভিজাতদের সুরাপানের ক্ষেত্রে নানারূপ বিধিনিষেধ ছিল। তবে আঞ্চলিক শাসকদের মহলে এইপ্রকার বিধিনিষেধ ছিল না বললেই চলে। বাংলার শাসকেরা সকলেই সুরাপায়ী ছিলেন। সিরাজ-উদ্-দৌলা সুরার একজন বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। মুর্শিদাবাদের দরবারে নারী ও সুরার কমতি ছিল না। তবে বর্ণহিন্দুরা সকলেই সুরাপান করতেন না। নেশা হিসাবে বরং ভাং, চরস, গাঁজা অনেক বেশি সুপরিচিত এবং গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হত। তার একটি কারণ সম্ভবত, সুরা ছিল মহার্ঘ বস্তু। তা পান করার সামর্থ্য একমাত্র নবাব-বাদশা বা আমির-ওমরাহের ছিল। তাছাড়া ধর্মকৃত্যের অঙ্গ হিসাবেও গাঁজা-ভাং খাওয়ার প্রচলন ছিল প্রাচীনকাল থেকেই। আদিবাবুদের আমলে মদ্যপানজনিত বিলাসিতার কথা তেমন মেলে না। কোম্পানির দেওয়ানি-বেনিয়ানির সূত্রে বিলিতি মদের সঙ্গে পরিচিত হলেও সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহলে বাবুদের বড়িতে তার তেমন কদর ছিল না প্রথম দিকে। নবকৃষ্ণের আমলে বড়লোকবাবুদের ছিল গাঁজার নেশা। স্বয়ং নবকৃষ্ণের ইয়ার ছিলেন দেওয়ান দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ওরফে শিবু ঠাকুর (১৭৮৩-১৮১৯)। হুতোমের মতে, ‘শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাগবাজারের রিফরমেশনে রামমোহন রায়ের সমতুল্য লোক— তিনি বাগবাজারেদের উড়তে শেখান।’[৬৭] শিবচন্দ্র নিজে ছিলেন কাস্টম হাউসের দেওয়ান, সৎ-অসৎ পথে প্রচুর অর্থ উপার্জন করলেও সে সমস্তই উড়িয়ে দেন লাম্পট্যে, গাঁজাড়ু ‘পক্ষীর দলের’ পিছনে। ‘ফুলবাবু’ শিবচন্দ্রের গাঁজার আড্ডাটা ছাড়া আর একটি প্রসিদ্ধ আটচালা ছিল মুৎসুদ্দি রামচন্দ্র মিত্রের বাড়ির উত্তর দিকে শোভাবাজার বটতলার কাছে। এর পরিচালক ছিলেন নিমতলা নিবাসী আনন্দময়ী কালী মন্দিরের মালিক রামনারায়ণ মিশ্র। তবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল শিবচন্দ্রের ‘পক্ষীর দল’। এই দলের মধ্যমণি ছিলেন বউবাজারের ‘মলঙ্গা’ নিবাসী রূপচাঁদ দাস মহাপাত্র। দলের প্রত্যেকে এক একটি পাখির নাম গ্রহণ করতেন এবং উক্ত পাখির ন্যায় আওয়াজ করে বার্তালাপ চালাতেন বলে এদের পক্ষীর দল বলা হত। রূপচাঁদ নিজের মুখে মুখে গান ও ছড়া বাঁধতে পারতেন। এঁদের দলে সভ্য হতে গেলে রীতিমতো পরীক্ষায়

পাস দিতে হত। একাসনে বসে একসঙ্গে কেউ পরপর ১০০ ছিলিম গাঁজা টানতে পারলে তবেই 'দলস্থ' হওয়া যেত। 'ফুলবাবু' শিবচন্দ্র এইসব গাঁজাড়ুদের পিছনে অকাতরে অর্থব্যয় করতেন, কারণ এঁরা অধিকাংশই ছিলেন নিষ্কর্মা, পরজীবী ভদ্রসন্তান। আদিবাবুদের 'দল' কালচার যে কতখানি রুচিহীন ছিল, তা বোঝা যায় পক্ষীর দলের কাণ্ডকারখানা থেকে।

রামনারায়ণ মিশ্রের আটচালা অবশ্য গাঁজা সেবনের জন্য যত না বিখ্যাত, তার চেয়েও বিখ্যাত রামনিধি গুপ্ত ওরফে নিধুবাবুর টপ্পা গানের পীঠভূমি হিসাবে। মার্কিন জাহাজ কোম্পানির মুৎসুদ্দি শোভাবাজার বটতলার রামচন্দ্র মিত্রের পুত্র জয়চন্দ্র মিত্র বা জয় মিত্তির ছিলেন এই আটচালার পেট্রন। নিধুবাবু ছাপরা দেওয়ানিতে কাজ করতেন, পরে ওই কাজ ছেড়ে তিনি কলকাতায় এসে বাস করতে থাকেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি ওই গাঁজার আড্ডায় উপস্থিত হতেন এবং গান গাইতেন। ছাপরায় থাকাকালীন তিনি এক মুসলমান ওস্তাদের কাছে কিছুদিন সংগীতে তালিম নিয়েছিলেন। সে সময়কার নগরস্থ ' সমস্ত শৌখিন ধনী ও গুণিলোকেরা' তাঁর গান শোনার জন্য উক্ত আড্ডায় এসে ভিড় জমাতেন। ঈশ্বর গুপ্ত জানিয়েছেন, 'বাবু নারায়ণ মিশ্র মহাশয় পক্ষীর দল করিয়া উক্ত প্রসিদ্ধ আটচালায় সর্বদাই উল্লাস করিতেন। পক্ষীর দলের পক্ষী সকলেই ভদ্র সন্তান, ও বাবু এবং শৌখিন নামধারী সুখী ছিলেন। পাখির দলেরা নিধুবাবুকে কর্তা বলিয়া অত্যন্ত মান্য করিত।'[৬৮] ঈশ্বর গুপ্ত এই দলকেও 'পক্ষীর দল' বলেছেন। তাছাড়া একই প্রকার নিয়ম অর্থাৎ পরপর ১০০ ছিলিম গাঁজা টেনে দলভুক্ত হওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু রূপচাঁদ পক্ষীর নাম করেন নি। সম্ভবত রূপচাঁদ পক্ষীর দলের ঘটনাটি পরবর্তীতে নিধুবাবুর আটচালার গল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকবে। নিধুবাবু সেকালের একজন সম্ভ্রান্ত বাবু। তাঁর গীতগুলি সবসময় রুচির বিচারে সমতুল্য না হলেও, আদিযুগের বাবুসংস্কৃতির মাঝে তিনি যে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম, তা স্বীকার করতেই হবে। সম্ভবত মুর্শিদাবাদ থেকে আসা মহারাজ মহানন্দ রায় বাহাদুরের রক্ষিতা শ্রীমতী তাঁর প্রণয়প্রত্যাশী ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত অংশত সত্য বলেছেন যে, নিধুবাবু 'স্তুতি, বিনয়, স্নেহ এবং নির্মল প্রণয়ে'র বশীভূত ছিলেন। এই কারণেই শ্রীমতীকে 'অতিশয় স্নেহ করিয়া প্রায় প্রতি রজনীতেই তাহার গৃহে গমন করিতেন, এবং কিয়ৎক্ষণ হাস্যপরিহাস, কাব্য আলাপ ও গীতবাদ্য করিয়া আসিতেন আর সেখানে বসিয়া মনের মধ্যে যখন যেরূপ ভাবের উদয় হইত তৎক্ষণাৎ রাগ সুরবদ্ধ করিয়া তাহারি এক এক টপ্পা রচনা করিতেন।'[৬৯] আদিবাবুরা প্রায় প্রত্যেকেই বারাঙ্গনা বিলাসী ছিলেন, সম্ভবত নিধুবাবুও তার ব্যতিক্রম নন। তবে ঘটনা সত্য হলে, বেশ্যাগমন নিধুবাবুর ক্ষেত্রে উচ্চাঙ্গের কিছু টপ্পাগানের অনুপ্রেরণাস্বরূপ হয়েছে, একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে।

নিধুবাবু অবশ্যই ব্যতিক্রম। বাকিরা তা নন। সাধারণভাবে, আদিবাবুদের আমলে মদ্যপান ছিল নিম্নস্তরের নেশা, ওসবে মৌতাতের আনন্দ নেই। প্রাচীন বাবুরা তাই সকলেই গাঁজা-চরস-গুলি অর্থাৎ আফিম-এর ভক্ত ছিলেন। প্রমথনাথ মল্লিক শুনিয়েছেন সে যুগে প্রচলিত ছড়া[৭০] —

কচু ঘেঁচুর কম্ম নয় রে যাদু!
যে — শুঁড়ির দোকানে গিয়ে, ট্যাক ট্যাক ফেলে দিয়ে
ঢুক করে মেরে দিলে শুধু।

এই ছড়ায় সমাজদৃষ্টি পরিষ্কার। সাধারণভাবে, মদ্যপানকে নিম্ন দৃষ্টিতে দেখা হত। 'কচু ঘেঁচু' অর্থাৎ যেকোনো সামাজিক অবস্থানের মানুষই দোকানে গিয়ে সামান্য পয়সা দিয়ে মদ্যপান করতে পারত। কিন্তু

গুলি-গাঁজার আড্ডা ছিল সম্ভ্রান্ত ‘বাবু’দের জন্য নির্দিষ্ট। খাস কলকাতায় গাঁজার আড্ডাগুলি ছিল প্রধানত বাবুদের দখলে, মধ্যবিত্ত বা অল্পবিত্তরা গুলি বা চন্ডু খেতেন। দুর্গাচরণ রায়ের সাক্ষ্য থেকে মনে হয়,[৭১] কলকাতার তুলনায় চন্দনগর প্রমুখ ছোটো শহরে গুলির ব্যবহার ছিল বেশি। স্বয়ং বিদ্যাসাগর ছাত্রজীবনে গুলির আড্ডায় গুলিসেবন করতে গিয়েছিলেন।[৭২]

কিন্তু ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ‘বাবু’রা ইংরেজদের দৃষ্টান্তে বিলিতি মদের নেশাকেই আভিজাত্য ও বাবুয়ানির সেরা বলে গ্রহণ করতেন। তাঁদের কাছে মদ্যপান শুধু নেশামাত্র নয়, তা ট্যাবু। শিক্ষিত বড়োমানুষি, কবলানোর ট্যাবু। এ কারণেই ব্রাহ্মবাবুরা কেউ গাঁজা-গুলি-চন্ডু ইত্যাদির ধারে কাছে ঘেঁষতেন না, কিন্তু পরিমিত-অপরিমিত মদ্যপান করতেন। সেটা ছিল তাঁদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার অঙ্গ। পর্তুগীজদের হাত ধরে আমরা তামাক সেবনে অভ্যস্ত হয়েছিলাম, ইংরেজদের কাছ থেকে আমরা অভ্যস্ত হলাম ‘স্বাস্থ্যপান’ তথা বিলিতি মদ্যপানে। বস্তুত, বাণিজ্যসূত্রে আসা সকল ইউরোপীয় মানুষজনই মদ্যপানকে তাঁদের নিত্যকর্মের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক বলে মনে করতেন। বাংলায় কুঠি স্থাপনের প্রথম পর্যায়ে সারাদিন উদয়াস্ত খাটুনির পর একমাত্র আরাম ছিল হলঘরে বসে যথেষ্ট খাবারদাবারের সঙ্গে এদেশীয় আরক এবং সিরাজী-তে চুমুক দেওয়া। মাঝে মাঝে মিলত 'European wine punch bottled bear', যা ছিল তাদের কাছে স্বর্গীয় আনন্দ। আঠারো শতকের শেষদিকে ট্যাভার্ন ও পাঞ্চহাউসগুলির মধ্যে দিয়ে তাদের সুরাসেবনের এই অভ্যাস ক্রমশ সামাজিক পরিচিতি লাভ করেছিল। সেদিনের কলকাতায় গড়ে ওঠা ট্যাভার্ন, হোটেল ও মদিরা-মঞ্জিল গুলিতে প্রায় সকল প্রকার দামি-কমদামি মদ বিক্রি হত। এদেশে আগত লাট-বড়োলাট ও তাঁদের পত্নী থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মচারী সকলেই মদ-লভ্যতার প্রাচুর্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ইংরেজি সভ্যতা-সংস্কৃতির কাছাকাছি আসতে গিয়ে এদেশীয় নব্যবাবু সম্প্রদায় সম্মীলিত মদ্যপানকে সামাজিক ট্যাবু হিসাবে গ্রহণ করে এই প্রথাকে তাদের নিত্যকৃত্যে পরিণত করল। বাংলায় স্বাভাবিকভাবে কলকাতা সহ নাগরিক সমাজে সর্বপ্রথম বিলিতি মদ্যের ব্যাপকতা এ কারণেই দেখা দেয়। রামমোহন ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত নন, তিনি মদ্যপান করতেন, রক্ষিতাও পুষতেন, কিন্তু তাঁর সামাজিক জীবনের মধ্যে পরিমিতি ছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, মদ্যপান আভিজাত্য ও সম্পন্নতার প্রতীক ছিল দেশীয় জীবনে। সমালোচকের মতে, ‘রামমোহন, দ্বারকানাথেরা প্রকাশ্যভাবে ‘পরিমিত সুরাপান’ চালু করেন নি, তাঁরা প্রকাশ্য মদ্যপানে পরিমিতি আনার চেষ্টা করেছিলেন, প্রচলিত জীবনাচরণের অতিরেকের বহু ক্ষেত্রে যেমন তাঁরা সংযম ও মাত্রা আনতে চেষ্টা করেছিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখেরা সেই পরিমিতি আজীবন রক্ষা করেছিলেন।’[৭৩] কিন্তু একথাকে সম্পূর্ণ সত্য বলে মেনে নিলেও বলা চলে, এঁরা সর্বার্থেই ব্যতিক্রম। অধিকাংশ মান্যগণ্য ব্যক্তিরাই মদ্যপানে বেএক্তিয়ার হোতেন। হুতোম বা ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিংবা প্যারীচাঁদ মিত্র তার সুপ্রচুর দৃষ্টান্ত উদ্ধার করেছেন। এগুলিকে নিছক কথন বলে উড়িয়ে দেওয়ার উপায় নেই। ডিরোজিও-শিষ্যরা প্রায় সকলেই মদ্যপানে বাহাদুর ছিলেন। তাঁদের হিন্দুধর্মবিরোধী কথাবার্তা, উগ্রতা ও মদ্যপানে অতিরিক্ত আসক্তিকে ব্যঙ্গ করে অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার নীচের শ্লোকটি রচনা করেন—[৭৪]

দক্ষিণারঞ্জনো রামো রসিকঃ কৃষ্ণমোহনঃ।
তারাচাঁদ রাধানাথো গোবিন্দশচচন্দ্রশেখরঃ॥

হরচন্দ্রো রামতনুঃ শিবচন্দ্রশ্চ মাধবঃ।
মহেন্দ্রোহমৃতলালশ্চ প্যারীচাঁদো মধুব্রতাঃ॥
ফিরিঙ্গী- পুঙ্গব- শ্রীমদ্ ডিরোজিও কুশে শয়ে।
মধুপানরতাঃ সম্যগ্ দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞান বর্জিতাঃ॥

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ 'মধুব্রতী' ইয়ং বেঙ্গলেরা মদ্যপানে সে পরিমিতি দেখাননি, এই শ্লোক তার প্রমাণ। তাঁদের হয়তো হিন্দুধর্মের কাঠামো ভাঙার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু এরূপ উদ্দেশ্যহীন অসংখ্য বাবু সেদিন মদ্যপানকেই প্রগতি ধরে নিয়ে অপরিমিত আসবানন্দে ভেসে গিয়েছিলেন। 'একেই কি বলে সভ্যতা?' যিনি ইয়ং বেঙ্গলি মদ্যাসক্তিকে কটাক্ষ করেন, সেই মধুসূদন স্বয়ং অপরিমিত মদ্যপানে অকালপ্রয়াত! শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো মানুষ তাই সংগতভাবে 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে কটাক্ষ করেন, 'সে সময়ে সুরাপান কুসংস্কার-ভঞ্জনের একটা প্রধান উপায় ছিল। যিনি শাস্ত্র ও লোকাচারের বাধা অতিক্রম পূর্ব্বক প্রকাশ্যভাবে সুরাপান করিতে পারিতেন, তিনি সংস্কারক দলের মধ্যে অগ্রগণ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন।'[৭৫] এ কারণেই হয়তো ব্রাহ্মসমাজের দীক্ষাগ্রহণের দিন 'বিস্কুট ও সেরী আনিয়ে ঐ ধর্ম গ্রহণ করার কথা বলেছেন রাজনারায়ণ বসু।[৭৬] অবশ্য তাঁর মতে, 'সকলেই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের দিন ঐরূপ করিতেন তাহা নহে।' ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রগতিবাদী আধুনিক ধর্ম এই ধারণাতেই সম্ভবত এই মদ্যপানের প্রথা। পরবর্তীকালে মফস্সল ও গ্রামাঞ্চলের জমিদার বা 'হাফবাবু'দের মধ্যেও এই কু-প্রথা ছড়িয়ে পড়ে।

ঠাকুর পরিবারে মদ্যপানের বাড়াবাড়ি ছিল বলে সেকালে দুর্নাম রটেছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর নিজস্ব 'কার টেগোর এণ্ড কোং'-এর মারফত বিলেত থেকে মদ আমদানি করতেন। শুধু উপভোগের জন্য নয়, নিজের অনুগত লোক বিশ্বনাথ লাহাকে মদ বিক্রির জন্য দোকান পর্যন্ত করে দিয়েছিলেন। অবশ্য প্রায়ই তাঁর বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে তিনি পার্টি দিতেন। গভর্নর জেনারেলসহ আরো অনেক মান্যগণ্য লোক সেই পার্টিতে উপস্থিত থাকতেন। স্বভাবতই পার্টিতে মদের বন্যা বয়ে যেত। তাছাড়া তাঁর এলাকায় তেতাল্লিশ ঘর বারাঙ্গনার বসতি স্থাপন করে ভাড়া আদায় করতেন তিনি। সেখানে সরবরাহের প্রয়োজনেও মদ লাগত। ঠাকুর পরিবারে মদের এরূপ বাহুল্য দেখে রূপচাঁদ পক্ষী গান বেঁধেছিলেন—

কি মজা আছে রে লাল জলে
জানো ঠাকুর কোম্পানি।
মদের গুণাগুণ আমরা কি জানি
জানেন ঠাকুর কোম্পানি।
ফি শনিবারে আসে গাড়ি-ভরে
বেরান্ডী আর শ্যাম্পেন
যত বাবু চেয়ে আসছেন ধেয়ে
সাহেবসুবো ছাড়া নয়।... ইত্যাদি।[৭৭]

মদ্যপানের ব্যাপক রসরমায় কলকাতা শহর সেদিন গুলজার। অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (১৮৪৪ আগস্ট) লেখা হল : 'কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তি সন্ধ্যার পরে কলিকাতায় অবস্থা দেখিলে

বিস্ময়াপন্ন হইবেন। তিনি তৎকালে এমন পথ দেখিতে পাইবেন না, যাহাতে ভূরি ভূরি মনুষ্য সুরাপানে মত্ত হইয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় ব্যবহার না করিতেছে এবং কোনো কোনো পল্লীর মধ্যে তিনি এরূপ গৃহ দেখিতে পাইবেন না, যেখানে বহুব্যক্তি দলবদ্ধ হইয়া মদ্যরসে প্রমত্ত না হইতেছে।' ইতিমধ্যে রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডাফ, রেভা: বোয়াস, রেভা: জেম্‌স লং প্রভৃতি প্রভাবশালী মিশনারি এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ইউরোপীয়দের চেষ্টায় ১৮৪১ সালে গড়ে ওঠে ক্যালকাটা টেমপারেন্স সোসাইটি। অবশ্য মদ্যপান তখন নব্যবাবুদের ধ্যানজ্ঞান। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা অনেকেই নিয়মিত মদ্যপানে অভ্যস্ত। এ কাজকে তাঁরা প্রগতির অঙ্গ বলে মনে করেন। বিলিতি মদ্যপানে অভ্যস্ত হলেই বুঝি শাসককুলের সমপর্যায়ে ওঠা যাবে,— এরকম এক ঔপনিবেশিক বিভ্রম হয়তো কাজ করছিল তলে তলে। হুতোম তাঁর গ্রন্থে বাবুদের মদ্যপান ও বেশ্যাবাজির যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা তাঁর সময়ের বাস্তব চিত্র। কালীপ্রসন্ন স্বয়ং মদ্যপানে অমিতাচারী ছিলেন। তাঁর দেওয়া এক পার্টিতে মদের সঙ্গে লবেজান মিশিয়ে খাওয়ায় তাঁর অনুগত একজনের মৃত্যুতে কালীপ্রসন্নকে ঝামেলায় পড়তে হয়। নব্যবাবুদের মদ্যপানের দৃষ্টান্তে উজ্জীবিত হয়ে এবং ইংরেজ সরকারের বদান্যতায় মদ ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষও বিলিতি মদের রসাস্বাদনে মত্ত হলেন। ১৮৫০ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঢাকায় গিয়ে ব্রাহ্মদের মধ্যে মদ্যপানের বাড়াবাড়ি দেখে বিস্মিত ও বিরক্ত হন। সম্ভ্রান্ত বাবুদের বাড়ির মহিলারাও কেউ কেউ মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। ১৮৬৩ সালে এ কারণেই প্যারীচরণ সরকার Bengal Temperance Society গড়ে তুলে আরেক বার উদ্যোগ গ্রহণ করেন মদ্যপানাসক্তি নিবারণের। তবে কয়েকবছর চলার পর ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে প্যারীচরণের মৃত্যু হলে এই উদ্যোগ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নব্যবাবুদের মদ্যপানের উদ্যমে মাঝে মধ্যে বাধার সৃষ্টি হলেও তাতে ভাঁটা পড়েনি কোনোকালে।

নব্যবাবুরা ধর্মাচরণের সঙ্গেও জুড়ে দিয়েছিলেন বিলিতি সুরাকে। দুর্গোৎসব হোক কিম্বা স্নানযাত্রা, রথযাত্রা হোক কিংবা সরস্বতী পূজা, সুরার অবাধ প্রবেশ সবক্ষেত্রেই। কে কতটা নিজে মদ খেতে পারেন এবং মোসাহেবদের ইয়ারদোস্ত পোষা মেয়েমানুষকে খাওয়াতে পারেন— তার উপর নির্ভর করত 'বাবু'র মানমর্যাদা। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আপনার মুখ আপুনি দেখ'র চন্নবিলাসবাবু চন্নবিলাসীকে নিয়ে বাগানবাড়িতে ইয়ারবকশি নিয়ে বড়োদিনের মজা করতে তায়ফা, খেমটার আয়োজন করলেন; তারপর বললেন, 'সুদু বাগানবাটী সাজিয়ে কেবল নাচ দেখালে তো হবেনা? দশজন নেমন্তন্নের সঙ্গে আরো কুড়িজন মানুষ আসবে, সকল মানুষ কিছু একরকম নেশা করে না, আবগারির বিষয়ে সকল রকমই রাখ্‌তে হবে। (মদ) স্যাম্পেন, লিকর, ব্রাণ্ডী ও বিয়ারই অধিক চাই, চেরি সেরি না রাখলেও চল্‌বে না, জিনও দু তিন বোতল রাখ্‌তে হবে, ধাড়ী পাড়বার জন্য নডেলাম প্রভৃতি রাখাও খুব কর্তব্য। কত কত লোক মদ খেতে ঘৃণা করেন, কিন্তু এদিকে মোছলমানের জল ভিস্তির নেশার (তাড়ী) বাঁক খালি কোরে দ্যান, তাঁদের জালাপেট পোরাবার জন্য দু চার জালা তাড়িও চাই। গাঁজা, গুলী, চণ্ডু, চরস, মাজম, খাট্টা, গুলকদ ও টকপাত, প্রভৃতিও রাখ্‌তে হবে। অম্বুরি, ভ্যাল্‌সা, মিটে ও কড়া তামাক, ও নস্য পর্য্যন্ত অবকারির বিষয় চাই। লোকে যেন কোনো জিনিশ চেয়ে "পেলুম না" না বলে'[৭৮] লক্ষ করার মতো, চন্নবিলাসীবাবুর এই ফর্দে হুইস্কি ও রামের বিলিতি সুরার নাম অনুপস্থিত। সেকালে সাধারণত রাম ও হুইস্কি ছিল এদেশে বসবাসকারী সাধারণ ইউরোপীয়ের বস্তু। অর্থাৎ অন্যান্য বিলিতি সুরার মতো এ দু'টির কৌলীন্য ছিল না তেমন। অভিজাত বাবু স্বভাবতই এই দু'টিকে নেশার তালিকা থেকে বর্জন করেছেন। আদিবাবুদের সঙ্গে

এখানেই নববাবুদের তফাত। আদিবাবুরা সুরাকে বর্জন করেন নি, কিন্তু নববাবুদের মতো সুরাসর্বস্বও হয়ে ওঠেননি। তাঁদের দেখানেপনা ছিল জীবনযাত্রার আনুষঙ্গিক খরচে। মার্বেল পাথরের মূর্তি, ভিনিসীয় আয়না, বেলজিয়াম কাট-গ্লাস, সোনা-দানা-হীরে-মতি, আতর ও এসেন্সে সেকালের কলকাতায় তাঁরা নবাবি মহলকে মূর্ত করতে চেয়েছিলেন। দাস-দাসী, লোক-লৌকিকতায় তাঁদের দানধ্যানের পরিমাণটিও ছিল সুপ্রচুর। তাছাড়া, উৎসবে পার্বণে অনেকেই জাঁকজমক আড়ম্বরের 'হুদ্দমুদ্দু' করেছেন, সাহেবসুবো, অতিথি-অভ্যাগতে সে এক এলাহি ব্যাপার, কিন্তু অতিথিদের জন্য বিলিতি সুরা ও খানার ব্যবস্থা থাকলেও নিজেরা তার থেকে দূরে থেকেছেন। নবকৃষ্ণ প্রমুখ অনেক আদিবাবুরা দোল-দুর্গোৎসবে সাহেবদের আমন্ত্রণ জানাতেন এবং মহার্ঘ সুরা পরিবেশন করে ধন্য হতেন; কিন্তু নিজেরা এক টেবিলে বসে ওই সকল মদ্য সেবন করতেন না, তাঁরা অন্য ঘরে বসতেন। দুই ঘরের মাঝের দরজা কেবল খোলা থাকত। নববাবুরা কিন্তু এই প্রথা মানেন নি। এ জাতীয় সংযম তাঁদের অধিকাংশের মধ্যেই অনুপস্থিত ছিল। আদিবাবুরা সুরাপান করতেন না নিয়মিত, বিলিতি সুরা তো নয়ই, উৎসব উপলক্ষ্যে সুরা পানের আয়োজন করতেন। নব্যবাবুরা সেক্ষেত্রে সুরাপানকেই উৎসব করে তুলেছিলেন। পরবর্তীকালের প্রথিতযশা নববাবুদের অনেকেরই যেমন— রাধানাথ শিকদার, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখেরা মারা গিয়েছেন অধিক মদ্যপানের বাড়াবাড়িতেই।

নতুন বাবুদের ক্ষেত্রে মদ্যপানের অনুষঙ্গেই এসে পড়ে গণিকাগমন তথা রক্ষিতা-বিলাসের কথা। নবকৃষ্ণের সাত সাতজন উপপত্নী বা রক্ষিতা ছিল। এ ছাড়াও ধর্ষণের অভিযোগেও তিনি অভিযুক্ত হয়েছিলেন। তবু তিনি 'বাবু'। রামমোহন মাসিক হাজার টাকা ব্যয়ে সেকালের নামকরা বাইজি নিকি-কে রেখেছিলেন। ১৮২৫ সালে প্রাণকৃষ্ণ হালদারের ঐতিহাসিক দুর্গাপূজায় লক্ষৌ থেকে বাইজি আনা হয়েছিল, সঙ্গে ছিল বিলিতি মদ্যপানের এলাহি আয়োজন। নবাবরা 'হারেম' রাখতেন, সেখানে থাকত দেশি-বিদেশি হরেক উপপত্নী। বাবুরা হয়তো সেই নবাবি চাল অনুসরণ করে উপপত্নী রাখার তথা রক্ষিতা পোষার বিলাসিতা দেখাতেন। নতুবা মধ্যযুগীয় সমাজ কাঠামোয় একাধিক বিবাহিতা পত্নী থাকত সম্ভ্রান্ত কুলীনদের, কিন্তু তাঁরা ধর্মপত্নী সকলেই, কেউ রক্ষিতা নন। সাধারণ বিত্তবানেদের মধ্যে বেশ্যাগমন ছিল বিচ্ছিন্ন ব্যাপার। কিন্তু আঠারো শতকের শেষভাগ থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত 'রক্ষিতা রাখা' হয়ে উঠল 'বড় মানুষ কবলানোর' অন্যতম লক্ষণ। উনিশ শতকের প্রথম তিন দশকের মধ্যে যাঁরা 'বাবুয়ানি'তে বেশ নাম কিনেছেন, তাঁদের একটি দু'টি তিনটি রক্ষিতা বা উপপত্নী থাকত। এদেশে আগত সাহেবসুবোদের মধ্যে এ জাতীয় ঘটনা যে ঘটত না এমন নয়। হিকি সাহেব তো তাঁর স্মৃতিকথায় এদেশীয় জমাদারনির প্রতি তাঁর প্রেম ও আকর্ষণের কথা অমর করে রেখে গেছেন। স্বয়ং চার্ণকেরও নাকি একজন দিশি বিবি ছিল। এঁরা সকলেই উপপত্নী, কিন্তু এভাবে প্রকাশ্যে উপপত্নী রাখা সব সাহেবসুবোর পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিশেষ করে যাঁরা চুক্তিপত্রে সই করে কোম্পানির কর্মচারী হিসাবে আসতেন, এ ব্যাপারে তাঁদের কঠোর সংযম পালন করতে বলা হত। কোম্পানির বড়ো সাহেবরা অবশ্য যাত্রীদের নিয়েই আসতেন অনেকে; কিন্তু ছোটো কর্মচারীদের সে সৌভাগ্য হত না। অতএব লুকিয়ে চুরিয়ে চলত অভিসার, কখনো স্বদেশীয় মহিলাদের সঙ্গে, কখনো নিম্নশ্রেণির এদেশীয় রমণীদের সঙ্গে। কিন্তু প্রকাশ্যে রক্ষিতা রাখার সাহস বা সাধ্য তাদের ছিল না। প্রথম যুগের 'হঠাৎ বাবু'রা প্রত্যেকেই ছিলেন বিত্তবান, সমাজ ছিল তাঁদের টাকার বশ। টাকা এবং ক্ষমতার জোরে প্রচলিত সামাজিক বিধিবিধানকে তাঁরা উল্টে দিতে পারতেন। ফলে প্রকাশ্যে রক্ষিতা রেখে তা সদম্ভে ঘোষণা করতে তাঁরা দ্বিধাবোধ করতেন না।

ফুলবাবুরা অনেকেই রক্ষিতাদের মাসোহারা দিতেন, তাঁদের জন্য পৃথক বাগানবাড়ি তৈরি করে দিয়েছিলেন, সেখানে বাবু কর্তৃক নিযুক্ত দাস-দাসী, অলংকার পরিবৃত হয়ে তাঁরা কালাতিপাত করতেন। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে কিংবা প্রতিদিন বিশেষ সময়ে বাবু সচরাচর ইয়ারদোস্ত সহ, কখনো-বা একাই বাগানবাড়িতে যেতেন। তবে বাবুর পোষা রক্ষিতারা নাচ-গান ছাড়া আর কোনো কারণেই অন্য পুরুষের মনোরঞ্জনের অধিকার পেতেন না। পৃষ্ঠপোষক বাবুদের সঙ্গে এভাবেই কখনো কখনো তাদের বিবাহ-বহির্ভূত দাম্পত্য জীবন গড়ে উঠত। মুসলমান রক্ষিতার গর্ভে রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রাজারামের জন্ম বলে প্রচলিত। আবার, রামতনু দত্তের বংশজ কালীপ্রসাদ এক মুসলমান বাহজির সঙ্গে বাগানবাড়িতে পৃথক সংসার করে থাকতেন, এমনকী 'যাবনিক নাম' পর্যন্ত গ্রহণ করেছিলেন। পরে সমাজে ফিরে যেতে চাইলে সে ব্যাপারে প্রভূত শোরগোল হয় এবং রামদুলাল সরকারের সাহায্যে বহু অর্থ ব্যয়পূর্বক কালীপ্রসাদ নিজধর্মে ফিরে আসেন। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আপনার মুখ আপনি দেখ'র বাবু তাঁর পোষ্য রক্ষিতা চন্দনবিলাসীকে বাগানবাড়ি তৈরি করে দিয়েছেন, সেখানে চন্দনবিলাসী ও তার মা-র যাবতীয় ভরণপোষণের দায়িত্ব তাঁর। ভবানীচরণের 'নববাবুবিলাস'-এ 'খোশামুদে দালাল' নববাবুকে উপদেশ দিয়েছে, 'প্রতি রবিবার বাগানে যাইবা মৎস্য ধরিবা সকের যাত্রা শুনিবা নামজাদা নামজাদা বেশ্যা ও বাই ইহারদিগের নিমন্ত্রণ করিয়া বাগানে আনাইবা বহুমূল্য বস্ত্র হার হীরকাঙ্গুরীয়ক অর্থাৎ হীরার আংটি ইত্যাদি প্রদান করিয়া তুষ্ট করিবা।'[৭৯] অতএব শনিবার ও রবিবার নববাবুদের বিলাসে সম্ভোগে বাগানবাড়ি উপচে পড়ত, বটতলার লেখককুল থেকে শুরু করে অমৃতলাল, গিরিশচন্দ্র ঘোষ পর্যন্ত 'নববাবু'দের এ প্রকার 'বিলাসকলাষুকুতূহলম্'কে ব্যঙ্গবাণে বিদ্রূপ করেছেন। ভবানীচরণের গ্রন্থ থেকেই জানা যায় রাজা গুরুদাস, রাজা ইন্দুনাথ, রাজা লোকনাথ, তনুবাবু, রামহরিবাবু, বেণীমাধববাবু প্রমুখ সেকালের খ্যাত অখ্যাত একাধিক বাবুরই এসব দোষ ছিল।

তবে উনিশ শতকের চারের দশক থেকেই প্রকাশ্যে বেশ্যা রেখে বেশ্যাবাজির শখ কমতে থাকে। সম্ভবত, এই সময় থেকে হঠাৎ নবাবদের অনেকেরই চরম দুরবস্থা হয়, বিলাসিতায় বা অন্যান্য কারণে অনেকে সর্বস্বান্ত হন, তাছাড়া শিক্ষাদীক্ষার প্রসারের ফলে নতুন বাবুদের অনেকেই আর বেশ্যাবাজির ব্যাপারটিকে ভালো চোখে দেখছিলেন না। যদিচ এমন মনে করার কারণ নেই যে, শহরে বেশ্যালয়ের সংখ্যা কমে যাচ্ছিল। বরং পুরোনো বেশ্যালয়গুলি ছাড়া চাহিদা মেটাতে শহরের নানা স্থানে আরো অনেক বেশ্যালয় গড়ে ওঠে। ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ওরফে নিশাচার-এর 'সমাজকুচিত্র' থেকে জানা যায়— সোনাগাছি, বাগবাজার, সিমলা, মেছুয়াবাজার, গরাণহাটা, বাঁশতলা, মাথাঘষা, চোরবাগান, সিদ্ধেশ্বরীতলা, চাঁপাতলা, হাড়কাটা, সেন্ট জেম্‌স চার্চ, বৌবাজার, জানবাজার ইত্যাদি নানা স্থানে সেদিন বেশ্যাপল্লীগুলি গড়ে ওঠে। আর হুতোম তো জানিয়েইছেন যে, এসব পল্লীতে 'ছোটোলোক ভদ্রলোক' চেনবার জো ছিল না। আসলে বাবুত্বে রূপান্তরের কারণের মধ্যেই ধরা আছে বেশ্যাবাজির প্রকাশ্য বিজ্ঞাপনে তাঁদের অস্বস্তির রহস্য।

লক্ষ করলে বোঝা যাবে, উনিশ শতকের তিন-চারের দশক থেকেই সমাজের মুখ হিসাবে যাঁরা উঠে আসছেন, তাঁরা আর কেউ দেওয়ানি বা বেনিয়ানি করে অল্পদিনের মধ্যেই বিস্তর টাকা কামিয়ে ফেলা 'বাবু' নন। এই সময় থেকেই হিন্দু কলেজের সুযোগ্য ইয়ং বেঙ্গলের সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে দেশীয় মানুষের নিয়োগের পথ সুনিশ্চিত করতে নিযুক্ত হচ্ছেন নানান সরকারি কাজে। হরচন্দ্র ঘোষের মতন শিক্ষিত

মানুষেরা নিম্ন আদালতের বিচারপতি হয়ে বিচার ব্যবস্থাতেও অংশগ্রহণ করছেন। এঁরা অনেকে বিলিতি সুরার ভক্ত হতে পারেন, কিন্তু বেশ্যাবাজিতে এঁদের আকর্ষণ নেই। আকর্ষণ নেই বুলবুল লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো কিম্বা প্রাণকৃষ্ণ হালদারের মতো নোট জ্বেলে চুরুট ধরাতে। বেশ্যাবাজির চেয়ে এঁরা বরং বেশি চিন্তিত বেশ্যার সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধানে। এঁরা মনে-প্রাণে চাইছেন বা স্বপ্ন দেখছেন সংস্কারমুক্ত কলুষমুক্ত এক আধুনিক সমাজ বিকশিত হোক কলকাতার বুকে। নিজ নিজ গোষ্ঠীর সংবাদপত্রের মাধ্যমে সেই স্বপ্নেই তাঁরা মশগুল। মেয়েরা ঘরের বাইরে পা রাখুন, এ ছিল তাঁদেরও অভিপ্রায়; কিন্তু মেয়েরা ঘরের বাইরে পা রাখবেন বেশ্যা হবার জন্য নয়, 'Civil Society'-তে পুরুষের সঙ্গে সমমর্যাদায় মেলামেশা করবেন, শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে চিন্তার স্বাধীনতা লাভ করবেন, এই ছিল তাঁদের আকাঙ্ক্ষা। সংবাদপত্রগুলিতে তাঁদের কথা, সাধারণ মানুষের কাছে তাঁরাই তখন সত্যিকারের ‘বাবু’। এঁরা কেউ বনেদি বড়োলোক বা টাকার কুমির হতে চাননি, এঁদের হাত ধরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ-মধ্যবিত্তের দু’টি শ্রেণি গড়ে উঠছিল ধীরে ধীরে। এদের ভাবনাচিন্তা তাই বনেদি বাবুর থেকে ভিন্ন গোত্রের।

‘সমাচার দর্পণে’ আমরা যে বাবুর কথা পেয়েছি (০৯.০৬.১৮২১) তিনি দায়গ্রস্ত লোকের দায় মেটাবার ছুতোয় উক্ত ব্যক্তির গৃহে উপস্থিত হন এবং পরামর্শের ছলছুতোয় ‘বাটীর ভিতর গিয়া মিথ্যা আশ্বাসবাক্যে আকাশের চন্দ্র হাতে দিয়া স্ত্রীলোক কোন দিকে থাকে তাহার অনুসন্ধান করেন; ঐ চেষ্টাতে প্রত্যহ যাতায়াত করেন।’[৮০] কিন্তু নতুন বাবুরা সভা-সমিতি স্থাপন করে, আলাপ-আলোচনা করে সামাজিক দায় মোচনের কথা ভাবেন। তাঁদের এই ভাবনার কতটা কার্যে রূপায়িত হয়েছিল, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র; একথাও সত্যি, দু’চারটি প্রকৃত সভার দৃষ্টান্তে অগণন নামসর্বস্ব সভা গড়ে উঠেছিল, তবুও সেসব সভার সভ্য কিম্বা পরিচালকেরা কেউ ইতিহাসের পাতায় ‘বাবু’ হয়ে উঠতে পারেননি। সেইসব ‘বাবু’ না হতে পারা অথচ নিজেদের ‘বাবু’ ভেবে নেওয়া মানুষেরাই ‘খলিফা’র হাত ধরে এইসব বেশ্যালয়ে ভিড় জমিয়েছেন। এঁদের মধ্যে চাকরিজীবী মধ্যবিত্ত কেরানি, উচ্চবিত্ত অনেকেই ছিলেন। কিন্তু বাগানবাড়ি কিম্বা নিদেনপক্ষে রক্ষিতার জন্য দালানকোঠা নির্মাণ করে দেওয়ার ক্ষমতা আর তাঁদের নেই। মাসোহারা দিয়ে ‘বাঁধাবাবু’ হওয়ার সংগতি নেই বলেই শনি-রবিবার এইসব গলিতে আসা। বেশ্যাবাজি আর অহংকারের বিষয় নয় বলেই লুকিয়ে চুরিয়ে আসা। বেচুলাল বেনিয়ার ‘হনুমানের বস্ত্রহরণে’ হনুমানচন্দ্র বেশ্যাগৃহে ধরা পড়ায় লজ্জায় লাল হয়। আসলে নতুন নাগরিকদের কাছে বেশ্যার পোষ্টারা আর ‘বাবু’ নামে আখ্যাত হচ্ছেন না। প্রথম পর্যায়ের ‘বড়মানুষি কবলানো’ বাবু তখন ব্যঙ্গের উপজীব্য, নতুন ‘বাবু’রা আর সেই আওতায় পড়ছেন না। অবশ্য পরবর্তীকালে ‘ইয়ং বেঙ্গলি আচারে’র অনুকরণকারী ছদ্মবাবুরা এবং প্রগতির বাড়াবাড়ি দেখানেপনা করে ব্রাহ্মবাবুরা আবার ব্যঙ্গের উপহাসের পাত্র হয়ে উঠেছিল। তবে সে যুগে আর বারাঙ্গনা গমন ‘বিশেষ’-এর অধিকারে নেই, কলকাতার মিশ্র সংস্কৃতিতে তা ‘সার্বজনীন’ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে বাবুত্বের আসরে তার আর ‘বিশেষ’ কদর নেই। হুতোমের নকশায়, বটতলার নাটক-নভেলে যেসব বাবুদের কথা মেলে তাঁদের সকলেই কোনো ‘ফুলবাবু’ নন, এমনকী ‘হাপবাবু’ হতে গেলেও যা যা গুণ থাকা দরকার তাও তাঁদের নেই। আসল বাবুত্বের কাল তখন শেষ হয়ে গেছে; তলানিটুকুর মতো পড়ে আছে ‘ফোতো নবাব’দের কাল এবং তারই অনুষঙ্গ হিসাবে বেশ্যাগমন ও বিলিতি মদ্যপান।

ঐতিহাসিক বিচারে ‘ফুলবাবু’দের কাল শেষ হয়ে গিয়েছিল ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই। তারপর বাবুত্বের মধ্যেও শুরু হয়েছিল বিমিশ্র সংস্কৃতি যুগ। আফিম-লবণের দেওয়ানি-বেনিয়ানির চেয়ে অনেক

বেশি বাঞ্ছিত ও সম্মানের ছিল সরকার বাহাদুরের অধীনস্থ চাকরি। তাতে হয়তো টাকা মিলবে না বেশি, কিন্তু মিলবে সম্মান। এই সময় থেকেই বাঙালি স্বাধীন ব্যাবসার পথ ছেড়ে, দেওয়ানি-বেনিয়ানি ছেড়ে চাকরিজীবী মধ্যবিত্ত বাঙালিতে পরিণত হন। অতএব 'নববাবুবিলাসে'র 'খলিফা' যে 'নবধা' লক্ষণ বাবুর জন্য নির্দিষ্ট করে—

মুনিয়া বুলবুল আখড়াই গান,
খোষ পোশাকি যশমী দান,
আড়িঘুড়ি কানন ভোজন,
এই নবধা বাবুর লক্ষণ।

সেই 'নবধা' লক্ষণযুক্ত বাবুর যুগ ১৮৩০ সালের মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। মনে রাখতে হবে এই 'নবধা' লক্ষণ মিলিয়ে কেউ বাবুত্বে উন্নীত হত না। বাবুত্ব যখন অতীত ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নেবার তোড়জোর করছে; তখন বাবুত্বের সাধারণ লক্ষণগুলি বিচার করে 'নববাবুবিলাসে'র খলিফা তথা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সাধারণীকৃত সংজ্ঞা দান করেন। আদি বনেদিবাবুরা কম-বেশি এই সাধারণীকৃত আচরণের সীমায় বাঁধা। সেকালের কলকাতায় এই নয়টি লক্ষণযুক্ত 'বাবু' স্বাভাবিকভাবেই খুব কম ছিলেন। যাঁরা এর কাছাকাছিও যেতে পেরেছেন, তাঁদের নিয়ে গল্পগাছা, মিথ, সম্ভব-অসম্ভব নানান কিংবদন্তী গড়ে উঠেছে। এই বাবুরা যেন রূপকথার রাজ্য থেকে এসে পড়া অসম্ভব সত্য সব! তাঁরা কেউ গোলাপ জলে শৌচ করেন, আতরজলে মেঝে ধোয়ান, ঝাড়বাতিগুলো উইয়ে খাচ্ছে শুনলে তক্ষুনি বিদেশের ঝাড়বাতি আনতে ছোটেন, শরীরে ব্যথা পাবেন বলে বহুমূল্য বস্ত্রের পাড় ছিঁড়ে পরেন, দুর্গাপূজায় বাই-খেমটা কিম্বা কবিগানের মোচ্ছব বসিয়ে দেন, সোনার থালা রুপোর বাটিতে খানা সারেন, ঘরে ও বাইরে পত্নী ও উপপত্নীর সমান আদরযত্নে লালিত হন, আনন্দ পেতে লক্ষ্ণৌ থেকে বাইজি আনান— বুলবুলির লড়াই দেখেন, বিলিতি পানীয়ের নেশায় ধরাকে সরাজ্ঞান করেন।

সেদিনের কলকাতায় এরকম অষ্টবাবুর সংবাদ পাওয়া যায়।[৮১] এঁরা হলেন ক্লাইভের আমলে সল্ট কমিটির দেওয়ান মদনমোহন দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামতনু দত্ত ওরফে তনুবাবু, কোম্পানি আমলের ভুঁইফোঁড় বড়োলোক এবং পরে কোম্পানির কাগজ ও নোট জাল করার অপরাধে সাত বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর প্রাপ্ত প্রাণকৃষ্ণ হালদারের ভাই নীলমণি হালদার, ক্লাইভের দেওয়ান— পলাশির খাজনা লুটের অন্যতম দোসর রাজা নবকৃষ্ণের পুত্র রামকৃষ্ণ, লবণের ব্যাবসাদার সীতারাম মিত্রের পুত্র গোকুল মিত্র, কোম্পানির প্রথম আমলের খাদ্য ও পানীয় এবং কুলি সরবরাহের দায়িত্বপ্রাপ্ত পঞ্চানন ঠাকুরের পৌত্র দর্পনারায়ণ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহের পিতা তথা স্যার টমাস রামবোল্ড ও মিস্টার মিডলটনের অধীনে মুর্শিদাবাদ ও পাটনার দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের পুত্র নন্দলাল সিংহ ওরফে সাতু সিংহ[৮১ক], ধনকুবের এবং ভারত-মার্কিন বাণিজ্যের অগ্রদূত রামদুলাল সরকারের পুত্র আশুতোষ দেব এবং সুবর্ণবণিক লক্ষ্মীকান্ত ধর ওরফে নকু ধরের দৌহিত্র রাজা সুখময়। তালিকায় সামান্য রকমফের খেলার কথা স্বীকার করে নিয়েই বলা চলে, লক্ষ করলেই বোঝা যাবে তালিকার পাঁচজন বাবুর পিতা-প্রপিতামহই কোম্পানির অনুগ্রহভাজন এবং দেওয়ান, প্রাণকৃষ্ণ হালদার ও তাঁর ভাই 'প্রতারক' বাবু, একজন সুবর্ণবণিক, আর একজন কায়স্থ বংশীয়— দুজনেই বেনিয়ান। এই তালিকা থেকে বোঝা যায় কোম্পানি আমলে পলাশি উত্তরপর্বে যাঁরা

অর্থ সঞ্চয় করে কিংবা সৎ-অসৎ উভয় প্রকারে বিপুল অর্থ উপার্জন করেছিলেন, বাবুরা এঁদের বংশেরই বিষবৃক্ষের ফল। কর্ণওয়ালিসের নীতির ফলে লবণ, আফিম ও রেশমের উপর দেশীয় ব্যক্তিদের নিয়োগ বন্ধ হয়ে গেলে অগাধ অর্থের জোগানদার কলটিও শুকিয়ে গেল। ফলে পরবর্তীকালে নতুন বাবুদের অর্থ উদ্গমের পথ সঙ্কুচিত ও নির্দিষ্ট হয়ে গেল। পরবর্তীকালে রুচিশীল 'বাবু' হিসাবে নামযশপ্রাপ্ত রামমোহন রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর উভয়েই অন্যান্য উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করেন। দ্বারকানাথ পরবর্তীকালে লবণ, আমদানি-রপ্তানির ব্যাবসা, জাহাজ ব্যাবসা প্রভৃতি উপায়ে অর্থ উপার্জন করলেও, রামমোহনের আয়ের প্রধান উৎস ছিল সুদের ব্যাবসা এবং ভূমিরাজস্ব। দিন যত এগিয়েছে, নানারকম বিধিনিষেধ আরোপের ফলে এদেশীয় বাবুদের বৃহদাংশই চাকরিজীবীতে পরিণত হল। মাস-মাহিনার টাকায় সংসার প্রতিপালনই ছিল অসম্ভব, বাবুয়ানি তো দূরের কথা। ফলে রামমোহন বা দ্বারকানাথের যুগ শেষ হলে এক পুরুষেই তাঁদের বংশধরেরা নেমে এসেছেন উচ্চমধ্যবিত্তের আওতায়। রবীন্দ্রনাথ তো তাঁর বাল্যকালের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার কথা বলেইছেন, সৌদামিনী দেবীও জানিয়েছেন, 'যখন ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল হওয়াতে অকস্মাৎ ঋণসমুদ্রের মধ্যে পড়িতে হইল, তখন এক রাত্রেই পিতা ডিনারের সমারোহ বন্ধ করিয়া দিলেন।"[৮২] দেবেন্দ্রনাথের পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিছু বাবুয়ানি করতেন, 'অবিদ্যাপাড়ার অভিনেত্রী'দের সঙ্গে তাঁর নাকি মেলামেশা ঘনিষ্ঠতা ছিল, কিন্তু স্টিমার কোম্পানি সহ আরও নানান ব্যাবসা লাটে উঠলে তাঁকেও ফিরে আসতে হল সাধারণ নিঃসঙ্গ জীবনে। আসলে বাবুত্ব যেহেতু বিত্তনির্ভর, ফলে বিত্তের স্বল্পতা তথা ব্যয়ের স্বল্পতায় বাবুরাও লোপ পান। মনে রাখতে হবে, সামাজিক সম্ভ্রম, পদমর্যাদা থেকে যে আভিজাত্য কোনো কোনো 'বাবু' লাভ করেছিলেন, তাঁরা 'বাবুয়ানি'র অমিতাচার ছাড়াই জনমানসে চিরজীবী হতে পেরেছিলেন। অন্যদিকে আদিপর্বে বিত্তনির্ভর যে বাবুয়ানি, বিত্ত ফুরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই সে বাবুয়ানির আয়ুও ফুরিয়ে গিয়েছিল।

স্নানযাত্রা, চড়ক প্রভৃতি উপলক্ষ্যে হুতোম অনেক বাবুদের কথা বলেছেন। 'মাহেশের স্নানযাত্রা' উপলক্ষ্যে হুতাম বলেছেন, 'পূর্ব্বে স্নানযাত্রার বড় ধূম ছিল— বড় বড় বাবুরা পিনেস, কলের জাহাজ, বোট ও বজরা ভাড়া করে মাহেশে যেতেন গঙ্গায় বাচ খ্যালা হতো, স্নানযাত্রা পর রাত্তির ধরে খ্যামটা ও বাইয়ের হাট ল্যেগে য্যেতো। কিন্তু এখন আর সে আমোদ নাই— সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই— কেবল ছুতর, কাঁশারি, কামার ও গন্ধবেণে মশাইরাই যা রেখেছেন, মধ্যে মধ্যে দু চার ঢাকা অঞ্চলের জমিদারও স্নানযাত্রার মান রেখে থাকেন, কোন কোন ছোকরা গোছের নতুন বাবুরাও স্নানযাত্রায় আমোদ করেন বটে।'[৮৩] হুতোমের এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক কালসত্যের দিকে ইঙ্গিত করে। পূর্বে দাখিলিকৃত তালিকায় কায়স্থ কুলোদ্ভব বাবুরাই সর্বাধিক, পলাশির যুদ্ধের পর সবচেয়ে লাভবান যাঁরা হয়েছিলেন, তাঁরা এই কায়স্থ শ্রেণি। ব্রাহ্মণও দু'চারজন ছিলেন না এমন নয়। কিন্তু নিঃস্ববিত্ত হওয়াতে, উত্তরপুরুষদের রুচি-পেশার বদল হওয়াতে তাঁরা আর কেউ 'বাবুত্বে'র তালিকাভুক্ত নন। নতুন যুগে সেই ফাঁক পূরণ করতে যাঁরা এগিয়ে এসেছেন তাঁরা গোত্রে হীন, বংশবিচারে অকুলীন, বিত্তের বিচারে দীন। ছুতোর, কামার, কংসবেনে, গন্ধবণিকেরা এসে দখল করছেন তাঁদের ফেলে যাওয়া রাজপাট। এদের শিক্ষাদীক্ষা তথৈবচ, পেশাগত দিক থেকেই গুরুদাস গুঁইয়ের মতন অনেকেই বিদেশি কোম্পানির 'মেটমিস্তিরি' প্রভৃতি। তিরিশ টাকা মাইনে আর উপরি দশটাকা সাকুল্যে চল্লিশ টাকায় সংসার চালাতে জেরবার। দানধ্যান বুলবুল লড়াই তো দূরের কথা, 'মেয়েমানুষ' জোগাড় করতে পারে না বলে শেষ পর্যন্ত

নিজের বিধবা পিসিকে ‘দেখ পিসি সকলেই একটি দুটি মেয়েমানুষ নিয়ে স্নানযাত্রায় যাচ্ছে, কিন্তু পিসি সুদুই বা কেমন করে যাওয়া হয় আমার নিজের জন্য যেন না হল কিন্তু পাঁচো ইয়ারের সুদু নিরামিষ রকমে যেতে মন হচ্ছে না— তা পিসি আমোদ কত্তে কত্তে যাবো, তুমি কেবল বসে যাবে’— এই বলে রাজি করিয়ে নিয়ে যান। বাবুত্বের পড়ন্ত বেলায় আভিজাত্যহীন রুচিহীন কদর্য বাবুদের ভিড়।

কালীঘাটের পট এবং বটতলার প্রহসনে সেসময় এ জাতীয় বাবুদেরই গুণপনা কীর্তিত। ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ দত্ত প্রমুখের কলমে তখন এমন বাবুদেরই বিলাসকথা। ভবানীচরণের ‘নবধা’ লক্ষণে এ সব বাবুরা কেউই মণ্ডিত নন। এঁরা আদি বাবুদের কঙ্কালও নন, ছায়ামাত্র। এঁরা সিপাহি বিদ্রোহের পরবর্ত্তীকালে সময়ের দাবিকে চেনেন না, জানেন না, বোঝেন না। অথচ তখন বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ, মধুসূদন, দক্ষিণারঞ্জন প্রমুখের হাত ধরে আদিবাবুদের উত্তরপুরুষেরা ‘বাবুত্বে’র জন্য সংজ্ঞা নির্মাণে প্রস্তুত।

উনিশ শতকের চারের দশক থেকেই ল্যান্ডহোলডার্স সোসাইটি (১৮৩৮), বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩), ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৫১) প্রভৃতির হাত ধরে শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের বদল ঘটছিল। নিজেদের স্বার্থ রক্ষা এবং সরকারের আস্থাভাজন শ্রেণি হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভই এইসকল সভা-সমিতির প্রধান লক্ষ্য হলেও, নিজেদের নানারকম দাবিদাওয়া আদায়ে আবেদন নিবেদনের মধ্য দিয়ে খুব সূক্ষ্মভাবে হলেও অলক্ষিত এক রাজনৈতিক চেতনার বোধ গড়ে উঠছিল জাতীয় মননে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে বাঙালি বুদ্ধিজীবী শ্রেণির নীরবতার প্রধান কারণ, বিদেশি শাসনের প্রতি এই শ্রেণির সসম্ভ্রম নির্ভরতা এবং নিশ্চয়তা। কিন্তু ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি ‘বাবু’দের চরিত্রবদল ঘটল। বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেল। বিনয় ঘোষ দেখিয়েছেন,[৮৪] ১৮৫৭ থেকে ১৮৮১ সালের মধ্যে উত্তরপ্রদেশ থেকে বর্মা পর্যন্ত বিস্তৃত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন শিক্ষালয় থেকে প্রবেশিক্ষা পরীক্ষায় উত্তীর্ণের সংখ্যা ২০,০০০ জন, তার মধ্যে ১৬,০০০ জনই বাঙালি। ১৮৬১ সাল থেকে ১৮৮১ সালের মধ্যে এফ.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৫০০০ জনের মধ্যে ৪০০০ জন বাঙালি। ১৮৫৮ থেকে ১৮৮১ সালের মধ্যে ১৭০০ জন গ্র্যাজুয়েট হন, বাঙালি গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ১৫০০ জন। অন্যদিকে ১৮৬১ থেকে ১৮৮১ সালের মধ্যে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৪২৩ জনের মধ্যে ৩৫০ জনই বাঙালি। বাঙালির মধ্যে এই দ্রুত শিক্ষাবিস্তারের পাশাপাশি কমছিল চাকরির সুযোগ। বাঙালি ইতিমধ্যেই চাকরিজীবী শ্রেণিতে পরিণত হয়েছিল। অথচ চাকরির বাজার সংকুচিত জেনে বাঙালির মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছিল, সংকীর্ণ হলেও জেগে উঠছিল স্বদেশবোধ, স্বজাতিপ্রীতি। এমতাবস্থায় ১৮৬১ সালে রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরে ‘জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিনী সভা’ স্থাপন করলেন। ঐ সভার রাজনারায়ণ বসু কৃত ইংরেজি অনুষ্ঠানপত্রে উদ্বুদ্ধ নবগোপাল মিত্র ১৮৬৭ সালের ১২ এপ্রিল ‘হিন্দুমেলা’র প্রতিষ্ঠা করেন এবং কালে এই মেলা জাতীয়তার ভাব বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়ে ওঠে। শিবনাথ শাস্ত্রী নিজেই বলেছেন, ‘কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা, দীনবন্ধুর নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সোমপ্রকাশ, মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাথি, এই সকলের মধ্যে শিক্ষিত দলের সনে যেমন নবভাব আনিয়া দিতেছিল, তেমনি আর এক কার্য্যের আয়োজন হইয়া নব আকাঙক্ষার উদয় করিয়াছিল। তাহা... নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ‘জাতীয় মেলা’ নামক মেলা ও প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা এবং দেশের সকল বিভাগের ও সকল শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের তাহার সহিত যোগ। বঙ্গ সমাজের ইতিবৃত্তে ইহা একটি প্রধান ঘটনা; কারণ সেই যে বাঙালির

মনে জাতীয় উন্নতির স্পৃহা জাগিয়াছে তাহা আর নিদ্রিত হয় নাই।'[৮৫] 'জাতীয় মেলা' বা হিন্দুমেলা উপলক্ষ্যে সম্ভ্রান্ত অভিজাত 'বাবু'রা অনেকেই যুক্ত হয়ে পড়েন। ঠাকুর পরিবার প্রথম থেকেই এই মেলার পৃষ্ঠপোষক। এছাড়া শিল্প, সংগীত, মল্লবিদ্যা, বিদ্যানুশীলন প্রভৃতি ছয়টি বিভাগের জন্য ছয়টি মণ্ডলী গঠন করা হয়। তৎকালীন সম্ভ্রান্ত বাবুরা অনেকেই সেই মণ্ডলীতে ছিলেন[৮৬]— রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, রমানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, তারিণী বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীশ্বর মিত্র, দুর্গাচরণ লাহা, নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, প্যারীচরণ সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল, জয়গোপাল সেন, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, রাজনারায়ণ বসু, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, জয়গোপাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, প্রসাদদাস মল্লিক, যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কুমার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, দুর্গাদাস কর, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নীলকমল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এই তালিকা অনুসন্ধান করলে দেখা যায় নবকৃষ্ণ-রাধাকান্ত দেবের উত্তরসূরীরা, মিত্র, মল্লিক, সেন প্রমুখ গণ্যমান্য বাবুবংশের উত্তরাধিকারীরা প্রায় অনেকেই এই মণ্ডলীতে রয়েছেন। বাবুদের উত্তর প্রজন্ম যে স্বদেশবোধ নামক উন্নত ভাবধারার চর্চায় উৎসাহী হয়ে উঠেছেন, তা থেকেই বদলে যাওয়া বাবুত্বের স্বরূপটি অনুধাবন করা যায়।

কিন্তু 'জাতীয় মেলা'র পৃষ্ঠপোষকদের 'ভারতবোধ' কোনো অর্থেই স্বাধীনতা-স্পৃহা নয়। এই মেলার মধ্য দিয়ে নব্যবাবুরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে কোনো চ্যালেঞ্জ খাড়া করতে চাননি। শাসকের সঙ্গে আপোশকামী মনোভাব বজায় রাখাই ছিল তখন পর্যন্ত তাঁদের একান্ত অভিপ্রায়। তৃতীয় অধিবেশনে (১৮৬৯) প্রধান বক্তা মনোমোহন বসু বিস্তারিতভাবে মেলার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতির কথা জানাতে গিয়ে বলেন, 'সামাজিক উন্নতি বলাতে সমাজের নিয়মাদি পরিবর্ত্তন অথবা নূতন প্রথা প্রচলন দ্বারা সমাজের উন্নতি সাধন করা এ মেলার উদ্দেশ্য নহে; সাধ্যায়ত্তও নহে। সমাজবন্ধন দৃঢ় করা এবং সামাজিকতার নষ্টোদ্ধার করাই সার অভিপ্রায়।... স্বজাতীয় সকল শ্রেণীস্থ লোকের একত্র অধিবেশন, পরস্পর সৎসম্ভাষণ, পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের মনোগত ভাব বিনিময়, গত সম্বৎসর মধ্যে সমাজের কি বা উন্নতি আর কিবা অনুন্নতি হইয়াছে তদালোচনা পূর্ব্বক উন্নতিকে উৎসাহ দেওয়া আর অনুন্নতিকে নিরুৎসাহ করা এবং স্বজাতীয়ের প্রতি স্বজাতীয়ের অনুরাগ বর্দ্ধন ও স্বজাতীয় শিল্প সাহিত্যাদিত প্রতি সমুচিত আস্থা জন্মাইয়া দেওয়া যখন মেলার কার্য্য হইল, তখন এই মেলা যে সামাজিকতা উদ্ধারের যোগ্য এবং স্বাবলম্বনস্বরূপ অমূল্যনিধির আকরস্থল হইবে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।'[৮৭] সমাজের নিয়মাদি পরিবর্তন করার অর্থ বিদেশি শাসকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বিরোধের বাতাবরণ সৃষ্টি, নূতন পথ প্রচলনের অর্থ চিরাচরিত সামাজিক অনুশাসন ও সমাজপতিদের বিরোধিতা— এসব প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের ক্ষেত্রগুলি এড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে বাঙালির তথাকথিত প্রথম রাজনৈতিক স্বদেশবোধক সমিতির গা বাঁচিয়ে চলার মনোভাব স্পষ্ট। আসলে মৌচাকে ঢিল মারা 'হিন্দুমেলা'র নীতিই ছিল না। সে আসলে চেয়েছিল নতুন যুগের শিক্ষাভিমানী, সুসংস্কৃত, ইংরেজিয়ানা সমৃদ্ধ, বিদেশি শাসকের পক্ষপুষ্ট বাবুদের একটা নতুন সামাজিক প্ল্যাটফর্ম গড়ে দিতে। বিদেশি শাসককে ক্ষুব্ধ না করে শিবনাথ শাস্ত্রী কথিত 'জাতীয় উন্নতির স্পৃহা' চরিতার্থ করার একটি নির্বিষ প্রচেষ্টা ছিল 'হিন্দুমেলা'। এও ছিল শিক্ষাভিমানী নতুন যুগের বাবুদের একটি 'হুজুগ'। ফলে 'হিন্দু মেলা'র নামে 'জাতীয় উন্নতি'র হুজুগ কিছুদিন পরেই তিরোহিত হয়। মেলার নবম ও দশম অধিবেশনে সেরকম ভিড় না হওয়ায় 'সোমপ্রকাশ','সাধারণী'র মতো পত্রিকা আক্ষেপ করে। এই আক্ষেপোক্তির অবশ্য কারণ ছিল না কোনো। সেই হুতোম তো কবে বলেই দিয়েছিলেন, 'বাবুদের শখ

বিলিতি এলবাতের মতো', অতএব কয়েক বছর পার হতে না হতেই জাতীয় উন্নতির শখ বাবুদের 'বোতাম আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান' হয়েই রইল। মেলার তৃতীয় অধিবেশনে পুরাতন সম্ভ্রান্ত বাবুদের বাড়ির মহিলাদের রৌপ্যপদক দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন মেলা-সদস্যরা। এঁদের মধ্যে মৃত আশুতোষ দেবের পরিবার, বাবু রাজেন্দ্র মিত্রের পরিবার, বাবু প্রিয়নাথ দত্তের পরিবার, বাবু নীলকমল মিত্রের পরিবার, বাবু মণিমোহন মল্লিকের পরিবার প্রমুখেরা ছিলেন। নতুন যুগের বাবু কর্তৃক পুরাতন বা আদিবাবুদের পরিবারকে সম্মান জানানো আসলে কি প্রাচীন বাবুত্বের প্রতি নবীন বাবুদের যুগোপযোগী স্বীকৃতি নিবেদন? হয়তো নয়, তথাপি এই পুনঃস্মরণ তাৎপর্যপূর্ণ।

১৮৭৬ সালের ২৬ জুলাই কলকাতার ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা 'ভারতসভা' প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে বাবুরা এই নতুন সভায় ভিড় করতে থাকেন। প্রথম অধিবেশনে নবগোপাল মিত্রও যোগদান করেন। 'ভারতসভা' থেকেই রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবন শুরু। তাঁর সহযোগী হিসাবে আসেন আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, মনোমোহন ঘোষ প্রমুখেরা। শিবনাথ শাস্ত্রীর মত অনুযায়ী,[৮৮] এই সভার প্রতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিশেষ উৎসাহ ছিল। তবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেকোনো কারণেই হোক, রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে চিরকাল দূরত্ব রক্ষা করে গেছেন। ঠাকুর পরিবারের দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রমুখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকলেও নবগোপাল মিত্র এবং ঠাকুরপরিবারের মানসসন্তান 'হিন্দু মেলা'র কোনো কমিটিতে বিদ্যাসাগর ছিলেন না কোনোদিনই। 'ভারতসভা'কে বলা যায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনে স্থাপিত প্রথম সভা, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গঠনের ভ্রূণভূমি। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'এ নেশন ইন মেকিং' গ্রন্থে (১৯২৫) বলেছেন, '.... the idea that was working in our minds was that the Association was to be the centre of an all India movement. We accordingly resolved to call the new political body, the Indian Association.

'The Indian Association supplied a real need; it soon focused the Public spirit of the middle class, and become the centre of the leading representatives of the educated community.' [৮৯] এই প্রথম 'মধ্যবিত্ত শ্রেণির' মানসিক চাহিদার কথা জানা গেল। এঁরাও বাবু, কিন্তু শিক্ষিত, রুচিশীল, রাজনৈতিক মননসমৃদ্ধ যথার্থ নূতন যুগের প্রতিনিধি। উনিশ শতকের মাঝামাঝিও যা ছিল বিলাস, সেই 'সভা-সমিতি'র হাত ধরে বাঙালি মধ্যবিত্তের শ্রেণিচেতনা স্পষ্ট হয়ে উঠল। 'বিলাস' হয়ে উঠল 'জরুরি প্রয়োজন'। ক্রমে ক্রমে 'ভারতসভা' থেকেই জাতীয় কংগ্রেসের শুভসূচনা হল।

বলা বাহুল্য, এইসকল কাজকর্মও সমালোচিত হচ্ছিল। 'ভারতসভা' গঠনের আগেই 'Bengal Magazine'-এ 'Babu: A Hindusthani'! নামক একটি দীর্ঘ রচনা প্রকাশিত হয়, (এপ্রিল ১৮৭৪)। এই লেখায় বলা হল— সমসাময়িককালে 'বাবু' সবচেয়ে নিন্দিত একটি বস্তু। প্রায়ই শাসককুল, চার্চের পাদরি শালীনতার সীমা পার হয়ে 'বাবু'কে আক্রমণ করে থাকেন। একালের বাবু শীর্ণকায়, কাপুরুষ, হীনবুদ্ধির অধিকারী। একদিকে শাসককুলের প্রতি তার তীব্র ক্ষোভ, অন্যদিকে ইংরেজি শিক্ষার মোহে সে মাতৃভাষাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। শাসকশ্রেণির নানান ভুলচুক দেখানোই তার একমাত্র কাজ। উচ্চশিক্ষা বিস্তারের কুফল স্বরূপ এই মনোভাবের সৃষ্টি। অজ্ঞাত লেখক এসব বলেই ক্ষান্ত হলেন না। আদিবাবুদের 'নবধা' লক্ষণের মতো নতুন বাবুদের 'অষ্টধা' লক্ষণ নির্দেশ করলেন। এগুলি হল—

1. 'The Babu has been represented, and justly represented as weak in body, timid in heart and imaginative intellect.

2.'The Babu is said to be the very type of superficial not solid education.

3. 'This system again explains that other defects of the Babu's intellect so frequently pointed out and lashed. viz. its want of creative energy.

4. 'The Babu is described as entirely denationalized by an outlandish education which has merely sharpened the imitative faculties of the soul, leaving its noble elements asleep in the back ground.

5. 'The Babu is represented as having lost the sedateness and suavity of the national dispositions, as having become ill-tempered and ill-natured rude in his manners, and proud and presumptuous in his tone.

6. 'The Babu's predilection of English, and his consequent neglect of the vernacular have been the stock themes of ridicule, bitter sacasm and even ribaldny with a class of writers.

7. 'The Babu's antagonism to the ruling class has provoked much righteous indignation, and his supposed ingratitude has been again and again censured in the bitterest terms concievable.

8. 'And, lastly, the Babu is stigmatized as a grumbler and an agitator, one not will affected towards British rule, and ready in consequence to give vent to his spite in news-paper tirodes and inflammatory speeches.'[১০] বলা বাহুল্য, আদি বা মধ্যপর্বের বাবুদের তুলনায় এই পর্বে বাবুদের চরিত্র ও স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ আলাদা। সুরেন্দ্রনাথ 'ভারতসভা' গঠন করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাবু-কে রাজনৈতিক বুদ্ধিবৃত্তির দিকে চালিত করার কথা বলেছেন বটে, কিন্তু সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার সাক্ষ্যে মধ্যবিত্ত বাবু-র যে শ্রেণিচরিত্র উঠে আসে, তা যে প্রশংসাব্যঞ্জক নয়, বলাই যায়। সিপাহি যুদ্ধের আগে ঈশ্বর গুপ্ত নব্যবাবুদের বিলিতি আদবকায়দা ও ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগে আশঙ্কিত হয়েছিলেন। দশ-বিশ বছরের মধ্যেই গুপ্তকবির আশঙ্কা সত্যি প্রমাণিত করে নব্যবাবুরা একেকজন 'বাংরেজ' হয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু বাহ্য আদবকায়দা ও আড়ম্বরসর্বস্বতায় এঁরা বিলিতি বাবুসদৃশ হলেও, স্বভাব ভীরুতার কারণে এঁরা পুরোপুরি 'সাহেব' হতে পারেননি। একদিকে সাহেবদের দ্বারা উপেক্ষিত হবার যন্ত্রণা, অন্যদিকে আবার সাহেবদের অধীনে চাকরি প্রত্যার্থী বাবুর দুর্বলতা 'বাবু'দের মানসিক দ্বন্দ্বের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। একদিকে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা থেকে বাবুদের প্রতি সীমাহীন ভক্তি টলে গিয়েছিল, অথচ পোশাক-আশাক, আদবকায়দা, খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতিতে অন্ধ অনুকরণও বন্ধ হয়নি। এই বাবুদের জাতে তুলে বিদেশি শাসক নিজেদের দলভুক্ত করে নেয়নি, আবার আত্যন্তিক ঘৃণায় দেশের বৃহত্তর সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এঁরা নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন। এইসব সাধারণ মানুষদের উপস্থিতি সত্য ছিল কেবলমাত্র এঁদের ভাববাদী কল্পনায়, বাস্তবে এদের স্বগোত্র বলে নিজেদের ভাবতে এঁরা ঘৃণা বোধ করতেন। বিগত অতীতে বাবু-রা দানধ্যান, উৎসব, পুণ্যাহ প্রভৃতি উপলক্ষ্যে যে জনসংযোগ স্থাপন করতে পেরেছিলেন, তার জন্যই বিলাসিতা, অগম্যাগমন প্রভৃতি নানান আনুষঙ্গিক দোষ সত্ত্বেও তাঁরা লৌকিক চেতনায়, জনমানসে চিরস্থায়ী শ্রুতকীর্তি হতে পেরেছিলেন। মধ্যযুগের ফিউডাল সমাজেও আমরা দেখেছি, জমিদার বা ভূস্বামী কর্তৃক শোষণ, অত্যাচার, অনাচার সত্ত্বেও প্রজাদের সঙ্গে তাঁদের আকর্ষণ-বিকর্ষণের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠত। প্রজাদের উপর তাঁদের প্রবল অধিকারবোধ থাকত, তা সে ন্যায় হোক কিংবা অন্যায়, প্রজারাও তাঁদের অভিভাবকতুল্য জ্ঞান করতেন। কলকাতার নগর-বিকাশের প্রথম পর্বে

আদিবাবুদের অনেকেই দান, ধ্যান, বিলাসিতায় প্রভূত অর্থ ব্যয় করে সেদিনের নগরবাসী জনসাধারণের মনে সম্ভ্রমবোধের বিভ্রম সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। তাঁদের মধ্যে আভিজাত্য ছিল, নির্মমতা ছিল, কিন্তু লোক ব্যবহার বিষয়টিও তাঁরা উপেক্ষা করেননি। তাই তাঁদের ঘিরে এত কিংবদন্তী, এত আখ্যানবিলাস।

উনিশ শতকের শেষ কয়েক দশকে অর্থ, বিত্ত, আভিজাত্য হারাতে বসা বাঙালি সম্প্রদায় জনগণ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন বলেই, তাঁদের বৃহত্তর আশা-নিরাশা কিম্বা পতন-অভ্যুদয়ে সাধারণ মানুষ আর সেভাবে প্লাবিত হল না। তাছাড়া বিমিশ্র সংস্কৃতির ক্ষেত্র কলকাতায় তখন বাঙালি ছাড়াও আরো অনেক বাবু। কৌলীন্যে না হোক, অর্থে-বিত্তে নতুন যুগের এই বাবুরা বুঝি জগৎ শেঠকেও হারিয়ে দেন। সুরাপান কি অগম্যাগমন-অনাসক্ত নন তাঁরা কোনোটিতেই। তবু তাঁদের ঘিরেও 'বাবু'ত্বের মিথ গড়ে উঠল না। অন্য সংস্কৃতির 'বাবু'রা বাঙালি বাবুত্বের ভিড়ে ঠাঁই পেলেন না। নতুন বাবুরা শিক্ষিত তাই শিক্ষাভিমানী, অহংকারী, সাধারণ লোকবৃত্তের অনেক উপরে তাঁদের সামাজিক অবস্থান। অতএব জনমানস থেকে এঁরা মুছেও যেতে লাগলেন দ্রুত। দেশে স্ত্রীশিক্ষা চালিত হয়েছে। বাঙালি নারীরাও আর শুধু 'গতিসুখসঙ্গে রভসরঙ্গে' কাল কাটাতে রাজী নন। পুরুষদের সঙ্গে সমান তাল মিলিয়ে তাঁরাও আত্মশক্তির বিকাশে মগ্ন। বিভ্রান্ত, হতভম্ব সমাজ বিদ্রূপ করতে ছাড়ছে না তাঁদেরও। বটতলা থেকে কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সমাজের আশঙ্কার কথা প্রকাশ করছেন 'বৌবাবু' লিখে (১৮৯০ খ্রি.); 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় যোগেশচন্দ্র গুপ্ত 'মডেল ভগিনী' লিখে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার বাড়াবাড়ির ফলে ঘটিতব্য দুর্গতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। লেডি ডাক্তার সোহাগিনি বসু ও তার বারবিলাসী স্বামীবাবুটি দেখা দিচ্ছেন 'সচিত্র কলিকাতা-রহস্যে'র (১৮৯৬) পাতায়। আখ্যাপত্রে জহরলাল ধর সবিনয়ে জানান—

'উচিত বলিলে বন্ধু বিগাড়িয়া যায়;
কিন্তু, — চোকে আঙুল না দিলেও দেখিতে না পায়।'

অতএব, চোখে আঙুল দাদার মতো সেদিন কলকাতায় খ্যাত-অখ্যাত জানা-অজানা কত না লেখকের ভিড়।

বাস্তবিক, আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে কলকাতায় ছাপাখানার ধীরবিস্তার[১১] এবং ইংরেজদের হাত ধরে ইংরেজি সংবাদপত্র, মেসোয়ার, বইপত্রের প্রকাশ বাঙালিকে সচকিত ও আকৃষ্ট না করলে হারিয়েই যেত বাবু-সংস্কৃতির সেকাল-একালের ইতিহাস। ১৭৮০ সালে কলকাতার ৩টি প্রেস থেকে যেখানে প্রকাশিত হয়েছে ৬খানি বই, সেখানে শেষ বছরে, ১৭৯৯-তে বই প্রকাশ হয়েছে ২৬টি; সব মিলিয়ে কুড়ি বছরে বই প্রকাশ পেয়েছে ৩৬২টি। উনিশ শতকের শুরু থেকেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উদ্যোগে বাংলা গদ্যে যেসব বই লেখানো হল, তার সীমাবদ্ধতা ছিল, বৃহত্তর পাঠককুলের কথা উপেক্ষিত হয়েছিল; গ্রন্থগুলি ছিল সিভিলিয়ানদের পাঠ্যপুস্তক। তবে এসবের মাধ্যমে হরফ নির্মাণ, কাঠের ব্লক তৈরি, এনগ্রেভিং বা এচিং-এর ব্যবহার শিখিয়ে দেশীয় কর্মচারীদের ছাপাখানার কাজে উপযোগী করে তোলা, এসবের অলক্ষিত প্রভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকেই প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের পাশাপাশি নিছক ব্যক্তিগত উদ্যোগে ছাপাখানার বিস্তার ঘটল এবং দেশীয় উদ্যোগে বাংলা হরফে একাধিক সংবাদপত্র ও স্বাধীন গ্রন্থাদি প্রকাশ পেতে লাগল। রামমোহনের ব্রহ্মচিন্তা বিষয়ক গ্রন্থগুলি এ জাতীয় ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফল হলেও, বিষয়ের কারণেই এইসব বই সাধারণ পাঠকের পরিবর্তে 'পণ্ডিত' পাঠকের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সেই বিচারে সাধারণ পাঠকের জন্য স্বাধীন উদ্যোগে গ্রন্থরচনা ও প্রকাশের কৃতিত্ব ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পলাশির যুদ্ধের পরবর্তীকাল থেকে উনিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক পর্যন্ত বহমান

বাবুত্বের লীলাখেলা-ই এইসব গ্রন্থের বিষয়। কোনো বিশেষ বাবুকে ভবানীচরণ নির্দিষ্ট করে দেন না, বরং বাবুত্বের সাধারণ বিশেষত্বগুলিকেই নিপুণ, নিখুঁত,অনুপুঙ্খ সমাজদৃষ্টির দ্বারা ফুটিয়ে তোলেন। কিন্তু ভবানীচরণ নির্মম নন, নিরপেক্ষ নন, গ্রন্থের শেষে কাতর অনুনয়-উপদেশ ও আশ্বাস-বাক্যের ব্যবহারে তিনি বিষয় ও বিষয়ীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। অন্যদিকে হুতোম শুধু নিরপেক্ষ নন, নির্মমও। হুতোমের গ্রন্থ যেন ভবানীচরণের সম্প্রসারণ, তবে ইতিহাসবোধে, মননে, অভিজ্ঞতায়, হাস্যে ব্যঙ্গে আরও ধুরন্ধর, আরও তীক্ষ্ণ। বস্তুত হুতোমের গ্রন্থ যেন উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বয়ে চলা বাবুত্বের জীবন্ত ইতিহাস। প্রতিভায়, প্রকরণে, আভিজাত্যে এই দুই গ্রন্থ বাবু-ইতিহাসের সুবর্ণযুগটির দুই প্রান্ত ধরে আছে।

অন্যদিকে উনিশ শতকের পাঁচের দশক থেকে তুলনায় সস্তা কাগজে, লাল রঙের পাতলা মলাটে উড্-কাটপ্রিন্টের ছবি ছাপা ক্ষীণকায় কয়েক ফর্মার যে বইগুলি হপ্তায় হপ্তায় নাগরিক জীবনের মাঝখানে এসে দেখা দিত, প্রথমদিকে হয়তো-বা বিস্তৃত বটগাছগুলির বাঁধানো তলে বিক্রি হতে হতে 'বটতলার বই' নাম পরিগ্রহ করা সেইসব নন-এলিট পুস্তকে বাবুত্বের অনেক ইতিহাস, অনেক লীলাখেলা নীরবে বাঙ্ময় হয়ে আছে। এসব বইয়ের লেখকেরা উপাদান সংগ্রহ করেছেন সমসাময়িক কালের ঘটমান জীবনের স্রোত থেকে। যা দেখেছেন তাই তুলে ধরেছেন, যা শুনেছেন সে ভাষাতেই বলেছেন, যা ভাবছেন অকপটে সেকথা বলতে দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছেন না। হুতোম ও ভবানীচরণ যদি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাবু-ইতিহাস রচনা করে থাকেন, তবে বটতলার লেখকেরা উনিশ শতকের বাকি অর্ধাংশের বাবু-বৃত্তান্তের পরিশিষ্ট রচনা করেছেন। এঁরা যেন সমাজ-বিবেক। বিশেষ করে সিপাহি বিদ্রোহের পরবর্তীকালে বদলে যাওয়া বাবুত্বের নানান ফন্দিফিকির, রকমারি লীলা কখনো নির্মম ব্যঙ্গে, কখনো চরম ঔদাসীন্যে এঁরা বলে গেছেন। বাবুত্বের পুরোনো সংজ্ঞা-লক্ষণ যত বদলে গেছে, এঁরা সেই বদলে যাওয়া বাবুত্বকে নতুন সংজ্ঞায় ধরতে চেয়েছেন। অবশ্য অনেক লেখকই সমাজ-পরিশোধনের গোপন ইচ্ছেটাকে গোপন করে রাখতে পারেননি শেষপর্যন্ত। নীতিবাক্যে, উপদেশের ঘনঘটায় তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

বস্তুত, কেবল বাবুত্বের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নয়, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি মানসের রূপ-রূপান্তরের পথরেখাটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এইসব রচনায়। মদ্যপান, বেশ্যাগমন, পরস্ত্রীলোলুপতা, পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্ধ আকর্ষণ, বাবুয়ানি, ফোতো-নবাবি, জাল-জুয়াচুরি, স্বাদেশিকতার ভণ্ডামি, রাজনীতির নামে স্বেচ্ছাচার, অর্থগৃধ্নুতা, বড়োলোকের অন্দরমহলের অন্ধকার— সমস্তকিছুর সূত্রে 'বাবু' নামক শ্রেণিটির মুখ ও মুখোশ উন্মোচন করে দেন বটতলার জ্ঞাত-অজ্ঞাত লেখকেরা। এমনকী 'ফিমেল এডুকেশন' এবং সেইসূত্রে বাঙালি বাবুর বাড়াবাড়ি থেকে শুরু করে কেরানিবাবুর অশ্রুজলটিকেও তাঁরা সযত্নে ধরে রেখেছেন এইসব পুস্তকে। সমসময়ে বটতলা সাহিত্যে রতিশাস্ত্রের রমরমা দেখা দিয়েছিল, লং, তাঁর ক্যাটালগে যেসব গ্রন্থকে 'These works are beastly, equal to the worst of the French School'[৯২] বলে ভর্ৎসনা করেছেন, সেগুলি আসলে যুগজীবনের অনিবার্য প্রতিফলন। গ্রাম থেকে নগর, নগর থেকে মেট্রোপলিস হয়ে উঠতে থাকা শহরে অর্থ-বিত্ত-সম্পদের একটি সাময়িক প্রবাহ ক্রিয়াশীল ছিল, অতএব চাহিদা বাড়ছিল। এ চাহিদা বিলাসের, সম্ভোগের, এ চাহিদা যেনতেনপ্রকারেণ জীবন উপভোগের। এ ইতিহাস পৃথিবীর যেকোনো নগরের হয়ে ওঠার ইতিহাসে অনিবার্য সত্য। নবাবি আমলে এদেশে নবাবদের প্রধান প্রধান কার্যস্থল— রাজমহল, ঢাকা, কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি সকল স্থানেই এ প্রকার বিলাস-সম্ভোগের স্রোত বয়ে গিয়েছিল; নবগঠিত কলকাতাও তার ব্যতিক্রম নয়। ইংল্যান্ডেও ভিক্টোরিয়ান

যুগে বাহ্য শুচিতা-শ্লীলতার আড়ালে erotic সাহিত্যের নির্লজ্জ সম্ভার স্তূপাকৃত হচ্ছিল। বিদ্যাসুন্দর ভক্ত বাঙালি বিত্তবানেরা তাঁর ব্যতিক্রম হবেন না আশাই করা যায়। তা তাঁরা হননি। অর্থনীতির দিক দিয়েও উনিশ শতকের প্রথমার্ধের সমৃদ্ধি উর্ধ্বমুখী। ক্রয়ক্ষমতা সুলভ হলে মানুষ তো সব নেয়, 'নারীকেও কিনে নিতে চায়'; উনিশ শতকের বাবুবিলাসের সেটাও অন্যতম কারণ।

সাধারণভাবে উনিশ শতক নানারকম ভাব-সংঘাত ও সমন্বয়ের কাল। উনিশ শতকের বাঙালি জীবন এইসব ভাব-সংঘাতে আবর্তিত হতে হতে এগিয়ে চলেছিল দ্রুতগতিতে। ধর্ম, সমাজ, জীবন-মনন সবকিছুই এই সংঘাতের স্পর্শে আলোড়িত হয়েছে এবং প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রটি প্রকাশ করেছে। কলকাতার সামাজিক গড়নের মধ্যেই ছিল এই সংঘাতের বীজ। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকেই ইংরেজরা একটু একটু করে পরিকল্পনা মাফিক তাদের বাণিজ্যভূমি গড়ে তুলছিল। পুরাতন যে গ্রামীণ সমাজ গোবিন্দপুর-সুতানুটি-ডিহি কলকাতার বর্তমান ছিল, তাকে উৎখাত করে এক বিমিশ্র সংস্কৃতির জন্ম দিল ইংরেজ। এ সমাজের কাঠামো বাংলার তথা ভারতবর্ষের চিরপ্রচলিত সামাজিক কাঠামোর ক্ষেত্রে অভিনব। সেদিন নূতন কলকাতায় যাঁরা এসে ভিড় জমালেন, তাঁরা নানা জাতি, নানা ভাষাভাষী, নানা সংস্কৃতির মানুষ। গ্রামজীবনে দীর্ঘকাল ধরে থাকতে থাকতে বংশপরম্পরায় যে সামাজিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয় বাসিন্দারা, নতুন গড়ে ওঠা কলকাতায় সে সুযোগ ছিল না। সকলেই এখানে রবাহূত, অধিকাংশই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্করহিত, নানান পেশার, নানান ধর্মের মানুষ। ইংরেজের সঙ্গে ধীরে ধীরে তাদের সম্পর্ক শাসক-শাসিতের হয়ে দাঁড়াল বটে, কিন্তু এই সম্পর্ক ভূস্বামী ও প্রজার সম্পর্কের সমতুল নয়। মনে রাখতে হবে, শহর কলকাতায় জড়ো হওয়া মানুষদের সঙ্গে কৃষি-অর্থনীতিতে অভ্যস্ত বাংলার গড়নের কোনো মিল ছিল না। এ এক নূতন সমাজব্যবস্থা যেখানে কৃষিজ পণ্যের বেচাকেনা চলে, অর্থাৎ এই অর্থনীতি নেহাতই বাজার-অর্থনীতি। এখানের মানুষগুলিও কোনো-না-কোনো সূত্রে এই বাজার অর্থনীতিরই ধারকবাহক।

আদিবাবুরা যাঁরা সরাসরি ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে ব্যাবসা, দেওয়ানি, বেনিয়ানি, মুতসুদ্দিগিরি প্রভৃতি সূত্রে যুক্ত ছিল, তাঁরা অনেকেই অভ্যস্ত ছিলেন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-বিন্যাসে। এঁরা প্রত্যেকেই বাজার-কলকাতার মিশ্র-সমাজের মাথা হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন। ফলে ব্রাহ্মণ্য-শাসিত সমাজ গড়নকে অস্বীকার করে কায়স্থ, বৈশ্য, এমনকী সদগোপ-তিলি প্রভৃতি পুরাতন সামাজিক ধারণায় নিম্নজাতীয় বর্ণ-গোত্রের মানুষরাও একে একে অভিজাত এবং সমাজ-বিচারে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হচ্ছিলেন। বিপুল অর্থ ব্যয় করে সমাজে মান্যতা চাইছেন এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আবার মান্যতা চাইলেও সবসময় যে মান্যতা মিলছে এমনটিও নয়। পাথুরিয়াঘাটার দর্পনারায়ণ ঠাকুর 'পিরালি' আখ্যার অপনোদনের জন্য 'সমন্বয়' ডাকেন এবং এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে কৃষ্ণনগরাধীশ কৃষ্ণচন্দ্রকেও আনান। কিন্তু কলকাতার প্রধান দুই সমাজপতির অন্যতম মদনমোহন দত্তের আপত্তিতে তা সম্ভব হয়নি।[১৪] কালু ঘোষ নামক এক সদগোপও মদনমোহনের আপত্তিতে জাতে উঠতে পারেননি। আবার, রামদুলাল দে'র সাহায্যে ওই মদনমোহন দত্তের পৌত্র কালীপ্রসাদ যবন-সংসর্গ করে পতিত হলেও পুনরায় সমাজে গৃহীত হন। পরবর্তীকালেও, ব্রাহ্মসমাজভুক্ত বহু কৃতবিদ্য পুরুষ পুনরায় হিন্দুধর্মে আনুষ্ঠানিকভাবে ফিরে আসেন।[১৫] এইরকম একটি সামাজিক আবহাওয়ায় সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল। বহুজাতি, বহু ধর্মমতাবলম্বী মানুষের গোষ্ঠীগত স্বার্থের চেহারা যেহেতু ভিন্ন, ফলে মিশ্র সংস্কৃতিতে স্বার্থের সংঘাত ঘনীভূত হয়েছিল।

যে কলকাতাকে ইউরোপীয় ঘরানার ‘প্রাসাদ-নগরী’ করে গড়ে তুলতে চেয়েছিল ইংরেজ, সেই কলকাতার সামাজিক আবহাওয়ায় দিব্যি ঘর করছিল সতীপ্রথা, বহুবিবাহ, গৌরীদান, কৌলীন্যপ্রথা, জাত-পাত-অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা। আদিবাবুদের জীবনযাত্রা, ভাবনাচিন্তা, মনোবৃত্তি সমস্তই ছিল সামন্ততন্ত্রের উপযোগী। অথচ সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সামন্তপ্রভু ও প্রজাদের মধ্যে যে শাসক-শাসিতের সম্পর্ক স্থাপিত হত, কলকাতায় তা সম্ভব ছিল না। ইংরেজ এখানে প্রভু, আদিবাবুরা মধ্যস্বত্বভোগী মাত্র। অথচ মেজাজে-জীবনযাত্রায় মধ্যযুগীয় ঐতিহ্য অনুসরণের মধ্য দিয়ে যে পুরাতনী অনুবর্তন চলছিল বাবুদের হাত ধরে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাবুদের দ্বিতীয় তৃতীয় প্রজন্ম সেই প্রতিকূল প্রবাহকে ত্যাগ করে আধুনিকতার অগ্রসরমুখী স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। নিজেদের শ্রেণিস্বার্থেই এমন এক অনুকূল পরিবেশ রচনা করা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল নতুন বাবুদের কাছে, যা সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়া থেকে বহুদূরবর্তী এবং পাশ্চাত্য জীবন দর্শনের সঙ্গে নৈকট্যযুক্ত। আর এই পরিবেশ রচনা করতে গেলে আশু প্রয়োজন ছিল ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কারসাধন। কেবলমাত্র এই প্রকার সার্বিক সংস্কারের মধ্য দিয়েই এই বিমিশ্র সংস্কৃতির নগরীতে পাদপ্রদীপের আলোয় উঠে আসা যায়। ফলে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয় দত্ত, ঈশ্বর গুপ্ত কিম্বা ইয়ং বেঙ্গলেরা দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সামাজিক-ধর্মীয় নানাপ্রকার সংস্কারমূলক আন্দোলনে। অর্থাৎ পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণাপুষ্ট আদিবাবুদের যুগ কালের অমোঘ নিয়মেই বিগত হল।

অবশ্য নতুন বাবুদের যুগ যে পুরোপুরি মানসিক দ্বন্দ্বরহিত হতে পারল এমনটি নয়। তবে সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারা থেকে যে বহুলাংশে মুক্তি লাভ করল সেকথা মেনে নিতেই হবে। অবশ্য সংস্কারপন্থীরা যে নিরঙ্কুশ সাফল্য পেল তাও নয়। ঐতিহাসিকেরা কেউ কেউ ভিন্ন মত পোষণ করেন। কেউ মনে করেছেন, 'The conservatives ultimately gained ground. They were able to obtain popular support by representing popular beliefs and defending popular customs against the attacks of those who stood for reform and change.'[৯৫] কেউ-বা আবার বলেছেন, ‘বাংলার প্রথম যুগের ইংরাজী নবিশেরা নূতন স্বাধীনতা এবং মানবতার প্রেরণায় সমাজে একটা প্রবল সংশয়বাদ বা নাস্তিক্য আনিয়া ফেলেন; আর ইহারই সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ও প্রচলিত ধর্ম্ম ও সমাজনীতির বেষ্টনী উল্লঙ্ঘন করিয়া একটা স্বেচ্ছাচার ও অনাচারের বন্যায় সমাজকে ভাসাইয়া দিতে উদ্যত হন।’[৯৬] মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক খোলস ছেড়ে এক সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সংশয়বাদী জীবনযাপনের অভ্যাস আরো অনেকের কাছেই ছিল ‘স্বেচ্ছাচার ও অনাচারে’র বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু আসল সত্য এই যে, নূতন কালের নাগরিক জীবনে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার উপস্থিতি ছিল বিসদৃশ এবং অসুবিধাজনক। কাল তার নিজস্ব নিয়মেই তাই বদলে দিতে চেয়েছিল পুরাতন ধ্যানধারণার সেই বিসদৃশ ছককে। নতুন কালের শিক্ষিত সম্প্রদায় কালের বাহনমাত্র, যাদের সংস্কার আন্দোলন ও স্বাধীন ধ্যানধারাণার প্রান্ততা আদিবাবুদের অলস, অনড়, মন্থর জীবনযাত্রাকে উপড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে প্রস্তুত হয়েছিল অতীত ইতিহাসের গর্ভে। এর ফলেই বনেদি বাবুত্বের কাল শেষে শুরু হল এক নূতন বাবুদের  কাল, যাঁরা ইংরেজদের চোখে 'Bhadralok– the respectable middle calss in Bengal (Hindu)'[৯৭]।

উনিশ শতকের শেষপাদ পর্যন্ত সামাজিক আন্দোলনগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এগুলি মূলত প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের সংঘাত; মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণার সঙ্গে আধুনিক মনন-চিন্তনের সংঘাত। প্রাচীন

‘বাবু’দের সঙ্গে নবীন ‘বাবু’ তথা ‘ভদ্রলোক মধ্যবিত্তে’র সংঘাত। অবশ্যই এই সংঘাত ছিল সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ। সাধারণ মানুষ এই ‘দলাদলি’ সংঘর্ষকে দূর থেকে কিছুটা বা নির্লিপ্ত হয়েই দেখেছে, তবুও ভাবধারাগত সংঘাত ও সমন্বয়ের প্রক্রিয়া যে শুরু হয়েছিল তা অস্বীকার করা যায় না। রাজায় রাজায় যুদ্ধে উলুখাগড়ার প্রাণ যায়নি এক্ষেত্রে বরং সাধারণ মানুষ ঈষৎ কৌতূহল মিশ্রিত কৌতুকের সঙ্গে দুই প্রজন্মের বাবুদের সংঘাত লক্ষ করেছে। সেদিন নাগরিক কলকাতায় দুই শ্রেণি— 'Rich Bangalee Baboo' এবং 'respectable middle class'। ভোলানাথ চন্দ্র থেকে রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখেরা সকলেই এই দুই শ্রেণি নির্দেশ করছেন।[৯৮] তৃতীয় শ্রেণি অর্থাৎ নিম্নবিত্ত মুষ্টিমেয় জনসাধারণ সেই শ্রেণিবিভাগে অবহেলিত, কারণ নাগরিক কলকাতার ইতিহাস তখন বয়ে নিয়ে চলেছেন এই দুই শ্রেণিই।

মনে রাখতে হবে, ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি— সব ক্ষেত্রেই এই দুই শ্রেণির স্বার্থের সংঘাত যেমন সত্য, তেমনি সমন্বয় বা সম্পর্কের ইতিহাসটিও। প্রাচীনপন্থী যে বাবুরা সতীদাহ রদ, কৌলীন্য প্রথা ও বহুবিবাহ বিলোপ, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন প্রভৃতিকে মেনে নিতে না পেরে প্রতিরোধে সামিল, তাঁদের অনেকেই আবার স্থল বিশেষে প্রগতির পরিচয় রাখেন। যে রাধাকান্ত দেব প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী, তিনিই আবার নিজ বাড়িতে ‘ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি’র বালিকাদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন— ‘স্মরণ হয় যে, ১৮২২ সালের আরম্ভকালে ত্রিশ জন বালিকার বিদ্যার পরীক্ষা লইতে তাঁহার বাটীতে দেখা গিয়েছে।’[৯৯] অন্যদিকে, যে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ‘ইয়ং বেঙ্গলে’র অন্যতম হিসাবে হিন্দুধর্মের অসারতার কথা বলেছেন, রাজনারায়ণ বসু-র সাক্ষ্য মেনে নিলে বলতে হয়,[১০০], ‘দক্ষিণারঞ্জন অযোধ্যায় গিয়া টিকি রাখিয়া পরম হিন্দুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন।’ মুখ ও মনের এই দ্বৈতভাব ‘বাবু’দেরই আদর্শ স্বভাব। তাঁরা ছিলেন ‘হুজুগে’ পুরুষ। সাময়িক উত্তেজনার বশে, হয়তো-বা কিছু সহৃদয় ইংরেজ সাহেবের অনুপ্রেরণায় নানান সামাজিক আন্দোলনে তাঁরা যুক্ত হচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ায় অচিরেই অন্তর্হিত হয়েছেন। বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে এরকম দৃষ্টান্ত তো ভূরি ভূরি। স্বয়ং কালীপ্রসন্ন সিংহ এ জাতীয় উদ্যোগে অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হয়েও পরে তা বিস্মৃত হয়েছেন। আসলে দ্বন্দ্ব ছিল বাবুদের চরিত্রের অন্তর্নিহিত সত্য। এ কারণেই সতীদাহ ছাড়া উনিশ শতকে অন্য সংস্কার আন্দোলনগুলি প্রাথমিক সাফল্য লাভ করলেও, অচিরেই সেগুলি মুখ থুবড়ে পড়েছে। বিদ্যাসাগরের মতো মহিমময় পুরুষও বিধবা বিবাহের জন্য এত উদ্‌যোগ, এত লাঞ্ছনা সহ্য করেও শেষদিন পর্যন্ত এর সাফল্যের ছবি দেখতে ব্যর্থ হয়েছেন। যে ব্রাহ্ম আন্দোলন উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ‘ভদ্রলোক’বাবুদের শ্রেণিগত 'identity' হয়ে উঠেছিল, উনিশ শতকের ছয়-সাতের দশকেই সেই ব্রাহ্মবাবুরা উপহাসিত হচ্ছেন। অনেকের গৃহে ‘ব্রাহ্মমতে কালী কিম্বা সরস্বতী পূজা’ হচ্ছে বলেও সেকালের পত্র-পত্রিকায় ব্যঙ্গ করা হচ্ছে।[১০১] বিশ শতকের প্রথম দশকেই ‘ব্রাহ্মবন্ধু’ সভার অধিবেশনে প্রকাশ্যে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে, ‘ঠিক কথা। ব্রাহ্মগণের মধ্যে অনেকের এই হিন্দুত্বের দিকে অতি মাত্রায় ঝোঁক হওয়াতে এত বড়ো উদার বিশ্বজনীন ব্রাহ্মধর্ম এই শ্রেণির লোকের হাতে পড়িয়া মেঘাচ্ছন্ন শশধরের ন্যায় হীনপ্রভ হইয়া যাইতেছেন।.. কীসে লোকে আমাদিগকে ‘হিন্দু’ বলিবে, কিসে হিন্দুদিগের নিকট বাহবা পাইব, ইহাই যেন ইদানীং অনেক ব্রাহ্মের প্রাণগত চেষ্টা হইয়াছে।’[১০২] আঠারো শতকে পলাশির যুদ্ধ-পরবর্তীকালে যে বাবুসমাজের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল, একশো বছর পার হতে না হতেই এত ভাঙচুরের মধ্য দিয়ে যেতে হল তাকে যে, বাবুত্বের রূপ ও স্বরূপটিকেই আর বিশেষ করে চেনবার

উপায় রইল না। ১৮৭২-এ 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'বাবু'দের অতীত গাথা রচনা করেছেন, তখন বাবুত্ব আর তার আভিজাত্য-বিস্ময়মিশ্রিত সম্ভ্রমের গোত্রভুক্ত নেই, সে কেবলই ব্যঙ্গের পাত্র। বাবুত্বের রূপান্তরও ঘটে গেছে। বিষ্ণুর মতো তাঁদেরও এখন দশ অবতার— কেরানি, মাস্টার, ব্রাহ্ম, মুৎসুদ্দি, ডাক্তার, উকিল, হাকিম, জমিদার, সংবাদপত্র সম্পাদক এবং নিষ্কর্মা। বাবুর যে নূতন সংজ্ঞা তিনি নির্মাণ করেন, তিনি আসলে মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোক কিম্বা সাধারণ বিত্তজীবী শ্রেণি। এই বাবুদের বাবুত্বে তাই আর বনেদিয়ানার লেশমাত্র নেই— 'যাঁহার বাক্য মনোমধ্যে এক, কথনে দশ, লিখনে শত এবং কলহে সহস্র, তিনিই বাবু। যাঁহার বল হস্তে একগুণ, মুখে দশগুণ, পৃষ্ঠে শতগুণ এবং কার্যকালে অদৃশ্য, তিনিই বাবু। যাঁহার বুদ্ধি বাল্যে পুস্তক মধ্যে, যৌবনে বোতলমধ্যে, বার্ধক্যে গৃহিণীর অঞ্চলে, তিনিই বাবু। যাঁহার ইষ্টদেবতা ইংরেজ, গুরু ব্রাহ্মধর্ম্মবেত্তা, বেদ দেশী সম্বাদপত্র এবং তীর্থ ''ন্যাশনাল থিয়েটার'', তিনিই বাবু। যিনি মিসনারির নিকট খ্রীস্টিয়ান, কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্ম, পিতার নিকট হিন্দু, এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকট নাস্তিক, তিনিই বাবু। যিনি নিজগৃহে জল খান, বন্ধুগৃহে মদ খান, বেশ্যাগৃহে গালি খান, এবং মুনিব সাহেবের গৃহে গলাধাক্কা খান, তিনিই বাবু। যাঁহার স্নানকালে তেলে ঘৃণা, আহারকালে আপন অঙ্গুলিকে ঘৃণা এবং কথোপকথনকালে মাতৃভাষাকে ঘৃণা, তিনিই বাবু। যাঁহার যত্ন কেবল পরিচ্ছদে, তৎপরতা কেবল উমেদারিতে, ভক্তি কেবল গৃহিণী বা উপগৃহিণীতে, এবং রাগ কেবল সদ্‌গ্রন্থের উপর, নিঃসন্দেহে তিনিই বাবু।'[১০৩] বঙ্কিম-নির্দেশিত এই বাবু স্পষ্টতই উনিশ শতকের তিনের দশকের পরবর্তীকালের বাবু। বনেদি বাবুত্বের কাল বঙ্কিমের সময়ে পাথুরে ইতিহাসে পরিণত। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ এবং কোম্পানির হাত থেকে ইংল্যান্ডের রানির হাতে ক্ষমতা-হস্তান্তর কোম্পানি শাসনের পরিবর্তে ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি বাঙালিদের অনুগত করেছিল। ১৮২২ সালে রাধাকান্ত দেব কলকাতার সম্ভ্রান্ত বংশের তালিকা তুলে দিয়েছিলেন কোম্পানি বাহাদুরের হাতে, সেই তালিকার অতি সামান্য রদবদল করে কোম্পানি সেটিকে মান্যতা দিয়েছিল। ১৮৭১ সালে পৌঁছে দেখা যায়, বাঙালি বাবুদের আভিজাত্য-সম্ভ্রমের নতুন ঠিকাদার ব্রিটিশ সরকার স্বয়ং। ১৮৭১ সালের পয়লা জানুয়ারি 'সুলভ সমাচার' রাজশক্তির সেই অধিকারের যে নমুনা পেশ করেছে, তাতে দেখা যায়— সে সময়ে এদেশে ১২ জন মহারাজা, ১৯ জন রাজা বাহাদুর, ১৪ জন রাজা, ৭ জন কুমার, ২৩ জন রায় বাহাদুর, ৪ জন খাঁ বাহাদুর, ২ জন সিম, ৭১ জন সর্দার, ৪ জন নবাব বাহাদুর ও ১ জন বাবু বাহাদুর।[১০৪] খেতাব বিতরণের প্রক্রিয়া এদেশে আগেও ছিল। নবাবি আমলে কর্মকুশলতা ও নবাবের প্রতি আনুগত্যের বদলে খেতাব মিলত, আর খেতাব অনুসারে সমাজে সম্ভ্রমবোধের মাত্রা নির্দিষ্ট হত। যদিও 'বাবু' নামক কোনো 'খেতাব' তখন প্রচলিত ছিল না বলেই মনে হয়, তথাপি সদৃশ খেতাবের সংখ্যা নগণ্য ছিল না। ইংরেজ জঙ্গল-আবাদ পরিষ্কার করে, কলকাতার গ্রামীণ চরিত্র মুছে ফেলে যখন নগর পত্তনের কাজ শুরু করল, সেই সময়ে দেশীয় ব্যক্তিবর্গের সামাজিক মানমর্যাদা সম্পর্কিত 'বিশেষ' ধারণা তাদের ছিল না। তাছাড়া শাসন ব্যবস্থার শুরুতেই দেশীয় বিত্তশালীদের সঙ্গে সংঘাত বা সংঘর্ষে যাওয়াটাও কোম্পানির ব্যাবসায়িক মনোবৃত্তির অনুকূল ছিল না। এ কারণেই নবকৃষ্ণ, মদনমোহন দত্ত, রাজা সুখময় কিম্বা রাধাকান্ত দেবের মতো আদিবাবুরা বিত্ত-সম্পত্তি এবং কোম্পানির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে 'বাবুত্বে'র শিরোপা লাভ করেছিল, কিনে নিয়েছিল নূতন নাগরিক মিশ্র সমাজ-সংস্কৃতির চালকের আসনটি। তখনও পর্যন্ত পুঁজিপতি (Banker) বাবুদের অনেকেই সাহেবসুবোদের ব্যাবসায়

বিনিয়োগ করার অর্থ জোগান দিত। ফলে এই অধিকারদান আসলে কোম্পানির নিজ স্বার্থের দিকে লক্ষ রেখেই। কিন্তু সিপাহি বিদ্রোহের পরে রাজশক্তি সরাসরি ক্ষমতা দখল করে দেশীয় মানুষের ব্যাবসায় বিনিয়োগের অধিকার বহুলাংশে হরণ করল। পূর্বেকার স্বার্থসম্পর্কও আর টিকিয়ে রাখার প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া দেশীয় বিত্তশালীদের উত্তরপুরুষেরা অর্থাৎ আমাদের নব্যবাবুদের অনেকেই সভা-সমিতি গঠন, ইংরেজ শাসনের কুফল-সুফল ব্যাখ্যার দ্বারা স্বাধীন মনোবৃত্তির প্রকাশ ঘটাচ্ছিল। এমতাবস্থায় এই শ্রেণির উপর ইংরেজ সরকার আর আস্থা রাখতে পারছিল না। এজন্যই সরকারের প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ বা বলা যায় সরকারের তল্পিবাহক 'জো হুজুর' বাবুদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে নানাপ্রকার খেতাব দ্বারা তাঁদের ভূষিত করার ব্যবস্থা করা হয়। যদিও এই বিতাড়িত খেতাবের সংখ্যা প্রথমদিকে কম ছিল। তথাপি পরবর্তী দশকগুলিতে এই সংখ্যাবৃদ্ধির দ্বারা বিত্তশালী, শিক্ষিত অভিজাতবর্গ এবং বাঙালি শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'কে চির আনুগত্যের শেকল পরাতেই যে চেয়েছে ইংরেজ, তা বেশ বোঝা যায়। আসলে 'বাবু'ই হোক কিম্বা 'রায়বাহাদুর', এসব শাসকের পক্ষ থেকে শাসিতকে খেতাব তথা সম্মান দান নয়, এ আসলে ওঁদের 'শেকল পরাবার ছল।' আদিবাবুরা শিক্ষায়-দীক্ষায়, রুচিতে যেমনই হোন না কেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন স্বাধীন, আর যাই হোক, তাঁরা কেউই শেকল পরা 'বাবু' হতে চাননি।

'ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল' সম্পর্কে বলতে গিয়ে (নিউ ইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন, ০৮.০৮.১৮৫৩) কার্ল মার্ক্স বলেছিলেন,[১০৬] ব্রিটিশরা ভারতবর্ষের প্রথম জীবনের ভিতগুলো নষ্ট করে দিয়েছে, কুটির শিল্পকে ধ্বংস করেছে, ভারতবর্ষের উৎপাদন শক্তিকে পঙ্গু (Paralyzed) করে দিয়েছে। এক কথায় ভারতবর্ষের প্রাচীন কাঠামো ধ্বংসপ্রাপ্ত। একইসঙ্গে নিজেদের স্বার্থেই 'From the Indian natives, reluctantly and sparingly educated in Calcutta, under English superintendence, a fresh class is springing up, endowed with the requirements for government and imbued with European science.' ঔপনিবেশিক প্রভুদের ঐকান্তিক চাহিদার এই যে 'বিশেষ গোষ্ঠী'র (Fresh Class) জন্ম হয়েছিল সেদিনের কলকাতায়, তাঁরা সর্বার্থেই ছিলেন বিদেশি শাসকের মানসরসপুষ্ট। মেকলের ভাষায়, যাঁরা 'Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in words and intellect'। আদিবাবুরা দেওয়ানি, বেনিয়ানি প্রভৃতির সূত্রে ইংরেজদের জীবনযাত্রার কাছাকাছি এলেও তাঁরা কেউই ইংরেজি ধরনের জলহাওয়ায় বেড়ে ওঠা শ্রেণি নন। সামন্ততান্ত্রিক যে কাঠামোয় তাঁরা বেড়ে উঠেছিলেন, রস-রসদ সংগ্রহ করেছিলেন, ইংরেজ আমলে তার থেকে সরে আসার কোনো চেষ্টাই তাঁরা করেননি। বরং নবাবি আবহাওয়ার অস্তযাত্রাকালে অনেক সাহেব শাসকেরাই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন নবাবি চালচলনে; বাটন এঁদের ব্যাপক মৃত্যুহারে উদ্বিগ্ন হয়ে এদেশের স্বাস্থ্য ও জলবায়ুকে অভিযুক্ত করলেও,[১০৭] তাঁদের অমিতাচারী জীবনযাত্রা এবং নবাবি ধরনের বিলাসিতাও যে এই মৃত্যুহার বৃদ্ধি করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। অতএব, আদিবাবুদের জীবনযাত্রায় যে বিশেষ ছাঁদ (type) দেখা যায়, তা নবাবি আমলের জীবনচর্চা দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত। সাহেব-শাসকেরা এইসব চালচলনকে প্রথমদিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, কেউ কেউ সরাসরি এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, কাছ থেকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন তথাকথিত সম্ভ্রান্ত ফিউডাল প্রভুদের জীবনচর্চার স্বরূপটি। নবকৃষ্ণ, রাজা সুখময় কিংবা প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়ির দুর্গোৎসবে এ কারণেই সাহেবসুবোদের ভিড় উপচে পড়ে, লাট-বড়োলাট অংশগ্রহণ করেন এবং 'ডিনার' সারেন। মিসেস

ফেনটনের মতো ক'জনই বা ঘৃণার ভাষায় বোঝাতে পেরেছেন বিদেশি শাসকের অন্তর্গত মুখটিকে— 'The poor animal who exists on rice and ghee all the year, contended with the mat for his bed, here may be seen playing the liberal entertainer.'[১০৭]

মনে তো রাখা প্রয়োজন, এদেশের মানুষকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো পৌঁছোনোর তাগিদে ইংরেজ এদেশের মাটিতে পা রাখেনি। এদেশে পদার্পণ, নবাব মহলের ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ, কলকাতার বিশেষ অবস্থানের ভবিষ্যৎ বুঝে প্রাথমিক পর্বে মাটি কামড়ে পড়ে থাকা, উৎকোচ ও অন্যান্য সুবিধা দানের মাধ্যমে দেশীয় মিত্রবর্গ গড়ে তোলা এবং তাঁদেরই সাহায্যে ক্রমে ক্ষমতা দখল— এই সমস্ত প্রক্রিয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অবাধ ও নিরঙ্কুশ বাণিজ্যের অধিকার ভোগ। কলকাতা তথা সমগ্র ভারতবর্ষই ছিল তাদের কাঁচামাল সংগ্রহের এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের বৃহৎ বাজার মাত্র। বাংলার মাটিতে যখন তারা পা রাখে তখন সপ্তগ্রাম বন্দরের ভাগ্যসূর্য অস্তাচলে ঢলে পড়েছে; হুগলি বন্দরের নাব্যতা সরস্বতী নদীর খামখেয়ালিতে ক্রমশ নিম্নমুখী, তাছাড়া প্রতিযোগিতাও বেশি; এসময়েই তাদের চোখ পড়েছিল কলকাতার দিকে। ইংরেজ আসার বহু আগে থেকেই কলকাতা ও তৎসংলগ্ন এলাকা তার ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যই বাণিজ্য-সহায়ক হয়ে উঠেছিল, অন্তত ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে শেঠ, বসাকদের মতো ব্যবসায়ীরা এ অঞ্চলে চলে আসেন, এমন অনুমানও কেউ কেউ করছেন।[১০৮] বেনিয়া ইংরেজ তার ধুরন্ধর দৃষ্টি দিয়ে সেই সত্য উপলব্ধি করেছিল বলেই কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাজার-নগরী গড়ে তুলল। সেই সঙ্গে পরিকল্পিত উপায়েই নিজস্ব শ্রেণিস্বার্থে তারা এমন এক বিশেষ গোষ্ঠী তৈরি করল যাঁরা বংশ পরিচয়ে কুলীন কিন্তু সাহেবদের কৃপাভিক্ষু। এইসব শ্রেণিকে উপেক্ষা বশেই তারা ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছিল, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের মুষ্টিভিক্ষা দিয়েছিল একটি মাত্র লক্ষ্যে,— এই শ্রেণি উত্তরকালে সাহেব-প্রভুদের তল্পিবাহক হয়ে থাকবে। তাই হয়েছে। ইংরেজদের হাত ধরে যে ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণি বা 'ভদ্রলোক' বাবুর বিকাশ, উত্তরকালের ইতিহাসবিদের সংজ্ঞানুযায়ী, 'The Indian middle class which the British aimed at creating was to be a class of imitators, not the originators of new valves and methods.'[১০৯] ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর ছড়া-কবিতায় সমকালেই এই বিশেষ প্রবণতা বা লক্ষণের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও উত্তরকালের 'বাবু'দের 'অনুকরণপ্রিয়' বলছেন ঠিক একই কারণে। আদিবাবুরা বাবুত্বের চেকনাই দেখানোর জন্য নিত্যনতুন পন্থা বার করতেন, কতক-বা তাঁদের দলস্থ মোসাহেবরা জোগান দিত। বাবুরা সেদিন দেশীয় মানুষকে যেমন মোহিত করতে চেয়েছেন বাবুগিরির ছটায়, তেমনি সাহেবদেরও চমকে দিতে চেয়েছেন বিত্তের ঠমকে। সে ছিল অনেকটাই গোপন সংঘর্ষের ইতিহাস। আদিবাবু কোম্পানির বেতনভুক সাহেব প্রভুকে সেদিন বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন, অর্থ-বিত্ত-সম্পদে আদিবাবুর অবস্থান যে কত উচ্চে, তেমনটি। ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের প্রসঙ্গটিও যে জড়িয়ে ছিল না এমন নয়। সব মিলিয়ে আদিবাবুরা অনেকটাই কর্মসূত্রে ইংরেজ ঘনিষ্ঠ হলেও ব্যক্তিগত জীবনচর্চায় খাঁটি দেশীয়, তাঁদের মনে পুরাতন ও আধুনিকের কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। এঁদের অনুসৃত পথগুলি ভালো বা মন্দ যাই হোক না কেন, উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যেই তা এমন এক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিল যে, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৫ সালেই বাবুত্বের সাধারণ লক্ষণ ও সংজ্ঞা নির্দেশ করতে সক্ষম হন, ১৮২১-শেই 'সমাচার দর্পণ' বাবু বিষয়ে রচনায় উক্ত শ্রেণির সাধারণ বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের খসড়া প্রকাশ করতে পারে। আদিবাবুদের যে 'নবধা লক্ষণ' তাতে সাহেবি প্রভাব নেই বললেই চলে। বিলিতি সুরার প্রসঙ্গটি মনে রেখেই একথা বলা চলে।

অন্যদিকে উনিশ শতকের তিনের দশক থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত যে মধ্যবিত্ত 'বাবু'রা ভিড় জমালেন, তাঁরা প্রায় সকলেই ভালো-মন্দ নির্বিশেষে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে মত্ত। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ গুটি কয়েক মানুষকে এর ব্যতিক্রম বলে বাদ দিলে বাকি সকলেই পাশ্চাত্যমুখী পরজীবী শ্রেণি। সভা-সমিতি স্থাপন, থিয়েটার-প্রীতি, স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহ, 'স্বদেশের ঠাকুর ফেলে বিদেশের কুকুর ধরা'র প্রচেষ্টা— সমস্তই সাহেব ঘনিষ্ঠ হওয়ার প্রয়োজনে। প্রগতিশীলতা যে এঁদের অনেকের কাছে নিতান্ত কথার কথা, ভাণ, এঁদের আচরণেই তা স্পষ্ট। এ কারণেই সোচ্চার হিন্দুধর্মবিরোধী ডিরোজিয়ান মাধবচন্দ্র মল্লিক ঘটা করে দুর্গাপূজা করেন, রামতনু লাহিড়ী পৈতে ত্যাগ করেও পাচক ব্রাহ্মণের রান্না খান, নাস্তিক দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় অযোধ্যা প্রবাসে নিষ্ঠাবান হিন্দুর আচরণ পালন করেন, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রকাশ্যে 'যবনস্পৃষ্ট দ্রব্য' খেতে দ্বিধাবোধ করেন, ব্রাহ্ম দেবেন্দ্রনাথের গৃহে দুর্গাপূজা, দোল, জগদ্ধাত্রী পূজা পালিত হয় ঘটা করে। এগুলি তো বিচ্ছিন্ন কিছু উদাহরণ মাত্র। এরকম দৃষ্টান্ত নববাবুদের ঘরে ঘরে। তাঁদের অনেকেরই মনে যে পাশ্চাত্য অনুকরণের আকাঙক্ষা এবং দেশীয় রীতি না মানার ফলজাত দ্বিধা কাজ করেছিল, তা সত্য। তাঁদের এই প্রকার দ্বিধার কারণেই তাঁরা সমকালীন সমাজে উপহাসিত হয়েছেন। লক্ষ করলে দেখা যাবে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাবু বিষয়ক গ্রন্থ বা রচনাদির সংখ্যা হাতে গোনা, এমনকী সমকালীন সংবাদপত্রগুলিতেও এ জাতীয় নিদর্শন চোখে পড়ে নামমাত্র। অথচ দ্বিতীয়ার্ধের সূচনা থেকেই 'বাবু'রা এক এক করে ছড়া, কবিতা, গান, আখ্যান-নকশা-প্রহসনের 'বিষয়' হয়ে উঠছেন। ১৮৩০ পরবর্তী কুড়ি বছরের মধ্যেই ইংরেজ ঘনিষ্ঠ নব্যপন্থী 'বাবু'দের দল এমন স্বাতন্ত্র্য অর্জন করলেন যে এবং এমনভাবে দেশ ছেয়ে ফেললেন যে, বাংলা গ্রন্থাদিতে 'কানু ছাড়া গীত নাই'-এর মতো বাবু ছাড়া কথা নেই।

আরেকটি ব্যাপার লক্ষণীয়, সেকালের গ্রন্থাদিতে আলো করে থাকা এইসব নব্যপন্থী 'বাবু'রা সকলেই প্রায় এই 'কলকাতা' নামক নগরের উপজাত। সদর-মফস্সলে নাগরিক জীবনের উপাচার সহজলভ্য হয়ে উঠলেও 'কলকাতা'ই তখন বাবুদের নন্দিত নরক। এখানে যেহেতু বিত্তবান জমিদার থেকে শুরু করে পুঁজিপতি ব্যবসায়ী, লাট-বড়োলাট থেকে শুরু করে তাঁদেরই অনুকারক বাঙালি-সাহেবের বাস, তাই এই শহরই তখন বাবুদের তীর্থক্ষেত্র। তাছাড়া কফি-হাউস, উইলসনের হোটেল, পাড়ায় পাড়ায় ছড়িয়ে পড়া গণিকালয়, বিলিতি মালপত্রের দোকান, মদিরালয়— এসবের আকর্ষণ তো ছিলই। অতএব নতুন যুগের ছড়াকাররা তো বলবেনই—

> 'ধন্য হে কলিকাতা, ধন্য হে তুমি,
> যত কিছু নূতনের তুমি জন্মভূমি॥
> দিশি চাল ছেড়ে দিয়ে বিলাতের চাল।
> নকলে বাঙালিবাবু হল যে কাঙাল॥
> রাতারাতি বড়লোক হইবার তরে।
> ঘর ছেড়ে কলিকাতা গিয়ে বাস করে॥'[১১০]

ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের কৌশল হিসাবে, কলকাতা তখন অগ্নিধাবিত পতঙ্গবৎ টেনে আনছে 'রাতারাতি বড়োলোক হবার' মোহগ্রস্ত নানান জাতির মানুষকে। স্থানটি বাংলায় হওয়ায় বাঙালিরা

প্রাথমিক পর্বে যে কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল বলাই বাহুল্য। যাঁদের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়লো, রাতারাতি বড়োলোক বনে গেলেন সৎ-অসৎ পথে, তাঁরা উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়াই বড়োলোক 'বাবু' বনে গেলেন। আর যাঁরা উচ্চশিক্ষার হাত ধরে 'চাকরিজীবী বাঙালি বাবু' হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেন, তাঁদের কাছ থেকে সময় পেল কেবল অন্ধ অনুকৃতি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের 'বাবু'কেন্দ্রীক বিস্তৃত গ্রন্থরাজির মুখ্য অবলম্বন এই দুই শ্রেণির নব্যবাবু। আদিবাবুদের চেয়ে এক ধাপ কম, 'অষ্টধা' লক্ষণ যুক্ত। কালের অমোঘ নিয়মে, ১৯১২ সালে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়ে গেলে সমাজ আলো করে থাকা ওই বাবুরা এবং তাঁদের জীবন হঠাৎ করে যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। রাজধানীর মর্যাদা চলে যাওয়ায় কলকাতা তখন তার এলিট বৃত্ত থেকে পতিত। অতএব তাকে ঘিরে ভিড় জমানো বাবুরাও আর 'বিশেষ' হয়ে রইলেন না, সকলেই নির্বিশেষ 'সাধারণে' পরিণত হলেন। এ কারণেই বাবু-কেন্দ্রীক বিষয় আলোচনায় 'কলকাতা'র হয়ে ওঠার ইতিহাসটিও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, যেমন জড়িত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে ব্রিটিশ সরকারের কক্ষভূত বাঙালির দিনযাপনের ইতিহাস।

বাবু-কেন্দ্রীক আলোচনায় 'যুগ ও জীবনে'র এই বিস্তৃত পথপরিক্রমার শেষে বলা যায়, অষ্টাদশ শতকের বাঙালি জীবন ছিল প্রধানত গ্রাম-কেন্দ্রীক এবং কৃষিভিত্তিক। এই সমাজ নিয়ন্ত্রিত হত সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর দ্বারা। সাধারণভাবে বাংলা দিল্লির নবাবদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন বলা হলেও, স্থানীয় স্তরে জমিদার ও প্রজার মধ্যে যে সম্পর্কবিন্যাস গড়ে উঠেছিল, তাতে দিল্লির মসনদের প্রত্যক্ষ কোনো যোগ ছিল না। জমিদার প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায়ের ব্যবস্থা করতেন, বাড়তি কর বা 'আবওয়াব' নিতেন; দোল, দুর্গোৎসব, শ্রাদ্ধ, উপনয়ন, বিবাহ উপলক্ষ্যে প্রজারা যেমন 'পার্বণী' দিত, তেমনই উৎসব-অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পেত। এভাবেই জমিদার ও প্রজার মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হত এবং সাধারণভাবে এই সম্পর্ক বংশপরম্পরায় প্রতিষ্ঠিত থাকত। বিলাসব্যসন-আড়ম্বর-অগম্যাগমন অধিকমাত্রায় না হলেও তখনও ঘটত। কিন্তু তা স্বাভাবিকত্ব হারিয়ে বিসদৃশ দেখানেপনায় পর্যবসিত হয়নি। জমিদার তাঁর নির্দিষ্ট অঞ্চলেই শাসন করতেন, ফলে নির্দিষ্ট অঞ্চলের আওতাধীন প্রজাদের কাছে আড়ম্বর-সর্বস্ব সম্মান প্রতিষ্ঠার কোনো প্রয়োজন হত না। তা ছিল বংশানুক্রমিক এবং স্বতঃসিদ্ধ।

নগর-শহরের পত্তনের মধ্য দিয়ে এঁদের যখন কলকাতায় এসে ঠাঁই করতে হল, তখন বংশানুক্রমিকভাবে গড়ে ওঠা সম্পর্কের নির্দিষ্ট বৃত্ত ছেড়ে তাঁরা এসে দাঁড়ালেন সম্পূর্ণ নতুন এক বিমিশ্র এবং অপরিচিত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। ফলে আদিবাবুরা অর্থ-বিত্ত-বিলাসিতার বাহ্য আড়ম্বরের দ্বারা বিমিশ্র সংস্কৃতির বৃত্তে অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নামলেন। যাঁর যত বিত্ত, তিনি তত বড়োবাবু নন। যিনি হেলায় সেই বিত্তকে উড়িয়ে দেন তিনিই তত বড়োবাবু। এই কারণেই আদিবাবুদের অনেকেই এক 'দু'পুরুষে অর্থ-বিত্ত উড়িয়ে দিয়ে মধ্যবিত্তের পর্যায়ে নেমে এসেছেন দেখতে পাই। গ্রামজীবনে তখনও যেসব জমিদার রয়ে গেলেন, তাঁদের অনেকে বিত্তশালী হলেও গ্রামজীবনে বিত্ত প্রদর্শনের সুযোগ কম, প্রদর্শনও অর্থহীন। বিত্ত প্রদর্শনের জন্য যে অর্থসাম্য প্রয়োজন, গ্রামীণ ক্ষেত্রে তার সুযোগ প্রায় নেই বলেই উনিশ শতকের মধ্যভাগের অনেক রচনায় গ্রাম্য জমিদারের ফূর্তির উদ্দেশ্যে কলকাতা আগমন এবং যথাবিহিত লাঞ্ছনার শেষে সর্বস্বান্ত হওয়ার ছবি মেলে। সাধারণভাবে, গ্রামীণ জমিদারদের সকলেই যে প্রজাপালনে অনীহা দেখাতেন, অসংযত জীবনাচরণ করতেন এমন নয়। ভাওয়ালের রাজার ঘটনা বিচ্ছিন্ন বলেই ধরতে হবে।

তুলনায়, গ্রামজীবী জমিদারদের মধ্যে বাবুয়ানির প্রকোপ কমই ছিল বলা চলে। পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে ‘বাবু’ খেতাব তাঁদের কেউ কেউ অর্জন করলেও, সেই ‘বাবুত্ব’ ছিল সম্মানের প্রতীক, শহরে ‘বাবু’ শ্রেণির মতো উচ্ছৃঙ্খল অনাচারের চিহ্ন নয়।

ফিউডাল মনোবৃত্তিসম্পন্ন প্রথম যুগের বাবুরা ক্রমশ ফুরিয়ে গেলেন কিংবা নিষ্প্রভ হয়ে গেলেন। দ্বিতীয় যুগের বাবুরা এঁদেরই পুত্র-পৌত্র কিম্বা বংশজ। এঁদের শিক্ষা কিংবা অর্ধশিক্ষা হয়েছে। নগরায়নের সুযোগ নিয়ে এঁরা সকলেই নগরবাসী; দেশি মদ্যের পরিবর্তে বিলিতি সেরি-শ্যাম্পেনে অভ্যস্ত; আবার চণ্ডু, গাঁজা, চরস ইত্যাদিতেও অরুচি নেই; প্রকাশ্যে বেশ্যা পোষা কিংবা বেশ্যা গমনে এঁরা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন কারণ তা আভিজাত্যের প্রতীক; এঁদের মধ্যে ফিউডাল মানসিকতাও যেমন দুর্লভ নয়, তেমনি আধুনিককে, পাশ্চাত্যের যা কিছু আছে তাকে বুঝে হোক, না বুঝে হোক অনুকরণের ইচ্ছাও প্রবল। এঁদের মধ্যে প্রথমদিকে দ্বিধা ছিল না তেমন, ছিল বিমিশ্রিত সংস্কৃতির লালনপালনের প্রবল ইচ্ছা। আসলে নবগঠিত শহরকে কেন্দ্র করে বাজারি-সভ্যতার অনুষঙ্গ হিসাবে নিত্যনতুন মোচ্ছবের যে আঁতুড়ঘরগুলি জন্ম নিচ্ছিল,— স্পাইস হোটেল, ট্যাভার্ন, সভা-সমিতি, গণিকাপল্লী ইত্যাদি, সেসবের আকর্ষণ এড়ানো এই নূতন জমিদারদের পক্ষে সহজ ছিল না, বরং অনিবার্য ছিল। অন্যদিকে দোল, দুর্গোৎসব, গঙ্গাপূজা না করলেও হিন্দু সমাজে ঠাঁই মেলে না। মনে রাখতে হবে, ‘বাবু’দের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত কেবলমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের ঘিরেই আবর্তিত। সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা কলকাতার নূতন নাগরিক জীবনে প্রথমদিকে আসতে অনিচ্ছুক ছিলেন। ঢাকা, মুর্শিদাবাদের সম্ভ্রান্ত মুসলিমরা আজীবন সেখানেই থেকে গিয়েছেন প্রায়ক্ষেত্রে। নগর কলকাতা বিকাশের আদিপর্বে যেসব মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে এসে ভিড় করেন, তাঁরা সকলেই প্রায় নিম্নবিত্তের মানুষ। জীবিকার দিক থেকেও তাঁরা নিম্নস্তরের পেশার সঙ্গে নিযুক্ত ছিলেন। উল্লেখ্য, প্রথমদিকে সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ হিন্দুরা আরক্ষা-বিভাগের চাকরিতে নিযুক্ত হতে চাইত না বলে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই বিভাগে ছিল মুসলমান সম্প্রদায়েরই একাধিপত্য। একইসঙ্গে বলা যায় যে, দু’একঘর সম্ভ্রান্ত মুসলমান কলকাতা নগরে এসে বসবাস করেন, তাঁরা ধর্মভীরুতার কারণেই হোক, কোম্পানি-ঘনিষ্ঠ না হবার দরুনই হোক, বিলাস-উচ্ছৃঙ্খলতার চেনা বৃত্ত থেকে দূরেই ছিলেন।

অন্যদিকে কলকাতার নূতন নাগরিক পরিবেশে গ্রামজীবনে এতকাল প্রতিষ্ঠিত জমিদারদের কিম্বা তাঁর পরবর্তী প্রজন্মদের নূতন করে নিজেদের আভিজাত্য ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। গ্রামজীবনে এতকাল তা ছিল প্রতিষ্ঠিত সত্য। অথচ শহর কলকাতায় জড়ো হওয়া বংশজ এবং ভুঁইফোঁড় জমিদারেরা প্রায় সকলেই শহরবাসী নানান শ্রেণি ও পেশার মানুষজনের কাছে অপরিচিত। অতএব আভিজাত্য ও শক্তি- প্রদর্শনের প্রয়োজনে এই ‘বাবু’রা দেদার অর্থের অপচয় করতে লাগলেন কারণে-অকারণে।

তৃতীয় পর্বের বাবুরা কিন্তু স্কুল-কলেজে শিক্ষিত, রাজনৈতিকভাবে সচেতন; এঁদের একটা বড়ো অংশ অর্থবিত্তহীন কিম্বা স্বল্প আয়ের মধ্যবিত্ত প্রেক্ষাপট থেকে উঠে আসা। এঁদের ‘বাবুত্ব’ এসেছে শিক্ষা-সংস্কৃতি সচেতন রাজনৈতিক পরিনির্বাণের মধ্য দিয়ে। প্রথম দুই যুগের বাবুরা এসেছেন অর্থ-বিত্ত-সম্পদের হাত ধরে, তৃতীয় যুগের এই বাবুরা যথার্থই শিক্ষিত ভদ্রলোক, সাহেবদের ভাষায় 'Educated Bangalee Baboo'। বাবুদের এই তিনটি যুগ বা পর্ব অবশ্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন কোনো প্রক্রিয়া নয়, নগরায়নের পিছু পিছু আসা শিক্ষা-সংস্কৃতি-মানসিক ভাব-সংঘাত ও সামাজিক চাহিদার অনিবার্য ফল। অতএব পাশ্চাত্য

শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে 'বাবু'রা সবাই 'ভদ্রলোক' বনে গেলেন, এমন ভাবনা অতি সরলীকরণদোষে দুষ্ট। অন্যান্য কারণও ছিল—

এক. উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই অর্থের অন্তহীন জোগানে ঘাটতি দেখা দিয়েছিল;

দুই. তৃতীয় পর্বের বাবুদের অনেকেরই আর নিজেদের বংশকৌলীন্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল না; আগের পুরুষেই তা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল;

তিন. মধ্যবিত্তরা কার্যসূত্রে অর্থ-বিত্তের অধিকারী হলে উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির সৃষ্টি হল। তাদের সামাজিক অবস্থান দ্রুত উঠে এল কুলীন বাবুদের সমগোত্রে। বাবুত্বের দোষত্রুটি তাঁরাও কেউ কেউ অনুসরণ করলেন; অন্তত করতে আর বাধা রইল না। অতএব 'বাবুত্বে'র 'দোষগুলি'র আর আভিজাত্য রইল না;

চার. নানাপ্রকার আইনকানুন প্রচলনের ফলে বাধাহীন উচ্ছৃঙ্খল প্রকাশ্য জীবনের পায়ে শেকল পড়ল। যেমন, বেশ্যাবাজির প্রকাশ্য বেলেল্লাপনা বন্ধ করতে ১৮৬৮-তে 'The Indian Contagious Diseases Act, 1868' বা 'চোদ্দ আইন' চালু হলে এক বাবু বলেছে, 'আমরা যেন পা থাকিতে ঘোড়া বিনা দোষে কয়েদ, আচ্ছা মজাটা হল কিন্তু, এক চোদ্দ আইন বেরিয়ে সকল লোককে জব্দ করেছে, ইংরেজদের ধন্যবাদ।'[১১১]

পাঁচ. রাজনৈতিক ক্রমমুক্তি ও দাবিদাওয়া আদায়ের মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে শিক্ষাদীক্ষা, রুচিতে ইংরেজদের সমগোত্রীয় করে তোলার আকাঙক্ষায় তৃতীয় পর্বের বাবুরা ক্রমশ নিজেদের চারিত্রিক কাঠামোকে সুউন্নত করবার প্রচেষ্টায় রত হলেন। ক্রমশ এই 'বাবুয়ানা' অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত, নিম্নশ্রেণির বিত্তপতি ও মধ্যবিত্তের একচেটিয়া হয়ে গেল। সেই সঙ্গে ঐতিহাসিক বাবুদের যুগও শেষ হল বলা চলে।

বিনয়কৃষ্ণ দেববাহাদুর মন্তব্য করেছেন, 'কলিকাতার ক্রমোন্নতিতে বাণিজ্যই প্রধান সহায়— বোধ হয়, সর্বপ্রধান সহায়',[১১২] যথার্থ কথা। কিন্তু আরো যথার্থ হল, বাবুয়ানির শ্রীবৃদ্ধি ও অস্তযাত্রার ক্ষেত্রেও বাণিজ্যই ছিল প্রধান ব্যাপার। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই ব্যাবসাবাণিজ্যের পরিবর্তে অধিকাংশ বাঙালি চাকরিজীবী হয়ে উঠলেন। নিজ ব্যাবসা বা মুৎসুদ্দিগিরির পরিবর্তে অন্যের অধীনে চাকরি করাই বাঙালির কাছে নিশ্চিন্ত নিরাপদ জীবিকা বলে গৃহীত হয়েছিল। ফলে দেখা গেল যে, অর্থনৈতিক বুনিয়াদের উপর বাবুত্বের সৌধ গড়ে উঠেছিল, তা ভেঙে পড়তে দেরি হল না। চাকরিজীবী বাবুরা আর যাই হোক 'বুলবুলস্য পক্ষীর যুদ্ধ' কিম্বা বিড়ালের শ্রাদ্ধে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করার সাহস দেখাতে পারলেন না, রক্ষিতাকে দালানকোঠা করে দেওয়া তো দূরের কথা। সে সামর্থ্যও তাঁদের ছিল না। ফলে বাবু এবং তাঁর বাবুয়ানি অচিরেই ইতিহাসের বিষয় হিসাবেই বেঁচে রইল কেবল।

## টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. ডাক্তার বৌটন অগ্নিদগ্ধ জাহানারার জীবন-দান করেছিলেন বলে শাজাহান প্রীত হয়ে ইংরেজদের নিঃশুল্ক বাণিজ্যের অনুমতি দেন। বিনিময়ে বৌটন নিজের জন্য কোম্পানির কাছে কোনো অর্থ দাবি করেননি বলে কথিত আছে। এই কিংবদন্তীর জন্য দ্র. বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন 'বাঙ্গালার

ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী) নবাবি আমল', প্রথম দে'জ সংস্করণ ২০০৩, সম্পাদনা : চৌধুরি, কমল। পৃ.১৮-১৯; এবং মুখোপাধ্যায়, হরিসাধন— 'কলিকাতা সেকালের ও একালের', পুনর্মুদ্রণ ১৯৯১। সম্পাদনা : রায়, নিশীথরঞ্জন, পৃ.১৩৫। তবে সাম্প্রতিককালে বৌটন সম্পর্কিত কাহিনির অসারতা খণ্ডন করেছেন ঐতিহাসিকেরা। এ প্রসঙ্গে দ্র. Chaudhuri, Dr. S – 'The Myth of the English East India Company Trading privilages in Bengal, 1651-1668', Bengal Past and Present Sir J.N. Sarkar Centenary Vol, 1970।

২. রায়, অনিরুদ্ধ— মধ্যযুগের ভারতীয় শহর, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ৩৫২।

৩. আত্হার আলি, এস.— আওরঙ্গজেবের সময়ে মুঘল অভিজাত শ্রেণি, অনু: দে, অরুণ কুমার, পুনর্মুদ্রণ ২০১২, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, পৃ. ১৪৭-১৫০।

৪. Chaudhuri Dr. S— The Myth of the English East India Company Trading Privilages in Bengal 1651-68, প্রাগুক্ত।

৫. দ্র. আত্হার আলি, এস. আওরঙ্গজেবের সময়ে মুঘল অভিজাত শ্রেণি, তদেব।

৬. সরকার, যদুনাথ— 'বঙ্গে মগ ও ফিরিঙ্গি', প্রবাসী ১৩২৯ ফাল্গুন, ভাগ ২২, খণ্ড ২, সংখ্যা ৫। গুহ, নিখিলেশ এবং পাল, রাজনারায়ণ— যদুনাথ সরকার রচনা সম্ভার, প্রথম সংস্করণ ২০১১, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ৩৯৪-৪০৩।

৭. D. Sen, Surendra Nath– 'The portuguese in Bengal'; The History of Bengal Vol.II; Edi. by Sarkar, Jadunath, The University of Dacca, 4th Impression, 2006, p.364.

৮. দেববর্মা তত্ত্বনিধি, চৌধুরি শ্রীপূর্ণচন্দ্র— চট্টগ্রামের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ১৯২০ খ্রি.। চৌধুরি, কমল সম্পা., 'চট্টগ্রামের ইতিহাস' গ্রন্থে সংকলিত।

৯. Lawson, P.– The East India Company : A History, London & New York Longman. 1993.

১০. Wilson's Early Annals, Vol-1.
দ্র. মিত্র, সুধীরকুমার— হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, প্রথম খণ্ড, প্রথম মণ্ডল বুক হাউস সংস্করণ ১৯৯১, কলিকাতা, পৃ. ৫৬৩।

১১. মুখোপাধ্যায়, অরুণ সম্পা., দারোগার দপ্তর, ২য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ২০০৪, পুনশ্চ, কলকাতা, পৃ. ২৪৪।

১২. শেঠ, হরিহর—প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়— কথায় ও চিত্রে, প্রথম সংস্করণ ১৯৫২, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা পৃ: ৯৮।

১৩. সাঁতরা, তারাপদ— 'কলকাতার মন্দির স্থাপত্য'; বসু, দেবাশিস সম্পা., কলকাতার পুরাকথা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯০, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ.৬৭-৭০ দ্র.।

১৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. মিত্র, উদয়ন—'কোম্পানির চিঠিপত্রে কলকাতার নগরায়ন'; বসু, দেবাশিস সম্পা., কলকাতার পুরাকথা, তদেব, পৃ. ৩৫১-৩৬২।

১৫. দেববাহাদুর, রাজা বিনয়কৃষ্ণ কলিকাতার ইতিহাস; অনু. মিত্র, সুবলচন্দ্র, তৃতীয় সংস্করণ ২০০১, কলকাতা, পৃ. ২৪।

১৬. রায়, এ. কে — কলিকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস; ভাষান্তর-সেন, শুদ্ধোদন, ঋদ্ধি-ইন্ডিয়া, প্রথম সংস্করণ ১৯৮২, কলকাতা, পৃ. ১৭৪।
১৭. Busteed, H.E– Echoes from Old Calcutta, Rupa & Co, New Delhi, Edi not mentioned, p. 7-8.
১৮. রায়, এ কে— কলিকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, তদেব, পৃ. ১৪২।
১৯. মুখোপাধ্যায়, সুখময়— 'প্রাক্-চার্ণক কলিকাতা'; বসু, দেবাশিস সম্পা., কলকাতার পুরাকথা, তদেব, পৃ.৫৪-৫৫।
২০ তদেব, পৃ.৫৬।
২১. দ্র. শেঠ, হরিহর— প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়— কথায় ও চিত্রে, সরকার, যদুনাথ লিখিত ভূমিকা, প্রথম সংস্করণ ১৯৫২, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা।
২২. ভট্টাচার্য, ধীরেশ— ভারতের বহির্বাণিজ্য ও বৈদেশিক লেনদেন, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ ১৯৯১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ.২২।
২৩. দ্র. Caney, W.H– The Good Old Days of Honorable John Company, Riddhi Edition 1980, Riddhi-India, Kolkata, p.32.
২৪. শেঠ, হরিহর, তদেব, পৃ.-১৫।
২৫. মল্লিক, প্রমথনাথ— কলিকাতার কথা (আদিকাণ্ড), তৃতীয় সংস্করণ ২০০১, কলকাতা, পৃ. ২২-২৩।
২৬. Datta, K.K— Alivardi and His Times, 2nd edi 1963, Calcutta, p. 175.
২৭. দ্র. শ্রীমানী, সৌমিত্র— 'বাজারের শহরঃ অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ; বিষয় কলকাতা, জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৩, কলকাতা, পৃ. ৬৬৩।
২৮. রায়, এ কে, তদেব, পৃ. ১৪৭।
২৯. পত্রী, পূর্ণেন্দু— পুরোনো কলকাতার কথাচিত্র, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ.১৩৭।
৩০. নাগ, অরুণ সম্পা., সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সং ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, পৃ. ৩০-৩১।
৩১. বসু, গিরিশচন্দ্র— সেকালের দারোগার কাহিনি; বসু, কাঞ্চন সম্পা., দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ ৩য় খণ্ড, পঞ্চম মুদ্রণ ২০০১, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৩০৭।
৩২. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৪০১ বঙ্গাব্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃ. ৪২২-২৩
৩৩. কুমার, শ্রীমদনমোহন — ভারত মার্কিন বাণিজ্যের পথিকৃৎ রামদুলাল দে, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা পৃ. ১৫।
৩৪. দ্র. রায়, এ.কে, তদেব, পৃ. ৩১৩-৩১৪।
৩৫. সম্পূর্ণ নামের তালিকার জন্য দ্রষ্টব্যঃ- পাদটীকা; শাস্ত্রী, সত্যচরণ মহারাজ নন্দকুমার চরিত, প্রথম পুঁথিপত্র সংস্করণ ২০০৩, পুঁথিপত্র, কলকাতা পৃ. ১৬৮-১৬৯।

৩৬. দ্র. Ray, Alok edi, Calcutta Keepsake, First edition 1978, Rddhi-India, Kolkata.
৩৭. নাগ, অরুণ সম্পা., সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা, তদেব, পৃ.৩১।
৩৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত, সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, তৃতীয় সংস্করণ পঞ্চম মুদ্রণ ১৪০১ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা, পৃ. ৩২৯।
৩৯. মুখোপাধ্যায়, সুবোধকুমার বাংলার আর্থিক ইতিহাস (ঊনবিংশ শতাব্দী), প্রথম সংস্করণ ১৯৮৭, কে. পি বাগচী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, পৃ. ৪।
৪০. দ্র. ফ্রাইকেনগর্গ, রবার্ট এরিক সম্পা., ল্যান্ড কন্ট্রোল অ্যান্ড সোস্যাল স্ট্রাকচার ইন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৯, দিল্লি, পৃ. ১৬৯।
৪১. ঘোষ, বিনয়— 'টাউন কলকাতার কড়চা'; কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত ২য় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯৭, বাক্‌সাহিত্য প্রা.লি. কলকাতা, পৃ. ১১।
৪২. মুখোপাধ্যায়, হরিসাধন— কলিকাতা সেকালের ও একালের, তৃতীয় সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ ১৯৯১, পি.এম. বাক্‌চি অ্যান্ড কো. প্রা.লি. কলকাতা, পৃ. ৪৪৩।
৪৩. দ্র. Panks, Fanny— 'Wanderings of the Pilgrim'; Nain, P. Thankappan, Calcutta in the 19th Century, First edi 1989, Firma KLM Pri.Ltd, KolKata, p. 287.
৪৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ— কলিকাতা কমলালয়; গুপ্ত, সনৎকুমার সম্পা., রসরচনাসমগ্র, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৭, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ৭।
৪৫. তদেব, পৃ. ৭-৮।
৪৬. ঘোষ, বিনয়— টাউন কলকাতার বড়চা, তদেব, পৃ. ৫৭।
৪৭. দ্র. Holzman, J.N— The Nabbobs in England, New York, 1926, ch-IV.
৪৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ— বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃ. ১৮।
৪৯. নাগ, অরুণ সম্পা., সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা, তদেব, পৃ. ১০৪।
৫০. ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, নবম সংস্করণ ১৯৯৭, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, পৃ. ৭২।
৫১. দত্ত, ভবতোষ সম্পা., ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী, আকাদেমি সংস্করণ ১৯৯৮, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, পৃ.১৪৬।
৫২. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ— বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, তদেব, পৃ. ২২।
৫৩. দ্র. বসু, স্বপন সংকলিত, সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ, ২য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ২০০৩, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, পৃ. ১৫০।
৫৪. নাগ, অরুণ সম্পা.— সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা, তদেব, পৃ. ৩১।
৫৫. দ্র. দত্ত, প্রাণকৃষ্ণ— কলিকাতার ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য রচনা; বসু, দেবাশিস সম্পা., পুস্তক বিপণি সংস্করণ,প্রথম সংস্করণ ১৯৯১, পুস্তক-বিপণি, কলকাতা, পৃ. ২০-২১।
৫৬. সমগ্র ঘটনার জন্য দ্রষ্টব্য:- দত্ত, প্রাণকৃষ্ণ— কলিকাতার ইতিবৃত্ত, তদেব পৃ. ২১-২২।
৫৭. ব্রজবিলাস, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
বিদ্যাসাগর রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, দেবকুমার বসু সম্পা., মণ্ডল বুক হাউস, প্রথম সংস্করণ ১৯৬৯, কলকাতা. পৃ. ৪৮১-৪৮৫।

৫৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, কলিকাতা কমলালয়, রসরচনাসমগ্র, তদেব, পৃ. ১৮।

৫৯. সমাচার দর্পণ, ০৫.০১.১৮৩৩।
দ্র. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সং— সংবাদপত্রে সেকালের কথা, তদেব, পৃ. ২৭১।

৬০. দ্র. পাদটীকা, কুমার, শ্রীমদনমোহন— ভারত মার্কিন বাণিজ্যের পথিকৃৎ রামদুলাল দে, তদেব, পৃ. ২৮।

৬১. Sinha, Pradip– Calcutta in Urban History, First Edition 1978, Firma KLM Pri LTD, Calcutta, p.91.

৬২. Mitra, Rajendralal– History of the Society; Centenary Review of the Asiatic Society 1784-1884, Reprinted 1986, The Asiatic Society, Kolkata, p. 3.

৬৩. ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ২৬.০৫.১৮৪২।
দ্র. বসু, স্বপন— সংবাদসাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ ২য় খণ্ড, তদেব, পৃ-১৫১।

৬৪. দ্র. Mitra, Kissory Chand– Memoir of Dwarakanath Tagore. 1870, First Parul Edi 2011, Parul, Kolkata, p. 49.

৬৫. গুপ্ত. ক্ষেত্র সম্পা.— মধুসূদন রচনাবলী, একাদশ মুদ্রণ ১৯৯০, সাহিত্য সংবাদ, কলকাতা, পৃ.২৪৩।

৬৬. শ্রীপান্থ— 'গরম সভা, নরম সভা', 'কলকাতা', প্রথম সংস্করণ ১৯৯৯, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ.৩৪৩।

৬৭. নাগ, অরুণ সম্পা.— সটীক হুতোম পাঁচার নকশা, তদেব, পৃ-১০৪।

৬৮. দত্ত, ভবতোষ সম্পা.— ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী, তদেব, পৃ. ১০৫।

৬৯. তদেব, পৃ. ১০৭।

৭০. মল্লিক, প্রমথনাথ— কলিকাতার কথা (আদিখণ্ড), তদেব, পৃ.

৭১. রায়, দুর্গাচরণ— দেবগণের মর্ত্যে আগমন, দে'জ সংস্করণ ২০০১, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ২৩২।

৭২. দ্র. চৌধুরি, সত্যজিৎ এবং সেনগুপ্ত, নিখিলেশ সম্পা.— হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাসংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৯, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, পৃ. ৬৬৮-৬৬৯।

৭৩. সান্যাল, অবন্তীকুমার— বাবু, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৭, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ.৪৭।

৭৪. পূর্ণচন্দ্র উদ্ভটসাগর উদ্ধৃত, পঞ্চপুষ্প ১৩৩৬, কার্তিক।

৭৫. শাস্ত্রী, শিবনাথ— রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, দ্বিতীয় সংশোধিত নিউএজ সংস্করণ ২০০৭, নিউএজ, কলকাতা, পৃ. ৫৯।

৭৬. বসু, রাজনারায়ণ— আত্মচরিত, ঘোষ, বারিদবরণ সম্পাদিত, রাজনারায়ণ বসু নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ, প্রথম সংস্করণ ১৪০২, কলেজ স্ট্রিট পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৩৩।

৭৭. ঠাকুর, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী, অফবিট দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ ২০০৫, অফবিট পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৭৪-৭৫।

৭৮. মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ— আপনার মুখ আপনি দেখ, পৃ. ১১৩।
বসু, কাঞ্চন সম্পা., দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ ২য় খণ্ড, পঞ্চম মুদ্রণ ২০০১, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা।
৭৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ— নববাবুবিলাস; রসরচনাসমগ্র, তদেব, পৃ. ৪৫।
৮০. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ— সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম খণ্ড, চতুর্থ মুদ্রণ ১৪০৮, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পৃ. ১১৩।
৮১. দত্তবর্মা, ললিতাপ্রসাদ— 'স্বর্গীয় মদনমোহন দত্ত', কায়স্থ পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬।
দ্র. রায়, নিশীথরঞ্জন এবং উপাধ্যায়, অশোক সম্পা.— প্রাচীন কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৩৯০ বঙ্গাব্দ, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃ. ২৪৬।
৮১ক. ঘোষ, মন্মথনাথ— মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্রথম পারুল সংস্করণ ২০০৮, পারুল, কলকাতা, পৃ. ৭।
৮২. দেবী, সৌদামিনী— পিতৃস্মৃতি। প্রথম দে'জ সংস্করণ ২০১১, দে'জ, কলকাতা, পৃ. ২৯।
৮৩. নাগ, অরুণ সম্পা.— সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা, তদেব, পৃ. ২১৫।
৮৪. দ্র. ঘোষ, বিনয়— 'বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা ও ভারতবোধ', দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৪, পৃ. ৭৫।
৮৫. শাস্ত্রী, শিবনাথ— রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, তদেব, পৃ. ১৬৯।
৮৬. বাগল, যোগেশচন্দ্র— হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত, মৈত্রী সংস্করণ ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ, মৈত্রী, কলকাতা, পৃ.৬।
৮৭. তদেব, পৃ. ১৫।
৮৮. শাস্ত্রী, শিবনাথ— আত্মচরিত, প্রথম দে'জ সংস্করণ ২০০৩, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ১৩৩।
৮৯. Banerjee, Surendranath– A Nation in Making, Akademi edi 1998, p.39.
৯০. The Babu: A Hindustani, Bengali Magazine, April 1874.
৯১. সম্পূর্ণ তালিকা ও আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য:-
Shaw, Graham– Printing in Calcutta to 1800, The Bibliographical Society, London, 1981, p.38.
৯২. দ্র. Long, Rev. J– A Descriptive Catalogue of Bengali Works, 1855.
উদ্ধৃত:- সেন, দীনেশচন্দ্র— বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ২য় খণ্ড, পর্ষদ দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯১, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, পৃ. ৮২৮।
৯৩. দত্তবর্মা, ললিতাপ্রসাদ— 'স্বর্গীয় মদনমোহন দত্ত', কায়স্থ পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬।
দ্র. রায়, নিশীথরঞ্জন এবং উপাধ্যায়, অশোক সম্পা.— প্রাচীন কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৩৯০ বঙ্গাব্দ, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃ. ২৪৬।
৯৪. দ্র. বসু, স্বপন— বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৩; পুস্তক-বিপণি, কলকাতা।
৯৫. Ahmed, A.F. Salahuddin– Social Ideas and Social change in Bengal 1818-1835, Papyrus edition 2003, Papyrus, KolKata, p. 78.

৯৬. পাল, বিপিনচন্দ্র, নবযুগের বাংলা, চিরায়ত সংস্করণ ২০১২, চিরায়ত প্রকাশন প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ৬১।

৯৭. দ্র. Ker, J.C– Political Trouble in India (1907-1917), Glossary.
উদ্ধৃত :- পাদটীকা, কবিরাজ, নরহরি— 'বাংলার জাগরণ ও ভদ্রলোক', উনিশ শতকের বাংলার জাগরণ, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৯, কে. পি বাগচী অ্যান্ড কোং, পৃ. ১৯৮।

৯৮. দ্র. Mukherjee, S.N.– 'Bhadralok in Bengali Language and Literature', Bengal Past and Present, July-December 1976.

৯৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রলাল— সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ড, তদেব, পৃ. ৪২৬।

১০০. বসু, রাজনারায়ণ— আত্মচরিত, ঘোষ, বারিদবরণ সম্পাদিত, রাজনারায়ণ বসু নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ, প্রথম সংস্করণ ১৪০২, কলেজ স্ট্রিট পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৮০।

১০১. দ্র. বসন্তক ১ম বর্ষ—২য় বর্ষ, লাহিড়ী, চণ্ডী সম্পাদিত ও সংকলিত, প্রথম সংস্করণ (অনুল্লিখিত), নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ৫৮।

১০২. চট্টোপাধ্যায়, বটকৃষ্ণ— ব্রাহ্মগণ হিন্দু কি না?, ১২/১ নং রামকিষণ দাসের লেন কলিকাতা নিউ আর্টিস্টিক প্রেস হইতে শ্রী শরৎকালী রায় দ্বারা মুদ্রিত ও ১৭ নং ভুবনমোহন সরকারের লেন হইতে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ. ১।

১০৩. 'বাবু', লোকরহস্য (১৮৭২)।
দ্র. বাগল, যোগেশচন্দ্র সম্পা.— বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড সাহিত্য-সংসদ সংস্করণ, নবম মুদ্রণ ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ১২।

১০৪. পাদটীকা; সান্যাল, অবন্তীকুমার— বাবু, তদেব, পৃ. ৬৪।

১০৫. Marx, Karl– Dispatches for The New York Tribune, First Edi 2007, Penguin Books, England, p. 220.

১০৬. 'That life is uncertain in such a city' ইত্যাদি বলে কটনের মন্তব্য, 'But only a constitution of Iron and nerves of Steel can possibly come out of a long residence in the capital of our Indian Empire without sustaining vital injury.'
মন্তব্য এবং মৃত্যুহারের (১৮১৪-১৮৩৩) জন্য দ্রষ্টব্য:- Carey, W. H– The Good Old Days of Honorable John Company, Ibid, p. 327-340.

১০৭. Nair, P. Thankappan– Calcutta in the 19th Century, Ibid, p. 469.

১০৮. দেববাহাদুর, বিনয়কৃষ্ণ— কলিকাতার ইতিহাস, তদেব, পৃ. ১৬২।

১০৯. Misra, B. B– The Indian Middle Class, Re-print 1978, p.11.

১১০. শেঠ, হরিহর— প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়— কথায় ও চিত্রে, তদেব, পৃ. ৩১৪।

১১১. দত্ত, প্রাণকৃষ্ণ— বদ্‌মাএস জব্দ।
দ্র. দত্ত, প্রাণকৃষ্ণ— কলকাতার ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য রচনা; বসু, দেবাশিস সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৯৯১, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ৩৬৬।

১১২. দেববাহাদুর, বিনয়কৃষ্ণ— কলিকাতার ইতিহাস, তদেব, পৃ. ১৪৮।

# তৃতীয় অধ্যায়ঃ

# বাবু: রূপ ও স্বরূপ

উনিশ শতকের সমাজে যেমন, তেমনি সাহিত্যে, দিনলিপিতে, স্মৃতিকথা কিংবা সংবাদপত্রে অন্যতম আলোচ্য বিষয় সম্ভবত 'বাবু'। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলার কোনো কোনো রাজন্যবর্গ, দালাল, মুনাফাখোর, পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীদের সম্মিলিত সহায়তায় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন বাংলার প্রকৃত ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে উঠল, তখন থেকেই সমাজে 'বাবু'দের এই রমরমা। পলাশির যুদ্ধে সিরাজের বিরুদ্ধে জয়লাভের জন্য ইংরেজদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা করায় মুর্শিদাবাদের নবাবের প্রাসাদ লুণ্ঠনের অর্থ এঁরা ভাগ হিসাবে পেয়েছিলেন যথেষ্ট পরিমাণেই। এঁদের কেউ কেউ আগে থেকেই ছিলেন ধনী, এর উপর অর্থলগ্নি করে, সৎ-অসৎ উভয় পন্থায় উপার্জন করে কিংবা ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহায়তা করে এঁরা কালক্রমে হয়ে উঠেছিলেন সমাজের এক একজন 'কেওকেটা'! এঁদের সঙ্গে ছিলেন কিছু ভুঁইফোঁড় মানুষ, সময় ও সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করে যাঁরা অচিরেই 'হঠাৎ নবাব' বনে গিয়েছিলেন। অপরিমিত ধনলাভে স্ফীত এইসব মানুষগুলি কিংবা এঁদের উত্তরপুরুষদের কেউ কেউ হয়ে উঠেছিলেন অকর্মণ্য, বিলাসী, অমিতব্যয়ী, আরামপ্রিয়, ভ্রষ্টচরিত্র এক একজন 'বাবু'। সামাজিক মর্যাদায় কিংবা পেশাগত দিক থেকে এঁরা কেউ ছিলেন রাজা, কেউ জমিদার, কেউ-বা দালাল-ব্যবসায়ী-মুৎসুদ্দি; কিন্তু আচরণগত সাম্যে এবং সমধর্মী মানসিকতায় অল্পকালের মধ্যেই এঁরা যে 'বাবু' নামক একটি বিশেষ শব্দবন্ধের দ্বারা চিহ্নিত বা পৃথকীকৃত হলেন কীভাবে, সে এক বিস্ময়!

'বাবু' শব্দটির উৎসমূল নির্ণয় এ কারণে সহজসাধ্য নয়। বাংলা ও হিন্দি সহ প্রায় সমস্ত আধুনিক ভারতীয় ভাষাতেই শব্দটি প্রচলিত এবং অর্থ প্রায় সদৃশ— পিতা, সন্তান, মান্য বা সম্ভ্রান্ত। 'হিন্দি শব্দসাগরে' শব্দটির আরেকটি অর্থ দেওয়া হয়েছে— 'রাজার নিম্নে রাজ, বন্ধুবান্ধব বা রাজন্যদের প্রতি প্রযোজ্য 'শব্দ' বলে।[১] অন্যদিকে নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'বিশ্বকোষে' শব্দটিকে 'দেশজ' বলে দু'টি অর্থ নির্দেশ করা হয়েছে— ক. ভদ্রলোক এবং খ. তিব্বতি ভাষায় অলস ব্যক্তিকে বাবু বলা হয়।[২] রাজশেখর বসু 'চলন্তিকা'য় এবং কাজী আবদুল ওদুদ 'ব্যবহারিক শব্দকোষে' 'বাবু' শব্দটির কোনো ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করেননি। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় শব্দকোষে' শব্দটির তেরো রকমের অর্থভেদ উল্লেখ করে 'বাপু' শব্দের ধ্বনিসাম্যে 'বাবু' শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করেছেন।[৩] হরিচরণের পূর্বে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তাঁর 'বাঙ্গালা শব্দকোষে' একইভাবে প্রাচীন বাপা > আদৃত অর্থে বাপু > ধ্বনিসাম্যে 'বাবু'— এই ক্রম নির্দেশ করেছেন।[৪]

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিক্ষিপ্তভাবে বাপা, বাপু বা বাবু শব্দের প্রয়োগ চোখে পড়ে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গলে' দুঃশীল বণিক মুরারি কালকেতুকে প্রতারণা করতে গিয়ে বলেছে—

> 'সোনা রূপা নহে বাপা এ ব্যাঙ্গা পিত্তল।
> ঘষিয়া মাজিয়া বাপা কর‍্যাছ উজ্জ্বল॥'[৫]

এখানে প্রযুক্ত 'বাপা' আদৃত অর্থে নয়, ব্যঙ্গার্থে সম্বোধনসূচক 'ওহে' রূপে ব্যবহৃত। অন্যদিকে, অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের কাব্যগুলিতে 'বাপা' শব্দ নানার্থে ব্যবহৃত। মানিকরাম গাঙ্গুলির 'ধর্ম্মমঙ্গলে' পাই—

> 'তোমার বিক্রম যত মোরে নাঞি ছাপা।
> কাভুর মহিম ত্বরায় যেতে হল বাপা॥'[৬]

এখানে সাধারণ অর্থে 'বাপু' হিসাবেই 'বাপা' শব্দটি ব্যবহৃত। আবার, অষ্টাদশ শতকেরই 'মনসামঙ্গল' কাব্যের কবি বিষ্ণু পাল 'পিতা' অর্থে 'বাপা' শব্দের ব্যবহার করেন :

'শোন শোন বাপা　　শোনো সদাশিব
　　　　আমার দুঃখের বাণী।
স্বর্গের অনিরুদ্ধ　　আনিঞা দাও বাপা
　　　　মর্ত্যে লইব ফুল-পানী॥'[৭]

কবি বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গলে'র প্রচলিত সংস্করণগুলিতে না মিললেও কেউ কেউ উক্ত কাব্যের হস্তলিখিত কোনো কোনো পুঁথিতে 'পিতা' অর্থে 'বাবু' শব্দের ব্যবহার পেয়েছেন—

'পদ্মা বলে বাবু তুমি সংসারের সার।
ঝির অপমান বাবু না দেখ একবার॥'[৮]

বিজয় গুপ্ত ছিলেন বরিশালের কবি। পূর্ববঙ্গে, বিশেষ করে রংপুর, দিনাজপুর অঞ্চলে 'পিতা' অর্থে 'বাপো' এবং কুমিল্যায় 'বাবু' শব্দের ব্যবহার আজও প্রচলিত।[৯] উক্ত অঞ্চলগুলিতে জমিদার-ভূস্বামী বা সম্ভ্রান্ত রাজন্যবর্গকে 'প্রজাগণের পিতা বা পালক' অর্থে 'বাবু' সম্বোধন অসম্ভব নয়। উনিশ শতকের প্রথম পাদে সাধারণত সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী কিংবা অভিজাতবর্গকেই কেবল 'বাবু' নামে সম্বোধন করা হত, একথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন।

আচার্য সুকুমার সেন অবশ্য ফারসি থেকে গৃহীত আগন্তুক শব্দ হিসাবেই 'বাবু' শব্দটিকে নির্দিষ্ট করেছেন।[১০] কিন্তু ফারসি 'বাবু' শব্দটির একটি অর্থ— A kind of Wandering Monk[১১], অন্য আরেকটি অর্থ— 'ঈশ্বরপ্রিয়, ভগবদনুগৃহীত প্রকৃত জ্ঞানী, যার সদ্‌গুণের সুবাস ও যশের বিস্তার আছে।[১২] কিন্তু আমাদের আলোচ্য উনিশ শতকীয় 'বাবু' শব্দটি কোনোভাবেই এই অর্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় তা বেশ বোঝা যায়। কেউ কেউ আবার 'সুবাস' বা 'যশের বিস্তার' অর্থটির সম্প্রসারণগত তাৎপর্য নির্দেশ করে প্রাচীন গালগল্পের অবতারণা করেছেন।[১৩] এই গল্প অনুসারে বাংলাদেশ থেকে যেসব বাঙালি প্রতিনিধিরা বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজকর্মের প্রয়োজনে মোগল দরবারে যেতেন, তাঁরা বেশি করে আতর ব্যবহার করতেন দরবারস্থ অন্যান্য আমির-ওমরাহ্‌-কে টেক্কা দিতে; এ কারণেই তাঁদের ব্যঙ্গ করে 'বাবু' বলা হত। কিন্তু এই জাতীয় গল্পের পিছনে আদৌ কোনো নির্দিষ্ট সমর্থন মেলে না— না সাহিত্যিক দিক থেকে, না ঐতিহাসিক দিক থেকে।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, আনুমানিক ১৬২০ থেকে ১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নেপালে লেখা 'গোপীচন্দ্র নাটকে'[১৪] 'বাবু' শব্দটির সুপ্রচুর প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন— মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি : 'আহা বাবু আমি কাঙ্গার জোগি রাজার সনে কার্জ নাহি বাবা' (পৃ.২৯); কোতোয়ালের প্রতি: 'কি পুছুসি বাবু করিগায়ি' (পৃ.৩২); দম্ভপরায়ণ রাজকর্মচারীর প্রতি : 'আহা ভাগীখোর বাপু এমত অহংকার না করো' (পৃ. ৩৮) ইত্যাদি। এক্ষেত্রে প্রায় সমজাতীয় অর্থে 'বাবু' শব্দটি সম্বোধনে প্রযুক্ত হয়েছে এবং সর্বত্রই যোগী জালন্ধরীপাদের মুখে। কাছাকাছি সময়ে, শারলা দাসের মহাভারতে সম্বোধনে 'বাবু' শব্দের প্রয়োগ মেলে; যেমন— ভীমার্জুনদের প্রতি যুধিষ্ঠিরের উক্তি : 'মোহ আগে কহ বাবু স্বরূপ বচন।[১৫] অন্যদিকে ওড়িয়া কবি

উপেন্দ্র ভঞ্জ-এর রামায়ণে লক্ষ্মণের প্রতি সম্বোধনে 'বাবু' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন রাম— 'বাবু নাকু সিরী দানু যোগ্য ঘোষাকু।' অর্থাৎ বাংলার পাশাপাশি অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও 'বাবু' শব্দের প্রয়োগ মেলে এবং প্রায় সর্বত্রই সম্ভ্রান্ত বা বিশিষ্ট জনদের প্রতি সম্বোধনে।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে' নানাবিধ দৃষ্টান্তযোগে শব্দটির সামাজিক, ঐতিহাসিক, অর্থসম্প্রারণগত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। প্রচলিত বাঙ্গালা অভিধানের মধ্যে তাঁর আলোচনাই বিজ্ঞানসম্মত ও সম্পূর্ণ। জ্ঞানেন্দ্রমোহন তাঁর অভিধানে শব্দটিকে সংস্কৃতমূল ধরে নিয়ে করেছেন— সংবপ্তা>বপ্পা >বাপা>বাপু> বাবু।[১৬] হেনরি ইয়ূল এবং এ. সি বার্নেল (Col. Henry Yule & A. C. Burnell) ১৮৮৬ সালে তাঁদের সুবিখ্যাত 'Hobson Jobson' নামক অভিধানে 'Baboo' শব্দটিকে সংস্কৃত মূল বলে প্রথম উল্লেখ করেন। প্রথমদিকে যে এটি সম্ভ্রমার্থেই ব্যবহৃত হত, সেকথাও উল্লেখ করেছেন তাঁরা— 'Properly a term of respect attached to a name, like Master or Mr., and formerly in some parts of Hindustan applied to certain persons of distinction.'[১৭] সেইসঙ্গে তিনি অর্থভেদ উল্লেখ করে বলেছেন যে, সম্প্রসারিত অর্থে বর্তমানে (অর্থাৎ সংকলকদ্বয়ের সংকলন কালে) 'a native clerk who writes English'-ও বোঝায়। ১৮৮৬ সালে ব্রিটিশ সরকারের অধীনস্থ ভারতে সরকারের কাজকর্মে দেশীয়দের নিয়োগ স্বাভাবিক ঘটনা ছিল এবং 'বাবু' শব্দটিও যে তার পূর্ববর্তী মর্যাদা-সম্ভ্রম হারিয়ে সাধারণ অর্থে প্রযুক্ত হচ্ছিল, তার ফলেই 'বাবু' শব্দের এই অর্থসংক্রম। সংকলকদ্বয়ের মতে, সংস্কৃত 'বপ্র', যার অর্থ পিতা, সেখান থেকেই মান্য, সম্ভ্রান্ত অর্থে শব্দটি এসেছে। দক্ষিণ ভারতেও শব্দটি 'Sir, My Lord, your Honour' অর্থে প্রযুক্ত হয়। বাংলায় সেন রাজাদের সময়কাল থেকে দক্ষিণ ভারতের আচারবিচার, সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগ গড়ে উঠেছিল। এভাবেও শব্দটি বাংলায় অনুপ্রবিষ্ট হতে পারে; বিপরীত গমনও অসম্ভব কিছু নয়। শব্দটি যে সংস্কৃতমূল হওয়াই স্বাভাবিক, কোনো ভাবেই ফারসি নয়, তার আরেকটি প্রমাণ, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সংকলিত 'পারসীক অভিধান'। ১৮৩৮ সালে সংকলিত এই অভিধানে জয়গোপাল সমকালে প্রচলিত এবং বাংলা ভাষায় (জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের ভাষায় 'স্বদেশীয় ভাষা'য়) গৃহীত আরবি-ফারসি শব্দ সংগ্রহ করেছেন। এই শব্দসংগ্রহে তিনি 'বাবু' শব্দটিকে গ্রহণ করেননি। জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের ন্যায় ভাষা ও সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ে পরম প্রাজ্ঞ যে শব্দটিকে ফারসি হিসাবে গ্রহণ করেননি, তার দ্বারা শব্দটির ফারসি জনকত্ব অপ্রমাণিত হয়।

১৮২৩ সালে 'কলিকাতা কমলালয়' গ্রন্থে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সমকাল প্রচলিত 'যাবনিক ভাষা' এবং 'সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় নাই' অথচ, 'ভদ্রলোকে ব্যবহার করিয়া থাকেন', এমন শব্দের যে তালিকা দাখিল করেছেন, সেখানেও 'বাবু' শব্দটি অনুপস্থিত। অথচ সংবাদপত্রের পাতায়, গ্রন্থাদিতে তখন 'বাবু' শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে প্রায়শই। বস্তুত, পলাশির যুদ্ধের পরবর্তীকালেই সম্ভ্রান্ত ও মান্য অর্থে 'বাবু' শব্দটি যে সমাজে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলা ১১৭০ অর্থাৎ ইংরেজি ১৭৬৯ সালের কাছাকাছি সময়ে ভূকৈলাশের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের সঙ্গে নৌকায় কাশী যাত্রা করেছিলেন বিজয়রাম সেন। ১১৭৭ বঙ্গাব্দে সেই ভ্রমণযাত্রার বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেন 'তীর্থ-মঙ্গল' কাব্যে। ভূকৈলাশের রাজবংশ কোম্পানি আমলের প্রথম দিকেই খ্যাতি-প্রতিপত্তির চূড়ায় ওঠে। কবি বিজয়রাম সেনের পোষ্টা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল ক্লাইভ-পরবর্তী বাংলার গভর্নর হ্যারি ভেরেলেস্টের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ভেরেলেস্ট কৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা গোকুলচন্দ্র ঘোষালকে ২৭ জানুয়ারি ১৭৬৯ থেকে ২৬

আগস্ট ১৭৬৯ পর্যন্ত বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। ফলে আভিজাত্য ও সম্মানের দিক দিয়ে এঁরা ছিলেন সে সময়ের অন্যতম খ্যাতনামা বংশ। এইচ. টি. প্রিন্সেপের অনুরোধে ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে রাধাকান্ত দেব 'respectable and opulent Natives of the Presidency'-র নামের যে তালিকা প্রস্তুত করেন, সেখানে 'First class Residents of Calcutta' র তালিকায় যে সাতটি পরিবারের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে, তার মধ্যে দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র জয়নারায়ণ ঘোষাল (তখন তিনি সদ্যমৃত) ও তাঁর পুত্র বাবু কালীশঙ্কর ঘোষালের নাম আছে।[১৮] বিজয়রাম সেনের তীর্থযাত্রাকালে জয়নারায়ণ সদ্য যুবা, তখনও তাঁর পুত্র কালীশঙ্কর ঘোষালের জন্ম হয়নি সম্ভবত। কবি কাব্যের শেষে ভূকৈলাশের ঘোষাল বংশের পরিচয় দিতে গিয়ে জয়নারায়ণ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> ‘জয়নারায়ণ বাবুকে চণ্ডী দিবা বর।
> চিরজীবী পুত্র তাঁর হউক সত্বর।।
> অল্প বয়সে বাবুর অতি তীব্র বুদ্ধি।
> যেই কর্ম্ম মনে করেন হয়্যা উঠে সিদ্ধি॥’[১৯]

এক্ষেত্রে ‘বাবু’ শব্দটি প্রথম প্রয়োগে ‘মহাশয়’ অর্থে, দ্বিতীয় প্রয়োগে সম্ভবত ‘মান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি’ অর্থে প্রযুক্ত। এ জাতীয় শব্দ প্রয়োগের দৃষ্টান্তে বোঝা যায়, ১৭৭৭ সালের আগেই ‘বাবু’ শব্দটি সম্ভ্রান্ত বা অভিজাত ব্যক্তি বোঝাতে সমাজে প্রচলিত হয়ে গেছে। ইয়ুল ও বার্নেল 'Hobson Jobson'-এ 'Baboo' শব্দের প্রায়োগিক উদাহরণ টানতে গিয়ে ১৭৮১ সালে লেখা দুধ সিংহের বক্তব্যের যে অংশ তুলে দিয়েছেন, তাতে দেখা যায়[২০], রাজা এবং বাবু পরিপূরক শব্দ বা সদৃশ-শব্দ হিসাবে প্রযুক্ত। ১৭৮২ সাল থেকে সংবাদপত্রগুলিতে 'Cantoo Baboo'দের দেখা মিলতে থাকে।[২১] ১৭৭৫ সালে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে নন্দকুমারের অভিযোগের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে কান্তবাবু কাউন্সিলের সামনে হাজির হননি। সেক্ষেত্রে লোকমুখে প্রচলিত গানে-ছড়ায় তাঁকে অনেক ব্যঙ্গ সহ্য করতে হয়েছে। ১৭৫৪ থেকে ১৭৬৪ পর্যন্ত তিনি ছিলেন হেস্টিংসের দেওয়ান; এ ছাড়াও লবণ, রেশম কাপড়ের ব্যাবসাদিতে তিনি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হন। প্রথম জীবনের পেশাগত দিক দিয়ে তিনি তেলি ছিলেন। তথাকথিত বংশগৌরব বা আভিজাত্য কোনোটিই তাঁর ছিল না। ১৮২৪ সালের গভর্নমেন্ট গেজেটে যেমন ‘কান্তবাবু’ বলে তিনি উল্লিখিত, তার বছর পঁয়ত্রিশ আগে থেকেই তিনি ওই নামে অভিহিত হচ্ছেন। ১৭৮২ সালের ১২ অক্টোবরের ‘ইন্ডিয়া গেজেটে’র সংবাদে দেখা যায়, "Cantoo Baboo" appears as a subscriber to a famine fund at Madras for 200 Sicca Rupees'; অতএব তখনই তিনি কোম্পানির গেজেটে ‘বাবু’ হিসাবেই উল্লিখিত। কৃষ্ণকান্ত নন্দী কি কোম্পানির বশংবদ কর্মচারী হওয়ায় এবং যাবতীয় সৎ-অসৎ কর্মে হেস্টিংসের সাহায্যকারী হিসাবে কোম্পানি কর্তৃক আভিজাত্যব্যঞ্জক ‘বাবু’ নামে উল্লিখিত হতেন? না হলে পরবর্তীকালের গানে-ছড়ায় দেখা মেলে যে ‘কান্তবাবু’র, তাঁর ‘বাবু’ নামক হুলটি এমন ব্যঙ্গবিষ ছড়াতে পারত কি?

বলা যায়, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের পরবর্তীকালে ১৭৮০ সালের মধ্যেই ‘বাবু’ Baboo শব্দটি ইংরেজদের দ্বারা যেমন ব্যবহৃত হতে হতে বিত্তবান, অভিজাত সম্প্রদায়বিশেষের সাধারণ নির্দেশক হয়ে উঠেছে যেমন, তেমনি দেশীয় লোকেরাও কাজকর্মের সূত্রে ‘বাবু’ শব্দটিকে সম্ভ্রান্ত জমিদার বা ভূস্বামী কিংবা বিত্তপতিদের ‘শ্রেণি’ (class) নির্দেশক হিসাবে ব্যবহার করছেন। ১৮২০ খিস্টাব্দ আগেই অবশ্য তার

যাবতীয় রোগ-লক্ষণ নিয়ে 'বাবু' সমাজ-মানসে সুপ্রতিষ্ঠিত, ফলত ইংরেজি-বাংলা সংবাদপত্রে 'বাবু'দের নিন্দা-প্রশংসার আসর বসতে থাকে এই সময় থেকেই। মনে হয়, বাংলার সাধারণ মানুষ যেমন সম্ভ্রমার্থে এবং মান্য ব্যক্তির প্রতি সম্বোধনের ক্ষেত্রে 'বাবু' শব্দটি প্রয়োগ করতে শুরু করে, তেমনি ইংরেজরা প্রশাসনিক ও সামাজিক কর্মক্ষেত্রে এদেশীয় বিত্তপতি, মান্য বাঙালিদের প্রথমদিকে 'Baboo' সম্বোধনে পৃথকীকৃত করতেন। প্রথম দিকের ইংরেজি সংবাদপত্রগুলি এই দৃষ্টান্তের এদেশীয় সাধারণ অর্থে 'Native' এবং মান্য বাঙালি অর্থে 'Baboo' শব্দ দু'টি ব্যবহার করতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর (১৭৯৩) বিত্তশালী প্রাচীন অভিজাতদের অনেকেই সর্বস্ব খুইয়ে যেমন সাধারণের স্তরে নেমে এলেন, তেমনি ভুঁইফোঁড় অনেকেই ভূসম্পত্তি কিনে নিয়ে উঠে এলেন বিত্তপতি হিসাবে। ফলে বিত্তহীন আভিজাত্য এবং আভিজাত্যহীন বিত্ত— এই দুই শ্রেণি গড়ে উঠল। বিত্ত ও আভিজাত্য পূর্বে অঙ্গাঙ্গি ছিল বলে 'বাবু' শব্দের দ্বারা নির্দিষ্ট একটি 'শ্রেণি' বোঝাত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর তা যখন রইল না, তখন সরকারিভাবে শিক্ষিত, রুচিসম্পন্ন, অভিজাত নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিকেই 'বাবু' নামে নির্দেশ করার প্রথা বেসরকারিভাবেই প্রচলিত হল। এ কারণেই সম্ভবত তৎকালীন কলকাতার সেরা সংবাদপত্র, জেম্স সিল্ক বাকিংহাম সম্পাদিত 'ক্যালকাটা জার্নাল'-এর (প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৮১৮) ১৮২০ সালের ১৩ মার্চ সংখ্যায় রামমোহন রায়ের লেখালেখির (Publication) কথা বলতে গিয়ে 'Baboo Ram Mohun Roy' ব্যবহার করা হয়েছে।[২২] অথচ, ওই বছরেই ০১.১০.১৮২০ সংখ্যায় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে তথাকথিত বাবুদের মোচ্ছবের কদর্যতা নির্দেশ করতে গিয়ে 'Baboo' শব্দ ব্যবহৃত হয়নি, বরং আভিজাত্যহীন বিত্তবানদের শ্রেণিচরিত্র বোঝাতে 'বাবু'র পরিবর্তে 'The wealthy banker, the extensive fund-holder, and the large proprietors of land, are all crowded into one city...' বলা হয়েছে।[২৩] সাধারণ জনমানসে 'বাবু' শব্দটি তখনও 'বিত্তবান' অর্থে প্রচলিত থাকলেও শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মহলে 'বাবু' শব্দটি আর নির্বিচারে প্রযুক্ত হল না। এইসময় থেকেই 'বিশিষ্ট নাগরিক' অর্থে 'বাবু'র একটি পৃথক মাত্রা তৈরি হতে থাকে। রাধাকান্ত দেব ১৮২২ সালের তালিকায় যেসব বিশিষ্টদের চিহ্নিত করেছিলেন, ১৮২০ সাল থেকেই তাঁরা সংবাদপত্রের পাতায় 'বাবু' যুক্ত হয়ে শোভা পাচ্ছেন। অবশ্য এই পর্বের বিশিষ্ট 'বাবু'রা সকলেই বিত্তবান ছিলেন; এঁদের পূর্বপুরুষেরা কোম্পানির দেওয়ানি-মুৎসুদ্দিগিরি করে ইতিপূর্বেই সামাজিক কৌলীন্য অর্জন করেছিলেন। সম্ভবত ভুঁইফোঁড় নতুন অকুলীন বিত্তবানদের থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র রাখতে 'বাবু' নামক বাহুল্যকে তাঁরা স্বীকার করেছিলেন। এ কারণেই রাধাকান্ত দেবের তালিকায় নতুন বাবু রামমোহন রায় অনুপস্থিত। তাঁকে অস্বীকার করে রাধাকান্ত দেবেরা সম্ভবত বোঝাতে চেয়েছেন, ব্রহ্মবাদী রামমোহন যতই শিক্ষিত এবং সাহেবদের প্রশংসার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠুন না কেন, কলকাতার ইতিমধ্যে কুলীন অভিজাতরা তাঁকে স্বীকার করতে অপারগ।

দ্বিধাদ্বন্দ্ব, প্রতিরোধ-অস্বীকার এসবের মধ্যে দিয়েই 'বাবু' ক্রমশ 'নানার্থ' হয়ে উঠছিল। 'শিক্ষিতবাবু'রা তখনও দল বেঁধে আসরে নামেননি। হিন্দু কলেজে 'ডোজুসাহেবে'র কারখানায় তখনও ইয়ং বেঙ্গলেরা শিক্ষানবিশ রয়েছেন, ফলে তখনও 'বাবু'র অর্থ 'An educated Native Gentleman' হয়ে ওঠেনি। ফলে, স্কুল বুক সোসাইটির সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে 'সমাচার দর্পণ' জানাচ্ছে[২৪] (২১.১০.১৮২০) 'শ্রীযুত' মন্টেগু সাহেব এবং 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট' খ্যাত 'শ্রীযুত' তারিণীচরণ মিত্রের সুপারিশে পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পুত্র 'শ্রীযুত' রামজয় তর্কালঙ্কার সোসাইটিতে পিতার স্থানে যোগ দিচ্ছেন (একবছর আগেই

মৃত্যুঞ্জয় পরলোকগমন করেছেন) এবং 'শ্রীযুত বাবু উমানন্দ ঠাকুরও সোসাইটির অন্তঃপাতী হইয়াছেন।' ৯ জুন ১৮২১ তারিখের 'সমাচার দর্পণে'ও 'শ্রীযুত বাবু' রাধাকান্ত দেব ও উমানন্দ ঠাকুরের উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য ইতিপূর্বে ১৮২১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি এবং ৯ জুন সংখ্যার 'বাবুর উপাখ্যান' নামক দুই পর্বে প্রকাশিত নকশায় 'সমাচার দর্পণে'র অজ্ঞাতনামা লেখক (সম্ভবত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) আদিবাবুদের চরিত্র-লক্ষণের উপভোগ্য বিবরণী রচনা করে কুলীনবাবুদের আদিযুগের এপিটাফ রচনা করে ফেলেছেন। ১৮২৩ সালের ৮ মার্চ 'সমাচার দর্পণে'র পাতায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, ভিন্ন রুচির বাবুদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গঠিত 'গৌড়ীয় সমাজ'-এর সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার সংবাদে 'শ্রীযুত' রামজয় তর্কালঙ্কার, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদুলাল দে প্রমুখ বলা হলেও, রাধাকান্ত দেব উল্লেখিত হন 'বাবু রাধাকান্ত দেব' বলে। অন্যদিকে সভাপতি হলেও কৃতবিদ্য রামকমল সেন 'বাবু'হীন।[২৫] অথচ ১৮২৩ সালেরই ২০ ডিসেম্বর 'সমাচার দর্পণে' ভূকৈলাশের জয়নারায়ণ ঘোষালের পুত্রের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে 'শ্রীযুত বাবু কালীশঙ্কর ঘোষাল' বলে। উল্লেখযোগ্য এই যে, ১৮৩০ সালের পর কৃতবিদ্য ডিরোজিয়ানরা প্রত্যেকেই কিন্তু 'বাবু' নামে আখ্যাত হতে থাকেন। বোঝা যায়, দিন বদলাচ্ছে। বিত্তনির্ভর 'বাবু'ত্বে আর আস্থা নেই কালের, 'বাবু'ত্ব এখন শিক্ষা-সংস্কৃতি-রুচি নির্ভর। বিত্তপতিদের আওতা থেকে তার বিচরণ এখন মধ্যবিত্তের উঠোনে।

ঔপনিবেশিক আমলের প্রথম থেকেই কখনো কর্মোপলক্ষ্যে, কখনো নিছক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে একাধিক বিদেশি, বিশেষ করে ইংরেজরা প্রভূত সংখ্যায় বাংলায় এসেছেন। তাঁদের ডায়েরি, চিঠিপত্র, ভ্রমণ-বিবরণীতে 'বাবু' শব্দের ব্যবহার প্রায়শই চোখে পড়ে। এই বিবরণীগুলি থেকে ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'বাবু'র রূপ-রূপান্তরের ইঙ্গিত বুঝতে পারা যায়। এদেশীয় বিত্তবানেরা পলাশি যুদ্ধের পরবর্তীকালে কলকাতার বুকে যে নতুন সামাজিক প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তারই অনুষঙ্গ হিসাবে বিদেশি শাসকদের সঙ্গে তাঁরা ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে চাইতেন। উৎসব, অনুষ্ঠানে যে যত উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সাহেব প্রভুদের গৃহে আনতে পারবেন, তাঁর সামাজিক মর্যাদা তত ঊর্ধ্বগামী হবে। এ কারণেই নবকৃষ্ণ কিংবা রাজা সুখময়ের দুর্গোৎসবে কোম্পানির গভর্নরেরা আসতেন নিয়মিত। অন্যান্য উৎসবেও তাঁরা আমন্ত্রণ ও উপহার পেতেন। বিদেশি শাসকের মন জয় করে দেওয়ানি, বেনিয়ানি কিংবা ব্যাবসাদিতে অনৈতিক-নৈতিক সুবিধাগ্রহণ ছিল এই লৌকিকতা রক্ষার পরোক্ষ কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য। ইংরেজ প্রভুরা যে তা বুঝতেন না, এমনটা নয়। পরবর্তীকালে রামমোহন রায় এই সামাজিক মিলনাকাঙ্ক্ষাকে অন্য মাত্রা দিয়েছিলেন। পৌত্তলিক হিন্দুধর্মের উপর আস্থাহীন রামমোহন উৎসব উপলক্ষ্যেই নয় শুধু, সাধারণভাবে সামাজিক মিলনের প্রয়োজনে পার্টি দিতেন। এমনই এক পার্টিতে ১৮২২ সালে উপস্থিত ফ্যানি পার্ক্স লিখেছেন, 'The other evening we went to a party given by Rammohun Roy, a rich Bengalee Baboo'[২৬], সদ্য কলকাতায় পা রাখা ফ্যানি পার্ক্সের কাছে তখনও পর্যন্ত সাধারণ বাঙালি মাত্রেই 'বাবু'। সম্ভবত রামমোহন রায়ের বাবুত্বের শ্রেণি বোঝাতে তিনি 'rich' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আবার দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি নাচের আসরে উপস্থিত থাকার অভিজ্ঞতার কথা জানাতে গিয়ে তিনি 'we went to a nach at the house of a Wealthy Baboo' কথাটি ব্যবহার করেন।[২৭] বিত্তবান বাবুর কথা বলে ফ্যানি বাবুত্বের সঙ্গে বিত্তের সম্পর্কটিকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন সুকৌশলে। বিত্তবান বাবুদের এই সাহেব-ভজনার আড়ালের উদ্দেশ্যকে বুঝতে অসুবিধা হয়নি মিসেস পার্ক্সের। রুস্তমজী-কাওয়াসাজীর

বাড়িতে বল নাচের পার্টিতে উপস্থিত অভ্যাগতদের মধ্যে ফ্যানি পার্ক্স-এর মতো ছিলেন মিসেস এমিলি ইডেন। ফ্যানির কৌশলী মন্তব্য, 'The Misses Eden were there, which the Baboo ought to have thought a very great honour.'[২৮] বাঙালিবাবুরা এ জাতীয় সম্মান প্রদর্শনের বিনিময়ে নিজেদের সামাজিক পদমর্যাদা বাড়িয়ে নিত এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার পথটিও সুগম করত। ফ্যানি ১৮২৬ সালে এক বাবুর বাড়ির অন্দরমহলে এদেশীয় মহিলাদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পান। এই প্রসঙ্গে উক্ত 'Baboo'-র কথা বলতে গিয়ে তিনি শব্দটির সংজ্ঞার্থ করেছেন— 'a rich Calcutta native Gentleman', কলকাতায় দীর্ঘবাসের সূত্রে ফ্যানি বুঝতে পেরেছেন, আপামর বাঙালি মাত্রেই ‘বাবু’ নন; ‘বাবু’ মূলত রাজধানী তথা কলকাতাবাসী, সম্ভ্রান্ত ও ধনী এদেশীয় ভদ্রলোক। আগেই বলা হয়েছে, এই সময়কালে শিক্ষিত রুচিশীল কুলীনবাবুরা ক্রমশ বাবুত্বের চেনা লক্ষণগুলি ত্যাগ করে ‘ভদ্রলোক’ হওয়ার সাধনায় রত। ফ্যানির ডায়েরিতে এ কারণেই ‘বাবু’ সামাজিক বিবর্তনের স্পষ্টতা নিয়েই চিহ্নিত।

১৮২৩ সালে বিশপ হেবার তাঁর ডায়েরিতে কলকাতার বাড়িঘর প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, '... and here and there the immence convent-like mansion of some of the more wealthy "Baboos" (The name of the native Hindoo Gentleman answering to our Esquire) or Indian Merchants and banker.'[২৯] লক্ষণীয়, হেবার পুঁজিপতি এবং ব্যবসায়ীকে ‘বাবু’ শ্রেণি থেকে পৃথক করেছেন। ‘বাবু’রাও বিত্তবান (Wealthy) পুঁজিপতি কিংবা ব্যবসায়ীদের মতো, কিন্তু একইসঙ্গে এই বাবুরা ‘ভদ্রলোক’ও (Gentleman) বটে; ‘ভদ্রলোক’ বলতে তিনি সম্ভবত ‘সুসংস্কৃত’ বুঝিয়েছেন, যা আভিজাত্যহীন ভুঁইফোঁড় বিত্তবানশ্রেণি তখনও অর্জন করে উঠতে পারেনি। অন্যত্র রাধাকান্ত দেব প্রসঙ্গে তিনি জানান যে, রাধাকান্ত অন্যান্য ধনীবাবুদের তুলনায় সেই মুষ্টিমেয় বাবু, যাঁরা সুসংস্কৃত, মার্জিত এবং রুচিশীল।[৩০] বোঝা যাচ্ছে যে, বিত্তবান হুল্লোড়বাজ অমিতব্যয়ী রুচিহীন বাঙালি মানেই আর ‘বাবু’ নন, বাবুত্বের মধ্যেও রুচি-শিক্ষার মাপকাঠিতে ভেদাভেদ করা হচ্ছে এবং বিদেশি সাহেবরাই তা করছেন। আদিবাবুদের এন্তেকাল আসন্ন।

হেবার অবশ্য এক জায়গায় সরকার (Sircar) প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে 'Baboo' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সরকার প্রসঙ্গে 'Baboo' শব্দটি ফ্যানিও ব্যবহার করেছেন, যদিও সামাজিক সম্মান, বিত্ত ও আভিজাত্যের দিক দিয়ে পূর্ববর্তী বাবুদের সঙ্গে Sircar-এর তুলনা চলে না কিছুতেই। কিন্তু মনে হয়, সাধারণভাবে শিক্ষিত, মার্জিত, বশংবদ দেশীয় কর্মচারীরা আপাত ভদ্রতার কারণেই সাহেব-প্রভুদের চোখে Gentleman অর্থে 'Baboo' নামে চিহ্নিত হচ্ছিলেন। আসলে এর মধ্যেও ছিল যুগান্তরের ইঙ্গিত। বিত্ত, সম্ভ্রম হারিয়ে ‘বাবু’ যে ক্রমশ শিক্ষিত দেশীয় ভদ্রলোক কিংবা কেরানিতে পরিণত হবে, এ যেন সেই মনোভাবেরই বাহক। ইয়ুল ও বার্নেল 'Baboo' অর্থে যে 'native Clerk who writes English' বলেছিলেন, তার উৎস এই ‘সরকার-Baboo’রাই।

অবশ্য 'Baboo'দের প্রতি ঔপনিবেশিক প্রভু বা প্রভু-পত্নীদের দৃষ্টিভঙ্গি যে সর্বদা সম্মানের ছিল, এমনটি নয়। ১৮২৫ সালে তখনকার অন্যতম বিত্তবান বাবু রূপলাল মল্লিকের বাড়িতে উপস্থিত ফেনটন পত্নীর প্রতিক্রিয়া— 'The Poor animal who exists on rice and ghee all the year, contended with the mat for his bed, here may be seen playing the liberal entertainer.'[৩১] আবার, হাগিন্‌স্-এর (Huggins) কাছে, বাবু মানেই টাকার থলি হাতে দণ্ডায়মান দুর্বৃত্ত একেকটা। নতুন নতুন যুবক ইউরোপীয়

writers-দের ব্যয় বিলাসিতার অর্থ জুগিয়ে যারা হয় প্রভূত সুদ আদায় করে, নচেৎ কোম্পানির কোনো দেওয়ানি বা বেনিয়ানির সুযোগ হাতিয়ে নেয়।[৩২] জনৈক লন্ডনবাসী মিশনারির কাছে বাবু মানেই তিন শিলিং-এরও কম মূল্যের সস্তা পোশাক পরিহিত, আপাত গোবেচারা দেখতে এদেশীয় ব্যক্তি, যে আসলে ধনপতি এবং হয়তো বহু লক্ষ টাকার লেনদেনের কারবারি। বস্তুত ঔপনিবেশিক প্রভু কিংবা অতিথিরা নিজ নিজ অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে বাবুদের বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। কারোর কাছে 'বাবু' মানে অর্থবান সুশিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোক, কারোর কাছে বিত্তবান ব্যবসায়ী, কেউ-বা 'বাবু' বলতে বোঝেন সরকারমশাইকে, কেউ-বা আবার কেরানি অর্থে বাবু শব্দটিকে গ্রহণ করেছেন। ফরাসি প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ভিক্‌তর জাকমঁর মতো কেউ কেউ ১৮২৯ সালের রোজনামচায় 'বাবু' প্রসঙ্গে লিখে রাখছেন : 'Gentle-man : a native Gentleman। তাঁদের এই মার্জিত উপাধিটি জাতের মূল্যে অর্জিত হয়নি, অর্জিত হয়েছে তাঁদের বিত্তসম্পত্তি ও জীবনযাপনের স্টাইলের জন্য, ইউরোপীয়দের সঙ্গে সে স্টাইলের ফারাক কম। তাঁরা সকলেই হিন্দু।'[৩৩] ভিক্‌তর জাকমঁ যাঁদের 'বাবু' হিসাবে সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, তাঁরা প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামকমল সেন, হরময় দত্ত প্রমুখ। এঁদের কারোর কারোর জীবনে ইউরোপীয় জীবনযাপনের ছাপ যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল, তা অমূলক নয়। তবে এই ধরনকে সাধারণীকৃত করে দেখা চলে না। তথাকথিত বাবুসমাজের কেউ কেউ এ জাতীয় জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেও, সংখ্যার বিচারে তা নেহাতই কম এবং উনিশ শতকের সামাজিক দৃষ্টি এইসব দলছুট বাবুদের আপন বলে গ্রহণ করে নেয়নি। নকশায়, প্রহসনে, গল্প-কাহিনিতে সমাজ-দৃষ্টির রূঢ় ব্যঙ্গবিদ্রূপ উৎক্ষিপ্ত হয়েছে এই শ্রেণির প্রতি। লক্ষ করলে বোঝা যায়, উনিশ শতকের সমাজমানস এদেশীয় 'বাবু'দের কৌতূহলী চোখে নিরীক্ষণ করেছে, নিজের নিজের মতো করে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে উন্মোচন করতে চেয়েছে বাবুত্বের স্বরূপটিকে, কিন্তু কেউই 'বাবু'কে খেতাববিশেষ বা মোগল শাসক কর্তৃক প্রদত্ত সাম্মানিক হিসাবে উল্লেখ করেননি।

প্রসঙ্গটি প্রথম উল্লেখ করেন সম্ভবত দুর্গাচরণ রায় তাঁর 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন' গ্রন্থে। ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থে দুর্গাচরণ ডাচ কোম্পানির দেওয়ান শ্যামরাম সোম প্রসঙ্গে বলেন, 'ইনি নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার নিকট "বাবু" উপাধি লাভ করেন।'[৩৪] পরবর্তীকালে প্রমথনাথ মল্লিক উক্ত মতের অনুসরণে বলেন, 'বাবু তখনকার সম্মানসূচক উচ্চ কর্মচারীর পদবী ছিল।'[৩৫] এই বিশ্বাসেরই প্রতিধ্বনি করেছেন হরিহর শেঠ — 'সিরাজ-উদ্-দৌলার সময়ে "বাবু" একটি উপাধি ছিল।'[৩৬] কিন্তু নবাবি আমলে 'বাবু' নামক কোনো খেতাব-প্রচলনের কথা কোনো সূত্রই সমর্থন করে না। পরবর্তীকালে, ইংরেজ আমলেও শুধুমাত্র 'বাবু' নামক খেতাব প্রচলিত ছিল না। ইংরেজ সরকার 'বাবু-বাহাদুর' নামক খেতাব দিতে শুরু করেন উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে। ১৮৭১ সালের ১ জানুয়ারির 'সুলভ সমাচার' অনুযায়ী, সে সময় এদেশে একজন মাত্র 'বাবু বাহাদুর' ছিলেন। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মতো বাংলাতেও 'বাবু' একটি লোক প্রচলিত শব্দ ছিল এবং তা মান্য বা সম্ভ্রমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হত। তবে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলায় লেখা দলিল বা চিঠিপত্রাদিতে 'বাবু'র অনুল্লেখে বোঝা যায়, এটি কোনো রাজপ্রদত্ত খেতাব বা সম্মান ছিল না। ইংরেজরা প্রথম দিকে সম্ভ্রমার্থে শব্দটি প্রয়োগ করলেও, পরবর্তীকালে বাঙালি শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত কিংবা ব্যবসায়ী মাত্রেই 'Baboo' নামে অভিহিত হতেন। প্রথমদিকে 'বাবু' নামের সঙ্গে অবশ্য অর্থকৌলীন্য (Wealthy) জড়িত ছিল। ব্যাবসাবাণিজ্য সূত্রে ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত লোকেদের 'বাবু' বলা হত। জেম্‌স্ হর্নে তাঁর কলকাতা বিষয়ক রচনায়

(১৮২৭ খ্রি.) 'Baboo' প্রসঙ্গে পাদটীকায় বিস্তারিতভাবে জানাচ্ছেন, 'The Baboos of Calcutta are a very useful class of persons; their business is to dispose of the investments of European Traders, to make purchases for them in the bazer, and in short, to provide all their necessaries. They indeed, by their superior skill in the art of over-reaching, levy a duty on their employer beyond what he expected to be called upon to pay; but if they cheat him, they take care that no one else shall. The baboos of the lower description (on sircars), with the view of getting into their power any young European, fresh from Europe, readily come forward with advances of cash, in which case they seldom fail to realise a handsome interest on their money, changing an enormous profit of seventy five or a hundred percent on every article furnished.'[৩৭] হর্নে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সূত্রে সম্ভবত এই দুই শ্রেণির 'বাবু'দের সংস্পর্শে এসেছিলেন। ফলে সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যবসায়ী এবং সরকার— এঁদের বাইরে শিক্ষিত, তথাকথিত আলোকপ্রাপ্ত, রুচিশীল আর এক শ্রেণির বাবুদের যে উত্থান হচ্ছিল এই সময়, তাঁদের ব্যাপারে তিনি নীরব। অবশ্য এই বিশেষ শ্রেণির বিকাশ দ্রুততা পেয়েছিল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক ১৮২৮ খ্রি. গভর্নর জেনারেল হিসাবে এদেশে আসার পর। বেন্টিংক তাঁর আমলে শাসন ব্যবস্থায় গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। ১৮২৯ খ্রি. সতীদাহ প্রথা রদে বেন্টিংকের ভূমিকা রামমোহন রায়ের চেয়েও কার্যকরী। তিনি ইংরেজি শিক্ষিতদের সরকারি চাকরির আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর প্রচেষ্টাতেই ডিরোজিয়ান হরচন্দ্র ঘোষ সরকারি কার্যে যোগ দেন। দেশীয়দের জুতো পায়ে দরবারে ঢোকার অনুমতি মিলেছে। ১৮৩৩ খ্রি. কোম্পানির সনদের পুনর্নবীকরণ হয়। এইসময় থেকেই কোম্পানির একচ্ছত্র বাণিজ্যিক অধিকারের অবলুপ্তি ঘটে। অন্যদিকে ১৮৩৫ খ্রি. লর্ড মেকলে শিক্ষাসংক্রান্ত বিখ্যাত দলিলটি প্রণয়ন করেন। সব মিলিয়ে শিক্ষিত দেশীয়দের মধ্যে এক নতুন প্রাণোন্মাদনা সঞ্চারিত হয়। এ সবের প্রতিক্রিয়ায় পুরাতন বাবুগিরির অবসান ঘটিয়ে সংবাদপত্রসেবী, সভা-সমিতিমুখী এক নতুন বাবু শ্রেণির উত্থান ঘটে, যাঁরা ক্রমশ উনিশ শতকের বাকি ইতিহাসের চালিকাশক্তি হয়ে ওঠেন।

উনিশ শতকের তিনের দশক থেকেই বিশেষ করে এদেশীয় সংবাদপত্রগুলিতে Mr.-এর পরিবর্তে 'শ্রীযুত' ও 'বাবু'— দু'টি শব্দই পৃথক পৃথক ভাবে, কখনো একইসঙ্গে প্রযুক্ত হতে থাকে। যেমন— মতিলাল শীল বোঝাতে 'শ্রীযুত মতিলাল শীল', 'শ্রীযুত শীলবাবু', 'শ্রীযুত মতিলাল শীলবাবু' ব্যবহৃত হতে থাকে। সেকালের সকল সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেদের নামের সঙ্গেই এই জাতীয় প্রয়োগ প্রায়ই চোখে পড়ে। 'বাবু' বলতে উড়নচণ্ডী, বিশ্ববখাটে, বিত্তসর্বস্ব, লম্পট, বিলাসী যে সম্প্রদায় বোঝাত, সেই অর্থে মুছে গেল না রাতারাতি, তবে সামাজিক ক্ষেত্রে তার ওই জাতীয় অর্থে প্রয়োগ কমে গেল নিঃসন্দেহে। উক্ত বাবুরা এককালে বিড়ালের বিয়ে দিয়ে, মাতৃশ্রাদ্ধে বাইনাচের আসর বসিয়ে, শ্যাম্পেন, সেরি, আফিম, কোকেনের বন্যা বইয়ে দিয়ে, বুলবুল লড়াইয়ে কিংবা উপপত্নীর আবদারে সর্বস্বান্ত হয়ে বিত্তহীন অবস্থায় নিতান্ত কৃপা ও ব্যঙ্গের পাত্র হয়ে আশ্রয় নিলেন নকশায়, প্রহসনে, বটতলার সস্তা আখ্যান, কেচ্ছাকাহিনির পাতায়। আদিবাবুদের মহিমা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে 'বাবু' শব্দটি লুপ্ত বা অব্যবহৃত হতে থাকল এমন নয়। ইংরেজি-শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত নতুন একদল সম্প্রদায় 'বাবু' নামে আখ্যাত হতে লাগলেন, যদিও তাঁদের আচার-আচরণে পূর্ববর্তী বাবুদের সকল গুণগুলি আর দেখা গেল না, সম্ভবত অর্থনৈতিক কারণেই আদিবাবুদের সকল লক্ষণগুলি অনুসরণ করা সম্ভব হল না তাঁদের পক্ষে; তা ছাড়া কারোর কারোর মধ্যে প্রকাশ্যে

এ জাতীয় আচরণ গর্হিত বলে মনে হল। ভিক্টোরিয়ান শুচিতার প্রাবল্য দেখা দিতে লাগল রুচি, জীবনযাপন প্রভৃতির ক্ষেত্রে। সমাজও নতুন স্তরের এই 'বাবুত্ব'কে স্বীকৃতি দিয়েছিল। 'সমাচার দর্পণ' (০১.১০.১৮৩১) লিখছে : 'বাবু উপাধির বিষয়ে কী কহা যাইবে; ইঙ্গলন্ডীয় উপাধি ইসক্বৈর যাঁহারদের বিপুল ধন থাকে তাঁহারদেরই হয় এমত দৃষ্ট হইতেছে কলিকাতার মধ্যে যিনি ইষ্টকনির্মিত গৃহে বাস করেন বিশেষত ঐ অট্টালিকা যদি দোতলা হয় তিনিই বাবু খ্যাতি পান। অতএব বাবু খ্যাতি প্রাপ্তি বিষয়ে কিছু অনুগম নিয়ম নাই...।'[৩৮] ইংরেজ বা পূর্ববর্তী মোগল শাসক— কারোর দ্বারাই 'বাবু' উপাধি প্রবর্তিত ও বিতরিত না হলেও উনিশ শতকের তৃতীয় দশকেই সভা-সমিতিতে, সংবাদপত্রের স্তম্ভে, সমাজজীবনে 'বাবু' শব্দটি উপাধি-সদৃশ ব্যবহৃত হচ্ছিল। বাঙালি সম্ভ্রান্ত শ্রেণি 'Lord' শব্দের সাদৃশ্যে কি এই নতুন শব্দ নামের পূর্বে ব্যবহার করে সামাজিকভাবে তাঁদের শ্রেণিগত বিশিষ্টতা প্রকাশ করতে চাইছিলেন? 'সমাচার দর্পণে'র লেখক 'বাবু'কে উপাধি হিসাবে বিচার করে বিত্তবান ইংরেজদের উপাধির সঙ্গে (অবশ্যই Lord) তুলনীয় বলতে চেয়েছেন এবং বিত্তহীন বাবুদের 'বাবু' বলা সংগত কি না এই প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু বাবু যে বিত্ত-সম্পদের সঙ্গেই আর যুক্ত নেই কেবল, তা যে হয়ে উঠেছে বিশেষ এক সামাজিক অভিধা, সে সত্যও তো আর প্রচ্ছন্ন থাকে না তাঁর পর্যবেক্ষণে। বিজয়রাম সেনের 'তীর্থ মঙ্গলে' সম্ভ্রান্ত মান্যগণ্য অর্থে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধেই 'বাবু' শব্দের প্রয়োগ আমরা দেখেছি, সম্ভবত উনিশ শতকের তিনের দশক থেকে লোকপরম্পরায় মানী ব্যক্তিমাত্রেই 'বাবু' নামে আখ্যাত হতে থাকেন। বিত্তের দিক থেকে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিও বাবু, আবার শিক্ষাদীক্ষা, রুচি, সংস্কৃতি এসব দিক থেকেও যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি সাধারণ-বিত্ত হলেও 'বাবু'। উনিশ শতকের শেষার্ধে সরকার 'বাবু-বাহাদুর' নামক উপাধি চালু করলেও করতে পারেন। কিন্তু তার আগেই বাঙালি সমাজে 'বাবু' যে উপাধি বলে গণ্য হচ্ছে সম্ভ্রান্ত-শিক্ষিত মানী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তা স্পষ্ট। ১৮৬১ সালে কেশবচন্দ্র রায় কর্মকার সম্পাদিত অভিধান 'শব্দার্থ প্রকাশিকা' এ কারণেই 'বাবু' শব্দের সংস্কৃতমূল (বপ্র) উল্লেখ করে অর্থ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন— ক. ধনী ব্যক্তিদিগের উপাধি; খ. সুখভোগী, সুখাসক্ত।[৩৯] এই সময় সাধারণ বিলাসী ব্যক্তিরাও যেমন 'বাবু' হিসাবে আখ্যাত হচ্ছেন; তেমনি মান্য ব্যক্তিরাও, যাঁরা ধনীও বঠেন, তাঁরাও উপাধি-সদৃশ 'বাবু' যুক্ত হয়ে সমাজে বিশিষ্ট হয়ে উঠছেন। অর্থাৎ 'বাবু'কে খাতায়-কলমে তখনও পর্যন্ত উপাধি না বলা হলেও, লোকশ্রুতিতে 'বাবু' উপাধি বিশেষ এবং সম্ভ্রান্ত, ধনী, অভিজাতর পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্নে পরিণত হয়েছিল।

মাত্র একশো বছরের মধ্যেই একটি শব্দ তার আদি অর্থ থেকে বিবর্তিত হয়ে প্রথমে মান্য, সম্ভ্রান্ত, বিত্তবান, অভিজাত অর্থে (শব্দার্থের উৎকর্ষ) > পরে ব্যঙ্গ বা নিন্দার্থে (শব্দার্থের অপকর্ষ) > শিক্ষিত, ইংরেজি-নবিশ ভদ্রলোক অর্থে (শব্দার্থের উৎকর্ষ এবং সংকোচন) > সাধারণ কেরানি তথা চাকরিজীবী অর্থে (শব্দার্থের অপকর্ষ এবং বিস্তার) > পরিশেষে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক অর্থে (শব্দার্থের রূপান্তর) এসে থিতু হল। ভাষাবিজ্ঞানের শব্দার্থতত্ত্বে একটি শব্দের এত দ্রুত অর্থ পরিবর্তনের এ জাতীয় নজির নেই বললেই চলে। বঙ্কিমচন্দ্র যে বলেছিলেন, 'বাবু শব্দ নানার্থ হইবে',[৪০] তা যথার্থ।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৩ সালে কলকাতার 'বিষয়ী ভদ্রলোকের' যে খতিয়ান পেশ করেছেন,[৪১] তা অনুসরণ করলে বলা চলে, পলাশির যুদ্ধের পর থেকে উনিশ শতকের প্রথম দুই দশকের মধ্যেই কলকাতাস্থ এই সকল 'বিষয়ী ভদ্রলোকে'রা দেখা দিয়েছেন। পলাশি কাণ্ডের বহু পূর্বেই ১৬৯৮ সালে ডিহি কলকাতা-সুতানুটি-গোবিন্দপুরের জমিদারিসত্ত্ব লাভ করলেও তখনও পর্যন্ত ইংরেজ কোম্পানি বাণিজ্যিক

লাভ-লোকসানের ব্যাপারেই আগ্রহী ছিলেন। ফলে নিতান্ত ব্যাবসাবাণিজ্য বৃত্তিধারীরা ছাড়া দেশীয় মানুষজন সেদিন চিরাচরিত সামাজিক কাঠামোতেই নিশ্চিন্তে বাস করছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব কিংবা তাঁর প্রতিনিধিস্বরূপ নিয়োজিত জমিদারেরা তাঁদের কাছে অনেক বেশি মান্যতা পেতেন। গোবিন্দরাম মিত্রের মতন 'ব্ল্যাক জমিদারে'রা সেদিনের কলকাতায় বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম বলেই গণ্য হতেন। যাঁদের আর্থিক সংগতি ইংরেজদের সম্পর্কসূত্রে আসেনি, তাঁরা সকলেই ছিলেন সমাজে প্রতিষ্ঠিত, সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। ভুঁইফোঁড় 'বাবু'দের মতো অকারণ ও অপরিমিত বাবুয়ানি দেখিয়ে তাঁদের প্রতিষ্ঠা অর্জনের চেষ্টা করতে হয়নি বলেই ইংরেজদের হাত ধরে নতুন রূপে বিকশিত হয়ে ওঠা কলকাতার ইতিহাসে আঠারো শতকের প্রথমার্ধের ইতিহাস বাবু-সম্পর্কিত মিথের দেখা মেলে না। বাবুমিথের জন্ম আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং বিকাশ উনিশ শতক জুড়ে। কারণ এ সময় কোম্পানি আর নিছক ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানমাত্র নয়, প্রকারান্তরে বাংলা তথা সারা দেশেরই আর্থিক এবং শাসনতান্ত্রিক নিয়ন্তা হয়ে উঠেছেন। শাসিতেরাও এই সময় থেকেই নতুন শাসকের সঙ্গে সম্পর্কবন্ধন প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই পর্বেই নানান বিষয়কর্মে স্থানীয় মানুষেরা যুক্ত হতে থাকেন ইংরেজদের সঙ্গে। 'কলিকাতায় অধুনা যে সকল এ দেশীয় মান্য পরিবার বিরাজ করিতেছেন, ইহাদের প্রায় সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি ইংরাজদিগের আগমনের সঙ্গে আরম্ভ হয়,'[৪২] রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বক্তব্য আংশিক সত্য। ইংরেজদের সূত্রে পরবর্তীকালের মান্য পরিবার সমূহের উত্থান যথার্থ হলেও, এই ঘটনা ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয়নি, হয়েছে পলাশির ষড়যন্ত্রের সময় থেকে। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে কলকাতার মান্যগণ্য বিশিষ্টরা অধিকাংশই ছিলেন এই ষড়যন্ত্রের অংশীদার এবং সাধারণ অবস্থা থেকে 'বিশিষ্ট' হয়ে ওঠা ভুঁইফোঁড় 'আদিবাবু'র দল। তবে সকলেই 'বাবুত্বে'র পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেননি; ইংরেজ-প্রভুদের সঙ্গে কিংবা তাদের দেওয়ান-মুৎসুদ্দির সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে তাঁরা 'বিষয়ী' হয়ে উঠেছিলেন এইমাত্র। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কথিত 'বিষয়ী' ভদ্রলোকের এই মডেল নগর কলকাতার নিজস্ব, এর সঙ্গে অবশিষ্ট বাংলার 'বিষয়ী' ভদ্রলোকের জীবনযাপন প্রায় মেলে না বললেই চলে। নগর কলকাতার 'বিষয়ী ভদ্রলোকদের' চারটি স্তরে বিন্যস্ত করে ভবানীচরণ জানিয়েছেন—

'যাঁহারা প্রধান প্রধান কর্ম্ম অর্থাৎ দেওয়ানি বা মুচ্ছদ্দিগিরি কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া মুখ প্রক্ষালনাদি পূর্ব্বক বহুবিধ লোকের সহিত আলাপ করিয়া পরে তৈল মর্দন করিয়া থাকেন... স্নানক্রিয়া সমাপনান্তর পূজাহোমদান বলিবৈশ্ব প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া ভোজন করেন, কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিয়া অপূর্ব্ব পোশাক জামাজোড়া ইত্যাদি পরিধান করিয়া পালকী বা অপূর্ব্ব শকটারোহণে কর্ম্মস্থানে গমন করেন, কর্ম্মানুযায়ী কাল বিবেচনা পূর্ব্বক তৎস্থানে থাকিয়া গৃহে আগত হইয়া সে সকল বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া হস্তপাদাদি প্রক্ষালনান্তর গঙ্গোদক স্পর্শে পবিত্র হইয়া সায়ংসন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করিয়া জলযোগানন্তর পুনর্ব্বার বৈঠক হয়, পরে অনেক লোকের সমাগম হইয়া থাকে, কেহ কোন কর্ম্মোপলক্ষে কেহ-বা কেবল সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আইসেন অথবা তিনি কখন কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন ইত্যাদি।

'মধ্যবিত্ত লোক অর্থাৎ যাঁহারা ধনাঢ্য নহেন কেবল অন্নযোগে আছেন তাঁহাদিগের প্রায় ঐ রীতি কেবল দান বৈঠকি আলাপের অল্পতা আর পরিশ্রমের বাহুল্য।

'দরিদ্র অথচ ভদ্রলোক তাঁহারদিগের অনেক ঐ ধারা কেবল আহার ও দানাদি কর্ম্মের লাঘব আছে আর শ্রমবিষয়ে প্রাবল্য বড় কারণ, কেহ মুহরি কেহ মেট কেহ-বা বাজার সরকার ইত্যাদি কর্ম্ম করিয়া থাকেন,

বিস্তর পথ হাঁটিতে হয় পরে প্রায় প্রতিদিন রাতে গিয়া দেওয়ানজীর নিকট আজ্ঞা যে আজ্ঞা মহাশয় মহাশয় করিতে হয়— না করিলেও নয়, পোড়া উদরের জ্বালা।

'... ভগবানের কৃপাতে যাঁহারদিগের প্রচুরতর ধন আছে, সেই ধনের বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ হইতে কাহারো-বা জমিদারির উপসত্ব হইতে ন্যায্য ব্যয় হইয়াও উদ্বৃত্ত হয়। তাঁহারা প্রায় আপন আলয়ে থাকিয়া পূর্বোক্ত রীত্যনুসারে সন্ধ্যা বন্দনাদি পূর্ব্বক মধ্যাহ্নকালে ভোজন করিয়া প্রায় অনেকেই নিদ্রা যান চারি বা ছয় দণ্ড বেলা সত্বে আপন বিষয়ে দৃষ্টি করেন কেহ-বা পুরাণাদি শ্রবণ করিয়া থাকেন।'[৪৩]

ভবানীচরণের এই তালিকায় নিম্নবিত্তরা অনুপস্থিত, সম্ভবত 'বিষয়ী' হলেও সামাজিক বিচারে তাঁরা 'ভদ্রলোক' নয় বলেই। অন্যদিকে যথার্থ সমাজতাত্ত্বিকের মতো ভবানীচরণ উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্তরভেদ নির্দেশ করেছেন। নগর কলকাতার শ্রেণিকাঠামোয় উচ্চমধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত -এর দল তখন দেখা দিয়েছেন, যথাক্রমে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তর লক্ষ করলেই তেমনটি মালুম হয়। পরবর্তীকালের শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত 'বাবু'দের অনেকেই উঠে এসেছেন দ্বিতীয় স্তর থেকে; অন্যদিকে তৃতীয় স্তর থেকে জন্ম নিয়েছেন কেরানিবাবুরা। তালিকার সর্বোচ্চস্তরে রয়েছেন অবশ্যই দেওয়ানি কিংবা মুতসুদ্দিগিরি কর্মে নিযুক্ত ধনাঢ্যরা। লবণ, আফিম, রেশম ইত্যাদির দেওয়ানিসূত্রে এঁদের বিপুল উপার্জনের পথ প্রশস্ত হয় এই সময়েই। এমনকী কর্ণওয়ালিস ব্যক্তিগত মালিকানায় লাভজনক লবণের উৎপাদন বন্ধ করে, শ্বেতাঙ্গ এজেন্টদের হাতে নিমক মহলের দায়িত্ব তুলে দেওয়ার পরও এইসব কোম্পানি নিযুক্ত এজেন্টদের দেওয়ান হিসাবেও এইসব ধণাঢ্য দেশীয়রা তাঁদের অর্থ উপার্জনের পথ অটুট রাখতে সমর্থ হন। ভবানীচরণ স্বয়ং ডকেট কোম্পানির সাধারণ কর্মচারী থেকে প্রথমে সদর মেট, পরে উক্ত 'হৌসের' মুতসুদ্দি নিযুক্ত হন।[৪৪] অতএব বর্ণিত সামাজিক স্তরভেদ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল। আলোচ্য প্রথম তিনটি স্তর বা শ্রেণিকে তিনি 'কর্ম্মকারি বিষয়ী লোক' বলে নির্দিষ্ট করেছেন অর্থাৎ আর্থিক সুস্থিতির প্রয়োজনে এঁদের নানাবিধ বিষয়কর্মে নিযুক্ত থাকতে হত। অন্যদিকে, শেষ স্তর বা শ্রেণিকে তিনি 'অসাধারণ ভাগ্যবান লোক' বলেছেন, কারণ পিতৃপিতামহ সঞ্চিত ধন কিংবা চিরস্থায়ী ইত্যাদি বন্দোবস্তের ফলে করায়ত্ত জমির মালিকানা এঁদের অর্থের উৎস। ফলে নিষ্কর্মা হলেও এঁরা অর্থবান এবং সেকারণেই ভাগ্যবান। উনিশ শতকের বাবুরা অধিকাংশই এই 'অসাধারণ ভাগ্যবান লোকে'র শ্রেণিজাত। অর্থ সংস্থানের ব্যাপারে এঁদের পরিশ্রম করতে হত না, অর্থের জোগান বিষয়েও এঁরা খোঁজখবর রাখতেন না; নায়েব-গোমস্তাদের হাতে সেসব ভার তুলে দিয়ে এঁরা ইয়ারবকশিদের সঙ্গে নিশ্চিন্তে নরক গুলজার করতেন এবং অপরিমিত ব্যয় সামলাতে না পেরে প্রায়শই সর্বস্বান্ত হতেন। এঁদের অনেকেরই পূর্বপুরুষ কোম্পানি কিংবা কোম্পানির এজেন্টদের হৌসের দেওয়ান-মুৎসুদ্দি ছিলেন, কেউ ছিলেন আদিবাবুদের নায়েব-গোমস্তা। সৎ-অসৎ উভয় পথে উপার্জিত অর্থ এঁরা তিল তিল করে সঞ্চয় করেছিলেন। এঁদেরই অর্থকৃচ্ছ্রতার ফলস্বরূপ চতুর্থ শ্রেণিভুক্ত 'অসাধারণ ভাগ্যবান' লোকেরা দেখা দিলেন এবং 'হাপবাবু' কিংবা 'ফুলবাবু'ত্ব দেখাতে গিয়ে অচিরেই ফৌত হলেন।

এইসব 'অসাধারণ ভাগ্যবান লোকেদের' হাপবাবু কিংবা ফুলবাবু হয়ে ওঠার নিয়ম বা লক্ষণগুলিও নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল উনিশ শতকের গোড়াতেই। 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত 'বাবুর উপাখ্যান' (২৪.০২.১৮২১) 'সুখী মহাবাবু'র লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছে: 'ঘুড়ী তুড়ী জস দান আখড়া বুলবুলি মণিয়া গান। অষ্টাহে বনভোজন এই নবধা বাবুর লক্ষণ।'[৪৫] অর্থাৎ ধরে নেওয়া যেতে পারে, ১৮২১-এর মধ্যেই বাবুদের

দল এই বিশেষ বিশেষ আচরণ বা আসক্তিকে নির্বিশেষ সাধারণ ধর্মে পরিণত করেছেন। ইংরেজি-বাংলা সংবাদপত্রে এসব আচরণের নিন্দাও শুরু হয় এই সময় থেকে। হিন্দুদের প্রধান উৎসব দুর্গাপূজা বলে মন্তব্য করে 'ক্যালকাটা জার্নাল'-এ আয়োজক বাবুদের রুচির নিন্দা করা হয়েছে; বলা হয়েছে, 'these festivals impart an irresistible impulse to the progress and the inveteracy of immorality and vice; one half the money is expended in midnight revelry, in songs so obscene and filthy...'[৪৬] যদিও বাবুরা এসব নিন্দায় কর্ণপাত করেননি, বলাই বাহুল্য। অনেক সাহেবরাও এতদুপলক্ষ্যে এইসব 'obscene and filthy' নাচ-গানের আসরে উপস্থিত হতেন কিংবা বলা যায় তাঁদের জন্যই এইসব নাচ-গানের ব্যবস্থা করে বাবুরা ধন্য হতেন। ১৮২৫ সালে স্বনামধন্য বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদারের আয়োজিত দুর্গাপূজার 'স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত থাল, গাড়ু, ঘটি, বাটি ইত্যাদি সামগ্রী প্রস্তুত' হয়েছিল এবং 'গীত বাদ্য রোশনাই ও বাটীর সজ্জা'র আয়োজনেও ত্রুটি ছিল না, সেইসঙ্গে এসমস্ত উপভোগের জন্য 'কলিকাতা, ভবানীপুর, চুঁচুড়া, নপাড়া, চন্দননগর প্রভৃতি নানা দিগ্দেশীয় ব্রাহ্মণ ও কায়েস্থাদি এবং ইংরাজ প্রভৃতির নিকট নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইয়াছিল...।'[৪৭] এইরকমই একটি নাচের সভায় উপস্থিত শ্রীমতী ফেনটন নাচ, গান, অন্দরসজ্জা এবং আদবকায়দার সানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে বাবুদের রুচি-বিকৃতির নিন্দা করেছিলেন।[৪৮] শুধু পূজা উপলক্ষ্যেই নয়, বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানেও এ জাতীয় আমোদপ্রমোদের ঢালাও আয়োজন চলত। সঙ্গে আনুষঙ্গিক দোষ-গুণগুলি তো ছিলই। মিশনারি সংবাদপত্রগুলি প্রথম থেকেই বাবুদের এ জাতীয় ঘৃণ্য আচরণ এবং রুচির নিন্দা করে এসেছে। বিশেষ করে 'সমাচার দর্পণ' ১৮২১ সাল থেকেই ধারাবাহিকভাবে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করে বাবু এবং তাঁর বাবুত্বের নিন্দনীয় দিকগুলি তুলে ধরেছে। ১৮২২ সালের ১৬ মার্চ প্রকাশিত একটি চিঠিতে কলকাতা মহানগরীতে অনেক 'ভাগ্যবান লোকের' কারো কারো 'যুবা সন্তানেরা কুজন সহবাসে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মে প্রায় বিরত হইয়া নিন্দিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন, যেহেতুক কুশীল লোকেরা বিদ্যা ও ধনরহিত আপন ক্ষমতায় উদর পালন হয় না ইহাতে বয়ঃক্রীড়া কিরূপে চলে কেবল অনায়াসসাধ্য চুলকাটা পইতা খোটা লম্বা কাছা উড়ে কোঁচা করিয়া লম্পটাভিমানী হয়, তাহারা ইষ্টসিদ্ধির কারণ এবং বাবুর সহিত বয়স্যতার আলাপ দ্বারা সর্বদা সহবাস করিয়া প্রীতি জন্মায়, সুতরাং আহারাদি চিন্তা দূর হয়। বাবুরাও ঐ অসদালাপ দ্বারা ক্রমে ক্রমে ঐ পথবর্ত্তী হন। যেহেতু সংসর্গজা দোষগুণাভবন্তি ইত্যাদি' বলা হয়েছে।[৪৯] এই চিঠির প্রেরক সম্ভবত মিশনারিদেরই কেউ, কারণ সাধারণ মানুষ তখনও সংবাদপত্র পাঠ এবং পত্রপ্রেরণের অভ্যাস আয়ত্ত করতে পারেনি। কিন্তু বাবুত্ব অর্জনের ধরনধারণটি যে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল এই চিঠিটিই তার প্রমাণ। ফলে ১৮২৫-এ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'নববাবুবিলাস' গ্রন্থে যখন বাবুত্বের রূপ-লক্ষণ সম্পর্কে বলেন[৫০]:

মনিয়া বুলবুল আখড়াই গান,
খোষ পোষাকী যশমী দান,
আড়িঘুড়ি কানন ভোজন,
এই নবধা বাবুর লক্ষণ।

তখন বাবুদের বাবুত্ব অর্জনের এই নয়টি ধাপ যে সামান্য ইতর-বিশেষে সমাজ-মানসে পাকাপোক্ত রূপলাভ করেছে, তা বেশ বোঝা যায়। মুনিয়া প্রভৃতি পাখি পোষা, বুলবুল-লড়াইয়ের আয়োজন করা, আখড়াই গানের আসর বসানো, সদাসর্বদা আনন্দে কাল কাটানো, পোশাক-আশাকে বিশেষত্ব রক্ষা, যশস্বী

হওয়ার জন্য সৎ-অসৎ নানান কাজ করা, দানের ব্যাপারে উদারহস্ত হওয়া (সেও ওই যশ অর্জনের খাতিরেই), ঘুড়ি ওড়ানোর মতো 'মহৎ' কাজে অংশগ্রহণ এবং মূলত বাগানবাড়িতে ইয়ারদোস্ত, রক্ষিতাসহ খানাপিনার আয়োজন করা— এই নয়প্রকার কৃতকর্মের মধ্যে দিয়েই আদিতে 'বাবু'ত্ব অর্জিত হত।

বাবুদের পাখি পোষার এই শখটি দেখা দিয়েছিল বিশেষ সামাজিক তাগিদেই, নতুবা ভারতবর্ষে পাখি পোষার ব্যাপারটি বহুযুগ প্রাচীন। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে বাৎস্যায়ন তৎরচিত 'কামসূত্রমে' গৃহসজ্জা প্রসঙ্গে পাখি পোষার ব্যবস্থা রাখার কথা বলেছেন— 'তস্য বহিঃ ক্রীড়াশকুনিপঞ্জরাণি';[৫১] 'শুকসপ্ততি'তে বুদ্ধিমান শুকের আদরযত্নের ব্যবস্থাদির কথা আছে। মোগল সম্রাটদের অনেকেই ছিলেন পক্ষীপ্রিয়। বাবরের পোষা শিকারি বাজ ছিল বেশ কয়েকটি। এ ছাড়াও বিদেশি কাকাতুয়া, ম্যাকাও জাতীয় পাখিও ছিল মোগল অন্তঃপুরে। তবে পাখি পোষার এই শখটি ছিল অভিজাত মহল্লাতেই সীমাবদ্ধ। সাধারণ মানুষ তাঁদের সাংসারিক প্রয়োজনে হাঁস, তিতির, ঘুঘু, পায়রা প্রভৃতি পুষতেন, বাহারি পাখি পোষার নিষ্প্রয়োজন শখ তাঁদের ছিল না, সে সামর্থ্যও ছিল না। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ভুঁইফোঁড় বাবুরা সামাজিক দিক থেকে আভিজাত্য অর্জনের লক্ষ্যে আরও নানান উপাচারের মতো এই মূল্যবান শখটিকেও গ্রহণ করেন। পক্ষীবিশারদ পণ্ডিতের মতে, 'অনেক মাছপুষিয়ের এই সখে হাতেখড়ি হয় গোল্ড ফিশ দিয়ে। পাখিপোষার সখেও তেমনই প্রথমে বাড়িতে ঢোকে টিয়া, চন্দনা বা এক খাঁচা মুনিয়া পাখি। অন্তত পাঁচ ছ'জাতের মুনিয়া— তিলে মুনিয়া, সর মুনিয়া (লঞ্চুরা মালাবারিকা), শাঁখারী মুনিয়া, কালোমাথা মুনিয়া (লঞ্চুরা অ্যাট্রিক্যাপিলা), লাল মুনিয়া ও সবুজ মুনিয়া (আমাণ্ডাভা ফরমোসা) বিক্রি হত কলকাতার বিভিন্ন বাজারে— হাতিবাগানে এবং চড়ক-রথের মেলায়। সব জাতের মুনিয়ার মধ্যে লাল মুনিয়ার দাম আর কদর ছিল কিঞ্চিৎ বেশি।'[৫২] এইসব পাখির খাঁচা বা দাঁড়ও তৈরি করা হত রুপো কিংবা অন্য দামি ধাতু দিয়ে। কল্যাণী দত্ত জানাচ্ছেন, 'আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে কলকাতা শহরে প্রায় ঘরে ঘরে পাখি পোষার রেওয়াজ ছিল। বড়লোকের বাড়ির চিড়িয়াখানায় বিশাল ময়ূর, দুষ্প্রাপ্য ক্যানারি, নানা জাতের হাঁস, পায়রা থেকে শুরু করে ছোট মুনিয়া পর্যন্ত রংবেরঙের কতপাখি যে থাকত বলে শেষ করা যায় না। শৌখিন হলেই পাখির শখ থাকত।... গোঁফে গড়গড়া আর পাখিতে মিলে তবেই না বাবু!'[৫৩] বস্তুত পাখি পোষার মাধ্যমে বাবুর শৌখিনতা প্রমাণিত হত সমাজের কাছে; আর এ জাতীয় শৌখিন শখ বজায় রাখতে গেলে রীতিমত আর্থিক কৌলীন্যের প্রয়োজন; বাবুর যে তদ্রূপ অর্থকৌলীন্য রয়েছে তাও প্রমাণিত হত অতএব। এসব পাখির আহার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাবুরা প্রভূত অর্থ ব্যয় করতেন। কল্যাণী দত্তের লেখা থেকেই জানা যায়, সময়ের ফলফুলুরি তো ছিলই, কেউ কেউ পাখিকে গোলাপের কুঁড়ি খাওয়াতেন কেবল; কোনো কোনো পাখি দুপুরে লুচি এবং ক্ষীর খেতো; এ ছাড়া ডালিম, বেদানা, আখরোট, মনাক্কা, কিসমিস এসব আমদানি করা ফল ও শুকনো খাবার তো আছেই। বাঙালিবাবুরা মোছলমানের দোকানের বিস্কুট-পাঁউরুটিতে অভ্যস্ত হবার পর কেউ কেউ পাখিকে বিস্কুট কিংবা পাঁউরুটিতে মধু মাখিয়েও খেতে দিতেন। কোনো কোনো বাবু তাঁর বাবুত্বের প্রমাণ দিতে ঘটা করে পাখির বে' দিতেন, সেই বিয়েতে অতিথি-অভ্যাগতদের ঢালাও ভোজ দেওয়া হত। সাধারণ পাখি যেমন টিয়া, ময়না, ঘুঘু ইত্যাদি যেহেতু সেদিনের মধ্যবিত্তদের ঘরে হামেশাই দেখা যেত, ফলে বাবুরা অপ্রচলিত এবং দুর্লভ দেশি-বিদেশি পাখি যেমন লাল মুনিয়া, ক্যানারি, ম্যাকাও, কাকাতুয়া, ময়ূর প্রভৃতি পোষার মাধ্যমে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য এবং আভিজাত্য প্রদর্শন করতেন। বড়োলোক বাবুদের পাখিরা রুপোর তৈরি দাঁড়ে রুপো কিংবা সোনার সরু

শেকলে বাঁধা থাকত; ভালো ধাতু দিয়ে তৈরি খাঁচাও কেউ কেউ পাখি পুষতে ব্যবহার করতেন। আদিবাবুদের অনেকেরই পায়রা ওড়ানোর শখ ছিল। এই শখটি তাঁরা পেয়েছিলেন ক্ষয়িষ্ণু নবাবি ঐতিহ্যের সূত্রে। আগেকার কালে খবর আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে পায়রা ব্যবহৃত হত। মোগল বাদশাহ থেকে শুরু করে স্থানীয় নবাব সকলেই পায়রা পুষতেন, তার মধ্যে প্রশিক্ষিত পায়রারা অবশ্য স্বতন্ত্র থাকত। বলা বাহুল্য, সমস্ত প্রক্রিয়াটিই ছিল ব্যয়বহুল, অতএব ধনী লোক ছাড়া এইরকম অকাতরে অর্থব্যয় করা সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত। দেওয়ানি-বেনিয়ানি কিংবা দালালির সূত্রে অর্জিত টাকায় নববাবুরা তখন আঙুল ফুলে কলাগাছ। অতএব পাখি পোষার দামি শখে তাঁরা যে অকারণ অর্থব্যয় করবেন, এতে আর আশ্চর্য কী! কল্যাণী দত্ত সেই ঘটকীর কথা জানিয়েছেন, যে নাকি সম্বন্ধ করতে এসে বলেছিল,‘বাবুর বাড়ির কাকাতুয়ারা যা কিসমিস মোনাক্কা খায়, তাই কুড়িয়ে খেলে লোকের ছেলে মানুষ হয়ে যায়, নিশ্চিন্দি হয়ে মেয়ে দাও গো।’[৫৪]

পাখি পোষার এই দামি শখটি ক্রমে বাঙালি সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত বাবুমাত্রেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত জানিয়েছেন, অতিথি আত্মীয়স্বজন, আর্ত, আঁতুড়দের যেমন, তেমনি পশুপাখির সেবাকেও ‘ধৰ্ম্মকাৰ্য ও অবশ্য পালনীয় ব্রতরূপে’ নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালন করা হত।[৫৫] অবশ্য সে কেবল পায়রা, হাঁস, বটের ইত্যাদি পাখি, যাদের আহার্যের নিমিত্ত পালন করা হত এবং চন্দনা, টিয়া, ময়না ইত্যাদি কথাবলা দেশীয় পাখিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। দুর্লভ বাহারি পাখিদের যেসব বাবুরা পুষতেন, তার পিছনে ধর্মকৃত্যের কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, ‘বড়োমানুষি কবলানোই’ ছিল আসল লক্ষ্য। অবশ্য আদিবাবুরা পাখি পোষার ক্ষেত্রে যে বাড়াবাড়ি রকম অর্থব্যয় করতেন, পরবর্তীকালের বেতনভোগী বাবুদের সে সামর্থ্য ছিল না, তবে পাখি পোষা হয়ে উঠেছিল একপ্রকার স্ট্যাটাস-সিম্বল। এমনকী বারবণিতার কাছে মন পেতেও যে বাবুদের বাহারি দামি পাখি উপহার দিতে হত, কালীঘাটের পটুয়ারা সেসব স্মৃতি অমর করে রেখেছেন। ‘হরি ঘোষের গোয়াল’ (১২৯২ বঙ্গাব্দ) প্রহসনের নায়িকা জ্ঞানদা পাখির খাঁচার সামনে বসে বলেছে— ‘হে বুলবুল, হে নাইটিঙ্গেল! আজ আমি তোমার ব্রত করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হয়ে আমার গণ্ড সিন্দুরের মতো করিয়া দাও, কারণ তুমি অনেক সিন্দুর রঙের তেলাকুচা খাইয়া থাক।... তোমার স্বরের মতো আমার স্বর করিয়া দাও। তাহা হইলে আমি সমাজে বসিয়া মধ্যে মধ্যে পিউ পিউ করিতে পারি।... তোমরা উনিশ শো শতাব্দীর ব্রতের খবর কি রাখবে? তবে আজকালকার ব্রতের নাম শুনবে? তবে শোন— নাইটিঙ্গেল ব্রত, কার্পেন্টার ব্রত, ওয়াসারম্যান ব্রত, বার্ব্বর ব্রত।’ লক্ষণীয় পাখির খাবার এখানে খোয়া-মনাক্কা থেকে তেলাকুচোয় নেমে এসেছে। বাবুদের আর্থিক সমৃদ্ধি যতই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, ততই তার শখ-আহ্লাদের মাত্রাতেও লাগাম পড়ছে। তবুও, সেকালের সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত বাবুদের ঘরে আদিবাবুদের মতো জাঁকজমক না করে হলেও পাখি পোষা হত। রাজনারায়ণ বসু তাঁর ‘আত্মচরিতে’ হেয়ার স্কুলের সহপাঠী বন্ধু বাবু নীলকমল মিত্রের এলাহাবাদের বাড়িতে প্রকাণ্ড এক কাকাতুয়া পাখি দেখেছিলেন, যে সবসময় রেগেই থাকত।[৫৭] রামমোহনের নাতি প্যারিমোহনের শখের চিড়িয়াখানায় ছিল শ’য়ে শ’য়ে কাকাতুয়া; অন্যদিকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বাবুদের অনেকেরই ছিল পাখি পোষার শখ-শৌখিনতা। গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আরও অনেক পাখির সঙ্গে ছিল দুষ্প্রাপ্য গোলাপি কাকাতুয়া; মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ‘দক্ষিণের বারান্দা’য় জানিয়েছেন, তাঁর দাদামশাই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘পালে পালে পাখি কিনে’ খাঁচায় ক’দিন পুষে তাদের ছেড়ে দিয়ে আনন্দ করার কথা।[৫৮]

সেকালে রথের মেলা কিংবা চড়কপূজার সময় পাখি মিলত হরেকরকম। সে সবই প্রায় সংগ্রহ করতেন শৌখিন বাবুরা। তবে বিত্তবান বাবুদের জন্য পাখি কেনা বেচার স্থায়ী ঠিকানা ছিল হাতিবাগানের পাখির বাজার। সাহেবদের যেমন ছিল বাগানের শখ, 'বাবু'দের তেমনি পাখি পোষার শখ। মনে রাখা প্রয়োজন, পাখি পোষার এই শখ বিদেশি সাহেব-সান্নিধ্যের ফল নয়। এই শখের মূল নিহিত ছিল দেশীয় ঐতিহ্যের মধ্যেই। মোগল বাদশাহ এবং শাসক নবাবদের হাতে এই শখ কালানুযায়ী আভিজাত্য অর্জন করে। কিন্তু প্রথমাবধি এই শখ ছিল বিত্তবান কুলপতিদেরই একচেটিয়া। উনিশ শতকের প্রথম থেকেই ক্ষয়িষ্ণু নবাবিয়ানার প্রতীক বাবুরা ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম-কাম-মোক্ষের যে নানা পথ অনুসরণ করেছেন, তা ছিল সাহেবিয়ানা-মুক্ত; অর্থকরী ব্যাপার ছাড়া প্রথম দিকে 'বাবু'রা সাহেবদের কাছ থেকে নীতি-নৈতিকতা বা রুচির পাঠগ্রহণ করতে চাননি বলেই মনে হয়, বরঞ্চ সাহেবদের অনেকেই 'বাবু'দের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের অনুকরণ করে নিজেরাই 'বাবু' বনে গিয়েছিলেন। বস্তুত, নতুন নাগরিক সংস্কৃতির প্রথমোদগমের দিনে পাখি পোষার শখ-শৌখিনতা এবং তার সাহায্যে নিজের অর্থবিত্তসম্পদের গৌরব প্রতিষ্ঠার ছকটি বিগতকালের ক্ষয়িষ্ণু নবাবিয়ানার স্মারক। আদিবাবুদের 'বাবুত্ব' প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে সাহেবরা নয়, নবাবরাই হয়ে উঠেছিলেন অনুসরণের আদর্শ।

একই কথা প্রযোজ্য বাবুদের বুলবুল-বিলাস প্রসঙ্গে। 'নববাবুবিলাসে'র খলিফা বাবুত্ব অর্জনের উপায় প্রসঙ্গে নববাবুকে 'বুলবুল' পোষার কথা বলেছে। আদিবাবুদের অনেকেরই ছিল এই শখ। পোষা বুলবুলকে রীতিমত শিক্ষা দিয়ে 'তয়ের করে' প্রতি শীতকালে লড়িয়ে দিয়ে হত 'বুলবুলাস্য পক্ষির যুদ্ধ'। কোথাও কোথাও পোষা মুনিয়া পাখিদেরও লড়াইয়ে নামানো হত। 'সমাচার দর্পণ' থেকে জানা যায়, 'বুলবুল লড়াই মনিয়া লড়াই আখড়া গান এতন্নগরে বহুকালাবধি হইতেছে।'[৫৯] তবে এ লড়াইয়ের সূচনা কবে কীভাবে হয়েছিল সে সম্পর্কে নিশ্চয় করে কিছু বলা সম্ভব নয়। 'পুরাতন প্রসঙ্গে' বিপিনবিহারী গুপ্ত লিখেছেন, 'প্রতি বৎসর শীতকালে ছাতুবাবুর মাঠে যে বুলবুলির লড়াই হইত, তাহা আমাদের দেশীয় নবাবি আমল হইতে চলিয়া আসিতেছিল, আজ তাহার স্মৃতিটুকু পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।'[৬০] এর থেকে কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে,[৬১] ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইউরোপীয় পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের সূত্র ধরে মোগল সম্রাট এবং শাসক নবাবদের মধ্যে এই শখ এসে থাকবে। জাহাঙ্গির হাতির লড়াই দেখতে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর পিতা আকবরের শখ ছিল নিজের হাতে পশুদের শিকারের জন্য প্রস্তুত করার। তাঁর নিজের সংগ্রহে ছিল হাজারখানেক চিতা। যুদ্ধের প্রয়োজনে হাতি, ঘোড়া, উট প্রভৃতি যেমন রাখা বাধ্যতামূলক ছিল মোগল শাসকদের, তেমনি হরিণ, ভেড়া প্রভৃতি নিরীহ প্রাণী এবং পায়রা, তিতির প্রভৃতিদেরও পালন করা হত খাদ্য ও অন্যান্য কারণে। সম্রাটদের অধীন নবাবদেরও নির্দিষ্ট সংখ্যায় হস্তিযূথ ইত্যাদি রাখতে হত। সম্ভবত অবসরে এইসব পশু-পাখিদের লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করিয়ে নবাবেরা যেমন তাঁদের সুপ্ত যুদ্ধভাবনার পরিপোষণ করতেন, তেমনি পশু-পাখিদের লড়াইয়ে নামিয়ে দিয়ে যুদ্ধবাজ হিসাবে তাদের প্রস্তুত করতেন। তবে পশু-পাখিদের লড়াইয়ের ব্যাপারটি ইউরোপ-আগত, এমন মনে করায় সংশয় জাগে। আমাদের দেশে লোকায়ত জীবনে বনচর মানুষেরা অনেকেই পশু-পাখি পুষতেন এবং তাদের দিয়ে নানান ক্রীড়াকৌতুক প্রদর্শন করতেন। বেদেদের দল ভ্রাম্যমান জাতি হিসাবে নগরে নগরে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে পশু-পাখিদের দিয়েও নানান অদ্ভুত অদ্ভুত খেলা প্রদর্শন করে বেড়াতেন। এসবই বাদশাহ-নবাবদের আকৃষ্ট করে থাকবে। উত্তরকালে বাবুরা নবাবি ঐতিহ্যের স্মৃতিবাহী পাখির লড়াইকে

গ্রহণ করেন। সম্ভবত নতুন নগরজীবনে হিংস্র পশু প্রতিপালন এবং যুদ্ধশিক্ষা দেওয়া অসম্ভব ছিল বলেই বাবুরা সহজতর এবং তুলনায় অতি অল্প ব্যয়সাপেক্ষ বুলবুল প্রভৃতি পাখির লড়াইয়ের দিকে ঝোঁকেন।

বুলবুল লড়াইয়ে সবচেয়ে নাম করেছিলেন, রামদুলাল দে'র পুত্র আশুতোষ দেব ওরফে সাতুবাবু। পরবর্তীকালে অনাথবাবুর বাজার, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার গড়ে ওঠে যে প্রকাণ্ড মাঠটিতে, ওই মাঠটি ছিল সাতুবাবুর সম্পত্তি। প্রতি শীতকালে সাতুবাবুর সঙ্গে অন্যান্য বাবুদের লড়াই হত। বিপিনবিহারী গুপ্ত পূর্বোক্ত রচনায় জানিয়েছেন, 'শীতকালে সেই মাঠে খুব ধুমধামের সহিত বুলবুলির লড়াই হইত। অনেক তাঁবু পড়িত। পোস্তার রাজা নরসিংহ দেড়শত শিক্ষিত বুলবুলি লইয়া আসিতেন, সাতুবাবুও দেড়শত বুলবুলি আনিতেন। উভয় দলের মাঝখানে কিছু খাদ্যদ্রব্য ছড়াইয়া দেওয়া হইত, সেই খাবার লইয়া তাহাদের লড়াই বাঁধিয়া যাইত। লড়াইয়ে হারিয়া গেলেই পাখি উড়িয়া যাইত, অমনি অন্যদলের লোকেরা উল্লাসে চিৎকার করিয়া উঠিত। ''বো মারা''।'[৬২] অবশ্য প্রতিবারেই যে পোস্তার রাজার সঙ্গে সাতুবাবুব 'বুলবুলাস্য পক্ষির যুদ্ধ' হত এমন নয়; ১৮৩৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সমাচার দর্পণ' থেকে জানা যায়, ২৬শে জানুয়ারি তারিখে সাতুবাবুর বুলবুলের দলের সঙ্গে লড়াইয়ে নামে 'শ্রীযুত বাবু হরনাথ মল্লিকের একদল পক্ষী।'[৬৩] হরনাথ মল্লিক ছিলেন বড়োবাজারের প্রাচীন সম্ভ্রান্ত সুবর্ণ বণিক পরিবারের সন্তান। এঁদের জাতিগত পদবি ছিল 'দে'। মুসলমান সরকার কর্তৃক এঁরা মল্লিক উপাধি প্রাপ্ত হন।[৬৪] এঁরা পূর্বে সপ্তগ্রামে বাস করতেন, পরবর্তীকালে কলকাতায় স্থানান্তরিত হন। কলকাতার আদিপর্ব থেকে যে কয়টি সম্ভ্রান্ত প্রাচীন পরিবার এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন, তাঁদের মধ্যে মল্লিক পরিবার অন্যতম। হরনাথ মল্লিকের পিতা রামমোহন মল্লিক মহাজনি কারবার করে বিপুল সম্পত্তির মালিক হন। এ ছাড়া উত্তরাধিকার সূত্রেও বিস্তৃত সম্পত্তি পেয়েছিলেন। হরনাথ পিতার জীবিতকালেই ১৮৪৮ সালে মারা যান। তিনি তাঁর জীবিতকালেই বাবুয়ানির জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন। পোস্তার রাজার সঙ্গে এঁদের বংশের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। এঁর সঙ্গে অনেকবার সাতুবাবুর বুলবুলের লড়াই হয়েছিল। এইসব লড়াইয়ে মধ্যস্থতা করতেন এবং জয়-পরাজয় নির্ধারণ করতেন তৃতীয় পক্ষের কোনো সম্ভ্রান্ত বাবু। উল্লিখিত লড়াইয়ে যেমন মধ্যস্থতা করেন শ্রীযুত মহারাজ বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর এবং 'দুই প্রহর দুই ঘণ্টার পর মল্লিক বাবুর পক্ষ পক্ষি পরাজিত হইলে সভা ভঙ্গ' হয়।[৬৫] আশুতোষ দেবের মৃত্যুর পর কোনো কোনো বাবু এই শখটিকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। ৬ মাঘ ১২৫৯ বঙ্গাব্দের 'সংবাদ প্রভাকর' থেকে জানা যায়,[৬৬] সিমুলিয়ার বাবু দয়াল চাঁদ মিত্র এবং জোড়াসাঁকোর রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায় বিগত তিন বছর ধরে 'শীতকালে বুলবুলি পক্ষি সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহারদিগের যুদ্ধ দ্বারা আমোদপ্রমোদ করিয়া থাকেন,... পক্ষী আনয়ন করত সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন এবং তদুপলক্ষে অনেকানেক মনুষ্য প্রতিপালন করিয়া থাকেন।' বাবুরা বুলবুল পাখি নিয়ে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবেন এবং সে আমোদ কেবল নিজেরাই উপভোগ করবেন, এমনটি হবার নয়; তা করলে আনন্দ যেমন মাটি, তেমনি মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ এবং অন্যান্য লোকের উপস্থিতিতে বাবু এই লড়াইয়ে জয়ী হলে সামাজিক প্রতিপত্তির যে ব্যাপারটি নিশ্চিন্ত হত, তাও হয় না। বাবুর বাবুত্বের 'যশঃ সৌরভ' দিগবিদিকে ছড়িয়ে না পড়লে বাবু-জন্মই বৃথা। অতএব বুলবুল-লড়াইকে কেন্দ্র করে আয়োজক বাবু আমন্ত্রিত নিমন্ত্রিত এবং অনাহূতদের আদর-আপ্যায়ণে প্রভূত অর্থ ব্যয় করতেন। 'সংবাদ প্রভাকর' পূর্বোক্ত সংবাদে জানিয়েছেন, 'এই সামান্য সংগ্রাম সন্দেশনার্থ কলিকাতাস্থ যাবতীয় ধনাঢ্য ব্যক্তি একত্রীভূত হইয়া স্বীয় পুত্র পৌত্র দৌহিত্র অমাত্যবর্গকে সমভিব্যাহারে

লইয়া উপস্থিত হইয়া থাকেন।... এই সূত্রে সংবাদ করিবা মাত্র সহস্র কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলে অতি প্রত্যূষে প্রাণপণ যত্নে প্রাত্যহিক ক্রিয়া সমাধা করিয়া সভায় কিঞ্চিৎ স্থান প্রাপ্ত হওনাভিলাসে সত্বর হইয়া আগমন করেন এবং ইহাতে কেহ উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত স্থান বিবেচনা করেন না।'[৬৭] কোনো কোনো বাবু তাঁদের রক্ষিতাকেও নিয়ে যেতেন এই উপলক্ষ্যে। বুলবুল লড়াইয়ের আসরে সেইসঙ্গেই উপস্থিত থাকতেন এমন অনেক লোক, 'সমাচার দর্পণে'র ভাষায়,[৬৮] 'তাঁহারদিগকে তদ্বিষয়ে আহ্বান করিতেও হয় নাই যেহেতুক তাঁহারা সোয়াকীনরূপে খ্যাত অর্থাৎ তদ্বিষয়ঘটিত সুখে মহাসুখী হন।' সুতরাং বুলবুল-লড়াই উপলক্ষ্যে 'বাবু' সমাজের নানান স্তরের মানুষদের একত্রিত করতে পারতেন; বিপুল ব্যয় করে নিজের আর্থিক প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন, সেইসঙ্গেই একজন প্রধান 'বাবু' হিসাবে সমাজের কাছে নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। মূলত এই বিশেষ উদ্দেশ্যেই বাবুদের 'বুলবুলাস্য পক্ষীর যুদ্ধে'র আয়োজন।

কলকাতায় আদিবাবুদের হাত ধরে যে বুলবুল লড়াইয়ের রমরমা একদিন দেখা গিয়েছিল, নতুন রুচি ও শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোয় আলোকিত পরবর্তী বাবুরা তা প্রত্যাখ্যান করায় হারিয়েও গেল ধীরে ধীরে। পাখি পোষার শখ পরিশোধিত আকারে পরবর্তী বাবুরা গ্রহণ করলেও, আর্থিক সংস্থানের অভাবেই ব্যয়সাধ্য বুলবুল-লড়াই কলকাতার স্মৃতি থেকে মুছে গেল একেবারে। বিত্তবান অভিজাতদের আয়ের উৎস যত রুদ্ধ হয়েছে, অকর্মণ্য বংশজদের হাতে সঞ্চিত অর্থ যত নিঃশেষিত হয়েছে, ততই রুদ্ধ হয়েছে বুলবুল— লড়াইয়ের মতো তুলনায় নিম্নরুচির, ব্যয়বহুল বিনোদনের অগ্রগতি। পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী মানুষেরা তখন এ জাতীয় সামাজিক সম্মেলনের বদলে সভা-সমিতি স্থাপনের হুজুগে মেতে উঠেছে। ভুঁইফোঁড় বড়োলোকেরাও সে হুজুগে সামিল হতে দ্বিধা করেনি। ফলে প্রান্তিক ক্ষেত্রগুলিতে লোকায়ত জীবনে বুলবুল লড়াই আরও কিছু কাল প্রচলিত থাকলেও শেষ পর্যন্ত এই শখটিই প্রান্তিক হয়ে পড়ে এবং হারিয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার কিছু অঞ্চলে এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুরে বর্তমান সময়েও বুলবুল-লড়াই ছোটো করে হলেও প্রচলিত আছে।[৬৯]

এদেশে প্রাচীনকাল থেকেই রাজারাজড়ার দরবার ছিল সংগীতচর্চার অন্যতম প্রধান আশ্রয়স্থল। শাস্ত্রীয় এবং অশাস্ত্রীয় তথা লৌকিক উভয়প্রকার সংগীতেরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাঁরা। মোগল আমলে শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। আকবরের রাজত্বকালে তানসেন এদেশীয় ধ্রুপদের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের সুরধারার সংমিশ্রণে উত্তর-ভারতীয় তথা হিন্দুস্তানি রীতির জন্ম দেন।[৭০] বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের 'সেনী' ঘরানার বিকাশও এই সময়ের ঘটনা। ইতিপূর্বে অবশ্য মার্গরীতি-আশ্রয়ী অর্থাৎ দশ লক্ষণযুক্ত ও নিয়মসম্মত আভিচারিক গান বাংলায় প্রবেশ করেছিল সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর মধ্যেই। চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের নানারূপ রাগরাগিণী ও তালবাদ্যনির্দিষ্ট গান সে কথাই প্রমাণ করে। অন্যদিকে লক্ষ্মণসেনের রাজসভার কবি জয়দেব উত্তর ভারতীয় মার্গসংগীতের সঙ্গে মিশিয়েছেন দক্ষিণী রীতির সুর-তাল-ফাঁক, সম্ভবত পৃষ্ঠপোষক সেনরাজাদের দক্ষিণী হওয়ার কারণেই। পরবর্তীকালে মোগল আমলে বাদশাহের তরফে যেসব নবাব, আমির-ওমরাহ্ বাংলায় শাসন সংক্রান্ত কাজে আসতেন, তাঁরাও বয়ে নিয়ে এলেন নবাবি-সংস্কৃতি এবং শাস্ত্রীয় সংগীত। তাঁদের ছোটো-বড়ো সভাগৃহ সংগীতচর্চায় অন্যতর ইন্ধন জোগাল। এতৎসত্ত্বেও বলা যায়, বাংলায় অবিমিশ্র শাস্ত্রীয় সংগীতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা সম্ভবত কোনোকালেই ছিল না। বাংলার নিজস্ব 'বিষ্ণুপুরী ঘরানা'র চর্চা ও প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল। তুলনায় বিশুদ্ধ দেশি তথা অশাস্ত্রীয় লৌকিক গানের চর্চা এ বঙ্গে ব্যাপকভাবে হয়েছে। চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত

একদিকে যেমন ভক্তিধর্মের প্রভাবে ভারতের নানাস্থানে সাংগীতিক ভজন তথা কীর্তনের প্রসার ঘটে, তেমন এ বঙ্গেও শাস্ত্রীয় রীতিকে অবলম্বন করে চৈতন্য-উত্তরকালে কীর্তনরীতির বিভিন্ন ঘরানা বাংলাদেশের সংগীতকলায় নতুন বেগ দান করে। পাশাপাশি লোকায়ত গ্রামীণ সমাজে ঝুমুর, ধামালি, ভাদু, টুসু, বাউল, নাথযোগীদের দেহতত্ত্বমূলক গান লৌকিক ও ধর্মীয় নানা প্রসঙ্গে গাওয়া হত। বস্তুত উচ্চকণ্ঠে সম্মেলক গান গাওয়া অতি প্রাচীন ও বহুপ্রচলিত সামাজিক প্রথা।[৭১] বাংলার গ্রামভিত্তিক সমাজজীবনে গোষ্ঠীপতি প্রমুখেরা এসবের রসাস্বাদন করতেন নিশ্চয়ই। শাস্ত্রীয় সংগীত থেকে বহুদূরবর্তী এসব গানে প্রসঙ্গ হিসাবে যেমন থাকত নানান ধর্মীয় প্রসঙ্গ, তেমনি গুরুত্ব পেত উগ্র আদিরসের বিষয় ও শব্দাবলী। লঘু চপল চটুল এসব গানের প্রবাহে পৃষ্ঠপোষক ব্যক্তিবর্গ ভেসে যেতেন সন্দেহ নেই।

উনিশ শতকে কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে নতুন নাগরিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, তার পৃষ্ঠপোষক 'বাবু'রাও পরিবর্তিতভাবে সেই চপল চটুল লঘুরসের সংগীতকে সাদরে ফিরিয়ে আনলেন। এ জাতীয় সংগীতে বিষয় হিসাবে আদিরস-মান-বিরহ গৃহীত হল, অশ্লীল-ইঙ্গিতপূর্ণ 'ননদী এবং দেওরা' ব্যবহৃত হল, কিন্তু একইসঙ্গে নানাপ্রকার রাগরাগিণী ব্যবহৃত হয়ে গানের গায়কী পদ্ধতিতেও ব্যাপক পবির্তন এল। 'আখড়াই' নামক এই প্রকার গান থেকেই কলকাতার নিজস্ব 'বৈঠকী গানে'র সূচনা ঘটল বলা যায়।[৭২]

নগর কলকাতার 'বাবু'রা আদিতে যে আখড়াই গানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তার জন্ম সম্ভবত নদীয়া-শান্তিপুর অঞ্চলে। ইতিহাসের বিচারে পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য না হলেও, গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্যের মতে[৭৩] শান্তিপুর ও ফুলিয়ার দু'টি 'সংগীত সংগ্রামের আখড়া' থেকে আখড়াই গানের সূচনা হয়। প্রথমদিকে এইসব গানের বিষয় ছিল রাধাকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গ। কালক্রমে রুচির পরিবর্তন ঘটায় এই আখড়াই সংগীত সংগ্রাম থেকে কবিগানের জন্ম হয়। আবার, কবিগানের অনুকরণে 'সাধারণ অশিক্ষিত স্বভাবকবি মুসলমানগণ আবার একটি নূতন' সংগীত-সংগ্রামের দল করে; এই গায়কিকে বলা হত 'তর্জ্জার লড়াই'। পরবর্তীকালে 'উক্ত তিন প্রকারের (অর্থাৎ আখড়াই, কবি ও তর্জার) ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া শিক্ষিত ভদ্রবংশীয় যুবক ও প্রৌঢ়গণ' কৃষ্ণলীলার প্রাধান্য কমিয়ে 'তাল মান লয়াদি' নিয়ে মেতে ওঠেন। শান্তিপুরের এই তালমানলয়বিশিষ্ট আখড়াই বাণিজ্যকেন্দ্র সপ্তগ্রামে প্রচলিত হয়। বাণিজ্যনগরী সপ্তগ্রামে তখন পুঁজিপতি, বণিক, বিত্তবান ব্যবসায়ী প্রমুখের বাস। প্রধানত তাঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় 'খেউড় ও প্রভাতী' সম্বলিত আখড়াই গান বিষয়গতভাবে ধর্মের আবরণ ঘুচিয়ে ফেলে সম্ভবত এই সময়েই। অতঃপর 'ভাগীরথীর দেহ ক্ষীণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সপ্তগ্রাম হইতে বাণিজ্যকেন্দ্র হুগলি চুঁচুড়াতে সরিয়া আসিল... আখড়াই সংগীত সংগ্রাম ধনীর সেবনীয় হইয়া চুঁচুড়ায় আসিয়া আসন পাতিল। ভাগীরথী তথায়ও ক্ষীণ হওয়াতে বাণিজ্যকেন্দ্র কলিকাতায় চলিয়া আসিবার কালে সহচর সংগীত সংগ্রামাদিও কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল।'[৭৪]

ঈশ্বর গুপ্তের 'কবিজীবনী'তে গঙ্গাচরণের বক্তব্যের আংশিক সমর্থন মেলে। গুপ্তকবি জানিয়েছেন, 'সর্বাগ্রে শান্তিপুরস্থ ভদ্র-সন্তানেরা আখড়াই গাহনার সৃষ্টি করেন, ইহা প্রায় (১৫০) দেড়শত বৎসরের ন্যূন নহে।'[৭৫] তাঁর মতে, শান্তিপুরেই আখড়াই গান থেকে ধর্মীয়ভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় এবং 'রচকেরা অতিশয় অশ্রাব্য কদর্য্য বাক্যে' যেসব গান রচনা করতেন, তা শুনেই সকলে আনন্দ পেত। তবে প্রথম দিকে 'যন্ত্রের বিশেষ বাহুল্য এবং সুরের তাদৃশ পারিপাট্য ও আধিক্য ছিল না।' আখড়াই গানে পরবর্তীকালে যন্ত্র ব্যবহারের যে বাহুল্য দেখা যায়, তার সূচনা চুঁচুড়ায়। ঈশ্বর গুপ্তের মতে, এঁরা হাঁড়ি, কলসী প্রভৃতি ২২

খানা যন্ত্র বাজাতেন বলে 'তাবতেই চুঁচুড়ার দলকে ''বাইসেরা'' বলিতেন।' প্রথম দিকে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারে দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের প্রাধান্য ছিল। পরবর্তীকালে বৃন্দবাদনে ঢোল এবং বেহালা— এই দুই প্রকার বাদ্যযন্ত্রকে মুখ্য বলা হয়েছে।[৭৬] সম্ভবত পর্তুগীজদের সঙ্গে দীর্ঘ বসবাসের সূত্রে দেশীয় বাদনরীতির মধ্যে বিদেশি বাদনযন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত হয়। সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের এই ছোট্ট ঘটনায় সুদূরপ্রসারী সামাজিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য লুকিয়ে আছে। এমনকী সম্মেলক বৃন্দবাদনের প্রসঙ্গটিও, ইউরোপীয় Concert-এর দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। কারণ, যে 'অদ্বিতীয় সংগীতজ্ঞ' কুলুইচন্দ্র সেন 'আপন ক্ষমতা ও শক্তিদ্বারা পুরাতন বিষয়ের কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তন করতে অনেকে নূতন সৃষ্টি করেন' এবং 'সুর ও গীতকে নানা প্রকার রাগরাগিণীতে যুক্ত করতে নূতন নূতন বাদ্যের সূচনা করিয়াছিলেন।'[৭৭] তিনি ছিলেন কলকাতায় আখড়াইগানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রাজা নবকৃষ্ণ দেবের পক্ষপুষ্ট। পলাশির যুদ্ধের পরবর্তীকালে হেস্টিংসের বদান্যতায় নবকৃষ্ণের উত্থান এবং ১৭৮০ সাল নাগাদ সম্ভ্রান্ত 'বাবু' হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠিত। ১৭৯৭ সালে নবকৃষ্ণের মৃত্যু হয়। যদি ধরে নেওয়া যায়, তার বছর কুড়ি আগে থেকেই কুলুই চন্দ্র প্রমুখেরা তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে এসেছেন, তথাপি ১৭৭৭ সালের আগে তা নয়। কলকাতায় বৃন্দবাদন বা Concert-এর ব্যাপারটি শুরু হয় ১৭৪৮ সাল নাগাদ ট্যাভার্ন কালচার শুরু হবার পর। ১৭৮০ সাল নাগাদ ট্যাভার্ন কালচারের রমরমা তো সুবিদিত। অতএব নবকৃষ্ণ প্রমুখের মতো আদিবাবুরা যদি সাহেবদের সূত্র ধরে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতরূপে দেশীয় সংগীতের রস উপভোগের আয়োজন করেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। অবশ্য এই প্রভাব নিতান্ত বহিরঙ্গগত। প্রকৃত অর্থে আখড়াই গান দেশীয় ঐতিহ্যের শেকড়টাকে সযত্নে রক্ষা করে চলেছিল; আদিবাবুদের সভাগৃহে এ কারণে তার সাদর অভ্যর্থনা।

আদিবাবুদের মধ্যে বড়োবাজার-নিবাসী কাশীরাম দাসই সম্ভবত কলকাতায় আখড়াই সংগীত সংগ্রামের প্রথম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বৎসরে দুই-একবার ফুলবাগানস্থ বাগানবাড়িতে কাশীনাথবাবু এই সংগীত সংগ্রামের আসর বসাতেন।[৭৮] কাশীনাথ দাস অবশ্য নবকৃষ্ণের মতো ভুঁইফোঁড় ধনী ছিলেন না। কাশীনাথের পিতামহ ঘাসিরাম ছিলেন সম্রাট শাহ্‌জাহানের দেওয়ান। লাহোরনিবাসী, জাতিতে ক্ষেত্রী ঘাসিরামের পুত্র মুলুকচাঁদ পিতার মৃত্যুর পর বিপুল সম্পত্তি নিয়ে ব্যাবসাবাণিজ্যের সূত্রে প্রথমে মুর্শিদাবাদ এবং পরে কলকাতায় বসবাস করতে থাকেন। এঁর পুত্র কাশীরাম প্রথম যুগে ক্লাইভের দেওয়ান হিসাবে কিছুদিন কাজ করেন, পরে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এবং ভারতের অন্যান্য অংশের বহু রাজা ও ধনী ব্যক্তির কলকাতাস্থ প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে থাকেন। ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে 'কাশীজুড়া'র রাজার সঙ্গে বিরোধের সূত্রে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে তাঁর বিবাদ বাধে এবং হেস্টিংস তাঁর পক্ষ অবলম্বন করেন। এই মামলা উপলক্ষ্যে ১৭৮০-র মার্চ মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে কলকাতাস্থ সুপ্রিম কোর্টের অধিকার বিষয়ে নতুন আইন হয়।[৭৯] সুতরাং, কাশীরাম শুধুমাত্র যে অভিজাত এবং বিত্তবান ছিলেন তাই নয়, যথেষ্ট ক্ষমতাশালী না হলে হেস্টিংস তাঁর পক্ষ অবলম্বন করতেন না। নবকৃষ্ণের সময়কালেই কাশীনাথ ঈর্ষণীয় সামাজিক সম্মানের অধিকারী হন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, গোবিন্দরাম মিত্রের পুত্র রাধাচরণ মিত্রের ফাঁসির হুকুম রদের প্রতিকূলে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার সম্ভ্রান্ত অধিবাসীরা যে আবেদনপত্র ইংল্যান্ডের রাজার কাছে পাঠান,[৮০] তাতে প্রথমদিকেই কাশীনাথের স্বাক্ষর আছে। এহেন কাশীনাথ আখড়াই গানের বাৎসরিক সংগ্রামের আয়োজন করতেন কলকাতায়, সম্ভবত তিনি যৌবনেই বাণিজ্য উপলক্ষ্যে পিতার মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে অবস্থানকালে এ জাতীয় সংগীতরীতির সঙ্গে পরিচিত হন এবং উৎসাহিত হয়ে কলকাতায় এর আয়োজন

করেন। অবশ্য কলকাতায় তখন গুটি কয়েক আখড়াইয়ের দল নিশ্চয়ই ছিল, তবে কুলুইচন্দ্রের আগে আর কোনো কলকাতাস্থ দল বিশিষ্ট হয়ে ওঠেনি। কাশীরামের আয়োজিত আখড়াই-সংগীত সংগ্রামের ব্যাপারে আজ আর বিশদে কিছু বলা সম্ভব নয়; কলকাতায় তখনও বাংলা সংবাদপত্র প্রচলিত হয়নি, ইংরেজি সংবাদপত্র ১৭৮০ সালে দেখা দিলেও, নেটিভদের অতি সাধারণ 'গাওনা-বাজনা' নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের কথা তাঁরা ভাবতেও পারতেন না। তবে, অনুমান করা অসংগত নয় যে, আখড়াই সংগীত সংগ্রামের জনপ্রিয়তা নবকৃষ্ণ প্রমুখ ভুঁইফোঁড় অভিজাত বিত্তবানদের আকৃষ্ট করেছিল, ফলে কবিগানের পাশাপাশি আখড়াই দল স্থাপন করে নবকৃষ্ণ আদিবাবুদের গোত্রলক্ষণ হিসাবে আখড়াই গানের স্থান সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।

আদিতে আখড়াই গানে যে অমার্জিত রুচি এবং সুর-তাল-বাদ্যের অভাব ছিল, নবকৃষ্ণের সভা-গায়ক কুলুইচন্দ্র সেন তার যথাবিহিত সংস্কার করে আখড়াই গানকে বৈঠকি উচ্চাঙ্গ সংগীতে উত্তীর্ণ করেন। কুলুইচন্দ্রকে এ কারণেই 'আখড়াই গাহনার একজন জন্মদাতা' বলেছেন ঈশ্বর গুপ্ত।[৮১] ইনি ছিলেন রামনিধি গুপ্ত ওরফে নিধুবাবুর নিকট সম্বন্ধীয় মাতুল[৮২] কিংবা মাতুল-পুত্র।[৮৩] নবকৃষ্ণের পক্ষপুষ্ট হওয়ার আগে অবশ্য আখড়াই গানের কয়েকটি পেশাদারি দল গড়ে ওঠে, যাঁরা গোবিন্দরাম মিত্রের বিখ্যাত হালসীর বাগানে[৮৪] সম্মিলিত হয়ে আখড়াই সংগীত সংগ্রামে অবতীর্ণ হতেন। ঈশ্বর গুপ্ত জানিয়েছেন, 'ধনি ও সৌখিন বাবুলোকেরা ইহারাদিগের এক এক পক্ষের পক্ষ হইয়া অর্থ দান প্রভৃতি নানা প্রকারেই সাহায্য করিতেন।'[৮৫] তখন আখড়াই ছিল স্থূল রুচির এবং শান্তিপুরি 'খেউড়' দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু কুলুইচন্দ্র এই গানকে প্রথম জাতে তোলেন। প্রথম যুগের আখড়াই গায়ক হিসাবে বৈষ্ণব দাস এবং রামজয় সেনের নাম সুপ্রসিদ্ধ। জোড়াসাঁকোর 'ন্যাটা বলাইয়ের দল' এবং তাঁর তিন শিষ্য নবু আঢ্য, রাজু আঢ্য ও রূপচাঁদ পেশাদারি আখড়াই দল হিসাবে বাবুদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। জোড়াসাঁকোর দলের গীত ও সুরকার দুর্গাপ্রসাদ বসু এবং বেহালা-বাদক পার্বতীচরণ বসুরও নাম স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। নিমতলার দত্তবাবু এবং রামবাগানের প্রসিদ্ধ দত্তবাবুদেরও দু'টি আখড়াইয়ের দল ছিল। দু'টি বংশই ইংরেজদের দেওয়ানি-বেনিয়ানি করে প্রভূত অর্থ-বিত্ত করেছিলেন। আদিবাবুদের অনেকেরই ইতর ভাবালুতাপূর্ণ প্রথম দিকের আখড়াই গানের প্রতি আসক্তি ছিল। উচ্চাঙ্গ সংগীতের সমঝদার হওয়ার জন্য যে পরিমাণ রুচি, শিক্ষা, তালিম থাকা প্রয়োজন, এঁদের কারোরই তা ছিল না। ছিল অর্থ, যা দিয়ে তাঁরা আখড়াই সংগীত সংগ্রামের আসর বসাতেন এবং ওই উপলক্ষ্যে জনসমাগম করে যশঃভাগী হতেন। নবকৃষ্ণের পক্ষপুষ্ট কুলুইচন্দ্র আখড়াই গানকে মার্গ-সংগীতের কোঠায় তুলে দিলে আখড়াই গান উপভোগ নিতান্তই সমঝদারের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে পড়ে। এ কারণেই সম্ভবত নবকৃষ্ণের ছোটো তরফের পুত্র রাজকৃষ্ণ পেশাদারি আখড়াই গায়ক শ্রীদাম দাস, রাম ঠাকুর এবং নসিরাম সেকরার সংগীত আয়োজন করতেন বিপুল অর্থব্যয় করে। যেহেতু উচ্চাঙ্গ সংগীতে তাদৃশ শিক্ষা বা অনুরাগ তাঁর ছিল না, অতএব কুলুইচন্দ্র সেন পিতার আমলে সভা-গায়ক থাকলেও, কিঞ্চিৎ তরল রসের সন্ধানে রাজকৃষ্ণকে পেশাদারি আখড়াই গায়ককে আহ্বান করতে হয়েছে বলেই আমাদের অনুমান।

কুলুইচন্দ্র আখড়াই গানের সংস্কারসাধন করে তাকে জাতে তোলেন, আর তাঁরই আত্মীয় নিধুবাবু ১২১১ বঙ্গাব্দে শোভাবাজার, বাগবাজার এবং পাথুরিয়াঘাটায় দু'টি 'সংশোধিত শখের আখড়াই দল' গড়ে তোলেন। নিধুবাবু স্বয়ং 'বাবু' ছিলেন, তিনি কারোর পক্ষপুষ্ট হয়ে গান রচনা করেননি কিংবা দল

গঠন করেননি। ছাপরা থেকে ফেরার সময় তিনি দশ হাজার টাকা সঙ্গে নিয়ে আসেন এবং সাধারণ মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চমধ্যবিত্ত চাকুরে ভদ্রলোকের গোত্রভুক্ত হন। যদিও টপ্পা গানই নিধুবাবুকে অবিস্মরণীয় করেছে, তবুও আখড়াই গানের পরিমার্জনার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান বিস্মৃত হবার নয়। তিনি নিজস্ব ভবনে আখড়াই ও অন্যান্য গান করতেন; ঈশ্বর গুপ্ত জানিয়েছেন, নানা জায়গা থেকে সম্ভ্রান্ত রসিক শ্রোতৃগণ 'তাবতেই বাবুর নিকট আসিতেন, কিন্তু বাবু প্রায় কখনই কাহারো নিকট গমন করিতেন না, কারণ তিনি স্বাধীনতা সম্মানের উপর নিয়তই দৃষ্টি রাখিতেন';[৮৬] সুকণ্ঠ গায়ক এবং পরবর্তীকালে হাফ-আখড়াই গানের স্রষ্টা মোহনচাঁদ বসু নিধুবাবুর শিষ্য হিসাবে আখড়াই দলে গান করতেন। নিধুবাবু প্রথমত, আখড়াই গানকে পেশাদারি দলের পাশাপাশি অপেশাদার 'শৌখীন' শখে উত্তীর্ণ করেন, দ্বিতীয়ত, আখড়াই গানকে বিশুদ্ধ উচ্চাঙ্গ সংগীতের কোঠায় তুলে নিয়ে যান। গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্যের মতে, নিধুবাবু 'কালোয়াতী প্রথা'র প্রচলন করেন, যার ফলে সুরের 'বিস্তর বাহুল্য' হয়।[৮৭] অবশ্য এ কারণেই সম্ভবত নিধুবাবুর জীবদ্দশাতেই আখড়াই গান কলকাতার বুক থেকে প্রায় হারিয়ে যায়। অস্থিরমতি, সংগীতে অনভিজ্ঞ বাবুদের পক্ষে নিধুবাবুর আখড়াই গান আদৌ সুখকর মনে হয়নি। পরবর্তীকালের সমালোচকের ভাষায়, 'নিধুবাবুর "সংশোধিত" আখড়াই গান ছিল কঠোর অনুশীলনসাধ্য— একেবারেই উচ্চাঙ্গসংগীত। বোধ হয় সেই কারণেও এই গান নিধুবাবুর পরে আর চলেনি— হাফ-আখড়াইয়ের প্রচলন হয়েছে।'[৮৮]

'সখের আখড়াই' প্রচলনের প্রথমদিকে অবশ্য কলকাতার তাবৎ বাবুরা প্রভূত অর্থ ব্যয় করে এক একটি আখড়াইয়ের দল খুলে বসেন। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবার, জোড়াসাঁকোর সিংহবাবুরা (কালীপ্রসন্ন সিংহ এই পরিবারেরই সন্তান), গরানহাটার কৃষ্ণমোহন বসাক, শোভাবাজারস্থ কালীশঙ্কর ঘোষের পুত্ররা, শ্যামপুকুরের দিগম্বর মিত্র ও হলধর ঘোষ প্রমুখেরা আখড়াইয়ের দল স্থাপন করেন। আখড়াইয়ের শখের দল গঠন এবং তার ব্যয় নির্বাহ করা সাধারণ বাবুদের কাজ নয়। কবি-গানের দলের সঙ্গে তার মৌল পার্থক্য রয়েছে। কবিয়ালরা অনেকেই নিজ দল নিজেরাই পরিচালনা করতেন, তাঁরা অনেকেই নিজস্ব বৃত্তিতে নিয়োজিত ছিলেন; হরু ঠাকুরের মতো কেউ কেউ শেষজীবনে নবকৃষ্ণের মতো ভুঁইফোঁড় বড়োলোকদের পক্ষপুষ্ট হলেও, প্রধানত তাঁরা ছিলেন স্বাধীন। অন্যদিকে শখের আখড়াই দল গঠন এবং দলস্থ গায়ক ও বাজনাদারদের ভরণ-পোষণ বাবুকেই করতে হত। নিধুবাবুর সমকালে যাঁরা শখের আখড়াই দল গঠন করেন, তাঁরা সামাজিক আভিজাত্যের দিক থেকে যে যে কোঠারই হন না কেন, অর্থকৌলীন্যে তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন ধনী। যেমন— পাথুরিয়াঘাটার দর্পনারায়ণ ঠাকুর চন্দননগরে ফরাসি সরকারের অধীনে চাকরি করে এবং ব্যাবসাবাণিজ্যের সূত্রে প্রভূত বিত্ত-সম্পদের অধিকারী হন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগে তিনি নাট্যের এস্টেটের অধীন রংপুরের জমিদারি কিনে নেন। এই পরিবারে সংগীতেরও ব্যাপক চর্চা ছিল। অন্যদিকে, জোড়াসাঁকোর সিংহ বংশ প্রতিষ্ঠিত হয় মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় মি. মিড্‌লটন ও স্যার টমাস রামবোল্ডের দেওয়ান শান্তি সিংহের হাতে। বাংলা ও ওড়িশায় এঁদের বহু জমিদারি খরিদ করা ছিল। গরানহাটার কৃষ্ণমোহন বসাক (কৃষ্ণচন্দ্র?) ছিলেন গভঃ জেনারেল স্যার জন শোরের সরকার, এরই বংশজ গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে প্রথম হিন্দু স্কুল স্থাপিত হয়।[৮৯] তেমনি, শোভাবাজারের কালীশঙ্কর ঘোষ ছিলেন আমেরিকান শিপিং কোম্পানির সরকার। তাঁর পাঁচ পুত্রের মধ্যে হরচন্দ্র ঘোষ ছিলেন শিপ্ বিল্ডার আমেরিকান ক্যাপ্টেন জনৈক সি. কিডের সরকার। এঁরা প্রত্যেকেই অপরিমেয় অর্থ-বিত্ত-সম্পদের অধিকারী ছিলেন, যদিও সামাজিক আভিজাত্যের ক্ষেত্রে এক শ্রেণিভুক্ত

ছিলেন না। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে রাধাকান্ত দেবের প্রস্তুত করা 'respectable and opulent Natives of the Presidency'-র তালিকা অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, এঁদের কেউ কেউ তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত অভিজাত বিত্তবান হিসাবে চিহ্নিত। সন্দেহ নেই, অর্থ-বিত্ত ব্যবহার করে এঁরা দ্রুত উঠে আসতে চেয়েছেন আভিজাত্যের উপরিস্তরে। প্রাথমিক পর্বে আখড়াই দল স্থাপনকে এঁরা অভিজাত বাবুদের কুললক্ষণ মনে করেছেন এবং এক একটি আখড়াই দলের পৃষ্ঠপোষকতা করে অর্জন করতে চেয়েছেন অভীষ্ট সিদ্ধি।

কিন্তু ব্যয়সাধ্য আখড়াই দল স্থাপন বিত্তবান বাবুদের পক্ষে সহজসাধ্য হলেও, কুলুইচন্দ্র ও নিধুবাবুর বেঁধে দেওয়া সংগীতাদর্শের রস গ্রহণে এঁরা অপারগ ছিলেন। সেইসময় অনুষ্ঠিত সংগীত সংগ্রামগুলিতে প্রায়শই বাকিরা নিধুবাবুর দলের কাছে পরাজিত হতেন।[৯০] পরবর্তীকালে মোহনচাঁদ বসু আখড়াই ভেঙে কম সাংগীতিক কলাকৌশলযুক্ত হাফ-আখড়াই তৈরি করলে, বাবুরা নিজস্ব রুচির উপযোগী হাফ-আখড়াইয়ের দিকে ঝোঁকেন। দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পুত্র গোপীমোহন ঠাকুর ছিলেন বাবুয়ানির জন্য বিখ্যাত। তবে তিনি শিক্ষিত মার্জিত রুচির ছিলেন বলে বাবুত্বের 'নবধা' লক্ষণই তাঁর চরিত্রে প্রকাশ পায়নি। গোপীমোহনের দুর্গাপূজায় কলকাতার বড়োলাট-ছোটোলাট সহ বিশিষ্ট নাগরিক ও ইউরোপীয়রা, উপস্থিত থাকতেন। ঈশ্বর গুপ্ত জানিয়েছেন,[৯১] নবকৃষ্ণের পর গোপীমোহন ঠাকুরই সম্ভবত সবচেয়ে দীর্ঘদিন আখড়াই গানের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তিনি ছিলেন বাস্তবিক রসজ্ঞ ব্যক্তি। লোকনাথ ঘোষের সাক্ষ্যে[৯২] দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সংগীতজ্ঞরা, এমনকী উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সংগীতজ্ঞরাও তাঁর বাড়িতে এসে গান গেয়ে যথাযোগ্য সমাদর লাভ করতেন এবং পুরস্কৃত হতেন। তাঁর বাড়িতে প্রায়ই গান-বাজনার মেহফিল বসত এবং দেশের অনেক সংগীতজ্ঞ গুণীকেই তিনি নিয়মিত মাসোহারা দিতেন। স্বাভাবিকভাবেই নিধুবাবুর হাতে উচ্চাঙ্গের 'বৈঠকী' গানে পরিণত হওয়া আখড়াই গান উপভোগের অধিকার তাঁর মতো বাবুরই ছিল। কিন্তু বাবুসমাজে গোপীমোহনকে ব্যতিক্রমই বলতে হবে। বাকি ভুঁইফোঁড় বাবুদের কাছে আখড়াই গান দ্রুত তার আবেদন হারাচ্ছিল। আখড়াই গান উপভোগের ক্ষেত্রে নিজেদের অজ্ঞতা এবং 'অরসিকেসু রহস্য নিবেদনম্'-এর ফলাফল নিজেরা জানতেন বলেই বাবুরা পরবর্তীকালে হাফ-আখড়াইয়ের দিকে সরে গেলেন।

ইতিহাসবিদের মতে, 'আখড়াই গান ঠিক জনসাধারণের জন্য পরিকল্পিত হয়নি। জনসাধারণ কবি ও পাঁচালী গানেই তৃপ্তি পেত। আখড়াই-এর অবলুপ্তির এটাও একটা কারণ।'[৯৩] কিন্তু এটি অন্যতম কারণ হলেও, প্রধান কারণ, পৃষ্ঠপোষক বাবুদের রুচির পরিবর্তন এবং পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করে দেওয়া। পেশাদারি আখড়াইয়ের দলগুলি নিধুবাবুর শখের দল তৈরির পরপরই উপযুক্ত গীত ও গায়কের অভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া, বাবুদের নিজস্ব দল থাকায় সংগীত সংগ্রামের বায়নাও তাঁরা আর পেতেন না। ফলে শৌখিন দলগুলির উপর ভর করেই আখড়াই গান বেঁচেছিল। কিন্তু পৃষ্ঠপোষক বাবুরাই মুখ ফিরিয়ে নেওয়ায়, আখড়াইয়ের পক্ষে আর টিকে থাকা সম্ভব হল না। একই সঙ্গে আখড়াই গান ঠিক কিংবা বেঠিক, কোনোভাবেই জনসাধারণের জন্য পরিকল্পিত হয়নি। কবি ও পাঁচালি যে অর্থে জনসাধারণের গান, আখড়াই গান কোনোমতেই সে প্রকারের গান নয়। বরং জনগণের রুচির কবল থেকে মুক্ত করে প্রথমে কুলুইচন্দ্র, পরে নিধুবাবু একে একপ্রকার সরস, শোভন রুচিশীল পরিমার্জনায় অলংকৃত করেছিলেন যে, সাধারণ জনরুচির প্রবেশাধিকার সেখানে ছিল না। কিন্তু বাবুরা মুখ ফিরিয়ে নেওয়ায় আখড়াই গান বেঁচে থাকার আর কোনো সম্ভাবনাই ছিল না; বেঁচেও রইল না সে।

ভবানীচরণের 'নববাবুবিলাসে'র খলিফা বাবুত্বের নবধা লক্ষণ বিচার করতে গিয়ে ১৮২৫ সাল নাগাদ আখড়াই-এর উল্লেখ করেছে বটে, কিন্তু সে বোধ হয় ঐতিহাসিক বাস্তবতা রক্ষার খাতিরে। কারণ, কলকাতার বাবুদের আখড়াইয়ের শখ তখন অস্তমিত। ঈশ্বর গুপ্ত ১২৩০-৩১ সাল নাগাদ অর্থাৎ ১৮২৩-২৪-এর দিকে আখড়াই গান 'রহিত' হওয়ার কথা বলেছেন।[৯৪] তারপরেও বিক্ষিপ্তভাবে আখড়াই গান অনুষ্ঠিত হলেও হতে পারে, কিন্তু সেই উদ্যম ও উদ্দীপনা সম্ভবত ছিল না। 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, ১২৩৫ অব্দের ৬ মাঘ (১৭.০১.১৮২৯) বাবু গুরুচরণ মল্লিকের বাড়িতে হরচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে বাগবাজারের দল এবং বৃন্দাবন ঘোষাল ও রামলোচন বসাক পরিচালিত জোড়াসাঁকোর দল আখড়াই সংগীত সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। এই সংগীত সংগ্রামে বাগবাজারের দল জয়লাভ করে। সংবাদদাতার বিবরণেই প্রকাশ: 'কবিতাযুদ্ধ সুদ্ধ এই দেখা গেল এমত নহে ইহার পূর্ব্বে অপূর্ব্ব গীত শুনা গিয়াছে কিন্তু সম্প্রতি এমত বোধ হইয়াছে যে কবিতা-সংগ্রাম এ অবধি বিশ্রাম বা হয় বুঝি এমত আর হবে না...।' আখড়াই গান যে তখন প্রায় বন্ধ, ক্বচিৎ-কদাচিৎ এবং পরেও আর হবে না, এমত তথ্য ও সংশয় সংবাদদাতার বক্তব্যে নিহিত। সেকালে দু'জন বিখ্যাত গুরুচরণ মল্লিক ছিলেন। একজন বড়োবাজারের এবং অন্যজন জোড়াসাঁকোর বাসিন্দা ছিলেন। সংবাদে দয়েহাটার বাড়ির উল্লেখ দেখে মনে হয় ইনি বড়োবাজারের বণিক গুরুচরণ মল্লিক। এঁরা আকবরের আমলে সপ্তগ্রামে ব্যাবসা করে ধনবান হয়ে ওঠেন। হুগলি, নদীয়া এবং ২৪ পরগনায় 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'র সুযোগে এঁরা বহু ভূ-সম্পত্তি খরিদ করেন। গুরুচরণ তৎকালে একজন প্রধান বাবু ছিলেন। তিনি এবং তাঁর দুইভাই পিতৃশ্রাদ্ধে বিপুল ব্যয় করেন।[৯৭] 'সমাচার দর্পণ' (২৭.০৩.১৮২৪)-এ প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, গুরুচরণ প্রায়শই বড়োবাজারের বাড়িতে সাহেবলোককে নিমন্ত্রণ করে প্রচুর খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা করতেন এবং 'ভোজনান্তে উত্তম বাইয়ের নাচ' দেখিয়ে, সঙ্গে 'বাদশাহী ইংলণ্ডীয় বাদ্য' শুনিয়ে সকলকে সন্তুষ্ট করতেন।[৯৮] কিন্তু অতিরিক্ত বাবুয়ানির জন্য গুরুচরণের ঠাটবাট পরবর্তীকালে হ্রাস পায়। ফলে ১৮২৯-এর পর তাঁর বাড়িতে বা অন্যত্রও আখড়াই সংগীত সংগ্রামের কোনো সংবাদ মেলে না।

অনেকেই নিধুবাবুর শিষ্য মোহনচাঁদ বসুকে দায়ী করেছেন।[৯৯] কিন্তু দেখা যাচ্ছে, মোহনচাঁদের হাতে হাফ-আখড়াই জন্মের (সম্ভবত ১২৩৮ সাল ৯ মাঘ[১০০]) বহু আগে থেকেই আখড়াইয়ের 'শখ' বাবুরা পরিত্যাগ করেছিলেন। নিধুবাবু ১২৪৫ বঙ্গাব্দের (১৮৩৯) ২১ চৈত্র দেহান্তরিত হন, অথচ তাঁর টপ্পার নানান কথা শোনা গেলেও আখড়াই সংগীতের ব্যাপারে সমকালীন পত্র-পত্রিকাগুলি নীরব। অনুমান করা অসংগত নয় যে, শ্রোতৃমণ্ডলী বাবুদের আখড়াই গানের প্রতি 'অসদ্ভাব' দেখে এ জাতীয় গান রচনা থেকে তিনি বিরত হয়েছিলেন এবং আখড়াই গানের প্রসারের ক্ষেত্রেও আর কোনো কর্মতৎপরতা দেখাননি। বস্তুত, আখড়াই সংগীত অবলুপ্তির পশ্চাৎ-এ মোহনচাঁদের ভূমিকা বিশেষ ছিল না বললেই হয়। বরং মোহনচাঁদ সমকালীন বাবু-রুচি অনুধাবন করে সদৃশ হাফ-আখড়াই করে অবস্থার সামাল দিতে চেয়েছিলেন এবং পেরেওছিলেন।

১৮৫৩-৫৪ সাল নাগাদ শ্যামপুকুরের কিছু যুবক উদ্যোগী হয়ে আখড়াই সংগীত সংগ্রামের আয়োজন করে ব্যর্থ হল বলে জানা যায়।[১০১] এ ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী ছিল। যুগরুচির বদলে তখন মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী 'ভদ্রলোক' শ্রেণি সমাজের পরিচালক হয়ে উঠেছেন, ভদ্রলোকবাবুদের কেউই আখড়াই সংগীত-সংগ্রাম আয়োজন করার মানসিকতাসম্পন্ন ছিলেন না, এসবের চেয়ে সামাজিক নানান সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁদের

উৎসাহ ছিল বেশি। তা ছাড়া এ জাতীয় দল গঠন এবং পালন যে পরিমাণ ব্যয়সাধ্য, তা চাকুরে মধ্যবিত্তের ছিল না। অতএব 'বৈঠকী' গান হিসাবে নিধুবাবু কিংবা গোপাল উড়ের টপ্পা বেঁচে রইল, তরজা কবিগানও টিকে রইল কিছুকাল সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও, হাফ-আখড়াইও তখন অস্তসূর্যের স্বপ্ন দেখছে, কিন্তু খলিফা-বর্ণিত আখড়াই গান বাবুদের অপক্ষপাতে হারিয়েই গেল চিরতরে।

মনে রাখা প্রয়োজন, আখড়াই গান বিশুদ্ধ দেশজ-মূলোৎপন্ন। সম্মিলিত বৃন্দবাদনের ব্যাপারটিতে এবং বেহালার মতো বিদেশি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার পাশ্চাত্য প্রভাবের পরোক্ষ ফলজাত হলেও, সংগীতের ভাব, সুর, গায়কিতে পাশ্চাত্যের কিছুমাত্র প্রভাব ছিল না। আদিবাবুরা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাণপণে দেশজ রীতি-স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চাইতেন। সুদীর্ঘকালের মোগল শাসনে মোগল ঘরানার কিছু সংস্কৃতি তাঁরা নিজের করে নিয়েছিলেন। এ কারণেই বিশুদ্ধ মার্গ-সংগীতে এসে মিশেছে উত্তর-পশ্চিমা সুর-তাল ইত্যাদি। এ মিলন দীর্ঘ সহবাসের অনিবার্য ফল। ইংরেজ শাসক ও তার সংস্কৃতির সঙ্গে এই সহবাস সহজ ছিল না, অন্ততপক্ষে প্রথম যুগে। এ কারণেই আদিবাবুদের আখড়াইয়ের শখ পাশ্চাত্য প্রভাব যথাসম্ভব এড়িয়ে 'আপনাতে আপনি বিকশিত' হয়ে উঠেছিল, সামান্য কিছু সময়ের জন্য হলেও। পরবর্তীকালেও যে এর কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছে এমনটি নয়। সাধারণ বাবুরা যেমন, তেমনি শিক্ষিতবাবুরা ও নিধুবাবুর টপ্পা, বেশ্যা কিংবা বাইজি-সংগীতে মজে ছিলেন। সেকালের সম্ভ্রান্ত-শিক্ষিতবাবুদের অনেকেরই এ জাতীয় সংগীতে আসক্ত ছিলেন। সাহেবসুবোদের অনেকেই ১৮৫৭ সালের আগে পর্যন্ত এ জাতীয় নাচ-গানের আসরে আমন্ত্রিত হতেন এবং তাঁদের বিতৃষ্ণা কিংবা মুগ্ধতার কথাও তাঁরা লিখে গেছেন ডায়েরি, দিনলিপি, চিঠিপত্র কিংবা ভ্রমণ-বিবরণের পাতায়।

প্রকৃতপক্ষে 'বাবু'সমাজ খুশি থাকার জন্য নানারূপ আমোদপ্রমোদের আয়োজন করতেন, আবার আমোদপ্রমোদের মৌতাতে আপনি খুশি হয়ে উঠতেন। এই আমোদপ্রমোদের মাত্রা ছিল দ্বিবিধ— এক. ব্যক্তিগত সুখভোগের জন্য আয়োজিত আমোদপ্রমোদ; দুই. সমষ্টিগত সুখ-ভোগের জন্য আয়োজিত আমোদপ্রমোদ। প্রথম ক্ষেত্রে বাবুরা রক্ষিতা পুষেছেন, ইয়ারদোস্ত সহ বেশ্যালয়ে গমন করেছেন, নেশা-ভাং-মদ-মেয়েমানুষ নিয়ে 'খুশির হদ্দমুদ্দ' করেছেন, পরিণামে কেউ কেউ সর্বস্বান্ত হয়েছেন; কিন্তু এইসব বাবুরা কেউ 'বনেদি' বাবু নয়। বদলে যাওয়া অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে উনিশ শতকের চল্লিশের দশক থেকে অনেক বনেদি বাবুই আর্থিক কৌলীন্য থেকে চ্যুত হচ্ছিলেন। নতুন বাবুরা শিক্ষিতই হোন বা অশিক্ষিত, আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণেই তাঁদের আমোদপ্রমোদের মাত্রাও সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। মদ্যপান ও বেশ্যাগমনের আনুপাতিক হার বেড়ে গেলেও, এ জাতীয় আচরণ সমাজে নিন্দিত হওয়ায়, বাবুরা কেউ এহেন আমোদপ্রমোদের প্রকাশ্য আয়োজন করতে পারেননি আর। রাজনারায়ণ বসু বলেছেন, 'সে কালে এতদ্দেশে দু-একটি বাবু ছিল, এক্ষণে সকলেই বাবু। পূর্ব্বে মোটা চালচলন সাধারণ ছিল; এক্ষণে বাবুয়ানা চালচলন সাধারণ ও মোটা চালচলন বিরল।'[১০২] অর্থাৎ 'বাবুয়ানা'র সাধারণীকরণ ঘটেছিল। কিন্তু সাধারণীকরণ মানে তার উৎকর্ষবৃদ্ধি হওয়া নয়। বরং বিগতকালে বাবুয়ানার যে আভিজাত্য ছিল, সমষ্টিগতভাবে উপভোগের দ্বারা যে বাবুয়ানা আরও আস্বাদ্য ও আনন্দদায়ক হয়ে উঠত, পরবর্তীকালের বাবুদের পক্ষে তেমনটি রক্ষা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। রাজনারায়ণ বসুর মতে, 'এক্ষণকার লোকে পানাসক্ত ও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেশ্যাসক্ত।... সে কালে লোক প্রকাশ্যরূপে বেশ্যা রাখিত। বেশ্যা রাখা বাবুগিরির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত; এক্ষণে তাহা প্রচ্ছন্নভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু সেই

প্রচ্ছন্নভাবে তাহা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। বেশ্যাগমন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার প্রমাণ বেশ্যাসংখ্যার বৃদ্ধি।'[১০৩] পানাসক্তি তথা বিলিতি মদ্যপান ইয়ং বেঙ্গলদের মারফত ক্রমশ উনিশ শতকের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কালক্রমে যে অর্ধশিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই এ রসের অনুরাগী হয়ে ওঠে, তার পিছনে রয়েছে, বিলিতি মদ্যপানের মাধ্যমে সাহেবদের জাতিভুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টাজনিত ভ্রমাত্মক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। নবাবি আমলে উৎকৃষ্ট মদ সাধারণের অপ্রাপ্য ছিল, নবাব কিংবা ধনবান অভিজাতরাই ছিলেন সে রসের অধিকারী। কিন্তু কলকাতার ক্রমবিকাশের প্রথম থেকেই ইংরেজরা প্রথমত প্রয়োজনে পানশালা তৈরি করেছে, পরে আবগারি বিভাগ স্থাপন করে পানশালা ও পানীয় সর্বসাধারণের রসোপভোগের বিষয় করে তুলেছে। কিন্তু মদ্যপান সাধারণীকৃত আচরণ বলেই 'নববাবুবিলাসে'র খলিফা হাফ কিংবা ফুল— কোনো বাবুদেরই লক্ষণ বর্ণনায় পৃথক করে তার উল্লেখ করেনি। কিন্তু বেশ্যাবাজি'র বা বেশ্যাগমনকে যথাবিহিত গুরুত্ব দিয়ে নববাবুকে আনন্দে থাকবার পথনির্দেশ করেছে সে:[১০৪] 'গাওনা বাজনা কিছু শিক্ষা কর, যাহাতে সর্বদা জিউ খুসি থাকিবেক এবং যত প্রধানা নবীনা গলিতা যবনী বারাঙ্গনা আছে ইহাদিগের বাটীতে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিয়া ঐ বারাঙ্গনাদিগের সর্ব্বদা ধনাদি দ্বারা তুষ্ট রাখিবা, কিন্তু যবনী বারাঙ্গনাদিগের বাই বলিয়া থাকে, তাহা সম্ভোগ করিবা...' এবং 'প্রতি রবিবারে বাগানে যাইবা, মৎস্য ধরিবা, সখের যাত্রা শুনিবা, নামজাদা নামজাদা বেশ্যা ও বাই ইহারদিগের নিমন্ত্রণ করিয়া বাগানে আনাইবা, বহুমূল্য বস্ত্র হার হীরকাঙ্গুরীয়ক অর্থাৎ হীরার আংটি ইত্যাদি প্রদান করিয়া তুষ্ট করিবা, আমি সঙ্গে থাকিব, দেখিবা কি মজা হইবেক...।' অতঃপর খলিফা, গায়েন, 'গুণী মোসাহেব দুইজন', দুই-চারজন 'এয়ার', সেইসঙ্গে খানসামা খেজমৎগার ফরাস হুক্কাব্যর্দ্দার পাঙ্খাবর্দ্দার সহ বাবু রক্ষিতা সংসর্গ করতে বাগানে গেলেন। কিন্তু এমন লোকলশকর সঙ্গে নিয়ে বেশ্যাগমন উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকেই কমতে শুরু করে এবং চারের দশক শেষ হতে না হতেই তা অতীত হয়ে যায়। হুতোম, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, টেকচাঁদ ঠাকুর, ভাঁড় প্রমুখেরা দলবলসহ বাবুর বেশ্যাবাজির যে চিত্র এঁকেছেন, তা 'আকবরী সোনার মোহরে'র মতো অতীত সুখস্মৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। নতুন কালে বাবুরা মূলত অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে জাঁকজমকের সঙ্গে বেশ্যাবাজি করতে অপারগ; সেইসঙ্গেই সামাজিক রুচির পক্ষে তখন তা পীড়াদায়ক প্রতিপন্ন হয়েছে, অতএব 'প্রকাশ্য বেশ্যাবাজি' কিংবা 'আড়ম্বরপূর্ণ ব্যক্তিগত বেশ্যাবাজি'র এলাকা সংকুচিত হয়ে গেছে। ফলে মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনের (১৮৬০) নবকুমার, কালী প্রমুখেরা অনেকে মিলে 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'র আড়ালে পয়োধরা ও নিতম্বিনীর সস্তা গান-নাচের মজা লোটে, এককভাবে 'বাঁধা মেয়েমানুষ' রাখবার ক্ষমতা তাদের নেই। আবার, 'কোনো নাট্যানুরাগী ব্যক্তি' রচিত 'বেশ্যানুরক্তি বিষমবিপত্তি'র (১২৭০ সন) বেশ্যা প্রেমানুরক্ত বাবু প্রিয়বাবু রক্ষিতা হেমলতাকে প্রতিশ্রুতি মতো জিনিস দিতে না পারায় স্বগতোক্তি করেছে: 'আজ বিবিকে মুক্তার শাতনর দেবার কথা ছিল, টাকা হাতে নেই বলে খরিদ করা হয় নাই, আজ না পেলে দেখচি ভারি বেজার হবে, যা হোক কাল রবিবার কাল আর হবে না, পরসু নিদেন টাকা ধার করে এনে দিতে হবে; রোজ রোজ ভাঁড়াভাঁড়ি ভাল দেখায় না।'[১০৫] আর, 'সেরুড কোম্পানির বাড়ির মেট মিস্তিরি' গুরুদাস গুঁইয়ের স্নানযাত্রায় আমোদ প্রসঙ্গে হুতোম স্বয়ং জানান, 'পূর্ব্বে স্নাযাত্রার বড়ো ধূম ছিল— বড় বড় বাবুরা পিনেস, কলের জাহাজ, বোট ও বজরা ভাড়া করে মাহেশে যেতেন, গঙ্গায় বাচ খ্যালা হতো, স্নানযাত্রার পর রাত্তির ধরে খ্যামটা ও বাইয়ের হাট ল্যেগে যেতো। কিন্তু এখন আর সে আমোদ নাই—

সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই— কেবল ছুতোর, কাঁশারি, কামার ও গন্ধবেনে মশাইরাই যা রেখেছেন, মধ্যে মধ্যে দু-চার ঢাকা অঞ্চলের জমিদারও স্নানযাত্রার মান রেখে থাকেন, কোন কোন ছোকরা গোছের নতুন বাবুরাও স্নানযাত্রায় আমোদ করেন বটে।'[১০৬] অর্থাৎ বাবুত্ব declassed হয়েছে, সাধারণ জীবিকার লোকেরাও বাবুত্বের পর্যায়ে উঠে আসতে চাইছেন আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও। দেওয়ানি বা মুচ্ছুদ্দিগিরির অফুরন্ত অর্থ-বিত্ত এঁদের নেই, আদিবাবুদের মতো জাঁকজমক করে আমোদপ্রমোদের আয়োজন করার সামর্থ্যও তাই নেই। গুরুদাস গুঁইয়ের মতো কেউ তিরিশ টাকা মাইনে ও দশ টাকা উপরির রোজগারে বাবু হওয়ার স্বপ্ন দেখেন, বাঁধা মেয়েমানুষ মায় বাজারে মেয়েমানুষ ভাড়া করার আর্থিক সংগতি না থাকায় বিধবা পিসিকেই বজরায় তোলেন; কেউ আবার গ্রামীণ জমিদার; অর্থাৎ আদিযুগে বাবুত্ব ছিল নগরকেন্দ্রীক অর্থ-বিত্ত-সম্পদে কুলীন মানুষদেরই স্বধর্ম, নতুন কালে তা গ্রাম্য ভূস্বামীদেরও অধিকারভুক্ত হয়েছে। আদিযুগের বাবুরা বাই পোষা কিংবা বেশ্যাগমনকে আভিজাত্যের কোঠায় তুলেছিলেন। লোকে 'প্রকাশ্যভাবে বেশ্যা রাখত' বলে, আর পাঁচজনের চোখে সেই শখটির মহার্ঘতা প্রতিপন্ন করার প্রয়োজনও ছিল। বাবুদের আর্থিক সংগতি থাকায় তা বিশেষ অসুবিধাজনকও ছিল না। আদিবাবুদের প্রায় সকলেরই বাঁধা রক্ষিতা ছিল, নিয়মিত বাইনাচের আসর বসাতেন তাঁরা। কোনো কোনো মতে, কলকাতার অভিজাত বাবু-মহলে প্রথম বাইজি নাচের প্রবর্তক নবকৃষ্ণ দেব: 'he introduced into Calcutta Society and popularised the nautch which English men believe to be the chief of our public amusements. It is Bai Nautch.' [১০৭] নীলমণি মল্লিক এবং রাজা রামচন্দ্রের উদ্যোগে নিকি এবং আশরুম বাইয়ের নাচের সংবাদ মেলে; রাজা বৈদ্যনাথ রায় জিন্নত্ বাইয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[১০৮] ফ্যানি পার্ক্সও রামমোহন রায়ের মানিকতলার বাগানবাড়িতে নিকির নাচ-গান দেখেছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে 'স্বদেশীয় স্বজনগণকে লইয়া মহাভোজ আমোদপ্রমোদাদি করিলেন এবং তদুপলক্ষে বায়ীর নাচ হইয়াছিল তাহাতে কলিকাতার মধ্যে প্রাপ্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান নর্ত্তকী ও প্রধান বাদ্যকর তাহারদের নৃত্যগীত বাদ্যাদির দ্বারা আমোদ করেন।[১০৯] কিন্তু হুতোমের কালে এই অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। রূপলাল মল্লিকের মতো সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে[১১০] কেউ আর বাইজি নাচের আয়োজন করেন না, বাগানবাড়িতে রক্ষিতা পুষে সে কথা আর 'প্রকাশ্যভাবে' জানান না; সমাজের চোখে দূষণীয় নিন্দনীয় বলেই সম্ভ্রান্ত বাবুরা আমোদপ্রমোদের জন্য স্থান-কাল-পাত্র সংগ্রহ করে নিচ্ছেন। অন্যদিকে বাইজি বেশ্যারা নগরের প্রধান প্রধান রাস্তার ধারে নির্দিষ্ট এলাকায় বাড়িভাড়া করে থাকছেন। রক্ষিতাদের কারোর কারোর বাঁধাবাবু থাকলেও, বাবুত্বের বদলে যাওয়া সংজ্ঞায় তাঁরা তখন আপাত বিচারে অনভিজাত সাধারণ বাবুদেরও মনোরঞ্জন করছেন। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে বেশ্যা-নিয়ন্ত্রক 'চোদ্দ আইনে'র পরিপ্রেক্ষিতে জোড়াবাগান থেকে প্রকাশিত (১২৭৯ সাল) অঘোরচন্দ্র ঘোষের 'পাঁচালী কমলকলি'তে দেখা যায়,[১১১] নব্য বাবুরা চুলে বাহারি ছাঁট দিয়ে, পকেটে পাঁচ পয়সা নিয়ে 'রাঁঢ়ের বাড়ি এয়ারকিটি মাচ্ছে'। কিন্তু বাবুত্ব যে শ্রেণিচ্যুত হয়েছে, নতুন নাগরিক জীবনে 'বেশ্যাবাজি' যে আর মুষ্টিমেয় কিছু বাবুর অধিকারভুক্ত সম্পদ নয়, তা বোঝা যায়, যখন দেখা যায় :

'আট পয়সার মজুর যারা খাজুর চাটায় থাকে।
খাট পালঙ্কে খাসা বিছানায় শুচ্ছে লাখে লাখে॥

ভাই সাহেবরা কামিয়ে দাড়ি রাঁঢ়ের বাড়ি যায়।
হোঁদু বলে হোল-নাইট নির্ব্বিঘ্নে কাটায়॥
নায়ের মাঝি যারা তারা শুনে গুজব কথা।
আল্লা রছুল স্মরণ কোরে নভোর কোচ্ছে তথা॥
বলে হালা হর রোজ কি বেয়ে মরবো লা।
হরেশডাঙায় হ্যাকটা আত কাবার কোরে যা॥'

যে বেশ্যাবাজি ছিল বাবুদের শখের 'চরম', তার এহেন সাধারণীকরণ ঘটুক, স্বপ্নেও বোধ হয় এমন প্রত্যাশা আদিবাবুদের ছিল না। থাকলে অন্তত এই শখকে বাবুত্বের চরম বলে নির্দিষ্ট করতেন না। রাজনারায়ণ বসু যে ধারণা করেছিলেন, বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি মানে বাবুরও সংখ্যা বৃদ্ধি, এমনটি মোটেও নয়। আর্থিক ও সামাজিক আভিজাত্য না থাকলেও নতুন কালে বেশ্যাবাজি করা যায়। এর ফলেই সাধারণ মজুর, মাঝি, শ্রমিক প্রভৃতি লোকেরা পকেটে সামান্য পয়সামাত্র সম্বল করে বেশ্যাগমন করতে পেরেছে। আদিবাবুদের কাছে বেশ্যাবাজি ছিল মহার্ঘ 'শখ', নতুন বাবুয়ানার বাহকদের কাছে তা নিছক রতিনিবৃত্তির উপায়মাত্র।

বস্তুত, আদিবাবুদের কাছে ব্যক্তিগত আমোদপ্রমোদ নিছক ব্যক্তিগত উপভোগের বিষয় ছিল না। এ কারণেই ইয়ারদোস্ত সহ নিজের আনন্দকেও সর্বজনের চোখে উপভোগ্য করে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। পরবর্তী চাকরিজীবী মধ্যবিত্ত বাবুরা আর্থিক সীমাবদ্ধতা এবং সামাজিক অনুশাসনের ভয়েই এই পথ পরিহার করে গেলেন, যাঁরা অনুসরণ করলেন, তাঁরা তো প্রকাশ্যে আনতে দিলেন না। অর্থাৎ পরবর্তী যুগের বাবুরা ব্যক্তিগত আমোদপ্রমোদের মাত্রাকে আদিবাবুদের মতো সর্বজনীন না করে তুলে, নিছকই ব্যক্তিক উপভোগের স্তরে নামিয়ে আনলেন।

এমন অবনমন অবশ্য অনিবার্যই ছিল। আদিবাবুরা যে বিলাসী জীবন ও শখের অনুগামী ছিলেন, সেই আদর্শ তাঁরা পেয়েছিলেন নবাবি সংস্কৃতির অবশেষ থেকে। কোনো কোনো সমাজতাত্ত্বিক অবশ্য বলেন, 'এই নবাবির আদর্শ ছিল চোখের সামনে কলকাতারই ''ইংরেজ-নবাবরা'', যাঁরা অনুকরণ করতেন দেশি নবাবদের। ক্লাইভ, ভেরেলেস্ট, হেস্টিংসের নিত্য পার্শ্বচর বেনিয়ান-দেওয়ান-মুনশিরা নবাবির আদর্শ বলতে তাঁদের ইষ্টদেবদেরই দেখেছেন।'[১১২] কিন্তু তা বোধ হয় সম্পূর্ণ সঠিক নয়। কলকাতার আদিবাবুদের অনেকেই মুর্শিদাবাদ, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য ইত্যাদি কাজের সূত্রে বাস করতেন, নবাব-দরবারের সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁরা ওয়াকিবহাল ছিলেন যথেষ্ট পরিমাণে। মুর্শিদকুলি খাঁ-র সময় থেকে মুর্শিদাবাদে বহু জাতি ও বহু ধর্মের মানুষ এসে বাস করতে থাকেন, তাঁদের সামাজিক অবস্থানও ছিল নানাপ্রকার। নবাব-দরবারে ষড়যন্ত্র ও অন্যান্য অনৈতিক কাজ বন্ধ করবার অভীপ্সায় মুর্শিদকুলি বাঙালি হিন্দুদেরই কেবল রাজস্ববিভাগে নিযুক্ত করতেন, ফলে প্রচুর বাঙালি হিন্দু মুর্শিদাবাদে বাস করতেন।[১১৩] সেইসঙ্গেই সংস্কার মূলক নীতির ফলে 'যে নতুন ব্যাঙ্কার-ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয় তাদের অধিকাংশই হিন্দু।'[১১৪] সপ্তগ্রামেও ছিল মিশ্রসংস্কৃতির প্রবাহ। প্রথম যুগের দেওয়ান-মুনশি-বেনিয়ানদের অতএব 'ইংরেজ নবাব'দের দেখে নবাবি চালে অভ্যস্ত হতে হয়নি, বাংলার মোগল শাসনের সুদীর্ঘ পর্বে নবাবি সংস্কৃতি এবং তাঁদের বিলাসিতার কাহিনি অজানা ছিল না বাংলার মানুষজনের। অতএব দেশি নবাবদের কাছ থেকে আদিবাবুরাও বিলাস-ব্যসনের মাত্রাতিরেক আয়ত্ত করেছিলেন। 'ইংরেজ নবাব'রা দেশীয় নবাবিয়ানার

সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছিলেন নিজস্ব সংস্কৃতি, যা একান্তভাবেই সাগরপারের। কিন্তু আদিবাবুরা চালচলনে যতই দেশীয় নবাবদের অনুকরণের চেষ্টা করুন না কেন, আদতে তাঁরা ছিলেন রক্ষণশীল, ধর্মকৃত্য, প্রাত্যহিক জীবনযাপন ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে মেনে চলেছেন হিন্দু সমাজের সযত্নলালিত কাঠামো, এ কারণেই বিদেশি প্রভুদের চোখে বর্বর হলেও, উনিশ শতকের ১৮৩০-এর আগে দিব্যি টিকে থাকে সতীদাহ-সংস্কৃতি; এমনকী আইনবিরুদ্ধ হওয়ার পরেও এই প্রথার সমর্থনে সমাজের গরিষ্ঠ অংশ ইংল্যান্ডে আপিল করেন। অর্থাৎ আদিবাবুরা অন্তত মানসিক এবং সামাজিক কোনো দিক থেকেই ইংরেজ নবাবদের আদর্শ বলে ভাবেননি। নবাবি আমলে যে জীবনযাপন এই বাবুদের পূর্বপুরুষ কিংবা স্বয়ং নিজের পক্ষে অসম্ভব ছিল, অনুকূল পরিস্থিতিতে তাঁরা ওইরূপ জীবনযাপনের সুযোগ করে নিয়েছিলেন মাত্র। এইরকম বল্গাহীন বিলাসিতা হেস্টিংস, ভেরেলেস্ট, ক্লাইভ প্রমুখ উচ্চপদমর্যাদাসম্পন্ন এবং কোম্পানির প্রথম শ্রেণির কর্মচারীদের পক্ষেও করা সম্ভব ছিল না। অভিজাত জীবনযাপন (Aristocratic living) এবং বিলাসী জীবনযাপনের মধ্যে যে পার্থক্য, তা এঁরা মেনে চলতেন। আদিবাবুদের বিলাসী জীবনযাপন সাহেব- প্রভুদের মনে কখনো বিস্ময়, কখনো বিরক্তি, কখনো ছদ্ম-কৌতুকের ভাব উদ্রিক্ত করেছে। বিশপ হেবার পাথুরিয়াঘাটার বাবু হরিমোহন ঠাকুরের প্রাসাদ ও তার অন্দরসজ্জা দেখে মন্তব্য করেছেন, যদিও লোকে একে 'ইটালিয়ান ভিলা' বলে থাকে, তবুও 'the whole is little less Italian than the facade of his house, but on my mentioning this similarity, he observed that the taste for such things was brought into India by the Mussulmans.'[১১৫] জনৈক সাহেব সৈনিক লে'র (Leigh) চোখে, বাবুদের জীবনযাত্রায় নবাবি অনুকরণের ছাপ স্পষ্ট।[১১৬] সাহেব-প্রভুরা যে এজাতীয় জীবনযাপন ও আমোদপ্রমোদকে মোটেও শ্রদ্ধার চোখে দেখত না, সে প্রসঙ্গে শ্রীমতী ফেনটনের (Mrs. Fenton) প্রবাদপ্রতিম উক্তি মনে করা যেতে পারে। ১৮২৮ সালের ২৪ অক্টোবর বাবু রূপলাল মল্লিকের বাড়িতে নাচের আসরে উপস্থিত হয়ে শ্রীমতী ফেনটনের মূল্যায়ন : 'The Poor animal who exits on rice and ghee all the year, contented with the mat for his bed, here may be seen playing the liberal entertainer.'[১১৭] অতএব, আদিবাবুদের প্রথম যুগের মাত্রাছাড়া বিলাসিতা নবাবি রীতির অনুসরণ মাত্র। ১৮৩০-এর পর মূলত ইংরেজি শিক্ষিত বাবু এবং ইয়ং বেঙ্গলদের হাত ধরে বাঙালিবাবুদের জীবনে বিলিতি বিলাসিতার অনুপ্রবেশ ঘটে। হুতোমের আমলে এই বিলাসিতা প্রায় উন্মাদের মতো অনুসৃত হতে থাকে। স্মরণ করা যেতে পারে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী'র (১৮৯২) ব্যাং-সাহেবের কথা, যে কিনা 'মাথায় হ্যাট, গায়ে কোট, কোমরে পেন্টুলেন' পরে সাহেব সেজেছিল, যদিও তার 'রংটি কেবল ব্যাঙের মতো আছে, সাবাং মাখিয়াও রংটি সাহেবের মতো হয় নাই'। তবুও সে ভেবেছে, বাইরের পোশাক-পরিচ্ছদের চেকনাইতেই 'এখন হইতে আমাকে সকলে সেলাম করিবে, সকলে ভয় করিবে। যখন রেলগাড়ির তৃতীয় শ্রেণিতে গিয়া চড়িব, তখন সে গাড়িতে অন্য লোক উঠিবে না। টুপি মাথায় দিয়া আমি দ্বারের নিকট গিয়া দাঁড়াইব। সকলে উঁকি মারিয়া দেখিবে, আর ফিরিয়া যাইবে, আর বলিবে, "ও গাড়িতে সাহেব রহিয়াছে।"'[১১৮] এই সাহেবিয়ানার উন্মেষ ১৮৩০-এর সমকালে। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখেরা আদবকায়দায়, শিক্ষাদীক্ষায় পাশ্চাত্য থেকে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদ, চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে প্রাচ্য সংস্কৃতির শেকড়টাকে তাঁরা অস্বীকার করতে পারেননি। তাঁদের জীবনযাপনে প্রাচীন হিন্দু এবং মোগল নবাবি সংস্কৃতির এক সুচারু মেলবন্ধন ঘটেছিল, তা

অস্বীকার করা যায় না। আদিবাবুদের কালপর্বের অন্তর্ভুক্ত হলেও বিলাস-ব্যসনে তাঁরা সংযত রুচির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলেন।[১১৯] আর এই সংযত রুচির শিক্ষাটা তাঁরা পেয়েছিলেন ইউরোপীয়ান সভ্যতা ও শিক্ষার সংস্পর্শে এসে। উত্তরকালে রমেশচন্দ্র দত্তের মতো সিভিলিয়ানেরও মনে হয়েছে, 'The Hindu intellect came in contact with all that is noblest and most healthy in European history and literature, and profited by it. The Hindu mind was to some extent trained under the European thoughts and ideas, and benefited by it'[১২০] অর্থাৎ আদিবাবুদের মধ্যে এঁরা ছিলেন, 'intellect class', ফলে এঁদের আমোদপ্রমোদের আয়োজনে অসংযমের চিহ্নমাত্র ছিল না। আবার, রাধাকান্ত দেবের (১৭৮৪-১৮৬৭) কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তাঁর জীবনযাপনেও ছিল এই রুচি-সংযমের বোধ। সাধারণভাবে প্রাচীনপন্থী বলে পরিচিত রাধাকান্ত ছিলেন নবকৃষ্ণের দত্তক পুত্র। কিন্তু পালক পিতার মতো বাইজি-বিলাস কিংবা আখড়াই দল পালনে তাঁর শক্তি অপব্যয়িত হয়নি। নবকৃষ্ণের ঔরসজাত সন্তান বাবু রাজকৃষ্ণ যেখানে জীবনযাপনে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন, রাধাকান্ত দেব তাঁর রুচি-শিক্ষায়-স্বাতন্ত্র্যে তৎকালের হিন্দুসমাজের দলপতি পরিগণিত হয়ে উঠেছিলেন। 'বস্তুত ধর্ম্মে ও সামাজিক ব্যাপারে তিনি প্রাচীনপন্থী ছিলেন। কিন্তু জ্ঞান-বিস্তারকল্পে রাধাকান্ত চির-উদার।'[১২১] বিশপ হেবার তাঁর প্রাচ্য-প্রীতি এবং উদারতা উভয়েরই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করে তাঁকে 'one of the few sincere ones, it is said, among the present race of wealthy Baboos' বলেছেন।[১২২] উচ্চশিক্ষিত রাধাকান্ত তাঁর জীবনযাপন এবং আমোদপ্রমোদে প্রাচ্য-সংস্কৃতি অনুসরণ করেছেন ঠিকই, তবে 'intellect class' বলেই তাতে যুক্ত করেছিলেন সংযমের মাত্রা। বস্তুত, 'intellect class'-এর হাত ধরেই ১৮৩০-এর আগে আদিবাবুরা কিছুটা বিবর্তিত হলেন। এই বিবর্তন ঘটল রুচিতে, শিক্ষায়, জীবনযাপন-আমোদপ্রমোদে। পরবর্তীকালে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী এবং তদনুকরণকারী ইংরেজি শিক্ষিত নব্যবাবুরা এবং ভুঁইফোঁড় 'হঠাৎ নবাব'দের মাঝখানে এই 'intellect class' বস্তুত এক মিসিং লিঙ্ক।

বাবুদের সমষ্টিগত আমোদপ্রমোদের উপলক্ষ্য ছিল প্রধানত দুর্গাপূজা; স্নানযাত্রা, চড়কপূজা ইত্যাদি উপলক্ষ্যে বাবুরা আমোদপ্রমোদে মত্ত হতেন ঠিকই, কিন্তু এগুলি ছিল মূলত লোকায়ত উৎসব; বাবুদের যোগদান ছিল তাঁদের ব্যক্তিগত বিলাস। কিন্তু অষ্টাদশ শতক থেকেই, বিশেষ করে ভুঁইফোঁড় আদিবাবুদের উত্থানের পরবর্তীকালে দুর্গাপূজা হয়ে উঠেছিল তাঁদের স্ট্যাটাস সিম্বল। জনৈক ফরাসি সেনাধ্যক্ষের ভাষায়, 'All the rich celebrate a festival of this kind in their own houses, and are ambitious of displaying the greatest luxury, lighting up their apartments in the most splendid manner. Such as cannot afford to observe this solemnity at their own house, go to that of some neighbour.'[১২৩] ১৭৮৯-৯০ সালের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে করা এই মন্তব্যে লক্ষণীয়, ধনীবাবুরা প্রত্যেকেই দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে তাঁদের ঐশ্বর্য প্রদর্শনের প্রতিযোগিতায় নামতেন। যাঁরা তা পারতেন না, তাঁরা আর যাই হোক, 'বাবু' নন। নগর কলকাতার সামাজিক জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অবতীর্ণ বাবুরা দুর্গাপূজার মতো হিন্দু বাঙালির প্রধান উৎসবকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন মাত্র, একে 'ধর্মকৃত্য' বলে মনে করা আদৌ যথার্থ নয়।[১২৪]

আদিবাবুদের অনেক সংস্কৃতির মতো দুর্গাপূজা সংস্কৃতিও কৃষ্ণনাগরিক সমাজ থেকে গৃহীত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মহাসমারোহে দুর্গাপূজা করতেন, কলকাতা বিকাশের পর, মুর্শিদাবাদের নবাবি সম্পদ লুণ্ঠনের ভাগ পেয়ে যেসব ব্যক্তি এই নতুন নাগরিক সমাজে মুখ্য হয়ে উঠলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই আভিজাত্য

বদলানোর জন্য দুর্গোৎসবে অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন। ১৭৯২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর তারিখের 'ক্যালকাটা ক্রনিকাল' মহাসমারোহে দুর্গাপূজা করার ব্যাপারে খ্যাতিমান ধনীদের যে তালিকা পেশ করেছে,[১২৫] তাঁদের মধ্যে মহারাজা নবকৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ সিংহ, কেষ্টচাঁদ মিত্র, নারায়ণ মিত্র, রামহরি ঠাকুর, বারাণসী ঘোষ ও দর্পনারায়ণ ঠাকুরের বাড়ির পূজায় সাহেবরা যোগ দেবেন বলা হয়েছে। ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখের সংখ্যায় 'ক্যালকাটা ক্রনিকাল' রাজা সুখময় রায়ের বাড়িতে দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত নাচসভার বিবরণ জানিয়ে বলা হয়, 'The only novelty that rendered the entertainment different from those of last year was the introduction, or rather the attempt to introduce, some English tunes among the Hindoostance music...[১২৬] প্রচলিত ধর্মকৃত্যে আস্থা থাকলে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে মুসলমান বাইজির নাচ, সাহেবদের জন্য সামাজিক বিচারে 'অখাদ্য-কুখাদ্য' পান-ভোজনের ব্যবস্থা করা, বিজাতীয় বিলিতি সুর বাদন— এসব সম্ভব ছিল না। ১৮২৩-এও দেখা যায়, দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে সাহেবদের সমাবেশ ঘটেছে ধনীবাবুর বাড়িতে এবং ফ্যানি পার্ক্‌স-এর বিবরণ অনুযায়ী, বিখ্যাত 'গান্টার অ্যান্ড হুপার' খাদ্য সরবরাহের দায়িত্বে ছিলেন উক্ত উৎসবে।[১২৭] কলকাতার অন্যতম বাবু রূপলাল মল্লিক রীতিমত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে উৎসব পালন করতেন। বহু সাহেবসুবোর ভিড়ে তাঁর বাড়ি উপচে পড়ত। প্রাণকৃষ্ণ হালদার তাঁর চুঁচুড়ার বাড়িতে এভাবে বিপুল অর্থব্যয়ে দুর্গাপূজার আয়োজন করে কলকাতার সম্ভ্রান্ত বাবুদের প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠেছিলেন।

'ক্যালকাটা ক্রনিকালে' উল্লিখিত বাবুরা ছাড়াও অন্যান্য সম্ভ্রান্তরাও দুর্গোৎসবের আয়োজন করতেন, তবে এঁরাই ছিলেন প্রধান। এঁরা ছাড়াও গোবিন্দরাম মিত্রের পুত্র রঘুনাথ মিত্রও জাঁকজমকের সঙ্গে দুর্গাপূজা করতেন বলে জানা যায়।[১২৮] উল্লিখিত বাবুদের প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন দেওয়ানি-বেনিয়ানির দ্বারা উপার্জিত অর্থে ধনী; নবকৃষ্ণ কেবল মুর্শিদাবাদের লুণ্ঠিত নবাবি সম্পদে জায়মান ভুঁইফোঁড় 'মহারাজা'; এবং মহারাজা সুখময় ছিলেন মাতামহ লক্ষ্মীকান্ত ধর ওরফে নকুড় ধরের অর্থবিত্ত সম্পদে ধনী। রাজভক্তির পুরস্কার স্বরূপ হেস্টিংসের আমলে ইনি 'রাজাবাহাদুর' খেতাব ও স্বর্ণপদক লাভ করেন। উল্লিখিত বাবুদের মধ্যে কেষ্টচাঁদ মিত্র ছিলেন রঘুনাথ মিত্রের (ইনি মারা যান ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে) সন্তান, ইনি ঢাকার কালেক্টরের দেওয়ান ছিলেন। বারাণসী ঘোষ ছিলেন সেকালের বিখ্যাত 'বাবু'। ইনি চব্বিশ পরগনার কালেক্টর 'আইন-ই-আকবরি'র অনুবাদক গ্লাডুইন সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। বিবাহসূত্রে ইনি কালীপ্রসন্ন সিংহের পিতামহ শান্তিরাম সিংহের কন্যাকে বিবাহ করেন। শান্তিরাম ছিলেন মি. মিডলটন ও স্যার টমাস রামবোল্ডের যথাক্রমে পাটনা ও মুর্শিদাবাদ কুঠির দেওয়ান। প্রাণকৃষ্ণ সিংহ এঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র। পাথুরিয়াঘাটার দর্পনারায়ণ ঠাকুর এবং রামহরি ঠাকুর সদৃশভাবে বিপুল অর্থবিত্তের অধিকারী হয়েছিলেন। অন্তত ১৮৩০-এর সময়কাল পর্যন্ত এই বংশগুলি সঞ্চিত অর্থের প্রদর্শনে দুর্গাপূজার ব্যবস্থা করা, সাহেবদের ডিনার খাওয়ানো, বাইজি নাচের আসর বসিয়ে বন্ধুবান্ধব আপ্যায়ন, এসব করে গেছেন। এই সময়কার ইংরেজি-বাংলা সংবাদপত্রে, সাহেবসুবোদের ডায়েরি বা ভ্রমণ-অভিজ্ঞতায় এসবের প্রচুর খোঁজ মেলে। কিন্তু ধীরে ধীরে ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালিবাবুরা সমাজে ভিড় করতে থাকলে, সেইসঙ্গে অপরিমেয় অর্থসম্পদের ব্যয়বাহুল্যে পুরাতন বিত্তপতি কিংবা তাঁদের বংশধরেরা অবস্থাবৈগুণ্যে দুর্গাপূজা ইত্যাদির সমারোহ অনেকটাই কমিয়ে ফেলেন। ১৮৩০ সালের পর পুরাতন সংবাদপত্রগুলিতে প্রচুর বারোয়ারি পূজা অনুষ্ঠিত হওয়ার সংবাদ মেলে, তার কারণ সম্ভবত দেওয়ানি, বেনিয়ানির পদ দুর্লভ হওয়ায় এইসময়

বাঙালি নব্যবাবুরা স্বল্পবেতনের কিন্তু সম্মানজনক চাকরির প্রতি ঝোঁকেন। ফলে আদিবাবুদের আমোদপ্রমোদ, বিলাসী হুল্লোর তাঁরা আর অনুকরণ করেননি। অবশ্য, তারপরেও বিত্তবান পরিবারগুলির কেউ কেউ দুর্গাপূজার আয়োজন করেছেন, এমনকী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো গোঁড়া ব্রাহ্মও পরিবারে দুর্গাপূজা বন্ধ করতে পারেননি বা করেননি। এ বিষয়ে 'আত্মজীবনী'-তে তিনি বলেছেন, 'দশ বৎসর হইল তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, এখনও আমাদের বাড়িতে পূজা হয়,— দুর্গাপূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজা। সকলের মনে কষ্ট দিয়া, সকলের মতের বিরুদ্ধে, আমাদের ভদ্রাসন বাড়ি হইতে চিরপ্রচলিত পূজা ও উৎসব উঠাইয়া দেওয়া আমার কর্তব্য বোধ হইতেছে না। আমি আপনিই ইহাতে নির্লিপ্ত ও স্বতন্ত্র থাকি, তাহাই ভাল।'[১২৯] এই দ্বিধাদ্বন্দ্বও পরবর্তী বাবুদের স্বভাব বৈশিষ্ট্য। ইয়ং বেঙ্গলদের অনেকেই পরবর্তীকালে হিন্দুত্বের পুরাতন চালে ফিরে এসেছিলেন।[১৩০]

আদিবাবুরা যে কেবল দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা করে খুশি হতেন এমন নয়। কারণে অকারণে তাঁরা পার্টি দিতেন। এই পার্টি-কালচার অবশ্যই সাহেবদের অবদান। ট্যাভার্ন এবং পাঞ্চ হাউসগুলিতে নানান শ্রেণির সাহেবরা মিলিত হতেন; তাঁদের মধ্যে জন কোম্পানির নানান পদমর্যাদার কর্মচারীরা যেমন আছেন, তেমনি সাধারণ সৈনিক, জাহাজি, ভাগ্যসন্ধানী বাউণ্ডুলেরাও ভিড় জমাতেন। ফলে উচ্চপদস্থ সাহেব কর্মচারীরা আমন্ত্রিত অতিথি বন্ধুবর্গের জন্য পার্টি দিতেন। কলকাতায় যে হররোজ পার্টি চলে, সেই ১৮৭৭ সালেই এক সাহেব জানিয়েছিলেন সেকথা।[১৩১] আর লর্ড ভ্যালেনশিয়া তো জানাতে ভোলেননি,[১৩২] The society of Calcutta is numerous and gay; the fetes given by the Governor General are frequent, splendid, and well arranged. The chief Justice, the Members of council, and Sir Henry Russel, each open their houses once a week for the reception of those who have had the pleasure of being presented to them. Independently of these, hardly a day passes, particularly during the cool season, without several large dinner parties being formed, consisting generally of thirty or forty.' সাহেবদের এই পার্টি-প্রীতি প্রভুভক্ত, বাঙালিবাবুদের, সাহেব-প্রিয় বাঙালিবাবুদের, প্রতিষ্ঠাকামী বাঙালিবাবুদের মনে ধরেছিল, প্রায়শই পার্টির আয়োজন করে, সাহেবসুবোদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে বাবুরা আসলে তাঁদের উন্নতি ও ভাবী প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে চাইতেন। বাঙালিবাবুরা এসব আসরে নাচের ব্যবস্থা রাখতেন, সাহেবি কোম্পানি খানা সরবরাহ করতেন, অঢেল পানীয়র ব্যবস্থা করতেন এবং এসবের মাধ্যমে ব্রিটিশ রাজের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতেন। রামমোহন রায়ের মতো intellect class বাবুদেরও এ জাতীয় পার্টি দেওয়ার অন্যতম কারণ, সাহেব-মহলে নিজের প্রভাব বজায় রাখা। অন্যান্য বাবুদের মধ্যে রূপলাল মল্লিক প্রায়ই এজাতীয় পার্টির আয়োজন করতেন। সেকালের বহু বিখ্যাত-স্বল্পখ্যাত সাহেবসুবোরাই রূপলাল মল্লিকের আয়োজিত পার্টিতে যোগ দিতেন। ফ্যানি পার্কস, শ্রীমতী ফেনটন প্রমুখ অনেকেই তাঁর দেওয়া পার্টির খুঁটিনাটি বর্ণনা করে মন্তব্য করেছেন। বিনিময়ে রূপলাল মল্লিক গভর্নর জেনারেলের কাছ থেকে 'ছয় পারচার খেলাৎ সরপেচ কলগায় সমাদৃত হন।'[১৩৩] বড়োবাজারের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী নিমাইচাঁদ মল্লিকের অষ্টম পুত্র মতিলাল মল্লিকও প্রায়ই এ জাতীয় পার্টি দিতেন। ১৮২৩ সালের ১৫ মার্চ মতিলাল মল্লিকের শুঁড়ার বাগানবাড়িতে নাচ-গান, খানাপিনার বিরাট মজলিশের বিবরণ বিলেতের 'এশিয়াটিক জার্নালে' পর্যন্ত প্রকাশিত হয়।[১৩৪] অন্যদিকে, দ্বারকানাথ ঠাকুর সাহেবসুবো এবং বন্ধুবর্গকে আপ্যায়ন করবার জন্যই বেলগাছিয়া ভিলা তৈরি

করেন। এইসব উৎসবে তখনকার দিনের উচ্চপদস্থ সাহেব-কর্মচারীরা প্রায় সকলেই উপস্থিত হতেন। বেলগাছিয়া ভিলার উৎসবগুলির মতো বিলাসবহুল ও জমকালো উৎসব সে যুগে খুব কমই হত।[১৩৫] এ উদ্দেশ্যে সমকালীন সমাজে ছড়া রচিত হয়—

> বেলগাছিয়ার বাগানে নয় ছুরি কাঁটার ঝন্‌ঝনি,
> খানা খাওয়ার কত মজা, আমরা তার কি জানি?
> জানেন ঠাকুর কোম্পানি।'[১৩৬]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জানিয়েছেন: 'যখন এখানে গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ড ছিলেন, তখন আমাদের বেলগাছিয়ার বাগানে অসামান্য সমারোহে গভর্নর জেনারেলের ভগিনী মিস্ ইডেন প্রভৃতি অতি প্রধান প্রধান বিবি ও সাহেবদিগের এক ভোজ হয়। রূপে, গুণে, পদে, সৌন্দর্যে, নৃত্যে, আলোকে আলোকে, বাগান একেবারে ইন্দ্রপুরী হইয়া গিয়াছিল।'[১৩৭] 'ক্যালকাটা ক্যুরিয়ার' ও 'বেঙ্গল হরকরা' থেকে জানা যায় ১৮৪০ ও ১৮৪১ সালে এ-রকম বহু ভোজ বা পার্টি হয়। দ্বারকানাথ চব্বিশ পরগনার কালেক্টরের অধীনে সেরেস্তাদার ছিলেন। পরে তদানীন্তন সদর বোর্ডের সেক্রেটারি হেনরি মেরিডিথ পার্কার তাঁকে নিমকি বোর্ডের দেওয়ান করেন। ১৮৩৪ সালে দেওয়ানি ত্যাগ করে তিনি 'কার ঠাকুর কোম্পানি' খুলে স্বাধীন ব্যাবসা শুরু করেন। তাঁর রাজভক্তির পুরস্কারস্বরূপ গভর্নমেন্ট তাঁকে ১৮৩৫ সালের আগস্ট মাসে 'জাস্টিস অব দি পীস্' বা কলকাতার শান্তিরক্ষক করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি এই সম্মান লাভ করেন। একইসঙ্গে বিলেত-ভ্রমণের সময় তিনি ইংল্যান্ডের রানির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার বিরল সম্মান লাভ করেন। বলা বাহুল্য, সেকালের অনেক বিত্তবান বাবু জানান খেলাত ও রাজকীয় পদমর্যাদা লাভের জন্য এভাবেই পার্টি প্রভৃতি সমষ্টিগত আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা করতেন, উল্লিখিত বাবুরা তার কিঞ্চিন্মাত্র।

প্রসঙ্গত, উল্লেখযোগ্য যে, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, রাস কিংবা চড়ক পূজায় কোনো কোনো বাবু অংশগ্রহণ করতেন ঠিকই, কিন্তু সেখানেও 'ধর্মকৃত্য' জনিত কোনোপ্রকার আচার-আচরণের চিহ্ন মেলে না। পোষা রক্ষিতা কিংবা ভাড়া করা মেয়েমানুষ সঙ্গে নিয়ে, মদ-আফিম সহ নানাপ্রকার নেশার দ্রব্যসহ, বন্ধুবর্গ ও মোসাহেব-পরিবৃত বাবু নিতান্তই ব্যক্তিগত আনন্দ-উপভোগের ছুতো খুঁজে নিতেন মাত্র। নতুন ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অর্থই ছিল তাঁদের মোক্ষ, আরাধ্য সব। ঠাকুরকে তাঁরা নাটমন্দির কিংবা দোলমঞ্চের ঘেরাটোপে রেখে নিশ্চিন্ত ছিলেন। বংশের কুলদেবতা ও গৃহদেবতাকে পূজার বিধি চালু রেখেছিলেন এমনকী সাহেবি নব্যবাবুরা। তার কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই কলকাতার মিশ্র সমাজ-সংস্কৃতিকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও পদমর্যাদা উক্ত কুলদেবতা বা গৃহদেবতা নির্ভর ছিল। এ কারণেই অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ নিয়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে ছলনা করতে চান ভুঁইফোঁড় নবকৃষ্ণ কিংবা বাংলাদেশের সমস্ত বিখ্যাত বিগ্রহগুলি জড়ো করে 'সভা-বাজার' স্থাপন করেন, ঠিকাদার গোকুল মিত্র বিষ্ণুপুরের মদনমোহন মর্টগেজ হাতিয়ে বাগবাজার প্রতিষ্ঠা করেন, বিলাসীর চরম মতিলাল মল্লিক চৈতন্য-আস্বাদিত পারিবারিক পুঁথির সিংহভাগ দখল করে রাধা-শ্যামসুন্দর ও রাজরাজেশ্বর শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠা করেন। নানাপ্রকার সংস্কারকে কেন্দ্র করে এইসময় হিন্দু রক্ষণশীলদের পক্ষ থেকে যেসব প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের চেষ্টা হয়েছে, সেখানে তাকালেও দেখা যায়, আদতে তা বিশেষ বিশেষ দলভুক্ত বাবু ও তাঁর পোষ্য স্মার্ত-ব্রাহ্মণদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই। নতুবা যে বাবুরা সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবাদের পুনর্বিবাহের আন্দোলনে হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধতা, সংস্কার বিষয়ে

রক্ষণশীল অনড় মনোভাব দেখান, তাঁরাই 'লোকে পূজার রাত্রিতে যেমন প্রতিমা দর্শন করিয়া বেড়াইতেন, বিজয়ার রাত্রিতে তেমনই বেশ্যা দেখিয়া বেড়াইতেন।'[১৩৮] বাঙালি হিন্দুর চরিত্রে ধর্মবোধের ভিত্তি এমনিতেই শিথিল, তার উপর অষ্টাদশ-উনিশ শতকের নাগরিক কলকাতার বিমিশ্র সংস্কৃতির মাঝে এই ধর্মভিত্তি প্রায়ই অদৃশ্য। আদিবাবুরা জাতিচ্যুত হওয়ার ভয়ে প্রকাশ্যে দুর্গাদালান, ঠাকুরবাড়ি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করতেন এবং সাধারণ লোকাচার মেনে চলার চেষ্টা করতেন; অশাস্ত্রীয় কোনো কাজ করে ফেললে অর্থব্যয় করে পুনরায় হিন্দুসমাজভুক্ত হতেন কিংবা তাঁদের পোষ্য পণ্ডিতেরা নানান ন্যায়শাস্ত্রের বিধান দেখিয়ে উক্ত অশাস্ত্রীয় কাজকে সমর্থন করতেন। উনিশ শতকীয় কলকাতার নাগরিক পরিবেশে ধর্ম ছিল তাঁদের হাতের মুঠোয়, নাম, যশ, খ্যাতির লোভে উক্ত বাবুদের কেউ কেউ দেবালয়, মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন বা প্রতিষ্ঠিত হতে অর্থ সাহায্য করেছেন, সেইসঙ্গেই মন্দির প্রতিষ্ঠা করে নিজের 'বড়োমানুষি কবলেছেন'। তা ছাড়া intellect class-এর মধ্যে প্রচলিত পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম নিয়ে যে দ্বিধা সংশয়ের জন্ম হয়েছিল, তার ফলেও বড়োমানুষ বাবুদের ধর্মকৃত্যের চেনা ছক বিপর্যস্ত বিভ্রান্ত হয়েছে। ব্রাহ্মবাবুদের অনেকে যেমন মন্দির-গামী হয়েছেন (যেমন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ), তেমনি হিন্দুধর্মের রক্ষক বাবুরাও পরবর্তীকালে মন্দির প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা সভা-সমিতি, স্কুল স্থাপনে অনেক বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। ধর্মকৃত্য অপেক্ষা সমাজকৃত্যের দ্বারা যশলাভের পথ গ্রহণযোগ্য হওয়ায়, এই পথই তাঁরা গ্রহণ করেছেন। ফলে, জনসংখ্যা রাজধানী শহরে বেড়ে চললেও, ১৮৫৬ সালের স্ট্রিট ডিরেক্টরিতে ২৪টি শিবমন্দির, পাঁচটি কালীমন্দির, চারটি পঞ্চানন ঠাকুরের মন্দির, পনেরোটি পারিবারিক ঠাকুরবাটী, দু'টি জগন্নাথ মন্দির এবং একটি গোপাল জীউর মন্দির, সর্বমোট একান্নটি মন্দিরের তালিকা মেলে।[১৩৯] কলকাতার তৎকালীন প্রতিষ্ঠাকামী বাবুদের সংখ্যা বিচার করলে মন্দিরের সংখ্যা যথেষ্ট কমই বলতে হয়; তার উপর, এই তালিকার বেশকিছু মন্দির জনসাধারণের সম্মিলিত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে কথাও মনে রাখতে হবে। অতএব উৎসবাদি উপলক্ষ্যে আমোদপ্রমোদই মুখ্য ছিল, ধর্মকৃত্যের মনোভাব আদৌ ছিল না মনে হয়। সাধারণভাবে বলা চলে, বাবুদের আমোদপ্রমোদের ধরনধারণে নবাবি সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ অনুকরণ থাকলেও, বিচ্ছিন্নভাবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশও ঘটছিল। ১৭৯২ সালে মহারাজা সুখময় রায়ের বাড়িতে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে আয়োজিত উৎসবে হিন্দুস্থানি গানের সঙ্গে বিলিতি সুরের মিশ্রণই তার প্রমাণ। তবে আরও স্পষ্টভাবে, রামমোহন রায়ের হাত ধরে বাবুদের আমোদপ্রমোদের সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্য রুচি, আদবকায়দা অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের হাতে তা চরমতমভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমোদপ্রমোদের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি পোশাক-আশাকের ক্ষেত্রেও বাবু-সংস্কৃতির বিবর্তন চোখে পড়ে। প্রাচীন হিন্দু বাঙালির পোশাক-পরিচ্ছদে বাহুল্য ছিল না, কিন্তু বৈশিষ্ট্য ছিল। বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণে' প্রাচীন বাঙালির পোশাকের সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায়[১৪০]—

> 'একখান কাচিয়া পিন্ধে আরখান মাথায়ে বান্ধে
> আরখান দিল সর্ব্ব গায়ে।'

এই তিন প্রস্থ পোশাক পরার প্রাচীন রীতি যে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ ও উনিশ শতকের প্রথম দিকেও বজায় ছিল তা জানা যায়, বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ এবং ইউরোপীয় শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্র থেকে। সাধারণ বাঙালি অবশ্য খাটো ধুতি পরত কেবল, উর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন গাত্র থাকত; সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া সাধারণের

মধ্যে পাদুকা ব্যবহার তখনও চালু হয়নি। মহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, সাধারণ গৃহস্থ বাড়িতে খালি গায় ও খালি পায়ে থাকতেন।[১৪১] তবে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সাজসজ্জায় যে পরিবর্তন এসেছিল, তা অনুমান করা যায়, পলাশির যুদ্ধের অব্যবহিত আগে সমাপ্ত, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'র বিদ্যাসুন্দর অংশে সুন্দরের সাজ-পোশাকের বিবরণ থেকে[১৪২]—

'আপনি সাজায় ঘোড়া মনোহর সাজ।
আপনার সুসাজ করয়ে যুবরাজ॥
বিলাতী খেলাত পরে জরকশী চীরা।
মাণিক কলগী তোরা চকমকে হীরা॥
গলে দোলে ধুকধুকি করে ধক্‌ধক্‌।
মণিময় আভরণ করে চকমক॥'

পরবর্তীকালে সাহেব-প্রভুদের কাছ থেকে 'খেলাত' প্রাপ্ত অনেক 'বাবু'র পোশাক ছিল সুন্দরের মতোই, সঙ্গে আনুষঙ্গিক আর কিছু উপকরণ যুক্ত হয়েছিল মাত্র। আদিবাবুরা সাধারণত দু'ধরনের পোশাক পরতেন, যথা— কাজের পোশাক এবং অবসরের পোশাক। কাজের পোশাকে স্বভাবতই কোনো বৈচিত্র্য ছিল না তেমন। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আপনার মুখ আপনি দেখ'-তে যশচন্দ্রবাবুর মুখ থেকে জানা যায়,[১৪৩] 'আগে যাঁহারা দেওয়ান মুচ্ছুদ্দিগিরি প্রভৃতি ভাল ভাল কর্ম্ম কোরে গিয়েচেন, তাঁরা আটহাত একখানা থানফাড়া ধুতি পোরে, বন্দ দেওয়া একটী চাপকান ও পাঁচহাত একখানা চাদর গায়ে দিয়ে, (হয় পরা কাপড় ছেঁড়ার না হয় সুঁটে থানের) একটী পাগড়ী বেঁধে গোলপাতার ছাতা ধরিয়ে কুটী যেতেন।' সেকালে নবকৃষ্ণ, রামদুলাল দে প্রমুখেরা এভাবেই কাজে যেতেন সন্দেহ নেই। প্রাচীন কাঠখোদাই কিংবা এনগ্রেভিং করা ছবিতে এ জাতীয় পোশাকেই বাঙালি দেওয়ান মুচ্ছুদ্দিদের দেখা যায়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে,[১৪৪] ধোত্র বা ধুতি, উত্তরীয় বা অঙ্গবস্ত্র বা চাদর এবং শিরোবস্ত্র বা পাগড়ি— এই তিন প্রস্থ পোশাক ছিল বাঙালির 'full dress বা সামাজিক ভদ্র পোশাক'। সম্ভ্রান্তরা রাজপুত বা মুসলমানি পোশাকে আঙ্গিয়া বা আচকান পরতেন। আঠারো-উনিশ শতকে সাদা সুতির কাপড়েই সেরজাই বা 'বেনিয়ান', সুতো বা ঝিনুকের বোতামের বদলে দড়ি বা ফিতা দিয়ে যা ভিতর দিকে বাঁধা হত, বাবুরা তাই পরতেন। রাজারাজড়া বা পদস্থ ব্যক্তিরা টুপির পরিবর্তে মুসলমানী ধরনে জরিদার 'তাজ' পরতেন। তাঁর মতে, 'খাঁটি বাঙ্গালি বাঁধা পাগড়িও নানান্‌ ধরনের হইত, যথা— "পাক, পাগ, পাপড়ি, ফেটা, মুরেঠা বা মুররেঠা (মুণ্ডবেষ্ট)",— এগুলি, যত দূর জানা যায়, কেবল শ্বেতবর্ণ সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড, লঘু শিরোবেষ্টনী আকারে মাথায় জড়ানো হইত, এবং এইরূপ পাগড়ি বাঙ্গালি ব্যবসায়ী বা বৈশ্যবৃত্ত পদস্থ ব্যক্তিরাই ব্যবহার করিতেন।' 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত 'বাবুর উপাখ্যানে' দেখা যায়, বাবু উমেদারদের ছলনা করার জন্য মজলিশে পদার্পণ করেই চাকরকে হুকুম দিয়েছেন, 'আমার জামা জোড়া পাগ ইত্যাদি পোশাকে তৈয়ার রাখ, কল্য দরবার যাইব।'[১৪৫] মাথায় পাগ বা পাগড়ি বাঁধার এই রীতি নবাবি-শাসন বাহিত হওয়াই সম্ভব। ঘনরামে পাওয়া যায়, 'রাজসভা যাইয়া মাথায় ফেলে পাগ', অন্যদিকে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের মানসিংহ বা কালিকামঙ্গল অংশে সাধারণ সৈনিকের সাজসজ্জাতেও পাগের ব্যবহার চোখে পড়ে—

'ফেলিয়া বন্দুক জামা পাগ তলবার।
ঢাল বুকে দিয়া দিল সিপাই সাঁতার॥'[১৪৬]

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা পাশে নানা ধরনের রত্নাদি ব্যবহার করতেন মনে হয়। বাবু রামরত্ন মল্লিকের পুত্রের বিবাহে বর্ধমানের মহারাজা প্রতাপচন্দ বাহাদুর শিরোবেষ্টনীতে একখানি হীরক ধারণ করে আসায়, ছদ্মবেশে থাকা সত্ত্বেও তাঁকে চিনে ফেলেন সূর্যকুমার ঠাকুর।[১৪৭] সাদা পাতলা কাপড়ের টুকরো দিয়ে 'লঘু শিরোবেষ্টনী' বাঁধাকে সম্ভবত 'ফেটী পাক্ড়ী' বলা হত। 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়ে' (১৮৭৫) আক্ষেপ করা হয়েছে এই বলে যে,[১৪৮] 'মাথায় প্রায় কোন কুঠীওয়ালা ফেটী পাক্ড়ী বাঁধেন না।' তবে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই কাজের পোশাকে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটতে থাকে। 'কলিকাতা কমলালয়ে' (১৮২৩) স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, কোনো কোনো ভদ্রলোকের সন্তানেরা 'ধুতি প্রভৃতি বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া ইজার জামাজোড়া ইত্যাদি পরেন কালচর্ম্মের পাদুকা ফিতেবান্ধা গোড়তোলা মাথা নেড়াবোঁচা সকল পায়ে দেন।'[১৪৯] এইরূপ 'হিন্দুস্থানি পোশাক' দরবার কিংবা মজলিশে যাওয়ার জন্যও পরা হত কখনো কখনো। সাধারণভাবে কাজের পোশাকে এই পরিবর্তন আদিবাবুদের দ্বিতীয় প্রজন্মের কালেই ঘটে, তবে মজলিশের পোশাক তথা অবসরের পোশাক সাদাসিধে ছিল না কোনোকালেই। 'নববাবুবিলাস' রচনার কালেই অর্থাৎ ১৮২৫-এর মধ্যেই বাবুদের কুঠি যাওয়ার পোশাক হিসাবে 'জামাযোড়া চাপকান পাজামা পাপেষ-পাগড়ী আমামা লাড়ুদার মেড়োসা চাকাবাকা' ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের দামি দামি পোশাকের কথা জানা যায়।[১৫০] পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্পর্শের প্রভাবে দেশি ও নবাবি ঘরানার এই সংমিশ্রিত পোশাকে প্রায় বিলিতি ধরনে পর্যবসিত হয়। 'আপনার মুখ আপুনি দেখ'র মতে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে '... দেওয়ান মুচ্ছদ্দি প্রভৃতি ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের ছেলেদিগের মধ্যে অনেকেই খুব উঁচু চালে চোলেচেন, আট টাকার, দশ টাকার জুতো পায়ে, ভাল মোজা ও পেন্টুলেন পরা, পাইনাপেল, তশর, গরদ, কোরা, আলপাকা, কাশ্মীর, ক্যামলেট ও বনাতের চাপকান গায়ে, ভিতরে কাহারও প্লেটওলা কামেজ কাহারও ওয়েশকোট, কাহারও সাটীনের কিম্বা কিংখাপের ফতুই আছে, সালের বাঁধা পাগড়ী মাথায়, কেহবা সিলভার জেনিভা ওয়াচে চুলের চেইন ঝুলিয়েচেন, কেহবা গোলডেন মেকাবি আদুলির মতন হন্টীং ওয়াচে সোনার কচড়া মোটা ইংরাজের সপের চেন লাগিয়েচেন, তাতে গণ্ডারের মূর্ত্তিতে ঘড়ির চাবি মুখে কোরে ঝুলচে, তার সঙ্গে দু'চারখানা চুণি-পান্না ও পাথরও আছে, কাহারও বা ওয়াচ্ গার্ডও রোয়েছে। দু'হাতের আঙ্গুলে তিন চারটে আংটী ঝকমক কোচ্চে, বিলিতি পারফিউমারি ও আতর গোলাপের গন্ধ ভরভর করে হাওয়ার সঙ্গে ছুটচে।'[১৫১] কাজের পোশাক হিসাবে সম্ভ্রান্ত বাঙালির এ এক অভিনব সাজসজ্জা বটে, পোশাকে ইঙ্গ-বঙ্গ সংস্কৃতির মিশ্রণ চোখে পড়ে, যদিও বর্ণনায় অতিশয়োক্তি থাকা সম্ভব। এ বাবুদের কাজের পোশাক, না কি অবসরের, সে ব্যাপারে সন্দেহ জাগে 'বিলিতি পারফিউমারি ও আতর গোলাপের' ভুরভুর গন্ধের বাড়াবাড়িতে। সম্ভবত, এই সময় চাকরিজীবী বাঙালিবাবুরা মাথায় পাগড়ি বাঁধার রেওয়াজ পরিত্যাগ করেন এবং মেরজাইয়ের বদলে 'পিরান' ব্যবহার করতে থাকেন। সেইসঙ্গেই কর্মচারী মাত্রেই 'প্যান্টুলেন চাপকান' ব্যবহার করতে শুরু করেন।[১৫২] বাঙালিবাবুদের কাজের পোশাকে যে সাহেবিয়ানা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল, সন্দেহ নেই।

শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (১৯০৪) গ্রন্থে 'বাবু'দের সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন, তাদের (বাবুদের) 'মুখে, ভ্রূপার্শ্বে ও নেত্রকোলে নৈশ অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ কালিমা রেখা, শিরে তরঙ্গায়িত বাউরি চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে ফিনফিনে কালাপেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেমরিকের বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুনট করা উড়ানী ও পায়ে পুরু বগলস সমন্বিত চিনের বাড়ীর

জুতা।'[১৫৩] বাবুদের অবসরের পোশাক বিষয়ে এই বর্ণনা মোটামুটি ইতিহাসসম্মত। কাজের পোশাক হিসাবে আদিবাবুরা উত্তরকালে বিলিতি প্রভাবকে অস্বীকার করতে না পারলেও, অবসরের তথা বিনোদনের পোশাক হিসাবে দেশীয় ধুতি-বেনিয়ানকে আপন করে নিয়েছিলেন। 'নববাবুবিলাসে' দেখা যায়, খলিফা নববাবুর জন্য এক গাঁটরি বস্ত্র নিয়ে এসেছেন, যার মধ্যে থেকে 'শান্তিপুর, অম্বিকা, বাদাগাছি, ঢাকা, চন্দ্রকোণা, খাসবাগান, বরাহনগর প্রভৃতি নানাস্থানের শাটী শালপেড়ে, কাঁকড়াপেড়ে, লালপেড়ে, নীলপেড়ে, তাবিজপেড়ে, বরানগুরে ডুরি' ব্যক্তিবিশেষ পরিধান করেন।[১৫৪] বাবুবিলাসের প্রথম যুগে শান্তিপুর, অম্বিকা, বাদাগাছি, ঢাকা, চন্দ্রকোণা, প্রভৃতি স্থান থেকে উৎকৃষ্টমানের ধুতি আসত, সন্দেহ নেই। তখনও সম্ভবত বিলিতি মিলে প্রস্তুত ধুতি বাংলার বাজারে দেখা দেয়নি। যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা থেকে অনুমান করা যায়,[১৫৫] ঢাকাই এবং শান্তিপুরি কাপড়ের পাড়ে নক্সা থাকত, ফরাসডাঙার কাপড়ের পাড়ে কোনোরূপ নকশা থাকত না, 'ধনবান জমিদারগণ ঢাকাই, শান্তিপুরী বা ফরাসডাঙার ধুতি ও শাড়ী ব্যবহার করিতেন।' দেশি কালোপেড়ে ধুতির পাড়ের রং বেশ পাকা ছিল বলে, স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত এবং সাধারণ গৃহস্থের কালোপেড়ে ধুতিই পছন্দ ছিল। বাবুরাও সম্ভবত কালোপেড়ে ধুতি ব্যবহার করতেন সাধারণভাবে। 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত চিঠির (১৫.০৯.১৮২১) সাক্ষ্য থেকেও এই বক্তব্য সমর্থিত হয় যে: 'বাবু পরেন স্বর্ণ, মুক্তা, হীরা প্রভৃতির আভরণ অর্থাৎ দোনরি, তেনরি, পাঁচনরি হার, বাজুবন্ধ উপলক্ষ্যে ইষ্ট কবচ গোট চাবির শিকলি ইত্যাদি গহনা। ও কালাপেড়্যে রাঙ্গাপেড়্যে, শালপেড়্যে, কাঁকড়াপেড়্যে লিখক কহে ইচ্ছা হয় ছাইপেড়্যে ধুতি পরিধান করেন... আর ঐ নটবর বেশ বিন্যাস দেখিলে বোধ হয় না যে কোন সভায় কিম্বা সাহেব লোকের দরবার যাইতেছেন স্পষ্ট বুঝা যায় যে বেশ্যালয়ে গমন হইতেছে।'[১৫৬]

পাড়ের নকশার কারণে এই ধুতিগুলির দাম চড়া হত, কিন্তু বাবুরা চড়া দামেই ধুতিগুলি কিনে আনতেন, যদিও পরার সময় একদিকের পাড় ছিঁড়ে ব্যবহার করতেন। হাটখোলার মদনমোহন দত্তের পুত্র তনুবাবু এ জাতীয় বাবুয়ানায় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি প্রত্যেকদিন নতুন নতুন বস্ত্র পরতেন, যেগুলি বহু দাম দিয়ে ঢাকা থেকে কিনে আনা হত। 'তাঁহার কোমরে দাগ যাহাতে না পড়ে তজ্জন্য ঐ বস্ত্রের একদিকের পাড় কাটিয়া ফেলা হইত এবং ঐ বস্ত্র একবার পরিত্যাগ করিলে উহা পুনরায় তাঁহার ব্যবহারের উপযুক্ত হইত না। শুনা যায় যে, ঐ বস্ত্রগুলি প্রত্যেকটি তৎকালে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা মূল্যে ক্রয় করা হইত।'[১৫৭] সাধারণভাবে পাড়যুক্ত ধুতি পরাটাই বাবুদের ফ্যাশন ছিল, তবে কেউ কেউ বাবুয়ানার চরম করার জন্যই পাড় ছিঁড়ে পরতেন। ধুতি পরার ক্ষেত্রেও একটু বিশেষত্ব ছিল। সাধারণ মানুষের মতো বাবুরা ছোটো আট-হাত ধুতি পরতেন না, বরং স্ত্রীলোকেদের ব্যবহৃত[১৫৮] বারো হাত ধুতি পরতেন তাঁরা। ধুতির কাছা লম্বা এবং বেশ বড়ো উড়ে কোঁচা থাকত। 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত (১৬.০৩.১৮২২) একখানি চিঠিতে দেখা যায় যে, বাবুরা 'কেবল আয়াসসাধ্য চুল কাটা পইতা মোটা লম্বা কাছা উড়ে কোঁচা করিয়া লম্বটাভিমানী হয়।'[১৫৯] আদিবাবুদের চুলের বাহার বলতে বাবরি বা বাউরি চুল বোঝানো হয়েছে। হুতোমের আমলেও কোনো কোনো 'লম্পটাভিমানী' বাবু বাবরি চুল, পাকানো কাছা, কোঁচানো চাদর ও লপেটা জুতোয় সাজসজ্জা করে অভিসারে যেতেন।[১৬০] তবে সাধারণভাবে সে সময়, 'সোনার ঘড়ী আর চেন ঝুলিয়ে সিম্‌লে ফরাসডাঙার ফিনফিনে ধুতি পরে, একটি ঘেরাটক গায়ে আর চোকে পরকলা দিয়ে বাবু সাজা বড় সহজ' ছিল,[১৬১] তবুও দেখা যায়, 'সচিত্র গুলজারনগরে'র নায়ক হেমাঙ্গ 'চুলটি খোট্টাইকেতায় বাবরি কোরে আঁচড়ে, একখান কাশীপেড়ে ধুতি তেকোঁচা করে পোরে সবুজ বারাণসী সাল, কিন্‌খাবের

চাইনাকোট গায়ে, মাথায় তারই একটি টুপি টেরচা কোরে দিয়ে, একটি হীরের আংটি আঙুলে এঁটে’ বাবু সেজেছেন। কালীঘাটের পটের ছবিতে বাবুদের এই তরঙ্গায়িত বাবরি চুল, লম্বমান কাছা, উড়ে কোঁচা এবং কালোপেড়ে ধুতির ফোটোগ্রাফসুলভ ইমেজ (image) ধরা আছে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে কথোপকথনে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছিলেন, ‘এক একটি উপাধি হয়, আর জীবের স্বভাব বদলে যায়। যে কালাপেড়ে কাপড় প’রে আছে, অমনি দেখবে, তার নিধুর টপ্পার তান এসে জোটে; আর তাস খেলা, বেড়াতে যাবার সময় হাতে ছড়ি (stick) এইসব এসে জোটে।’[১৬২]

কিন্তু আদিবাবুদের সমকালেই তৎকালীন intellect class বাবুদের পোশাক-আশাকে এক সচেতন পরিবর্তন দেখা যায়। কাউন্ট জর্জ ভ্যালেনশিয়া ১৮০২ সালের দিকে কলকাতায় আসেন। তিনি বলেছেন যে, এদেশের অভিজাত ভদ্রলোক 'White jackets' তথা ‘মেরজাই বা বেনিয়ান’ পরেন প্রায় সমস্ত সময়, যা এদেশের আবহাওয়ায় আরামপ্রদ; তবুও সম্মিলিত উৎসবের (Public Occasions) সময় তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ 'are now laid aside for English cloth'.[১৬৩] সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক কতখানি ইউরোপীয় পোশাকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন উনিশ শতকের দোরগোড়ায় পৌঁছে, তা বলা যায় না; তবে শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত শ্রেণির কেউ কেউ যে নতুন fashion statement নিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন, তার প্রমাণ প্রথম মেলে রামমোহন রায়ের পোশাকি-স্বাতন্ত্র্যে।

রামমোহন আদিবাবুদের পর্বভুক্ত হলেও, মননে-মেজাজে-স্বভাবে তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র। তাঁর মধ্যে বাবুত্বের ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক সুসমঞ্জস মেলবন্ধন ঘটেছিল। একদিকে যেমন সৎ-অসৎ উভয় পথে অর্থ উপার্জন,[১৬৪] বাইজি-বিলাস কিংবা রক্ষিতা-পোষণে তাঁর অরুচি ছিল না, অন্যদিকে তেমনি সামাজিক সংস্কারে, ধর্মীয় চিন্তায়, রুচি ও ভাবনার স্বাতন্ত্র্যে তিনি ‘বাবু’ হয়েও ছিলেন এক ভিন্নতর শ্রেণি। তাঁর পোশাকে-আশাকে, দিনযাপনের প্রতিটি স্তরে এই রুচি ও ভাবনার স্বাতন্ত্র্য উজ্জ্বল হয়ে আছে। আদিবাবুদের মধ্যে ‘ভিন্নতর’ রামমোহনই সম্ভবত সর্বপ্রথম পোশাকি স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় রাখেন। রামমোহনের পিতামহ নবাব আলিবর্দি খানের দরবারের কর্মচারী ছিলেন, পরবর্তীকালে দ্বিতীয় শাহ আলমের অধীনে কর্মচারী হিসাবে তিনি প্রভূত অর্থ ও সুখ্যাতি অর্জন করেন। সে যুগের আরও অনেক বাঙালি কর্মচারীর মতোই রামমোহনের পূর্বপুরুষগণ মুসলমান শাসকের রাজস্ব বিভাগে চাকরি নিয়ে অর্জিত অর্থে ভূসম্পত্তি কিনে স্বগ্রামে জমিদার বা তালুকদার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন।[১৬৫] রামমোহন নিজেও অত্যল্পকাল মি. টমাস উডফোর্ডের ব্যক্তিগত মুনশি হিসাবে মুর্শিদাবাদে ছিলেন।[১৬৬] অর্থাৎ নবাবি সংস্কৃতির সঙ্গে রামমোহনের আবাল্য পরিচয় ছিল। অন্তত নবাবের বিশিষ্ট কর্মচারীদের দরবারি পোশাকের ব্যাপারে তিনি যে অবহিত ছিলেন, তা অনুমান করা যায়। উত্তরকালে, উনিশ শতকের প্রথম দিকেই নগর কলকাতার একজন সম্ভ্রান্ত, বিশিষ্ট ভদ্রলোকবাবু হিসাবে তিনি যে দুর্লভ জ্ঞান, পরিচ্ছন্ন রীতি ও মার্জিত রুচির পরিচয় দিয়েছিলেন, তার পরিচয় মেলে তাঁর পোশাকি অভিনবত্বে, যা নবাবি ঘরানারই অনুবর্তন মাত্র। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জানিয়েছেন, ‘যদিও রাজা সমাজে পদব্রজে যাইতেন, কিন্তু তিনি কখনদ্র ধুতি চাদর পরিয়া যাইতেন না। সমাজে যাইবার সময়ে পোশাক পরিয়া যাইতেন। মুসলমানদিগের বাহ্য আচার ব্যবহারের প্রতি রাজার বিশেষ অনুরাগ ছিল। রাজার এই এক মনের ভাব ছিল যে, পরমেশ্বর মানুষের রাজা ও প্রভু। তাঁহার দরবারে যাইবার সময়ে উপযুক্তরূপ পোশাক পরিয়া যাওয়া উচিত।... রাজা এই ভাবটি মুসলমানদিগের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। রাজার সকল বন্ধুগণ তাঁহার ন্যায় পোশাক পরিয়া

সমাজে যাইতেন। আমার পিতা এ নিয়মের ব্যতিক্রম স্থল ছিলেন।'[১৬৭] বিশ্বভারতীতে রক্ষিত রাজা রামমোহনের যে তৈলচিত্রটির সঙ্গে আমরা সুপরিচিত, সেখানে রাজাকে যে পোশাকে দেখা যায়, তাতে দরবারি ঘাঘরার ঈষৎ পরিমার্জিত রূপ কাবা এবং মুসলমানি খিড়কিদার পাগড়ির পরিবর্তে বাঁধা পাগড়িরই সন্ধান মেলে।[১৬৮] এই কাবাই পরে চাপকানে পরিণত হয়ে দ্বিতীয় পর্বের বাবুদের অঙ্গে ওঠে। যদিও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ই জানান, রাজা চোগা, চাপকান প্রভৃতি পোশাক পরে প্রায়ই ভ্রমণে বেরুতেন।[১৬৯] তাঁর কাছ থেকেই জানা যায়, 'তৎকালীন প্রথা অনুসারে তাঁহার বাব্‌রী চুল ছিল; চুলগুলির প্রতি অতিশয় যত্ন করিতেন; প্রতিদিন স্নানের পর দর্পণের সম্মুখে কেশবিন্যাসে অনেক সময় নষ্ট হইত।'[১৭০] শাল ছিল সেকালের সম্ভ্রান্ত বাঙালির মর্যাদার প্রতীক। রামমোহন রঙিন নকশাদার শাল ব্যবহার করতেন চোগা, চাপকানের উপর। ফরাসি প্রকৃতি বিজ্ঞানী ভিক্তর জাকমঁ অবশ্য রামমোহনের বেশভূষাকে অত্যন্ত সাধাসিধে বলেছেন, কেবল 'সচ্ছল দেশীয়দের চেয়ে পার্থক্য এইখানে যে, খালি পায়ে চটির বদলে তিনি ইউরোপীয় কায়দায় জুতোমোজা পরেছেন।'[১৭১] অর্থাৎ বাবুদের পোশাকি বিলাসিতায় রামমোহনই সর্বপ্রথম ইউরোপীয় আভিজাত্য যোগ করেন। পরবর্তীকালে দ্বারকানাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রমুখ প্রগতিপন্থী, উচ্চশিক্ষিত 'বাবু'রা জ্ঞানত পোশাকি আভিজাত্যে রামমোহনেরই পথের পথিক।

বস্তুত, দেবেন্দ্রনাথ যতই বলুন না কেন যে, দ্বারকানাথ রামমোহনের পোশাকি-স্বাতন্ত্র্য অনুসরণ করে চলতেন না, তা কতদূর যথার্থ সে বিষয়ে সংশয় জাগে। কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'mamoin of Dwarkanath Tagore' গ্রন্থে (১৭৮০) দ্বারকানাথের যে চিত্রটি পাওয়া যায়, সেখানে দ্বারকানাথ চোগা-চাপকান-শাল পরিহিত, তবে তাতে জরি ও অন্যান্য রত্নাদি খচিত; নিম্নাঙ্গে নবাবি ঘরানার পায়জামা পরিহিত, সেইসঙ্গেই ঈষৎ শুঁড়তোলা জাহাঙ্গীরের সময় প্রচলিত 'সলীমশাহী জুতা'। এই পায়জামা এবং সলীমশাহী জুতো আমাদের নবাবি সংস্কৃতির কথা মনে পড়িয়ে দেয়। আবদুল হালিম 'শরর' তাঁর 'পুরনো লখনউ'-এ বলেছেন, 'মুসলমান আসার আগে হিন্দুস্থানে ধুতি ছিল; পায়জামা ছিল না।— দিল্লির শেষদিন পর্যন্ত এবং সারা হিন্দুস্থানে মুসলমানদের এই পায়জামাই ছিল। হিন্দুদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে নিম্নবর্গের মুসলমানেরা ধুতি পরত এবং প্রতিষ্ঠাবান হিন্দুরা ইচ্ছে করলে, ঘরে ধুতি পরত কিন্তু শিষ্টমণ্ডলীতে আসার সময় পায়জামা পরেই আসত।[১৭২] অবশ্য নিম্নবর্গের মুসলমানেরা যে ধুতি পরত, তার কারণ হিন্দুদের সঙ্গে মেলামেশা নয়; অধিকাংশ নিম্নবর্গের মুসলমানই ছিল ধর্মান্তরিত হিন্দু। তাঁরা মুসলমান হয়েও হিন্দুদের মতো ধুতি পরার অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেননি। তবে প্রতিষ্ঠাবান হিন্দু অভিজাতরা মুসলমানি সংস্কৃতি থেকে জরিদার পোশাক, পাগড়ি এবং পায়জামা পরার অভ্যাস করেন। দ্বারকানাথ, কিশোরীচাঁদ কিংবা দিগম্বর মিত্র যে পাগড়ি ব্যবহার করতেন, তাও রামমোহন-প্রভাবিত এবং প্রকৃতপক্ষে নবাবি সংস্কৃতির অনুবর্তন।

পরবর্তীকালে ডিরোজিও-শিষ্যদের অনেকেই বিলিতি কোট, প্যান্টালুন, চামড়ার জুতো, মোজা পরিধান করলে ধীরে ধীরে সম্ভ্রান্ত বাবুর পোশাকের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয় পরিবর্তন আসে। 'মধুস্মৃতি'তে নগেন্দ্রনাথ সোম জানিয়েছেন, হিন্দু কলেজে মধুসূদন 'একদিন হঠাৎ ধুতি-চাদর পরিত্যাগ করিয়া বুট পায়জামা ও আচকান পরিধান করিয়া উপস্থিত হইলেন। তারপরে অচিরেই ''আচকান'' পরিত্যাগ করিয়া, ইংরাজি-কোট গ্রহণ করিলেন। ইহা আর কখনো ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার দেখাদেখি অনেক ছাত্র (উড়ানি) ত্যাগ করিয়া, তাঁহার প্রবর্তিত একছুটের দলের অন্তর্গত হইলেন। দিগম্বর মিত্রের ভ্রাতা মাধবচন্দ্র

মিত্র উড়ানি ত্যাগ করিয়া টাইট জামা পরিতে লাগিলেন।'[১৭৩] তবে, মধুসূদন এবং মধুব্রতীর দল সমাজে বেশি ছিল না, সাধারণভাবে কাজের পোশাকে নবাবি সংস্কৃতির অনুসরণ দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল, কিন্তু অবসরের পোশাক 'বাবু'র রুচি অনুযায়ী এবং কর্মের খাতিরে সাধারণ কিংবা অসাধারণ হয়ে উঠত। উনিশ শতকের মধ্যপর্বে একশ্রেণির মেকিবাবু দেশীয় ঘরানা, নবাবি সংস্কৃতি এবং বিলিতি কালচারের অভিনব মিশেলে এক পোশাকি বিপ্লবের সূচনা করেন। দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'তে (১৮৬৬ খ্রি.) মুক্তেশ্বরের জামাইয়ের বর্ণনায় নিমচাঁদ বলেছে— 'তুমি বাবু যে বাহার দিয়ে এসেচ— মাতার মাঝখানে সিতে, গায়ে নিনূর হাফ-চাপকান, গলায় বিলাতি ঢাকাই চাদর, বিদ্যাসাগর পেড়ে ধুতি পরা; গরমিকালে হোলমোজা পায়ে, তাতে আবার ফুলকাটা গারটার, জুতো জোড়াটি বোধ হয় পথে আসতে কিনেচো, ফিতের বদলে রূপার বগলস, হাতে হাড়ের হ্যাণ্ডেল বেতের ছড়ি, আঙুলে দু'টি আংটি।'[১৭৪] এ পোশাকে স্বভাবতই পূর্বকথিত বিমিশ্রিত সংস্কৃতির প্রভাব প্রকট। তবে, সম্ভ্রান্ত মান্য ব্যক্তিরা হয় রামমোহনী পোশাকে, নয়তো হুতোমের ভাষায়, 'সেই নবাবী আমলের বড়মান্ষি কেতা, সেই পাকানো কাছা; সেই কোঁচানো চাদর, লপেটা জুতো ও বাবরি চুল আজও দ্যাখ্যা যাচ্ছে বরং গৃহস্থ মধ্যস্থ লোকের মধ্যে পরিবর্তন দ্যাখ্যা যায়; কিন্তু আমাদের হুজুরেরা যেমন তেমনই রয়ে রয়েচেন।'[১৭৫] এইসময় থেকেই অবশ্য জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার বাঙালির সাজ-পোশাকে পরিবর্তনের সূত্রপাত করেন এবং সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত বড়োমানুষ বাবুরা ধীরে ধীরে তাঁদেরই অনুসরণ করতে থাকেন। অন্যদিকে স্বল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত অথচ অর্থবান হঠাৎ বাবুরা ধীরে ধীরে বিলিতি সাজ-পোশাকের অক্ষম অনুকরণ করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। প্রিয়নাথ পালিতের 'টাইটেল দর্পণ' (১৮৮৪) প্রহসনে দেখা যায়, 'মহারাজা' টাইটেল পেতে উদ্‌গ্রীব আশুবাবুকে গোরাচাঁদ নামক এক খলিফা 'বড়োলোকি পোজিসানে চলা'র জন্য একখানা ফর্দ করে দিয়েছে, তাতে রয়েছে— 'একখানা পেব্‌লের চশমা সোনা বাঁধান সলোমনের বাড়ী থেকে; সোনার স্টডস্ আরলিঙ্ক হেমিল্‌টনের বাড়ী থেকে; বুড় আঙুলের মতন মোটা পাতা ফেসানের চেন মেথুসনের বাড়ি থেকে, ভাল স্টিক্ মেকেঞ্জিলায়লের ওখান থেকে, রথার হেম্ মেকারের সোনার ঘড়ি কুককেলভির বাড়ী থেকে; বারাণসী চাদর, কিংখাপের পোশাক লিভিতে যাবার জন্যে; সাটিনের পোষাক ইভনিং পার্টিতে যাবার জন্যে, মাদার ও পার্‌লের অপেরা গ্লাস নিউমানের বাড়ি থেকে। সোপ ও খোসবয়ের জিনিস সকল।'[১৭৬] অর্থাৎ বিলাসিতার মাত্রা একই থাকলেও, ব্যবহৃত সামগ্রীর বদল ঘটেছে কিংবা বিলিতি দোকানের দ্রব্যাদি না হলে আর বাবুদের বাবুয়ানা চলছে না। এই পরিবর্তন স্বাভাবিক এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে একই প্রকার। 'সধবার একাদশী'তেও বাবুর গলায় যখন 'বিলাতি ঢাকাই চাদর'-এর দেখা মেলে, তখন বোঝা যায়, আরও অনেক কিছুর মতো, বাবুর বাবুয়ানাও ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের ফলে স্বস্থানচ্যুত।

বাবুদের পোশাক-আশাকে যেমন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ঔপনিবেশিক রুচির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, তেমনি বাবুর শখ-আহ্লাদ-বিনোদনেও যুক্ত হয়েছিল রূপান্তরের লক্ষণ। উনিশ শতকের প্রথমভাগে বাবুদের শখ-আহ্লাদের কথা বলতে গিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, 'এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার এসরাজ বীণ প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাপ আকড়াই, পাঁচালী প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বারঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে পীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত।'[১৭৭] কবি, হাফ আখড়াই, বুলবুলির লড়াই প্রভৃতির মতো বাবুদের আর এক শখ ছিল ঘুড়ি ওড়ানো। শখটি অবশ্য প্রাচীন। সাধারণ ধারণা মতে, সম্ভবত চৈনিক ব্যবসায়ীরা চিনদেশ থেকে এদেশে এই শখটির প্রাদুর্ভাব ঘটান।

আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা জাপানে ঘুড়ি ওড়ানোর প্রচলন করেন। বুদ্ধের নামাঙ্কিত ঘুড়ি ওড়ানোর এই প্রথাটি সম্ভবত তার আগেই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর মোগল মিনিয়েচারে ঘুড়ি ওড়ানোর চিত্র দেখে মনে হয়, অভিজাত মোগলদের মধ্যে এই শখটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ক্রমশ এই সংস্কৃতি নবাবদের হাত ধরে কিংবা সম্ভ্রান্ত মোগল অভিজাতদের সূত্রে সাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তবে আদিবাবুদের কালে ঘুড়ি ওড়ানোর এই বিলাসিতা যে আদৌ সাধারণের মধ্যে তাদৃশ প্রচলিত ছিল না, তার প্রমাণ, এই শখ 'বাবুয়ানা'র অন্যতম লক্ষণ হিসাবে গৃহীত হয়েছে উনিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে। এই শখ 'সাধারণ' হলে বাবুরা তা গ্রহণ করতেন কিনা সন্দেহ। 'বাবুর উপাখ্যান'-এ দেখা যায়, 'বাবু ঘুড়ী বুলবুলি প্রভৃতি খেলাতে সদা মগ্ন থাকেন লেখাপড়ার দোকান আছে কিন্তু করেন না।'[১৭৮] সম্ভবত সম্ভ্রান্ত বাবুমাত্রেই এই বিশেষ শখে অভ্যস্ত ছিলেন। হুতোম তাঁর নকশায় শৈশবের খেলার সরঞ্জাম হিসাবে পায়রা, ক্রিকেট, লাট্টুর সঙ্গে 'ঘুড্‌ডী'র উল্লেখ করেছেন,[১৭৯] আবার জাল 'প্রতাপচাঁদে'র কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, সমসাময়িক জনশ্রুতির কথা— 'তিনি গুলিতেও মরেননি— রাণী বলেচেন, তিনিই রাজা প্রতাপচাঁদ— ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে লকে কান কেটে গিয়েছিল, সেই কাটাতেই তাঁর ভগ্নী চিনে ফেল্লেন!'[১৮০] তবে হুতোমের সময় বাবুদের এই শখটি সাধারণ্যে প্রচলিত হয়, ফলে বাবুরাও এই শখ ছেড়ে নতুন শখের দিকে ঝোঁকেন।

উনিশ শতকের প্রথম দিকেই, ১৮৩৬-এর ১৬ মার্চ মুচিখোলার মাঠ থেকে জনৈক রবার্টসন সাহেব বেলুনে চড়ে গগন-বিহার করলে, সম্ভ্রান্ত বাঙালিবাবুরা এই বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে পড়েন। ১৮৩৮-এ রবার্টসনের মৃত্যু হলে তাঁর সম্পত্তি নিলামে তোলা হয় এবং ২৪০০ টাকা ব্যয়ে নির্মিত বেলুন-প্রস্তুতের তিনটি যন্ত্র মাত্র ৫০ টাকায় বিক্রিও হয়।[১৮১] অনুমান করা অসংগত হবে না যে, বেলুন-বিহারে সাধারণ মানুষের কৌতূহল লক্ষ করে কোনো উদ্যমী বাবু উক্ত যন্ত্র কিনে নেন। ১৮৫০-এর নভেম্বর মাসে জনৈক মি. কাইট রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের বাগান থেকে বেলুন-বিহার করেন।[১৮২] সেকালের অন্যতম সম্ভ্রান্ত বিত্তপতি রাজা সুখময় রায় বাহাদুরের তৃতীয় পুত্র বৈদ্যনাথ রায় দানধ্যান এবং অর্থব্যয়ে পূর্বপুরুষের বাবুত্বের ঠাট বজায় রেখেছিলেন। খুব সম্ভব, কাইট সাহেবের বেলুন-ভ্রমণের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বৈদ্যনাথ। তবে উনিশ শতকের শেষদিকে, বাঙালিবাবু 'ইন্ডিয়ার সার্কাসে'র রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'First Indian Aeronaut' হিসাবে বেলুন-বিহার করে সকলকে চমৎকৃত করে দেন। ১৮৮৯-র ১০ এপ্রিল নারকেলডাঙার ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানির প্রাঙ্গণ থেকে 'ভাইসরয়' বেলুনে চেপে স্পেন্সার সাহেবের সঙ্গে আকাশে ওড়েন রামচন্দ্র।[১৮৩] অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরোয়া'র সাক্ষ্যে জানা যায়, রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দৌহিত্র বাবু গোপাল মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁরই বাড়িতে থান-থান তসর কেটে রামচন্দ্র নিজের বেলুন (সম্ভবত প্যারাসুট) তৈরি করে নেন।[১৮৪] এই ঘটনার পরপরই কালীঘাটের পটে, পঞ্জিকা ও সংবাদপত্রের পাতায়, সর্বোপরি বটতলার নাটকে, নভেলে বাবু-বিবির বেলুন-বিলাসের নানান কথা, হরেক ছবি দেখা দিতে থাকে। ঘুড়ি ওড়ানো ছেড়ে বাবুরা সেদিন নিজেরাই উড়তে চাইছেন। তবে এই শখটি শুধু ব্যয়সাধ্য তো নয়, এর জন্য যে পরিমাণ মানসিক সাহস ও শারীরিক সক্ষমতার প্রয়োজন, সাধারণভাবে স্বভাবভীরু, জীর্ণ শরীর বাবুদের অধিকাংশেরই তা ছিল না; শখের জন্য শারীরিক ক্লেশে রাজি ছিলেন না তাঁরা। ফলে, শখটি শেষপর্যন্ত বাবুদের কৌতূহল এবং কিঞ্চিৎ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলেও, ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়নি। অন্যদিকে, বনেদি বাড়িগুলিতে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও ঘুড়ি-

ওড়ানোর পারস্পরিক প্রতিযোগিতা দেখে মনে হয়, কালান্তরের উত্থান-পতনে আভিজাত্যের মাত্রাভেদ ঘটলেও 'ঘুড়ি ওড়ানোর শখ' তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল আরও অনেকদিন।

ঘুড়ি ওড়ানোর সংস্কৃতি বাবুরা গ্রহণ করেছিলেন নবাবি-সংস্কৃতির অবশেষ থেকে; কিন্তু 'কানন-ভোজন' তথা বাগানবাড়িতে একত্রে সম্মিলিত হয়ে পান-ভোজন, গণিকাসংসর্গে আমোদ আহ্লাদের রীতি একান্তভাবেই দেশীয়। দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় শতকের মধ্যে রচিত বাৎস্যায়নের 'কামশাস্ত্রে' বাগান-বিলাস মানুষের মুখ্য কর্ম হিসাবে গৃহীত। দৈনিক আমোদপ্রমোদ ছাড়াও বিশেষ বিশেষ দিন বা তিথি উপলক্ষ্যে সমান সামাজিক স্তরের ব্যক্তিদের সম্মিলিত হওয়ার কথা বলেছেন বাৎস্যায়ন।[১৮৫] সম্মিলনের এই উপলক্ষ্য তাঁর মতে পাঁচ প্রকার:

এক. ঘটানিবন্ধন অর্থাৎ দেবতার উৎসবের দিনে নাগরিকদের সমাবেশ;

দুই. গোষ্ঠী বা আড্ডা তথা প্রধানত কলাচর্চার জন্য বেশ্যাগৃহে বা সভায় বা বিশিষ্ট নাগরিকের বাড়িতে একাসনে অবস্থান ও আলোচনা;

তিন. আপানক তথা নাগরিকদের পরস্পরের গৃহে বা নির্দিষ্ট কোনো স্থানে সুরাপানের আসরে সম্মিলন;

চার. সমস্যাক্রীড়া অর্থাৎ যক্ষরাত্রি, কোজাগরী পূর্ণিমা ও সুবসন্তক তথা মদনোৎসবে সম্মিলিত হয়ে আমোদপ্রমোদ; এবং

পাঁচ. উদ্যানগমন অর্থাৎ বেশ্যা, পরিচারক এবং মিত্রবর্গকে নিয়ে (বা না নিয়ে) নগরের নিকটস্থ কোনো বাগানবাড়িতে গিয়ে একত্রে আনন্দ উপভোগ। সেইসঙ্গে উদ্যানগামীরা বাগানবাড়িতে গিয়ে আপানক বিধিরও অনুসরণ করাবেন, 'উদ্যানগতৈরপ্যয়মেবাপানকবিধি কার্য্য'।

বস্তুত, বাৎস্যায়ন কথিত আমোদপ্রমোদের রীতিগুলি বিচার করলে দেখা যায় যে, বাবুরা যেন আমোদপ্রমোদ-বিলাসের ক্ষেত্রে তাঁরই আদর্শ অনুসরণ করেছেন। দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বাবুদের আয়োজিত নৃত্যগীতসহকারে প্রীতি সম্মেলন 'ঘটানিবন্ধনে'র স্মৃতিবাহী, যেখানে মন্দিরের দেববেশ্যা ছাড়াও অন্যস্থান থেকে আগত কুশীলবে নৃত্যগীতের মধ্য দিয়ে মনোরঞ্জন করতেন; 'আগন্তবোহন্যস্মাদগিতা নট নর্ত্তকাঃ প্রেক্ষণক যেষাং প্রজ্ঞাতেহহন্যনাত্র বাহনি দদ্যুর্দর্শয়েযু:।' এ জাতীয় উৎসবে বাবুরা নানাপ্রকার মদ-মাংসসহ সাহেবসুবোদের যে আপ্যায়ন করতেন, তার পিছনে আর্য-ঐতিহ্যের এই সমর্থন ছিল বলেই হয়তো কলকাতাবাসী রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ ভ্রূ-কুঞ্চিত করলেও টুঁ শব্দ করেনি। অবশ্য বাবুরা স্বীয় অর্থব্যয়ে যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজে পুষতেন, তাঁরাও এইসব শাস্ত্রের সমর্থন পেড়ে এ জাতীয় কাজকে স্বীকৃতি দিতেন।[১৮৬] অন্যদিকে বেশ্যাগৃহে, সভা-সমিতিতে কিংবা অন্যত্র সম্মিলিত হয়ে কলাচর্চা, মদ্যপান এসবেতেই বাবুদের প্রীতি ছিল প্রবল। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় জানিয়েছেন, 'পূর্ব্বে গ্রীস দেশে যেমন পণ্ডিত সকলও বেশ্যালয়ে একত্রিত হইয়া সদালাপ করিতেন সেইরূপ প্রথা এখানেও প্রচলিত হইয়া উঠিল। যাঁহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত নহেন, তাঁহারাও আমোদের ও পরস্পর সাক্ষাতের নিমিত্ত এইসকল গণিকালয়ে যাইতেন। সন্ধ্যার পর রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্যন্ত বেশ্যালয় লোকে পরিপূর্ণ থাকিত। বিশেষত পর্ব্বোপলক্ষ্যে তথায় লোকের স্থান হইয়া উঠিত না।'[১৮৭] অবশ্য তৎকালের পাঞ্চ হাউস ও ট্যাভার্নগুলিরও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদান থাকা সম্ভব। অন্তত, খাদ্যবস্তু ও মদ সরবরাহে বিলিতি হোটেল এবং ওয়াইন-শপের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ চোখে পড়ে। পাশাপাশি, সমস্যাক্রীড়া অর্থাৎ লোকায়ত উৎসব দোল, রথযাত্রা,

গঙ্গাযাত্রা, চড়ক, এমনকী বড়োদিন পালনেও সেকালের বাবুরা মেতে উঠতেন। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আপনার মুখ আপুনি দেখ'তে চন্ননবিলাসবাবুর বড়োদিনের ধুম দেখে জনৈক ছা-পোষা মধ্যবিত্ত মন্তব্য করেছে, 'ভাই! বড় মানুষেরা যে জন্মায় সার্থক, আজ বড়দিন, আজ ছোটদিন, আজ গুড্‌ফেরাই ডে, নিত্য নিত্য এক একরকম নূতন নূতন আমোদ নিয়েই আছে, টাকার তো ভাবনা নাই? পরব পেলেই আমোদ করে। আমাদের এদিকে আনতে ওদিকে কুলায় না.... চন্ননবিলাসবাবু আজ বড়দিন উপলক্ষে যে টাকাটা খরচ কোচ্চে, তাহার শিকি টাকা আমরা পেলে স্ত্রীকে পাঁচখানা গয়না দিয়েও স্বপরিবারে এক বচ্ছর সুখে খেতে পারি।'[১৮৮] সেকালের গুটি কয়েক বিত্তবান বাবুদের অন্তহীন টাকার স্রোত ও বিলাসের পাশাপাশি সাধারণ মধ্যবিত্তের দৈনন্দিন দিনযাপনের ক্লেশ ও গ্লানির এই বিপ্রতীপ চিত্র থেকে অনুমান করা যায়, বাবুদের প্রতি কেন সাধারণের দৃষ্টি এত ক্ষুরধার, এত ব্যঙ্গনিপুণ, এত ক্ষমাহীন! আদিবাবুদের উৎসব-পার্বণে সাধারণের অংশগ্রহণ নিরুদ্ধ ছিল না, ফলে যাবতীয় অমিতাচার সত্ত্বেও কোথাও যেন তাঁরা 'মিথে'র মর্যাদা পেয়ে যান; কিন্তু উত্তরকালের চন্ননবিলাসী-বাবুদের মতো বাবুরা সেই সম্মানের ভাগীদার নন। তাঁদের আয়োজিত আনন্দ-অনুষ্ঠানে প্রবেশাধিত, নির্বাচিত এবং নিয়ন্ত্রিত। অতএব সাধারণ মানুষের সঙ্গে পূর্ববর্তী বাবুদের যে সখ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তা-ও উনিশ শতকের মধ্যভাগে পৌঁছে অন্তর্হিত। একদিকে ধনতান্ত্রিক কাঠামোর ঔপনিবেশিক সমাজে বিত্তের অধিকার নির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত, ফলে তা কুক্ষিগত মুষ্টিমেয় কিছু সুবিধাভোগীর; অন্যদিকে চাকরিজীবী মধ্য ও নিম্ন মধ্যবিত্তের শোষিত, বঞ্চিত জীবন। এ দু'য়ের মধ্যে কিম্ভূতকিমাকার 'জীবে'র মতোই 'বাবু'র অবস্থান। বিসদৃশ, উৎকট, অমার্জনীয়। এইসব কারণেই উনিশ শতকের মধ্যভাগে পৌঁছে বাবুদের আচার-ব্যবহার, বিলাস-ব্যসন আর রূপকথার বিষয় হয়ে ওঠেনি। বাবুরা তখন নিতান্তই ব্যঙ্গবিদ্রূপের পাত্র, 'সাপ হতেও ভয়ানক, বাঘের চেয়ে হিংস্র, বলতে গেলে এঁরা একরকম ভয়ানক জানোয়ার'।[১৮৯]

আপানক বিষয়ে বলতে গিয়ে বাৎসায়ন জানান, 'তত্র মধুমৈরেয়সুরাসবান্ বিবিধ লবণ ফল হরিত শাকতিক্ত কটুকাম্লোপদংশান্ বেশ্যা পায়য়েযুরনু-পিবয়েশ্চু';[১৯০] নানাবিধ খাদ্যবস্তুসহযোগে মধু, মৈরেয়, মদ বেশ্যাদের আগে পান করিয়ে, তবে উপভোক্তার পান করা বিধেয়। বাৎসায়ন কথিত এই প্রথা অবশ্য সামাজিক স্তরভেদ নির্দিষ্ট হওয়ায় মনু-পরবর্তীকালে রহিত হয়। মুসলমান আসার পর একত্রে পান-ভোজন প্রভৃতি ব্যাপারে সামাজিক সংস্কার আরও দৃঢ়তর হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিস্পর্ধী হিসাবে প্রথমে বৈষ্ণব এবং পরে শাক্ত ধর্মের বিকাশ ঘটলে, সমাজের নির্দিষ্ট বৃত্তে একত্রে ভোজন, মিলন প্রভৃতি ব্যাপারে সাময়িক শৈথিল্য দেখা দিলেও তা গোটা সমাজকে প্রভাবিত করতে পারেনি। এ কারণেই যবনী বেশ্যাদের সঙ্গে একত্রে ভোজনের ব্যাপারে আদিবাবুদের মনেও সংস্কার বা দ্বিধা ছিল, তা নাহলে 'নববাবুবিলাসে'র খলিফা বাবুকে নানান যুক্তি দেখিয়ে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা চালাত না।[১৯১] তারপরেও যেটুকু দ্বিধা ছিল, বাবুর কুলপুরোহিত শিরোমণি তন্ত্রের দোহাই দিয়ে 'ভৈরবীচক্রে জাতিবিচার নাই' বলে বচন দিলে, 'সকলে হৃষ্টচিত্ত হইল, হিন্দু মোছলমান বেশ্যা সাধারণ তাবতেই নির্ম্মলান্তঃকরণে একাসনে বিবিধ মদ্য মাংস প্রভৃতি নানা দ্রব্য ভোজন করিলেন।'[১৯২] শাস্ত্র, ধর্মের বচন সকলকেই অর্থের জোরে নববাবুরা ট্যাঁকে পুরেছিলেন, তাঁদের অনৈতিক আচরণও তাই শাস্ত্রের মান্যতা পেয়েছিল। সম্ভবত, এসব কারণেই উনিশ শতকের নাগরিক কলকাতায় ধর্মাধর্ম বিষয়ে নানান দল-উপদল গড়ে উঠলেও সাধারণভাবে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের বিশ্বাসের ভিত্তি শিথিল হয়েছিল। বাবুরা সকলেই আশ্বস্ত ছিলেন যে, ধর্মের দ্বারা তাঁরা চালিত

নন, বরং ধর্মকে তাঁরাই ইচ্ছামত চালনা করে থাকেন।'[১৯৩] এই মনোভাবই বাবুদের আচার-আচরণে বেপরোয়া, বল্গাহীন মাত্রা যোগ করেছিল।

বাবুরা বাৎস্যায়নের 'উদ্যান গমন' বৃত্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচিত ছিলেন বলে মনে হয় না, তবে তাঁদের প্রভাবিত করে থাকতে পারে নবাবি বিলাসিতার স্মৃতি। যদিও 'উদ্যান গমন' প্রসঙ্গে বাৎস্যায়নের বক্তব্য বাবুদের বাগান-বিলাসের সঙ্গে আশ্চর্যরকম সাদৃশ্যযুক্ত। বাৎস্যায়নের মতে, আমোদপ্রমোদের জন্য নির্দিষ্ট দিনের একদিন আগেই বেশ্যা ও পরিচারকসহ উপভোক্তা বাগানে পৌঁছোবেন। সেখানে 'দৈনিক যাত্রার উপভোগ করিয়া কুক্কুট যুদ্ধ ও দ্যূত (দাবাখেলা প্রভৃতি) ক্রীড়া ও নটনর্তকের প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করিয়া যাহার যেমন চেষ্টা, সেইরূপ চেষ্টার পূরণ দ্বারা কাল অতিবাহিত করিয়া অপরাহ্নে সেই উদ্যানের চিহ্ন (পুষ্পগুচ্ছ ও মাল্যাদি) গ্রহণ করিয়া সেইরূপেই চলিয়া আসিবে।'[১৯৪] উনিশ শতকীয় কলকাতার 'ফুলবাবু'রা এর চেয়ে বিশেষ আলাদা কিছু করতেন মনে হয় না। স্মরণ রাখা দরকার, বাৎস্যায়ন আপানক বৃত্তিকেও একইসঙ্গে পালনীয় বলেছেন। বেশ্যার মুখে আগে মদ ও খাবারদাবার তুলে দিয়ে পরে নিজে খাওয়ার এই রীতি বাবুরা আনন্দের সঙ্গে পালন করতেন। অজ্ঞাত লেখকের 'বেশ্যানুরক্তি বিষমবিপত্তি' প্রহসনে (১৮৬৩) দেখা যায়, বেশ্যানুরক্ত প্রিয়বাবু তাঁর রক্ষিতা হেমলতাকে মদ ঢেলে পান করাতে চাইলে হেমলতা 'তোমরা আগে খাও, আমি তো প্রথম খাবনা' বলায়, প্রিয়বাবুর কপট ইয়ার মোহন বলেছে, 'সেকি শক্তির অগ্রে ভোগ না হলে কি কারেও খেতে আছে, আপনি আগে নিবেদন কোরে দিন।'[১৯৫] লক্ষণীয়, এখানেও 'শক্তি' প্রভৃতির উল্লেখে তন্ত্রের গোপন আভিচারিক ক্রিয়ার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একে বাবুদের অপরাধবোধজনিত মানসিক রেচন (Purgation) ভাবা কোনোমতেই সংগত নয়। এ একপ্রকার ভণ্ডামি। 'তন্ত্রতত্ত্ব' প্রণেতা শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব বলেছেন, 'মানসপূজা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একথা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ, কিন্তু যে মন দিয়া সেই মানসপূজা করিতে হইবে সেই মনই যদি দূষিত, কলুষিত বা বিকারপ্রাপ্ত হয়, তবে আমি মানসপূজা করি কি দিয়া? মন দূষিত হইলে তথা হইতে তখন যে দুর্গন্ধ ছুটিতে থাকে, তাহাতে দেবতা দূরে থাকুন মানুষেরও তথাতে দাঁড়ান কঠিন।'[১৯৬] বাবুদের প্রসঙ্গে ঠিক এই কথাটি মনে আসে। নিজেদের অনৈতিক কাজগুলির সমর্থন পোষ্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সাহায্যে তাঁরা খুঁজেছেন অপ্রচলিত শাস্ত্রে কিংবা আপাতগুহ্য তন্ত্রের মধ্যে, তার কারণ সংস্কারনিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থায় নিজেদের অবস্থান সুরক্ষিত রাখা। অর্থ বিত্তের জোরে অপ্রচল কিংবা অ-শাস্ত্রীয় বিধানকেও যে প্রতিষ্ঠা দেওয়া যায় এবং নিজেদের অবস্থানও সুরক্ষিত রাখা যায়, কালীপ্রসাদি হাঙ্গামা কিংবা রামমোহনের পুত্র রাধাপ্রসাদের 'প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পর্ণ নর দাহ করিয়া ত্রিরাত্রি অশৌচ ব্যবহার পূর্ব্বক অর্থাৎ যথাকর্ত্তব্য হবিষ্যান্ন ভোজন, উত্তরীয়, বসন, ধারণ, কুশাসনে শয়ন, আমিষ বর্জন, দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ হিন্দুর তাবৎ আচরণ'[১৯৭] করা, বিধবাবিবাহের দোষ 'আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মে'র দ্বারা স্খালন করে বাবু শ্রীশচন্দ্রের 'পুনরায় স্বশ্রেণিভুক্ত' হওয়া[১৯৮]— সেকালের বাবুসমাজে এরকম দৃষ্টান্ত সুপ্রচুর। মোট কথা, বাবুরা বাৎস্যায়ন পড়ুন বা নাই পড়ুন, উদ্যান গমনে তাঁদের অরুচি ছিল না এবং বেশ্যাসংসর্গের জন্য, গাওনা-বাজনা-পানভোজনের কারণে, সাহেবসুবো প্রমুখ অতিথিবর্গের আপ্যায়নের কারণে, সেইসঙ্গেই আকাশ-যাপনের উদ্দেশ্যেও বাবুরা বাগানবাড়ি তৈরি করতেন। বাগানের সৌন্দর্য উপভোগের মন তাঁদের কতটা ছিল, দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আক্ষেপেই তা বোঝা যায়, 'আমাদের এ প্রদেশস্থ অনেক লোক ফল ভোগের বা লাভের নিমিত্ত উদ্যান করেন, কিন্তু শোভার নিমিত্ত অত্যল্প লোক ইহা করিয়া থাকেন।'[১৯৯]

কলকাতার জনপ্রসিদ্ধ বাবুদের প্রায় সকলেরই এক বা একাধিক প্রমোদ-উদ্যান ছিল। সেখানে যেমন ব্যক্তিগত আমোদপ্রমোদ চলত, তেমনি সামাজিক মেলামেশা, পান-ভোজন থেকে সাহেবসুবো, অতিথি আপ্যায়ন সকলই চলত। বাগানবাড়ি রাখা নিছক বিলাস ছিল না, তা হয়ে উঠেছিল বাবুদের সামাজিক মর্যাদার অন্যতম প্রতীক স্বরূপ। নবাবি আমলে সচরাচর নবাব কিংবা আমির-ওমরাহ্‌দের আমোদপ্রমোদের জন্য এক বা একাধিক প্রমোদ-উদ্যান থাকত। এদেশে, প্রথম দিকে, কোম্পানির উচ্চপদমর্যাদাসম্পন্ন প্রতিনিধিরা অনেকেই অবকাশ-যাপন ও প্রীতি সম্মেলনের জন্য একাধিক বাগানবাড়ি রাখতেন। খাস কলকাতার সীমানার বাইরে আলিপুর, বেলগাছিয়া, দমদম প্রভৃতি স্থানে, কিংবা কলকাতা থেকে কিঞ্চিৎ দূরবর্তী ব্যারাকপুর, চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানে তাঁদের প্রমোদ-উদ্যানগুলি গড়ে উঠেছিল। হেস্টিংস স্বয়ং আলিপুর, দমদম ও সুখসাগরে বাগানবাড়ি করেছিলেন অবকাশ যাপন এবং আমোদপ্রমোদের উদ্দেশ্যে। প্রথম দিকে সম্ভ্রান্ত বাবুদের অনেকেই কলকাতা ও তৎসংলগ্ন স্থানে বাগানবাড়ি করেছিলেন, পরবর্তীকালে সাহেব-প্রভুদের পদাঙ্ক অনুসণ করে আলিপুর, বেলগাছিয়া, দমদম, বারাসাত প্রভৃতি অঞ্চলে বাগানবাড়ি গড়ে তোলেন। এইসব বাগানবাড়িগুলিতে ব্যক্তিগত আমোদপ্রমোদ ছাড়াও বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে দেশীয় খ্যামটা নাচ থেকে শুরু করে বিলিতি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে পার্টি— সবই হত। কলকাতার বিকাশের প্রথম দিক থেকেই একাধিক বাগানবাড়ি কিংবা প্রমোদ-উদ্যান গড়ে উঠতে দেখা যায়। এ. কে. রায় তাঁর 'সংক্ষিপ্ত কলকাতার ইতিহাসে' হাইডের 'প্যারোকিয়াল অ্যানাল্‌স'-এর উদ্ধৃতি উদ্ধার করে জানিয়েছেন, যে, চৌরঙ্গি (বা চেরঙ্গি), চিৎপুর, বউবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে ইউরোপীয় ও ধনী দেশীয় ব্যবসায়ীদের বাগানবাড়ি গড়ে উঠতে থাকে ১৭৩৭-এর পরবর্তী সময় থেকেই।[২০০] কোটিপতি উমিচাঁদের বাগানবাড়ি ছিল লালদিঘির উত্তরে; কবরখানার পশ্চিমে ছিল রাসবিহারী শেঠ ও রামকিষেণ শেঠের বাগানবাড়ি। উমিচাঁদের বাগানবাড়ি হালসির বাগান নামে পরিচিত ছিল এবং কথিত যে, ১৮৫৬ সালে কলকাতা আক্রমণের সময় সিরাজ এই স্থানেই ছাউনি ফেলেন, সেইসঙ্গে রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে পাবার জন্য এই বাগান তছনছ করে উমিচাঁদের বাড়ি লুট করেন।[২০১] সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এলিজা ইম্পের দেওয়ান 'রাজা' সুখময় রায় বাগানবাড়ি-বিলাস ও বাবুয়ানায় সুবিখ্যাত ছিলেন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা সংবাদপত্রগুলিতে এই পরিবারের বাগান-বিলাস এবং আমোদপ্রমোদে বহুব্যয়ের নানান সংবাদ পাওয়া যায়। সামাজিক ইতিহাসবিদের মন্তব্য যথার্থ, 'The "garden house" culture of the opulent Calcuttans and the life style of the babu owe an extensive debt to the family'.[২০২] এঁরা অন্যান্য জাঁকজমকের সঙ্গে দু'দুটো টানাপাখার দ্বারা অতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে সেকালে চমক সৃষ্টি করেছিলেন।[২০৩] রামমোহন রায়ের আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়ি ছাড়াও, ১১৩ নং আপার সার্কুলার রোডে সুসজ্জিত বাগানবাড়ি ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্মৃতিকথায় রামমোহনের যে বাগানে নিজের দৌরাত্ম্যের কথা জানিয়েছেন,[২০৪] সে সম্ভবত আপার সার্কুলার রোডের এই বাগানবাড়িই। খাস কলকাতায় রামদুলাল দে-র ১৮ খানা বাড়ি ছিল এবং তাঁর পুত্র আশুতোষ দেব তথা সাতুবাবুর একাধিক বাগানবাড়ি ছিল জোড়াবাগান, টালা, এন্টালি, বেলঘরিয়া প্রভৃতি স্থানে।[২০৫] তবে সবাইকে টেক্কা দিয়ে, বিলাস বৈভব এবং রুচির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। দেশি, বিদেশি নানান ফুলের চারা, ফোয়ারা, কিউপিডের মূর্তিশোভিত কৃত্রিম মার্বেল পাহাড়, বৃহৎ পুকুরের মাঝখানে কৃত্রিম দ্বীপ এবং সেখানে পৌঁছোনোর জন্য শোভিত সেতু ইত্যাদি মিলিয়ে তাঁর বেলগাছিয়া ভিলা হয়ে

উঠেছিল যথার্থ নন্দনকানন। ফরাসি থেকে স্বদেশীয় রান্না, খোদ ইউরোপ থেকে আমদানি করা vintage পানীয়, দুর্লভ বাসন-পত্র প্রভৃতির আকর্ষণে বেলগাছিয়া ভিলা হয়ে উঠেছিল সেকালের সম্ভ্রান্ত ইংরেজ এবং অভিজাত, রুচিবান বাবুদের যথার্থ মিলন-ক্ষেত্র। কিশোরীচাঁদ মিত্র জানিয়েছেন, 'It was the only private Garden House, the only place, in fact, where Europeans of different classes, as well as native gentlemen, met and mixed freely and cordially.'[২০৬]

মোট কথা, উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাগানবাড়িকে কেন্দ্র করে বাবুয়ানার যে স্ফূর্তি লক্ষ করা যায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর তাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রুচির যথোচিত মাত্রা যোগ করেছিলেন। পরবর্তীকালে শিক্ষা, জনরুচি এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পট পরিবর্তনে 'ভদ্রলোক'বাবুরা বাগান-বিলাস থেকে দূরে সরে যান। তাঁদের ফেলে রাখা স্থান দখল করেন কিছু অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত, সৎ-অসৎ উভয় পন্থায় অর্থবান দালাল, ব্যবসায়ী কিংবা মফস্সল থেকে আগত জমিদার বা তাঁদের বংশজরা। তা ছাড়া স্থান সংকুলান ও ক্রমাগত বেড়ে চলা নাগরিকদের চাপ সামলাতে বৃহৎ পরিবারগুলির ব্যবহৃত জমি কোম্পানি গ্রহণ করেন। 'সচিত্র কলিকাতা-রহস্যে'র লেখক জানাচ্ছেন (১৮৯৬)। 'পূর্ব্বে, রাজার বাগান, গোয়া বাগান, হাতির বাগান, নাথের বাগান, প্রভৃতি সহরের অধিকাংশ স্থানেই বড় বড় লোকের উদ্যান ছিল। অধুনা সেই সেই স্থানে মহা-মহা অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রবাদ এই যে, গোয়াবাগান রাজ চক্রান্তকারী উমিচাঁদের প্রমোদ-উদ্যান ছিল। ক্রমে কালের পরিবর্তনশীল গতিতে সেই গোয়া বাগান বিলিতি ''ম্যান্‌চেষ্টারের'' ন্যায় কল্ কৌশলের স্থান হইয়াছে।'[২০৭] যথার্থ সত্য। তা বলে নতুন বাবুদের বাগান-বিলাসের ইচ্ছে কমে যায়নি। বাবুরা অনেকেই তখন বোট ভাড়া করে মাহেশ, রিষড়া, কিংবা ফরাসডাঙাগামী। তবে পকেটে রেস্ত কম থাকায়, বাবুরা অনেকে মিলে ভাড়ায় বাগানবাড়ি জোগাড় করে আমোদপ্রমোদ করছেন, ১৮৬০-এর দিকেই তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত মিলতে থাকে। 'আপনার মুখ আপুনি দেখ'তে অর্থবান বাবুদের বড়োদিন পালনের ধুম দেখে চার-পাঁচজন 'গেরস্ত গোচ বাবু'রাও পঁচিশ-তিরিশ টাকা চাঁদা তুলে ফেললেন এবং যেহেতু 'বাবুদিগের নিজের বাগান কারোরই নাই, দু'জন, একজন বড় মানুষ বাবুর কাছে গিয়ে একখানা বাগানের চিটী আনলেন।'[২০৮] উনিশ শতকের মধ্যভাগে পৌঁছেই দেখা যাচ্ছে যে, 'বাবুয়ানা'র শখ উচ্চবিত্তের কোঠা ছেড়ে চাকরিজীবী মধ্যবিত্তকেও পেয়ে বসেছে। সামান্য শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত মধ্যবিত্ত চাকরিজীবীদের মধ্যে কেউ কেউ এ প্রকার বাবুয়ানায় বেশ হাত পাকিয়েছিলেন। টেকচাঁদ ঠাকুর জুনিয়ার তাঁর 'কলিকাতার নুকোচুরি'তে জানিয়েছেন, 'আর সহরের কতক কতক নব্যবাবুরাও হাফ ভূত, কেবল মজা নিয়ে আছেন। আজ কালীঘাট, কাল বারাকপুর, তারপর মধুর শনিবার। রবিবারের বাগান তো আছেই, তাহার কথা নাই; বাড়িতে ব্যায়রামই হোগ, কর্ম্ম কাজই থাক, অথবা আকাশ ভেঙ্গে পড়ুক, বাগান যেতেই হবে।'[২০৯] হুতোম-কথিত বঙ্কবেহারী, পদ্মলোচন দত্ত, গুরুদাস গুঁই প্রভৃতি 'বাবু'রা এঁদেরই স্বগোত্র। এঁরা হলেন, হুতোমের ভাষায়, 'ক্ষুদ্র নবাব'। এইসব 'ক্ষুদ্র নবাব দিব্যি দেখতে— দুদে আলতার মত রং— আলবার্ট ফেসানে চুল ফেরানো— চীনের শুয়ারের মত— শরীরটি ঘাড়ে গদ্দানে— হাতে লাল রুমাল ও পিচের ইস্টিক— সিমলের ফিন ফিনে ধুতি মালকোচা করে পরা, হঠাৎ দেখলে বোধ হয় রাজারাজড়ার পৌত্তুর, কিন্তু পরিচয়ে বেরোবে— ''হিদে জোলার নাতি''!'[২১০] 'নব্যবাবু'দের এই সামাজিক অবনমনের পিছনে কালের যাত্রার ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বাবুদের দল তখন সভা-সমিতি, অ্যাসোসিয়েশন, স্কুল-কলেজ-স্ত্রীশিক্ষা, জাতীয়তাবাদী রাজনীতি, মদ্যপানবিরোধী আন্দোলন কিংবা 'ব্রেহ্ম

হুজুগ', নিদেনপক্ষে থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি নিয়ে ব্যস্ত। নতুন কালের 'কাপ্তেনবাবু'রা তখন উঠে আসছেন তথাকথিত সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের নীচের তলা থেকে। এমনকী তাঁরা সকলে নাগরিকও নন, গ্রামগঞ্জ থেকে অর্থসম্বল করে দু'রাতের 'বাবু' সাজছেন। শিক্ষাদীক্ষার স্বল্পতায় অথবা অজ্ঞতায় তাঁদের হাত ধরে উঠে আসছে রুচিহীন, অমার্জিত, অসংস্কৃত এক 'বাবুয়ানি'। আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে এঁরা বুলবুল লড়াই করান না, মুনিয়া হয়তো পোষেন কিন্তু আখড়াইয়ের দল পোষার সাধ্য নেই; বাঁধা মেয়েমানুষ রাখার সামর্থ্য নেই যদিও শখ ষোলোআনা, অতএব ভাড়া করা 'বাঁশতলার গলি নিবাসিনী পতিতপাবনকারিণী দোসরমণি' বেশ্যাতেও আপত্তি নেই; পোশাক-পরিচ্ছদে ইঙ্গ-বঙ্গ রীতির অনুকরণের চেষ্টা থাকলেও, নিজের বাগান রেখে জাঁকজমকের সঙ্গে আমোদপ্রমোদের অসম্ভব চেষ্টা থেকে সরে এসে 'ভাড়ার বাগান' দিয়েই কাজ সারেন। সেইসঙ্গে আদিবাবুরা যেমন যশের জন্য দানধ্যান করতেন অথবা দানধ্যান করে যশ কুড়োতেন, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা এবং মানসিক অনুদারতার কারণে 'ক্ষুদ্র নবাবে'রা সে রাস্তা মাড়ালেন না। বস্তুত, সময়ের উপজাত এই বাবুদের হাত ধরেই আদিবাবুয়ানা আভিজাত্যচ্যুত হল বলা চলে।

দানখয়রাতের ব্যাপারে আদিবাবুরা অনেকেই ছিলেন কল্পতরু। তখনও অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা বাবুদের অবাধ চালচলন, জীবনযাত্রার পায়ে বেড়ি পরায়নি, দালালি-বেনিয়ানি কিম্বা দেওয়ানির সূত্রে অবাধ ও সুপ্রচুর অর্থের জোগান অব্যাহত, অতএব কৃপাভিক্ষু মানুষদের প্রয়োজনে এবং কখনো-বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত দানধ্যান করে বাবুরা আত্মপ্রসাদ অনুভব করতেন। তা ছাড়া নাগরিক সমাজে দানধ্যানের পরিমাণগত তারতম্যে নির্ধারিত হত বাবুর আর্থিক কৌলীন্য এবং সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব। অতএব বাবুর প্রথমদিকে অবাধে ধনসম্পত্তি বিলি-বন্টন করেছেন। মোসাহেববর্গ, ভৃত্যগণ কিংবা পরিচিত জন বাবুর জ্ঞাতসারেই দানের নামে অর্থ আত্মসাৎ করতেন। বাবুরা তাদের 'অর্থের আবশ্যকতা'র কথা চিন্তা করে কাজটিকে 'দোষাবহ' মনে করতেন না। তা ছাড়া 'তাঁহারা বাবু হইয়া যাচককে কি করিয়া ন্যায়সংগত প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন? উহা করিলে তাঁহাদিগেরই বা কি প্রকারে বাবুগিরি হইবে?'[২১১] এ জাতীয় ভাবনা থেকে অনেকসময় অমিতব্যয়িতার চরমে পৌঁছোতেন তাঁরা। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত 'কলিকাতার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে ব্রাহ্মণকে সামান্য আতর দান উপলক্ষ্যে নবকৃষ্ণ দেব ও চূড়ামণি দত্তের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা জানিয়েছেন।[২১২] এই অহেতুক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাঁচ হাজার টাকা অনর্থক ব্যয় হয়। মদনমোহন দত্তের পুত্র রামতনু দত্ত তরফে তনুবাবু এহেন অনর্থক এবং অকাতর দানধ্যানের প্রতিযোগিতায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি নাকি কৃপাভিক্ষু কাউকেই বিমুখ করতেন না এবং টাকার 'থলির মধ্য হইতে এক মুষ্টিতে যাহা উঠিত তৎপরিমিত মুদ্রা তিনি যাজককে দিতেন'।[২১৩] তনুবাবুর এক খুল্লতাত ভ্রাতা বাবু কাশীনাথ দত্ত বাৎসরিক খাজনার টাকা গোনার সময়, নিজের প্রাপ্য বিশ হাজার টাকায় গুরুদেবের প্রাপ্য একশত এক টাকার কয়েকটি অসতর্কতাবশত মিশে গেলে সম্পূর্ণ টাকাটাই অর্থাৎ ২০১,১০১ টাকাই গুরুদেবদের দান করেন এবং সেই টাকায় গুরুদেবরা কলকাতার আহিরীটোলায় বাড়ি করেন।[২১৪] বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে দানের চেয়ে অমিতব্যয়িতা কিংবা অবিমৃষ্যকারিতার ভাবটাই বেশি চোখে পড়ে। কিন্তু সাধারণভাবে, প্রাণকৃষ্ণ দত্তের মতে, 'দান, সেবা ও ক্রিয়াকলাপে সেকালের বাঙ্গালীরা যশস্বী হইতে চেষ্টা করিতেন। ধনবানেরা ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, দেবালয়, জলাশয়, অতিথিশালা ও গোচারণ ক্ষেত্রাদি দান করিতেন। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কবি, গায়ক, বাদক, শিল্পী প্রভৃতিকে প্রচুর পুরস্কার ও বৃত্তি দিয়া উৎসাহিত করিতেন। চতুষ্পাঠী, পাঠশালা, মাদ্রাসা, চিকিৎসালয়, সংগীতের আখড়া, সাধারণের আমোদপ্রমোদের

জন্য উদ্যানসহ বারদ্বারি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার ব্যয় নির্বাহ করিতেন।'[২১৫] এ জাতীয় দানধ্যান করে সম্পন্ন বাবুদের কেউ কেউ উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই কিংবদন্তীতে পরিণত হন। উদাহরণস্বরূপ 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন' প্রবাদটির কথা স্মরণ করা যায়। বৈষ্ণবচরণ শেঠের ব্যাবসার অংশীদার গৌরী সেন তাঁর অর্জিত সম্পত্তি থেকে অকাতরে দানখয়রাত করতেন; 'কন্যাদায়, মাতৃদায়, পিতৃদায়, দেনার দায়ে কয়েদী অধমর্ণ, কিম্বা যাহারা ন্যায়পথে থাকিয়া সৎকার্যের জন্য ফৌজদারিতে জড়িত ও জরিমানার আসামী তাহাদের জন্যই অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন।'[২১৬] পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ মল্লিকবংশের নীলমণি মল্লিক ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষ্যে কারাগারের কয়েদিদের ঋণ পরিশোধ করে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করতেন।[২১৭] তাঁর নিজ বসতবাটীর সামনে সদাব্রতের জন্য একটি চক ছিল, তার ব্যয়ভারও তিনি বহন করতেন।

দানখয়রাতের ব্যাপারে আদিবাবুদের উদারতার সুযোগ যে অনেকেই নিত, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হরি ঘোষ। 'হরি ঘোষের গোয়াল' প্রবাদের অমর হরি ঘোষ ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মুঙ্গের দুর্গের দেওয়ান। দেওয়ানির দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জন করে তিনি কলকাতাবাসী হন এবং বহু আত্মীয়স্বজন, স্বজাতিগণ, এমনকী 'অনাহূত রবাহূত বহু লোকও' তাঁর বাড়িতে আশ্রয় ও আহার্য দুই-ই পেত। নানারকম দানধ্যান ক্রিয়াকলাপে তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করতেন। তাঁর এই স্বভাবের সুযোগ নিয়ে অনেকে তাঁকে প্রতারণা করায় শেষ জীবনে কাশীতে প্রভূত কষ্ট পেয়ে হরি ঘোষের জীবনাবসান হয়।[২১৮]

সেকালে বাবুরা অনেকেই গঙ্গার ধারে ঘাট বাঁধিয়ে দিয়ে পুণ্যসঞ্চয় করতেন। আজও গঙ্গার তীর ঘেঁষে যে ঘাটগুলি বিদ্যমান, সেগুলি বাবুদেরই অমর কীর্তি। ঘাট নির্মাণের মাধ্যমে পুণ্য ও যশ দুই-ই মিলত। বাবুরা নৈতিকভাবে এবং ব্যক্তিগত জীবনেও অনেক অশাস্ত্রীয় এবং গর্হিত আচরণে অভ্যস্ত ছিলেন। তৎসত্ত্বেও দানখয়রাত করে পুণ্য সঞ্চয় কিংবা পাপ স্খলনের চেষ্টা করা সম্ভবত বাবুদের লক্ষ্য ছিল না, বরং যশ অর্জনের আকাঙ্ক্ষাই ছিল প্রবল। তা ছাড়া বাবুমাত্রেই যে দানখয়রাত করতেন এমন নয়; এমন বাবুরা সংখ্যায় বেশিই ছিলেন, যারা নিতান্ত দায়গ্রস্তদের 'আমি কিছু দিব না যাও আর দিক করিও না' বলে গলাধাক্কা দিতেন।[২১৯] দায়গ্রস্ত লোকের অসহায়তার সুযোগও নিতেন কেউ কেউ। সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে উক্ত ব্যক্তির বাড়িতে উপস্থিত হয়ে 'মিথ্যা আশ্বাস বাক্যে আকাশের চন্দ্র হাতে দিয়া স্ত্রী লোক কোনদিকে থাকে তাহার অনুসন্ধান করেন, ঐ চেষ্টাতে প্রত্যহ যাতায়াত করেন।'[২২০] এহেন বাবুদের ধর্মাধর্ম বোধ যে কেমন ছিল তা সহজেই অনুমেয়। ভবানীচরণ কথিত 'নববাবুবিলাসে'র খলিফার শিক্ষা থেকেও ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়। নিজ পিতার শ্রাদ্ধাদি কর্ম প্রসঙ্গে খলিফা অনেক বৈয়াকরণ, স্মৃতিবিদ ভট্টাচার্যদের প্রশ্ন করেছে, 'তোমরা এক দিবস সন্ধ্যা পূজা বন্দনাদি না করিয়া দেখ দেখি, যাহা আহারাদি করিয়া থাক তাহা গলাধঃকরণ হয় কি না, আর এক দিবস পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণ না করিয়া দেখ দেখি, তোমারদিগের ঘাড়ে তাহারা ভূত হইয়া চাপে কি না। এই দেখ আমি শ্রাদ্ধাদি কিছুই করিলাম না, ইহাতে আমার কি ক্ষতি হইয়াছে?'[২২১] বাবুদের ধর্মীয় সংস্কারের ভিত ১৮২৩-এর দিকেই বেশ শিথিল হয়ে এসেছিল দেখা যাচ্ছে। নববাবুরা, বিশেষ করে বাবুয়ানির মোহে প্রচলিত ধর্মীয় কৃত্যাদি, সংস্কার, দানধ্যানের মতো পূণ্যকর্মকে অমান্য করতে শুরু করেছিলেন। 'নববাবুবিলাসে'র (১৮২৫) সাক্ষ্য মানলে বলতে হয়, রামমোহন রায়ের দ্বারা 'ব্রহ্মসভা'র আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠার (১৭৫০ শক ও ৬ ভাদ্র; ১৮২৮ খ্রি. ২০ আগস্ট) অনেক আগে এবং ডিরোজিও কর্তৃক অনুপ্রাণিত ইয়ং বেঙ্গলের প্রথম আনুষ্ঠানিক খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের (কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম খ্রিস্ট ধর্মান্তরিত হন ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর (?)[২২২])

পূর্ব থেকেই নববাবুরা হিন্দুধর্মের মূলধারার প্রতি প্রকারান্তরে অনাস্থা দেখাতে শুরু করেন। রামমোহন এবং তাঁর অনুগামীরা প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থা ত্যাগ করলেও বেদ ও ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদে আস্থা স্থাপন করেছিলেন এবং নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিকতাকে মান্য করে চলতেন। কৃষ্ণমোহনের মতো খ্রিস্টীয় ধর্মে আস্থাশীল মানুষেরাও আত্যান্তিক সাহেব-প্রীতির কারণে পাশ্চাত্য ধর্ম-সংস্কারকে মান্য করে চলতেন। খ্রিশ্চান সমাজে তাঁর মান-সম্ভ্রম-প্রতিপত্তি কম ছিল না। ফলে তিনি চার্চের আচার্য নিযুক্ত হন। যদিও 'স্বদেশ ও স্বজাতি কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, খ্রিস্ট-ধর্মযাজকের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও কৃষ্ণমোহন একদিনের জন্য জন্মভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি বিরাগভাব প্রদর্শন করেন নাই।'[২২৩] শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও শেকড়ের প্রতি এই টান intellect class বাবুদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যবিশেষ। কিন্তু আদিবাবুদের অবশিষ্টাংশ পঞ্চ ম-কারের লোভে চিরাচরিত ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারগুলিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অস্বীকার করতে শুরু করেছিলেন। সতীদাহ রদ, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন প্রভৃতি উপলক্ষ্যে রাধাকান্ত দেব কিংবা ভবানীচরণের 'ধর্মসভা' চেষ্টা করেও সমাজের একটা অংশ তথা নববাবুদের নৈতিক ও ধর্মচেতনার ভাঙন রোধ করতে পারেননি।

১৮৩০-এর পরবর্তী সময়ে পূর্বোল্লিখিত intellect class বাবুরা মন্দির স্থাপন, ঘাট নির্মাণ, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায় প্রভৃতির চেয়ে সামাজিক সংস্কারমূলক কাজে মনোনিবেশ করতে থাকেন। স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা, স্ত্রী-শিক্ষা, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কাজে অর্থদানের প্রবণতা লক্ষ করা যায় এই সময় থেকেই। নানাপ্রকার জনকল্যাণমূলক উদ্যোগকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সভা-সমিতি, অ্যাসোসিয়েশন গড়ে উঠতে থাকে এবং শিক্ষিত বাবুরা এইসব অ্যাসোসিয়েশনে শ্রম ও অর্থদান করতে থাকেন। অবশ্য ইতিপূর্বেই শিক্ষিত বাবুদের কেউ কেউ শিক্ষা-স্বাস্থ্য-জনসেবা প্রভৃতি উদ্যোগে দানখয়রাত করেন। প্রধানত, ডেভিড হেয়ারের উদ্যোগে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি হিন্দু স্কুল স্থাপনের সময় বাবু গোপীমোহন ঠাকুর বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুরের সমতুল ১০,০০০ টাকা দান করেন। ১৮২৪ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হওয়ার সময় মোট ১ লক্ষ ১৬ হাজার ১৭৯ টাকা যে সংগৃহীত হয়,[২২৫] তার সিংহভাগই শিক্ষা ব্যাপারে উৎসাহী ধনী বাবুদের দান থেকে সংগৃহীত। এঁদের মধ্যে যে নাম-যশের প্রত্যার্থী বাবু কিংবা সাহেবদের কৃপাভিক্ষু বাবুর দল একেবারেই ছিলেন না, এমন নয়; কিন্তু সামাজিক তর-তম পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বাবুরা একজোটে এ জাতীয় জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করার সাধুতা যে দেখাচ্ছেন কেউ কেউ, তা এইসময় থেকেই চোখে পড়তে থাকে। ১৭৯৪ সালে কলকাতায় নেটিভ হাসপাতাল স্থাপিত হয় শুধুমাত্র সাহেবসুবোর টাকায় নয়, কলকাতা ও গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের ক্ষুদ্র-বৃহৎ মানুষদের দানে।[২২৫] এই মহৎ উদ্যোগের দাতাদের তালিকা লক্ষ করলে, সে তালিকায় কলকাতার প্রথম আমলের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত বাবু যেমন— কৃষ্ণকান্ত সেন, কাশীনাথ ঘোষ, সীতানাথ ঘোষ, হিদারাম ব্যানার্জি, দুর্গাচরণ চক্রবর্তীর নাম দাতা হিসাবে পাওয়া গেলেও, এই সময় থেকে বাবুত্বের সৌরভে দিগ্‌বিদিক আচ্ছন্ন করে রয়েছেন এমন অনেক খ্যাতনামা বাবু রাজা নবকৃষ্ণ, চূড়ামণি দত্ত, লক্ষ্মীকান্ত (নকু) ধর প্রমুখের অনুপস্থিতি আশ্চর্যজনক। সম্ভবত ব্যক্তিগত কারণ এবং ধর্মকৃত্যমূলক সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্র ছাড়া জনসেবামূলক দানখয়রাতে সম্মিলিত উদ্যোগের ব্যাপারটিতে আদিবাবুদের প্রথম পর্বের প্রতিনিধিরা অভ্যস্ত ছিলেন না। তা ছাড়া আঠারো শতকের সেইসময়ে এ জাতীয় উদ্যোগে সামিল হলে কোম্পানির কাছ থেকে কোনোপ্রকার সামাজিক সম্মান বা অন্যান্য লাভ হবারও সম্ভাবনা ছিল কম। বাবুরা অর্থ-বিত্তে,

ক্ষমতায় অনেকসময় কোম্পানির সমতুল ছিলেন। তাঁরা নাগরিক বৃত্তে ফিউডাল-সুলভ জীবনযাপন এবং মানসিকতা নিয়েই সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। নিজের নাম-যশের প্রতিষ্ঠার কারণে প্রয়োজনে তাঁরা অর্থব্যয় করতে দ্বিধা করতেন না। পাথুরিয়াঘাটার দর্পনারায়ণ ঠাকুর শুধুমাত্র 'পিরালি' আখ্যা অপনোদনের জন্য ৩-৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন,[২২৬] যদিও হাটখোলার মদনমোহন দত্তের বিরোধিতায় কৃতকার্য হতে পারেননি। আবার মদনমোহন দত্তেরই বংশধর কালীপ্রসাদ দত্ত অখাদ্য ভোজন ও যবনী বাই রেখে সমাজচ্যুত হলে এককালে তাঁদের আশ্রিত এবং পরে প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী রামদুলাল দে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করে 'সমন্বয়' অনুষ্ঠান করেন এবং কালীপ্রসাদকে জাতে ফিরিয়ে দেন।[২২৭] তথাপি এঁদের অনেককে নেটিভ হাসপাতালের মতো উদ্যোগে সামিল হতে দেখা যায় না। আসলে কলকাতার নবগঠিত সমাজ-কাঠামোয় বাবুদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের প্রক্রিয়াটি তখনও পর্যন্ত সাহেব-প্রভুদের করতলগত ছিল না। বাবুরা প্রয়োজনমতো অর্থব্যয় করে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-কুলীন কায়স্থদের 'সমন্বয়' ডেকে, ঘাট-মন্দির-নিধি স্থাপন করে জাতে উঠতেন। অনেক ভুঁইফোঁড়, অকুলীন বাবুরা এভাবেই সমাজের 'দলপতি' হিসাবে উঠে এসেছিলেন, স্বয়ং নবকৃষ্ণই তার বড়ো নিদর্শন। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথম দিক থেকেই ক্রমশ অনুভূত হতে থাকে, সাহেব-প্রভুদের দ্বারা স্বীকৃতি অর্জনের বিষয়টি। অতএব দ্বিতীয় দশক থেকেই বাবুরা ক্রমশ সাহেব-তোষিণী, সেই সূত্রেই নানান জনসেবামূলক কাজে অংশ নিয়ে কৃপালাভের প্রয়াসী। এর ফলে খলিফা উক্ত 'নবলক্ষণযুক্ত' ফুলবাবুদের অনেকেই সেদিন দানখয়রাতের সম্মিলিত সামাজিক সেবামূলক কাজে সামিল। আশুতোষ দেব বা সাতুবাবু নানান ধর্মীয় ও দাতব্য দানের পাশাপাশি শিক্ষা, সমাজ প্রভৃতি সংস্কারেও দান করতেন। ১৮৩০ সালে আকালের সময় আট দিন ধরে সদাব্রত পালন করে কাঙালিদের অকাতরে অন্নদান করেন তিনি।[২২৮] এই রাজধর্ম পালনের বিনিময়ে কোম্পানি-বাহাদুর তাঁকে ১৮৩৩ সালে অন্যতম গ্রান্ড জুরি নিযুক্ত করেন।[২২৯] নবকৃষ্ণের পুত্র রাজকৃষ্ণ কাস্টম্‌স হাউস ও কতকগুলি থানা নির্মাণের জন্য সরকারকে জমি দান করেন, সেইসঙ্গে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণের জন্য তিন মাইল দীর্ঘ জমিও দান করেন। অগুনতি পুকুর, খড়দহ থেকে নাটাগড় পর্যন্ত খাল নির্মাণ করেন সম্পূর্ণ নিজের খরচে।[২৩০] এর স্বীকৃতিস্বরূপ অচিরেই গভর্নর জেনারেল স্যার জন ম্যাকফর্সন কর্তৃক রাজা উপাধিতে ভূষিত হন। বিখ্যাত আটবাবুর অন্যতম রাজা সুখময় পুরী-জগন্নাথধাম যাতায়াতের সুবিধার জন্য কলকাতা-পুরী সড়ক নির্মাণ করে দেন এবং পথিমধ্যে আশ্রয়ের জন্য লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে যাত্রীনিবাস নির্মাণ করেন। লোকনাথ ঘোষ জানিয়েছেন, 'তাঁর এই দানের জন্য মার্কুইস অব হেস্টিংসের শাসনকালে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে তিনি রাজা বাহাদুর খেতাব ও একটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। এর কিছুদিন পর দিল্লির বাদশাহ্ শাহ আলমও তাঁকে রায়-বাহাদুর খেতাব ও পাঁচ হাজার সওয়ার রাখবার অধিকার দান করেন।'[২৩১]

অবশ্য সকল বাবুই যে 'দানে'র বিনিময়ে কিছু পাবার আশায় দানখয়রাত করতেন, এমনটি নয়। সাধারণ্যে শিক্ষার বিস্তারের জন্য অনেক সম্ভ্রান্ত ধনীই অকাতরে অর্থদান করেছেন। বিধবা বিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের আন্দোলন ও পুস্তিকাপ্রকাশ ('বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' প্রথম ভাগ ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ) এবং আইন পাশের (২৬ জুলাই, ১৮৫৬) অনেক আগেই ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত ধনীবাবু মতিলাল শীল ভদ্রঘরের হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহে দশ হাজার টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দেন। বেথুনের 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' (পরবর্তীকালে বেথুন স্কুল)-এর নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মির্জাপুরের জমিদান করেন এবং মতিলাল শীল হেদুয়ার পশ্চিমদিকে

নিজের ইজারা নেওয়া জমি দান করে দেন।[২৩২] রেভারেন্ড জেম্‌স লং মাইকেল মধুসূদনকে দিয়ে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' অনুবাদ করিয়ে প্রকাশ করলে (১৮৬১ খ্রি.) তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয় এবং বিচারে লঙের একমাস কারাবাস ও এক হাজার টাকা জরিমানা হয়। স্বয়ং 'হুতোম' কালীপ্রসন্ন সিংহ জরিমানা টাকা দিয়ে দেন। আবার, এই কালীপ্রসন্নই বিধবা বিবাহ প্রচলিত হলে এক বছরের মধ্যে বিধবা বিবাহকারী প্রত্যেককে হাজার টাকা দেবার কথা ঘোষণা করলেও, কার্যক্ষেত্রে তা না করায় জনৈক অর্থলোভী 'বিধবা বিবাহকারক' এই প্রতিশ্রুত অর্থ না পেয়ে 'সম্বাদ ভাস্কর' সম্পাদকের কাছে লেখা চিঠিতে দুঃখপ্রকাশ করেন।[২৩৩]

আসলে, আলোর পিছনেই ছিল অন্ধকার। বাবুরা অনেকসময় নাম, যশ, খ্যাতির মোহে দানখয়রাতের প্রতিশ্রুতি দিতেন এবং কার্যক্ষেত্রে তা ভুলে যেতেন। পারিবারিক ইতিহাস এবং ব্যক্তিগত কিংবা পরিবারসহ আত্মীয়স্বজনের উদ্যোগে রচিত জীবনীগুলি আদৌ নিরপেক্ষ না হওয়ায়, অলীক ও অনৃত দানের মিথ কতদূর বাস্তব, সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। দানখয়রাতের ব্যাপারে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া যে বাবুদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল, 'নববাবুবিলাসে'র খলিফার পূর্বোল্লিখিত বিবরণই তার প্রমাণ। হুতোম তাঁর নকশায় 'বাগাম্বর মিত্রে'র উল্লেখ করে বলেছেন, এঁরা 'সাপ হতেও ভয়ানক, বাঘের চেয়ে হিংস্র; বলতে গেলে এঁরা একরকম ভয়ানক জানোয়ার। চোরেরা যেমন চুরি কত্তে গেলে মদ ঠোঁটে দিয়ে গন্ধ করে মাতাল সেজে যায়, এঁরা সেই রূপ কেবল স্বার্থ সাধনার্থ স্বদেশের ভালো করার চেষ্টা করেন। ''ক্যামন করে আপনি বড় লোক হব'' ''ক্যামন করে সকলে পায়ের নীচে থাকবে'', এই এঁদের নিয়ত চেষ্টা— পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে আপনার গোঁপে তেল দেওয়াই এঁদের পলিসী, এঁদের কাছে দাতব্য দূরপরিহার— চার আনার বেশী দান নাই!'[২৩৪] এইসব ছদ্ম-দানশীল বাবুরা কীভাবে প্রচারের বিনিময়ে সাহেব-প্রভুদের কাছ থেকে 'রায় বাহাদুর' ইত্যাদি খেতাব লাভ করতেন, বঙ্কিমচন্দ্র 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে' সে কাহিনি বর্ণনা করে গেছেন। নীল বিদ্রোহের অক্লান্ত সৈনিক 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অকাল-মৃত্যুতে তাঁর কর্মের কথা স্মরণে রেখে মুখোপাধ্যায়ের বিধবা পত্নীকে সাহায্য করার জন্য যে ফান্ড গঠন করা হয়, অধিকাংশ বাবু প্রতিশ্রুত হয়েও কার্যক্ষেত্রে উক্ত ফান্ডে কপর্দকও দেননি।[২৩৫] অনেক বাবুরাই এভাবে কার্যক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতার পরিবর্তে পৃষ্ঠপ্রদর্শনেই দক্ষ ছিলেন।

তবে সাধারণভাবে intellect class বাবুরা অনেকেই দানখয়রাতের ব্যাপারে আদিবাবুদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখেন। অবশ্য আদিবাবুদের মতন অগাধ অর্থব্যয় সম্ভব ছিল না তাঁদের পক্ষে, দেওয়ান-বেনিয়ান-মুতসুদ্দিবাবুরা সে সময় চাকরিজীবী নির্দিষ্ট বেতনভুক বাঙালিতে পরিণত; অতএব তাঁদের আর্থিক সাধ্য ছিল সীমাবদ্ধ। তবুও, সর্বস্বান্ত হয়েও কেউ কেউ মহৎ কাজে দানখয়রাত করতে আপত্তি করতেন না। বিশেষত ব্রাহ্মরা, সিপাহি বিদ্রোহের সমকালে যাঁরা ছিলেন intellect class বাঙালিদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা-রুচি-স্বাতন্ত্র্যে বাস্তবিক অগ্রবর্তী, নানান সামাজিক আন্দোলন ও প্রয়োজনে তাঁরা অকাতরে দান করতেন। এঁরা কেউই প্রথাগত নবধা লক্ষণযুক্ত বাবু নন, এঁদের লক্ষণ সম্পূর্ণ আলাদা, তবুও দানখয়রাতের ব্যাপারে এঁদের বদান্যতা আদিবাবুদের তুলনায় বেশি বই কম ছিল না। আদিবাবুরা দানখয়রাত করতেন জাঁকজমক সহকারে, ঢাকঢোল পিটিয়ে। তাঁদের দানখয়রাতের পশ্চাতে ছিল আত্মপ্রচার ও যশলাভের মোহ। এর ব্যতিক্রম ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। 'কলিকাতা কমলালয়ে'র সংশয়ী প্রশ্নকর্তা জানান যে, 'প্রায় অনেক ভদ্রলোক আপন প্রশংসা শুনিতে মহা সন্তোষ হয়েন, ইহাতে কি মূর্খ কি পণ্ডিত সকলেই কহিয়া

থাকেন যে, মহাশয়ের তুল্য গুণবান ও গুণযোদ্ধা আর দেখি না ইত্যাদি আর দানও দম্ভ যুক্ত হইয়া করেন যথা অমুক পিতার শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণের দিগ্যে দশ টাকা দিয়াছে আমি ২০ টাকা দিব;'[২৩৬] বাস্তবিক সম্ভ্রান্ত বাবুরা অনেকেই ছিলেন তোষামোদপ্রিয় এবং অসম্ভব চাটুকারিতায় খুশি হয়ে যেমন গ্রহীতার হাতে স্বর্গ তুলে দিয়ে 'কত লোক দরিদ্র' হতেন, তেমনি বিরূপ হলে 'একটী কি দুইটী টাকা' দিয়ে অথবা না দিয়ে অর্ধচন্দ্র দেখাতে কসুর করতেন না।

কিন্তু intellect class বাবুদের অনেকেই ছিলেন প্রচারবিমুখ। তাঁরা কেউ কেউ দান করে সর্বস্বান্ত হতেন, কিন্তু সেই দান যথাসাধ্য গোপন করতে চেষ্টা করতেন। মদ্যপানবিরোধী আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ এবং শিক্ষা-সংস্কারের অক্লান্ত কর্মী বাবু প্যারীচরণ সরকার প্রসঙ্গে নবকৃষ্ণ ঘোষ বলেছেন,[২৩৭] প্যারীচরণ যতদূর সম্ভব গোপনে তাঁর দানখয়রাতের কাজটি করতেন, এমনকী তাঁর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবর্গও এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র জানতে পারত না;— 'অনেকে দান গোপন করিবার জন্য এরূপ আড়ম্বর করেন যে তাহাতে ঠিক বিপরীত ফলই হইয়া থাকে। প্যারীবাবুর চরিত্রে সেরূপ বিসদৃশ ব্যবহার কখনও দৃষ্ট হইত না। তিনি দান করিয়া ভ্রমেও কখনও আত্মসম্প্রীতি প্রকাশ করিতেন না, কর্ত্তব্যপালন করিয়াছেন মাত্র এইরূপ বোধ করিতেন। নামের বা লোকখ্যাতির আশায় দান তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল।' এই চরিত্রধর্ম শিক্ষিত বাবুদের অনেকেরই ছিল। উত্তরকালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলে (১৮৮৫ খ্রি.) শিক্ষিত বাবুরা অনেকেই স্বদেশের প্রয়োজনে দানের ঝুলি রিক্ত রাখেননি। কৃষ্ণনগরের বাবু তারাপদ ব্যানার্জি ১৮৮৩ সালে 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'এর পক্ষ থেকে 'জাতীয় তহবিল' গঠনের যে পরিকল্পনা করেন, তার জন্য প্রথম প্রচেষ্টাতেই ২০,০০০ টাকা সংগৃহীত হয়। বলা বাহুল্য, এই দান প্রথম পর্যায়ে সংগৃহীত হয়, intellect class বাবুদের কাছ থেকেই। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'The amount is small, but it has been found helpful to have a permanent fund at our disposal, a sort of nucleus drawing to it funds from other sources and inspiring public workers with the belief that the sinews of war would never be wanting.'[২৩৮] পঞ্চ ম-কারের সাধনা ছেড়ে শিক্ষিত রুচিমান বাবুরা তখন স্বদেশ সেবায় নিমগ্ন প্রাণ; অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জনহিতকর মহৎ দানের উপর তখন নির্ভর করছে বাবুদের সামাজিক কৌলীন্য। বাবুরা তখন অর্থনৈতিক কারণেই 'মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকে' পরিণত, অতএব মাতৃশ্রাদ্ধ-পিতৃশ্রাদ্ধে সোনা-রূপা, লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় অপেক্ষা সভা-সমিতি স্থাপন, জনহিতকর কাজে সম্মিলিত দান, শিক্ষা-সংস্কার, দেশসেবামূলক কাজে অর্থদানকে তাঁরা তখন সংগত বিবেচনা করছেন।

অবশ্য অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে দানেরও যে মাত্রাভেদ ঘটেছে, তা বেশ বোঝা যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র বাবু রামকমল সেনের জীবন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জানিয়েছেন, 'তিনি বাছবিচারহীন দানকে নিন্দা করতেন। তিনি বলতেন, যে লোক ভিক্ষা পাওয়ার যোগ্য তাকে ভিক্ষা না দেওয়া যতটা অন্যায়, যে ভিক্ষালাভের পক্ষে অনুপযুক্ত তাকে ভিক্ষা দেওয়াও ঠিত ততখানি অন্যায়।'[২৩৯] আদিবাবুরা দানখয়রাতে প্রয়োজন-অপ্রয়োজন বিচার করতেন না, বরং অপ্রয়োজন দানেই তাঁদের বাবুয়ানির যশসৌরভ দিগ্‌বিদিকে ছড়িয়ে পড়ত বলে, এ জাতীয় দানে তাঁদের সপক্ষপাত সমর্থন ছিল। কিন্তু সামান্য কেরানি থেকে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের চাকরিতে উন্নীত হওয়া রামকমল সেনের আর্থিক সংগতি ছিল সীমাবদ্ধ। অতএব, দানখয়রাত প্রসঙ্গে তাঁর এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃতপক্ষে বাবুদের রূপান্তরিত যুগধর্মের দিকে ইঙ্গিত দেয়। বিলাসী

ফুলবাবুদের জীবিত বংশধরেরাও দানখয়রাতে যে রীতিমত ব্যয়কুণ্ঠ, তা বোঝা যায় 'আপনার মুখ আপুনি দেখ'র চন্ননবিলাসী বাবুর আচরণে।[২৪০] বাবু মন্দিরে বাধ্য হয়ে একটি সিকি দিয়ে সারেন, কাঙালি-বিদায়ে 'পয়সা দেবার বদলে দু'টো চারটে হুড়ো' দিয়ে সারেন, বাপের আমলের পুরুতকে বিদায় দিয়ে বিবির পুরোহিতকে দক্ষিণাসহ ধরে 'পূজার একটী টাকা' দেন; বিলাসী বাবুরা রূপান্তরিত যুগধর্মের ইঙ্গিত বুঝেই দানখয়রাতের সংকোচনের পক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থনে বলেন, 'মনুষ্যের যেমত সাধ্য, তদনুসারে দান কিম্বা পুরস্কার প্রদান করায় যশলাভ এবং ধর্ম্ম সঞ্চয় হইয়া থাকে এবং তাহা করাও কর্ত্তব্য বটে।'[২৪১] 'নববাবুবিলাসে'র খলিফা 'দান'কে বাবুদের নয় লক্ষণের অন্যতম বলে নির্দিষ্ট করেছিল; দেখা যাচ্ছে, যুগধর্মে বাবুরা অনেকেই 'দান'কে বাবুয়ানার অঙ্গ হিসাবে না দেখে, নিতান্ত প্রয়োজন হিসাবে দেখছেন। সামাজিক সৎকার্যের প্রয়োজনে তাঁদের দানখয়রাতে আপত্তি নেই, যদিও দানের পরিমাণ বা সাধ্য সীমাবদ্ধ; কিন্তু নিতান্ত আর্থিক প্রতিপত্তি জাহির করতে কিংবা নিজেকে বড়ো দানশীল করতে অথবা বাবুশ্রেষ্ঠর শিরোপা পেতে লাগামছাড়া দানে তাঁরা অপারগ এবং অনাগ্রহী।

'নববাবুবিলাসে'র খলিফা যশস্বী হওয়াকে বাবুর নববিধ লক্ষণের অন্যতম বলে নির্দেশ করেছে। পূর্বে বর্ণিত আট প্রকার লক্ষণের আড়ম্বর সহ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে বাবুরা যে প্রভূত যশ অর্জন করতেন, সন্দেহ নেই। তবে অষ্টাদশ শতকের দিক থেকে তাবৎ উনিশ শতকের কালসীমায় মনন ও মেজাজের বদলে বাবুরা এতবার রূপান্তরিত হয়েছেন যে, যশ অর্জনের প্রক্রিয়াতেও প্রকৃতিগত বদল ঘটেছে। সাধারণভাবে দেখা যায়, আদিবাবুদের যশ অর্জনের প্রক্রিয়া কতকটা স্থূল এবং আড়ম্বরসর্বস্ব। অল্পশিক্ষা, কম পরিশ্রমে, সৎ-অসৎ পন্থায় প্রভূত আয়, নবাবি-সংস্কৃতির অবশেষের প্রতি আন্তরিক টান, মধ্যযুগীয় সামন্তপ্রভুসুলভ জীবনযাপন, সদ্যবিকচমান নগর কলকাতার গোষ্ঠীপতি হবার ঐকান্তিক ইচ্ছা আদিবাবুদের যশ অর্জনের পদ্ধতিগুলিকে নির্দিষ্ট করেছিল। সেসবের মধ্যে আড়ম্বর যতটা ছিল, রুচির পরিচয় ততটা নয়। চুঁচুড়ার বিখ্যাত কিংবা কুখ্যাত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদারের কোম্পানির নোট জ্বালিয়ে চুরুট ধরানো, তনুবাবুর খড়ম দিয়ে বহুলক্ষ মূল্যের বেলজিয়াম গ্লাসের আয়না ভেঙে পুনরায় তা খরিদ করা, দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে সম্ভ্রান্ত বাবুদের বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করে বাইনাচের আসর বসানো, পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধে 'স্বর্ণ-রৌপ্য নির্ম্মিত তৈজস এবং হস্তী নৌকা গাড়ি প্রভৃতি কত কত দানসামগ্রী' বিলানো, চূড়ামণি দত্তের খিস্তি-খেউড় সংসহকারে শোভাযাত্রা করে গঙ্গাযাত্রা করা, উৎকৃষ্ট ঢাকাই মসলিন ছিঁড়ে হাত-পা মোছা ইত্যাদি আচরণগুলিতে বাবুদের অপরিমিত বিত্তের পরিচয় মেলে বটে, কিন্তু রুচি হিসাবে এ জাতীয় আচরণ যে নিতান্ত স্থূল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অথচ প্রথম পর্যায়ে এই রুচিহীন আড়ম্বর সর্বস্বতাই তাঁদের যশের কারণ হয়েছে। যে গোপীমোহন দেব বন্যাদুর্গতদের সাহায্যার্থে একশত টাকা মাত্র দান করেন,[২৪২] তাঁরই জীবৎকালে পুত্র রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্রীর বিবাহে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'পাঁচ দিবস মজলিস হইয়াছিল, তাহার প্রথম তিন দিবস কেবল ইঙ্গরাজের মজলিস হইয়াছিল; ঐ মজলিসে শহরস্থ অনেক ভাগ্যবান সাহেব লোক ও বিবি লোক আগমণ করিয়াছিলেন এবং শহরস্থ তাবৎ নর্ত্তক-নর্ত্তকী আসিয়াছিল... শেষ দুই দিবস বাঙ্গালি মজলিস হইয়াছিল এবং তাহাতে শহরস্থ অনেক অনেক ভাগ্যবান লোক ও দেশ বিদেশস্থ নিমন্ত্রিত ঘটক কুলীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতির আগমন হইয়াছিল। ঐ দুই রাত্রিতে উত্তমরূপ নাচ গানেতে অতিশয় আমোদ হইয়াছিল, বিদেশাস্ত্রদিগের এমত সুন্দর বাসা ও মিধার পারিপাট্য করিয়া দিয়াছিলেন যে তাহারা নিবাসাপেক্ষা সুখবোধ করিয়াছিলেন।'[২৪৩]

লক্ষণীয় যে, প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ আদিবাবুদের যশ মূলত নির্ভরশীল ছিল বিবাহ, শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য উৎসবাদি উপলক্ষ্যে ব্যয়িত অর্থবিত্তের পরিমাণে, বাইনাচ ও বেশ্যাবাজিতে, জীবনযাপনের মাত্রাহীন বিলাসিতায়, তোষামোদকারীর প্রতি অকুণ্ঠ দানের দেখনদারিতে। এঁরা সাহেবসুবোদের পান-ভোজনে আপ্যায়িত করতেন, বিনিময়ে বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মতো মিলে যেত সরকারি খেতাব। একইসঙ্গে উৎসবাদি-পার্বণে লাট-বড়োলাটকে আপ্যায়িত করে অর্জন করতেন সামাজিক প্রতিষ্ঠা। প্রচুর অর্থব্যয়ে 'দলস্থ' ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত রেখে সামাজিক জাত-কাছারি বসাতেন এবং ন্যায়-অন্যায় সবরকমের বিধিবিধান দান করে নিজ যশগৌরবে আমোদিত হতেন। বুলবুল লড়াই কিংবা আখড়াইয়ের দলের পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারাও বাবুর যশ অর্জিত হত। নিকি প্রভৃতি বাইজি এবং যবনী বেশ্যার 'বাঁধাবাবু' হিসাবেও প্রভূত খ্যাতি মিলত তাঁদের। রক্ষিতাদের পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে দ্বিধাবোধ করতেন না তাঁরা, বদলে জুটত 'ফুলবাবু'র খ্যাতি ও যশ। তুলনায় কম হলেও, প্রয়োজনে মন্দির-নির্মাণ ও সংস্কারে অর্থব্যয় করতেন। গোবিন্দরাম মিত্রের 'ব্ল্যাক প্যাগোডা' নামে দেবালয় হলেও, মুখ্যত তা ছিল গোবিন্দরামের দম্ভের প্রকাশ। 'ব্ল্যাক জমিদার' গোবিন্দরামের আর্থিক প্রতিপত্তির ধ্বজাবাহী, একইসঙ্গে তাঁর যশেরও অন্যতম কারণ। আরেক 'ব্ল্যাক জমিদার' নন্দরাম সেনের উত্তরপুরুষ রচিত জীবনীতে মাতার ব্রতপালন উপলক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ের কথা জানিয়ে বলা হয়েছে :[২৪৪]

রথ মধ্যে দেবস্থান বিবিধ প্রকার।
উচ্চ মন্দিরের তুল্য রথের আকার॥...
তুল্যমূল্য ব্যয় হয় উভয় নির্মাণে।
লক্ষমুদ্রা প্রত্যেকেতে সর্ব্বদেশে জানে॥
কলিকাতা অট্টালিকা লক্ষমুদ্রা ব্যয়।
অলীক কিছুই নহে সর্ব লোকে কয়॥
বিগ্রবাটী শিবা ব্রত বাটীতে নিশ্চয়।
অন্য এক লক্ষ মুদ্রা হইলেক ব্যয়॥
হাটখোলা ঘাটে আর গো অশ্ব আশ্রমে।
আর লক্ষমুদ্রা যায় এইসব ধামে॥
লক্ষ মুদ্রা ব্যয় পুনঃ পুষ্কর্ণি দ্বাদশে।
হিজলি বাটীতে লক্ষ জানিহ বিশেষে॥
দেশ দেশান্তরে সর্ব্ব পুষ্কর্ণি হওয়াতে।
ব্রাহ্মণ মণ্ডলী বসবাস করাইতে॥
তাহাতে অনেক ব্যয় লোকেতে জানিল।
একলক্ষ মুদ্রা গত তাহাতে হইল॥
বাটীর পূজারবাটী সুশোভন ছিল।
আর লক্ষ মুদ্রা জান তাঁহাতে লাগিল॥
শিববিগ্র তৈজসাদি যত্ন অলঙ্কার।
সকলেতে ব্যয় হয় লক্ষ যে মুদ্রার॥

ব্রতের পালনে যত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠায়।
লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হয় কারণ মাতার॥...

এই বর্ণনায় অতিশয়োক্তি আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু বসতবাটী নির্মাণ, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত রক্ষণ, ব্রতপালন প্রভৃতি উপলক্ষ্যে বাবুরা যে অমিতব্যয়িতার পরিচয় দিতেন, সেই সত্যও নিহিত। উল্লিখিত নন্দরাম সেন তো একটি মাত্র উদাহরণ, সেকালের সংবাদপত্রের পাতায় এ জাতীয় অমিতব্যয়িতার দৃষ্টান্ত অসংখ্য। 'নববাবুবিলাসে'র খলিফা বাবুত্বের মাত্রাগত ভেদের কথা বলেছে,— 'যাঁহার চারি পরিপূর্ণ হইবেক তিনি হাপবাবু হইবেন। পয়ের বিবরণ পাশা পায়রা পরদার পোষাক। যাহার চারি প চারি খ, এই দুই পরিপূর্ণ হইবেক তিনি পুরা বাবু হইবেন। খয়ের বিবরণ খুসি খান-কী খানা খয়রাত।'[২৪৫] লক্ষণীয়, 'হাপবাবু' ও 'ফুলবাবু'র ওই মাত্রাভেদ কোথাও বাবুদের সুমার্জিত সুসংস্কৃত রুচিশীল চারিত্রিক গুণের কথা বলা হয়নি। অর্জিত শিক্ষা ও রুচির সমবায়ে গড়ে ওঠা জীবন-অভ্যাস অন্তত আদিবাবুদের ছিল না। 'হাপবাবু' কিংবা 'ফুলবাবু' হতে বাবুকে অর্থব্যয় করতে হবে কেবল। রুচিহীন, সুমার্জিত সাংস্কৃতিক জীবনাদর্শহীন, বিত্ত-লগ্ন বাবুত্বের এই বাহ্যাড়ম্বর সাহেব-প্রভুদের কৌতূহল উদ্রিক্ত করলেও, মুগ্ধ করেনি; শ্রীমতী ফেনটনের মতো অনেকের চোখেই এঁরা ছিলেন 'জানোয়ারেরও অধম' (Poor Creatures), 'নিকৃষ্ট জীব'। রামমোহন রায়ই সম্ভবত সর্বপ্রথম এই বাহ্য আড়ম্বরসর্বস্ব জীবনাচরণের মাঝে মার্জিত রুচি-স্বাতন্ত্র্যের সুপবন বয়ে আনলেন।

আলোচ্য সময়পর্বে রামমোহন রায়ের অবস্থান সম্ভবত আদিবাবু এবং intellect class 'ভদ্রলোক'বাবুদের মধ্যবর্তীস্থানে। তাঁর জীবনাচরণে আদিবাবুদের অনেক আচার-আচরণ আড়ম্বর যেমন অনুসৃত হয়েছে, তেমনি উত্তরকালের শিক্ষিত, রুচিমান বাবুদেরও তিনি বীজপুরুষ। এই রামমোহন শহরের সবচেয়ে ব্যয়সাপেক্ষ বাইজিকে পোষেন, নিয়মিত (যদিচ পরিমিত) মদ্যপান করেন, হিন্দুস্থানি নাচ সহযোগে সাহেবসুবোদের পান-ভোজনে আপ্যায়িত করেন। বাগানবাড়িতে রক্ষিতা-বিলাসে মগ্ন হন, উপরি উপার্জনের মাধ্যমে অল্পদিনেই সুবিশাল সম্পত্তির অধিকারী হয়ে বসেন। আবার, সেই রামমোহনই উপনিষদিক ধর্মচর্চা ও গ্রন্থাদি রচনার মাধ্যমে উদার ধর্মচর্চার সূচনা করেন, সতীদাহের বিরুদ্ধে সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হন, হিন্দুকলেজ সহ একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা-সংক্রান্ত সংস্কারে উৎসাহ দেখান, সংবাদপত্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতার সপক্ষে সোচ্চার হন, বিলেতে হাউস অব কমন্স-এ ভারতীয় জাতিসত্তা এবং অর্থনৈতিক সংস্কার বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মতামত জ্ঞাপন করেন। প্রাচীনের পাশাপাশি এই চূড়ান্ত আধুনিকতা, সেইসঙ্গে সমাজ-প্রগতির প্রতি টান রামমোহনকে আদিবাবুদের বৈশিষ্ট্যযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও intellect class বাবুদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এনে দিয়েছে। বস্তুত, intellect class বাবুদের আবির্ভাবের পশ্চাতে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ততটাই গুরুত্বপূর্ণ সমাজজীবনে রামমোহন রায়ের তাৎপর্যপূর্ণ উদ্যোগ ও ভূমিকা। এই উদ্যোগ সঞ্চারিত হয়েছিল ধর্ম থেকে শিক্ষা, সমাজসংস্কার থেকে ব্যক্তিগত রুচিবোধে। উত্তর কালের শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুরা অনেকেই যে রুচি ও মননকে বাবুত্বের শিরোভূষণ করে তুলেছিলেন, তার মূলে রামমোহন রায়ের জীবনচর্যা ও শিক্ষা। বিপিনচন্দ্র পালের মন্তব্য যথার্থ,— 'রাজা বর্ত্তমান যুগের যুগসন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং একদিকে প্রাচীনের সূত্র দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিয়া, অন্যদিকে নিজের স্বজাতির সাধনার সনাতন কষ্টিপাথরে ইউরোপের আগন্তুক সাধনাকে কষিয়া, উভয়ের সম্মিলন ও সমন্বয়ের উপরে এদেশে বর্ত্তমান নূতন যুগের,

নূতন সাধনার গোড়াপত্তন করিয়া যান।'[২৪৬] শিক্ষিত, আত্মাভিমানী, রুচিশীল উনিশ শতকীয় উত্তর-তিরিশ বাবুরা এই ভাবমোক্ষণেরই উপজাত।

নতুন ধ্যানধারণা ও জীবনাদর্শের পরিপোষক এই বাবুদের যশলোভ ছিল না এমন নয়, কিন্তু তাঁদের যশঅর্জনের পন্থা ছিল ভিন্ন। সমসাময়িক যুগপ্রেক্ষিতে এঁদের উন্নত জীবনাচরণ, রুচিবোধ ও মানসিকতা জনসাধারণের কাছ থেকে যশ ও সম্ভ্রম আপনা থেকেই আদায় করে নিয়েছিল, এর জন্য রাশি রাশি অর্থব্যয় করতে হয়নি। বস্তুত এঁরাই প্রথম প্রমাণ করলেন যে, বাবুত্ব অর্জনের জন্য পুঁজি ও বিত্তের পরিবর্তে শিক্ষা ও রুচিস্বাতন্ত্র্য অর্জনের প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, বাবুত্বকে বিত্তবানের একচেটিয়া অধিকারের আওতা থেকে উদ্ধার করে এঁরাই প্রথম মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোকে'র পঙ্‌ক্তিভুক্ত করলেন। এঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন পাশ্চাত্যশিক্ষায় সুশিক্ষিত এবং কেউ কেউ সরকারি প্রশাসনিক কর্মে নিযুক্ত। আদিবাবুদের মতো এঁরা কোম্পানির কর্মচারী কিংবা ইউরোপের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্কে আবদ্ধ থাকতে চাইলেন না আর, বরং নিজস্ব একটি শ্রেণি বা class গড়ে তুলতে চাইলেন। পরিবর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিও এর জন্য কতকটা দায়ী। উনিশ শতকের চারের দশক থেকে কোম্পানির উচ্চকোটির কর্মচারীদের সঙ্গে দেশীয় বিত্তবানদের অবাধ সামাজিক সম্পর্ক হ্রাস পেতে থাকে, ইউরোপীয় বণিকের ব্যাবসায় দেশি-বিদেশি যৌথ মালিকানাার পরিবর্তে সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব পুঁজি বিনিয়োগ এবং একক মালিকানাভোগের ব্যাপারে উৎসাহিত হয়ে পড়ে, শিক্ষিত দেশীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণি ব্যাবসাবাণিজ্য কিংবা দেওয়ানির পরিবর্তে প্রশাসনিক কাজের প্রতি উৎসাহ দেখাতে থাকে, এমনকী আদিবাবুদের উত্তর-প্রজন্মও পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে প্রণোদিত হয়ে শিক্ষিত 'মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক' শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসে 'অভিজাত ভদ্রলোক' বলতে বোঝাত বড়ো জমিদার, উদ্যোগপতি, দালাল, বেনিয়ানদের— যাঁদের বিপুল বিত্ত-সম্পত্তি রয়েছে। কিন্তু চারের দশক থেকেই এই ধারণা বদলাতে শুরু করে। ১৮৭৩-এ পৌঁছে রমেশচন্দ্র দত্ত 'দেশীয় জনসাধারণের মত' কথাটি প্রসঙ্গে তাঁর অসন্তোষ ব্যক্ত করেন এই কারণে যে, 'Public opinion in this country means opinion of Aristocracy and middle classes— in one word, the opinion of the Bhadralok and not of the cultivating and working classes.'[২৪৭] অর্থাৎ উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়েই কলকাতার 'বনেদি বড়োলোক' ও ভুঁইফোঁড় অভিজাত এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাবুরা সমচিহ্নিত 'ভদ্রলোকে'র কোঠায় উন্নীত। এইসব মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুরা একটি বিশেষ সামাজিক বর্গ, যাঁরা প্রায় সমজাতীয় আর্থিক স্তরজীবী, সদৃশ জীবনযাপনে অভ্যস্ত এবং একইসঙ্গে নিজেদের স্বতন্ত্র সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন।[২৪৮] নতুন শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুরা আদিবাবুদের জীবনযাপন প্রণালী গ্রহণ করতে অনাগ্রহী ছিলেন, বরং আদিবাবুদের উত্তর প্রজন্মই নব্যশিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের অনুকরণ করতে সচেষ্ট হলেন। ইতিপূর্বে ডিরোজিওর শিষ্যগণ তথা ইয়ং বেঙ্গলদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি টান, পাশ্চাত্য আদবকায়দা অনুসরণের প্রতি মোহ, সামাজিক ন্যায় বিষয়ে উৎসাহ, সেইসঙ্গে আবেদন-নিবেদনের মধ্য দিয়ে প্রশাসনের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ইচ্ছা দেখা দিয়েছিল। সাধারণভাবে উচ্চতর প্রশাসনিক কাঠামোয় ভারতীয়দের অংশগ্রহণ তখন পর্যন্ত অসম্ভব ছিল। যদিও ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের পরে ওয়ারেন হেস্টিংসের অধীনে কোম্পানির অধস্তন পদগুলিতে ক্রমাগত ভারতীয়দের নিয়োগ করা হতে থাকে, বিশেষ করে বিচারব্যবস্থায়। পরবর্তীতে লর্ড বেন্টিংক প্রশাসনকে স্থানীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য ভারতীয়দের নিয়োগ

করার কথা বলেন। বিশেষ করে বিচারবিভাগীয় আধিকারিক হিসাবে ভারতীয়দের নিয়োগ করা হয় এবং ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে একটি রেগুলেশন চালু করে তাঁদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। রাজধানী শহর হিসাবে কলকাতার বাঙালি শিক্ষিত সম্প্রদায় এই সুযোগ পূর্ণমাত্রায় সদ্‌ব্যবহার করে। দেওয়ানি, বেনিয়ানি কিংবা দালালির মতো অর্থকরী পেশা থেকে মুখ ফিরিয়ে স্বল্প আয়ের প্রশাসনিক কর্মে আগ্রহী হয়ে ওঠেন তাঁরা। হরচন্দ্র ঘোষের মতো ইয়ং বেঙ্গল সামান্য বেতনে জেলা কোর্টের বিচারবিভাগীয় আধিকারিকের পদ গ্রহণ করেন, যদিচ তাঁর পারিবারিক সম্পত্তি থেকে আয় ছিল সরকারি বেতন অপেক্ষা বেশি। স্বভাবতই এঁদের জীবনযাপন এবং মানসিক গঠন আদিবাবুদের জীবনযাপন কেন্দ্রিক ধারণা থেকে ছিল প্রায় বিপরীত। দানশীলতা, বদান্যতা, সংগীত প্রভৃতি সাংস্কৃতিক বিষয়ে আসক্তি, কিঞ্চিৎ পানদোষ এঁদের থাকলেও, এঁরা কেউ খলিফা-কথিত 'হাপবাবু' বা 'ফুলবাবু' হতে চাইলেন না, ফলে লাগামছাড়া রুচিহীন বিলাসের বহ্নুৎসব থেকে এঁরা দূরেই রইলেন।

শিক্ষিত বাঙালিবাবুদের এই পরিবর্তনশীল মানস ব্রাহ্ম ভাবধারার সংস্পর্শে এসে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি তথা 'ভদ্রলোক'বাবুদের জন্ম দিল। বস্তুত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পারস্পরিক সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে ব্রাহ্মবাবুরা যুগের এক নতুন সমীকরণ উপস্থিত করলেন, যার ফলে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিকতা অতিদ্রুত অপসৃত হল এবং বিকশিত হল 'নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি' (new middle class)। আধুনিক মনন-চিন্তা ও যুক্তিবাদের মাধ্যমে এঁরা যথার্থই এক নবযুগের সৃষ্টি করলেন। আদিবাবুদের কাল ইতিপূর্বেই শেষ হয়েছিল, আদিবাবুত্বেরও মৃত্যুঘণ্টা বাজল এবার। যদিও এই নবযুগের ব্যাপ্তি ও প্রভাব 'ভদ্রলোক'বাবুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল বলে, সার্বিক অর্থে একে 'রেনেসাঁস' বলা গেল না; তবুও বাবু শ্রেণির এই মানসিক ভাব-বদল যে সময়কে কিছুমাত্র প্রভাবিত করেনি, এমনটি নয়। এ কারণেই ব্রাহ্মসমাজ বুদ্ধিজীবী, বণিক এবং বুর্জোয়া ভূ-স্বামীদের কাছ থেকে প্রাথমিকভাবে সহর্ষ সমর্থন আদায় করে নিয়েছিল।[২৪৯] জাতি-ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে উদারনীতি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় বিদ্যায় পারদর্শিতা, জীবনযাপনে দেশি-বিদেশি উভয় সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন, স্ত্রীশিক্ষা সহ নানান সামাজিক সংস্কারে উৎসাহ, সংবাদপত্র পরিচালনা বা সম্পাদনার মাধ্যমে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের ও সামাজিক বিষয় সম্পর্কিত মতবাদের প্রচার প্রাথমিক পর্বে ব্রাহ্মদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা গিয়েছিল। নতুন কালের শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুরা সাধারণভাবে এই গুণগুলি অধীত করে সামাজিক যশ ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

১৮৩৯-এর ৬ অক্টোবর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে আচার্য পদে বরণ করে, মাত্র ১৬ জন সভ্য নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন, ১৮৪৭-এর মধ্যে তার সভ্যসংখ্যা ৫০-এ গিয়ে দাঁড়ায়।[২৫০] দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় এব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে পড়েন, এও সত্য। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের হাত ধরেই রামমোহনের কঠোর যুক্তিবাদী ধর্ম আনুষ্ঠানিকতার পল্বলে নিমজ্জিত হল। ব্রাহ্মধর্ম হয়ে উঠল আচার- সর্বস্ব, প্রচারমুখী, গুরু-কর্তৃক মন্ত্রদান চালু হল, পরমত অসহিষ্ণুতাও দেখা দিতে লাগল। রাজনারায়ণ বসু জানিয়েছেন, ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের দিন বিস্কুট ও সেরি পান সহযোগে তিনি ধর্মান্তরিত হন। কারণ 'জাতিবিভেদ আমরা মানি না, উহা দেখাইবার জন্য ঐরূপ করা হয়।'[২৫১] স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ কন্যার বিবাহে মন্ত্রোচ্চারণ ও স্ত্রী-আচার পালনে কোনো আপত্তি না করায় 'The Friend of India' (18.08.1862) তাঁকে বিদ্রূপ করে। ব্রাহ্ম বাবুরা ক্রমশ আনুষ্ঠানিকতা এবং বাহ্যাড়ম্বরকে আঁকড়ে ধরলে উপহাসের পাত্র হয়ে ওঠেন। হিন্দুধর্মের যেসব আচার-সংস্কারকে উপাসনাকালে ব্রাহ্মরা বিদ্রূপ করতেন, অনেক ব্রাহ্মবাবুই

ব্যক্তিগত জীবনে ওইসকল কুসংস্কার-পালনে দ্বিধাবোধ করতেন না। পৌত্তলিকতা, কলসী উৎসর্গ কিংবা ভূতচতুর্দ্দশীর প্রদীপ দেখানো, গোবর-ভক্ষণ করে প্রায়শ্চিত্ত করা ইত্যাদি সাড়ম্বরে প্রতিপালিত হত। দাড়ি রাখা, চশমা পরা ইত্যাদি বাহ্যাড়ম্বর ক্রমশ ব্রাহ্মবাবুদের আচ্ছন্ন করে ফেলে। ভুবনমোহন সরকারের 'ডাক্তারবাবু' (১৮৭৫ খ্রি.) প্রহসনে বসুজ মশায় বলেছেন, 'আমি ত বলি সে বরং ছিল ভাল, যা দু'টো ব্যাপ্টাইজ হতো বটে, কিন্তু তারা সমাজভ্রষ্ট হয়ে আমাদের বিশেষ ক্ষতি করতে পারত না। এরা (ব্রাহ্মরা) ত তা নয়, হিঁদুয়ানির প্রকৃত শত্রু হয়ে স্বচ্ছন্দে আমাদের সমাজে রয়েছে; বামুন পইতে ফেলে শূদ্রের মেয়ে বিয়ে করছে; অথচ সমাজভ্রষ্ট নয়, কেমন মজা দেখুন দেখি, বুকে বসে দাড়ি উপড়াচ্ছে; অথচ হিন্দু নয় বলে পরিচয় দেয়।... ওরা যে কি তা আজও বুঝতে পারলেম না; দেখতে ত না হিন্দু না মুসলমান, না সাহেব; নাকে চস্‌মা, নেড়েদের মত দাড়ি, ভট্‌চাজদের মত থান ধুতি— সাহেবদের মত বেদিতে দাঁড়িয়ে লেকচারও দেয়, আবার খোল করতাল বাজিয়ে রাস্তায় রাস্তায় নেচেও বেড়ায়।'[২৫২] যে ব্রাহ্মরা স্বর্গ-নরক, আত্মা— কিছুই মানে না, কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় এসব তাদের ভণ্ডামি ছাড়া কিছু নয়। অমৃতলাল বসু-র 'বাবু' (১৮৯৫) প্রহসনে ব্রাহ্ম সজনী তিনকড়িকে ভর্ৎসনা করে বলেছে, 'হরি হরি— মা মা— বলতে আমার আপত্তি নেই, তা বলে হিন্দু হওয়ার আবশ্যক কি? দেখুন, প্রেমের বলে আমাদের হৃদয় এখন উদার হয়েছে; আত্মায় কিছুমাত্র ময়লা নাই, তাইতে করে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে হিন্দুমাত্রেই মিথ্যাবাদী, প্রতারক, অত্যাচারী, রমণী পীড়নকারী— তারা সকলেই নরকে যাবে।'[২৫৩]

বস্তুত, ভণ্ডামি ও আড়ম্বর ব্রাহ্মবাবুদের ক্রমশ সমাজের চোখে নিন্দনীয় ও উপহাসাস্পদ করে তুলেছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মদের কথা মনে রেখেই বলা চলে, ব্রাহ্মবাবুদের মধ্যে হুজুগ যতটা ছিল, ব্রাহ্মমতের প্রতি নিষ্ঠা তদ্রূপ ছিল না। নিজেদের রুচিশীল, শিক্ষিত, প্রগতিপন্থী বাবু হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার গোপন বাসনা থেকেই অনেকে ভিড় জমিয়েছিলেন ব্রাহ্মসমাজে। এতে সংখ্যাবৃদ্ধি যতটা ঘটেছিল, আস্থা ততটা নয়। হুতোম তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় জানিয়েছেন[২৫৪] যে, ব্রাহ্মসমাজের জন্মতিথিতে দেয় ব্রাহ্ম ভোজে যতসংখ্যক সভ্য ভিড় জমাতেন, প্রতি বুধবার সাপ্তাহিক উপাসনার দিন 'সমাজে কেবল জন দশ বারোকে চক্ষু বুজে ঘাড় নাড়তে ও সুর করে সংস্কৃত তাজিয়া' পড়তে দেখা যেত। সাধারণভাবে ব্রাহ্মবাবুদের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল সমাজের চোখে; যথা—

ক. ধর্মীয় আচার-আচরণে খ্রিস্ট ও ইসলাম ধর্মের প্রভাব ও বাড়াবাড়ি। রাজনারায়ণ বসু যে বিস্কুট ও সেরি সহযোগে ব্রাহ্মদীক্ষার উল্লেখ করেছেন, তা এ লক্ষণের অন্যতম উদাহরণ।

খ. বিদেশি সাহেবদের অনুকরণে স্ত্রী-পুরুষ সম্মিলিত মেলামেশার দিকে ঝোঁক। কানাইলাল সেনের 'কলির দশদশা' (১৮৭০) প্রহসনে ব্রাহ্মপুরুষের প্রধান আকর্ষণের কথা বলতে গিয়ে হরিহর বলেছে, 'ঐ যে সমাজমন্দিরে যে কান্‌খুড়কী বেটীদের সঙ্গে একত্রে বসে চক্ষু বুজোবি, ঐটেই প্রধান মৎলব।'[২৫৫]

গ. কথায় ও কাজে ফারাক ছিল ব্রাহ্মবাবুদের অন্যতম স্বভাব-বৈশিষ্ট্য। পৌত্তলিক হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিষোদ্গার করেও অনেক প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মবাবুই গোপনে পৌত্তলিকের আচার-সংস্কার মেনে চলতেন। ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'সমাজ কুচিত্র' (১৮৬৫) গ্রন্থে দেখা যায়,[২৫৬] 'একজন ব্রাহ্ম মাটির সরস্বতীর চূড়োর উপর "ওঁ তৎসৎ" লিখে পৌত্তলিকদের ঢাক ঢোলের পরিবর্তে পিয়ানো এবং হারমোনিয়াম বাজিয়ে দুদণ্ড আয়েস কর্ব্বেন স্থির করেছেন। তিনি এজন্য দোষী হতে পারেন না। যখন

ব্রাহ্মশ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মঅন্নপ্রাশন, ব্রাহ্ম জাতকর্ম্ম, ব্রাহ্ম-সূতিকাপুজো ও ব্রাহ্ম উপনয়ন প্রভৃতি চল্‌চে, তখন ব্রাহ্মমতে সরস্বতী পুজো ও দুর্গোৎসব না হতে পারে কেন?' দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পারিবারিক বাসন্তীপূজা রহিত করলেও দুর্গাপূজা বন্ধ করেননি। কেশব সেন যোলো বছরের কমে মেয়েদের বিবাহ না দেবার পক্ষে মত রেখেও নিজের ত্রয়োদশ বৎসরের কন্যার বিবাহ দেন কুচবিহার রাজপরিবারে। প্রথম বিধবা বিবাহকারী ব্রাহ্ম শ্রীশচন্দ্র বিধবা বিবাহের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ পত্নীর মৃত্যুর পর গোবর-ভক্ষণ করে পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরে যান। হুতোম এ কারণেই নির্মম: 'সকালে ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মরা একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিধিপূর্বক উপাসনা করেচেন— আবার অনেকে ব্রাহ্ম কলসি উচ্ছগ্‌গু কর্‌বেন। এ বারে উক্ত সমাজের কোন উপাচার্য্য বড় ধুম করে কালী পুজো করেছিলেন ও বিধবা বিবাহে যাবার প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে জমিদারের বাড়ি শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করে গোবর খেতেও ত্রুটি করেননি। আজকাল ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মর্ম্ম বোঝা ভার, বাড়িতে দুর্গোৎসবও হবে আবার ফি বুধবারে সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদ্রিত করে মড়াকান্না কাঁদতেও হবে। পরমেশ্বর কি খোট্টা না মাহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ? যে বেদ ভাঙা সংস্কৃত পদ ভিন্ন অন্য ভাষায় তাঁরে ডাক্‌লে তিনি বুজতে পারবেন না— আড্‌ডা থেকে না ডাকলে শুনতে পাবেন না; এসে কৃশ্চানী ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আড়ম্বর এক হবে, তারি যোগাড় হচ্চে।'[২৫৭]

ঘ. স্ত্রীশিক্ষা, নারীস্বাধীনতা বিষয়ে তাদের মোহ ও উদ্যম ক্রমশ হুজুগে পরিণত হয়েছিল। সাহেবদের মতো স্ত্রীদের সমাজে বের করার জন্য তাঁরা অনেক সময় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়তেন। রাখালদাস ভট্টাচার্যের 'সুরুচির ধ্বজা' (১৮৮৬) প্রহসনে ব্রাহ্ম-বাবু চারুচন্দ্র তাঁর সেকেলে স্ত্রী সম্পর্কে বিরক্ত হয়ে লালচাঁদকে বলেছেন, 'Accomplished wife বিনা এই পার্থিব জীবনই বৃথা। মানুষের progress-এর অর্দ্ধভাগ wife-এ help করেন। বিশেষত সভ্য সমাজে আর আজকালকার দিনে wife নিয়েই পসার। এই দেখুন আমার একটী সেকেলে বন্ধু কেবল এক accomplished wife-এর জোরে বড় বড় association-এর member হচ্চেন, Secretary হচ্চেন; প্রধান প্রধান social movement-এ leading part নিচ্চেন। Progressive-দের মধ্যে তাঁর ভারি পসার। সেই wife-এর direction-এ তিনি যেন নবজীবন লাভ করেছেন। এখন আর তাঁকে সে মানুষ বলেই বোধ হয় না— the old bird has assumed new feathers.'[২৫৮]

ঙ. পোশাকে-আশাকে ব্রাহ্মবাবুরা নিজস্ব ফ্যাশন মেনে চলতেন। গলাবন্ধ কোট ও ধুতির সহাবস্থান তাঁরাই প্রথম চালু করেন। সেইসঙ্গে দাড়ি রাখা ও চশমা পরা ছিল আবশ্যক। শেযোক্ত দু'টি যেন ব্রাহ্ম-বাবুদের অলংকার-স্বরূপ ছিল। ইয়ং বেঙ্গলদের অনুকরণে এই ফ্যাশন ব্রাহ্মরা গ্রহণ করে থাকতে পারেন। ব্রাহ্মবাবুদের এই বিশেষ বেশবাসের উপর কটাক্ষ করে 'বিশ্বসঙ্গীত' গ্রন্থে গান বাঁধা হয়েছে—[২৫৯]

> 'চাপ দাড়ি রাখা চোখে চস্‌মা ঢাকা,
> ভয়ানক ঢং লেগেছে বাংলাতে।
> এ পথের পথিক নম্বরে অধিক
> যায় কেবল ইয়ং বেঙ্গলেতে।...'

অবশ্য শুধু ব্রাহ্মবাবুরাই নয়, নব্য সংস্কৃতি সম্পন্ন অনেক যুবকই দাড়ি ও চশমা শোভিত হতেন। অমৃতলাল বসু-র 'বিবাহ-বিভ্রাট' (১৮৮৪) প্রহসনে এল.এ পাঠরত বরের পিতা ঘটকের কাছে নগদ চার হাজার

টাকা, ছেলের জন্য সোনার ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হীরের আংটি ও সোনার চশমা চেয়েছেন। ছেলের চোখে কোনো 'ব্যামো হয়েছিল না কি' জানতে চাওয়ায়, ঘটককে বরের পিতা বলেছেন, 'তুমি দেখছি কিছুই খবর রাখ না, এল.এ-র বিদ্যা এখন সূক্ষ্ম হয়েছে, চস্‌মা না হ'লে স্পষ্ট দেখা যায় না।'[২৬০]

চ. মদ্যপানকে ব্রাহ্মরা Social taboo বলে মনে করতেন। রামমোহন রায়ের দৃষ্টান্তে দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ সকলেই নিয়মিত মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন। 'আত্মচরিতে' রাজনারায়ণ বসু মদ্যপানে নিজের মাত্রারিক্ত আসক্তির কথা জানিয়েছেন। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ মিত্র, ডাক্তার দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের অকালমৃত্যু হয় অপরিমিত মদ্যপানের জন্য। শিবনাথ শাস্ত্রী এই বলে আক্ষেপ করেছেন যে, 'রাজা (রামমোহন রায়) বোধ হয় এ কথাটা চিন্তা করিয়া দেখেন নাই যে, যাহা তাঁহার পক্ষে পরিমিত সীমার মধ্যে রক্ষা সুসাধ্য ছিল, তাহা অপরের পক্ষে সর্ব্বনাশের কারণ হইতে পারে। পরবর্তী সময়ে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই সুরা পান নিবন্ধন আমরা অনেক ভাল ভাল' লোক অকালে হারাইয়াছি।'[২৬১] ভণ্ড বা পোশাকি ব্রাহ্মরা 'প্রগতিশীলতা'র ছুতো দেখিয়ে মদ্যপানে আসক্ত হত। ফলে, ব্রাহ্মবাবু মাত্রেই ভণ্ড, শঠ, মদ্যপ এমন একটি ধারণা গড়ে উঠেছিল সাধারণের মনে। বটতলার বইয়ে এ বিষয়ে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েননি জানা-অজানা গ্রন্থকারেরা।

ছ. সুরুচি-কুরুচি, শ্লীল-অশ্লীল প্রভৃতি বিষয়ে ব্রাহ্মবাবুদের বাড়াবাড়ি রকম ছুৎমার্গ ছিল। ভিক্টোরিয়ান শুচিতার ধারণাকে তাঁরা সামাজিক জীবনের সর্বস্তরে প্রয়োগ করতে চাইতেন। তাঁদের কাছে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর যেমন অশ্লীল, স্বামী-স্ত্রী শব্দও তেমনি অমার্জিত। অমৃতলাল বসু-র 'বাবু' নাটকে (১৮৯৪) বাঞ্ছারামের পত্নী ক্ষমাসুন্দরী 'যেখানে সেখানে মাগ-ভাতারে আর দিন-রাত সভ্য হতে পারা যায় না' বললে বাঞ্ছারাম স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করে বলেছে, 'একি, ক্রমে অসভ্যতা থেকে কুরুচি ধর্‌লে! স্ত্রী-পুরুষ কি! ভ্রাতা-ভগিনী বল্‌তে পার না?[২৬২]

জ. তবে সাধারণভাবে ব্রাহ্মবাবুরা শিক্ষিত, মার্জিত বুদ্ধি এবং সামাজিক প্রগতি ও সংস্কার বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। পত্রিকা সম্পাদন, সংবাদপত্র পরিচালনার মতো কাজে তাঁদের উৎসাহ ছিল প্রবল। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মোহ থেকেই এঁদের মনে স্বাজাত্যবোধের বীজ উপ্ত হয় এবং কালক্রমে রাজনৈতিক সচেতনতার সৃষ্টি করে। উনিশ শতকের রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের অনেকখানি ব্রাহ্মবাবুদের অবদান। সাধারণভাবে ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য ছিল 'to establish the worship of the Supreme Being in Spirit as opposed to the prevailing idolatry of the land',[২৬৩] কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মরা কেবল পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে পরম ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠার কাজেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, সামাজিক সংস্কার ও প্রগতিতে অংশগ্রহণ করে শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' বাবুদের একটি বিশেষ শ্রেণিপরিচয় গড়ে দিয়েছিলেন। হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্ম-ধর্মের বিকাশের গতি রুদ্ধ হলেও, শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের আচার-আচরণ ও চিন্তাবৃত্তে তাঁরা দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। উদ্ভ্রান্ত আদিবাবুত্বের কাল থেকে শিক্ষিত, রুচিশীল নব্যবাবুত্বে উত্তরণে ব্রাহ্ম-বাবুদের অবদান বিস্মৃত হবার নয়।

ব্রাহ্মবাবুদের বোধ ও উত্তরণে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব ছিল প্রবল। আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করে দেখিয়েছি, প্রশাসনিক কাজে এ-দেশীয়দের অংশগ্রহণের অধিকার শিক্ষিত দেশীয় মানুষদের মধ্যে কি নিদারণ ভাব-উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য মুখিয়ে ছিলেন শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুরা। কিন্তু প্রশাসনের উচ্চপদ তখনও পর্যন্ত ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত

না থাকায় স্বল্প বেতনের নিম্নপদে নিযুক্ত হওয়াকেই তাঁরা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কভেনান্টেড সিভিল সার্ভিস তথা উচ্চপদে নিয়োগের পরীক্ষা ১৮৫৩ সালে প্রকরণগতভাবে ভারতীয়দের কাছে উন্মুক্ত হলেও, কার্যত তা ছিল না। কারণ যেহেতু নিয়োগের এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হত কেবলমাত্র ইংল্যান্ডেই। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের সময় বাঙালি 'ভদ্রলোক' শ্রেণি আশ্চর্যজনকভাবে নীরব ছিলেন, ইংরেজিয়ানার প্রতি তাঁদের অধিকাংশের প্রত্যক্ষত আস্থা ও মোহ ছিল অটুট। তবে তাঁদের মনোজগতে যে আলোড়ন চলছিল তা বোঝা যায়, বিদ্রোহের পরের বছরগুলিতে হিন্দুমেলা, ভারতসভা ইত্যাদি গঠনের মধ্য দিয়ে। সমকালীন ইউরোপে, এমনকী খোদ ইংল্যান্ডে, মধ্যবিত্ত-শ্রেণি স্বাধীনতা-সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের জন্য যে লড়াই শুরু করেছিলেন, তা-ও এঁদের অজ্ঞাত ছিল না; 'They were conscious of their political role in the Society which had created them'.[২৬৪] মহাবিদ্রোহের পর ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা ব্রিটিশ সরকারের কাছে বারবার আর্জি জানিয়েছিল উচ্চপদে নিয়োগের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা যাতে এদেশেই নেওয়া হয়। অতঃপর সরকার ইউরোপীয় আমলাদের প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও ১৮৭০ সালে 'স্ট্যাটিউটরি সিভিল সার্ভিস' চালু করে এবং দক্ষ ও মেধাবী ভারতীয়দের প্রশাসনের উচ্চপদে নিয়োগের বাধা দূর হয়। কিন্তু অভিজাত লোকেরাই ছিলেন লর্ড লিটনের বিশেষ পছন্দের মানুষ ফলে, সাধারণত অভিজাত বনেদি বংশজাত কিংবা এদেশের রাজপরিবারের সদস্যরাই এর সুযোগ পেতে থাকে।[২৬৫] দেওয়ানি, বেনিয়ানি, দালালির মাধ্যমে বনেদি বড়োলোক বনে যাওয়া আদিবাবুদের তৃতীয়, চতুর্থ প্রজন্ম, তিরিশের দশকের পর ইংরেজি শিক্ষার প্রসাদপুষ্ট মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবু, শিক্ষিত জমিদার কিংবা রাজপরিবারের সদস্যরা এই ব্যবস্থার সুযোগেই সমশ্রেণিভুক্ত হয়ে পড়েন। রমেশচন্দ্র দত্ত এ কারণেই এঁদের সমশ্রেণিভুক্ত 'ভদ্রলোকে'র দল বলেছেন।

রাজ পরিবারের সদস্য কিংবা বনেদি বংশজদের সুবিধা দেওয়ার জন্য লিটনের উৎসাহের কারণ ছিল, ব্রিটিশ শাসনের প্রতি এঁদের স্বাভাবিক আনুগত্য, যদিও আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকের মতে, 'The loyalty of the Bengali intelligentsia was, therefore, conditional. So long as the British rulers acted in favour of the class interest of the intelligentsia, thieir loyalty was assurd but not otherwise.'[২৬৬] তথাপি, সাধারণভাবে এঁদের অনেকেই জীবনযাপনে, আদবকায়দায়, ভাবনায়চিন্তায় সাহেব-ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। প্রথমদিকে যা ছিল প্রেরণা, ক্রমশই তা উৎকট অনুকরণে পর্যবসিত হয়। হুতোম এই শ্রেণিদের দু'টি type-এর উল্লেখ করেছেন ১৮৭০-এর আগেই। বোঝা যাচ্ছিল, এঁরা তৈরিই ছিলেন, ১৮৭০ ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। হুতোমের মতে, 'আজকাল সহরের ইংরাজি কেতার বাবুরা দু'টি দল হয়েছেন, প্রথম দল উঁচুকেতা সাহেবের গোবরের বস্ট। দ্বিতীয় ''ফিরিঙ্গীর জঘন্য প্রতিরূপ''। প্রথম দলের সকলি ইংরাজি কেতা, টেবিল চেয়ারের মজলিস, পেয়ালা করা চা, চুরট, জগে করা জল, ডিকান্টারে ব্রাণ্ডী ও কাচের গ্লাসে সোলার ঢাক্নি, সালু মোড়া,— হরকরা, ইংলিশম্যান ও ফিনিক্স সামনে থাকে, পোলটিক্স ও ''বেস্ট নিউস অব দি ডে'' নিয়েই সর্ব্বদা আন্দোলন। টেবিলে খান, কমোডে হাগেন এবং কাগজে পোঁদ পোঁচেন। এঁরা সহৃদয়তা, দয়া, পরোপকার, নম্রতা প্রভৃতি বিবিধ সদগুণে ভূষিত; কেবল সর্ব্বদাই রোগ, মদ খেয়ে খেয়ে জুজু, স্ত্রীর দাস— উৎসাহ, একতা, উন্নতীচ্ছা একেবারে হৃদয় হতে নির্ব্বাসিত হয়েছে; এঁরাই ওল্‌ড ক্লাস।'

'দ্বিতীয়ের মধ্যে— বাগাম্বর মিত্র প্রভৃতি, সাপ হতেও ভয়ানক, বাঘের চেয়ে হিংস্র, বল্‌তে গেলে এঁরা একরকম ভয়ানক জানোয়ার। চোরেরা যেমন চুরি কত্তে গেলে মদ ঠোঁটে দিয়ে গন্ধ করে মাতাল সেজে যায়,

এঁরা সেইরূপ কেবল স্বার্থ সাধনার্থ স্বদেশের ভাল চেষ্টা করেন। ''ক্যামন করে আপনি বড়লোক হব'' ''ক্যামন করে সকলে পায়ের নীচে থাকবে,'' এই এঁদের নিয়ত চেষ্টা— পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে আপনার গোঁপে তেল দেওয়াই এঁদের পলিসী, এঁদের কাছে দাতব্য দূরপরিহার— চার আনার বেশী দান নাই।'[২৬৭]

হুতোমের সময়েই প্রথমোক্ত 'ওল্‌ড ক্লাস' বাবুরা কমে আসছিলেন, ভিড় করছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণির বাবুরা। নিজ স্বার্থের প্রয়োজনে 'ফিরিঙ্গী' সাজা বাবুদের কথা বলতে নিয়ে হুতোম অবশ্য নব্যবাবু তথা ইয়ং বেঙ্গলদের দিকে প্রকারান্তরে ইঙ্গিত করেছেন। ভবানীচরণ-কথিত 'নববাবু'দের প্রহরশেষের ঘণ্টা বেজেছিল এঁদেরই হাতে। ১৮২৮ সালের মধ্যেই ডিরোজিওর সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে। ডিরোজিওর জীবনচরিত-লেখক মি. টমাস এডওয়ার্ড্‌স-এর গ্রন্থে উদ্ধৃত হিন্দু কলেজের তৎকালীন কেরানি হরমোহন চট্টোপাধ্যায়ের মূল্যবান বিবরণী থেকে জানা যায়,[২৬৮] ডিরোজিওর প্রভাবে এঁদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল সু-সাহিত্য পাঠের রুচি; নানাবিধ কুসংস্কার ও প্রাচীন আচার-প্রথার প্রতি অবিশ্বাস; চারিত্রিক দৃঢ়তা, যুক্তিবোধ, সর্বোপরি 'they were all considered men of truth'। ডিরোজিওর 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রেরণায় উত্তরকালে তাঁর একাধিক 'Debating Club' গড়ে তোলেন এবং হিন্দুসমাজের কুসংস্কার মুক্তি, স্ত্রী-শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক, আলাপ-আলোচনা কিম্বা আন্দোলন সংঘটিত করতে থাকেন।

ইয়ং বেঙ্গলদের প্রভাবে অন্যান্য যুবকেরাও এই ভাবধারায় দীক্ষিত হন এবং এই নিয়ে সমাজে প্রাচীন ও নবীনের প্রাথমিক সংঘাতের বাতাবরণ গড়ে ওঠে। প্যারীচাঁদ মিত্রের ভাষায়, 'তাঁহার শিক্ষার এই ফল দর্শিল যে ছাত্রেরা ধর্মজ্ঞান বিষয়ে অনেক উন্নতি লাভ করিল। কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রতি তাহাদিগের বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অখাদ্য ভোজন, অপেয় পান আর হিন্দু ধর্মে নিন্দা ও বিদ্রূপ অনেক পরিবারে প্রকাশ পাইল।'[২৬৯] যদিও উইলসনের হোটেলের অখাদ্য ভোজন, মুসলমানের দোকানের বিস্কুট-পাঁউরুটি, বিলিতি মদ্যপান, সাহেবি চাল-চলন ও পোশাক-আশাকের অত্যাচার কারণে ইয়ং বেঙ্গলদের সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক নিন্দা-মন্দ-বিদ্রূপ সইতে হয়েছিল, তবুও অমার্জিত বাবুত্বের অবসান ঘটিয়ে তাঁরা যে শিক্ষিত-মার্জিত বাবুত্বের পরিসর তৈরি করে দিয়েছিলেন, তা অনস্বীকার্য। নব্যবাবু তথা ইয়ং বেঙ্গলদের হাত ধরেই কলকাতার বাবু-সমাজের মর্মকোষে সাহেবিয়ানার অন্তঃস্রোত দেখা দিয়েছিল। আদিবাবু থেকে নববাবুদের কাল পর্যন্ত (১৭৫৮-১৮৩০) বাবুদের উৎসব-পার্বণে, সাহেব-প্রভুদের আপ্যায়নে সাহেবি খাদ্য-পানীয়-বলডান্স প্রভৃতির আয়োজন হলেও তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে সাহেবিয়ানার দিকগুলি এড়িয়ে চলতেন। তাঁদের জীবনযাপনে আপাতভাবে হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল ছাঁচটিই লক্ষ করা যেত। এই কালপর্বে রামমোহন রায় একমাত্র ব্যতিক্রম। কিন্তু ১৮৩০-এর পর রামমোহনের ইংল্যান্ড গমন এবং ১৮৩৩-এর ২৭ সেপ্টেম্বর সেখানেই মৃত্যুর পরে ১৮৩০ থেকে কলকাতার সামাজিক জীবনের শিক্ষিত-বলয়ের রাশ ধরেন প্রধানত ইয়ং বেঙ্গলেরা। জীবনযাপন সম্পর্কিত এঁদের ভাবনা ও ধরন বাবুত্বেরই মার্জিত রূপ। এই নব্যবাবুদেরই এক অংশ পরবর্তীকালে ব্রাহ্মধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করে ব্রাহ্মবাবুতে পরিণত হন এবং জীবনযাপনে সাহেবিয়ানার সঙ্গে দেশীয় ভাবের সমন্বয় ঘটান। ব্রাহ্মবাবুদের উত্থান ও সমন্বয়িত জীবনযাপনের কারণে ইয়ং বেঙ্গলদের প্রভাব ১৮৫০-এর পরেই তিরোহিত হয়। শুধু তাই নয়, ইংরেজি শিক্ষিত নব্যবাবুরা ক্রমে নিজেদেরকে একটি বিশেষ শ্রেণিতে পরিণত করেন এবং সাধারণ বাঙালির জনমানস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ইতিহাসবিদের ভাষায়, 'ইংরেজি শিক্ষিতরা চাকুরি ও

ব্যাবসাসূত্রে অর্থকৌলীন্য লাভ করে পরিণত হলেন সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীতে, তাঁরা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন নিজেদের সুখ-সুবিধা, আশা-আকাঙক্ষা নিয়ে। ইংরেজি শিক্ষাজনিত বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা তাঁদের জনসাধারণের সুখ-দুঃখের শরিক হতে দেয়নি। মূলত এইসব কারণেই ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী বাংলার জনজীবনের সঙ্গে নিবিড় যোগ অনুভব করতে পারেননি।'[২৭০] তাঁরা তা না পারুন, কিন্তু জনজীবন তাঁদের বাঁকা চোখে দেখে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতে ছাড়েনি। গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের 'একেই কি বলে বাঙ্গালী সাহেব' প্রহসনে (১৮৭৪) বাবাজীর গানে লেখক স্পষ্ট করে দেন জনমানসের সেই ভাষ্য :

'... কলির প্রথম ঢেউ রামমোহন তুলে, একাকারের পথ দিল খুলে,
সহমরণটা উঠিয়ে দিয়ে, কল্লে পাপের বীজ বুনানি।
ও তারপরে রামগোপাল এসে, খানা খাওয়াটা শিখিয়ে দেশে,
জেতের দফা কল্লে রফা, চালিয়ে ব্র্যান্ডি রাঙা পানি।'[২৭১]

অন্যদিকে অজ্ঞাত লেখকের ব্যঙ্গকাব্য 'ইয়ং বেঙ্গল ক্ষুদ্র নবাব' (১৭৮৫ শক; ১৮৬৩)-এ ইয়ং বেঙ্গল তথা নব্যবাবুদের চালচলন, পোশাক-আশাকের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে: 'ইয়ং বেঙ্গল্ এই হোয়েছে কি কাল।/চালচুলো নাহি যার তারও লম্বা চাল।।' নব্যবাবুদের কেউ—

'কোঁচা কাচা দিয়ে আর পরেনা বসন॥...
পেন্টুলেন পোঁদে আঁটা মোজা পরা পায়।
ওরেফ আস্তেন কাটা চাপকান গায়॥
নাহিক ওয়াচ্ কিসে গার্ড হবে তার।
কারের কি গার্ডেনন তাহার বাহার॥
চুলের কি কেতা আহা! বলিহারি যাই।
সম্মুখেতে যত ঘাড়ে শিকি তার নাই॥
দু'দিকে বাঁকান সিঁতে আলবার্ট কেতায়।
চুরুট মুখেতে প্রায় শ্রদ্ধা দেখা যায়॥
ভিতর হইলে ভোয়া চলিলে এ চেলে।
অকস্মাৎ মনে হয় পিঁদরুসের ছেলে॥
চাপ্কান দেখিলে পর সেই সন্ধ যায়।
তথাপি দোআঁশ্লা এক রকম দেখায়॥
কাড়েন ইংরাজি বুলি কথায় কথায়।
ইংলন্ডে বরণ যেন এমন জানায়॥
মুখেতেও বলা আছে সদা সর্বক্ষণ।
বাঙ্গালা কহিতে আমি পারিনে কখন॥'...

মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা, পোশাকি সাহেবিয়ানার প্রতি মোহ, আলবার্ট সিঁতে কেটে মুখে চুরুট টেনে সাহেব সাজার প্রাণান্তকর প্রয়াস ইত্যাদি ইয়ং বেঙ্গলদের বহিরঙ্গত আদবকায়দাগুলি বুঝে- না বুঝে অনুসৃতও হচ্ছিল একশ্রেণির মধ্যে। ইয়ং বেঙ্গল তথা নব্যবাবুদের মানসিক রুচি ও শিক্ষা এদের ছিল না, অথচ

এইসব অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত বাবুদের দল শুধুমাত্র অর্থবিত্তের জোরে প্রগতিশীল 'সাহেব-বাবু' সেজে বসেছিলেন। অবশ্য তার জেরে এঁরা যে সামাজিক সম্ভ্রম আদায় করতে পেরেছিলেন এমনটি নয়। সাধারণভাবে সামাজিক দৃষ্টি এঁদের প্রতি ছিল নির্মম। এমনকী যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত নিজেই ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল তথা নব্যবাবুদের প্রভাবপুষ্ট, তিনিও 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনে (১৮৬০) এইসব মেকি সাহেব-বাবুদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'দি বেঙ্গলী'র সম্পাদক গিরীশচন্দ্র ঘোষ এইসব মেকি নব্যবাবুদের প্রতি বিষোদ্গার করে বলেছেন, 'You often meet a blustering fellow dashing forward in a phaction or buggy, shaking you by the hand, pouring forth a torent of English words without regard to Lindley Murry, eating beef-steaks with you at your table and drinking your health now and then perhaps making emour to your wife or dauthter.'[২৭৩] বোঝা যায়, যতই চোগা-চাপকান পরুন না কেন, আলবার্ট সিঁতে কেটে 'বিফস্টিক' খেয়ে মদ্যপান করে প্রগতিশীল সাজার ভান করুন না কেন, নব্যবাবুদের মানসিক রুচি ও তার বিকার 'নববাবু'দের চেয়ে ভিন্ন কিছু নয়।

অবশ্য, সাহেব-বাবুদের বাড়বাড়ন্ত শুধু যে ইয়ং বেঙ্গলদের প্রভাবে ঘটেছিল, তা নয়। সম্ভবত, সামাজিক চাহিদা বৃদ্ধিও এর অন্যতম কারণ। আগেই বলা হয়েছে, ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের পরে ওয়ারেন হেস্টিংস কোম্পানির অধস্তন পদে কম খরচে এদেশীয়দের নিয়োগ চালু করেন। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে লর্ড বেন্টিঙ্ক ভারতীয় বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের ক্ষমতা বাড়িয়ে এদেশীয়দের নিয়োগ সুনিশ্চিত করেন। এভাবেই ইংরেজ প্রশাসনে এদেশীয়দের নিয়োগে সুযোগ বৃদ্ধি পায়। ইংরেজ প্রভুদের পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল কম খরচে বশংবদে কর্মচারীদের শ্রেণিবৃদ্ধি; পক্ষান্তরে এদেশীয়রাও প্রস্তুত হতে চাইছিলেন এ জাতীয় পদের উপযুক্ত হিসাবে। শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে রামমোহন, হেয়ার থেকে শুরু করে ইয়ং বেঙ্গল কিংবা ব্রাহ্মবাবুদের চিন্তা ও উদ্যোগের সাহায্য নিয়ে অতি দ্রুত বাঙালিবাবুরা মনে-প্রাণে সাহেব-তোষণী হয়ে উঠতে চাইছিলেন। আচার-আচরণে, আদবকায়দায় সাহেবিয়ানার অনুকরণ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল উচ্চবিত্ত থেকে সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যেও। যেহেতু ইংরেজদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অংশীদারিত্বে দেওয়ানি, বেনিয়ানির যুগ শেষ তখন, বাঙালিবাবুরা ধীরে ধীরে হয়ে উঠতে চলেছেন বেতনভুক কেরানিতে, অতএব তার পূর্ব-প্রস্তুতির প্রয়োজনে প্রত্যক্ষ সামাজিক তাগিদ থেকেই বাঙালিবাবুরা ক্রমশ ইংরেজ ঘেঁষা হয়ে উঠছিলেন। ০৬.০২.১২৬২ সালের (১৮৫৬) 'সংবাদ প্রভাকরে' এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : '... ইংরাজরা এ দেশের অধীশ্বর হওয়াতে সকলেই স্বীয় স্বীয় সন্তানদিগকে শৈশবকালাবধি ইংরাজি বিদ্যার উপদেশ প্রদান করাতে অনেকে সেই শিক্ষা প্রভাবে ও সাহেব শিক্ষকগণের সহবাসে এবং উপদেশক্রমে সর্ব্ব বিষয়েই সাহেবি স্বভাব এবং সাহেবি ব্যবহার প্রাপ্ত হইতেছে, সুতরাং স্বজাতীয় প্রথা পুঞ্জের প্রতি তাহারদিগের তাদৃশ শ্রদ্ধা নাই। পূর্ব্বতন লোকেরা যে সকল কার্য্যকে অতিহীন ও ঘৃণিত এবং পাপজনক বোধ করিতেন, ভ্রমেও যাহার অনুষ্ঠান করিতেন না, অধুনাতন ব্যক্তিগণ সেই সকল কার্য্যকে অবশ্য কর্তব্য ও পরম সুখদায়ক এবং তদনুষ্ঠানে পরম পুরুষার্থ বিবেচনা করিতেছেন।'[২৭৫]

১৮৫৩ থেকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অবাধ হওয়ায় উচ্চতর পদে প্রবেশের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের বাধা আপাতভাবে দূর হয়, যদিও নিয়োগের পরীক্ষাটি কেবলমাত্র ইংল্যান্ডেই নেওয়া হত। এইসময় থেকে বাঙালি উচ্চবিত্ত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার কারণে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাবুরাও বিলেত যেতে থাকেন। বাঙালিবাবুদের এই বিলেতগামী শ্রেণি যখন এদেশে ফিরে আসতেন, তখন

অধিকাংশেরই চালচলন, আচার-ব্যবহার সাহেবিয়ানার অনুসরণে প্রায়-সাহেবি হয়ে উঠত। স্বদেশীয়দের প্রতি যুগপৎ ঘৃণা ও অনুকম্পা ছিল এঁদের স্বভাবসুলভ। এঁরা মনে-প্রাণে হয়ে উঠেছিলেন ইংরেজ-শাসনের সমর্থক, শাসকের ধ্বজাবাহী হিসাবেই এঁরা নিজেদের কল্পনা করে নিতেন। অন্যদিকে, যাঁরা স্বদেশবাসী কিন্তু ইংরেজি ভাষায় সুশিক্ষিত, তাঁদের আদবকায়দা চালচলনও সাহেবিয়ানার অন্ধ অনুকরণমাত্র, যদিও মুখে তাঁদের 'ন্যাশনালিটি'র বুলি। সম্ভবত এ কারণেই হুতোম এঁদের 'বাগাম্বর মিত্রে'র বর্গভুক্ত করেছেন। নিজ স্বার্থের প্রয়োজনেই এঁরা সাহেবি চালচলন দেখান, পরোপকারের ভান করেন, বিলিতি চাপকান গায়ে জাতীয়তার ভাববৃদ্ধির কথা বলেন। রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসার' উপন্যাসে (১৮৮৬ খ্রি.) বড়োমানুষ ধনঞ্জয়বাবুর বাগানবাড়িতে সম্মিলিত ইয়ারদের মধ্যে এই দুই শ্রেণির নব্যবাবুরই দেখা মেলে।[২৭৫] এঁদের মধ্যে একজন 'পাশ্চাত্য সভ্যতার অবতার ''মিস্টর'' কর্মকার'— 'তাঁহার কোট-পেন্টেলুন অনিন্দনীয়, চক্ষের চসমা অনিন্দনীয়, কলার নেকটাই অনিন্দনীয়, হস্তে শেরীর পেলাস অনিন্দনীয়। তাঁহার ইংরাজী বুলি বিস্ময়কর, ইংরাজী ধরন বিস্ময়কর, ইংরাজী মেজাজ বিস্ময়কর। ইউরোপ হইতে পাশ্চাত্য সভ্যতার চরম ফল আহরণ করিয়া তিনি ধনঞ্জয়বাবুর সভা শোভিত করিতেছেন।' এঁরই পাশাপাশি রয়েছেন যদুনাথ— 'গুণ বল, লেখাপড়া বল, কার্য্যদক্ষতা বল, হাস্য-রহস্য-ক্ষমতা বল— যদুনাথের ন্যায় কলিকাতার কে আছে? ব্যাবসা, ওকালতি, মুখে ইংরাজী বুলি যেন খই ফোটে, ইংরাজী চালচোলে, ইংরেজী খানায়, ইংরাজী ধরনে তাঁহার ন্যায় কে উপযুক্ত? শ্যাম্পেন বা সোটরণ বা সাব্‌লিস্ সম্বন্ধে তাঁহার ন্যায় কে বিচারক? ভাষার তাঁহার বক্তৃতা-ক্ষমতাও অসাধারণ— ''ন্যাশনালিটী'' রক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার তীব্র হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শুনিয়া কলিকাতার কোন্ শিক্ষিত লোকের মন না দ্রবীভূত হইয়াছে? যদুনাথবাবুর সমকক্ষ হওয়া বালকদিগের উচ্চাভিলাষ, যদুনাথবাবুর সহিত বন্ধুত্ব করা বিষয়ীদিগের উদ্দেশ্য, যদুনাথবাবুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা কন্যাকর্ত্তাদিগের সুখস্বপ্ন।'

১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়ে ইয়ং বেঙ্গল তথা নব্যবাবুদের হাত ধরে যে সাহেবিয়ানার শুরু, চল্লিশ-পরবর্তী নব্যবাবুরা তাতে মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েন। এই মোহ শুধুমাত্র কলকাতার নব্যবাবুদেরই আবিষ্ট করেনি, মফস্সলের যেসব বাবুরা কার্যসূত্রে কিংবা শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে কলকাতায় এসে ভিড় জমাতেন, তাঁদেরকেও আচ্ছন্ন করেছে। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নব-নাটকে' (১৮৬৬ খ্রি.) গ্রামনিবাসী বাবু কিছুকাল কলকাতা শহরে বাস করার পর গ্রামে ফিরে ইংরেজিতে কথাবার্তা বলাকেই দস্তুর জ্ঞান করেন, বহুবিবাহ নিবারণী সভার অধিবেশনের উৎসাহী সভ্য হিসাবে অন্যদেরকেও সেখানে যোগ দিতে বলেন, কথায় কথায় 'গভর্নমেন্ট'কে ''দরখাস্ত'' পাঠান, রাজপুরুষদের কাজ 'অচ্ছিদ্র' জ্ঞান করে ভক্তিতে গদগদ হন। বাঙালি হয়েও সাহেব-সাজার এই হাস্যকর প্রয়াসের সপক্ষে বাবু ('নাগর') বলেছেন, 'আমরা তো বহুরূপী হর্‌বোলার জাত্, যা দেখি তাই শিখি। দেখ যখন হিন্দু রাজা ছিল, তখন সেই ব্যবহারই করেছি,... পরে যবনদের অধিকারে ফার্সিতে অনুরক্ত হয়েছিলাম,... এখন আবার ইংরাজের অধিকার, এখন চ্যার, চুরোট, চাম্‌চে কেন না চল্‌বে? ইংরেজি ভাষাপ্রতি শ্রদ্ধাই বা কেন না হবে?[২৭৬] অর্থাৎ বাবুদের বিবর্তন ও রূপান্তরের কারণটি রাজশক্তির ধর্ম ও বদলের সাপেক্ষে বিচার্য। 'প্রকাশ্য বক্তৃতা অর্থাৎ কলিকাতাস্থ হিন্দু মেট্রোপলিটন নাটক বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের উপদেশার্থে তত্রস্থ প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত দ্বারা বিদ্যা বিষয়ক বক্তৃতা নামক পুস্তিকায় (১৮৫৩ খ্রি.) লেখক স্বয়ং সমাজ-মানসের চাহিদার কথা তুলে ধরেছেন, '...ইংরেজি ভাষা বর্ত্তমানকালীন রাজভাষা সুতরাং ইংরাজীই কেবল সমীচীনরূপে

শিক্ষা করিলে ভূরি ভূরি অর্থ উপার্জ্জিত হইবে বটে, কিন্তু বিদ্যার যে অর্থোপার্জ্জন মাত্র ফল এমত নহে দেশহিতৈষিতাই বিদ্যার প্রধান ফল...'[২৭৭] বলা বাহুল্য, বক্তব্যের শেষোক্ত উপদেশ সাহেববাবুরা হেলায় প্রত্যাখ্যান করেছিল। ইয়ং বেঙ্গলদের স্বভাবজ গুণ, শিক্ষা, স্বাতন্ত্র্য এঁদের কিছুমাত্র ছিল না, তথাপি এঁদের ইয়ং বেঙ্গলদের ভস্মাবশেষ বলে সমাজ মনে করেছিল এবং ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময় থেকেই এঁদের বিরুদ্ধে সমাজের ক্ষোভ কিছুমাত্র অপ্রকাশ থাকছিল না। দ্বারিকানাথ রায় সম্পাদিত 'সুলভ পত্রিকা' এই প্রসঙ্গে 'এতদ্দেশীয় বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের বিদ্যানুরূপ ব্যবহার না করণের বিষয়' প্রবন্ধে (১২৬০ শ্রাবণ, ১২৬০ ভাদ্র) স্পষ্টভাবেই বলেছে, 'বিদ্যার প্রধান ফল জ্ঞানচর্চ্চা। ধনার্জ্জন তাহার আনুষঙ্গিক ফল বটে। কিন্তু এ দেশীয় অধিকাংশ বিদ্যোজ্জ্বল ব্যক্তিকে প্রায় তদ্দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিতেই দৃষ্ট হয় জ্ঞানচর্চ্চার সহিত তাঁহারা প্রায় সম্পর্কই রাখেন না।...'

'অপর অনেক নবীন যুবক (Young Bengal) সাম্প্রদায়িক মহাশয়েরা, কিরূপে সভ্যরাজ ইংরাজদিগের আচার-ব্যবহারাদি অভ্যাস করিবেন, ইহাই নিয়ত চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু ইংলণ্ডীয় বীর পুরুষদিগের মহোৎসাহ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞাদি গুণসমস্ত যত অভ্যাস করিতে পারুন বা না পারুন, ত্বরায় তাঁহাদিগের পানদোষ ও হঠাৎ ক্রোধোদয় প্রভৃতির অনুগামি হইয়া দারুণ দুরাচার হইয়া উঠেন।...'[২৭৮]

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুরা জাতীয়তাবাদ, ইন্ডিয়ান লীগ, হিন্দুমেলা, ভারত-সভা প্রভৃতির হাত ধরে অতিদ্রুত নব্যবাবুদের শ্রেণি থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং নিজেদের এত স্বতন্ত্র পরিচয় (identity) গড়ে তোলে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ মূলত সীমাবদ্ধ ছিল বিত্তবান অভিজাত শ্রেণির মধ্যে। কিন্তু হিন্দু কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর উচ্চবিত্তদের পাশাপাশি উচ্চমধ্যবিত্তরাও ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ লাভ করছিলেন। ইয়ং বেঙ্গল তথা নব্যবাবুদের প্রথম দিকের অনেকেই ছিলেন উচ্চমধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর ইংরেজি শিক্ষা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং জনসাধারণের আগ্রহের কারণে কলকাতার বাইরে মফসসলগুলিতেও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত Anglo-Vernacular School গড়ে ওঠে একের পর এক। এইসময় থেকেই দালালি-বেনিয়ানির পরিবর্তে ইংরেজের অধীনে চাকরি সমাজে অধিক মর্যাদা পেতে থাকে এবং যদিও সরকারি ক্ষেত্রে চাকরির সুযোগ কম, তবুও বহ্নিবৎ পতঙ্গের মতো সাধারণ মধ্যবিত্তরা ওইদিকেই ধাবিত হন। শিক্ষাদীক্ষা এবং তার নিরিখে সরকারি চাকরি মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের কাছে যেমন, তেমনি সমাজের চোখেও এত লোভনীয় হয়ে ওঠে যে 'যিনি বড় চাকুরি করেন, যিনি মোটা বেতন পান— অধুনা সমাজে তাহাদিগের যত সম্মান, স্বদেশের উপকার সাধন অথবা স্বাধীন বাণিজ্য ব্যাবসা করিয়া তদপেক্ষা অধিক টাকা উপার্জন করিতেছেন, তাঁহার তত সমাদর নহে।'[২৭৯] ইংরেজি শিক্ষা প্রাথমিকভাবে সুলভ হওয়ার জন্য নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা এই সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন সত্য, কিন্তু উচ্চশিক্ষা ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় তাঁদের ভগ্নাংশমাত্র এম.এ, বি.এ পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারতেন। উনিশ শতকের শেষে ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালির সংখ্যা প্রায় তিরিশ হাজার; এর মধ্যে ১৯০০ সাল পর্যন্ত মোট গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ৩০০০-এর সামান্য কিছু বেশি; এম.এ পাসের সংখ্যা তো আরও কম।[২৮০] ১৮৬১-তে এম.এ চালু হওয়ার পর ১৮৮১ সাল পর্যন্ত মোট এম.এ পাস বাঙালির সংখ্যা মাত্রই ৩৪৪ জন। কলকাতা-কেন্দ্রিক চাকরির সুযোগ না বাড়ায় ক্রমশ বাড়ছিল বেকার শিক্ষিতের সংখ্যা, সেইসঙ্গেই হতাশা, লক্ষ্যপূরণ না হওয়ায় ক্ষোভ-যন্ত্রণা। ১৯৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ যে বাঙালি মধ্যবিত্ত

বাবুদের তেমনভাবে নাড়া দিতে পারেনি, শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলায় সেই মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুরা রাজনৈতিক পথে দাবিদাওয়া আদায়ে উদ্‌গ্রীব হলেন।

সমাজবিজ্ঞানের ভাষা ধার করে বলা যায়, চাহিদা ও জোগানের মধ্যে গুরুতর প্রভেদের কারণে জীবিকা-সংকট দেখা দেয় এবং মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুরা সে কারণেই নানান ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। 'ভদ্রলোক'বাবুদের বিচিত্র রূপভেদের রহস্য লুকিয়ে এই সংকটের মধ্যেই। আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির কারণে সচরাচর বাঙালি বাবুরা শিল্পোদ্যমে মনোযোগ দেননি, পুঁজির অভাবও অন্যতম কারণ ছিল। তাহার শিক্ষাভিমান তাঁদের দেওয়ানি-বেনিয়ানি কিংবা দালালির মতো পেশা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। রামমোহনের আদর্শ এ ব্যাপারে তাঁদের আদৌ উৎসাহিত করেনি। বরং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র মতে, কোনো ব্যক্তির শিক্ষা সাঙ্গ হলে তিনি হয় ডাক্তারি, নয় ইঞ্জিনিয়ারিং এবং যাঁদের মোটামুটি আর্থিক সংস্থান আছে তাঁরা ওকালতি— এই তিনরকম ব্যাবসায়ের প্রতি ধাবিত হন। যাঁদের সেরকম আর্থিক সংস্থান নেই তাঁরা বিদ্যালয়ে মাস্টারি আরম্ভ করেন। অন্যদিকে যাঁদের যথেষ্ট আর্থিক সংগতি রয়েছে, তাঁরা 'অবিরল-নিপতিত সংবাদপত্র ধারায় অবগাহন করতঃ রাজনীতিজ্ঞ মণ্ডলীর মধ্যে' গণ্য হবার চেষ্টা করেন।[২৮১] কিন্তু যাঁদের আর্থিক সংগতি এবং উচ্চশিক্ষা কোনোটিই নেই, অথচ অল্পবিস্তর ইংরেজি-জ্ঞান এবং বিদ্যালয়-শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে, ফলে কুলগত বৃত্তি গ্রহণে অপারগ, তাঁদের কেউ কেউ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আপাত মর্যাদাহীন করনিকের বৃত্তি গ্রহণ করে 'কেরানি-বাবু'তে পরিণত হন। সাধারণভাবে এঁরা প্রত্যেকেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবু, যদিও এঁদের বৃত্তিগত ভিন্নতার কারণে এঁরা কেউ ব্রাহ্মবাবু, কেউ সাহেব-বাবু, কেউ ডাক্তারবাবু, কেউ কেরানিবাবু। বঙ্কিমচন্দ্র যে বলেছেন, 'বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহাদিগেরও দশ অবতার— যথা, কেরানি, মাস্টার, ব্রাহ্ম, মুৎসুদ্দী, ডাক্তার, উকিল, হাকিম, জমিদার, সম্বাদপত্র সম্পাদক এবং নিষ্কর্ম্মা'[২৮২] তা যথার্থ।

মনোমোহন বসু সম্পাদিত 'মধ্যস্থ' পত্রিকার খরদৃষ্টিতে মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি হলঃ [২৮৩]

এক॥ 'ইংরাজী স্কুল বা ইংরাজী প্রণালীর বাংলা বিদ্যালয়ে পড়িতে হইবে। কতকাল বা কতদূর পড়া— তাহার নিশ্চয়তা নাই। দিনকতক বা পাতকতক পড়িলেই যথেষ্ট।'

দুই ॥ 'ইংরাজী বুলি কতকগুলি পাকা ধরনে, বাঁকা টোনে ও একেলে উচ্চারণে (অশুদ্ধ বাঙ্গালার সহিত ভাঁজাল দেওনার্থ) অভ্যাস করা চাই।'

তিন॥ 'তোমার বিষয় যেমন তেমন হউক, ইংরাজী জুতা, পীরান্‌, চিনাকোট, ফিরানো চুল, পায় হাফ মোজা, হাতে স্টিক্‌ একটা তো চাইই চাই; আর যদি উচ্চধরনের সাহেববাবু হইতে সাধ থাকে, তবে জ্যাকেট পেন্টুলেন, চেন ঘড়ী, নাকে চশ্‌মা, চাঁপ দাড়ী, চুরোট, শীশ, কুকুর, ড্যাম্‌ হ্‌ট্‌ ইত্যাদি কয়েকটি প্রকরণের প্রয়োজন।'

চার॥ 'ঘাড় নাড়িয়া সম্ভাষণ, সেক হ্যান্ড, নমস্কার, প্রণামে ঘৃণা, বৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে পরোক্ষ বা সমক্ষেও উপহাস, ভিক্ষুককে অনাদর, খবরের কাগজে আদর, রাজ্যের আগ্রহ, সভা-টভার নামে রোমাঞ্চ, দলাদলির নামে খড়গহস্ত, কথায় কথায় স্বাস্থ্যরক্ষার উল্লেখ, সর্ব্বদাই অস্বাস্থ্যের অভিযোগ, আহারের দিনদিন স্বল্পতা, পদব্রজে গমনের ক্লেশ জ্ঞাপন— এসব নইলে নয়।'

পাঁচ ॥ 'পুরোহিতের পুত্র হও তো পূজা ত্যাগ, অধ্যাপকের হও তো সংস্কৃত পড়া ত্যাগ, কায়স্থ হও তো ঘরে রাঁধুনী রাখাবা সঙ্গতি অভাবে মা বোনকে দিয়ে সে কাজ সারা— তাঁকে হাঁড়ি ছুঁতে না দেওয়া; ... ... চাষার হও তো হাল-গরু বিলিয়ে দেওয়া— দেনা থাকলে বেচে ফেলা! এসব বাদে সকলকেই কতকগুলি পশম কিনে ঘরে কার্পেটের কাজ কর্ত্তে দিতে হবে।'

সাধারণ ইংরেজি শিক্ষা, ইংরেজি-বুলি আওড়ানোর অভ্যাস, সাহেবিয়ানার প্রতি মোহ, দেশীয় আচার-বিচারকে তুচ্ছ জ্ঞান এবং কুলবৃত্তিত্যাগ— এই পাঁচ প্রকার সাধারণ লক্ষণের কথা বলে 'মধ্যস্থ'বাবুদের মধ্যে ফুলবাবু, প্রগ্রেসিভবাবু, স্বাধীনবাবু— এই তিন শ্রেণির কথা বলেছেন। এর মধ্যে 'যে যত বাপের মনে দুঃখ দিতে' পারবে, সে তত 'প্রগ্রেসিভ'বাবু হবেন। আবার, আত্মীয়স্বজন সব পরিত্যাগ করে, বিলেতের 'পলিটিকাল ইকনমি' মূলক জীবনযাত্রার প্রতি আনুগত্য বশত 'বাবার পরিবার বাবা পুষুন, আমার পরিবার আমি পুষি' তত্ত্ব মেনে চলে, সে 'স্বাধীন'বাবু। স্বাধীনবাবুরা বড়োই স্বাধীনতা প্রিয়। ইংল্যান্ডের ইতিহাস পড়ে এই স্বাধীনতার স্পৃহা তাদের মধ্যে জেগে উঠেছে, কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে পার্লামেন্টে সে প্রস্তাব করতে গেলেই জুটবে 'কিকিং', বইলেখাও যাবে না এ বিষয়ে নচেৎ হাজতবাস, অথচ স্বাধীনতা-বিনাও প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, অতএব ঘরের বুড়ো বাপ-মাকে ছেঁটে ফেলে পরিবারসহ আলাদা জীবন কাটাতে পারলেই স্বাধীনবাবু তৃপ্তিলাভ করেন। উনিশ শতকের শেষদিকে যৌথ পরিবারগুলির ভাঙনের আড়ালে রয়েছে আর্থ-সামাজিক যে কারণ, তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত 'স্বাধীনবাবু'র আচরণে। যৌথ পরিবার প্রতিপালন করতে 'ভদ্রলোক'বাবুরা অক্ষম কারণ, চাকরিজীবী হওয়ায় আর্থিক সংগতি সীমাবদ্ধ, বাঙালির 'বারো মাসে তেরো পার্বণে'র লোক-লৌকিকতাও ব্যয়সাধ্য, সেইসঙ্গেই মহানগরের জীবনযাপনের খরচও ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী, এই অবস্থায় 'ইংলন্ডের ইতিহাসে'র দোহাই পেড়ে স্বাধীনবাবুরা নিষ্করুণ বাস্তববুদ্ধির পরিচয় তুলে ধরেছে।

প্রগ্রেসিভবাবু ও স্বাধীনবাবুর পাশাপাশি রয়েছেন ফুলবাবু। 'নির্দ্দোষা যোষা সহধর্ম্মিনীদের মনে যে যত দুঃখ দিতে সমর্থ হয়', সে তত 'ফুলবাবু শিরোমণি' পরিগণিত হয়। এই শ্রেণির বাবুদের দু'টি প্রধান গুণ— 'অগম্যাগমন ও অপেয় পান'। ভবানীচরণের 'নববাবুবিলাসে'র খলিফা চারি 'প' ও চারি 'খ'— মোট আটপ্রকার লক্ষণসাপেক্ষে 'ফুলবাবু' হওয়ার কথা জানিয়েছিল, বিত্তবান বাবুদের যুগ অতীত হওয়ায় উনিশ শতকের শেষে পৌঁছে 'ফুলবাবু'রা একে একে সব লক্ষণ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন, কেবল বেশ্যাবাজি ও মদ্যপান— এই দুই গুণেই থিতু হয়েছেন। যদিও প্রবন্ধকারের মন্তব্য, 'অধুনা এ দেশে এ শ্রেণীর বাবু যত, অন্য কোনো শ্রেণীর বাবু তত দেখা যায় না।' রাজনারায়ণ বসুও একই কথা বলেছেন, 'এক্ষণকার লোক পানাসক্ত ও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেশ্যাসক্ত।... যেমন পানদোষ বৃদ্ধি পাইতেছে, তেমনি বেশ্যাগমনও বৃদ্ধি হইতেছে। সেকালে লোকে প্রকাশ্যরূপে বেশ্যা রাখিত। বেশ্যা রাখা বাবুগিরির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত; এক্ষণে তাহা প্রচ্ছন্নভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু সেই প্রচ্ছন্নভাবে তাহা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে।'[২৮৪] অবশ্য এই জাতীয় লাম্পট্য বাবুগিরির আদি থেকেই অন্যতম প্রধান 'গুণ' বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে। 'মধ্যস্থ' কথিত 'ফুলবাবু'রা 'নববাবুদের'ই সময়োপযোগী বিবর্তনের ফল। বাবু-ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করলে দেখা যায়, এই প্রকার ফুলবাবুরা সাধারণ রূপ-রূপান্তরের সমান্তরালে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিলেন বরাবর। নব্যবাবুদের রমরমার কালে তাঁরা কিছুটা নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিলেন সত্য, বদলে যাওয়া সমাজ-মানসে তাঁরা আর তত আকর্ষণের যোগ্য বলে বিবেচিত হননি, কিন্তু তা বলে

তাঁরা বিলুপ্তও হয়ে যাননি। আসলে নাগরিক কাঠামোয় 'বাবু'রা একটা বিশেষ type বা বর্গ, যাঁরা নাগরিক ধনতান্ত্রিক কাঠামোর উপজাত হিসাবে উঠে আসেন এবং নগর-কাঠামোর অন্যতম অঙ্গ হিসাবেই নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখেন। 'নববাবুবিলাসে'র ফুলবাবু এবং 'মধ্যস্থ' কথিত ফুলবাবু একই বর্গের সম্প্রসারণমাত্র। অতএব শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক' বাবুদের গোত্রে এঁদের অন্তর্ভুক্ত করা সংগত নয়।

সাধারণভাবে উনিশ শতকের সাতের দশক থেকেই শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের লক্ষণবিচার শুরু হয়ে গিয়েছিল। 'বঙ্গদর্শনে'র ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় (১৯৭২ খ্রি.) 'বাবু' নামক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র 'ভদ্রলোক' বাবুদের লক্ষণ বিচার করে প্রথম জানালেন, 'যাঁহার বাক্য মনোমধ্যে এক, কথনে দশ, লিখনে শত এবং কলহে সহস্র, তিনিই বাবু। যাঁহার বল হস্তে একগুণ, মুখে দশগুণ, পৃষ্ঠে শতগুণ এবং কার্য্যকালে অদৃশ্য, তিনিই বাবু। যাঁহার বুদ্ধি বাল্যে পুস্তকমধ্যে, যৌবনে বোতলমধ্যে, বার্ধক্যে গৃহিণীর অঞ্চলে, তিনিই বাবু। যাঁহার ইষ্টদেবতা ইংরাজ, গুরু ব্রাহ্মধর্মবেত্তা, বেদ, দেশী সম্বাদপত্র এবং তীর্থ ''ন্যাশনাল থিয়েটার'' তিনিই বাবু। যিনি মিসনরির নিকট খ্রীস্টিয়ান, কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্ম, পিতার নিকট হিন্দু, এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকট নাস্তিক, তিনিই বাবু। যিনি নিজগৃহে জলখান, বন্ধুগৃহে মদ খান, বেশ্যাগৃহে গালি খান, এবং মুনিব সাহেবের গৃহে গলাধাক্কা খান, তিনিই বাবু। যাঁহার স্নানকালে তৈলে ঘৃণা, আহারকালে আপন অঙ্গুলিকে ঘৃণা এবং কথোপকথনকালে মাতৃভাষাকে ঘৃণা, তিনিই বাবু। যাঁহার যত্ন কেবল পরিচ্ছদে, তৎপরতা কেবল উমেদারিতে, ভক্তি কেবল গৃহিণী ও উপগৃহিণীতে, এবং রাগ কেবল সদ্‌গ্রন্থের উপর, নিঃসন্দেহে তিনিই বাবু।'[২৮৫] বঙ্কিম-উল্লিখিত 'বাবু'দের রূপলক্ষণগুলি রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নব-নাটক'-এর 'নাগর' চরিত্রে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দেই চোখে পড়ে। হুতোমও তাঁর নক্‌শায় ভদ্রলোক 'বাবু'দের এ জাতীয় রূপলক্ষণগুলি ইতস্তত তুলে ধরেছেন। তাঁদের চোখেও শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুরা নিতান্ত বাক্‌সর্বস্ব, স্বভাবভীরু, পরানুকরণপ্রিয়, মদ্যাসক্ত, দেশাচারে পরাঙ্মুখ, অহংকারী, চাকরিজীবী, গোপনে বেশ্যাসক্ত, মাতৃভাষার প্রতি খড়্গহস্ত শ্রেণিবিশেষ। পাশ্চাত্য শিক্ষার অহংকারে 'ভদ্রলোক'বাবুরা ক্রমশই জনমানস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিলেন। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শাসক সাহেবদের পদলেহী কিংবা বশংবদ দেশীয়দের রাজা বাহাদুর, রায় বাহাদুর, নবাব বাহাদুর, বাবু বাহাদুর ইত্যাদি উপাধিদান শুরু হয়,[২৮৬] ভদ্রলোকবাবুরা ক্রমশ এ জাতীয় খেতাবের পিছনে ছুটতে থাকেন; সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে খেতাবপ্রাপ্ত বাবুরা 'ভদ্রলোক'বাবুশ্রেণির মধ্যে অভিজাত-বর্গ বলে বিবেচিত হতে থাকেন; মধ্যবিত্তের মন-মেজাজ বহন করেই এঁদের হাত ধরে উচ্চমধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুরা ক্রমশ জাঁকিয়ে বসতে থাকেন সমাজে। সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুরা ক্রমেই ছা-পোষা গৃহস্থে পরিণত হন। উত্তরকালে নিম্নবিত্তজীবী কেরানিবাবুদের সঙ্গে তাঁদের শ্রেণিগত পার্থক্যও বিলুপ্ত হয়ে পড়ে।

বশংবদ 'বাবু'দের টাইটেল বা খেতাব বিতরণের পদ্ধতিটিও ছিল আপাত অস্বচ্ছ। শিক্ষা-রুচি-স্বাতন্ত্র্যের কথা বলা হলেও তথাকথিত অল্প-শিক্ষিত বা অশিক্ষিত ব্যক্তিরাও উমেদারির সূত্রে এ জাতীয় খেতাব লাভ করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে'র মুচিরাম (১৮৮০), চন্দ্রনাথ বসুর 'পশুপতি-সম্বাদে'র (১২৯০ বঙ্গাব্দ) পশুপতির খেতাব-প্রাপ্তির কাহিনি নিতান্ত কাহিনি-মাত্র নয়। আদিবাবু ও নববাবুদের বাবুত্ব ছিল বিত্তের উপর নির্ভরশীল, নব্যবাবুদের বাবুত্ব নির্ভর করত শিক্ষা-রুচি-সাহেবিয়ানার উপর, মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে ইংরেজি শিক্ষা ও চাকরি বাবুত্বের

কারণ হলেও, ক্রমে উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির কেউ কেউ এই চাকরির সুযোগ ও উমেদারিকে কাজে লাগিয়ে নতুন যুগের বাবু হয়ে বসলেন, রাজ-প্রদত্ত 'খেতাব' যাঁদের বাবুত্বের প্রতীক। সুযোগসন্ধানী এবং কপালে এইসব ব্যক্তি-ব্যতীত অবশিষ্ট মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুরা কম-বেশি মাহিনার চাকরি করে বা না করে, রাজনীতির মৌখিক চর্চা করে, সভা-সমিতির সদস্য হয়ে নির্বিষ বক্তৃতার মাধ্যমে কল্পনায় দেশোদ্ধার করে এবং নিজেদের শিক্ষিত, স্বতন্ত্র, আলোকপ্রাপ্ত শ্রেণি ভেবে সাধারণ শ্রেণি থেকে পৃথক হয়ে রইলেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে'র এপ্রিল, ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ সংখ্যায় প্রকাশিত 'The Babu' শীর্ষক রচনার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করে দেখানো হয়েছিল যে, দেহে মনে আপাতভীরু বাবুদের জনমানস বিচ্ছিন্ন প্রবণতার কারণে তাঁরা স্বভাবের কোমলতা হারিয়ে রূঢ়, অহংকারী এবং গায়ে-পড়া স্বভাবের হয়ে উঠেছেন, এবং সেকারণেই সমকালীন সাহিত্য-সংগীতে বারংবার উপহাসিত হয়েছেন। কুলীন বাবুদের নয়টি লক্ষণের মতো ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'নববাবু'দের নবধা লক্ষণ স্থির করেছিলেন। 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের আটটি লক্ষণের কথা বললে— এক. বাবু দেহে মনে আপাতভীরু এবং অতিরিক্ত মাত্রায় কল্পনাপ্রবণ; দুই. শিক্ষা পল্লবগ্রাহী; তিন. চিন্তায়-ভাবনায় সৃজনীশক্তির পরিচয় মেলে না; চার. সাহেবিয়ানার উগ্রতা বাবুর স্বভাবসুলভ। ইংরেজি শিক্ষার কুফলগুলি বাবু আয়ত্ত করেছেন, ভালো দিকগুলি কিন্তু অধরাই থেকে গেছে; পাঁচ. অহংকারী, দয়া-মায়া-কোমলতাহীন, কর্কশভাষী, ছয়. ইংরেজির প্রতি অত্যাসক্তিতে মাতৃভাষাকে বিজাতীয় জ্ঞানে ঘৃণা; সাত. আদর্শায়িত কল্পনাবিলাসের কারণে শাসকশ্রেণির প্রতি আপাত বিরুদ্ধতা ও 'ন্যাশনালিটী'র কারণে অবজ্ঞা; আট. সংবাদপত্রে, বিতর্কসভায় দেশোদ্ধারের খাতিরে বাবু বক্তৃতায় জ্বালাময়ী ব্যক্তিত্বের পরিচয় রাখেন, যদিও কার্যক্ষেত্রে সকলই অসার।

লক্ষণীয়, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা, রুচির বদল ইত্যাদি কারণে 'নববাবুদের' মতো বিত্ত নির্ভর লক্ষণে আর বাবুদের ধরা হচ্ছে না, বাবুদের শিক্ষা-রুচি-মানসিক গড়নের দ্বারা নির্দিষ্ট হচ্ছে তাঁদের বাবুত্ব। কালীপ্রসন্ন ঘোষ কাব্যবিশারদ সম্পাদিত 'বান্ধব'-এও (আশ্বিন-কার্তিক, ১২৮১ সন) এইসব 'ভদ্রলোক'বাবুদের মানসিক গড়নের প্রতি ব্যঙ্গ করে 'বাবু' শব্দের অভিনব বুৎপত্তি নির্দেশ করা হচ্ছে এই বলে,[২৮৭] 'বাবু— বব চাঞ্চল্যে, বৃথাভিমানে, পরানুকরণে, ধৃষ্ট ব্যবহারে চ। ঔনাদিক ণুঃ প্রত্যয়ঃ। ণ ইৎ যায়, উ থাকে, অকারের বৃদ্ধি। যাহাদিগের স্বভাব চঞ্চল, অভিমান গগনস্পর্শী, চিত্ত পরানুকরণরত এবং ব্যবহার ধৃষ্ট, তাহারা বাবু। বাবু চাঞ্চল্যে ভ্রমর সদৃশ্য, চিন্তাশক্তি কিছুতেই বহুক্ষণ অবস্থান করিতে পারে না; অভিমানে শরতের মেঘ, গর্জে কিন্তু বর্ষে না; অথবা বর্ষার ভেক, নিয়ত শব্দ করে, কিন্তু নিকটে আসিতে সাহস পায় না; পরদেশীয় ছন্দানুবর্তনে সর্বথা নিগারদিগের সমান, একবার আসবাব ও পোশাকের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; এবং ধৃষ্টতায় প্রুসিয়াদিগেরও প্রপিতামহ, কথায় বোধ হয়, একলম্ফে সপ্তসাগর উল্লঙ্ঘন করাও বিচিত্র নহে।' সাধারণের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যের কারণে যাঁরা অহংকারে দূরে সরে থাকতেন, সাহেব-প্রভুদের সঙ্গে ব্যবহারে সেই 'ভদ্রলোক'বাবুরাই দাসানুদাসের ন্যায় আচরণ করতেন। এইসব কাগুজে বাঘ বাবুদের প্রসঙ্গেই নব্য যুবক রবীন্দ্রনাথ 'মানসী' কাব্যের 'দুরন্ত আশা' কবিতায় (১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮) ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন:[২৮৮]

'দাস্যসুখে হাস্যমুখ,
বিনীত জোড়-কর,

প্রভুর পদে সোহাগ-মদে
দোদুল কলেবর!
পাদুকাতলে পড়িয়া লুটি
ঘৃণায়-সাখা অনু খুঁটি
ব্যগ্র হয়ে ভরিয়া মুঠি
যেতেছে ফিরি ঘর।'

মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের এই স্বভাব কেরানিবাবুদের অতি বিনীত, অন্তরে বঞ্চনার জ্বালা কিন্তু দায়ে পড়ে প্রভুভক্ত, নির্বিষ-স্বভাবের সঙ্গে মিলে যায়। সম্ভবত, এ কারণেই 'হবসন-জবসনে' (Hobson-Jobson) 'Baboo' শব্দের পরিচয় দিতে গিয়ে ইয়ূল ও বার্নেল 'Frasen's Magazine'-এর আগস্ট, ১৮৭৩-এর বক্তব্য তুলে ধরে বোঝাতে চান যে, 'The pliable, plastic, receptive Baboo of Bengal eagerly avails himself of this system (of English Education) partly from a servile wish to please the Sahib logue, and partly from a desire to obtain a Government appointment.'[২৮৯] শাসক-প্রভুরা নিজেদের স্বার্থে মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের নমনীয়, নতুন ধারণা গ্রহণে সমর্থ, মানিয়ে চলার ক্ষমতাসম্পন্ন বলেছেন একথা সত্য, কিন্তু বিপরীত ক্রমে এও সত্য যে, উনিশ শতকের সাতের দশক থেকেই বাঙালি 'বাবু'রা সামাজিক বিবর্তনের সূত্র মেনেই প্রয়োজন সাপেক্ষে নমনীয়, বশংবদ হওয়ার সাধনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ধনতান্ত্রিক কাঠামো এভাবেই শাসিতকে রূপান্তরিত করে নেয় নিজস্বার্থে। জীবনযাপনে প্রতিটি ক্ষেত্র এমনকী মনন-মানসিকতার সূক্ষ্মতর বোধকেও সে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রিয়নাথ পালিতের 'টাইটেল দর্পণ' প্রহসনে (১৮৮৪ খ্রি.) রাজা-টাইটেলপ্রাপ্ত আশুতোষ বাবুর ছেলে গোরাচাঁদ 'পোজিসান' অনুযায়ী চলার জন্য যে ফর্দ করেছে তাতে 'একখানা পেব্‌লের চশমা সোনা বাঁধান সলোমনের বাড়ী থেকে; সোনার স্টড্‌স আরলিঙ্ক হেমিল্টনের বাড়ী থেকে, বুড়ো আঙ্গুলের মতন মোটা পাতা ফেসানের চেন মেথুসনের বাড়ী থেকে, ভাল স্টিক মেকেঞ্জিলায়লের ওখান থেকে, রথার হেম্ মেকারের সোনার ঘড়ি কুককেলভির বাড়ী থেকে; বারাণসী চাদর, কিংখাপের পোষাক লিডিতে যাবার জন্য। সাটিনের পোষাক ইভনিং পার্টিতে যাবার জন্য, মাদার ও পালের অপেরা গ্লাস নিউম্যানের বাড়ী থেকে। সোপ ও খোসবয়ের জিনিস সকল।''[২৯০] লক্ষণীয়, বাবুয়ানার উপকরণগুলির প্রায় সবই সাহেব-বাড়ির। দেশীয় চালচলন থেকে 'ভদ্রলোক'বাবুরা সরে আসছিলেন ঢের আগে থেকে, এখন বাবুদের ব্যবহার্য সামগ্রী তথা মানসিক চাহিদাও ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রের অনুকূলে পরিবর্তিত। অহিভূষণ ভট্টাচার্যের 'বোধনে বিসর্জন' (১৮৯৬ খ্রি.) প্রহসনেও দেখা যায়, 'শিক্ষিত ভদ্রলোক বাবু'র দৈনন্দিন ব্যবহার্যের তালিকার প্রায় সবই সাহেবি দোকান থেকে কেনা বিশুদ্ধ বিলিতি দ্রব্য। বাঙালিবাবুদের স্বভাবসুলভ বশ্যতা সাহেব প্রভু এবং ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রের সাঁড়াশি চাপের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে।

প্রিয়নাথ পালিত 'টাইটেল দর্পণে' নতুন যুগের উচ্চমধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের আটটি লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন বটে;[২৯১]

'সুদুবাবু হয় নাই, আটটী লক্ষণ চাই,
তবে নাম জানিবে সকলে।

বেশ্যাবাড়ী, ছড়ি ঘড়ি, বিকেলে ফিটন গাড়ি,
দিবা নিশি ভাস লাল জলে॥
গান বাদ্য কর সার, মাছধর রবিবার,
চুল কাট আলবার্ট ফ্যাসনে।
বড়লোক বলি তবে, ঘুষিবে সুখ্যাতি সবে,
সার কথা দীনবন্ধু ভণে॥'

কিন্তু এই আট লক্ষণ পূর্বোল্লিখিত 'ফুলবাবু', যাঁরা আদতে 'নববাবু'দেরই সম্প্রসারণ, তাঁদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের ক্ষেত্রে এই আট লক্ষণ পালন করা শুধু কষ্টসাধ্যই নয়, অসম্ভবও বটে। বাঙালি নব্যবাবুদের মধ্যেই চাকরিজীবী হওয়ার প্রবণতা প্রথম লক্ষ করা গিয়েছিল। উচ্চশিক্ষার ব্যাপারটি তখন পর্যন্ত মুষ্টিমেয়ের করতলগত ছিল বলে, শাসক প্রভুদের অধীনে চাকরিলাভ এবং সেই কারণে সামাজিক মর্যাদালাভ তাঁদের ক্ষেত্রে সহজ হয়েছিল। কিন্তু ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে উচ্চশিক্ষা ব্যয়বহুল হওয়া সত্ত্বেও সর্বসাধারণের করতলগত হওয়ায়, চাকরির বাজারে ক্রমশই শিক্ষিত বাবুদের সংখ্যা বাড়ছিল, সংখ্যা বাড়ার ফলে প্রতিযোগিতা বাড়ছিল, কিন্তু চাকরির সুযোগ সেই অনুপাতে না বাড়ায় শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুরা সহায়ক পেশা (যেমন ডাক্তারি, ওকালতি ইত্যাদি) বেছে নিচ্ছিলেন, স্বল্প মাহিনায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যোগ দিচ্ছিলেন কিংবা অতি সামান্য মাহিনায় করণিকবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হচ্ছিলেন। কিন্তু এঁদের মিলিত সংখ্যা ছিল অর্ধেকেরও কম। ১৮৮১ সালের একটি হিসাব থেকে জানা যায়,[২৯২] উক্ত বছরে গ্র্যাজুয়েট প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা মাত্র ১৭০০; এঁদের মধ্যে সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত হয়েছেন (মধ্য ও অধিকাংশই নিম্ন পদে) মোট ৫২৮ জন, বেসরকারি ক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ১৮৭ জন। কর্মহীন বা বেকার ৬৩৫ জন, খবর জানা যায়নি এমন ৩২০ জন এবং মৃত ৪২ জন। উনিশ শতকের শেষপাদে পৌঁছে চাকরির বাজার উচ্চশিক্ষিতের পক্ষেও এত সংকুচিত যে, ভদ্রলোকবাবুরা যেকোনো প্রকারে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি পেতে চাইলেও, কর্মহীনতার সমস্যায় তাঁরা পীড়িত, কেউ কেউ কুলগত কৌলীন্য ভুলে নিম্নশ্রেণির কেরানিবৃত্তি গ্রহণেও রাজি।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত অজ্ঞাত লেখকের 'কেরাণী পুরাণ' মতে,[২৯৩] কেরানি তিন প্রকার— 'কুলীন, মৌলিক এবং বংশজ'। বেতনক্রমের দিন থেকে এই বিভাজন। কুলীন কেরানি ২০০ থেকে ৪০০, বংশজ ১০০ থেকে ২০০ এবং মৌলিক ৩০ থেকে ১০০ টাকা বেতন পান। এরপরেও ৪০০ টাকার উপরে যাঁরা বেতন পান তাঁরা 'মুখ্য কুলীন' এবং ৩০ টাকার নীচের বেতনভোগীরা পচা মৌলিক। বিদ্যা-বুদ্ধির পরিবর্তে সাধারণভাবে কিছুটা কার্যদক্ষতা তোষামোদ, উৎকোচ, তৈলমর্দন, চাটুকারিতা, পরনিন্দা, উপরচালাকি এবং সাহেবের 'নেকনজরে'র উপর পদোন্নতি নির্ভর করে। তবে অজ্ঞাত লেখকের মতে, 'সকল শ্রেণীর কেরাণীর মধ্যেই বিদ্বান এবং মূর্খ উভয়েরই দর্শন পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের চিহ্নিত এবং সাবেক কলেজে বৃত্তিধারী দু'দশ জনকেও কেরাণীদের মধ্যে পাওয়া যায় এবং তাঁহাদের ভিতর সংবাদপত্র লেখক, সমালোচক, বক্তা এবং গ্রন্থকার দেখা যায়।' লেখক 'সাবেক কলেজ' বলতে হিন্দু কলেজের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। চাকরির বাজার সংকুচিত বলে হিন্দু কলেজের পাশ করা বাবুরাও আজ কেরানি বৃত্তি গ্রহণে

পরাঙ্মুখ নন। অবশ্য মনে রাখতে হবে, এঁরা আসলে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদেরই গোত্রভুক্ত। অতএব অজ্ঞাত লেখক যখন বলেন, 'সুশিক্ষিত কেরাণীদের আচার-ব্যবহার ও রুচি অন্য প্রকার। অশ্রাব্য কথা তাহাদের মুখে শোনা যায় না, আপিসে কলহ্ করেন না, এবং গল্প করিবার সময় কোন সামাজিক বিষয় লইয়া মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইঁহাদের মধ্যে কোন না কোন প্রকাশ্য সভা সভ্য এবং সেই সভার কার্য্যে আপনাদের কতক সময় ও চিন্তা দিয়া থাকেন। জ্ঞান লাভ করিতেও বিলক্ষণ ইচ্ছা আছে, অবকাশ পাইলেই লেখাপড়া করিয়া থাকেন। নদের সকলেই পণ্ডিত নয়, সুশিক্ষিত কেরাণীর মধ্যে সকলেই যে সচ্চরিত্র, তাহা নহে। ইহাদের ভিতর শয়তানের প্রিয় চেলাও আছে। তাঁহারা সুরেশ্বরী ও বারাঙ্গনা দেবীর পূজাতে সর্বস্ব আহুতি দিয়া থাকেন এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই সিদ্ধিলাভ করিয়া ইহসংসার ছাড়িয়া চলিয়া যান্; স্ত্রী-পুত্র পথের ভিখারি হয়।'[২৯৪] লেখক-কথিত 'সুশিক্ষিত কেরাণী'দের লক্ষণ বিচার করে বলা যায়, আদতে এঁরা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবু কিংবা তাঁদেরই স্বগোত্র। বিত্তনির্ভর বাবুত্বের দিন অনেক আগেই ফুরিয়েছিল; নব্যবাবুরা পাশ্চাত্যে রুচি ও শিক্ষার সঙ্গে সেই বাবুত্বের আপাত বেমানান তারটিকে বাঁধতে চেয়েছিলেন, ইংরেজ প্রভুরা এ কাজে ছিলেন তাঁদের সহায়; ব্রাহ্মবাবুদের সমন্বয়কামী মননচর্চার হাত ধরে উক্ত বাবুত্ব পরিশীলিত হয়েছিল; আর শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের বিত্ত মধ্যম হলেও, তাঁদের হাত ধরেই পরিশীলিত, পরিচিন্তিত বাবুত্ব বিশেষ থেকে সাধারণ হয়ে উঠেছিল। অবশেষে, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতের কারণে এবং জনসাধারণের রুচি বদলের সূত্রে প্রকাশ্য যেকোনো প্রকার বাবুত্বই আর আসর জমিয়ে রাখতে পারেনি। বিশেষ থেকে নির্বিশেষ হতে গিয়ে অতি সাধারণ কেরানি-জীবনেই 'বাবুত্বের' মহাপ্রয়াণ ঘটল। ফুলবাবুত্বের বাহ্য দোষ-গুণ-আড়ম্বর-উদ্‌যোগ নিয়ে এরপরেও যাঁরা টিকে রইলেন, তাঁরা কেউ কুলীনবাবু নয়, নিতান্তই 'পচা মৌলিক' গোত্রের অধমর্ণ মেকি বাবুদের দল।

অন্যদিকে যথার্থ বাবুরা পরিস্থিতির চাপে কেরানি-জীবনে আত্মসমর্পণ করলেন বটে, কিন্তু নিজেদের অন্তর্গত রক্তস্রোতে তখন বহন করে চললেন বাবুত্বের মেজাজ ও মনোবীজ। অতএব তাঁরা 'কেরানি' হয়েও রুচি-ব্যবহারে স্বতন্ত্র, সামাজিক বিষয়ে সতর্ক সজাগ এবং প্রয়োজনে প্রতিবাদী, সভা-সমিতির উৎসাহী সভ্য, যুক্তিবাদ-উদারতা ও মানবতার গুণে সমৃদ্ধ, স্বাদেশিকতা ও জাতীয়বাদের স্বপ্নে বিভোর, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী অতএব সংবাদপত্রের সম্পাদক কিংবা লেখক, ইংরেজ প্রভুদের ক্ষেত্রে দায়ে-পড়ে বশংবদ কিন্তু কোথাও ভিতরে নিহিত ক্রোধ-বঞ্চনা-অপমানের জন্য জ্বালা, বিগত বাবুয়ানির ইতিবৃত্ত জানা থাকলেও সে সাধ্য নেই, রুচিও নেই, শিক্ষাকে পুঁজি করে বাবুরা জীবনযুদ্ধে জয়ের অভিলাষী। এইসব 'সুশিক্ষিত' 'ভদ্রলোক' কেরানিবাবুরা কোনো কোনো সৃষ্টিতে উপহাসিত সত্য, কিন্তু সে উপহাসের পিছনে জমা হয়ে আছে অনেকখানি অশ্রুজল।

কেরানি-জীবনে 'সুশিক্ষিত' ভদ্রলোকবাবু ও অল্পশিক্ষিত শুধু কেরানির মধ্যে তফাৎ কিছু নেই। উভয়েরই জীবন দুঃখ-কষ্ট-বঞ্চনাময়। 'সুশিক্ষিত' হওয়ার কোনো সুবিধাই ভদ্রলোকবাবুরা অতিরিক্ত পান না। সাধারণ কেরানির মতো তাঁদেরও আক্ষেপ করে বলতে হয়—

'কেরাণী জীবনে নাহি তিলেক্ সুখ
সবাই দেখে কালি কলম
বোঝে না সে কত দুখ।

সকাল থেকে সন্ধ্যা ধরে,
কেবল মরি মাছি মেরে,
ফুললো কপাল ছেলাম করে,
উন্নতি নাই এতটুকু।।
খেতে বসে বেলা মেপে
শুনতে গেলে উঠি কেঁপে,
স্বপন দেখি 'উইদাউট পে'
উড সাহেবের রাঙা মুখ।'[২৯৫]

এহেন দুঃখ-কষ্ট-হতাশা সত্ত্বেও 'ভদ্রলোক'বাবুরা সেদিন কেরানির চাকরি স্বীকার করতে উদ্গ্রীব। প্রাণকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কেরাণী-চরিত'-এর (১৮৮৫ খ্রি.) কেরানি নন্দ দেশে বহু বিষয়-আশয় থাকলেও সেখানে সচ্ছলভাবে থাকতে রাজি নয়; কারণ হিসাবে সে বলেছে, 'ওহে চাকরির একটা ইজ্জত আছে, দেশে হাজার বিষয় থাকলেও Civilized Society- তে সে ইজ্জতটুকু হয় না।'[২৯৬] অতএব Civilized Society-তে 'ইজ্জতে'র জন্য 'ভদ্রলোক'বাবুরা সেদিন কেরানির ভূমিকায় অবতীর্ণ। হুতোম অবশ্য তাঁর নকশায় 'গবর্মেন্ট আপিসের ক্যারানিদের কেরানি গাড়ির গাড়োয়ান দ্বারা যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনার ছবি এঁকেছেন,[২৯৭] যদিও সেই ''ক্যারানি''রা কেউই 'সুশিক্ষিত ভদ্রলোকবাবু' নন বলেই বোধ হয় কারণ, নকশার প্রথম প্রকাশকালে অর্থাৎ ১৮৬১-৬২ সালে শিক্ষিত মধ্যবিত্তবাবুরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আঁতুড়ঘরে তৈরি হচ্ছেন, চাকরির বাজারে তখনও ভাঁটার টান অনুভূত হয়নি; ফলে কেরানিবৃত্তি গ্রহণে শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুরা তখনও ভিড় জমাননি। 'সুশিক্ষিত কেরানিবাবু'দের যুগ শুরু হয় উনিশ শতকের আটের দশক থেকে, উনিশশোর মধ্যেই তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। একইসঙ্গে শেষ হয় কুলীনবাবুদের সুবিস্তৃত সুবর্ণ যুগেরও। পরের শতকে যাবতীয় কৌলীন্য হারিয়ে বাবুরা নেমে আসবেন ছা-পোষা মধ্যবিত্তের গণ্ডিতে। বাবু এবং তাঁর বাবুয়ানার হরেক বৃত্তান্ত তখন কেবল স্মৃতিবাহী, অতীত দিনের গল্পগাছা মাত্র।

ইংরেজদের সঙ্গে কাজ-কারবারের সূত্র ধরে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের নগর কলকাতায় বাবুদের পথচলা শুরু। পরের দেড়শো বছরে এই বাবুরা নানান বিবর্তন বা রূপ-রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে তার অন্ত্যপরিণামের দিকে। বাবুদের এই বিবর্তন বা রূপ-রূপান্তরের ইতিহাস যতটা না প্রকাশ্য, তার চেয়েও সামাজিক-জীবনের নানান ঘাত-প্রতিঘাত, টানা-পোড়েনের মধ্যে রয়েছে প্রচ্ছন্ন। সেই প্রচ্ছন্ন ইতিহাসও এত জটিল এবং সূক্ষ্ম যে 'শেষ নাহি যার শেষ কে বলিবে'! তবুও সাধারণ প্রবণতা ও সামাজিক জীবনের ঘটমান সূত্র ধরে বাবুদের দেড়শো বছরের ইতিহাসকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায়। সাধারণ মানস-প্রবণতা বিচার করে বাবুরা প্রধানত দুই প্রকার, যথা—

(ক) কুলীনবাবু বা Classical Baboo; অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে প্রায় ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এঁদের কাল।

(খ) অকুলীনবাবু বা Intellect Class Baboo ; ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে উনিশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত এঁদের জের চলেছে এবং বিশ শতকের মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে এঁদের শ্রেণিচরিত্রগুলি মিশে গেছে।

এই দুই প্রধান দলের মধ্যে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। যেমন, কুলীন বাবুরা— এক. আদব-কায়দা, জীবনযাপনে নবাবি আমলের রীতি-রেওয়াজের প্রতি অনুগত ছিলেন; দুই. দেওয়ানি-বেনিয়ানি-দালালি-সুতসুদ্দিগিরি ছিল এঁদের প্রধান জীবিকা; তিন. সাধারণভাবে প্রচলিত হিন্দু আচার-সংস্কারের প্রতি মান্যতা দেখাতেন; চার. পঞ্চ ম-কারের প্রতি এঁদের আসক্তি ছিল প্রবল; বিশেষ করে রক্ষিতা-রাখার ক্ষেত্রে কুলীনবাবুদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলত; পাঁচ. সামাজিক বিষয়ে দুই থেকে তিনটি প্রধান দলে বিভক্ত ছিলেন, প্রতিটি দলের মধ্যে পারস্পরিক রেষারেষি ছিল সাধারণ ব্যাপার; ছয়. অকারণ বা অতিরিক্ত অর্থব্যয় করে বাবুয়ানা প্রদর্শন এবং যশ-গৌরব লাভের ইচ্ছায় এঁরা সম্ভব-অসম্ভব অনেক কাণ্ড করতেন; সাত. ইংরেজদের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক ছিল মূলত আর্থিক। তখনও বশংবদ ইংরেজানুগত চরিত্রটি এঁদের মধ্যে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়নি। ইংরেজরাও এঁদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন; আট. সকলেই ছিলেন তৎকালের রেওয়াজ অনুযায়ী ফারসি ভাষায় শিক্ষিত; কেউ কেউ ছিলেন স্বল্পশিক্ষিত, তবে কাজের ইংরেজিতে মোটামুটি পটু; নয়. সংগীত, নৃত্য, শখের যাত্রার প্রতি অনুরাগ ছিল এঁদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য; দশ. জীবনযাপন ছিল আপাত-মন্থর, সামাজিক জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসার ভাঁড়ার ছিল শূন্য, তবুও নতুন নগরজীবনের বিমিশ্র সামাজিক শ্রেণির কাছে এঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র।

Intellect Class বা অকুলীনবাবুরা আবার— এক. আদবকায়দা, জীবনযাপনে চূড়ান্ত সাহেবিয়ানা অনুসরণ করতেন; দুই. মূলত ছিলেন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাকরিজীবী; তিন. যেকোনো প্রকার প্রচলিত হিন্দু সংস্কার সম্পর্কে সংশয়বাদী এবং প্রায়শই আস্থাহীন; চার. মদ্যপান এবং সংবাদপত্র পাঠ, এ'দুটি ছিল প্রধান taboo. পাঁচ. বহু দল-উপদলে বিভক্ত। এঁদের দলগুলি নানান সভা-সমিতির নামে প্রচলিত ছিল। তবে মতবিরোধ থাকলেও তর্ক-বিতর্ক, আলাপ-আলোচনাকেই এঁরা মতৈক্যের পথ বলে মনে করতেন; ছয়. বেতন ছিল সীমিত, ফলে অকারণ অর্থব্যয়ের সুযোগ ছিল সীমিত। অতএব জীবনযাপনে এঁরা অনেক মিতব্যয়ী, একইসঙ্গে রুচিশীল; সাত. ইংরেজদের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক ছিল মানসিক। এঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন ইংরেজি শিক্ষায় সুশিক্ষিত, ফলে ইংরেজিয়ানার প্রতি এঁদের অস্বাভাবিক মোহ ছিল; আট. জীবনযাপন ছিল নিয়ন্ত্রিত। বেশ্যাগমনের ন্যায় সামাজিক বিচারে কুরুচিকর শখ থেকে স্বাভাবিকভাবেই দূরে থাকতেন; নয়. স্বাদেশিকতা, জাতীয়তাবোধ, উন্নত জীবনচিন্তা এঁদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য। সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ছিলেন অতি সক্রিয়; দশ. যেকোনো প্রকার উন্নত প্রগতিচিন্তারই ছিলেন সমর্থক; এগারো. ধর্ম বিষয়ে উদার, মিল-বেন্থামের অনুরাগী, সামাজিক জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ও প্রতিবাদ ছিল এঁদের চরিত্রগত। কিন্তু প্রচলিত রীতি-নীতির বিরুদ্ধে চলায় এঁরা রক্ষণশীল সমাজের কাছে ছিলেন নিন্দিত, উপহাসের পাত্র; বারো. উনিশ শতকের স্ত্রী-শিক্ষা, বিধবা বিবাহ ইত্যাদি নারীকেন্দ্রিক আন্দোলনে Intellect Class বাবুদের উৎসাহ, সমর্থন ও অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা; তেরো. দেশের সাধারণ রীতি-নীতি সংস্কার সম্পর্কে বিজাতীয় মনোভাব, কিছুটা আত্মম্ভরিতা, হঠকারিতা সাধারণ জনজীবনের কাছ থেকে এঁদের অনেককেই দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তবুও উনিশ-বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতিতে এই বাবুদের অবদান বিস্মৃত হবার নয়।

বাবুদের এই দুই প্রধান রূপভেদ ছাড়াও ইতিহাসের ঘটনাসূত্র বিচার করে আরেক ধরনের রূপভেদ করা যেতে পারে, যথা—

(ক) আদিবাবু — আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ (এই বৎসর আদিবাবুদের কুলপতি রাজা নবকৃষ্ণের মৃত্যু হয়);

(খ) নববাবু — ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ (এই বৎসর থেকেই ডিরোজিওর শিষ্যরা আলোড়ন তুলতে থাকেন);[২৯৮]

(গ) নব্যবাবু — ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ (এই সময়ের পর থেকেই নব্যবাবু তথা ইয়ং বেঙ্গলদের গুরুত্ব কমতে থাকে এবং ব্রাহ্মরা উঠে আসতে থাকেন আলোকপ্রদীপে);

(ঘ) শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবু — ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে উনিশ শতক হয়ে আজও পর্যন্ত বাহিত এই বাবুদের দল। সম্ভবত বৈচিত্র্যের দিক থেকেও এই বাবুদের তুলনা মেলা ভার। বঙ্কিমচন্দ্র এঁদের 'বাবুদের দশ অবতার' বলে জানিয়ে দেন,[২৯৯] 'বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহাদিগেরও দশ অবতার— যথা, কেরাণী, মাস্টার, ব্রাহ্ম, মুৎসুদ্দি, ডাক্তার, উকিল, হাকিম, জমিদার, সম্বাদপত্র সম্পাদক এবং নিষ্কর্ম্মা।' বাবুদের ইতিহাস সবচেয়ে জটিল, সবচেয়ে দুরূহ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের স্বরূপ বর্ণনা।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'নববাবুবিলাসে' নববাবুদের হাপ্‌বাবু ও ফুলবাবু— এই দুই রূপভেদের কথা বলেছেন এবং হাপ্‌বাবুদের চার প্রকার ও ফুলবাবুদের আট প্রকার লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পৌঁছে দেখা যায়, ফুলবাবুরা রয়ে গেলেও ভবানীচরণ-কথিত অষ্ট লক্ষণের প্রায় সবক'টিই গেছে পালটে; আর উনিশ শতকের শেষদিকে পৌঁছে মদ্যপান ও অগম্যাগমন ছাড়া আর কোনো লক্ষণেই ফুলবাবুরা চিহ্নিত হচ্ছেন না দেখা যায়। অবশ্য বাবুত্বের আচরণগত পছন্দ-অপছন্দের মাত্রাগত তারতম্যে হাপ্‌বাবু ও ফুলবাবুত্বের ভেদরেখা টানা হলেও, মানসিক সংক্রিয়ার বিচারে এঁরা সকলেই এক;— রুচিহীন বিলাস এবং অফুরন্ত বিত্তের গৌরবে যাঁদের অহংকার গগনস্পর্শী; এঁরা প্রত্যেকেই আদিবাবুদের উপজাত— 'নববাবু'। পরবর্তীকালে রুচিহীন, শিক্ষাদীক্ষা-সংস্কৃতিহীন বাবুমাত্রেই 'ফুলবাবু' বলে অভিহিত হন, বোঝা যায় 'ফুলবাবু' আর কোনো বিশেষ সময়ের সীমায় বন্দি বাবুত্বের রূপ নয়, উত্তরকালের দৃষ্টিকোণে তাঁরা সকলেই অশিক্ষিত, অমার্জিত বাবুত্বের প্রোটোটাইপ মাত্র।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি পৌঁছে বিত্তনির্ভর বাবুত্বের দিন শেষ হয়ে গেলে, চাকরিজীবী বাঙালিবাবুরা পেশাগত অভিধায় নির্দিষ্ট হতে লাগলেন, যেমন— ডাক্তারবাবু, বড়োবাবু, বেহ্মবাবু, উকিলবাবু, কেরানিবাবু ইত্যাদি। কিন্তু আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে বাবুয়ানার বৈচিত্র্য ক্রমে কমে আসতে থাকে, পেশাগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও কিছু সাধারণ চরিত্রগত ধর্ম এঁদেরকে কেন্দ্র করে সমাজে বিকশিত হয়। উগ্র সাহেবিয়ানা থেকে দেশীয় যা কিছুর বিরুদ্ধে উগ্রতা এঁদের চরিত্র ধর্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এ কারণেই বঙ্কিম-কথিত 'দশ অবতার'-এর উৎসমূল এক— শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবু। এই বাবুদের দল 'শিক্ষিত' বলেই উনিশ শতকের প্রথম পাদের নববাবুদের উৎকট অমার্জিত আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে সরে এসে সমষ্টিগতভাবে রুচিশীল বাবুত্বের ভাষা রচনা করতে চেয়েছিলেন। হতে পারে তাঁদের পথ সংকীর্ণ, হতে পারে তাঁদের দৃষ্টি বিশেষ পক্ষপাতিত্বের কারণে মোহান্ধ, তবু তাঁদের আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমের দিক থেকে আন্তরিকতায় ঘাটতি ছিল না কোনো। এই পর্বের মেকিবাবুদের কথা বাদ দিলে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুরাই হয়ে উঠেছিলেন যুগের প্রতিভূ। প্রায় দেড়শো বছরের বাবু-ইতিহাসে এঁরাই প্রথম বাবুত্বের কলঙ্কচিহ্নগুলিকে মুছে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন আপন রুচি-স্বাতন্ত্র্য-শিক্ষার দ্বারা। উনিশ শতকের বাবু-ইতিহাস তাই আসলে এক বিশেষ মনন-সংস্কৃতির ভাঙা-গড়া, রূপ-রূপান্তরের গল্প, যে গল্পের আদিতে অন্ধকার লেগে আছে সত্য, কিন্তু সে অন্ধকার অচিরেই কেটে যাবে, দেখা দেবে এক আলোকিত ভোর॥

### টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন, 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান', ২ খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ চতুর্থ মুদ্রণ ১৯৯৪, সাহিত্যসংসদ, কলকাতা, পৃ. ১৫৪২।
২. বসু, নগেন্দ্রনাথ সম্পা., 'বিশ্বকোষ', ১২ ভাগ, পুনর্মুদ্রণ ১৯৮৮, বি. আর. পাবলিশিং কর্পোরেশন, দিল্লী, পৃ. ৭৫০।
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, 'বঙ্গীয় শব্দকোষ', ২ খণ্ড, সাহিত্য আকাদেমি, চতুর্থ মুদ্রণ ১৯৯৬, নতুন দিল্লী, পৃ. ১৫০৫।
৪. বিদ্যানিধি, যোগেশচন্দ্র, 'বাঙ্গালা শব্দকোষ' ভূর্জপত্র সংস্করণ ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ, ভূর্জপত্র, কলকাতা, পৃ. ৬৫৯।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার এবং চৌধুরী, বিশ্বপতি সম্পাদিত— কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, ২০১১, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ২৯৪।
৬. দত্ত, বিজিতকুমার এবং দত্ত, সুনন্দা সম্পা., 'মানিকরাম গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৯, কলকাতা, পৃ. ৩২৮।
৭. ভট্টাচার্য, ড. আশুতোষ সম্পা., 'বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা', পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ ২০১১, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পৃ. ১৩৪।
৮. সান্যাল, অবন্তীকুমার, 'বাবু', প্রথম সংস্করণ ১৯৮৭, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, (পাদটীকা দ্র.) পৃ. ৬৩।
৯. শহীদুল্লাহ্, ড. মুহম্মদ সম্পা., 'বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান', দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৭৫।
১০. সেন, সুকুমার, 'বুৎপত্তি-সিদ্ধার্থ বাংলাকোষ', প্রথম সংস্করণ ২০০৩, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, পৃ. ৩১৫।
১১. সান্যাল, অবন্তীকুমার, 'বাবু', তদেব, (পাদটীকা দ্র.), পৃ. ৬৩।
১২. দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন, 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান', ২ খণ্ড, তদেব, পৃ. ১৫৪২।
১৩. দত্ত, নারায়ণ, ''বাঙালি বাবু'', 'অমৃত', ১১ মে ১৯৭৮, কলকাতা, সম্পা., ঘোষ, তুষারকান্তি; পৃ. ১২।
১৪. মুখোপাধ্যায়, তারাপদ সম্পা., 'গোপীচন্দ্র নাটক', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম সংস্করণ ১৯৭০, কলকাতা।
১৫. বিদ্যানিধি, যোগেশচন্দ্র, 'বাঙ্গালা শব্দকোষ', তদেব, পৃ. ৬৬০।
১৬. Mrs. Fenton, 'The Journal of Mrs. Fenton', London, India Office, 1901, p. 4421. উদ্ধৃত ও সংকলিত : Nair, P. Thankappan, 'Calcutta in the 19th Century (Company's Days)', First Edition 1989, Firma KLM private limited, Kolkata, p. 469.
১৭. Yule, Con. Henry & Burnell, A.C, 'Hobson-Jobson', Fifth Rupa Impression 2007, Rupa & Co, New Delhi, p. 44.

১৮. Bose, Ananda Krishna, 'A short Account of the residents of Calcutta in the year 1822'; 1928. দ্র. Ray, Alok Ed., 'Calcutta keepsake', Riddhi-India, First Edi 1978, Kolkata, p. 303.
১৯. সেন, বিজয়রাম, 'তীর্থ-মঙ্গল', পরশপাথর সংস্করণ ২০০৯, পরশপাথর প্রকাশন, কলকাতা পৃ. ১২৫।
২০. Yule, con Henry & Burnell, A.C, 'Hobson-Jobson', তদেব, পৃ. ৪৪।
২১. তদেব, পৃ.
২২. Das, Satyajit Compiled, 'Selections from The Indian Journals', vol. II, First Edition 1965, Firma K.L. Mukhopadhyay, Kolkata, p. 114.
২৩. তদেব, পৃ. ১১৪।
২৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সংক, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', প্রথম খণ্ড, চতুর্থ মুদ্রণ ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, পৃ. ৩।
২৫. তদেব পৃ. ৯।
২৬. Parks, Fanny, 'Wanderings of a Pilgrim, in search of the Pictureque', London, Pelham Richardson, p. 29. উদ্ধৃত ও সংকলিত, Nair, P. Thankappan, 'Calcutta in the 19th Century's (Company's Days)', তদেব, p. 254.
২৭. তদেব পৃ. 258.
২৮. তদেব পৃ. 293.
২৯. Nair, P. Thankappan, Calcutta in the 19th Century (Company's Days), তদেব, p. 352.
৩০. তদেব, p. 386.
৩১. Mrs. Fanton, 'The Journal of Mrs. Fanton', তদেব, p. 469.
৩২. Nair, P. T., 'Calcutta in the 19th Century (Company's Days), তদেব, p. 416.
৩৩. সান্যাল, অবন্তীকুমার, 'ভিক্তর জাকমঁর রোজনামচায় কলিকাতা'; দ্র. "বিষয় কলকাতা", জাতীয় গ্রন্থাকার কর্মী সমিতি, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৩, কলকাতা, পৃ. ৬৬।
৩৪. রায়, দুর্গাচরণ, 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন', প্রথম সংযোজিত দে'জ সংস্করণ ২০০১, দে'জ, কলকাতা, পৃ. ২২৫।
৩৫. মল্লিক, প্রমথনাথ, 'কলিকাতার কথা আদি কাণ্ড, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০১, পুঁথি, কলকাতা, পৃ. ১৬৭।
৩৬. শেঠ, হরিপুর, 'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়-কথায় ও চিত্রে', প্রথম সংস্করণ ১৯৫২, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, পৃ. ৪০০।
৩৭. Naufragus, 'The Adventures of Naufragus'. First Edi 1827, London, p.35 উদ্ধৃত ও সংকলিত, তদেব, পৃ. ৪৪১।
৩৮. সান্যাল, অবন্তীকুমার, 'বাবু' তদেব, পৃ. ৩৯।
৩৯. রায় কর্মকার, কেশবচন্দ্র, 'শব্দার্থ প্রকাশিকা', প্রথম সংস্করণ ১৮৬১, নূতন তুলি-কলম সং ২০০৪, সম্পা., পাল, নিমাইচন্দ্র, তুলি-কলম, কলকাতা, পৃ. ৪৩।

৪০. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র ''বাবু'', 'বঙ্কিম রচনাবলী', ২ খণ্ড, সাহিত্য-সংসদ সংস্করণ, নবম মুদ্রণ ১৩৯২, কলকাতা, পৃ. ১১।
৪১. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, 'রসরচনাসমগ্র', তদেব, পৃ. ৭-৮।
৪২. বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল, 'কলিকাতা কল্পলতা'; দ্র. বসু, কাঞ্চন সম্পা., 'দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ', ২ খণ্ড, পঞ্চম মুদ্রণ ২০০১, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৫৩০।
৪৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, 'রসরচনাসমগ্র', তদেব, পৃ. ৭-৮।
৪৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ, ''বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনচরিত দৃষ্টশ্রুত পবিত্র 'বিবরণ', ধর্মসভা, ১৮৪৯, পৃ. ৩-৭। দ্র. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, 'ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়', সাহিত্য-সাধক চরিমালা-৪, ষষ্ঠ মুদ্রণ ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃ. ৮-৯।
৪৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ১ম খণ্ড, চতুর্থ মুদ্রণ ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃ. ১০৮।
৪৬. Das. Satyajit Compiled, 'selection from Indian Journals', vol. II, first edition 1965, Firma K.L. Mukhopadhay, Kolkata, p. 114.
৪৭. দ্র. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ খণ্ড, তদেব, পৃ. ২৫৯।
৪৮. Nair, P. Thankappan, Calcutta in the 19th Century (Company's Days), তদেব, p. 469.
৪৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড তদেব, পৃ. ১২৮।
৫০. বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ভবানীচরণ, 'রসরচনাসমগ্র', তদেব, পৃ. ৪১।
৫১. বেদান্ত বিদ্যাসাগর, গঙ্গাচরণ অনূদিত, 'বাৎস্যায়নের কামসূত্র', প্রথম প্রকাশ ১৩১৩ বঙ্গাব্দে, নবপত্র দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৮৬, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ৮২।
৫২. দাস, স্বপনকুমার, 'কলকাতার পাখি'; দ্র. 'বিষয় কলকাতা', জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩, কলকাতা, পৃ. ৫৩০।
৫৩. দত্ত, কল্যাণী, ''খাঁচার পাখি'', থোড় বড়ি খাড়া, চতুর্থ মুদ্রণ ২০০৪, থীমা, কলকাতা, পৃ. ১১৯।
৫৪. তদেব, পৃ. ১২৩।
৫৫. দত্ত, প্রাণকৃষ্ণ, 'কলিকাতার ইতিবৃত্ত', পৃ. ১৩৫।
দ্র. বসু, দেবাশিস সম্পা., 'কলিকাতার ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য রচনা', ১ সংস্করণ ১৯৯১, পুস্তক-বিপণি, কলকাতা।
৫৬. উদ্ধৃত:- শ্রীপান্থ, 'কেয়াবাৎ মেয়ে', দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৮, আনন্দ পাবলিশার্স অ্যান্ড প্রা. লি, কলকাতা, পৃ. ২৭।
৫৭. বসু, রাজনারায়ণ, 'আত্মস্মৃতি'; ঘোষ বারিদবরণ সম্পা., 'নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ' প্রথম সং ১৪০২ বঙ্গাব্দ, কলেজ স্ট্রিট পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৭৯।
৫৮. গঙ্গোপাধ্যায়, মোহনলাল, 'দক্ষিণের বারান্দা', পুনর্মুদ্রণ ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ. ২৮-২৯।
৫৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২ খণ্ড তৃতীয় সংস্করণ পঞ্চম মুদ্রণ ১৪০১ বঙ্গাব্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃ. ২৮।

৬০. গুপ্ত, বিপিনবিহারী, 'পুরাতন প্রসঙ্গ',বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার সম্পা., প্রথম পুস্তক বিপণি সংস্করণ ১৯৮৯, পুস্তকবিপণি, কলকাতা, পৃ. ২।

৬১. নন্দী, সোমনাথ, 'বুলবুল লড়াইয়ের সেকাল-একাল', প্রথম সংস্করণ ১৯৯৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ১৪-১৫।

৬২. গুপ্ত, বিপিনবিহারী, 'পুরাতন প্রসঙ্গ', তদেব, পৃ. ৩।

৬৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২ খণ্ড, তদেব, পৃ. ২৮৮।

৬৪. দ্র. ঘোষ, লোকনাথ, 'কলকাতার বাবু-বৃত্তান্ত'; অনুবাদ ঃ সেন, শুদ্ধোদন, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৩, অয়ন, কলকাতা, পৃ. ৪৮।

৬৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২ খণ্ড, তদেব, পৃ. ২৮৮।

৬৬. ঘোষ, বিনয়, সংকলিত, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', ২ খণ্ড, প্যাপিরাস সংস্করণ ১৯৭৮, প্যাপিরাস, কলকাতা, পৃ. ১৪১।

৬৭. তদেব, পৃ. ১৪১।

৬৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২ খণ্ড, তদেব, পৃ. ২৮৮।

৬৯. নন্দী, সোমনাথ, তদেব, পৃ.;

৭০. দ্র. Chatterjee, Suniti Kumar, "The Eighteenth Century in India", 'Muhammad Shahidullah Felicitation Volume,' ed. by Haq, Muhammed Enamul Haq, Dacca 1966, p. 135.

৭১. সান্যাল, হিতেশরঞ্জন, 'বাঙ্গালা কীর্তনের ইতিহাস', ২য় মুদ্রণ ২০১২, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, পৃ. ১৬।

৭২. দ্র. De, S.K.

৭৩. বেদান্ত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য, গঙ্গাচরণ, 'হাফ আখড়াই সঙ্গীত সংগ্রামের ইতিহাস' প্রথম সংস্করণ ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ৮।

৭৪. তদেব, পৃ. ৮।

৭৫. দত্ত, ভবতোষ সম্পা., 'কবিজীবনী', আকাদেমি সংস্করণ ১৯৯৮, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, পৃ. ১২৭।

৭৬. তদেব, পৃ. ২২৭।

৭৭. তদেব, পৃ. ১০৭।

৭৮. তদেব, পৃ. ১২৭।

৭৯. সম্পূর্ণ বিবরণের জন্যে দ্র. ঘোষ, লোকনাথ, 'কলকাতার বাবু-বৃত্তান্ত', অনু. সেন, শুদ্ধোদন, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৩, অয়ন, কলকাতা, পৃ. ২৬-২৭।

৮০. দ্র. পাদটীকা: শাস্ত্রী, সত্যচরণ, 'মহারাজা নন্দকুমার চরিত', প্রথম পুঁথিপত্র সংস্করণ ২০০৩, পুঁথিপত্র প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ১৬৫।

৮১. দত্ত, ভবতোষ সম্পা., 'কবিজীবনী', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।

৮২. তদেব, পৃ. ১০৭।

৮৩. গুপ্ত, রামনিধি, 'গীতরত্ন', ভূমিকা;
উল্লিখিত :- চক্রবর্তী, রমাকান্ত, 'নিধুবাবু ও তাঁর টপ্পা', প্রথম পুনশ্চ সংস্করণ ২০০১, পুনশ্চ, কলকাতা, পৃ. ৪৬।

৮৪. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ, ''কলিকাতা দুইশত বৎসর পূর্ব্বে'', নব্যভারত, কার্তিক ১২৯০।
দ্র. চৌধুরি, সত্যজিৎ ও সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর সম্পা., 'হরপ্রসাদ রচনাবলী', প্রথম সংস্করণ ১৯৮৯, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, পৃ. ৬১।

৮৫. দত্ত, ভবতোষ সম্পা., 'কবিজীবনী', প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।

৮৬. তদেব, পৃ.১০৬।

৮৭. বেদান্ত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য, গঙ্গাচরণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

৮৮. চৌধুরী, সর্বানন্দ, ''প্রেমসিন্ধু নীরে'', 'বিভাব' শীত-বর্ষা সংখ্যা ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ.২০।

৮৯. বসু, রাজনারায়ণ, 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত'।
দ্র. ঘোষ. বারিদবরণ সম্পা., 'নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ' কলেজ স্ট্রিট প্রথম সংস্করণ ১৪০২, কলকাতা, পৃ. ২০।

৯০. দত্ত, ভবতোষ সম্পা., 'কবিজীবনী', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

৯১. তদেব, পৃ. ১১২।

৯২. ঘোষ, লোকনাথ, 'কলকাতার বাবু বৃত্তান্ত', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।

৯৩. চক্রবর্তী, রমাকান্ত, 'নিধুবাবু ও তাঁর টপ্পা', প্রথম পুনশ্চ সংস্করণ ২০০১, পুনশ্চ, কলকাতা, পৃ. ৪৫।

৯৪. দত্ত, ভবতোষ সম্পা., 'কবিজীবনী', প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।

৯৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪-৪৫।

৯৬. চক্রবর্তী, রমাকান্ত, 'নিধুবাবু ও তাঁর টপ্পা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

৯৭. ঘোষ, লোকনাথ, 'কলকাতার বাবু বৃত্তান্ত', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

৯৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯।

৯৯. যেমন, (১) গুপ্ত, ঈশ্বর, 'কবিজীবনী', (২) বসু, মনোমোহন, 'গীতাবলী', ভূমিকা, পৃ. ৫-৯, (৩) চক্রবর্তী, রমাকান্ত, 'নিধুবাবু ও তাঁর টপ্পা', পৃ. ৪৫ দ্রষ্টব্য।

১০০. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯।

১০১. দত্ত, ভবতোষ সম্পা., 'কবিজীবনী', প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।

১০২. বসু, রাজনারায়ণ, 'সেকাল আর একাল'।
দ্র. 'নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩।

১০৩. তদেব, পৃ. ৩২৬।

১০৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, ''নববাবুবিলাস'' 'রসরচনাসমগ্র', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

১০৫. অজ্ঞাত, 'বেশ্যানুরক্তি বিষমবিপত্তি'; দ্র. ভট্টাচার্য, মৌ সম্পা., 'বেশ্যাপাড়ার পাঁচটি দুর্লভ সংগ্রহ', প্রথম সংস্করণ ২০১১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৪১।

১০৬. নাগ, অরুণ সম্পাদিত, 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, পৃ. ২১৫।

১০৭. Ghosh, N.N, 'Memoirs of Maharaja Nubkissen Bahadur, 1st edition 1901, Kolkata, p. 186.

১০৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৪।

১০৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫০।

১১০.

১১১. ঘোষ, অঘোরচন্দ্র, 'পাঁচালী কমলকলি'; দ্র. ভট্টাচার্য, মৌ সম্পা., 'বেশ্যাপাড়ার পাঁচটি দুর্লভ সংগ্রহ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩-৮৪।

১১২. সান্যাল, অবন্তীকুমার 'বাবু', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

১১৩. Karim, Abdul, 'Murshid Kuli and His Times', 1st edi 1965, Dacca, পৃ. 68।

১১৪. চৌধুরী সুশীল, 'নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদ', প্রথম সংস্করণ ২০০৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ১২৫।

১১৫. Nair, P. Thankappan, 'Calcutta in the 19th Century', Ibid p. 402.

১১৬. তদেব, পৃ. 644-646।

১১৭. তদেব, পৃ. 469।

১১৮. মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ, 'কঙ্কাবতী', 'প্রথম প্রকাশ ১৮৯২;
দ্র. 'ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সাহিত্যম্ প্রথম সংস্করণ ২০০৫, সাহিত্যম্, কলকাতা, পৃ. ১১৬।

১১৯. সান্যাল, অবন্তীকুমার 'বাবু', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

১২০. Dutt, R.C, 'The literature of Bengal', 1877, 1895. উদ্ধৃত :- রায়, অলোক, ''উনিশ শতক: জাগরণ, পরিবর্তন ও পরিণাম'', 'উনিশ শতকের বাংলা', রায় অলোক ও নিয়োগী, গৌতম সম্পা., প্রথম সংস্করণ ২০১২, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৩৮।

১২১. বাগল, যোগেশচন্দ্র, 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা', প্রথম বিবেকানন্দ বুক সেন্টার সংস্করণ ২০১১, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, কলকাতা, পৃ. ২১।

১২২. Nair, P. Thankappan,' Calcutta in the 19th Century', Ibid p. 386.

১২৩. Nair, P. Thankappan, 'Calcutta in the 19th Century', First Edition 1984, Firma KLM Pri Ltd, Kolkata, p. 254.

১২৪. সান্যাল, অবন্তীকুমার 'বাবু', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

১২৫. ঘোষ, বিনয়, 'কলকাতা কালচার', 'কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত', ১ খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ ১৯১৯, বাক্ সাহিত্য প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ৩১১।

১২৬. তদেব, পৃ. ৩১১-৩১২।

১২৭. Parks, Fanny, 'Wanderings of a Pilgrim, in search of the Picturesque', London, Pelhem Richardson. উদ্ধৃত ও সংকলিত : Nair, P. T, 'Calcutta in the 19th Century', Ibid p.

১২৮. ঘোষ, লোকনাথ, ‘কলকাতার বাবু বৃত্তান্ত’, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।
১২৯. ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ, ‘মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী’, সম্পা., আমেদ, অসীম, ৪র্থ চ্যারিয়ট সংস্করণ ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, চ্যারিয়ট ইন্টারন্যাশনাল, কলকাতা, পৃ. ৯২।
১৩০. বসু, স্বপন, ‘বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস’, তৃতীয় সংস্করণ ২০০০, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ.
১৩১. Nair, P. T, 'Calcutta in the 19th Century', Ibid p.169.
১৩২. Nair, P. T, 'Calcutta in the 19th Century', Ibid p.14.
১৩৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত, ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা’, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২।
১৩৪. তদেব, পৃ. ৪৬৫।
১৩৫. Mitter, Kishorichand, Memoir of 'Dwarakanath Tagore', Parul edition 2011, Parul Prakashani, Kolkata, P.
১৩৬: দ্র. প্রসঙ্গকথা, মিত্র, কিশোরীচাঁদ, ‘দ্বারকানাথ ঠাকুর’, অনুবাদঃ নাথ, ‘দ্বিজেন্দ্রলাল; সম্বোধি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা ১, সম্পা., দাশগুপ্ত, কল্যাণকুমার, সম্বোধি পাবলিকেশন্‌স প্রাঃ লিঃ, ১ম সংস্করণ, ১৯৬২, কলকাতা, পৃ. ২৮৭। পদ্যটির সম্পূর্ণ ভিন্নপাঠ রূপচাঁদ পক্ষীর নামে উল্লিখিত হয়েছে : ঠাকুর, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, ‘দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী’, ২য় পরিমার্জিত সংস্করণ ২০০৫, অফবিট পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৭৪-৭৫।
১৩৭. ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ, ‘মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী’, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪।
১৩৮. পাল, নিমাইচন্দ্র সম্পা., ‘দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনচরিত’, প্রথম সদেশ সংস্করণ ২০০৫, সদেশ, কলকাতা, পৃ. ৩৮।
১৩৯. দ্র. পরিশিষ্ট ৩; সাঁতরা, তারাপদ, ‘কলকাতার মন্দির মসজিদ’, প্রথম সংস্করণ ২০০২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ১২৬-২৭।
১৪০. দাসগুপ্ত, জয়ন্তকুমার সম্পা., ‘বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ’, পুনর্মুদ্রণ ২০০৯, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পৃ. ২৭৩।
১৪১. দত্ত, মহেন্দ্রনাথ, ‘কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা’, চতুর্থ মুদ্রণ ১৯৮৩, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, কলকাতা, পৃ. ৫।
১৪২. রায়গুণাকর, ভারতচন্দ্র, ‘ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী’, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, নবম সংস্করণ ১৯৯৭, কলকাতা, পৃ. ১১।
১৪৩. মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ, ‘আপনার মুখ আপুনি দেখ’।
বসু, কাঞ্চন সম্পা., ‘দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ ২, পঞ্চম মুদ্রণ ২০০১, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৮৯।
১৪৪. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, “পরিচ্ছদের ইতিহাস আলোচনা”, সাংস্কৃতিকী’, চতুর্থ খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৩, আনন্দ, কলকাতা, পৃ. ১৬৬।
১৪৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত, ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা’, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।
১৪৬. রায়গুণাকর, ভারতচন্দ্র, ‘ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী’, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫।

১৪৭. সম্বাদ ভাস্কর, ২০.০১.১৮৫৪, দ্র. সম্পাদকীয়; বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৬।

১৪৮. অজ্ঞাত, 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়', ১ম খণ্ড, রায়, অলোক সম্পা., গ্রন্থন সংস্করণ, পুনঃপ্রকাশ ১৯৭৯, গ্রন্থন, কলকাতা, পৃ. ৫।

১৪৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, ''কলিকাতা কমলালয়'' 'রসরচনাসমগ্র', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

১৫০. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, ''নববাবুবিলাস'' 'রসরচনাসমগ্র', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

১৫১. মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ, 'আপনার মুখ আপুনি দেখ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-৯০।

১৫২. দ্র. অজ্ঞাত, 'সুরলোক বঙ্গের পরিচয়', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

১৫৩. শাস্ত্রী শিবনাথ, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ', সম্পা., ঘোষ, বারিদবরণ, দ্বিতীয় সংশোধিত নিউ এজ সংস্করণ, নিউ এজ পাবলিশিং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ৩৭।

১৫৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, ''নববাবুবিলাস'' 'রসরচনাসমগ্র', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

১৫৫. চট্টোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রকুমার, 'স্মৃতিতে সেকাল', মুখোপাধ্যায়, প্রবীর সম্পা., প্রথম সংস্করণ ২০০৯, চর্চাপদ, কলকাতা, পৃ. ৯২-৯৩ দ্র.।

১৫৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

১৫৭. দত্ত বর্ম্মা, ললিতাপ্রসাদ, 'কলিকাতার আটবাবু' কায়স্থ পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩২৬।
দ্র. রায়, নিশীথরঞ্জন এবং উপাধ্যায়, অশোক সম্পা., 'প্রাচীন কলিকাতা', প্রথম সংস্করণ ১৩৯০ বঙ্গাব্দ, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃ. ২০৬।

১৫৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

১৫৯. তদেব, পৃ. ১২৮।

১৬০. নাগ, অরুণ সম্পাদিত, ''সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা', দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, পৃ. ।

১৬১. ভাঁড়, 'সচিত্র গুলজারনগর'; বসু, কাঞ্চন সম্পা., 'দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ', ৩য়, পঞ্চম মুদ্রণ ২০০১, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৪৫০-৫১।

১৬২. শ্রীম কথিত, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' (চতুর্থ অধ্যায়, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ), প্রথম ভাগ, চতুর্দশ পুনর্মুদ্রণ ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, শ্রীম ঠাকুরবাটী, কলকাতা, পৃ. ৭৫।

১৬৩. Nair, P. T, 'Calcutta in the 19th Century', Ibid p.

১৬৪. এই ইঙ্গিত প্রথম দিয়েছিলেন কিশোরীচাঁদ মিত্র। পরবর্তীতে গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী এই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করেন এবং তথ্য-প্রমাণ উদ্ধারের চেষ্টা করেন।
দ্র. রায়চৌধুরী, গিরিজাশঙ্কর, 'রাজা রামমোহন রায় জীবনচরিতের নূতন খসড়া',

১৬৫. দ্র. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, 'রামমোহন রায়', ৬ষ্ঠ সংস্করণ ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃ. ১১।

১৬৬. See:- Editors Note; Collet, Sophia Dobson, 'The Life and Letters of Raja Rammohan Ray', edited by Biswas, Dilip Kumar and Ganguli, Prabhat Kumar, Fourth edi 1988, Sadharan Brahmo Samaj, Calcutta, p. 28.

১৬৭. চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ, 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত', তৃতীয় দে'জ সংস্করণ ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ, দে'জ, কলকাতা, পৃ. ৩৯০।

১৬৮. তদেব, পৃ.

১৬৯. তদেব, পৃ. ২৭৪।

১৭০. তদেব, পৃ. ২৭২।

১৭১. সান্যাল, অবন্তীকুমার, 'ভিক্তর জাকমঁর রোজনামচায় কলিকাতা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

১৭২. শরর, আবদুল হালিম, 'পুরনো লখনউ', তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৫, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, পৃ. ১৮৮-৮৯

১৭৩. সোম, নগেন্দ্রনাথ, 'মধুস্মৃতি', প্রথম দীপ সংস্করণ ১৯৯৮, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, দ্র.।

১৭৪. মিত্র, দীনবন্ধু, 'সধবার একাদশী'; তপ্ত, ক্ষেত্র সম্পা., 'দীনবন্ধু রচনাবলী', চতুর্থ মুদ্রণ ১৯৯২, সাহিত্য সংসদ।

১৭৫. নাগ, অরুণ সম্পাদিত, 'সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২।

১৭৬. পালিত, প্রিয়নাথ, 'টাইটেল দর্পণ';
সরদার, সহঃ আবদুর রফিক সম্পা., 'বাংলা দর্পণ নাটক সংগ্রহ', প্রথম সংস্করণ ২০০৪, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃ. ৩৩৮।

১৭৭. শাস্ত্রী, শিবনাথ, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

১৭৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

১৭৯. নাগ, অরুণ সম্পাদিত, 'সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা', প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।

১৮০. তদেব, পৃ. ১২৪।

১৮১. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫২।

১৮২. পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য দ্র. ঘোষ, সিদ্ধার্থ, ''বেলুনে বিবি, বাঙালি ও সাহেব ভায়া'', 'কলের শহর কলকাতা', প্রথম সংস্করণ ১৯৯১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৯৯-১০৯।

১৮৩. তদেব, পৃ. ১০০।

১৮৪. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, 'ঘরোয়া';

১৮৫. বেদান্ত বিদ্যাসাগর, গঙ্গাচরণ অনু, 'বাৎস্যায়ণের কামসূত্র', দ্বিতীয় নবপত্র প্রকাশ ১৯৮৬, রায়, ত্রিদিবনাথ সম্পা., নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ৯১-৯৯।

১৮৬. সুর, অতুল, 'কলকাতা' (এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস), প্রথম সংস্করণ ১৯৮১, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ১৮৬।

১৮৭. পাল, নিমাইচন্দ্র সম্পা., 'দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনচরিত', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

১৮৮. মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ, 'আপনার মুখ আপুনি দেখ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫-১১৭।

১৮৯. নাগ, অরুণ সম্পা., 'সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

১৯০. বেদান্ত বিদ্যাসাগর, গঙ্গাচরণ অনূদিত, 'বাৎস্যায়ণের কামসূত্র', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

১৯১. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, 'নববাবুবিলাস', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

১৯২. তদেব, পৃ. ৫১।

১৯৩. দ্র. ভূমিকা; 'ব্রজবিলাস';

১৯৪. বেদান্ত বিদ্যাসাগর, গঙ্গাচরণ অনূদিত, 'বাৎস্যায়ণের কামসূত্র', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

১৯৫. অজ্ঞাত, 'বেশ্যানুরক্তি বিষমবিপত্তি', ভট্টাচার্য, মৌ সম্পা., 'বেশ্যাপাড়ার পাঁচটি দুর্লভ সংগ্রহ', প্রথম সংস্করণ ২০১১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৪?

১৯৬. বিদ্যার্ণব, শিবচন্দ্র, 'তন্ত্রতত্ত্ব', প্রথম নবভারত সংস্করণ ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৪৭৯।

১৯৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯২।

১৯৮. দেবী, হাসিরাশি, 'কুশদহের ইতিহাস', (আখ্যাপত্র বিনষ্ট), পৃ. ৯৭।

১৯৯. পাল, নিমাইচন্দ্র সম্পা., 'দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্ররায়ের আত্মজীবনচরিত', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪।

২০০. রায়, অতুলকৃষ্ণ, 'কলিকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', সেন, শুদ্ধোদন অনূদিত, ঋদ্ধি-ইন্ডিয়া, প্রথম সংস্করণ ১৯৮২, কলকাতা, পৃ. ১০৭-১০ দ্র.।

২০১. বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল, 'কলিকাতা কল্পলতা', রায় নিশীথরঞ্জন এবং দাস, সুনীল সম্পা., 'পুরনো কলকাতার কথা', প্রথম সংস্করণ ১৯৮৯, জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ২৪।

২০২. Sinha, Pradip, 'Calcutta in Urban History', 1st edition 1978, Firma KLM Pri.Ltd, Kolkata, p. 75.

২০৩. শেঠ, হরিহর, 'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়- কথায় ও চিত্রে', প্রথম সংস্করণ ১৯৫২, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, পৃ. ৪১২।

২০৪. ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ, 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী', প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

২০৫. Sinha, Pradip, Ibid, p. 154-157.

২০৬. Mitter, Kissory Chand, 'Memoir of Dwarakanath Tagore', 1st Parul reprint 2012, Parul Prakashani, Kolkata, p. 80.

২০৭. ধর, জহরলাল, 'সচিত্র কলিকাতা রহস্য', প্রথম পরশপাথর সংস্করণ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, পরশপাথর প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ৯০।

২০৮. মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ, 'আপনার মুখ আপুনি দেখ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

২০৯. ঠাকুর জুনিয়ার , টেকচাঁদ, 'কলকাতার নুকোচুরি'; বসু, কাঞ্চন সম্পা., 'দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ', ১ম খণ্ড, পঞ্চম মুদ্রণ ২০০১, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ২৩৭।

২১০. নাগ, অরুণ সম্পা., 'সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

২১১. দত্তবর্ম্মা, ললিতাপ্রসাদ, 'কলিকাতার আটবাবু', প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫।

২১২. দত্ত, প্রাণকৃষ্ণ, 'কলিকাতার ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য রচনা'; বসু, দেবাশিস সম্পা., পুস্তক-বিপণিত প্রথম সংস্করণ ১৯৯১, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ২০-২১।

২১৩. দত্তবর্ম্মা, ললিতাপ্রসাদ, 'কলিকাতার আটবাবু', প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬।

২১৪. দত্ত, যতীন্দ্রমোহন, 'যমদত্তের ডায়ারী ও অন্যান্য রচনা'; ভট্টাচার্য, কৃশানু সম্পা., প্রথম সংস্করণ ২০০৬, রীতা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ২৬।

২১৫. দত্ত, প্রাণকৃষ্ণ, 'কলিকাতার ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য রচনা'; প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।

২১৬. দ্র. পাদটীকা; মুখোপাধ্যায়, হরিসাধন, 'কলিকাতা সেকালের ও একালের'; রায়, নিশীথরঞ্জন সম্পা., তৃতীয় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯১, পি.এস. বাক্‌চি অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ১৮৮।

২১৭. দত্ত, প্রাণকৃষ্ণ, 'কলিকাতার ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য রচনা'; প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

২১৮. শেঠ, হরিহর, 'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়— কথায় ও চিত্রে', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৩-৫০৪।

২১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।

২২০. তদেব, পৃ. ১১৩।

২২১. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, ''নববাবুবিলাস'' 'রসরচনাসমগ্র', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

২২২. লাহিড়ী, দুর্গাদাস, 'আদর্শ চরিত কৃষ্ণমোহন', নস্কর, মানবেন্দ্র সম্পা., প্রথম সংস্করণ ২০১৩, সূত্রধর, কলকাতা, পৃ. ৫০।

২২৩. তদেব, পৃ. ৫২।

২২৪. বসু, রাজনারায়ণ, 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬।

২২৫. সম্পূর্ণ দানপত্রের জন্য দ্র. রায়, বিনয়ভূষণ, 'নেটিভ হাসপাতাল থেকে ফিভার হাসপাতাল'; বসু, দেবাশিস সম্পা., 'কলকাতার পুরাকথা', প্রথম সংস্করণ ১৯৯০, পুস্তক-বিপণি, কলকাতা, পৃ. ১৮৩-১৮৭।

২২৬. রায়, নিশীথরঞ্জন এবং উপাধ্যায়, অশোক সম্পা., 'প্রাচীন কলিকাতা', প্রথম সংস্করণ ১৩৯০ বঙ্গাব্দ, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃ. ২৪৬।

২২৭. কুমার, শ্রীমদনমোহন, 'ভারত-মার্কিন বাণিজ্যের পথিকৃৎ রামদুলাল দে', প্রথম সংস্করণ ১৯৭৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃ. ২৭-২৮।

২২৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৭।

২২৯. তদেব, পৃ. ৩৭১।

২৩০. ঘোষ, লোকনাথ, 'কলকাতার বাবু-বৃত্তান্ত', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪।

২৩১. তদেব, পৃ. ১৪৩।

২৩২. দ্র. ভূমিকা, বসু, স্বপন সম্পা., 'উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা', দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা ১, প্রথম সংস্করণ ১৪১২ বঙ্গাব্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃ. ১৫।

২৩৩. ঘোষ, বিনয়, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৩য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ১৯৬৪, বিদ্যাভবন, কলকাতা, পৃ. ৩৭৭।

২৩৪. নাগ, অরুণ সম্পা., 'সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

২৩৫. সেনগুপ্ত, গৌরাঙ্গগোপাল, 'হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও হিন্দু পেট্রিয়ট', প্রথম সং, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, পৃ. ২০০-২০৫।

২৩৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, ''কলিকাতা কমলালয়'', 'রসরচনাসমগ্র', প্রথম নবপত্র সংস্করণ ১৯৮৭, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ১৫।

২৩৭. ঘোষ, নবকৃষ্ণ, ‘প্যারীচরণ সরকার’, সম্পা., চট্টোপাধ্যায়, সুদিন, ভারতী দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০২, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, পৃ. ১২৭।
২৩৮. Banerjea, Sir Surendranath, 'A Nation in Making', First Paschimbanga Bangla Akademi Edi, 1998, Paschimbanga Bangla Akademi, Kolkata, p. 76.
২৩৯. মিত্র, প্যারীচাঁদ, ‘রামকমল সেন’, গুপ্ত, সুশীলকুমার অনূদিত; বাগল, যোগেশচন্দ্র সম্পা., প্রথম সংস্করণ ১৯৬৪, সম্বোধি পাবলিকেশন্‌স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ৫৭।
২৪০. মুখোপাধ্যায় ভোলানাথ, ‘আপনার মুখ আপুনি দেখ’, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।
২৪১. তদেব, পৃ. ১০০।
২৪২. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত, ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা’, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯।
২৪৩. তদেব, পৃ. ২৭৪।
২৪৪. সেনদাস, শ্রীজয়ন্তীচন্দ্র, “শ্রীনন্দরাম সেনের জীবনোপাখ্যান”, শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস অ্যান্ড কোং, ১২৭৩ সাল;
২৪৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, “নববাবুবিলাস” ‘রসরচনাসমগ্র’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।
২৪৬. পাল, বিপিনচন্দ্র, ‘নবযুগের বাংলা’, চট্টোপাধ্যায়, অশোক সম্পা., প্রথম চিরায়ত সংস্করণ ২০১২, চিরায়ত প্রকাশন প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ৩৯।
২৪৭. Dutta, R.C, "The Bengal Zamindar and Ryot", Bengal Magazine, vol. II, December 1873, p. 201
২৪৮. Mukherjee, S.N. "Bhadralok and their Dals - Politics of Social Factions in Calcutta, C.1820-1856", 'The Urban Experience Calcutta', edi by Sinha, Pradip, 1st edi 1987, Riddhi-India, Kolkata, p. 44.
২৪৯. Das, Jogananda, "The Brahmo Samaj"; 'Studies in the Bengal Renaissance', 3rd revised edition 2002, National Council of Education. Bengal, Kolkata, P. 417-418.
২৫০. ‘১৭৭০ শকের সাম্বৎসরিক আয়-ব্যয় পুস্তকের ভূমিকা’, তত্ত্ববোধিনী, শ্রাবণ ১৭৭১ শক, কলকাতা, পৃ. ৬৭।
২৫১. বসু, রাজনারায়ণ, ‘আত্মচরিত’, ঘোষ, বারিদবরণ সম্পা., ‘নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ’, প্রথম সংস্করণ ১৪০২ বঙ্গাব্দ, কলেজ স্ট্রীট পাবলিকেশন্‌স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ৩৩।
২৫২. উদ্ধৃতঃ- গোস্বামী, ড. জয়ন্ত, ‘সমাজচিত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন’, প্রথম সংস্করণ ১৩৮১ বঙ্গাব্দ, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, পৃ. ৯৬৯।
২৫৩. গুপ্ত, ক্ষেত্র ও গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ সম্পা., ‘অমৃতলাল বসুর শ্রেষ্ঠ প্রহসন’, পুঁথি প্রকাশনা ১৯৯৪, কলকাতা, পৃ. ১৮৫।
২৫৪. নাগ, অরুণ সম্পা., ‘সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা’, প্রাগুক্ত, পৃ.।
২৫৫. গোস্বামী, ড. জয়ন্ত, ‘সমাজচিত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭০।
২৫৬. মুখোপাধ্যায়, ভুবনচন্দ্র, ‘সমাজ কুচিত্র’, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, পৃ. ১৬৯-১৭০।
২৫৭. নাগ, অরুণ সম্পা., ‘সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

২৫৮. দ্র. বিশ্বাস, হার্দিকব্রত সংকলিত ও সম্পাদিত, 'প্রহসনে কলিকালের বঙ্গমহিলা (১৮৬০-১৯০৯)', প্রথম সংস্করণ ২০১১, চর্চাপদ, কলকাতা, পৃ. ২৭৫।

২৫৯. 'বিশ্ব-সঙ্গীত', ১২৯৯ সাল, পৃ. ৪৬০-৬১।
উদ্ধৃতঃ- গোস্বামী, ড. জয়ন্ত, 'সমাজচিত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬৭।

২৬০. গুপ্ত, ক্ষেত্র ও গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ সম্পা., 'অমৃতলাল বসুর শ্রেষ্ঠ প্রহসন', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

২৬১. শাস্ত্রী, শিবনাথ, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', প্রাগুক্ত, পৃ.।

২৬২. গুপ্ত, ক্ষেত্র ও গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ সম্পা., 'অমৃতলাল বসুর শ্রেষ্ঠ প্রহসন', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২।

২৬৩. Sastri, Sivanath, 'History of the Brahmo Samaj,' Second edition, reprint 1993, Sadharan Brahmo Samaj, Kolkata, p. 1.

২৬৪. Ghosh, Benoy, "The Bengali Intelligentsia and the Revolt".
Joshi, P.C edi, 'Rebellion 1857', Second Reprint 2009, National Book Trust India, New Delhi, p. 126.

২৬৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, 'পলাশি থেকে পার্টিশান আধুনিক ভারতের ইতিহাস', অনু. রায়, কৃষ্ণেন্দু, পুনর্মুদ্রণ ২০১০, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, পৃ. ১৪০।

২৬৬. Ghosh, Benoy, "The Bengali Intelligentsia and the Revolt". Ibid, p. 112.

২৬৭. নাগ, অরুণ সম্পা, 'সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭।

২৬৮. See: Edwards, Thomas, 'Henry Derozio', 1st Radiance Publication 2003, Radiance, Kolkata, p. 49-51.

২৬৯. মিত্র, প্যারীচাঁদ, 'ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত', মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পা., 'প্যারীচাঁদ রচনাবলী', প্রথম সংস্করণ ২০০৩, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ. ৪০৮।

২৭০. বসু, স্বপন, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

২৭১. গোস্বামী, ড. জয়ন্ত, 'সমাজচিত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১৯।

২৭২. বিশ্বাস, অদ্রীশ সম্পা., 'বটতলার বই ১', প্রথম সংস্করণ ২০১১, গাঙচিল, কলকাতা, পৃ. ২৯৮।

২৭৩. Ghosh, Grish Chunder, "Young Bengal", 'Selections From the writings of Girish Chunder Ghose', 1st edi 1912, Papyrus edi, Papyrus, p. 121.

২৭৪. ঘোষ, বিনয়, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড, বর্ধিত ও মার্জিত সংস্করণ ১৯৭৮, প্যাপিরাস, কলকাতা, পৃ. ১৯১-৯২।

২৭৫. দত্ত, রমেশচন্দ্র, 'সংসার'; বাগল, যোগেশচন্দ্র সম্পা., 'রমেশ রচনাবলী' পঞ্চম মুদ্রণ ১৯৯০, সাহিত্য-সংসদ, কলকাতা, পৃ. ৩৮২।

২৭৬. তর্করত্ন, রামনারায়ণ, ''নবনাটক'', বক্সী, সন্ধ্যা সম্পা, 'রামনারায়ণ তর্করত্ন রচনাবলী', প্রথম সংস্করণ ১৯৯১, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃ. ১০।

২৭৭. তর্করত্ন, রামনারায়ণ, ''প্রকাশ্য বক্তৃতা''; তদেব, পৃ. ৬৭৫।

২৭৮. ঘোষ, বিনয়, সম্পা., 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', ৩য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ১৯৮০, প্যাপিরাস, কলকাতা, পৃ. ১২০।

২৭৯. ঘোষ, বিনয়, সম্পা., 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', ৪র্থ, বিদ্যাভবন সংস্করণ, পৃ. ১৪১-৪৩।

২৮০. ঘোষ, বিনয়, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা', ২য় সংস্করণ ২০০৭, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, পৃ. ২০৯-২১১।

২৮১. ঘোষ, বিনয়, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৪৪।

২৮২. বাগল, যোগেশচন্দ্র সম্পা., 'বঙ্কিম রচনাবলী', ২য় খণ্ড, নবম মুদ্রণ ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, সাহিত্য-সংসদ, কলকাতা, পৃ. ১১।

২৮৩. 'মধ্যস্থ', চৈত্র ১২৮০ সাল, পৃ. ৭৫৩।

২৮৪. বসু, রাজনারায়ণ, 'সেকাল আর একাল'; ঘোষ, বারিদবরণ সম্পা., 'নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬।

২৮৫. বাগল, যোগেশচন্দ্র সম্পা., 'বঙ্কিম রচনাবলী', ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

২৮৬. সুলভ সমাচার, ১ জানুয়ারি, ১৮৭১।

২৮৭. "বুৎপত্তিবাদ", বান্ধব, আশ্বিন-কার্তিক ১২৮১, পৃ. ৯৫।

২৮৮. দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ১৪০২ বঙ্গাব্দ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ. ২৯২।

২৮৯. Yule, Col. Henry and Burnell, A.C, 'Hobson-Jobson', Rupa Fifth impression 2007, Rupa Co, New Delhi, p. 44.

২৯০. সরদার, মহঃ আব্দুর রফিক সম্পা., 'বাংলা দর্পণ নাটক সংগ্রহ', প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১।

২৯১. তদেব, পৃ. ৩৪৪।

২৯২. ঘোষ, বিনয়, 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা', প্রাগুক্ত পৃ. ৩৩৮।

২৯৩. অজ্ঞাত, 'কেরাণী পুরাণ';
সাহা অর্ণব সম্পা., 'দুষ্প্রাপ্য বাংলা সাহিত্য', প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ২০১০, সপ্তর্ষি প্রকাশন, শ্রীরামপুর হুগলি, পৃ. ৩৮০-৩৮২।

২৯৪. তদেব, পৃ. ৩৮১-৩৮২।

২৯৫. উদ্ধৃত : শ্রীপান্থ, "কেরাণী-পুরাণ", শ্রীপান্থের নানারকম', প্রথম সংস্করণ ১৯৮৪, ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা, পৃ. ১৮৫।

২৯৬. দ্র. গোস্বামী, ড. জয়ন্ত, 'সমাজচিত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৮।

২৯৭. নাগ, অরুণ সম্পা., 'সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

২৯৮. বসু, স্বপন, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

২৯৯. বাগল, যোগেশচন্দ্র সম্পা., 'বঙ্কিম রচনাবলী', "বাবু"; প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ

## ছড়া-কবিতা-গান-প্রবাদ-পাঁচালিতে বাবু

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। অতি অনুভূতিপ্রবণ কবিও যতই কেননা কল্পনার পক্ষ বিস্তার করুন নিজ ভাবজগতের আকাশে, সে কল্পনায় প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষভাবে মিশে থাকে পারিপার্শ্বিকের রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ-স্পর্শ। বিশেষ করে লোককবিদের কল্পনাকে প্রত্যক্ষভাবে উদ্‌বেজিত করে দৈনন্দিন সমাজ, সময়, জীবনযাপন ও অভিজ্ঞতা। সমসময় থেকে মধু আহরণ করে কখনো তা পরিণত হয় চিরন্তন রসোপভোগের সামগ্রীতে, কখনো আবার প্রাত্যহিকতার সীমাতেই শেষ হয়ে যায় তার যত সম্ভাবনা। ছড়া-কবিতা-গানে, প্রবাদপ্রবচন কথকতার প্রচ্ছন্ন অন্তর্গত তলে এভাবেই মিশে থাকে সজাগ সামাজিক অভিজ্ঞতা, চলমান সময়ের ভাষ্য। নিছক সময়-দর্শন নয়, তাকে কাটাছেঁড়া করা, সমালোচনার কষ্টিপাথরে যাচাই করা, তীব্র তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে প্রয়োজনে এফোঁড়-ওফোঁড় করা, একই সঙ্গে আত্মসমালোচনা ও আত্মউদ্দীপনের বীজমন্ত্রে সমাজ পরিশুদ্ধির ঐকান্তিক আকাঙক্ষাও মিশে থাকে সেই অন্তর্গত তলে,— কখনো প্রকাশ্য স্পর্ধায়, কখনো সংগুপ্ত অভীপ্সায়। উনিশ শতকের সাহিত্যসংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঠিক এমনটিই ঘটেছিল।

ইংরেজের হাত ধরে গ্রামীণ চরিত্র থেকে নগর কলকাতার আত্মপ্রকাশ এবং ধীরে ধীরে নানা জাতি নানা মতের হাত ধরে এক বিমিশ্র নাগরিক সংস্কৃতির বিকাশ অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের বাংলার ইতিহাসে এক অতীব তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। নগর কলকাতা শুরুর দিন থেকেই বিশেষ একটি কোনো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মানদণ্ড নিয়ে বিকশিত হয়নি; পথ চলতে চলতে সে সংগ্রহ করেছে বহু জাতি বহু সংস্কৃতির নানান রূপ, নানান অধ্যাসকে। তার দিনযাপন ও ভাবনার মধ্যে মিশে ছিল নবাবি সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ অবশেষ, মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক রীতিনীতির উচ্ছিষ্ট, ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহবাসের ফলে উৎপন্ন জারজ ঔপনিবেশিক রীতি ও নীতি, একইসঙ্গে গোবিন্দপুর-সুতানুটি সহ ডিহি কলকাতার নিজস্ব গ্রামীণ সংস্কৃতি এবং গ্রাম ছেড়ে শহরে আসা লাখো লাখো মানুষের নিজস্ব লোকায়ত সাংস্কৃতিক বীক্ষা। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর কোনো নগরের ক্ষেত্রে এতরকম বৈচিত্র্যের সহাবস্থান কখনো হয়নি। সব মিলিয়ে, অনুভবী ইতিহাসবিদের মতে, 'কলকাতায় এক মেট্রোপলিটান মনের জন্ম হয়েছিল। সে অতীত বঙ্গসংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে না থেকে তাকে ঘষে মেজে ভেঙে চুরে এক নতুন মূল্যবোধের দিকে সমাজকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছিল।'[১] তবে, শুধুমাত্র 'অতীত বঙ্গসংস্কৃতি'ই নয়, বিশুদ্ধ 'নাগরিক' সংস্কৃতিও নয়, প্রথম থেকে তার মধ্যে মিশে ছিল সাবেক ও নতুন, গ্রামীণ ও নাগরিক নানান সাংস্কৃতিক discourse ।

মনে রাখা প্রয়োজন, এদেশের শাসনক্ষমতা হস্তগত করার পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার জনজীবনে আপাত রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু প্রাথমিক পর্বে কোম্পানির মূল লক্ষ্য ছিল যেহেতু বাণিজ্য, ফলে বাঙালির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সেই বাণিজ্যসহায়ক পরিবেশকে বিনষ্ট করতে চায়নি তারা। ফলে অষ্টাদশ শতক তো বটেই, উনিশ শতকের ত্রিশের দশক পর্যন্ত বাঙালিজীবনে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ সীমিত ছিল। অতঃপর ১৮১৮ সাল নাগাদ হিন্দুস্কুল-কলেজ স্থাপন, সংবাদপত্রের প্রচলন, ছাপাখানার বিস্তার, পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রবর্তন প্রভৃতির ফলে বাঙালিজীবন প্রকাণ্ড এক দ্বিধার সম্মুখীন হল। একদিকে আধুনিক জীবনের হাতছানি, অন্যদিকে সংস্কারমূলক প্রাচীনের প্রতি আকর্ষণ— এই দু'য়ের টানাপোড়েনে কেটে গেল উনিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগ। ফলে যখন পাশ্চাত্য শিক্ষা ক্রমপ্রসারিত হচ্ছে, বাঙালি জীবনযাপনে উঁকি মারতে শুরু করেছে বিলিতি সাহেবিয়ানা, তখনও অষ্টাদশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক ভস্মাবশেষ উড়ে বেড়াচ্ছে উনিশ শতকীয় কলকাতার আকাশে-বাতাসে। ফলে উনিশ শতকের অন্তত মধ্যপর্ব পর্যন্ত পাঁচালি, ছড়া, কবিগান,

আখড়াই-হাফ আখড়াই প্রভৃতি লৌকিক সংস্কৃতির ছত্রছায়ায় পুষ্ট হচ্ছিল কলকাতার 'নাগরিক' সংস্কৃতির প্রাথমিক পর্ব। নগর কলকাতার এই পর্বের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আদিবাবু এবং নববাবুরা, যাঁদের জীবন বেড়ে উঠেছিল গ্রামীণ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোয়। কেউ কেউ মনে করেন, পল্লীকেন্দ্রিক সংস্কৃতির এই ধারা কলকাতায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল নবোদ্ভূত পরিস্থিতির সুযোগে প্রধানত গ্রামবাংলা থেকে আসা মানুষের হাত ধরে, — "The migrants who came to Calcutta from the villages brought with them a rich repertoire of entertainments which they have inherited from traditional rural folk-culture.' ২ কিন্তু এই বক্তব্য পুরোপুরি সত্য নয়। মনে রাখতে হবে, নগরজীবনে প্রবেশের আগে খাস কলকাতা ও তৎসংলগ্ন মৌজাগুলি ছিল গণ্ডগ্রাম। ছড়া-পাঁচালি-কবিগান-কথকতার সংস্কৃতি অতএব সেই গ্রামীণ সাংস্কৃতিক কাঠামোয় নিতান্ত অপরিচিত ছিল না। শান্তিপুর, হুগলি, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ছড়াকার, পাঁচালিকার, কবিগাইয়েদের উদ্দেশ্যমুখী অনুপ্রবেশ সেই সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু নিতান্ত নতুন হলে এঁদের পক্ষে এত সহজে কলকাতার নতুন নাগরিক সংস্কৃতিতে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া একপ্রকার অসম্ভব ছিল। ভুঁইফোঁড় বাবুরা চারিত্রিক দিক থেকে যতই ভ্রষ্ট-স্খলিত হোন না কেন, সাবেকিয়ানার প্রতি তাঁদের ঝোঁক ছিল মাত্রাতিরিক্ত। এ কারণেই উত্তরকালে নব্যবাবুদের সাহেবি-সংস্কৃতির প্রতি অতি আসক্তিকে নববাবুরা যথাসম্ভব প্রতিহত করতে চেষ্টা করেছিলেন। অতএব এইসব আদি ও নববাবুদের আর্থিক কৌলীন্যের হাত ধরে নগর কলকাতায় অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে উনিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত এ জাতীয় সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষণ অব্যাহত ছিল। জনৈক আলোচকের মতে, 'ইংরাজের প্রভুত্ব-লাভের পর কলিকাতায় ব্যাবসাবাণিজ্য জাঁকাইয়া উঠিতে যে নবীন অভিজাত সম্প্রদায় শহরের উপর গড়িয়া উঠিল— যেমন সভাবাজারের রাজবাটী, রামদুলাল সরকারের উত্তরাধিকারীগণ, কলুটোলার শীলেরা, বাগবাজারের বসুরা, হাটখোলার দত্তেরা, দর্জিপাড়ার মিত্রেরা— এই সময় হইতে তাহাদের আমোদপ্রমোদের অঙ্গস্বরূপ দোল-দুর্গোৎসব-রাস অনুষ্ঠানে কবিগান গাহনার ব্যবস্থা করিয়া তদানীন্তন কবিদের প্রকাশ্যভাবে পোষকতা করিতে থাকেন। পাইকপাড়া ও কাশিমবাজারের ভূস্বামীগণ কবিদিগকে সযত্নে পোষণ ও পালন করিতে লাগিলেন।'[৩] পাশাপাশি, 'নবাবি আমলের সূর্য অস্ত গ্যালে' নবাবের পক্ষপুষ্ট বাইজি-বেশ্যাদের অনেকেই নতুন রুজি-রোজগারের সম্ভাবনায় ভিড় জমাতে থাকে ফরাসডাঙায়, হুগলিতে এবং বিশেষ করে কলকাতায়। এঁদের হাত ধরে প্রকৃত অর্থেই অনুপ্রবিষ্ট হয় বাইজি-সংস্কৃতি, যা গ্রামীণ কলকাতার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোয় এতকাল অনাস্বাদিতপূর্ব ছিল। লক্ষণীয়, এঁদের যাঁরা প্রথম পৃষ্ঠপোষকতা করলেন, সেই নবকৃষ্ণ কিংবা রাজা সুখময়, মুর্শিদাবাদের নবাবি সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁরা নিতান্ত অপরিচিত ছিলেন না। কলকাতার নতুন সামাজিক জীবনে ক্ষমতায়-প্রতিপত্তিতে-আর্থিক কৌলীন্যে এঁরা তখন একেকজন ক্ষুদ্র নবাব বিশেষ। অতএব এঁদের পৃষ্ঠপোষকতালাভে দেরি হল না বাইজি-বেশ্যাদের। কলকাতার নাগর-সংস্কৃতিতে এঁদের হাত ধরে যুক্ত হল নবাবি ঘরানা থেকে আসা হিন্দুস্তানি সংগীতের আভিজাত্য, চটুল বন্দিশ এবং কামোদ্দীপক নৃত্যচ্ছন্দ।

আপাতদৃষ্টিতে কবিগান, আখড়াই ইত্যাদির সঙ্গে বেশ্যাসংগীত-বাইজিসংগীতের গুণগত ও পদ্ধতিগত (গায়কি) অমিল থাকলেও, ভাবগত দিক থেকে উভয়েই ছিল পরস্পরের খুব কাছাকাছি। কবিগানের সখীসংবাদ, তরজা, খেউড় প্রভৃতি পর্যায়ের মূল আলোচ্য ছিল শ্রীকৃষ্ণের গোপন নারীসংসর্গ, তজ্জনিত

কারণে শ্রীরাধিকার অন্তর্জ্বালা, সখীগণের দৌত্য এবং নায়ক-নায়িকার পুনর্মিলন;— এককথায় শৃঙ্গাররসাত্মক 'বিলাসকলাসুকুতূহলম্' সম্বলিত বিষয়। বাইজি-বেশ্যাদের সংগীতেও ছিল গোপন শৃঙ্গারের অবাধ আমন্ত্রণ, প্রেমিকপ্রবর কর্তৃক উপেক্ষিত হবার বিরহ-যন্ত্রণা-মর্ম্মদাহ, আসঙ্গলিপ্সার কাতর অনুনয়। সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মিলিত সখ্যে তখন কিছু সুবিধাভোগী মানুষের হাতে সঞ্চিত হচ্ছে কাঁচা টাকার অবাধ ভাণ্ডার, চিরাচরিত নৈতিকতা ও সংস্কারকে প্রয়োজনে কিনে ফেলা যাচ্ছে, 'একজাই'য়ের মারফত কলকাতার নতুন বিমিশ্র সমাজজীবনের চালকের আসনে বসা অতএব সহজসাধ্য, সাবেক সংস্কার-আচার-নিয়মকে যতদূর সম্ভব মান্যতা দিতে হচ্ছে সমাজের উপর নিয়ন্ত্রণ যাতে বজায় থাকে সে কারণে, পাশাপাশি প্রকাশ্যে রক্ষিতা রেখে-বাইজির পৃষ্ঠপোষণ করে 'বড়মানুষী কবলাতেও' দ্বিধাবোধ করছেন না তাঁরা। বরং আর্থিক প্রতিপত্তির জোরে বাইজি বা রক্ষিতা রাখা 'বড়মানুষ বাবু'দের সমাজস্বীকৃত আচরণে রূপান্তরিত হচ্ছে।

নাগরিক কলকাতা তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে গড়া ধনতন্ত্রের নবচারণভূমি। ধনতন্ত্র নিজের প্রয়োজনেই কাজ ও অবকাশের সুযোগ করে দেয়। অবকাশ বিনোদন আসলে ধনতন্ত্রেরই স্বার্থবাহী। সমাজ- তাত্ত্বিকের ভাষায়,[৪] 'Leisure was also the creation of Capitalism in another sense, through the commercialization of leisure. This no longer meant participation in traditional sports and pastimes. Workers began to pay for leisure activities organized by capitalist enterprises'. নগর কলকাতার তৎকালীন আধা সামন্ততান্ত্রিক ও আধা ধনতান্ত্রিক কাঠামোয় প্রত্যক্ষ বাবুরা শ্রমজীবীতে পরিণত হননি সত্য, কিন্তু ভবানীচরণের 'কলিকাতা কমলালয়ে'র (১৮২৩) সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয় যে,[৫] বিষয়ী ভদ্রলোকেদের মধ্যে যাঁরা প্রধান অর্থাৎ দেওয়ান, মুৎসুদ্দি— তাঁরাও যথাসময়ে 'শকটারোহণে কর্ম্মস্থানে গমন করেন কর্ম্মানুযায়ী কাল বিবেচনা পূর্ব্বক তৎস্থানে থাকিয়া গৃহে আগত' হয়ে মজলিশে বসেন। 'নিতান্ত অনুযোগে থাকা' বিষয়ী ভদ্রলোকেদের অবশ্য তখনও পর্যন্ত 'অবকাশে'র সুযোগ মেলেনি, সামান্য অর্থের সংস্থানে তাঁদের অহোরাত্র পরিশ্রম করতে হয়। কিন্তু প্রধান বিষয়ী ভদ্রলোকবাবুদের কাজের সময় ও অবকাশ বিনোদনের সময় ধনতান্ত্রিক কাঠামোয় প্রকারান্তরে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। আধা সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো তখনও বজায় থাকায় বাবুরা হয়তো তখনও ধনতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় জায়মান বিনোদনের আস্বাদ পাননি; তাঁদের অবসর কেটেছে কবিগান, আখড়াই, হাফ আখড়াই কিংবা ভাঁড়ের সং-এ, বাগানবাড়িতে পোষ্য বাইজি বা রক্ষিতার মধুর সান্নিধ্যে; কিন্তু তাঁদের সেই অবসর বিনোদনের আনুষঙ্গিক উপাচারে, বৈঠকখানা ও বাগানবাড়ির সাজসজ্জায়, আসবাবপত্রে ধনতন্ত্রের গোপন অনুপ্রবেশ ঘটেছিল ভালোরকমেই। নবকৃষ্ণ, রাজা সুখময়, প্রাণকৃষ্ণ হালদার কিংবা দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনযাপন এবং বাগানবিলাসের আনুষঙ্গিক উপাচারের খতিয়ান নিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। বেলজিয়াম-গ্লাসের আয়না, ভিনিসীয় মার্বেল ভাস্কর্য, বিলিতি সুরা, আমদানি করা পারসিয়ান কার্পেট, বিদেশি কাটগ্লাস ও ফ্লাওয়ার ভাস ইত্যাদি উপকরণে বোঝাই হয়ে থাকত বিষয়ী আদিবাবু ও নববাবুদের অবকাশ-যাপনের চারপাশ। ধনতন্ত্রের গোপন অভিসন্ধিতে এসব উপকরণ বাবুদের কাছে অবসর বিনোদনের অত্যাবশ্যকীয় উপাদানে পর্যবসিত হয়েছিল।

এক হিসাবে কবিয়াল, বাইজিরাও তো মার্ক্স-এর ভাষায় 'Wage labour' ছাড়া কিছু নয়। বিত্তবানবাবুরা পৃষ্ঠপোষণার মাধ্যমে আসলে বিনিয়োগ করতেন; আর্থিক সুরক্ষার বিনিময়ে কবিয়াল-

বাইজিরা বাবুর মনোরঞ্জনের উপকরণ জোগাত, এনে দিত নাম, যশ, সামাজিক প্রতিষ্ঠার সুগমতা। নবকৃষ্ণ, রাজা সুখময়, দর্পনারায়ণ কিংবা জোড়াসাঁকোর সিংহদের মধ্যে কবিগানের দল নিয়ে যে রেষারেষি ছিল, তার হার-জিতের উপর নির্ভর করত সমাজে বাবুর প্রতিষ্ঠার মাত্রা। অতএব নিজেদের স্বার্থেই বাবুরা কবিগানের দল পুষতেন, বনেদি বাইজি রাখাও বাবুর বাবুয়ানার মাত্রা নির্ধারণ করত। বাবুর বাঁধা কবিয়ালেরা অনেকসময় পৃষ্ঠপোষক বাবুর সম্ভব-অসম্ভব স্তুতি-প্রশংসা করে মূল গানের সঙ্গে জুড়ে দিতেন। স্বাধীনচেতা কবিয়ালদের অনেকে অবশ্য সুযোগমতো পৃষ্ঠপোষক বাবুদেরও সমালোচনা করতে ছাড়তেন না, বাবুদের প্রতি তীব্র-তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করতেন গানের মাঝে মাঝেই। সেকালে অবশ্য কবিয়ালদের বিদ্রূপ-ব্যঙ্গকে সবাই হাসিমুখেই গ্রহণ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। এসবকে তখন কবিগানের অঙ্গ হিসাবেই বিবেচনা করা হত। পাশাপাশি, কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলমে'র হংসপাদিকার গানে যেমন প্রেমিক রাজার ভ্রমর-সদৃশ চরিত্র-মাহাত্ম্যের প্রতি তীব্র কটাক্ষ আছে, তেমনি কটাক্ষ একালের বাইজি-বেশ্যাদের সংগীতেও নিতান্ত দুর্লভ নয়। বাবুদের চারিত্রিক শৈথিল্য, ব্যভিচার, কথা দিয়ে কথা না রাখা ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে কটাক্ষ করেছেন বাইজি-বেশ্যারা তাঁদের কোনো কোনো গানে। ধনতন্ত্রে 'Wage labour' দের ব্যক্তিগত ইচ্ছে-অনিচ্ছে, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি বলতে আসলে কিছু থাকে না, বিনিয়োগকারীর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয় তাঁদের শ্রম ও অবকাশের সবটুকু। হৃদয়হীন বিলাসিতাও ধনতন্ত্রের স্বভাবসুলভ। অতএব বাবুদের চরিত্রভিত্তির যাবতীয় শৈথিল্য লজ্জাজনক হলেও, আশ্চর্য কিছু নয়।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগেই এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' সংস্কৃত 'চৌরপঞ্চাশিকা'র বঙ্গীয় সংস্করণ 'কালিকামঙ্গল' কাব্যধারার নিছক অনুবর্তন নয়, বরং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বিমিশ্র জাতি-সংস্কৃতি এবং বাণিজ্যবাহী ধনতন্ত্রের নানান চিহ্নে আবিল। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দীর্ঘকাল ফরাসডাঙায় ফরাসি গভর্নমেন্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে সেখানে বসবাস করেছিলেন, ওলন্দাজ গভর্নমেন্টের দেওয়ান রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যেও তাঁর কিছুকাল কাটে,[৬] ফলে নতুন কাল, নতুন চৈতন্যের ভাষাকে বুঝতে তাঁর কষ্ট হয়নি। 'বিদ্যাসুন্দর' আখ্যানে সুন্দরের বর্ধমান-দর্শন অংশে বণিকতন্ত্রের ছবিটিকে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন,'—

'প্রথম গড়েতে কোলাপোষের নিবাস।
ইংরেজ ওলন্দাজ ও ফিরিঙ্গি ফরাস॥
দিনেমার এলেমান করে গোলন্দাজী।
সফরিয়া নানা দ্রব্য আনয়ে জাহাজী॥... ...
ষষ্ঠ গড়ে দেখে যত বোঁদেলার থানা।
আঁটি আঁটি সেই গড়ে থাকে মালখানা॥
সেই গড়ে নানা জাতি বৈসে মহাজন।
লক্ষ কোটি পদ্ম শঙ্খে সংখ্যা করে ধন॥'

বণিক ও পুঁজিপতিদের মিলিত সহাবস্থানে ভারতচন্দ্রের কল্পকল্পনার বর্ধমান নগর তখন বহু জাতি-বহু সংস্কৃতির গন্তব্যস্থল।[৮] —

ইরাকি তুরাকী তাজী আরবী জাহাজী।
হাজার হাজার দেখে থাকে বান্ধাবাজী॥

উট গাধা খচ্চর গণিতে কেবা পারে।
পালিয়াছে পশু পক্ষী যে আছে সংসারে।।
ব্রাহ্মণমণ্ডলে দেখে বেদ-অধ্যয়ন।
ব্যাকরণ অলঙ্কার স্মৃতি দরশন॥...
বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধি-ভেদ।
চিকিৎসা করয়ে পড়ে কাব্য আয়ুর্ব্বেদ॥
কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারী।
বেণে মণি গন্ধ সোনা কাঁসারি শাঁখারী॥
গোয়ালা তামুলি তিলি তাঁতি মালাকার।
নাপিত বারুই কুঁরী কামার কুমার॥
আগুরি প্রভৃতি নাগরী যতেক।
যুগী চাষা-ধোবা চাষা কৈবর্ত্ত অনেক॥
সেকরা ছুতোর নুড়ী ধোবা জেলে শুঁড়ী।
চাঁড়াল বাগ্দী হাড়ী ডোম মুচি শুঁড়ী॥
কুমরী কোরঙ্গী পোদ কপালী তিয়র।
বেপল কলু ব্যাধ বেদে মালী বাজীকর॥
বাইতি পটুয়া কান কসবী যতেক।
ভাবক ভক্তিরা ভাঁড় নর্ত্তক অনেক॥

রায়গুণাকরের জাতিসম্মিলনে অতিশয়োক্তি থাকলেও, বিমিশ্র নাগরিক সংস্কৃতি যে ক্রমশ গোপন আগ্রাসনে উন্মুখ, অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে এই সত্য আর কল্পকাল্পনিক নয়। এককালে ফরাসডাঙার বাসিন্দা, উত্তরকালে কৃষ্ণনগরবাসী কবির পক্ষে বন কেটে ইংরেজ বণিকদের হাত ধরে বসত হয়ে ওঠা কলকাতার কথা অজানা থাকার কথা নয়। এ জাতীয় বিমিশ্র নাগরিক সংস্কৃতিতে চরিত্র-ভিত্তির দৃঢ়তাও নিতান্ত সাময়িক, এ সত্যও ক্রান্তদর্শী কবির জানা স্বাভাবিক। ফলে, 'ভুবনবিদিত রাজধানী' বর্ধমানের সম্মুখীন হয়ে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের রসিকবাবু 'সুন্দরের পদে লাগে কামফাঁস'। তার সাজসজ্জাতেও আঠারো শতকের সম্ভ্রান্ত রাজন্যবর্গের চিহ্ন, 'বিলাতী খেলাত পরে জরকশী চীরা।/মাণিক কলগী তোরা চকসকে হীরা।।'[৯] ঊনবিংশ শতাব্দীর সম্ভ্রান্ত বাবুদের আনুষ্ঠানিক বেশ এর চেয়ে ভিন্ন কিছু ছিল না। দ্বারকানাথ ঠাকুর এই পোশাকেই সাহেবসুবো অতিথি অভ্যাগতদের তাঁর বেলগাছিয়ার সুরম্য বাগানবাড়িতে আপ্যায়িত করতেন। সুন্দরের সুন্দরী রমণী-প্রীতি, গোপন মিলনের আকাঙ্ক্ষায় কুট্টনী নিয়োগ, ছলাকলাবিস্তার করে নারীসম্ভোগ উনিশ শতকের নববাবুদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাসে'র (১৮২৫) বাবু আসলে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' আখ্যানের নায়ক সুন্দরের কালোচিত সংস্করণ।

বাবুর পৃষ্ঠপোষণায় থাকলেও পোষ্টা বাবুর প্রতি কবিয়ালদের সাধারণ দৃষ্টি ছিল ব্যঙ্গাত্মক। জীবনযাপনের তাগিদে বাবুদের পৃষ্ঠপোষকতা স্বীকার করলেও কবিয়ালরা ছিলেন স্বাধীন কবিদৃষ্টির

অধিকারী। কিন্তু পোষ্টার মন জুগিয়ে চলাই ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের ভবিতব্য। ফলে আর্থিক প্রয়োজনে পোষ্টার পৃষ্ঠপোষণা মেনে নিলেও, প্রকৃত অর্থে তাঁদের মানসিকতা ছিল পোষ্টাবাবু অপেক্ষা ভিন্ন, প্রায়ই বিপরীত মেরুর। ফলে সুযোগ পেলেই তাঁদের গানের ভাবে-কথায়-বিষয়বস্তুতে মিশে যেতে থাকে বাবুদের প্রতি ব্যঙ্গ, কটাক্ষপাত। অন্যদিকে, পূর্বতন গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় লোকায়ত কবি-গায়কদের সামাজিক অবস্থান আর্থিক দিক থেকে নিম্নবিত্তদের কোঠায় নির্ধারিত হলেও, কবিত্বগুণের জন্য গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে তাঁদের সম্মান ছিল নির্দিষ্ট। বৃহত্তর গোষ্ঠীজীবনের সঙ্গে তাঁদের মানসিক যোগাযোগও ছিল নিবিড়। কিন্তু নগর কলকাতার বিমিশ্র সামাজিক পরিবেশে লোককবিরা ইঙ্গিত আর্থিক কৌলীন্য লাভে অসমর্থ হলেন, আগেকার মতো মিশ্র নাগরিক জাতি-সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে না ওঠায় আপামর লোকসমাজের শ্রদ্ধা-সম্মান-ভালোবাসাও আর তেমন পেলেন না। আধা সামন্ততান্ত্রিক, আধা ধনতান্ত্রিক নগর-পরিবেশ সাহেব-প্রভু ও উচ্চবিত্ত বাবুদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবধান ছিল সীমাহীন, কবিয়ালদের ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হয়নি। নতুন সামাজিক পরিবেশে এই ব্যবধান যে কোনোমতে ঘোচবার নয়, বাস্তব জীবন-অভিজ্ঞতা থেকে এই সত্য তাঁরা বুঝেছিলেন। একদিকে নতুন সামাজিক পরিবেশে মিশে না যেতে পারার যন্ত্রণা ও অপ্রাপ্তির হাহাকার, অন্যদিকে কবির সম্মানলাভে বঞ্চিত হওয়ায় ক্ষোভ কবিয়ালদের গানে বিদ্যুৎল্লেখার মতো চকিত ব্যঙ্গের ঝলকানিতে ফেটে পড়েছে।

শুধুমাত্র বাবুবৃত্তান্ত নিয়ে রচিত কবিগান অবশ্য নিতান্ত দুর্লভ। কবিগানের আসরে সব ধরনের শ্রোতা থাকতেন যদিও, তথাপি এর পৃষ্ঠপোষক বাবুটি যেহেতু সচরাচর হিন্দু, ফলে গানের বিষয়বস্তু চয়ন করা হত পৌরাণিক হিন্দুধর্মের আখ্যানগুলি থেকে। শ্রোতারাও অধিকাংশ ছিলেন পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থাশীল তথা উক্ত শ্রেণীভুক্ত মানুষ। ফলে, কবিগানের জনপ্রিয় ধারাগুলি যেমন, সখীসংবাদ-গোষ্ঠ-গৌরচন্দ্রী, মালসি-ডাকমালসি-লহরমালসি, আগমনি-বিজয়া প্রভৃতিতে অনুসৃত হত হিন্দুধর্মের তৎকালপ্রচলিত দু'টি জনপ্রিয় ধারা— বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্মাশ্রিত পুরাণ-আখ্যান। 'তরজা' বা কবির লড়াইয়ের অবলম্বিত বিষয়ও হত প্রধানত ভবানীবিষয়, সখীসংবাদ, মান, বিরহ, কলঙ্ক, মাথুর প্রভৃতি। 'খেউড়' ছিল ইতর ভাবালুতাপূর্ণ, অশ্লীল শব্দযুক্ত, পুরাণ-মিশ্রিত লৌকিক গান। এই সমস্ত ধারার কবিগানে 'বাবুবৃত্তান্ত' বর্ণনা করা অসম্ভব ছিল। কবিয়ালরা তার বদলে কিঞ্চিৎ অর্বাচীন 'ভণিতা'র সাহায্য নিতেন। সমালোচকের ভাষায়, 'স্বদেশ, সমাজ ও সমকালের যে-কোন দিক্ লইয়া অথবা স্থানীয় কোন ব্যাপার লইয়া এই ভণিতা শুরু হইতে পারে। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা চিরনূতন এবং স্বতউদ্ভূত ও সদাউদ্ভূত, ইহা অশ্লীলতা-দোষ-দুষ্ট নয় অথচ শ্লেষমণ্ডিত। মাধুর্যও কিছু কিছু জড়িত থাকে বলিয়া ইহার স্বাদ হয় অম্লমধুর। এককথায় এই জাতীয় ভণিতা পল্লীবাসিনী রমণীদের ''ছড়াকাটা''র লক্ষণ-যুক্ত। আবার পল্লীকবিদের গাথার মতই এই ভণিতা হয় অনতিদীর্ঘ।'[১০] দাশরথি রায়, ভোলা ময়রা প্রমুখ প্রখ্যাত কবিয়ালরা অনেকেই কবিগানের 'ভণিতা'য় বাবুদের 'গুণ'কীর্তন করেছেন। শ্লেষমণ্ডিত সেই 'গুণ'কীর্তনে কবিয়ালদের কণ্ঠে বাবুদের প্রতি সমকালের মনোভাব বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। সেকালে দোল, দুর্গোৎসব, গাজন, বিবাহ প্রভৃতি ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবে ধনীবাবুরা হয় নিজেদের দলের সঙ্গে অপর একটি দলকে আহ্বান করে, কিংবা দু'টি কবিগানের দলকে আমন্ত্রণ করে কবির লড়াই করাতেন। এইরকম কবিগানের আসরে পরস্পর চাপান-উতোরের সময় তাৎক্ষণিক বাগ্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে উত্তেজনার ঝোঁকে কবিয়ালরা কখনো কখনো বৃহত্তর সমাজ, সমকাল, এমনকী পৃষ্ঠপোষক বাবুকেও শ্লেষকঠিন ব্যঙ্গে বিদ্ধ করতেন। কালের প্রবাহে ওইরূপ

তাৎক্ষণিক বাচিক নিদর্শনগুলির অধিকাংশ হারিয়ে গেলেও, গুটিকয়েক প্রাপ্ত উদাহরণের মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, বাবুদের জীবনযাত্রার সঙ্গে সাধারণের জীবনযাত্রার সীমাহীন ব্যবধান, জনমানসে কেবল ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল; অথচ উপায়হীন, সহায়সম্বলহীন জনসাধারণ আর কীই-বা করতে পারতেন? ফলে মনের বিষ উগরে দিয়েছেন কবিয়ালরা তাঁদের 'ভণিতা'র মধ্য দিয়ে। অবশ্য এতৎসত্ত্বেও শেষপর্যন্ত আদি ও নববাবুরাই ছিলেন কবিয়াল ও কবিগানের রসগ্রাহী পৃষ্ঠপোষক। উনিশ শতকের চারের দশক থেকে যুগধর্মে নববাবুদের কাল শেষ হয়ে আসে, তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হন ইংরেজি-শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে শিক্ষিত-সুঅভ্যস্ত নব্যবাবুদের দল। কবিয়ালরাও পৃষ্ঠপোষক বাবুদের কাল শেষ হয়ে যাওয়ায়, সেইসঙ্গেই জনরুচির পরিবর্তনে কলকাতার আধা-নাগরিক আধা-গ্রামীণ সংস্কৃতিতে তাঁদের আধিপত্য হারান। তাঁদের ছেড়ে যাওয়া আসন অধিকার করেন পৃষ্ঠপোষণাহীন স্বাধীন কবি-ছড়াকারের দল।

কবিগানের সংকলনগুলিতে কবিয়ালদের 'ভণিতা'র দেখা মেলে না বললেই চলে। 'ভণিতা'গুলির অধিকাংশ যেহেতু কবিয়ালদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার ফল, অতএব মূল গানের অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় অংশবিধায়ে সেগুলিকে বর্জন করা হয়েছে। এর ফলে যে জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সূত্রগুলি হারিয়ে গেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কলকাতার বাবুদের প্রতি কবিয়ালদের বক্র-বঙ্কিম দৃষ্টিভঙ্গির কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় গৌণসূত্র থেকে। স্মৃতিকথা, কলকাতার ইতিহাস, প্রবন্ধ ইত্যাদিতে ইতস্তত উল্লেখিত হয়েছে 'ভণিতা'র কিয়দংশ। বলা বাহুল্য, 'ভণিতা'গুলি নিছক কবিপ্রেরণার অনুভবসঞ্জাত নয়, এগুলির উৎপত্তি সমকালীন বাস্তব ঘটনার গর্ভ থেকে। ভোলা ময়রার নামে প্রচলিত একটি কবি-গানে 'সেকালের কলিকাতার জমিদার বড়লোকদের আকার, ইঙ্গিত, ধাঁচ ও ধরন' নিয়ে বলা হয়েছে[১১]:

'আমি ময়রা ভোলা, ভিঁয়াই খোলা, বাগবাজারে রই।
নই কবি কালিদাস তবে খোসামুদের মাথা খাই॥
বাবু তো, লালাবাবু, কোলকাতাতে বাড়ী।
বেগুন পোড়ায় নুন দেয় না, সে ব্যাটাতো হাঁড়ী॥
পিঁপড়ে টিপে গুড় খায়, মুফতের মধু অলি।
মাপ কর গো রায়বাবু, দুটো সত্য কথা বলি॥
মোষের মত মুন্সীবাবু মসীর ন্যায় কালো।
পান খেয়ে ঠোঁট রাঙায় চেহারাখানা ভালো॥
পূর্ব জন্মের পুণ্য ফলে পান খেতে পাই।
লক্ষ্মীছানা বাসী মড়া, যার পানের কড়ি নাই॥'

সেকালের সব বাবুরাই বেহিসাবি খরচ করতেন না; কেউ কেউ ছিলেন রীতিমতো কৃপণ, এরকমই কোনো 'লালাবাবু'র কথা বলা হয়েছে এখানে। কোনো কোনো গবেষক কবিগানটির কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত পাঠ উল্লেখ করে অনুমান করেছেন যে,[১২] উল্লিখিত 'লালাবাবু' ও 'রায়বাবু' একই ব্যক্তি এবং তিনি হলেন মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত জাড়া গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদার রায়বাবু। এই মত কতদূর গ্রহণযোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে। প্রথমত, গানটিতে কলকাতার বাবুদের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে, যার সঙ্গে জাড়া গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদার রায়বাবুদের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হবার কোনো সার্থকতা নেই। দ্বিতীয়ত, গানটিতে

'মোষের মতো মুন্সীবাবু মসীর ন্যায় কালো' বলে স্পষ্টই জেদি, ক্ষমতাবান এবং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ নবকৃষ্ণ মুন্সীর প্রতিই স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতএব এই গানে বর্ণিত বাবুরা জাড়া গ্রামের ব্রাহ্মণ রায়বাবু নন। তা ছাড়া, জাড়া গ্রামে ভোলা ময়রার সঙ্গে চন্দ্রকোণা নিবাসী যজ্ঞেশ্বর কবিয়ালের লড়াই উপলক্ষ্যে এই গান গাওয়ার কথা বলা হয়।[১৩] একথাও যথার্থ নয়। কবিয়ালরা প্রায়শই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কুৎসা বা ব্যঙ্গোক্তি করতেন। ভোলা ময়রাও তার ব্যতিক্রম নন। 'লক্ষ্মীছানা বাসী মড়া' বলতে সম্ভবত তিনি তাঁর সমসাময়িক কবিয়াল লক্ষ্মীনারায়ণ কবিওয়ালা তথা 'লোকেযুগী'র প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।[১৪] ইনি নিজে তেমন গান বাঁধতে পারতেন না; বাঁধনদার গৌর কবিরাজ, রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা এঁর দলে গান বেঁধে দিতেন।[১৫] এঁর জনপ্রিয়তাও ভোলা ময়রার তুল্য ছিল না, এ কারণেই সম্ভবত ভোলা 'যার পানের কড়ি নাই' বলে লক্ষ্মীনারায়ণ যুগীর স্বল্পখ্যাতি ও আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যাই হোক, ভোলা সেকালের বাবুদের শখ ও ধরনের প্রতি যে ইঙ্গিত করেছেন তা উপাদেয় হয়েছে সন্দেহ নেই।

কিন্তু অধিকাংশ বাবুই এমন কিছু ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন না। যেমন, মহারাজা সুখময় রায়-এর দুই পুত্র রাজাবাহাদুর বৈদ্যনাথ এবং রাজাবাহাদুর নৃসিংহচন্দ্র 'সেকালের কলিকাতায় বাবুগিরির চূড়ান্ত করেন।'[১৬] এর মধ্যে রাজা নরসিংহ বা নৃসিংহচন্দ্র ছিলেন প্রথম শ্রেণির শৌখিন লোক। বাগানবাড়িতে পশুশালা, নানাজাতীয় ফল-ফুলের চাষ ও কলম করে, বুলবুল পাখির লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানোর প্যাঁচপয়জারে শেষ পর্যন্ত তিনি ওই শখেই হৃতসর্বস্ব হয়েছিলেন। কবিয়ালদের গানে এই উপলক্ষ্যে সেকালের বাবুদের বাবুয়ানার প্রতি তীব্র কটাক্ষ এবং একইসঙ্গে কিঞ্চিৎ বেদনাবোধ উৎসারিত হয়েছে:[১৭]

'দুর্গা পূজা ঘণ্টা নেড়ে খোকা হলে বাজে ঢাক,
কাকাতুয়া ছেড়ে দিয়ে খাঁচায় পুল্লেন কিনা কাক,
বিষয়কর্ম্ম গোল্লায় গেল লড়িয়ে কেবল বুলবুলী,
প্রকৃতি বিকৃতি হয়ে হায়! মারা গেল লোকগুলি।'

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ঢাক বাজানো বাঙালির চিরাচরিত প্রথা, আবার পুত্রসন্তান হলে মঙ্গলশঙ্খ বাজানো ও উলুধ্বনি দেওয়াও বহুদিনের সংস্কার। কিন্তু বিত্তবান বাবুরা বিধিনিয়ম প্রায়ই মানতেন না। সবাই যা করে, তার বিপরীত কাজ না করলে আর বাবু কীসের? অতএব প্রথা-নিয়মের বিপরীত কাজ করে তাঁরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইতেন। এ কারণেই দুর্গাপূজা কোনোমতে 'নমো নমো' করে সারলেও, 'খোকা হলে' ঢাক বাজিয়ে, আড়ম্বরের চূড়ান্ত করতে তাঁরা ছাড়তেন না। এ নিতান্ত কথার কথা নয়; ১৮২৬-এর ৪ ফেব্রুয়ারির 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায়,[১৮] দেওয়ান প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের এক 'নবকুমার' জন্মালে 'আহ্লাদিত হইয়া বাবুজী মহাশয় সদ্বিবেচনা করিয়া বহুবিত্ত ব্যয়দ্বারা অনেক দীনদুঃখি লোকেরদের ক্লেশ দূর করিয়াছেন এবং যাবতীয় বাদ্যকরকে ধনদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিয়াছেন তাহাতে রবাহূত দীনাদি কেহ ক্ষুণ্ণমনা হইয়া গমন করে নাই।'[১৮]

আবার, অর্থবান বাবুমাত্রেই সেকালে কাকাতুয়া পুষতেন; অতএব আলোচ্য বাবু তদ্‌বিপরীত বিবেচনায় 'কাক' পুষে তার জন্য বহুব্যয় করে বাবুয়ানার চূড়ান্ত করেছেন। বুলবুল লড়াই ও ঘুড়ির প্যাঁচে বিষয়কর্ম জলাঞ্জলি দেওয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সেকালের কোটিপতি রামদুলাল দে'র পুত্রদ্বয় সাতুবাবু (আশুতোষ দেব) ও লাটুবাবু। এভাবে যথার্থই 'প্রকৃতি বিকৃতি' বলে নববাবুরা ক্রমশ হারিয়ে গেলেন উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ থেকে।

কবিয়ালদের কোনো কোনো গানে প্রত্যক্ষভাবে বাবুদের উল্লেখ না থাকলেও, গানের বিষয়ে ও ভাবে রিপুতাড়িত, বেশ্যাগৃহপালিত বাবুদের প্রসঙ্গ উপস্থিত। বিশেষ করে নববাবুদের লাম্পট্য ছিল সুবিদিত। কেউ দায়গ্রস্ত হলে, বিপদে পড়ে বাবুর কাছে সাহায্য চাইলে বাবুরা নানা ছলছুতায় উক্ত বিপদগ্রস্তের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হতেন এবং 'বাটীর ভিতর গিয়া মিথ্যা আশ্বাস বাক্যে আকাশের চন্দ্র হাতে দিয়া স্ত্রীলোক কোন দিকে থাকে তাহার অনুসন্ধান করেন, ঐ চেষ্টাতে প্রত্যহ যাতায়াত করেন।'[১৯] অনেকেই সফল হতেন। তখন সেই 'কুলবালা'রা নগর কলকাতার বেশ্যাসংখ্যা বৃদ্ধি করতেন অচিরেই। কবিয়ালরা এই সকল মন্দভাগ্য নারীদের ভাবসাদৃশ্যে রাধাবিরহের ছবি এঁকেছেন কখনো কখনো। রাম বসু'র এ জাতীয় একটি গানে প্রিয়পরিত্যক্তা কুলরমণী আক্ষেপ করেছে [২০]:

'তোরে ভালবেসেছিলাম্, বোলে কিরে প্রেম্
আমার দুকূল মজালি।
দু'মাস না যেতে, দারুণ বিচ্ছেদের হাতে,
সঁপে দিয়ে আমায় ফেলে পালালি।...
আমি মৎস্য মাংসভোগী, হোয়েছি জম্বুকী,
তুই কি আমার ভাগ্যে এখন্ সেইটে ঘটালি।
পীরিতে মজিয়ে চিরদিন রব, প্রাণজুড়ান, ছিল বাসনা।
ত্রিরাত্র না যেতে, তাতে, কি বিড়ম্বনা॥
আমি তোরি জন্যে হলেম পরের বশ।
আগে মান্ খোয়ালেম, কুল মজালেম্,
দেশবিদেশে অপমান আর অপযশ॥
আগে দেখিয়ে বাড়াবাড়ি, করলি ছাড়াছাড়ি তুই,
আমার মাথায় তুলে দিলি কলঙ্কের ডালি!'

সেকালে বিধবা রমণীদের কুলত্যাগ এবং পরিণামে বারাঙ্গনাবৃত্তি গ্রহণ প্রায়শই ঘটত এবং এ জাতীয় ঘটনার পিছনে অনেক নববাবুদের ভূমিকাই ছিল প্রধান। 'আমি মৎস্য মাংসভোগী, হোয়েছি জম্বুকী' অংশে স্পষ্টই বিধবা রমণীর পদস্খলনের ইঙ্গিত। চিরদিন সুখে থাকবেন এই আকাঙ্ক্ষায় যে রমণী ঘর ছেড়েছিলেন মান খুইয়ে, কুলে কালি দিয়ে, 'দু'মাস না যেতে' বাবুটি 'দারুণ বিচ্ছেদের হাতে, সঁপে দিয়ে' তাঁকে ফেলে পালিয়েছেন। নারীটির আর কীই-বা করার থাকে তখন অন্ধকারের জীবন বেছে নেওয়া ছাড়া? রাম বসু'র আরেকটি গানে নববাবুর এ জাতীয় স্বভাবের প্রতি অনুযোগ জানিয়েছেন কুলত্যাগী, গতাসুপ্রিয় নারী[২১]:

'কও দেখিছে নূতন্ নাগর, এ কি নূতন ভাব রাখা।
হোয়ে কামিনী, জেগে পোহাই যামিনী,
দু'মাসে ন'মাসে তোমার পাইনেকো দেখা॥... ...
নূতন প্রেমে আমায় মজালে, কোরে নূতন আকিঞ্চন।
নূতন ভাব, ধোরে নূতন স্বভাব, হোরে নিলে মন॥
নূতন প্রেম বাড়াবার্ লেগে।

এসে নিত্যি সখা, দিতে দেখা, নূতন নূতন সোহাগে।
এখন্ কোথা রৈলো তোমার সে সব নূতন ভাব,
পেলে ছুতো-লতা কর বদনো বাঁকা॥...'

কুলরমণী ও অসহায় বালবিধবাদের ভাবীসুখের লোভ দেখিয়ে ঘরের বার করা এবং কিছুদিন ভোগতৃপ্তির শেষে পরিত্যাগ করা ছিল নববাবুদের সাধারণ চরিত্রধর্ম। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখেরা নববাবুর এহেন চরিত্র বৈশিষ্ট্যের প্রতি কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। কোনো কোনো ভুঁইফোঁড় বাবু আবার ভাগ্যলাভের আশায় কলকাতায় এসে আঙুল ফুলে কলাগাছ হতেন, সঙ্গে সঙ্গে ঝেড়ে ফেলতে চাইতেন অনাগরিক অতীত। কেউ মানসিক ভাবে দূরত্ব বাড়াতেন, কেউ-বা প্রয়োজনে পরিত্যাগ করতে পিছপা হতেন না পিতা-মাতা-পরিবারকে। শহরে কলকাতার আদবকায়দা রপ্ত করে, ইয়ারদোস্ত ও রক্ষিতা সঙ্গে কেটে যেত তাঁদের কাল। কবিয়ালরা নববাবুদের এহেন আচরণের সঙ্গে মিল পেয়েছেন মথুরাবাসী কৃষ্ণের আচরণ ও স্বভাবের। মথুরা গমনের পর কৃষ্ণ যেমন বৃন্দাবন ও বৃন্দাবন-নিবাসিনী রাধা— উভয়কেই ভুলে নিত্যনতুন রভসরঙ্গে কাল কাটান, শহুরে কলকাতায় ভিড় করা নববাবুরাও সেইরূপ ফেলে আসা জীবন ভুলে নতুন নারী নতুন জীবনের আসক্তিতে মত্ত হতেন; রাম বসু'র পদে সমকালীন সত্যের অকুণ্ঠ মর্মবেদনা অনাবৃত : [২২]

ঘরের ধন্ ফেলে প্রাণ,
পরের ধনকে আগলে বেড়াও।
নাহি জানি ঘরবাসা, কি বসন্ত, কি বরষা,
সতীত্ব কোরে নিরাশা অসতীর আশা পূরাও॥
রাজ্য পেয়ে ভার্য্যের প্রতি কর্ম্মেতে লুকাও।
যেমন্ প্রাণ হে সত্যবাদী।
আমি তেমনি কর্ম্মনাশা নদী।
ছুঁলে পরে কর্ম্ম নষ্ট হয় যদি॥
আমি সতী হোয়ে করি পতির মান্যবান্,
তুমি অন্যকূলে গিয়ে জীবন জুড়াও।'

এ গানে পুরাণের ছদ্মবেশ কিছুমাত্র রক্ষিত হয়নি। এ গান নববাবুকুলের অন্দরমহলের চেপে রাখা অবচেতনার আক্ষেপ। বাবুদের রক্ষিতা-বিলাস, পরনারীর প্রতি আসক্তিতে পত্নীকে উপেক্ষা— এ ছিল উনিশ শতকের প্রথম পর্বের বাবুদের চরিত্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। মাথুর সংগীত উপলক্ষ্যে কবিয়ালেরা সেই মর্মসত্যকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন। সে যুগের জনপ্রিয় কৃষ্ণযাত্রার কবি ও গায়ক গোবিন্দ অধিকারীর গানে কৃষ্ণের প্রতি উপেক্ষিতা রাধার উক্তিতেও সেই একই আক্ষেপ, তবে শাণিত ব্যঙ্গে জরজর:[২৩]

'পার না পার না চিনিতে। পারি চিনিতে॥
ছিলে যে শ্রেণিতে, এখন নাহিকো সে শ্রেণিতে।
যখন বেণু চিনিতে, তখন ধেনু চিনিতে,
তখন ব্রজের রেণু চিনিতে॥'

পূর্ব-পরিচয়কে অস্বীকার করে de-class বাবুরা নতুন শ্রেণিভুক্ত হয়েছেন, অতএব ফেলে আসা জীবনকে তাঁরা চিনবেনই বা কেন? একই কবির অন্য গানেও রাধার আক্ষেপোক্তিতে সেই সত্য প্রতিফলিত:[২৪]

‘এখন চিনবে কেন চিন্তামণি।
হয়েছ রাজা, পেয়েছ কুব্জা,
আমি বৃন্দাবনের সেই বৃন্দা কাঙালিনী,
যখন ছিল রাধার চিন্তে, তখন আমায় চিনতে,
বসেছ নাম কিনতে, পারবে না হে চিনতে,
কুঞ্জবিহার বনে, এ মধুর ভুবনে...’

‘নাম কিনতে বসা’ নববাবুদের প্রতি ঢপ-কীর্তন রচয়িতা মধুসূদন কানও অনুরূপ ব্যঙ্গোক্তি করে বলেছেন,[২৪ক]
‘রাই হতে কুলিনী কুবুজী, গরবে বেঁকেছ বুঝি,
নতুন কুল করে হয়েছ, কুলীন রাজাজী

‘হঠাৎ নবাব’ ভুঁইফোঁড় বাবুদের প্রতি যে কেবল হুতোমই কটাক্ষ করেছেন এমন নয়, দেখা যাচ্ছে সাধারণ শ্রেণি থেকে উঠে আসা কবিয়ালরাও অনেক আগে থেকেই এইসব অনভিজাত বাবুদের প্রতি ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, সহানুভূতিহীন। সমাজ-ইতিহাসবিদের মতে, ‘মনে হয়, যদিও কলকাতার সমাজের উপরতলাতে ঐ সময়, অনগ্রসর জাতি-উদ্ভূত হঠাৎ-ধনীরা সামাজিক স্বীকৃতি ও সমাদর লাভ করেছিলেন (মূলত তাঁদের টাকার জোরে), শহরের লোককবিরা ব্যাপারটাকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। এই হঠাৎ-ধনীদের মধ্যে অনেকেই, এই লোককবিদের মতো, উচ্চসমাজের উপহাস্য ও অবজ্ঞা-জর্জরিত তথাকথিত শূদ্র শ্রেণিভুক্ত ছিলেন। কিন্তু ঔপনিবেশিক অর্থনীতির আওতাতে তৈরি কলকাতা শহরের melting pot-এ, এক অজ্ঞাত কুলশীল রতন সরকার, নকু ধর, রামদুলাল, অক্রুর ধরনের লোকেরা রাতারাতি ক্রোড়পতি হয়ে গেলেন। অতীতের গ্রামীণ সমাজের জাত-ভিত্তিক বৃত্তি ও পেশার যে বাঁধাধরা ব্যবস্থা ছিল, সবই ওলটপালট হয়ে গেল কলকাতাতেও। এই হঠাৎ-রাজাদের প্রতি লোককবিদের এক ধরনের ঈর্ষা-মিশ্রিত-অবজ্ঞার ভাব ছিল মনে হয়।’[২৫] মধু কানের গানে তারই ইঙ্গিত, ‘নতুন কুল করে হয়েছে, কুলীন রাজাজী’।

কবিয়ালদের সমৃদ্ধির পর্ব মোটামুটিভাবে উনিশ শতকের প্রথম তিন দশক অর্থাৎ নববাবুদের কাল পর্যন্ত। ইংরেজি শিক্ষিত নব্যবাবুদের রুচির পরিপন্থী না হওয়ায় উচ্চ অভিজাত মহলে কবিগাওনা ক্রমশই সংকুচিত হয়ে আসে। হুতোমের সময় নববাবুদের পক্ষপুষ্ট কবিগানের দলগুলি প্রায় অন্তর্হিত হয়েছিল। স্নানযাত্রা, চড়ক, দুর্গোৎসব ইত্যাদি উপলক্ষ্যে বারোয়ারি স্থানে কখনো কখনো কবিগানের আসর বসতো,[২৬] তবে তখন যাত্রা, পাঁচালি, মেয়ে পাঁচালি প্রভৃতি নতুন মাধ্যমগুলি ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছিল। এর মধ্যে হুতোমের ভাষায়, ‘পাঁচালি ছোট কেতার হাফ আখড়াই, কেবল ছড়া কাটানো বেশীরভাগ’,[২৭] অন্যদিকে যাত্রায় বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ অধিকারীরা দূতী সেজে এবং বয়স্ক ছেলেরা সখী সেজে আসরে নামতেন এবং নাচ, গান, কিঞ্চিৎ অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের মনোরঞ্জন করতেন। ১৮৭২ সালে ‘ন্যাশনাল থিয়েটার’ প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালে এক বা একাধিক রঙ্গালয় গড়ে ওঠে এবং বাবুদের সঙ্গে সাধারণ দর্শকেরাও থিয়েটার দর্শনের বাসনায় ওইসব রঙ্গালয়ে ভিড় জমাতে থাকেন; ফলে পাঁচালি বা যাত্রার জনপ্রিয়তা খাস কলকাতার বুকে ধীরে ধীরে কমতে থাকে। যাই হোক, একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, বাবুদের

পৃষ্ঠপোষণার আওতার বাইরে থাকায় পাঁচালি ও যাত্রাগানে কবি-গায়কদের স্বাধীনতা ছিল অনেক বেশি। সাধারণ লোকসমাজ এগুলির মধ্যে বাবুদের প্রতি বক্রোক্তি, ব্যঙ্গোক্তি পেয়ে খুশিই হতেন। ফলে পাঁচালিকার ও যাত্রাগানের মধ্যে বাবুদের কথকতা অনেক বেশি পরিমাণেই উঠে এসেছে।

সাধারণভাবে তৎকাল প্রচলিত পাঁচালিগানের রূপবৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে আলোচক জানিয়েছেন, 'ইহার কথাবস্তুর মধ্যে একটি কাহিনীর ধারাবাহিকতা থাকিলেও, তাহার মধ্যে ঘটনাবিন্যাসের স্বাভাবিক পারম্পর্য ও ক্রমপরিণতি থাকে না, অসংলগ্ন বস্তুর সংযোজনে, অবান্তর বিষয়ের আকর্ষণে, সমসাময়িক ঘটনার টীকাটিপ্পনী বর্ণনে, ব্যঙ্গচিত্র বা নক্‌শা অঙ্কনে— মূল কাহিনীটি নেপথ্যে অপসারিত হয়।'[২৮] বলা বাহুল্য, আলোচক নির্দেশিত এই ত্রুটির কারণেই আবার, সমকাল প্রচলিত পাঁচালিগুলি হয়ে ওঠে সমসময়ের দর্পণ। সম্ভবত শ্রোতাদের রুচিও ছিল এর বড়ো কারণ। সমসময়ের নানান দোষ-ত্রুটি, ঘটনা-দুর্ঘটনা ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণের ধারণা বা মনোভাবই প্রতিফলিত হত এ ধরনের গানে। শ্রোতারাও নিজেদের মনোভাবনার প্রতিফলন শুনতে পেয়ে খুশি হতেন, নতুবা পৌরাণিক বা ধর্মীয় বিষয়ের মধ্যে সমসময়ের প্রক্ষেপ তাঁরা মেনে নিতেন না বলেই মনে হয়।

পাঁচালি গানে সে সময় দাশরথি রায় ছিলেন অগ্রগণ্য। দাশরথির জীবৎকাল ১৮০৬ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ। বয়সে ঈশ্বর গুপ্তের সমসাময়িক এই কবি প্রায় অর্ধ শতকের পরিবর্তমান কালের দর্শক। নববাবুদের অস্তমুখ পর্ব থেকে নব্যবাবুদের বিলিতি বোলচাল, নকলনবিশি তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল ঘনিষ্ঠভাবে। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে দাশরথি তাঁর পাঁচালি গানের আখড়া স্থাপন করেন। সেইসময় কলকাতায় নব্যবাবুদের কাল। দেশীয় সৎ রীতিনীতি পরিত্যাগ করে, বিজাতীয় সংস্কৃতি ও আদবকায়দাকে আয়ত্ত করে নব্যবাবুরা তখন যুগ মাতাচ্ছেন। প্রকৃত শিক্ষিত বাবুদের তুলনায় চারিদিকে অর্ধশিক্ষিত-অল্পশিক্ষিত নকলনবিশ বাবুদের ছড়াছড়ি। এরা উইলসনের হোটেলে খানা খায়, আবার বেশ্যাবাড়ি গিয়ে মজাও লোটে। মূল আখ্যানের পাশে, পুরাণ কথার মধ্যেই কখনো দাশু-কবি ব্যঙ্গেবিদ্রূপে জ্বলে উঠেছেন:[২৯]

'এখনকার ব্যাঙার দেখে কংস থাকিলে লজ্জা পেতো।
সে কি স্বধর্ম ত্যজে উইলসনের খানা খেতো॥
আখড়াতে গুলি গাঁজা, খেতো কি কংস রাজা,
রাঁঢ়, ভাঁড় লয়ে মজা, করিতে কি প্রবর্ত হোত॥'

সন্দেহ নেই, নব্যবাবুদের প্রতি দাশরথির দৃষ্টিভঙ্গি শ্লেষজর্জর। নব্যবাবুদের অনেকেই নববাবুদের মতোই যথাসর্বস্ব উড়িয়ে দিয়ে বেশ্যাবাজি করতেন। গৃহস্থ ঘরের কন্যা-বধূ-আত্মীয়কে ঘরের বাইরে এনে বাগানবাড়িতে রেখে দিনকয়েকের মজা লুটতেন, আর ওমুখো হতেন না। বাবুদের এই বাগান-বিলাস ও লাম্পট্যের ছবি মিশে যায় 'কৃষ্ণ-বিরহে শ্রীমতীর খেদে':[৩০]

'হরি করেছেন মুক্তাবন, সৌরভে মোহিত বৃন্দাবন,
রাই থাকি কুঞ্জবন, মধ্যে সখী সঙ্গে।
কেঁদে কহিছেন শ্রীমতী, কেন হলো কুমতি?
সুবলে না দিলাম মতি, ব্যঙ্গ ক'রে ত্রিভঙ্গে॥
হারালেম হয়ে রিপুর বশ,
কুঞ্জে এলেন না চার দিবস,

হ'য়ে যার প্রেমের বশ,　ত্যজিলাম গো কুল!
কাজ কি মুক্তাদি রতনে,　স্থূলে হয়ে কুল॥'...

লক্ষণীয়, রাধা এখানে কুলত্যাগ করে হরি-নির্মিত কুঞ্জবনে গিয়ে সখীদের সঙ্গে বাস করছেন, অথচ চারদিন ধরে কৃষ্ণ আর এমুখো হচ্ছেন না; রাধা তাই শঙ্কিত। এ ছবি একান্ত ভাবেই উনিশ শতকের বাবু-বৃত্তান্তের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। যে বাবুদের এহেন প্রেমকে 'ফক্য প্রেম' বলে অভিহিত করেন দাশরথি, বলেন:[৩১]

'ফক্য প্রেম ফক্কিকারি, সকল প্রেমের ওঁচা।
তায়, আগাগোড়া ধোকার টাটি,
　　কিছুই নহে সাঁচা॥
বেচে বাড়ীর পাটা কত বেটা ফক্যা প্রণয় করে।
বেড়ায়, খিচুড়ি মেরে বেশ্যার দ্বারে,
　　জেতের দফা সারে॥
তাদের, বাবুয়ানা, কি কারখানা,
　　ধোবার কাপড় নিয়ে।
কেবল, তিলকাঞ্চনে, রাত্রি কাটান,
　　ছেঁড়া চেটায় শুয়ে॥'...

আর্থিক সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও বাবুরা রক্ষিতা-বিলাসে সর্বস্বান্ত হতেন। বাড়ি বন্ধক রেখে, কোনোমতে ডাল-চাল খেয়েও 'বেশ্যার দ্বারে' ভিড় জমাতেন তাঁরা। এমনকী বাবুয়ানা করবার জন্য উপযুক্ত পোশাক না থাকায় ধোবার বাড়ি কাপড় অর্থমূল্যে ধার করে এনেও বেশ্যাবাজি করতেন তাঁরা। হুতোমের নকশার সেরুড কোম্পানির মেট মিস্তিরি তিরিশ টাকা মাইনের গুরুদাস গুঁইয়ের কথা মনে পড়ে যেতে পারে, যে কিনা বাবুগিরি ও স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে বেশ্যাবাজি করবার জন্য ধারকর্জ করে হলেও আয়োজন করে, অথচ এদিকে সংসার চালাতে 'কখন কখন মাস কাবারের পূর্ব্বে গয়না খানা ও জিনিসটা পত্তরটাও বাঁদা পড়ে'।[৩২] ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আপনার মুখ আপুনি দেখ'তে [৩৩] বাবুদের বড়োদিন পালনের ধূম দেখে কয়েকজন 'গেরস্ত গোচ বাবু', যাঁদের 'এদিকে আন্‌তে ওদিকে কুলোয় না, কুড়ী টাকা মাইনে পাবো, কিন্তু এদিকে পঁচিশ টাকা ধার হোয়ে আছে', তাঁরাও সকলের ছ'টাকা হিসাবে চাঁদা ধরে বেশ্যাবাজির আয়োজন করেন। অথচ ওই সামান্য টাকা জোগাড় করতেই, 'কেও টাকাটায় চার পয়সা সুদ কোবলে ধার কোল্লে, কেও স্ত্রীর গয়না বাঁদা দিয়ে আন্‌লে, কেও হাত কর্জ্জ নিলে, কাহারও নিজের নিকটেই ছিলো, কেও ঘরের থালা ঘটী বাসন বেচেই চাঁদার টাকা আনলেন।' বোঝা যাচ্ছে, বাবুগিরির শখটি আর অর্থসম্পন্ন বিশেষ শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট নেই, নিতান্ত দরিদ্র ছা-পোষা মানুষের মধ্যেও ক্রমশ বাবুয়ানির প্রতি মোহ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার জন্য সর্বস্বান্ত হতে, নিকৃষ্ট স্তরে নামতেও এঁদের আর দ্বিধা নেই। দাশরথি সরাসরি এই বাবুদের প্রতি বিদ্রূপ করে বলেছেন : [৩৪]

'মরি কি বাবুগিরি, দিয়ে ঠোঁটে গিরি, —
　　　　বেড়িয়ে বেড়ান।

আবাল-শিক্ষে, করেন ভিক্ষে,
পরের খেয়ে দিনটী কাটান॥
ব্রাণ্ডি, রেণ্ডী, গাঁজাগুলি,
ইয়ার জুটে কতকগুলি,
মুখেতে সর্ব্বদা বুলি, —
হুট বলে দেয় গাঁজায় টান।
পড়ে থাকে বেশ্যার বাড়ী,
হয়ে তাদের আজ্ঞাকারী,
হ'লে তাদের মনটি ভারী,—
হুঁকোটী কল্কেটী পানটী যোগান॥'

দাশরথির চোখে এই বাবুরা 'লম্পট' ছাড়া আর কিছু নয়। দাশরথি রায়ের এই বক্তব্যের কয়েক দশক আগে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কলিকাতা কমলালয়ে' (১৮২৩) প্রকারান্তরে এই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, 'কলিকাতার অধিক লোক কর্ম্মকাণ্ড ও সন্ধ্যা-বন্দনাদি পরিত্যাগ করিয়াছে এবং আহার পরিচ্ছদেরও বিবেচনা নাই যাহাতে সুখানুভব হয়, তাহাই করেন।'[৩৫] দাশরথি রায়ের পাঁচালিতে 'লম্পট'বাবু আত্মপরিচয় দিয়ে বলেছে [৩৮]:

'মুখে করি হুট হুট, জলপান আমার বিষকুট,
পায়েতে ইংরাজী বুট,
লোকের গায়ে দিয়ে বেড়াই খোঁচা।
কথা কই সব লম্বা লম্বা, ঠাকুর ঘরে খাই রম্ভা,
সন্ধ্যা আহ্নিক অষ্টরম্ভা, গলায় পৈতের গোছা॥
অপব্যয়ে বিতরণ, অধর্ম্মে সর্ব্বদা মন,
তাতেই অর্থ বিতরণ, ধর্ম্মে নাই এক কাঁচ্চা।
যেখানে সেখানে যাই,
জেতের বিচার কোথাও নাই,
হাস্যমুখে অন্ন খাই, বলে থাকি,— আচ্ছা॥
পরিবারে দেই গালি, ঘরেতে নাহিক চালি,
সদাই নবাবী চালি, পরি কালা-পাড় ধুতী।
সদাই আমার দেল খুসি, মদে গেল কোশা-কুশী,
ঠিকে, যথা-তথা অন্ন লুসি, লম্পট খেয়াতি॥'

কবির এই বর্ণনায় ভবানীচরণ কথিত 'বাবুর নবধা লক্ষণে'র সবকটি না হলেও, প্রায় অনেকটাই উপস্থিত। নব্যবাবুদের শিক্ষাগত যোগ্যতা যাই থাক, পোশাকে-আশাকে বাহ্যাড়ম্বর ছিল প্রবল। পায়ে ইংরেজি বুট পরা কিংবা বিস্কুট দিয়ে জলপান করা পরানুকরণের হাস্যকর ফল ছাড়া আর কিছু নয়। পরিবারকে গালি দিয়ে অস্থানে-কুস্থানে কাটানো, কিংবা মদ্যপানের প্রকোপে যথাসর্বস্ব বেচে দেওয়া কিংবা বন্ধক রাখার

অপরাধ অনেক বাবুই করতেন। দাশরথি ছিলেন প্রগতিশীল। স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ এসবকে তিনি পাঁচালির মাধ্যমে সমর্থন জানিয়েছিলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষাও তাঁর কাছে অপাংক্তেয় ছিল না। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে নিজ দেশের সুস্থ সংস্কৃতি বর্ণাশ্রম ধর্ম— এসবকে বিসর্জন দেওয়ার বিরোধী ছিলেন তিনি। নব্যবাবুদের কালে এমনটাই ঘটেছিল। ফলে, দাশরথি নব্যবাবুদের অনাচার-কদাচার, সর্বোপরি ভণ্ড নব্যবাবুদের জীবনযাপনের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন। 'কলি-রাজার উপাখ্যানে' মদ্যাসক্ত বাবুদের ব্যঙ্গ করে বলেছেন দাশরথি,[৩৬]

'এড়ান যায় না কোন সূত্রে,
এমন বাঁধে প্রেমের সূত্রে,
এক গেলাসে পিতা-পুত্রে,
মদ খাওয়ায় কৌশলেতে।।
দেখি, বাকী হদ্দ একটী পাই,
ভারতবর্ষে মদ্যপায়ী, —
আর দেখতে পাই কিনা পাই,
কিছুদিন বাদেতে।'

কেবল এতেই শেষ নয়। বেশ্যাসক্তি এদের নৈতিক-সামাজিক সর্বপ্রকার দূষণের কারণ হয়ে উঠেছে, [৩৭]

'জ্যেঠা খুড়া পিতা তনয়,—
এক বেশ্যায় করে প্রণয়, এমন বাঁধে প্রেমে।
করে মজা তলে তলে,
ছেলেকে রেকে খাটের তলে
তার বাপকে লয়ে খাটে তুলে
ছাড়ে না কোন ক্রমে।।'

সন্দেহ নেই, সমকালে নব্যবাবুদের যে অংশ পাশ্চাত্য শিক্ষার জ্ঞানালোকে সমাজের যাবতীয় অন্ধকারকে অপসৃত করবার প্রচেষ্টা করছেন, দাশরথির লেখায় তাঁদের কথা নেই। চাঁদের যে পিঠে অন্ধকার দাশরথি সেই পিঠটুকুই দেখেছেন, অন্ধকারের পিছনের আলো তাঁর চোখে পড়লেও (বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গ ছাড়া) বিশেষ উল্লেখ করেননি। আসলে সাহেবদের নকলনবিশ মেকি ভণ্ড বাবুদের সংখ্যাধিক্যে নব্যবাবুদের যথার্থ প্রগতিশীল অংশ পিছু হটছিল ক্রমেই। লোকায়ত সংস্কৃতির কবি তার ফলে পাঁচালির বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন বাস্তবের সংখ্যাগুরু ছাঁচটিকে। কলকাতার মিশ্র সংস্কৃতির বলয়ে সামন্ততান্ত্রিক জাত-পাত-সংস্কৃতির কাঠামো বারে বারে অস্বীকৃত হচ্ছিল। শুধুমাত্র টাকার জোরে অ-জাত কু-জাতরাও উঠে আসছিলেন ক্ষমতার বৃত্তে। সাহেবদের হাত ধরে বিলিতি জিনিস, বিলিতি সংস্কৃতিও ক্রমে সুলভ হচ্ছিল, ফল কিনে নেওয়া যাচ্ছিল ভুঁইফোঁড় আভিজাত্যের সঙ্গে সঙ্গে বিলিতি সংস্কৃতির অধিকারও :[৩৮]

'হবে না কেন মরদানি, যে বিলাতী আমদানি,
ধুতি উড়ানি জামদানি, পরে মেথরের ছেলে।'

অথচ,

'এসব, ছোট লেকের কর্ম্ম নয়,
আমীরের ছেলে যদি হয়,
তারাই নেশা ক'রে থাকে ও-সকলে'।

দাশরথির মতো লোককবিদের গানে-পাঁচালিতে এভাবেই বারবার ফিরে ফিরে আসে নগর কলকাতার মিশ্র সংস্কৃতিতে ভুঁইফোঁড় বাবুদের সামাজিক অস্বীকৃতির কথা। আরেকটা দিকও ভেবে দেখবার, দাশরথির সময় থেকেই নব্যবাবুদের হাত ধরে ক্রমশ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকবাবুরা উঠে আসছিলেন এবং কলকাতার নাগরিক কাঠামোর এঁরাই হয়ে উঠছিলেন প্রধান চালিকাশক্তি। এই 'ভদ্রলোক'বাবুদের উত্থানকে কি দাশরথি মেনে নিতে পারেননি কিংবা আভিজাত্যহীন বলে উপেক্ষা করতে চেয়েছেন? যে কারণে, তাঁর পাঁচালিতে উপেক্ষিত হয়েছেন নগর কলকাতার সংখ্যাগুরু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকবাবুদের দল? মনে রাখা প্রয়োজন, কবিয়ালরা নববাবুদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন, বাবুর দল হিসাবে কিঞ্চিৎ সামাজিক মর্যাদাও তাঁদের কপালে জুটত। কিন্তু যাত্রাগান ও পাঁচালিকারেরা সেই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। ইংরেজি শিক্ষিত, বিলিতি আদবকায়দায় অভ্যস্ত নব্যবাবুরা যেমন এসব সংস্কৃতিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছেন, তেমনি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকবাবুদের দলও 'অমার্জিত' আখ্যা দিয়ে এসব গান-সংস্কৃতিকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছেন। অথচ পুরাতন সামাজিক কাঠামোর বিচারে, এইসব বাবুদের কেউ কেউ কুলগৌরব, বংশমর্যাদা প্রভৃতি বিচারে হীনতর। অথচ শিক্ষাদীক্ষা, সর্বোপরি আর্থিক আনুকূল্যে এঁরা যে সমাজ-কাঠামোর উপরিস্তরে বিরাজ করছেন, ভোগ করছেন ক্ষমতা ও সামাজিক সুবিধা, এও তো অস্বীকার করার নয়। সমকালীন ছড়াতেও বাবুদের এ জাতীয় সামাজিক উত্থানের প্রতি ব্যঙ্গ লক্ষ করা যায়:

'হাল বয়, তাল খায়, গিধনায় বাস,
তার বেটা কায়েত হলো, বিশ্বাস খাস।'[৩৮]

কিংবা,

'দুলোল হল সরকার, ওক্কুর হলো দত্ত।
আমি কিনা থাক্‌বো যে কৈবত্ত সেই কৈবত্ত।।'[৩৯]

অথচ লোককবিরা নগর কলকাতার মিশ্র সংস্কৃতির বলয়ে প্রাপ্য সম্মানটুকুও পাননি। নাগরিক শিষ্টজনসংস্কৃতির প্রকোপে অচিরেই তাঁদের সরে যেতে হয়েছে গ্রামীণ লোকজীবনের বৃত্তে। সবদিক দিয়েই এই মহাবিনিষ্ক্রমণের পর আর তাঁরা ফিরতে পারেননি নাগরিক কলকাতা-সংস্কৃতির বলয়ে। এ কারণেও তাঁদের গানে-পাঁচালিতে নব্যবাবুদের দোষ-ত্রুটি যতটা সমালোচিত-উপহাসিত হয়েছে, তাঁদের সৎকার্যের প্রশংসা আদৌ হয়নি বললেই চলে।

দাশরথি রায়ের প্রায় সমসাময়িক আরেকজন কবি রূপচাঁদ পক্ষী (১৮১৫[৪০]-১৮৯০?) স্বরচিত গানের মাধ্যমে নব্যবাবু, ইয়ং বেঙ্গল প্রমুখের সমালোচনা করেছেন, যদিও সে ব্যঙ্গে দাশরথির ঝাঁঝ ও জ্বালা নেই, কৌতুকসুস্মিত কটাক্ষ আছে। রূপচাঁদ তাঁর জীবনের তাবৎ সময় বৌবাজারের মলঙ্গায় বাস করেছেন এবং সহজাত রচনাশক্তির সঙ্গে লোকচরিত্রজ্ঞান, সামাজিক অভিজ্ঞতার ব্যবহারে অল্পদিনের মধ্যেই সংগীত রচয়িতা হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। বাগবাজারের বিখ্যাত পক্ষীর দলের তিনি ছিলেন

প্রাণপুরুষ। তাঁর সংকলিত ও প্রাপ্ত ২১১টি গানের[৪১] অধিকাংশই ভক্তিসংগীত, কিছু দেহতত্ত্ববিষয়ক নীতিসংগীত। রঙ্গব্যঙ্গমূলক গান তিনি কমই রচনা করেছেন এবং সেগুলির মুখ্য বিষয় স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষার কুফল, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক বাবুর বিলিতি চাল অনুকরণের প্রয়াস, ইয়ং বেঙ্গল তথা নব্যবাবুদের আচার-আচরণ ইত্যাদি। রূপচাঁদ নিজে অভিজাত শ্রেণির বৃত্তে লালিত-পালিত, বিশেষ করে নববাবুদের কালের সঙ্গে তাঁর একটা মানসিক যোগ গড়ে উঠেছিল। রূপচাঁদ ছিলেন বাগবাজারের সুবিখ্যাত পক্ষীর দলের অন্যতম প্রধান পক্ষী। হুতোম জানিয়েছেন,[৪২] রাজা নবকৃষ্ণের আমলে বাগবাজারের শিবচন্দ্র ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় দলটি গড়ে ওঠে। তাঁর ভাষায়, 'শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাগবাজারের রিফরমেসনে রামমোহন রায়ের সমতুল্য লোক— তিনি বাগবাজারেদের উড়তে শেখান। সুতরাং কিছুদিন— বাগবাজারেরা সহরের টেক্কা হয়ে পড়েন। তাঁদের একখানি পাব্‌লিক আট্‌চালা ছিলো সেইখানে এসে পাকি হতেন, বুলি ঝাড়্‌তেন ও উড়্‌তেন—।' রূপচাঁদ ছিলেন পরবর্তীকালে এই আড্ডার মধ্যমণি। তাঁর 'বুলি ঝাড়া' অর্থাৎ গান ও রঙ্গব্যঙ্গমূলক কবিতায় কখনো কখনো উঠে এসেছে সমসাময়িক প্রেক্ষিত, বিশেষ করে সাহেব সাজতে চাওয়া বাঙালিবাবুদের প্রতি ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ। কবিয়ালদের মতো রূপচাঁদও পুরাণের পটে সমসময়ের কথা বলতে চান। ফলে, তাঁর রচিত আগমনি সংগীতে দেখা যায়, গাঁজাখোর পশুপতি এবং অবাধ্য দুই পুত্র কার্তিক ও গণেশকে নিয়ে নাজেহাল অবস্থা অম্বিকার।[৪৩] —

> 'ঘাঠে মাঠে বেড়ায় ছুটে কার্তিক গণেশ দুই নাতি
> শৈশব হতে যদি শিখাতে দুটিরে,
> বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরা আসিত পাশ করে;
> অনায়াসে দুইটিতে বিদ্যাবুদ্ধির জোরে,
> হত হাইকোর্টের বিচারপতি॥
> যত হট্টের সঙ্গে থেকে শিখেছে হট্টতা,
> কীরূপে তাহারা শিখিবে সভ্যতা,
> অসিদ্ধ বালকের নাম সিদ্ধিদাতা,
> কলা বৃক্ষ যার সঙ্গতি॥...'

১৮৫৭-তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় এবং সমসময়ের হাইকোর্টের লোয়ার বেঞ্চগুলিতে দেশীয় বিচারপতি নিয়োগও শুরু হয়। ইংরেজি শিক্ষিত নব্যবাবুরা, ইয়ং বেঙ্গলদের কেউ কেউ এই পদমর্যাদার অধিকারীও হন। পুরাণের কার্তিক-গণেশকে ইংরেজি-শিক্ষিত নব্যবাবুদের মতো হতে বলে বক্রোক্তি করেছেন কবি; কারণ, কিছু বিদ্যালয়ে পাশ না দিলে তারা কীভাবেই বা 'শিখিবে সভ্যতা?'

নব্যবাবু তথা ইংরেজি শিক্ষিত ইয়ং বেঙ্গলদের প্রতি রূপচাঁদ পক্ষীর মনোভাব অনুকূল ছিল না। যদিও সাধারণভাবে নগর কলকাতায় ইংরেজের হাত ধরে সভ্যতার অগ্রগতি যে দ্রুতবেগে চলছে এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন নিঃসংশয়। কলকাতা তাঁর কাছে—

> 'অতুল্য মর্ত ভুবনে, বৈকুণ্ঠ যায় হার মেনে,
> হেরে টেলিগ্রাপ, বলে বাপ,
> লাজে লুকায় পুরন্দর॥'[৪৪]

কিন্তু সামগ্রিকভাবে উচ্চশিক্ষার প্রভাবে যেমনটি ভাবা গিয়েছিল, তেমনটি না হওয়ায় কবি আশাহত, ক্রুদ্ধ। বরং তিনি দেখেছেন উচ্চশিক্ষার প্রভাবে নব্যবাবুরা ধরাকে সরা জ্ঞান করেছেন, নানান কুসংস্কার ও কুরীতিতে তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন, আচার-আচরণে উগ্র সাহেবিয়ানা এবং সেই কারণে দেশীয় প্রথা-নিয়ম-সংস্কার, এমনকী স্বদেশীয়দের ঘৃণা করতেও তাঁরা তৎপর। ক্ষুব্ধ কবি বলেছেন[৪৫]—

'উচ্চশিক্ষার প্রভাবে দেশের উন্নতি হবে,
সামাজিক কুক্রিয়া যাবে, বিদ্যাজ্যোতিতে।
হিতে হল বিপরীত, পাশ করায় বাড়ায় কুরীত,
এশিক্ষা কার মনোনীত হয় অনিষ্ট যাতে॥
সভ্যভব্য গুণবন্ত, সকলে কয়ে সিদ্ধান্ত
যাতে হয় এ বিষয়ে ক্ষান্ত চূড়ান্ত মতে।'

পূর্বে, কার্তিক-গণেশকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়ে 'সভ্য' হওয়ার ব্যঙ্গোক্তি করেছিলেন কবি। দেখা যাচ্ছে, তাঁর কাছে উচ্চশিক্ষা শেষ পর্যন্ত 'হিতে হল বিপরীত', সামাজিক কুক্রিয়া ও অসভ্যতার উৎসস্থল। উগ্রপন্থী ইয়ং বেঙ্গলদের তিনি এ কারণেই যখনই সুযোগ পেয়েছেন, তখনই খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছেন। নব্যবাবুদের দোষেই যে আর্যজাতির উন্নতি বিপদগ্রস্ত, এ ব্যাপারে তিনি নিঃসংশয়, কারণ তাঁর মতে,[৪৬] —

'সভাতে বক্তৃতা কেবল, কিছু হয় না ফলাফল,
যত নব্য বাবুর দল, খোসবাসী খাস-বাগানে॥
হাত পা নাড়ে, বচন ঝাড়ে,
কথাটি কয় রগ টেনে।
কখন বক্তৃতার বেগে, গলদ্‌ঘর্ম উঠেন রেগে,
বৃথা গর্জন প্রভাত মেঘে, বর্ষা ভরসা বিহীনে॥'

আগে অসুখ-বিসুখ হলে নিরাময়ের জন্য দেবতার কাছে চুল-দাড়ি মানত করা হত, তাতেই বাবুর দাড়ি থাকত। কিন্তু কবির মতে, 'এখন দাড়ির ছড়াছড়ি'; নব্যবাবুদের—

'কারো দাড়ি লম্বমান, কারো দাড়ি ঠিক শয়তান,
কেউ মেজেছে জাম্বুবান, হিন্দু পাঠান কে না চেনে॥'

পূর্বে চল্লিশ পেরোলে তবেই লোকে চশমা ব্যবহার করত, কিন্তু নব্যবাবুরা প্রায় সকলেই কারণে-অকারণে 'নাকের ডগায় চশমা লয়'; এমনকী,—

দুধের বালক কচি ছেলে,
চশমা ছাড়া নাহি চলে,
শুধালে শর্ট-সাইট বলে,...'

দেশীয় শিক্ষার প্রতি এঁদের মন নেই, 'আর্যধর্ম' এঁদের দ্বারা পরিত্যাজ্য, 'এখন স্কুলে গমন, কেবল অর্থের প্রয়োজন'; অবশ্য পড়াশোনা হলেও নব্যবাবুদের মধ্যে যাঁদের মুরুব্বির জোর আছে, স্কুল শেষ করেই তাঁর

কপালে সরকারি চাকরি জোটে, বাকিরা মুরুব্বিহীন, ‘মরেন আহার বিহীনে’। নব্যবাবুদের কাছে পুরাতন কালের ধুতি চাদর আর আদর পায় না, একালে—

‘ধুতি চাদর, নাইকো আদর
কাটা পোশাক ঘর ঘর, সামনে গোটা,
পেছুন ছাটা মাথার চুলের টেঁশুভাব।’

নব্যবাবুদের কেউ কেউ দু’চারপাতা ইংরেজি পড়েই ইয়ং বেঙ্গলদের দলে নাম লেখান, এঁরা—

‘ইংরাজি পড়ে পাত দু-চার,
ধরাটা দেখেন সরার আকার,
মদ গর্ব অহংকার, জীবে ভাবেন তৃণবৎ।
দেখলে অভীষ্ট, হন রুষ্ট, করে নাকো দণ্ডবৎ।
কেবল বুঝোন আপ্তসুখ, পর দুঃখে নাহি দুখ,
হেরেন না জননির সুখ, শস্যাগুরুর বারণে।।’

নববাবুদের সঙ্গে নব্যবাবুদের পার্থক্য হল, নব্যবাবুরা নববাবুদের মতোই যশ অর্জনে করতে চান, কিন্তু তার অন্যতম উপায় হিসাবে দানখয়রাতে তাঁদের আগ্রহ নেই— ‘পর দুঃখে নাহি দুখ।’ ইংরেজিয়ানার অনুকরণ করতে করতে নব্যবাবুরা যতই কেননা 'Equality and Fraternity' র কথা বলুন, বাস্তবে তাঁরা নিজেদের এক বিশেষ শ্রেণি-পরিচয়ে ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন। প্রাচ্য ধর্ম-সংস্কার-শিল্প-সাহিত্য সব কিছুর প্রতিই নব্যবাবুদের ছিল অবজ্ঞার ভাব। অন্যদিকে তাঁদের জীবনযাপনের প্রায় সর্বস্তরে অনুকৃত হত সাহেব-প্রভুদের রীতিনীতি। বঙ্কিমচন্দ্র এ জাতীয় প্রবণতার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করে 'The confession of Young Bengal' (Mookherjee's Magazine, Dec.1872) প্রবন্ধে বলেছেন, ‘The very idea that external life is a worthy subject of the attention of a rational being, except in its connections which religion, is, amongst ourselves, unmistakably of English origin. In spite of their emphatic inculcation of the duty of self-preservation, the prevailing tendency of our shastras was towards a severe asceticism, founded upon a profound feeling of the transitoriness and unreality of this world.' [৪৬] তিনি আরও বলেছেন, এই ইয়ং বেঙ্গল তথা ইংরেজি শিক্ষিত নব্যবাবুরা জন্মগত শ্রেণিবিভেদ না স্বীকার করলেও কর্মগত শ্রেণিবিভেদ স্বীকার করেন, 'We have cast away caste. We have outlived the absurdity of a social classification based upon the accident of Birth. But we are not such ultra-radicals as to adopt for our watch-word the impracticable formula of "Equality and Fraternity".[৪৭] রূপচাঁদ পক্ষী তাঁর কবিতায় ইয়ং বেঙ্গলদের এই ‘শ্রেণি-বিহীণ শ্রেণির’ মানসিকতাকে এবং স্বদেশের কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞার মনোভাবকে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন, —

‘(বলেন) ইয়ং বেঙ্গলের সভ্য ভব্য,
সাবেক হিন্দু সব অসভ্য, পড়েন কাশীরাম দাস।
এলে, বিএ, এম এ,
এরা সাত জন্মে করে না পাশ।

লেখাপড়া যাক গোল্লায়,
যদি ডিনার পার্টিতে যায়, তথাচ শরীরে বল পায়,
তবে দশ জন ইংরাজে চেনে।।
ওই যে রামায়ণ ভাগবত, সুপথ থেকে নে যায় কুপথ,
হায় কী বিশ্রী মত, করে গেছেন বেদব্যাস।
এরা মাইকেল মধুর, দীনবন্ধুর,
বুঝে নাকো ব্ল্যাঙ্কভার্স।'

লক্ষণীয়, রূপচাঁদ পক্ষী ইয়ং বেঙ্গল তথা নব্যবাবুদের বিদ্রূপ বাণে বিদ্ধ করলেও, মাইকেল মধুসূদনের প্রশংসা করেছেন, যিনি ব্যক্তিজীবনে ইয়ং বেঙ্গলদেরই সম্প্রসারণ ছিলেন, নব্যবাবুদের প্রতিনিধি। এর থেকে স্পষ্ট হয়, কবির লক্ষ্য প্রকৃত ইংরেজি শিক্ষিত, সুসভ্য, সুমার্জিত ব্যক্তিমাত্রেই নন; মেকি, ভণ্ড, অহংসর্বস্ব, আত্মপ্রবঞ্চক, মদ্যপায়ী, ইংরেজের নকলনবিশ, আধা শিক্ষিত নব্যবাবুরাই তাঁর ব্যঙ্গের লক্ষ্যস্থল। অবশ্য ভণ্ড নব্যবাবুদের প্রতি উনিশ শতকের শেষপাদ পর্যন্ত শিষ্ট ও জনপদসাহিত্যের কবি-লেখকেরা তাঁদের ক্ষুরধার আক্রমণ শানিয়ে গেছেন, এমনকী কালীঘাটের পটুয়া শিল্পীরাও তাঁদের নিয়ে ব্যঙ্গচিত্রের পট জমিয়ে তোলেন। তৎকালের সামাজিক পটের অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছিলেন এই নব্যবাবুরা।

নব্যবাবুরাই অবশ্য নয়, কবি ধিক্কার জানিয়েছেন চাকরিজীবী মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদেরও। বাঙালি একদিন 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী'র মন্ত্রে সিদ্ধি অর্জন করেছিল।[৪৮] —

'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী, অনেক ইহার পাবে সাক্ষী,
ছিল পালচৌধুরী দুলাল দুঃখী,
হল বিশ ক্রোরপতি।'

কবি এখানে রামদুলাল সরকার এবং জোড়াসাঁকোর তিলি বংশীয় বিত্তপতি কালীচরণ পাল প্রমুখ যাঁরা বাণিজ্যে-ব্যবসায় প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন, তাঁদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। অথচ এমন দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও শিক্ষিত বাঙালিবাবুরা সরকারের কিংবা ইংরেজ মালিকের অধীনে দাসত্ব করতে অধিক আগ্রহী। অথচ এর বিনিময়ে 'ভদ্রলোক'বাবুরা যে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকেন, এমনটিও নয়।—

রাতের আহার হয় না জীর্ণ,
প্রাতে উঠে ভুঞ্জে অন্ন,
পেট আঁটে অতি জঘন্য,
পাকযন্ত্র হয় বিকৃতি॥
কেহ এঁটে প্যান্টুলন কোট,
বলে দশটা বাজবে ত্বরায় ছোট,
হাজিরে বইয়ে করবে নোট,
অ্যাবসেন্টটা সম্প্রতি।।...
দৈবে একদিন কামাই হলে,
ড্যাম রাস্কেল কুলি বলে,
বেগে বেগে বাহু তুলে, ঘুসিয়ে ভেঙে দেয় ছাতি...'

এদিকে আবার ইংরেজ আপিসে প্যান্টালুন 'মলিন বসন পরবার যো নেই' বলে কোট-প্যান্টালুন-বুটের পেছনে মাসমাহিনার অনেকখানি যায়। সেইসঙ্গেই রয়েছে হোটেলের দেনা, অসুখ-বিসুখের দেনা, আবার 'বিদেশির দেখে শিখে চাল' নব্যবাবু সাজতে গিয়ে 'পানীয় দোষে চক্ষু লাল', অতএব পানীয়ের জন্য দেনা। দেনায় দেনায় জেরবার। অসংযত অত্যাচারে পীড়িত দেহ জবাব দিলেও রক্ষা নেই, কারণ—

'যদি বৈদ্যতে চিকিৎসা করে, অল্পব্যয়ে রোগ সারে,
সার্টিফিকেট না পেলে পরে,
ফরফিট হয় বেতন পাতি।'

কবি ইয়ং বেঙ্গল তথা নব্যবাবুদের বিরুদ্ধে যেমন খড়গহস্ত, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের প্রতি তেমন নয়। কোথাও যেন ঈষৎ সমবেদনার স্পর্শে ধন্য শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুর দল। এদের তিনি 'ভাই' বলে সম্বোধন করে উপদেশ দেন, চাকরি ছেড়ে 'কৃষি রেখে করো চাষ, দ্বারেতে বাঁধবে হাতি।' সম্ভবত স্বীয় শ্রেণিভুক্ত বলেই কবির এই সমানুভূতি।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'নববাবুবিলাসে' খলিফার পরিচয়দান প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'দুই একজন বাবুর অতি প্রত্যাশাপন্ন হয়েন, তাহারা পুরাতন বিলক্ষণ জুয়াচোর হরেক রকম কথার ধারা ও ব্যবহার জ্ঞাত আছেন বিদ্যাভিন্ন যে কোন বিষয়ে বাবু তুষ্ট থাকেন এমত চেষ্টা সর্ব্বদাই করেন, যদি বাবুর মনস্থ বুঝিতে পারেন, তবে ছায়াপ্রায় সর্ব্বদা খোসামদি করিয়া মিষ্টবাক্যে বাবুকে তুষ্ট রাখেন...।'[৪৯] অতি ধুরন্ধর, চাটুকারিতার পটু, অর্থবান বিলাসেচ্ছুক নববাবুদের সর্বনাশ সাধনে সদাতৎপর, পরান্নজীবী এই 'খলিফা' শ্রেণিকে বাবুসংস্কৃতির ধাত্রীমাতা বলা চলে। ইনি একাধারে বাবুত্বের লালনপালন ও পরিবর্ধনের তদারকিতে স্বনিযুক্ত, আবার যাবতীয় নষ্টামির সঙ্গে বাবুর মিলন ঘটানোর গুরুদায়িত্বও কুট্নী মাসির মতো পালন করেন। রূপচাঁদ পক্ষী এই সর্বনেশে খলিফা শ্রেণিকে 'ঘুঘুবাবু' অভিধায় ভূষিত করেছেন। উনিশ শতকে কিংবা পরের শতকেও আর কেউ বাবুদের আলোচনা সূত্রে এই 'খলিফা' শ্রেণিকে বাবুত্বের কোঠায় এনে বিচার করেননি। বাবুদের নবধালক্ষণ পালনের ব্যাপারে খলিফাদের ভূমিকাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এঁরা প্রথমে বাবুকে পাপের পথ দেখাতেন, ওই ব্যাপারে বাবুর আকর্ষণ বৃদ্ধি পেলে তার যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন, প্রয়োজনে অধিক টাকার হ্যান্ডনোট লিখিয়ে ভবিষ্যতে বাবুর সর্বস্বান্ত হওয়ার পথ প্রস্তুত করতেন, আবার বাবুর ভাঁড়ার শূন্য হলে এঁরা পুরাতন ডাল ছেড়ে নতুন ডালে গিয়ে বসতেন অবলীলায়। এঁদের উমেদারি ছিল বস্তুত বাবুর অর্থের প্রতি; বাক্‌পটুত্বে এঁরা নববাবুদের প্রভাবিত করেন প্রথমে, তারপর 'খোশামোদি তোষামোদি' আড্ডাধারী হয়ে বাবুর সর্বনাশের পথ প্রস্তুত করেন। কবি এঁদের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বলেন,[৫৫]—

'এরা কুহক মন্ত্র জানে, বশীকরণ গুণে,
লোকে টেনে এনে করে রে নাকাল।।
খোশামোদি তোষামোদি আজ্ঞাকারী,
মধুর চাটুবাক্য বদনেতে পুরি,
বাবুতোষা পেশা, খাসা দোকানদারী,
ধোনে ভাঙা রসিক চোঙা, ফক্করুগিরি,

খেতে শুতে বসতে কুড়োয় কত গাল;
ঘুঘুবাবুর নাম জগৎ রাষ্ট্র,
বাপন্ত পিতান্তে না হয় এদের কষ্ট,
কথায় কথায় লোকের করেন অনিষ্ট,
দেহটি বলিষ্ঠ বড়োই পাপিষ্ঠ,
গলা কাটে নোট কেটে, করে জাল॥'

এই 'ঘুঘুবাবু'দের শনিগ্রহ অপেক্ষা ভয়ানক ও অনিষ্টকারী বলেছেন কবি। এঁরাই বাবুদের অমিতাচার ও ব্যভিচারের মূল কারণ। এঁরাই নববাবুদের পাপের পথে প্রলুব্ধ করেন, পাপাগ্নিতে হব্যিদান করেন, আবার সুযোগ বুঝে আশ্রয়দাতা বাবুর সর্বনাশ ঘটিয়ে আর এক বাবুর স্কন্ধে গিয়ে ভর করেন। কবির ভাষায়,

'এদের কুমন্ত্রণায় ভিটেয় ঘুঘু চরে,
ধন হরে, মান হরে করে নাজেহাল।'

এঁদের লক্ষ্য মূলত নববাবুরাই। কারণ, এঁদের সহজে প্রলুব্ধ করা যায়, এঁরা খলিফাদের উপর আস্থাও স্থাপন করেন সহজে; ফলে এ জাতীয় শিকার যদি পেয়ে যান খলিফারা, তবে —

'ছলে বলে ঠুকে বসেন তাল;
প্রথম নাটক, সখের ভালোবাসা,
চরস তালের রস অবিদ্যার নেশা,
সুরার সলিলে ঢেলে সকল পয়সা,
খাসা বাসা কারাগারে হরে কাল॥...
যারে পায় তারে শেষ করে যায়,
ঐশ্চর্য রাজ্য বেচায় ঘটি থাল;'

অতএব কবির পরামর্শ, 'ঘুঘুর মায়ায় কভু যেয়ো না বাবু'। এককালে যাঁরা খলিফা ছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ পৃষ্ঠপোষক বাবুদের ছলে-বলে-কৌশলে দোহন করে কিংবা সর্বস্বান্ত করে বাবু হয়ে বসেছিলেন। কলকাতার নববাবুদের পূর্বপুরুষেরা অনেকেই এভাবে উঠে আসা 'ভুঁইফোঁড়' অভিজাত; পূর্ববর্তী জমিদারের নায়েব গোমস্তা ইয়ারদোস্ত অথবা খলিফা। উনিশ শতকের মধ্যভাগে পৌঁছেও দেখা যায়, সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। যুগধর্ম অনুযায়ী খলিফারা শুধু নিজেদের বাহ্যস্বরূপ বদলেছেন, নতুন কালের অধঃপতনের গুণগুলি আয়ত্ত করেছেন, আদতে যদিও চরিত্রধর্ম বিশেষ বদলায়নি। সংগীতের বিষয় হিসাবে এইসব ঘুঘুবাবুদের নির্বাচন করে রূপচাঁদ পক্ষী সম্ভবত একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছেন।

এভাবেই উনিশ শতকে জন-সাহিত্যের হাত ধরে সমকাল এবং বিশেষ করে সেইকালের অন্যতম মুখ্য প্রতিভূ বাবুরা চিরজীবী হয়ে উঠলেন, যদিও একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাঁদের কারোর কারোর মহৎকর্ম বা প্রচেষ্টাগুলি সেভাবে প্রতিফলিত হয়নি এ জাতীয় সাহিত্যে। অন্যদিকে বাবুদের দোষ-ত্রুটি স্খলন-পতন প্রভৃতি বিষয় ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে নিন্দিত-সমালোচিত হয়েছে প্রায়শই। এ দেখা একদিক থেকে দেখা সন্দেহ নেই। কিন্তু তথাকথিত শিষ্টসাহিত্যেও তো বাবুদের অনুপ্রবেশ কুণ্ঠিত-

দ্বিধাগ্রস্ত-বিকৃত। জনসাহিত্যে যে 'বাবু'দের স্বচ্ছন্দ পদচারণা, তাঁরা কেবল লম্পট-মদ্যাসক্ত-পরদারলোভী অর্ধশিক্ষিত শ্রেণি নয়; এঁদের পাশাপাশি ব্রাহ্মবাবু, বিলিতিবাবু বউবাবু, শিক্ষিতবাবু, কাপ্তেনবাবু, কেরানিবাবু প্রমুখ শিক্ষাভিমানী, অহংসর্বস্ব, ছদ্ম প্রগতিশীল, বাহ্য আড়ম্বরপ্রিয়, স্বজাতি-স্বধর্ম সংস্কৃতি বিদ্বেষী, ভীরু-দুর্বল, আবেদন-নিবেদনপ্রিয় আত্মসুখী পরজীবী শ্রেণিরাও 'বাবু' গোত্রধারী। ফলে জনসাহিত্যে গৃহীত 'বাবু'র ব্যাপ্তি অনেক প্রসারিত, অনেক গভীর। তথাকথিত শিষ্টসাহিত্য যে অনেকদিন পর্যন্ত মুখ ফিরিয়ে থেকেছে 'এহেন' বাবুদের দিক থেকে, তার কারণ সম্ভবত, জন-সাহিত্যে যেসব বাবুদের ভিড়, তাঁদের অনেকেই শ্রেণি-পরিচয়ে ওই শিষ্ট বাবুদেরই গোত্রভুক্ত। ফলে জনসাহিত্যের মতো 'আপনার মুখ আপুনি দেখতে' তাঁরা যে কেন আগ্রহী নয়, তা অনুমান করা শক্ত নয়। উনিশ শতকের তথাকথিত শিষ্ট মার্জিত কাব্য সাহিত্যের ধারা যুগভেদজনিত বাবু-বৈচিত্র্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকলেও, কলকাতা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের জনসাহিত্যকারেরা সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণেই এদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারেননি। তাঁদের রচিত এবং লোকমুখে প্রচলিত নানান ছড়া ও প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে বাবুদের জীবন ও যাপনের মুখর ইতিহাস।

সম্ভবত উনিশ শতকের প্রথম দিকে লোকমুখে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল আদিবাবুদের নামাঙ্কিত এই ছড়াটি —

'নন্দরামের ছড়ি।
উমিচাঁদের দাড়ি।
হুজুরীমলের কড়ি।
বনমালী সরকারের বাড়ি।'[৫০]

অন্য আরেকটি পাঠও প্রচলিত। সেখানে পাওয়া যায়—

'গোবিন্দরামের ছড়ি।
উমিচাঁদের দাড়ি।
নকু ধরের কড়ি।
মথুর সেনের বাড়ি।'[৫১]

ভিন্ন আরেকটি পাঠান্তরে মেলে,—

'বনমালী সরকারের বাড়ী
গোবিন্দরাম মিত্রের ছড়ি।
আমির চাঁদের দাড়ি।
হুজুরি মল্লের কড়ি।'[৫২]

ভিন্ন পাঠ এবং পাঠান্তরে ছড়াটিতে ঘুরে ফিরে এসেছেন পলাশির ষড়যন্ত্রের সঙ্গী দুই ধনকুবের অবাঙালি হুজুরিমল বা হুজুরিমল্ল এবং উমিচাঁদ ওরফে আমির চাঁদ। সিরাজের বিপক্ষে ক্লাইভকে এঁরা অর্থসাহায্য জুগিয়েছিলেন। কলকাতা বিকাশের আদিযুগে এঁদের প্রতিপত্তি অনুমান করা যায়। উমিচাঁদ তাঁর দীর্ঘ দাড়ির জন্য প্রাচীন কলকাতায় প্রসিদ্ধ ছিলেন বলে জানা যায়।[৫৩] একদিকে ইনি ছিলেন সিরাজ-উদ্-দৌলাহের

আস্থাভাজন পরামর্শদাতা, অন্যদিকে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ইংরেজ শিবিরের ঘনিষ্ঠ সহায়ক। উমিচাঁদ থাকলে যে তাঁরা সফল হবেনই, এ কথা ওয়াট্‌স জানিয়েছিলেন ক্লাইভকে।[৫৪] হুজুরিমল ছিলেন অন্যতম বিখ্যাত পুঁজিপতি। ব্যক্তিগত ভাবে উমিচাঁদ ও হুজুরিমল পারস্পরিক বৈবাহিক সম্পর্কে যুক্ত ছিলেন। কলকাতা গড়ে উঠবারপ্রথম যুগে অন্তত পলাশির পরবর্তী সময়ে কিছুকাল এঁদের আর্থিক ও সামাজিক দাপট যে অপ্রতিহত ছিল বেশ বোঝা যায়। হুজুরিমলের ছিল আর্থিক সামর্থ্য, উমিচাঁদের ছিল বিচক্ষণতা— যা 'দাড়ি'র ইঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে সম্ভবত।

অন্যদিকে বাঙালিবাবুদের মধ্যে যে নামগুলি উঠে এসেছে, তাঁদের দু'জন ইংরেজ আমলের প্রথম যুগের 'ব্ল্যাক জমিদার' নামে খ্যাত নন্দরাম সেন ও গোবিন্দরাম মিত্র। নন্দরাম সেন ছিলেন কলকাতার প্রথম ডেপুটি ব্ল্যাক জমিদার। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নন্দরাম রল্‌ফ সেলডন সাহেবের অধীনে এই দায়িত্বে ছিলেন, পরে বাউচার কালেক্টর হলে তিনি কর্মচ্যুত হন।[৫৫] ১৭২০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ গোবিন্দরাম মিত্র পূর্ণ ক্ষমতা সহ ব্ল্যাক জমিদারের পদে নিযুক্ত হন এবং প্রায় ৩২ বৎসর কাজ করে ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে অবসর নেন। সেকালে নন্দরাম এবং গোবিন্দরামের দাপট ও ক্ষমতা ঈর্ষণীয়। শাসক হিসাবে তাঁরা যে মাত্রাতিরিক্ত কঠোর ও সম্ভবত অত্যাচারী ছিলেন, 'ছড়ি' উল্লেখে তা বোঝা যায়। গোবিন্দরামের সুউচ্চ 'ব্ল্যাক প্যাগোডা' থাকা সত্ত্বেও, কবি যে তাঁর 'ছড়ি'কেই অধিক গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন, তাও লক্ষ করবার মতো। গোবিন্দরামের জনৈক উত্তরসূরির মতে,[৫৬] পলাশির সফল যুদ্ধের পর গোবিন্দরাম কলকাতার ডেপুটি ফৌজদার নিযুক্ত হন। 'ছড়ি'র উল্লেখ সে কারণেও হতে পারে। তবে তাঁর উদ্যমী স্বভাব, বিচক্ষণতা, কূটকৌশল, দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রভৃতি কারণে তিনি যে 'Hon'ble John Company' র বিশেষ আস্থাভাজন ছিলেন, সে কথা স্বীকার্য। উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও কোম্পানি যে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল, তার দ্বারাই সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে দেশীয় জনসাধারণের উপর তাঁর প্রভাবের প্রমাণ মেলে। গোবিন্দরামে উক্ত উত্তরসূরির মতে, 'This circumstances gave him an influnce with his own countrymen, who looked upon him as the only mediator between the English and the Natives on an important subject or business.[৫৭] আদিবাবুদের মধ্যে গোবিন্দরাম সর্বপ্রথম জাঁকজমক সহকারে দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। নবকৃষ্ণ প্রমুখেরা উত্তরকালে উক্ত পথই অনুসরণ করেছিলেন।

বনমালী সরকার ছিলেন গোবিন্দরাম মিত্রের কর্মচারী।[৫৮] পরবর্তীকালে ইনি পাটনায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের দেওয়ান এবং কিছুদিন কোম্পানির কলকাতা শাখার ডেপুটি ট্রেডার ছিলেন। কুমারটুলিতে নির্মিত তাঁর বসতবাটি ছিল কলকাতার বৃহত্তম অট্টালিকা [৫৯]— কথিত যে, ১৭৫৬-তে কলকাতা অবরোধের বহু আগে এটি নির্মিত হয়। আদিবাবুদের বাবুয়ানা দেখানোর অন্যতম মাধ্যম ছিল প্রাসাদোপম বাড়ি নির্মাণ। বলা হয়ে থাকে, বনমালী সরকার 'owned the finest native house of the day'. [৬০] মথুর সেন ও তেজারতি ও ব্যাঙ্কিং ব্যাবসায় প্রচুর বিত্তসম্পত্তি করেন। নিমতলাঘাট স্ট্রিটের উপর তাঁর প্রাসাদতুল্য বাড়িটি নির্মিত হয়। আদিবাবুদের মধ্যে তিনিও অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁর বাড়ির ফটক লাটসাহেবের বাড়ির অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল।[৬১] যদিও বাবুয়ানাতেই সব অর্থ উড়িয়ে দিয়ে মথুর সেন সর্বস্বান্ত হন। কিন্তু বিত্ত প্রদর্শন করে যশ অর্জনের জন্য নির্মিত বাড়ির জন্যই মথুর সেনও জনসাহিত্যের পাতায় জীবন্ত হয়ে রইলেন। অন্যদিকে নকু ধর ওরফে লক্ষ্মীকান্ত ধর সুবর্ণবণিক সমাজে অগ্রগণ্য ছিলেন।

পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী নকু ধর ইংরেজ কোম্পানির বিশেষ আস্থাভাজন ছিলেন। কর্ণেল ক্লাইভ ও তাঁর পূর্বসূরিরা তাঁর কাছে অর্থ সাহায্য পেয়েছেন। মারাঠা যুদ্ধের সময়ও জন কোম্পানিকে অর্থসাহায্য করেছিলেন ইনি।[৬২] এরই ফরমায়েশে নবকৃষ্ণ সামান্য কর্মচারী থেকে হেস্টিংসের মুনশি নিযুক্ত হন।[৬৩] এঁর দৌহিত্র রাজা সুখময় রায় কলকাতার প্রসিদ্ধ আট নববাবুদের অন্যতম ছিলেন।

লক্ষণীয় ছড়াকার উক্ত ছড়ার মধ্যে কলকাতার আদিবাবুদের সূচনাকালের ইতিহাসকে যেন ধরে রাখতে চেয়েছেন। নবকৃষ্ণের আগে আদি কলকাতার মিশ্র সমাজব্যবস্থা এঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। নন্দরাম থেকে গোবিন্দরাম, বনমালী সরকার থেকে মথুর সেন, হুজুরিমল থেকে নকু ধর— ছড়ার পাঠান্তরের মধ্যেও কালপ্রবাহের ইঙ্গিত নিহিত আছে। কলকাতার বিমিশ্র সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক যুগে যখন কোম্পানির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়নি, তখনও অর্থবান কতিপয় বাবুদের ব্যক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্তি সমাজ চালনার দায়িত্ব বহন করত। ব্যক্তিবিশেষের প্রভাবাধীন বলে এক নিয়ন্ত্রণ থেকে অন্য নিয়ন্ত্রণে ক্ষমতার বদল হলে পূর্ববর্তী নামের পরিবর্তে লোককবি নতুন নাম সংযোজন করতেন। উত্তরকালে কোম্পানির প্রত্যক্ষ শাসনাধীন হওয়ায় কলকাতার বিমিশ্র সমাজে আর দেশীয় ব্যক্তিবিশেষের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকেনি, ফলে ছড়াটির মধ্যে অন্য নাম সংযোজিত করা বা রূপান্তরেরও আর প্রয়োজন হয়নি।

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর কালসীমায় কলকাতার আদিবাবুদের অনেকেরই আভিজাত্য ছিল বিত্তগত বা অর্জিত, বংশগত নয়। অগাধ বিত্ত-সম্পত্তি অর্জনের সূত্রে, কেউ-বা ইংরেজ-তোষণের বিনিময়ে নানারূপে সামাজিক প্রতিষ্ঠা বা ইংরেজ প্রদত্ত খেতাব অর্জন করে কলকাতার নতুন নাগরিক বিমিশ্র সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতেন। ভুঁইফোঁড় বিত্তবানেরা অনেকেই এই সুযোগে জাত-গোত্র প্রভৃতি বদলে নিতে চাইতেন। পূর্বতন সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় যা নিতান্ত অসম্ভব ছিল, নতুন সামাজিক পরিবেশে তাতে আর বাধা রইল না। কলকাতার সমৃদ্ধির ইতিহাসে ইংরেজদের অবদান যতটা, ততটাই অবদান নিম্নগোত্রীয় ব্রাহ্মণ-কায়েত ও সুবর্ণবণিকদের, পূর্বতন সমাজে যাঁরা ছিলেন অবহেলিত-ব্রাত্য কিংবা পতিত। নাগরিক কলকাতার বিকাশ-পর্বের প্রথমদিকে উচ্চশ্রেণির ব্রাহ্মণ বা কুলীন কায়স্থরা যে তেমনভাবে উঠে আসতে পারেননি সমাজ-পরিচালকের মর্যাদায়, তার পিছনে সম্ভবত পূর্বতন সমাজে অবহেলিত জাতি-গোত্রের গোপন সক্রিয়তা ছিল। লোককবির ছড়ায় তার গোপন স্বীকৃতি—

> 'পিরালি কায়েত তাঁতি, আর সোণার বেণে
> করলে আবাদ তারা দেশ বয়ে ধন এনে।'[৬৪]

কিন্তু পূর্বতন সামাজিক জাতপাতভিত্তিক কাঠামোর এই বিপর্যয় লোককবিরা সম্ভবত মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। তাঁদের অসূয়া মিশ্রিত ব্যঙ্গও ফলে সময়-সুযোগে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এইসব ভুঁইফোঁড় নাম-গোত্রধারী বাবুদের প্রতি—

> 'হাল বয়, তাল খায়, গিধনায় বাস,
> তার বেটা কায়েত হল, বিশ্বাস খাস।'[৬৫]

যদিও সব বাবুদের গোত্রান্তরের ইচ্ছা সফল হত না। আর্থিক প্রতিপত্তি অর্জন করে অনেকেই চাইতেন সামাজিক প্রতিষ্ঠা, আভিজাত্যমহিম বংশ পরিচয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে আদিবাবুদের অন্যতম নবকৃষ্ণের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও জাত-কাছারি প্রতিষ্ঠিত হলে বিষয়টি আর সহজ থাকেনি। নবকৃষ্ণ

কলকাতার বিমিশ্র সমাজে শক্তিশালী গোষ্ঠীপতি ছিলেন, সামাজিক জীবনে তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম। নবকৃষ্ণের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আর এক বিখ্যাত বাবু মদনমোহন দত্ত মহাশয় ছিলেন আর একজন প্রভাবশালী পুরুষ। প্রধানত তাঁরই আপত্তিতে 'পীরালী' ব্রাহ্মণ অন্যতম ধনীবাবু দর্পনারায়ণ ঠাকুর 'সমন্বয়' করে জাতে উঠতে চেয়েও ব্যর্থ হন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র লক্ষ টাকার বিনিময়ে দর্পনারায়ণকে প্রথমে সমর্থন করলেও পরে মদনমোহনের আপত্তিতে দর্পনারায়ণের পক্ষ ত্যাগ করেন।[৬৬] আর এক বাবু কালু ঘোষও মদনমোহনের আপত্তিতেই জাতে উঠতে চেয়েও পারেননি।[৬৭] জনশ্রুতি মতে, রানি রাসমণির শ্বশুর প্রীতিরাম দাস (১৭৫৩-১৮১৭), যাঁদের ব্যাবসায়িক উপাধি ছিল 'মাড়', তিনি কায়স্থ পদবিভুক্ত হয়ে কলকাতার বাবুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে চাইলে নবকৃষ্ণ প্রমুখের বিরোধিতায় ব্যর্থ হন। লোককবিরা ভগ্নমনোরথ প্রীতিরামের জবানিতে আপাত সহানুভূতির ছলে নিদারুণ ব্যঙ্গ করতে ছাড়েননি—

'দুলোল হল সরকার, ওক্কুর হলো দত্ত।
আমি কিনা থাক্‌বো যে কৈবত্ত সেই কৈবত্ত।।'[৬৮]

বাঙালি বণিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী রামদুলালের বংশগত পদবি ছিল দত্ত। দরিদ্র রামদুলাল প্রথম জীবনে দশ টাকা মাসিক বেতনে মদনমোহন দত্তের অধীনে শিপ সরকারের কাজ করতেন। নিজ অধ্যবসায়ে, বুদ্ধিচাতুর্যে এবং আশ্রয়দাতা মদনমোহন দত্তের আনুকূল্যে ক্রমে স্বাধীন ব্যাবসায় নিযুক্ত হয়ে তিনি ক্রোড়পতি হন। পরবর্তীকালে তিনি ফেয়ারলি কোম্পানির সরকার নিযুক্ত হন। মদনমোহন দত্তের কৃপায় রামদুলাল দে 'রামদুলাল সরকার' হিসাবে জাতে উঠে আসেন। অন্যদিকে ওক্কুর দত্ত অর্থাৎ অক্রুর দত্ত ছিলেন মলঙ্গার দত্ত বংশের আদিপুরুষ। তিনি প্রীতিরাম মাড়ের সঙ্গে ব্যাবসা করে বিত্তসম্পত্তি করেন। সম্ভবত তাঁর পদবি তথা জাত ছিল সমাজের চোখে হীন। কিন্তু কোম্পানির আমলে কমিশরিয়েটে কাজ করে তিনি প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন। বীরভূম রাজনগরের মুসলমান রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধলে অক্রুর ইংরেজ-সেনার সঙ্গে সেখানে উপস্থিত ছিলেন।[৬৯] বিনিময়ে তিনি ১৮০৯ সনের পূর্বেই কলকাতার বিমিশ্র সমাজে জাতে উঠে আসেন। অথচ অক্রুরের ব্যাবসার এককালীন সহযোগী প্রীতিরাম মাড়ের জাতে ওঠার স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়। এখানে লোককবির ব্যঙ্গের লক্ষ্য কেবল প্রীতিরাম একা নন, দুলোল তথা রামদুলাল দে সরকার এবং অক্রুর দত্ত উভয়েই একইসঙ্গে ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ। প্রচলিত সমাজবিন্যাসে নীচুতলার মানুষেরা এভাবে বিত্ত ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সমাজের উপরতলায় উঠে আসায় লোককবিরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে উচ্চশ্রেণির ব্রাহ্মণ-কায়স্থ হওয়া সত্ত্বেও বিমিশ্র নাগরিক সমাজে তাঁরা কলকে পাননি, ফলে তাঁদের কারোর কারোর এই অন্তর্দাহ বা ক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক। একইসঙ্গে কলকাতার আদিবাবুদের গোত্রান্তরের আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির ইতিহাস হিসাবেও ছড়াটি পৃথক মনোযোগের দাবি রাখে।

অন্তঃসারশূন্য-বাহ্যাড়ম্বর সর্বস্ব বাবুদের প্রতি লোকসমাজের সার্বিক মনোভাব ছিল অশ্রদ্ধার, বিরোধিতার। সমকালীন জীবনে অধিকাংশ বাবুরাই ছিলেন এই গোত্রের। বাবুয়ানা দেখাতে গিয়ে অনেকে সর্বস্বান্ত হতেন, তবুও বাইরে ঠাটবাট বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। হুতোম বলেছেন, 'বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন সং বড় চমৎকার!— বাবুর ট্যাসল দেওয়া টুপি, পাইনাপেলের চাপকান, পেটি ও সিল্‌কের রুমাল, গলায় চুলের গার্ড্‌চেন অথচ থাকবার ঘর নাই মাসীর বাড়ী অন্ন লুসেন, ঠাকুরবাড়ী

শোন, আর সেনেদের বাড়ী বসবার আড্ডা। পেট ভরে জল খাবার পয়সা নাই, অথচ দেশের রিফরমেসনের জন্য রাত্তিরে ঘুম হয় না। (মসারির অভাবও ঘুম না হবার একটি প্রধান কারণ) পুলিস্, বড় আদালত, টালার নিলেম, ছোট আদালতে দিনের ব্যালা ঘুরে বেড়ান, সন্ধ্যেব্যালা ব্রহ্মসভায় মিটিং ও ক্লবে হাঁফ ছাড়েন — গোয়েন্দাগিরী, দালালী, খোসামুদী ও ঠিকে রাইটরী করে যা পান, ট্যাসলওয়ালা টুপি ও পাইনাপেলের চাপকান রিপু কত্তে ও জুতো বুরুসেই সব ফুরিয়ে যায়! সুতরাং মিনি মাইনের স্কুল মাষ্টারী কখন কখন স্বীকার কত্তে হয়!'[৭০] সাধারণ লোকসমাজ এইসব ভড়ং সর্বস্ব বাবুদের প্রতি তীব্র ধিক্কার জানিয়ে জন্ম দিয়েছে একাধিক প্রবাদের। যেমন— 'উপরে বাবুয়ানা, ভেতরে খড়ের বেনা,[৭১] 'ঘরে নাই সম্ভাবনা, বাহিরে তাই বাবুয়ানা',[৭২] 'ঘরে নাই ভাত, কোঁচা তিন হাত',[৭৩] 'ঘরে নাই অষ্টরম্ভা, বাহিরেতে কোঁচা লম্বা'[৭৪] ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে, এই লোকপ্রবাদগুলি কোনো একক সময়ে সৃষ্টি হয়নি; আদিবাবু থেকে উনিশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাবুদের নানান রূপ-রূপান্তর ঘটলেও কিছু কিছু অন্তর্গত স্বভাব ছিল অপরিবর্তনীয়। আলোচ্য লোকপ্রবাদগুলি ফলে ধরতে চেয়েছে বাবুদের সেই অপরিবর্তনীয় কিছু চরিত্রধর্মকে, সময়ের সীমা পার করেও যা ছিল সাধারণভাবে অটুট। বাবুদের মধ্যে এমন স্বভাবের ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু সংখ্যায় তা নগণ্য। তাছাড়া বাবু-বিষয়ক লোককবিদের ছড়াগুলির মূল মেজাজ ছিল ব্যঙ্গের, লোকপ্রবাদগুলিও তার ব্যতিক্রম নয়। ফলে যেসব বাবুরা ছিলেন শ্রদ্ধার্হ, লোককবিরা তাঁদের প্রতি বিনম্র প্রণতি জানিয়েছেন, কিন্তু ব্যঙ্গাত্মক ছড়া বা প্রবাদের বিষয় করে তোলেননি।

তবে নব্যবাবুরা যেভাবে লোককবি বা ছড়াকারের ব্যঙ্গের বিষয় হয়ে উঠেছে, আদিবাবু কিংবা নববাবুরা তেমনটি নয়। ভোগবিলাসের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি, বাহ্যাড়ম্বর প্রিয়তা, মদ্যাসক্তি কিংবা লাম্পট্য আদিবাবু-নববাবুদের সাধারণ চরিত্রধর্ম হলেও, স্বদেশের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-আচার-সংস্কারের প্রতি তাঁদের বিজাতীয় মনোভাব গড়ে ওঠেনি। লোকায়ত উৎসব-পার্বণে, দানধ্যান-ধর্মাচরণে সাধারণভাবে তাঁদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। লোকায়ত জীবনের সঙ্গেও তাঁদের গড়ে উঠেছিল নাড়ির যোগ। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হয়েছে, এঁদের জীবনাচরণে ছিল মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র ও নবাবি সংস্কৃতির অবশেষের ছায়া, ফলে লোকসমাজে এঁদের মান্যতা লাভ ঘটেছিল সহজে। যাবতীয় নঞর্থকতা সত্ত্বেও চেনা ফিউডালিজমের ছকে মানিয়ে নিতে অসুবিধা হয়নি কলকাতার বিমিশ্র সমাজেরও। হাটখোলার প্রসিদ্ধ বাবু মদনমোহন দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র, নববাবুদের মধ্যে সর্বোত্তম রামতনু দত্ত ওরফে তনুবাবুর যাবতীয় আড়ম্বর, ভোগোন্মত্ত জীবনযাপনও ফলে লোককবির ক্ষমাসুন্দর প্রসন্নতা লাভ করে, কারণ ব্যক্তিগত জীবনযাপনে উচ্ছৃঙ্খল-অমিতব্যয়ী তনুবাবুর দানধ্যানের হাতটিও ছিল খোলা। অতএব 'বাবু তো বাবু তনুবাবু' জাতীয় প্রবাদের[৭৫] মাধ্যমে তিনি ভূষিত হন, ছড়াকার তাঁর বাবুয়ানার আভিজাত্যের সপ্রশংস উল্লেখ করতে ছাড়েন না, বাবুগিরির শিখরস্পর্শী তনুবাবু হয়ে ওঠেন ছড়াকারের চোখে কেওকেটা একজন—

' কত শত ফেতো বাবু কলকাতা সহরে,
বাবু বটে তনু বার দত্ত বাবুর ঘরে।
গাজিপুরের গোলাপ জলে উঠানেতে ছড়া
পাইখানাতে থাকে তাঁর আতর ঘড়া ঘড়া।
ঢাকাই-এর পাড় ছিঁড়ে লাগান কোমরে,
ভয় হয়, পাছে লাগে কিংবা দাগ ধরে।

সোনার থালে সোনার বাটি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন,
রুপোর গাড়ুতে তাঁর পদ প্রক্ষালন।
দত্তবাবুর তত্ত্বকথা বড়ই চমৎকার,
কাঙালির তরে সোজা দরজা খোলা তাঁর।'[৭৬]

কিন্তু এই মুগ্ধ দৃষ্টি নব্যবাবুদের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। তার অন্যতম কারণ, নব্যবাবুরা ইংরেজিয়ানার ঝোঁকে ভাঙতে চেয়েছিলেন প্রচলিত সংস্কার-ধর্ম-জীবন; পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে স্বদেশের প্রথাবদ্ধ সামাজিক কাঠামোকে অস্বীকার করে গড়তে চেয়েছিলেন এক পাশ্চাত্যমুখী নতুন সমাজ। চিরচেনা উৎসব-পার্বণ, পূজা-আচ্চায় এঁদের বিশ্বাস ছিল না। পাদরিদের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দলে দলে সাহেব সাজা বাঙালি নব্যবাবুরা খৃষ্ঠধর্ম গ্রহণ করেছেন যে, এমনটিও নয়। নব্যবাবুদের সময় থেকেই নাগরিক জীবনে ব্যক্তিগত উদ্যোগে মন্দির প্রতিষ্ঠা কিংবা উৎসবাদি পালনের রেওয়াজ প্রায় উঠে যায়। নতুন কালের রুচি-সংস্কৃতিতে পুষ্ট নব্যবাবুরা লোকায়ত সমাজের সংস্কৃতির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। শেক্সপিয়র-মিলটনে অভ্যস্ত নব্যবাবুদের কাছে উপেক্ষিত হতে থাকে যাত্রা, কথকতা, সং আখড়াই প্রভৃতি। ফলে নব্যবাবুদের দৃষ্টিকোণকে লোককবিরা কোনোভাবেই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে পারেননি। ঈশ্বর গুপ্ত থেকে প্যারিমোহন কবিরত্ন, রূপচাঁদ পক্ষী থেকে অশ্বিনীকুমার দত্ত— তথাকথিত উচ্চশ্রেণির কবিরাও যেখানে নব্যবাবুদের থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকেছেন, সেখানে বঞ্চিত লোককবিদের ক্ষোভ যুক্তিসংগত, স্বাভাবিক। উনিশ শতকে প্রচলিত সঙের ছড়া ও গানে তার একাধিক উদাহরণ মেলে,—

'একশো বছর সমান টানে,
মাতাল ছিলেন মদ্যপানে,
বিলিতী বোতলে পোরা,
গোরার চোলাই করা সে সুরা
নাম তার এডুকেসন্।
সঙ্গে সঙ্গে ছিল চাট,
পেন্ট, কোট, টাই, সার্ট,
উঠিয়ে দিয়ে পূজা-পাঠ,
ইংরিজী ঠাট, ইংরিজী নাট,
ইংরিজী ফ্যাসান্।।'[৭৭]

নব্যবাবুদের দু'পাতা ইংরেজি পড়ে, কোট-প্যান্টের সাহেবিয়ানা শিখে সভা-সমিতিতে রাজা-উজির মারেন, সাহেবদের মুখে 'ইম্পুডেন্ট ড্যাম, নিগার নিক্— কিক্ হিম্ আউট' শুনেও তাদের প্রতি অচলা ভক্তিতে অটুট থাকেন, দেশোদ্ধারের ব্রত নেন, জাতীয়তাবাদের কথা বলেন, অথচ স্বদেশের ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি কোনো কিছুর প্রতিই কোনো মোহ নেই তাঁদের,—

'এখন ''ন্যাসনাল্টি'' আর ''লিবার্টি'', কথায় কথায় কয়্!
কিন্তু কাজের্ বেলা বিজাতী চা'ল্ স্বজাত্ ঠেলা রয়্!'[৭৮]

নব্যবাবুদের বিদ্যার গর্ব-অহংকার, বক্তৃতা-প্রীতি, সমাজ-স্বদেশ শোধনের নামে ফাঁকা বুলি সব কিছুই সং-রচয়িতা বক্রবঙ্কিম দৃষ্টিতে লক্ষ করেছেন,—

'এখন, গুরু লোক্‌কে গরু ভাবে, সমাজ ঘুঘু যারা!
দুটো, বক্কিড়িতা ক'রেই ভাবে, (দেশের্) গ্যারিব্যলডি তারা!
ধরে, নাম্ পেট্রিয়ট্, কাজে প্যারট্, পেটে স্বার্থ পোরা!
বাহ্য সভ্যতার মত্ততায় মাতি, বিদ্যার গ্যাদায় ফুলিয়ে ছাতি,
কোলা ব্যাং যায় হ'তে হাতি, চাঁদ্ হতে চায় জোনাকি!
আবার, সমাজ্ শোধন আস্থা যাদের, (তাদের) গতিক্ বাতিক্ প্রায়—
কেবল, অস্বাভাবিক নূতন এনে, (সাবেক) সব্ ঘুচাতে চায়!
ফাঁপা উন্নতির্ দাস্, ভড়ং বিলাস্ (নিরেট্) দলে না মিশ্ খায়!'[৭৯]

অবশ্য, নব্যবাবুদের স্বভাবের মধ্যে গুণও কিছু ছিল। নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে সং-রচয়িতা সে-কথাও উল্লেখ করতে ভোলেন না, যার ফলে স্পষ্ট হয়ে যায়, নববাবুদের সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নব্যবাবুদের মৌল প্রভেদ,—

'দেখছি ভালর্ মধ্যে ইন্দ্রিয়-দোষ্, নাইকো আর তেমন;
এখন্, সত্য কথা কয়্ অনেকে; জ্ঞান-প্রচারেও দেয়্ মন;
আর ঐ কেঁউ-বনে আক্-জ'ন্মে ক'জন্, ক'র্চ্ছেও হিত্‌সাধ্‌ন।'[৮০]

নববাবুদের জন্য নির্দিষ্ট 'নবধা' লক্ষণের মধ্যে অনেকগুলিই নব্যবাবুদের কালে পরিত্যক্ত হয়। প্রকাশ্য 'বেশ্যাবাজি' নববাবুদের গৌরবের ঘট পূর্ণ করত, বুলবুল লড়াই, আখড়াই, হাফ আখড়াইয়ের পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকা ওড়ানো ছিল তাঁদের আভিজাত্যের অঙ্গ— নব্যবাবুদের পরিবর্তিত এবং মার্জিত রুচি এসবের থেকে স্বতন্ত্র হতে চেয়েছিল। উত্তরকালে বিলিতি কোট-প্যান্টালুনে মোড়া সাহেব-সাজা মেকি বাঙালিবাবুরা নব্যবাবু নন, কালের উপজাত ক্যারিকেচার মাত্র। উত্তরকালে বেশ্যালয়গুলি আর অর্থবান বাবুদের একচেটিয়া অভিসারের স্থান ছিল না। নানান অর্থনৈতিক কাঠামোর, নানান পেশার মানুষ যেখানে ভিড় জমাতেন, তাঁদের অধিকাংশই বাবু-গোত্রভুক্ত নন। অন্যদিকে, ব্যক্তিগত দানখয়রাত ছিল নববাবুদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য, কিন্তু বৃহত্তর সামাজিক হিতসাধন বা সংস্কারে তাঁদের ভূমিকা আশাব্যঞ্জক ছিল না। নব্যবাবুরা এ জাতীয় অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন না সাধারণত। উনিশ শতকের সামাজিক সংস্কারের ইচ্ছা ও প্রক্রিয়া তাঁদের হাত ধরেই শুরু হয়েছিল এবং উত্তরকালে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুরা নিরলস যৌথ প্রচেষ্টায় তাকে সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এঁদের প্রতি সমাজের রক্ষণশীল প্রাচীন অংশের যতই আপত্তি থাক, নব্যবাবু এবং তৎপরবর্তী বাবুরা যে সমাজ-প্রগতির অনেকাংশে কারিগর ছিলেন, এভাবেই কোনো কোনো গানে-ছড়ায় তা ধরা পড়েছে।

নব্যবাবুরা স্বদেশীয় ধর্মকর্ম-সংস্কৃতির প্রতি আস্থাশীল নয় বলে যেমন লোকায়ত সমাজের ব্যঙ্গের লক্ষ্য হয়েছেন, নববাবুদের কেউ কেউ আবার ধর্মীয় আচার-ব্যবহারের বাড়াবাড়ির জন্য কটাক্ষপাতে বিদ্ধ হয়েছেন। যেমন— আহিরীটোলার বিত্তবান বাবু নিমাইচরণ গোস্বামী। সাধারণভাবে কার্তিক মাসে শ্রীকৃষ্ণের রাস উৎসব হয় এবং সেকালের কলকাতায় এই রাসোৎসব খুব জাঁকজমকের সঙ্গে হত।

বাগবাজারের গোকুলচন্দ্র মিত্রের বাড়ির রাসোৎসবে চিৎপুর রোডে যাতায়াত করাই দুরূহ হয়ে উঠত অগণিত দর্শনার্থীদের ভিড়ে।[৮১] নিমাইচরণ গোস্বামী কার্তিক মাসে রাস না করে চৈত্র মাসে রাস উৎসবের আয়োজন করতেন, কারণ তাঁর গৃহদেবতা ছিলেন বলরাম এবং বলরামের রাসোৎসবের কাল চৈত্র মাস। রাসের জাল খাটানোর জন্য প্রাঙ্গণে অনেক উঁচু উঁচু স্তম্ভ তৈরি হত এবং ৪০-৫০টি বাঁশ একত্রে ভাড়া বেঁধে তৈরি হওয়ায় সম্ভবত প্রাঙ্গণ অন্ধকার হয়ে যেত।[৮২] অথচ পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থাও ছিল না। লোককবি নিমাইচরণ গোস্বামীর এই অবিমৃষ্যকারিতাকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন —

'জন্ম মধ্যে কর্ম্ম নিমুর চৈত্র মাসে রাস।
আলের সঙ্গে খোঁজ নাইক বোঝা বোঝা বাঁশ।।'[৮৩]

এতৎসত্ত্বেও বলরামের এই রাস সেকালের কলকাতায় জনপ্রিয় ছিল। হরিসাধন মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, (তাঁর গ্রন্থে নিমাইচরণ উল্লেখিত নিমাইচাঁদ গোস্বামী বলে) 'নিমু গোঁসাইয়ের রাস সেকালের কলিকাতায় একটা দর্শনীয় ব্যাপার ছিল। নানা দেশ হইতে দর্শকগণ এই রাস দেখিতে আসিত। চৈত্র মাসেই এই রাস হইত।'[৮৪] সাধারণ্যে অপ্রচলিত বলরামের রাস উৎসবের প্রচলন করে বাবু নিমাইচরণের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল, বাবুত্বের যশঃগৌরব তাঁর ভালোরকম জুটেছিল। তবে তনুবাবুর ক্ষেত্রে 'কাঙালির তরে সোজা দরজা খোলা' বলে ছড়াকারের যে সহানুভূতি লক্ষ করা যায়, নিমাইচরণ গোস্বামীর ক্ষেত্রে তেমনটি অনুপস্থিত। ছড়ার বয়ানেই স্পষ্ট, জন্ম অবধি নিমাইচরণের একমাত্র উল্লেখযোগ্য কাজ বলতে 'চৈত্র মাসে রাসে'র আয়োজন করা। বাবু নিমাইচরণের অন্য কোনো মহিমা থাকলে তা ছড়াকার নিশ্চয়ই উল্লেখ করতেন।

সাধারণভাবে নববাবুদের চরিত্র ভিত্তি ছিল শিথিল। আদিবাবুদের মতন এঁদের অর্থসংস্থানের জন্য পরিশ্রম করতে হয়নি; পিতৃ-পিতামহের সঞ্চয়ীকৃত অর্থের ব্যয়সাধনে এঁরা যতটা তৎপর ছিলেন, ব্যাবসাবাণিজ্য বা পরিশ্রমের দ্বারা সঞ্চয়ীকৃত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধিতে এঁদের উৎসাহ তেমন ছিল না। এঁরা ছিলেন স্বভাবতই উদারপরায়ণ, অলস, অকর্মণ্য; নৈতিক চরিত্রের দিক থেকে অধঃপতিত, এঁদের মুখ এবং মন ছিল বিপরীত। সেকালের বাইজি-বেশ্যাদের গানেও বাবুর স্বভাব-অসংগতি ও ক্ষুদ্রতা প্রকট হয়ে উঠেছে—

'তোমারে ভালো জানি হে নাগর।
কহিলে বিরস হবে সরস অন্তর॥
যেমন আপন রীতি, পরে দেখ সেই নীতি,
ধরম করম প্রতি কিছু নাহি ডর।
আগে ভালো বলো যারে, পিছে মন্দ বলো তারে,...
আদর কাজের বেলা, তার পরে অবহেলা,
জান কত খেলা দেলা, গুণের সাগর।
কথা কহ কত মতো, ভুলায়ে রাখিবে কত,
তোমার চরিত্র যত, ভারত গোচর॥'[৮৫]

এই সংগীতের ভাবে বৈষ্ণবীয় আবহ উপস্থিত, কিন্তু এর প্রকৃত লক্ষ্য 'নাগর' বাবুদের চারিত্রিক শৈথিল্য ও অসততা। এঁরা বারাঙ্গনাদের বিশ্বাসলাভে অক্ষম। সমকালীন কলকাতায় বাবুদের এ জাতীয় অনৈতিক-

শিথিল জীবনযাপন ক্রমশই ব্যাপকতা লাভ করেছিল। নববাবুদের সঙ্গে কালে তা ছিল অর্থবান বাবুদের একচেটিয়া, ক্রমশ মধ্যবিত্ত শ্রেণির বাবুদের মধ্যেও তার সম্প্রসারণ ঘটে—

'প্রেম করা হরেক রকম, দেখি আমি এই শহরে।
কেউ হাসে কেউ কেঁদে মরে, ছার পিরিতের মায়ায় পোড়ে।।
কেউ বা ট্যাঁকে পয়সা করে, কেউ বা যায় রাস্তার ধারে,
কেউ বা পয়সা খরচ করে, শেষকালে আপশোশে মরে।।...
কেউ বা দেখি সন্ধে হলে, বেড়ায় কেবল রাঁড়মহলে,
গান বাদ্য শুনতে পেলে, অমনি জানলায় উঁকি মারে।...'[৮৬]

নব্যবাবুদের কালে 'বেশ্যাবাজি' শিক্ষিত রুচির চোখে দোষাবহ বলে বিবেচিত হত বলে, বারাঙ্গনা-বিলাসের মাত্রা সাময়িক ভাবে কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল নব্যবাবুদের মধ্যে। কিন্তু ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে বাজার অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মেই এই পেশাকে নিয়ন্ত্রিত ভাবে টিকিয়ে রাখা হয়েছিল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি নব্যবাবু এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুরা বারাঙ্গনা-বিলাস থেকে সাধারণভাবে মুখ ফিরিয়ে নিলে রূপোপজীবিনী শ্রেণি নির্ভর করতে থাকেন এদেশে আগত ব্রিটিশ সৈনিক, নিম্নবর্গীয় খ্রিশ্চান এবং সাধারণ শ্রেণির দেশীয়দের উপর। বাবু শ্রেণির মধ্যে এই অভ্যাস একেবারে তিরোহিত না হলেও, তার আর শ্রেণিবিশেষে আটকে রইল না। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার স্বাস্থ্য-সচিব ফেবার-টনার, ১৮৬৮-র 'চৌদ্দ আইন' বা 'The Indian Contagious Diseases Act'- র জন্য যিনি বিখ্যাত, কলকাতার নৈতিক অবস্থা ও বারাঙ্গনা-বৃত্তির প্রসার সম্পর্কে লিখেছেন, 'No where are the lower classes of christians and Natives more debased, dissolute and unclean than in the metropolis of India. Everything about them bears the stamp of a total absence of every moral, religious and social feeling. Hence the great number of prostitutes, who not only swarm in the bye-lanes and back slums of Calcutta, but who infest our neighbourhood, and who, by their indecent conduct, scandalize the morals of the population in the midst of which they are permitted to live.'[৮৭] টনার অবশ্য যাবতীয় দায় বারাঙ্গনাদের উপর চাপিয়েছেন। কিন্তু এঁদের যাঁরা উপভোক্তা, তাঁদের নৈতিক চরিত্র যে অধঃপতিত ছিল পূর্বোক্ত গানেই তার প্রমাণ মেলে। ধনীবাবুরাও যে একেবারে সে রাস্তা পরিত্যাগ করেছিলেন, এমন তো নয়। ১৮৪৯-এর ৩০ নভেম্বর তারিখের 'সম্বাদ রসরাজ' প্রকাশিত 'কথঞ্চিৎ দালালানাং'-এর চিঠিতে জানা যায়, 'আমরা ধনী লোক সকলকে এক শুভ সমাচার দিতেছি— যাঁহারা বারবধূগণের রূপগুণ সন্ধান করিয়া বেড়ান তাঁহারা যদি টাকা ছাড়িতে পারেন তবে শৃঙ্গারবেশে প্রস্তুত হউন, ... আগামীকাল মনোমোহিনীর পুষ্পোৎসব, অপিচ নীলাম ডাকের ন্যায় ডাক হইবে, অধিক ডাকিয়া যিনি মনোমোহিনীকে পুষ্পবিবাহ করিতে পারিবেন, তিনিই কন্যারত্ন পাইবেন ...';[৮৮]— এই বিজ্ঞাপনের ভাষাই প্রমাণ করে বিত্তবান বাবুসমাজ থেকে এ অভ্যাস পুরোপুরি মুক্ত হবার নয়, হয়ওনি। তথাকথিত প্রগতিশীল, শিক্ষিত নব্যবাবুদের মধ্যে এ রোগের প্রকোপ কেমনতর ছিল, 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনে মধুসূদন তার চমৎকার পরিচয় দিয়েছেন। রাজনারায়ণ বসু যথার্থই বলেছেন যে, 'সেকালে লোকে প্রকাশ্যরূপে বেশ্যা রাখিত। বেশ্যা রাখা বাবুগিরির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত; এক্ষণে তাহা প্রচ্ছন্নভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু সেই প্রচ্ছন্নভাবে তাহা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। ... ইহা কিন্তু সভ্যতার চিহ্ন। যতই সভ্যতা বৃদ্ধি হয়,

ততই পানদোষ, লাম্পট্য ও প্রবঞ্চনা তাহার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হইতে থাকে।'[৮৯] অতএব, নতুন কালেও পানদোষ এবং বেশ্যাগমন বাবুগিরির অঙ্গ হিসাবে টিকে গেল। বারাঙ্গনাদের গানে তার স্বরূপ ও পরিণাম উঠে এসেছে বারে বারে,—

'পিরিতি সবাই করে, কেউ হাসে কেউ কেঁদে মরে।
কারো ভাগ্যে দুশো মজা, কেউ বা দাঁড়ায় রাস্তার ধারে॥
পিরিতি করে অনেক বাবু, রীতিমতো হয়ে কাবু,
খাচ্ছেন এমন হাবুডুবু, জ্যান্তে বাবু আছেন মরে॥'[৯০]

উনিশ শতকে বেশ্যা-বাইজিদের দ্বারা গীত গানে বড়ো হয়ে ওঠে নিঃসঙ্গতার হাহাকার, বাবু কর্তৃক প্রতারিত হওয়ার যন্ত্রণা। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলমে'র প্রথম অঙ্কে হংসপাদিকার গানে রাজাদের প্রণয়কে 'ভ্রমর' বৃত্তির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে; নতুন যুগের বাবুরাও সেই পথের পথিক। এক নারী থেকে আরেক নারীতে, এক বারাঙ্গনা থেকে অন্য বারাঙ্গনায় তাঁরা সর্বদাই 'মন দেওয়া-নেওয়া' করতেন। বাবুদের চরিত্রে নৈতিকতার যেমন বালাই ছিল না, তেমনি তাঁদের ভালোবাসারও কোনো স্থিরতা ছিল না। কখনো বেদনা, কখনো অভিমান, কখনো ব্যঙ্গের ঝাঁঝে বেশ্যা-বাইজিরা সেকথাই বলতে চেয়েছেন। এ.কে. রায় 'কলিকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে' জনসংখ্যা বিষয়ক পরিসংখ্যান দিতে গিয়ে ১৮৬৬ সালের হিসাব অনুযায়ী ৩,৭৭,৯৪২ জন বাসিন্দার কথা জানিয়েছেন।[৯১] স্বাস্থ্য-সচিব ফেবার-টনারের ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের প্রতিবেদনে উল্লেখিত দেহপসারিণীর সংখ্যা তিরিশ হাজারেরও বেশি।[৯২] মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি পুরুষ ধরলে সেকালের মহানগরীর বাবুবৃন্দের নৈতিক চরিত্রের আভাস পাওয়া অসম্ভব নয়। সেইসঙ্গেই মনে রাখা প্রয়োজন, এই নারীদের একটা বড়ো অংশ অভাবের তাড়নায় এই পথে এসে পড়লেও, বাকি অনেকেই এসেছিলেন অকাল বৈধব্যের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে কিংবা বর্তমান জীবন অপেক্ষা উন্নততর জীবনের আশায়। অনেক বাবুরাই সেদিন এঁদের প্রেমময়, সুখ-শান্তিময় জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘরের বার করে আনতেন। ভবানীচরণের ব্যঙ্গ-নকশাগুলিতে, 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত 'বাবুর উপাখ্যানে', উনিশ শতকের মধ্যভাগে বটতলা আলো করে রাখা ব্যঙ্গ-নকশায় ও প্রহসনে এসব চিত্র নিতান্ত সুলভ। অথচ যে বাবুরা অভাগিনীদের উন্নত জীবনের ভালোবাসার প্রলোভন দেখিয়ে ঘরের বার করতেন, তাঁরাই ভোগের তৃপ্তিশেষে এইসব রমণীদের পরিত্যাগ করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। ফলে পতিতাদের অধিকাংশ গানেই লম্পট, প্রতারক, প্রায় অধঃপতিত, ভণ্ড বাবুদের প্রতি অভিমানের ছলে তীব্র ব্যঙ্গ ঝলসে উঠেছে। তাঁদের গানগুলির আপাত বৈষ্ণবীয় ছদ্মবেশের আড়ালে নৈতিকভাবে দূষিত বাবুসমাজের ছবিই ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং উনিশ শতকের নাগরিক জীবনে 'বাবু' নামক একটি বিশেষ শ্রেণির হালহকিকতও বুঝে ওঠা সম্ভব হয়।

উনিশ শতকের পরিবর্তমান প্রেক্ষাপটে বাবুসমাজের বিচিত্র কীর্তিকলাপ নিছক বেশ্যা-বাইজি এবং লোককবিদের আরাধ্য বিষয় হয়ে থাকেনি বেশিদিন, তথাকথিত মূল ধারার সাহিত্যেও তার অনিবার্য প্রবেশ ঘটেছিল অচিরেই। মূলধারার গদ্যে-পদ্যে-আখ্যানে বাবু ও তাঁর জীবনযাপন ক্রমশই সুলভ হয়ে উঠছিল। কখনো ব্যঙ্গে, কখনো সমাজ-পরিশোধনের আকাঙ্ক্ষায়, কখনো আখ্যান-রস বিস্তারের প্রয়োজনে বাবুরা ঘন ঘন উঠে আসছিলেন এইসব সাহিত্যমাধ্যমে। এ ব্যাপারে যিনি পথিকৃৎ, তিনি হলেন

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮)। ভবানীচরণের জন্ম আদিবাবুদের কালে, তাঁর কর্ম ও অভিজ্ঞতা নববাবু ও নব্যবাবুদের কালে; যদিও রক্ষণশীল মনোভঙ্গির কারণে নব্যবাবুদের থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলেন। অন্যদিকে যে নববাবুদের তিনি ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছিলেন, চিনেছিলেন, তাঁদের যাবতীয় অমিতাচার ও অনৃতাচারের কথা বলেও দীর্ঘনিঃশ্বাস ও অশ্রুজল গোপন করেননি। গদ্যপদ্যমিশ্রিত 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫) গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক স্পষ্টই জানিয়ে দেন যে, স্বীয় সমাজের নিন্দা-মন্দ পাঠ করে বাবুরা কুপিত হতে পারেন, 'কিন্তু বিবেচনাপূর্ব্বক তাবদ্ গ্রন্থার্থাবলোকনাধীন স্বস্ব রোষদোষ বিমোচন হইবেক কারণ নববাবুবিলাসনামৈক পুস্তক বিশিষ্ট শিষ্টানুষ্ঠিত বিধিত নিত্য নৈমিত্তিক দৈব পৈতৃক কাম্যাদি ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানবিবর্জিত স্বীয় ধর্ম্মচ্যুত, অন্যধর্ম্মাশ্রিত পুরুষের বহুতর দোষশ্রুতিপুরঃসর বহুতর বেদ পুরাণাদিসম্মতপথগামী পুরুষের ছলক্রমে পুরুষার্থবোধিত প্রকাশ হইবেন।'[৯৩] নব্যবাবুদের যে ভবানীচরণ অস্বীকার করতে চেয়েছেন, তার কারণ সম্ভবত তাঁদের 'দিশি চাল ছেড়ে বিদেশি চালে'র প্রতি আসক্তি। যে পাশ্চাত্য শিক্ষার হাত ধরে নব্যবাবুরা গতানুগতিককে, প্রচলিতকে অস্বীকার করার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন, হিন্দুধর্মের মূল কাঠামো ধরে টান দিয়েছিলেন, ভবানীচরণ সেই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতিও বিরূপ। এদেশীয় সামাজিক বিন্যাস ও গড়নকে নব্যবাবুরা অঙ্গীকার করতে চাননি, কিন্তু নববাবুরা অপম্যাগমন, যবনীসংসর্গ জাতীয় 'পাপ' করা সত্ত্বেও প্রাত্যহিক সন্ধ্যা-আহ্নিক, দেবালয়-স্থাপন, বর্ণাশ্রমধর্ম স্বীকার, দেব-দ্বিজে ভক্তি তথা প্রচলিত সামাজিক গড়নকে অস্বীকার করার দুঃসাহস দেখাননি। অপরিমেয় অর্থবিত্তের কারণে এঁদের নৈতিক চরিত্র দূষিত হয়ে পড়েছিল সত্য, কিন্তু মানসিকভাবে এঁরা ছিলেন প্রচলিত হিন্দুধর্মের অনুগত। 'কলিকাতা কমলালয়ে' (১৮২৩) ভবানীচরণ স্পষ্টই বলেছেন যে,[৯৪] শহরে উপস্থিত 'স্মার্ত ভট্টাচার্য মহাশয়'দের ব্যবস্থানুযায়ী 'ভাগ্যবান্ লোকেরা' সর্বদাই দোল-দুর্গোৎসব, পুকুর বা দেবালয় প্রতিষ্ঠা, বিশেষ করে পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধের আসরে স্বজাতি জ্ঞাতি বন্ধুবর্গ পুরোহিত অধ্যাপকদের নিমন্ত্রণ করে 'দানসাগর' করে থাকেন। বহু দেব-দ্বিজ এই শ্রেণির বাবুদের অর্থে প্রতিপালিত হন। অনুমান করা অসংগত নয় যে, নববাবুদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ, অধ্যাপক, পণ্ডিত প্রমুখের এমন এক সামাজিক আদান-প্রদানের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, যা অস্বীকার করা প্রায় অসম্ভব ছিল। নব্যবাবুদের কালে এই সম্পর্ক স্বাভাবিক কারণেই বিনষ্ট হয়। পুরাতন কালের প্রতি অনুগত ভবানীচরণের পক্ষে এ কারণেই নব্যবাবুদের মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে, বাংলার সমাজভিত্তি ছিল মূলত সামন্ততান্ত্রিক এবং গ্রামীণ চরিত্রবিশিষ্ট। সেই গ্রামীণ সামাজিক কাঠামোয় সামন্তপ্রভু বা জমিদার কিংবা তৎকর্তৃক নিযুক্ত কোনো প্রশাসকই ছিলেন প্রধান। শোষক, উৎপীড়ক, চরিত্রহীন, উচ্ছৃঙ্খল হলেও উক্ত প্রশাসক বা জমিদারদের সমাজ নির্দিষ্ট স্থান ও ক্ষমতার সচরাচর বদল ঘটত না। সাধারণ মানুষ উল্লিখিত দোষ-ত্রুটিকে প্রশাসক বা জমিদারের স্বাভাবিক চরিত্র বৈশিষ্ট্য বলেই মেনে নিতেন। নিজেদের উৎপীড়ন ও শোষণের পাপস্খলনের প্রচেষ্টাতেই যেন এঁরা ধর্মীয় কৃত্যাদিতে প্রভূত ব্যয় করতেন, নানান ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের পৃষ্ঠপোষকতা করে আপাতভাবে সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করতেন। অবশ্যই এসব ছিল এঁদের গোপন স্বার্থসিদ্ধির উপায়মাত্র। তথাপি গ্রামকেন্দ্রিক বাংলার জীবনে এঁদের ভূমিকা ছিল সম্মানের, ভীতির এবং অবশ্যই প্রভুর। কলকাতার নগরজীবন গড়ে ওঠার পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসকেরা প্রভু হয়ে উঠলেও প্রজাদের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল কম। তা ছাড়া পুরাতন সামন্ততন্ত্র, আধা-ধনতন্ত্র ও আধা সামন্ততন্ত্রের রূপ নেওয়ায় ইংরেজ-শাসকের সর্বোচ্চ শাসনবিন্দুর

(বড়োলাট) সঙ্গে প্রজাদের পুরাতন রাজা-প্রজার সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। কলকাতার নাগরিক জীবনে অর্থ-বিত্ত ও ভুঁইফোঁড় কৌলীন্য কিছু ব্যক্তি অবস্থাগতিকে রাজা বা জমিদারের সমতুল্য হয়ে উঠেছিলেন। বাস্তবে এঁরা ছিলেন ইংরেজদের শোষণ-যন্ত্রের সহায়ক এবং সর্বোচ্চ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির শোষক। এঁদের জীবনযাপন, ইংরেজ শাসনযন্ত্রে কর-সংগ্রাহক হিসাবে ভূমিকা, কলকাতার নাগরিক মিশ্র সমাজব্যবস্থায় এঁদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি উনিশ শতকের প্রথম দুই দশকেও ছিল চোখে পড়ার মতো। ফলে এ'সব ধনী বাবুদের উচ্ছৃঙ্খলতা, লাম্পট্য, শোষণ, অত্যাচার, ভণ্ডমী, বৈভব প্রদর্শনের কদর্য খামখেয়াল আপাতভাবে জনসাধারণের ঔৎসুক্য ও বিশেষ চর্চার বিষয় ছিল। সমালোচনা নয়, যেন সুস্মিত প্রশ্রয়; বিবমিষা নয়, যেন সচেতন স্বীকার। কিন্তু ক্রমে বাঙালি জীবন পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চার আস্বাদ-গ্রহণে স্বাধীনচেতা হয়ে উঠে দেশীয় সেকেলে কুৎসিত রীতিনীতিকে অস্বীকার করে নব্যবাবুদের হাতে প্রগতিশীল, আধুনিক হয়ে উঠতে চাইল। ভবানীচরণের মতো পুরাতন রীতিনীতি ও সমাজকাঠামোয় অভ্যস্ত মানুষের পক্ষে আদি বা নববাবুদের ভূমিকা খর্ব হওয়া ছিল বিপদসংকেতের মতো। এর ফলে প্রচলিত সামাজিক অনুশাসন ভেঙে পড়বে, বর্ণসংকরের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠবে, জাতভিত্তিক সমাজ-কাঠামো ধূলিসাৎ হবে, ধনীবাবুদের বকলমে অনেক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে। অতএব রক্ষণশীল ভবানীচরণ নানা দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও নববাবুদের প্রশ্রয় দিয়েছেন, পাপের চিত্র অঙ্কণ করে তাঁদের সচেতন করতে চেয়েছেন, নারীদের স্বৈরিণী, কুলটা হিসাবে দোষারোপ করে নববাবুদের পাপের ভার লঘু করতে চেয়েছেন, সর্বোপরি সমালোচনা নয়, নব্যবাবুদের ধ্বংসপ্রায় ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করে অশ্রু বিসর্জন করেছেন। নববাবুদের প্রতি সমালোচনার পরিবর্তে সমবেদনা জ্ঞাপনেই ভবানীচরণের দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষত্ব তথা স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

ভবানীচরণ কথিত নববাবুর সাক্ষাৎ মেলে গদ্য-পদ্য মিশ্রিত সমাজচিত্র 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫) ও 'নববিবিবিলাসে' (১৮৩২); এবং কাব্য 'দূতীবিলাস'-এ (১৮২৫)। গ্রন্থ তিনটির মধ্যে প্রথমটিতে কেবল নববাবুকে কেন্দ্রে রেখে আখ্যান নির্মিত হয়েছে, অপর দু'খানি গ্রন্থে কামুক নববিবি ও কূলরমণীর কামলীলাজালে বদ্ধ পতঙ্গবৎ নববাবুর উপস্থিতি। পৃথক তিনটি গ্রন্থ হলেও বক্তব্য বিষয়ে এবং লক্ষ্যে তিনখানিই সমধর্মী। নববাবুর অত্যধিক রমণীপ্রীতি এবং তার পরিণামে নববিবি কিংবা কুহকী রমণীর হাতে বাবুর সর্বস্বান্ত হওয়া এবং পরিণামে আক্ষেপ ও উপদেশ দান তিনটি গ্রন্থেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য। বাবু প্রসঙ্গযুক্ত কাব্য 'দূতীবিলাস' প্রকৃতপক্ষে 'চৌর-পঞ্চাশি' কাব্যধারার অনুসরণে রচিত বাংলার 'বিদ্যাসুন্দর' আখ্যানের ছায়ায় নির্মিত। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' আখ্যানের প্রায় ষাট-সত্তর বৎসর পর উনিশ শতকীয় কলকাতার নববাবু-বিবিদের ভোগ-লালসা-রিরংসার ইতিবৃত্ত লিখতে বসেছেন ভবানীচরণ এবং তা ওই বিদ্যাসুন্দর আখ্যানেরই আদলে। এ কাব্যের পোষ্টা কমল নয়নের বেড় (পরবর্তীকালের বড়োবাজার) নিবাসী কলকাতার সুবিখ্যাত ধনী নিমাইচরণ মল্লিকের সপ্তম পুত্র স্বরূপচন্দ্র (?-১৮৪৮)। একদিন 'বাগানে' বসে 'নানা আনন্দ উৎসব' করার ফাঁকে ইনি আক্ষেপ করেন :

'মুদ্রাক্ষরে বহু গ্রন্থ প্রকাশ হইল।
কিন্তু আদিরস কাব্য দেখিতে না পাই।
যে দেখি ভারত কৃত নব্য কিছু নাই॥

এখন কতক নব্য নায়ক মজিয়া।
করে কত রস নানা নায়িকা লইয়া॥
সে রস বর্ণিলে ভাল গ্রন্থ এক হয়।
তাহারা কুকর্ম্ম ত্যাজে ইথে সুখোদয়॥'[৯৫]

স্বরূপচন্দ্রের এই আক্ষেপ, আগ্রহ ও সদিচ্ছা থেকেই 'দূতীবিলাস' রচনা। অবশ্য 'ভারত কৃত' কাব্য থেকে ভবানীচরণ বেশি কিছু 'নব্য' রস পরিবেশন করতে পেরেছেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তবে তাঁর নায়ক শ্রীদেব নাগর উনিশ শতকের নববাবুদের প্রোটোটাইপ— সাজসজ্জায় লাম্পট্যে, জীবনদর্শনে হুবহু এক। ভবানীচরণ বিস্তৃতভাবে শ্রীদেব নাগরের সাজসজ্জার বর্ণনা দিয়েছেন, যা থেকে নববাবুকে চিনে নিতে আমাদের অসুবিধা না হয়,—

'কালা কলকাদার ধুতি উত্তম ঢাকাই।
পরিয়াছে সেই বস্ত্র যার সম নাই॥
বুক মসলিন ভাল তার একলাই।
অঙ্গে সুশোভিত এক লিনুর স্রজাই॥
হীরা পান্নাদার গোটা কিনারির তাজ।
বাঁকায়ে দিয়েছে শিরে যেমত মেজাজ॥
কুটিল কুণ্ডল কাটা ঘষিয়াছে তায়।
তাহার উপরে টুপি কিবা শোভা পায়॥....
গোড় তোলা মাথা নেড়া টাটবাবি জুতা।
পদদ্বয়ে আছে তার শোভা অদ্ভুতা॥
বামহাতে ধরিয়াছে স্বর্ণ গুড়গুড়ি।
দেখি মদনেতে মজে যুবতী কি বুড়ি॥'[৯৬]

এহেন শ্রীদেব সম্ভ্রান্ত ঘরের কুলবধূ অনঙ্গমঞ্জরীকে দেখে প্রেমে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। সে প্রেম যতটা না মনের, তার চেয়েও বেশি শরীরের। দূতী মতি নাপিতিনীর কথা থেকে কলকাতার তৎকালীন অভিজাত পরিবারের অনেক গোপন অন্ধকার উঠে আসতে থাকে। অভিজাত পরিবারগুলির নৈতিক অবস্থা যে আদৌ সুস্থ ছিল না, তা বোঝা যায়, যখন মতি বলে যে, অনঙ্গমঞ্জরীর চেয়েও সুন্দরী ওমুক রায়ের 'মাগু', পালের বউ, দাসের ভগিনী,— যে কিনা 'কড়েরাঁড় তবু যেন স্থির সৌদামিনী', সুবোধ দত্তের বউ, সাহার মেয়ে যার নাম শশী,—

'এসব যুবতি মধ্যে যারে মন চায়।
এক্ষণি আনিতে পারি তোমার বাসায়॥'[৯৭]

শ্রীদেব অবশ্য অনঙ্গমঞ্জরীকেই কামনা করে। অতঃপর প্রথমে গোপী দাসীর সাহায্যে, পরে অনঙ্গমঞ্জরীর বিধবা পিসির সাহায্যে, কখনো বৈষ্ণব বাবাজীর আখড়ায়, কখনো কালীঘাটে কিংবা তারকেশ্বরে তীর্থভ্রমণচ্ছলে, কখনো-বা শখের যাত্রার আয়োজন করে নিজগৃহেই গোপনে উভয়ের অভিসার চলে।

অবশেষে মিথ্যা দৈবাদেশ ও সন্তানোৎপাদনের কথা বলে অনঙ্গমঞ্জরী স্বামীকে বাধ্য করে শ্রীদেবকে উপপতি নিযুক্ত করতে। পিসি জনৈক সুজন বাবুর প্রসঙ্গ টেনে অনঙ্গের স্বামীকে বলেছে, সুজন বাবু 'উপপতি সঙ্গে মাগু পাঠায় বাগানে', তার দ্বারাই তিন পুত্রও লাভ করেছেন তিনি। তারপরেই সার কথাটি বলে অনঙ্গের স্বামীকে আশ্বস্ত করে,—

'যখন এসব কথা হয় জানাজানি।
সে সময় লোকগুলো করে কানাকানি॥
কিছুদিন থাকে কথা শেষ কিবা রয়।
কলঙ্ক কি বশ সব কালে লোপ হয়॥'[৯৮]

লক্ষণীয়, উনিশ শতকের গোড়ার দিকেই তথাকথিত সামাজিক অনৈতিকতা ও অন্যান্য প্রয়োজনসাপেক্ষ নৈতিকতার সমর্থন খুঁজছে এবং সামাজিক কলঙ্ককে অগ্রাহ্য করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে। নববাবুদের এবং তাঁদের অন্দরমহলের অনেক অনৈতিক ও অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম যেন সমাজের চোখে মান্যতা পেয়ে যায়, যেমনটি পেয়েছিল সেদিনও। বিখ্যাত 'কালীপ্রসাদী হাঙ্গামা' এবং অর্থের জোরে বাবুর সামাজিক পুনঃপ্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত আবারও মনে করা যায়। এমন উদাহরণ নববাবুদের জীবনযাত্রায় নিশ্চয়ই দুর্লভ ছিল না। যদিও শেষপর্যন্ত যাবতীয় অনৈতিকতা ও অন্যায্য 'যৌনতার অবাধ নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই ঘুরপাক খায়, তবুও অবাধ যৌনতার এই যাপনচিত্র তো ভারতচন্দ্রের বিদ্যা-সুন্দরের পক্ষেও কল্পনা করা অসম্ভব ছিল। সুন্দর বিদ্যাকে দেখে রূপোন্মত্ত হয়েছিল, পরে উভয়ের শৃঙ্গার কৌশলে বিদ্যার গর্ভসঞ্চার হয়। কিন্তু বিদ্যা বিবাহিতা কুলরমণী নয়, ষোড়শী কন্যা; সুন্দর ও অভিজাত ঘরের যুবক, বয়সে তরুণ। অতএব তাদের প্রণয় সাধারণ সামাজিক দৃষ্টিসাপেক্ষে নিন্দাজনক হলে অনৈতিক বা অন্যায্য নয়। সুন্দর এবং বিদ্যার প্রেম একনিষ্ঠ। সুন্দর কেবল অভিজাত ঘরের যুবক নয়, তার প্রকৃত আভিজাত্য তার মনে। বিদ্যা ছাড়া আর কোনো রমণীর সঙ্গেই সে কামমিলনে রত হয়নি, সেরূপ রতিপ্রবৃত্তির কোনো লক্ষণ অন্তত কাব্যে মেলে না। বিদ্যাও নিঃশর্ত প্রেমিকা। প্রেমাস্পদের ভালোবাসাই তার একমাত্র কাম্য। কিন্তু মাত্র সত্তর বৎসরের এদিক-ওদিকেই নববাবুদের বাহ্যিক অর্থভিত্তিক আভিজাত্য বজায় থাকলেও, তাঁদের মননগত আভিজাত্য যে নিঃশেষিত, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ— শ্রীদেব নাগর এবং অনঙ্গমঞ্জরী।

শ্রীদেব অনঙ্গমঞ্জরীর সঙ্গে যাবতীয় রতিরঙ্গে মত্ত থাকাকালীনই অনঙ্গমঞ্জরীর দাসী গোপীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে, এমনকী সম্পর্কে মাতৃসমা অনঙ্গের পিসির সঙ্গেও 'মত্ত হয়ে গিয়ে মধু নাহি বিবেচনা'। সুন্দর শেষপর্যন্ত প্রেমিক, শ্রীদেব কামুক। যৌনতার এরূপ অবাধ ও অনৈতিক প্রবাহে অবগাহন করতে শ্রীদেবের মনে দ্বিধা জাগেনি, রতিশেষেও কোনো অনুশোচনা বা অনঙ্গমঞ্জরীর প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের বেদনাতেও তাকে মথিত হতে দেখি না আমরা। নববাবুদের এ প্রকার হৃদয়হীন দেহসর্বস্ব চেতনার সঙ্গে আমাদের স্বতোৎসার বেদনাবোধের মিলমিশে কোথাও যেন বাধা জাগে। ফলে, ক্রমশ যখন অনঙ্গমঞ্জরীর চাহিদা বাড়তে থাকে এবং সে চাহিদা মেটাতে গিয়ে শ্রীদেবের তালুক পর্যন্ত বিক্রি হয়ে যায়, তখন ভবানীচরণ যতই বিষণ্ণ বোধ করুন না কেন, আমাদের সহানুভূতি জাগে না। লক্ষ টাকার জড়োয়া গয়না, বাউটী না দিতে পারায় অনঙ্গমঞ্জরী যখন সোজাসাপটা ভাষায় তাকে বলে, —

'শুনেছিনু বড় লোক বড় জাঁকজোক।
হইল বিস্তর লাভ পেনু রোক থোক॥

কুলবতী সাথে প্রেম করা বড় দায়।
তখনি তা দিতে হয় যখন যা চায়॥
কেন বল দেখি থাকি তোমার সহিত।
নিজপতি আছে তারে করিয়া বঞ্চিত॥
তুমি যদি অদ্যাবধি আশা ছাড় মোর।
তবে স্বামী কাছে বলি কত করি জোর॥
অতএব স্পষ্ট কথা শুন বলি ভাই।
তোমার আসার হেথা লাভ কিছু নাই॥
অনেক দিনের প্রীতি তোমার সহিতে।
কি কব তোমারে আর পারি না রাখিতে॥'[৯৯]

তখন শ্রীদেবের দীর্ঘ বিলাপ ও অনুশোচনার বাড়াবাড়ি আমাদের মনে সহানুভূতির উদ্রেক করে না। অনঙ্গমঞ্জরীও যে প্রেমের অপেক্ষা আর্থিক উপযোগিতাবাদকেই প্রাধান্য দিয়েছে, তার মধ্যেও বদলে যাওয়া কালধর্মের ইঙ্গিত। নিছক আবেগতাড়িত আসঙ্গলিপ্সায় আর মন নেই নায়িকারও, অতএব টাকাকড়ি, গয়নাগাটি যা পেরেছে অনঙ্গ আদায় করে নিয়েছে শ্রীদেবের কাছ থেকে। কিন্তু ভবানীচরণ নববাবু শ্রীদেবকে যতই ধোওয়া তুলসীপাতা প্রমাণ করার চেষ্টা করুন না কেন, শ্রীদেবের কর্মকাণ্ড তার বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। বেকায়দায় পড়ে নববাবুটি যাবতীয় অনৈতিকতার দোষ নববিবির উপরেই চাপাতে চেয়েছে—

'দেখিয়া সামান্যা এক জঘন্যা যুবতী।
তখনি পাপিষ্ঠ মনে হৈল ইচ্ছা রতি॥...
সে বাসনা পূরণ হেতু যত ছিল ধন।
পাপীয়সী মিলে জুলে করিল হরণ॥....
আমার সঙ্গতি নাই বিশেষ বুঝিল।
পর দিন দ্বারে দ্বারী ছেড়ে নাহি দিল॥'[১০০]

যে নায়িকাকে দেখে নায়ক নববাবুটির একদিন মনে হয়েছিল, 'তড়িৎ কি তারা বা কনকলতা চয়', তাকেই আজ 'সামান্যা এক জঘন্যা যুবতী', 'পাপীয়সী', 'অধমা নায়িকা' মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। অনৈতিক-অন্যায্য যা কিছুর দায় বেকায়দায় পড়লেই নারীর উপর চাপানো পুরুষতন্ত্রের একটি চেনা ছক, অতএব শ্রীদেবের ভূমিকা সমর্থনযোগ্য না হলেও, অস্বাভাবিক কিছু নয়। উপরন্তু, এই সুযোগে পোষ্টা নববাবুর প্রীতি উৎপাদন করতে লেখক যাবতীয় দোষ স্খলন করে, প্রকারান্তরে নববাবুর পক্ষ সমর্থন করে তাকে পাঠান অরণ্যে, ধর্মের আশ্রয়ে,—

'যাহা চাবে তাহা পাবে বিপিনে বসিয়া।
চিন্তামণি চিন্তাকর দিবেন আনিয়া॥'[১০১]

কিন্তু এক নিমেষে এইরূপ বিশ্বাসে রিপুতাড়িত নববাবুটির 'ছাড়িয়া সংসার সুখ সব অভিলাষ' ধর্মপুর নামক বনে গমন যেমন অবাস্তব, তেমনি হাস্যকর। এর চেয়ে বরং 'নববাবুবিলাসে'র নববাবুটি খলিফার উপর 'অনেক' দোষারোপ করেও নিজের দিকেও অঙ্গুলী নির্দেশ করতে ভোলেনি,—

'মতি ছিল নিরন্তর কুকর্ম্মেতে আশা।
কুকর্ম্ম করিয়া আমার এই দেখ দশা॥
অন্ন বস্ত্র অভাবে নিজ পরিবার।
শ্রীভষ্ট হইল আর অস্থিচর্ম্ম সার॥'[১০২]

সম্ভবত, 'নববাবুবিলাস' রচনার পিছনে 'দূতীবিলাসে'র মতো পোষ্টার আদেশ ও সমর্থন ছিল না বলে, সমাজ সংশোধনের ব্যক্তিগত নৈতিক ইচ্ছায় এবং নববাবুদের প্রতি স্বাভাবিক সমবেদনার কারণে সেখানে নববাবুর জন্য কোনো বনবাসের আয়োজন করতে হয়নি তাঁকে। তবে 'নববাবুবিলাসে'ও তিনি নববাবুর বিবিটিকে স্বৈরিণী হিসাবেই চিত্রিত করেন। রক্ষণশীল ভবানীচরণের এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচীনপন্থী, রক্ষণশীল কলকাতাস্থ হিন্দু সমাজেরই প্রতিনিধিত্ব করেছে। শ্রীদেবের মতো নববাবুরা অবশ্য অর্থের বিনিময়ে একাধিক নারীগমন করলেও সমবেদনাপূর্ণ ভর্ৎসনাই পেয়ে থাকে।

আসলে, ভবানীচরণ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, রক্ষণশীলতার ধুয়া তুলে যতই তাঁরা কালের গতি রুদ্ধ করার চেষ্টা করুন না কেন, নববাবুদের যুগ আর ফিরে আসবে না। তখন পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে আভিজাত্য আর লক্ষ্মীর সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে চাইছে না, তার টান সরস্বতীর দিকে। শুধুমাত্র শিক্ষাদীক্ষা, পাশ্চাত্য জীবনযাপনের অনুকরণের মধ্য দিয়ে তথাকথিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকেও জন্ম হচ্ছে নতুন কালের অভিজাত নব্যবাবুদের। নববাবুদের সচেতন করে তাদের টিকে থাকার ব্যাপারটি নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন সম্ভবত ভবানীচরণ। ভারতচন্দ্র থেকে আলাদা হতে চেয়েছিলেন তিনি। লিখতে চেয়েছিলেন একালের সুন্দরদের কথা। উপনিবেশের নতুন রাজধানী 'স্বর্গের জ্যেষ্ঠ সহোদর' কলকাতায় সেদিন অনেক সুন্দর থুড়ি শ্রীদেব। নতুন যুগের সুন্দরেরা ভালোবাসার নয়, কামনায় উদ্‌বেল হয়; কালিকার স্তব অপেক্ষা কূটবুদ্ধি প্রয়োগে মুক্তির উপায় খোঁজে। নারীবেশে চৌকিদারের হাতে ধরা পড়লে শ্রীদেব তাই উৎকোচ দিয়ে ত্রাণ পাবার উপায় খোঁজে। লক্ষণীয়, সুন্দরের দেব-দ্বিজে ভক্তি ছিল, ভবানী বা কালিকার পূজা সে করেছে আন্তরিক ভক্তিবশতই। কিন্তু শ্রীদেবের মতো নববাবুদের মধ্যে থেকে দেব-দ্বিজে ভক্তি বা বিশ্বাসের চিহ্নমাত্র মেলে না। অনঙ্গের সঙ্গে প্রথমে বৈষ্ণবের আখড়ায় বৈষ্ণবের ভেক ধরে, কালীঘাট ও তারকেশ্বরে তীর্থ করতে যাবার ছলে কামোন্মত্ত নববাবুদের যে চিত্র তুলে ধরেন ভবানীচরণ থেকে ভুবনচন্দ্র, তাতে বোঝা হয় নববাবুদের ধর্মকর্মে আস্থা বা দুর্বলতা আদৌ নেই। থাকলে, নববাবুরা ধর্মকর্মকে গৌণমাত্র ভেবে, তুচ্ছ জ্ঞান করে ব্যক্তিগত ভোগলিপ্সায় রত হতেন না। আসলে নির্মোহ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে 'কলিকাতা কমলালয়ে'র প্রশ্নচ্ছলে ভবানীচরণ সারসত্যটা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'কলিকাতার অধিক লোক কর্ম্মকাণ্ড ও সন্ধ্যা বন্দনাদি পরিত্যাগ করিয়াছে এবং আহার পরিচ্ছেদেরও বিবেচনা নাই; যাহাতে সুখানুভব হয় তাহাই করেন।'[১০৩] শ্রীদেবের মতো নববাবুরা ঠিক এমনটিই করেছে। রক্ষণশীল হিন্দু নাগরিক সমাজ ধর্ম-জ্ঞানরহিত আচরণকে সমর্থন না জানালেও, শ্রেণিস্বার্থেই শ্রীদেবের মতো নববাবুদের পক্ষপাতিত্ব করেছেন। সে পক্ষপাত 'দূতীবিলাসে'র অন্ত্যভাগে প্রত্যক্ষ স্পষ্টতায় চিহ্নিত। তবে শেষভাগে পৌঁছে শ্রীদেবের আকস্মিক চৈতন্যোদয়ের কথাটি ছাড়া ভবানীচরণ বাস্তবতার প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছেন। 'দূতীবিলাস' একইসঙ্গে নববাবুদের দ্বিধাহীন লাম্পট্যের তথা উনিশ শতকের অভিজাত-বৃত্তে বদলে যাওয়া যৌনতার এক নিখুঁত ডিসকোর্স। রক্ষণশীল বাবুদের দল এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রসপুষ্ট মোসাহেবদের দল ব্যতীত কলকাতার নতুন অভিজাত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত নব্যবাবুরা লাম্পট্যের,

যৌনতার আকণ্ঠ পঙ্কে মজ্জমান নববাবুদের প্রতি ঘৃণাই পোষণ করেছেন। সমাজতাত্ত্বিকের মত যথার্থ, 'বিত্ত ও বিদ্যার জোরে এবং মুখ্যত বিদ্যার বলে বিত্ত অর্জনের জোরে যাঁরা সমাজের উঁচুতে উঠেছেন, তাঁরা শতবর্ষের পুরনো প্রথাগত সাম্মানিক কৌলীন্যের উপাধি বাবু আখ্যায় ভূষিত হলেও, বাবুত্বের মোহ থেকে বহুলাংশে মুক্ত। শিক্ষিত সমাজে বাবুর কৌলীন্য নষ্ট প্রায়, বাবু ক্রমশ উপহাসিত, নিন্দিত ও অতি অবজ্ঞেয় পাত্র।'[১০৪] বাবুর কৌলীন্য খুব দ্রুত বিনষ্ট না হলেও, বিনষ্টির সূচনাতেই 'দূতীবিলাস' রচিত হয়েছিল। এক হিসাবে ভবানীচরণের 'দূতীবিলাস' উনিশ শতকের নববাবুদের আত্মধ্বংসের প্রাক্মুহূর্তে লেখা করুণ এপিটাফ।

ভবানীচরণের উপলক্ষ্য ছিল বিগতকাল নববাবুদের বিলাপগাথা রচনা, আর তাঁরই উত্তরসাধক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) নিজ লেখনীর অভিমুখ নির্দিষ্ট করলেন নব্যবাবুদের চিতাশয্যা রচনায়। পূর্বসূরির সঙ্গে উত্তরসাধকের মিল ও অমিল দুই-ই ছিল। ভবানীচরণের মতনই ঈশ্বর গুপ্ত জন্মসূত্রে কলকাতার সহচারী নন, জীবন ও জীবিকাসূত্রে কলকাতার সহধ্যায়ী। মাতৃবিয়োগের পর হুগলি জেলার কাঁচড়াপাড়ার স্বীয় জন্মভূমি ছেড়ে ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বর গুপ্তের কলকাতায় আগমন। সে সময় কবির বয়স দশ বছর। মাতুলালয়ে থাকার সুবাদে পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ গড়ে ওঠে। বিশেষ করে, গোপীমোহন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের সখ্যতা জন্মায়। যোগেন্দ্রমোহন ঈশ্বর গুপ্তের সমানবয়সি ছিলেন।[১০৫] এই অকাল প্রয়াত যোগেন্দ্রমোহনের আনুকূল্যেই চোরবাগানের একটি মুদ্রাযন্ত্র ভাড়া নিয়ে ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘ (১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি) সাপ্তাহিক 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশিত হয়। নবকবি-সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তের বয়স তখন উনিশ-বিশ। সেকালের অনেক সম্ভ্রান্ত বাবু যোগেন্দ্রমোহন ও ঈশ্বর গুপ্তের এই উদ্যোগের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।[১০৬] রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, বাবু নন্দলাল ঠাকুর, বাবু চন্দ্রকুমার ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন, নীলরত্ন হালদার, বাবু ব্রজমোহন সিংহ, বাবু ধর্মদাস পালিত, বাবু শ্যামাচরণ সেন, বাবু রসিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ প্রমুখেরা ছিলেন উক্ত পোষ্টা।

ঈশ্বর গুপ্ত যে সময় কলকাতায় আসেন, সে সময়টা কলকাতার নৈতিক ও সামাজিক জীবনে এক দ্বান্দ্বিক কাল। রামমোহনের হাত ধরে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে, হিন্দু কলেজের হাত ধরে জন্ম নিচ্ছে শিক্ষিত-মার্জিত, বুদ্ধি-যুক্তিবাদী সংস্কার মুক্ত নব্যবাবুদের দল, ডিরোজিও শিষ্যরা গুরুর হাত ধরে সাজঘরে প্রস্তুতি নিচ্ছেন, ইংরেজিয়ানার প্রকাশ্য স্রোতে ভাসতে উদ্যত নব্যযুবকের দল, সেইসঙ্গেই নববাবুদের সৌভাগ্যসূর্যও অস্তমিত। বুলবুল-লড়াই, বাইজি-বিলাস, রক্ষিতা-রক্ষণ, অমিতব্যয় ও অনর্থক দেখানেপনার ভাণ্ডার দেউলিয়া হয়ে পড়েছে অতএব। কবির দল বিদায় নিয়েছেন, আখড়াইয়ের আঁচও নিভু নিভু। নতুন কালের রুচি, আভিজাত্য নব্যবাবুদের হাত ধরে এক নতুন ভাবনার দীক্ষায় সংজ্ঞায়িত। পরবর্তীকালে যাঁরা 'ইয়ং বেঙ্গল' হিসাবে স্বীকৃত, তাঁদের অনেকেই— কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫), রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-১৮৫৮), রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৫-১৮৭০), রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮) প্রমুখেরা রুচি, মানসিকতা ও সমাজ বদলের মন্ত্র আয়ত্ত করছেন এই সময় পাশ্চাত্য শিক্ষার মারফত। ঈশ্বর গুপ্ত এঁদের সমসাময়িক হয়েও ইংরেজি শিক্ষার দিকে ঝুঁকলেন না, পড়াশোনায় নিতান্ত অমনোযোগী হয়েও সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ও প্রাচীন কাব্য আত্মস্থ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করেছেন যে, 'তিনি সুশিক্ষিত হইলে, তাঁহার যে প্রতিভা ছিল, তাহার বিহিত প্রয়োগ হইলে, তাঁহার কবিত্ব, কার্য এবং সমাজের উপর আধিপত্য অনেক বেশী

হইত।... তাঁহার রচনায় দুইটি অভাব দেখিয়া বড়ো দুঃখ হয়— মার্জিত রুচির অভাব, এবং উচ্চ লক্ষ্যের অভাব। অনেকটাই ইয়ারকি।'[১০৭] কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের রুচি এবং লক্ষ্য সম্পর্কে বঙ্কিমের এই আক্ষেপোক্তির সত্যতা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। মনে রাখতে হবে, তাঁর রচনার সিংহভাগ সংবাদপত্রের সংবাদ মাত্র, কেবল ছন্দে ঢালা এবং সাংবাদিকসুলভ দ্রষ্টার ভূমিকায় যাঁকে অবতীর্ণ হতে হয়, তাঁর রচনায় প্রচলিত কাব্যগুণ না থাকাই স্বাভাবিক। বঙ্কিমের মতে যা 'মার্জিত রুচি', তা পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল। বঙ্কিম স্বয়ং নব্যবাবু পরবর্তী বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের গোত্রভুক্ত; অতএব পাশ্চাত্য শিক্ষার তথাকথিত আলোকদর্শনের ফলস্বরূপ ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে বিশেষ 'মার্জিত রুচি'র অভাব তিনি বোধ করতেই পারেন, (যদিও সমকালীন বটতলা সাহিত্য কিংবা কবিয়ালদের গানের ভাষা ও রুচি মনে রাখলে ঈশ্বর গুপ্ত নির্দোষ প্রতিপন্ন হবেন), নতুন সাহিত্যরুচির নিরিখে তাঁর মনে হতেই পারে, 'দেস্‌দিমোনা আলেখ্য অধিকতর প্রজ্বল বলিয়া দেস্‌দিমোনার কাছে শকুন্তলা দাঁড়াইতে পারে না',[১০৮] কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের রচনার কোনো 'উচ্চ লক্ষ্য' নেই, এমন মনে করা শুধু অসংগত নয়, অনৃতভাষণও বটে। 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' শীর্ষক রচনায় বঙ্কিম স্বয়ং বলেছিলেন যে, 'যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।'[১০৯] ঈশ্বর গুপ্ত 'দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধনে'র জন্যই কলম ধরেছিলেন, নিছক সৌন্দর্যসৃষ্টি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। মনে রাখা প্রয়োজন, ভবানীচরণের মতো তিনি নববাবুদের কাল বিগত বলে বিলোপ করেননি, বিকৃত বাবুয়ানির প্রতি তাঁর সমর্থন কোনো স্থলেই প্রকাশ পায়নি, স্ত্রীশিক্ষা বা স্ত্রী-স্বাধীনতার নামে নব্যবাবুদের বাড়াবাড়ি রকম লোক দেখানো প্রগতিশীলতাকে সমর্থন না করলেও শেষপর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ উদার মত জ্ঞাপন করতে দ্বিধাবোধ করেননি।[১১০] আধুনিকতার তিনি বিরোধী ছিলেন না বলেই মনে হয়, কিন্তু যে শিক্ষা, যে রুচি স্বদেশীয় ভাষা-শিল্প-সংস্কৃতিকে ভুলিয়ে দিয়ে পাশ্চাত্যের নকল করতে শেখায় কিন্তু স্বদেশীয় ঐতিহ্যকে নস্যাৎ করে 'বিদেশীয়' হয়ে উঠতে চায়, তার বিরুদ্ধে তিনি খড়্গাহস্ত। 'মেকি'র প্রতি তাঁর এই বিরূপতা অবশ্য বঙ্কিম অস্বীকার করেননি, বলেছেন, 'ঈশ্বরচন্দ্রের এই মহৎ গুণ ছিল যে, তিনি খাঁটি জিনিষ বড় ভালোবাসিতেন, মেকির বড় শত্রু।... সকল রকম মেকির উপর তিনি গালি বর্ষণ করিতেছেন— গবর্নর জেনারেল হইতে কলকাতার মুটে পর্যন্ত কাহারও মাফ নাই।'[১১১] অতএব মেকি নববাবু কিংবা নব্যবাবুদেরও তিনি রেয়াত করেননি।

নব্যবাবুদের 'মেকিত্বে'র প্রতি ঈশ্বর গুপ্তের যেমন ক্রোধ ছিল, আদি ও নববাবুদের প্রতিও তেমনি তিনি সহানুভূতি শূন্য ছিলেন, পূর্বজ ভবানীচরণের ন্যায় বিগতকাল বাবুদের জন্য তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করেননি। তা সম্ভবও ছিল না। ভবানীচরণের সঙ্গে গুপ্তকবির সামাজিক অবস্থানগত প্রভেদ ছিল লক্ষণীয়। প্রথম যৌবনে ডকেট কোম্পানির সরকারি কাজে নিযুক্ত 'বাবু ভবানীচরণ' ধাপে ধাপে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম-এর মেজর জেনারেল কার সাহেবের মুতসুদ্দি, কলকাতা পারমিটের দারোগা, নিমক মহালের সেরেস্তাদার, পরিশেষে ট্যাক্স অফিসের দেওয়ানি পদ লাভ করেন। আদি ও নববাবুদের বৃহদংশই ঠিক এভাবেই বিত্তসম্পদের চূড়ায় উঠেছিলেন, হুতোম তাঁর ঐতিহাসিক নকশার সূচনাতেই একথা জানিয়ে দিয়েছেন : 'আমাদের বাবুর প্রপিতামহ নিমকের দাওয়ান ছিলেন, সেকালে নিমকির দাওয়ানিতে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় ছিল; সুতরাং বাবুর প্রপিতামহ পাঁচ বৎসর কর্ম্ম করে মৃত্যুকালে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা রেখে যান— সেই অবধি বাবুরা বনেদি বড় মানুষ হয়ে পড়েন।'[১১২] ভবানীচরণের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত রচনা করেন, উক্ত পুস্তিকায় ভবানীচরণের প্রাত্যহিক কর্মের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন : 'তিনি প্রত্যহ প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করত প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাধানান্তে তৈল গ্রহণ সময়ে সমাগত পরিচিতা পরিচিত শিষ্ট সাম্প্রদায়িক জনগণের সহিত ইষ্ট মিষ্টালাপ করত স্নান তর্পণ, দেব পূজনাদি নিত্য কর্ম্মাবসানে ভোজনোত্তর বিষয় কার্য্য পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন,... অপরিচিত দীনজনেরা ও তাপিত লোকেরা তাঁহার প্রিয়ালাপে শীতল হইত, তিনি পণ্ডিতগণকে লইয়া মধ্যে মধ্যে শাস্ত্রীয়ালাপ করিতেন, এবং সর্ব্বথা অধ্যাপকগণের উপকারেচ্ছ ছিলেন, নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্ম দান দেবার্চ্চনাদিতে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল,... তিনি প্রতিদিন সায়ংসন্ধ্যার পর পুরাণ শ্রবণ পূর্ব্বক নগরীর যাবতীয় সংবাদপত্র পাঠ করিয়া রাত্রি দুই প্রহর পরে নিদ্রা যাইতেন।'[১১৩] 'কলিকাতা কমলালয়ে' বিষয়ী ভদ্রলোকের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ধনাঢ্য দেওয়ান-মুতসুদ্দির জীবনযাপনের যে বিশেষত্বের নির্দেশ করেন ভবানীচরণ, নিজে উক্ত গোত্রভুক্ত বলেই আদি ও নববাবুদের প্রসঙ্গে তাঁর হৃদয় অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে। আত্মবিনাশ কেই-বা সহ্য করতে পারে?

কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের জীবন বাল্যকাল থেকেই কষ্টের, বঞ্চনার, অপ্রাপ্তির। শৈশবে মাতুলালয় কলকাতায় আগমন এবং পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে সংযোগে তাঁর বৌদ্ধিক ও সংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ ঘটালেও, উক্ত সংযোগে তাঁর ঐহিক জীবনের কিছু সুরাহা হয়নি। কোনোরকম আর্থিক লাভের আশাও অবশ্য তিনি করেননি; তাঁর সংযোগের মুখ্য কারণ ছিল ঠাকুরবাড়ির কবিগান এবং নন্দকুমারের চিররুগ্ন পুত্র যোগেন্দ্রমোহনের সখ্য। ফলে, আদি ও নববাবুদের সহানুভূতিশীল মহৎ হৃদয় কিংবা দানখয়রাতের কোনো মহতী সৌভাগ্য তাঁর জীবনে ঘটেনি। নব্যবাবু এবং ডিরোজিও প্রসঙ্গে প্রথম পর্যায়ের 'সংবাদ প্রভাকরে' (২৮ জানুয়ারি ১৮৩১) ঈশ্বর গুপ্তের অসহিষ্ণুতা যে বিতর্কবিবাদ তৈরি করেছিল, কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে,[১১৪] গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্র এবং যোগেন্দ্রমোহনের জ্যেষ্ঠতাত, হিন্দু কলেজের অন্যতম গভর্নর চন্দ্রকুমার ঠাকুর মধ্যস্থ হয়ে সম্ভবত সেই বিবাদ মেটান এবং হয়তো-বা এর জেরেই ১৮৩২-এর জানুয়ারি মাস নাগাদ গুপ্তকবি প্রথম পর্যায়ের 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদনার দায়িত্ব ছেড়ে দেন। উত্তরকালে তাঁর গোঁড়ামি হ্রাস পেলেও, নব্যবাবুদের ভণ্ডামি, সাহেব ও খ্রিস্টধর্ম প্রীতি, স্বদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে সরে আসার চেষ্টাকে তিনি কোনোদিনও সমর্থন করেননি। প্রথম পর্যায়ে ঈশ্বর গুপ্তের গোঁড়ামি কালধর্মের ফল। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর ডিরোজিও ও নব্যবাবুদের দল প্রচলিত রীতিনীতি, ঐতিহ্য সংস্কারকে যেভাবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে শুরু করেছিলেন, তা তৎকালীন কলকাতার হিন্দুসমাজে দ্বন্দ্বের জন্ম দিয়েছিল। আধুনিকতার অর্থ কী স্বধর্মত্যাগ, এই প্রশ্নই বড়ো হয়ে উঠেছিল। ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ-প্রভাকর' উদিত হওয়ার আগেই 'সমাচার-চন্দ্রিকা' থেকে আহৃত জনৈকের পত্রে দেখা যায়, হিন্দু কলেজে শিক্ষার ফলে যুবকদের 'কিছু কালের মধ্যে বিপরীত রীতি হইতে লাগিল পরে দেশের রীত্যনুসারে আচার-ব্যবহার ও পোষাক ত্যাগ করিলেক অর্থাৎ চুল কাটা সাপাতু জুতাধারি মালাহীন স্নানবিহীন প্রাপ্তমাত্রেই ভোজন করে শুচি অশুচি দুই সমান জ্ঞান জাতীয় বিষয় অভিমানত্যাগী উপদেশ কথা হইলেই Nonsense কহে ইত্যাদি',[১১৫] কোনো নব্যবাবু আবার কালীঘাটের কালীকে প্রণাম না করে 'গুড মর্নিং ম্যাডাম' বলায় তাঁর পিতার 'জাতি মান' সব গিয়ে 'একঘরে' হতে হয়।[১১৬] অর্থাৎ নব্যবাবুদের আচার-ব্যবহারের বিসদৃশ্যতার কারণে হিন্দুসমাজেরই এক বৃহৎ অংশের ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল, এমনকী সমাজের শিক্ষিত অংশও— দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখেরা খ্রিস্টধর্মের মহিমাপ্রচার ও ধর্মান্তরিকরণ

এবং হিন্দু জাতি-সংস্কৃতির মর্যাদাহানিকর বক্তব্যের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণুতা জ্ঞাপন করছিলেন। এমতাবস্থায় ঈশ্বর গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকর'-এর মারফত আবেদন জানান হিন্দু কলেজের সদস্যদের প্রতি, 'হিন্দু কালেজের ছাত্রেরা ফিরিঙ্গির মত পরিচ্ছদ না করিতে পায় যথা ফিরিঙ্গি জুতা পায় সবচুল মাথায় খালি আঙ্গরাখা গায় মালা নাই গলায় নেচরের গুণে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় এবং দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে ইত্যাদি পরিবর্তে মাথা কামায় ফিরিঙ্গি জুতা পায় না দিতে পায় উড়ানি কিম্বা একলাই দেয় গায় মালা দেয় গলায় অস্পৃশ্য দ্রব্য না খায় তিলকসেবা করে ত্রিকচ্ছ কব্যে ধুতি পরে ঈশ্বরের গুণানুকীর্তনে সর্ব্বদাই রত হয় কাছা খুলে প্রস্রাব ত্যাগ করে জল লয় ইহা হইলে আপাততো হিন্দুর ছেলেদিগের হিন্দুর মত দেখায় নতুবা মহিষটানা ফিরিঙ্গির ছেলেদের ন্যায় পথে পথে বেড়ায় দেখে বিশিষ্ট শিষ্ট লোকের অঙ্গ জ্বলে যায়...।'[১১৭] পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুর একবার রাইটার্স বিল্ডিং-এ আগত কিছু অসামরিক ইংরেজ কর্মচারীর উৎপীড়নের হাত থেকে একটি অবলা ব্রাহ্মণী ষাঁড়কে রক্ষা করেন।[১১৮] তাঁর এই সাহসিকতা, ধর্মনিষ্ঠা ও স্বাদেশিকতার খ্যাতি ঈশ্বর গুপ্তের কানে আসাই স্বাভাবিক। অবশ্য নতুন গড়ে ওঠা কলকাতার পথে পথে সেদিন ভবঘুরে, দুর্বৃত্ত, মাতাল, লম্পট গোরাদের ভিড়ও কম ছিল না। এদের অনেকেই জাহাজ বোঝাই হয়ে ইংরেজদের নবগঠিত ঔপনিবেশিক রাজধানীতে এসে ভিড় জমিয়েছিল। সাধারণ্যে এই পথে পথে ঘুরে বেড়ানো ইংরেজদের কুপ্রভাব পড়েছিল অনুমান করা অসংগত নয়। উচ্চবর্গের অভিজাত ইংরেজরা সাধারণের কাছে সহজলভ্য ছিলেন না। তা ছাড়া সাধারণভাবে উনিশ শতকের চারের দশক থেকেই 'the upper strata of White colonial Society had adopted a more sober and disciplined lifestyle, the advnturers and nabobs of late eighteenth century were gradually replaced by a new generation of administrators of the bureaueratic type – who had been reminded during their training time and again that "the habit of control must be constant in private and public'.[১১৯] কিন্তু জাহাজের নাবিক, ভবঘুরে, চা-কর ও নীলকর সাহেব, সাধারণ ইংরেজ সৈনিক, ব্যবসায়ী— এদের জীবনাচরণের উপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। হিন্দু-মুসলিমদের ধর্মীয় সংস্কার ও নৃত্যাদির উপর আঘাত করাটা এদের কাছে আরাম ও আনন্দদায়ক মানসিক-ক্রীড়া ছিল। এদের হাত ধরেই কলকাতা সহ সারা দেশেই 'degrade the British character by drunkerness, misconduct, or the frequent punishment to which they would subject themselves.'[১২০] ডিরোজিও-পন্থী নব্যবাবুরা অনেকেই পাশ্চাত্য জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি মদ্যপান, গোমাংস ভক্ষণ, খ্রিস্টধর্মের প্রতি আসক্তিবশত হিন্দু ও মুসলমানদের সংস্কার ও ধর্মীয় কৃত্যাদির উপর আঘাত করাকে ধর্মজ্ঞান বলে মনে করতেন। ডিরোজিও এবং তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্যদের প্রায় কেউই মদ্যপান ও নিষিদ্ধ খাদ্যভক্ষণ ব্যতীত জীবনাচরণ অসম্ভব জ্ঞান করতেন। উত্তরকালে কেউ কেউ পরিবর্তিত হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের জীবৎকালে এই পরিবর্তন দেখা দেয়নি। সাধারণ ইংরেজদের অসদাচরণকে যেমন সাধারণ হিন্দুসমাজ ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করেছিল, নব্যবাবুদের বিসদৃশ জীবনাচরণকেও তেমনি তারা বিদ্ধ করতে ছাড়েনি। ডিরোজিওর অন্যতম প্রধান শিষ্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫)-এর জীবনযাপনে দেশীয় সমাজ যেমন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। ১৮৩০ সালে আলেকজান্দার ডফ্ এদেশে এলে তাঁর সান্নিধ্যে কৃষ্ণমোহন খ্রিস্টধর্মের প্রতি অনুরাগবশত অখাদ্য-ভক্ষণ এবং হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করতে থাকেন। ১৮৩১ সালে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর 'রিফরমার' (Reformer) নামক সংবাদপত্র বের করলে, কৃষ্ণমোহন ওই বছরের মে মাসে উক্ত সংবাদপত্রের

প্রতিদ্বন্দ্বী পত্র 'Inquirer' বের করেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর সাক্ষ্য অনুযায়ী, ‘এই কাগজে তৎকালোচিত রীতি অনুসারে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের প্রতি কটুক্তি বর্ষণ করিতে ত্রুটি করিতেন না। এই হিন্দুধর্ম্ম হিন্দুজাতি বিদ্বেষ তাঁহার অন্তরে বহুদিন ছিল।’[১২১] ১৮৩১ সালের ২৩ আগস্ট স্বগৃহে গোমাংসভক্ষণের অপরাধে কৃষ্ণমোহন নিজগৃহ থেকে বিতাড়িত হন এবং অন্যতম ডিরোজিয়ান ও সুহৃদ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের গৃহে আশ্রয় নেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর অনুমান, দক্ষিণারঞ্জনের পিতার দ্বারা ভর্ৎসিত হয়ে কৃষ্ণমোহন অচিরেই সে স্থান ত্যাগ করেন।[১২২] যদিও, কৃষ্ণমোহন তাতে না দমে 'The Persecuted' নামে নাটক লিখে (১২ নভেম্বর, ১৮৩১) ‘চন্দ্রিকা’ সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘সম্বাদ প্রভাকর’ সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত এবং ‘রিফরমার’ সম্পাদক প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র সম্পাদক লালচাঁদ নামক চরিত্র সৃষ্টি করে তাঁদের চরিত্রহনন করেন। তাঁর নাটকে অনাচারীদের বিরুদ্ধে লালচাঁদ পত্রিকায় সত্য-মিথ্যা লিখতে নির্দেশ দিয়েছে। এর প্রতিবাদে ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর সংবাদপত্রে কৃষ্ণমোহনকে আক্রমণ করেন কুৎসিত ভাষায় : ‘বাবু কৃষ্ণা ফ্রিঙ্গি হিন্দু ইউথ নামক একখানি ক্ষুদ্র দর্গার পুষ্য পুত্র প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে পেটকো ফিরিঙ্গি কৃষ্ণা মুচি হিন্দুদিগের কি করিবেন যেহেতু তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ইনকোয়েরর পত্রেই বা এ পর্য্যন্ত কি করিলেন যে এইক্ষণে ঐ বাচ্ছা পত্র আচ্ছা হইয়া হিন্দু ধর্ম্মের হানি করিবেক...।’[১২৩] মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত ‘সমাচার দর্পণ’ নব্যবাবু তথা কৃষ্ণমোহনদের পক্ষ থেকে কটাক্ষ করতে ছাড়ল না যে, ‘রাজধানীনিবাসী লোকেদের আচারব্যবহার সকল শিথিল হইয়া গিয়াছে। এবং যাঁহারা নাস্তিক বলিয়া সংপ্রতি হিন্দুধর্ম ত্যক্ত ব্যক্তিরদিগকে তিরস্কার করেন, তাঁহারা যদি আপনাদের পরমমান্য ধর্মশাস্ত্রের দ্বারা বিচারিত হন তবে তাঁহারাই পরমদোষী হইতে পারেন।’[১২৪]

ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে তথা সাধারণ শ্রেণির সমাজের সঙ্গে নব্যবঙ্গীয় তথা নব্যবাবুদের এই বিরোধে ক্রমশ নব্যবাবুদের সাধারণ চরিত্র লক্ষণগুলিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কৃষ্ণমোহন-সুহৃদ, ডিরোজিয়ান মাধবচন্দ্র মল্লিক প্রভাকরের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে সমাচার দর্পণে (০৮.১০.১৮৩১) চিঠি লিখে জানালেন, ‘পৃথিবীর মধ্যে আমি ও আমার মিত্রেরা যদ্রূপ হিন্দুধর্ম্ম ঘৃণা করি তদ্রূপ আমদের অপর কোনো ঘৃণ্য বস্তু নাই। হিন্দুধর্ম্ম কুকর্ম্মের যদ্রূপ কারণ তদ্রূপ কুকর্ম্মের কারণ জ্ঞান করি না হিন্দুধর্ম্মের দ্বারা যদ্রূপ কুক্রিয়ায় প্রবৃত্তি হয় এমত অপর কোন বিষয়ে আমরা বোধ করি না এবং সর্বসাধারণ লোকের শান্তি ও কুশল ও সুখের হিন্দুধর্ম্মে যদ্রূপ ব্যাঘাত জন্মে তদ্রূপ অপর কোন বিষয়ে আমরা বুঝি না। এবং অযুক্তধর্ম্ম বিনাশার্থ আমারদের যে অভিপ্রায় তাহা কি ব্যঙ্গোক্তি কি তোষামোদ কি ভয় কি তাড়না কোনপ্রকারেই আমরা ত্যাগ করিব না।’[১২৫] হিন্দুধর্ম, দেশীয় রীতিনীতি কৃত্যাদির প্রতি নব্যবাবুদের দৃষ্টিভঙ্গি কীরূপ ছিল মাধবচন্দ্রের এই চিঠিই তার প্রমাণ। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের ‘আত্ম-জীবনচরিত’ থেকে জানা যায়, ‘হিন্দু কলেজের সুশিক্ষিত ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহারা এ দেশের সমাজ সংস্কার করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সুরাপান করিতেন।... হিন্দু কলেজের সুশিক্ষিত মাধবচন্দ্র মল্লিক এখানে ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন এবং আমাদের প্রতি যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। আমরা চারি পাঁচ জন আত্মীয় কখনও কখনও তাঁহার বাসায় আহারের সঙ্গে মৃদু মদিয়া পান করিতাম, এবং বড়ই সুখী হইতাম।’[১২৬] ডিরোজিও শিষ্যরা যে কেবল নিজেরাই বিলিতি অশন-ভূষণ অভ্যাস করেছিলেন তা নয়, বালক ও যুবাদের সমমনস্ক করে তোলার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোয় তাঁরা স্বদেশ ও সমাজকে তুচ্ছজ্ঞান করে পাশ্চাত্যের সমাজ ও ধর্মকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। এও তো বিপরীতপক্ষীয় এক সংস্কার। অতএব

ঈশ্বর গুপ্ত তো এর বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হবেনই। জনৈক বাবু চণ্ডীচরণ সিংহ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলে ঈশ্বর গুপ্ত তাঁকে স্বধর্মে ফিরে আসার আহ্বান জানান :[১২৭]

'তুমি ত সুবোধ চণ্ডী বৈষ্ণবের ছেলে।
কোথা যাও মনোহর মালসাভোগ ফেলে?
হিন্দু হয়ে কেন চল সাহেবের চেলে?
উদরে অসহ্য হবে মাংস মদ খেলে॥
ক্ষীর সর ননী খেয়ে বৃদ্ধি কর কায়া।
বিধর্ম-ডোবার জল খেও না হে ভায়া॥'

বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের মতো আরও অনেক বাবুই সেদিন হিঁদুয়ানির মুখে ছাই দিয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এ ব্যাপারে আলেকজান্ডার ডফ্ এবং বাবু রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকা ছিল প্রবল। কৃষ্ণমোহনের মৃত্যুর পরও তাঁর প্রতি রক্ষণশীল দেশীয় মানুষের বীতরাগ প্রকাশ পেয়েছে। অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবন' পত্রিকায় কৃষ্ণমোহনের মৃত্যুর দু'বছর পর প্রকাশিত জীবনীতে বলা হয়েছে, 'কলিকাতায় অধিক লোকে তাঁহাকে ''ঘর মজানে কৃষ্ণ'' বলিয়া ডাকিত। বালকদিগকে একবারের অধিক তাঁহার সংসর্গে দেখিলে তাহাদের বন্ধু-বান্ধবেরা সশঙ্কিত হইত। ফলেও কৃষ্ণমোহন অনেক অপরিণত বয়স্ক এবং সুকুমারমতি হিন্দু বালকের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি যে কত হিন্দু পিতামাতাকে শোক-সাগরে ডুবাইয়া তাহাদের অকাল-মৃত্যুর কারণ হইয়াছিলেন, কে তাহার সংখ্যা করিতে পারে? ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর।'[১২৮] জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র এবং প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার। প্রথমা স্ত্রী বালাসুন্দরীর (১৮৩৩-৫২) মৃত্যুর পর খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নেন পাদ্রি কৃষ্ণমোহনের কাছে (১০ জুলাই ১৮৫১)। ওই বছরেই কৃষ্ণমোহনের কন্যা কমলমণিকে বিবাহ করেন এবং ব্যারিস্টারি পড়তে ইংল্যান্ডে যান। এই ঘটনার ফলে প্রসন্নকুমার তাঁকে ত্যাজ্য করেন। ঈশ্বর গুপ্ত এসব কারণে ডফ্ এবং কৃষ্ণমোহনের মতো মিশনারি বাবুদের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নানান লেখায়। 'ছদ্ম মিশনারি' কবিতায় এই গোষ্ঠীকে আক্রমণ করে তিনি বলেছেন :[১২৯]

'মিষ্টভাষী শুভ্রকায় মিশনারি যত।
আমাদের পক্ষে তারা দয়া-ধর্ম্মহত॥
পিতার সুখের নিধি তনয়-রতন।
কিছু নাহি বুঝে তার মনের মতন॥
শূন্য কবি জননীর হৃদয় ভাণ্ডার।
হরণ করিয়া লয় সাধের কুমার॥
বাক্যের কুহক-যোগে ঈশুমন্ত্র ছেড়ে।
যুবতীর বুক চিরে পতি লয় কেড়ে॥

ইংরেজি নববর্ষ কিংবা বড়োদিন উপলক্ষ্যে বাঙালি নব্যবাবুদের সাহেবসুলভ ব্যবহারকে তিনি নিদারুণ বিদ্রূপ করেছেন। নব্যবাবুরা সেদিন সাহেবদের দেখাদেখি উইলসনের হোটেলমুখী। সেখানে সাহেব-

মেমদের গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে নানারকম শাস্ত্রবর্জিত খাদ্য এবং 'সেরি চেরি বীর ব্যান্ডি' ভক্ষণ করে নব্যবাবুরা ধরাকে সরাজ্ঞান করতেন; কবির ভাষায় :[১৩০]

'রাঙ্গামুখ দেখে বাবা টেনে লও হ্যাম।
ডোন্ট ক্যার হিন্দুয়ানী ড্যাম ড্যাম ড্যাম॥
পিঁড়ি পেতে ঝুরো লুসে মিছে ধরি নেম।
মিসে নাহি মিস খায় কিসে হবে ফেম?
সাড়ীপরা এলোচুল আমাদের মেম।
বেলাক নেটিভ লেডি শেম্ শেম্॥'

হিন্দুর ধর্মীয় সংস্কার ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষপাত তথা ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা ছিল নব্যবাবুদের স্বভাবজ বৈশিষ্ট্য। অথচ খ্রিস্টধর্মের প্রতি তাঁদের আত্যন্তিক শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম বিশ্বাস কতদূর ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। ইয়ং বেঙ্গল হিসাবে খ্যাত বাবুদের দু'একজন ব্যতীত সকলেই উত্তরকালে তাৎক্ষণিক আবেগের ঢেউ স্তিমিত হয়ে গেলে খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে 'অটুট' বন্ধন ছিন্ন করেছেন। এঁদেরই উত্তরসূরি নব্যবাবুরাও তাৎক্ষণিক হুজুগ বশত মুসলমানের দোকানের রুটি, বিস্কুট ভক্ষণ, সাহেবি হোটেলের 'বিফস্টিক' ও মদ্যপান ইত্যাদি বহিরঙ্গমূলক আচরণকেই খ্রিস্টিয়ানি ভেবে নিয়েছিলেন। রাতারাতি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করা নব্যবাবুদের ধর্মীয় বিশ্বাসের স্থিতিশীলতা বিষয়ে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'ও সন্দেহ প্রকাশ করেছে।[১৩২] রাজনারায়ণ বসু স্পষ্টই জানিয়েছেন যে,[১৩৩] ডিরোজিওর শিষ্যগণ তথা নব্যবাবুদের এইরূপ সংস্কার ছিল যে, 'মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া সুসংস্কৃত জ্ঞানালোক সম্পন্ন মনের কার্য।' তাঁরা মনে করতেন যে, 'এক এক গ্লাস মদ খাওয়া কুসংস্কারের উপর জয়লাভ করা।' ঈশ্বর গুপ্তের প্রশ্ন এই অপ্রয়োজনীয় অসংগত আচরণের প্রতি; রচিত গানে অতএব তিনি প্রশ্ন তুলেছেন,[১৩৪]

''খাবার দ্রব্য অনেক আছে,
তাই নিয়ে মা চলুক খানা।
ও মা, এমন ত নয় গরুর মাংস,
না খেলে পর প্রাণ বাঁচে না।''

তাঁর মতে, 'যত দিশী ছেলে, কোপচে উঠে, চাল, চেলেছে সাহেবানা।' ইয়ং বেঙ্গলরা তবু তো শিক্ষিত ছিলেন, কিন্তু তাঁদের দেখাদেখি কতগুলি অর্ধশিক্ষিত-অশিক্ষিত মানুষের দল কোট-বুট পরে, কিছু ইংরেজি বুলি আউরে যখন নিজেদের 'সাহেবানা' প্রমাণ করার চেষ্টা করল, ঈশ্বর গুপ্ত খড়্গহস্ত না হয়ে পারলেন না,[১৩৫]

'ছাড়েন বাঙালী দেখি বিলাতের বুলি।
''লিছু যাও কেলাম্যান নেটিব বেঙালী''॥
জুতা গোড়ে প্রাণ যায় কর হেই ডেই।
রূপী বিনা রূপীভাব কথামাত্র নেই॥
বড়দিনে বাবু সেজে কতরূপ খেই।
জাহাজ হইতে যেন নামিলেন এই॥

তেঁতুলে-বাগদী যেন ফিরিঙ্গির ঝাঁক।
বাঁচিলেক দেখিয়া তাদের ফোতো জাঁক॥'

উত্তরকালে এই de-classed নব্যবাবুরাই বটতলার প্রহসনের বিষয়বস্তু হয়েছেন, হুতোমের নকশায় দেখা দিয়েছেন, উনিশ শতকের শেষে পৌঁছে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের হাতে 'কঙ্কাবতী'র ব্যাঙসাহেবে রূপান্তরিত হয়েছেন। সেযুগে হিন্দু-সামাজিক ভেদরেখার নিম্ন কোটির বাসিন্দা অসংখ্য মানুষ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং রাতারাতি সাহেবি মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মানুষেরা। মিশ্র রক্তের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের প্রতি ব্রিটেনের খাঁটি সাহেবদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অবহেলার, ঘৃণার। ১৭৮৬ থেকে ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তৎকালীন 'বোর্ড অব ডিরেক্টরস' যেসব আদেশনামা জারি করেন অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের জন্য, তার অন্যতম ছিল 'দেশীয় ভারতীয়দের সন্তানসন্ততি'রা কোম্পানির প্রশাসন, সামরিক বা নৌবিভাগ কোনোটিতেই কোনো চাকরির সুযোগ পাবে না।'[১৩৬] অন্তত ১৮৭৬ সালে কলকাতায় অ্যাংলো ইন্ডিয়ানেরা 'ইউরোপীয় এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিবাদ গড়ে তোলার আগে পর্যন্ত এঁদের প্রতি ব্রিটিশদের দৃষ্টিভঙ্গির আদৌ বদল ঘটেনি। অথচ এইসব দেশীয় মায়ের সন্তানসন্ততিরা তাদের 'কালো' গাত্রবর্ণ নিয়েই সাহেব-সাজার সুখ অনুভব করছিলেন। হাস্যকর এই জীবনযাপন ও মানসিকতার প্রতিও ঈশ্বর গুপ্ত ব্যঙ্গবান নিক্ষেপ করতে দ্বিধা করেননি,—[১৩৭]

'পোরে ড্রেস হন ফ্রেস দেখা যায় বেড়ে।
বাঁকাভাবে কথা কন কালামুখ নেড়ে॥
পুঁইখাড়া চিঙড়ির ক'রে ভুষ্টিনাশ।
মেম সঙ্গে নানা রঙ্গে গরিমা প্রকাশ॥
চুনাগলি অধিবাস খোলার আলয়।
তাহাতেই কতরূপ আড়ম্বর হয়॥'

কিন্তু এহো বাহ্য। ঈশ্বর গুপ্তের ক্ষুরধার ব্যঙ্গ ঝলসে উঠেছে সেইসব বাহ্যিক আড়ম্বরসর্বস্ব মেকি বাবুদের প্রতি, যাঁরা ধর্মে খ্রিস্টান না হয়েও 'বড়দিন' উপলক্ষ্যে আমোদ-আহ্লাদের উদ্দেশ্যে 'সাহেব' সাজেন। এঁদের মধ্যে একদল নব্যবাবু আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল, ফলে—

'যে সকল বাঙালীর ইংলিস ফ্যাসন।
বড়দিনে তাঁহাদের সাহেব ধরণ॥
পরস্পর নিমন্ত্রণে সুখের সঞ্চার।
ইচ্ছাধীন বাগানেতে আহার-বিহার॥
বাবুগণ বাবু নন নাহি যার ফ্যালা।
চুপি চুপি বহুরূপী লুকাছুরি খ্যালা॥
দিশি সহ বিলাতীর যোগাযোগ নানা।
কতশত আয়োজন ইয়ারের খানা॥'[১৩৮]

বোঝা যায়, নববাবুদের কাল ঐতিহাসিক দৃষ্টিসাপেক্ষে বিদায় নিলেও, আসলে তা বহমান নব্যবাবুদের মধ্যে। অতএব, সেই ইয়ারদোস্ত সহ আড়ম্বর সহকারে উৎসব-পালন, সেই বাগানবাড়িতে 'ইচ্ছাধীন' আহার-বিহার আমোদপ্রমোদ, সেই নানাপ্রকার সৎ-অসৎ 'বহুরূপী লুকোচুরি খেলা', সঙ্গে দিশি-বিলিতি আসরের স্রোত। অর্থাৎ নববাবুদের যেসব 'নবধা' লক্ষণের কথা ভবানীচরণ জানিয়েছিলেন, তার কিছু কালের বিচারে পরিত্যক্ত হলেও 'চারি খ' অর্থাৎ 'খুসি খান-কী খানা খয়রাত'[১৩৯] বহাল তবিয়তে বিরাজমান। শুধু পূর্বতন দেশীয় মেজাজটি আর সংগতভাবেই এই প্রকার আনন্দে অনুপস্থিত, কেবলই 'সাহেব-ধরন'। দু'একজন ব্যতিক্রম হলেও, সাধারণভাবে নব্যবাবুদের নৈতিকতার বোধটি তেমন সুদৃঢ় ছিল না; সেইসঙ্গেই তাঁদের 'অনুকৃত' জীবনাচরণ ও ব্যবহারে স্থূলতা, তাৎক্ষণিক আবেগ ও দেখানেপনা যতটা ছিল, আন্তরিক বিশ্বাসের অভাব ছিল ততটাই। রাধানাথ শিকদার, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো দু'একজন প্রকৃত নব্যবাবু ছাড়া অনেকেই সেদিন হুজুগে 'নব্যবাবু'। নববাবুদের নৈতিক চরিত্রের মান যতই স্খলিত-দূষিত হোক না কেন, তার সঙ্গে মিশে ছিল বংশানুক্রমিক আভিজাত্য। তাঁদের খেয়ালখুশির মধ্যেও যে আভিজাত্য ঝলসে উঠত। কিন্তু নব্যবাবুদের অনেকের মধ্যেই দ্বিধা ছিল। সাহেবি আচার-আচরণে অভ্যস্ত হয়ে যাঁরা দেশীয় আচার-প্রথাকে সদম্ভে অস্বীকার করতেন, তাঁরাও প্রয়োজনে স্বধর্মে ফিরে আসতে দ্বিধা করেননি। ডিরোজিয়ান দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রথম জীবনে গোঁড়া হিন্দুধর্মদ্বেষী হয়ে ওঠেন, সেই তিনিই আবার প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হয়ে অযোধ্যায় গিয়ে টিকি রেখে 'পরম হিন্দুর ন্যায়' ব্যবহার করতেন।[১৪০] কেবল তাই নয়, অযোধ্যার এক ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে নিজ পুত্রের বিবাহও দেন। নিজেকে তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু হিসাবে জ্ঞান করতেন, রাজনারায়ণ বসু লক্ষ্ণৌতে যে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন, তিনি তার উপর কড়া নজর রাখতেন, যাতে 'ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনরূপ অহিন্দু কার্য দ্বারা' হিন্দুসংস্কার বিপন্ন না হয়ে পড়ে। অন্যতম ডিরোজিয়ান 'অগ্নিস্ফুলিঙ্গ' চারজনের অন্যতম রসিককৃষ্ণ মল্লিকও প্রথম জীবনে হিন্দুধর্ম-সংস্কার ইত্যাদিকে অস্বীকার করলেও, শেষপর্যন্ত নিজেকে 'হিন্দু' বলেই ঘোষণা করে স্বধর্ম ত্যাগ করতে অস্বীকার করেন।[১৪১] প্যারীচাঁদ মিত্র শেষ পর্যন্ত প্রচলিত হিন্দুয়ানি ও আধিভৌতিক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন।

প্রকৃত পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত 'নব্যবাবু'দেরই যখন এই অবস্থা, তখন সাহেব-সাজা নব্যবাবু কিংবা অল্পশিক্ষিত 'নব্যবাবু'দের আচরণ যে কতদূর বিসদৃশ হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। বড়োদিনের হুজুগে এঁদের মত্ততা চরমে পৌঁছোত। পাশ্চাত্যের জ্ঞানমার্গের আলোকশিখা এঁদের মনোগহনের অন্ধকারকে দূরীভূত করতে পারেনি, বরং করেছিল আরও ঘনীভূত। বস্তুত, নব্যবাবুদের এই শ্রেণির হাত ধরেই 'বাবুত্ব' ক্রমে সুলভ হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। সাধারণ মানুষ, যাঁরা সম্বৎসর অভাব-অনুযোগে থাকেন, তাঁরাও এই সময় থেকেই 'বাবু-সাজা'য় হাত পাকাতে থাকেন। গুপ্ত-কবির চোখ এড়াতে পারেননি এঁরাও; ফলে বড়োদিন উপলক্ষ্যে এঁরাও—

তেড়া হয়ে তুড়ি মারে টপ্পাগীত গেয়ে।
গোচে গাচে বাবু হয় পচা শাল চেয়ে॥
কোনরূপে পিত্তিরক্ষা এঁটো কাঁটা খেয়ে।
শুদ্ধ হন ধেনো গাঙে বেনোজলে নেয়ে॥

"এ, বি" পড়া ডবি ছেলে প্রতি ঘরে ঘরে।
সাজায়েছে গাঁদা-গাদা ডেক্‌সের উপরে॥
পড়েনি' ক উচ্চ পাঠ অল্পে মারে তুড়ি।
তাকায় ওদিকে বটে পাকায় খিচুড়ি॥'[১৪২]

উত্তরকালে হুতোম যখন মাহেশের স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে গুরুদাস গুঁইয়ের কথা শোনান, যে তিরিশ টাকা মাইনে ও দশ টাকা উপরিতে নিজের ছোটো সংসার চালাতেই গলদ্‌ঘর্ম, অথচ স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে বাবু সেজে বসেন এবং পয়সার অভাবে 'মেয়েমানুষ' জোগাড়ে ব্যর্থ হয়ে বিধবা পিসিকেই বজরায় তুলে আনে [১৪৩], তখন বোঝা যায় 'বিষবৃক্ষে ফল ফলতে' শুরু করেছে। নব্যবাবুদের বিকার এ'ভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। মনে রাখতে হবে, মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের নৈতিকতা বিষয়ে সংস্কার ও দ্বিধা এবং আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য তাঁদের 'বাবুত্বে'র অন্যতর এক পথসন্ধানে প্রাণিত করেছিল। শুরু হয়েছিল 'অকুলীন বাবুত্বে'র যুগ। দলগঠন, বাগাড়ম্বরপ্রিয়তা, অভাব-অভিযোগের প্রতিকারার্থে সাধারণ আবেদন-নিবেদনের রীতি— এ সমস্তই তাঁদের পৃথক থাকের বাবুত্বে চিহ্নিত করেছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই পুরাতন অভিজাত বিত্তবানদের অনেকেরই ক্ষয়রোগ ধরেছিল। বনেদি বাড়ির লক্ষ্মীর ঝাঁপি শূন্য হয়ে এসেছিল, কলকাতার আকাশে-বাতাসে আর টাকা উড়ছিল না, অতএব আবেদন-নিবেদনের মধ্যপন্থা গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। নানাপ্রকার 'Voluntary Association' গড়ে নিজেদের স্বার্থরক্ষা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল অতএব। কুলীন বিত্তবানদের অনেকেই জমির স্বত্বের উপর ভরসা রাখতে না পেরে চাকরিজীবী শ্রেণিতে পরিণত হয়েছিলেন। অন্যদিকে চাকরিজীবী শ্রেণির স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, জমির স্বত্ব-উপস্বত্ব কিনে জমিদার হয়ে ওঠার দিকে। এভাবেই 'Inadequacy of employment opportunities turned people to land and inadequate quantity of land turned men from landed families to the distinction between the non-landed occupational groups and lesserland-holders'.[১৪৪] পরিবর্তিত আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে গুপ্ত-কবির মতো তাঁদেরও অনেকের মনোগত বাসনা—

'যাক চাইনে বাবুয়ানা, গরিবানা খানা,
ধরি প্রাণ শুধু চেলে ডেলে।'[১৪৫]

ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটনীর 'দুধ-ভাতে'র প্রার্থনা থেকে এ-কালের বাবুরা 'ডাল-ভাতে'র আকাঙ্ক্ষায় নেমে এসেছেন দেখা যাচ্ছে আর্থিক কৌলীন্য তিরোহিত হওয়ায়, এইসব বাবুরা আর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায়ে মাতেন না, জাঁকজমক-সহকারে উৎসব-পার্বণ ও হয় না আর, অতিথিবৎসলতা আর তাঁদের চরিত্রগুণ নয়; ঈশ্বর গুপ্তের আক্ষেপ [১৪৬]—

'দয়াল বাবু কোথায় আছে,
পূরে আশা গেলে কাছে,
দয়াল নয় সব কয়াল বাবু,
হাড়ে টোকো মুখে মিঠে।'

কৌলীন্য-ভ্রষ্ট নব্যবাবুদের দ্বিচারিতার প্রতি কবি খড়্গহস্ত। তৎকালীন 'বঙ্গরাজ্যের যুবক সম্প্রদায়' প্রসঙ্গে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখেছে (০৬.০২.১২৬২ সাল),[১৪৭] 'আধুনিক যুবকদিগের মতের কিছুই স্থিরতা দেখা

যায় না, এবং দেশীয় কোন প্রকার প্রথা পরিবর্তন করিতেও সাহস নাই, শুদ্ধ মুখভারতীতে কী হইতে পারে? তাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজি শিক্ষা করিয়া ইংরাজ জাতির গুণভাগ গ্রহণ করিতে না পারিয়া কেবল দোষভাগ গ্রহণ করিয়াছেন, সাহেবি ধরন, সাহেবি কথা, সাহেবি মেজাজ পাইয়াছেন, সাহেবি আহার, বিহার, পরিচ্ছদ ভালবাসেন, কিন্তু সাহেবি বিদ্যা, সাহেবি বুদ্ধি, সাহেবি প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি সাহেবদিগের সদগুণ কিছুই প্রাপ্ত হয়েন নাই।' নব্যবাবুদের প্রতি ঈশ্বর গুপ্তের বিদ্বেষের কারণ এজন্যই। 'ঠোঁটকাটা' কবিতায় নব্যবাবুদের জবানীতে তিনি মনের ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন,[১৪৮]

'ভদ্রকুলে জন্ম লই ভদ্র নই নিজে।
যবনের সম সদা জ্ঞান করি দ্বিজে॥
ভদ্র কর্ম্ম করে কহে কিছু নাহি জানি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য কিছু নাহি মানি॥'

তাঁর দৃষ্টিতে, নব্যবাবুরা লজ্জাহীন, উচ্চ-নীচ বিচার না করে সকলকেই তুচ্ছজ্ঞান করেন; পরস্পর লাঠালাঠি করে ইয়ারদোস্তসহ জেলে যেতেও তাঁরা কুণ্ঠিত নন। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করতে তাঁদের জুড়ি মেলা ভার। তাঁদের কেবলই 'মুখেন মারিতং জগত' ভাব। এখানেই শেষ নয়,[১৪৯]—

'বয়স বাড়িছে যত পাকিতেছে কেশ।
ততই ধারণ করি নটবর বেশ॥
গোডিম ভাঙেনি যবে উঠে নাই গোঁপ।
তখন করেছি আমি পিতৃ-পিণ্ড লোপ॥
শালগ্রাম ফেলে দিয়া বেশ্যা আনি ঘরে।
ভার্য্যা তারে রেঁধে দিয়া পদ সেবা করে।
চক্ষে দেখে চুপ মেরে কাষ্ঠ হন বাবা
গো টু হেল ওল্ড ফক্স ড্যাম ড্যাম হাবা॥'

সংবাদপত্রের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ঈশ্বর গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে'র আদর্শ সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'ছাই ভস্ম বিষয় সকল প্রকাশ করণের জন্য সমাচার পত্রের সৃষ্টি হয় নাই, যে সমুদয় বিষয় সাধারণের উপকার ও হিতজনক আমরা তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকি, নিন্দাজনক কুৎসিত বিষয় কখনই প্রকটিত করি না, বিশেষত পরগ্লানি প্রকাশে অতিশয় দুঃখ বোধ করিয়া থাকি ...।'[১৫০] অর্থাৎ নব্যবাবুদের প্রতি গুপ্তকবির যে ক্রোধ ও ক্ষোভ, তার পিছনেও টলটল করছে অশ্রুবিন্দু। কিন্তু সে অশ্রুবিন্দুর উৎস ভবানীচরণের পক্ষপাতমূলক সহানুভূতি নয়, প্রচণ্ড প্রকাণ্ড অন্তর্জ্বালা। বস্তুত, নব্যবাবুদের চারিত্রিক ও মানসিক বিকার সম্পর্কে এই অসহিষ্ণুতা, নিতান্ত গুপ্তকবির ব্যক্তিগত মনোভাব নয়, সমকালীন যুগমানসসম্ভূত। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে থেকেই নব্যবাবুদের প্রতি একপ্রকার অসহিষ্ণুতা, ব্যঙ্গবিদ্রূপ, রোষকষায়িত কটাক্ষ লক্ষ করা যায় লেখককুলের মধ্যে। নব্য সভ্যতার অনাচার ও ভণ্ডামিকে আঁকড়ে ধরে নব্যবাবুরা তখন আর পূজিত নন। আর তাঁদের বিরুদ্ধে ঈশ্বর গুপ্তের ন্যায় যাঁরা খড়্গহস্ত হলেন তাঁরা প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের দল। বলা যায়, নব্যবাবুদের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের এ এক সম্মিলিত

জাগরণ। ঈশ্বর গুপ্ত যেমনটি বলেছিলেন, নব্যবাবুরা ইংরেজদের বহিরঙ্গগত দোষগুলি আয়ত্ত করলেও, অন্তর্গত গুণগুলি অধরাই থেকে গেছে; এ অভিযোগ মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোকে'বাবুরও। আদিবাবু ও নববাবুদের কেবল বিত্ত ছিল, শিক্ষা ছিল না; নব্যবাবুরা অনুকূল পরিস্থিতিতে শিক্ষার সূত্রে বিত্ত অর্জন করলেন। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে চাকরিজীবী বাঙালির চাকরির সুযোগ কমে আসায় শিক্ষা আর বিত্তসহায়ক হিসাবে গণ্য হচ্ছিল না। ফলে বিত্তহীন মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোকে'র এক বৃহৎ অংশ ইংরেজ শাসনের সদিচ্ছা নিয়েও সন্দিহান হয়ে পড়ছিল। জাতীয় খেলা, হিন্দুমেলার মতো ক্রিয়াকাণ্ডগুলি যুক্ত হয়ে এক প্রবল জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সূচনা করেছিল। এমতাবস্থায় নব্যবাবুদের পোশাকি সাহেবিয়ানা, পাশ্চাত্য প্রীতি সমালোচিত হচ্ছিল সর্বস্তরেই। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুরা, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন শিক্ষিত ব্রাহ্ম নেতৃবৃন্দ থেকে শিক্ষিত দেশীয় হিন্দুরা, নব্যবাবুদের অনাচার ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। সমিতি গঠন করে রাজনৈতিক দাবিদাওয়া আদায়ে এই সময় থেকেই সচেষ্ট হয়ে উঠতে থাকেন তাঁরা। ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রে নগরজীবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক সমাজের গুরুত্ব বাড়ে। কলকাতাও তার ব্যতিক্রম নয়। একসময় আদিবাবু, নববাবু, নব্যবাবুরা দেশীয় নাগরিক সমাজের মুখপাত্রস্বরূপ মান্যতা পেয়েছিলেন, নব্যবাবুরা অবশ্য অনেকটাই অর্জন করেছিলেন সে মান্যতা তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা-স্বাতন্ত্র্যের কল্যাণে। পরিবর্তিত কাল পরিস্থিতিতে সে উত্তরাধিকার অর্জন করলেন মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের দল। ঈশ্বর গুপ্তের পরবর্তীকালে আরও স্পষ্ট-প্রত্যক্ষভাবে নব্যবাবুদের আক্রমণ জানানো হয়েছে। মধুসূদন ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসন লিখে আত্মসমালোচনায় মগ্ন হয়েছেন। বটতলার প্রহসন-নাটক-পদ্যাদিতে নব্যবাবুদের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরও নগ্ন, নির্মম। স্বাদেশিকতার যে বীজমন্ত্র ঈশ্বর গুপ্তের প্রাণের সুরটি বেঁধে দিয়েছিল, উত্তরকালে সেই সুরটিই 'সভ্যতার অত্যাচার' প্রবন্ধে লেখা হয়েছে : '... দৃষ্টিমাত্র অনেক জিনিষের বাহ্য শোভা মনকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে, কিন্তু তাহাদের অন্তরের গুণ তাহার সহিত না মিশিলে বুঝিয়া উঠা বড়ই দুষ্কর। দেখিতেছি, আমাদের এ সভ্যতার বাহ্য শোভা খুবই জাঁকাল। যাহা কিছু এদেশে ছিল না, সভ্যতা সাতসমুদ্র তেরো নদী পার হইতে তাহা এদেশে আনিয়া দিয়াছে। কোট্ প্যান্টালুন, ফ্রগ গাউন, বুট মোজা, স্টিক্ চশমা, চেন, চুরুট— হরেক রকম ভাল ভাল জিনিষের আমদানি হইয়াছে। Freedom, Fraternity, Female Emancipation, Mass Education প্রভৃতি লম্বাচওড়া অনেকগুলি কথা সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া এ দেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছে। দেখিতে শুনিতে বড়ই ভাল। কিন্তু ইহাই কি প্রকৃত সভ্যতা?'[১৫১]

বেশবাসের হাস্যকর বিজাতীয় অনুকরণ, ইংরেজি শিক্ষার স্বল্প ছোঁয়া এবং আনুষঙ্গিক কুকর্মদোষে নব্যবাবুদের প্রাচীন গরিমা ধূলিস্যাৎ হয়ে পড়েছিল নিমেষেই। দু'একজন ব্যতীত বাকি ডিরোজিয়ানদের উদ্যমহীন আত্মবিলাস, পরবর্তীকালে নব্যবাবুদের পথভ্রষ্ট করেছিল। উদ্দেশ্যহীন অনুকরণই হয়ে উঠেছিল নব্যবাবুদের একমাত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মনোমোহন ঘোষের গানে বলা হয়েছে[১৫২]—

> 'হায়! দেশের হলো কি— সব্ দেখি মেকি!
> প্রবল ধলোর নকল শিখে, দুর্বল কালোর বুজরুকি।
> সেই কালোর গায় ধলোর পোষাকে, ময়ূর পাখ্ যেন দাঁড়কাকে,
> সেই বিটকেল জন্তু দেখে তাকে, বিজ্ঞ লোকে হয় সুখী।'

সন্দেহ নেই, তীব্র বিষোদগার, শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়েছে, কিন্তু সমকাল ও উত্তরকালের মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক' বাবুদের দৃষ্টিভঙ্গি নব্যবাবুদের বিষয়ে কেমন ছিল, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় সুস্পষ্টভাবে। ঈশ্বর গুপ্ত অনেক মিঠেভাবে, শালীনতার সঙ্গেই নব্যবাবুদের প্রতি তাঁর অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেছেন এবং তা করাটাই তিনি দেশের পক্ষে দশের পক্ষে 'হিতজনক' মনে করেছেন।

বাবু-বাঙালি বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল দেশহিতৈষণার। যে ইয়ং বেঙ্গলদের বিরুদ্ধে তিনি অসহিষ্ণু ছিলেন, তাঁদের কারোর কারোর হাত ধরে বাংলায় স্বাদেশিকতার সূত্রপাত ঘটেছিল। স্কট-বায়রন, মিল-বেন্থামের প্রভাবে এক শ্রেণির রোমান্টিক স্বাদেশিকতা ক্রমশ আচ্ছন্ন করে নব্যবাবুদের। সভা-সমিতি স্থাপন, প্রস্তাব গ্রহণ, শাসক শ্রেণির সহযোগে স্বদেশীয় উন্নতিসাধন বিষয়ক পরিকল্পনা গ্রহণ, এ সমস্তই উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই আত্মপ্রকাশ করে; বিশেষ প্রাবল্য অর্জন করে ওই অর্ধের শেষ দশক থেকে। পাশ্চাত্য শিক্ষার মারফত এই সময় থেকেই ইয়ং বেঙ্গল ও তদনুসারী নব্যবাবুরা আত্মমর্যাদাবোধ বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠেন। যদিও রণজিৎ গুহের মতে,[১৫৩] এই আত্মমর্যাদাবোধ কোনো রাজনৈতিক স্বাধীনতাস্পৃহার জন্ম দেয়নি তখনও, 'but to want of recognition within the framework of colonial dependence'. তাঁর মতে, এ হল প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কে আত্মমর্যাদাবোধের চেতনা। একে জাতীয়তাবাদ বলা যেতেই পারে সংকীর্ণ অর্থে, কিন্তু 'স্বাদেশিকতা' বলা যাবে না। অতএব নব্যবাবুদের জীবনযাত্রায় দেখা দিয়েছিল দ্বিধাবিভক্ত স্বভাব। বিলিতি হ্যাট-কোট-বুট সমন্বিত, বিলিতি জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত নব্যবাবুরা সভা-সমিতিতে একত্রিত হয়ে জাতীয়তাবাদের চর্চা করতেন, স্বদেশীয়দের সংস্কারমুক্তি কিংবা উন্নতির জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করতেন। সুশোভন সরকারের মতে, প্রতীচ্য [westernism (modernism, liberalism)] এবং প্রাচ্যের [orientalism (traditionalism, conservatism)] এক সম্মেলক আকর্ষণ বা অনুগমন এই দ্বিধার (conflict) জন্ম দিয়েছিল।[১৫৪] যে ঈশ্বর গুপ্ত নব্যবাবুদের সাহেবিয়ানা তথা বিলিতি অনুকরণ অসহ্য জ্ঞানে ব্যঙ্গ করেছেন, সেই তিনিই আবার সিপাহি যুদ্ধ থেকে শুরু করে একাধিক প্রসঙ্গে রানি ভিক্টোরিয়া তথা ব্রিটিশ শাসনের প্রশংসা ও উপযোগিতার কথা স্বীকার করেছেন। আপাদমস্তক সাহেব, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের সঙ্গেই স্বদেশীয় শাস্ত্রাদি সম্পাদনা ও আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছেন। ডিরোজিয়ান হরচন্দ্র ঘোষ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সরকারি চাকরিতে থেকেও স্বজাতির সংস্কার ও ধর্ম-কৃত্যাদি মেনে চলেছেন। 'অগ্নিস্ফুলিঙ্গে'র অন্যতম প্যারীচাঁদ মিত্র ইংরেজি আদবকায়দায় অভ্যস্ত হয়েও ঝুঁকে পড়ছেন প্রাচ্য আধ্যাত্মিক রহস্যময়তার দিকে। প্রথম জীবনে আপাদমস্তক সাহেব, ডিরোজিয়ান দক্ষিণারঞ্জন অযোধ্যায় কর্মসূত্রে বসবাসকালে হয়ে উঠছেন হিন্দুধর্মের রক্ষক ও সেবক। এরকম উদাহরণ অজস্র। আসলে বাঙালি নব্যবাবুদের তখন 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' অবস্থা। একদিকে সরকারি চাকরির প্রলোভন, নতুন ধনতন্ত্রের সঙ্গে মানিয়ে নিতে চাওয়ার আপ্রাণ প্রচেষ্টা, বিদেশি শাসকের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য, অন্যদিকে নিজ স্বদেশীয় সমাজের বিধি-নিষেধ সংস্কার; না মানলে একঘরে হওয়ার ভয়। এই উভয়-সংকটের মুখোমুখি হয়ে নব্যবাবুরা নিজ নিজ পছন্দমতো দিক অনুসরণ করলেন কেউ কেউ, তবে অধিকাংশই আপোশরফার মধ্যবর্তী পথ গ্রহণ করলেন; শুরু হল দ্বৈত জীবনাচরণের। কিন্তু এই দ্বৈধতা কেবল নব্যবাবুদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রইল না, ক্রমশ তা মিশে গেল মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের জীবনচর্যায়। যে ব্রাহ্মরা ছিলেন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জন্ম নেওয়া মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের অগ্রপুরুষ, তাঁদের জীবনাচরণেও এই দ্বিধা লক্ষ করা যায়। কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার 'কুচবিহার বিবাহ'

এবং ব্রাহ্মসমাজে ভাঙন হয়তো ঐতিহাসিক কারণেই বহু আলোচিত, কিন্তু এই আলোকবৃত্তের বাইরেও বহু ব্রাহ্মই এ জাতীয় মানসিক দ্বন্দ্বের আবহে অভ্যস্ত ছিলেন। ব্রাহ্ম বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বৈষ্ণব যুগাবতার হিসাবে আত্মপ্রকাশ তার অন্যতম প্রমাণ।

মনে রাখতে হবে, যে জাতীয়তাবোধ ব্রাহ্মদের সূত্রে মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক' হাতে পেয়েছিলেন, তা ছিল আদতে খণ্ডিত, 'হিন্দু' জাতীয়তাবোধ। বেদ, উপনিষদ ইত্যাদিকে অবলম্বন করে যে 'আর্যগাথা' ব্রাহ্মবাবুরা রচনা করেছিলেন, কালক্রমে ব্রাহ্মদের তার থেকেই বিচ্যুত করা হল। আটের দশক থেকেই খ্রিস্টান, মুসলমানদের সঙ্গে ব্রাহ্মদেরও হিন্দু জাতীয়তাবাদ এক পঙ্‌ক্তিভুক্ত হিসাবে দেখতে শুরু করল। প্রচলিত ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠা হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মরা ক্রমে অচ্ছুত হয়ে পড়লেন এবং বাঙালি 'ভদ্রলোক'বাবুরা এভাবেই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়লেন— ব্রাহ্মবাবু এবং হিন্দু 'ভদ্রলোক'বাবু। বঙ্কিমী হিন্দু জাতীয়তাবাদ 'বাবু' প্রবন্ধে এ কারণেই বাবুর আধুনিক রূপান্তর প্রসঙ্গে 'ব্রাহ্মবাবু'র উল্লেখ করে কটাক্ষ করেছেন। [১৫৫] এই সময়েই দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের আবির্ভাব ও উত্থানে হিন্দু জাতীয়তাবাদী মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুরা নতুন করে উল্লসিত হয়ে ওঠেন, উজ্জীবিত হয়ে জাতীয়তাবাদী 'হিন্দু' কাঠামো নির্মাণে মনোনিবেশ করেন। ব্রাহ্মবাবুরা আরও কোণঠাসা হয়ে পড়েন। হুতোমের সময় থেকেই অবশ্য ব্রাহ্মদের উপর কটাক্ষ চলছিল, বটতলার আখ্যানে, 'বসন্তকে'র মতো ব্যঙ্গপত্রিকায় ক্রমশ তা প্রবল আকার ধারণ করে। অথচ ব্রাহ্মবাবুদের মারফত নব্যবাবুদের স্বভাবসুলভ নানা বৈশিষ্ট্য তখন ঢুকে পড়েছিল তথাকথিত 'হিন্দু' মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের মধ্যেও। সভা-সমিতি গঠন থেকে মদ্যপান, সংবাদপত্র প্রকাশ থেকে সমাজ-সংস্কার ইত্যকার আরও অনেক কিছুই। আর এইসব তুমুল আলোড়নের উপজাত হিসাবে জন্ম নিয়েছিল ভণ্ডামি, লোকদেখানো স্বাদেশিকতা, কাগুজে সামাজিক সংস্কারের অসার তর্জন-গর্জন, স্বজাতির শ্রেষ্ঠত্বের ফাঁপা বুলি। অথচ এঁরাই আবার লালায়িত রায়বাহাদুর, বাবুবাহাদুর, স্যার ইত্যাদি খেতাব বা টাইটেলের জন্য, অতএব ইংরেজ-ভজনাও এঁদের স্বভাবসুলভ। কলকাতা গঠনের আদিপর্বে নবকৃষ্ণ প্রমুখ আদিবাবুরা সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের লক্ষ্যে ইংরেজ-ভজনা করেছিলেন, ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদে পৌঁছে খেতাবলোভী 'ভদ্রলোক'বাবুরা আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাহেব-ভজনা শুরু করলেন, সমকালীন সাহিত্যে এসব কোলাহলের ছায়াপাত ঘটল অনিবার্যভাবেই।

১৮৭৩ সালে বসন্তপঞ্চমীর পরের দিন প্রকাশিত হয় বাংলাভাষার প্রথম 'পাঞ্চ' জাতীয় পত্রিকা 'বসন্তক', সম্পাদক প্রাণনাথ দত্ত ও গিরীন্দ্রনাথ দত্ত ভ্রাতৃদ্বয়। প্রাণনাথ ছিলেন কলকাতার মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে করদাতা সাধারণ নাগরিকদের ভোটাধিকারদান আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ। প্রধানত, তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৮৭৪ সালে স্যার রিচার্ড টেম্পল পুর আইনের সংশোধন করে সাধারণ নাগরিকদের ভোটাধিকার দান করেন। এ ছাড়া রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র তিনি ছিলেন সহযোগী-সম্পাদক। 'বসন্তক' পত্রিকায় প্রকাশিত অধিকাংশ রচনাই স্বনামে-বেনামে প্রাণনাথ দত্তেরই রচনা। ব্রিটিশদের বিভেদমূলক নীতি, স্বৈরাচার, শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে 'বসন্তক' যেমন অসমাহসিক সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল, তেমনি ব্রিটিশ-ঘেঁষা, স্বল্পবুদ্ধি, পরানুকারী নব্যবাবু, 'ভদ্রলোক' ও ব্রাহ্মবাবুদের বিরুদ্ধে সম্মার্জনী প্রয়োগ করতে দ্বিধাবোধ করেনি। যদিও পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার সিংহভাগই ছিল গদ্যধর্মী ব্যঙ্গবিদ্রূপ, তবুও কখনো কখনো বাঙালির ছদ্ম রাজনীতি প্রীতি, সংস্কারমূলক ধর্ম আন্দোলন এবং পরানুকরণের নির্লজ্জ প্রবৃত্তিকে ব্যঙ্গ করে কবিতাও প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রাণনাথ করদাতাদের ভোটাধিকার আদায় করে ছেড়েছিলেন সত্য, তবে সাধারণভাবে বাঙালি 'মধ্যবিত্ত' 'ভদ্রলোক'বাবুদের চরিত্র সম্পর্কে তাঁর যে বিশেষ আস্থা ছিল না বেশ বোঝা যায়। আগেই বলা হয়েছে, বাঙালি তখন ছদ্ম ও খণ্ডিত জাতীয়তাবাদ এবং পাশ্চাত্যের শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতি মোহবশত একদিকে যেমন পরাণুকরণে প্রবৃত্ত হয়েছে, তেমনি আবার সামাজিক নিন্দা ও অনুশাসনের ভয়ে আজন্মলালিত সংস্কারকেও অস্বীকার করতেও পারছে না। এই মানসিক দোদুল্যমানতা ও 'বসন্তকে'র কবিতাদি রচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

'বসন্তকে'র প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত 'বসন্তকের উপদেশ' সংক্রান্ত ব্যঙ্গকবিতায় মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের চারিত্রিক দোলাচলের প্রতি ছদ্মসমর্থন জ্ঞাপন করা হয়েছে[১৫৬]

'উচ্চ শিক্ষা নিবারণ গুড খট উটি।
দুইদিকে দুইভাব বুদ্ধে নাই ক্রুটি॥
দূর হোক সে সব কতায় নাই কাজ!
ভাল রাজা তাই ভাল, শিভিল ইংরাজ॥
সমাজ বিষয়ে কিছু বলি হিত বাণী।
উল্‌টা শিক্ষা আজকাল দেন বীণাপাণি॥
শিক্ষা করো সেই সব খিচড়ীর নীতি।
দোয়াস্‌লা রকমে চলো ফিরাইয়া মতি॥
দূর কোরে ফেলে দাও পুঁতি আর পাঁজী।
নবীন হিন্দুরা তবে হইবেন রাজী॥'

'হম্বগ্‌' ধর্মের বই ছেড়ে নব্য বাঙালি এখন 'ইংরাজী বুক্‌নী'ওয়ালা গ্রন্থপাঠ করে। কারণ, 'নতুবা ইয়ং দলে স্থান মান নাই'। বাঙালি নব্যবাবুর মুখের ভাষাও ক্রমশ পালটে গেছে; নতুন এক জগাখিচুড়ি ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতিতে 'ভদ্রলোক'বাবুরা অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন, যাঁদের—

'ভাষা-মিশ্র ধর্ম্ম মিশ্র কর্ম্ম-মিশ্র গুড।
পরা মিশ্র, চলা মিশ্র, মিশ্র চাই ফুট॥
পারসী মিশানো কিন্তু ইলি-বিলি বুলী।
বোলো নাকো তবে হারাইবে ভিক্ষা-ঝুলী॥
হিন্দি বলো, উর্দু বলো, বলো ফরাশিস্‌।
জর্ম্মেণী, ইটালী বলো ভাষার ছত্রিশ॥
চটিবেন নব্য দল শুনিলে পারসী।
সাহেবী মেজাজে আছে সাজা আর বাসি!!'

এই নব্যবাবুরা আর 'ভাতভুজা' খান না, উপবীতাদি ত্যাগ করেছেন আগেই, 'কোট্‌-চস্‌মা' ইত্যাদি সাহেবি বসন-ভূষণে অভ্যস্ত, যা কিছু স্বদেশীয় সংস্কৃতির ধারকবাহক তাকে ত্যাগ করাটাই ফ্যাশন। সবচেয়ে বড়ো কথা, মাতা-পিতাকে ত্যাগ করে যৌথ সংসারের সংস্কার ভেঙে ফেলে মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুরা ক্রমশ স্ত্রী-পুত্র সহ একক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন। পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকে যৌথ পরিবারের

ভাঙনের এই সংকট, বিপন্নতা উঠে এসেছিল, তার সূচনা এই সময় থেকেই। শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুটি পিতৃপরিচয় দিতে গিয়েই তাই কুণ্ঠিত বোধ করে,—

'বড় ডার্টি বুড়া বাপ অসভ্য নেটিফ।
হবিষ্য আহার করে ছোঁয় নাই বীফ্॥
ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না, ওটা খানসামার মতো।
পরিচয় দিতে উচ্চ মাতা হয় নত॥
জিজ্ঞাসিলে বলিবে বান্ধব বরাবর।
পূয়র্ বেচারা ওটি প্রাচীন চাকর!!'

লেখকের উদ্দেশ্য যে ব্রাহ্মবাবু, তা স্পষ্ট হয় যখন তিনি পোশাক-পরিচ্ছদের আদবকায়দার বর্ণনা প্রসঙ্গে স্ত্রীসহ উপাসনার প্রসঙ্গ আনেন,—

'ঘেঁষে গিয়ে কতা কও ইংরাজের সনে।
নেটিভ ধরন ছাড়ো, গর্ম্মি আনো মনে॥
ফল কতা, কোট, মোজা আর ইষ্টাকিন।
দাড়ী, ছড়ী, দস্তানা বিশেষ গুড্ তিন॥
বাঁকা শিঁতে লম্বা নখ চায়্না সুজ চাই।
মুখেতে চুরুট, বুকে চুরুটের ছাই॥
লেডীসার্ট প্রণয়িনী বামা বামভাগে।
শেষ কাজ উপাসনা, ইহা কিন্তু আগে॥'

তাঁর মতে, এইসকল ব্রাহ্মবাবুরা মনু জানে না, বেদকে মনে করে 'জঞ্জালের ডীশ', মা-বাবাকে কাঁদিয়ে এইসব 'দেশীভূতে' শত্রুর অধিক ব্যথা দেন। তাঁর বিষজর্জরিত ব্যঙ্গোক্তি—

'ইদানী ওস্তাদ গুণে ধর্ম্ম অনুপম!
বাহির হোয়েছে ঠিক কাল সাপ সম॥
চারিদিকে ফোঁশ্ ফোঁশ্ নিনাদ বিষাল।
পর্শে বিষ, বর্ষে বিষ, বিষম বিশাস॥
যারে খায়, সে না মরি, অন্য জনে মরে।
এমন বিষম সাপ না হেরি সংসারে॥'

ঈশ্বর গুপ্ত খ্রিস্টান পাদরিদের 'কালসর্পে'র সঙ্গে তুলনা করে বলেছিলেন, তাঁরা যাকে ধরেন 'একেবারে বিষদাঁতে সেরে ফেলে তারে।' উনিশ শতকের শেষদিকে পৌঁছে রক্ষণশীল হিন্দু বাঙালি অনেক বেশি উদ্বিগ্ন ব্রাহ্মবাবুদের কার্যকলাপ নিয়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁরা বিবেচিত হচ্ছেন স্বজাতিদ্রোহী হিসাবে; কারণ হিন্দু ঘরে জন্ম নিয়ে তাঁরা স্বধর্মকেই বিনষ্ট করতে উদ্যত, অতএব তাঁদের প্রতি 'বসন্তক' সহ আরও অনেকেরই আক্রমণের ধার আরও তীব্র, আরও শাণিত।

প্রথম বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যা 'বসন্তকে' কলকাতার কথা বলতে গিয়ে লেখক বাঙালি 'ভদ্রলোক'বাবুদের আদবকায়দার বাহ্যাড়ম্বরের দিকেই কটাক্ষপাত করেছেন। নতুন যুগের এই বাবুরা অনেক বেশি আত্মপরায়ণ,

অকর্মার ধাড়ি কিন্তু কাব্যরচনায় পারঙ্গম, নিজের ঢাক এঁরা নিজেরাই পেটান, কখনো  কখনো যা স্থূল ভাঁড়ামির পর্যায়ে পর্যবসিত হয়। তার উপর রয়েছে 'পিরান চুরুট বুট চসমার আড়ম'। সব মিলিয়ে এই বাবুদের নৈতিক স্বাস্থ্যের প্রতি যে ইঙ্গিত করেছেন লেখক, তা প্রীতিপ্রদ নয় কোনোমতেই,—[১৫৭]

'রাসলীলা হয় এ নগরে বারমাস।
জড় আছে যত সং দেখে ভরে আশ॥
গেছে লোকে সাবেক ধরনগুলো ভুলে।
লপেটা পাদুকা আর বাবরি কাটা চুলে॥
কোথা হতে আসিয়াছে নিয়ম নূতন।
থাকিলে আপন ভাবে তুষ্ট নহে মন॥'

ওই বর্ষের সপ্তম সংখ্যায় প্রকাশিত 'গীতে' অভিজাত বাবুদের (অর্থাৎ আদি ও নববাবুদের) দিন গিয়েছে বলে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। লেখকের মতো, খাঁটি গয়নার চেয়ে গিল্টি সোনার এখন কদর বেশি। সম্ভ্রান্ত বাবুদের তুলনায় মেকি বাবুদেরই যুগ এখন। 'বড় ঘরের বড়লোকে'রা 'সামান্যের মত আচে নাহি গণ্ডগোল'। যত সমস্যা পদ্মলোচন বা হঠাৎ অবতারদের নিয়েই।—[১৫৮]

'চোড়ে বগি ফেটিন, পদ্মলোচন
যত বাবু হয়ে বেরোলো॥
দেশের হিতে ছিল মন যাহার।
নীরবে সে কর্ত্তো যথা সাধ্য আপনার।
ছিল ধর্ম্মে রত, সুজন যত,
তারা সবে তাক হোলোঃ
উন্নতি সোপানে কত জন।
চড়ি বসে মুখে মিছে করি আস্ফালন।
দেখে সে সব রাক্ষস, সিভিল মুকস,
ভারত ভুলে ভোর হোলো॥'

ফেলে আসা দিনে বাবুরা নীরবেই দেশহিতৈষণার কাজ করতেন, কিন্তু একালের 'ভদ্রলোক'বাবুদের শুধু বাগড়ম্বরই সার। 'সিভিল' হওয়ার মুখোশ পরে এঁরা আসলে একেকজন 'রাক্ষস'। দেখা যাচ্ছে মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুরা যতই সভ্য-শিক্ষিত হওয়ার দাবি করুন না, ক্রমশ সামাজিকভাবে তাঁরা আভিজাত্যের প্রাক্তন মর্যাদা হারাচ্ছেন। শিক্ষাদীক্ষা তাঁদের 'মধ্যবিত্তে'র শ্রেণিপরিচয় মুছে ফেলতে পারছে না। হয়তো তা  তাঁরা চানও না। কিন্তু আদি, নব বা নব্যবাবুদের জীবনযাপন যে ধরনের শ্রদ্ধা কিংবা কৌতূহলমিশ্রিত বিস্ময়বোধের সঞ্চার করেছিল সামাজিক জীবনে, 'ভদ্রলোক'বাবুদের দল তেমনটি পারছেন না। একপ্রকার অশ্রদ্ধা, ব্যঙ্গ, তুচ্ছতা-হীনতার দৃষ্টি তাঁদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল সমাজের দিক থেকে। সন্দেহ নেই, ক্ষয়িষ্ণু সম্ভ্রান্তবাবুদের দল এবং তাঁর অনুগতদের কিছু অবদান ছিল এর পিছনে, কিন্তু তা যৎসামান্য। মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক' বাবুরা রাজনীতি-দেশহিতৈষণাসহ সর্বক্ষেত্রে যে ধরনের বিলিতি ঘেঁষা, আপোশকামী জীবনযাপনে স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠা উচ্চ ও নিম্নমধ্যবিত্তের বিভাগটিও উচ্চমধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের বিচ্ছিন্ন

করেছিল। নতুন ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে উচ্চবিত্তদের এই অন্তঃসারশূন্য উত্তরণ বড়োসড়ো প্রতিরোধের মুখে পড়েছিল। ব্রাহ্মদের  অনেকেই যেহেতু চাকরিসূত্রে সাহেব ঘনিষ্ঠ এবং সুবিধাজনক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানে বিরাজ করতেন, তার ফলে তাঁরাই হয়ে উঠেছেন অনেক ক্ষেত্রে প্রতিরোধকারীদের লক্ষ্যবিন্দু। নতুন আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোয় বাবুরা যত শাখা-উপশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ছিলেন, ততই নিত্য নতুন ব্যঙ্গবিদ্রূপের তীর নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল তাঁদের প্রতি।

দ্বিতীয়বর্ষ 'বসন্তকে'র প্রথম সংখ্যায় সাহেব-ঘেঁষা মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদেরকে 'ঘোর কলি'র উপজাত বলা হয়েছে। নতুন যুগের বাবুদের পোশাক-পরিচ্ছদ, ধর্মাধর্ম, সংস্কার-বিশ্বাস সব বদলে গেছে বলে আক্ষেপ করা হয়েছে,[১৫৯] —

'হয়েচে নূতন কাল,
কেহ নাহি পরে শাল,
বনাত র‍্যাপার চাল,
        গেছে দেশে চলি

হাপ মোজা প্রিয়তর,
ল্যাবেন্ডার বহুতর,
পমেটাম মনোহর,
        চুলে কাটা কলি।

মুখেতে চুরুট ধরা,
পায়ে হাপ বুটপরা,
বগলে বোতোল ভরা,
        যুবক সকলি॥'

এই ঘোর কলিতে পিতা-মাতার আদর নেই, ভাই-বন্ধুরাও কেউ আপন নয়, কেবল সকল বাবুই 'গিন্নিভজা'। ধর্মও নানারকম— বৈষ্ণব, সনাতন হিন্দুধর্ম, খ্রিস্টধর্ম, নতুন ব্রাহ্মধর্ম। যদিও আচারবিচার আর কিছুমাত্র রক্ষা পায়নি। 'সালগ্রাম' গড়াগড়ি খায়, মুসলমানদের মতো হাঁটু গেড়ে বসে নমাজের মতো সকল দেবদেবীরই পূজা সারছেন 'নব্য'বাবুদের দল। এঁদের—

'পিতৃশ্রাদ্ধে ভোজ মানা,
হয় সাহেবের খানা
ভুজ্যিদান বুড়োপনা,
হাম্মা হয় বলি॥
ঘরে হয় কান্নাকাটি
গুরু পুরুত খায় লাঠি,
বেশ্যালয় পরিপাটি
বাহবারে কলি॥'

নব্যবাবুদের শিক্ষা-সংস্কার, প্রচলিত ধর্মকে না মানা, মদ্যপান— এসব দোষ থাকলেও, ‘বেশ্যাবাজি’টি তাঁরা মানসিক রুচির কারণেই পরিত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু উচ্চমধ্যবিত্ত ‘ভদ্রলোক’বাবুদের মধ্যে আবার সেই ‘বেশ্যাসক্তি’টি ফিরে এসেছে দেখা যাচ্ছে। সমসময়ের ‘হঠাৎ অবতারে’রা অনেকে নতুন মোড়কে নববাবুদের জাঁকজমক ও বাবুয়ানার স্মৃতি ফিরিয়ে আনছিলেন। যেমন, কলকাতার বারোয়ারি পূজার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা জোড়াসাঁকোর ধনীবাবু শিবকৃষ্ণ দাঁ (১৮৩৭-৭৩)। এঁর কয়লাখনি, বড়োবাজারে লোহার ব্যাবসা ও ইস্ট ইন্ডিয়া ও ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের ঠিকাদারির ব্যাবসা ছিল। প্রমথনাথ মল্লিক জানিয়েছেন, ‘বারোয়ারি লইয়া টকরা-টকরিতে বিলক্ষণ অর্থ ব্যয় হইত।... জোড়াসাঁকোর শিবকৃষ্ণ দাঁর গদিতে উহার জন্য বড় ধুমধাম হইত। তিনিই প্রধান উদ্যোগী হইয়া কলিকাতার ধনী ও ব্যাবসায়ীগণের নিকট হইতে বারোয়ারি বৃত্তি লইয়া পূজা করিতেন।’[১৬০] সমকালে দাঁবাবুর এই বারোয়ারি পূজা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। স্বয়ং হুতোম তাঁর নকশার প্রথম খণ্ডের ‘বীরকৃষ্ণ দাঁ’র বকলমে শিবকৃষ্ণকে উজ্জ্বল করে রেখেছেন। এঁর প্রতিমার সাজসজ্জার বিশেষ খ্যাতি ছিল। অমৃতলাল বসু জানিয়েছেন, ‘সে সময় কলকাতায় একটা কথা প্রচলিত ছিল যে, মা এসে গয়না পরেন জোড়াসাঁকোয় শিবকৃষ্ণ দাঁ-র বাড়ী, ভোজন করেন কুমারটুলি অভয়চরণ মিত্রের বাড়ী, আর রাত্রি জেগে নাচ দেখেন স'বাজারের রাজবাড়ীতে। শিবকৃষ্ণ দাঁ-র মত অমন পরিপাটী ঠাকুর সাজান আর কোথাও হত না ...।’[১৬১] দেবীপ্রতিমার এই সাজসজ্জায় ব্রিটিশ সাজসজ্জার অনুকরণে unicorn ও royal crest বানানো হত।[১৬২] নতুন যুগের অর্থবান বাবু শিবকৃষ্ণর পূজায় দেবী প্রতিমার সাজসজ্জা আসত বিলেত থেকে। ‘বসন্তকে’র দ্বিতীয় বর্ষের পঞ্চম সংখ্যায় ‘বসন্তকের দুর্গোৎসব’ পদ্যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হয়েছে,—

> ‘বাসনা বিলাত হতে দাঁয়েদের মত।
> আনি আমি ইন্ডেন্ট করিয়ে সাজ যত॥’[১৬৩]

সে সময় অর্থবান ভুঁইফোঁড় ধনীরাও ঝাড়বাতি, গ্যাসলণ্ঠনে বাড়িঘর সাজাতেন; দেশি-বিদেশি আসবাব, আসঙ্গ-লিপ্সার পোর্ট্রেট গৃহসজ্জার উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হত। সন্দেহ নেই এই দেখনদারি আদতে নববাবুদের মতোই আর্থিক আভিজাত্য প্রমাণ করতে, যদিও নববাবুদের মতন কুলগৌরব তাঁদের ছিল না। নাগরিক সাধারণ মানুষের চোখেও এঁরা কেউ ছিলেন না অভিজাত মর্যাদার অধিকারী। দুর্গাপূজায় নানারকম খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গেই সাহেবি হোটেলের খানা রাজা সুখময়ের আমল থেকেই চলে আসছিল। এক্ষণে তা প্রায় উন্মাদনার পর্যায়ে পৌঁছেছে দেখা যাচ্ছে,—

> ‘বাই নাচ খেম্‌টা নাচে রাজাদের মত।
> মজলিস কোরে বসি লয়ে বন্ধু যত॥
> জালা কোরে মদ রাখি বোতলে কি সানে।
> মদের দি সদাব্রত সদা সাধ প্রাণে॥
> বৈঠকখানাতে বেশ্যা আনিয়ে সুরঙ্গে।
> মদের গটরা করি ইয়ারের সঙ্গে॥
> হোটেল হইতে খানা আনিয়ে ভবনে।
> খাওয়াই প্রাণের বন্ধুগণে সযতনে॥...

অমৃত সমান বীপস্টিক রলিপুলি।
পোর্ট চপ, সসেজেস, তাকি কভু ভুলি॥...
এমন সুস্বাদ খাদ্য ত্রিভুবনে নাই।
দেবের দুর্লভ ইহা কি কহিব ভাই॥'

সাহেবের পূজায় আমন্ত্রণ করে এনে সামাজিক প্রতিষ্ঠার ভিতটি শক্ত করার পথ দেখিয়েছিলেন নবকৃষ্ণ দেব, সুখময় রায় প্রমুখেরা। প্রাণকৃষ্ণ হালদার নোট জাল করে যে দুর্গাপূজার আয়োজন করতেন, সে পূজাতেও দূরদূরান্ত থেকে সাহেব-মেমরা আসতেন। অবশ্য তাঁর নোট জাল ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে দুর্গাপূজা এবং তাঁর বাবুয়ানার খ্যাতিও অস্তমিত হয়েছিল। তবে উত্তরকালে উনিশ শতকের তিনের দশক থেকেই সম্ভ্রান্ত সাহেব-মেমদের এইসব পূজা-আচ্চায় যোগদান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তবে আটের দশকে পৌঁছে দেখি ছোটোখাটো পদমর্যাদার সাহেবসুবোরা আমন্ত্রিত হচ্ছেন বাৎসরিক পূজায় এবং সেইসব 'লালমুখ সাহেব বিবি', যাঁদের সম্মান প্রতিষ্ঠাকামী ভুঁইফোঁড় বাবুদের কাছে 'ঠাকুর সমান'। তাঁরা যখন এসে 'পা দিয়ে সিংহের ঘাড়ে দেখিবে দুর্গায়', তখন বাবুর সৌভাগ্য আর দেখে কে? অতএব 'সেরি স্যাম্পিন ব্রাণ্ডি বিয়ার' সহ পূর্ব্বমত নানা খাদ্য দ্বারা বাবু তাঁদের আপ্যায়ন করতেন। শেষে বাইনাচেরও ব্যবস্থা থাকত। তবে আদি বা নববাবুদের অন্তঃপুরে সচরাচর সাহেব-বিবিদের প্রবেশাধিকার ছিল না। নতুন কালে দেখা যাচ্ছে, স্বল্পশিক্ষিত বাবুরাও সাহেব-সুবোর সঙ্গে নিজ স্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দিতে সদা উন্মুখ,—

'বাসন্তিকা প্রেয়সীরে বিবি সাজাইয়ে।
দিব তাহাদের ইন্ট্রোডিউস করিয়ে॥
সেকহ্যান্ড করিবে প্রিয়া সাহেবের সনে।
আর নানা বাক্যালাপ করিবে যতনে॥
হাব ভাব রসোল্লাস প্রকাশিয়ে প্রিয়ে।
তাঁহাদের মনপ্রাণ লইবে হরিয়ে॥'

এ কাজের পিছনে অবশ্য শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুটির একটি গোপন অভিপ্রায় আছে। অভিপ্রায়টি তাঁর প্রতিষ্ঠাকামী মনের সযত্ন-লালিত একটি স্বপ্ন,—

'কে পায় আমারে তবে কি ভাগ্য আমার।
পাথরে পাঁচকিল মোর কি কহিব আর॥
উপাধি পাইব তবে নিশ্চয় ত্বরায়।
নহিলে কি উপাধি সহজে কেহ পায়?
উপাধিতে মান পেলে যত স্বজাতিরে।
বাঁচুক মরুক তারা তাকাব না ফিরে॥
বরঞ্চ ধরিব ছুপে স্বজাতীয় গণে।
মাথা তুলে উঠিতে না দিব কোন জনে॥
গাইব ইংরেজ-গুণ হয়ে কুতূহলী।
জয় জয় ইংরেজের জয় জয় বলি॥'

পদমর্যাদা ও কাজকর্মের নিরিখে নানারকম খেতাব বা Title প্রদান পৃথিবীর সব দেশে সব কালে প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষেও প্রাচীনকাল থেকে তার পরিচয় মেলে। নবাবি আমলেও নানাপ্রকার খেতাব প্রদান করা হত এবং প্রদত্ত খেতাবের কারণে কারোর কারোর সামাজিক অবস্থান পর্যন্ত বদলে যেত। কলকাতাকে ঘিরে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি যখন বিদেশি শাসকের অর্থনৈতিক শোষণের ভিত গড়ে উঠল, তখন তারা প্রাথমিকভাবে তৎকালে সমাজে প্রচলিত পদমর্যাদাকেই মান্যতা দিয়েছিল। নবকৃষ্ণ বা কান্ত-মুদির মতো কেউ কেউ অবশ্য অর্থের বলে নতুন সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। তথাপি উনিশ শতকের তিনের দশকের আগে এ জাতীয় খেতাব প্রদানের ব্যাপারে বিদেশি শাসকের তেমন আগ্রহ ছিল বলে মনে হয় না। তা ছাড়া বিদেশি শাসক প্রদত্ত খেতাব অর্জন করলেই দেশীয় সামাজিক জীবনে সম্মান বা প্রতিষ্ঠা পাওয়াও নিতান্ত সহজ ছিল না। এদিকে পুঁজিবাদী শিল্পব্যবস্থায় এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিক্রিয়ায় যে নতুন ভুঁইফোঁড় জমিদারশ্রেণির সৃষ্টি হয়েছিল, তাঁদের প্রয়োজন ছিল সামাজিক সম্মান, প্রতিষ্ঠা ও স্থানীয় ক্ষেত্রে প্রতিপত্তির। তথাপি বলা যায়, উনিশ শতকের প্রথম ভাগে এ ব্যাপারে বিদেশি শাসকের ভূমিকা ছিল উদাসীনের।

কিন্তু ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পর বিদেশি শাসকের পক্ষে আর উদাসীন থাকা সম্ভব ছিল না। শাসনতন্ত্রের সুবিধার জন্যই প্রয়োজন হয়েছিল এক শ্রেণির অনুগত, বিদেশি প্রভুভক্ত দেশীয় পুঁজিপতি জমিদার ও বিত্তবান শ্রেণিকে তোষণ করবার। আগেকার দিনে মহাসামন্ত, সামন্ত ইত্যাদি খেতাব প্রদান করে রাজা তাঁর রাজ্যকে সুরক্ষিত করতেন, ইংরেজ শাসকও সেইভাবে নানান খেতাব বা Title তৈরি করে একশ্রেণির বশংবদ বাবুশ্রেণির সৃষ্টি করতে চাইলেন। জমিদার বিত্তবান ও পুঁজিপতিদের নানান খেতাব বিলিয়ে যদি তাঁদের শাসকঘনিষ্ঠ করে রাখা যায়, তাহলে দেশীয় অর্থনৈতিক সমাজ ও তার শাসন ও শোষণ পরোক্ষে নিয়ন্ত্রণও করা সম্ভব হয় বিদেশি শাসকদের পক্ষে। অতএব ১৮৫৭-র পরবর্তীকালে মহারাজা, রাজাবাহাদুর, রাজা, কুমার, রায়বাহাদুর, খাঁবাহাদুর, বাবুবাহাদুর ইত্যাদি একাধিক Title বা খেতাবের সন্ধান মেলে।[১৬৪] এই খেতাব অনেক ক্ষেত্রেই বংশানুক্রমিকভাবে বাহিত হত, তবে তার জন্য শাসকের স্বীকৃতির প্রয়োজন ছিল। 'সুলভ সমাচার' জানিয়েছে, 'মহারাজ রাজাবাহাদুরেরা পৈতৃক বিষয় পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের খেতাব পাইয়া থাকেন। যাঁহারা রাজাবাহাদুর প্রভৃতি খেতাব সকল পাইয়াছেন, তাঁহারা কোন কোন ভাল কাজ করাতে গবর্নমেন্ট তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া সেই সকল খেতাব দিয়াছেন।'[১৬৫] বলা বাহুল্য, এই 'ভাল কাজে'র সংজ্ঞাটি নিরুপিত হত বিদেশি শাসকের অনুকূলে যেসব বাবুরা কাজ করতেন কিংবা নানান উপঢৌকন ও আনুগত্য দিয়ে তোষণ করতেন, তার দ্বারা। বঙ্কিমচন্দ্র 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' নামক ব্যঙ্গরচনায় ভুঁইফোঁড় অজ্ঞাতকুলশীল মুচিরামের অবস্থাগতিকে 'রায়বাহাদুর' খেতাব লাভ হয়, মুচিরাম 'বাবু' হয়ে ওঠেন। সন্দেহ নেই, ইংরেজ-প্রদত্ত খেতাব এবং তার যথার্থ মর্যাদা নিয়ে উনিশ শতকের আটের দশক থেকেই সামাজিক জীবনে সংশয়, সন্দেহ, আলোড়ন সৃষ্টি হতে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিদারুণ ব্যঙ্গেরও অভিমুখ হয়ে ওঠে তা। 'বসন্তকে' 'উপাধি' পাবার আশায় মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুটির নির্লজ্জ আচরণ সমাজে নিতান্ত দুর্লভ ছিল না। বৈষ্ণবচরণ বসাক সম্পাদিত 'সচিত্র বিশ্বসঙ্গীতে' সংকলিত একটি গানে Title-এর সামাজিক অনিষ্ঠকারী ভূমিকার কথা বলা হয়েছে আক্ষেপের সঙ্গে,[১৬৬]—

> ... 'আবার উপাধি হয়েছে ব্যাধি
> কত অবিদ্বানের ঘরে।

কেহ হলো সাহেব সুবা
রীতি মত সেলাম করে;
আবার কেহ হলো রাজা নবাব
বড় বড় খানার জোরে।'

স্পষ্টতই সমসাময়িক নানান ঘটনার ইঙ্গিত আছে এই গানে। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর যুবরাজ, পরে যিনি সপ্তম এডওয়ার্ড হন, তিনি কলকাতায় আসেন এবং এখানকার সম্ভ্রান্ত বাঙালি ঘরের মহিলাদের দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সবাই যখন অপারগ, তখন ভবিষ্যৎ লাভের কথা ভেবে জুনিয়ার গভর্নমেন্ট প্লীডার রায় জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় যুবরাজকে ভবানীপুরে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান ও তাঁর বাড়ির মেয়েরা যুবরাজকে ফুল-মালা দিয়ে বরণ করে নেন। সমকালীন হিন্দুসমাজে এই ঘটনা তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বলা বাহুল্য, এই প্রকার প্রভু-ভক্তির বিনিময়ে বিদেশি শাসক প্রদত্ত সর্বোচ্চ খেতাব 'সি.এস.আই' করায়ত্ত হয় জগদানন্দের। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র ৭ বৈশাখ ১২৮২ বঙ্গাব্দ সংখ্যার 'বাজিমাৎ' নামক বিখ্যাত ব্যঙ্গ কবিতার কটাক্ষ করে বলেছেন,[১৬৭]

'বেঁচে থাকো মুখুজ্জের পো, খেল্লে ভালো চোটে।
তোমার খেলায় রং রূপো হয়, গোবরে শালুক ফোটে॥
'ফিব্রুদানে এক তাড়াতে, কল্লে বাজিমাৎ।
মাছ্ কাতুরে ভেকো হোলো কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ॥
*　　*　　*
ধন্য হে মুখুজ্জে ভায়া বলিহারি যাই।
বড়ো সাপটা দরে সাৎ করিলে খেতাব 'সি.এস.আই'॥
হেদে ও শহরবাসি আর কি হাসি হাসনি রেড়ো বলে?
দেখ না চেয়ে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে রানির ছেলে॥'

যুবরাজকে খুশি করতে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের অন্যতম শরিক মহারাজা রমানাথ ঠাকুর বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে বিরাট ভোজসভার আয়োজন করে বহু অর্থ ব্যয় করেন। প্রিন্স অব ওয়েল্‌সকে অভ্যর্থনার জন্য যে জাতীয় অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়, রমানাথ ঠাকুর তার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই ভোজসভায় যুবরাজ-ঘনিষ্ঠ হবার জন্য আমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত হিন্দুবাবুদের হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। 'বসন্তক' দ্বিতীয় বর্ষের অষ্টম সংখ্যায় 'বেলগেছের বাগানের বাঙ্গালীখানা' শীর্ষক কবিতায় খেতাব-লোভী শিক্ষিত 'মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের লজ্জাজনক ভূমিকার সমালোচনা করে বলা হয়েছে[১৬৮] :

'এত পড়াশুনা করি কাপুরুষ হোলে।
তবে কেন কেন সবে হইয়ে না মোলে॥
এ বিদ্যার চেয়ে বরং অবিদ্যাতো ভাল।
তা হোলে বরঞ্চ তেজ থাকিত বিশাল॥
খানা খান দোতালায় বসি বাবু যত।
মাঠে পড়ি হিম খায় রাজা শত শত॥

একপেট হিম খেয়ে হইল অধীর।
কার শ্রাদ্ধ কেবা করে নাহি হয় স্থির॥'

শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের তুলনায় 'রাজা' খেতাবধারী ব্যক্তিদের মর্যাদা এসময় সমাজের চোখে যে উচ্চ ছিল সহজেই অনুমেয়। 'বাবু' বলতে যে সম্ভ্রান্ত বা অভিজাত ভাবটি বোঝাত তা আর এসময় নেই দেখা যাচ্ছে। 'বাবু' সাধারণ শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' বোঝাতেই ব্যবহৃত হচ্ছে তখন। কিন্তু মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের এই শিক্ষা কতখানি তাঁদের চরিত্রস্বভাবকে বদলাতে পেরেছে, সে বিষয়ে পদ্যকার সন্দিহান :

'লেখাপড়া শিখে লোকে উচ্চাশয় হয়।
তোমরা শিখিয়ে শুধু হলে নীচাশয়॥
ইংরেজের উচ্চগুণ যে সকল আচে।
তোমরা কখনো নাহি যাও তার কাচে॥
শিখিয়াছ খানা খেতে বেতাল হইয়ে।
মান অপমান প্রতি না দেখ চাহিয়ে॥'

হেমচন্দ্র লিখেছেন বটে, রমানাথ ঠাকুর 'বেলগেছেতে খানা দিয়ে খেটে হল খুন',[১৬৯] তবে বাস্তবে তা ঘটেনি। রমানাথ ঠাকুরের সুপ্ত ইচ্ছাও পূরণ হয়েছিল। ইতিপূর্বে রমানাথ ১৮৭৩-এ গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিল-সদস্য হিসাবে 'রাজা' খেতাবে ভূষিত হন।[১৭০] বেলগাছিয়া ভোজকাণ্ডের পর প্রিন্স অব ওয়েল্‌স তাঁকে একটি বহুমূল্য আংটি উপহার দেন। ১৮৭৫-এই তিনিও 'সি.এস.আই' খেতাবে ভূষিত হন। ১৮৭৭-এ ১ জানুয়ারি গর্ভনর জেনারেল লর্ড লিটন তাঁকে 'মহারাজা' খেতাবে ভূষিত করেন।[১৭১] অতএব, রমানাথের কপালে Title লাভ যথেষ্ট পরিমাণেই প্রাপ্ত হয়েছিল।

অবশ্য 'খেতাব' লাভের এই জাতীয় পন্থা সমকালেই সমালোচনা ও ব্যঙ্গের লক্ষ্যস্থল হয়েছে। 'রাজা', 'রাজাবাহাদুর' প্রভৃতি খেতাবও আর বাবুদের মহিমা প্রমাণ করছে না। সমকালে প্রকাশিত একটি 'সঙ্‌'-এর গানে দেখা যায়[১৭২] —

'আমি রাজা বাহাদুর
কচু বাগানের হুজুর। ... ...
জমি নাই, জমা নাই, নাইকো আমার প্রজা!
আমি পেত্নীপুরের রাজা!
ওহে নই হে আমি গোঁজা!
অন্দরে অবলা কাঁপে খেয়ে আমার সাজা।
ওরে বাজা বাজা বাজা,
তা ধিন্ ধিন্ নাচি আমি
কচু বনের রাজা।'

বস্তুত, কলকাতার নাগরিক জীবন বিকাশের আদিপর্বে যাঁরা সামাজিকভাবে অগ্রগণ্য হিসাবে বিবেচিত হয়েছিলেন, সেইসব বিত্তবান গোষ্ঠীপতি কতিপয় মানুষ ছাড়া উত্তরকালে ইংরেজ-প্রদত্ত 'রাজা'

খেতাবধারী বাবুরা সাধারণ জনগণের আন্তরিক শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম লাভ করতে পারেননি প্রায় ক্ষেত্রেই। এঁদের অনেকের বংশগত কৌলীন্য যেমন ছিল না, তেমনি ছিল না দানধ্যান-ঔদার্য-পরোপকার ইত্যাদি রাজকীয় গুণ। ফলে খেতাবধারীদের 'রাজা', 'মহারাজা', 'রায়বাহাদুর' বা 'বাবুবাহাদুর' বলে মেনে নিতে পারেননি সাধারণ মানুষেরা। এঁদের জীবনদৃষ্টি, আত্মকেন্দ্রিক জীবনচর্চা, কলকাতার বৃহত্তর নাগরিক সমাজের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাই এঁদের সাধারণের চোখে উপহাসাস্পদ করে তুলেছিল। ফলে, দেখা যায় বাবুদের 'খেতাব' আকাঙ্ক্ষা যতই তীব্র হোক না কেন, সাধারণের চোখে তা হাসিঠাট্টার বিষয় হয়ে উঠেছে [১৭৩]—

'আমি রাজা হয়েছি, আমি রাজা হয়েছি
সত্য স্বর্গ চতুবর্গ মুটোই পেয়েছি॥
বাপ পিতেমো খুড়ো খেয়ে
সবাই মলো বুড়ো হয়ে
চ্যাকা খেয়ে ভ্যাকা হল জ্যাঠাখুড়ো মোর।
সুখ না চিনে দুঃখ কিনে করে জীবন ভোর।
রাজা হলেম ভাগ্যে আমি লেজা খেয়েছি।
জমীজমার নাইকো লেঠা,
বাস্তু কেবল তের কাঠা,
থাক না নীচে কপ্নি আঁটা ক্ষতি কি তায়
সাঁচ্চা দেওয়া আচ্ছা রকম পাগড়ী ত মাথায়,
বাড়ীর নাম রাজবাড়ী, আমার বল না আর ভাবনা কি?'

এই বিষয়ে 'অনুসন্ধান' পত্রিকার পূর্বোল্লিখিত সংখ্যায় মন্তব্য সামাজিক দৃষ্টিটিকে স্পষ্ট করে তোলে,— 'চাকির বলেই চকচকে উপাধিমালা গলায় দোলাইয়া অনেক গোবরগণেশ গা ফুলাইয়া বেড়ায়। সেটা কিন্তু বড় ভাল নয়। দেখিতে শুনিতে কেমন লজ্জা লজ্জা করে না কি? যাহারা পরে তাহারা প্রায় আপন মুখ আয়নায় দেখে না। যাহারা পরায়, তাহাদের কৌতুক বটে! কান্নাকাটি কেবল ঘরের লোকের।'[১৭৪]

সভা-সমিতি সেবী, বাগাড়ম্বরপ্রিয়, টাইটেল-ভক্ত বাঙালি 'বাবু'দের আত্মধ্বংসের এই দিনে শ্মশান-সংগীত শোনাতে এলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১)। সামাজিক আদর্শে ইন্দ্রনাথ ঐতিহ্যাশ্রয়ী, সংস্কারমুখী গোঁড়া রক্ষণশীল মনোভঙ্গির অধিকারী। যথাযথ প্রতিরোধ গড়ে তুলে হিন্দু জাতীয়বাদী সংস্কৃতি ঘুরে দাঁড়িয়েছিল তাঁর সময়ে। খ্রিস্টধর্মের প্রতি অনুরাগ উন্মাদনা প্রতিহত হয়েছিল ইতিপূর্বেই, ইসলাম ধর্ম সযত্নে পরিহার্য ছিল নাগরিক বাঙালি হিন্দুর জীবনে; জাতীয়তাবাদী হিন্দুত্বের এই নব উত্থানের যুগে তার প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল ব্রাহ্মধর্ম। উনিশ শতকের মধ্যভাগের দীর্ঘ সময় জুড়ে শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতির ব্রাহ্মরাই হয়ে উঠেছিলেন সমাজের সর্বাপেক্ষা এবং যথার্থ প্রগতিশীল অংশ। যে জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতি পরবর্তীকালে হিন্দুত্বের পথ ধরল, তার প্রাথমিক সূচনা ও পৃষ্ঠপোষকতাও করেছিলেন এই ব্রাহ্মরাই। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবু বলতে এক দীর্ঘ সময় ধরে ব্রাহ্মবাবুদেরই বোঝানো হত। কিন্তু ক্রমে ব্রাহ্মবাবুদের মধ্যেও নানাপ্রকার গোঁড়ামি, রক্ষণশীলতা, কথায় ও কাজে আপাতবিরুদ্ধতা দেখা দিতে থাকে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মতো ব্রাহ্মনেতা হিন্দুধর্মের মূলস্রোতে গুরু হয়ে

দেখা দেন, কেশবচন্দ্র সেন রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে প্রায় দ্বৈতধর্ম পালন করতে থাকেন, অপরাপর ব্রাহ্মরাও উপনয়ন, চূড়াকরণ ইত্যাদি ব্রাহ্মণ্য হিন্দু সংস্কারগুলি প্রকাশ্যে অথবা গোপনে পালন করতেন। অথচ প্রকাশ্যে ব্রাহ্মবাবুরা হিন্দুধর্মের মূল স্রোতে ফিরে আসার ব্যাপারে অনাগ্রহ প্রকাশ করতেন। তা ছাড়া মূলত ব্রাহ্মধর্ম ছিল শহরকেন্দ্রিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ধর্ম। বাংলা এবং বাংলার বাইরের প্রধান প্রধান শহরগুলিতে এই ধর্মের অল্পবিস্তর প্রকোপ ও প্রভাব দেখা গেলেও গ্রামকেন্দ্রিক জীবনে এর প্রভাব ছিল না। বেদান্ত বা উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধির পরিবর্তে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রাচীন কাঠামোর প্রতিই গ্রামের সাধারণ মানুষেরা একনিবিষ্ট ছিলেন। ফলে প্রধানত নাগরিক সমাজে ব্রাহ্মবাবুরা এক নতুন Privileged class বা সুবিধাভোগী উন্নত শ্রেণি হিসাবে পরিগণিত হচ্ছিলেন। এঁরা অধিকাংশই ছিলেন চাকরিজীবী, শ্রেণিগত বিচারে আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে স্বচ্ছল, ইংরেজ ঘনিষ্ঠ কিন্তু জাতীয়তাবাদের মুখর সমর্থক, সভা-সমিতি-সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত কিংবা সম্পাদক। 'কাগুজে বাঘ' হিসাবে বাঙালিবাবুদের খ্যাতি এঁদেরই হাত ধরে। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ভুবনচন্দ্র কিংবা ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখেরা এই শ্রেণির প্রতি বাঙালি হিন্দুর অপর স্রোতের বা বলা ভালো মূল স্রোতের মনোভাবকেই তুলে ধরেছেন। অবশ্য ইতিপূর্বেই হুতোমের রচনায় ব্রাহ্মবাবুদের প্রতি মূলস্রোতের হিন্দু বাঙালির মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল। বলা বাহুল্য, সে মনোভাব ব্যঙ্গের। ইন্দ্রনাথ প্রমুখেরা তাঁদের রচনায় সে ধারাকেই প্রবহমান রেখেছেন। সন্দেহ নেই যে, উনিশ শতকের শেষ লগ্নেও যখন ব্রাহ্মবাবুদের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল হিন্দু মানসের ব্যঙ্গবিদ্রূপ-প্রতিরোধ প্রচেষ্টা লক্ষ করি আমরা, তখন স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যায় যে, অন্তত তখন পর্যন্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের মুখ্য অংশ ব্রাহ্মবাবুদের দমিত করা সম্ভব হয়নি। গ্রামীণ ক্ষেত্রগুলিতে এবং মফসস্বলে স্থানীয় ভাবে 'হিন্দু ধর্মরক্ষিণী সভা' গঠন করে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হয়েছিল বিশ শতকের প্রথম দশকটিতেও। শহরগুলিতে বিশেষ করে কলকাতায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালি 'ভদ্রলোক'বাবুরা এই প্রতিরোধের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কল্পতরু' উপন্যাসের (১৮৭৪) ব্রাহ্মবাবু নরেন্দ্রনাথ কিংবা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর উপন্যাসের ব্রাহ্মবাবুদের ক্যারিকেচার এই প্রতিরোধেরই ফল।

শুধু ব্রাহ্মবাবুরাই নয়, সমকালীন সমাজে কিছু ইংরেজি শিক্ষিত, ডিগ্রিধারী মধ্যবিত্ত বাঙালিবাবু ব্রাহ্মদের অনুকরণে ছদ্ম জাতীয়তাবাদ, নারীশিক্ষা, দেশপ্রেম ইত্যাদি বিষয়ে অনুকরণে যেভাবে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন, তারও প্রবল সমালোচনা করেছেন এই সময়ের রক্ষণশীল লেখকেরা। সভা-সমিতি-অ্যাসোসিয়েশন গড়ে, জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে যাঁরা সেদিন দেশের পুনরুদ্ধারের কাজ শেষ হল বলে আত্মতৃপ্ত বোধ করছিলেন, বলা বাহুল্য সেই ছদ্ম-জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেমকে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি ইন্দ্রনাথের মতো লেখকের পক্ষে। ইন্দ্রনাথের মানসিক অবস্থান রক্ষণশীল হলেও, তাঁর দেশপ্রেমটি ছিল খাঁটি। উত্তরকালে 'স্বদেশী' শীর্ষক রচনায় ('বঙ্গবাসী', ২ আষাঢ় ১৩১৩ সাল) ইন্দ্রনাথ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছিলেন, 'আমার মনে হয় যে, এখনকার এই স্বদেশীটা আসল স্বদেশী নহে, ইহা নকল স্বদেশী। ইংরেজী পড়িয়া শুনিয়া, জাপানী ভাবিয়া ভাবিয়া, এই নকল স্বদেশীর সৃষ্টি করা হইতেছে। প্রেমের অনুরাগে এ স্বদেশীর উৎপত্তি হয় নাই, মাৎসর্য্যের বিদ্বেষেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। এ স্বদেশীর পুষ্টিও ঐ প্রবৃত্তির বশেই হইতেছে। যাঁহারা কোমর বাঁধিয়া এ কাজে আগুয়ান হইয়াছেন, স্বদেশের উপর তাঁহাদের ভক্তি নাই; বিদেশেই তাঁহাদের অচলা ভক্তি। স্বদেশকে ইঁহারা কোন অংশেই বড় বলিয়া মনে করেন না,

বরং ইহারা মনে করেন যে, এদেশ সর্ব্বাংশেই দীন-হীন কাঙ্গাল এবং কৃপারই পাত্র; আমাদের দেশ বলিয়া এ দেশকে আমরা কৃপা করিব, কৃপা করিয়া দেশটাকে স্বর্গে তুলিয়া দিব, আমাদের কীর্ত্তিতে এদেশের মুখ উজ্জ্বল হইবে, দশের মাঝে এদেশ মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিবে, চাহিয়া অন্তকাল পর্য্যন্ত আমাদিগকে ধন্য ধন্য করিতে থাকিবে। বিদেশের উপরই ইঁহাদের ভক্তি ষোল আনা; এই স্বদেশকে বিদেশ করিয়া তুলিতে পারিলেই বুঝি, ইঁহারা কৃতকৃতার্থ হইবেন।'[১৭৫] স্বদেশপ্রেমের ছদ্মবেশে 'বিদেশী' হয়ে ওঠা এবং 'আমিত্ব' নামক অহংকে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের চরিত্রধর্ম। উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেম অনেক ক্ষেত্রেই অন্ধ স্তুতি কিংবা আত্মগরিমার ছদ্ম প্রচার। সংবাদপত্র বা মাসিকপত্রে প্রবন্ধ রচনা করে, সভা-সমিতিতে উচ্চঃস্বরে আস্ফালন করে দেশোদ্ধারের যে কৌশল উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শুরু হয়, ক্রমশ তা জাতীয় চরিত্রলক্ষণ হয়ে দাঁড়ায় মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক' বাবুদের। এঁদের ভিড়ে প্রকৃত দেশহিতৈষী কিছু মানুষ যে ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আসল অপেক্ষা নকলের ভারই ছিল বেশি। এই মেকির প্রতিই ইন্দ্রনাথের অসহিষ্ণুতা ও ক্রোধ। দেশীয় 'ভদ্রলোক'বাবুদের 'জাতীয়তাবাদে'র (Nationality) নামে আবেদন-নিবেদনের, অযথা বিক্ষোভ-উন্মাদনা, আবার তলে তলে শাসকের কৃপাভিক্ষাকে তিনি 'পাঁচুঠাকুর' ছদ্মনামে লিখিত রচনায় তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনা করেছেন। 'জাতীয়তাবাদে'র ধারণাটি সম্পর্কে তাঁর বিরূপতা ছিল। এ ব্যাপারে তাঁর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ 'সাধারণী' সম্পাদক, সুলেখক এবং উকিল অক্ষয়চন্দ্র সরকারের (১৮৪৬-১৯১৭) প্রভাব থাকতে পারে। জাতীয়তাবাদের দেশীয় মডেলটি অক্ষয় চন্দ্রের না-পসন্দ ছিল। দেশের সরকার সাধারণের উন্নতির জন্য যে খুব সচেষ্ট হবেন, অক্ষয়চন্দ্রের মতে[১৭৬] এমনটি আশা করাই ভুল। অতএব দেশের উন্নতিবিধানের জন্য দেশীয় রাজনীতিবিদদের আবেদন-নিবেদন ও বৃথা কান্নাকে তিনি আদৌ সমর্থন করতে পারেননি। তা ছাড়া তাঁর বিশ্বাস ছিল, 'The religion of the Muhammadans is a real stumbling block to the realization of national unity in India. If uniformity of language and dress be criteria of national unity, India cannot claim to be a nation.' [১৭৭] জাতীয়তা, জাতীয় ঐক্য, হিন্দুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থান প্রায় অক্ষয়চন্দ্র সরকারের প্রতিরূপ। ভারতবর্ষের সমকালীন প্রেক্ষাপটে 'জাতীয়তা'র ধারণাটিই যেহেতু ভুল, অতএব তা নিয়ে রাজনীতি-বিলাসী বাঙালি 'ভদ্রলোক'বাবুদের কার্যকলাপ ও প্রতিক্রিয়াও হাস্যকর। পাঁচু ঠাকুর ছদ্মনামে রচিত 'ভরত ভক্তের গানে' তাঁর শ্লেষবঙ্কিম কটাক্ষ লক্ষণীয়—

'আমি অনুরক্ত ভারত-ভক্ত
ভারত-মাতার সুসন্তান।
(আমার) দাও তুলে নিশান।
বীরত্ব আমার যত,
মুখ ফুটে বোলবো কত,
ভারত-উদ্ধারের ব্রত,
নিয়ে, থাকি দিনমান।
শুধু রাত্রিকালে, ইয়ার পেলে,
গড়ের মাঠে সখের প্রাণ।

পোড়া ভারতের তরে,
যখন আমায় শোকে ধরে,
ডেকে ডুকে সভা কোরে,
        ইংরজীতে ছাড়ি তান।
ও ছার মাতৃভাষা, কর্ম্মনাশা,
        সভাস্থলে অপমান!'[১৭৮]

বাগাড়ম্বর সর্বস্ব বাঙালিবাবুর স্বভাব-চরিত্রটি নিতান্ত মন্দ নয়। কথার জাদুতে ছেলেদের ভুলিয়ে ভারত-ভক্তের দল ভারী করা কিংবা 'মুখে ভারত ভারত বুলি' আউড়ে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে নিজের স্বার্থরক্ষা করা সবেতেই এঁরা সমান পটু। আনুষঙ্গিক 'গুণ'ও কিছু আছে। কুলের রমণীকে কুল থেকে বের করে 'স্বাধীনতা' দান করা, 'নবেলে'র অনুকরণে 'প্রেমের পালা' কীর্তন করা কিংবা 'বিধবা পেলে কচি' মা-বাবার যাবতীয় অনুযোগ-অনুনয়কে হেলায় সরিয়ে এঁরা উদ্ধার করেন। 'ধুতি ছেড়ে পেন্টুলান' পরা এইসব 'ভদ্রলোক'বাবুরা অবশ্যই সবাই 'ব্রহ্মজ্ঞানী' তথা ব্রাহ্ম, সেকথা অবশ্য উক্ত সম্প্রদায়ের প্রতি হিন্দুদের সমকালীন দ্বেষসম্ভূত। হিন্দু 'ভদ্রলোক'বাবুদের মধ্যে এহেন ভণ্ড ভারত-ভক্তের সংখ্যা সেদিন কম ছিল না, বরং বেশিই ছিল।

সভা-সমিতি-সেবী, বাগাড়ম্বর সর্বস্ব 'ভদ্রলোক'বাবুদের 'পেট্রিয়ট', জাতীয়তা, দেশোদ্ধার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে লেখা 'ভারত-উদ্ধার কাব্য' ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতুলনীয় সৃষ্টি। ১২৮৪ বঙ্গাব্দে রচিত এই কাব্য সমকালীন 'ভদ্রলোক'বাবুদের জাতীয়তার দিবাস্বপ্ন, নিজ প্রয়োজনভিত্তিক আন্দোলন-প্রতিরোধ, বীরত্বের অলীক মায়ায় আচ্ছন্ন। বাঙালি 'ভদ্রলোক' শ্রেণির চারিত্রিক ও মানসিক পরিমণ্ডলকে ব্যঙ্গের আবহে স্পষ্ট করেছেন ইন্দ্রনাথ। এই 'ছদ্মবীরভাবাশ্রিত' বা mock-heroic epic-এ তিনি ওই বছর প্রতিষ্ঠিত (১৮৭৬) ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এবং তার নেতৃবৃন্দকে কটাক্ষ করেছেন বলে কেউ কেউ মনে করেন।[১৭৯] ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, আনন্দমোহন বসু, মনোমোহন ঘোষ প্রমুখ। ইতিপূর্বে এঁরা শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত পত্রিকা 'সমদর্শী' (প্রথম প্রকাশ ১৮৭৫, নভেম্বর) এবং তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সমদর্শী দলের হয় সভ্য ছিলেন, নচেৎ সমর্থক-পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[১৮০] 'সমদর্শী' ব্রাহ্মদের দল হলেও এর সভ্য-সমর্থক-পৃষ্ঠপোষকেরা সকলেই ব্রাহ্ম ছিলেন না। কিছুদিনের মধ্যেই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেলেও 'সমদর্শী দলে'র সামাজিক সংস্কারমূলক কাজকর্ম ১৮৭৬ সালের পরেও প্রলম্বিত হয়েছিল। 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' ছিল মুখ্যত বাঙালি মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'দের দল।[১৮১] উনিশ শতকের শেষদিকে এঁরা ছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি 'ভদ্রলোক'বাবুদের প্রতিনিধিস্থানীয়। ইতিহাসবিদের চোখে,[১৮২] 'They had gone to England for their studies and had returned with an image which could easily turn them into heroes of the educated middle class.' বস্তুত, আটের দশক থেকেই এঁরা হয়ে ওঠেন রাজনীতি-বিলাসী মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের আদর্শ। ঔপনিবেশিক শাসকের নিজ সুবিধার্থে গৃহীত ও পরিকল্পিত মেকলের জাতীয় শিক্ষানীতির সুযোগ গ্রহণ করে বাঙালি 'ভদ্রলোক'বাবুরা সেদিন শিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত, সাহেব-ঘেঁষা। কিন্তু এই সময় থেকেই সরকারি চাকরির বাজার সংকুচিত হতে থাকে, ক্রমবর্ধমান কর্মান্বেষী বাঙালি ও

অপরাপর ভারতীয়দের ভিড়ে কলকাতায় তখন নাভিশ্বাস ওঠার দশা; নতুন নাগরিক সমাজের একদিকে সুবিধাভোগী শ্রেণি, অপরদিকে নিম্নমধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তরা; স্বচ্ছলতার পিছনে ছায়া ফেলছে দারিদ্র্য-অভাব, কর্ম ও জীবিকা-সংকট। পত্রপত্রিকার মারফত আবেদন-নিবেদন ও সমালোচনার পথ নিলেও দেশীয় 'ভদ্রলোক'বাবুদের তখনও আমল দিতে নারাজ ব্রিটিশ সরকার। এ সময়ই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রীর মিলিত প্রচেষ্টায় ১৮৭৬ সালের ২৬ জুলাই কলকাতার অ্যালবার্ট হলে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' বা ভারত-সভা।[১৮৩] এঁদের আন্দোলনের ফলেই রিপনের আমলে ১৮৮৪-তে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিধি প্রবর্তিত হলে দেশীয়রা তাতে যোগ দিতে সমর্থ হন। ১৮৭৮-এর অস্ত্র আইন ও ভার্নাকুলার প্রেস আইনের বিরুদ্ধে এবং ১৮৭৯ সালে তুলোজাত পণ্যের উপর আমদানি শুল্ক ছাড় তুলে দেওয়া ও দুর্ভিক্ষ ফান্ডের টাকা আফগান যুদ্ধে ব্যয় করার বিরুদ্ধে ভারত-সভা সরব হয়েছিল। কেউ কেউ বলেছেন, 'বস্তুত বাংলা ও বাঙালি সমাজের নতুন প্রজন্মকে আন্দোলনমুখী করে তোলার পিছনে ভারত সভার দান বড়ো কম নয়।'[১৮৪]

এই তরুণ প্রজন্মের অনেকেই যুক্ত ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে। ব্রাহ্মরা যেহেতু ছিলেন তখনও পর্যন্ত উচ্চশিক্ষিত চাকরিজীবী সুবিধাভোগী শ্রেণি, ফলে তাঁদের প্রতি ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক কারণেই তুলনায় পশ্চাদ্‌পর হিন্দু রক্ষণশীল গোষ্ঠী বিরূপতা পোষণ করতেন। রক্ষণশীল হিন্দু পুনরুত্থানবাদীরা 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে'র কার্যকলাপ ও আদর্শকে এ কারণেই ব্রাহ্ম আদর্শ বলে ধারণা করেছিলেন, সভার 'জাতীয় ঐক্যে'র ধারণাকে বিচ্ছিন্ন সুবিধাভোগীর প্রলাপ ভেবে তুচ্ছজ্ঞান করেছিলেন এবং নতুন প্রজন্মের এই সভাকে ঘিরে উন্মাদনা লক্ষ করে আশঙ্কিত হয়েছিলেন; স্বভাবতই খড়্গহস্ত হয়েছিলেন সভার প্রতি। ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত এই সভার দশম বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে এ কথা স্পষ্ট যে,[১৮৫] ভারত-সভার উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক আন্দোলনকে এমনভাবে সম্প্রসারিত করা, যাতে তা 'confined to a few educated Babus'-এ সীমাবদ্ধ না থেকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এই বার্ষিক প্রতিবেদন থেকেই এও স্পষ্ট হয় যে, তখনও পর্যন্ত সভার পরিধি সর্বস্তরে ছড়িয়ে যেতে পারেনি, এর গ্রহণযোগ্যতা তখনও পর্যন্ত ছিল ওই 'few educated Babus'দের ভিতরেই।

সমসময়ে ব্রাহ্মদের মধ্যেও এক ধরনের আধ্যাত্মিক অসহিষ্ণুতা ও অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল, বিশেষত গোঁড়া হিন্দুদের বিরুদ্ধে। ১৮৬৬-তে ব্রাহ্মসমাজের প্রথম ভাঙনের পরবর্তী সময়ে ব্রাহ্মরা যতটা পরিমাণ পারস্পরিক দলাদলিতে ব্যস্ত ছিল, ধর্মের উদারনৈতিক ভাবপ্রচার কিংবা সামাজিক সংস্কারে তার সিকিভাগও ছিল না। নানাপ্রকার ধর্মীয় সংস্কার তাঁদের ক্রমশই মানসিকভাবে রুদ্ধ করছিল, ফলে ১৮৭০-এর পরবর্তী সময়ে তাঁরা ক্রমশই জনমানস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিলেন। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল আর্যসমাজের প্রাথমিক প্রভাব এবং শশধর তর্কচূড়ামণির 'আর্যধর্ম প্রচারিণী সভা'র সাময়িক উত্থান। বিশেষ করে ১৮৭০-এর পরবর্তী সময়ে কলকাতার নাগরিক হিন্দুসমাজে শশধর তর্কচূড়ামণির (১৮৫১-১৯২৮) ছিল অপ্রতিহত প্রভাব, অন্তত ১৮৮৫ পর্যন্ত। শশধর তর্কচূড়ামণি ছিলেন কাশিমবাজারের সভাপণ্ডিত। কথিত যে, সামান্য ইংরেজি জ্ঞানসম্পন্ন কিছু ব্যক্তি কর্তৃক তাঁর ধর্ম ও সমাজকে লাঞ্ছিত হতে দেখে ব্যথিত শশধর হিন্দুধর্ম ও সংস্কারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে উজ্জীবিত হন। কাশিমবাজারের জমিদার অন্নদাপ্রসাদ রায় ছিলেন এঁর পোষ্টা। সাময়িকভাবে সমকালীন ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দুসমাজে শশধর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হন। এঁর প্রাথমিক অনুগামীদের মধ্যে ছিলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ভূদেব

মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্দ্রনাথের গোঁড়া হিন্দুত্ববাদী দৃষ্টির অনেকটাই শশধরের প্রভাব সঞ্জাত বলে মনে হয়। উৎকট স্বাদেশিকতা, হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বদ্ধমূল ধারণা, অন্ধ অতীতমুখী বিশ্বাস, পুরাণ ও কাব্যকে সত্য ধরে নিয়ে যুক্তির ছলে বৈজ্ঞানিক অপব্যাখ্যা— এ সমস্তই ছিল শশধর ও তাঁর দলবলের চরিত্রস্বভাব। ক্ষণসময়ের জন্য হলেও যা সমকালীন শিক্ষিত হিন্দু 'ভদ্রলোক'বাবুদের আকৃষ্ট করেছিল। বঙ্কিম সঠিক অনুমান করেছিলেন যে, ছদ্ম-দেশপ্রেম ও ভ্রান্ত ধর্মালোচনার দ্বারা কখনোই চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার সম্ভব নয়। শশধর-এর চেষ্টা অতএব 'টিকিবে না'।[১৮৬] টেকেওনি। তবে সাময়িকভাবে বাঙালি ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুরা যে এঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্বাদেশিকতার ছদ্ম-মোহে আবিষ্ট হয়েছিলেন, তা অস্বীকার করা যায় না। আবার, ইংরেজি শিক্ষার ফলে এঁদের স্বদেশিয়ানা যথার্থ 'স্বদেশী' হয়ে উঠতে পারেনি। বিলিতি আদবকায়দায় সভা-সমিতি ডেকে, পাশ্চাত্য মতে 'পেট্রিয়টিক' বক্তৃতা করে এঁরা হিন্দুর ভারত গড়ে তুলতে চাইতেন। শশধর তর্কচূড়ামণিরা এঁদের হৃদয়ের অর্ধেক জুড়ে থাকলেও, বাকি অর্ধাংশ জুড়ে ছিলেন লক, পেইন, ড্রাইডেন, পোপ প্রমুখেরা। স্বাদেশিকতার প্রতি মোহাবিষ্ট থাকলেও বিদেশি ভাবের 'পেট্রিয়াটিজম'এর প্রতি ইন্দ্রনাথ প্রমুখের বিরূপতাই ছিল। 'ভারত-সভা' বা ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের বিদেশিভাবের 'পেট্রিয়টিজমে'র চর্চা স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সমর্থন লাভ করেনি। তবে 'ভারত উদ্ধার কাব্যে'র লক্ষ্য কেবলমাত্র 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' ছিল, এমনটি মনে হয় না। সমকালে আরও অনেক সভা-সমিতি গড়ে উঠেছিল, যাদের পৃষ্ঠপোষক ও উদ্যোক্তা ছিলেন মুখ্যত মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুরাই। এঁরা যে কেউই 'ভারত-উদ্ধার কাব্যে'র নায়ক শ্রীবিপিনকৃষ্ণ হতে পারেন। আমাদের মনে হয়, লেখকের লক্ষ্য বিশেষ কোনো সভামাত্র নয়, সার্বিকভাবে আত্মপরায়ণ, ভীরু, নিষ্কর্মা ও কর্মলাঞ্ছিত, রাজনীতিবিলাসী বাঙালি মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুরা।

পঞ্চম সর্গে বিন্যস্ত 'ভারত উদ্ধার কাব্যে'র প্রথম সর্গে আমরা কলেজের পাঠ শেষ করা অথচ ছ'মাস ধরে ঘুরে ঘুরেও চাকরি না পাওয়া বেকার যুবক কবি প্রবরের সাক্ষাৎ লাভ করি। উনিশ শতকের শেষদিক থেকেই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে এবং আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির অবনতির ফলে খাস কলকাতায় চাকরি সুদুর্লভ হয়ে পড়ে। শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুরা মূলত নির্ভর করত সরকারি চাকরির উপর, যা ছিল সীমিত; আবার উচ্চশিক্ষার কারণে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কিংবা কল-কারখানায় সামান্য বেতনে কাজ করাটাও তাদের পক্ষে ছিল অসম্ভব। এইসব কারণেই মুগ্ধতা সত্ত্বেও ইংরেজের বিরুদ্ধে অসন্তোষও পুঞ্জিভূত হচ্ছিল শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'দের মধ্যে। বর্তমান কবিও এর ব্যতিক্রম নয়। হতোদ্যম কবি 'ধূলিধূসরিত জুতা, মলিন বদনে' এসে স্ত্রীর কাছে খাবার চাইলে স্ত্রী 'ভস্ম খাও দগ্ধানন' বাক্য ও সম্মার্জনী দ্বারা প্রহার করলে ভীত, অপমানিত বিপিন দ্রুত নিজের ঘরে ঢুকে দরজায় খিল তুলে দেয় এবং— [১৮৭]

'অর্গলিয়া দ্বার,
সুরেশ্বরী ছিল ঘরে, ভকতি করিয়া
সেবিলাম যথোচিত।'

উনিশ শতকের শেষদিকে পৌঁছে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুরা আর কোনো উত্তরাধিকার বহন করুন বা না করুন, সুরাপানের প্রেজুডিসটা ভালোভাবেই গ্রহণ করেছে। নববাবুদের কাছে যা ছিল আনুষ্ঠানিক

বিলাসের উপকরণ, নব্যবাবুরা তা সাহেব হয়ে ওঠার অত্যাবশ্যকীয় লক্ষণ হিসাবে দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করেন, 'ভদ্রলোক'বাবুরা চালচুলো-আভিজাত্য কিছু না থাকলেও সেই 'সুরা'কেই কঠোর বাস্তব-বিস্মরণের উপায় রূপে আপন করে নিয়েছে। বেকার কবিটিও এই 'সুরা'র প্রভাবেই 'দিব্যজ্ঞান' লাভ করেছে এবং 'ভারত উদ্ধারে'র 'গীত' গাইতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

দ্বিতীয় সর্গে সন্ধ্যাবেলায় 'অঙ্গারাম্প বাষ্পে পূরিত' গোলদীঘির ধারে অভাবপিষ্ট, চিন্তাক্লিষ্ট, শিক্ষিত অথচ অদ্যাবধি বেকার যুবক তথা কাব্যের নায়ক বিপিনকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ধর্মহীন, সংস্কারহীন, পরাধীন ভারতের কথা ভেবে সে উত্তেজিত। চারিদিকের এবং নিজের অবস্থা দেখে তাকে একটাই চিন্তা কুরে কুরে খায়— 'বঙ্গবাসী-পেটে অন্ন যদি নাহি পড়ে?' তার স্বদেশপ্রেম, দেশহিতৈষণা সমকালের আরও অনেক বেকার, হতোদ্যম, ফলে ক্ষুব্ধ আন্দোলনকারী 'ভদ্রলোক'বাবুদের মতোই— উদরজ্বালাভিত্তিক। নতুবা,

'ইংরেজে আপত্তি নাই, যদি জনে জনে
''লাট'' পদে অভিষেকি আহার যোগায়।'

কিন্তু 'ভারতের ভাগ্যদোষে' যেহেতু তা হবার নয়, অতএব, 'রুষ ভাল, যদি খেতে পাই দুই বেলা'; না হয় —

'যবন মাথার মণি, জঠরের জ্বালা
নিবারণ করে যদি; না হয় স্বাধীন
হউক ভারতবর্ষ, লুটে পুটে খাব।'

ভাবতে ভাবতে বিপিনের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে, যদিও হীনবল, শীর্ণদেহ হওয়ার ফলে অন্য অস্ত্র ধরে ইংরেজ বিতাড়ন তার মতো বাঙালির পক্ষে সম্ভব নয়, অতএব চিরপরিচিত ঘরোয়া 'বঁটি'ই ভরসা। ক্রুদ্ধ বিপিনের কণ্ঠে জেগে ওঠে বাঙালি বীরের চরম শপথ—

'বঁটাইয়া দিই যত পাষণ্ড ইংরেজে।'

যদিও এই বীরত্ব যে মৌখিক আস্ফালন, শারীরিক বা মানসিক নয়, তা বোঝা যায়, যখন প্রিয় বন্ধু কামিনীকুমার চুপি চুপি পিছন দিক থেকে এসে অকস্মাৎ বিপিনের কাঁধে হাত রাখে। পুলিশ ভ্রমে বীর বিপিনের অতঃপর পালানোর চেষ্টা এবং বন্ধুসহ ভূপতিত হওয়ায় সব বীরত্বের অবসান। মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুরা যতটা কথায় দড়ো, ততটা কার্যক্ষেত্রে নয়, সুতরাং—

'আড়ষ্ট বিপিন, মুখে বাক্য নাহি সরে,
সংশ্লিষ্ট দশন, চক্ষু স্পন্দন-রহিত,
নাসায় নিশ্বাসবায়ু বহে কি না বহে।'

যদিও বন্ধুর শুশ্রূষায় কিঞ্চিৎ সুস্থ বিপিন 'ভয়ের কথা' উড়িয়ে দিয়ে জানায়, 'মাথার ব্যারাম'। এরপর দুই বন্ধুর বসে বসে 'বহু ভাবে বহু কথা বিচার' করে, 'ভারতের ভাবনা' ভেবে 'অশ্রুনীড়' বিসর্জন করে শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, 'বাক্যে শুধু কালক্ষয়, কার্য্যহানি তায়', অতএব—

'আর বিলম্ব না সহে;
কল্যই সভায় সব করিব নিশ্চয়।
— ভারত উদ্ধার কিংবা সভার বিলয়।'

অতঃপর দুই বন্ধুর নিজ নিজ গৃহে গমন এবং 'নিজ নিজ ঘরে ভাত খাইলা দু'জনে'। বাঙালির যাবতীয় বীরত্বের অবসান ঘটেছে সুখী গৃহকোণের তুচ্ছতার অবতারণায়।[১৮৮]

'মন্ত্রণা' নামক তৃতীয় সর্গ কাব্যের দীর্ঘতম অংশ। সম্ভবত সভাপ্রিয় 'ভদ্রলোক'বাবুর বাগাড়ম্বরের দীর্ঘসূত্রিতার কথা বোঝাতেই সর্গের এই বৃহদাকার। সভাগৃহের বর্ণনাতেও প্রাচীনত্বের আভাস দিয়ে বাঙালির সভাপ্রেমের ঐতিহ্য যে নিতান্ত নতুন নয়, এই বোঝানো হয়েছে। 'আর্য্য-কার্য্যকরী সভা' নামটি শশধর তর্কচূড়ামণির 'আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রতি শনিবারে অধিবেশন হওয়া এই সভায় চারটে বাজা মাত্র একটি দু'টি করে সভ্যরা জমতে শুরু করে। অতঃপর গুটি পাঁচেক সভ্য উপস্থিত হলে গত অধিবেশনের উপস্থিতি, আরব্ধ কাজ ও তার অগ্রগতির রিপোর্ট, কী প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, কেই-বা ছিল সেই প্রস্তাবের সমর্থক দ্বিতীয়ক (Seconder)— এইসব গতানুগতিক কাজের শেষে বিপিনচন্দ্র জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে বোঝাতে চেয়েছে— 'ভারত আপন ভার, পারে কি না পারে লইতে আপন স্কন্ধে'— এই জিজ্ঞাসার উত্তর একমাত্র বাংলাই দিতে পারে, কারণ, বাঙালিই 'ভারতের ভাবী।' দিনের পর দিন ইংরেজ বাঙালির সাধের বাংলার বুকে 'শেল হানিয়াছে', ভারতবর্ষকে শোষণ করেছে, শুধু তাই নয় —

'বিশাল ভারত-ক্ষেত্র, মাসাবধি যার
নিয়ত হাঁটিলে প্রান্ত দেখা নাহি যায়,
লৌহের শৃঙ্খলে তার অষ্ট অঙ্গবাঁধি,
চালাইছে তদুপরি আগ্নেয় শকট,
সপ্তাহের পথ হেন সঙ্কীর্ণ করেছে।
কি আর লাঘব বল, কোন্ অপমান
এর চেয়ে তীব্রতর বাজিবেক হৃদে...'

উনিশ শতকের শেষ দিক পর্যন্ত রেল নিয়ে বাঙালি-মনন দ্বিধাবিভক্ত ছিল। এমনকী বিশ শতকের প্রথম দিকেও রেলযাত্রা নানাভাবে সমালোচিত আলোচিত হয়েছে। স্বাদেশিকতার তীব্র আবেগে রেললাইনকে ভারতবর্ষের পরাধীনতার শৃঙ্খল হিসাবে দেখা হত প্রায়শই। বিপিনকৃষ্ণ সে সত্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 'অকাল কুষ্মাণ্ড, কুম্ভকর্ণ বাঙালির' ঘুম ভাঙাতে চেয়েছে। বাংলার পত্রপত্রিকার 'সুপুত্র' যত সম্পাদক এবং কবি ও নাট্যকারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে স্মরণ করে বলেছে,—

'ভাব ত, ধরিলে অস্ত্র এ হেন বাঙালী,
কি হইবে কাপুরুষ ইংরেজের গতি!—'

বিপিনের কথা শেষ হবার আগেই অবশ্য অন্যতম সভ্য সুরেশ কতগুলি প্রশ্ন ও সংশয় উত্থাপন করেছে। ইংরেজ চলে গেলে ভারতবাসী স্বাধীন হবে ঠিকই, কিন্তু ভারতবর্ষের ঐক্য বিধান হবে কি না সে বিষয়ে তার যথেষ্ট সন্দেহ। বহু জাতি-ধর্মের দেশ কে শাসন করবে? কেমন করেই বা তা করবে? ইংরেজ বিদেশি শাসক বটে, কিন্তু তারা ঠগি দমন করেছে, রাস্তাঘাট বাঁধিয়ে দিয়ে, নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে জীবনযাপন সহজ করেছে, এমনকী নিত্য-ব্যবহার্য খাদ্য-বস্ত্রের যথাযথ জোগানের মাধ্যমে জাতির উপকারই করেছে। অতএব তার মতে,—

'পায়ে ধরি দশ যুগ রাখিবারে হবে,
শিখাতে ভারতে শুধু ঐক্য কারে বলে,
শিখাতে, কেমনে হয় রাজত্ব-বিধান,
শিখাইতে পশু-বল, নীতিবলে ভেদ,
শিখাইতে রাজা-প্রজা সম্বন্ধ কেমন।'

বস্তুত, সুরেশের কণ্ঠে শাসকের এই স্তুতি আসলে ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের অন্তরের কথা। মেকলের শিক্ষানীতির সুফল তারাই ভোগ করেছে সবচেয়ে বেশি। 'লোকরহস্যে'র 'ইংরাজ স্তোত্র' নামক রচনায় বঙ্কিম এই মধ্যশ্রেণির মানসিকতাকে নিপুণ ব্যঙ্গের ছলে চিত্রিত করেছেন।[১৮৯] সমসময়ে ইংরেজ-কৃপাভিক্ষু মধ্যশ্রেণির মুখপাত্র হিসাবে সুরেশের ভূমিকা যথাযথ। 'ভারতের জন্য ইংলন্ড কি করিয়াছেন?' শীর্ষক ব্যঙ্গপ্রবন্ধে ইন্দ্রনাথ এই মধ্যশ্রেণির মানসিকতাকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন, 'পূর্ব্বে ভারতবর্ষ অরাজক ছিল; ভারত রাজা জানিত না, রাজ্য জানিত না; ভারতবাসী জন্মিত, খাইত, ঘুমাইত, আর বংশ রাখিয়া মরিত। এখন সে দুর্দ্দশা নাই; ভারতবাসী রাজনীতি জানে, সমাজনীতি বোঝে, ধর্মনীতির বিচার করে, অথচ রাজ্যের চিন্তা তাহাকে করিতে হয় না, ইংলণ্ড স্বয়ং ভারতের হইয়া চেষ্টা করিয়া লন; সমাজের জন্য তাহাকে ভাবিতে হয় না, ভগবান্ এক প্রকার চালাইয়া লন, আর ধর্ম্মের ভার লইতে হয় না, খোলা হাওয়ায়, খোলা প্রাণে দুইটা উচ্চ-বাচ্য করো উত্তম, না করো, নাই। এ সুখের কর্ত্তা — ইংলণ্ড।'[১৯০]

সমকালীন বাঙালিবাবুরা যথার্থ রাজনীতি সম্পর্কে কতখানি সচেতন ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বাঙালির রাজনীতি চর্চা, অন্তত এই শতকে যতটা আবেগসর্বস্ব, ততটা হৃদয় বা মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। বাঙালি বাবুর 'রাজনীতি' হয় শাসকের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ স্তুতিবাচন, নতুবা ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অপ্রাপ্তিজনিত ক্ষোভ। যদিও ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট' এই বলে সন্তোষ প্রকাশ করেছে যে,[১৯১] 'রাজকার্য্য বিষয়ে আমাদের দেশের লোকের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুরাগ জন্মিয়াছে, এবং তাঁহাদের দলবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার শক্তি জন্মিতেছে।' শাসকের শাসন-প্রণালী সম্পর্কে অনুরাগ কতখানি রাজনৈতিক চেতনা সঞ্জাত, সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়; সেইসঙ্গে 'দলবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার শক্তি' সম্পন্ন বাঙালি মধ্যশ্রেণি সে শক্তি কার অনুকূলে এবং কোন যুক্তিতে ব্যয় করতেন, সে প্রশ্নও ভেবে দেখবার। যেহেতু 'এডুকেশন গেজেট' ছিল সরকারি শিক্ষাবিভাগের সাপ্তাহিক, অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এই দৃষ্টিভঙ্গি ও মত নিছকই শাসকের; শাসিতের নয়। অন্যদিকে কেশবচন্দ্র সেনের 'ইন্ডিয়ান মিরর' জানাচ্ছে[১৯২] যে দেশে কলেজ পড়ুয়ারা এখনও 'দেশের নাগরিক' (citizen) হিসাবে নিজেদের ভাবতে শেখেনি, তাদের স্বদেশপ্রেম (Patriotism) ও রাজনৈতিক বোধ যে কি পরিমাণ ক্ষুদ্র তা বোঝা অসম্ভব নয়। প্রেরিত পত্রের সারাংশ তুলে পত্রিকাটি আরও জানিয়েছে, 'The embryonic and patriotic associations which exist in a few places in India have a very slight weight beyond their own four walls and none whatever beyond the sea.'[১৯৩] পারস্পরিক দলাদলি, আত্মবোধ 'ভদ্রলোক' মধ্যশ্রেণির মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, ফলে জাতীয় ঐক্যের প্রসঙ্গে সহমত গড়ে ওঠা ছিল অসম্ভব। 'এডুকেশন গেজেট'-এর পূর্বোল্লিখিত রচনায় বলা হয়েছে যে, দেশের বাঙালি 'ভদ্রলোক'বাবুদের এমন চারটি দল— প্রাচীন রক্ষণশীল হিন্দু, ধর্মান্তরিত গোঁড়া খ্রিস্টান বাঙালি, ব্রাহ্মবাবু এবং ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধ গোষ্ঠী। এ ছাড়াও উপদল ছিল আরও তা সহজেই অনুমেয়। আদিবাবুদের দলাদলি উনিশ শতকের শেষ

পর্বে এসে বিচিত্র ও অগনন রূপে বিরাজিত; এবং উল্লেখ্য যে, শিক্ষিত বাঙালিবাবুদের দলাদলিও প্রায়শই ধর্মবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

'ভারত-উদ্ধার কাব্যে'র বিপিনকৃষ্ণ, কামিনীকুমার, সুরেশ প্রমুখেরা মিলেও ওইরূপ ক্ষুদ্র একটি দল, যারা শখের 'স্বাদেশিকতা' ও 'দেশোদ্ধারে'র কল্পনায় মত্ত। নানা দুর্বল ও অসম্ভব যুক্তি বিস্তার করে সুরেশের প্রতিবাদকে হেলায় উড়িয়ে দিয়ে 'বিনা রক্তপাতে' ইংরেজকে পরাজিত করে যাতে 'ভারত উদ্ধার' করা সম্ভব হয় সে ব্যাপারে 'উপায়' চিন্তা করতে বলেছে বিপিন। তার বক্তব্যকে সমর্থন করে কামিনীকুমার জানিয়েছে, যদি ইংরেজকে পরাস্ত করা সম্ভব হয়, তবে তো 'সফল জন্ম', আর তা যদি নাও হয়, তবুও—

'পরাজয় যদি
স্বদেশ উদ্ধার হেতু, নাহি লাজ তায়।
ফাঁসি দিতে চাহে যদি বিজয়ী ইংরেজ,
লইব না গলে ফাঁসি, কি ভয় হে তবে?—'

এই 'বীরজনোচিত' প্রলাপ শেষে 'গভীর মন্ত্রণা, বিতর্ক, সিদ্ধান্ত' গৃহীত হয় সভ্যবৃন্দ দ্বারা। আর তারপর সভা ভঙ্গ হলে 'সভ্য-ভুজঙ্গম' সকলে 'যে যার বিবরে গেল গর্জিতে গর্জিতে'।

'উদ্‌যোগ' নামক চতুর্থ সর্গে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাঠ ও বাঁশ সংগ্রহ, বিপুল পরিমাণে ছাতু ক্রয় করে সুয়েজ খালের দিকে প্রেরণ এবং পথিমধ্যে আরবের আমিরের সঙ্গে কূটনৈতিক সন্ধি স্থাপন এই শর্তে যে—

'নিয়ম হইল এই— আমীরের রাজ্যে
বিপিন পাইবে পথ বাঙালীর তরে
অবারিত, হৈলে পরে ভারত-উদ্ধার,
ভারতের অর্ধ অংশ আমীর পাইবে।'

কী তীক্ষ্ণ কুশলী রাজনৈতিক ivony ! ভারতের মাটি থেকে ইংরেজ-উৎখাত ও পরাধীনতার গ্লানিমোচনের বিনিময়ে ভারতেরই অর্ধাংশ তুলে দেওয়া অপর বিদেশি শাসকের হাতে! ইন্দ্রনাথ সম্ভবত সমকালের 'ভদ্রলোক' বাবুদের দিশাহীন রাজনৈতিক বোধের অপরিপক্কতার দিকে কটাক্ষ করেছেন। বিপিনদের অবশ্য সে বোধ নেই। বিপুল পরিমাণে লঙ্কা ক্রয় করে, চিৎপুরের খালধার থেকে মাটি তোলার নাম করে ফোর্ট উইলিয়াম পর্যন্ত সুড়ঙ্গ খুঁড়ে সেই লঙ্কা এবং বাজার থেকে সংগৃহীত পটকা দ্বারা বোঝাই করেছে তারা। এদিকে কামারেরা বঁটি আর ছুতোরের দল বঁটির বাঁট ও বাঁশ দিয়ে পিচকারি তৈরি করতে মগ্ন। 'ভারতে-ভরসা' 'বাঙালীর চূড়া' বিপিনকৃষ্ণের দল কেউ 'কোঁচান উড়ানী বুকে' বাঁধা-পিরাণ গায়, কেউ ইজের-চাপকান-কার্পেটের টুপি মাথায় দিয়ে 'ভারত-উদ্ধারে'র তদারকিতে মত্ত। অতঃপর, পঞ্চম তথা 'উদ্ধার' নামক শেষ সর্গে এই সুদূরপ্রসারী ও সুপরিকল্পিত রণনীতির ফল ফলল। ইংরেজরা পরাজয় বরণ করল। কিন্তু যুদ্ধের কাল্পনিক ফল নয়, এই অংশে মুখ্য হয়ে উঠেছে যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে বিপিনকৃষ্ণের বীরত্বের ছদ্ম-আবরণের আড়ালে লুকিয়ে থাকা চিরকেলে বাঙালিরবাবুর ছা-পোষা, গৃহগতপ্রাণ, ভীরু হৃদয়ের চিত্র। মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুরা মিলটন-বায়রন পড়েই কাল্পনিক বীরত্ববিলাসে মগ্ন; যতটা তাঁরা কথায় দড়ো, ততটা কার্যক্ষেত্রে নয়। যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে তাই বিপিনকৃষ্ণের মনে ভয়, পদে পদে দ্বিধা, মনের

বাসনা— যদি কোনোভাবে যেতে না হয়। 'বিশুষ্কমুখে' বিপিন স্ত্রীর কাছে বিদায় নিতে গিয়ে তাই, 'ঝর ঝর করে' কেঁদে ফেলে বারবার। স্ত্রী সব শুনে 'যুদ্ধে যাওয়া হইবে না, কোথায় বাজিবে অঙ্গে' বললে শিউরে উঠে, কাল্পনিক আসন্ন ব্যথা পাওয়ার ভয়ে বিপিনের সর্বাঙ্গ 'কাঁটা' দিয়ে ওঠে। বিপিনের পড়াশোনা না জানা স্ত্রী সরল মনেই বলেছে,—

'বলি প্রাণনাথ,
দেশ ত দেশেই আছে, কি আর উদ্ধার?
এতই অমূল্য ধন স্বাধীনতা যদি
নিতান্তই দিবে যদি সে ধন কাহারে,
আমারেই দাও নাথ, লব শিরঃপাতি,
আমি তব চির দাসী।'

সাধারণভাবে, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার ব্যাপারে ইন্দ্রনাথের অবস্থান ছিল রক্ষণশীল। কিন্তু মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের চেতনাও এ ব্যাপারে যথেষ্ট 'আধুনিক' ছিল না। ব্রাহ্মগণ এবং ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানরা স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার ব্যাপারে উদারতা দেখালেও সার্বিকভাবে দেশে স্ত্রীশিক্ষা ও প্রগতির ব্যাপারটি উপেক্ষিতই হয়েছিল। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণিও এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না। যদিও তাঁদের জীবনধারণ হত পাশ্চাত্য চিন্তা ও চেতনার ভাবপরিমণ্ডলে। বিপিনের স্ত্রীর স্বাধীনতা-কামনা এবং পরিবর্তে 'বুঝিবে না মর্ম্ম তুমি' বলে বিপিনের আত্মরক্ষায় সেদিকেই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সুনিপুণ ব্যঙ্গে ইন্দ্রনাথ মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক' বাবুদের প্রগতির মুখ ও মুখোশ আলাদা করে দিয়েছেন।

'ভয় যদি নাই তবে চক্ষে জল কেন?' প্রিয়ার এহেন প্রশ্নবান বাক্সর্বস্ব বাঙালি মধ্যশ্রেণির বাবুদের প্রতিনিধি বিপিন সামলেছে যথেষ্ট কৌশলে; সে বলেছে,—

'যাত্রা-কালে নেত্র জল বাঙালী কল্যাণ,
উদ্দেশ করিয়া যদি কোনো কাজে যাই
গৃহ ছাড়ি দুই পদ, কান্দিবারে হয়।'

এ কথায় আশ্বস্ত হয়ে বিপিনকৃষ্ণের পত্নী চিরকেলে বাঙালি ঘরের বধূটির মতোই বলেছে,—

'নিতান্তই যাবে যদি হৃদয়-বল্লভ,
নিতান্তই দাসীর কথা না রাখিবে যদি,
(ফুকারি কান্দিয়া এবে উঠিলা বিপিন)
আলু-ভাতে ভাত তবে দিই চড়াইয়া,
খাইয়া যাইবে যুদ্ধে।— বিপিন সম্মত।'

দেশোদ্ধারের জন্য বাঙালি মধ্যশ্রেণির গালভরা প্রচেষ্টা, শাসকের সঙ্গে লড়াই, তার প্রাক্কালে 'আলু-ভাতে ভাত' খেতে সম্মত হবার মধ্যে বাঙালিবাবুর নখদন্তহীন ভীরু-দুর্বল চরিত্র স্বভাবই প্রকট হয়ে উঠেছে। এই ভাব-বৈপরীত্যই উক্ত শ্রেণির প্রতি কবির ব্যঙ্গদৃষ্টি উন্মোচিত করে দিয়েছে। 'ক্ষুদিরাম' নামক ক্ষুদ্র উপন্যাসেও (লেখকের ভাষায় 'গাল-গল্প') নিবারণ নামক চরিত্রের মুখে বাঙালির দেশোদ্ধারের অবাস্তব

ও ভ্রান্ত আদর্শের প্রতি ইন্দ্রনাথ কটাক্ষ করেছিলেন। কেউ কেউ একে 'রক্ষণশীল' দৃষ্টিভঙ্গি বলতেই পারেন, কিন্তু এই 'রক্ষণশীলতা' স্যাটায়ারিস্টের (satirist) গুণ। সাধারণভাবে 'he operates within the established framework of Society, accepting its norms, appealing to reason (or to what his society accepts as rational) as the standard against which to judge the folly he sees. He is the preserver of tradition, the true tradition from which there has been grivious falling away'.[১৯৪] ইন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও আমরা সদৃশ রক্ষণশীলতা লক্ষ করি। আসলে নিজের দেশ-কাল-সংস্কৃতির ব্যাপারে অনভিজ্ঞ, কেবল পাশ্চাত্য জ্ঞান-চিন্তার আধারপুষ্ট কতিপয় ধারণাসর্বস্ব শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের 'হুজুগে' স্বদেশপ্রেম তিনি অসহ্য বোধ করেছেন। কারণ, তাঁদের চিন্তাচেতনা আসলে দেশের জন্য নয়, কারণ দেশ সম্পর্কিত বোধ (Idea of Nation) তখনও পর্যন্ত মধ্যশ্রেণির চিন্তাজগতে নির্দিষ্ট রূপ লাভ করতে পারেনি, আসলে তা আত্মমুখী-আত্মসর্বস্ব ভাবনার উদ্দীপন মাত্র; ব্যক্তিক লাভালাভের চিন্তাটিও অপ্রত্যক্ষ নয়। ফলে এহেন মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের ভণ্ডামিকে তিনি ব্যঙ্গের লক্ষ্য হিসাবে নির্দিষ্ট করেছেন। একথা যথার্থ যে, বিশ শতকের আগে বাঙালির চিন্তাচেতনায় যথার্থ 'স্বদেশের ধারণা' অভিব্যক্ত হয়নি। এই সময়কার দেশপ্রীতির চেতনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র পাল স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে,[১৯৫] উনিশ শতকেও দেশপ্রেম ছিল, কিন্তু বাস্তবতার পরিবর্তে তা ছিল আবেগসর্বস্ব। এ দেশপ্রেমের উৎস ছিল ইংরেজি সাহিত্য, ইউরোপ ও আমেরিকার ইতিহাস, পাশ্চাত্য দেশগুলির স্বাধীনতা-যুদ্ধের কাহিনি ইত্যাদি। বস্তুত ভারতবর্ষের ভাবধারা-চিন্তাচেতনায় অভ্যস্ত হওয়ার পরিবর্তে আমরা ইউরোপীয় ধ্যানধারণায় পুষ্ট হয়েছি। ফলে আমাদের দেশপ্রেম আসলে ছিন্নমূল বিজাতীয় এক ধারণা, দেশের সঙ্গে যার নাড়ির যোগ নেই বললেই চলে। 'দেশ' সম্পর্কে কোনো ভালোবাসার বোধ এর মধ্যে ছিল না। এ যেন অখ্রিস্টানদের প্রতি খ্রিস্টানদের ভালোবাসা, যাদের মুক্তির জন্য নিজ স্বার্থেই তারা আগ্রহী।

মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের দেশপ্রীতি যে ব্যক্তিগত স্বার্থবাহী, সে ব্যাপারে ইন্দ্রনাথের কোনো সংশয় ছিল না। যে 'ভদ্রলোক' বাবুকুল পিতৃ-পিতামহের আচারবিচার সংস্কার সব ত্যাগ করে নির্দ্বিধায় 'হ্যাট-কোট-পেন্টুলুন'-এর সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে পারে, নিজ স্বার্থের প্রয়োজনে তাঁরা সব কিছুই করতে পারেন। ফলে 'ভারত-উদ্ধার কাব্যে' যে বিপিনকৃষ্ণ ইংরেজ বিতাড়নের আদর্শ কল্পনায় মত্ত ছিল, তাকেই 'ভলান্টারি কাব্যে' দেখা যায় ভারতে রুশ আক্রমণের সম্ভাবনায় ভীত-সন্ত্রস্ত ইংরেজ শাসককে সাহায্যের জন্য উদ্যোগী হতে। ইংরেজ শাসকের কৃপাধন 'ভদ্রলোক'বাবুদের প্রতিনিধি হিসাবে বিপিনকৃষ্ণ বলেছে[১৯৬] :

'রাজভক্ত
মোরা, ব্যক্ত চরাচর; হইবে সমর
যুঝিব, বুঝিব বল ভল্লুকের কত;
দাঁড়াইয়া সিংহ পাশে, বাড়াইয়া বাহু
ছুঁড়িব বন্দুক মোরা দুডুম দুডুম;-
বীরত্ব দেখিয়া সবে চমকিয়া যাবে।'

যদিও 'ভদ্রলোক'বাবুদের এই বীরত্বের আস্ফালন যে মৌখিক, তা বেশ বোঝা যায়, যখন বিপিনকৃষ্ণ সভাস্থ সকলকে বন্দুক চালনা শেখাতে গিয়ে গলদ্‌ঘর্ম হয়। কাউকে মাথায় ছাতা ধরতে বলে, কাউকে

বলে পাখা করতে, আর এক জনকে বলে জোরে তার কোমর চেপে ধরতে, অন্য আর এক জনকে ডাকে 'আগুন দিবার লাগি', সেইসঙ্গেই চাকরকে ডেকে ব্র্যান্ডি ও সোডা জল প্রস্তুত করে রাখবার আদেশ দেয়। সহাস্য ব্যঙ্গের চাবুকে বাঙালি 'ভদ্রলোক'বাবুদের বীরত্বের মুখোশ খসে পড়ে তখন। 'সিংহ' ছিল ব্রিটিশ ভারতে ব্রিটেনের রাজ-শাসনের প্রতীকচিহ্ন। সেকালের শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের কাছে এই 'সিংহে'র প্রতীক ছিল গর্বের বিষয়, পরম আকাঙ্ক্ষিত। রাজভক্তির প্রতীক স্বরূপ অনেকেই আপন বসতবাড়িতে সিংহের মূর্তি স্থাপন করতেন তোরণশীর্ষে, কিংবা ঠাকুরদালান অথবা অট্টালিকার কোনো মার্গশীর্ষে। বিপিনকৃষ্ণও 'সিংহপাশে' দাঁড়িয়ে 'রাজভক্ত' বাঙালি মধ্যশ্রেণি হিসাবেই যুদ্ধ করবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে, কারণ—

'অবশ্য যাইব রণে, নতুবা কেমনে ইংরাজ,
রক্ষিতে সক্ষম হবে আমার ভারত?'

বাঙালি শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের 'আমার ভারত' বোধের রক্ষাকর্তা ইংরেজ, এর চেয়ে অদ্ভুত আর কীই-বা হতে পারে? বাঙালি মধ্যশ্রেণির বাবুদের এই স্বভাব-বৈপরীত্য দেখা গিয়েছিল ১৮৫৭-র সিপাহি বিদ্রোহের সময় থেকেই। বাঙালি মধ্যশ্রেণির বাবুদের ইংরেজ-প্রীতি তাঁদের সেদিন নীরব করে রেখেছিল। এমনকী ঈশ্বর গুপ্তের মতো তথাকথিত রক্ষণশীল স্বদেশী এই যুদ্ধে মনেপ্রাণে ইংরেজ-শাসকের জয় চেয়েছিলেন।[১৯৭] শিক্ষিত বাবুকুলের যে 'স্বদেশপ্রীতি'র আদর্শ ছিল ইউরোপীয় তথা ইংরেজি সাহিত্য-দর্শন, তাঁরা যে মনে প্রাণে আদতে 'ইংরেজ' হয়ে উঠতে চাইবেন এতে আর আশ্চর্য কী। 'পাঁচু-পুরাণে শিব-নারদ সংবাদ' নামক কবিতার এই 'ইংরাজী শিক্ষা'কে 'ঘোড়ার ডিমে'র সঙ্গে তুলনা করে, ইংরেজিশিক্ষিত বাবুকুলকে উক্ত ডিম হতে নির্গত 'অপূর্ব্ব জীব অদ্ভুত আকার' বলা হয়েছে, [১৯৮]

'মুখাকৃতি দাড়ি গোঁফ হস্তপদ আদি।
রাখয়ে সর্ব্বদা দেহ পোষাকে আচ্ছাদি॥
শিরে টুপি জেবে ঘড়ী আর ঝোলা চেন।
পায়েতে বিলাতী বুট পরা পেন্টুলেন॥
দেখিয়া মানুষ ভ্রম হয় সবাকার।
লাফাইয়া চলে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার॥'

দেখা যাচ্ছে, উনিশ শতকের শেষ পাদে পৌঁছে 'বাবুত্বে'র পরিবর্তিত তুলাদণ্ডটি বিলিতিয়ানা ও স্বদেশিয়ানার লড়াইয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচ্য হচ্ছে। রক্ষণশীল স্বদেশীয়ানার চোখে বাবুদের শিক্ষাদীক্ষা-সংস্কৃতি যেহেতু বিজাতীয় নকল, অতএব পরিত্যাজ্য; অন্যদিকে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুরা স্বদেশীয়ানাকে কূপমণ্ডুক মনে করে জীবনযাপনে বিলিতি হয়ে উঠতে ব্যস্ত। 'বাঙ্গালার আত্ম-শাসন' কবিতায় এই নতুন বাবুকুলের মোক্ষ সম্পর্কে বলতে গিয়ে ইন্দ্রনাথ বলেছেন যে,[১৯৯] এঁদের কাছে 'স্বর্গের সিঁড়ি' হচ্ছে নির্বাচন-প্রণালী, 'মোক্ষফল' হচ্ছে কমিশনারের পদলাভ, 'গোলোক ধাম' মিউনিসিপ্যাল গৃহ এবং ভোটই হচ্ছে এঁদের ধ্যানজ্ঞান। যদিও তার সাহায্যে নিজ স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া সমষ্টির কোনো মোক্ষলাভ অসম্ভব। 'একটি গান'-এ ইন্দ্রনাথ নতুন মধ্যশ্রেণির বাবুকুলের আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করেছেন,[২০০]

'আমি চাই মিউনিসিপাল-মান।...

*　　*　　*　　*

(যদি বলো, তাতে লাভ কি?)—
লাট-মহলে আনা গোনা,
(আর,) দশের মাঝে চেনা-শুনা,
　　বালাখানা কি শ্বেতখানা,
　　সকল ঘরে অধিষ্ঠান।...

*　　*　　*　　*

পাই যদি রায়-বাহাদুরী,
হলেমই বা লবেজান
আমি চাই মিউনিসিপালমান।'

আদি ও নববাবুরা সমাজে 'মান' কুড়োতে গিয়ে দেদার অর্থ ব্যয় করতেন, উদ্ভট-অদ্ভুত নানান খামখেয়ালিপনা করে ইতিহাস হয়ে উঠতেন, কিন্তু সেখানে তাঁদের সেই শখ-আহ্লাদের সঙ্গে সমষ্টিরও একটা অংশগ্রহণ ছিল।বাইনাচ, বুলবুল লড়াই, নাট্যাভিনয় কিংবা আখড়াই-হাফ আখড়াই ইত্যকার পালা-পার্বণের গোপন লক্ষ্য 'মানলাভ' হলেও, বাহ্যত এ আনন্দে ছিল সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেবার দিকটিও। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের 'মানলাভে'র আকাঙক্ষা প্রত্যক্ষ তাই 'ভীষণ', পথ সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির দ্বারা নির্দিষ্ট ফলে দৃষ্টিকটু, সর্বোপরি সমষ্টির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র মানসিক বলয়ের বাসিন্দা হয়েও আবার সেই সমষ্টির কাছেই মানভিক্ষা অতএব ঘৃণাই, ব্যঙ্গযোগ্য। সম্ভবত এ কারণেই আদি ও নববাবুরা যাবতীয় অসামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা সত্ত্বেও সমকালীন সমাজের চোখে সস্নেহ প্রশ্রয় পেয়ে এসেছেন, অন্যদিকে মধ্যশ্রেণির বাবুরা পেয়েছেন কেবল ক্রোধ-ঘৃণা-উপহাস। 'বাবু' শব্দটির ব্যঙ্গার্থক প্রয়োগের পশ্চাতে মধ্যশ্রেণির বাঙালি 'ভদ্রলোক'দের জীবনদর্শন ও জীবনাচরণ অনেকটাই দায়ী, সে কথা অবশ্যস্বীকার্য।

'বাঙালীর ছেলে' শীর্ষক কবিতাগুচ্ছ মধ্যশ্রেণির বাবুদের লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে ইন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন,[২০১] এঁরা সর্বদাই 'কাব্যরসে' অস্থির; শাস্ত্রজ্ঞান-স্বদেশী সংস্কৃতির বোধ নেই বললেই চলে, কেবল বিলিতি বুলি মুখে, ঠিক যেন 'পাকা ছাঁদে কাঁচা ভাব'; এঁদের পিঠে-পায়েস মুখে না রুচলেও চাচার 'চপ কারি চাই'; মদ্যপান প্রায় সামাজিক ট্যাবুতে পরিণত; এঁরা পেশায় কেরানি— 'মাছি মেরে কাপি করে বাহাদুরি তাতে'; অথচ—

'যখন বক্তার বেশ, চোখে দিয়া ঠুলি,
গলা চিরে ঝাড়ে তোতা বিদেশীর বুলি।
মাথামুণ্ডু মুর্গি মটন, বিলক্ষণ টান,
কালিয়ে কাবাব পেলে দেমাকে অজ্ঞান॥
বুক ফোলাতে, চেন ঝোলাতে, চূড়ান্ত নিপুণ,
"চিয়ার" "হিয়ার" গোলে চতুর্ম্মুখ খুন,

গরমদিনে জামাজোড়া জবড়জং হয়ে,
ঠান্ডা রেতে হাওয়া খাওয়া বাগান-বাড়ী পেয়ে।
চক্ষু মুদে চোরা যেন— ব্রেহ্ম সভায় গেলে,
ঘুঙুর পায়ে ঝুমুর নাচে মদের বোতল পেলে,—'

উনিশ শতকের শেষদিক থেকেই ইংরেজের শিক্ষাব্যবস্থার ফল ফলতে শুরু করেছিল। মেকলের পরিকল্পনা মতো বাঙালি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী 'নব্যবাবু'রা মধ্যশ্রেণির পর্বান্তরের মধ্য দিয়ে মাছি-মারা কেরানিতে পরিণত হয়েছিলেন। এঁরা না পারছিলেন উচ্চবর্গের সামাজিক অবস্থানে পৌঁছোতে, না পারছিলেন নিম্নবর্গের আসনে নিজেদের কল্পনা করতে। অতএব ত্রিশঙ্কুর মতোই তাঁরা বহিরঙ্গে বিলিতি এবং অন্তর ধর্মে 'আয়েসী' বাঙালি হয়ে উঠলেন। এঁদের কাজকর্মের বড়াই কেবল 'চোটের চাপড়ে', লেখকের মতো—[২০২]

'নিজে ঘাটে, অন্যে দোষে, মুখের সাপট,
চৌদ্দতে মলি না তবু পদ্যের দাপট,
বাঙালীবাবুর জোড়া কোথা গেলে মেলে—'

বাঙালিবাবুমাত্রেই স্বভাবভীরু, অলস, কাজের চেয়ে কথায় বেশি দড়ো; সেইসঙ্গে তাঁর চরিত্রে মানসিক Conflict- ও প্রকট। যে বাঙালিবাবু মুখে স্বদেশবোধের কথা, পরাধীনতার যন্ত্রণার কথা আওড়ান, তাঁর ক্ষেত্রেই আবার দেখা যায় 'দরবারে দাঁড়াতে পেলে আটখানা হন বাবু'[২০৩]। এই দ্বিচারিতার কারণেই বাঙালি 'বাবু' ক্রমশই হাস্য-পরিহাসের উপাদান হয়ে উঠলেন, যদিও তার পশ্চাতে অনেকখানি মনোবেদনা লুকিয়ে আছে। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্দ্রনাথের শ্লেষ-ব্যঙ্গের (Satire) প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'ইন্দ্রনাথের শ্লেষ-ব্যঙ্গ উদ্দেশ্যশূন্য ছিল না। কেবল হাসাইবার জন্য তিনি হাসাইতেন না। তাঁহার হাসির নিম্ন স্তরে হতাশার দীর্ঘশ্বাস যেন ফুটিয়া উঠিত। তাঁহার হাসির হলহলার মধ্যে শোকের সকরুণ রোদন ধ্বনি শুনা যাইত। দেশের দুঃখ ও সমাজের অধোগতি দেখিয়া রোদনে কুলাইত না বলিয়াই তিনি হাসিতেন।'[২০৪] সমকালীন জীবনে বাঙালিবাবুর ক্রম 'অধোগতি' দেখে ব্যথিত ইন্দ্রনাথ 'বাবু'দের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েছিলেন। তাঁর ব্যঙ্গ তাই নিছক ব্যঙ্গ নয়, তিনি আসলে চেয়েছিলেন 'অদ্ভুত জীব' বাবুরা শোধিত হয়ে আবার জাতীয় গৌরবের অংশীদার হোক। কিন্তু ইন্দ্রনাথের এই কামনা সর্বার্থেই তাঁর যুগের কামনা। সেই সময়ের বটতলা ও মূলধারার রক্ষণশীল লেখকদের সমাজ পরিশোধনের তাগিদ তাঁদের রচনায় ভাষা পেয়েছে। আবার এই পরিশোধনের আকাঙ্ক্ষা থেকেই বাবুকুলকে 'আপনার মুখ আপুনি দেখ' বলে তাঁরা যে আয়না ধরেছেন, তারই প্রভাবে 'বাবু'রা ক্রমশ উপহাসের গভীর তলদেশে নিমজ্জিত হয়েছেন। উনিশ শতকের শেষদিকের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির লাগাতার ব্যঙ্গবিদ্রূপ-আক্রমণের কথা জেনে বাবুকুলের প্রতি বাঙালি সাধারণের ঘৃণা-ক্রোধ-দাহ ক্রমে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল। 'বাবু'কে তার সামাজিক আভিজাত্যের আসন থেকে টেনে নামিয়ে এ কারণেই নিক্ষেপ করা হল চির উপহাসের অনন্ত গহ্বরে। এই শতকের প্রারম্ভে 'বাবুত্বে'র যে মহিমা জনমানসে ভীতি-সম্ভ্রম-শ্রদ্ধার কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ লাভ করেছিল, শতকের শেষে বিবর্তিত বাবুকুল তার সিকিভাগও ধরে রাখতে পারলেন না। এক হিসাবে এই পর্বকে বাঙালিবাবুর অবক্ষয়ের পর্ব বলা যায়। ক্রমশ উনিশ শতকের শেষ দিকে পৌঁছে দেখব, অভিজাতবাবু থেকে নববাবু-নব্যবাবু-'ভদ্রলোক'বাবুর পথ বেয়ে বাঙালিবাবুর চরম পরিণতি কেরানিবাবু'তে। এর চেয়ে নির্মম অভিজ্ঞতা সমাজের পক্ষে, 'বাবু'দের পক্ষে আর কীই-বা হতে পারে?

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুরা আচার-আচরণ, আদবকায়দা তথা জীবনযাপন পদ্ধতি ক্রমশ নিন্দাপঙ্কে নিমজ্জিত হচ্ছিল। এর অন্যতম কারণ, জীবন সম্পর্কে প্রচলিত সমাজ দৃষ্টির পরিপন্থী জীবনদর্শন। মেকলের শিক্ষানীতি ইংরেজ শাসকের প্রতি বশংবদ মধ্যশ্রেণির নির্মাণে আস্থাশীল ছিল, কালক্রমে তা হয়েছিল সত্য, বরং আরও এক ধাপ এগিয়ে ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুরা স্বদেশের সমাজ-সংস্কৃতি সব কিছুকেই অস্বীকার করতে চেয়ে দেশীয় ঐতিহ্য-সংস্কৃতির ভিতকে বিপন্ন করে তুলেছিল। ফলে দেশীয় সংস্কৃতির হোতাদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। খ্রিস্টধর্মের পাশাপাশি মধ্যশ্রেণির মধ্যে ব্রাহ্মধর্মের রমরমা ও ব্যাপকতা লক্ষ করে সামাজিক প্রতিরোধের পাশাপাশি ধর্মীয় প্রতিরোধের প্রচেষ্টাও শুরু হয়। এই বাংলায় 'হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা'র সূচনা ও বাড়বাড়ন্ত ক্রমশ শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে বাকি সমাজকে ধরে রাখার প্রচেষ্টা থেকেই শুরু হয়। হুতোমের সমকালেই ইংরেজের নকলনবিশ বাবুদের প্রতি রক্ষণশীলদের হুংকার ও বিষোদগার গদ্য-পদ্য-কবিতা পুস্তকের অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে। এগুলির সাহিত্যমূল্য অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু সামাজিক মূল্য অসীম। অজ্ঞাত লেখকের লেখা ৯২ নং আহিরীটোলা থেকে প্রকাশিত (১৮৬৩) 'ইয়ং বেঙ্গল ক্ষুদ্র নবাব' নামক ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থটি যেমন। গ্রন্থটিতে লেখক 'ইয়ং বেঙ্গল' নামের প্রতীকে ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির জীবনযাপন এবং দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেছেন।[২০৫] শিক্ষা, বিশেষত ইংরেজি শিক্ষা বাঙালি মধ্যশ্রেণির মানসিক রুচির যে ব্যাপক পরিবর্তনের জন্য দায়ী, সে ব্যাপারে লেখক নিঃসংশয় :

> 'ইয়ং বেঙ্গল্ এই হোয়েছে কি কাল।
> চাল চুলো নাহি যার আরো লম্বা চাল॥'

যাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে নিম্নবিত্ত কিংবা নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান ছিলেন, দু'চার পাতা ইংরেজি পড়েই তাঁরা একেকজন 'ক্ষুদ্র নবাব' হয়ে উঠেছেন দেখা যায়। 'কোঁচা কাচা' দিয়ে বেশবাস করে আর এই 'বাবু'দের দল 'বাহিরের বাবুয়ানা' দেখান না। তাঁর বেশ এখন প্যান্টালুন, মোজা, চাপকান; সঙ্গে থাকে গার্ড ওয়াচ, 'আলবার্ট' ফ্যাশনে'র ছাঁটাচুলের বাহার, মুখে চুরুট। হঠাৎ দেখলে মনে হবে 'পিঁদরুসের হেল্লে ছেলে' শুধু পোশাকি বাবুয়ানাতেই নয়, বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও নিজ শ্রেণি ও নিজসংস্কৃতির প্রতি আচার-ব্যবহারেও এই বাবু' আলাদা :

> 'ঝাড়েন ইংরাজী বুলি কথায় কথায়।
> ইংলণ্ডে বরণ যেন এমন জানায়॥
> মুখেতেও বলা আছে সদা সর্ব্বক্ষণ।
> বাঙ্গালা কহিতে আমি পারিনে কখন॥...
> ফরন্‌সিং টাইম্ লাস বিবেচনা করি।
> ন্যাষ্টি ভাষা বেঙ্গালি এ কেয়ারে না ধরি॥'

নতুন এই মধ্যশ্রেণির 'বাবু'দের চোখে বাংলাভাষার গ্রন্থাদিতে যেহেতু কোনো 'মরেল্' (moral) নেই, অতএব ওগুলি পরিত্যাজ্য। বাংলার চেয়ে ইংরেজি 'নিউজ-পেপার'-এর দিকেই তাঁদের মনের ঝোঁক। যদিও অনেকেরই ইংরেজিয়ানা নিছক 'বাহারি-পোশাকি', সাহেবদের কাছে তার ফলে 'নাথি খেয়ে মরে', যদিও তৎসত্ত্বেও তাঁদের 'দেমাক' কিছু কমে না। এঁরা মদ্যপ, হোটেলের অখাদ্য-কুখাদ্যপ্রিয়, নিজগৃহ ছেড়ে

বাগানবাড়িতে গিয়ে বাস ও নানাপ্রকার নিষিদ্ধ আমোদপ্রমোদে সদাতৎপর, ধর্মাধর্মজ্ঞানহীন; বস্তুত নববাবু এবং নব্যবাবুদের দোষগুণগুলির সমবায়ে এই মধ্যশ্রেণির 'বাবুকুল' সৃষ্টি হয়েছেন। নববাবুদের জীবনযাপন, বিলাসিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল একান্তভাবেই তাঁদের ব্যক্তিগত; নব্যবাবুদের জীবনযাপন এবং কাজকর্মে গোষ্ঠীজীবন ও সামাজিক জীবনের এক সুমিত সমন্বয় লক্ষ করা গিয়েছিল অন্তত প্রথমদিকে; কিন্তু মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক' বাবুদের জীবনযাপন ও দৃষ্টিভঙ্গি আদতে ব্যক্তিগত হয়েও সামাজিকতার বাহ্যিক ভণ্ডামির মুখোশে ঢাকা। এঁরা কথায় যেমন দড়ো, কাজে তেমন নয়।—

'ক্ষুদ্র নবাবের হয় মেজাজ যেমন।
ফলে কিন্তু কাজে কভু হয় না তেমন॥
রাজা-উজিরের লয় কথায় গদ্দান।
কথায় কথায় করে লক্ষ টাকা দান॥
কাহার সুখ্যাতি নাহি করেন কখন।
আপুনি সবার সেরা ভাবেন এমন॥
বিদ্যাতে নাহিক কেহ তাহার সমান।
বুদ্ধিতে তাহার সম নাহি বুদ্ধিমান॥
ব্যয়েতে কেমন বাবু বলিতে পারিনে।
হাতে নাই টাকা তাই ও কাজ দেখিনে॥
যেখানে হইবে পার্টি যুটে যায় আগে।
খাবার সময় কিন্তু খাওয়া ইতে ভাগে॥
গতিবিধি আছে প্রায় সকল সভায়।
বিশেষতঃ মহোদয় বাবু দেখে যায়॥
নামমাত্র মহোদয় ফলে তাহা নয়।
কালের গতিকে লোকে বলে মহোদয়॥'

ইতিপূর্বেই আমরা বলেছি যে, অর্থনৈতিক কারণে বাঙালি মধ্যশ্রেণি ভূমধ্যাধিকারী নববাবুদের মতো বিলাসিতা বা দানধ্যান-পুণ্যকর্মে যথেচ্ছ ব্যয়ে সমর্থ ছিল না। নববাবুদের মতো বিলাসব্যসন-আড়ম্বরের 'বাবুয়ানা'য় তাঁরা অপারগ ছিলেন। কিন্তু নব্যবাবুরা এই ঘাটতি অনুরূপ পুষিয়ে নিয়েছিলেন তাঁদের প্রতিভা ও কর্মমুখী মানসিকতার দ্বারা। নানান সামাজিক আন্দোলন ও সংস্কারে তাঁদের কারোর কারোর অনুরূপ ভূমিকা তাঁদের 'মহোদয়' বাবুতে পরিণত করেছিল। কিন্তু শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুরা অধিকাংশই ছিলেন প্রতিভাহীন, নিছক প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার 'ফল' মাত্র। তাঁদের উচ্চাশা ছিল গগনস্পর্শী, কিন্তু কাজেকর্মে ছিলেন অলস, অপটু। সবচেয়ে বড়ো কথা, নব্যবাবুরা দেশীয় সংস্কার-সংস্কৃতিকে তুচ্ছজ্ঞান করলেও, দেশের মানুষের প্রতি তাঁদের দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করে নিতেন। কিন্তু শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির দেশের প্রতি, দশের প্রতি এই দায়বদ্ধতা ছিল মৌখিক, সভা-সমিতিতেই সীমাবদ্ধ। তা ছাড়া যে প্রীতি, যে সম্মানের বোধ থাকলে দেশের মানুষ ও তার সংস্কৃতির সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, দায়বদ্ধতা দেখা দেয়, সেই প্রীতি সেই সম্মান দেশের মানুষ ও তার সংস্কৃতির প্রতি মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের ছিল না।

এঁদের দেশহিতৈষণা আসলে ব্যক্তিগত হিতেরই রকমফের, অতএব মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের দল সাধারণের চোখে কখনোই সেই শ্রদ্ধা, সেই সম্মান লাভ করতে পারেননি, যা কিছুটা হলেও নববাবুরা এবং নব্যবাবুরা লাভ করেছিলেন।

শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের দেশীয় সাধারণের সঙ্গে এই যে বিচ্ছিন্নতার মানসিকতা, তা ক্রমশ বাঙালি 'ভদ্রলোক' শ্রেণির সাধারণ চরিত্রধর্মে পরিণত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক তার সমালোচনাও করেছেন :

> 'ক্ষুদ্র নবাবের কিন্তু যা থা ভিতরে।
> বাহিরে দেমাকে ফুলে উচ্চ চাল ধরে॥
> তেমন লোকের দিকে ফিরিয়ে না চায়।
> জিজ্ঞাসিলে কোন কথা নাহি দ্যায় সায়॥
> না হয় গম্ভির শব্দে হুঁটা টুঁটা মেরে।
> জিজ্ঞাসার কথা দ্যান একেবারে সেরে॥
> পুনঃ কথা যেবা কয় তাহার উপরে।
> চক্ষুলাল কোরে বাবু কন ক্রোধ ভরে॥ ...
> মুখের ভঙ্গিমা দেখে কেহ পুনর্ব্বার।
> জিজ্ঞাসা করেনা তারে কোন কথা আর॥'

মধ্যশ্রেণির বাঙালি 'বাবু'র এই চরিত্রমাহাত্ম্য বর্ণনা করে অজ্ঞাত লেখকের উপদেশ :

> 'এমন জনম পেয়ে আসিয়া ধরায়।
> যেজন না কর্ম্ম করে ধিক্ ধিক্ তায়॥
> কর্ম্মই মানব দেহ ধারণের সার।
> পাইয়ে মানব দেহ কর্ম্ম কর ভার॥'

অবশ্য, লেখকের এই উপদেশে তথাকথিত 'ইয়ং বেঙ্গল ক্ষুদ্র নবাবে'রা 'কর্ম্মযোগে'র কতটা আকৃষ্ট হয়েছিলেন বলা যায় না; কিন্তু একটা কথা স্পষ্ট যে, সাধারণ সামাজিক দৃষ্টি এই মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'বাবু'দের তেমন সুনজরে দেখেনি কখনোই। যে নব্যবাবুদের ক্রমপরিণতিতে মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের উত্থান, তাঁদের প্রতি সাধারণ সামাজিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে অবিমিশ্র অশ্রদ্ধা ছিল না; তাঁদের কেউ কেউ সমকালে সাধারণের কাছে খ্যাতিমান, শ্রদ্ধার্হ ছিলেন। কিন্তু এঁদের অনুগামী মধ্যশ্রেণির বাঙালি 'ভদ্রলোক'দের প্রতি নির্দোষ উপহাস নয়, বিষতিক্ত বিদ্রূপ-কটাক্ষ বর্ষণ করেছেন সেকালের সমাজ। বস্তুত, মধ্যশ্রেণির বাঙালিবাবুদের কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল, যে সীমাবদ্ধতা (limitation) ইয়ং বেঙ্গলদের হাত ধরেই এসেছে। সুশোভন সরকারের ভাষায়, 'The educated community of the 19th century failed to understand the exploiting character of the alien British rule in India, looking mainly at its immediate benefits; the protagonists of our "awakening" had little contact with or understanding of the toiling masses who lived in a world apart; the obsession with Hindu traditions and life kept at a distance the community of our Muslim fellow citizens.'[২০৬]

সমাজের বৃহত্তর সাধারণ শ্রেণির থেকে দূরে দাঁড়িয়ে নিজস্ব কল্পনা ও ভাবের সত্যকে যথাসর্বস্ব জ্ঞান করে উক্ত সাধারণ শ্রেণির উপর আরোপ করার এই প্রবণতার জন্যই মধ্যশ্রেণির ভদ্রলোক 'বাবু'রা চিরকাল বিদ্রূপ ও উপেক্ষারই অংশভাগী হয়েছেন। এ ব্যাপারে বটতলার জ্ঞাত-অজ্ঞাত লেখকেরা যেমন নিন্দামুখর, তেমনি তথাকথিত 'শিষ্ট' সাহিত্যধারার লেখকেরাও ব্যঙ্গবিদ্রূপে অক্লান্ত।

মনে রাখতে হবে, উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাধারণের জন্য প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলির কারণে শিক্ষিতের হার ক্রমশ বাড়ছিল, সেই অনুপাতে সংকুচিত হচ্ছিল চাকরির বাজার। ব্যাবসা-বাণিজ্য কোনোকালেই বাঙালিবাবুদের সাধারণ জীবিকা ছিল না। মোগল যুগে বাঙালি মূলত কৃষিজীবী শ্রেণিতে পরিণত হয়েছিল পুরোপুরি। উনিশ শতকের কালপর্বে কলকাতার উত্থানের প্রথম পর্বে এই পেশার প্রতি কতিপয় বাঙালিবাবুর আগ্রহ দেখা গেলেও, এই পর্বে বাঙালিবাবু মূলত দেওয়ান-মুৎসুদ্দি কিংবা পুঁজিপতির ভূমিকা পালন করেছে। বাঙালিবাবুদের সেই পুঁজিও মূলত সংগৃহীত হয়েছে স্থায়ী জমির আয় থেকেই। যে যে পুঁজি পরিকল্পনামাফিক ব্যয় করে বাঙালিবাবুরা পুঁজিপতি থেকে উদ্যোগপতি হয়ে উঠতে পারতেন, বাস্তবে স্বপ্ন ও পরিকল্পনার অভাববশত তা হয়নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কিছু নতুন জমিদারির উত্থান ঘটলেও, তাঁদের আয়-উপায় ও ক্ষমতা ছিল নির্দিষ্ট। জমিদারির আয়কে অন্যত্র লগ্নি করা কিংবা দীর্ঘমেয়াদি আয়ের বা লাভের উৎস হিসাবে গণ্য করা এঁদের চিন্তায় আসেনি। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষ থেকেই শিক্ষাদীক্ষার হাত ধরে এঁরা নেমে পড়েন চাকরির বাজারে। ক্রমশ, চাকরিজীবী শ্রেণি হিসাবেই বাঙালিবাবুরা একচেটিয়া প্রাধান্য লাভ করেন। তা ছাড়া ব্রিটিশ শাসকশ্রেণির প্রতি শিক্ষিত বাঙালির একপ্রকার মোহ ও মুগ্ধতা ছিল। মোগল আমলে দরবারি সংস্কৃতিতে ধর্মীয় ও সামাজিক নানান কারণে বাঙালির অংশগ্রহণ সীমিত হয়ে পড়েছিল। উনিশ শতকে বিমিশ্র কলকাতা কালচারে বাঙালিবাবুরা সহজেই শাসকের কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হিসাবে কলকাতার বাঙালিবাবুরা অনেক সুযোগসুবিধা (Advantage) অনায়াসেই পেতে পারতেন; পেয়েওছেন। কিন্তু ক্রমশ শিক্ষিত শ্রেণির সংখ্যা বেড়ে চলায় সরকারি চাকরির হার কমতে থাকে। সিপাহি বিদ্রোহের পর এ জাতীয় চাকরিতে নানান শর্ত ও বিধি-নিষেধও আরোপ করা হয়। অতএব বাঙালিবাবুরা গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় খুঁজতে থাকেন সাহেবি কোম্পানি বা সহযোগী অফিসে। শিক্ষিত কেরানিবাবুরা জন্ম নেন এভাবেই। কর্মক্ষেত্রে অনেক লাঞ্ছনা-অপমানের বিনিময়ে জুটত অল্প মজুরি, অথচ শিক্ষিতের অভিমান তাঁরা বিস্মৃত হননি। পাশ্চাত্য শিক্ষার হাত ধরে ছদ্ম দেশাত্মবোধ (যা আসলে ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার নামান্তর), রাজনৈতিক অসার আলাপ-আলোচনা, কল্পনাবিলাসের স্বাভাবিক পরিণতি সভা-সমিতি ও বক্তৃতা। সেইসঙ্গেই পত্র-পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ তথা আত্মপ্রচারের মোহে বাঙালিবাবুরা উনিশ শতকের শেষপাদে পৌঁছে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। এই উন্মত্ততা যে সামাজিক প্রগতির পক্ষে তেমন সহায়ক হয়েছিল, এমনটি নয়। অনেকটাই ছিল 'হুজুগ'। কিন্তু কেরানিবাবুতে পরিণত বাঙালি মধ্যশ্রেণি ক্রমশ একটা নির্দিষ্ট চরিত্রলক্ষণ প্রাপ্ত হচ্ছিল, এতে সন্দেহ নেই। শিষ্ট সাহিত্যেও 'বিষয়' হিসাবে উঠে আসছিলেন মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুরা তাঁদের যাবতীয় দোষ-ত্রুটি নিয়েই। যেহেতু এইসব লেখকেরাও ছিলেন মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'দেরই শ্রেণিভুক্ত, অতএব তাঁদের লেখনীকে আত্মসমালোচনা বলা ভুল নয়। স্বশ্রেণির মোহ ও বিভ্রান্তির সমালোচনায় এঁরা ছিলেন আশ্চর্যজনকভাবে সহানুভূতিশূন্য, নিরপেক্ষ ও নির্মম।

'মানসী' কাব্যের (১২৮৭ বঙ্গাব্দ) 'দুরন্ত আশা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তথাকথিত 'ভদ্র, শান্ত, পোষ-মানা' বাঙালিবাবুদের এ জাতীয় ভাবসর্বস্ব, অসার জীবনযাপন ও মানসিকতার সমালোচনা করেছেন—[২০৭]

'বেহালাখানা বাঁকায়ে ধরি
বাজাও ওকি সুর—
তবলা-বাঁয়া কোলেতে টেনে
বাদ্যে ভরপুর!
কাগজ নেড়ে উচ্চস্বরে
পোলিটিকাল তর্ক করে,...
দম্ভ ভরা কাগজগুলো
করিয়া দাও দূর।'

বস্তুত, উনিশ শতকে বাঙালি মননে রাজনীতির এই ব্যাপকতায় আদতে ছিল অন্তঃসারশূন্য হুজুগ মাত্র। যে শাসক-শ্রেণির বিরুদ্ধে আবেদন-নিবেদনের, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কথা বলতেন তাঁরা, আদতে তাঁদেরই উচ্ছিষ্টে প্রতিপালিত হতেন বলে, মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের কথায় যতটা ভার ছিল, ধার ততটা নয়। সুশোভন সরকারের পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্যে যে 'alienation'-এর কথা ছিল, ছিল শাসকের প্রতি বিনম্র মোহের কথা, রবীন্দ্রনাথ সমকালেই সেকথার উল্লেখ করেছেন এই কবিতায়—

'দাস্যসুখে হাস্যমুখ,
বিনীত জোড়-কর,
প্রভুর পদে সোহাগ-মদে
দোদুল কলেবর!
পাদুকাতলে পড়িয়া লুটি
ঘৃণায় মাখা অন্ন খুঁটি
ব্যগ্র হয়ে ভরিয়া মুঠি
যেতেছে ফিরি ঘর।
ঘরেতে বসে গর্ব কর
পূর্বপুরুষের,
আর্যতেজ দর্পভরে
পৃথ্বী থরথর!'

'মানসী' কাব্যের 'দেশের উন্নতি' কবিতায় মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের অসার দেশোদ্ধারব্রত ও সভাপ্রিয়তাকে নিদারুণ ব্যঙ্গ করেছেন রবীন্দ্রনাথ।[২০৮] সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করে এবং শুনে যাঁরা আবেগে উদ্দীপনায় ক্ষণিকের জন্য জ্বলে ওঠেন, তাঁদের বক্তৃতাবাণে ভারতের প্রগতি ঊর্ধ্বমুখী বলে যাঁরা রোমাঞ্চিত, 'লম্বা পিটিশনে' সই করেই যাঁদের জীবন ধন্য এবং কর্ম সারা হয়, লেখক তাঁদের কিছু সাধারণ চরিত্রধর্মের উল্লেখ করেছেন—

'উৎসাহেতে জ্বলিয়া উঠি
দুহাতে দাও তালি।
আমরা বড়ো এ যে না বলে
তাহারে দাও গালি।
কাগজ ভ'রে লেখো রে লেখো
এমনি করে যুদ্ধ শেখো,
হাতের কাছে রেখো রে রেখো
কলম আর কালি!
চারটি করে অন্ন খেয়ো,
দুপুরবেলা আপিস যেয়ো,
তাহার পরে সভায় ধেয়ো
বাক্যানল জ্বালি—
কাঁদিয়া লয়ে দেশের দুখে
সন্ধেবেলা বাসায় ঢুকে
শ্যালীর সাথে হাস্যমুখে
করিয়ো চতুরালি।'

এইপ্রকার পোশাকি দেশহিতৈষণা, ভাবুকতাসর্বস্ব জাতীয় উন্নতিচিন্তা আদতে ঔপনিবেশিক শাসক পরিকল্পিত শিক্ষার ফল। কেতাবি শিক্ষা কীভাবে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাঙালি 'বাবু'দের নিশ্চেষ্ট ভাবপ্রবণতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে, 'মানসী' কাব্যেরই 'বঙ্গবীর' কবিতায় তার চিত্র আছে।[২০৯] বি.এ পাস ভুলুবাবু এবং তাঁর এম.এ পাশ দাদা সারাদিন ঘরে থেকে কেদারায় হেলান দিয়ে শুয়ে লাইব্রেরি থেকে আনানো ইউরোপের ইতিহাস বই খুলে গ্যারিবল্ডি, মাৎসিনী, ওয়াশিংটন, ক্রমোয়েল পড়েন আর ভাববিপ্লবে মত্ত হয়ে ওঠেন। ইউরোপের ইতিহাস পড়ে তাঁরা স্বদেশের গর্বে আত্মহারা হন। যদিও দেশের সাধারণ সমাজের থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন; তাঁদের মতো 'মূর্খ', অশিক্ষিত মানুষ যখন বক্তৃতা শুনে 'হাই' তোলে, তখন ভুলুবাবুর মতো শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 'বুক ফেটে যায়'। এঁদের জীবনদর্শন ভাববাদী বলে, বাস্তবের সঙ্গে তার যোগ কম। দেশের সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙক্ষা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি সম্পর্কে এঁদের কোনো ধারণাই নেই। এঁরা কেবল—[২১০]

'সংহিতা আর মুর্গি জবাই
এই দুটো কাজে লেগেছি সবাই,... ...
দেশের লোকের কানের গোড়াতে
বিদ্যেটা নিয়ে লাঠিম ঘোরাতে,
বক্তৃতা আর কাগজ পোরাতে,
        শিখেছি হাজার ছুতো।'

'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, 'তখন যে-সমস্ত আত্মশক্তিহীন রাষ্ট্রনৈতিক সভা ও খবরের কাগজের আন্দোলন প্রচলিত হইয়াছিল, দেশের পরিচয়হীন ও সেবাবিমুখ যে-দেশানুরাগের মৃদুমাদকতা তখন শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল— আমার মন কোনোমতেই তাহাতে সায় দিত না। আপনার সম্বন্ধে, আপনার চারিদিকের সম্বন্ধে বড়ো একটা অধৈর্য ও অসন্তোষ আমাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিত।'[২১১] সমকালীন 'আত্মশক্তি' প্রবন্ধগ্রন্থেও এ জাতীয় অসন্তোষের কথা আছে।[২১২] আসলে, মধ্যশ্রেণির এই প্রকার চরিত্র-মাহাত্ম্য এবং তাঁদের ভাবগত দীনতা যতই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছিল, ততই সমাজের সাধারণ মানুষের চোখে এঁরা হাস্যাস্পদ বলে বিবেচ্য হচ্ছিলেন। 'দেশের উন্নতি' কবিতায় মধ্যশ্রেণির 'বাবু'দের এই চারিত্রিক দুর্বলতা ও ত্রুটিতে বেদনার্ত কবি তাঁদের সচেতন করতে চেয়েছেন, সম্ভবত স্বীয় শ্রেণির প্রতি সহানুভূতি তাঁকে উদ্রিক্ত করে থাকবে। কিন্তু তিনি নিজেও সম্ভবত জানতেন, শতাব্দী-প্রাচীন বাঙালিবাবুদের তার চেয়েও প্রাচীন অর্জিত চরিত্রধর্ম সহজে মুক্ত হবার নয়। কেউ কেউ মনে করেছেন,[২১৩] কেবলমাত্র কথা না বলে, বক্তৃতা না করে, কাজের মধ্য দিয়েই দেশের অভাব ও দুর্গতিমোচনের চেষ্টা ঠাকুর পরিবার থেকেই প্রথম শুরু হয়। এরই প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠেন এবং সমালোচনায় মুখর হন। কিন্তু এতটা সরলীকরণ উচিত নয়। একথা ঠিক যে, বাঙালি তথা ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, সামাজিক নানান সংস্কারের বিরুদ্ধে ঠাকুরবাড়ির অবদান বিস্মৃত হবার নয়, তবুও বলতেই হবে, তাঁরা অন্যতম হলেও, একমাত্র নন। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি যে, উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই বটতলার তথাকথিত অমার্জিত সাহিত্যগুলির মধ্যে মধ্যশ্রেণির শিক্ষিতবাবুদের উৎকেন্দ্রিক আচরণ, পাশ্চাত্য সর্বস্ব জীবনদর্শন, দেশ ও জাতি বিষয়ে আকাশকুসুম কল্পনা ইত্যাদির প্রতি কী প্রকার ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও উপহাস উঠে এসেছিল। তা ছাড়া, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এ জাতীয় আচার-আচরণের তীব্র নিন্দা করেছিলেন বারংবার। এসবের প্রভাবেও শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'বাবু'দের নিজেদের ভিতরেই ধিক্কার ও সচেতনতা জাগ্রত হয়েছিল। শতাব্দী প্রাচীন বাবুত্বের শেষবেলায় তার জন্য তোলা রইল কেবল অপমান, বিদ্রূপ, নিন্দা ও অসূয়ার ইতিহাস।

বাবুগৌরবের অস্তযাত্রাকালে কেউ কেউ অবশ্য বিদ্রূপের তিক্ত-কটু বাণ নিক্ষেপের চেয়ে মিঠেকড়া ব্যঙ্গের শর সন্ধান করেছিলেন; দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) যেমন। নিজে বিলেত প্রত্যাগত হয়েও ব্যক্তিগত জীবনে দ্বিজেন্দ্রলাল সাহেববাবু সাজার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেননি, বরং দায়িত্বশীল দেশহিতৈষীর ভূমিকা পালন করতে গিয়ে সমকালীন সাহেব-সাজা বাঙালিবাবুর মেকিত্বের মুখোশটিকে টান মেরে খুলে দিয়েছেন, বিষতিক্ত বিদ্রূপ নয়, ক্ষমাহীন সহাস্য ব্যঙ্গে। হিন্দুর ছেলে হয়ে কালাপানি পার হয়ে বিলেত যাত্রার ফলে দেশে ফিরে তাঁকে নানাপ্রকার সামাজিক বাধার সম্মুখীন হতে হয়, ফলে তৎকাল প্রচলিত তথাকথিত হিন্দুয়ানির সংস্কার ও ধর্মীয় কৃত্যের প্রতি তাঁর ছিল সীমাহীন ক্ষোভ, কিন্তু তা বলে নির্বিশেষ সাহেবিয়ানার প্রতি তিনি ঝুঁকে পড়েননি। সাহেবদের চারিত্রিক গুণগুলি তাঁর চেতনায় সমাহৃত হয়েছিল, তাঁদের অপগুণগুলি থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল সসম্মান দূরত্ব রক্ষা করেছেন। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাঙালিবাবুদের মধ্যে সাহেবি অপগুণগুলির ক্রমপ্রসার তাঁকে ক্ষুব্ধ, ব্যথিত করেছিল। পোশাকি সাহেবিয়ানার প্রতি অন্ধ আকর্ষণ থেকে মধ্যশ্রেণির বাঙালিবাবুদের মধ্যে সাহেবি অপগুণগুলির ক্রমপ্রসার তাঁকে ক্ষুব্ধ, পুঁথিপড়া জাতীয়তাবাদের শিক্ষায় সভা-সমিতি, বক্তৃতা ইত্যাদির মতো বাহ্যাড়ম্বরকেই দেশপ্রীতির চূড়ান্ত বলে মনে করছেন, এসব দেখে দ্বিজেন্দ্রলাল চুপ করে থাকতে পারেননি। 'আষাঢ়ে' (১৮৯৯) এবং 'হাসির গান'

(১৯০০) এই দু'টি কাব্য-সংগীত গ্রন্থের একাধিক রচনায় তাঁর সেই অন্তরের ক্ষোভ ধরা পড়েছে। তবে ক্ষুব্ধ হলেও তিনি অসহিষ্ণু নন। তাঁর কটাক্ষ জ্বালা ধরায় না, মৃদু ভর্ৎসনার সুরে আমরা স্বকৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হই, কিন্তু বক্তার প্রতি ক্রুদ্ধ হই না। বাবুত্বের সমালোচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের পথ নরমপন্থীর। তাঁর নিজের কথায়, বিলেত থেকে ফিরে 'বাংলা ভাষায় হাস্যরসাত্মক কবিতার অভাব পূরণ করিবার অভিপ্রায়ে Ingoldsby Legends-এর অনুকরণে কতকগুলি হাস্যরসাত্মক বাঙ্গালা কবিতা' [২১৪] লেখেন তিনি। যদিও ইনগোল্ডসবি নিছক হাস্যরস প্রকাশ নয়, সামাজিক অসংগতি দূর করতে চেয়েছিলেন একটু অন্যপথে— 'an honest endeavour to combat error and imposture in an age of scientific doubt and unrest'.[২১৫] দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্দেশ্যও ছিল এক। যুগের ভ্রান্তি নিরসন করে, বাঙালিবাবুদের মেকিত্ব ও ভণ্ডামির হাত থেকে উদ্ধার করে এক সুস্থ ও রুচিশীল মধ্যশ্রেণির নির্মাণ, যাঁরা হতে পারেন 'truly modern'।

দ্বিজেন্দ্রলালের বাবু-দর্শন তথা মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের মহিমা-কীর্তন রবীন্দ্রনাথের মতো ভাবমূলক নয়, আখ্যান-নির্ভর। সমসাময়িক অভিজ্ঞতা থেকে গল্প বলেন তিনি, প্রয়োজনে মিশিয়ে দেন অনতি-অতীত ইতিহাসকে, ইনগোল্ডসবির মতোই, তত্ত্বের চেয়ে নীতিকথার দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশি। মধ্যশ্রেণির 'শিক্ষিত' 'ভদ্রলোক'বাবুদের সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল সুগভীর, যেহেতু তিনি নিজে ওই শ্রেণিভুক্ত ছিলেন; ফলে তাঁর আখ্যান-কবিতা যখনই মধ্যশ্রেণির বাবুদের প্রসঙ্গ গ্রহণ করেছে, তখন তিনি ও তাঁর বাবুরা অনেক সাবলীল, স্বচ্ছন্দ এবং অকৃত্রিম। এ ব্যাপারে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই তাঁর সাদৃশ্য বেশি। কিন্তু যখনই তিনি অভিজ্ঞতার অভাব কল্পনার দ্বারা পুষিয়ে নিতে চেয়েছেন, তখনই তাঁর বাবুপ্রদর্শন আড়ষ্ট, কৃত্রিম ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। 'রাজা নবকৃষ্ণ রায়ের সমস্যা' কবিতাটি যেমন। বিচ্ছিন্নভাবে অনেকগুলি মধ্যশ্রেণির 'বাবু'দের দেখা মেলে;— নাটক-নভেল, লেখক ও পাঠক 'শ্রীল শ্রীযুত' পূর্ণচন্দ্র রায়, যিনি বিজ্ঞান, দর্শন, ও অঙ্ক শাস্ত্র কিছুই না বুঝে' লেখক হয়েছেন; নন্দদুলাল দত্ত, যিনি সংবাদপত্রের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী, তাঁর নিজের কথায়[২১৬] —

' ... আমি লিখে বিশুদ্ধ প্রবন্ধ;  
ইংরাজ এবং বড়লোককে দিয়ে গালি মন্দ,  
চলে যায় পেটে;            দিন যায় কেটে  
সুখে; ধর্ম্মের এবং স্বদেশহিতৈষিতার ভাণে,  
করি মেলা গোল, তাই আসায়  
            অনেক লোকেই জানে।'

আছেন 'পাশা, তাস ও দাবা' খেলে সময়কাটানো বাবু শ্রীল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র ঘোষ, সেকেলে আফিংখোর বাবু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল মুখোপাধ্যায় 'গুলি, গাঁজা, সিদ্ধি এবং চরশ' ভক্ত শ্রী রাধানাথ চট্টো, 'কতিপয় নব্য, বর্বর, অসভ্য, বাবু এগুলির মহিমা খর্ব করতে চায় বলে যিনি যৎপরোনাস্তি বিরক্ত; এবং তাঁর বিরক্তি বাড়িয়ে নব্যবাবুর প্রতিনিধি শ্রীযুত রতিকান্ত বন্দ্যো যুক্তি দেখিয়েছে—[২১৭]

'ইংরাজী প্রথায়—এ—  
            ব্রান্ডি কিম্বা হুইস্কি পান,  
সময় বধের অত্যাশ্চর্য্য অব্যর্থ সন্ধান;

তারা ছোট করে না ক শুধু দীর্ঘ সময়,
তারা খাটো করে নরজীবনের ''প্রময়''।'

তাঁর মতে, সময়টাকে কাটানোর শ্রেষ্ঠ উপায়— 'এই দুই তুল্যমূল্য দ্রব্য—বেশ্যা এবং মদ।' সমসময়ের বাবুশ্রেণির নানান চরিত্রকে সার্থকভাবে তুলে ধরতে পারলেও কবিতা হিসাবে এর রসসিদ্ধি অকিঞ্চিৎকর। তবে লেখকের অভিজ্ঞতার প্রশংসা করতেই হয়। লেখক, সম্পাদক, নিষ্কর্মা, বকাটে ফুলবাবু থেকে শুরু করে মধ্যশ্রেণির 'নব্য' বাবুও যথাযথভাবে সামান্য কয়েকটি সংলাপেই অতি স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে। 'শ্রীহরি গোস্বামী' কবিতায় চতুর্দিকে 'বিদ্যারত্ন, শাস্ত্রী, শিরোমণি, ন্যায়রত্ন, স্মৃতিরত্ন— হিন্দুধর্ম্মখনি' পরিবৃত শ্রীহরিকে দেখা যায় প্যান্ট-কোট পরে টেবিলে বসে 'কাটলেট, রোস্ট ক্যরি' খেতে। মদের গেলাস হাতে চূড়ামণি বলেছেন—[২১৮]

''হা বাঙ্গালি নব্য; হয়ে একটু সভ্য
বিজ্ঞানের ক খ গ পড়ি করে কতই গর্ব্ব—
ডুবছে ''খাবি খাচ্ছে সবে'' সভ্যতা হিল্লোলে;
হায় ব্যাসের কর্ম্ম, হায় মনুর মর্ম্ম,
ডুবলো কি এ কলিকালে মুর্গীর ঝোলে?'

শ্রীহরি গোস্বামীর মতো বাবুরা সেকালের কলকাতায় নিতান্ত দুর্লভ ছিলেন না। চরিত্রটি নির্মাণে অনতি-অতীত কলকাতার ইতিহাসের কোনো কোনো প্রসিদ্ধ আদি ও নববাবুর আদল থাকা দুর্লভ নয়। কিন্তু এগুলি দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ নির্মাণ নয়, তাঁর প্রতিভা ও হাস্যরস উচ্চকিত হয়েছে মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের বেন্দ্র করে লেখা কবিতা ও গানে। ডেপুটি থেকে কেরানি, বিলিতি মোহগ্রস্ত বাবু থেকে মেকি দেশোদ্ধারে উন্মত্ত বাবু— সক্কলেই উপস্থিত।

নব্য কলকাতার আকাশে-বাতাসে তখন বাবুদের নতুন হুজুগ— 'নতুন কিছু করো'। যা কিছু 'সেকেলে', যা কিছু দেশীয়, তাকে বর্জন করে পাশ্চাত্যের যাবতীয় কিছুকে গ্রহণ করাই তখন আধুনিকতা। বাঙালির খাদ্যাভ্যাস থেকে পোশাক-পরিচ্ছদ, ধর্মীয় ভাবনা থেকে জীবনযাপন সব কিছুতেই তখন পরিবর্তনের হাওয়া। বাঙালিবাবু তখন বেলুনে চেপে উড়ছেন, রেলে চড়ে তীর্থস্থানে রক্ষিতা-বন্ধুবান্ধব সহ মোচ্ছব করতে ছুটছেন। অতএব ধুতি চাদর ছেড়ে প্যান্ট-কোট, কাঁচকলা ছেড়ে রোস্ট-চপ শিক্ষিত বাবুদের নতুন অভ্যাসে পরিণত হচ্ছে। লক্ষণীয় এই যে, অভ্যাসগুলি পরবর্তীকালে শুধু বাঙালিবাবু নয়, তাবৎ বাঙালি চরিত্রের Identity- তে পরিণত হবে। সেইসঙ্গেই নতুন কিছু করা'র হুজুগে—

'কিম্বা সবাই ওঠো, টাউন হলে জোটো;
হিন্দুধর্ম্ম প্রচার কর্ত্তে আমেরিকায় ছোটো;
আমরা যেন নেহাইৎ খাটো হয়ে না যাই, দেখো,
খুব খানিক চেঁচাও কিম্বা খুব খানিক লেখো;
বেন্, মিল্, ছাড়ো, আবার ভাগবত পড়ো।
— নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।'[২১৯]

লটারি কমিটির টাকায় নির্মিত টাউন হল (১৮১৩) উনিশ শতকের চারের দশক থেকেই বাঙালি নব্যবাবুদের সভা-সমিতির স্থল হিসাবে পরিচিতি অর্জন করে। প্রথমে এই ভবনটি বিনোদনের জন্য নির্মিত হলেও, কলকাতা তথা সারা বাংলার দেশি-বিদেশি মানুষদের বাদ-প্রতিবাদ, সভা-সমিতির স্থল হিসাবে পরিচিত হতে থাকে এবং কালক্রমে তা হুজুগে পরিণত হয়।[২২০] মধ্যশ্রেণির 'এলিট' বাবুদের সম্মানের প্রতীক হয়ে ওঠে টাউন হলে যোগদানের বিষয়টি। শিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত কিংবা দু'এক বছর ইংরেজি স্কুলে পড়া বাবুও 'টোন হলে' সভার জন্য লালায়িত থাকতেন। তবে, তাঁরা সকলেই যে হিন্দুধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আমেরিকার ছুটতেন, এমনটি নয়। লেখক সম্ভবত স্বামী বিবেকানন্দের ১৮৯৩ সালের ৩০ জুলাই আমেরিকায় শিকাগো মহানগরে ধর্মমহাসভায় যোগদান এবং ১৮৯৭-এর প্রারম্ভে দেশে ফিরে আসার ঘটনাকে মনে রেখে সাধারণীকরণ করেছেন। তবে বাবু চরিত্রে এ জাতীয় দৃষ্টান্ত নিতান্ত দুর্লভ বললেও অত্যুক্তি হয় না। ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও এই সভায় যোগদান করেন এবং বেশ কিছুকাল আমেরিকায় ব্রাহ্মধর্মের প্রচার চালান। তবে একে বাবু-বাঙালির বাতিক না ভাবাই সংগত। অন্যদিকে মিল, বেন্থাম-এর সঙ্গে ভাগবত-গীতার সমন্বয় তো স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই করে গেছেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই এঁদের প্রভাব মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক' বাবুদের উপর জেঁকে বসে। পাশ্চাত্যের তাত্ত্বিকতা দিয়ে দেশীয় ধর্ম-দর্শনকে ব্যাখ্যা ও আলোচনা করার প্রবণতা মুখর করে তোলে মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের। কিন্তু কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে অনেক ক্ষেত্রেই তা ছিল 'হুজুগ' মাত্র। সভা-সমিতি বক্তৃতা গরম করে তোলার প্রচেষ্টা মাত্র।

বস্তুত, নব্যবাবুদের কাছ থেকে উত্তরসূরি মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' বাবুরা যে বিদ্যাটি বহুমাত্রায় আয়ত্ত করেছিলেন— তার একটি হল মদ্যপান, অন্যটি হল সভা-সমিতি উপলক্ষ্যে ভাষণদান। প্রথম দিকে স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ সহ নানাবিধ দেশীয় সংস্কারমূলক বক্তব্য প্রাধান্য পেলেও, সাতের দশক থেকেই প্রধান হয়ে উঠতে থাকে, 'দেশোদ্ধারে'র আচারমূলক বাহ্যাড়ম্বরসর্বস্ব চিন্তা। 'আষাঢ়ে'র 'নসীরাম পালের বক্তৃতা', 'কলি-যজ্ঞ' এবং 'হাসির গানে'র 'তা সে হবে কেন', 'নন্দলাল' প্রভৃতি কবিতায় এই মেকি দেশোদ্ধারের কথা আছে। মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত বাবুদের বহুপ্রকার হুজুগের মতো এও এক নতুন হুজুগ। ইতিহাসবিদের মতে, 'গত শতাব্দীর (উনিশ শতক) সপ্তম দশকে বাঙালি জীবনের নানা দিকে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজসেবা সকল দিকেই আমরা এক অভূতপূর্ব কর্মতৎপরতা লক্ষ করি। ইহার প্রত্যেকটিরই মূল লক্ষ্য ছিল স্বদেশের উন্নতি।'[২২১] এই উৎসাহ থেকেই ১৮৭৫-৭৬ সালে সপ্তম এডওয়ার্ডের কলকাতা সফরকে মাথায় রেখে দেশীয় জনসমাজের পক্ষ থেকে কেশবচন্দ্র সেন 'অ্যালবার্ট হল' প্রস্তুত করেন। বস্তুত 'দেশীয় বিভিন্ন শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের' মিলন ক্ষেত্র হিসাবে অ্যালবার্ট হল অচিরেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সভ্য এবং ভব্য গুটিকতক নব্যে'র মুখপাত্র নসীরাম পালকেও আমরা দেখি অ্যালবার্ট হলে 'মিটিং'-এ স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে। তাঁর বক্তব্য অবশ্য পরিষ্কার—[২২২]

> 'স্ত্রীজাতির এক কর্ম্ম        স্ত্রীজাতির এক ধর্ম্ম
> স্বামিসেবা—        সতীত্বই রমণীদের বর্ম্ম;—
> স্ত্রীদের স্বাধীনতা দিলে, নাহিক বিচিত্র,
> হবে কলঙ্কিত তাঁদের অমূল্য চরিত্র।'

লেখক এখানে আপাত শিক্ষিত বাবু নসীরাম পালের মধ্য দিয়ে মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের মানসিক বিভ্রান্তির রূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'কলি যজ্ঞে' মহতী সভায় 'মুখসর্বস্ব বাঙালি' বাবুই পুরোহিত, যাঁরা 'রেজলুশন নির্মাণে বক্তৃতায় মহারথী'।[২২৩] স্বদেশের উন্নতিকল্পে, স্বদেশী সংস্কৃতিতে উদ্বুদ্ধ বাঙালি ইংরেজিতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেয়, তার পরিণামও সাংঘাতিক। লাট সাহেব স্বদেশে চম্পট দেন, 'বাঙালি বক্তৃতা হুড়া' খেয়ে আফগান মহাকাবু, রাশিয়া বাঙালির বক্তৃতার চোটে 'দেশে পলায়ন' করে—

'বাঙালী বক্তৃতা শব্দে কাঁপে ইংলণ্ড জর্ম্মানী।
কাঁপে ফরাস মার্কীন কাঁপে সসাগরা ধরা॥
ধন্য ধন্য পড়ে গেল সর্বত্র এ মহীতলে।
ভরিয়া গেল এ দেশে মিটিঙ রেজলুশনে॥'

কেবল বক্তৃতার জোরে দেশোদ্ধারের স্বপ্ন দেখে যে মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুর দল, তাঁদের মূর্খ আত্মাভিমানকে ব্যঙ্গ করে কবি বলেছেন—[২২৫]

'তোমরা দেশোদ্ধারটা কর্ত্তে চাও কী
করে মুখে বড়াই?
তা' সে হবে কেন!
তোমরা বাক্যবাণে শুধু ফতে কর্ত্তে
চাও কি লড়াই?
তা' সে হবে কেন!'

মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের 'ভিরুতাটি আধ্যাত্মিক, আর কুড়েমিটা ধর্ম্ম!' নতুন যুগের শিক্ষিত বাঙালি-বাবুদের চরিত্রধর্মে মিশে যায় আদিবাবু-নববাবুদের থেকে নব্যবাবুদের বিচিত্র স্বভাব ও শৌখিনতার পরম্পরা। কখনো তাস-পাশা-দাবা খেলে বৃথা সময় কাটে, কখনো নাটক-নভেল দেখে-পড়ে দিন অতিবাহিত হয়; যখন সেসবে অরুচি ধরে, মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুর কাজ তখন[২২৫]—

'পরনিন্দা নিয়ে আছি, দলাদলি পেলে নাচি;
কাটে যদি দিবা, তাহে কাটে না ক বিভাবরী;—

গাঁজা গুলি চরস ভাঙ খেতে হয় সুতরাং;
কিম্বা ব্রান্ডী হুইস্কি ''বিয়ার''
কিম্বা তাড়ি ধান্যেশ্বরী;—
নইলে দিন যে যায় না কি করি!'

অতএব সময় কাটাতে বাঙালিবাবুর এই 'দেশোদ্ধারে'র ছল। 'নন্দলাল' কবিতার নন্দলাল যেমন,[২২৬]— দেশের উদ্ধার করবে বলে সে পণ করে বসে আছে; কলেরায় মর মর ভাইকে সেবা করে না, পাছে তার জীবন চলে গেলে 'দেশের হইবে কি?' বহু আয়াস গালমন্দ করে একখানি কাগজ বার করলে সাহেবের গলাটিপুনিতে কোনোরকমে নাকে খৎ দিয়ে সে উদ্ধার পায় এবং পথে-ঘাটের বিপদ এড়াতে বাড়িতে শুয়ে

শুয়ে সে দেশোদ্ধারের স্বপ্ন দেখে। এই ভণ্ডামি দ্বিজেন্দ্রলাল মানতে পারেননি। ফলে, সহাস্য ভর্ৎসনা করেছেন। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন মধ্যশ্রেণির বহির্ভাব ও ভাবনার অসংগতিটুকু।

দেশ’ সম্পর্কে মধ্যশ্রেণির ‘ভদ্রলোক’বাবুদের সচেতনতা ছিল পাশ্চাত্যমুখী। তাঁদের ভাব-ভাবনা আশা-আকাঙক্ষা সব কিছুই প্রতিফলিত করত দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের স্বাতন্ত্র্যের। যে জনগণের মুক্তি আকাঙক্ষায় তাঁদের এই দেশোদ্ধার-বিলাস, তাদের দুঃখ-কষ্ট-ভাব-ভাবনা সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন অনভিজ্ঞ, উদাসীন। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির চালচলন, ভাষা, জীবনযাপনের পদ্ধতি— কোনো কিছুতেই বিশুদ্ধ স্বদেশীয়ানা রক্ষিত হয়নি। 'Reformed Hindoos' কবিতায়[২২৭] শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির চরিত্রস্বভাবকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ডিটেলে ফুটিয়ে তুলে লেখক দেখিয়েছেন খাদ্যাভাস, পোশাক-আশাক, মুখের ভাষা, জীবনযাপন— সব কিছুই এক কিম্ভূতকিমাকার রূপলাভ করেছে। এঁদের আদর্শ বলতেও কিছু নেই; মিল, হিউস, স্পেন্সার পড়ে এঁরা ধর্মাধর্মের ধার ধারেন না, কিন্তু ফলার ভোজের আমন্ত্রণে ‘হিঁদু’ হতেও দ্বিধা বোধ করেন না। যেহেতু এঁরা শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি, অতএব এঁদের মানসিক কাজের অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণেই এঁরা drink করেন বেশি। তাঁদের নিজেদের ভাষায়, এ যুগের শিক্ষিত ‘ভদ্রলোক’বাবুদের অভিজ্ঞান হল—

‘ ... আমরা neither fish nor flesh;
আমরা curious commodities, human
oddities, denominated Baboos;
আমরা বক্তৃতায় যুঝি ও কবিতায় কাঁদি,
কিন্তু কাজের সময় সব ঢুঁ ঢুঁ;
আমরা beautiful muddle,
a queer amalgam
of শশধর, Huxley and goose.'

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ‘... তাঁহার হাসির গানে বিছুটির জ্বালা ছিল না; আলকুশীর বিস্ফোরক উদ্ভূত হইত না।... পরন্তু যাহারা এই হাসির গানের চাপা করুণার লবণস্বাদ পাইত, তাহারাই মরমে মরিয়া যাইত; ... ... হাসির গানে তিনি ব্যঙ্গ করেন নাই কাহাকে লইয়া? ব্রাহ্ম, থিওসফিস্ট, নব্য হিন্দু, বিলেতফেরতা বাঙালী সাহেব, ভণ্ড দেশহিতৈষী, রাজনৈতিক আন্দোলনকারী, বাবু, ব্রাহ্মণপণ্ডিত, হাকিম— বাঙ্গালার সকল শ্রেণীর সকল রকমের ন্যাকা ধরিয়া তিনি ব্যঙ্গ করিয়াছেন।’[২২৮] কিন্তু এই উক্তি সর্বাংশে সত্য নয়। যাবতীয় ‘ন্যাকা’দের ন্যাকামি-ভণ্ডামির প্রতি দ্বিজেন্দ্রলাল প্রসন্নচিত্ত থাকতে পারেননি সকল সময়, নির্মম কশাঘাত করতে বাধ্য হয়েছেন। ‘বিলেতফেরতা’ কবিতার সাহেব-সাজা বাঙালিবাবুরা, যারা স্বদেশী আচার দূরে সরিয়ে সাহেব সেজে বাংলা ভাষা ভুলেছেন, সেকেলে ধরনের নামের পরিবর্তে ‘ডে রে মিটার’ বলাকেই ফ্যাশন করে নিয়েছেন, ধুতি চাদর ছেড়ে হ্যাট-কোট-প্যান্ট পরে বিলিতি ধরনে হাসেন ও ফরাসি ধরনে কাশেন, সাহেবিয়ানার বাধা গাত্র বর্ণ দূর করতে ফরসা হওয়ার ‘ভিনোলিয়া’ ক্রিম মাখেন রোজ, তাঁদের কাছে দেখা যায়—[২২৯]

‘‘‘সাহেব’’ না বলে ‘‘বাবু’’ কেহ বলে
মনে মনে ভারি চটি।’

'বাবু' শব্দটি উনিশ শতকের সাহেবি-মধ্যশ্রেণির চোখে শ্রেণিবিচারে নিম্নথাকের, নিতান্ত দেশীয় সম্মানহীন সম্বোধন হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে দেখা যাচ্ছে। লেখকের মতে কার্যকালে এই 'চম্পটির দল' বাবুরা আসলে ভাবে-ভাবনায় 'ইউরেশীয়ান'[২৩০]; বিলেত থেকে ঘুরে এলে দেশি রঙে 'সাহেবি ঢং'-এর আর সীমা-পরিসীমা থাকে না,—[২৩১]

'আমরা বিলেতফের্তা ক'টায়,
দেশে কংগ্রেস আদি ঘটাই;
আমাদের সাহেব যদিও দেবতা, তবু ঐ
সাহেবগুলোই চটাই।

আমরা সাহেবি রকমে হাঁটি,
স্পিচ দেই ইংরিজি খাঁটি;
কিন্তু বিপদেতে দেই বাঙালিরই মত
চম্পট পরিপাটি।'

একটি সত্য ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের এই অতি পাশ্চাত্যমুখীনতার প্রতি তাঁদের নিজশ্রেণির মধ্যেই জন্ম নিয়েছে ক্ষোভ, অসহিষ্ণুতা, আত্মসমালোচনা। উনিশ শতকের শেষভাগে পৌঁছে মধ্যশ্রেণির বাঙালি 'বাবু'রা একটি স্বতন্ত্র আত্মপরিচয় লাভের জন্য ক্রমশ উন্মুখচিত্ত হয়ে উঠছেন। ডেপুটি-বাবু ও কেরানিবাবুর যে চিত্র দ্বিজেন্দ্রলাল যথাক্রমে 'ডেপুটি কাহিনি' ও 'কেরানী' কবিতায় তুলে ধরেছেন, তাতে এই শ্রেণির প্রতি আমাদের অনুকম্পা জেগে ওঠে। 'বাবু' তখন 'Hobson-Jobson'-এর ভাষায় নিতান্তই এমন এক শ্রেণি 'a native clerk who writes English.'[২৩২] ঔপনিবেশিকের প্রভুদের উপেক্ষার ভাষা ধীরে ধীরে অতিস্পষ্ট হচ্ছিল মধ্যশ্রেণির মধ্যে। বিশ শতকের সূচনা থেকেই একের পর এক স্বদেশী আন্দোলন মধ্যশ্রেণির বাবুদের আত্মোপলব্ধিরই ফল। সে কারণেই বাঙালিবাবুরা এরপর বিলিতি পোশাক বর্জন করবেন, ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত ও পরিকল্পিত শিক্ষার পাদপীঠ ছেড়ে দেশীয় শিক্ষার মডেল তৈরি করতে সচেষ্ট হবেন; হয়তো পুরোপুরি মোহমুক্ত হতে পারবেন না, রাতারাতি তা সম্ভবও নয়; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর এক দশকের ভিতর উনিশ শতকের বাবু কিছু বৈশিষ্ট্য রেখেই নতুন করে গড়ার কাজে মনোনিবেশ করবেন, যাকে বলা যায় ultimate makeover।

কাব্যে-সংগীতে বাবু-দর্শনের এই শতাব্দী পরিক্রমার শেষে আমরা দেখি, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাবু নামটি ছিল কবিদের মনতোষক। বাবুর 'ভ্রমরক' চরিত্র-বৃত্তির বক্র-বঙ্কিম উল্লেখ করেও সহানুভূতি ও প্রশ্রয়ের প্রসাদ থেকে তাঁদের বঞ্চিত করেননি কবিরা; অবশ্য তাঁদের কারোর-কারোর পোষ্টা ছিলেন স্বয়ং বাবুরাই। বিশেষ করে কবিয়ালদের কাব্য-সংগীতে বাবু শেষ পর্যন্ত মহিমান্বিত হয়েই স্পষ্ট হন। বেশ্যাদের সংগীতে তো রোমান্টিক অনুযোগই বেশি। বাবু যেন রমণীমোহন কৃষ্ণ। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জনরুচির সামগ্রিক পরিবর্তনের ফলে সভাকবি কর্মহীন হলেন। স্বাধীন কাব্যরসিক লেখকের স্বাধীন দৃষ্টিতে 'বাবু' হয়ে উঠলেন নিন্দা-বিদ্রূপের লক্ষ্যবস্তু। বটতলার কাব্য-কবিতায়, গুপ্ত-কবির ছড়ায় নব্যবাবু ও নববাবুরা ভর্ৎসিত হলেন ক্ষমাহীন কঠোরতায়। মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত বাবুদের দলও উপহাসিত হলেন তাঁদের পাশ্চাত্যমুখী জীবনযাপন এবং ভাবনাচিন্তার কারণে। মূলত ব্রাহ্মদের হাত ধরেই এই শ্রেণি বিকাশলাভ

করে বলে প্রাথমিকভাবে ব্রাহ্মবাবুরাই হলেন এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির শিকার। কিন্তু ক্রমে সাহেব-সাজা মধ্যশ্রেণি ইংরেজ-ঘনিষ্ঠ হিসাবে 'এলিট' শ্রেণিরূপে পরিগণিত হতে লাগলেন, সমাজের বৃহত্তর জনসাধারণের সঙ্গে তাঁরা আর যুক্ত থাকতে পারলেন না। এই অ্যালিয়েনেশন বা মানসিক বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে কিন্তু ধীরে ধীরে আত্মক্ষোভ-আত্মধিক্কার জাগতে লাগল এই শ্রেণির মধ্যেই। উত্তরকালে যাঁরা কাব্য-কবিতায় পদে পদে বিব্রত-বিপর্যস্ত করে তুলেছেন মধ্যশ্রেণির বাঙালিবাবুদের, তাঁরা সাধারণত, উক্ত শ্রেণিরই অংশভাগ। কাব্য-কবিতায় প্রায়শই আখ্যানের অবতারণায় স্বীয়-শ্রেণিকে সচেতন করতে চেয়েছেন তাঁরা। প্রত্যক্ষতা ও বাস্তবতাবোধ, অভিজ্ঞতার সুষ্ঠু সমবায়ে নিশ্চিতভাবেই লক্ষ্যভেদী হয়ে উঠেছে।

অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে, এই অতি প্রত্যক্ষতা কাব্য-কবিতার চিরন্তনত্বের পরিপন্থী। কিন্তু বাবু-কেন্দ্রিক রচনাকারেরা কেউই সরস্বতীর মন্দিরে চিরকালের অর্ঘ্য নিবেদন করতে চাননি। তাঁদের অধিকাংশেরই ছিল সোচ্চার সামাজিক অভীপ্সা; 'আপনার মুখ আপুনি দেখিয়ে' সমাজ পরিশোধনের তথা বাবুশ্রেণির আত্মশোধনের পীঠভূমি প্রস্তুত করা। সে কাজে তাঁরা নিরলস প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। এই অর্থে তাঁদের 'Committed' লেখক বলাই চলে। শতাব্দীপ্রাচীন বাবুত্বের শ্মশান-শয্যায় তাঁরা উদাসীন হয়েই শেষযাত্রার গান বেঁধেছেন। মহাকালের মন্দিরে বাবু-কাব্যের সেই মালা ঠাঁই না পেলেও, সমাজ-ইতিহাসের চলমান চিত্রশালা হিসাবে তথা বাঙালি-পুরুষের মানসিক ও সামাজিক বিবর্তনের সাক্ষ্য হিসাবে এগুলির গুরুত্ব কখনো কম হবার নয়॥

## টীকা ও সূত্রনির্দেশ


১. পালিত, চিত্তব্রত, 'কলকাতা নগরায়ন', 'বাংলার চালচিত্রে কলকাতা', প্রথম এবং মুশায়েরা সংস্করণ ২০০৮, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, পৃ. ৬৪।

২. Banerjee, Sumanta, 'The Parlour and the Streets', Seagull Books 1989, Calcutta, p. 83-84.

৩.. ভূমিকা; পাল, ড. প্রফুল্লচন্দ্র সম্পা., 'প্রাচীন কবিওয়ালার গান', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৪, কলিকাতা, পৃ.১১।

৪. Fulcher, James, 'Capitalism a very short Introduction', First edition 2004, Oxford university Press, New York, United States, p.8.

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, 'রসরচনাসমগ্র'; গুপ্ত, সনৎকুমার সম্পা., প্রথম নবপত্র প্রকাশ ১৯৮৭, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, পৃ.৭।

৬. ভূমিকা; 'রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী', নবম সংস্করণ ১৯৯৭, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড (বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির), কলকাতা, পৃ.৪।

৭. তদেব, পৃ.১৩।

৮. তদেব, পৃ.১৪।

৯. তদেব, পৃ.১১।

১০. ভূমিকা; পাল, ড. শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮।

১১. মল্লিক, প্রমথনাথ, 'কলিকাতার কথা', মধ্যকাণ্ড; সম্পা., গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৯, মল্লিক, শ্রীঅরিজিৎ প্রকাশিত, কলকাতা, পৃ. ৯৯।

১২. চক্রবর্তী, নিরঞ্জন, 'ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য', কলকাতা ১ম সংস্করণ, ১৮৮০ শকাব্দ, পৃ. ৮০।

১৩. তদেব, পৃ.৮০।

১৪. দ্র. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংস্করণ ১৯৮৫, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ৫৫-৫৬। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্মীনারায়ণ যুগীকে সম্ভবত ভুল করেই একই বইয়ের অন্যত্র (পৃ. ১৩৩-৩৪) লক্ষ্মীকান্ত যুগী বলে উল্লেখ করেছেন।

১৫. তদেব, পৃ. ১৩৩।

১৬. মল্লিক, প্রমথনাথ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫১।

১৭. তদেব, পৃ. ১৫২।

১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত ও সম্পাদিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, চতুর্থ মুদ্রণ ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃ. ২১৭।

১৯. 'বাবুর উপাখ্যান', ৯ জুন ১৮২১, 'সমাচার দর্পণ'। তদেব, পৃ. ১১৩।

২০. পাল, শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র— প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১।

২১. তদেব, পৃ. ২১১।

২২. তদেব, পৃ. ২০২-২০৩।

২৩. লাহিড়ী, দুর্গাদাস সম্পা., 'বাঙালির গান'; বর্তমান সংস্করণের সম্পাদক, বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, প্রথম পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সংস্করণ ২০০১, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, পৃ.৩২৭।

২৪. তদেব, পৃ. ৩২৯।

২৪ক. তদেব, পৃ. ৩২৯।

২৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, 'কলকাতার লোকসংস্কৃতির আদিপর্ব', 'উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান', প্রথম প্রকাশ ২০০৮, অনুষ্টুপ, কলকাতা, পৃ. ৪২।

২৬. দ্র. নাগ, অরুণ সম্পা. 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ ১৪০৩, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, পৃ. ১০১।

২৭. তদেব, পৃ. ৯১।

২৮. চক্রবর্তী, হরিপদ সম্পা., 'দাশরথি রায়ের পাঁচালী', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬২; ভূমিকা; পৃ-৮-৯।

২৯. তদেব. পৃ. ২৪।

৩০. রায়, অর্দ্ধেন্দুশেখর সম্পা., 'দাশরথি রায়ের পাঁচালী, প্রথম মহেশ সংস্করণ ১৯৯৭, মহেশ লাইব্রেরি, কলকাতা, পৃ. ২১৭।

৩১. তদেব, পৃ. ৫৯৩।

৩২. দ্র. 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪।
৩৩. বসু, কাঞ্চন সম্পা., 'দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ', ২য়, সপ্তম মুদ্রণ ২০০৪, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ.১১৭-১১৯ দ্র.।
৩৪. রায়, অর্দ্ধেন্দুশেখর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৩।
৩৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, 'কলিকাতা কমলালয়', 'রসরচনাসমগ্র', প্রথম নবপত্র প্রকাশ ১৯৮৭, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ৮।
৩৬. রায়, অর্দ্ধেন্দুশেখর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০২।
৩৭. তদেব, পৃ. ৬০২।
৩৮. শেঠ, হরিহর, 'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়', 'কথায় ও চিত্রে', প্রথম সংস্করণ ১৯৫২, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, পৃ. ৩৩০।
৩৯. তদেব, পৃ. ৩৩২।
৪০. ড. সুশীলকুমার দে'র মতে, রূপচাঁদের জন্মসন ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ; দ্র. HBL-19, 2nd edition, [foot-note], KolKata, p.347.
৪১. দ্র. 'সংঙ্গীতরসকল্লোল'; দ্র. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ৪র্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৫, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ৩২৯।
৪২ 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪-১০৫ দ্র.।
৪৩. 'বাঙালির গান', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৮।
৪৪. তদেব, পৃ. ৪০৫।
৪৫. তদেব, পৃ. ৪০৭।
৪৬. দ্র. Chattopadhyaya, Bankimchandra, 'The confession of a Young Bengal', Bagal, Jogesh Chandra Edi, 'Bankim Rachanavali, vol.3, 3rd print 1998, Sahitya-sansad, Kolkata, p. 138.
৪৭. তদেব, পৃ. ১৩৯।
৪৮. 'বাঙালির গান', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৯।
৪৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, 'নববাবুবিলাস', 'রসরচনাসমগ্র', প্রাগুক্ত, পৃ.-৪১।
৫০. মুখোপাধ্যায়, হরিসাধন, 'কলিকাতা সেকালের ও একালের', তৃতীয় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯১; রায়, নিশীথরঞ্জন সম্পা., পি.এম. বাকচি অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ৫০২।
৫১. তদেব, পৃ. ৫০২।
৫২. শেঠ, হরিহর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩।
৫৩. মুখোপাধ্যায়, হরিসাধন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০২।
৫৪. দ্র. পাদটীকা:- 'Watts to Clive: 11 April 1757; রায়, রজতকান্ত, 'পলাশির ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ', দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ২৪৮-২৪৯।
৫৫. দত্ত, বর্মা, ললিতাপ্রসাদ, 'গোবিন্দরাম', কায়স্থ পত্রিকা, আশ্বিন ১৩২৬।
দ্র. রায়, নিশীথরঞ্জন ও উপাধ্যায়, অশোক সম্পা., 'প্রাচীন কলকাতা', প্রথম সংস্করণ ১৩৯০ বঙ্গাব্দ, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃ. ২৩৩।

৫৬. 'An Account of the Late Govindram Mitter etc. by a Member of the Family', Calcutta, 1869. দ্র. দত্ত, নারায়ণ, 'জন কোম্পানির বাঙালি কর্মচারী', প্রথম সংস্করণ ১৯৭৬, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ২৪৬।
৫৭. তদেব, পৃ. ২৪৬।
৫৮. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ, 'কলিকাতা দুইশত বৎসর পূর্বে', নব্যভারত, কার্তিক ১২৯০।
দ্র. চৌধুরী, সত্যজিৎ ও সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর সম্পা., 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ', ৪র্থ খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৯, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, পৃ. ৬৮।
৫৯. ঘোষ, লোকনাথ, 'কলকাতার বাবু বৃত্তান্ত', সেন, শুদ্ধোদন অনূদিত, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৩, অয়ন, কলকাতা, পৃ. ১৯৬।
৬০. Sterndal, C – 'An Historical Account of Calcutta Collectorate', 1959.
দ্র. পাদটীকা; সান্যাল, অবন্তীকুমার, 'বাবু', প্রথম সংস্করণ ১৯৮৭, প্রতিক্ষণ, কলকাতা, পৃ. ৬৮।
৬১. মুখোপাধ্যায়, হরিসাধন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৭।
৬২. ঘোষ, লোকনাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩।
৬৩. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।
৬৪. শেঠ, হরিহর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮।
৬৫. তদেব, পৃ. ৩৩০।
৬৬. দত্তবর্মা, ললিতাপ্রসাদ, 'স্বর্গীয় মদনমোহন দত্ত', কায়স্থ পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬।
দ্র. রায়, নিশীথরঞ্জন ও উপাধ্যায়, অশোক সম্পা., 'প্রাচীন কলিকাতা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬।
৬৭. তদেব, পৃ. ২৪৬-৪৭।
৬৮. শেঠ, হরিহর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২।
৬৯. মিত্র, রাধারমণ, 'কলিকাতা-দর্পণ', প্রথম পর্ব, চতুর্থ মুদ্রণ ১৯৯৭, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, পৃ. ১২১।
৭০. 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।
৭১. দে, সুশীলকুমার সম্পাদিত, 'বাংলা প্রবাদ', দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫৯, এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং, কলকাতা, পৃ. ১৬২।
৭২. তদেব, (প্রবাদসংখ্যা ২৭২৯), পৃ. ৩১৭।
৭৩. তদেব, (প্রবাদসংখ্যা ২৭৪২), পৃ. ৩১৭।
৭৪. তদেব, (প্রবাদ সংখ্যা ২৭৩০), পৃ. ৩১৭।
৭৫. দত্ত বর্মা, ললিতাপ্রসাদ, 'কলিকাতার আটবাবু', কায়স্থ পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩২৬।
দ্র. রায়, নিশীথরঞ্জন ও উপাধ্যায়, অশোক সম্পা., 'প্রাচীন কলিকাতা', প্রাগুক্ত, পৃ-২০৬।
৭৬. উদ্ধৃত:- মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ, 'সেকেলে বড়লোকদের খেয়ালখুশি', পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯২, বিদ্যামন্দির, কলকাতা, পৃ. ৩০-৩১।
৭৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ্বর, 'বাংলাদেশের সঙ্ প্রসঙ্গে', দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৬, মনীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ.২৭৬।
৭৮. তদেব, পৃ. ১৬৭।

৭৯. তদেব, পৃ. ১৬৮।

৮০. তদেব, পৃ. ১৬৮।

৮১. দত্ত, প্রাণকৃষ্ণ, 'কলিকাতার ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য রচনা', বসু, দেবাশিস সম্পা., প্রথম সংস্করণ ১৯৯১, পুস্তক-বিপণি, কলকাতা, পৃ.১৫১।

৮২. তদেব, পৃ. ১৫২।

৮৩. তদেব, পৃ. ১৫২।

৮৪. মুখোপাধ্যায়, হরিসাধন, প্রাগুক্ত, পৃ.৫২৩।

৮৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজিত সম্পাদিত, 'বেশ্যাসংগীত বাইজিসংগীত', প্রথম সংস্করণ ২০০১, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, পৃ. ১২৬-২৭।

৮৬. তদেব, পৃ. ১৪৮।

৮৭. উদ্ধৃত :- 'বদমাএস জব্দ', প্রসঙ্গকথা; বসু, দেবাশিস সম্পা., দত্ত, প্রাণকৃষ্ণ, 'কলিকাতার ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য রচনা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৭-৩৬৮।

৮৮. উদ্ধৃতঃ- সাহা, অর্ণব, 'ভগ্নাংশের যৌনটোপিয়া'; আচার্য, অনিল ও সাহা, অর্ণব সম্পা., 'যৌনতা ও বাঙালি', প্রথম সংস্করণ ২০০৯, অনুষ্টুপ, কলকাতা, পৃ. ১২৬।

৮৯. বসু, রাজনারায়ণ, 'সেকাল আর একাল'; ঘোষ, বারিদবরণ সম্পা, 'নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ', প্রথম সংস্করণ ১৪০২ বঙ্গাব্দ, কলেজ স্ট্রিট পাবলিকেশন প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ৩২৬।

৯০. 'বেশ্যাসংগীত বাইজিসংগীত', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।

৯১. রায়, এ. কে, 'কলিকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'; সেন, শুদ্ধোদন অনূদিত, প্রথম ঋদ্ধি সংস্করণ ১৯৮২, ঋদ্ধি-ইন্ডিয়া, কলকাতা, পৃ. ১৬৪।

৯২. 'বদমাএস জব্দ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮।

৯৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, 'রসরচনাসমগ্র', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

৯৪. তদেব, পৃ. ৯।

৯৫. তদেব, পৃ. ৬৩। পঞ্চম চরণে মুদ্রিত আছে 'করে কত রস নানা নায়ক লইয়া'। এখানে সম্ভবত 'নায়ক' শব্দটি মুদ্রণপ্রমাদ; কারণ অন্য পাঠে 'নায়িকা' শব্দটি পাওয়া যাচ্ছে। দ্র. সর, রমেনকুমার সম্পা., 'ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সংগ্রহ'; দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা ৯, প্রথম সংস্করণ ২০১৩, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃ. ১৯৫। আমরা কেবল উক্ত 'নায়ক' শব্দটি সংশোধন করে নিয়েছি।

৯৬. 'রসরচনাসমগ্র', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

৯৭. তদেব, পৃ. ৭৯।

৯৮. তদেব, পৃ. ১৫০।

৯৯. তদেব, পৃ. ১৬৩।

১০০. তদেব, পৃ. ১৬৫-১৬৬।

১০১. তদেব, পৃ. ১৬৭।

১০২. 'নববিলাস', 'রসরচনাসমগ্র', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

১০৩. ‘কলিকাতা কমলালয়’, ‘রসরচনাসমগ্র’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।
১০৪. সান্যাল, অবন্তীকুমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩-৫৬।
১০৫. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, ‘ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ-ভূমিকা’; বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড, বাগল, যোগেশচন্দ্র সম্পাদিত, সাহিত্য-সংসদ সংস্করণ, নবম মুদ্রণ ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, সাহিত্যসংসদ, কলকাতা, পৃ. ৮৪০।
১০৬. তদেব, পৃ. ৮৪২।
১০৭. তদেব, পৃ. ৮৩৯।
১০৮. ‘শকুন্তলা-মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা’, ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯।
১০৯. তদেব, পৃ. ২৭২।
১১০. দ্র. ঘোষ, বিনয় সম্পা., ‘সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র’, দ্বিতীয় খণ্ড, প্যাপিরাস সংস্করণ ১৯৭৮, প্যাপিরাস, কলকাতা, পৃ. ২৪-২৯।
১১১. ‘ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব’, বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩৭।
১১২. ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’, পৃ. ৩০-৩১।
১১৩. দ্র. পরিশিষ্ট, সর, রমেনকুমার সম্পা., ‘ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা সংগ্রহ’ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯।
১১৪. দ্র. আনুষঙ্গিক তথ্য; দত্ত, ভবতোষ সম্পা., ‘ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব’ (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়), সাহিত্যলোক সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ২০১৩, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃ. ১০৩।
১১৫. ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা’, ২য়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১।
১১৬. তদেব, পৃ. ২৩৭।
১১৭. তদেব, পৃ. ২৩৮।
১১৮. ঘোষ, লোকনাথ, ‘কলকাতার বাবু বৃত্তান্ত’, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।
১১৯. Fischer-Tine, Harald, 'Law and Licentious Europeans Race, Class and "White Subalternity " in Colonial India', Ist Imp 2009, Orient Blackswan Private Ltd, New Delhi, India, p.135-136.,
১২০. তদেব, পৃ. ১৩৬।
১২১. শাস্ত্রী, শিবনাথ, ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’; সম্পা., ঘোষ, বারিদবরণ, দ্বিতীয় সংশোধিত নিউ এজ সংস্করণ ২০০৭, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৭৮।
১২২. তদেব, পৃ. ৭৮।
১২৩. ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা’, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৬।
১২৪. তদেব, পৃ. ১৫৪।
১২৫. তদেব, পৃ. ৫২।
১২৬. রায়, দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র, ‘আত্মজীবনচরিত’, পাল, নিমাইচন্দ্র সম্পা., প্রথম সদেশ সংস্করণ ২০০৫, সদেশ, কলকাতা, পৃ. ৮৭।
১২৭. ‘বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের খ্রীস্ট ধর্মানুরক্তি’, ‘ঈশ্বরগুপ্তের কবিতাসংগ্রহ’, সম্পা., হাই, মুহম্মদ আবদুল ও পাশা. আনোয়ার; মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১০, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ. ১৬৭।

১২৮. সরকার, অক্ষয়কুমার সম্পা., 'নবজীবন', ১২৯৪, ভাদ্র, ২ সংখ্যা, পৃ. ৭২-৮৫।
উদ্ধৃতঃ- নাথ, শঙ্করকুমার, 'কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হলেন', নস্কর, সনৎকুমার ও মুখোপাধ্যায়, কস্তুরী সম্পা., 'রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিশতবর্ষের আলোয়', ১ম সংস্করণ ২০১৩, রত্নাবলী, কলকাতা, পৃ. ৪৮।

১২৯. 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬।

১৩০. 'ইংরেজি নববর্ষ', তদেব, পৃ. ১৬১।

১৩১. তদেব, পৃ. ১৬২।

১৩২. 'ভারতবর্ষীয় লোক খ্রষ্টীয় ধর্ম কেন গ্রহণ করে?', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৭৭৬ শক, ১৩৪ সংখ্যা। দ্র. ঘোষ, বিনয়, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', ৫ম খণ্ড, প্যাপিরাস সংস্করণ, ১৯৮১, প্যাপিরাস, কলকাতা, পৃ. ১৮০।

১৩৩. বসু, রাজনারায়ণ, 'সেকাল আর একাল', 'নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩।

১৩৪. 'ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১।

১৩৫. তদেব, পৃ. ১৭২।

১৩৬. ডি'রোজ, জি এ উইলসন, 'অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সমাজের রাজনৈতিক উৎপত্তি'; 'বিষয় কলকাতা', জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৩, কলকাতা, পৃ. ১০০।

১৩৭. 'ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ', পৃ. ১৭২।

১৩৮. 'বড়দিন', তদেব, পৃ. ১৭২।

১৩৯. 'নববিলাসবাবু', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

১৪০. বসু, রাজনারায়ণ, 'আত্মচরিত', 'নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮১।

১৪১. পাল, কানাইলাল, 'সত্যনিষ্ঠ রসিককৃষ্ণ মল্লিক মহাশয়ের জীবনচরিত', পৃ. ৫৩।
উদ্ধৃতঃ- বসু, স্বপন, 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস', তৃতীয় সংস্করণ ২০০০, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ-৯৬।

১৪২. 'বড়দিন', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।

১৪৩. 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪-২৩০।

১৪৪. Sanyal, Rajat, 'Voluntary Associations and the Urban Public life in Bengal (1815-1876), First Edi 1980, Riddhi India, Kolkata, p.23.

১৪৫. 'ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮।

১৪৬. 'পৌষড়ার গীত', তদেব, পৃ. ২০০।

১৪৭. ঘোষ, বিনয় সম্পা., 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', প্রথম খণ্ড, প্যাপিরাস সং ১৯৭৮, প্যাপিরাস, কলকাতা, পৃ-১৯৩।

১৪৮. 'ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ', প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩।

১৪৯. তদেব, পৃ. ২০৩।

১৫০. ঘোষ, বিনয়, 'সাময়িকপত্রে বাংলা সমাজচিত্র' প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

১৫১. ‘কল্পনা’, ১২৯৩, পৃ. ৫। সম্পাদক কে? কোন্ সংখ্যা?
উদ্ধৃত:- গোস্বামী, ড. জয়ন্ত, ‘সমাজচিত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন’, প্রথম সংস্করণ ১৩৮১ বঙ্গাব্দ, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, পৃ. ৭৬৫।

১৫২. ‘বীণা’, পৌষ ১২৯৩।
সংকলিত:- বিশ্বসংঙ্গীত, আখ্যাপত্র বিনষ্ঠ, পৃ. ৪৭৬।

১৫৩. দ্র. Guha, Ranajit, 'An Indian Histriography of India, A Nineteenth Century Agenda and Its Implications', S.G. Deuskar Lectures on Indian History,1987. K.P. Bagchi and Co., Centre for studies in Social Science, Calcutta.

১৫৪. দ্র. Sarkar, Susobhan, 'Conflict within the Bengal Renaissance', 'On the Bengal Renaissance', Third Edition 2002, Papyrus, Kolkata, p.67-73.

১৫৫. দ্র. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, ‘বাবু’ ‘বিবিধ প্রবন্ধ’।

১৫৬. লাহিড়ী চণ্ডী সম্পাদিত ও সংকলিত, ‘বসন্তক’ ১ম বর্ষ - ২য় বর্ষ, প্রথম সংস্করণ, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ৩২-৩৫।

১৫৭. ‘কলিকাতা’, তদেব, পৃ.-১১৭।

১৫৮. তদেব, পৃ. ১৩৯-১৪০।

১৫৯. ‘বসন্তক’, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, তদেব, পৃ. ৫।

১৬০. মল্লিক, প্রমথনাথ, ‘কলিকাতার কথা, মধ্যকাণ্ড’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬।

১৬১. দাস, সুনীল সম্পাদিত, ‘অমৃতলাল বসুর স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি’, সংস্করণ, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃ. ১০৬।

১৬২. দ্র. টীকা; নাগ, অরুণ সম্পাদিত, ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’, প্রাগুক্ত, পৃ.-৯৩।

১৬৩. ‘বসন্তক’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৮।

১৬৪. ‘সুলভ সমাচার’, ১ জানুয়ারি ১৮৭১, ৮ পৌষ, ১২৭৭।

১৬৫. তদেব।

১৬৬. ‘সচিত্র বিশ্বসঙ্গীত’, ১২৯৯ সাল, পৃ. ৪৫৭।

১৬৭. দ্র. বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র, ‘বাজিমাৎ’, ‘হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী’ (আখ্যাপত্র বিনষ্ট), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা।

১৬৮. ‘বসন্তক’, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬-১৩৭ দ্র.।

১৬৯. ‘বাজিমাৎ’, প্রাগুক্ত,

১৭০. ঘোষ, লোকনাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২-১৯৩।

১৭১. তদেব, পৃ. ১৯৩।

১৭২. অজ্ঞাত, ‘রাজাবাহাদুর’, ‘অনুসন্ধান’, ১৭ আষাঢ় ১৩০৪ সাল।

১৭৩. ‘চিত্রদর্শন’, ১২৯৭ সাল, পৃ. ৭১।
উদ্ধৃত:- গোস্বামী, জয়ন্ত, ‘সমাজচিত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন; প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২১।

১৭৪. 'অনুসন্ধান', ১৭ আষাঢ় ১৩০৪ সাল।

১৭৫. 'স্বদেশী', বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার সম্পা., 'ইন্দ্রনাথ-গ্রন্থাবলী', প্রথম খণ্ড, সেকাল ও একাল, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ৩৯০-৯৪।

১৭৬. Majumder, Biman Behari, 'History of Indian Social And Political Ideas', 2nd Edition 1967, Reprint 1996, Firma KLM Private Limited, Kolkata, p.188.

১৭৭. Ibid, p.191.

১৭৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ, 'ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী', ২য় খণ্ড; বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন সম্পাদিত, প্রথম দীপ সংস্করণ ২০০৭, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ৯২।

১৭৯. দ্র. পাদটীকা; Majumder, Biman Behari, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮০।

১৮০. শাস্ত্রী, শিবনাথ, 'আত্মচরিত', প্রথম দে'জ সংস্করণ ২০০৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ১২৬।

১৮১. দ্র. Proceedings of the meeting for the formation of the Indian Association in Bengalee, 5 August, 1876.

১৮২. Sanyal, Rajat, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।

১৮৩. বাগল, যোগেশচন্দ্র, 'কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র', প্রথম সংস্করণ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, শ্রীগুরু লাইব্রেরি, কলকাতা, পৃ. ১৭৪।

১৮৪. নিয়োগী, গৌতম, 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, বাংলা ও বাঙালি : আদিপর্ব'; বসু, স্বপন ও চৌধুরী, ইন্দ্রজিৎ সম্পা., 'উনিশ শতকের বাঙালি-জীবন ও সংস্কৃতি', প্রথম সংস্করণ ২০০৩, পুস্তক-বিপণি, কলকাতা, পৃ. ২৮৫।

১৮৫. পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টের জন্য দ্র. বাগল, যোগেশচন্দ্র, 'History of the Indian Association' 1876-1951, Kolkata, 1951।

১৮৬. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র 'হিন্দুধর্ম' প্রচার, ১ম বর্ষ; দ্র.বাগল, যোগেশচন্দ্র সম্পাদিত, বঙ্কিম-রচনাবলী ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৬, পাদটীকা দ্র.।

১৮৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ, 'ইন্দ্রনাথ-গ্রন্থাবলী', ১ম খণ্ড, বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার সম্পা., পৃ. ১৬১-১৯১।

১৮৮. ভূমিকা, তদেব, পৃ. ২৬।

১৮৯. দ্র. 'বঙ্কিম-রচনাবলী', ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০।

১৯০. বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ইন্দ্রনাথ, 'ইন্দ্রনাথ-গ্রন্থাবলী', ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১।

১৯১. এডুকেশন গেজেট, ০৯.০১.১২৭৮ বঙ্গাব্দ।
দ্র. ঘোষ, বিনয়, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', ৫ম খণ্ড, প্রথম প্যাপিরাস সংস্করণ ১৯৮০, প্যাপিরাস, কলকাতা, পৃ. ১৯১।

১৯২. The Indian Mirror, Thursday. June 5, 1879 দ্র. Chattopadhay, Kanailal, 'Selections from The Indian Mirror', First edi 2005, Papyrus, Kolkata, p. 50.

১৯৩. তদেব, পৃ. ৫১।

১৯৪. Elliott, Robert C., 'The Power of Satire', Princeton 1966, p. 266.

১৯৫. Pal, Bipin Chandra, 'Swadeshi and Swaraj', Calcutta 1954, p. 17.

১৯৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন সম্পা., 'ইন্দ্রনাথ-গ্রন্থাবলী', ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬-১১১।

১৯৭. দ্র. 'নানাসাহেব', 'যুদ্ধ' ইত্যাদি কবিতা; হাই, মুহম্মদ আবদুল ও পাশা, আনোয়ার সম্পা., 'ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০-৩১৬।

১৯৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন সম্পা., 'ইন্দ্রনাথ-গ্রন্থাবলী', ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

১৯৯. তদেব, পৃ. ১২৯।

২০০. তদেব, পৃ. ১৩১।

২০১. তদেব, পৃ. ৫৯।

২০২. তদেব, পৃ. ৬১।

২০৩. তদেব, পৃ. ৬১।

২০৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি, 'ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; বন্দ্যোপাধ্যায়', ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত সম্পাদিত, 'পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী', ১ম খণ্ড, তৃতীয় মুদ্রণ ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃ. ২০৬।

২০৫. অজ্ঞাত, 'ইয়ং বেঙ্গল ক্ষুদ্র নবাব'।
দ্র. বিশ্বাস, অদ্রীশ সম্পাদিত, 'বটতলার বই', ১ম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ২০১১, গাঙচিল, কলকাতা, পৃ. ২৯৫-৩০৯। লেখায় পরবর্তীতে এই গ্রন্থের উদ্ধৃতিগুলি প্রাগুক্ত উৎস থেকেই ব্যবহৃত।

২০৬. Sarkar, Susobhan, 'Derozio and Young Bengal', 'On the Bengal Renaissance', Third Edition 2002, Papyrus, Kolkata, p. 108.

২০৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'দুরন্ত আশা', 'মানসী', রবীন্দ্র-রচনাবলী ১ম খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ১৪০২ বঙ্গাব্দ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ. ৫১৩।

২০৮. 'দেশের উন্নতি', 'মানসী'; তদেব, পৃ. ২৯৩-২৯৭।

২০৯. 'বঙ্গবীর', 'মানসী'; তদেব, পৃ. ২৯৮-৩০১।

২১০. তদেব, পৃ. ৩০০।

২১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'জীবনস্মৃতি', রবীন্দ্রনাথ-রচনাবলী ৯ম খণ্ড, সুলভ সং, পুনমুর্দ্রণ ১৪০২ বঙ্গাব্দ, বিশ্বভারতী কলকাতা, পৃ. ২৯০-২৯৩।

২১২. দ্র. 'আত্মশক্তি', রবীন্দ্র-রচনাবলী ২য় খণ্ড, সুলভ সং, পুনমুর্দ্রণ ১৪০২ বঙ্গাব্দ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ. ৬১৭।

২১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র, 'রবি-রশ্মি', ১ম খণ্ড, চতুর্থ কলেজ স্ট্রিট সংস্করণ, ১৪১০ বঙ্গাব্দ, কলেজ স্ট্রিট পাবলিকেশন প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ২০৩।

২১৪. রায়, রথীন্দ্রনাথ সম্পাদিত, 'দ্বিজেন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৯৮, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, পৃ. ৭০৯।

২১৫. দ্র. Introduction; Tanfield, John & Boas, Guy-edited, 'The Ingoldsby Legends', Page-x. উদ্ধৃতঃ- ভূমিকা; 'দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী', প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. আটত্রিশ।

২১৬. তদবে, পৃ. ৫৫৬।
২১৭. তদেব, পৃ. ৫৫৮।
২১৮. তদেব, পৃ. ৫৩০।
২১৯. 'নতুন কিছু করো', 'হাসির গান', তদেব, পৃ. ৫৭৩।
২২০. বাগল, যোগেশচন্দ্র, 'কলকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র', প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।
২২১. তদেব, পৃ. ১৭০।
২২২. 'দ্বিজেন্দ্র-রচনাবলী', প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬২।
২২৩. তদেব, পৃ. ৫৬৩।
২২৪. 'তা সে কেন হবে', তদেব, পৃ. ৫৭৬।
২২৫. 'কি করি', তদেব, পৃ. ৫৮২।
২২৬. 'নন্দলাল', তদেব, পৃ. ২৭৮।
২২৭. 'Reformed Hindoos', তদেব, পৃ. ৫৭১-৫৭২।
২২৮. 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায়'; 'পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী', ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২।
২২৯. 'বিলাতফের্ত্তা, দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭২।
২৩০. 'চম্পটির দল', তদেব, পৃ. ৫৭৩।
২৩১. 'বিলাতফের্ত্তা', তদেব, পৃ. ৫৭২।
২৩২. Yule, Henry & Burnell, A.C, 'Hobson-Jobson', Fifth Rupa Impression 2007, Rupa & Co., New Delhi, p. 44.

পঞ্চম অধ্যায়ঃ

# নাটক-প্রহসনে বাবু

উনিশ শতকে বাঙালিবাবুরা সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের বিনোদনে মেতে উঠেছিলেন, যা এসেছিল সাগর পার থেকে সাহেবদের দ্বারা বাহিত হয়ে; এবং সেই বিনোদনটি হল— 'শখের থিয়েটার'। এই শতকে বাঙালিবাবুদের একনিষ্ঠ উদ্যোগে এবং প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় একের পর এক গড়ে ওঠা শখের নাট্যশালা ও তার অভিনয়-প্রকল্প দৃশ্যতই ছিল বাঙালিবাবু-কালচারে সাহেবদের এক বড়োসড়ো অবদান। এর অর্থ অবশ্য এমন নয় যে, নাটক ও তার অভিনয়-কলা সম্পর্কিত কোনো ধারণা ইতিপূর্বে এদেশের বিনোদন-সংস্কৃতিতে অজ্ঞাত ছিল। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকেই রচিত হোক বা খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে[১], তাঁর আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে এক সুদীর্ঘ কালপর্ব জুড়ে অভিনয়, রঙ্গমঞ্চ ইত্যাদির পুষ্ট সংস্কৃতি গড়ে না উঠলে এ জাতীয় গ্রন্থ রচনা সম্ভব নয়। সংস্কৃত নাটকের সুবিশাল ও সমৃদ্ধ ভাণ্ডার রাজা ও রাজন্যবর্গের বিনোদনের জন্যই রচিত হয় এবং দরবারি সংস্কৃতিতে সেগুলির অভিনয়ও হত, সন্দেহ নেই। এদেশে মুসলমান-বিজয়ের প্রতিক্রিয়ায় সমৃদ্ধ সংস্কৃত নাটকের পশ্চাদপসরণ ঘটে এবং উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে অবক্ষয়িত হতে হতে কালে হারিয়ে যায়।[২] হারিয়ে যায়, তবে ফুরিয়ে যায় না। অন্যান্য দেশের মতো এ দেশের লোকায়ত জীবনেও অবসর বিনোদনের কারণে জন্ম নিয়েছিল নৃত্য, গীত, লোকনাট্য, ছড়া-পাঁচালির এক সমৃদ্ধ জগৎ; ছিল যক্ষগান, ভাগবত মেলা, ছৌ, অঙ্কিয়া-নাট, নৌটঙ্কি, ভবাই, তামাশা এমনি আরও কত কী। কেউ কেউ সঠিকভাবেই বলেছেন,[৩] বৈদিক ও বৈদিকোত্তর যুগে যেমন গাথা বা ব্যালাডের রূপ বিকশিত হয়েছিল, তেমনি কিছু শিল্পরূপ খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে ধ্রুপদি সংস্কৃত কাব্যের যুগে উদ্ভূত হয়; তবে লোকায়ত-আঞ্চলিক নাট্যশিল্পগুলির একটি বড়ো অংশই বিকশিত হয় ১২৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের মধ্যে, তুর্কি আক্রমণ ও ভারতবর্ষ-বিজয়ের অব্যবহিত পরবর্তীকালে। কারণটি সহজেই অনুমেয়। মুসলমান রাজার দরবারে ধ্রুপদি সংস্কৃত নাটক বা হিন্দু-পুরাণ ও বিষয় অভিনীত হওয়া অসম্ভব ছিল। পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে নাট্যকাররা সব নীরব হলেন। মুসলমান শাসকেরা ধর্মীয় কারণেই নাট্য-প্রকল্পগুলি থেকে দূরে রইলেন। এমনকী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের তাগিদের যুগেও এই বাংলায় নবাবের পৃষ্ঠপোষকতায় কোনো নাট্য-প্রকল্পের সন্ধান মেলে না। তবে লোকায়ত জীবনে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তথাকথিত আর্য মিথ-পুরাণ ঢুকে পড়েছিল, ফলে সিংভূম-মানভূম-পুরুলিয়া অঞ্চলের ছৌ-শিল্পীরা রামায়ণ কিংবা দেবী-ভাগবতের কাহিনিকে বেছে নেন নাট্যপ্রকল্পের বিষয় হিসাবে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' লোকায়ত নাট-গীতি-পাঞ্চালির ছকে ঢুকে পড়েন জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্'-এর দরবারি সংস্কৃতি। মুসলমান-আমলে পূর্ববর্তী বড়ো-ছোটো একাধিক নগরজীবনের লয়-বিলয় ঘটে, সীমিত ও পরিকল্পিত নগরজীবনের বিকাশ ঘটে, বাকি ভারতবর্ষ পূর্বতন গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতির মধ্যে ফিরে যায়। বিশেষ করে, বাংলায় গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির উত্থান ঘটে এবং তাঁদের ছত্রছায়ায় গ্রামীণ ক্ষেত্রগুলিতে নাট-গীতি-পাঞ্চালি-কথকতার একটা স্রোত বহমান থাকে। বলা বাহুল্য, এই সাংস্কৃতিক প্রকল্পগুলির বিষয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল ধর্মকেন্দ্রিক, তবুও যখনই লোকায়ত কবি-শিল্পী সুযোগ পেয়েছেন, নিজেদের জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, আনন্দ-বেদনার কথা বুনে দিয়েছেন সেসবের অবয়বে। ফসলরিক্ত শস্যক্ষেত্রে, চণ্ডীমণ্ডপে, গ্রাম্যাধ্যক্ষের দালানে-কোঠায় এসবের অভিনয় চলত, উন্মুক্ত আসরে প্রবেশের অধিকার ছিল সকলের, অভিনয় দর্শনকালে কিংবা শেষে প্রসন্ন দর্শক সাধ্যমত কিছু দিতেন কিংবা দিতেন না, সামন্ত-প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করলে যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্তিযোগ ঘটত কবি-শিল্পীদের; আর এই ভাবেই ধর্মীয় ভাবের সঙ্গে দৈনন্দিনের বাস্তবতা, সংস্কৃতায়িত চেতনার সঙ্গে অশ্লীল খিস্তি-খেউড়ও অপূর্ব সহাবস্থান

করত উক্ত প্রকল্পগুলিতে। ইংরেজদের হাতে কলকাতা-নগরের উত্থান ও বিকাশের পরবর্তীকালেও, একশো-দেড়শো বছর ধরে এ জাতীয় মিশ্র প্রকল্পের চর্চা ও আস্বাদন অব্যাহত ছিল। খিস্তি-খেউড়-যাত্রা-পাঁচালিতে আসক্ত বাবুদের হাতে এইসব প্রকল্পগুলি পুষ্ট হয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে। ইতিপূর্বেই সে বিষয় আমরা সবিস্তারে আলোচনা করে দেখিয়েছি। কিন্তু ইউরোপিয়ান থিয়েটার এসবের বাইরে সম্পূর্ণই ভিন্ন ধরনের এক রসাস্বাদনের প্রক্রিয়া, যা অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত মানুষের আস্বাদনের প্রকল্প থেকে দূরের কিছু। স্বতন্ত্র এই প্রকল্পটির প্রতি ঔৎসুক্যবশত বাবুরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, আকৃষ্ট হয়েছেন এবং নতুন নাগরিক বিনোদন হিসাবে এর রূপকল্পকে হুবহু অনুসরণ করতে চেয়েছেন, যার দরুন জন্ম নিয়েছে বাবুদের পৃষ্ঠপোষকতায় বর্ধমান 'শখের থিয়েটারে'র ইতিহাস।

অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই কলকাতাকে প্রেসিডেন্সি শহরে উন্নীত করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে ইংরেজ এবং সেই অনুযায়ী কলকাতার নানা অঞ্চলের সীমানা ও চরিত্র-নির্ধারণ এবং আরও নানা উন্নতির পরিকল্পনা গৃহীত হয়। যদিও এই পরিকল্পনা দেশীয় নেটিভদের দুর্দশা-মুক্ত করতে পারেনি, কারণ সকল পরিকল্পনার অভিমুখ ছিল 'হোয়াইট টাউন'কে কেন্দ্র করে পরিবর্ধিত। তবে প্রথমদিকে তাদের লড়াই করতে হয়েছে স্যাঁতসেঁতে জলবায়ু, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, মশা, মাছি, ম্যালেরিয়ার মতো রোগ অসুখের সঙ্গে। ফলে বিনোদনের নির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ সম্ভব হয়নি তখন। অষ্টাদশ শতকেরই তিনের দশক থেকে তৎকালীন ট্যাঙ্কস্কোয়ার (বর্তমান ডালহৌসি), লালবাজার, কসাইতলা (বেন্টিক স্ট্রিট) ও বউবাজার অঞ্চলগুলিতে ট্যাভার্ন ও পাঞ্চহাউসগুলি গজিয়ে ওঠে এবং সাহেবসুবোদের সান্ধ্য বিনোদনের জনপ্রিয় লক্ষ্য হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই ট্যাভার্ন ও পাঞ্চহাউসগুলি তাদের অস্তিত্ব ভালোমতোই টিঁকিয়ে রাখতে পেরেছিল। এগুলির মধ্যে পাঞ্চহাউস ছিল সর্বসাধারণের জন্য, ট্যাভার্ন ছিল সম্ভ্রান্ত সাহেবদের বিশ্রামকেন্দ্র। আধুনিক আড্ডাঘর নামও দেওয়া যেতে পারে। এগুলিকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত এ জাতীয় ট্যাভার্নগুলিতে দেশীয় লোকের প্রবেশাধিকার ছিল না, সম্ভ্রান্ত বাবু হলেও; পাঞ্চহাউসগুলিতে নাবিক, লোফার, ভ্যাগাবন্ড ইউরোপীয়রা ভিড় জমাতেন বলে দেশীয় জনসাধারণ, বিশেষ করে সম্ভ্রান্ত দেশি বাবুরা পাঞ্চহাউসগুলিকে এড়িয়েই চলতেন। ফলে, 'বাংলার সমাজ জীবন থেকে কলকাতার পাঞ্চহাউস ও ট্যাভার্নগুলি একেবারে বিচ্ছিন্ন ছিল বলা চলে।'[৪] বাঙালি নব্য অভিজাতদের বাড়িতে সাহেবসুবোদের নিয়ে ভোজসভা বা নাচের আসরের আয়োজন অষ্টাদশ শতকের শেষদিক থেকে শুরু হলেও, তার চরিত্র ছিল আলাদা।

এরই মাঝে সাহেবদের জেগে উঠেছিল এক অন্য ধরনের ক্ষুধা। থিয়েটার দেখার ক্ষুধা। ইউরোপে তখন প্রসেনিয়াম থিয়েটারের রমরমা। তর-তম ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আসনে বসে একই বিনোদন উপভোগ করার এই সর্বজনমান্য পদ্ধতিটিকে সাহেবরা যে প্রেসিডেন্সি শহরে উন্নীত কলকাতায় চালু করবার চেষ্টা করবেন, তা অনুমান করাই যায়। অতএব অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রায় গোড়াতেই ইংরেজ রাজপুরুষ এবং কেরানিকুলের জন্য নির্মিত হল 'দ্য প্লে হাউস', ১৭৫৩ সালেই। অবশ্য সিরাজ-উদ্-দৌলা অতর্কিত আক্রমণ করে এই রঙ্গমঞ্চটি ১৭৫৬-তেই ধূলিসাৎ করে দেন। তারপর পলাশির ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধ, পালাবদল, পুনরায় পালাবদল, রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ তৈরি করে ইংরেজের ঘর গুছোনো এবং ১৭৭৫-এ 'দ্য নিউ প্লে হাউস' বা 'ক্যালকাটা থিয়েটারে'র হাত ধরে নতুন এক বিনোদনের সূচনা। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনে ভবিতব্যের মতো ক্রমশ ছড়িয়ে পড়া আত্মতৃপ্ত ইংরেজের নতুন গন্তব্যস্থল। অভিজাত

ইউরোপিয়ানরা ট্যাভার্নগুলির পাশাপাশি এই থিয়েটার হলেই সম্মিলিত হতেন। ১৭৮৯ সালে মিসেস এমা ব্রিস্টোর বাড়ির মঞ্চ স্থাপিত হয়ে প্রমাণ করে দিল থিয়েটারের প্রতি সাহেবদের ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে। সাহেব-পাড়ার সান্ধ্য বিনোদন তখন হোটেলে ডিনার, বলরুম পার্টি, ঘোড়ার গাড়িতে সান্ধ্যভ্রমণ, কনসার্টের পাশাপাশি থিয়েটার দর্শনও।[৫] বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিংস-এর ঠিক পিছনে প্রথম থিয়েটার হলটি গড়ে ওঠে। ১৭৯৫-এর প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী[৬], সারা বছর মোট ছ'টি অভিনয় রজনীর জন্য দিতে হত ১২০ সিক্কা-টাকা 'সিজন' টিকিটের মূল্য বাবদ; এই টিকিট সাহেব ও তাঁর লেডীর জন্য নির্ধারিত ছিল। সিঙ্গল টিকিটের মূল্য ছিল ৬৪ টাকা। তৎসত্ত্বেও থিয়েটারের চাহিদা ও জনপ্রিয়তা ক্রমেই বাড়ছিল। ১৭৯৮-তে দু'দুটি থিয়েটার হল গড়ে ওঠে সাহেবদের থিয়েটার তৃষ্ণার পূরণ করতে— 'ক্যালকাটা থিয়েটার' এবং 'হুইলার প্লেস থিয়েটার' (Wheler Place Theatre)। যোগ্য অভিনেতার অভাব, টিকিটের অগ্নিমূল্য, সীমিত সাধ্য সত্ত্বেও একের পর এক থিয়েটার হল প্রতিষ্ঠা একদিকে যেমন সাহেবদের উৎসাহের আগুনে ঘৃতাহূতি দিয়েছিল, অন্যদিকে দেশীয় জীবনেও কি কিছু কৌতূহলের, চাহিদার সঞ্চার ঘটিয়েছিল? নতুবা কেন একজন রুশ সাহেব হেরাসিম স্টেপেনোভিচ লেবেদেফ নানা দেশ ঘুরে কলকাতায় এসে ২৫ নং ডুমতলাতে (বর্তমান এজরা স্ট্রিট) এক নাট্যশালা স্থাপন করে বসবেন ১৭৯৫ সালে এবং ওই সালের ৫ নভেম্বর 'ক্যালকাটা গেজেটে' বিজ্ঞাপন দিয়ে ঘোষণা করবেন থিয়েটার হলটি 'Decorated in the Bengalee Style'[৭] বলে। অভিনীত নাটকগুলির মূল বিদেশি – 'The disguise' ও 'Love is the Best Doctor' রোমান্টিক প্রহসনধর্মী নাটক, আবার বিদ্যাসুন্দরের অংশবিশেষও গীত হত। সব মিলিয়ে বাংলা নাটক দু'টিতে অভিনয় করেন দেশীয় অভিনেতা-অভিনেত্রী। 'ক্যালকাটা গেজেটে'র মতো কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বাংলায় নাটক অভিনীত হত কাদের জন্য, সেটা একটা বড়ো প্রশ্ন। লেবেদেফ প্রথম অভিনয়ের পরে কাগজেই বিজ্ঞাপন দিয়ে[৮] সর্বসাধারণকে ধন্যবাদ জানান। এই সর্বসাধারণ দেশীয় নাকি সামান্য বাংলাজ্ঞান সম্পন্ন সাহেবরা, তা জানবার উপায় নেই। কারণ, প্রথাগতভাবে তখনও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং তৎপ্রকাশিত বাংলা পাঠ্যপুস্তক সিভিলিয়ানদের জন্য প্রকাশিত হয়নি, তবে মানসিক প্রস্তুতি চলছিল বলা যায়।

নাটক দু'টির পুনরাভিনয় হয় ১৭৯৬-এর ১০ মার্চ এবং লেবেদেফের নিজের কথাতেই, দু'টি অভিনয় রজনীতেই রঙ্গালয় লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। রঙ্গমঞ্চটি কতটা প্রশস্ত এবং কত দর্শক-আসন বিশিষ্ট জানবার উপায় নেই। তবু বাংলা নাটক ঘিরে এই উদ্দীপনার আঁচ নতুন কলকাতার নাগরিক বাবুদের উত্তপ্ত করেনি একেবারেই, এমনটি নিঃসন্দেহে বলা যায় না। অনুমান, এই দু'টি অভিনয়েই দর্শকদের একটি বড়ো অংশ দেশীয় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকবৃন্দ। দ্বিতীয় যে ব্যাপারটি উল্লেখযোগ্য, লেবেদেফের বাংলা ভাষা শিক্ষক তথা মুনশি গোলোকনাথ দাস লেবেদেফের কথায় দেশীয় অভিনেতা-অভিনেত্রী সংগ্রহ করে এনেছিলেন। এর দরুন প্রমাণিত হয় দেশীয় ক্ষেত্রে অভিনয়ের প্রকল্পটি বন্ধ ছিল না। নানান ধরনের যাত্রাগান, লৌকিক উৎসবে এ জাতীয় অভিনেতারা অংশগ্রহণ করতেন, অন্তত অভিনয়ের সাধারণ ধারণা তাঁদের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। কলকাতার সম্ভ্রান্ত দেশীয় নাগরিক-জীবন তখন থেকেই হয়তো রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যাভিনয়ের জন্যে উৎসুক হয়ে ওঠেন।

ইত্যাবসরে, ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আরও কয়েকটি সাহেবি থিয়েটার গড়ে ওঠে। ১৮১৩ সালে স্থাপিত হয় 'দ্য চৌরঙ্গী থিয়েটার' বর্তমানের থিয়েটার রোড বা শেক্সপিয়র সরণিতে। ১৮৩৯ পর্যন্ত

এই থিয়েটার ইউরোপীয়দের কাছে থিয়েটার সংস্কৃতির প্রথম পছন্দ ছিল। ১৮১২ সালে স্বল্পস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ 'দ্য অ্যাথেনিয়াম' গড়ে ওঠে ১৮ নং সার্কুলার রোডে। ১৮১৪-তে গড়ে ওঠে 'দ্য চৌরঙ্গী ড্রামাটিক সোসাইটি', যাঁদের প্রথম অভিনয় হয় খিদিরপুরে ১৮১৫-র ২৮ আগস্ট। ১৮৩৯-এ স্থাপিত হয় বিখ্যাত 'সাঁ স্যুসি থিয়েটার', যা ১৮৪১-এ পার্ক স্ট্রিটে বর্তমান সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। সন্দেহ নেই, এইসব সাহেবি থিয়েটার হলগুলিতে কেবল ইংরেজি নাটকের অভিনয়ই হত, কারণ হলগুলির মূল উপভোক্তা ছিলেন সাহেবরাই। এমনকী দর্শক থেকে দ্বাররক্ষক পর্যন্ত সকলেই ছিলেন ইউরোপীয়, তথাপি ধীরে ধীরে দেশীয় ইংরেজি-শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বাবুদের কাছে ক্রমশ রঙ্গমঞ্চগুলির দ্বার উন্মুক্ত হতে থাকে। স্থানীয় অভিনেতা-অভিনেত্রী ছাড়া অনেকসময়েই লন্ডনের স্টেজে অভিনয় করা বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাউকে কাউকে নিয়ে আসা হত এবং কলকাতার দর্শকেরা সাক্ষী থাকতেন নানান প্রাণবন্ত অভিনয়ের। এসবের প্রতি ইংরেজি শিক্ষিত নব্যবাবুরা যে আকৃষ্ট হবেন তাতে সন্দেহ কী? তার জন্যই, উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই একশ্রেণির নব্যবাবুদের প্রায় প্রাত্যহিক গন্তব্যস্থল হয়ে ওঠে এবং কখনো কখনো প্রায় পাগলামির পর্যায়েও পৌঁছে যায় থিয়েটার দর্শন।[৯] হয়তো এই পাগলামি লক্ষ করেই তুলনায় অনভিজাত 'দমদম থিয়েটার' (১৮১৭, পুনর্প্রতিষ্ঠা ১৮২৬), 'থিয়েটার বৈঠকখানা' (১৮২৭) ইত্যাদি গড়ে ওঠে একের পর এক। নষ্ট সাক্ষ্য থেকে বোঝার আর উপায় নেই, ছোটো শহর কলকাতার চৌহদ্দিতে এরকম মোট কতগুলি সাহেবি থিয়েটার হল গড়ে উঠেছিল। তবে এসবকে কেন্দ্র করে দেশীয় শিক্ষিত বাবুদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

বাঙালি শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বাবুরা যে নিজস্ব রঙ্গালয় স্থাপন ও নাট্যাভিনয়ের তাগিদ অনুভব করছিলেন তা বেশ বোঝা যায়, রক্ষণশীলদের মুখপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা'র ১৮২৬-এর বক্তব্যে : 'এই বিস্তীর্ণ নগরে নগরবাসীদিগের উপকার ও উৎকর্ষের নিমিত্ত নানাবিধ জনহিতকর ও অভিনব প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হইয়াছে। কিন্তু তাহাদিগের চিত্তবিনোদনের কোন ব্যবস্থা হয় নাই এবং ইংরেজ সম্প্রদায়ের মত তাহাদের আমোদপ্রমোদের কোন সাধারণ স্থান নেই। সম্প্রতি আমাদের সমক্ষেও সখের যাত্রা প্রদর্শিত হইয়াছে। এগুলি সর্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও লোকের আনন্দবর্ধন করিয়াছিল। কিন্তু সখের যাত্রাও কদাচিৎ হয়। সুতরাং ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যাহাতে একত্র হইয়া ইংরেজদের মত "শেয়ার" গ্রহণ করিয়া একটি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহাতে একজন কর্ম্মাধ্যক্ষের অধীনে বেতনভোগী যোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত করিয়া এতদর্থে বিরচিত গীতি ও কাব্যের মাসে একবার নূতন অভিনয় করেন, তাহা নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। এইরূপে শ্রেণী নির্ব্বিশেষে সমাজভুক্ত সকলেরই আনন্দ বৃদ্ধি হইবে।'[১০] লক্ষণীয় যে, ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিজস্ব সম্মিলনস্থল হিসাবে নাট্যশালার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে এই প্রতিবেদনে। 'ইংরেজি ধরনের' বিনোদনের চাহিদা যে ইংরেজি শিক্ষিত বাবুদের মধ্যেই দেখা দেবে, সন্দেহ নেই। একইসঙ্গে, দেশীয় ধরনের 'শখের যাত্রা'র মধ্যে মধ্যে অভিনয় হওয়ার কথা বলা হয়েছে, যা থেকে অনুমান করা অসংগত নয় যে, সামগ্রিকভাবে কলকাতার নাগরিক সমাজে নাট্যাভিনয়ের প্রতি আগ্রহ ও ঔৎসুক্য দেখা দিয়েছিল প্রবলভাবেই। কেউ কেউ তাই বলেছেন, 'সাহেবদের দেখাদেখি বাঙালিরাও নাটক অভিনয় শুরু করে দিল। বড়লোকের বাগানবাড়ি, বসতবাড়ি ও স্কুলবাড়িতে অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ বেঁধে বিলাতী কায়দায় নাটক অভিনয় শুরু হয়।'[১১] যদিও প্রথমেই বাগানবাড়ি বা বসতবাড়িতে নাট্যাভিনয়ের প্রচেষ্টা হয়নি, তবে বাস্তবিকই স্কুল কলেজগুলিতে রঙ্গমঞ্চ বেঁধে বা না বেঁধেই নাটকের অংশবিশেষের অভিনয় বা পাঠ ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসকার জানিয়েছেন[১২], অনেক আগে থেকেই কলকাতার স্কুল-কলেজে ইংরেজি নাটকের অংশবিশেষ অভিনীত হত। প্রাপ্ত বিবরণ থেকে পরবর্তীকালের কিছু তথ্যাদি পাওয়া যায় মাত্র। যেমন, ১৮৩৭-এর ২৯ মার্চ কলকাতার গভর্নমেন্ট হাউসে হিন্দু কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় ছাত্রেরা শেক্সপিয়র থেকে অনেকগুলি অংশ আবৃত্তি করে। ১৮৫৩-তে ডেভিড হেয়ার একাডেমির ছাত্রেরা শেক্সপিয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' নাটক অভিনয় করেন (১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৩)। উক্ত নাটকটি দ্বিতীয়বার অভিনীত হয় ২৬ ফেব্রুয়ারি ডেভিড হেয়ার একাডেমির স্কুলবাড়িতে স্থাপিত নাট্যমঞ্চে। এই অভিনয়ের দৃষ্টান্তে ডেভিড হেয়ার একাডেমির প্রতিদ্বন্দ্বী ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্রেরা বিদ্যালয় গৃহেই 'ওরিয়েন্টাল থিয়েটার' স্থাপন করেন এবং ১৮৫৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর উক্ত মঞ্চে শেক্সপিয়রের 'ওথেলো' অভিনীত হয়। ৫ অক্টোবর এর দ্বিতীয় অভিনয় হয়। এ ছাড়াও পরবর্তীতে অনিয়মিতভাবে হলেও শেক্সপিয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস', 'চতুর্থ হেনরি' এবং হেনরি মেরিডিথ পার্কারের 'আমাটোর' নামক প্রহসনও অভিনীত হয়। তবে দেশীয় সাধারণ ইংরেজি নাটকের রসগ্রহণে ব্যর্থ হওয়ায় এই উদ্যোগ বন্ধ হয়ে যায়।

বাঙালিবাবুদের মধ্যে সর্বপ্রথম নাট্যশালা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর। ইনি প্রথম যুগের বাবুদের মধ্যে ইংরেজি ভাষায় অত্যন্ত সুশিক্ষিত, ১৭৮৪-তে প্রতিষ্ঠিত শেরবোর্ন-এর স্কুলের প্রথম দিকের ছাত্র। সম্ভ্রান্ত বাবুদের মধ্যে সম্ভবত তিনিই প্রথম পেশা হিসাবে ওকালতিকে বেছে নেন এবং এর থেকে তাঁর বার্ষিক আয় দাঁড়ায় গড়ে দেড় লক্ষ টাকা।[১৩] হিন্দু কলেজের পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য হিসাবেও তাঁর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমকালে ইংরেজি শিক্ষিত নব্যবাবুরা রুচিশীল বিনোদনের যে তাগিদ অনুভব করছিলেন, তার প্রতি দৃষ্টি রেখেই এবং তাঁদেরকে নিয়েই প্রসন্নকুমার 'হিন্দু থিয়েটারে'র দ্বার উদ্ঘাটন করেন। এই থিয়েটারের জন্য গঠিত কমিটিতে ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর ছাড়াও বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত, বাবু গঙ্গানারায়ণ সেন, বাবু মাধবচন্দ্র মল্লিক, বাবু হরচন্দ্র ঘোষ এবং সম্ভবত বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্তী, বলা বাহুল্য এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন প্রত্যক্ষ অর্থেই ডিরোজিয়ান। ফলে একে নব্যবাবুদের দ্বারা পরিচালিত প্রথম থিয়েটারি উদ্যোগ বলতে বাধা নেই। 'সমাচার দর্পণে'র ভাষ্য অনুযায়ী (১৭.০৯.১৮৩১), 'ঐ নর্তনশালা ইংলন্ডীয়দের রীত্যনুসারে প্রস্তুত হইবেক এবং তন্মধ্যে যে সকল নাটকের ক্রীড়া হইবে সে সকলি ইংলন্ডীয় ভাষায়'—[১৪] এই ছিল 'হিন্দু থিয়েটারে'র আদর্শ। সেইমতো ১৮৩১-এর ২৮ ডিসেম্বর শেকসপিয়রের 'জুলিয়াস সীজর' নাটকের অংশবিশেষ ও উইলসন কর্তৃক অনূদিত ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' এই নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয়ের দিন স্যার এডওয়ার্ড রায়ান, কর্নেল ইয়ং, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আমন্ত্রিত দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। কয়েকমাস পরে এই নাট্যশালাতেই 'Nothing Superfluous' নামে ছোটো একটি প্রহসনের অভিনয় হয়।

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের এই উদ্যোগকে আমরা নব্যবাবুদের উদ্যম ও চাহিদার ফল বলতে চেয়েছি। অভিনীত নাটকগুলির ভাষা ছিল ইংরেজি এবং রসগ্রহণ ছিল কেবলমাত্র ইংরেজি শিক্ষিত বাবুদের আয়ত্তাধীন। তা ছাড়া একে ঠিক পাবলিক স্টেজ বলা যায় না। টিকিট বিক্রি করে নয়, আমন্ত্রিত দর্শকদের সামনে অভিনয় করাই ছিল এই নাট্যশালার উদ্দেশ্য। বাবুদের উৎসাহ ও হুজুগ হুতোমের ভাষায় 'শরতের মেঘের মতো'। ফলে, দু'একটি অভিনয়ের পরই এই উদ্যোগ বন্ধ হয়ে যায়। সমালোচকের ভাষায়, 'প্রসন্নকুমার ঠাকুরের থিয়েটার স্কুল অথবা কলেজের ড্রামাটিক ক্লাবের বৃহত্তর সংস্করণের মত একটা

জিনিস ছিল। ইংরেজি ভাষায় অভিনীত হওয়ায় এই থিয়েটারে প্রদর্শিত নাটকগুলি সর্বসাধারণের বোধগম্য বা মনোরঞ্জক হইতে পারে নাই। সে জন্য নাট্যশালাটিও খুব বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই।'[১৫] তবে এই দৃষ্টান্ত কিছু নব্যবাবুদের প্রভাবিত করেছিল সন্দেহ নেই। উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল দু'টি— 'প্রিন্স' দ্বারকানাথ ঠাকুরের 'চৌরঙ্গী থিয়েটারে'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের একজন হওয়া (যদিও আমাদের মনে হয়, ইংরেজ রাজন্যবর্গকে খুশি করতেই অপরিমিত ব্যয় ও হুজুগে আসক্ত দ্বারকানাথের এই উদ্যোগ); তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ১৮৪৮-এর আগস্টে 'সাঁ সুসি থিয়েটারে'র 'ওথেলো' নাটকের অভিনয়ে 'ওথেলো'র ভূমিকায় একজন 'Native Gentleman' বৈষ্ণবচরণ আঢ্যর ভূমিকা গ্রহণ। বৈষ্ণবচরণের অভিনয় সম্পর্কে নানান মতভেদ থাকলেও এ ঘটনা অভিনয় পিপাসু দেশীয় মানুষদের মধ্যে গভীর উৎসাহ ও কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিল।

হয়তো এই উৎসাহ ও কৌতূহলের দ্বারা প্রণোদিত হয়েই শ্যামবাজারের বাবু নবীনচন্দ্র বসু নিজস্ব বাটিতে একটি রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করে 'শখের থিয়েটারে'র উদ্যোগকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যান। এই নাট্যশালায় বছরে চার-পাঁচটি নাটকের অভিনয় হত বলে জানা গেলেও এর স্থায়িত্ব বেশি দিন ছিল বলে মনে হয় না। ১৮৩৫-এর ৬ অক্টোবর 'বিদ্যাসুন্দর নাটক' অভিনীত হওয়ার অনেক উচ্ছ্বাসপূর্ণ কখনো-বা সমালোচনামূলক প্রতিবেদন প্রকাশিত হলেও, অন্যান্য নাটক সম্পর্কে সমকালীন পত্রপত্রিকাগুলির নীরবতা নানান প্রশ্নের জন্ম দেয়। আদৌ এইরকম ব্যয়বহুল উদ্যোগ একবারের বেশি অনুষ্ঠিত হয়েছিল কি? বছরে চার-পাঁচটি নাটক অভিনীত হওয়ার মিথটিও সত্য কি না সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে। কারণ তা হলে পরবর্তীকালের নাট্য-আলোচনার ক্ষেত্রে নবীন বসুর এই থিয়েটারের উল্লেখ কোথাও না কোথাও থাকত। ফলে এটিকেও বাবুদের ব্যক্তিগত খেয়ালি উদ্যোগ বলে ধরে নিতে হবে।

বাবুদের এই ব্যক্তিগত খেয়ালি উদ্যোগ প্রায় ধারাবাহিক হয়ে উঠল পরলোকগত নববাবু আশুতোষ দেব (সাতুবাবু)-এর দৌহিত্ররা সাতুবাবুর বাড়িতেই যখন থিয়েটার হল প্রতিষ্ঠা করলেন। এই উদ্যোগে বুলবুল লড়াই ও বাবুয়ানার কারণে বিখ্যাত সাতুবাবুর কোনো পূর্বভূমিকা ছিল না, এমন মনে হয় না। কারণ এই উদ্যোগের কিছু আগেই ১৮৫৬-র ২৯ জানুয়ারি সাতুবাবুর মৃত্যু হয়। আর ১৮৫৭-র ৩০ জানুয়ারি নন্দকুমার রায়ের অনূদিত 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা' নাটকের অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে সাতুবাবুর থিয়েটার পথ চলা শুরু করে। জুলাই মাসের মধ্যে নাটকটির তিনটি অভিনয় হয়, সেপ্টেম্বরে 'মহাশ্বেতা' নাটকের অভিনয় হয়। জানুয়ারি মাসে 'শকুন্তলা'র অভিনয়ের সাফল্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় হুজুগে বাবুমহলে। এবং এ কারণেই নতুনবাজারে বাবু রামজয় বসাকের বাড়িতে ১৮৫৭ সালে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয় হয়। অল্পদিনের মধ্যেই রামজয় বসাকের বাড়িতে আর একবার এবং গদাধর শেঠের বাড়িতে তৃতীয়বার 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয় হয়। উল্লেখযোগ্য যে, কৌলীন্য-প্রথা নিয়ে নাটক এই প্রথম; তার উপর, সমসাময়িক বিষয় নির্ভর নাট্যরচনার এই উদ্যম সম্ভবত বটতলার প্রকাশকদের উৎসাহিত করে। কারণ, এইসময় থেকেই সমসাময়িক বিষয় নির্ভর নাটক প্রহসনের স্রোত বইতে শুরু করে বটতলায়। ধর্মীয় কাহিনি বা বিষয়ের বাইরে সমসাময়িক সমাজের নানান কুশ্রী প্রথা, অভ্যাস, হুজুগ, কেচ্ছা নিয়ে প্রহসন লেখা হতে থাকে এইসময় থেকেই।

কলকাতার বুকে ১৭৫৩-য় ইংরেজদের প্রথম থিয়েটার হল 'দ্য প্লে হাউস' স্থাপনের প্রায় একশো বছর পর বাঙালি সম্ভ্রান্ত বাবুরা যেন থিয়েটার-থিয়েটার হুজুগে মেতে উঠেছিলেন। 'হুতোম' কালিপ্রসন্ন

সিংহও এই হুজুগে নতুন উৎসাহ জোগালেন ১৮৫৬ সালে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করে। ১৮৫৭-র ১১ এপ্রিল এই রঙ্গমঞ্চের প্রথম প্রযোজনা 'বেণীসংহার নাটক'-এ (রামনারায়ণ তর্করত্ন কর্তৃক অনূদিত) স্বয়ং কালিপ্রসন্ন অভিনয় করেছিলেন বলে জানা যায়। ১৮৫৮ পর্যন্ত এই রঙ্গমঞ্চের উদ্যোগের কথা জানা যায়। তারপর বাবুর হুজুগের নেশা কমে এলে যা হয়, এই রঙ্গমঞ্চের ভাগ্যেও তাই ঘটেছিল, রঙ্গমঞ্চটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

আসলে ১৮৭২-এর সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের আগে পর্যন্ত শখের নাট্যশালা স্থাপনের হুজুগ যেহেতু পোষ্টাবাবুর উপর আর্থিক ও সামাজিক নানান দিক দিয়ে নির্ভরশীল ছিল, তার ফলে বাবুদের হুজুগের নেশা কেটে গেলে, নতুন হুজুগে মন পেলে, পোষ্টাবাবুর মৃত্যু বা আর্থিক দায়গ্রস্ততা দেখা দিলে এই জাতীয় উদ্যোগগুলিও স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ হয়ে যেত। যেমন হয়েছিল, পাইকপাড়ার প্রতাপচন্দ্র সিংহ এবং তাঁর ভাই ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের উদ্যোগে স্থাপিত এই নাট্যশালার পরামর্শদাতা ছিলেন মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। নাট্যশালার অভিনেতারা প্রায় সকলেই ছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি নব্যবাবু। ১৮৫৮-র ৩১ জুলাই, শনিবার 'রত্নাবলী' নাটক অভিনয় দিয়ে এই রঙ্গালয়ের সূচনা। প্রায় ছয়-সাতবার নাটকীয় রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। বহু বিশিষ্ট ইংরেজ এইসব অভিনয়ে আমন্ত্রিত হতেন বলে, তাঁরা যাতে নাট্যবিষয় বুঝতে পারেন সেই কারণে 'রত্নাবলী'র ইংরজি অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়। এবং এই অনুবাদের সূত্র ধরে মধুসূদন দত্ত বাংলা নাটক ও বেলগাছিয়া নাট্যশালার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। সাহেব হতে চাওয়া বাবু মধুসূদন অচিরেই 'শর্মিষ্ঠা' লিখে ফেলেন এবং ওই বছর ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২১ সেপ্টেম্বর এই নাটকের তিনটি অভিনয় হয়। বিদেশি দর্শকদের জন্য মধুসূদন এর ইংরেজি অনুবাদ করেন। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এই রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য মধুসূদন তাঁর দু'খানি চমৎকার প্রহসন — 'একেই কী বলে সভ্যতা?' এবং 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' লিখে ফেলেন। 'একেই কী বলে সভ্যতা?'র বিষয় নব্যবাবু ও ইংরেজি আদবকায়দাপ্রিয় মধ্যশ্রেণির তথাকথিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের অনাচার, কদাচার ও ভণ্ডামি। সমসাময়িক 'বাবু'কেন্দ্রিক বিষয় অবলম্বনে এটিই প্রাপ্ত প্রথম প্রহসন (কালিপ্রসন্ন সিংহ 'বাবু নাটক' লিখেছিলেন বলে কথিত আছে, যদিচ তা পাওয়া যায়নি)। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে এই প্রহসনটি বেলগাছিয়া নাট্যশালা অভিনয় করেনি। একইসঙ্গে বৃদ্ধ জমিদারবাবুর লাম্পট্য দোষ নিয়ে লেখা 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রহসনটিও অভিনীত হয়নি। যদিও সমসাময়িক বিষয় নিয়ে এত উৎকর্ষবান প্রহসন ইতিপূর্বে লেখা হয়নি। সঠিক কারণ জানা না গেলেও আমাদের অনুমান, উক্ত বিষয় দু'টি পৃষ্ঠপোষক বাবুদের স্বশ্রেণিদের ব্যঙ্গ করে রচিত বলে বেলগাছিয়া কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রহসন দু'টি অভিনয় করতে অস্বীকার করেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে দেয় যে, পৃষ্ঠপোষক বাবুদের পৃষ্ঠপোষকতার আওতা ছেড়ে বেরিয়ে এসে 'পাবলিক থিয়েটার' গঠন না করলে, যেকোনো বিষয়, তা যতই জীবন্ত বাস্তবতার প্রতিরূপ হোক না কেন কিংবা যত দায়বদ্ধতাই থাক না কেন, শখের নাট্যশালায় অভিনয়ের ক্ষেত্রে বাধা আছে। তা ছাড়া এই জাতীয় অভিনয়ের দর্শককুল নির্দিষ্ট এবং আমন্ত্রিত বলে, নাগরিক সাধারণ মানুষেরা এর দ্বারা নিজেদের বিনোদন -তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম ছিলেন না। ফলে এ জাতীয় নাট্যশালার স্থায়িত্ব বড়োই অনিশ্চিত ছিল। ১৮৬১-র ২৯ মার্চ রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের অকাল মৃত্যু হলে (ইনিই ছিলেন বেলগাছিয়া নাট্যশালার প্রধান উদ্যোক্তা) বেলগাছিয়া নাট্যশালাটি বন্ধ হয়ে যায়।

তবে এ জাতীয় উদ্যোগগুলি মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের নাট্যাভিনয় বিষয়ে উৎসাহিত করে তোলে। শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত যুবকরাও নাট্যরচনা ও নাট্যাভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিধবা বিবাহ কেন্দ্রিক সমসাময়িক

বিষয়কে কেন্দ্র করে উমেশচন্দ্র মিত্রের লেখা 'বিধবাবিবাহ নাটক' অভিনীত হয় ১৮৫৯-এর ২৩ এপ্রিল চিৎপুরের সিন্দুরপট্টিতে রামগোপাল মল্লিকের বাড়িতে স্থাপিত ক্ষণস্থায়ী 'মেট্রোপলিটন থিয়েটার'-এ। নাটক যে ক্রমশ বাস্তব বিষয়কে অনুসরণ করতে চাইছে, হয়ে উঠছে কুসংস্কার, কচাদার, ভণ্ডামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হাতিয়ার, ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে শাণিত আক্রমণে সময়ের বিকৃত মুখচ্ছবিকে তুলে ধরতে চাইছে আয়নার মতো করে, খুব সহজেই তা অনুভূত হতে থাকে এইসময় থেকে। বাবুদের চেহারা, চরিত্র, ভণ্ডামি এইসময় থেকে ক্ষুরধার সমালোচনা, ব্যঙ্গবিদ্রূপের সম্মুখীন হয়। দীনবন্ধু মিত্রের শক্তিশালী কলম থেকে বেরিয়ে আসে 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) কিংবা 'জামাইবারিকে'র (১৮৭২) মতো নাটক; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু প্রমুখেরাও পরবর্তীকালে বাবুদের নানান রূপ ও স্বরূপ, অনাচার, ভণ্ডামি, কেচ্ছা ইত্যাদি নিয়ে লিখে ফেলেন এক বা একাধিক নাটক-প্রহসন। মূলধারার এইসব নাটক-প্রহসন শখের রঙ্গমঞ্চে কোনো কোনোটি অভিনীত হয়েছে ঠিকই, তবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে পাবলিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালে। কোনো কোনোটি এ জাতীয় রঙ্গমঞ্চগুলির প্রয়োজনেই লেখা হয়। বিশেষ কোনো পোষ্টাবাবুর প্রতি দায়বদ্ধ প্রযোজনা নয় বলে, জনরুচির নিরিখে সাফল্য পেলে এ জাতীয় নাটকগুলি বারবার অভিনীত হয়েছে। একে একপ্রকার নাট্যমুক্তি বলা চলে। পাশাপাশি বটতলা থেকে প্রকাশিত সমসাময়িক বাবুঘটিত কেচ্ছা বা ঘটনা নিয়ে লেখা নাটক-প্রহসনগুলি অধিকাংশই অভিনয়ের জন্য লেখা নয়, পাঠ করবার জন্য রচিত। সমকালে জনপ্রিয় নাট্য সংরূপের আদলে লেখা এ জাতীয় প্রহসনগুলিতে সহজেই অনাবশ্যক বর্ণনা অপেক্ষা দ্রুত লক্ষ্যবস্তুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এ জাতীয় প্রহসনের পাঠকেরা বাবু-বিবিদের কেচ্ছার মূল বিষয়টি জানতেই আগ্রহী থাকেন। ফলে, অন্যান্য ঘটনার চেয়ে বর্ণিতব্য বিষয়টি দ্রুত সংক্ষেপে বলে ফেলার দিকেই এ জাতীয় প্রহসনগুলির প্রবণতা চোখে পড়ে।

এদেশের নাট্যপ্রকরণে প্রাচীনকাল থেকেই হাস্যরসাত্মক লঘুনাট্য তথা প্রহসনের দৃষ্টান্ত সুপ্রচলন ছিল। ভরত কথিত, নাটকের দশরূপের মধ্যে 'প্রহসন'কেও অন্যতম 'রূপ' হিসাবে গ্রহণ করে শুদ্ধ ও সংকীর্ণ—এই দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। খুব সূক্ষ্ম বিচারে, সমাজের উচ্চবর্ণের (যেমন ভরতের মতে, শৈব গুরু, তাপস, বৌদ্ধ ভিক্ষু, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের) অতিশয় হাস্যপূর্ণ, নীচ ব্যক্তির সঙ্গে পরিহাস ও সম্ভাষণবহুল, হাস্যোদ্রেককারী ভাষা, আচার, কৃতকর্ম বর্ণিত হত শুদ্ধ প্রহসনে। অন্যদিকে, বেশ্যা, অসতী, প্রতারক, নপুংসক, চেট প্রমুখ সামাজিক দিক থেকে প্রান্তিক মানুষদের জীবনযাপন, অনাচার, বিকৃতি, বেশভূষা, কার্যকলাপ ইত্যাদি ছিল সংকীর্ণ প্রহসনের বিষয়। তা ছাড়া আচার্য ভরতের মতে, জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ঘটনা তথা কেলেঙ্কারি এবং দম্ভ (যা মূর্খতারই সামিল) কথোপকথনের ছলে প্রহসনে ফুটে উঠবে— 'লোকোপচারযুক্তা যা বার্তা যশ্চ দম্ভসংযোগঃ। তৎপ্রহসনে প্রযোজ্যং ধূর্ত বিটবিবাদসম্পন্নঃ।।'[১৬] সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে এ জাতীয় প্রহসন ছিল প্রচুর। লক্ষণীয় যে, কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির মতো সমসাময়িক ঘটনা যা লোকের কৌতূহলোদ্দীপক, তাকে প্রহসনের বিষয় হিসাবে গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এর দ্বারাই প্রমাণ হয়, উচ্চবর্গের মানুষদের অনাচার-কদাচার কিংবা ভুলভ্রান্তি সাধারণ মানুষের কাছে চিরকালই উপভোগ্য বিষয় হিসাবে গৃহীত হয়ে এসেছে। বড়োঘরের নানান কেচ্ছা-কাহিনি জেনে ফেলার মধ্যে যে একপ্রকার আত্মতৃপ্তির বোধ আছে এবং তার দরুন যে একপ্রকার আবিল আনন্দ মনের মধ্যে জেগে ওঠে, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সামাজিক দিক থেকে

শিষ্ট মার্জিতের অনাচার বা কদাচারের সন্ধান পেলে তাকে বেশ রসিয়ে পল্লবিত করার মধ্যেও এই আত্মতৃপ্ত আবিল আনন্দ উপভোগের ব্যাপারটি আছে। বিশ্বনাথ তাঁর 'সাহিত্যদর্পণে'র ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রহসনের বৈশিষ্ট্য হিসাবে এ কারণেই, নিন্দনীয় ব্যক্তির কবি কল্পিত বৃত্তান্তকে প্রহসন বলতে চান— 'ভবেৎ প্রহসনে বৃত্তং নিন্দ্যানাং কবি কল্পিতম্।' সেইসঙ্গেই প্রহসনে একটি মাত্র অঙ্ক থাকাই যথেষ্ট বলে তাঁরা মনে করেছেন, তবে প্রয়োজনে দু'টি বা ততোধিক অঙ্ক থাকবার কথাও বলেছেন। তবে আপাতভাবে মনে হয়, বর্ণিতব্য বিষয়কে অযথা পল্লবিত ভারাক্রান্ত করলে উৎক্ষিপ্ত হাস্যরসের গরিমা কমে যাবে, সম্ভবত এ কারণেই প্রহসনের আয়তনগত সুমিতিকে তাঁরা রক্ষা করবার কথা বলেছেন। সংক্ষিপ্ত, নিটোল, দ্রুত পরিণামী, অতিকথনহীন বর্ণিতব্য বিষয়ের মহিমাতেই প্রহসন সফল হয়ে ওঠে, এই হল প্রহসন বিষয়ে প্রাচ্যমত।

কিন্তু প্রহসন তো কেবল আলংকারিকদের তাত্ত্বিকতায় ভূষিত হয়ে মূল ধারার সাহিত্যেই বহমান ছিল না, সাধারণ লোকায়ত জীবনে আরও মেঠো ভাষায় রং, তামাশা ইত্যাদি সমসাময়িক বিষয়কেন্দ্রিক, কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি নির্ভর সংরূপের মধ্যেও কোনোরূপ তাত্ত্বিকতার আভিজাত্য ছাড়াই বেশ টিকে ছিল। এ বাংলায় সঙের গান উনিশ শতকের কালপর্বেও বেশ টিকে ছিল। মহেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৮১ সালেও কাঁসারিপাড়ার বিখ্যাত সঙের গান এবং সমসাময়িক কেচ্ছা-কেলেঙ্কারিকে অবলম্বন করে তার জনপ্রিয়তার কথা বলেছেন এবং একইসঙ্গে 'ভিস্তির গানে'র কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে মুসলমান দলকর্তা নানারকম সাজগোজ করা অভিনেতা, অভিনেত্রীদের নিয়ে নাট্য, গীত, নৃত্যের মধ্য দিয়ে হাস্যরসাত্মক সমাজ সমালোচনায় দর্শকদের মনোরঞ্জন করত।[১৭] উনিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে যে তিনটি নাটক বাংলায় অনূদিত হয়ে প্রথম প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে দু'টিই এ জাতীয় লঘুনাট্য তথা প্রহসন— 'হাস্যার্ণব' (১৮২২) এবং 'কৌতুকসর্বস্ব' (১৮২৮)। বোঝা যায়, সিরিয়াস নাটকের চেয়ে প্রহসনের জনপ্রিয়তা ও চাহিদা কোনো অংশে কম ছিল না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, প্রাচ্য প্রহসনের মূল রস— হাস্যরস; ব্যঙ্গবিদ্রূপ বা অসূয়াযুক্ত তির্যকতা তার স্বভাব ছিল না। অর্থাৎ লঘুতা ভাণের আড়ালে সিরিয়াস হয়ে ওঠার কৃৎকৌশল প্রাচ্য প্রহসনের লক্ষণ নয়। ফলে, উনিশ শতকের কলকাতায় শিষ্ট ও তথাকথিত অ-শিষ্ট সংস্কৃতিতে যে বিস্তৃত প্রহসন-কালচার তৈরি হয়েছিল, তার জড় নিহিত ছিল একই সঙ্গে পাশ্চাত্য প্রহসন বা Farce-এর মধ্যে।

'ফার্স' (Farce) শব্দটি এসেছে লাতিন শব্দ 'farsa' থেকে, যার অর্থ আদতে ছিল ধর্মীয় নাটক; পরবর্তীকালে ইংরেজি মিস্টিক নাটকের সঙ্গে এই রূপকল্পটি জুড়ে যায় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্যে হাস্যরসাত্মক, দৈহিক অঙ্গভঙ্গি প্রধান একশ্রেণির লঘু-তরল নাটককেই 'ফার্স' নামে চিহ্নিত করা হতে থাকে। মার্টিন গ্রে'র ভাষায় : ফার্স হল, 'A kind of drama intended primarily to provoke laughter, using exaggerated characters and complicated plots, full of absurd episodes, Iudicrous situations and knock about action. Mistaken indentify is frequently an element in the plot.'[১৮] উচ্চকিত হাস্যরস সৃষ্টির এই নাট্যসংরূপে অবশ্য হাসিই প্রধান, Satire-এর মতো তীব্র, তীক্ষ্ণ, ব্যঙ্গ ও সমাজ সমালোচনা কিংবা Wit-এর মতো বৈদগ্ধ্য সাধারণত ফার্সে অনুপস্থিত। তরল হাসি সৃষ্টির বিশুদ্ধ মনোরঞ্জনেই অবশ্য ফার্স ফুরিয়ে যায়, সামাজিক অন্যতর কোনো দায়বদ্ধতার ভার সে বহন করে না। কাডেনের মতে,[১৯] প্রহসন 'roars of laughter rather than smiles, ... of humour rather than

wit'. কখনো কখনো প্রহসন যে burlesque-র মতো হাসি-তামাশার মধ্যে দিয়ে সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ কিংবা জীবনের গাম্ভীর্যপূর্ণ সত্যের সন্ধান করে, এমনটিও তিনি বলেছেন; যদিও তিনিই আবার বলে দিয়েছেন প্রহসন 'must be distinguished from burlesque– with clowning, buffoonery, slapstic and knockabout.'[২০] ফার্সে প্রযুক্ত উচ্চকিত বোকামি ও দৈহিক অঙ্গভঙ্গির (ক্যারিকেচার) ব্যবহারের অতিরেকই burlesque-র সঙ্গে এর পার্থক্য এনে দেয়। এ. নিকোলও তাঁর 'Dramatic Theory' গ্রন্থে ফার্সের প্রসঙ্গে অবস্থা সৃষ্টি ও তার কাহিনি বৃত্তের অসম্ভাব্যতার উপরই জোর দিয়েছেন।[২১] প্রহসন যে লঘু-তরল হাসিতেই থেমে থাকে, সেকথাও প্রকারান্তরে জানাতে ভোলেন না তিনি।

কিন্তু উনিশ শতকে বাংলায় প্রচলিত, বিশেষ করে বাবু-বিষয়ক প্রহসনগুলিকে নিছক বিশুদ্ধ farce-এর তাত্ত্বিকতার আদর্শে বিচার করা সবসময় সম্ভব নয়। একথা ইতিপূর্বেই জানা হয়েছে যে, সমকালে প্রচলিত বিদেশি রঙ্গমঞ্চগুলিতে প্রায়শই ছোটোবড়ো প্রহসন অভিনীত হত। বাংলাতেও অনূদিত প্রথম নাটক তিনটির মধ্যে দু'টিই কৌতুকসর্বস্ব লঘুনাট্য বা প্রহসন। মধুসূদনের হাত ধরে তথাকথিত শিষ্ট-সাহিত্যেও প্রহসন রচনার হিড়িক পড়ে। কিন্তু বাংলায় রচিত অধিকাংশ প্রহসনের পিছনেই নিছক সাহিত্যিক প্রেরণা ছিল না, ছিল একপ্রকার সামাজিক দায়বদ্ধতা। হাসির আড়ালে আসলে অপেক্ষা করেছিলেন সমাজ সমালোচক ব্যঙ্গ-নিপুণ শিল্পীর চোখ। ফলে উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে রচিত প্রহসনগুলি বিশুদ্ধ প্রহসনের তকমায় তেমন বিবেচিত হবে না, যতটা না বিবেচিত হতে পারে Satire বা তির্যক ব্যঙ্গের দৃষ্টিকোণ থেকে। বাংলায় প্রহসন রচনার পিছনে উনিশ শতকের প্রথম দিকে হয়তো পাশ্চাত্য সংস্কার কাজ করেছে, কিন্তু ক্রমে তার মধ্যে মিশে গেছে প্রাচ্য লঘুনাট্যের ধারা ও তার সংরূপ, সেইসঙ্গেই যুক্ত Satire-এর সুতীব্র কশাঘাত। উনিশ শতকের Committed লেখকেরা সমসাময়িক বিষয় নিয়ে ক্যারিকেচার করতে বসে নিছক হাসতে পারেননি, বরং সামাজিক অধোগতির চিহ্ন দেখে শিউরে উঠেছেন এবং তীক্ষ্ণ তির্যক সমালোচনার সংযোগে একপ্রকার 'ব্যঙ্গহাস্যে'র জন্ম দিয়েছেন। বিশুদ্ধ প্রহসন থেকে সরে আসার ব্যাপারটিতে তাঁরা একইসঙ্গে সচেতন ও দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। উনিশ শতকে প্রচলিত ছয়-সাতশো প্রহসনের অনেকগুলির সংক্ষিপ্ত ভূমিকা কিংবা গৌরচন্দ্রিকায় এই সচেতনতা ও দ্বিধার প্রমাণ মেলে। প্রহসনের পরিচয় দিতে গিয়ে কেউ কেউ যেমন পাশ্চাত্য সংস্কারকে মান্যতা দিয়ে Farce, Satire, Pantomime বলছেন; তেমনি এই জাতীয় 'ব্যঙ্গহাস্য'মূলক রচনার পরিচয় দেওয়া হচ্ছে— পঞ্চরং, ব্যঙ্গকাব্য, ব্যঙ্গনাট্য, সামাজিক ব্যঙ্গনাট্য, সাময়িক নাট্যরঙ্গ, সামাজিক নকশা, সং, বিদ্রূপহাসক, সমাজচিত্র, হাস্যকাব্য, গীতিরঙ্গ, রং-তামাশা, জ্ঞানোদ্দীপক প্রহসন, সামাজিক কিংবা নিছক প্রহসন বলে।[২২] আর এ জাতীয় রচনায় অবধারিত হয়ে উঠেছে ব্যঙ্গের শাণিত ব্যবহার, যা Satire-এর কাছাকাছি যায়। অতএব, 'প্রহসন' নামে সাধারণ পরিচিতি পেলেও, পাশ্চাত্য প্রহসনের বিশুদ্ধতায় এগুলির সংরূপ মিলবে না, এবং Farce এবং Satire-এর সংমিশ্রণে এক নতুন প্রকল্প হিসাবেই উনি শতকের বাংলা প্রহসনগুলির জন্ম হয়েছে।

আসলে উনিশ শতকের উত্তাল এবং ভাঙাগড়ামুখর সময় ঠিক বিশুদ্ধ প্রহসনের উপযুক্ত ছিল না। সমালোচকের ভাষায়, 'সমাজে যখন কোনো কিছুর সংঘাতে জীবন আলোড়িত হয়, প্রচলিত মূল্যবোধের বিচলন ঘটে, গতানুগতিক জীবনস্রোত আকস্মিকভাবে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ হয়, তখনই প্রকৃতপক্ষে ব্যঙ্গ রচনার সূত্রপাত।'[২৩] উনিশ শতকও এ জাতীয় দ্বান্দ্বিক জীবন ও চিন্তনের মুখোমুখি হয়েছিল। সামাজিক, ধর্মীয় ও

রাজনৈতিক নানান সংস্কার ও সংরক্ষণের মধ্যে দিয়ে সমাজ যে অভিমুখে চলেছিল, তা হয় সদর্থক, নয় নঞর্থক— যেকোনো একটি সত্যে উপনীত হতে চেয়েছিল। স্বভাবতই সংস্কারের পক্ষে-বিপক্ষে বাদ-প্রতিবাদ, প্রতিরোধ-সমর্থন, অস্বীকার-স্বীকৃতি নানান চিন্তাভাবনা যুক্তি ফেনিল হয়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মধর্মের উত্থান, খ্রিস্টধর্মের প্রসার, হিন্দুধর্মের প্রাথমিক বিপন্নতা, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার উদ্‌যোগ, পুরাতন মূল্যবোধের বিনষ্টি, আবার নতুন মূল্যবোধকে পুরোপুরি গ্রহণ না করতে পারার যন্ত্রণা— আর এসবের প্রেক্ষাপটে নানান রূপে নানান বেশে 'বাবু'দের তিলতিল করে এগিয়ে-পিছিয়ে চলা, 'সিরিয়াস' এই বিষয় নিয়ে বিশুদ্ধ প্রাহসনিক মজা-মশকরায় মত্ত হতে পারেননি উনিশ শতকের লেখককুল। ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি, উনিশ শতকের বহমান বাঙালি জীবনে এত যে রূপ-রূপান্তর, আলোচনা-সংঘর্ষ, অধিকাংশ স্থলেই তার ঋত্বিক হলেন বাঙালি বাবুকুল। আদিবাবু থেকে নববাবু, নববাবু থেকে নব্যবাবু, নব্যবাবু থেকে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির ভদ্রলোকবাবু এবং তা থেকে শ্রী শক্তিহীন, পরমুখাপেক্ষী কেরানিবাবু পর্যন্ত সকলেই কোনো-না-কোনো ভাবে এ জাতীয় সামাজিক সংঘর্ষমূলক ঘটনা-দুর্ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন বলে, তাঁরাই হয়ে উঠেছেন 'ব্যঙ্গ-হাস্যে'র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আক্রমণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

'Satire' প্রসঙ্গে 'Oxford Dictionary of Literary Terms' জানাচ্ছে যে, এটি হল 'A mode of writing that exposes the failings of Individuals, institutions, or societies to ridicule and scorn.'[২৪] অভিধানকারের মতে, 'formal বা direct' স্যাটায়ারে, পাঠককে সরাসরি উদ্দেশ্য করে লেখক ব্যঙ্গরচনা শুরু করেন। অন্যদিকে নাটক বা নভেলে ব্যবহৃত হয় 'Indirect' স্যাটায়ার, যেখানে পাত্র-পাত্রী তথা চরিত্রের নানান কার্যকলাপের মাধ্যমে সামাজিক সংকটের সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং একইসঙ্গে লেখকের ব্যঙ্গও সুচারুভাবে উপলব্ধ হয়। সাধারণ 'প্রহসনে' এমনটি হবার নয়, কারণ সমালোচকের ভাষায়, 'প্রহসনের রস মিষ্ট হইলেও স্থায়ী নহে; সন্ধান তীব্র হইলেও মর্ম্মভেদী নহে। ইহা অম্লঘায়ের অমোঘ ঔষধ হইতে পারে কিন্তু পুরাতন জ্বরের কেহ নহে। ভোজনাগারে ইহা অতি পরম পরিপাটী চাটনী, কিন্তু ইহাতে উদর পূর্ণ হয় না— মুখে ইহার রসাস্বাদ মুখেই ইহার লয়।'[২৫] অতএব 'প্রহসনে'র এই তাৎক্ষণিতা দূর করতেই ব্যঙ্গের আয়োজন। সাধারণ ব্যঙ্গের ফলও সাময়িক, কিন্তু তার সঙ্গে যদি মিশে যায় সামাজিক ন্যায়বোধ, অনুশাসন ও মূল্যবোধ, সামাজিক সু ও কু-বোধের জলচল দৃষ্টিভঙ্গি, সেইসঙ্গেই সার্বিক কল্যাণবোধের চিন্তা, তবে 'ব্যঙ্গ' তার সাময়িকতাকে অতিক্রম করে সার্বিক সমাজের চরিত্র মোক্ষণ ঘটাতে পারে। হাসির ছলে এ আসলে আত্মস্বরূপদর্শনের প্রচেষ্টা। সামাজিক বিকৃতি, অনাচার, অত্যাচার, অধোগামিতা ইত্যাদি নঞর্থক জীবনসত্যকে দেখাবার অভিপ্রায় আসলে বৃহৎ সামাজিক কল্যাণের প্রয়োজনেই। চারিত্রিক ও সর্বাঙ্গীন পরিশুদ্ধির কামনা থেকেই ব্যঙ্গকর্তা নির্মম, নিষ্ঠুর ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন। এক তীব্র অন্তর্জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে থাকে চোখের জলও। এ কারণেই হিউমারের অশ্রুভার সামান্য হলেও স্যাটায়ারিস্টকেও আচ্ছন্ন করে থাকে।

ব্যঙ্গকর্তা আসলে নীতিবাগীশ নন। কিন্তু যা সমাজের পক্ষে অশুভ, যা অসংগত ও আতিশয্যপূর্ণ, এ জাতীয় স্খলনকে তিনি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখতে পারেন না। তাঁর দৃষ্টিতে থাকে কঠোরতা, অন্যায় ও পাপের প্রতি অনড়-অবিচল ঘৃণা। তিনি চান সহৃদয় সামাজিকের সৃষ্টি করতে, একপ্রকার শুভ বুদ্ধির জাগরণ ঘটাতে, যার দরুন জীবন ও সময় দুইই সুপরিচালিত, কল্যাণময় ও সুন্দর হয়ে উঠবে। সামাজিক

সংশোধন ব্যঙ্গশিল্পীর অন্যতম ঘোষিত অভিপ্রায়। যেমন— উনিশ শতকে 'মাগসর্বস্ব' (১৮৭০) প্রহসনের ভূমিকায় হরিমোহন রায় (কর্মকার) বলে দেন— 'প্রহসনাভিনয়ে যে সামাজিক দোষের কথঞ্চিৎ সংশোধন হয়, ইহা সর্বতোভাবে সম্ভব; কিন্তু বঙ্গদেশে প্রহসনের সংখ্যা অতি অল্প প্রযুক্তই যে সামাজিক দোষের বৃদ্ধি হইতেছে এমত নহে। তবে প্রহসনের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে যদি কিঞ্চিৎ দোষেরও সংশোধন হয়, তাহাই পরম লাভ।'[২৬] অন্যত্র 'বারইয়ারি পূজা' প্রহসনের রচয়িতা শ্যামাচরণ ঘোষাল গ্রন্থের ভূমিকায় (১৮৭৮) স্পষ্টই জানিয়ে দেন, 'আমি গ্রন্থকর্ত্তার পদাকাঙক্ষী কিংবা অন্য কোন গূঢ় অভিসন্ধিতে ইহা প্রকাশ করিতেছি না; সমাজের কতকগুলি কুরীতি সংশোধন করাই আমার পুস্তকখানির একমাত্র উদ্দেশ্য।'[২৭] অর্থাৎ, ব্যঙ্গশিল্পী তাঁর রচনায় সামাজিক কুরীতি, দোষ, পাপ, স্খলন, পতনকে দেখান সময় ও সমাজের অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রকট করবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তাঁর মনোগত অভিপ্রায় এই যে, এইসকল পাপ, দোষ, স্খলন, পতনের হাত থেকে সমাজ মুক্ত হবে, মানুষের মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় হবে এবং আত্মচরিত্র বিকার সংশোধন করে একটি সুউন্নত সমাজের জন্ম দেবে সেই পরিশুদ্ধ মানুষ। ব্যঙ্গশিল্পী বাইরে যতই কঠোর-কঠিন নির্মম হোন না কেন, আসলে তিনি বিবেকী চৈতন্যের দায়িত্ব পালন করেন।

কিন্তু 'ব্যঙ্গহাস্যে'র শিল্পী কি কেবল পাপ, দোষ, স্খলনের কথাই তুলে ধরবেন? সাময়িকতার প্রদর্শনের মধ্যে দিয়ে কি তিনি তাৎক্ষণিক উত্তেজনাই সঞ্চার করবেন? এ প্রসঙ্গে বলা যায়, একজন সার্থক ব্যঙ্গশিল্পী যা আছে, কেবল তার কথাই বলেন না, যা নেই, অথচ যা থাকলে ভালো হত এমন এক আদর্শ ভাবীকালের প্রত্যক্ষ ছবি উপস্থিত করেন কিংবা অপ্রত্যক্ষ ইঙ্গিত দেন অথবা রূপকের সাহায্যে তাঁর ঈপ্সিত কালের আদল তুলে ধরেন। এদিক দিয়ে ব্যঙ্গশিল্পীকে একটি আদর্শ জীবন বা সময়ের রূপকার বলা চলে। মনে রাখতে হবে, ব্যঙ্গশিল্পীকে অনুভবী হতে হয়, সেইসঙ্গেই প্রত্যক্ষ সত্যের অনুভবে তাঁকে উপনীত হতে হয় বাস্তব অভিজ্ঞতার বাস্তব সূত্রে। দেশ-কাল-সমাজ, সেইসঙ্গেই ব্যক্তি মানুষ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ও অনুভব হবে তীক্ষ্ণ, বিচারবিবেচনামূলক এবং আপাতভাবে যুক্তিগ্রাহ্য। পুরাতন মূল্যবোধকেও যেমন তিনি যাচাই করবেন, নতুন সংস্কারকেও তেমনই তাঁকে নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ করতে হবে। সাধারণভাবে লঘু অথবা বৃহৎ, তুচ্ছ কিংবা গম্ভীর, ব্যক্তিগত কিংবা নৈর্ব্যক্তিক যেকোনো বিষয় বা ব্যক্তিই তাঁর লক্ষ্য হতে পারেন, কিন্তু তাঁকে মনে রাখতে হয়, শেষপর্যন্ত যে আদর্শসত্যে তিনি উপনীত হবেন তা সার্বজনীন।

একথা ঠিক, ব্যঙ্গশিল্পীর সৃষ্টির মূল নিহিত থাকে সাময়িক নানান ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা সামাজিক ঘটনাপ্রবাহ বা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে। ফলে কোনো বিশেষ যুগে, বিশেষ দেশ-কাল-পাত্রের অবস্থানগত বিশেষত্বে একই সময়ের ব্যঙ্গশিল্পীদের মধ্যে যেমন গৃহীত বিষয়ের সমতা দেখা যায়, তেমনি রচনার মধ্যে বিষয়গত বৈচিত্র্যহীনতাও ফুটে ওঠে। এর ব্যতিক্রম নেই এমন নয়, কিন্তু সচরাচর কোনো এক যুগের কোনো একদল ব্যঙ্গশিল্পীর মধ্যে বিষয়গত বৈচিত্র্য প্রায় থাকে না বললেই চলে। তাঁদের যা কিছু অভিনবত্ব ও চমৎকারিত্ব, তা ওই বিষয়ের পরিবেশনের গুণে। ব্যঙ্গশিল্পীরা প্রত্যেকেই এককভাবে সামাজিক-পরিশুদ্ধির লক্ষ্যে এগিয়ে চলার লড়াই শুরু করেন বটে, কিন্তু আদতে সেই লড়াই হয়ে ওঠে সার্বজনিক। নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে বহুর কলরব আদতে একক কণ্ঠস্বরে পরিণত হয় এবং তার ফলেই পাপের বিরুদ্ধে, স্খলনের বিরুদ্ধে, আত্মধ্বংসের বিরুদ্ধে তাঁদের লড়াই জোরদার হয়ে ওঠে। সামাজিক অধোগতির দিনে কোনো মহৎ শিল্পীই সম্ভবত সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতাকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। নির্জ্জানে হলেও তাঁর মধ্যে ক্রিয়া করে এই সামাজিক দায়বদ্ধতা। উনিশ শতকীয় বাংলার তাবৎ সাহিত্যের মধ্যেই কোথাও যেন

নিহিত ছিল জ্ঞানে-নির্জ্ঞানে এই দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গটি। ব্যঙ্গহাস্যের কারিগরেরা অবশ্য বারংবার জানিয়ে দেন, সমাজের প্রতি ব্যক্তির প্রতি, জীবনের প্রতি, তাঁদের দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গটি। ব্যঙ্গহাস্যের কারিগর হতেই পারেন রক্ষণশীল, আবার হতেই পারেন আধুনিক প্রগতিশীল, কিন্তু নিজের নিজের যুক্তিসাপেক্ষে আদতে তাঁরা এক আদর্শ জীবনই প্রতিষ্ঠা করতে চান। অর্থাৎ তাঁদের লক্ষ্যের মহত্ব বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। উনিশ শতকের বাংলার তথাকথিত 'প্রহসন' এবং কিছু কিছু সিরিয়াস নাটকের মধ্যে এ কারণেই মূর্ত হয়ে ওঠে বাবুকেন্দ্রিক জীবন, সময়, আচার, অনাচারের মেধাবী ইতিবৃত্ত; আসলে এক পরিশুদ্ধ, বিবেক বাঙালি পুরুষের আত্মপ্রকাশের লক্ষ্যেই এই সময়ের প্রহসনগুলি মেকি বাবুত্বের অবসান কামনা করেছিল একযোগে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে প্রহসন রচনার হিড়িক পড়ে এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। ব্যঙ্গহাস্য যেহেতু তার হাসির উপাদান সংগ্রহ করে সমসাময়িকতা থেকে, অতএব ঐতিহাসিক কালক্রম অনুযায়ী নববাবুদের কথা প্রত্যক্ষভাবে তথাকথিত প্রহসন বা ব্যঙ্গহাস্যে অনুপস্থিত। একই কারণে নব্যবাবুদেরও প্রত্যক্ষভাবে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা দেখেছি যে, নববাবু-নব্যবাবু-মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত ভদ্রলোকবাবু কিংবা কেরানিবাবু— আপাতভাবে এঁরা বিভিন্ন স্বভাবধর্মবিশিষ্ট হলেও, প্রবাহিত কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা এঁরা একে অন্যের স্বভাব কিছু হলেও বহন করেছেন কিংবা স্বভাবের তর-তম রূপান্তরিত হয়ে গিয়ে একে অন্যের চরিত্রধর্মে মিশে গেছেন। নববাবুদের মদ্যাসক্তি, খামখেয়ালিপনা, আত্ম-অহমিকা পরিশুদ্ধ আকারে নব্যবাবুদের স্বভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল, আবার নব্যবাবুদের বিলিতি মদ্যপ্রীতি, সাহেবিয়ানা সংক্রামিত হয়েছিল মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' বাবুদের মধ্যে, সেইসঙ্গেই তাঁরা পেয়েছিলেন নববাবুদের অলসতা, চরিত্রদোষ, নব্যবাবুদের মতো কর্মশক্তি না থাকলেও সভা-সমিতি ও বক্তৃতা বহুভাষণে ভদ্রলোকবাবুরা বেশ দড় ছিলেন। আর কেরানিবাবুরা এই তিন শ্রেণির ভগ্নাবশেষ নিয়ে অলসতা, বাকপটুত্ব, নেশাপ্রীতি, কর্মে অদক্ষতা, পুঁথিপড়া বিদ্যার অন্ধ অনুকরণ, পরদ্বার-আশ্রিত, পরান্নজীবী চরিত্র-স্বভাবকে বাঙালি পুরুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত করে তাকে এগিয়ে দিলেন বিশ শতকের কোঠায়। অতএব, বাঙালিবাবুদের নিয়ে প্রহসন যদিও রচিত হতে শুরু করে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তথাপি সেই সব চরিত্রের মধ্যে বিগত ও সমকালীন বাবুদের আর্কেটাইপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রয়েই গেছে।

১৮৫৭-য় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পরবর্তী কয়েক দশকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে শিক্ষার হার দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। নতুন সামাজিক পরিবেশে আত্মরক্ষার তাগিদে পুরোনো বনেদি পরিবারের সন্তানেরাও উচ্চশিক্ষার আশ্রয়ে ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। ফলস্বরূপ কয়েক দশকের ভিতরেই শিক্ষিত শ্রেণির বাবুদের একটি ভিন্ন গোত্র জন্ম নেয়। এর মধ্যেও ছিল এলিট এবং সাধারণ— এই দুই শ্রেণিভেদ। এঁরা প্রায় সকলেই বাকপটুত্বে, সাহেবিয়ানায়, রাজনীতি নামক নতুন হুজুগে এবং আত্ম-অহমিকায় পৃথক এক বলয়ের বাসিন্দা হয়ে উঠেছিলেন। দেশের আপামর জনসাধারণের সঙ্গে কোথাও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন এঁরা মানসিক দিক থেকে। অথচ সর্বসাধারণের জন্য গৃহীত নানান নীতি-সংস্কার বিষয়ে এঁরাই অভিমত জ্ঞাপন করতেন, আন্দোলন করতেন। রক্ষণশীল এবং সাধারণ কোনো পক্ষ থেকেই এঁরা দীর্ঘকাল সম্মান বা শ্রদ্ধা লাভ করতে পারেননি। এঁদের মধ্যে অনেকের কেবল পানদোষ নয়, অন্য অনেক দোষ ছিল। অনেকেই যাপন করতেন দ্বৈতজীবন। উনিশ শতকের প্রহসনে বাবুদের অনেকেই

একদিকে উচ্চশিক্ষিত, ডিগ্রিধারী, অন্যদিকে লম্পট, বেশ্যাসক্ত, মদ্যপ। সার্বিকভাবে শিক্ষিত বাবুদের দৃষ্টান্তে সমাজের সর্বস্তরেই নৈতিক অধঃপতন ছড়িয়ে পড়েছিল। রক্ষণশীল লেখকদের একটি বড়ো অংশ একে আদৌ ভালোভাবে নেননি। ফলে তাঁদের রচিত ব্যঙ্গহাস্যে এই সকল বাবুরা নিন্দিত হয়েছেন, ধিক্কৃত হয়েছেন স্বভাবতই। একপ্রকার ক্ষমাহীন অসূয়া এই সকল রচনায় অপ্রকাশ্য থাকেনি।

নব্যবাবুরা পাশ্চাত্য শিক্ষার তাৎক্ষণিক আবেগে অনেক খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন, কেউ-বা হিন্দুর প্রচলিত সংস্কারের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করে সাময়িক নাস্তিকতায় নির্বাণপ্রাপ্ত হন। আবার কেউ-বা রুশো, ভলটেয়ার, লক্, বেন্থাম, কোঁত বা মিলের আদর্শে গড়ে তোলেন বাস্তবতার সঙ্গে সংস্পর্শবিহীন এক অলীক আত্মমুগ্ধতার জগৎ। জনসেবা, সমাজ-সংস্কার, নারীমুক্তির প্রতি উদগ্র আকুতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-দর্শনে ইউরোপীয় হয়ে ওঠার যেন প্রতিযোগিতা চলেছিল তাঁদের মধ্যে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুরাও নব্যবাবুদের এই দৃষ্টান্তে কলকাতার নগরজীবনে নিজেদের মধ্যে এক নকল ইউরোপ গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। যদিও এই 'নকল ইউরোপ' প্রকৃত ইউরোপিয়ানদের দ্বারা প্রতিনিয়ত উপেক্ষিত, নিন্দিত, উপহাসিত হত; তৎসত্ত্বেও নিজেদের গড়া এই 'নকল বুঁদিগড়' নিয়ে তাঁরা বেশ আত্মতৃপ্তই ছিলেন। দেশীয় শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের রচিত সেই নকল ইউরোপে যা কিছু পশ্চিমাগত, তাই গ্রহণীয় ও সাদরে বরণীয় হয়েছিল।[২৮] উনিশ শতকের শেষের দুই-তিন দশকে সুকৌশলে এঁদের মধ্যে উপশ্রেণি গড়ে তুলে ভেদবুদ্ধির বীজ বপন করতে ইংরেজ সচেষ্ট হয়। শিক্ষিত শ্রেণির সামগ্রিক জোটের সম্ভাবনা সন্দেহ নেই তাঁদের আতঙ্কিত করে তুলেছিল। ফলে এই ভেদ সৃষ্টির রাজনৈতিক কৌশল হিসাবেই ইংরেজ চালু করে টাইটেল বা খেতাব প্রদান। এর জন্য অবশ্য শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্তটি বাধ্যতামূলক ছিল না। শাসকের পক্ষে যে বাবুটির আনুগত্য ও একনিষ্ঠতা নিশ্চিন্ত ও নিরুপদ্রব বলে মনে হত, খেতাব জুটত তাঁর কপালেই। কখনো কখনো সাহেব উমেদারের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও বাবুদের ভাগ্যে খেতাব বা টাইটেলের শিঁকে ছিঁড়ত। আনুগত্য ও সহযোগিতার সবচেয়ে বেশি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন যে বাবুরা, এক বা একাধিক টাইটেল জুটত তাঁদের কপালে। এর দরুন বাবুদের একটি অংশের মধ্যে যেখানে দেখা যেত আত্মতৃপ্তি, অহমিকাবোধ; অন্যদিকে তেমনি টাইটেল কুড়াতে ব্যর্থ বাবুদের মধ্যে দেখা দিত হতাশা, হীনমন্যতাবোধ। সামাজিক বাবুত্বের ঐতিহাসিক যুগ অপসৃত হওয়ার পর টাইটেল বা খেতাব-নির্দিষ্ট বাবুরাই হতেন সামাজিক বিচারে উচ্চশ্রেণির বাবু। এঁরা এক বা একাধিক টাইটেল বা খেতাব লাভ করতেন। যাঁর যত বেশি খেতাব লাভ হত, তিনি আভিজাত্য ও কৌলীন্যের সপ্তম স্বর্গে বেশি বিরাজ করতেন। মোসাহেব-উমেদার-কর্মপ্রত্যার্থী নীচু থাকের বাবুদের ভিড় জমে থাকত এঁদের চারিপাশে। এঁদের ভিড়ে পরিবৃত 'এলিট' টাইটেল-ধারী বাবুটিকে দেখলে কখনো কখনো মনে পড়ে যায়, নববাবুদের মোসাহেব-পরিবৃত জীবনযাপনের কথা। অনেকসময়েই এই জাতীয় টাইটেল বা খেতাব মিলত অর্থব্যয়ের মাধ্যমে। তার জন্য খেতাব-হীন বাবুরা যারপরনাই ব্যয় করতেন, নৈতিক-অনৈতিক উভয় প্রকার পন্থাই আশ্রয় করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। কোনো কোনো প্রহসনে (এবং নকশায়) বাবুদের এই টাইটেল প্রীতিও তীব্র কটাক্ষের আগুনে ভর্ৎসিত হয়েছে।

মদ্যপান, বেশ্যাসক্তি, লাম্পট্য ইত্যাদি অর্জিত গুণগুলির জন্যও বাবুরা যেমন ভর্ৎসিত হয়েছেন, তেমনি উনিশ শতকের শেষদিকে স্বায়ত্তশাসন, দল, রাজনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে হুজুগে মেতে ওঠা বাবুরাও কম নিন্দিত হননি। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু থেকে শুরু করে বটতলার সাধারণ, অজ্ঞাত

প্রহসনকারেরাও শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের এই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও আন্দোলনের অন্তঃসারশূন্যতা ও আবেগসর্বস্ব উদ্ভ্রান্তিকে লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিয়েছেন। অনেকসময় নানান বাস্তব সামাজিক আন্দোলনের সূত্র ধরেও সমসময়ের রাজনীতি ও দলাদলি মূর্ত হয়েছে।

মনে রাখতে হবে, উনিশ শতকের প্রথম পর্বের প্রায় শেষদিক থেকে ব্রাহ্মরাই শিক্ষিত-মধ্যশ্রেণির ধারকবাহক ও চালক হয়ে উঠেছিলেন। প্রথমত, এঁরাই পাশ্চাত্য শিক্ষায় গড়ে ওঠা সুশিক্ষিত শ্রেণি হিসাবে বাবুত্বে কিছুদিনের জন্য অন্তত নতুন চারিত্র্যধর্ম সঞ্চার করেছিলেন। ব্রাহ্মরাই ছিলেন উনিশ শতকের নানান ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের মূল উদ্গাতা। নারীকেন্দ্রিক আন্দোলনের প্রতি যে সমর্থন ও সহযোগিতার ক্ষেত্র গড়ে তুলেছিলেন নব্যবাবুরা, ব্রাহ্মবাবুরা তাকেই মান্যতা দিয়ে তাত্ত্বিক ভাবনাকে কর্মের মধ্য দিয়ে সত্য করে তুলতে চেয়েছিলেন। সমাজের সবচেয়ে শিক্ষিত, আপাতভাবে ধর্মীয় গোঁড়ামিমুক্ত, প্রগতিশীল, আধুনিক শ্রেণি হিসাবে ব্রাহ্মবাবুরা উনিশ শতকের জাতীয় জীবন আচ্ছন্ন করে ছিলেন। মদ্যপানবিরোধী আন্দোলনই হোক, কিংবা রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলন, সবেতেই তাঁরা ছিলেন অগ্রচারী। স্বভাবতই উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে ব্রাহ্মদের প্রভাব-প্রতিপত্তির কাছে পিছু হটেছিল আগ্রাসী খ্রিস্ট ধর্মান্দোলন এবং হিন্দুর প্রাচীন সংস্কারে-আবিল জীবন। বিধবা বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতার কথা বলে রক্ষণশীল হিন্দুত্বের ক্ষেত্রে তাঁরা বড়োসড়ো আঘাত হেনেছিলেন। এইসব কারণেই শিক্ষিত হিন্দুদের রক্ষণশীল একদল লেখক ব্যঙ্গহাস্যের অবলম্বন হিসাবে প্রায়শই যে বাবুকে কেন্দ্র করে এগিয়ে চলেন, তিনি হয় ব্রাহ্ম, নয় ব্রাহ্মমতের সমর্থনকারী। এমনকী যে ব্যঙ্গহাস্যে কেন্দ্রীয় চরিত্রটি ব্রাহ্ম নয়, সেখানেও ব্রাহ্মবাবুর কোনো পার্শ্বচরিত্র সৃষ্টি করে উক্ত শ্রেণির প্রতি নির্মম কশাঘাত করা হয়েছে। উনিশ শতকের তথাকথিত প্রহসন বা ব্যঙ্গহাস্যে তার ফলে মধ্যশ্রেণির ‘ভদ্রলোক’বাবুদের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছেন ব্রাহ্মবাবুরা।

একথা ঠিক, উনিশ শতকের প্রায় প্রান্তসীমায় পৌঁছে নানা মত, নানা দল, নানান শাখা-উপশাখায় বিভক্ত ব্রাহ্মধর্ম ও তার অনুগামীদের মধ্যে সহনশীলতা ও সৌভ্রাতৃত্বের পরিবেশ আর ছিল না। প্রগতি ও নারীস্বাধীনতার নামে নানারকম অন্ধতা, গোঁড়ামি, স্থলবিশেষে অনাচার-ব্যভিচারও অনুপ্রবিষ্ট হয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে। পরিচালক তথা আচার্যবৃন্দের পারস্পরিক ব্যক্তিত্বের সংঘাত ব্রাহ্মবাবুদের ইমেজের ক্ষেত্রে ক্ষতি বই লাভ করেনি। নানান আবিলতায় ব্রাহ্মধর্ম ক্রমশ নিমজ্জিত হতে থাকে, যা থেকে উঠে আসা ছিল বহু সাধনার ফল। বলতে দ্বিধা নেই, বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম ছাড়া ব্রাহ্মবাবুদের পক্ষে আর পূর্বতন গরিমায় ফিরে আসা সম্ভব হয়নি। ফলে গল্প-উপন্যাস কিংবা নকশার আলোচনাকালেও আমরা দেখব, ব্রাহ্মবাবুদের এই হীন, আপাত উদারতার আড়ালে ভণ্ডামির ছবি সেসবেরও বিষয় হয়ে উঠেছে। সন্দেহ নেই, ব্রাহ্মদের ধর্মীয় চিন্তার সারবস্তুতে যেমন আবিলতা ছিল না, তেমনি সকল ব্রাহ্মবাবুই মন্দ হীন চরিত্রের ছিলেন না। কিন্তু তীব্র অসূয়াবশত রক্ষণশীল হিন্দু লেখকেরা যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন তাঁদের চরিত্রের dark side-টাই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড়ো করে দেখেছেন। এক হিসাবে, এ অর্ধসত্য সন্দেহ নেই, কিন্তু এই প্রবণতা সামাজিক মনান্তরের বাস্তব প্রেক্ষিতটিকেও অগোচরে ফুটিয়ে তোলে। তা ছাড়া শিক্ষিত ‘ভদ্রলোক’বাবু মাত্রেই ব্রাহ্ম— এই দৃষ্টান্ত প্রকারান্তরে হিন্দুদের শিক্ষাগত দৈন্যের আভাসও বহন করে। তথাকথিত হিন্দুরা যে তখনও ‘ভদ্রলোক’বাবুতে পরিণত হতে পারেননি, এমনটিই মনে হওয়া স্বাভাবিক। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসের নেতৃত্বে হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হিন্দু রক্ষণশীল অংশকে উজ্জীবিত

করেছিল। একইসঙ্গে বহু ব্রাহ্ম এবং হিন্দুদের একটি সামন্বয়িক মিলনক্ষেত্রও রচনা করেছিল। যদিও সেই সমন্বয়ের ছবি প্রাপ্ত প্রহসনগুলিতে নিতান্ত দুর্লভ।

তথাকথিত প্রহসন বা ব্যঙ্গহাস্যের রূপকল্প যেমনই হোক না কেন, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সাহিত্যের এই বিশেষ ধারাটি ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। প্রধানত, সামাজিক নানান সমস্যা, প্রবণতা কিংবা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে প্রহসনগুলি রচিত হয়েছিল এবং গৃহীত বিষয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে আপন আপন দৃষ্টিকোণ তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছিল। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি উনিশ শতকের প্রথমার্ধের শেষ দিকে নাট্যশালা স্থাপন এবং শখের থিয়েটারে অভিনয় শিক্ষিত বাঙালিবাবুদের কাছে হুজুগে পরিণত হয়েছিল। বিত্তবান বাবুদের কাছে প্রসঙ্গটি অনেকটা সামাজিক মর্যাদার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অথচ বাংলায় অভিনয়যোগ্য, এমনকী নিছক পঠিতব্য নাটকের সংখ্যা ছিল না বললেই চলে। অতএব প্রথম পর্যায়ে নাট্যমোদি বাবুরা সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করে বা ইংরেজি নাটকের অভিনয় করে তাঁদের শখ পূরণের চেষ্টা করেন। এরপর কোনো কোনো নাট্যমোদি বাবুদের উদ্যোগে মৌলিক বাংলা নাটক লেখার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে বাংলা নাটকের অভাব মোচনের ব্যবস্থা করা হয়। যেমন— জোড়াসাঁকো নাট্যশালার পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫) এবং গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৭-১৮৮১) বহুবিবাহ সম্বন্ধে নাটক রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে পরে তা প্রত্যাহার করে উক্ত দায়িত্ব রামনারায়ণ তর্করত্নের (১৮২২-১৮৮৬) উপর সমর্পণ করেন এবং রামনারায়ণ এই উপলক্ষ্যেই 'নবনাটক' (১৮৬৬) রচনা করেন। গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে রামনারায়ণ নিজেই স্বীকার করেছেন যে, 'জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, এই বহুবিবাহ বিষয়ক 'নবনাটক' তিনি রচনা করেছিলেন।[২৯] যদিও রামনারায়ণ ইংরেজি জানতেন না, তথাপি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাক্ষ্য অনুযায়ী, রামনারায়ণ 'ইংরেজি শিক্ষিত লোকদিগের রুচিকে প্রশ্রয় দিয়াই' বাংলায় এই বিয়োগান্ত নাটক রচনা করেন।[৩০] বাঙালি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের রুচি যে ক্রমে পাশ্চাত্যমুখী হয়ে পড়ছে, এই ঘটনাই তার প্রমাণ।

নাটক বা প্রহসন দৃশ্যকাব্য বলে অভিনয়ের মাধ্যমে তা শিক্ষিত-অশিক্ষিত বহু মানুষের কাছে পৌঁছোতে সক্ষম হয়। উনিশ শতক যে প্রবল ভাঙা-গড়ার মধ্যে দিয়ে চলেছিল, তার মূল স্বরূপটিকে জানানো-বোঝানোর জন্য নাটক প্রহসনকেই উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবে মনে করেছিলেন এই সময়ের স্রষ্টারা। কারণ, এর দ্বারা যত সহজে যত বেশি সংখ্যক মানুষকে সচেতন, প্রভাবিত কিংবা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা যায় অন্য মাধ্যমে ততটা নয়। কারণ, অন্য মাধ্যমগুলি নিতান্ত ব্যক্তিগত পাঠ-অভ্যাসের দাবি রাখে। প্রহসনগুলি তো এক হিসাবে সাধারণ জনমতের প্রতিফলন বললেই হয়। অবশ্য বাবুদের ব্যক্তিগত শখ কিংবা ইচ্ছে-অনিচ্ছের আওতা ছেড়ে বেরিয়ে এসে ১৮৭২-এ যখন ন্যাশনাল থিয়েটার তথা সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হল, তখনই সমাজ সমালোচনামূলক, এমনকী ব্যক্তিগত অসূয়ামূলক নাটক, প্রহসন রচনার যেন জোয়ার এল। বিশেষ করে, বাবুবিবিদের সমালোচনা, তাঁদের অধঃপতন বা ভ্রান্তির প্রতি ব্যঙ্গমূলক মতামত নাটকের ভাষায় স্বাধীন রূপ পেল ১৮৭২-এর পর থেকেই। সমসাময়িক বিষয়-নির্ভর কিংবা সংঘটিত ঘটনা বিষয়ক একাধিক নাটক এইসময় বটতলা থেকে প্রকাশিত হয়। এমনটি নয় যে, এই নাটকগুলির সবগুলিতেই বাবুর চেহারা চরিত্র বিষয় হয়ে উঠেছে। বিধবা বিবাহ থেকে পণপ্রথা, বহুবিবাহ থেকে মদ্যপানের কুফল— উনিশ শতকের সময় বিষয়ের দিক থেকে শূন্য ছিল না। পূর্বেই বলা হয়েছে— আদিবাবু, নববাবু বা নব্যবাবুর কাল তখন অস্তমিত। পাশ্চাত্যের ভাবধারা সম্মিলিত এক ধরনের সংকর-

স্বভাবের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুরাই তখন সমাজের উপর প্রভাব কায়েম করতে চাইছেন। হুতোমের ভাষায়, 'বনেদী বাবুয়ানার যুগ' তখন সত্যিই আর নেই। কিন্তু যেহেতু বনেদিবাবুরা না থেকেও ছিলেন এবং মধ্যশ্রেণির ভদ্রলোকবাবু থেকে কেরানিবাবু পর্যন্ত বনেদিবাবুদের নানান চরিত্র-ধর্ম, জ্ঞানে-অজ্ঞানে আচরণ করে চলেছিলেন, ফলত তাঁরাও অনেক প্রহসনে বিষয় হয়ে উঠেছেন। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির ভদ্রলোকবাবু, ব্রাহ্মবাবু, সাহেবি মনোভাবাপন্ন বাঙালি সাহেববাবু এবং অশিক্ষিত হয়েও 'বাবুজন্মাভিলাষী' কোনো কোনো তথাকথিত বাবুরাই হয়ে উঠেছেন এ জাতীয় প্রহসনের আক্রমণের লক্ষ্য।

সব মিলিয়ে, 'বাবু' সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ প্রহসনের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। সেগুলির মধ্যে সবকটিই যে আলোচনার দাবি রাখে এমনটিও নয়। গবেষণার এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সেগুলির সবকটির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা অসম্ভব জেনে প্রাপ্ত সংগৃহীত নির্বাচিত কিছু প্রহসন ও নাটককেই প্রতিনিধি স্থানীয় বলে গ্রহণ করা হয়েছে এবং বাবু সম্পর্কে তথা শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের চরিত্রের একটি আদল তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। একইসঙ্গে অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয়েছে, তাঁদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিকোণের স্বরূপটিকে। প্রত্যক্ষভাবে 'বাবু' বিষয়ক নয়, কিন্তু বিষয়গত তাৎপর্যে বাবুদের দেখা মেলে এবং তাঁদের কৃতকর্মের উপর ভর করে নাট্য বিষয় এগিয়ে চলে, এমন নাটক প্রহসনকেও কিছু কিছু গ্রহণ করা হয়েছে বক্ষ্যমান আলোচনায়। বর্তমানে লুপ্ত বা দুষ্প্রাপ্য, অতএব প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত নয়, এমন নাটক প্রহসনের বিষয়কে পরোক্ষ উৎস থেকে সংগ্রহ করেও প্রয়োজনে ব্যবহার করেছি আমরা। কোনো কোনো নাটক, প্রহসনের কেবল নামমাত্র জানা গেছে, তার থেকে অনুমানমাত্র করা চলে বক্তব্যবিষয়টি, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে না এসে সম্ভাব্য কোনো বক্তব্য উল্লিখিত হয়েছে দু'একটি ক্ষেত্রে। আসলে, বাবু-বিষয়ক অগণন নাটক-প্রহসনের বিষয় সংকলন না করে, আমরা প্রতিনিধিস্থানীয় কিছু রচনার মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছি 'বাবু' সম্পর্কে সমকালের ধারণা, মতামত ও সিদ্ধান্তকে। ব্যপ্ত অর্থে যা আসলে 'বাবু'র সূত্র ধরে উনিশ শতকের বাঙালি পুরুষের চারিত্রিক ও মানসিক রহস্য সন্ধানের প্রচেষ্টা। এই সময়ের নাটক, বিশেষত প্রহসনগুলি যেহেতু কল্পনা অপেক্ষা অনেক বেশি নির্ভর করেছে প্রত্যক্ষ সামাজিক বাস্তবের উপর, ফলে সাহিত্যগত মূল্যে তা যতই দীন বা তুচ্ছ হোক না কেন, ঐতিহাসিক সমাজ-বাস্তবতার দিক থেকে এগুলির সাক্ষ্য মূল্যবান। মনে রাখতে হবে, সাহিত্যের ভালো-মন্দ, উৎকর্ষ-অপকর্ষ আপেক্ষিক ব্যাপার। একযুগের সাহিত্যিক আদর্শ আর এক যুগের চোখে তুচ্ছ হীন বা পরিহারযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। অতএব এ জাতীয় প্রহসনের অনেকগুলিই যদি ভাষা বিষয় বা বর্ণনার দিক থেকে এ কালের চোখে অশ্লীল বলে পরিগণিত হয়, তাকে নেহাতই রুচিবদলের ফল হিসাবে গ্রহণ করাই সংগত। মনে রাখতে হবে, এইসব নাটক-প্রহসনের সিংহভাগই রচিত হয়েছিল বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিতে, বিশেষ সামাজিক দায়বদ্ধতার তাগিদে। সমকালের দায়বদ্ধ কিছু লেখক ব্যঙ্গে-ভর্ৎসনায়, উপহাসে-অনুরোধে বাঙালি 'বাবু' তথা ব্যাপ্ত অর্থে বাঙালি পুরুষের অন্তর্গত চেতনার পরিশুদ্ধি কামনা করেছিলেন, তার মানসিক উদ্ভ্রান্তিকে সংহত করে নিজের নিজের মতো করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সেই বিশুদ্ধ সত্তাকে, এই শতকের নাটক ও প্রহসনগুলির নির্বাচিত পরিগ্রহণ থেকে আমরা সেই তাগিদটিকেও বোঝার চেষ্টা করব।

উনিশ শতকের বাংলা প্রহসনে তথাকথিত বনেদিবাবুরা অনুপস্থিত। এর একটি কারণ সম্ভবত, এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বনেদিবাবুদের যুগ ফুরিয়েছিল। আর্থ-সামাজিক কারণেই বনেদি বাবুয়ানার টিকে থাকা

আর সম্ভব ছিল না। নতুন যুগের ভুঁইফোঁড় বাবুদের চরিত্র বদল ঘটেছিল। যাবতীয় দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও আদি ও নব্যবাবুদের সঙ্গে দেশীয় সাধারণের বিস্ময়যুক্ত সমর্থন ও শ্রদ্ধার যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, নতুন যুগের বাবুদের সঙ্গে তেমনটি গড়ে ওঠেনি আর সে কারণেই, একই দোষে নতুন যুগের বাবুরা যেখানে প্রায়শই ভর্ৎসিত হয়েছেন, সেখানে উক্ত দোষের বাড়াবাড়ি প্রকোপ সত্ত্বেও আদি বা নববাবুরা ঈষৎ অনুযোগ-মিশ্রিত প্রশ্রয় পেয়েছেন। এ যুগের বটতলার প্রহসনকারদের সিংহভাগই ছিলেন রক্ষণশীল হিন্দু। ইংরেজি শিক্ষা থেকে স্ত্রীস্বাধীনতা, মেয়েদের স্কুল থেকে প্রগতিপন্থীদের আন্দোলন, ব্রাহ্ম-কার্যকলাপ থেকে 'ভদ্রলোক'বাবুদের চিন্তা ও চেতনা— সব কিছুকেই তাঁরা রক্ষণশীল মূল্যবোধের নিরিখে যাচাই করেছেন এবং প্রায়ই তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন। প্রগতিশীলবাবুদের নানান কার্যকলাপের ফলে বাঙালি হিন্দুর চিরাচরিত সংস্কার এবং হিন্দু রমণীদের শুচিতা-পবিত্রতা বিলুপ্ত হবে, এমন আশঙ্কা তাঁরা প্রায়ই করেছেন। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হিন্দুত্বের মধ্যে অপরাপর বিজাতীয় ধর্ম সংস্কৃতির নির্বাধ অনুপ্রবেশ যে সংকট ও বিপন্নতার জন্ম দেবে, এ বিষয়ে তাঁরা একমত ছিলেন বলা চলে। তাঁদের সেই সংকট-সংশয় ও আশঙ্কার মূল হিসাবে তাঁরা চিহ্নিত করেছিলেন নতুন যুগের নব্যবাবু, শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবু প্রমুখদের। চারপাশের সমাজজীবন থেকে নানান উপাদান সংগ্রহ করে বাস্তবের সঙ্গে আশঙ্কিত কল্পনাকে মিশিয়ে তাঁরা এক ভীতির জগৎ গড়ে তুলতে চেয়েছেন, যাতে এই সংকট প্রত্যক্ষ করে সমাজের সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই সচেতন হন, দূরে থাকেন এই প্রকার ছদ্ম- প্রগতিশীলতা থেকে। অবশ্য এর পাশাপাশি এঁরাই আবার কিছু নিন্দনীয় সামাজিক ব্যাধি, যেমন— বেশ্যাগমন, লাম্পট্য, মদ্যপান, শিক্ষাভিমানিতা ইত্যাদি প্রসঙ্গেও প্রতিবাদের কণ্ঠ তুলে সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় রেখেছেন। সব মিলিয়ে কিন্তু অভিযোগের তীর সেই নতুন যুগের বাবুদের প্রতি এবং তাঁদের অনুকরণীয় রীতিনীতি আদর্শের প্রতি। নিজেদের মতো করে এক রক্ষণশীল হিন্দু গড়নের সমাজের কথা ভেবেছিলেন তাঁরা, যে সমাজে নতুন যুগের বাবুরা ছিলেন এককথায় অপাংক্তেয় কিংবা আত্মশুদ্ধির পরে গ্রহণযোগ্য। প্রহসনের মধ্য দিয়ে এই নতুন যুগের 'বাবুজন্মাভিলাষী' বাঙালি পুরুষদের এই আত্মশোধনের মুখোমুখি করে দিতে চেয়েছেন প্রহসনকারেরা। হয়তো, এ কারণেই তাঁদের রচনায় এত পাপ, এত বিকৃতি, এত দোষ, এত অন্ধকারের কথা।

নতুন যুগের বাবুদের শ্রেণিবিভাগ করতে গিয়ে, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতের কথা মাথায় রেখে কোনো কোনো প্রাজ্ঞ আলোচক[৩১] এই প্রসঙ্গে তিনটি ভাগের কথা বলেছেন— (ক) ফোতোবাবু, (খ) হঠাৎবাবু এবং (গ) কাপ্তেনবাবু। বিভাগগুলি যে যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নেই। আমরাও এই বিভাগ অনুসরণ করার পক্ষপাতী; তেমনটি করাও হয়েছে; কেবল তার সঙ্গে আমরা যুক্ত করতে চেয়েছি আরও একশ্রেণির বাবুদের কথাও— (ঘ) প্রগতিশীলবাবু। ছদ্ম-প্রগতিশীল এবং যথার্থ প্রগতিশীল উভয় প্রকার বাবুই প্রহসনকারদের রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণ থেকে তীব্রভাবে ভর্ৎসিত ও উপহাসিত হয়েছেন। উনিশ শতকের একেবারে শেষদিকের বাবুরাও তাঁদের ছদ্ম-স্বাদেশিকতা, হাস্যকর ইংরেজ অনুগত দেশভক্তি, স্বার্থপর রাজনৈতিক প্রোপাগাণ্ডা নিয়ে দিব্যি এই প্রগতিশীলবাবুদের দলভুক্ত হয়ে যান। আর এ জাতীয় প্রগতিশীলতা কখনো হাস্যকর অস্বাভাবিকতা, কখনো পারিবারিক ও সামাজিক বিপর্যয়, কখনো আবার খোদ বাবুরই আর্থিক সংকটের চেহারায় উপস্থিত হয়েছিল। এঁদের নিজস্ব চরিত্রমহিমা এবং এঁদের প্রতি প্রহসনকার তথা সমাজের একটি ব্যাপ্ত অংশের দৃষ্টিকোণটিকে বুঝতেই 'প্রগতিশীলবাবু' নামক পৃথক শ্রেণিবিভাগ যুক্তিযুক্ত বলে আমাদের মনে হয়েছে। প্রহসনের নিরিখে বাবুদের সামাজিক স্বরূপ নির্ণয় ও

সাংস্কৃতিক অভিঘাতকে আমরা এই ধারাবাহিকতাতেই সংক্ষেপে বুঝে নিতে চেষ্টা করব। আমাদের ধারাবাহিক ক্রমটি হবে— (ক) হঠাৎবাবু, (খ) ফোতোবাবু, (গ) প্রগতিশীলবাবু এবং (ঘ) কাপ্তেনবাবু।

**(ক) হঠাৎবাবু :** কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এবং নতুন ধনতান্ত্রিক বাজার-অর্থনীতির কৃপায় 'অর্থসম্পন্ন অথচ সাংস্কৃতিক আভিজাত্যহীন' একদল বাবুর আবির্ভাব হয়েছিল। ইংরেজদের শাসন ও শোষণ প্রক্রিয়ার সহায়ক হিসাবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে যেমন একশ্রেণির ভুঁইফোঁড় জমিদারদের দেখা মিলল, তেমনি দালালি, বেনিয়ানি, মৎসুদ্দিগিরির হাত ধরে আর্থিক দিক থেকে কুলীন হয়ে ওঠা একশ্রেণির 'হঠাৎবাবু'ও আবির্ভূত হলেন। ভুঁইফোঁড় গ্রামীণ হঠাৎবাবুরা সেদিন অনেকেই নগরমুখী। সবারই লক্ষ্য ছিল নব্যসংস্কৃতির রাজধানী কলকাতা। নিজেরা না পারলেও অনেকেই সন্তানসন্ততি তথা পরবর্তী প্রজন্মকে কলকাতাবাসী করতে তৎপর। কারণ, তবেই ইংরেজদের সান্নিধ্যের প্রত্যক্ষ সুযোগ মিলবে, মিলবে দেওয়ানি বা দালালির সুযোগ, সরকারি চাকরি লাভও অসম্ভব নয়। সেইসঙ্গেই নাগরিক জীবনের নানান রঙিন প্রলোভন তো আছেই। একইসঙ্গে লক্ষ্মীলাভ এবং সেইসঙ্গেই নাগরিক সংস্কৃতির অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে ভেসে যাওয়ার নেশায় এই 'হঠাৎবাবুরা' সেদিন বিভোর। যাঁরা কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছোতে পারতেন না, নিকটবর্তী জেলা শহরগুলিতে এসে বাস করতেন। এবং বলা বাহুল্য, অচিরেই তাঁদের চাহিদায় জেলা শহরগুলিও কলকাতার ক্ষুদ্র-অতি ক্ষুদ্র সংস্করণ হয়ে উঠত। আর নিতান্ত যাঁরা গ্রামে থাকতে বাধ্য হতেন, তাঁদের জীবনযাপনেও পড়ত শহুরে সংস্কৃতির নানান আদল। অন্যদিকে কলকাতা ও জেলা সদরগুলিতে ভিড় জমানো দালাল, বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, পুঁজিপতি 'হঠাৎবাবু'দের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই নাগরিক সংস্কৃতির প্রতি আসক্তি এবং তার দরুন অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল।

হঠাৎবাবুদের এই নব্য চাহিদা এবং আভিজাত্যহীন ঐতিহ্যহীন সংস্কৃতির জোয়ারে গা ভাসিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টার পিছনে ইংরেজদের ব্যক্তিগত স্বার্থ নিহিত ছিল। ধনতন্ত্রের স্বভাবই হচ্ছে, মুনাফাকে ঠিক রেখে যে বাজার থেকে রসদ সংগৃহীত হচ্ছে, সেই বাজারকেই বিপণনের ক্রেতা করে তোলা। ধনতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করতে চায় সকল কিছুকে। মানুষের অবকাশও ধনতন্ত্র নিজের মতো করে গড়ে তোলে এবং একইসঙ্গে অবকাশ-বিনোদনের প্রলোভন তৈরি করে লগ্নিকৃত পুঁজির অতিরিক্ত লভ্যাংশ সংগ্রহ করে। এই কারণেই— 'Industrial capitalism not only created work, it also created "leisure" in the modern sense of the term... leisure was also the creation of capitalism in another sense, through the commercialization of leisure.. The importance of this can hardly be exaggerated, for whole new industries were emerging to exploit and develop the leisure market, which was to become a huge source of consumer demand, employment, and profit.'[৩২] ঔপনিবেশিক শোষণের পরিপূরক হিসাবে অতএব ধনতন্ত্রের গোপন ছকে অতএব নাগরিক নব্য সংস্কৃতির ফাঁদ প্রস্তুত হল এবং ঐতিহ্যহীন আভিজাত্যহীন হঠাৎবাবুরা না বুঝেই স্বেচ্ছায় সেই ফাঁদে পা দিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, যে ইংরেজ ১৮৩৫-এর আগে পর্যন্ত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন যুক্তিযুক্ত হবে কি না, এ ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল[৩৩], তাঁরাই কিন্তু পাশ্চাত্য রকমের 'বিনোদনে'র নানান প্রলোভন তৈরি করে চলেছিল নির্দ্বিধায়। এর ফলে মূলধনকে অটুট রেখে ভারত থেকে বহিঃস্রোতের মতো নির্গত লভ্যাংশ থেকেই নতুন বিনিয়োগ করা যেত এবং ভারতকেই উৎপাদিত পণ্যের বাজার হিসাবে গড়ে তুলে অনেকটা মাছের তেলেই মাছ ভাজার ব্যবস্থা করা হত। সাহেবসুবোরা যাঁরা এদেশে চাকরি করতেন, এই সুযোগে

তাঁরাও তাঁদের মুনাফাকে বাড়িয়ে নিতে পারতেন। ধনীবাবুদের বাড়িতে সাহেব-বিবির আগমন এবং সেই উপলক্ষ্যে বিলিতি আবহাওয়ায় নাচ-গান, কনসার্ট, বলডান্সসহ চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়র অঢেল আয়োজনের সংস্কৃতি, ব্যক্তিগত জীবনাচরণে ক্রমশ ঢুকে পড়া বিলিতি দ্রব্যাদির অভ্যাস আসলে ধনতন্ত্রের সেই গোপন সূত্র মেনেই দেখা দেয়। হঠাৎবাবুরা স্বাভাবিকভাবেই চমক ধরানো এই প্রকার বিলিতি সংস্কৃতির আত্তিকরণ অনুকরণের মাধ্যমে জাতে উঠতে চেয়েছিলেন। তাঁরা জানতেন, প্রচলিত আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-ধনতান্ত্রিক উনিশ শতকীয় কলকাতায় বা  নগর জীবনে বংশগত কৌলীন্যে কোনোদিনই তাঁদের জো নেই কলকে পাবার। অতএব প্রয়োজন হয়েছিল শাসকের পক্ষপুষ্টে থেকে, বিলিতি প্রথামত স্বাচ্ছন্দ্য ও সংস্কৃতির আবহাওয়ায় বাইরের খোল-নলচে বদলানোর মধ্য দিয়ে সামাজিক ভাবে জাতে ওঠার। হঠাৎবাবুদের এই মনোভাবকেই পরিপোষণ করে ধনতন্ত্র আপন স্বার্থসিদ্ধি করেছিল। হঠাৎবাবুরা অনেকেই প্রভূত অর্থ-বিত্ত সঞ্চয় করেছিলেন, তা দেশীয় বাজারে বিনিয়োগ হলে তাঁদের দ্বিগুণ বা তিনগুণ লাভও হতে পারত। কারণ উনিশ শতকে খাস কলকাতাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল এক বিপুল বাজার, যার চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা ইংরেজেরও একার পক্ষে বেশ মুশকিলই ছিল। কিন্তু তবুও এই বাজারকে কুক্ষিগত করে রাখতে বেনিয়া ইংরেজ সুকৌশলে মনোরঞ্জনমূলক বিনোদনের অঢেল আয়োজন করে হঠাৎবাবুদের বিভ্রান্ত করেছে। বাবুয়ানার দ্রব্যসামগ্রী এঁরা সংগ্রহ করেছেন ইংরেজদের প্রস্তুত চাহিদামাফিক এবং বাবুয়ানার ক্রয়সামগ্রী সংগ্রহ করে বিদেশি শিল্পের বাজারকেই প্রত্যক্ষভাবে মুনাফালাভের সুযোগ করে দিয়েছেন। অপরপক্ষে এর দরুন দেশীয় বিনিয়োগের ব্যাপারটি দুর্বল হয়ে পড়েছে। ধনতন্ত্রের এই গোপন অভিসন্ধিকে বাঙালি শিক্ষিতবাবুরাও বহুকাল পর্যন্ত উপলব্ধি না করাও বংশানুক্রমিকভাবে এঁরা হয়ে পড়েছেন পরউচ্ছিষ্টভোজী দাসীয় বৃত্তিকাঙক্ষী, ব্যাবসাবিমুখ অথচ বিলাসী, অলস একটি জাতি।

‘হঠাৎবাবু’দের প্রতি আক্রমণ শাণিত হয়েছে দু’দিক থেকে;— রক্ষণশীল এবং প্রগতিপন্থী— উভয় দলই ‘হঠাৎবাবু’দের আক্রমণ করতে দ্বিধা করেনি। যেহেতু ‘হঠাৎবাবুদে’র কোনো বংশগত কৌলীন্য ছিল না, ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই রক্ষণশীলরা তাঁদের গ্রহণ করতে পারেননি। এমনকী তাঁদের জীবনযাপন, ধর্মীয় কৃত্যাদি রক্ষণশীলদের মতের উপযোগী হলেও তাঁরা গৃহীত হননি। অন্যদিকে প্রগতিশীলরা তাঁদের দ্বিধাগ্রস্ত জীবনযাপনকেই উপহাস করেছেন। একদিকে নিজ ধর্মের গোঁড়ামি বজায় রাখা, অন্যদিকে ‘কোঁচার পত্তনের আড়ালে ছুঁচোর কেত্তনে’র প্রবাদের মতো বিলিতি গৃহস্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন— এই মানসিক দ্বিচারিতাকে প্রগতিশীলরা কোনোভাবেই সমর্থন বা গ্রহণ করতে পারেননি। তা ছাড়া অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি হল, যথার্থ এবং উপযুক্ত পরিমাণ শিক্ষার অভাবও হঠাৎবাবুদের ব্যঙ্গের বিষয় করে তুলেছে। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন অশিক্ষিত, শিক্ষা যাঁদের ছিল তাঁরাই অল্পশিক্ষিতের আওতাতেই পড়বেন। ফলে শিক্ষিত প্রগতিহীন, সংস্কৃতিহীন আর্থিক আভিজাত্যকে তুচ্ছজ্ঞান করেছেন। নাগরিক সংস্কৃতির বাহ্যিক সূক্ষ্মতার কাছে তাঁদের অমার্জিত ‘গ্রাম্য’তা খুব স্বাভাবিকভাবেই রক্ষণশীলদের যেমন রক্তচক্ষু করে তুলেছে, তেমনি  প্রগতিশীলদের চোখে হাস্যাষ্পদ ঠেকেছে। অবশ্য এভাবে হঠাৎবাবুরা এক ধরনের বিমিশ্র, তা যতই হাস্যকর বা অস্বস্তিদায়ক হোক না কেন, নিজস্ব সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছেন। আচার-আচরণে, ভাষায়, জীবনযাপনে, রুচির পরিপোষণে আধা গ্রাম্য-আধা শহুরে এই বিমিশ্র সংস্কৃতি বলা বাহুল্য আদৌ সহৃদয় সামাজিকের আনুকূল্য লাভ করতে পারেনি। ফলে প্রাহসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ‘হঠাৎ বাবু’রা নিতান্ত নিন্দা-মন্দ ও ভর্ৎসনার মুখোমুখি হয়েছেন। কোনোপ্রকার করুণামিশ্রিত সহানুভূতিও তাঁদের জন্য দেখা দেয়নি প্রহসনকারদের চোখে।

তবে বলা বাহুল্য, বাবুত্বের এই রকমারি শ্রেণিবিভাগ সত্ত্বেও অন্যান্য অনেক কিছুর মতো এগুলিকে চুলচেরাভাবে পৃথক করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ ফোতোবাবুর সঙ্গে হঠাৎবাবুর আচরণগত সাদৃশ্য যেমন অনেক ক্ষেত্রেই মিলে যায়, তেমনি কাপ্তেনবাবু বা প্রগতিশীলবাবুদের ছদ্ম অংশের সঙ্গেও তাঁদের পার্থক্য তেমন কিছু নয়। তা ছাড়া একই নাটক বা প্রহসনে বিভিন্ন শ্রেণির বাবুচরিত্রের দেখা মেলে। যেমন— দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'তে যথার্থ প্রগতিশীল নব্যবাবু, হঠাৎবাবু আবার কাপ্তেনবাবুরও দেখা মেলে। কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের প্রহসন 'বৌবাবু'তেও হঠাৎবাবুর সঙ্গে দেখা মেলে কাপ্তেনবাবুদের। আসলে কলকাতার বিমিশ্র নাগরিক পরিবেশে 'বাবুত্ব' নামক বিশাল প্রবণতার বিশ্বে আসলে 'হঠাৎবাবু' কোনো বিচ্ছিন্ন শ্রেণি নন, একই বাবুত্বের সামান্য রকমফের বিশেষ। ফলে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় একই নাটক বা প্রহসনের বাবুরা এক শ্রেণির বাবুদের দৃষ্টান্তে উল্লেখের পাশাপাশি, অন্য শ্রেণির বাবুদের আলোচনাতেও প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হবেন, একথা পূর্বেই স্বীকার করে নেওয়াই ভালো।

**বাবু নাটক**॥ ১৮৫৪ সাল কালীপ্রসন্ন সিংহ এই নাটকটি রচনা করেন বলে জানা যায়। কিন্তু এর কোনো কপির সন্ধান মেলে না। ফলে সঠিকভাবে বলা না গেলেও, কালীপ্রসন্ন উত্তরকালে 'হুতোম প্যাচার নকশা'য় ভূঁইফোঁড় 'হঠাৎ নবাব' বাবুদের যেভাবে ব্যঙ্গবিদ্রূপ সমালোচনা করেছেন, অনুমান করা অসংগত হবে না যে, এই নাটকটি 'হঠাৎবাবু'দের ঐতিহ্যহীন বাবুয়ানাকেই সম্ভবত ব্যঙ্গ করে থাকবেন। ঐতিহাসিক দিক থেকে বাংলা মৌলিক প্রহসনের ক্ষেত্রে এটিই প্রথম নাটক (তথা প্রহসন), সেদিক থেকে এটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব সীমাহীন।

**চার ইয়ারে তীর্থযাত্রা**॥ ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত, কলিকাতা নিউপ্রেস যন্ত্রে মুদ্রিত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের এই প্রহসনটি বাবু বিষয়ে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ার দিকের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা।[৩৪] প্রহসনটিতে মদ্যপান, বাবুগিরি ও বেলেল্লাপনার দরুন সর্বস্বান্ত হওয়া হঠাৎবাবুদের দুরবস্থার চিত্র উপস্থিত হয়েছে। যদিও কাহিনির শেষে 'দৈববাণী'র আবির্ভাব ঘটিয়ে চার ইয়ার সহ অন্যান্য বাবুদের বৃন্দাবনে পাঠিয়ে, তাঁদের নিশ্চিত ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করে প্রহসনকার 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করতে চেয়েছেন, তথাপি তা নেহাতই আকস্মিক এবং নাট্যঘটনায় অস্বাভাবিক ও গুরুত্বহীন। তবে এই তীর্থযাত্রার ব্যবস্থা না করলে প্রহসনের নামকরণ যুক্তিযুক্ত হত না ভেবেই সম্ভবত এমনটি করা হয়েছে। অবশ্য এই প্রহসনে বনেদিবাবুদের দুরবস্থার পিছনে লেখকের সহানভূতি কাজ করেছে, কিন্তু হঠাৎবাবু প্রসন্ন ও পঞ্চাননের প্রতি লেখক সহানুভূতিহীন। পরিচয় লিপিতে শেষোক্ত দু'জনকে 'হঠাৎবাবু' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, অন্যরা অর্থাৎ 'চার ইয়ার' গোপালচন্দ্র মিত্র, হরিহর মিত্র, নিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শ্যামলাল গুপ্ত সর্বস্বান্ত হয়ে 'ফোতো বাবু'তে পরিণত হয়েছেন। 'চার ইয়ারে'র অন্যতম গোপালচন্দ্রের পিতা মৃত্যুকালে ৬০ হাজার টাকা রেখে যান। গাঁজা, গুলি, মদ, অনাবশ্যক দানধ্যানে-বিলাসিতায় গোপাল সকলই খুইয়েছেন। তখন যে মোসাহেব বন্ধুরা দিনরাত তাঁর কাছে পড়ে থেকে তাঁরই টাকায় আনন্দ-ফুর্তি করেছে, তারা সকলেই 'আপনাদের অভিষ্ট সিদ্ধ করনান্তর' পলায়ন করেছে। প্রয়োজনে গোপালচন্দ্র জগন্নাথ উড়ের বাটীর ঘটি চুরি করতেও বাধ্য হয়েছে। স্ত্রীর যাবতীয় গয়নাগাটিও সে বেচে খেয়েছে। এখন টাকার জন্য তাঁকে এদিক-ওদিক সন্ধান করতে হয়। পেটে ভাত জোটে না, নেশার দ্রব্য তো দূর। তবে গোপালচন্দ্রের মধ্যে একটি গোপন অনুশোচনা বোধ আছে। পাপকর্ম তিনি পেটের জ্বালায় করেন বটে, তবে গোপনে দুঃখও পান। তাঁর প্রতিবেশী হরিহর মিত্রের অবস্থাও একইরকম। নিজের যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তিনি,

তা থেকে জানা যায়, তিনিও ছিলেন ধনী পিতার সন্তান। ষোলো-সতেরো বছর বয়স থেকেই লেখাপড়ায় জলাঞ্জলি দিয়ে মদ, গুলি, গাঁজার বশ হয়েছেন। তবে তাঁর প্রিয় নেশা হচ্ছে আফিম সেবন। যৌবনের শুরুতেই পিতার অকস্মাৎ মৃত্যু হলে ইচ্ছেমত ব্যয় করতে পারবেন জেনে তিনি আনন্দিত হন এবং 'টাকা ব্যয় করিতাম বন্ধুগণ লয়ে'। বাবুগিরিতে অল্পকালের মধ্যেই সব নিঃশেষ করে এখন তিনি 'ভাত কাপড়ের তরে ফিরি দ্বারে দ্বারে'। তার উপর নুলো, কানা, পায়ে গোদ-ওয়ালা একটি অবিবাহিত ছেলে আছে ঘরে, সেও নিষ্কর্মা। অতএব তাঁরও পেটের ভাত জোগাড় করা নিতান্ত দুষ্কর হয়ে উঠেছে, অন্য নেশার দ্রব্য, বিশেষত আফিম তো দূর অস্ত।

নিতাই এবং শ্যামলালের অবস্থাও তদ্রূপ। নিতাইচাঁদ আক্ষেপ করে বলেছে— 'আমাদের যেমন কপাল এমন তো আর কারোর দেখি নাই, বোধ করি ভূমণ্ডলে আমাদের ন্যায় হতভাগা আর নাই। আমরা কি কম মানুষ। ধনী লোকের পুত্র সৎ কুলোদ্ভব, সুশ্রী সুন্দর, কিন্তু ভাই গোড়া বেটারা জুটে সর্বস্ব ধ্বংস কোরে গেছে, এখন দিন আনি দিন খাই।' অবশ্য শ্যামলালের কথায় জানতে পারা যায়, এমন বাবুদের সংখ্যা একটি-দু'টি নয় অজস্র, যাঁরা পিতৃসঞ্চিত ধন বাবুয়ানা, বিলাসিতা আর মদ্যপানে উড়িয়ে দিয়ে এখন 'ফোতোবাবু' হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। নিতাইচাঁদ গুলিখোর এবং শ্যামলাল গুপ্ত গাঁজাখোর। কিন্তু গুলি-গাঁজার জোগাড় হয় এখন সে অবস্থা নেই। তার উপর শ্যামলালের ঘরে রয়েছে এক সুশ্রী সোমত্ত মেয়ে, তার বিবাহ দেওয়া সম্ভব হয়নি এখনও অর্থাভাবে।

অতঃপর 'পেটের ভাত ও নেশার দ্রব্য' জোগাড়ের ব্যবস্থা করতে চার-ইয়ার মিলে ঠিক করেছেন, কোনো হঠাৎবাবুর কাছে গিয়ে 'তাঁহার খোসামোদ করত কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জন' করতে। প্রসন্ন তেমনই এক যুবক যে সম্প্রতি পিতার মৃত্যুর পর 'বাপের অগাধ বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছে।' অতএব চার-ইয়ার ধোপার বাড়ি থেকে কাপড় ভাড়া করে মোসাহেব সেজে প্রসন্নের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে এবং হঠাৎবাবুটিকে খুশি করে তার মোসাহেবের পদে অভিসিক্ত হয়েছে। প্রসন্ন তাঁদের 'মাসান্তে ছয় টাকা করিয়া মাহিনা দিবে কিন্তু প্রতিদিন তাঁর কাছে রাত্রিতে যাইতে হইবে।' অতএব, প্রতিদিন প্রসন্নর বাড়িতে অন্যান্য ইয়ারদের সঙ্গে গোপালচন্দ্র, হরিহর প্রমুখেরাও 'রাঙ্গা জল' সেবন করেন। শুঁড়ির বাড়ি থেকে ব্যবস্থা মতো রোজ 'রাঙ্গা জল' দিয়ে যায়। প্রসন্নর খাস-চাকর গোবিন্দ প্রসন্নকে 'অগাবাবু' এবং চার-ইয়ারদের 'ফোতোবাবু' বলে তাঁদের কাজকর্ম দেখে মনের বিরক্তি প্রকাশ করেছে। তবে চাকরি যাবার ভয়ে সে বাবুদের সরাসরি কিছু বলতে সাহস পায়নি।

প্রসন্নর অমিতব্যয়িতা, বাবুগিরি ও মদ্যাসক্তি কিছুদিনের মধ্যেই তাকে পথে বসিয়েছে। শুঁড়ির দোকানে তার বেজায় ধার। আগে যে হাজার হাজার টাকার মাল সওদা করেছে, এখন শুঁড়ির দেওয়া ধার-বাকির ২৫ টাকার শমনের ভয়ে সেই প্রসন্ন ক'দিন বাড়ি থেকে বের হয়নি। তার নিজের কথায়, সে এমন সর্বস্বান্ত হয়েছে, 'আমার কেবল এই বাড়িখানি আছে আর শিকি পয়সা আমার তপিলে নাই।' অবশ্য এরপরেও তার চিন্তা, 'আর দিন আটেকের মধ্যে বাড়িখানা বিক্রয় করিয়া কিছুদিন আরো মজা করবো।' প্রসন্ন হচ্ছে যথার্থ বাবু। নিঃশেষ হয়ে যেতে যেতেও সে তাই বাবুয়ানার কথা ভাবতে পেরেছে। যদিও গোপালচন্দ্র তাকে নিরস্ত করতে চায়। ওই বাড়িখানা বিক্রয় করে সেই টাকায় বৃন্দাবনে গিয়ে ভেক নেবার প্রস্তাব দেয়। মদ্যপান ছাড়ার কথাও সকলকে সে বোঝায়। যদিও হরিহরের বক্তব্য, 'যে একবার মদ পান করেচে সেকি আর মদ ছাড়িতে পারে।'

যদিও প্রসন্নর দৃষ্টান্ত বাবুয়ানার ভয়াবহ পরিণাম নির্দেশ করে, তবুও হঠাৎবাবুরা এসব দৃষ্টান্তের পরেও নিরস্ত হয় না। ফলে আরেক 'হঠাৎবাবু' পঞ্চানন গোপালচন্দ্রের পরামর্শ হেলায় উড়িয়ে দিয়েছে। পঞ্চাননের পিতা আদালতের বিচারক। অগাধ বিষয়সম্পত্তি, তাই সে ধরাকে সরাজ্ঞান করেছে। সে 'ভদ্রলোক' শিক্ষিত বাবু। খবরের কাগজে সকলকে গালাগাল দিয়ে লেখালেখি করে; দরকারের সময় সকলকে ডাকে, কিন্তু কাজ ফুরালেই 'বাপান্ত' করে, 'অপমান' করে। যদিও টাকার গুণেই এর পরেও তার মোসাহেবের সংখ্যা কমে না। সে উইলসনের হোটেলে যায়, আমোদ-ফুর্তি করে, মদ্যপানকে 'প্রেজুডিস' বলে মানে। গোপালচন্দ্র তাকে মদ্যপানের ভয়াবহতা দেখিয়ে এবং দাম্ভিকতা ছাড়তে বলেছেন, তাতে সে ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছে, 'ভাই তোমাদের খুরে দণ্ডবৎ, আমাকে মাপ কর আমি ঢের বিচার ৫১৫০ জানি, আর ঢের বিবেচনাও করিতে পারি, আমাকে শেখাতে হবে না, কোথা আমোদ কর্ত্তে এলাম, না একেবারে আমোদ ডুবিয়ে দিলে।' সে গোপালচন্দ্র, হরিহর এঁদের মদ্যপানজনিত দুরবস্থা ও দারিদ্রের প্রতি কটাক্ষ করে, যদিও একবারও নিজে ভাবে না, সে নিজেও ওই একই পথের পথিক। এই দুরবস্থা তারও আসন্ন। সম্ভবত প্রহসনকার, হঠাৎবাবুদের ধারাবাহিকতার প্রতিনিধি হিসাবে পঞ্চাননকে উপস্থিত করেছেন এবং বলতে চেয়েছেন, সমাজে হঠাৎবাবুদের দুঃখজনক পরিণামের এত দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে বাঙালি পুরুষেরা মদ্যপান বিলাসিতা বাবুগিরিতে ক্রমশ আসক্ত হয়েই চলেছে। একইসঙ্গে মদ্যপানজনিত দুরবস্থা যে কীভাবে বাঙালি পুরুষদের অধঃপতনের পথে নিয়ে যাচ্ছিল সে সমাজ-বাস্তবতার চিত্রও প্রহসনটিতে তুলে ধরা হয়েছে।

লেখক অবশ্য 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হিসাবে বৃন্দাবনে পাঁচ বাবুরই গ্রাসাচ্ছাদনের ভালো ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং সন্তানসন্ততি নিয়ে তাঁদের সুখে-শান্তিতে থাকার কথা জানিয়েছেন। তবে একে আকস্মিক সমাপতন বলাই উচিত হবে। একইসঙ্গে পাপের পথ পরিত্যাগ করলে ঈশ্বর সহায় হন— এমন নীতিবাক্যও জানাতে চেয়েছেন।

লাম্পট্য, পরস্ত্রীলোলুপতা 'বাবুগিরি'র অঙ্গ বলে বিবেচিত হত। ভবানীচরণের 'নববাবুবিলাস', 'নববিবিবিলাস' বা 'দূতীবিলাসে' এ জাতীয় আচরণকে বাবুত্বের সাধারণ লক্ষণ বলে নির্দেশ করা হয়েছে। গ্রাম্য জমিদাররাও হঠাৎ অর্থের দেমাকে অতি সহজেই লাম্পট্যকে তাঁদের শিরোভূষণ করে নিতেন। সরকারি মুনসেফ বা আত্মীয় সম্পর্কে বাবুরাও নির্দ্বিধায় পরস্ত্রীকে ঘরের বাইরে বার করে আনতেন এবং ভোগারতির শেষে তাঁদের পরিত্যাগ করতেন। অতঃপর তাঁদের স্থান হত কলকাতা বা মফস্সলগুলির গণিকালয়। বাবুদের এই 'লাম্পট্য' নামক দোষটির ব্যাপারে প্রহসনকাররা প্রথম থেকেই খড়্গহস্ত ছিলেন। 'হঠাৎবাবু'দের এ জাতীয় প্রবণতাকে নিয়ে লেখা অসংখ্য প্রহসনের মধ্যে দু'টি একটির উল্লেখ করা যেতে পারে;—

**বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ**॥ ১৮৬০ সালে মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা এই প্রহসনটির উপলক্ষ্য ছিল বেলগাছিয়া নাট্যশালা। যদিও পোষ্টাবাবুদের পছন্দ না হওয়ায় প্রহসনটি তখনই অভিনীত হয়নি। প্রহসনটি মধুসূদনের একটি সার্থক সৃষ্টি।[৩৫] মফস্সলে বাবুদের লাম্পট্যদোষ যে কী পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ধর্মজ্ঞানহীন-হিতাহিতবোধশূন্য হয়ে বয়সের কথাও বিবেচনা না করে তাঁরা যে পরস্ত্রীলোলুপতায় আজন্মকালের ধ্যানধারণা মুহূর্তের মধ্যে পরিত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করতেন না, বৃদ্ধ জমিদার ভক্তপ্রসাদের দৃষ্টান্তে মধুসূদন তা প্রকাশ করেছেন।

ভক্তপ্রসাদ এদিকে পরম বৈষ্ণব, সর্বদা মালা জপেন, সবসময় মুখে 'রাধে-রাধে-রাধে' করে যাচ্ছেন। কিন্তু দেবদ্বিজে তাঁর ভক্তি আসলে ভণ্ডামো। তাই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাচস্পতিকে তাঁর মাতৃদায়ে ভক্তপ্রসাদ যৎকিঞ্চিৎও দিয়ে সাহায্য করেন না। রায়ত প্রজাদের জমিতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়জনিত কারণে ফসল না হলেও, তিনি খাজনার হার কমান না, মকুব করা তো দূরের কথা। তাঁর সোজা কথা, 'কোম্পানির সরকার তো আমাকে ছাড়বে না।' কিন্তু এই ভক্তপ্রসাদ যখন শোনেন যে, হানিফের স্ত্রীর বয়স বছর উনিশ, ছেলেপিলে হয়নি এখনও এবং রং-ও কাঁচা সোনার মতো, তখন তাঁর মনের মধ্যে আসঙ্গলিপ্সা প্রবল হয়ে ওঠে। যদিও মুসলমানের মেয়ে বলে তাঁর মনে একটা প্রাথমিক দ্বিধা ছিল, তথাপি শাগরেদ গদাধরের কথায় তিনি নিজেই এর একটা স্বপক্ষীয় যুক্তি বার করেছেন— 'হ্যাঁ, স্ত্রীলোক— তাদের আবার জাত কি? তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতিস্বরূপা, এমন তো আমাদের শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্যে; বড় সুন্দরী বটে, অ্যাঁ?...' অতএব, হানিফের সুন্দরী স্ত্রীকে পাবার বাসনায় ভক্তপ্রসাদ হানিফের খাজনা-প্রদানের সময় বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তৎক্ষণাৎ মাত্র তিন সিকে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। অথচ ইনিই আবার গদাধরের কথায় হানিফের 'ছুকরি' বউকে 'হাত কত্যে' কুড়ি টাকা খরচ করতে সম্মত হয়েছেন। এমনকী বলেছেন, 'দেখ, টাকার ভয় করিস না। যত খরচ লাগে আমি দেব।'

ভক্তপ্রসাদের এ ব্যাপারে হাতযশ আছে। গদার সঙ্গে কথোপকথন সূত্রে জানা যায়, ইতিমধ্যে ভট্টাচার্যিদের মেয়ে ইচ্ছেকে তিনি ঘরের বার করেছেন। সে এখন বারবণিতা। পীতাম্বর তেলীর মেয়ে পঞ্চীকে দেখেও ভক্তপ্রসাদের লোলুপতা লেলিহান শিখায় জ্বলে উঠেছে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে বিদ্যাসুন্দরের 'বিদ্যার রূপবর্ণনা'র শ্লোক। এর মধ্যে কিছু ঐতিহাসিক বাস্তবতাবোধের পরিচয় আছে। অষ্টাদশ শতক ও উনিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙালি মজেছিল ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের রোমাঞ্চে। স্মরণ রাখতে হবে, লেবেদেফ যখন 'কাল্পনিক সংবদল' মঞ্চস্থ করেন, জনরুচিকে লক্ষ করেই ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের অংশবিশেষ গীতাকারে নাটকের মধ্যে সংযোজিত করেন। কলকাতায় শখের নাট্যশালায়, গোপাল উড়ের যাত্রাদলে 'বিদ্যাসুন্দরে'র অভিনয়, বিদ্যাসুন্দর-পালা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নববাবুরা বিদ্যাসুন্দরকে লাম্পট্যের পাঠ্যপুস্তক হিসাবেও দেখতেন। ভবানীচরণের গ্রন্থগুলিতে তার সাক্ষ্য রয়েছে। ভক্তপ্রসাদের মুখে এ কারণেই 'বিদ্যাসুন্দরে'র পদ্যাংশ জুড়ে বাবুর লাম্পট্যকে আরও বাস্তব করে তুলেছেন মধুসূদন। ভক্তপ্রসাদ পঞ্চীকেও 'হাত কত্যে' গদাধরের সাহায্য চেয়েছেন। গদাধর তার পিসিকে এ কাজের ভার দিতে বলেছে। পঞ্চীকে কর্তার মনে ধরেছে খুব, কারণ, 'ছুঁড়ীর কি চমৎকার রূপ গা, আর একটু ছেনালিও আছে।' এ কারণে সন্ধ্যা আহ্নিকের সময়েও পঞ্চীর কথাই বারে বারে পরম বৈষ্ণব কর্তাবাবুটির মনে পড়েছে।

কিন্তু ভক্তপ্রসাদের পাঠানো দূতীকে ফতেমা অর্থাৎ হানিফের স্ত্রী প্রথমে তাড়িয়ে দিলেও শেষে হানিফের পরামর্শে বিশেষ উদ্দেশ্যে রাজি হয়। আহত অপমানিত বাচস্পতিকে সঙ্গে নিয়ে হানিফ ষড়যন্ত্র করে। অতএব রাত্রি চার প্রহরের সময় ফতেমা ভক্তপ্রসাদের দূতী পুঁটির সঙ্গে ভাঙা শিবমন্দিরে এসে উপস্থিত হয়। ভক্তপ্রসাদও সেজেগুজে নির্দিষ্ট সময়ে সংকেত-কুঞ্জে এসে ফতেমার আঁচল ধরে 'তুমি আমার প্রাণ— তুমি আমার কলিজে— তুমি আমার চন্দো পুরুষ!' বলে মনোরঞ্জন করতে থাকেন। অতঃপর পূর্ব ব্যবস্থামত প্রথমে বাচস্পতি, পরে হানিফ গাজি উক্ত স্থানে উপস্থিত হয়ে ভক্তপ্রসাদকে যৎপরোনাস্তি নাকাল করে। দুর্বিপাকে পড়ে নিজের দোষ থাকাতে ভক্তপ্রসাদ হানিফ গাজিকে দু'শো টাকা এবং

বাচস্পতিকে তাঁর কাছ থেকে আত্মসাৎ করা ব্রহ্মত্র জমি ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। সেইসঙ্গেই বাচস্পতির মাতৃশ্রাদ্ধে আরও পঞ্চাশ টাকা দেবার কথা বলেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন, 'এ জঘন্য কর্ম্মটাই আজ অবধি দূর কল্যেম।'

মধুসূদন ভক্তপ্রসাদের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের অর্থবান অথচ অসংস্কৃত, গ্রাম্য, বিকৃত স্বভাবের হঠাৎ বাবুদের আত্মিক ভণ্ডামি প্রকাশ্যে এনে দিয়েছেন। মুখে ও মনে সম্পূর্ণ আলাদা ভক্তপ্রসাদ লম্পট-চূড়ামণি, তার জন্য যাবতীয় গর্হিত কাজ করতেও বাধে না তাঁর। অথচ কলকাতায় পাঠরত শিক্ষিত যুবক আনন্দের কাছে নিজপুত্র অম্বিকার সংবাদ নেওয়ার সময় ধর্ম ও সভ্যতার পরাকাষ্ঠা স্থাপনে তিনি সোচ্চার। হিন্দু কলেজে পড়া 'ক্লেবর ছোকরা' অম্বিকার ব্যাপারে তিনি আনন্দকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, অম্বিকা কোনো অধর্মাচরণ শিখেছে কি না। 'অধর্মাচরণে'র ফিরিস্তিও দেন তিনি— 'দেব ব্রাহ্মণের প্রতি অবহেলা, গঙ্গাস্নানের প্রতি ঘৃণা, এই সকল খ্রীস্টিয়ানি মত—'। যদিও তাঁর নিজেরই আশ্বাস নিজেকে যে তাঁর মতো ধার্মিকের ছেলে হয়ে অম্বিকাপ্রসাদ কখনোই অধর্মাচারী হবে না। কলকাতায় কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত্ত, সোনারবেনে, কপালি, তাঁতি, জোলা, তেলী, কলু সকলেই একত্রে ওঠে, বসে, আহার করে শুনে ভক্তপ্রসাদ শিউরে উঠেছেন এই বলে যে, 'হিন্দুয়ানির মর্য্যাদা দেখ্‌চি আর কোন প্রকারেই রৈলো না!' বড়ো বড়ো হিন্দুরা মুসলমান বাবুর্চি রেখে তাদের হাতের রান্না খায় শুনেও তিনি 'থু! থু!' করেছেন। অম্বিকাকে যে আর বেশিদিন কলকাতায় রাখা যাবে না, তাহলে ইংরেজি শিখে সে 'আপনার কুলে কলঙ্ক দেবে', এ ব্যাপারে তিনি দৃঢ়প্রত্যয় হয়েছেন। গদার মুখ দিয়ে প্রহসনকার ভক্তপ্রসাদের এহেন ভণ্ডামির প্রতি চপেটাঘাত করেন, 'নেড়েদের ভাত খেলে জাত যায়, কিন্তু তাদের মেয়েদের নিলে কিছু হয় না। বাঃ! বাঃ!'

বস্তুত উনিশ শতকের লম্পট হঠাৎবাবুদের একটি বিশেষ type ফুটিয়ে তুলেছেন মধুসূদন 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ', ভক্তপ্রসাদের মধ্যে। সে সময় এহেন মুখোশধারী লম্পট বাবুদের সংখ্যা বিশেষ কম ছিল না। বোধ হয় এরই দৃষ্টান্তে রামনারায়ণ তর্করত্ন 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' প্রহসনটি রচনা করেন—

**যেমন কর্ম তেমন ফল**॥ ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত রামনারায়ণ তর্করত্নের 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' প্রহসনে শিক্ষিত বাবুদের লাম্পট্য এবং তার সমুচিত প্রতিফল বিধানই মূল বিষয়।[৩৬] সে সময় সুদূর মফসসল এবং গ্রাম থেকেও বহু শিক্ষিত যুবক স্ত্রী, পুত্র, পরিবার রেখে চাকরি করতে আসতেন কলকাতা শহরে। বৎসরান্তে একবার কী দু'বার প্রোষিতভর্তৃকার সঙ্গে স্বামীর মিলন ঘটত। এই সুযোগ নিয়ে অনেকেই বিবাহিতা মেয়েদের নানারকম কুপ্রস্তাব দিত কিংবা ঘরের বার করে নিয়ে যেত। অনেক বেরিয়ে যাওয়া মেয়েই শেষ পর্যন্ত অন্ধকারের চোরা স্রোতে হারিয়ে যেত। কখনো কখনো তদারকির ভার অর্পণ করে যাওয়া হত যে ব্যক্তিটির উপর, সেই রক্ষকই হয়ে উঠতেন ভক্ষক। আবার স্বামীর সঙ্গে দিনের পর দিন বিচ্ছেদে কাতর নারীও কখনো কখনো মানসিক চাহিদা ও দুর্বলতার কারণে পদস্খলিতা হতেন। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ভদ্রবেশী কিছু লম্পট বাবুরা তাঁদের লালসা চরিতার্থ করতেন। লাম্পট্য দোষও মদ্যপানের মতো এতদূর ব্যাপকতা লাভ করে যে উনিশ শতকের শেষদিকে খাস কলকাতায় এবং মফস্সলেও বারাঙ্গনাপল্লীর ক্রমপ্রসার ঘটতে থাকে। রামনারায়ণ তর্করত্ন এই বাস্তব প্রেক্ষিত থেকে কাহিনিমাত্র তুলে নিয়ে তাঁর ক্ষুদ্র প্রহসনের লক্ষ্য পূরণ করেছেন।

প্রহসনে দেখা যায়, সুধীর শিক্ষিত ভদ্র যুবক। কর্মসূত্রে তাকে কলকাতায় থাকতে হয়। বাড়িতে তার স্ত্রী সুমতি একমাত্র দাসী মতের মা'কে নিয়ে বাস করে। সুধীর নিয়মিত সংসার খরচ পাঠায়, তবে কখনো

কখনো অন্যথা হয়। এ অবস্থায় সংসারের কাজ যাতে সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে এইজন্য সুধীর তার নিকটাত্মীয়, স্থানীয় মুনসেফের সেরেস্তাদার ভোলানাথকে, যাকে সে ভোলাদাদা বলে ডাকে, তার হাতে ভার দিয়ে গেছে আপদে-বিপদে সুমতিকে দেখবার। সুমতি সৎ চরিত্রের মেয়ে, স্বামী বিরহে সে নিতান্ত কাতর; সুধীর তার স্ত্রীর চরিত্র যে নিষ্কলঙ্ক একথা জানে। সুমতি সুধীরের বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছে। কিন্তু 'বড় জ্ঞানী, বড় ধার্ম্মিক' ভোলাদাতা যে অসৎ চরিত্রের লম্পট, তা সুধীর বুঝতে পারেনি।

সুধীর কলকাতায় গেলে ভোলাদাদা প্রথম প্রথম সুমতিকে মাছ-মিষ্টি পাঠাতেন, আসতেন যেতেন, খোঁজখবর নিতেন। তারপর আভাসে ইঙ্গিতে মতের মা'কে দিয়ে মনের কদর্য ইচ্ছের কথা ঘুরিয়ে জানান দিলেন। কিন্তু সুমতি সরল মেয়ে সে অতশত বোঝেনি। ইতিমধ্যে সংসারে টাকার টানাটানি হলে মতের মা'কে কিছু টাকা ধার করে আনবার জন্য ভোলাদাদার কাছে পাঠালে তিনি স্পষ্টই জানিয়ে দেন, 'বৌ যদি আমার প্রতি প্রসন্ন থাকেন ধার কেন যত টাকা চান অন্নি দিতে পারি।' সুমতি এর কোনো উত্তর না দিতে ভোলানাথ বাড়ি বয়ে এসে সুধীরের তিন-চার বৎসর আর না আসার মিথ্যে গল্প শুনিয়ে সুমতিকে সরাসরি প্রস্তাব দিয়েছে যে তাঁর কথা শুনে চললে তিনি তাঁকে 'পরম সুখে' রাখবেন। শরীর খারাপের অজুহাতে সুমতি কোনোরকমে নিস্তার পেয়ে বেঁচেছে।

কিন্তু কেবল মুনসেফের সেরেস্তাদার ভোলাবাবুই নয়, স্বয়ং মুনসেফও প্রতিদিন কাছারি থেকে ফেরার পথে খিড়কি পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে থাকেন। সুমতি ঘাটে গেলে হাসিঠাট্টা করেন, কত 'রঙ্গভঙ্গ' করেন; এমনকী মতের মা'কে ডেকে তার 'মা ঠাকরুণে'র সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলে দশ টাকা দেওয়ার কথাও বলেন। শিক্ষিত ভদ্র বাবুদের আপাত ভদ্রতার মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা লাম্পট্যের এই বিকৃতি সেদিনের সমাজে নিতান্ত অপ্রতুল ছিল না।

সুধীর অতঃপর সুমতির সঙ্গে পরিকল্পনা করে যাতে 'সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে'— সে যে ফিরে এসেছে, একথা সুমতিকে বাইরে প্রকাশ করতে নিষেধ করে। অবশেষে তার পরিকল্পনা মতোই সুমতি পৃথক পৃথক ভাবে উভয় লম্পট বাবুকেই সন্ধ্যার পরে ডেকে পাঠায়। দুই দুর্বৃত্তেরই সুধীরের হাতে চরম নাকাল হতে হয়। এই সূত্রেই উদ্ঘাটিত হয় মুনসেফ ও তাঁর সেরেস্তাদারের চারিত্রিক বিকৃতি এবং অসততা। ভোলানাথ বলেছেন, 'মুন্সোব বেটা বড় দুষ্টু, অন্য কাকেও তো বেটা দুপয়সা নিতে দেয় না; বেটার আপনারই পেট সর্ব্বস্ব।' অন্যদিকে, সুমতি রাজি না হওয়ায় মুনসেফ ইচ্ছাকৃত তার বোনপোর মোকদ্দমাটির দফারফা করেছে। সে অনুযোগ করে বলেছে, 'সেই সব হলো, তবে তুই মাগী সেদিন আমাকে অমন কথা বল্লি কেন? তাইতেই তো তোর বোনপোর মোকর্দ্দমাটী গেল।'

লাম্পট্যের পাশাপাশি অসদাচার, অসততা, উৎকোচ গ্রহণ ইত্যাদি গুণপণাগুলিও নতুন যুগের বাবুদের চরিত্রে দিব্যি স্থানান্তরিত হয়েছিল। যিনি আইনের রক্ষক, যিনি নিজ মুখেই বলেন, পরস্ত্রীর প্রতি অবৈধ প্রণয়ের অপরাধে 'প্রাণদণ্ডই বিহিত', সেই তিনিই এ জাতীয় আচরণ করতে পশ্চাৎপদ হন না। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির হঠাৎবাবুরা এ জাতীয় চারিত্রিক অসততার আকর হয়ে উঠেছিলেন অনেকে, ফলে প্রহসনকারের ব্যঙ্গ চাবুকের মতো তাঁদের পিঠে পড়েছে।

**জেল-দর্পণ**॥ ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'জেল-দর্পণ' নাটকটির অভিমুখ দু'টি — এক. হঠাৎ বাবুদের বাবুয়ানি, বেশ্যাগিরি ও নেশার কুফল প্রদর্শন এবং দুই. ব্রিটিশ উপনিবেশে বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত জেলের মর্মন্তুদ শাস্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।[৩৭] দ্বিতীয় অভিমুখটি আমাদের আলোচনার বহির্ভূত বিষয় বলে সে সম্পর্কে আমরা নীরব থেকেছি।

নাট্যকাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র শিবনাথ বাবু। তাঁর পিতা বনেদি বড়োমানুষ ছিলেন। শিবনাথের ইয়ার তারিণীর মুখে শোনা গিয়েছে যে, বাবুর 'বাপের নামে বাগে গরুতে জল খেত, যার বাপ একজন দলপতি ছিলেন, বিষয়ের তো সীমা-পরিসীমা ছিল না, এমন কি গল্প শুনা গিয়েছে, তিনি দিয়ালে নোট, কোম্পানির কাগজ টাঙিয়ে রাখ্‌তেন।' মধুও বলেছে, শিবনাথবাবুর পিতা মৃত্যুকালে প্রায় এক কোটি টাকার বিষয় রেখে গিয়েছিলেন। শিবনাথবাবু একমাত্র সন্তান বলে, বিষয় ভাগ হয়নি, সমস্তটাই তিনি পেয়েছেন। কিন্তু এহেন শিবনাথবাবু 'দিলদরিয়া বোকা লোক, পাঁচ রকমে বিষয়টা লণ্ডভণ্ড করে ফেললেন।'

শিবনাথবাবুর অনেক গুণ— তিনি মদ খান, অন্যান্য নেশা-ভাংও করেন; কিন্তু তাঁর একটি বড়ো নেশা বাইজি ও রক্ষিতা বিরাজকে পোষা। বিরাজকে তিনি সাত-আট বছর ধরে পুষছেন। শিবনাথবাবুর স্ত্রী সুরবালা সতীসাধ্বী। কিন্তু স্বামীর নেশা-ভাং আর বেশ্যা বৃত্তির জন্য তাঁর দুঃখের শেষ নেই। শিক্ষিতা সুরবালা অবসরে বই পড়ে মনের দুঃখ মোচন করেন। শিবনাথ তাও সইতে পারেন না। তিনি নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন যে তাঁর বাবা ও তিনি দু'জনেই পড়াশোনা করেননি তেমন। তাঁর কাছে স্ত্রী আর মেয়েমানুষে কোনো তফাৎ নেই— 'দুই এক গ্লাস মদ খাও, দুই একটা ছিটে ছাটা টান, একটা রকমারী গান গাও, একটু আধটু নাচতে পার, তাহলে তোমায় বুকে করে রাখবো।' বাজারে তাঁর দেনা প্রায় এক লক্ষ টাকা, জমিদারি বন্ধক দেওয়া— এসব কথা বলে সুরবালা স্বামীকে সংশোধনের কথা বললে শিবনাথ হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, 'দেনা হয়েছে তাতে আমার আর কি হবে। পৃথিবীতে আসা দশ দিনের জন্য, এতে যদি প্রাণের আয়েস মিটিয়ে না লব, তা হলে পৃথিবীতে আসবার দরকার কি? টাকা নিয়ে কে এসেছে, কে বা সঙ্গে নিয়ে যাবে। হেসে খেলে কাটিয়ে দিতে পারলেই হলো। আরে তুই এ বুঝিসনে ইয়ারকি প্রাণ খুলে দিয়ে মরে গেলেই স্বর্গলাভ হয়। বাবা জানলে না আমার তো সামান্য বিষয়; কলিকাতার বড় বড় লোক গুল খরচপত্র করে সুখে কাটিয়ে গিয়েছে।'

এ সার সত্যটি শিবনাথের রক্ষিতা বিরাজও জানে। সে খানদানি বেশ্যা। তার মা-ও 'কতগুল বড়লোককে ফেইল করেছে'। শিববাবুকে দিয়ে বিরাজের হাতেখড়ি। সাত-আট বছর ধরে সে শিবনাথ বাবুকে দোহন করেছে। বাবুটি তার জন্য যে বিবাহিত স্ত্রীকেও গঞ্জনা-লাঞ্ছনা করেছে, এ সত্যও তার অজানা নয়। কিন্তু তার জন্য তার কিছুমাত্র দুঃখ নেই। সে নিজের মুখেই বলেছে, 'আমাদের ব্যবসাই এইরকম। আমরা যাকে ধরি তাকে অল্পে ছাড়ি না। যতক্ষণ না ঘুঘু চরে, যতক্ষণ না ভিটে মাটি চাটি হয়, ততক্ষণ তিনি নিস্তার পান না।' আজ তার জন্যই শিবনাথবাবুর এই দুর্দশা, তার চাহিদা মেটাতে গিয়েই বাবুটিকে সর্বস্বান্ত হতে হয়েছে। কিন্তু বাবুর ভিটেয় ঘুঘু চরার অনুমান করেই সে পরীক্ষা করার জন্য 'মুক্তার মালাছড়া'র প্রসঙ্গ তুলেছে। শিবনাথ তাকে পরে দেবেন বলাতে সে শিবনাথকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা করেছে। তাঁকে অবিলম্বে চলে যেতে বলেছে সেখান থেকে। 'যখন দশ টাকা পেতুম, খাতির রাখতুম', এখন যেহেতু টাকাকড়ি সব নিঃশেষিত, অতএব এ বাবুটিকে পরিত্যাগ করতে তার দ্বিধা হয় না। সে নির্দ্বিধায় শিবনাথকে বলেছে, 'আমরা যে জাত, তাতে রূপচাঁদের চেয়ে কাহাকে ভালোবাসি না। বেশ্যারা কি বাবুদের ভালবাসে? তাদের টাকাকে ভালোবাসে। টাকা না দিলে ভালোবাসা থাকে না।' অতএব, বিরাজের ভালোবাসা নতুন বাবু সুন্দরবাজারের রাজার প্রতি। শিবনাথের কোনো অনুনয়-বিনয়েই সে কান দেয়নি। ঋণের দায়ে সোনাগাছিতে বিরাজের বাড়ি এসে সার্জেন্ট শিবনাথকে হাতে হাতকড়া পরিয়ে ধরে নিয়ে গেছে, সে বাবুটিকে বাঁচানোর কোনো চেষ্টাই করেনি। শিবনাথের জেল হয়েছে।

তবুও শিবনাথের প্রত্যয় হয়নি। দুর্দশাগ্রস্ত সুরবালা স্বামীকে চিঠি লিখলে শিবনাথবাবু তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে জানিয়েছেন যে, তিনি বিরাজকেই ভালোবাসেন, তার কাছেই ফিরবেন। কিন্তু ফিরলেও বিরাজ কপর্দকহীন শিবনাথকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তার প্রত্যাখ্যানে শিবনাথের চৈতন্যোদয় হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'আমার বাপের অতুল ঐশ্বর্য্য তোমার পাদপদ্মে ঢেলেছি, এখন একবার তোমার বাড়ি এসে বসেছি বলে বেরিয়ে যেতে বলো? আমি ঠেকে শিখ্‌লেম;... আমি বিপুলার্থ ব্যয় করে বেশ্যার প্রিয় হতে পারলেম না, আর লোকে দুই পাঁচ শত টাকা দিয়ে তাদের প্রিয় হবে, বড়ো আশ্চর্য্য।' অপমানিত, আহত শিবনাথ এই বলে বাড়ি ফিরে এসেছেন।

কিন্তু তখন বড়ো দেরি হয়ে গিয়েছে। স্বামীর প্রত্যাখ্যানে ব্যথিত সুরবালা নিজের হাতে ছুরি বিদ্ধ করে আত্মহত্যা করেছে। শিবনাথবাবু সুরবালাকে মৃত অবস্থায় আবিষ্কার করে সব বুঝতে পেরে শোকে অনুশোচনায় ওই ছুরি দিয়েই আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়িয়েছেন। শিবনাথের শেষ অনুভবে হঠাৎবাবুদের মহাপতনের কারণটিই আরেকবার ভেসে ওঠে। যে বাড়িতে একদিন লোক ধরত না, বারো মাসই ব্রাহ্মণ-ভোজন ও দেবসেবা চলত, বৈঠকখানায় বড়ো বড়ো গাইয়ে অষ্টপ্রহর গান-বাজনা করতেন, সেই বাড়িই আজ মৃতপুরী; আর সে বাড়ির সন্তান শিববাবু বেশ্যাগিরি আর নেশাভাঙে সর্বস্ব খুইয়ে পথের ভিখারি। লেখক অবশ্য সুরবালা ও শিবনাথবাবুর পরিণামী মৃত্যুর জন্য শিবনাথের জেলে যাওয়াকেই দায়ী করেছেন। কিন্তু এই উদ্দেশ্যমূলকতা আদৌ বেশ্যাগিরি করা মদ্যপ হঠাৎবাবুটির আত্মদোষ ঢাকতে পারেনি। সেকালের অনেক বাবুর মতো শিবনাথবাবুও পিতৃদত্ত সুবিপুল ধন লাভ করে বাবুগিরি চরম করেছিলেন এবং তার পরিণামেই তাঁর এই দুরবস্থা। জেলের কাহিনিকে বাদ দিলে এই দর্পণটি আসলে বাবু-বিষয়ক সত্যের দর্পণ। নববাবুদের যুগ শেষ হয়ে গেলেও উনিশ শতকের শেষদিক পর্যন্ত কত অর্থ-বিত্তে গরিমাময় বাবু বেশ্যাগিরি, মদ্যাসক্তি আর বিলাসিতায় আশু ফুরিয়ে গেছেন, শিবনাথবাবুর কাহিনি আর এক বার সেই সত্যকেই তুলে ধরে।

**বেল্লিক-বাজার**॥ ১৮৮৭-তে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'পঞ্চরং' জাতীয় রচনা 'বেল্লিক-বাজার' হঠাৎবাবুদের বাবুগিরি ও সর্বস্বান্ত হওয়ার এক খণ্ডচিত্র। যদিও নাট্য কাহিনির শেষে হঠাৎবাবুর ফুরিয়ে যাবার চিত্র সরাসরি উপস্থাপিত হয়নি, তবুও নাট্যকাহিনির মধ্যে তার পূর্ণ আয়োজন আছে।[৩৮] কোনো কোনো আলোচক এই পঞ্চরংটির ললিত ও দোকড়ি চরিত্রে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'র অটল ও রামমাণিক্যের অনুকরণ দেখেছেন।[৩৯] প্রহসনটির সাহিত্যমূল্য যেমনই হোক না কেন, এর সামাজিক মূল্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'সাধারণী'র অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভে ধন্য হয়েছিল : 'বেল্লিক-বাজার রুচিবিকারে ফুটিয়াছে। বেল্লিক-বাজার অভিনয়ে বড়ই ফুটন্ত! জীবন্ত! রঙ্গরুচি যে আমাদিগের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়া নীতি-প্রীতির মূল উল্টাইয়া আমাদিগকে পদে পদে পেষণ করিতেছে, পদে পদে স্বার্থের দায় ভদ্রাচারে জলাঞ্জলি দিতেছে, তাহা ইহাতে একরকম চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখান হইয়াছে।'[৪০] ধনী পিতার হঠাৎ মৃত্যু হলে অথবা সহসা হাতে প্রচুর অর্থ এলে হঠাৎবাবুরা আনন্দে আত্মহারা হতেন এবং সাত-পাঁচ না ভেবেই বিলাসিতার বাবুগিরিতে অকাতরে অর্থব্যয় করে অচিরেই ফতুর হতেন। অর্থ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকলেই কিছু ধুরন্ধর ইয়ার-বক্স জুটে যেত, তাদের মধ্যে থাকত দালাল, ফেরেববাজ, উমেদার, মোসাহেব, ধূর্ত, খল নানান জন। এঁদের সম্মিলিত ব্যবস্থায় হঠাৎবাবুটি অচিরেই ফোতোবাবুতে পরিণত হতেন এবং পথের ভিখারি হতে তাঁর আর বেশি দেরি হত না। 'বেল্লিক-

বাজার' পঞ্চরং-এ নাট্যকার সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিগণিত মনুষ্যরূপধারী বেল্লিকদেরই স্বরূপ তুলে ধরেছেন।

মহাজন দয়ালদাস নন্দীর আকস্মিক মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র ললিত হঠাৎবাবু হয়ে বসে। সে আদরে সোহাগে মানুষ। ফলে, পিতার মৃত্যু হলেও হবিষ্যি করতে পারবে না। তার পিসি তাকে প্রশ্রয় দেন। তিনি বলেন, 'পচা আমার হবিষ্যি কর্‌তে পারবে না; দুধের ছেলে, ওর আবার ওষুধ, ওর আবার হবিষ্যি, মাচভাত খেয়ে বালির পিণ্ডি দিলে উদ্ধার হবে, দাদা যখন ওর কোলে গেছে, তখন স্বগ্‌গে গেছে।' অতএব দুধের ছেলেকে বেশি বচন-টচন, শাস্ত্রনির্দেশ না শোনাতে ভট্টাচার্যিকে আদেশ করা হয়। 'দুধের ছেলে' ললিত অবশ্য হবিষ্যি করতে রাজি, 'এখন শীতকাল, ফুলকপি, শালগম হল, একদিন বা হাঁসের ডিম ভাতে দিলুম।' শেষ পর্যন্ত অবশ্য নিরামিষে রফা হয়। তবে পায়ে সে পশমের মোজা পরবে; নেকড়ার জুতা অথবা 'মৃগচর্মের জুতা' পরিধান করবে কারণ নইলে বিলিতি মোজা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ললিতের মায়ের ক্ষীণ প্রতিবাদ ধোপে টেঁকেনি। দানসাগর করলেই সব পাপ সব অনাচার খণ্ডন হয়ে যাবে;— ভট্টাচার্যের এই যুক্তিতে স্বস্তি ফেরে ললিত ও তার পিসির। সেকালে বড়োলোকবাবুরা পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধে এভাবে দানসাগর করে বড়োলোকি দেখাত। পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধে দানসাগর করা ছিল বাবুগিরির চরম। এতে বাবুয়ানার দোষগুলি আর লোকে ধরত না। ভট্টাচার্যও হঠাৎবাবু ললিতের রকমসকম দেখে বলেছে, 'কি জানেন ললিত বাবু, গরীব ব্রাহ্মণ আছি, দুঃখ ঘুচিয়ে দেবেন, আমি আপনার হয়ে সব নিয়ম পালন করে দেব, আমায় মূল্য ধরে দেবেন; পুরোহিতের উপর সব ভার চলে— সব ভার চলে।' ললিতবাবু তাতেই রাজি।

ইতিমধ্যে সুযোগসন্ধানী দোকড়ি দালাল মামলা না-পাওয়া উকিল খুদিরাম ও পসার না-জমানো ডাক্তার পুঁটিরামকে দিয়ে উপস্থিত হয়েছে 'হঠাৎবাবু' ললিতের কাছে। মওকা মতো ললিতের টাকাকড়ি বিষয়সম্পত্তি হস্তগত করাই তাদের উদ্দেশ্য। ললিতের মনে সুখ নেই। কারণ, তার পিতা পুত্রের রকম-সকম দেখে মৃত্যুর আগে ললিতের শ্বশুরকে সম্পত্তির একজিকিউটার নিয়োগ করে গেছেন। কোনো টাকা ললিতের হাতে নেই; যাবতীয় খরচ বিবেচনাসাপেক্ষে অনুমতিযোগ্য। দোকড়ি তাকে আশ্বস্ত করে যে মহাজনের কাছে টাকা মজুত। কাগজে সই করে সকালেই টাকা নিলে হবে। ললিত অবশ্য দশ হাজারে হবে না বলে জানায়, তার আরও বিশ হাজার অর্থাৎ মোট তিরিশ হাজার টাকা চাই। দোকড়ি সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে বলে বিদায় দেয়। খুদিরাম অন্য পন্থা নেয়। মহাজন কাগজে সই করে দশ হাজার লিখিয়ে পাঁচ হাজার দেবে। তার চেয়ে আদালতে উইল 'সেট য়্যাসা ইডের নালিশ' জানাতে বলে। তার বিনিময়ে সমস্ত সম্পত্তি ও টাকা ললিত নিজের হাতে পাবে। তা ছাড়া কম সুদে মর্টগেজে টাকা পাবার লোভ দেখায় সে ললিতকে। দোকড়ির পরামর্শ শুনে ললিতকে হ্যান্ডনোটে টাকা ধার নিতে নিষেধ করে। ডাক্তার পুঁটিরাম এই কাজে খুদিরামের সাক্ষী হয়ে যায়।

ললিত অবশ্য দোকড়িকে বিদায় জানাতে কিছুটা ইতস্তত করেছে। কারণ, দোকড়ি ললিতের চাহিদামতো বাজারের মেয়ে এনে দিত বৈঠকখানায়। পুঁটিরাম 'নারকেল তেল মাখা' পাবলিক ওম্যানগুলোর সঙ্গে রং-তামাশা করতে বারণ করে। 'ইংলিশ, আরমেনিয়ান, জার্মান, চিনা' মেমদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। ললিত বিভোর হয়ে ভাবে, সে বিলিতি লেডীদের সঙ্গে ড্যান্স করছে। এরজন্য ললিতকে খ্রিস্টমাসের পার্টি দিতে হবে। সেইসঙ্গেই সে ললিতকে বলে, 'একটা পলিটীক্যাল পার্টি কর্‌বো আমরা— বুঝেছ খুদিরাম, যাতে স্ত্রী-স্বাধীনতা হয়, বিধবার বিবাহ হয়, খাওয়া-

দাওয়া রেস্ট্রীক্‌শন উঠে যায়, ন্যাশনাল এনার্জি বাড়ে, এমন সব কাজ কর্‌তে হবে।' পরস্পরের স্ত্রীরা সবার সাক্ষাতে বেরুবেন, গল্প করবেন এই আনন্দে ললিত মশগুল হয়ে যায়। পার্টি ও অন্যান্য খরচের জন্য আপাতত তিরিশ হাজার টাকা বাড়ি মর্টগেজ রেখে নেওয়া ঠিক হয়।

ললিতকে সর্বস্বান্ত করতে পুঁটিরাম নসীরাম নামে তার এক ভাইপোকে এবং খুদিরাম মুক্তারাম নামে তার এক সারভিং ক্লার্ককে ভিড়িয়ে নেয়। মুক্তারাম যত জাহাজি গোরা আর বে-পাড়ার মেয়েদের সাহেব-মেম সাজিয়ে পার্টিতে আনবে। নসীরাম ললিতকে প্রতিশ্রুতি দেয়, কাগজে তার নাম বেরোবে। তখন বড়ো বড়ো সাহেব-মেমদের ভোজসভায় ললিত ডাক পাবে। নসী ললিতকে পার্টিতে বউ নিয়ে যেতে বলে। বউটি শ্বশুরের জিম্মায় আছে শুনে দর্শপিণ্ডির নাম করে তাকে জানাতে বলে। কারণ স্ত্রী সঙ্গে করে পার্টিতে না গেলে তা সাহেবরা ভালো চোখে দেখবে না। নসীরামকে ললিত জানিয়েছে, পিতার মৃত্যুর একমাসের মধ্যে বাগানবাড়িতে গেলে তার মা বাড়িতে ছেড়ে চলে যাবেন বলেছেন। নসীরাম তাতে বলেছে, 'তা অমন যাবে, আমি যখন রিফরম্‌ড হই, আমার মা গলায় দড়ি দেয়।'

অতঃপর বাগানবাড়িতে পার্টির আয়োজন হয়। বাজার থেকে আনা দু'জন বেশ্যা পুঁটিরাম ও খুদিরামের ধর্মপত্নী সাজে। মদ্যপ জাহাজি গোরারা মদের লোভে ললিতের বাগানবাড়িতে এসে ভিড় জমায়। নসীরামের স্পিচে, মাতাল গোরা ও মেমদের হইহল্লায় বাগানবাড়ির বড়োদিনের পার্টি নরক গুলজার হয়ে যায়।

এই প্রহসনে গিরিশচন্দ্র কোনো নীতিবাক্য শোনাননি, আত্মশুদ্ধির ঘটনা প্রসঙ্গ এনে কোনো পরিশুদ্ধ বাবুত্বের স্বপ্ন দেখাননি; কেবল, হঠাৎবাবুরা কীভাবে অসৎ শঠ মোসাহেবদের পাল্লায় পড়ে পথের ভিখারি হতে বসে, তার হুবহু চিত্রটাই তুলে ধরেছেন। অবশ্য 'রিফরম্‌ড' নসীরাম ও তার বক্তৃতা-বিলাসিতার মধ্যে দিয়ে ব্রাহ্মবাবুদের প্রতি গিরিশচন্দ্রের বিদ্বেষমূলক মনোভাবটি গোপন থাকেনি।

**রাজা বাহাদুর**॥ ১৮৯২ সালে প্রকাশিত অমৃতলাল বসু'র এই প্রহসনটি 'রাজা বাহাদুর' খেতাব লালায়িত গ্রাম্য হঠাৎবাবুর লাঞ্ছনার কাহিনি।[৪১] তৃতীয় অধ্যায়ে বাবুদের পরিচিতি প্রসঙ্গে আমরা বলেছিলাম যে, উনিশ শতকের শেষদিক থেকে বাঙালিবাবুরা শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে খেতাব লাভের জন্য লালায়িত হয়ে উঠেছিলেন। যেনতেনপ্রকারেণ সাহেব-শাসকদের খুশি করতে পারলে, সেবা, উপঢৌকন, উৎকোচ, উমেদারি যেভাবেই হোক না কেন সাহেবরা প্রীত হলে তাঁদের সুপারিশে রাজা বাহাদুর, রাজা, রায় বাহাদুর ইত্যাদি খেতাব মিলত। উনিশ শতকের শেষার্ধে 'বাবু' শব্দটি সাধারণ অর্থজ্ঞাপক হয়ে পড়ে, ফলে এলিট হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে নতুন খেতাবের প্রয়োজন পড়ে। অর্থবান ব্যক্তিমাত্রেই যেভাবেই হোক উক্ত খেতাবের জন্য লালায়িত হতেন এবং তাঁদের এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে একদল দুর্বৃত্ত সাহেব-বাবুর মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় নানাভাবে দাঁও মারতেন। আখেরে অশিক্ষিত অথচ অর্থবান হঠাৎবাবুরা এইসব প্রতারকের পাল্লায় পড়ে বাবুগিরির ফাঁদে এবং খেতাবের আকাঙক্ষায় নিজেরই সর্বনাশ ডেকে আনতেন। অমৃতলাল বসু এই ক্ষুদ্র প্রহসনে ব্যঙ্গ ও হাস্যের উতরোল আয়োজনে সেই সত্যকেই তুলে ধরেছেন। তাঁর অনেক প্রহসনেই ধূর্ত শঠ মধ্যস্বত্বভোগী দালাল হিসাবে ব্রাহ্মবাবুদের দেখা মেলে। এই প্রহসনেও কালাচাঁদ তেমনই এক ব্রাহ্ম, কথার ছলে মূর্খ ধনী 'শিকার' করাটাই যার পেশা। ব্রাহ্ম বাবুদের প্রতি হিন্দু পুনরুত্থানবাদী বা রক্ষণশীলদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুকূল ছিল না, ফলে উনিশ শতকের প্রহসনে 'ব্ল্যাক-ক্যারেকটার' হিসাবে ব্রাহ্মবাবুদের বারবার উপস্থিত হতে দেখা যায়। বিশেষ করে

প্রগতিশীলবাবু এবং ব্রাহ্মবাবু প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছিলেন বলা যায়। আলোচ্য প্রহসনে রক্ষণশীলদের দৃষ্টিকোণের বিশেষ পরিচয় মেলে।

প্রহসনে দেখা যায়, সামান্য সম্পত্তিবিশিষ্ট গ্রাম থেকে সদ্য কলকাতায় আগত জমিদার গাণিক্যধন (মণ্ডল) রায় 'রাজা বাহাদুর' খেতাব লাভের স্বপ্নে বিভোর। প্রতারক ব্রাহ্মবাবু কালাচাঁদ কথার জাদুতে তাঁকে আচ্ছন্ন করেছে। গাণিক্যধনের মুখের ভাষা এখনও কাঠ-বাঙাল। কলকাতার হাল-হকিকত বা দস্তুর কিছুই জানেন না তিনি। কালাচাঁদের স্ত্রী (ব্রাহ্ম সম্বোধনে ভগিনী) কালিন্দী স্বামীর মতোই চতুর মহিলা। এ জাতীয় হঠাৎবাবু শিকারে কালিন্দীর উৎসাহ কালাচাঁদের চেয়ে কিছু কম নয়। কালাচাঁদ ব্রাহ্ম হলেও স্ত্রীকে প্রকাশ্যে আনতে এখনও কুণ্ঠিত। গাণিক্যধনের সামনে স্ত্রীকে 'জানানা স্ত্রী নয়, স্বাধীন মেয়েমানুষ' বলে পরিচয় দিয়েও তার অস্বস্তি যায় না। গাণিক্যধন অবশ্য 'স্বাধীন মেয়েমানুষ' বলতে বাজারে-মেয়েমানুষ বুঝেছেন। ফলে ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী থেকে শ্লোক শুনিয়েছেন কালিন্দীকে। তাঁর এহেন ব্যবহারে বিব্রত কালিন্দী পলায়ন করলে গাণিক্যধন বলেছেন, 'অঃ মায়েমানুষ তো বড় লাজুগ দেহি মাষ্টরবাবু, বুঝি হালে বার কোরে আনছেন, এ্যাহোনে পোষ মানে নাই?'

গাণিক্যর স্বভাব ভালো নয়। কালাচাঁদ তাঁকে রাজা খেতাব দেওয়ার কথা বলে নাচিয়েছে, সেইসঙ্গে তার এক পরিচিত মাতাল সাহেবকে বড়ো সাহেব সাজিয়ে মিথ্যে মিথ্যে রানির সনন্দ দেওয়াবে ঠিক করে রেখেছে। গাণিক্যর মত অশিক্ষিত গ্রাম্য জমিদারদের প্রতি তার অশ্রদ্ধা গোপন থাকেনি, কালিন্দীকে সে বলেছে, 'এ কি আর একটা জমিদারের মত জমিদার, মফঃস্বলে দেড় কাঠা ভুঁই থাকলেই কল্‌কেতায় এসে অনেকে জমিদার হয়, এ সেই গোছ, দেখেছে বড় বড় জমিদারের গবর্নমেণ্ট মান্য করে, খেতাব-টেতাব দেয়, এত তাই ক্ষেপেছে, "এ্যাং যায় ব্যাং যায়, খোলসে বুড়ী বলে আমিও যাই।" একে কেউ চিনেও না, শুনেও না, একটা হাবাতে।'

অবশ্য 'হাবাতে' জমিদার গাণিক্যর ইয়ারদোস্ত মোসাহেব জুটতে দেরি হয়নি। তারা সব বাবুর টাকাতেই ফুর্তিফার্তা করে। রাজা হবার বাসনায় মশগুল গাণিক্যকে ছলছুতায় কালাচাঁদ নানান কথা বলে চাঁদা আদায় করে। গাণিক্য নিজেই বলেছে, 'চাঁদা তো বিস্তর দিলাম, বোজের চাঁদা, খানার চাঁদা, নাচের চাঁদা, হাডুডুডু খেলবার চাঁদা, সাতার ঘরের চাঁদা।' কালাচাঁদ তাঁকে বুঝিয়েছে, এবার বড়োদিনের পার্টির জন্য শ-দুই টাকা চাঁদা দিলেই রাজা খেতাব গাণিক্যের হাতের মুঠোয়। তবে শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের শ্রীমন্দির সারানোর জন্য সে গাণিক্যকে চাঁদা দিতে নিষেধ করেছে, কারণ 'ওতে লাভ কি? নাম বেরুবে? ইংরাজী কাগজে লিখবে? সাহেবরা খুসী হবে? খালি বাজে, খালি বাজে।' অতএব, তার সুপরামর্শ মেনে বেয়াক্কেল জমিদার গাণিক্য তাঁর ভাষায় 'পেত্নি নাচের' চাঁদাও দিতে রাজি হন।

গাণিক্যধনের সঙ্গে ভট্টাচার্যের পঞ্জিকা-বিচার অংশে গাণিক্যের স্বভাব-চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামে থাকাকালীন শামী ধোপানির সঙ্গে তার অবৈধ প্রণয় ছিল, তবে সে বৈশাখে মারা যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠীর দিনই রাইমোহন সর্দারের ভগ্নিটিকে তিনি কূলের বার করেন। কলকাতায় এসেও তিনি পাঁচী বাইজিকে রক্ষিতা হিসাবে রেখেছেন। এ ছাড়া নিষিদ্ধপল্লীর একাধিক মেয়ের কাছে তাঁর যাতায়াত আছে। তিনি তার জন্মদাতা পিতা মাণিক্যধনকে 'নোংরা চেহারার, কলকাতার ভদ্র সমাজে অচল' বলে গালি দিলে মাণিক্য উলটে যখন তাঁকে চেহারা নিয়ে ঠাট্টা করেছেন, তখন গাণিক্য রেগে বলেছে, 'মহারাজ গাণিক্যধনের চেহারা খাপসুরৎ কি না, তা কলকাতার হক্কল বন্দরই জানে; পুচ কর যাইয়ে পাচী বাইজীরে,

মুচি উমার ছুককী নিস্তারেরে, হারকাটার সোদোরে, সাব তুলসীরে, গোরামুখী মোঙ্গলারে, যাও হক্কেলরে জিজ্ঞাসে আস্— গাণিক্যধনের  চেহারা কেমন— ... মান কত বুঝবা, থাহ সেই বাঙ্গালা দেশে পইরে, পাচটা মাইয়েমানুষের কাছে তো সভ্যতা শিখলা না।'

জন্মদাতা পিতাকে গাণিক্য গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। কারণ সন্ধ্যায় কয়েকজন ভদ্রব্যক্তি খেতে আসবেন; তাঁদের সামনে মাণিক্যধনের মতো 'নোংরা' চেহারার মানুষকে 'সে রাখতে পারবে না'। পাঁচটা পয়সা দিয়ে তিনি বাবাকে বিষ্ণুঠাকুরের রাতের আড্ডাটা দেখিয়ে দিতে বলেন, সেখানেই বুড়ো রাত কাটাবেন এই সিদ্ধান্ত নেন তিনি। কালাচাঁদকে গাণিক্য বলেছেন, 'ও আমার পুরাতন পিতে, বড়োই অসৈভ্য, দুই একটা ধাক্কা ফাক্কা দিয়ে তারায়ে দ্যান, অধিক কিছু বলবান না।' অতঃপর তিনি কালাচাঁদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েন বড়োদিনের বাজার করতে। মিউনিসিপ্যাল বাজারে এসে গাণিক্যর দিশেহারা লেগেছে, তিনি বলেছেন, 'ও মাস্টরবাবু, এ যে বাঁশবাগানে ডোম আইলাম, দিশাহারা লাগে দেহি।' শেষপর্যন্ত 'বাঁদরে কলা খেয়েছিল বলেই রামচন্দ্র রাজা হয়েছিলেন,' ভট্টাচার্যের মুখে এই আশ্চর্য ডাকের বচন শুনে সাঙ্গোপাঙ্গ সহ গাণিক্য কদলীভক্ষণ করেছেন। এদিকে কালাচাঁদও মাতাল ও দরিদ্র ব্লকম্যান ফিশ সাহেবকে সব বুঝিয়ে বড়োদিনের পার্টিতে বড়োসাহেব সেজে আসবার ব্যাপার সব বুঝিয়ে দিয়েছে।

দারোয়ান, বরকন্দাজ সহ গাণিক্য উইলসনের হোটেলে বড়োদিনের আলো কেমন সেজেছে দেখতে যাবেন, সেইসঙ্গে কাছেই চৌরঙ্গি গিয়ে সাহেব বাড়ি থেকে রাজা হওয়ার সনন্দ আনবেন— এই উদ্দেশ্যে বেরিয়েছেন। তার আগে পাঁচী বাইজির কাছে এসেছেন শুভকাজে যাওয়ার আগে আশীর্বাদ চাইতে। পাঁচী ছেলেমানুষের মতো কান্না জুড়ে দিলে তিনি তাকে নানান প্রবোধ বাক্যে ভুলিয়েছেন। তার জন্য তিনি নানান খেলনা আনবেন— এমন আশ্বাস দিয়েছেন। শেষপর্যন্ত পাঁচী  গাণিক্যর গলার মুক্তার হার চাইলে গাণিক্য বুঝেছেন, 'ওরে, মুক্তোর মালার জন্যই এত আবদার, তা মন্দ বলোনি, এই লও, এই লও।' কিন্তু কণ্ঠীবদলের আগেই গাণিক্যর ধর্মপত্নী মনসাঠাকরুণ রুদ্র মূর্তিতে প্রবেশ করলে সকলে চমকে গেছে। গাণিক্য অবশ্য রাজার মতো আচরণ করবার চেষ্টা করেছেন, 'দ্যাহ মনসা ঠাকরাণ, আমার রাগ চরাইও না! আমার অ্যাহন রাজার মত ম্যাজাজ অইছে, অ্যাহনি বরকন্দাজেরে কোয়ে তোমার না ফাসী চারাইতে পারি।'

**মনসাও খাণ্ডার মহিলা**॥ তিনি কলকাতায় এসেছিলেন গঙ্গাস্নানে। গাণিক্যর হাতে লাঞ্ছিত অপমানিত মাণিক্য তাঁর সাক্ষাৎ পেয়ে পাঁচী বাইজির এই ঠিকানা দেখিয়ে দিয়েছেন। অতএব রুদ্রমূর্তিতে মনসা ঠাকরুণ গলায় গামছা দিয়ে গাণিক্যধনকে টেনে ফিরিয়ে নিয়ে যান পরে কপালে নানা দুঃখ আছে এসব বলতে বলতে।

গাণিক্য শেষপর্যন্ত আর সুযোগ পান না, মহারাজা হওয়ার। কালাচাঁদের পরিকল্পনা ভেস্তে যায় মনসার আগমনে এবং গাণিক্যকে বেঁধে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ায়। কিন্তু এই ছোটো হাস্যজনক চিত্রের উপস্থাপনের মাধ্যমে 'রাজা বাহাদুর' খেতাব-লোভী সেকালের অনেক উচ্চাশীবাবুর চারিত্রিক স্বরূপ ও পরিণামকে তুলে ধরেন প্রহসনকার। সাহিত্যমূল্যে দীন হলেও যার সামাজিক ঐতিহাসিক মূল্য কিছু কম নয়।

**বিলাসী যুবা**॥ অমরনাথ বসু চৌধুরী রচিত ১৮৯৬ সালে বটতলা থেকে প্রকাশিত কাহিনিতে হঠাৎ বাবুদের লাম্পট্যদোষ এবং তার দরুন পতনের নিদারুণ চিত্রই বিষয় হয়ে উঠেছে।[৪২] গ্রন্থসূচনায় লেখক লিখেছেন—

> 'পাইয়া বিপুল ধন প্রমত্ত যে জন।
> নিশ্চয় হইবে তার অচিরে পতন।

সমসাময়িক বটতলার সাহিত্যভাণ্ডারে এ জাতীয় গল্প দুর্লভ নয়। এ জাতীয় গ্রন্থবিষয়ের বহুল উপস্থিতি এবং জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে যে, ইংরেজ যতই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে উচ্চশিক্ষিত দেশীয় শ্রেণি গড়ে তোলার চেষ্টা করুন না কেন, প্রকৃত শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা উনিশ শতকের শেষপাদেও নিতান্তই কম ছিল। এ যেন এক অন্ধকারের সত্যকে তুলে ধরে। উচ্ছৃঙ্খলবাবু, অবহেলিতা স্ত্রী, বেশ্যাগিরি, মদ্যাসক্তি, ন্যক্কারজনক আমোদপ্রমোদ,—নববাবুদের কাল বিগত হলেও যেন উনিশ শতকের বাঙালিবাবুদের এক অংশ শতক শেষেও ভুলতে পারছে না। লাম্পট্যের, অশিক্ষার, অমিতাচারের ঐতিহ্যকে। না হলে কেন শতক শেষের জনপ্রিয় সাহিত্যের পসরায় এত বেশি বিলাসী যুবাদের ভিড়?

'বিলাসী যুবা'র কাহিনি অংশে বিশেষ নতুনত্ব নেই। যজ্ঞেশ্বরবাবুর মৃত্যুর সময় প্রভূত অর্থ এবং ঈশান নামে এক পোষ্যপুত্র রেখে গেছেন। ঈশান আগে গরিবের ছেলে ছিল, কিন্তু হঠাৎবাবু হয়েই তার মতিগতি সব বদলে গেছে। তাকে পাপকর্মে প্ররোচিত করে কামদেব ও ধনঞ্জয় নামে দুই শঠ-ধূর্ত মোসাহেব। বাজারের মেয়েমানুষ সরবরাহের দায়িত্বও ধনঞ্জয়রা নেয়। মাত্র পাঁচশো টাকায় একজন মেয়েমানুষ আনা গেছে জেনে খুশিতে ঈশান কামদেব ও ধনঞ্জয়কে দুইশো টাকা করে বকশিস দেয়। অথচ বৈষ্ণব ভিক্ষা চাইতে এলে জোটে অর্ধচন্দ্র। বাবুর্চির হাতের খাবার ছাড়া ঈশানের রোচে না। কোনো কারণে বাবুর্চি না এলে হোটেল থেকে খানা আনিয়ে নেওয়া হয়। সেইসঙ্গেই বাড়িতে চলে বাই-খেমটির নাচ। নেহাত যজ্ঞেশ্বরবাবুর স্ত্রী মহামায়া এখনও জীবিত আছেন, তাই দোল-দুর্গোৎসব এখনও হয়।

ঈশান তার স্ত্রী অন্নপূর্ণাকে একদম দেখতে পারে না। ওরকম প্রাচীন আচার-ব্যবহারসম্পন্ন স্ত্রী আছে বলে সে দুঃখ করে। অথচ বাড়ির পরিচারিকা জাহ্নবীর প্রতি তার কুনজর পড়েছে। জাহ্নবী তা বুঝতে পেরে অন্নপূর্ণার কাছে দুঃখ করে। ধনঞ্জয়ের মুখ থেকে জানা যায়, ঈশানের কুনজর পরের বউ-ঝিদের উপরও পড়েছে। ধনঞ্জয়ের মতে, 'টাকা খরচ করিলে কত শত সুন্দরী বেশ্যা বাড়িতে আসিতে পারে। পরের বৌ-ঝিদের প্রতি কুদৃষ্টি কেন? টাকা পেলেই সকলে ভুলে থাকে! আবার এখন বাড়ির চাকরানীর প্রতি নজর পড়েচে।' বাড়ির পুরুত-ঠাকুর ঈশানের লাম্পট্য ও অনাচারে বিরক্ত। একালে যে 'গুণের গৌরব নাই, ধনের আদর', এই নির্ম্মম সত্য তাঁকে ব্যথিত করেছে। টাকা থাকলেই ধনীরা সব অনাচারের মুখ বন্ধ করে দিতে পারে। তাঁর প্রতিবেশী বিশ্বেশ্বরের কথায় পাওয়া যায় হঠাৎবাবুদের স্বভাব-চূর্ণক—

> 'কুক্রিয়ায় রত সদা ধনীর সন্তান।
> সম্পদে মত্ততা বাড়ে, অন্যে তুচ্ছ জ্ঞান॥
> করিয়ে অবৈধ কার্য কত ধনক্ষয়।
> পরহিত তার কভু কপর্দ্দক নয়॥'

অবশ্য চারপাশের সমালোচনায়, অনুযোগে ঈশান থোড়াই কেয়ার করে। ধনঞ্জয়কে স্ত্রীবেশে পরিচারিকা জাহ্নবীর কাছে পাঠিয়ে তাকে রাজি করাতে ব্যর্থ হয়ে ঈশান নিজেই রাত্রিবেলা পরিচারিকার ঘরে যাবার ঠিক করে। আগেই সে খবর পেয়ে জাহ্নবীর ছদ্মবেশে ঈশানের স্ত্রী অন্নপূর্ণা জাহ্নবীর ঘরে রাতে থাকে। ঈশান আসে, পরিচারিকা ভেবে প্রণয় নিবেদন করে, পরে অন্নপূর্ণাকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে লাথি মেরে চলে যায়।

ঈশানের লজ্জাশরম কিছুই নেই। সে এসে মহামায়া ও অন্নপূর্ণাকে গালিগালাজ করে তার বিলাসিতার খরচ হিসাবে দু'শো টাকা চায়। মহামায়া না দিলে ঈশান স্ত্রীকে তার গয়নাগাটি দিয়ে দিতে বলে। স্বামীর

কাছ থেকে এ হেন ব্যবহার পেয়ে অন্নপূর্ণা কঠিন অসুখে পড়ে। সে আর বাঁচতে চায় না, ওষুধ খেতে তাই অস্বীকার করে। অতঃপর ঈশানের চরণ স্পর্শ করে অন্নপূর্ণার মৃত্যু হয়। কিন্তু এই মৃত্যুও ঈশানের মনে দাগ কাটতে পারে না। সে যেমন অমিতাচার ও বিলাসিতা চালাচ্ছিল চালিয়ে যায়। তার মোসাহেব ধনঞ্জয় ও কামদেবের তবু ভালো-মন্দ বিবেচানবোধ আছে, ঈশান বাবুর তাও নেই। এদিকে ঈশানের পুঁজিও প্রায় নিঃশেষিত। বাকিটুকুও আত্মসাৎ করতে চায় ধনঞ্জয়। কারণ সে 'ইঁদুরের সাহায্যে বিড়াল শিকার' করতে এসেছে। তবে বাগানবাড়িতে আগুন লেগে আকস্মিকভাবে তারা দুজনেই মারা পড়ে।

এদিকে নিঃসঙ্গ, নিঃস্ব ঈশানও রোগশয্যায় পড়ে থেকে থেকে উন্মাদবৎ হয়ে যায়। বিশ্বেশ্বর এসে তার চোখে মুখে জল দিয়ে জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করেন। বাজারে তার নামে ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে। ঈশানকে ধরতে পেয়াদা এসেও তার ওই দশা দেখে পেয়াদা ফিরে যায়। জ্ঞান ফেরার পড়ে বিশ্বেশ্বর ও গঙ্গাধরকে দেখে সে ক্ষমা চায়।

কাহিনির মধ্যে বিশেষত্ব বলতে বাবুদের অন্তঃপুরেই লাম্পট্য প্রচেষ্টার কাহিনি। যদিও সমসাময়িক বটতলার অন্যান্য গ্রন্থগুলিতে এ জাতীয় কাহিনি দুর্লভ নয়। হঠাৎবাবুদের কাহিনির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা থেকে বোঝা যায়, হঠাৎবাবুদের বাবুগিরির উপায়গুলি ছিল— ক) অকারণ বিলাসিতায় বহুব্যয়; খ) মদ্যপান ও অন্যান্য নেশার প্রতি আসক্তি; গ) বেশ্যাসক্তি; ঘ) লাম্পট্য দোষ; ঙ) খেতাব-প্রীতি ইত্যাদি। হরিহর নন্দীর 'হঠাৎবাবু' প্রহসনে (১৮৭৮) মদ্যপানের কুফলের প্রসঙ্গে সামগ্রিকভাবে বাবুয়ানার প্রতিই দোষারোপ করা হয়েছে। গোপালচন্দ্র মিত্রের 'পদীর বেটা পদ্মলোচনে' (১৮৭৯) সমাজের প্রান্তিক সম্প্রদায়ের এক যুবক পদীর ছেলের পদ্মলোচন নাম গ্রহণ করে অভিজাত সাজার চেষ্টা ব্যঙ্গবিদ্রূপের বিষয় হয়েছে। চন্দ্রকান্ত দত্তের 'আজব জোলা'য় একইভাবে প্রান্তিকতার ক্ষেত্র থেকে উঠে আসা ব্যক্তির হঠাৎ ধনী হয়ে বাবুগিরি করবার শখের প্রতি ব্যঙ্গ করা হয়েছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, কেবল সাধারণ শিক্ষিত হঠাৎ বাবুরাই নয়, রক্ষণশীলদের আশঙ্কিত প্রতিরোধ প্রান্তিক বৃত্ত থেকে বাবুত্বের উত্থানের প্রতিও। বাবুয়ানার সঙ্গে বনেদি আভিজাত্যের যে সম্পর্ক আছে, তা সার্বজনীন হয়ে পড়ুক সম্ভবত এমনটি চাননি রক্ষণশীল হিন্দুরা। আবার গ্রাম্য বাবুর সাহেব হতে চাওয়ার প্রসঙ্গও ব্যঙ্গবিদ্রূপে অভিষিক্ত হয়। অজ্ঞাত লেখকের লেখা 'মরকট বাবু' (১৮৯৯) প্রহসনে গ্রামের জনৈক কৃপণ ধনী বংশীধর সিংহের পুত্র মরকত 'পাল' বাপের ইচ্ছেয় কলকাতায় এসে 'দিনকতক কালেজে ঢু মেরে, এখন কালেজ আউট হয়ে বসে বসে খচাখচ হ্যান্ডনোট কাটছেন।' ইতিমধ্যে বংশীধরের মৃত্যু হলে হঠাৎবাবু মরকতের ঘাড়ে চেপে বসে দুই 'পাকামালে'র দালাল, খল-শঠ প্রেমচাঁদ এবং ভূতনাথ। অতঃপর তাদের প্ররোচনায় নিজেকে সাহেব ভাবতে বসা মরকত, ভূতনাথের ভাষায় মর্কট, বিলিতি মতে শ্রাদ্ধের আয়োজন করে। ৬ ডজন ব্র্যান্ডি, ১২ ডজন লেমনেড, একমন বরফ আনা হয়। শ্রাদ্ধে মাছ চলে না বলে প্রভূত মাংসের আয়োজন করা হয়। মেয়ে কীর্তনিয়ার পরিবর্তে একই টাকায় নাচ-গানের ব্যবস্থা করা হয় বেশ্যা খেমটাওয়ালি এনে। এই শ্রাদ্ধের আমন্ত্রণ জানানো হয় হ্যান্ডবিল ছড়িয়ে। সাহেব-সমাজে মরকতের খ্যাতি নেই, এখন প্রেমচাঁদ ও রায়চাঁদের কথায় মরতক প্রকৃত মর্কটের নাচই নেচে বেড়ায়। লেখকের মূল লক্ষ্য ছিল অশিক্ষিত গ্রাম্য হঠাৎ বাবুদের বাবুগিরি, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন এবং সাহেবিয়ানার কুফল প্রদর্শন। সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত ভাবেই তিনি তা করেছেন। প্রসঙ্গত, ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা ব্যক্তিগত লাভালাভের জন্য এইসব হঠাৎবাবুদের অনৈতিক এবং ধর্মবিরুদ্ধ কাজে কেমন করে প্রশ্রয় দিতেন, অজপতি বিদ্যাদ্বীপের চরিত্র উপস্থাপনের মধ্যে

তার প্রমাণ রেখেছেন। বেশ বোঝা যায়, হঠাৎবাবুর বাবুয়ানা ও পরিণামী ধ্বংসের কারণ কেবলমাত্র একা বাবুই নন, অন্তর্গত ইচ্ছাকে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থে যাঁরা প্রশ্রয় দিতেন, পরিবর্ধিত করতেন, তাঁরাও সমমাত্রায় দোষী। উনিশ শতকের শেষদিকে হঠাৎবাবুদের চারপাশে সেদিন এমনি কত ধূর্ত-শঠ মোসাহেবদের ভিড়।

**(খ) ফোতোবাবু** : ফোতোবাবু এবং হঠাৎবাবুদের মধ্যে মাত্রাগত ব্যবধান বিশেষ দূরের নয়। বিলাসিতায় বাবুগিরিতে অপরিমিত অর্থব্যয়ে অনেক বাবুই ফোতো হয়ে পড়েন, তখনও তাদের বাবুয়ানারা শখ না পেলে যেনতেনপ্রকারণে তাঁরা বাবুগিরি করবার উপায় খোঁজেন। এঁদেরকে ফোতোবাবু বলা যায়। ইতিপূর্বে উল্লিখিত 'চার ইয়ারে তীর্থযাত্রা'র গোপালচন্দ্র, হরিহর, নিতাইচন্দ্র এবং শ্যামলাল এমনি ফোতোবাবু। আবার, অনেকসময় সামর্থ্য নেই, তবু অপর বাবুদের দেখে বাবুয়ানা করবার শখ, অতএব ধারকর্জ করে, বউয়ের গয়না বেচে, নিতান্ত চুরি করে বাবুগিরি করতেন যাঁরা, তাঁরাও ফোতোবাবু। 'ফোতো' শব্দটি এসেছে আরবি 'ফতহ্' থেকে, যার অর্থ পরানুগ্রহ বা অন্যের অনুগ্রহে বা অর্থে পুষ্ট।[৪৩] ফোতোবাবুর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কেউ বলেছেন, 'যার ভিতরে দারুণ অর্থাভাব অথচ বাহিরে বাবুগিরি দেখান আছে তার মুখে অনেক বড় বড় কথা কিন্তু কাজে কিছুই নয়', তাকেই ফোতোবাবু বলে।[৪৪] কেউ কেউ ফোতোবাবু বলতে বুঝিয়েছেন, 'কেবল সাজসজ্জায় বাবু, কার্যত নির্ধন।'[৪৫] ফোতো শব্দটি 'ফৌত' থেকেও আসতে পারে, যার অর্থ নিঃশেষিত হওয়া। নিঃশেষিত-অর্থ ব্যক্তি যদি বাবুগিরির চালে চলেন, তবে তাঁকে 'ফোতোবাবু' বলা যেতে পারে। 'আলালের ঘরে দুলালে' প্যারীচাঁদ মিত্র এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'কতকগুলা ফতো বড়ো মানুষ আছে — তাহাদের উপরে চাকণ চিকণ, ভিতরে খ্যাঁড়। বাহিরে কোঁচার পত্তন ঘরে ছুঁচার কীর্তন, আয় দেখে ব্যয় করিতে হইলেই যমে ধরে— তাহাতে বাগানও হয় না— বাবু গিরিও চলে না। কেবল চটক দেখাইয়া মহাজনের চক্ষে ধূলা দেয়— ধারে টাকা কি জিনিস পাইলে দু আওরি লয়— বড়ো পেড়াপীড়ি হইলে এর নিয়ে ওকে দেয় অবশেষে সমন ওয়ারিন বাহির হইলে বিষয়-আশয় বেনামী করিয়া গা ঢাকা হয়।'[৪৬] অর্থাৎ ফোতোবাবু যেমন অর্থশূন্য অথচ বাইরে দেখানেপনা আছে, তেমনি অভাবশতই চারিত্রিক দিক থেকে অসৎ। 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় ফোতোবাবুর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ফোতোবাবুর এই বাহ্যিক আচরণগত দেখনেপণাকেই মুখ্য বলা হয়েছে— 'বাইরে বাবু নাম— ঘরে বাঙ্গারাম। অর্থাৎ বাস্তবিক ধনী নয়, অথচ ধনীর ন্যায় বাহা ভড়ং করিয়া চলিত তাহাকে লোকে "ফোতোবাবু" বলিত।'[৪৭]

সেকালে, বিশেষ করে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের নতুন আর্থ-সামাজিক পরিবেশে ফোতো বাবুয়ানি স্বাভাবিক ছিল। কারণ অর্থ-বিত্ত-ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত বনেদি বাবুয়ানার যুগ নিঃশেষিত হয়েছিল আগেই। বাঙালিবাবুরা ক্রমশ ব্যক্তিগত স্বাধীন পেশা ছেড়ে পরনির্ভর চাকরিজীবী হয়ে পড়ায় তাঁদের আর্থিক সামর্থ্যও সীমিত হয়ে পড়েছিল। ফলে, সাবেক কালের বাবুয়ানার চাল ধরে রাখা অসম্ভব ছিল। নতুন আর্থিক ব্যবস্থায় বাবুগিরিই ছিল অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু সাংস্কৃতিক বেলেল্লাপনা, বাবুগিরির শখ তখন বাঙালিবাবুদের অন্তর্গত স্বভাবের মধ্যে চারিয়ে গিয়েছিল। ফলে ধারকর্জ করে হলেও বাবুয়ানা করা শিক্ষিত-অশিক্ষিত অনেক বাঙালি পুরুষেরই মনোগত অভিপ্রায় ছিল। হুতোম তাঁর নকশায় সেরুড কোম্পানির তিরিশ টাকা মাইনে এবং দশ টাকা উপরির সেই মেট মিস্তিরি গুরুদাস গুঁইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন[৪৮], যে কিনা স্নানযাত্রার পরবে বাবুগিরি করবে বলে ধারকর্জ করে হলেও ব্যবস্থা করে কারণ

'সম্বৎসরের আমোদটি বন্ধ করা কোনো ক্রমেই হতে পারে না।' গুরুদাস গুঁই নতুন যুগের ফোতোবাবুদের উজ্জ্বল উদাহরণ। বাড়ির গয়না বাঁধা দিয়েও সে ঢ্যালা ফ্যালা, অরন্ধন, পৌষ পার্বনের মোচ্ছব করেছে। এক আলোচকের ভাষায়, নতুন কালে 'ব্যক্তিগত চুক্তিমূলক আয়ে বাবুয়ানা সম্ভব হয় না। তাই এইসব ফোতোবাবুদের আয় হয়ে গেছে দৌর্নীতিক। বাড়ির টাকা গহনা ইত্যাদি চুরি বা প্রতারণা দ্বারা সংগ্রহ করে তারা বাবুয়ানার খরচ চালিয়েছে।'[৪৯]

অবশ্য শুধুমাত্র বেশ্যাবাজি, বাবুগিরি বা মদ্যপানের জন্যই ফোতোবাবুরা লালায়িত হতেন না। উনিশ শতকের শেষপাদে বাবুরা টাইটেল বা খেতাব-প্রাপ্তির লোভে, নির্বাচনে জয়ী হবার বাসনায়, সামাজিক খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভের জন্যও ধারকর্জ করতেন। জাঁকজমক বাহ্যিক বাহারের চরম করতেন এবং শেষে সব নিঃশেষ করে 'ফৌত' হতেন। আসলে ফোতোমী এক ধরনের মানসিক চরিত্র, যা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই তাৎক্ষণিক সুখভোগ বা সামর্থ্যের চেয়ে বৃহৎ কোনো আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির উপায় খোঁজে। এই মানসিক জট থেকে সে যুগের অনেক বাবুই 'ফোতো নবাবি' বা 'ফোতো সাহেবিয়ানা'র চালে চলতেন। হরিহর নন্দীর 'ছাল নাই কুকুরের বাঘা নাম' (১৮৭৭) প্রহসনে উল্লিখিত ছড়ায় পাওয়া যায়—

'জাগা নাই জমিন নাই, গল্প করে ভারি।
আগে পাছে লণ্ঠন, টাকার নামে ঠন্‌ঠন্‌
সদাই দৌড়ান গাড়ী।।
কানে কলম গুঁজে ফিরে, ছেঁড়া কাঁথা গায় ওরে
বাত্তি জ্বালায় লেম্প
ইংরেজি বকেন সদা, ডেম্ ডেম্ মা ডেম্ ডেম্।'[৫০]

নতুন কালের ইংরেজি শিক্ষিত বাবুরা অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার চাপে ভালো করে বাবুগিরির শখ মেটাতে পারেন না, অথচ মনে বাসনা প্রবল। ভালো করে সংসার চলে না, ঘরে আহার্য বাড়ন্ত, তবু যাতায়াতের জন্য তাঁরা গাড়ির স্বপ্ন দেখেন। 'কানে কলম গোঁজা', সাধারণ কেরানিবাবু মাত্র, তবু বাবুগিরির শখ ষোলো আনা। অতএব সৎ-অসৎ যেকোনো উপায়ে সেই শখ মেটাতে তাঁরা তৎপর হতেন। উনিশ শতকের প্রহসনে স্বাভাবিকভাবেই এঁদের কথাও মেলে। তবে 'ফোতোবাবুদের' বাবুয়ানা যেহেতু প্রতারণামূলক, ফলে তাঁদের প্রতি সমাজের দৃষ্টি একদিকে যেমন ব্যঙ্গের, অন্যদিকে তেমনি ক্ষমাহীন। তার কারণ সম্ভবত এই যে, 'ফোতোবাবু'রা উঠে আসতেন যে অর্থনৈতিক জীবনবৃত্ত থেকে, তা রক্ষণশীল সামাজিক কিংবা আর্থিক কৌলীন্যের দৃষ্টিকোণ থেকে কখনো সম্মান-শ্রদ্ধা লাভ করতে পারেননি। যেসব ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায় ফোতো বাবুয়ানার পথে হেঁটেছেন, তাঁদের প্রতি রক্ষণশীল সমাজের দৃষ্টি আরও নির্মম। পাশ্চাত্য শিক্ষার দরুন দেশীয় সংস্কার ও সামাজিক জীবনের সাবেকি ছক ভেঙে পড়েছিল বলে রক্ষণশীল গোষ্ঠী মনে করতেন। ফলত, সেই শিক্ষার বাহক যদি ফোতো বাবুয়ানা করেন, তবে সমাজে যে নিন্দার ঝড় উঠবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেদিন এমনটিই ঘটেছিল। তবে শিক্ষিত শ্রেণির এই ফোতো বাবুয়ানা অনেকসময় প্রগতিশীলবাবুদের লক্ষণের সঙ্গে মিলে যায় বলে, এঁদের মধ্যে তুল্যমূল্য বিচারে খুব কম পার্থক্যই থাকে। সামগ্রিকভাবে, 'ফোতোবাবু'রা সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যতম নিন্দনীয় বলেই বিবেচিত, তা স্বীকার করতে হবে।

‘ফোতোবাবু’র বাবুয়ানার পরিচয়বাহী দু’একটি প্রহসনের বিষয় দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা যেতে পারে।—

**বক্কেশ্বরের বোকামি**॥ ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে বটতলা থেকে প্রকাশিত কামিনীগোপাল চক্রবর্তীর বর্তমান প্রহসনটির বিষয় ‘ফোতো বাবুয়ানা’ এবং তার দরুন ভোগান্তি।[৫১] সমাজের আর্থিক দিক থেকে অস্বচ্ছল বৃত্তে যখন বাবুয়ানির শখ জেগে ওঠে, তখন কী বিপত্তি ও দুর্দশা যে দেখা দেয়, তার চিত্রই এ প্রহসনে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অবশ্য এ প্রহসনের ‘ফোতোবাবু’ বক্কেশ্বরকে শেষপর্যন্ত চরম দুর্দশা ঘটিয়ে আবার আক্কেল ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সমাজে আর্থিক দিক থেকে অকুলীন মানুষদের যে বাবুগিরির শখ আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়, আলোচ্য প্রহসনে সেই উদ্দেশ্যমূলক বার্তা রয়েছে।

বক্কেশ্বরের মা ফল বেচে সংসার চালায়। বক্কেশ্বর নিষ্কর্মা, মায়ের উপার্জনেই তার বাবুগিরি চলে। নিজের স্ত্রীকে তার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে, তাতে সংসার খরচ কিছু হলেও সাশ্রয় হয়েছে। সে অর্থ বক্কেশ্বর তার বাবুগিরির পিছনে খরচ করে। এ কাজে তার মদতদাতা ইয়ারবন্ধু রামচন্দ্র। মদ্যপান ও বেশ্যাবাজিতেই বক্কেশ্বরের শখ বেশি। মা’-কে সে কোনোভাবেই দেখতে পারে না, কারণ মায়ের শিক্ষাদীক্ষা নেই, ‘দাঁত ভরা ছাতা’, পেশায় ফলওয়ালি। মাঝে মাঝে রেগে গিয়ে সে মাকে প্রহার পর্যন্ত করতে ছাড়ে না। মা তাকে পোস্তার বাজার থেকে ফল কিনে এনে দিতে বলে, কারণ তাতে তাঁর সুবিধা হয়। বক্কেশ্বর তার জন্য মুটে ভাড়া চায়। মা অবাক হয়ে নিজের ঝুড়ি মাথায় করে ফল বেচার দৃষ্টান্তের কথা তুলে ধরলে বক্কেশ্বর উত্তর দিয়েছে, ‘তুমি পার, আমার সাজে না, আমাকে দশজনে জানে, মান্য করে।’ মা এবং মায়ের প্রতিবাসিনীরা এ ব্যাপারে তাকে বোঝাতে গিয়ে যাচ্ছেতাই ভাবে অপমানিত হন।

ঘরে বক্কেশ্বর যেমন ভাবেই থাকুক না কেন, বাইরে বেরোলেই তার চালচলন বদলে যায়। গোলাপ বেশ্যার কাছে সে নিজেকে এমনভাবে তুলে ধরে যে, সে আদতে যে ফলওয়ালির ছেলে তা বোঝা যায় না। তার আর্থিক সামর্থ্যের মিথ্যা গল্প শোনায় সে গোলাপকে— ‘সোনাগাছির উর্বশী, মেছোবাজারের রম্ভা, চাঁপাতলার চাঁপা, আর জানবাজরের জেন, এরা কতবার গাড়ি হাঁকিয়ে আমার ওখানে গেছে, আমি অমনি তাদের নিয়ে বাগানে গেছি। মদ, পোলাও, পাঁঠা, দু’শ রগড় করেছি। কত টাকাই যে খরচ হয়েছে তা আর বলতে পারি না। এখন তোকে ফেলে কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না।’ বক্কেশ্বরের মনোগত ইচ্ছে, গোলাপ বেশ্যাকে তো মাস মাহিনায় বাঁধা বেশ্যা রাখবে। গোলাপের কাছে সে আর কাউকেই আসতে দিতে চায় না। গোলাপ অবশ্য বক্কেশ্বরের কথার প্রেক্ষিতে বলেছে যে, সে বারাঙ্গনা— একাঙ্গনা নয়। সেইসঙ্গেই বাঁধা-রক্ষিতা রাখতে গেলে সে মাসে পনেরো টাকা দাবি করেছে।

বক্কেশ্বর তার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছে, এ অতি তুচ্ছ ব্যাপার। যদিও গোলাপ বেশ্যার মনে বক্কেশ্বরের কথার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ জেগেছে। বাগাড়ম্বর আর মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে সন্দিহান হয়েই সে আপাতত পাঁচ টাকা দিতে বলেছে। কারণ, ওই টাকায় সে বাড়িভাড়া ও চালওয়ালার ধার শোধ করবে। বক্কেশ্বর বলেছে, অফিসের মাইনে পেলেই সে গোলাপিকে বুটকাটা শাড়ি কিনে দেবে। মিথ্যা স্তোতবাক্যে ভুলিয়ে মদ্যপান ও রাত্রিবাস করে বক্কেশ্বর। কিন্তু পাঁচ টাকা তো দূরের কথা, দু’টাকা জোগাড় করতেই সে হিমশিম খায়। বহুকষ্টের দু’টাকা জমিয়ে গোলাপ বেশ্যার হাতে দিয়ে সে বলেছে, আপাতত তার টাকা শেষ। কারণ পরিবার প্রতিপালন এবং লোক-লৌকিকতায় বিস্তর খরচ। অতঃপর ইয়ারবন্ধু সহ তাদের মদ্যপান শুরু হয়।

ইতিমধ্যে জাম বিক্রি করতে আসা এক ফলওয়ালির গলার আওয়াজ পেয়ে গোলাপি মদের সঙ্গে নুন মেখে জামের চাট খাওয়ার আবদার জানায়। জামওয়ালিকে ডাকা হলে দেখা যায়, তিনি আর কেউ নন, বক্কেশ্বরের গর্ভদাত্রী মা। মায়ের সামনে নিজেকে লুকাতে সে মুখে কাপড় জড়িয়ে রাখে এবং এভাবে বসে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'ও মাগি ভারি খারাপ, ওর মুখ দেখলে নেকার আসে। রাম রাম, এখনি ওকে দূর করে দাও, মাগির যে চেহারা!' বক্কেশ্বর যতই মুখ ঢেকে থাক, তার গলার আওয়াজ শুনে মা তাকে চিনতে পারেন এবং নিজেকে বক্কেশ্বরের মা বলে পরিচয় দেন। বক্কেশ্বর তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে মা'কে 'শালি' বলে সম্বোধন করলে মা বিস্ময় প্রকাশ করেন!' বক্কেশ্বর বলেছে— 'কে ওর ছেলে, মাইরি না, আমার বাবা দিনকতক ওকে রেখেছিল, তাই মাগী বাবা বাবা করে!'' নিজের দারিদ্র্য, দুর্বলতা, অসারতা ঢাকতে বক্কেশ্বর এভাবেই মিথ্যের পাহাড় সাজিয়ে তুলে গোলাপি বেশ্যার কাছে নিজের মান রাখার চেষ্টা করে যায়। তাকে সাহায্য করতে থাকে সকল দুষ্কর্মের সাথী রামচন্দ্র। বক্কেশ্বরের মা বৃদ্ধবয়সে নিজের ছেলের মুখ এহেন কথা শুনে আপন ভাগ্যকে দোষ দেন— 'তা বাবা, তুমি যার ছেলে, তার এইরূপই ঘটে থাকে। ওদিকে ঘরে ভাত নেই, মাথায় তেল নেই, চালে খড় নেই, এদিকে বাবার আমার পুরু নজর, মরণ আর কি!'

এ সমস্ত বাক্য বিনিময় শুনে গোলাপের আর বুঝতে বাকি থাকে না যে, বক্কেশ্বর আসলে ফোতো নবাব। সে তখন ঝাঁটা হাতে নিয়ে বক্কেশ্বরকে বেদম প্রহার করতে থাকে। বলে, 'এই তোর বাবুগিরি— ব্যাটা মাকে ভাত দিতে পারিস নে। রাঁড় পুষতে এসেছিস!' তার ইয়ার রামচন্দ্র বক্কেশ্বরের হয়ে ওকালতি করতে গেলে গোলাপ তাকেও প্রহার করে। গোলাপের কাছে প্রহার খেয়ে বক্কেশ্বরের চৈতন্য হয় এবং মায়ের কাছে ফিরে এসে সে ক্ষমা চায়। ফোতো বাবুয়ানার জন্য সে নিজেকে ধিক্কার দেয় এবং ভবিষ্যতে এই পথ সে পরিহার করে চলবে এমন প্রতিজ্ঞা করে।

প্রহসনকার উদ্দেশ্যমূলক এই নাটকে 'ফোতোবাবু' বক্কেশ্বরের অনুশোচনার ব্যবস্থা করে তাকে সৎ আদর্শে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন, কিন্তু বাস্তবে এমনটি ঘটত না বলেই মনে হয়। কারণ দেখা যায়, যাবতীয় অন্ধকার-বিকৃতি প্রদর্শনের পরেও সামাজিক 'ফোতোবাবু'দের চৈতন্য হয়নি। উত্তরোত্তর সেই সংখ্যা বেড়েই চলেছিল। বক্কেশ্বরের দৃষ্টান্ত তার ফলে একক বা বিচ্ছিন্ন নয়, সামগ্রিকভাবে একটি বিশেষ শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেছে।

**টাইটেল দর্পণ**॥ 'বক্কেশ্বরের বোকামি' সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির 'ফোতোবাবু'দের কথা শোনায়, অন্যদিকে ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত প্রিয়নাথ পালিতের 'টাইটেল-দর্পণ বা সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়' প্রহসনে সাধারণ শিক্ষিত, প্রবল উচ্চাশী মানুষের 'ফোতো নবাবি'র গল্প ওঠে এসেছে।[৫২] শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত অথচ আর্থিক দিক থেকে অসুবিধার মধ্যে থাকা বাবুরাও সামাজিক খ্যাতি-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য রাজা, মহারাজা, বাহাদুর, রায় বাহাদুর ইত্যাদি খেতাব কামনা করতেন। কেউ কেউ তার দরুন ভবিষ্যতে লাভের কথা ভেবে অগ্রিম কর্জ করতেন। এইভাবে টাইটেলের পিছনে অকারণ অর্থব্যয় করায় অনেকেই অচিরেই ফতুর হতেন এবং ঋণের দরুন অথৈ সাগরে পড়তেন। প্রহসনটির বিজ্ঞাপনে জনৈক অক্ষয়কুমার সেন উদ্দেশ্যমূলক এই দর্পণ নাটকের মূল অভিপ্রায়ের কথা বলেছেন— 'ইহার (টাইটেল দর্পণের) উদ্দেশ্য কেবল জনসমাজকে হাসাইবার নিমিত্ত নহে। যাহাতে লোকে মোহবশতঃ মনুষ্য প্রদত্ত পুরস্কারের আশায় ধাবমান না হয়, যাহাতে তাহারা সলিল ভ্রমে মায়াবিনী মরীচিকার প্রতি ধাবমান হইয়া নানাবিধ বিপজ্জালে জড়িভূত না

হয়, যাহাতে তাহারা স্বীয় অসামর্থ্য বুঝিতে পারিয়াও অত্যুন্নত মেরু শিখর উল্লঙ্ঘন করিতে অভিলাষী হইয়া পরিশেষে বিকলাঙ্গ হইয়া ভূতলে পতিত না হয়, ইহাই তাঁহার এই ক্ষুদ্র পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্য।' অর্থাৎ, খেতাবের লোভে শিক্ষিত জনসমাজ বাহ্যিক চাকচিক্য আদব-কায়দার মহার্ঘ জীবন বেছে নিচ্ছিলেন এবং প্রবঞ্চক অসৎ উমেদারের বা মোসাহেবের প্ররোচনায় শেষপর্যন্ত স্বখাত সলিলে ডুবতেন, তারই একপ্রকার প্রতিনিধিত্বমূলক চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে, এই প্রহসনে। প্রহসনকার আখ্যাপত্রে উদ্ধৃত শ্লোকেও কোনো প্রকার লোভের বশবর্তী হয়ে বুদ্ধিভ্রংশ হওয়ার থেকে সাবধান হতে বলেছেন। কারণ, তার দরুন পরিণামে দুঃখ ছাড়া আর কিছু লাভ হয় না বলেই প্রহসনকারের বিশ্বাস—

'লোভেন বুদ্ধিশ্চলতি লোভো জনয়তে তৃষ্ণাম।
তৃষ্ণার্ত্তো দুঃখমাপ্নোতি পরত্রেহ চ মানবঃ॥'

'টাইটেল দর্পণ বা সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়' প্রহসনের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে সামান্য অর্থসম্বলসম্পন্ন ফোতো জমিদার আশুতোষ বাবুর 'রাজা' টাইটেল প্রাপ্তিকে কেন্দ্র করে। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কেই আশুতোষবাবুর মুখে জানতে পারা যায়, এই 'রাজা' টাইটেলটি পাবার জন্য জনৈক প্রভাবশালী রাইচরণ বাবুকে কত না 'খোসামোদ' করতে হয়েছে। সেইসঙ্গে দিতে হয়েছে দেদার 'প্রেজেন্টেশন'।— নেপোলিয়ন প্রাইসের সাবান এক বাক্স, গস্ নেলের হোয়াইট রোজ, স্মিথের ল্যাভেন্ডার, পাশাপাশি রয়েছে পেস্তার বরফি, কেষ্টনগরের সরপুরিয়া ইত্যাদি কত না খাবারদাবার। আশুবাবুর ভাগ্নে নদের চাঁদের কথায়, 'আঁবই কত রকম দেওয়া হয়েছে ২০ টাকা শ = ২৫ টাকা না নেংড়া, বোম্বাই, হিমসাগর, সীতেভোগ, আবার কি বলে— সাহেব খায় বিবি চায় নানাবিধ'। তবে এতসব উপঢৌকন, ফল-মূল, মিষ্টির পারিতোষিক দিয়ে তুষ্ট করা গেছে মান্যগণ্য রাইচরণবাবুকে। তাঁর জন্যই অবশ্য শেষপর্যন্ত 'রাজা' টাইটেলটা জুটেছে আশুবাবুর। ফলে নদের চাঁদের ভাষায়, 'আপনার পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে অপ্পার টেন থাউজেন্ডের মধ্যে গণ্য হবে। পূর্ব্বকার সব ইয়েই ঢেকে যাবে।'

রাইচরণবাবু জাতে ছোটো। অন্যদিকে আশুতোষ কায়স্থ। রাইচরণের বয়সও খুব অল্প। আশুবাবুর কথায়, 'তা নৈলে আর আমি কায়েত বাচ্চা হয়ে তাকে দাদা দাদা করি— তোর পায়ে পড়ি না তোর কাজের পায়ে পড়ি— সে বেটা আমার ছেলের বয়সি হুঁঃ—', গরজ বড়ো বালাই। খেতাব না পেলে সমাজে আর মুখ দেখানো যাবে না। রাইচরণবাবুর সাহায্যে 'টাইটেল' লাভ করে আশুবাবু এখন 'উঁচু দরের কায়েত।' কিন্তু টাইটেল প্রাপ্তির খবর আসা মাত্র তাঁর এবং তাঁর পারিবারিক জীবনে নতুন সংকট ঘনীভূত হয়েছে। আশুবাবুর স্ত্রী-পুত্র সকলেরই ধারণা হয়েছে, 'রাজা' খেতাব পেয়ে আশুবাবুর আর্থিক কৌলীন্যও বেড়ে গেছে। 'টাইটেল' পেলে 'উঁচুদরের লোকের মতো চলতে হয়', অতএব, আশুবাবুর হুকুম হয়েছে, জাঁদরেল গোছের দু'জন দারোয়ান এনে পোশাক আর তকমা পরে দেউড়িতে পাহারা বসাতে। রাজা হবেন জেনে একমাস আগে থাকতেই তিনি এসব তৈরি করে রেখেছেন। সেইসঙ্গেই আশুবাবুকে যেন তারা 'মহারাজা' বলে ডাকে এবং কথায় কথায় 'হুজুর' বলে। বাড়ির চাকর-বাকরেরা তাঁকে যেন 'হুজুর' 'হুজুর' বলে ডাকে। সেইসঙ্গেই তাঁর পত্নীকে যথাক্রমে বড়ো রানি ও ভাই-বউকে ছোটো রানি বলে ডাকে বাড়ির দাসীরা, এও বলে দিয়েছেন তিনি। আশুবাবুর বউমাকে ডাকতে হবে 'বৌরানী' বলে।

ইতিমধ্যেই নিজেকে 'যুবরাজ' ভাবতে বসা আশুবাবুর পুত্র গোরাচাঁদ তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর ফর্দ পাঠিয়েছে আশুবাবুর কাছে। ফর্দ দেখে আশুবাবুর চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেছে,— গোরাচাঁদের প্রয়োজন—

'একখানা পেব্‌লের চশমা সোনা বাঁধানো সলোমনের বাড়ী থেকে, সোনার স্টড্‌স আর লিঙ্ক্‌ হেমিল্‌টনের বাড়ি থেকে, বুড় আঙুলের মতন মোটা পাতা ফেসানের চেন মেথুসনের বাড়ী থেকে, ভালো স্টিক মেকেঞ্জিলায়লের ওখান থেকে, রথার হেম্‌ মেকারের সোনার ঘড়ি কুককেলভির বাড়ী থেকে; বারাণসী চাদর, কিংখাপের পোশাক লিডিতে যাবার জন্যে; সাটিনের পোশাক ইভনিং পার্টিতে যাবার জন্যে; মাদার ও পার্লের অপেরা গ্লাস নিউম্যানের বাড়ী থেকে। খোপ ও খোসবয়ের জিনিস সকল।' হতভম্ব আশুবাবু আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর পত্নীও এবার 'আক্কেল গুড়ুম ফর্দ' বার করবে। এই সময়ই জানা যায়, আশুবাবু আসলে 'ফোতোবাবু'। 'রাজা' টাইটেল পাওয়া এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের জন্য হ্যান্ডনোট কেটে তিনি কেবলচাঁদ জহুরির কাছ থেকে ২০,০০০ টাকা নিয়েছেন। তার মধ্যে ১০,০০০ টাকাই কেবল 'ফান্ড আর সাবস্ক্রিপশনে' খরচ করা হয়েছে। ক্রুদ্ধ আশুবাবুর ক্ষুব্ধ মন্তব্য 'রাজা কি মুফৎ হইচি, রাজা হওয়া নয় তো ইয়েতে বাঁশ যাওয়া।'

এদিকে রাজা খেতাব লাভের পরে আশুবাবুর মোসাহেব হতে চেয়ে অনেক উমেদারই ভিড় জমিয়েছে। ধূর্ত-খল দীনবন্ধু আবার দরখাস্ত পর্যন্ত পাঠিয়েছে। আশুবাবু তার কথায় ভুলে মাস-মাহিনার দীনবন্ধুকে মোসাহেব নিয়োগ করেছেন। প্রথম দিনই দীনবন্ধু একজোড়া শান্তিপুরে ধুতি আর উড়ুনি আর এক জোড়া চাঁদনি চকের 'সাইড ইস্প্রিং জুতো' হস্তগত করেছে। অন্যদিকে আশুবাবুর পত্নী তথা 'বড়রানী' পান্নামতীও সুযোগ বুঝে আশুবাবুর আশঙ্কা মতো তাঁর দাবি পেশ করেছেন— খুব সরেশ মুক্তোর সরস্বতী হার এক ছড়া, হীরের কণ্ঠী একছড়া, হীরের রতনচূড়, দশটি হীরের আংটি, মুক্তোর ঝালরতয়ালা বারাণসী শাড়ি এবং একখানা পাইনাপেলের গাড়ি। সেইসঙ্গেই হাত খরচের জন্য পান্নামতীর নগদ ৫০০ টাকা চাই। সব শুনে আতঙ্কিত আশুবাবু ভাগ্যকে দোষ দিয়ে মন্তব্য করেছেন, 'এমন জানলে কোন গুহোর বেটা রাজা টাইটেল নিতো। কি পাপ?'

এদিকে আশুবাবুর মোসাহেব দীনবন্ধু 'যুবরাজ' গোরাচাঁদকে নানান কুমন্ত্রণা দিয়ে বাবুগিরি করবার জন্য উৎসাহিত করে। গোরাচাঁদ তার ইয়ারদোস্ত সহ একখানি সভা গঠন করেছে, নাম দিয়েছে— 'বিলাসতরঙ্গিনী সভা'। গোরাচাঁদের ভাষায়, 'ইহার মোখ্য উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের দেশের রীতিনীতি, কস্টম্‌, ফ্যাস্‌ন ইত্যাদির সংশোধন করণ।' আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে ওঠার জন্য 'সিদ্ধি বাটা জল, আইস পিচার, বরফ, দুধ, চিনি' দিয়ে সভা শুরু হয়েছে। দীনবন্ধু এই সভায় গোরাচাঁদকে প্ররোচিত করেছে বেশ্যা এনে মজার করার জন্য। সে গোরাচাঁদকে বড়োলোকের গুটিকতক লক্ষণ বলেছে—

'সুদুবাবু হয় নাই, আটটি লক্ষণ চাই,
তবে নাম জানিবে সকলে।
বেশ্যাবাড়ী, ছড়ি ঘড়ি, বিকেলে ফিটন্‌ গাড়ি,
দিবা নিশি ভাস লাল জলে॥
গান বাদ্য কর সার, মাছ ধর রবিবার,
চুল কাট আলবার্ট ফ্যাসনে।
বড়লোক বলি তবে, মুষিবে সুখ্যাতি সবে,
সার কথা দীনবন্ধু ভণে।।—'

সব মেনে নিলেও 'আলবার্ট ফেসানে' চুল কাটতে অস্বীকার করেছে গোরাচাঁদ। কারণ, বড়ো বড়ো 'কার্তিকে চুল' রাখাই নতুন 'ফেসান'। গোরাচঁদের এখনও বড়ো বড়ো চুল বেরোয়নি, তাই সে সাহেব বাড়ি থেকে তেমনি পরচুলা এনে পরে আছে। আশুতোষবাবুকেও বলতে শোনা যায় বড়ো চুল রাখার কথা। সভার পরিসমাপ্তি হয় দীনবন্ধুর গাওয়া একখানি রসের গান দিয়ে।

এদিকে 'রাজা' হবার মাশুল গুণতে আশুবাবু জেরবার। ১৬,০০০ টাকা খরচ করে বড়োরানির গয়না কিনে দিয়েছেন, যদিও সব টাকা শোধ করতে পারেননি। এদিকে আবার 'রাজপুত্তুর' গোরাচাঁদের অ্যালবার্ট পোশাক কিনতে দু'হাজার টাকা খরচ হয়েছে তাঁর। তার উপরে গোরাচাঁদের দু'মাসের মদের বিল বাবদ রাধাবাজারের সেন ব্রাদারস্‌কে ৫০০ টাকা মেটাতে হয়েছে। তাতে অবশ্য গোরাচাঁদের কিছু যায় আসে না। সে 'হঠাৎবাবু' হয়েছে, যদিও 'ফোতোবাবু'র পুত্র বলে সেও আদতে 'ফোতোবাবু' বলেই পরিগণিত হয়। নদের চাঁদ গোরাচাঁদকে সমর্থন করে আশুবাবুকে বলেছে, 'তা রাজাদের বাড়ীর ছেলে হলেই ও দোষটা আগে জন্মায়। এই সিঁদুরে পুরের সব রাজপুত্রদেরই প্রায় রোজ সকালে খানা থেকে তুলে আন্‌তে হয়।' গোরাচাঁদ গর্বের সঙ্গে জানায়, সে এখনও খানায় পড়েনি। বোঝা যায়, মদ্যপান, বেশ্যাবাজি, বাবুগিরির শখ হঠাৎবাবু বা ফোতোবাবুর জন্ম দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। গোরাচাঁদ নদের চাঁদের কথা শুনে বাবার কাছে আবদার করেছে যে, যদিও সে 'সেকেন্ড কেলাস' পর্যন্ত পড়েছিল, তবু তার এক ক্লাসফ্রেন্ড একই বিদ্যা নিয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে গেল। তাকেও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট করে দিতে হবে। অনুরোধে-আবদারে পরাস্ত হয়ে আশুবাবু সাহেবদের এ ব্যাপারে অনুরোধ জানাবেন বলেছেন।

এমতাবস্থায় দীনবন্ধু একটি চিঠি আনে। চিঠি পড়ে আশুবাবুর মাথায় হাত পড়ে। একটি মামলায় তাঁর হার হয়েছে। অ্যাটর্নি মামলার খরচ হিসাবে ১০,০০০ টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে। এদিকে ২০,০০০ টাকা যা ধার করেছিলেন আশুবাবু, তা খরচ হয়ে গেছে। আর ধার পাবার আশা নেই। নদের চাঁদ ভদ্রাসন বন্ধক দিতে বলে। কিন্তু তাতে ক'দিন সময় লাগবে। এদিকে বাইনাচের সঙ্গে সাহেবদের ভোজের অনুষ্ঠান পরের দিনই। আশুবাবু পার্টি বন্ধ করে দিতে বললে নদের চাঁদ যুক্তি দেখিয়েছে, 'আজ্ঞে তা কি হয়? কার্ড ইসু হয়ে গেচে, আতর গোলাপ, ঝাড়, বাতি, বাইউলী সব ঠিক হয়ে গেচে। তাদের বায়না পর্য্যন্ত দেওয়া হয়েছে। উইল্‌সনের বাড়ী পর্যন্ত চিঠী দেওয়া হয়েচে।'— অতএব পার্টির সিদ্ধান্ত বহাল থাকে। এদিকে কেবলচাঁদ জহুরিকে দেয় টাকা শোধ দেবার সময় পেরিয়ে গেছে বলে সে বড়ো বিরুক্ত করছে। ক্ষুব্ধ আশুবাবু বলেছেন, 'টাইটেল নেওয়া ত নয় ডান হাতে করে গু খাওয়া—।'

ইতিমধ্যে জনৈক প্রতিবেশী সত্যবাবু এসে তাঁর 'ইনট্রান্স' পাশ ভাগনের একটা ২৫/৩০ টাকার চাকরির জন্য তদবির করেছেন। আশুবাবু স্বগতোক্তি করেছেন যে, তাঁদের অবস্থাও তথৈবচ। তবে মুখে বাবুয়ানার মান রাখতে পার্টি হয়ে যাবার পরে এ নিয়ে ভাববার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এদিকে পান্নামতী শাড়িওয়ালি, গয়নাওয়ালির সঙ্গে নতুন পোশাক ও মুক্তোর দরদস্তুর করেছেন। যদিও আশুবাবু নানান কথা বলে অর্থ না দেওয়ায় মুক্তো তাঁর হস্তগত হয়নি। টাকার জোগাড় করতে উন্মাদ প্রায় আশুবাবু মিথ্যে কথা বলে পান্নামতীর হীরের সুটটি চেয়েছেন। যদিও পান্না তাঁর অভিসন্ধি বুঝতে পেরে গয়না না দেওয়ায় আশুবাবু হতাশ হয়ে পড়েছেন। সেই সঙ্গেই বিধবা ভ্রাতৃবধূর গোপন অবৈধ সম্পর্কের কথা শুনে আশুবাবু স্তম্ভিত হয়ে গেছেন।

দীনবন্ধুর কথা থেকে জানা যায়। পার্টি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সাহেব বাইজিদের সামনেই 'রাজপুত্তুর' গোরাচাঁদকে যাচ্ছেতাই ভাবে অপমান করেছে। দীনবন্ধু সার কথা বলেছে, 'এমন ফাঁকা টাইটেল্ নিয়ে কেবল নাকাল্ হওয়া আর বেউজ্যুৎ। হাঁ বাপু জানলুম্ রাজা হলুম্ তার সঙ্গে সঙ্গে জায়গীর পেলুম তা হলে একদিন রাজা হওয়া যায়। এমন ভূমি শূন্য রাজা হলেই কি আর না হলেই কি? এমন রাজা হওয়া পাপের ভোগ।' 'ফোতোবাবু'র এক চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত আশুবাবু। আর্থিক সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও প্রথম থেকেই টাকা ধার করে তিনি তাঁর টাইটেল লাভ করেছেন। কিন্তু সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও 'ফোতো নবাবি' করতে গিয়ে তিনি এবং তার গুণধর পুত্র সর্বস্বান্ত হয়েছেন। বাজারে জমে গেছে অজস্র ধারদেনা। সেকালে এভাবেই সীমিত সামর্থ্য বা আয়-সম্পন্ন লোক বাবুগিরি ও খেতাবের মোহে আপন সামর্থ্য সম্পর্কে আত্মবিস্মৃত হতেন। তাঁদের প্ররোচিত করতে মোসাহেব-রূপী শয়তানদের জুটে যেতে দেরি হত না। সেইসঙ্গেই গৃহস্থ ব্যক্তিবর্গও যদি আকাট মূর্খর মতো কেবল ভোগ, কেবল বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন, আয়ের উৎস সম্পর্কে কোনো ভাবনাচিন্তাই করেন না, তবে 'ফোতোবাবু'র সর্বনাশ ঘনাতে আর বেশি দেরি হয় না। আশুবাবু এবং গোরাচাঁদ— উভয় চরিত্রই ফোতো নবাবি করতে গিয়ে এইভাবে সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন। দীনবন্ধুর পরিণামী গানে 'ফোতোবাবু'দের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গের সুর ঝরে পড়েছে—

> 'মনে করি গাড়ি চড়ি বগি উল্‌টে পড়ে যাই।
> মন ত সকের বটে হাতে কিন্তু পয়সা নাই।।'

বস্তুত, এই হচ্ছে সেকালের 'ফোতোবাবু'দের মনের অন্যতম সার কথা এবং সমাজজীবনেরও প্রত্যক্ষ সত্য।

**বউবাবু**॥ ১৮৯০ সালে প্রকাশিত কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের এই প্রহসনে[৫৩] 'ফোতোবাবু'দের চেনা ছবিটি পাওয়া যায়। আর্থিক দিক থেকে অতি-সাধারণ ঘরের সন্তানরাও যখন মিথ্যা বাবুয়ানা এবং অনাচার বিকৃতির বশীভূত হয়, তখন জীবনে কোন দুর্গতি নেমে আসে তারই বাস্তব একখানি কাহিনি এই প্রহসনের উপজীব্য। তবে প্রহসনের সামগ্রিক চিত্রটি শেষপর্যন্ত অনাচার-বিকৃতি ও ভণ্ডামির কথা যতটা বলে, তা থেকে মুক্তির উপায় বা পন্থা তেমন নির্দেশ করে না। সম্ভবত, এ জাতীয় ফোতো বাবুয়ানার পরিণামী দুর্দশার ছবি দেখে পাঠক নিজেই সচেতন হবে, এই ছিল লেখকের অভিপ্রেত। পাশাপাশি গরিবের ঘরের ছেলের 'বাবুয়ানা'র প্রতি মোহ যে আদৌ উচিত নয়, সে বিষয়েও লেখক স্বতঃই ব্যঙ্গ মনোভাবাপন্ন হয়েছেন।

বিক্রমপুরের গরিব পাটের সুতো কাটা গৃহস্থ রামহরি মুখোপাধ্যায় পাট কেটে সামান্য আয় করেন, তাতেই কায়ক্লেশে সংসার চলে তাঁর। নিজে লেখাপড়া না শিখতে পারলেও লেখাপড়ার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। এ কারণেই তিনি তাঁর ছেলে রামকৃষ্ণকে কলকাতায় পড়তে পাঠিয়েছেন। রামকৃষ্ণ লেখাপড়া করে বড়োমানুষ হলে তাঁর দুঃখ ঘুচবে, এই রামহরির আশা।

কিন্তু রামকৃষ্ণ কলকাতায় এসে বিলাসব্যসনে গা ঢেলে দিয়েছে। সে ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে বউবাজারে 'বিলিতি কনসার্ট পার্টি' খুলেছে। নানা সমিতির সে সভ্য, প্রতিষ্ঠাতা, নিজের নামও সে বদলে নিয়েছে— রামকৃষ্ণ থেকে রমেন্দ্রকৃষ্ণে। স্কুলে অবশ্য সে বিশেষ পড়াশোনা করে না। হেডমাস্টার তাকে অঙ্কে মনোযোগ দিতে বলায় সে রেগে হেডমাস্টারকে রদ্দা মেরেছে। প্রগতির ব্যাপারে তার উৎসাহ কম নেই। সে সুরা সংহারিনী সমিতি, নেটিভ প্রোগ্রেসিভ ক্লাব ইত্যাদি সমিতির মেম্বর। যদিও তার সুরা সংহারিণী

সমিতি 'শুঁড়ির পাওনা মোটানোর ভয়ে— ৯৯-র বিলের ধাক্কায় অস্থির।' অবশেষে, রামকৃষ্ণ ওরফে রমেন্দ্রকৃষ্ণ বেশ্যা-শুদ্ধি সমিতি বা Prostitute Reformation Society খুলেছে। তাঁর কথায়, 'বেশ্যা চিরকাল যদি বেশ্যার মত থাকবে, তবে আমরা জন্মেছি কি জন্য?... এমনকি তাতে কুলীন বেশ্যাদের কুলীন ঘরে বে দেওয়ার নিয়মও বিধিবদ্ধ হবে।'

সেইমত স্কুলের দারোয়ানকে ঘুষ দিয়ে তারই ঘরে রামকৃষ্ণ স্বয়ংম্বর সভার আয়োজন করে। দারোয়ান চেয়ার এনে দিয়েছে। ঝি এনেছে মালা। পাত্র দু'জন— রমেন্দ্রকৃষ্ণ এবং তাঁর ইয়ার বন্ধু চারু। কিন্তু বিনোদ বেশ্যা রামকৃষ্ণের গলায় মালা পরাতে গর্বিত, তৃপ্ত রামেন্দ্রসুন্দর বলেছে,— 'এতদিনে আমার আত্মা পবিত্র হলো! Life-এর Value বাড়ল, লেখাপড়া শেখা সার্থক হল। ... এতদিনে আমার father-grand father, অধিক কি, চোদ্দ পুরুষ বিনা পিণ্ডদানে স্বর্গের দ্বারে উপস্থিত হল।' অতঃপর দরিদ্র বাবার দেশ থেকে পাঠানো টাকায় বিনোদ বেশ্যাকে নিয়ে রামকৃষ্ণের বাবুগিরি চলে রাতদিন।

এদিকে রামকৃষ্ণের মায়ের অসুখের খবর এলেও রামকৃষ্ণ কোনো জবাব দেয় না। রামহরি ছেলের প্রতি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ছুটে আসেন কলকাতা। দ্যাখেন চশমা এঁটে, চুরুট মুখে রামকৃষ্ণ তখন ঘোরতরো সাহেব-বাবু। প্রথমে চিনতে না পারলেও পরে নিজের সন্তানকে চিনতে পেরে অবাক হয়, 'অ বাপ তুমি এমন হইচ।' রামকৃষ্ণ অবশ্য গ্রাম্য অশিক্ষিত পিতাকে চিনতে চায় না। দারোয়ান ডেকে বার করে দিতে চায়। ক্রুদ্ধ রামহরি বলেছে, 'কি বুলিস্? পাহারালা নি বারা করে দেওন চাস? ফুটানি হচে? ওহানে কোষ্টা কাটনে পা টা ফুল্‌চে, এহানে সেই ট্যায়ায় লবাব হচিস্? আবার মারণ চাস? এ কি ধরম্?' বন্ধুরা এই 'insolent fellow' -র পরিচয় জানতে চাইলে রামকৃষ্ণ অম্লানবদনে পিতার সম্বন্ধে বলেছে— 'One of our family Servants'.

বহুবিবাহের ঘোরতর বিরোধী হলেও রামকৃষ্ণ বিনোদ-বেশ্যাকে divorce -এর কথা বলতে সাহস পায় না, আবার ঘটককেও ফেরাতে পারে না। কারণ ঘটকের মনোনীত পাত্রীকে বিয়ে করলে মোট ৬০০ টাকা কন্যাপণ পাওয়া যাবে। অতএব রামকৃষ্ণ সেই বিয়েতে মত দিয়েছে এবং নতুন বিয়ে করার যুক্তি দেখিয়ে বলেছে, তার পূর্বতন পত্রী (বিনোদ বেশ্যা) রবিবারে তার সঙ্গে সমাজে যেত। হৃদয়ে আলোক প্রবেশ করায় এক 'ভ্রাতা'র সঙ্গে তার প্রণয় হয়েছে। বিনোদ পরে সব জানতে পেরে অনুযোগ করলে রামকৃষ্ণ তাকে আশ্বস্ত করেছে, আখেরে লাভ হবে বলে।

অতএব যদুবাবুর মেয়ে বিনোদিনীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়ে যায়। কিন্তু নিজেকে উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের বলে দাবি জানালেও কিছুদিন পরে রামহরির লেখা একখানা চিঠি রামকৃষ্ণের শালী উচ্চকণ্ঠে পাঠ করলে রামকৃষ্ণের আসল স্বরূপ সকলে বুঝতে পারে। ক্ষুব্ধ রামকৃষ্ণ ভাঙে তবু মচকায় না। সে পদাঘাত করে স্ত্রীকে, তারপর বেরিয়ে যায়। অনেকদিন পর দুজনের পুনর্মিলন হয়। দুজনেই দুজনের ভুল বুঝতে পারে।

এই কাহিনির শেষাংশের মিলন আরোপিত তা বোঝাই যায়। কিন্তু বাকি অংশের বাস্তবতা সন্দেহের অবকাশ রাখে না। উনিশ শতকের শেষদিনের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের সভা-সমিতি প্রীতি, সমাজসেবা বিশেষ নারীমূলক আন্দোলনে উৎসাহ, ব্রাহ্মধর্মের সামন্বয়িক সংস্কার 'ফোতোবাবু' রামকৃষ্ণের মধ্যেও দেখা গেছে। এই গুণগুলি অর্জন না করলে উনিশ শতকের শেষপাদে আর 'বাবু'র 'বাবুত্ব'কে চেনা যাবে না। অতএব বেশ্যাপ্রীতি, মদ্যাসক্তির পাশাপাশি নতুন যুগের বাবুত্বের লক্ষণগুলিও বেশ ঠাঁই করে

নিয়েছে পাশাপাশি। উল্লেখযোগ্য যে, আখ্যাপত্র বিনষ্ট বটতলার একটি পুস্তিকা 'পুরুনজরে' দেখা মেলে খুদাবক্স নামে রহমনপুরের এক যুবকের। যে দরিদ্র বিধবা মা, যিনি তাকে অন্যের বাড়ি ধান ভেনে ও দাসীবৃত্তি করে মুনশির কাছে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, খুদাবক্স সেই মা ও বিবাহিতা স্ত্রীকে অবহেলা করে কলকাতায় পড়ে থাকে। জনৈক ধনী ব্যক্তির দোকানে কাজ করে সে। মদ্যপান করে, খারাপ পাড়ায় যায়, বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেয়। তার দোস্ত গাজি তাকে পাপের পথ চেনায়। নূরবিবিকে সে রক্ষিতা রাখে। শেষে খরচ কুলাতে না পেরে মনিবের দোকানে চুরি করে এবং ধরা পড়লে মনিব তাকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেন। কর্পদকহীন খুদাবক্সকে নূরবিবিও গলাধাক্কা দিয়েছে। অতঃপর দেশে ফিরে গিয়ে খুদাবক্স দেখে, তার মা মারা গিয়েছেন এবং বিবি অন্য একজনকে বিয়ে করে সুখে ঘর-সংসার করছে। কাহিনির মধ্যে বৈচিত্র্য নেই। কিন্তু বাবুয়ানা, তা যে গোত্রেরই হোক না কেন, হিন্দু বাঙালি পুরুষের আওতা ছেড়ে সে যে মুসলমান নবীন যুবকদের মধ্যেও প্রবেশ করেছে এ সত্যটা স্পষ্ট বোঝা যায়। বাবুত্ব ধর্মাধর্ম নির্বিশেষে বাঙালি পুরুষের সাধারণ ধর্ম হয়ে উঠেছে দেখা যাচ্ছে।

সাধারণভাবে 'ফোতোবাবু'দের নিয়ে লেখা প্রহসনগুলির একটি সাধারণ লক্ষণ আছে। সেগুলি এরকম—

ক) দরিদ্র অথবা হৃতদরিদ্র ঘরের সন্তানের উচ্চশিক্ষার্থে কলকাতা গমন এবং বাবুয়ানার লক্ষণগুলি আয়ত্ত করা;

খ) বেশ্যাসক্তি, মদ্যপান, পোশাক-আশাক জনিত বিলাসিতার সঙ্গে সভা-সমিতি, পলিটিক্স সম্পর্কেও আগ্রহ;

গ) অর্থনৈতিক দিক থেকে দীন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরানুগৃহীত অথচ বাবুয়ানার শখ পুরোমাত্রায়;

ঘ) একটি বা দুটি মোসাহেব, যে প্রায়শই 'ফোতোবাবু'র বন্ধু বা বন্ধুস্থানীয়, তারাই বাবুর পরামর্শদাতা ও সঙ্গী;

ঙ) টাইটেল-খেতাব প্রভৃতির প্রতি মোহ বা আকর্ষণে সর্বস্বান্ত হওয়া;

চ) নতুন শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতির পরিবেশে থেকে, বাবুগিরি করে, পূর্বতন শ্রেণিগত অবস্থান ও সংস্কৃতিকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। অনেকেই পিতা-মাতা বংশপরিচয় স্বীকার করতে অস্বীকার করেছে।

ছ) হঠাৎবাবুদের মতো মূর্খ এবং অশিক্ষিত নয় বলে, ফোতোবাবুদের শিক্ষার অহংকার থাকে; সেইসঙ্গেই অনেক বেশি ধূর্ত-চালাক ও খল-স্বভাবের হয়ে থাকে।

বটতলা থেকে প্রকাশিত অজস্র প্রহসনে ফোতোবাবুদের চেহারা চরিত্র ফুটে উঠেছে মোটামুটিভাবে উপরের আদল অনুসরণ করে। এর বাইরেও ব্যতিক্রমী লক্ষণ আছে বা থাকা সম্ভব। 'ফোতো নবাবি' করতে গিয়ে অনেকে আর্থিক সামর্থ্যের অভাবে চুরি বা প্রতারণার কাজও করত। অজ্ঞাত লেখকের 'ফোতো নবাবি'তে শ্যালক ও ভগ্নিপতি— বাদশামোহন ও নবাবচাঁদ অর্থ সামর্থ্য না থাকলেও বাইরে 'নবাবি চাল' দেখায়। পেট চালানোর জন্য লুকিয়ে রাঁধুনিগিরি কিংবা চুরিচামারি করে থাকে তারা। সুরেন্দ্রনাথ বসু'র 'কর্মকর্তা' প্রহসনে (১৮৮২) নিজের বাবুয়ানা জাহির করতে আহ্লাদ মাতৃশ্রাদ্ধের বিরাট ঘটা করে ধারকর্জ করে। শেষে পাওনাদারদের ঠেলায় তাকে লুকিয়ে থাকতে হয়। দুর্গাদাস দে'র 'ল-বাবু' প্রহসনে (১৮৯৮) টাইটেলের লোভে ন-বাবু টুনিরামের অধঃপতন ঘটেছে। স্ত্রীকে দিয়ে সে মজলিশ বসিয়েছে, কারণ তার দরুন টাইটেল লাভের পথ সুগম হবে। এভাবেই ফোতোবাবুরা ক্রমশ উনিশ শতকের শেষপাদের জনপ্রিয়

সাহিত্যে ধরা পড়েছিলেন। সাহিত্যমূল্য নিতান্ত তুচ্ছ হলেও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নে, সর্বোপরি সমাজগত চিত্রে এগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করবার উপায় নেই।

**(গ) কাপ্তেনবাবু** : 'কাপ্তান' বা 'কাপ্তেন' শব্দটি এসেছে ইংরেজি শব্দ Captain থেকে। জাহাজের কাপ্তেন যেসমন জাহাজ সহ বাকি জাহাজিদের পরিচালনা করেন, তেমনি কাজি আবদুল ওদুদের 'ব্যবহারিক শব্দকোষে'র মতে, 'নীচ আমোদপ্রমোদে সাথীদের খরচ জোগায় এমন ধনী বিলাসী' অথবা 'নিন্দিত বিষয়ে নিপুণ ও নেতৃত্বস্থানীয়' বাবু।[৫৪] হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য 'কাপ্তেনবাবু' বলতে দলের প্রধান ও ধনী ব্যক্তি বুঝিয়েছেন।[৫৫] প্যারিচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলালে' মতিলালের স্বভাব বদলে গেলে তার এক সুযোগসন্ধানী মোসাহেব গদাধর 'অন্য কাপ্তেনবাবু'র খোঁজ করতে শুরু করেছে দেখা যায়। হঠাৎবাবু কিংবা ফোতোবাবুদের নিজেদের স্বভাবের মধ্যেই বাবুয়ানার বীজ থাকে, মোসাহেবের চেষ্টায় তা দ্বিগুণ ফলবতী হয় মাত্র। কিন্তু কাপ্তেনবাবুরা অনেকাংশেই মোসাহেবের দ্বারা পরিচালিত, নিয়ন্ত্রিত। উনিশ শতকের শেষ দিকে অর্থসংক্রমের ফলে, 'কাপ্তেনবাবু'র অর্থ দাঁড়িয়েছে, ধনীর নাবালক পুত্র যে মোসাহেব ও অন্যান্য কারণে বয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ ভ্রষ্ট-চরিত্র নাবালক ধনী যুবা বা বালককে আমরা কাপ্তেনবাবু বলতে পারি। জনৈক সমালোচনাকের মতে, '... যেমন প্রফুল্ল সরোবরে পদ্ম ফুটলে ভ্রমরগুলো এসে গুন্ গুন্ করে, মধুর কলসি ভেঙ্গে গেলে মাছিগুলো এসে ভ্যান্ ভ্যান্ করে, বসন্তের উদয় হলে কোকিলগুলো এসে কুহু কুহু করে, আপিস অঞ্চলে একটা চাকরি খালি হলে, চারিদিক থেকে উমেদার এসে ভেড়ে, আর গো-ভাগাড়ে গরু পড়লে যেমন শকুনির টনক নড়ে, তেমনি বাজারে একটা কাপ্তেন বেরুলে মোসাহেবগুলো যেন কোথা থেকে হামড়ে পড়ে।... অমনি মায়ে মারা, বাপে খ্যাদান, হাড়হাবাতে উন্ পাঁজুরে, বরাঘুরে প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় মোসাহেব মহোদয়গণ চারিদিক থেকে এসে ধাঁ করে বাবুকে ঘিরে বসলো... সে ব্যূহ ভেদ করে বালকের প্রাণ রক্ষা করে, কাহার সাধ্য?'[৫৬] ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নকশা 'নববাবুবিলাস' মূলত এইরকমই এক কাপ্তেনবাবুর (পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত) কথা। নাবালক ধনীর পুত্রকে মিষ্ট কথায় কুপথে পরিচালিত করাই ছিল মোসাহেবদের কাজ। তার ফলে, উক্ত ধূর্ত মোসাহেবরা নিজেদের ইচ্ছেমত অর্থ ব্যয় করাতে সক্ষম হত, নিজের ঘুরপথে অর্থ সঞ্চয় হত এবং বাবুর টাকাতে নিজেরও বিলাসিতা, আমোদ, আহ্লাদ করা হত। অনেকসময় নাবালক বলে সম্পত্তি হাতে না এলে মোসাহেবরা হ্যান্ডনোটে টাকা পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করত, নাবালক 'কাপ্তেন বাবু' সাবালক হলে তাঁর টাকা শোধ করতেন। সাধারণভাবে মহাজন নিশ্চিন্ত থাকতেন যে, সাবালক হলেই 'কাপ্তেনবাবু'রা বিষয়-আশয়ের সমস্ত কর্তৃত্ব লাভ করবেন; তখন বড়ো দাঁও মারবার আশায় অধিক অর্থ কর্জ হিসাবে দিয়ে অনেকসময়ই সাবালকত্ব প্রাপ্ত হওয়া 'কাপ্তেনবাবু'র সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করা হত। সেইসঙ্গে ঘড়ি, আংটি, চেন ইত্যাদি বিক্রয় করে বা বন্ধক দিয়েও 'কাপ্তেনবাবু' বিলাসিতা ও বাবুয়ানার অর্থ জোগাড় করতেন।

বস্তুত 'কাপ্তেনবাবুরা' ছিলেন মোসাহেবদের হাতের ক্রীড়ানক মাত্র। অন্যান্য বাবুদের ক্ষেত্রে বাবুর ইচ্ছাকে মোসাহেবেরা ফলবৎ করে তুলতে সচেষ্ট হত; কিন্তু 'কাপ্তেনবাবু' মোসাহেবের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতেন বা মোসাহের ইচ্ছেকেই বলবৎ করার দিকে তাঁর প্রযত্ন থাকে। নাবালক হোন বা সাবালক, 'কাপ্তেনবাবু' আসলে মোসাহেবের অনুবর্তী। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 'আপনার মুখ আপুনি দেখ'তে (১৮৬৫) এঁদের সম্পর্কে বলেছেন, 'ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগকে নিঃস্ব করিতে কিংবা বিপদে ফেলিতে এই জানোয়ারেরাই মূল কারণ। কত কত ধনাঢ্য ব্যক্তি যে তাহারদিগের বুদ্ধিবশতঃ মনুষ্য নামের অযোগ্য

হইয়াছেন তাহা পাঠক মহাশয়েরা স্মরণ করিলেই জানিতে পারিবেন। দুগ্ধ কলা দিয়ে কালসর্প পুষিলে যেমন ফল লাভ হবে, তাহাদিগকে প্রতিপালন করাও সেইরূপ জানিবে। এমত অনেক দেখা গিয়েছে যে, এই অন্নদাস জানোয়ারেরা অনেকের অন্ন ধ্বংস কোরে শেষে অন্নদাতার এমত অনিষ্টসাধন করিয়াছে যে তাঁহার প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়িয়াছে।'[৫৭]

তবে অন্যান্য দিক দিয়ে হঠাৎবাবু কিংবা ফোতোবাবুর সঙ্গে 'কাপ্তেনবাবু'র বৈসাদৃশ্য ছিল না। এঁরাও ছিলেন বেশ্যাসক্ত এবং মদ্যপ। আপন ইন্দ্রিয় পরিতুষ্ট হবে, এমন শখ বা বিলাসিতার প্রতিই ছিল এঁদের টান। নববাবু কিংবা নব্যবাবুদের মতো এঁদের সঙ্গে সামাজিক উন্নতিবিধানের কোনো যোগ ছিল না। নববাবুরা নাম-যশ অর্জনের জন্য নিজব্যয়ে সড়ক নির্মাণ, ঘাট স্থাপন, দেবালয় সংস্কার, দেব-দ্বিজ দুঃখী মানুষকে সাহায্য করতেন; নব্যবাবুরা সার্বিক সামাজিক সংস্কারের প্রত্যাশায় নানা ধরনের গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু উনিশ শতকের শেষদিকের বাবুরা ব্যক্তিগত সুখভোগকেই মুখ্য করলেন এবং তারই ফলে বৃহত্তর জনসমাজ থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। প্রহসনের উদ্দিষ্ট বাবুরা সার্বিকভাবেই আত্মগত ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনাতেই উন্মুখ। কেউ কেউ খেতাব বা টাইটেল লাভের জন্য সভা-সমিতিতে দান বা সামান্য জনকল্যাণের কাজ করলেও, আদতে তা ছিল ভাবী মুনাফার জন্য লগ্নি। আর এ কারণেই বাবুদের এ জাতীয় কাজ জনমানসে শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেনি। প্রহসনকারদের রচনাতে এই সাক্ষ্য মেলে যে, এ জাতীয় কল্যাণমূলক কাজ (আদতে যা ছিল বড়ো কিছু দাঁও মারার লক্ষ্যে) সংখ্যায় সুপ্রচুরও ছিল না। বাবুগিরির বেশির ভাগটিই ছিল ব্যক্তিক আনন্দের লক্ষ্যে। উনিশ শতকের প্রথমদিকের বাবুদের সঙ্গে হঠাৎবাবু, ফোতোবাবু কিংবা কাপ্তেনবাবুদের একটি বড়ো পার্থক্য এখানেই ঘটে গেছে। দীনবন্ধু মিত্রের মতো কেউ কেউ 'সধবার একাদশী'তে নিমচাঁদের মতো কাপ্তেন ধরা মোসাহেবের মহত্তর শিক্ষা ও অনুভূতির রূপটাকে দেখিয়েছেন কিংবা ওই জাতীয় চরিত্রের বেদনাবহ পতনকে চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বলতে হবে, নিমচাঁদ উনিশ শতকের বাবু-প্রবাহের নিছকই ব্যতিক্রম মাত্র। সমাজে এ জাতীয় চরিত্র নিতান্ত দুর্লভ ছিল। কিন্তু অটল, ভোলা বা কেনারামের চরিত্র ছিল অত্যন্ত সুলভ। সংস্কার হিসাবে মদ্যপান এবং জৈবিক তাগিদ থেকে বিকৃতপূর্ণ বেশ্যাবাজি বাবু সমাজের নতুন প্রজন্মও গ্রহণ করেছিল। শিক্ষার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে নৈতিক চারিত্রিক কোনোদিক থেকেই সম্পূর্ণ বিকৃতিমুক্ত হওয়া সম্ভব হয়নি, বরং শতক শেষের মুখেও এ জাতীয় বিকৃতি, অনাচার, লাম্পট্য, সার্বজনীন চরিত্র হিসাবে সমাজে ক্রমশই বিস্তৃত বিকশিত হচ্ছিল, উনিশ শতকের প্রহসনে ভিড় জমানো বাবুদের দল তার প্রমাণ। 'কাপ্তেনবাবু' এই বৃহত্তর দলেরই একটি অভিমুখ।

এখন কাপ্তেনবাবুদের প্রসঙ্গ সম্বলিত দু'একটি প্রহসন আলোচনা করা যেতে পারে।—

**সধবার একাদশী** ॥ তথাকথিত মূল ধারার নাটক প্রহসনে বাবুকেন্দ্রিক সর্বশ্রেষ্ঠ রচনাটি হল দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'। ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত এই নাটকটি নাট্যকারের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে অনেকেই স্বীকার করে নিয়েছেন।[৫৮] প্রত্যক্ষ সমাজ বাস্তবকে বিন্দুমাত্র বিকৃত না করেও যে সাহিত্যমূল্যে একটি নাটক শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে উন্নীত হতে পারে, 'সধবার একাদশী' তার অন্যতম উদাহরণ। নাটকে কাপ্তেনবাবু অটলের মোসাহেব নিমচাঁদ চরিত্রটি বাংলা নাটকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নির্মাণ। এই চরিত্রের পশ্চাতে মাইকেল মধুসূদনের ছায়াপাত আছে বলে মনে করা হয়। যদিও নিমচাঁদের মতো শিক্ষিত, বিদ্বান, অনুভূতিসম্পন্ন মোসাহেব সমাজে কম হলেও নিতান্ত দুর্লভ ছিল না। নাট্যকার পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্র এই নাটকের পিছনে সমকালীন সমাজের প্রেরণার কথা উল্লেখ করেছেন :

'... দেশের তদানীন্তন শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর দুঃখে কাতর হইয়া (দীনবন্ধু মিত্র) 'সধবার একাদশী' রচনা করেন। শিক্ষিত সমাজ যখন ইংরাজী শিক্ষার বাহ্য চাক্‌চিক্যে বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়াছিল, আমার পিতৃদেব সেইসময় হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। ... কলেজের ছাত্রগণ অনেকেই তখন স্থির, শান্ত, স্বাভাবিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া, উচ্ছৃঙ্খলার তাণ্ডব নৃত্যে মগ্ন হইয়াছিল। ... মদিরা-রাক্ষসীর প্রভাব শিক্ষিত যুবকবৃন্দের উপর অপ্রতিহত আধিপত্য করিতেছিল। মদ না-খাওয়া যেন শিক্ষার অভাব বলিয়া পরিগণিত হইত। স্বদেশ-হিতৈষী বাগ্মীপ্রবর রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের এক ভাগিনেয় সুশিক্ষিত হইয়া কলেজ হইতে বাহির হয়েন। তিনি মদ্যপান করিতেন না শুনিয়াছি, ঘোষ মহাশয় তাঁহাকে বলিতেন, ''তুই মদ খেতে শিখিলি না, তোকে আমি সমাজে বার করিব কি করিয়া?'' ইহারই যেন প্রতিধ্বনি করিয়া নিমচাঁদ বলিয়াছে, ''বেটা কলেজের নাম ডোবাইল, মদ খায় না।'' শিক্ষিত সমাজের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই মর্মাহত হইয়াছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় প্যারিচরণ সরকার প্রমুখ দেশানুরাগীগণ সেইসময়ে ''সুরাপান নিবারণী সভা'' স্থাপন করিয়া মদিরার স্রোত রোধ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

'তদানীন্তন সমাজের দুর্দ্দশা দেখিয়া পিতৃদেবের হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল। বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতির জন্য এবং ভবিষ্যৎ অমঙ্গল নিবারণের জন্য তিনি সাহিত্যের আশ্রয় লইলেন। এই অধঃপতনের নিখুঁত চিত্র সমাজের সমীপে উপস্থিত করিলে কল্যাণ হইবে, এই আশায় আবার লেখনী ধরিলেন। শরীরে গলিত গন্ধময় ক্ষতস্থান দেখিলে লোকে যেমন শিহরিয়া উঠে এবং তাহার প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করে, সমাজশরীরে ক্ষতস্থান দেখাইয়া তাহাকে সচেতন করিবার জন্য তাই দীনবন্ধু শিক্ষিতমণ্ডলীর করে দ্বিতীয় দর্পণ অর্পণ করিলেন। সেই দর্পণ ''সধবার একাদশী''।'[৫৯]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গোড়া থেকেই মদ্যপানের বিরুদ্ধে দেশীয় সংবাদপত্রগুলি জনমত সংগঠিত করতে থাকে। নব্যবাবুদের মদ্যপান-সংস্কার তখন হিন্দু কলেজের অধিকাংশ ছাত্রকেই গ্রাস করেছিল এবং ক্রমেই তা মহামারীর ন্যায় শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত বাবুদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মদ্যপানের বিরুদ্ধে সরব হন এবং কলম ধরেন। এরই মধ্যে ডেভিড হেয়ার সাহেবের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় প্যারিচরণ সরকার ১৮৬৩ সালের ১৫ নভেম্বর ৪৫ নম্বর মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটের স্কুল বুক প্রেসে মদ্যপান বিরোধী একটি সভা আহ্বান করেন এবং এই সভাতেই বহু গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা একজোট হয়ে Bengal Temperance Society বা বঙ্গীয় সুরাপান নিবারণী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলায় মদ্যপানের প্রসারতা প্রতিরোধ কিছুকাল এই সভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচরিতে' বলেছেন, 'তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে, মদ্যপান করা সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই। তখনকার কলেজের ছোকরারা মদ্যপায়ী ছিলেন বটে, কিন্তু বেশ্যাসক্ত ছিলেন না। তাঁহাদিগের এক পুরুষ পূর্বে যুবকেরা মদ্যপান করিত না— কিন্তু অত্যন্ত বেশ্যাসক্ত ছিল।'[৬০] উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি থেকেই মদ্যপানের ব্যাপকতার সঙ্গে সঙ্গে বেশ্যাগিরিটির প্রকোপও বাড়তে থাকে আবার। 'সধবার একাদশী'তেও আমরা কাপ্তেনবাবু অটলকে মদ এবং বেশ্যা— উভয়ের প্রতিই আকৃষ্ট হতে দেখি পুরোদমে। এবং তাকে প্ররোচিত করে নিজের অপরিমিত মদ্যাসক্তির পরিতৃপ্তি ঘটিয়েছে শিক্ষিত সদ্বংশীয় ভ্রষ্টচরিত্র যুবক নিমচাঁদ।

অটলবিহারী বিত্তবান জীবনচন্দ্রের একমাত্র ছেলে। আদুরে, বকাটে এই ছেলেটির শিক্ষাগত যোগ্যতা বলতে গৌরমোহন আঢ্যির স্কুলে 'দিন দুই একখান বয়ের পাতা' উলটানো এবং ডেভিড হেয়ার সাহেবের

স্কুলে মাসকতক পড়া। তাতেই তিনি বেশ লায়েক হয়ে উঠেছেন। আগে অবশ্য বয়সোচিত দুষ্টুবুদ্ধি থাকলেও মদ্যপান বা বেশ্যাগমনের প্রতি তাঁর মনোযোগ ছিল না। কিন্তু তার ইয়ারদোস্ত কাম মোসাহেব নিমচাঁদের পাল্লায় পড়ার পর থেকে ধীরে ধীরে অটল ওই দু'টি নেশাতেই বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছে। সেইসঙ্গেই জুটেছে বয়স্য নকুলেশ্বর, ভোলা, রামমাণিক্য এবং ডেপুটি বাবু কেনারাম। বেচারাম আপাতত মদ খায় না। অটলেরও প্রথম প্রথম ভয় ছিল যে, মদ্যপান অতি গর্হিত কাজ, ফলে বাবা রাগ করবেন। সে নিমচাঁদকে বলেছে, 'নিমচাঁদ তোর পায়ে পড়ি আমায় আর দিস্ নে— বাবা যদি জানতে পারেন আমি মদ খেইচি তিনি গলায় দড়ি দেবেন।' (১/১) অবশ্য পরে, নকুলবাবুর অনুরোধে 'মডারেটলি খাওয়ায় কোনো অপরাধ থাকে না' বলে, নিমচাঁদের অনুরোধে 'বন্ধুর অনুরোধ ভেবে', বেশ্যা কাঞ্চনের অনুরোধে অটল মদ খেয়েছে। এবং ক্রমেই সে এ জাতীয় বিলাসব্যসনে গা ভাসিয়ে দিয়েছে।

জীবনচন্দ্র এবং গোকুল বাবুর কথোপকথনে জানা যায় (২/১) দুই তিন মাসে অটল তিরিশ হাজার টাকা মদ ও মেয়েমানুষের পিছনে উড়িয়ে দিয়েছে। এর পিছনে যেমন নিমচাঁদের প্ররোচনা রয়েছে, তেমনি অটলের মায়ের ভূমিকাও কম নয়। দীনবন্ধু দেখিয়েছেন, বাবুগিরি রোগটির একটি অন্যতম কারণ অন্ধ মাতৃস্নেহ। তাঁর জন্যই জীবনচন্দ্র পুত্রকে শাসন করতে পারেন না। তাঁর কথায়— 'ছেলেকে শাসিত কল্যে তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেন— তারই বা অপরাধ দেব কি, যে সুবোধ ছেলে স্বচ্ছন্দে আত্মহত্যা কত্তে পারে, কাজেই ছেলেরে কিছু বলতে দেয় না।' (১/২) অটল বেশ্যা কাঞ্চনকে বাড়ির বৈঠকখানায় আনলে অটলের বড়ো কাকা কাঞ্চনকে বাড়ি থেকে বার করে দিলে অটল রাগে 'সাপের মতো গজরাতে' লেগেছে এবং অকথ্য-কুকথ্য ভাষায় কাকাকে গালিগালাজ করেছে। অটল বন্দুক বার করে আত্মহত্যা করবার ভয় দেখালে অটলের মায়ের জেদে জীবনচন্দ্র কাঞ্চন বেশ্যাকে পায়ে হাতে ধরে আবার ঘরে নিয়ে আসেন। কাঞ্চনকে অটলের মা হাত ধরে বলেছেন, 'মা, তোমার হাতে ছেলে সঁপে দিলেম, দেখ বাছা, যেন আমি গোপালহারা হই নে।'

মায়ের এই দুর্বলতার পরিপূর্ণ সুযোগ অটল নিয়েছে। সে যা খুশি করে বেড়ায়, কারোর কিছু বলবার জো নেই। বললেই, সে আত্মহত্যার ভয় দেখায় তখন মায়ের চাপে কান্নায় জেদাজেদিতে তার সব আবদার অন্যায় 'মঞ্জুর' হয়ে যায়। এমনকী মা'র কাছ থেকে জোর করে 'দশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ' সে নিয়ে গেছে তার ফুর্তির ব্যয় হিসাবে। ওই টাকা দিয়ে সে কাঞ্চনের গয়না কিনে দিয়েছে, তার ঘর সাজিয়ে দিয়েছে। নিমচাঁদ তাকে প্ররোচিত করেছে। প্রথম দিকে কাঞ্চনকে রক্ষিতা হিসাবে রাখতে অটলের একটু দ্বিধা ছিল, কারণ, 'কাঞ্চন তিনশ টাকা মাসোয়ারা চায়।' শুনে নিমচাঁদ বলেছে, 'তুচ্ছ কথা — তোমার বাবা যে বিষয় করেচেন, অমন বিষয় আমার থাকলে, আমি কাঞ্চনের গর্ভধারিণীকে রাখতেম।' (১/১) নকুলেশ্বরকে জনান্তিকে নিমচাঁদ অবশ্য বলেছে, 'কিছু বল না বাবা, ওর বাপ অনেকের সর্বনাশ করে বিষয় করেছে, টাকাগুলো সৎকর্মে ব্যয় হোক্— তুমি দেখ্‌বে এক হপ্তার মধ্যে অটল টল্ টল্ কচ্চেন।' (১/১)

অটলের বিবাহিতা পত্নী কুমুদিনী শিক্ষিতা মেয়ে। সে এই অনাদরের অবহেলার জীবনের চেয়ে 'বৈধব্য' কামনা করে। অটলের শিক্ষাদীক্ষা, আচার-আচরণের প্রতি তার বিবমিষা মিশ্রিত ঘৃণা আছে। নিতান্ত স্বামী বলে সে কোনোরকমে আছে, তবে সুযোগ পেলেই অটলের বোন সৌদামিনীকে দু'চার কথা স্পষ্ট বলতে তার বাধে না। সৌদামিনীও বৌদির দুঃখে ব্যথিত। দাদার বেশ্যাগিরি, মদ্যপান ইত্যাদিকে সেও ঘৃণা করে।

অটলের চরিত্রও ভালো নয়। কুমুদিনীর কথায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় (২/১), সম্পর্কে ভাই-বোন কিংবা নিকটাত্মীয় হলেও অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনে অটল পিছপা নয়। মনে রাখতে হবে, মধুসূদন 'একেই কী বলে সভ্যতা?'য় ঠিক একই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন আরও স্পষ্টভাবে। সেকালের বটতলার কাহিনিতে 'এই এক গুপ্তকথা!!'-য় আদি সংস্করণে এ জাতীয় নিষিদ্ধ সম্পর্কের সুপ্রচুর ইঙ্গিত আছে। নতুন কালের কাপ্তেন বাবু অটল সেই সব গুণই আয়ত্ত করেছে ভালোমতো।

অটলের দেদার বেহিসাবি খরচ ক্রমে ক্রমে আরও ইয়ারদোস্ত জুটিয়ে ফেলেছে। অটলের খাস চাকর দামার কথায়, 'বোকা বাবুর কাছে নইলে চাকরি পোষায়? কত জিনিস ভাংচি, কত জিনিস চুরি কচ্চি, বাবুর হিসেবও নেই, কিতেবও নেই।... আমার ভাবনা কি, বাবু যে মদ ধরেচেন, কোটা বালাখানা করে ফেলবো।' (২/২) মুক্তেশ্বর বাবুর জামাই ভোলা ইংরেজি ছাড়া কথা কয় না। পেটে বিদ্যে তেমন নেই, কেবল কিছু শব্দ সাজিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করেন। অটলের নরক গুলজারের আড্ডায় সে জুটে গেছে। নিমচাঁদের পর্যবেক্ষণে এই বাবুটির (যে আদতে 'ফোতোবাবু', শ্বশুরের অর্থে বাবুয়ানা চলে) চেহারা-চরিত্রের বর্ণনা স্পষ্ট হয়; পেটে বিদ্যে তথৈব চ হলেও, 'তুমি বাবু যে বাহার দিয়ে এসেচ মাতার মাঝখানে সিতে, গায়ে নিনুর হাফ্ চাপকান, গলায় বিলাতি ঢাকাই চাদর, বিদ্যাসাগর পেড়ে ধুতি পরা, গরমিকালে হোল মোজা পায়ে, তাতে আবার ফুলকাটা গার্টার্, জুতাজোড়াটি বোধ হয় পথে আসতে কিনেচো, ফিতের বদলে রূপার বগ্‌লস, হাতে হাড়ের হ্যান্ডেল বেতের ছড়ি, আঙ্গুলে দুটি আংটি—'। বাঙাল রামমাণিক্য এসে জুটেছে। সে কাঠ-বাঙাল, দেশে থাকতে ধেনো খেত; অটলের আড্ডায় ব্র্যান্ডি গেলাসে দিতে বললে সে বলেছে, 'বান্ডিল (ব্র্যান্ডি) খাইমু তো বতোল চিবায়ে খাইমু।... দ্যাহো দ্যাহো, বতোলে কি কিছু রাকচি— হুক্ না।'

অটলকে অশিক্ষিত বললেই হয়। তবু বিদ্যে জাহির করার জন্য সে 'মেঘনাদবধ' কিনেছে। নিমচাঁদ তা পড়বে বলায় অটল জানিয়েছে যে, বইটা তার তেমন 'ভালো বোধ হয় না।' নিমচাঁদের প্রত্যুত্তরে অটলের পারিবারিক শিক্ষার চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে যায়— 'ওর ভালো-মন্দ তুমি বুঝ্‌বে কি, তুমি পড়েছ দাতাকর্ণ, তোমার বাপ পড়েছে দাশরথি, তোমার ঠাকুরদাদা পড়েছে কাশীদাস। তোমার হাতে মেঘনাদ, কাটুরের হাতে মাণিক—।' (৩/৩) অটলকে লুকিয়ে কাঞ্চন উকিল নকুলেশ্বরের বাগানবাড়িতে গেছে। তাতে অটল শিশুদের মতো কাঁদতে লেগেছে। বার বার কাঞ্চনকে জবাবদিহি চেয়েছে। কাঞ্চনের সাফ যুক্তি, 'আমি তো আর তোর ঘরের মাগ নই যে, বাগানে গিইচি বলে তোর মুখ হেঁট হবে।' অটল নির্দ্ধিধায় বলেছে, 'ঘরের মাগ বেরয়ে গেলেও আমার মুখ হেঁট হয় না', কিন্তু রক্ষিতা অন্যের বাগানবাড়িতে গেলে তার মাথা অপমানে হেঁট হয়ে যায়। যথার্থ 'কাপ্তেনবাবু'র মতোই কথা বটে।

কাঞ্চনের এ হেন আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে অটল প্রথমে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। তারপর জ্ঞান ফিরে পেয়ে কাঞ্চনকে শিক্ষা দেবার জন্য অটল তাকে পরিত্যাগ করে 'ঘরের মাগ বেরয়ে আনতে' চায়। তার নজর গিয়ে পড়েছে কাকাশ্বশুর গোকুলচন্দ্রের বিদুষী স্ত্রীর প্রতি। সে নিমচাঁদ ও এক হিজড়েকে পাঠিয়েছে তাকে বের করে আনবার জন্য। নিমচাঁদ প্রথমে রাজি হয়নি। কারণ সে মাতাল হলেও 'ভদ্রলোক'। পরের ঘরের মেয়ে বার করে আনাতে তার আপত্তি আছে। অটল তার কথায় কান দেয়নি। সে আবার মদ্যপান করে আর একবার কাঞ্চনের কাছে যেতে চেয়েছে। কাঞ্চন যদি রাগ করে থাকে, তবে তার মাসোহারা আরও একশো টাকা বাড়িয়ে দেবার কথা বলেছে সে। শুনে নিমচাঁদ মন্তব্য করেছে, 'ঘটিরাম ডেপুটি পাঁচ বৎসরে

এক গ্রেড্ বাড়াতে পেলে না, তুই মাস কতকের মধ্যে ফোর্ত গ্রেড্ করে দিলি, তোর সার্ভিসে প্রোমোশন বড় র্যাপিড্।' (৩/২) শেষপর্যন্ত অবশ্য অটলের পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। হিজড়ে ভুল করে গোকুলচন্দ্রের পত্নী ভেবে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে অটলেরই ধর্মপত্নী কুমুদিনীকে তুলে নিয়ে আসে, অটল মাতৃসমা শাশুড়িকে তুলে নিয়ে বার করতে চায় জানতে পেরে লজ্জায়-অপমানে কুমুদিনীর মাথা হেঁট হয়ে যায়। অটল অবশ্য যাবতীয় দোষ নিমচাঁদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। রামধন রায়ের হাতে জুতোর বাড়ি খেয়ে তার ভিতরটা তখন রাগে ও হতাশায় জ্বলছে, সে বলেছে— 'তুই (নিমচাঁদ) আর আমায় বিরক্ত করিস্ নে, তোরাই আমাকে মদ খাওয়াতে শেখালি, তাইতে আমার এই সর্ব্বনাশ হলো— তোকেও ভুগতে হবে।' অবশ্য এই রাগ বেশিক্ষণ থাকেনি। নিমচাঁদকে নিয়ে বাবা আসবার আগেই বাগানবাড়িতে গিয়ে মারের ব্যথা ভুলতে অটল ব্র্যান্ডি টানতে চলে গেছে।

নাট্যকার 'কাপ্তেনবাবু' অটলের চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে যেমন বাস্তবতার মাত্রা থেকে বিচ্যুত হননি, তেমনি উদ্দেশ্যমূলক নাটক হলেও কোনো শুদ্ধিকরণের আপাত কাল্পনিক পরিণাম প্রদর্শন করেননি। অটলের মতো বাবুরা প্রায় অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত, চরিত্রহীন, সংস্কার বা মূল্যবোধহীন, বিলাসী, বিকৃতমস্তিষ্ক, সেইসঙ্গেই অপদার্থ, দামার ভাষায় কলেজ-শিক্ষিত হয়েও মদ খায় না বলে নিমচাঁদ ক্রুদ্ধ হয়েছে; অন্যদিকে অটলের প্রসঙ্গে 'কাপ্তেনবাবু'র মোসাহেবের মতোই স্বীকার করেছে— 'অটল আমার আস্তাবলের বাঁদর, অটলের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে এত মজা কচ্চি।' এই হল তার অন্যতম অভিপ্রায়। অটল দুর্বৃত্ত-স্বভাব, লম্পট, মদ্যপ;— কিন্তু অটলের অনেক অসৎকার্যেই প্ররোচনা দেয় নিমচাঁদ, কারণ তা নইলে নিমচাঁদের নিজের 'মজা করার' পথ বন্ধ হয়ে যায়।

যদিও স্বীকার করতেই হবে, নিমচাঁদের মতো শেলি, বায়রন, মিল্টন আওড়ানো মোসাহেবের চরিত্র বাংলা নাটক ও প্রহসন সাহিত্যে প্রায় দুর্লভ। নিমচাঁদও দুর্বৃত্ত, কিন্তু সে মদ্যপ হলেও লম্পট নয়। সে কাঞ্চনের সঙ্গে ঠাট্টাইয়ার্কি করেছে, তাকে দেখে পাঁচালি পড়ার ঢঙে বলেছে—

> 'পুণ্য পুঞ্জ পণ্ড দেবি সৈরিণি!
> ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বৈরিণি!
> নব্য বঙ্গ বৃন্দ ধ্বংস ডায়িনি!
> সাধ্বিপুঞ্জ চিত্ত দুঃখ দায়িনি!... ইত্যাদি। (১/১)

নিমচাঁদের এই বক্তব্যের মধ্যে সমকালের নব্য বঙ্গের পরিচালকদের বেশ্যাবাজির প্রতি যেমন ইঙ্গিত আছে, তেমনি এই শখটিকে যে সে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে, তার প্রমাণও পাওয়া যায়। নিমচাঁদ প্রথাগত অর্থে 'মোসাহেব' নয়, সে আসলে নব্যবাবুদের ভস্মাবশেষ। ফলে পাশ্চাত্য সংস্কারের প্রতি মোহে সে মদ্যপান করতে পারে, কিন্তু লাম্পট্য থেকে শতহস্ত দূরে থাকে। এ কারণেই অটল 'ঘরের মাগ'কে বের করে আনতে বললে সে বলেছে, 'এ কি ভদ্রলোকের কাজ?' মাতাল বলে তার মনে অনুশোচনাও আছে। স্ত্রী, সংসার, সদ্বংশ— সকলের মুখে কালি দিয়ে সে অটলের বৈঠকখানায় বাগানবাড়িতে পড়ে থাকে, এর জন্য তার অনুতাপের শেষ নেই। সে হাহাকার করেছে— 'মদ কি ছাড়বো! আমি ছাড়তে পারি বাবা, ও আমায় ছাড়ে কই?' (৩/২) এই হাহাকার-অনুতাপ শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের সামান্য অংশের মনোভাবকেও প্রতিফলিত করে। একইসঙ্গে উচ্চশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও মদ্যপ নিমচাঁদ চাকরি না করে 'কাপ্তেনবাবু'

অটলের মোসাহেবি করছে, এর মধ্যে দিয়ে কি সমকালের কর্মহীন শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের অসহায়তা-অপারগতাকে ছুঁতে চেয়েছেন নাট্যকার?

তবে শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের তিনি সবটুকু দেখাতে চেয়েছেন, তা বলাই বাহুল্য। এ কারণেই কেনারাম তথা ঘটিরাম ডেপুটির চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তিনি। কেনারাম মফস্সলের হাকিম। সে ব্রাহ্ম, তবে 'হিন্দুদের মন রক্ষার জন্য ঠাকুর দেখতে গিয়ে ঝনাৎ করে টাকা ফেলে দিয়ে প্রণাম' করে। নিমচাঁদ তার শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে কটাক্ষ করলে সে ক্রুদ্ধ হয়েছে। বলেছে, কালেক্টার সাহেব তাকে ইংরেজিতে অনেক কিছু তর্জমা করতে দেন। নিমচাঁদ কিছু বাক্য তর্জমা করতে দিলে কেনারাম তার অসহায়তা প্রকাশ করে জানিয়েছে, 'আমি যখন তরজমা করি, তিন চারখান ডিক্সোনারি নিই আর এক একটা কথা মৎএজ্জম্‌কে জিজ্ঞাসা করি— এখানে বসে এ তরজমা কত্তে পারি নে।'(১/২) এই উক্তি থেকেই কেনারামের মতো তথাকথিত শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের এক অংশের শিক্ষার রূপটি প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

কেনারাম তথ্য ঘটিরাম সামাজিক 'image' বজায় রাখতে মদ্যপান করে না, অনেক অনুরোধে গেলাসে আঙুল ডুবিয়ে এক ফোঁটা মুখে দেয় মাত্র। তবে তার ভালোমানুষির মুখোশ ফাঁস করে দেয় কাঞ্চন। কেনারাম নিজের image তৈরি করতে জানিয়েছে যে, সে 'ঘুস' যায় না, কারণ 'লোকে নিন্দে করবে আর সাহেবেরা কর্ম্ম ছাড়িয়ে দেবে'। যদিও ঘুস না নেওয়ার ব্যাপারে কোনো সংস্কার নেই তার। নিমচাঁদ অবশ্য এই দ্বিচারিতা সহ্য করতে পারেনি। দুশো টাকা মাইনের ঘটিরামকে সে বলেছে— 'তুমি লেখাপড়া শিখেছ, তোমার প্রেজুডিস্‌ গিয়েছে, কেবল অর্ধচন্দ্রের ভয়েতে ঘুস খাও না—।' তবে কেনারাম যখন বলেছে যে, সে বেশ্যালয়ে যায় না, কারণ তাতে পাপ হয়, তখন কাঞ্চন তার ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিয়েছে। তার মুখ থেকেই জানা যায়, কেনারাম তার আর্দালিকে সঙ্গে করে বেশ্যালয়ে গিয়েছিল। কাঞ্চন তার মাইনের পরিমাণ মাত্র 'দুশ টাকা' শুনে ঠাট্টা করে বলেছিল, 'তোমার মতো ডেপুটি আমার কোচম্যান আছে'; এরপর কাঞ্চনের দাসী ইচ্ছে কেনারামের শামলার উপর হুঁকোর জল ঢেলে দিলে, কেনারাম সেখান থেকে অপমানিত হয়ে ফিরে যায়। এই ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয়, তথাকথিত শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুরা সুযোগ পেলেই বেশ্যাবাড়ি গমন করতেন; অন্তত বেশ্যাবাড়ি যাওয়াকে কু-নজরে দেখতেন না। কলকাতায় এবং মফস্সলগুলিতেও চাকরিজীবী বাবুদের মহল্লা ঘেঁষে বেশ্যালয় গড়ে ওঠা ও তার ক্রমপ্রসারের কথা দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় তাঁর আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন, যা ইতিপূর্বেই 'বাবুদের রূপ ও স্বরূপ' বিচারে আমরা উল্লেখ করেছি। কেনারাম ডেপুটি এই ভণ্ড-দ্বিচারী, সেইসঙ্গেই বেশ্যাসক্তির মতো দূষণীয় আমোদপ্রমোদে ইচ্ছুক বাবুর প্রতীক। তবে আর্থিক সাধ্য সীমিত হওয়ার জন্য, নিষিদ্ধ ফলের প্রতি লোভ থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা পূরণ করা সম্ভব হত না। কেনারামের মতো বাবুদের ক্ষেত্রে তাই আপাত 'ভদ্রতা'র মুখোশ পরে থাকাটাই শ্রেয় ছিল, যদিও তেমন অনুকূল পরিবেশে ভদ্রতার মুখোশ সরিয়ে অন্তরের বিকৃত আকাঙ্ক্ষাগুলি বেরিয়ে আসতে দ্বিধাবোধ করত না।

সব মিলিয়ে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' উনিশ শতকের বাবু প্রসঙ্গে একটি গুরুতর এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এক হিসাবে এ নাটক বাবুদের অগণন শ্রেণির প্রতিনিধিত্বে জমজমাট। হঠাৎবাবু, ফোতোবাবু, কাপ্তেনবাবু, তথাকথিত প্রগতিশীল ব্রাহ্মবাবু— উনিশ শতকের বাবুত্বের সম্পূর্ণ ভুবনটিকে ধরতে চেয়েছিল 'সধবার একাদশী' এবং সে কাজে যে নাটকটি অনেকাংশে সফল তা বলাই বাহুল্য।

**কাপ্তেনবাবু**॥ টালা ইউনিভার্সাল প্রেস থেকে প্রকাশিত কালীচরণ মিত্রের 'কাপ্তেনবাবু' প্রহসনটি (১৮৮৯) আমাদের আলোচ্যবাবু বিষয়ে অন্যতম একটি সৃষ্টি।[৬১] 'সধবার একদশী'র মতো অবশ্য এই প্রহসনের বিস্তার ও গভীরতা তেমন নয়, উদ্দেশ্যমূলক এই রচনায় কাপ্তেনবাবুটির চরিত্র-শুদ্ধির ছবি এঁকে সম্ভবত প্রহসনকার আদর্শায়িত বক্তব্য তুলে ধরতে চেয়েছেন। কাহিনি হিসাবে খুব বৈচিত্র্যপূর্ণ না হলেও এ জাতীয় রচনার একটি সামাজিক মূল্য রয়েছে, তা স্বীকার করতেই হবে।

আলোচ্য প্রহসনে দেখা যায়, জমিদার সারদাপ্রসাদ ঘোষের নাবালক পুত্র নরেন্দ্র কৃষ্ণ 'কাপ্তেনবাবু' হয়ে উঠেছে। তা নিয়ে সারদাবাবুর দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। তিনি প্রতিবেশী বন্ধু অমৃতলাল পাইন এবং নরেন্দ্রর শ্বশুর শরৎচন্দ্র বসু'র সঙ্গে এ নিয়ে নানান আলোচনা ও পরামর্শ করেছেন। অমৃতবাবু তাঁকে জানিয়েছেন, নরেন্দ্র সাবালক হলে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হবে এবং তখন সুযোগ বুঝে দাও মারা যাবে, এই আশায় শুঁড়িপাড়ার মহাজন রামকৃষ্ণ ভড় নাবালক জেনেও নরেন্দ্রকে হ্যান্ডনোট লিখিয়ে টাকা ধার দিয়েই তার সর্বনাশ করছে। অমৃতের মতে, 'সে ব্যাটা কত ভদ্রলোকের ছেলের এমনি করে সবর্নাশ করেছে। একগুণ দিয়ে চারি গুণ আদায় করে।' সারদাবাবুকে অমৃতবাবু পরামর্শ দিয়েছেন, অর্থপ্রাপ্তির তথা কর্জ্জ করার পথ রুদ্ধ হলেই নরেন্দ্রকৃষ্ণ বেকায়দায় পড়ে কাপ্তেনিগিরি বন্ধ করবে। যদিও সেইমত সারদাবাবু খাস চাকর শিবনাথকে দিয়ে চিঠি পাঠালেও রামকৃষ্ণ তা মানতে অস্বীকার করেছে এবং সে এইসব কাপ্তেনবাবুদের ভবিষ্যতেও টাকা ধার দেবে, এই কথা বলেছে।

'কাপ্তেনবাবু'টি অর্থাৎ নরেন্দ্রকৃষ্ণ স্ত্রী ফেলে বাগানবাড়িতে বেশ্যা মনমোহিনীকে নিয়ে ব্যস্ত। তাকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে তার ইয়াররূপী মোসাহেব মন্মথ। সারদাবাবুর স্ত্রী, নরেন্দ্রর মা গোলকমণি মন্মথর পরিচয় জানিয়ে বলেছেন, 'শিবনাথের মুখে শুনিছি যে তেলিপাড়ার প্রিয় দত্তের ছেলে মন্মথ দত্ত সেই ছোড়াই খেলে, তার চোদ্দ পুরুষ পরের সর্বনাশ করে আসছে তা সেই বা কেন না কর্বে।' তাঁরা স্বামী -স্ত্রী মিলে পরামর্শ করেন নরেন্দ্রকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সৎপথে আনবার।

ওদিকে নরেন্দ্র তখন তার রক্ষিতা মনমোহিনীকে লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে মনস্থির করেছে। সে বলেছে, 'আমার ইচ্ছা মনমোহিনীকে লেখাপড়া শিখাই; নিজে first year অবধি পড়া গেছে, মনমোহিনীকে fourth year অবধি পড়ান যাক।' মন্মথ অবশ্য কলেজে না ভর্তি করে, বাড়িতেই বাঙালি-মেম রেখে পড়ানোর পরামর্শ দিয়েছে। নরেন্দ্র সে ব্যাপারে একমত হয়েছে। ঠিক হয়, বেথুন কলেজের বাঙালি মেম প্রমদা সরকার এসে পড়াবেন। প্রমদা 'well educated' মেয়ে, 'এ বছর বি.এ পাস করেছে।' পাঁচ ঘণ্টার জন্য মাসিক তাকে আড়াইশো টাকা দিতে হবে। নরেন্দ্রকৃষ্ণ এতে রাজি হয়েছে এবং মহাজনের কাছে গিয়ে পাঁচশো টাকার হ্যান্ডনোট লিখে আড়াইশো টাকার আনবার জন্য মন্মথকে অনুরোধ করেছে। অন্যদিকে মনমোহিনী 'বাবুর যা ইচ্ছে' তাতেই মত দিয়েছে। মন্মথ মহাজনের কাছ থেকে আড়াইশো টাকা নিয়ে পঞ্চাশ টাকা নিজে আত্মসাৎ করেছে।

এদিকে নরেন্দ্রকৃষ্ণকে বোঝানোর জন্য সারদাবাবু বৈঠকখানায় তাকে ডেকে পাঠান। সেখানে অমৃতবাবু এবং নরেন্দ্রর শ্বশুর শরৎবাবুও উপস্থিত। নরেন্দ্র এলে তার মাথায় হাত দিয়ে সারদা ভালো কথায় তাকে বিষয়সম্পত্তি এভাবে না ওড়ানোর পরামর্শ দিলে নরেন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়েছে, বলেছে, 'আমি ঢের ঢের father দেখেছি, তোমার মতো এ রকম stupid father দেখি নাই। যা বলবার তা মুখে বল, মাথায় হাত্ টাত্ দিও

না বল্‌চি, আমার টেরি খারাপ হয়ে যাবে। এবার first time বলে excuse করলুম।' এই কথা শুনে হতভম্ব সারদাবাবু 'পাস করা' ছেলেপুলেদের শিক্ষার স্বরূপ নিয়ে কটাক্ষ করলে শরৎবাবু জামাইকে কিছু বলতে যান। কিন্তু নরেন্দ্র জানিয়ে দেয়, 'আমি এ রকম rustic-দের সঙ্গে কথা কহিতে চাহি না। যেসব লোক etiquette জানে না, যাদের discipline দোরস্ত নয়, তাহারা আমার সঙ্গে কথা কহিবার যোগ্য নয়।' অমৃতবাবু তাকে মনমোহিনীর ইঙ্গিত করে ওই 'বাজারে পেতনি'টাকে ঘাড় থেকে নামাতে পরামর্শ দিলে সে তাঁকেও কদর্য ভাষায় ইংরেজিতে বলেছে যে, অমৃতবাবু আদৌ জানেন না যে কী করে একজন 'educated young fellow-র সঙ্গে কথা বলতে হয়। এমনকী মা তাকে বোঝালে, তাঁকে নিজের কাজে যেতে বলে সে দ্রুত প্রস্থান করেছে। কারণ, প্রমদা সরকারের আসার সময় হয়ে গেছে। তার দেরি হলে মনমোহিনী কিছু মনে করতে পারে। অতএব মা'কে সে 'Go, go you devils won't speak with me' বলে সবেগে প্রস্থান করেছে।

ওদিকে প্রমদা সরকারের অধীনে মনমোহিনীর শিক্ষা ভালোই চলছে। মুগ্ধ নরেন্দ্র তার কাছেই পড়ে থাকে রাত্রিদিন। গান শোনে আর জানায় সে মনমোহিনীকে 'এ জীবনে ভুলতে পারবে না'। ইতিমধ্যে মন্মথকে মহাজন ধার শোধ দেবার কথা জানাতে বলে। দু'বছর হয়ে গেলেও কিস্তির টাকা শোধ করেনি নরেন্দ্র। অতএব শোধ না দিলে শমন ধরিয়ে নরেন্দ্রর জেল যাত্রার ব্যবস্থা করবে বলে মহাজন জানায়। মন্মথ তার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এবং কোর্টে মামলা উঠলে, সে নিজে মহাজন রামকৃষ্ণের পক্ষে সাক্ষী দেবে একথা জানায়। অতঃপর ঋণশোধ-এর কথা এসে নরেন্দ্রকে জানালে, নরেন্দ্র মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। কারণ, বাবাকে চাইলে তিনি টাকা দেবেন না। অতএব তার জেলযাত্রা প্রায় একরকম স্থির। এদিকে নরেন্দ্রর সাধের মনমোহিনী অবস্থা বেগতিক দেখে প্রমদা সরকারকে চলে যেতে বলেছে এবং বলেছে, 'নরেন বাবু আজ বাদে কাল জেলে যাবেন। উনি আর মাহিনা জোগাতে পারবেন না। ... আমিও মানে মানে পালাই। মন্মথ বাবু মানে মানে পালাবেন। কাহারো থেকে দরকার নাই। যে যার পথে যাওয়া যাক। বকের দলে সারসও কেন ধরা পড়ে।'

মন্মথ পেয়াদাকে ডেকে এনে নরেন্দ্রকে শমন ধরায়। আদালতে সে মহাজনের হয়ে নরেন্দ্রর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দেয় যে, নরেন্দ্র যখন টাকা কর্জ করে তখন সে নাবালক। কিন্তু অন্য পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য শুনে মন্মথর মিথ্যা সাক্ষ্য ধরা পড়ে যায়। তার জেল হয় এবং মহাজন রামকৃষ্ণ যেহেতু নাবালক জেনেও নরেন্দ্রকে টাকা ধার দিয়েছিল, তাই আইন অনুযায়ী তার টাকা বাজেয়াপ্ত হয়। অনুতপ্ত নরেন্দ্র নিজের ভুল বুঝতে পেরে পিতা-মাতার কাছে ক্ষমা চায়। স্ত্রীর কাছেও সে ক্ষমাপ্রার্থী এবং সকলের প্রতি সে জানায়, 'আর যেন কেহ কপটদিগের কপটতা জালে পড়িয়া আমার ন্যায় handnote না কাটে। যদি কেহ জ্ঞান শিক্ষা করিতে চাহেন, তাহা আমাতেই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন।' উদ্দেশ্যমূলক এই বক্তব্যের মধ্য দিয়েই প্রহসনটি শেষ হয়। নাবালক কাপ্তেনবাবু ঠেকে শিখে কাপ্তানির পথ পরিত্যাগ করেন।

**সপ্তমীতে বিসর্জন**॥ ১৯৯৪ সালে গ্রন্থাবলীতে সংকলিত গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সপ্তমীতে বিসর্জন' পঞ্চরংটি 'কাপ্তেনবাবুদের' খণ্ড তরল স্বভাবের একখানি চিত্রমাত্র। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে, 'পূজার বাজারে কাপ্তেনবাবুদের অবস্থা বর্ণনা করিয়া এই সামাজিক শ্লেষাত্মক পঞ্চরংখানি লিখিত।'[৬২] আলোচ্য প্রহসনে খণ্ড খণ্ড নানান চিত্রের সাহায্যে কাপ্তেনবাবুদের অশিক্ষিত অমার্জিত আচার-আচরণের

একটি রূপরেখা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কোনো নিটোল দীর্ঘ কাহিনির পরিবর্তে সামান্য কয়েকটি আঁচড়ে সমকালীন সমাজে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সার্বিকভাবে বাবুসমাজের অধঃপতনকেই চিহ্নিত করতে চেয়েছেন পঞ্চরংকার। কাপ্তেনবাবুদের হাতে ধর্ম থেকে সামাজিক সংস্কার প্রতিনিয়ত কেমন ধর্ষিত হত, তার একটি অতিশয়োক্তিমূলক চিত্র 'সপ্তমীতে বিসর্জনে' লভ্য। যদিও অতিশয়োক্তি প্রসঙ্গে আলোচক বলেছেন, 'সামাজিক নাটক বাস্তব সংসারে ঘটনা ও চরিত্র লইয়া রচিত হয়, এইরূপ বিদ্রূপাত্মক প্রহসনের গল্প এবং চরিত্র সম্ভব রাজ্যের প্রান্তসীমা হইতে আহূত হইয়া থাকে— ইহার সকলই উচ্ছৃঙ্খল।'[৬৩] 'কাপ্তেনবাবু'দের সেই উচ্ছৃঙ্খলতার ছবিই 'সপ্তমিতে বিসর্জনে'র একমাত্র লক্ষ্য।[৬৪]

প্রহসনের শুরুতেই দেখা যায় নতুন বাজারের রাস্তায় খোকাবাবুকে নিয়ে খানসামা এসেছে। খানসামা খোকাবাবুকে মহাজনের আড্ডায় এনে তুলেছে। সেখানে উকিল আর দালাল নিয়ে মহাজন ওৎ পেতে বসে আছে কাপ্তেনবাবু ধরবার আশায়। খানসামা বলেছে, 'খোকাবাবু সাবালক হয়েছে, কে হ্যান্ডনোটে ধার দেবে দাও, এই ঠিকুজী দেখে নাও।' দালাল তৎপর হয়ে আগেই জানিয়ে দেয়, 'পাঁচশ টাকা কমিশন দিতে হবে। পঁচিশ পার্শেন্টের দরে এক মাসের সুদ আগাম। দালালী বিশ পার্শেন্ট; গদিয়ানী আর উকিল খরচা।' উকিল প্রস্তুত আছে, হ্যান্ডনোট লেখা আছে; দালাল কলম এগিয়ে দেয় খোকাবাবুকে সই করার জন্য। খোকাবাবু একহাজার টাকার হ্যান্ডনোটে সই করে। উকিল হিসাব কষে দেখায়, কমিশন পাঁচশো টাকা, একমাসের সুদ আড়াইশো টাকা, দালালি দুশো টাকা, সব মিলিয়ে সাড়ে ন'শো টাকা বাদ যাবে, হাতে থাকবে পঞ্চাশ টাকা। উকিল খরচা মেটাতে গেলে খোকাবাবুকে 'ঘড়ি ও ঘড়ির চেন' দিতে হবে। অগত্যা 'কাপ্তেন' খোকাবাবু ঘড়ি ও ঘড়ির চেন দিয়ে সাকুল্যে পঁচিশ টাকা নিয়ে ঘরে ফেরে। মহাজন তাও অখুশি হওয়ার ভাণ করে। তবে 'লোকসান' হলেও কাপ্তেন সাজা খোকাবাবুকে সে বলেছে, 'ফের দরকার হয়, এখান থেকেই নেবেন, এত কম সুদে আর কোথাও পাবেন না।' খানসামা খোকাবাবুকে আশ্বস্ত করেছে যে, এই মহাজনের ঘর তার 'বাঁধা' থাকল, যখনই 'কম সুদে' টাকার দরকার পড়বে, ইনি আছেন। দালাল খানসামাকে দু'টাকা বকশিস দেয়, বলে, 'বাবুকে নিয়ে এসে ফের।' সেকালে ধূর্ত মহাজনরা খানসামা, ইয়ারদোস্ত, মোসাহেব প্রভৃতির সঙ্গে যোগসাজশে, দালাল, উকিলকে সঙ্গী করে কীভাবে 'কাপ্তেনবাবু'দের হ্যান্ডনোট লিখে টাকা ধার দেওয়ার নামে সর্বস্বান্ত করত, তার একটি বাস্তব অথচ নির্ভরযোগ্য ঘটনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন গিরিশচন্দ্র। কাপ্তেন সাজা খোকাবাবুর প্রতি তাঁর নির্মম ব্যঙ্গ গোপন থাকেনি।

পরবর্তী চিত্র আর এক কাপ্তেনবাবুর। বেলিফ সাহেবের সঙ্গে জনৈক ওয়ারেন্টের আসামি এই কাপ্তেন বাবুটি চলেছে থানায়। তবে জেলে যেতে কাপ্তেনবাবুটি ভয় পায় না। কারণ, 'অমন কত বার ধার করেছি, কতবার জেলে গেছি।' তবে, জেলে যাওয়ার আগে সে একটু পুজোর বাজারটা সেরে নেওয়ার অনুমতি চেয়েছে। রক্ষিতার জন্য চারশো টাকার শাড়ি, দু'শো টাকার এসেন্স, কয়েক জোড়া জুতো সে নেবে কেবল। তবে বেলিফ সাহেবকে সে চিন্তিত হতে বারণ করেছে, বরং দারোয়ানের কাছ থেকে দু'টাকা ধার নিয়ে সাহেবকে সে মদ খাইয়ে দেবে বলেছে; তা ছাড়া, এসেন্সের দোকান থেকে নগদ যে চার-পাঁচ টাকা ধার সে পাবে, তাতে গাড়ি ভাড়াও হয়ে যাবে। বাবুটি গর্বের সঙ্গে বলেছে, 'আমি বছর বছর জেলে অমন যাই, তুমি কিছু ভেব না। আর দেখ, তুমি নূতন এয়েছ, আলাপ ছিল না, এখন হামেসাই দেখাশুনো হবে; আমওয়ালার ধার আছে পাঁচশো, গয়লার সাড়ে চারশো, হোটেলওয়ালার পঞ্চাশ, মাসে তোমার দু'বার নিদেন ওয়ারিন নিয়ে আসতে হবে, ক্রমে আলাপ হোক, আমি কেমন মানুষ, তুমি বুঝতে পারবে।' বেলিফ

অবশ্য আশ্বস্ত করে বলেছে, 'আপনি বোনেদি আদ্‌মী, করজা তো করতেই হোবে।' এই সুযোগে নিজের জন্য বাবুটির কাছ থেকে সে একটি কোর্তা হাতিয়ে নিয়েছে।

তৃতীয় যে কাপ্তেনবাবু ও তার মোসাহেবের দেখা মেলে তারা হল গোবর্ধন ও গণেশের মুখোশ পরা প্যালারাম। তবে এ বছর গোবর্ধন কাপ্তেনবাবু হলেও, গত বছর প্যালারামও ধার করে 'ফোতোবাবু' সেজেছিল। সারা বছর ধারকর্জ করে শোধ দিতে পারেনি, তাই মুখে মুখোশ এঁটে সে নতুন বাজারে এসেছে গোবর্ধনের সঙ্গী হয়ে। সেইসঙ্গেই জানা গেছে, পূর্ব পরিকল্পনা মতো, গোবর্ধনের দিদিমাকে গণেশ সেজে প্যালারাম ঠকিয়ে কোনোমতে তিনশো টাকা হাতিয়ে আনতে পেরেছে। পুজোর খরচ কী করে চলবে, এই দুশ্চিন্তায় গোবর্ধন আকুল হলে, প্যালারাম তাকে আশ্বস্ত করেছে, 'আরে, তার জন্যে ভাবিস্‌নি! যখন নূতন মেয়েমানুষ রেখেছিস্‌, দু'তিনশো টাকার জিনিস ধারে চল্‌বে।' এরপর কাপড়ওয়ালা, খোসবোওয়ালা, জরি-ফিতেওয়ালা ও বডিগাউনওয়ালা সকলকে ৩২ নম্বর তাঁরাগাছির ঠিকানায় বাবুর মেয়েমানুষের কাছে নিয়ে যেতে বলেছে। এখন তাদের দাঁড়াবার সময় নেই, তারা ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যাবার আগেই নোট ভাঙাতে যাচ্ছে। এমন মিথ্যে না বললে বাজারে নতুন বাবু গোবর্ধন আস্থা অর্জন করতে পারবে না, তাই প্যালারাম সকলকেই একই কথা বলেছে। অতঃপর গোবর্ধনকে সে বলেছে কাল সকালেই দু'হাজার টাকার জিনিস সে তার মেয়েমানুষের জন্য নিতে পারবে। টাকা শোধ দেবার চিন্তায় ভাবিত বাবুকে আশ্বস্ত করে সে বলেছে, 'নতুন মেয়েমানুষ রেখেছিস্‌, আবার টাকা দিতে হবে! ঐ কিপটে ব্যাটারা যারা ভয়ে ভয়ে নগর কেনে, তারা কলকেতার সহরে ধার পায় না। তুই যত টাকার জিনিস ধার চাস, আমি কলকেতার সহর থেকেই দিয়ে দিচ্ছি। টাকা ছাড়া যা চাস আমি কলকেতার সহর থেকেই দিয়ে দিচ্ছি।' নতুন 'কাপ্তেনবাবু'কে দোরস্ত করতে মোসাহেব প্যালারামের এই প্রচেষ্টা ও সাহস জোগানো স্বাভাবিকতার মাত্রা বজায় রেখেই। কাপ্তেনবাবুদের একবার অধঃপতনের রাস্তায় নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারলেই মোসাহেবদের লাভ। এরপর বাবুটির মাথায় কাঁঠাল ভেঙে তার নিজেরও ফুর্তি চলবে।

এদিকে 'কাপ্তেনবাবু' গোবর্ধনের রক্ষিতা বিরাজের সপ্তমী পূজার দিন শখ হয়েছে দুর্গাপূজা করার। সাতকড়িকে সে পাঠিয়েছে প্রতিমা আনতে। সমস্ত দিন দুশ্চিন্তায় সে মদ খেয়ে চলেছে। এমন অবস্থায় গোঁসাই 'নিমতলার ঘাটের মড়া' বয়স্ক এক মামাকে নিয়ে তার কাছে এসে উপস্থিত। উদ্দেশ্য— বিরাজের সঙ্গে বসে 'রাসলীলার গুহ্য-তত্ত্ব' বলা এবং 'প্রেম বিলানো'। বিরাজ তাদের এড়ানোর জন্য শুক্রবার আসতে বলেছে, এখন তার সময় নেই, কারণ, 'খান্‌কী বাড়িতে কার্তিক পুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো, সরস্বতী পুজোই হয়, আমি ঠাউরেছি, দুর্গো পুজো কর্‌বো— তার জন্যে আমার মাথা ঘুরছে।' গোঁসাই অবশ্য তাতে রাগ করে না। মামাকে নিয়ে সে বসে বসে মদ খায় আর রাস-রসাসৃত গুহ্য-তত্ত্ব আলোচনা করে। অনেক অনুরোধ করে বিরাজকে এক গ্লাস মদও খাওয়াতে সমর্থ হয়।

এদিকে সপ্তমীর দিন কোথাও প্রতিমা জোগাড় করতে না পেরে সাতকড়ি চালচিত্র নিয়ে হাজির হয়। বিরাজের তাতে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। সে বলেছে, 'বেদানার বাড়ী সরস্বতী পুজো হ'লো, সেদিন— ধূমধাম বাজ্‌না, নিত্যগোপাল মুখুয্যে আমায় কত টিটকিরি দিয়ে গেল।' গোঁসাই বিধান দেয়, চালচিত্রের সঙ্গে একটি কার্তিক ঠাকুর হলেই 'শুদ্ধ পূজা' হয়। এ পূজার বিধান নাকি চৈতন্যচরিতামৃতের, যা 'বেদের ওপরে'। কিন্তু কার্তিক পাওয়া ভার বলে মামাই কার্তিক সাজে এবং সাতকড়ি ময়ূর হয়। গোঁসাই হুইস্কির বোতল পাশে রেখে 'তড়ং নমঃ, খড়ং নমঃ, মাতালস্য নমঃ, সোনাগাছায় নমঃ ইত্যাদি

মন্ত্র আউড়ে পূজা করে। যাত্রাদল বায়না নিতে এসে যশোদা-কৃষ্ণের অংশ এমনিই নমুনা স্বরূপ দেখিয়ে যায়। বিরাজের নতুন বাবু গোবর্ধন মোসাহেব প্যালারামকে নিয়ে প্রবেশ করে এবং নরক গুলজার হয়।

এই প্রহসনে কোনো পরিপূর্ণ কাহিনি নেই, কিন্তু অন্তঃস্রোতের মতো একটি বিশেষ ভাবনা-প্রবাহ কাজ করছে। কলকাতার উনিশ শতকীয় বাবু-কালচারের একটুকরো ইতিহাস যেন ধরা আছে এই পঞ্চরঙে। কাপ্তেনবাবু, ফোতোবাবু, বনেদিবাবু— সবাই এসে ভিড় জমিয়েছে বিরাজের আঙিনায়। অবস্থান ভিন্ন, চাহিদা এক; আর্থিক সামর্থ্য আলাদা, কিন্তু চরিত্রধর্ম এক। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধার্মিক-অধার্মিক ভেদে বেশ্যাগিরি, লাম্পট্য, মদ্যাসক্তিতে আসক্ত বাঙালিবাবুদের এই সার্বিক অবক্ষয়ের সামনে দাঁড়িয়ে হাসির সঙ্গে সঙ্গে সচেতন রসিককে স্তম্ভিতও হতে হয়। নরক গুলজারের দৃশ্যে অতিরেক থাকলেও, অধঃপতিত বাবুসমাজ, সুযোগসন্ধানী মোসাহেব এবং ভণ্ড, শঠ মহাজনদের বাস্তবতা সমৃদ্ধ চরিত্রচিত্রণ ইতিহাসের সত্যকেই নির্দেশ করে।

প্রায় সমসময়ে গিরিশ একই বিষয় নিয়ে লিখেছিলেন 'বড়দিনের বক্‌শিস' (১৮৯৪ গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত)। সেখানেও একইভাবে বাবুসমাজের অধঃপতনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

'কাপ্তেনবাবু'দের কেন্দ্র করে বটতলা থেকে অনেকগুলি প্রহসন প্রকাশিত হয়েছিল। প্রহসনগুলিতে মোটামুটিভাবে কতকগুলি স্পষ্ট লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়, যেমন—

ক) সাধারণত নাবালক এবং ভবিষ্যতে বিপুল পিতৃঋণের অধিকারী হবে কিংবা সদ্য সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়েছে ও পিতার সম্পদের অধিকারী কিন্তু অছির হাতে রক্ষিত অর্থ, এমন বাবুরাই মোসাহেব বা ইয়ারদোস্তদের প্ররোচনায় হ্যান্ডনোট কেটে কিংবা মর্টগেজ রেখে টাকা ধার নিয়ে কাপ্তেনবাবু সাজে।

খ) কাপ্তেনবাবুদের বেলেল্লাপনা ও বাবুগিরিতে শখ থাকলেও, সাধারণ বুদ্ধির কিছু অভাব থাকে; ফলে তারা সহজেই মোসাহেব দালাল বা মহাজনের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়।

গ) প্রথম থেকেই ধার করা অর্থে বাবুগিরিতে নামে বলে, তাদের পরিণামে সর্বস্বান্ত হওয়া একরকম নিশ্চিতই থাকে। অন্যান্য বাবুদের তাও নিজস্ব পুঁজি কিছু থাকে, কাপ্তেনবাবুদের প্রায় তাও থাকে না।

ঘ) অন্যান্য বাবুদের মতোই মদ ও রক্ষিতা— 'কাপ্তেনবাবু'দের মূলত এই দুই প্রধান শখ।

ঙ) চারিত্রিক দিক থেকে ভালো-মন্দ, ধর্ম-অধর্ম বোধ 'কাপ্তেনবাবু'দের কমই থাকে। নাবালক বা সদ্য-সাবালক হওয়ায় জীবন সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতাও কম হয়। ফলে অতি সহজেই দালাল বা মোসাহেবের কথায় প্রভাবিত হওয়া এদের স্বভাব।

চ) বাজারি-অর্থনীতিতে কাপ্তেনবাবুদের একটা বড়ো ভূমিকা আছে। সামর্থ্যের চেয়ে বেশি অর্থ বিলাসিতায় অপব্যয় করে বলে অপর আর্থিক লেনদেনের উৎসগুলি এদের সম্পর্কে মুক্তহস্ত।

ছ) শিক্ষিত কাপ্তেনবাবুর দৃষ্টান্ত খুব বিরল।

মোটামুটিভাবে এই প্রবণতাগুলিই কাপ্তেনবাবুদের কেন্দ্র করে রচিত নাটক-প্রহসনে ঘুরে ফিরে আসে। দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনি'তে (১৮৭২) জমিদার জগচ্চন্দ্র অপুত্রক বলে গরিব জ্ঞাতির ছেলে শরচ্চন্দ্রকে পোষ্য নেন। জগচ্চন্দ্র মারা যাবার আগেই শরচ্চন্দ্র 'কাপ্তেনবাবু' হয়ে বসে এবং হ্যান্ডনোট লিখে মদ ও মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তিতে 'তোয়ের' হয়ে যায়। বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

'অবাক কাণ্ড বা জ্যান্ত বাপের পিণ্ডদান' (১৮৯৩) প্রহসনে, গ্রাম্য জমিদারের ছেলে ঈশান কলকাতার সহপাঠী মাধবের পরামর্শে বেশ্যা কমলমণিকে নিয়ে পশ্চিমে বেড়াতে যাবার নামে বাড়িভাড়া করে আমোদ-আহ্লাদ করে। অর্থের জন্য নকল চাবি করে বাবার ক্যাশবাক্স থেকে টাকা সরায়। আরও অর্থের প্রয়োজন বলে মাধবেরই পরামর্শে পিতার অনুপস্থিতিতে সে জ্যান্ত বাপের শ্রাদ্ধের আয়োজন করে। তার ফলে বাজারে হ্যান্ডনোটে টাকা পেতে তার সুবিধা হবে। অবশ্য ইতিমধ্যেই ঈশানের পিতা কৈলাসবাবু ফিরে এলে ঈশান বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে মাধবের কাছে এসে তার নিজের গচ্ছিত টাকা ফেরত চায়। মাধব তাকে চিনতে অস্বীকার করে। উপরন্তু পাহারাওলা ডেকে ঈশানকে চোর বলে ধরিয়ে দেয়। চুণিলাল দেবের 'ফটিকচাঁদ' (১৮৯৮) প্রহসনে ছেলেদের গৃহশিক্ষক, আদতে মহাজনদের নিযুক্ত 'কাপ্তেনবাবু' ধরা দালাল ফটিকচাঁদকে অধঃপতনের পথ দেখিয়ে দেয়। ফটিকচাঁদের স্ত্রীও আধুনিকা হয়ে ঘরের বাইরে বের হতে থাকেন। দুই ছেলেও বখাটে হয়ে যায়।

এইসব কাহিনির মধ্যে স্থান-কাল-পাত্রের সামান্য ভেদ থাকলেও, আসলে তার মূল গল্প এক। বুদ্ধিহীন বাবু যশপ্রার্থী 'কাপ্তেনবাবু'দের অপরিমিত ব্যয়; বিলাসিতা ও বাবুগিরি এবং তার দরুন পরিণামী মহাপতন। উল্লেখযোগ্য যে, দীনবন্ধু থেকে বটতলার চুণিলাল কেউই কোনো পরিশুদ্ধির ছবি দেখাতে চাননি কাপ্তেনবাবুদের ক্ষেত্রে, নাকি চাননি? আসলে বাল্যাবস্থায় 'বাবু' হয়ে পড়লে তার উদ্ধার কোনোকালেই হয় না, সম্ভবত এই নিদারুণ বাস্তবকে মেনে নিয়েই 'কাপ্তেনবাবু'দের পাপাচারের বিকৃত চিত্র উপস্থাপনা করেছেন তাঁরা। শেষপর্যন্ত তাই কোনো অনুকম্পা বা পরিশুদ্ধির উপসংহার অপেক্ষা করে থাকে না তাঁদের জন্য।

**(ঘ) প্রগতিশীলবাবু** : বর্তমান অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে বাবুদের রূপ ও স্বরূপ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা যাঁদের মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবু বলেছি, তাঁরা এবং আপাত শিক্ষিত কিন্তু শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের ন্যায় আচার-আচরণকারী বাবুদের আমরা 'প্রগতিশীলবাবু' বলতে চাইছি। মূলত হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর নব্যবাবুদের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই এঁদের যাত্রা শুরু। তবে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নব্যবাবুরা ছিলেন প্রকৃত অর্থেই সুশিক্ষিত, পাশ্চাত্য ধ্যানধারণা সংস্কারে পরিমার্জিত এবং প্রভাবিত এক শ্রেণি। প্রচলিত দেশীয় সংস্কার বিশেষত হিন্দু সংস্কার, রক্ষণশীলতা ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁরা খড়্গহস্ত ছিলেন এবং নিজেরা তা বর্জন করে চলতে চেয়েছিলেন বলে হিন্দু রক্ষণশীল গোষ্ঠী তাঁদের প্রতি বিরূপ ছিলেন। কিন্তু বিরূপ হলেও তাঁদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ বা তাচ্ছিল্যের ভাব রক্ষণশীল অংশের ছিল না তেমন। পরবর্তীতে রামমোহনের অনুগামী ব্রহ্মবাদীরাও এঁদের দলে পরিগণিত হতে থাকেন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের শেষ দুই দশকে নব্যবাবু এবং ব্রাহ্মবাবুরা প্রগতিশীলতার সমার্থক বলে গণ্য হতেন। সমকালীন সমাজে উল্লেখযোগ্য আন্দোলনগুলি— সতীদাহ, বিধবা বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, সহবাস-সম্মতি বিল কিংবা বহুবিবাহ রোধ— সবকটি ক্ষেত্রেই দ্বিধাদ্বন্দ্ব সত্ত্বেও ব্রাহ্মরা এবং নব্যবাবুরা হয় পরিচালক, নয় সংগঠক, কিংবা অনুবর্তীর ভূমিকা পালন করেছেন।

ইতিমধ্যেই পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার, বেথুন স্কুল স্থাপন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে অতি দ্রুত মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত বাবুরা উঠে আসতে থাকেন এবং ক্রমশ ব্রাহ্মবাবুরাও একত্রে 'ভদ্রলোক'বাবুদের গোত্রে গণ্য হতে থাকেন। ব্রাহ্মবাবুরা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রমুখের নেতৃত্বে যেমন উক্ত ধর্ম এবং সামাজিক সংস্কারমূলক চিন্তার

সপক্ষে কাজ করছিলেন, তেমনি ব্রাহ্ম না হয়েও মধ্যশ্রেণির হিন্দু শিক্ষিতদের একাংশ তাঁদের জীবনযাপনকে প্রগতিশীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে অনুকরণীয় বলে মনে করেছিলেন। মদ্যপান এবং সভা-সমিতি কিংবা পত্রিকা পরিচালন তো নব্যবাবুদের হাত ধরে প্রগতিশীলবাবুদের অন্যতম অনুকরণীয় বলে গণ্য হয়েছিল, এমতাবস্থায় স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ, মেয়েদের স্বাধীন জীবনাচরণ, নারী-পুরুষে অবাধ মেলামেশা ইত্যাদি লক্ষণগুলিকে ব্রাহ্মদের কাছ থেকে তাঁরা প্রগতিশীল ভেবেই গ্রহণ করেছিলেন। যদিও রক্ষণশীলদের একটি বড়ো অংশ ব্রাহ্মবাবুদের নানান দ্বিচারিতার দিকে ইঙ্গিত বা অভিযোগ তুলেছিলেন। ব্রাহ্মবাবুদের একটি অংশ একত্রে 'হেলথ' পান, স্ত্রী-পুরুষে সমবেত প্রার্থনা ও নানান সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদানের বিষয়টিতে যেমন আগ্রহী ছিলেন, ব্রাহ্মধর্মের মূল বক্তব্য 'একেশ্বরবাদী' মতটিতে তেমন দৃঢ়বিশ্বাস ছিল না। অনেকেই বাইরে ব্রাহ্ম, ভিতরে হিন্দুবৎ আচরণ করতেন। প্রাজ্ঞ সমালোচক বলেছেন, 'ব্রাহ্মসমাজীদের এইসব আচরণের জন্য স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা জনমনে বিশেষ কোনো দাগ কাটতে পারেননি। প্রচলিত লোকাচারে বিশ্বাসী সাধারণ মানুষ ব্রাহ্ম আদর্শের মধ্যে আঁকড়ে ধরার মতো কিছু পায়নি, যে কারণে সাড়াও জাগেনি তাদের মধ্যে।'[৬৫]

হিন্দু রক্ষণশীলদের বড়ো অংশ ব্রাহ্মবাবুদের প্রতি বিযোদ্গার শুরু করেন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। ইতিপূর্বে রামমোহনের কার্যকলাপ সমালোচিত-ভর্ৎসিত হয়েছিল, কিন্তু তখন ছিল আশঙ্কা এবং সমীহ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই প্রমাণিত হয়ে যায়, কিছু শিক্ষিত তথাকথিত 'প্রগতিশীল' অংশ বাদে হিন্দু সাধারণ জনসমাজের একটি বৃহৎ অংশ এর থেকে সচেতন দূরত্বে থেকে গেছে। যার ফলে আশঙ্কা ও সমীহের জায়গায় এল ব্যঙ্গ এবং নির্মম উপহাসের লক্ষণটি। উনিশ শতকের প্রহসনকার নকশার লেখক থেকে শুরু করে নভেলে পর্যন্ত ব্রাহ্মবাবুদের প্রতি সমকালের এই ব্যঙ্গবিদ্রূপ উপহাসের দৃষ্টিকোণটি উপভোগ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। সেইসঙ্গে যেসব বাঙালিবাবু হিন্দু হয়েও ব্রাহ্মমতে চলেন, তাঁদের প্রতিও সমাজের নির্মম উপহাস এবং তির্যক ব্যঙ্গ প্রকাশিত হয়েছে। এই ব্যঙ্গের অভিমুখ ছিল— ক) পোশাক-আশাক, খ) আদবকায়দা তথা জীবনাচরণ এবং গ) সংস্কার, ধর্ম, বিশ্বাস— এগুলির প্রতি নির্দিষ্ট। মূলত নগর কলকাতাকে কেন্দ্র করে বিকশিত এই নব্য সভ্যতায় সাহেবিয়ানা, জীবনযাপনে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণের প্রবণতা, দেশীয় রীতিনীতিকে তুচ্ছজ্ঞান করা, স্ত্রী-পুরুষে অবাধ মেলামেশায় গুরুত্ব দান, প্রচলিত নারী বিষয়ক সংস্কারকে এড়িয়ে বা অস্বীকার করে সাহেবিয়ানার সংস্কারে নারীকে গড়ে তোলায় গুরুত্বদান,— প্রগতিশীলবাবুদের সাধারণ লক্ষণ বলে বিবেচিত হয়েছিল। এর সঙ্গেই যুক্ত হয়েছিল পাশ্চাত্য নাটক, নভেল, কাব্য পড়ে স্বদেশীয়ানার হুজুগ। বক্তৃতার দ্বারা দেশোদ্ধার করা, পাশ্চাত্য ভাষায় ও ধরনে আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে স্বদেশীয় ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতির উন্নতির আকাঙ্ক্ষা এবং রাজনৈতিক দল গঠন করে দেশের জনজীবনে আত্ম-অহংকে প্রতিষ্ঠা করার এক উন্মাদনাও প্রগতিশীল বাবুদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। নাটক, নভেল, প্রহসন, প্রবন্ধে রক্ষণশীল গোষ্ঠী এ জাতীয় ভ্রান্ত মত ও পথের বিস্তর সমালোচনা করেন। একইসঙ্গে পাশ্চাত্য অনুগৃহীত সভ্যতা-সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে নিজস্ব জাতিসত্তা যে বিপন্ন হয়, দেশজ সংস্কৃতির ভিত যে আলগা হয়ে পড়ে, সে বিষয়েও তাঁরা সচেতন করতে থাকেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লেখেন (০১.০৯.১৮৭০) : 'আমাদের সমাজে স্বতঃপরতঃ অনেকগুলি অশাস্ত্রীয় ও কুৎসিৎ রীতিনীতি প্রচলিত হইয়াছে এবং ব্রাহ্ম খৃস্টান কি ব্যবস্থাপক সভা অপেক্ষা যাঁহারা হিন্দু এবং হিন্দুসমাজে পদস্থ আছেন, তাঁহারা এ সমুদায় সংস্কার করার অধিক

উপযুক্ত।'[৬৬] 'সভ্যতার অত্যাচার' নামক প্রবন্ধে 'কল্পনা' পত্রিকা বলে, বর্তমান সভ্যতার বাহ্য দিকটি খুব জমকালো। পাশ্চাত্য থেকে আমদানিকৃত এই সভ্যতা মূলত দেশীয় বাবুদের বাহ্য বেশবাস ও চরিত্রের বদল ঘটাতে পেরেছে— 'যাহা কিছু এদেশে ছিল না, সভ্যতা সাতসমুদ্র তের নদী পার হইতে তাহা এদেশে আনিয়া দিয়াছে। কোট পেন্টালুন, ফ্রগ গাউন, বুট মোজা, স্টিক, চশমা, চেন, চুরুট— হরেক রকম ভালো ভাল জিনিষের আমদানি হইয়াছে। 'Freedom, Fraternity, Female Emancipation, Mass Education প্রভৃতি লম্বাচওড়া অনেকগুলি কথা সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া এ দেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছে। দেখিতে শুনিতে বড়ই ভাল। কিন্তু ইহাই কি প্রকৃত সভ্যতা?'[৬৭] এই একই প্রশ্ন সেদিনের শিষ্ট সাহিত্য এবং তথাকথিত বটতলার জনপ্রিয় সাহিত্যেরও। পাশ্চাত্যের হুবহু অনুকরণে দেশীয় সমাজের কোনো উন্নতি বা যথার্থ প্রগতি ঘটার সম্ভাবনা নেই বলেই এঁরা মনে করতেন।

অথচ তথাকথিত প্রগতিশীলবাবুরা বাহ্য কিছু আদবকায়দা, আচার-ব্যবহারকেই সত্য বলে মনে করে যেভাবে উন্মার্গগামী হয়ে উঠছেন, আদতে তা সামাজিক কল্যাণের পক্ষে, সমষ্টির সংহতির পক্ষে অন্তরায় হয়ে উঠবে, এই বিশ্বাসে তাঁরা নাটক-প্রহসনের মধ্যে দিয়ে এসব লক্ষণকে প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন। সমসাময়িক পত্রিকায় লেখা হয় : 'আজকাল অস্মদ্দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকের মনের ভাব এই যে, "পাশ্চাত্যশিক্ষার বিমল জ্যোতিতে আমরা উন্নতিসোপানের অনেক দূর আরোহণ করিয়াছি এবং শান্তির সুস্নিগ্ধচ্ছায়ায় এইভাবে আর দেড়শত বৎসর কাটিয়া গেলে, আমরা নিঃসন্দেহে শ্রীবৃদ্ধির উচ্চতম আরোহণীতে পদক্ষেপ করিতে সমর্থ হইব। ইংরাজ আমাদের আদর্শস্থানীয়, আমরা ইংরাজের তুল্য শিক্ষা ও সভ্যতা লাভ করিতে পারিলে জগতীতলে সুশিক্ষিত ও সুসভ্য বলিয়া সম্পূজিত হইতে পারিব।" অন্তঃপ্রবিষ্ঠ হইয়া উৎকর্ষাপকর্ম্ম ভাবিয়া দেখিলে, এই সংস্কার ভ্রান্তিমূলক বলিয়াই প্রতীত হয়। কোনও বস্তুর বাহ্যচাকচিক্য দর্শনে বিমোহিত হওয়া যেমন সদ্বিবেচনা ও বৈচক্ষণ্যহীনতার পরিচায়ক, ইংরাজের জাঁকজমক ও প্রভুত্বাদির্শনে তাঁহাদিগকে সর্ব্বাংশে আদর্শস্থানীয় মনে করাও তেমনই অসারগ্রাহিতা ও স্থূলদর্শিতার দ্যোতক।'[৬৮] ব্রাহ্মবাবুরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এই জাতীয় আচরণে অধিক মনোযোগ দিতেন বলে প্রগতিশীলবাবুদের একটি বড়ো অংশ তাঁদের মধ্যে থেকেই উঠে এসেছিল। পাশাপাশি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের একটি অংশ ছিলেন এই মনোভাবের ধারকবাহক। 'প্রগতি'র এই ভ্রান্ত অনুকারীরাই উনিশ শতকের নাটক-প্রহসনের ব্যঙ্গের লক্ষ্য। দ্বিতীয়ার্ধের প্রায় সূচনা থেকেই এঁদের প্রতি প্রতিবাদী কলম গর্জে উঠেছে। উল্লেখযোগ্য যে, এই প্রতিবাদ যাঁর হাতে প্রথম সার্থক ভাষা পায়, তিনি নব্যবাবুদের একজন প্রধান মুখ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ১৮৬০-এ প্রকাশিত 'একেই কী বলে সভ্যতা?'র মধ্যে নব্যবাবুদের এবং তথাকথিত শিক্ষিত 'ভদ্রলাক'বাবুদের অনাচার-ভণ্ডামি এবং হাস্যকর চরিত্র-লক্ষণগুলি যেভাবে তিনি ফুটিয়ে তুললেন, পরবর্তীকালে তারই অনুসরণ বা অনুকরণ চলেছে, দেখা যায়। মনে রাখতে হবে, প্রগতিশীলবাবুরা প্রচলিত শিক্ষা এবং বদলে যাওয়া আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থারই উপজাত। পূর্ববর্তীবাবুদের তথাকথিত দোষাবহ গুণগুলিকে তাঁরা আয়ত্ত করে নতুন শিক্ষা ও সভ্যতার উপাদানগুলিকে তার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছিলেন। উনিশ শতকের শেষপাদে নাটক-প্রহসনের জগৎ এই প্রগতিশীলবাবুদেরই নিন্দাকীর্তনে মুখর।

**একেই কি বলে সভ্যতা?**॥ মূলত বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনয়ের উদ্দেশ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের সঙ্গে ১৮৬০ সালে এই প্রহসনটিও রচনা করেন। যদিও দু'টি

প্রহসনের কোনোটিই শেষপর্যন্ত বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয়নি। তবে শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি ১৮৬৫ সালে দু'বার সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে। এই নাট্যশালার কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি ছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ, যদিও কিছুদিন পরে সম্ভবত মনোমালিন্যের কারণে এই নাট্যশালার সঙ্গে তিনি সম্পর্ক ছিন্ন করেন।[৬৯] তবুও এই নাটকাভিনয়ে তাঁর উপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর মতো প্রগতিশীল সংবাদপত্রও প্রহসনটির কিছু চরিত্র ও ঘটনা পারিবারিক নাট্যশালায় অভিনীত হওয়া উচিত নয় বলে মন্তব্য করেন; কারণ, তাঁদের মতে, এর দরুন 'সুরুচি ও সুনীতি ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে।'[৭০] প্রহসনটির মূল বিষয় পাশ্চাত্য প্রভাবে একদল নব্যবাবু এবং তথাকথিত শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' মধ্যশ্রেণির ভণ্ডামি, চারিত্রিক বিকৃতি, মদ্যাসক্তি এবং লাম্পট্য। শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' বাবুদের সভা-সমিতি প্রীতি, পারিবারিক ক্ষেত্রে ব্যভিচারের ইঙ্গিত ইত্যাদি বিষয় শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির ভদ্রলোক'বাবুদের পক্ষে অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল, 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র প্রতিক্রিয়াই তার প্রমাণ। নব্যবাবুদের দলভুক্ত মধুসূদন নিজেও মদ্যাসক্ত ছিলেন। এ প্রহসনে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রভাব অনেকাংশেই অনুমান করা যায়। কোনো নিটোল কাহিনি নয়, নব্যবাবু এবং শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' শ্রেণির ভণ্ডামির খণ্ডচিত্রের মধ্যে দিয়ে প্রহসনকার সময়ের উদ্ভ্রান্তি এবং বাবুদের অধঃপতনকেই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

প্রহসনের শুরুতেই আমাদের পরিচয় ঘটে দুই নব্যবাবু, (যদিও অর্ধশিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত) নবকুমার এবং কালীনাথের সঙ্গে। নবকুমারের পেটে যদিও কিছু বিদ্যে আছে, কালীনাথ অশিক্ষিত 'নব্যপন্থী'। বাড়ির কর্তা বৃন্দাবন থেকে হঠাৎ ফিরে আসায় নবকুমার খুব মুশকিলে পড়েছে। বাড়ি থেকে তার বেরোনোর উপায় নেই। লুকিয়ে দু'জনে ব্র্যান্ডি সেবন করতে করতে কী করে তাদের প্রতিষ্ঠা করা সভাটিকে রক্ষা করা যায়, নির্বিঘ্নে সভার কাজ চালানো যায়, একথাই ভাবতে থাকে। কালীনাথ ও নবকুমার উভয়েই পাঁড় মাতাল। লুকিয়ে মদ খেতে খেতে কালীনাথ নবকে বলেছে, 'দেখ, যে গুড জেনেরেল হয়, সে কি সুযোগ পেলে তার গ্যেরিসনে প্রোবিজন্ জমাতে কশুর করে?' অর্থাৎ কালীনাথও সুযোগ পেলে পাকস্থলিতে মদ সংগ্রহ করে রাখতে চায়। নবকুমারের পিতার সঙ্গে আলাপ করতে গেলে কালী যেন তাঁকে প্রণাম করে নিজের পরিচয় দেয়, এ কথা নব তাকে বললে সে বলেছে, 'কি পরিচয় দেবো বলো দেখি, ভাই? তোমাদের কর্তাকে কি বলবো যে আমি বিত্ররের— মুখটি— স্বকৃতভঙ্গ—সোণাগাছিতে আমার শত শ্বশুর না না শ্বশুর নয়— শত শাশুড়ির আলয়, আর উইলসনের আখড়ায় নিত্য মহাপ্রসাদ পাই—!' গরাণহাটার প্যারী আর তার ছুকরি বিন্দির ঘরেও যে তার যাতায়াত আছে, নবর সঙ্গে কথোকথনে এও জানা যায়। কালী শুধু মদ্যপ নয়, সে বেশ্যাবাজিতেও দড়ো।

কর্তার সঙ্গে কথোপকথনের জানা যায়, কালী বাঁশবেড়ের পরম বৈষ্ণব স্বর্গীয় কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। আপাতভাবে তার চেহারা দেখে কর্তার প্রথমে মনে হয়েছে, 'আহা, ছেলেটি দেখতে শুনতেও যেমন, আর তেমনি সুশীল। আর না হবেই বা কেন? কৃষ্ণপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র কি না?' কালীনাথ তাঁকে জানিয়েছে, সিকদার পাড়ার গলিতে তাদের 'জ্ঞান-তরঙ্গিনীসভা' বলে একটি সভা আছে। সেখানে প্রতি শনিবার একত্রিত হয়ে তারা 'ধর্ম্মশাস্ত্রের আন্দোলন' করে। তার মতে, 'আমাদের কলেজ থেকে কেবল ইংরাজী চর্চা হয়েছিল, তা আমাদের জাতীয় ভাষা তো কিঞ্চিৎ জানা চাই, তাই এই সভাটি সংস্কৃত বিদ্যা আলোচনার জন্য সংস্থাপন করেছি।' কর্তা প্রাথমিকভাবে প্রীত হলেও তাঁর সন্দেহ যায়নি। কি পড়া হয় জানতে চাওয়ায় অশিক্ষিত কালীচরণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার স্থলে 'শ্রীমতী ভগবতীর গীত' এবং জয়দেবের

গীতগোবিন্দের স্থলে 'বোপ্‌দেবের বিন্দা দূতী' বলেছে। এর দ্বারাই তার শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতার মুখোশটি উন্মোচিত হয়। বিকেল থাকতে থাকতেই তারা সভার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে।

উনিশ শতকে নব্যবাবুদের হাত ধরে সভা-সমিতি ক্রমশ শিক্ষিত বাঙালির 'প্রেজুডিসে' পরিণত হয়। প্রথম দিকে এই সভা-সমিতিগুলি ছিল যথার্থ অর্থেই আলাপ-আলোচনা তথা প্রগতিশীলতার কেন্দ্র। উনিশ শতকের বহু সফল-আপাত সফল আন্দোলন কিংবা সংস্কারের বীজ রোপিত হয়েছিল এ জাতীয় সভা-সমিতি থেকে। কিন্তু ক্রমেই এ জাতীয় সভা-সমিতিগুলি ছদ্ম-প্রগতিশীল বাবুদের দ্বারা পূর্ণ হতে থাকে, সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর তাগিদে অনেক অযোগ্য ব্যক্তি সভ্য হয়ে বসেন। কালধর্মে সভা-সমিতিগুলি হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত মোচ্ছব, অনৈতিক কাজকর্ম কিংবা নিরাপদ বাগাড়ম্বরের আগার। আপাত শিক্ষিত বাঙালিবাবুদের অন্তঃসারশূন্য সভা  প্রীতি এবং সভার আড়ালে পান-ভোজন-মোচ্ছবের সংস্কৃতিকে মধুসূদন তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। বাবাজির চোখ দিয়ে আমরা দেখি জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা যে পাড়ায়, সেখানে কেবল মাতাল-বেশ্যাদের ভিড়। মাতলামি, চুরিচামারি রদের জন্য দিনদুপুরেই সার্জেন্ট চৌকিদার নিয়ে ঘুরছে। জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায় একে একে আসতে দেখা যায়, হোটেলের বাক্স নিয়ে মুসলমান মুটিয়াকে, বেলফুলওয়ালা ও বরফওয়ালাকে, নিতম্বিনী পয়োধরী নামে দুই 'বাশ্‌বী' বা বেশ্যাকে। এসব দেখে নবকুমারদের প্রতিষ্ঠিত 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা'র হাল-হকিকত প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন থাকে না। মুটিয়াদের মধ্যে দ্বিতীয়জন বলেছে : 'দেখ্ মামু, এই হিঁদু বেটারাই দুনিয়াদারির মজা করে ন্যেলে। বেটারগো কি আরামের দিন ভাই। ... লেকিন ক্যেবল এই গরুখেগো বেটারগো দৌলতেই (মোগর পোঁচ ঘর এত ফেঁপে উঠতেছে; সাম হলেই ব্যাটারা বাদুড়ের মাফিক ঝাঁকে ঝাঁকে আসে পড়ে।' কলকাতার বাবু-জীবন তখন বাস্তবিকই উইলসনের হোটেল, মদ ও বেশ্যার প্রতি আংশিকভাবে দায়বদ্ধ। নবকুমার বাবাজিকে কিছু টাকা দিয়ে বশীভূত করেছে, যাতে বাবাজি নববাবুর বাবার কাছে গিয়ে সভার বিষয়ে যথার্থ সত্যটি গোপন রাখেন।

নবকুমারদের জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার সদস্য কতকগুলি বড়োলোকের বকাটে বাবু। চৈতন, বলাই, শিবু, মহেশ ইত্যাদি সভ্যদের কথোপকথন থেকে বোঝা যায় সকল সভ্যদের তুলনায় শিক্ষাদীক্ষায় নব ও কালী কিছুটা এগিয়ে। ফলে তারা দুজন সর্বদাই 'লিড' নিতে চায়, নিজেদেরকে সভার পক্ষে অপরিহার্য ভাবে। যদিও বলাই নব ও কালীন  বিদ্যাশিক্ষার বহর সম্পর্কে সংক্ষেপে খাঁটি কথাটি বলেছে যে, তাদের শিক্ষার দৌড় 'বিটুইন আওয়ার সেল্‌ব্‌স'। মহেশ স্মরণ করিয়ে দেয়, চিঠি লিখতে বসে ইংরেজি গ্রামার না জানায় নবর দুর্দশার কথা। নব ও কালীর দেরি দেখে সর্বসম্মতিক্রমে চৈতন সভার 'চ্যারম্যান' হয় এবং সভার কার্যাবলীস্বরূপ ব্র্যান্ডি আর তামাক সেবন, সেইসঙ্গে খেমটাওয়ালিদের গান শুরু হয়। বেশ্যাদের গান— 'এখন্ কি আর্ নাগর্ তোমার্/আমার্ প্রতি, তেমন আছে।/নূতন্ পেয়ে পুরাতনে/তোমার সে যতন্ গিয়াছে', বাবুদের বহুগামীতা ও লাম্পট্যের দিকে ইঙ্গিত করে।

নবকুমারের 'ইস্‌পিচ' থেকে জানা যায়, জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার সভ্যরা সকলে সভায় 'মীট করে যাতে জ্ঞান জন্মে তাই করে থাকি— এন্ড উই আর জলি গুড ফেলোজ।' তার বক্তব্যে নব্যবাবুদের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায় : 'আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপরষ্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রি হয়েছি; আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করি নে, জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়েচে ; এখন আমাদের প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা মন এক করে, এদেশের সোসিয়াল রিফরমেশন যাতে হয়, তার চেষ্টা কর।' 'সোসিয়াল রিফরমেশন' বলতে কী বোঝানো হচ্ছে

তাও নবকুমারের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়— 'মেয়েদের এডুকেট কর— তাদের স্বাধীনতা দেও— জাতভেদ তফাৎ কর— আর বিধবাদের বিবাহ দেও— তা হলে এবং কেবল তা হলেই, আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলন্ড প্রভৃতি সভ্য দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে— নচেৎ নয়।' অর্ধশিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবু নবকুমারদের কাছে এ দেশ উক্ত 'সোসিয়াল রিফরমেশনে'র অভাবে 'এক মস্ত জেলখানা'; তার মধ্যে 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভাগৃহ' হল তাদের একমাত্র 'লিবরটি হল'; অতএব 'এখানে যার যে খুশি, সে তাই কর।' নবকুমারের বক্তব্যের মধ্যে উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের গালভরা দেশাত্মবোধ, সামাজিক-সংস্কারের প্রসঙ্গ আছে। তাদের মন আর মুখ যে এক নয়, তা বেশ বোঝা যায় যখন, অচিরেই বেশ্যাদের নিয়ে মদ সহযোগে সভার সভ্যরা বাস্তবিকই নরক গুলজার করে ফেলে।

অর্ধশিক্ষিত নববাবুদের যে কেবল ভণ্ডামিই একমাত্র গুণ তা নয়, তারা লম্পটও। বাইরের গণিকার প্রতি আসক্তি তো আছেই, ঘরের মেয়েদের প্রতিও অনাসক্তি নেই। 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা' থেকে ফিরে এসে নিজের ভগিনীকে জড়িয়ে ধরে 'চুমো' খেতে নবর বাধে না। নবর স্ত্রী হরকামিনী ও নবর বোন কমলার কথাবার্তায় বাবুদের নিজ পরিবারের সঙ্গে ব্যভিচারী সম্পর্কের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-এর পরবর্তীকালের সাড়া জাগানো 'হরিদাসের গুপ্তকথা'র কাহিনিগুলি যে নিতান্ত কল্প-কল্পনার, তা বলা যায় না। নববাবু অবশ্য ফাউল কাটলেট, মাটন চপ সহযোগে ব্র্যান্ডি পান করে বেহেড মাতাল হয়ে ফিরে এসেছে এবং ঘরের মেয়েদের বেশ্যাদের নামে সম্বোধন করে কর্তার চোখে ধরা পড়ে গেছে। হরকামিনীর শেষ আক্ষেপোক্তিতেই নাট্যকারের মূল বক্তব্য প্রতিফলিত, 'মদ মাস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়?— একেই কি বলে সভ্যতা?'

মনে রাখতে হবে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ার দিকেই মধুসূদন শিক্ষিত বাবুকুলের দেশোদ্ধারের নামে অনৈতিক আচরণ ও অভ্যাসের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। সেইসঙ্গেই অন্তঃসারশূন্য বক্তৃতাসর্বস্ব প্রগতিশীলবাবুদের কথায় ও কাজে ফাঁক ও ফাঁকিটুকু দেখিয়ে দিয়েছেন। এইসময় থেকেই কেবল রক্ষণশীলদের পক্ষ থেকেই নয়, স্বপক্ষীয়দের কাছেও নব্য ও 'ভদ্রলোক'বাবুদের আচার-আচরণ সমালোচিত, নিন্দিত হচ্ছিল, তা অনুভব করা যায়। উত্তরকালে বটতলা এবং তথাকথিত মূল ধারার নাট্যকার প্রহসনকারেরা এই ধারাকেই পরিপুষ্ট করেন।

**কিঞ্চিৎ জলযোগ**॥ ১৮৭২ সালে প্রকাশিত এই প্রহসন রচনার মধ্য দিয়েই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নাটক রচনা শুরু করেন। এই প্রহসনে নব্যপন্থী ব্রাহ্মবাবু এবং স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতি কটাক্ষ আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন : 'এ সময়ে আমি কিন্তু পুরাতনপন্থী ছিলাম, তাই মেয়েদের স্বাধীনতা ব্যাপার লইয়া এই গ্রন্থে একটু হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছিলাম। প্রহসনখানি প্রকাশিত হওয়ার পর প্রায় প্রত্যহই দেখিতাম Indian mirror-এ আমার উপর কিছু না কিছু আক্রমণ থাকিতই। আক্রমণকারীদের মতে বইখানি অশ্লীল বিবেচিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণে এ পুস্তকে আমার নাম ছিল না, তবুও কি করিয়া যেন আমার নাম প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল— তাই সমস্ত আক্রমণ আমার নামেই হইত। নব্যপন্থী দলে এই বই লইয়া খুব একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছিল।'[৭২] বর্তমান প্রহসনে কেশবচন্দ্র সেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ভারত-আশ্রমে'র প্রতি সরাসরি ব্যঙ্গ করা হয়েছে। ১৮৭০ সালে কেশবচন্দ্র সেনের বিলেত গমনের আগে ১৩ নং মির্জাপুর স্ট্রিটের একটি তিনতলা বাড়ি ভাড়া নিয়ে কেশবচন্দ্র এবং আরও কয়েকটি ব্রাহ্ম পরিবার একত্রে থাকতে শুরু করেন। বিলেত থেকে ফিরে এসে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের

পক্ষে জয়গোপাল সেনের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে কেশবচন্দ্র 'ভারত-আশ্রম' আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৩ সালে সদস্য সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় বাবু ব্রজনাথ ধরের বাগানবাড়ি কিনে কাঁকুড়গাছিতে আশ্রমটি স্থানান্তরিত হয়। 'ভারত-আশ্রম' প্রতিষ্ঠার পিছনে একটি বিশেষ ভাবনা কাজ করেছিল— 'সকল ব্রাহ্মভক্ত তো একই ঈশ্বরের সন্তান, নরনারীর সম্পর্কে তো ভ্রাতা-ভগিনীর সম্পর্ক। এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে বৃহত্তর এক পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য কেশবচন্দ্র আশ্রমের পরিকল্পনা করেন।'[৭৩] মূলত এই আশ্রম ছিল ধর্মশিক্ষার ক্ষেত্র। পূর্ববঙ্গ থেকে অনেকেই সপরিবারে এই আশ্রমে থাকতে আসতেন মূলত নীতি ও ধর্মশিক্ষার ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়ে। মেয়েদের পর্দা প্রথা তুলে দেওয়া হয়। পূজা, উপাসনা, শাস্ত্রপাঠের পাশাপাশি প্রথাগত শিক্ষা, গার্হস্থ্য ধর্ম ইত্যাদিও শেখানো হত। নরনারীর একত্রে আলাপ, উপাসনা, আহার ইত্যাদিও প্রচলিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই সেকালের পত্রপত্রিকায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রক্ষণশীল গোষ্ঠীরা তো এ ব্যাপারে খড়্গহস্ত হয়েই ছিলেন, ব্রাহ্মদের মধ্যেও মতভেদ দেখা দিয়েছিল। আপাতভাবে সম্পর্কহীন অনেক পরিবার একসঙ্গে থাকতে শুরু করলে ব্যভিচার, অনৈতিকতা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে, এমন আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। এই অবস্থায় ভারত-আশ্রমের একেবারে গোড়ার দিকেই ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রধান আচার্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারের কেউ এমন প্রহসন লিখতে পারেন, এটা মেনে নিতে পারেননি কেশবপন্থী পত্রপত্রিকা। যদিও আলোচ্য প্রহসনে প্রগতিশীলবাবুর ভণ্ডামি, অনাচার, অনৈতিক জীবনযাপনই মুখ্য হয়ে উঠেছে, সে সত্যও অস্বীকার করা যায় না।[৭৪] তথাকথিত ব্রাহ্মবাবুদের শিক্ষাদীক্ষার সংস্কৃতি তাঁদের মন থেকে সাধারণ বাবুদের লক্ষণগুলিকে নিঃশেষ করতে পারেনি, এ নাটকের ডাক্তারবাবু পূর্ণচন্দ্রই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 'ফোতোবাবু' পেরুরামও কম যায় না। সাধারণ কেরানি হয়েও বর্তমানে সে বেকার, তবুও রক্ষিতা পোষার শখ তার যায়নি। এদের মাঝখানে আছেন ব্রাহ্ম বিবি পূর্ণচন্দ্রের গৃহিণী বিধুমুখী ঘোষ। ঘটনার আকস্মিকতা ও নিপুণ ব্যঙ্গে প্রগতিশীল ব্রাহ্মবাবুদের নারীস্বাধীনতার নামে তীব্র ব্যঙ্গ করা হয়েছে। অথচ তথাকথিত শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের রক্ষিতা-বিলাস আশ্চর্যজনকভবে লেখকের নীরব সমর্থন পেয়েছে।

পেরুরাম কেরানির কাজ করলেও বর্তমানে বেকার। কোনো একটি বিবাহ সভা উপলক্ষ্যে নাচের আসরে পাওনাদারের মুখোমুখি পড়ে যায় সে। পাওনাদার বাকি টাকার দায়ে তাকে তাড়া করলে সে ভুল করে দণ্ডায়মান একটি পালকিতে উঠে বসে এবং এসে পৌঁছোয় প্রায় জনহীন একটি বড়ো বাড়িতে। বাড়ির মালিক ডক্টর পূর্ণচন্দ্র ঘোষ এবং মালকিন বিধুমুখী নব ব্রাহ্ম। বিধুমুখী প্রত্যহ উপাসনা-গৃহে যান, সেখানে 'পরমগুরু, পরমপূজনীয়, শ্রদ্ধাস্পদ, ভক্তিভাজন পাপরি গতি' পতিতপাবন সেন ধর্ম উপদেশ দেন। বিধুমুখী মদ খাওয়া একদম বরদাস্ত করতে পারেন না। যদিও 'উন্নতশীল ব্রাহ্ম'দের মধ্যে মদ খাওয়ার চল আছে। পূর্ণচন্দ্র কিঞ্চিৎ বেশি মদ খেয়ে মাতালের মতো আচরণ করলে বিধুমুখী তাঁকে 'মাতাল' বলেন। এতে পূর্ণচন্দ্র বলেছেন, 'হ্যাঁ ডিয়ার, মদ খেলে কি কখনো পাপ হয়, স্যানজার কাছে এতদিন লেকচার শুনে কি শেষে এই বিদ্যে হল?' তিনি স্ত্রী-গত প্রাণ, যদিও তা বাহ্য দিক দিয়ে। প্রচ্ছন্নভাবে শ্যামবাজারের বেশ্যা কামিনী তাঁর বাঁধা রক্ষিতা। বিবাহের পূর্ব থেকেই এই রক্ষিতার প্রতি তিনি অনুরক্ত। বিধুমুখীও এ ব্যাপারে তাঁকে সন্দেহ করেন। তবে অভিসার ও মদ্যপান নিরবচ্ছিন্ন রাখতে প্রত্যক্ষভাবে পূর্ণবাবু স্ত্রীর সকল কথাতেই সায় দেন। তাঁর কথায় : 'তুমি যা বলো, আমি তাই শুনি। বললে, সাঁইজির গির্জেয় যাব, ভালো, বললে রবসেনের ওখানে চা খাব, ভালো তাই খাও। বললে, মেয়েমানুষের স্বাধীনতা আছে, আমি

যেখানে খুশি উড়ব— ভালো, তাই ওড় গিয়ে। আমি কোন্ কথাটা শুনিনি বলো দেখি ডিয়ার?' অবশ্য, শেষপর্যন্ত মদখাওয়ার জন্য বিধুমুখীর নির্দেশানুযায়ী উপর দিকে হাত তুলে করজোড়ে পরমপিতার কাছে ক্ষমা চাওয়ার দরুন 'প্রভু তাঁকে মার্জনা করেছেন' এমনটি বলেছেন বিধুমুখী।

ব্রহ্মসভার প্রচারক প্রেমনাথবাবু বিধুমুখীর প্রতি অযাচিতপ্রাণ। পালকির অভাবে বিধুমুখী বিপদে পড়লে হাত ধরে অন্ধকার রাস্তা পার করে বিধুমুখীকে তিনি গৃহে দিয়ে যান। একদিন সারা দুপুর বিধুমুখীর গৃহে এসে তাঁকে ধর্মশিক্ষার আলোচনা শুনিয়েছেন, এমনটিও পূর্ণচন্দ্র জানতে পেরেছেন। তবুও প্রগতিশীল বাবু বলেই স্ত্রী-চরিত্রে তিনি আপাতভাবে সন্দেহ করেন না। স্ত্রীকে নানারকম ভাঁওতা দিয়ে অসুস্থ মরণাপন্ন রোগীকে দেখতে যাচ্ছেন বলে তিনি বেরিয়ে কামিনী বেশ্যার কাছে যান। ফেরেন একেবারে ভোররাতে।

এদিকে পেরুরামও কামিনীর পুরোনো ঘাতক। সে তার সমস্ত টাকাপয়সা কামিনীর চরণেই ঢেলে দিয়েছে। কামিনীর জন্যই বাজারে তার এত ধার। সেই কামিনীর ঘর থেকে প-বাবুর লেখা প্রেমের চিঠি পেয়ে তার মোহভঙ্গ হয়েছে। যদিও এই প-বেটাকে জানার চেষ্টা করছে সে। সে আক্ষেপ করেছে, 'কামিনী! এই কি তোর ধর্ম; এতদিন খাওয়ালাম পরালাম, শেষকালে কিনা তুই আর একজনের হলি?' পেরুরাম সেই জনৈক প-বাবুর লেখা চিঠিটা পকেটে নিয়ে ঘুরছে। অবশ্য বিধুমুখীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, চোর ভেবে বিধুমুখীর প্রথমে ভয় পাওয়া পরে আশঙ্কামুক্তি, পেরুরামকে প্রেমনাথ নাম দিয়ে স্বামীর সন্দেহ যাচাই ইত্যাদির শেষে জানা যায়, প-বাবুটি আর কেউ নয়, কামিনির গুপ্ত প্রেমিক হলেন পূর্ণচন্দ্র ঘোষ স্বয়ং। যদিও পেরুরাম সদ্য পাওয়া 'সরকারে'র চাকরিতে যাতে বহাল থাকতে পারে তার জন্য তাৎক্ষণিক বুদ্ধি প্রয়োগ করে অবস্থা নিজের আয়ত্তে আনে এবং 'মধুরেণ সমাপয়েৎ ঘটে।

নাটকটিতে তৎকালীন শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের দ্বিচারিতার ছবি স্পষ্ট। এদিকে প্রগতিশীল, উন্নত, আধুনিক হলেও ব্রাহ্মবিবিরা যেমন স্বামীর ব্যাপারে সতর্ক-সন্দিহান, তেমনি আবার মুখে প্রগতিশীল, একনিষ্ঠ বললেও ব্রাহ্মবাবুদের মধ্যেও মদ্যাসক্তি এবং লাম্পট্যদোষ প্রবল। ব্রাহ্মসভার অবাধ মেলামেশার সুযোগে প্রেমনাথবাবুর মতো সুদর্শন, মিষ্টভাষী বাবুরা অপরের অন্দরমহলে যখন-তখন নানা অভিলাষে ঢুকে পড়তে দ্বিধা করতেন না। রক্ষণশীলদের দৃষ্টিকোণ থেকে স্ত্রীস্বাধীনতা, ব্রাহ্মবাবুদের অন্তঃসলিলা পাপ বিকৃতি ও আসক্তির কথা তুলে ধরেছেন প্রহসনকার। মিথ্যাচারণ ও মিথ্যাভাষণ যে ব্রাহ্মবাবুদের অলংকারস্বরূপ হয়ে উঠছে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা বেশ অনুভব করা যায় আলোচ্য প্রহসন থেকে।

**মা এয়েচেন॥** ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত অজ্ঞাত লেখকের লেখা 'মা এয়েচেন!!!' প্রহসনটি জনৈক শিক্ষিত উকিল বাবুর বেশ্যা দ্বারা প্রতারিত হওয়ার কাহিনি।[৭৫] তৎকালীন শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক' বাবুরা বেশ্যাগিরির মতো কদর্য শখটিকে বহন করে চলতেন। তাঁদের পারিবারিক জীবন উপেক্ষিত হত। বাগানবাড়ি কিংবা বেশ্যাগৃহেই তাঁদের তীর্থক্ষেত্র ছিল। আর এভাবেই বেশ্যার প্রভাবে বশীভূত হয়ে তাঁরা ধন-মান-কুল সব বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করতেন না। অতি ক্ষুদ্র এই প্রহসনে হাস্যজনক পরিস্থিতির মাধ্যমে যেমন বাবুদের স্বভাবের বিকৃতি তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি কুলীনদের বিশেষ বিবাহ প্রথাই যে অগণিত বেশ্যার সৃষ্টির কারণ, সেই সামাজিক সত্যের দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রহসনে দেখা যায়, কানাইবাবু পেশায় উকিল। মামলা-মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে প্রায়শই তাঁকে বাইরে যেতে হয়। ঘরে আছেন শশিকলা নামের সতীসাধ্বী পত্নী। কিন্তু তাঁর প্রতি কানাইবাবুর মন নেই। তিনি

মোহিনী নামে এক বেশ্যার প্রণয়াসক্ত। মোহিনী অবশ্য বাঁধা রক্ষিতা হয়েও কানাইবাবুর অগোচরে ও অনুপস্থিতিতে অন্য মানুষদের মনোরঞ্জন করে। বাঁধা বাবু ছাড়াও অন্য বাবুতে তার অরুচি নেই। মোহিনীর বন্ধু বেশ্যা কামিনী তাকে জিজ্ঞাসা করেছে, 'তুমি একজন ভদ্রলোকের কাছে রয়েছ, সে খেতে দিচ্ছে, পত্তে দিচ্ছে, গয়না দিচ্ছে, আর যখন যা চাচ্ছ, তাই যোগাচ্ছে, তবু তুমি তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে অপর মানুষের সঙ্গে বাগানে যাচ্ছ, অপর মানুষকে ঘরে আন্‌ছ, এটি ভাই তোমার কেমন বিবেচনা?... ইহকাল পরকাল তো আমাদের গেছেই, তবু নেমক হারামি করাটা কি ভাল?' কামিনী কুলীন ঘরের মেয়ে, অতি বৃদ্ধ বরের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। বিবাহের পর সে আর কোনোদিন বরের মুখ দেখেনি। অতঃপর মামাতো ভাই তাকে ঘরের বাইরে বার করে এনে পরিত্যাগ করে। এখন সে একটি সাধারণবাবুর বাঁধা হয়ে আছে। কোনোরকমে পেটের ভাত জুটে যায়। তবে তাতেই সে সুখী। কুলীন কন্যাদের এ হেন পরিণামের জন্য সামাজিক সংস্কার যেমন দায়ী, তেমনি এর দায় কিছু লম্পট বাবুদেরও। মোহিনী অবশ্য কামিনীর কথা শুনতে রাজি নয়। তার সাফ কথা, 'এত ধর্ম্ম ধর্ম্ম করলেই তুই অন্ন করে খেয়েছিস। আমি কারো কেনা দাসী নাকি? একজনের ভাতে কি আমাদের পেট ভরে? আমাদের জেতের ধর্ম্মই এই। রেখেছে, খরচাপত্র দিচ্ছে, গরজে দিচ্ছে, তা বলে কি আমি ঘরে দুটি পাঁচটি বন্ধুবান্ধব দিয়ে আমোদ-আহ্লাদ কর্‌বো না?'

অতএব কানাইবাবু 'কলকাতায় নেই, শ্রীরামপুরে গিয়েছেন, আজ ফিরবেন না' জেনে মোহিনী নতুন বাবুটিকে সন্ধ্যের সময় ঘরে আসতে বলে। এদিকে কানাইবাবু তিনদিনের জন্য যাচ্ছেন বলে দু'দিনের দিন রাতে ফিরে এসে দরজা খুলতে দেরি দেখে ধর্মপত্নীর উপর রুদ্রমূর্তি ধরেন। লুচি, ডাল, পাঁঠার ঝোল হলেও হাঁসের ডিমের দম রান্না হয়নি বলে স্ত্রীকে 'হারামজাদির মেয়ে হারামজাদি' বলে গালিগালাজ করে ঠেলে সব খাবার ফেলে দিয়ে বেরিয়ে যান। তাঁর গন্তব্য, মোহিনীর আলয়। কাশীমুখী জানেন, এটাই তাঁর ভবিতব্য; তিনি স্বগতোক্তি করে বলেছেন : 'আহা! একটু যদি বস্‌তেন,— আমি কি আর ওঁকে যেতে বারণ কত্তেম, আর বারণ কল্লেই কি থাক্‌তেন? তেমন অদৃষ্ট কি আমার? রোজই তো যান, ঘরে আর কবে থাকেন? এমনি কপাল, বিয়ে হয়ে অবধি একটী দিনও দুদণ্ড ভালো করে দেখ্‌তে পাইনি। তাও সচ্চে, একবার খাবার সময় ঘরে আসেন, তখনও যদি দুটো মিষ্টি কথা কন, তবু প্রাণটা জুড়োয়। তাও নয়, কেবল লাঞ্ছনা আর ছিছিকার।' সেকালে অধিকাংশ বাবুরাই যা করতেন, শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' হয়েও কানাইবাবু তাই-ই করেছেন ঘরে বিবাহিতা স্ত্রীকে লাঞ্ছনা করে তিনিও বাঁধা রক্ষিতার ঘরে গিয়ে পৌঁছেছেন।

মোহিনী তখন নতুন নাগর গিরিশবাবুর সঙ্গে প্রণয়সম্ভাষণ ও ফুর্তি করছিল। অসময়ে কানাইবাবুর হাঁকডাক শুনে উপায়ান্তর না দেখে গিরিশবাবুকে শাড়ি পরিয়ে সে তার মা সাজিয়ে কানাইকে ঘরে ঢুকতে দিয়েছে। বাঁধা বাবু থাকা সত্ত্বেও সে যে অন্য বাবুদের মনোরঞ্জন করছে, এই 'বেপরোয়া' সাহসের কথা গিরিশবাবু তুললে মোহিনী বাঁধা 'বানর'-এর সঙ্গে তুলনা করে বলেছে, 'এই আমাদের বানরকে যা বলে বুঝাই, তাই বোঝে।' কানাইবাবু এলে শাড়িপরা গিরিশবাবুকে সে মা বলে পরিচয় দিয়েছে। কানাইবাবু মা ভেবে গিরিশকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেছে। এমনকী কানাইবাবুকে দু'দুবার পাঠিয়ে মা-এর সন্দেশ ও শাড়ি কিনিয়ে নিয়ে এসেছে। সেইসঙ্গেই তার প্রাপ্য হার এখনও এনে না দেওয়ায় কপট অভিমান দেখিয়েছে। কানাইবাবুর কথা থেকে জানা যায়, তিনি সত্যি সত্যি মোকদ্দমার জন্য শ্রীরামপুর যাননি; পূর্বদেশ থেকে আসা ভালো স্যাকরার কাছে হার আনতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে হার ও ইয়ারিং নিয়ে এসেছেন মোহিনীর জন্য। তাঁর কথায়, 'বাড়িতে বলে গিয়েছিলাম মোকদ্দমা আছে,— হুঁ! আমার আবার মকদ্দমা, মকদ্দমা বল, মামলা বল, টাকা বল, কড়ি বল, আর এই পৃথিবীতে যা আছে সবই বল, সকলি আমার তুমি!'

কানাইবাবুর এই উচ্ছ্বাস বেশিক্ষণ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মোহিনীর মায়ের শাড়ি বদলানোর সময় দেওয়ালে 'আবছায়া' দেখে তিনি বুঝতে পেরেছেন, এটি স্ত্রীলোক কোনোমতেই হতে পারে না। মোহিনীর গুপ্ত নাগর, অন্য কোনো বাবু। মোহিনীকে মিথ্যেবাদী, বেইমান বলায় মোহিনী মুটে ডেকে সব জিনিসপত্র নিয়ে কানাইবাবুকে গালি দিতে দিতে চলে গেছে। কানাইবাবু খাটের তলা থেকে ছড়ি, মদের গ্লাস এসব আবিষ্কার করে সন্দেহের সত্যতা বুঝতে পেরেছেন। তাঁর অনুশোচনা থেকে জানা যায়, ঘরে তাঁর ধর্মপত্নী তৃতীয় পক্ষ, 'সতীসাধ্বী' মহিলা। তাঁকে অপমান, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা করে এসেছেন বলে তিনি অনুতপ্ত হন। পাশাপাশি 'পরমাসুন্দরী সাধ্বীসতী বিবাহিতা স্ত্রীকে যারপরনাই কষ্ট দিয়ে এই মোহিনীর মোহিনী মায়ায় আমি গুটিপোকার মতো বদ্ধ হয়েছিলেম, উরি জন্যে আমার সর্বস্ব গিয়েছে!' বেশ্যাগিরির মতো চরিত্রদোষে শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুরাও শ'য়ে শ'য়ে সর্বস্বান্ত হতেন। এই উদ্দেশ্যমূলক প্রহসনে আকর্ষণীয় ঘটনাক্রমে সে সত্যই উদ্ভাসিত হয়েছে।

এমন কর্ম আর করব না বা অলীকবাবু।। শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের হাতে শিক্ষিতা কন্যা সম্প্রদান করার আকাঙক্ষায় অনেকে কীভাবে প্রতারিত হতেন এবং বাহ্য চাকচিক্যের রোশনাইতে বিভ্রান্ত হয়ে গিল্টিকেই আসল সোনা বলে ভেবে ভুল করতেন, তারই এক হাস্যকর নিদর্শন 'অলীকবাবু' তথা 'এমন কর্ম আর করব না' প্রহসনটি।[৭৬] ১৮৭২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই প্রহসনেও শিক্ষিত মেয়েদের দুর্দশা, অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ হওয়ায় বাস্তবতাবোধের অভাব এবং তথাকথিত শিক্ষিত 'বাবু'দের অন্তঃসার শূন্যতার কথাই প্রকট হয়েছে।

অলীক প্রকাশ আদতে একজন 'ফোতোবাবু', কিন্তু সে শিক্ষিত প্রগতিশীল 'ভদ্রলোক'বাবুর ভেক ধরে সত্যসিন্ধু বাবুকে প্রতারিত করতে চেয়েছে। কারণ, তার লক্ষ্য সত্যসিন্ধুবাবুর মেয়ে হেমাঙ্গিনীকে বিবাহ করে সত্যসিন্ধুবাবুর অগাধ সম্পত্তি হস্তগত করা। এইজন্য সে বাড়ি ভাড়া করে সে বাড়িকে নিজের বলে চালিয়ে সত্যসিন্ধুকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে। তার গুণ বলতে সে বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে ওস্তাদ। তার কথার জাদুতে নভেল পড়ে পড়ে মাথা বিগড়ে যাওয়া হেমাঙ্গিনী নিজেকে আয়েষা বলে ভাবতে শুরু করেছে। অলীককে ছাড়া সে আর কাউকে বিবাহ করবে না পণ করেছে। সত্যসিন্ধুবাবু কৃষ্ণনগরের মানুষ। কলকাতার হালচাল কিছুই জানেন না। অলীক তাঁকে আকাশকুসুম অনেক গল্প শুনিয়েছে। অনেক রাজা মহারাজের সঙ্গে তার খাতিরের কথা, রাজকন্যাদের সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্য রাজাদের ঝোলাঝুলির কথা, বিডন স্ট্রিটের বাগানবাড়ি কেনা এবং দেড় লক্ষ টাকা দিয়ে তা বেচে দেবার কথা। সত্যসিন্ধুবাবু ইংরেজি জানেন না, সংস্কৃতও তথৈবচ; তবে বিষয়কর্মে পারসির প্রয়োজন হত বলে, তাই জানেন। অতএব অলীক সত্যসিন্ধুবাবুকে বিদ্যার পরাকাষ্ঠা প্রমাণ করতে শেক্সপিয়রের লেখা 'ওয়েবস্টার ডিক্সনারি' বলে নভেল কিংবা বায়রনের 'চেম্বার্স অ্যাটলাসে' লেখা উদ্ধৃতি আওড়েছে। সেইসঙ্গে কালিদাসের 'মুগ্ধবোধ' থেকেও শ্লোক শুনিয়ে ছেড়েছে। তার বিদ্যার গভীরতা দেখে পাড়াগেঁয়ে জমিদার সত্যসিন্ধুবাবু আপাতভাবে চমৎকৃত হয়েছেন। তবু তিনি অলীককে আরও পরীক্ষা নিয়ে তবে মেয়ের বিবাহ দিতে চান বলায় অলীক জনান্তিকে স্বগতোক্তি করেছে, 'কি উৎপাত! এত করে ইস্কুল থেকে এড়িয়ে আবার বুড়ো বয়সে এগ্‌জামিনের দায়ে পড়তে হল নাকি!' ভাবী শ্বশুরকে প্রভাবিত করতে অলীক 'হুমোপাথি' (হোমিওপ্যাথি) বা হনুমানপন্থী শাস্ত্র আওড়েছে, আইন-আদালতের নানা ধারার কথা বলেছে। তার বারফাট্টাই কথার অসত্যতা ধরা মুশকিল হয়েছে স্বল্পশিক্ষিত সত্যসিন্ধুর পক্ষে।

এদিকে প্রতিবেশী প্রভাবশালী ধনীবাবু জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের মোসাহেব গদাধর হেমাঙ্গিনীর দাসী বিধবা প্রসন্নের বিবাহার্থী। কারণ, বিধবা বিবাহ করলে জগদীশবাবু তাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবেন এবং হেমাঙ্গিনীর বিবাহে প্রসন্ন যে হাজার টাকা পাবে, তাও হস্তগত করা যাবে। এইজন্য অলীক ও হেমাঙ্গিনীর বিবাহ যাতে হয়, সে কারণে অলীকের মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করতে কখনো জমির ব্যাপারী লাটুভাই, কখনো চীনেম্যান, কখনো জগদীশবাবুর ভাগ্নে জগদীশের ছদ্মবেশ ধারণ করে সত্যসিন্ধুবাবুকে দেখা দিয়েছে। এসবের ত্র্যহস্পর্শে সত্যসিন্ধু অলীককে যখন কেওকেটা ভাবতে শুরু করেছেন, তখন অলীক তাকে জানিয়েছে, জগদীশ মুখোপাধ্যায় তাকে বাঙাল ব্যাঙ্কের দেওয়ানি পদটি পাইয়ে দিচ্ছেন। এসব ‘অলীক’ কথাকে সত্যসিন্ধু যথার্থ ধরে নিয়ে যখন মেয়ের বিবাহে মনস্থির করেই ফেলেছেন, তখন আসল জগদীশ মুখোপাধ্যায় অলীকপ্রকাশের পিতার একটি চিঠি নিয়ে উপস্থিত হন।

তাতে জানা যায়, অলীকপ্রকাশকে জগদীশবাবু কোনোকালেই দেখেনি, তবে তার বাবা অখিলপ্রকাশ দাসকে তিনি একটি কাজ পাইয়ে দিয়েছেন। অখিলপ্রকাশ এখন মুর্শিদাবাদে সেরেস্তাদারি করে। অতঃপর নানা গোলোযোগের মধ্য দিয়ে অলীকের মিথ্যার স্বরূপ উন্মোচিত হয়। ভাড়া বাকির দায়ে অলীককে পুলিস গ্রেপ্তার করলে হেমাঙ্গিনী বঁটি হাতে অন্তঃপুর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে ‘দুর্গেশনন্দিনী’ নভেলের ভাষায়, ‘আমি পিতার সমক্ষে, সমস্ত জগতের সমক্ষে, মুক্তকণ্ঠে বলছি, এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর...’ ইত্যাদি বলতে থাকেন। এর প্রতিক্রিয়ায় সত্যসিন্ধুবাবু বলেছেন, ‘আমি কি কুক্ষণে আমার মেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে গিয়েছিলেম, তার ফল এখন ফলছে। রাম রাম! কি লাঞ্ছনা! আমার আর একটি ছোটোমেয়ে আছে, তাকে আর লেখাপড়া শেখাচ্ছি নে— এবার বিলক্ষণ শিক্ষা হয়েছে।’ অবশ্য জগদীশবাবু সেকথা নস্যাৎ করে বলেছেন, লেখাপড়া অবশ্যই প্রয়োজন, সেইসঙ্গে প্রয়োজন ‘পিতামাতার উপদেশ দৃষ্টান্ত।’ অবশেষে হেমাঙ্গিনীকে বিবাহ না করার শর্তে সত্যসিন্ধু অলীকের বাড়িভাড়ার টাকা শোধ করেছেন। অলীকও ক্ষমা চেয়ে সেখান থেকে পলায়ন করে বেঁচেছে।

আপাত হাস্যরসের আড়ালে উপরচালাক, বাগাড়ম্বর সর্বস্ব, আপাতশিক্ষিত বাবুদের প্রতি লেখকের ধিক্কার ও ব্যঙ্গ গোপন থাকে না। সেইসঙ্গে নভেল পড়া বাস্তবতা বোধহীন স্ত্রীশিক্ষার প্রতিও ‘তৎকালে পুরাতনপন্থী’ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তীব্র কটাক্ষ লক্ষ করা যায়। শিক্ষিত বাবুদের ভণ্ডামি ও মিথ্যাচার সেকালের প্রগতিশীলবাবুদের একটি সাধারণ চরিত্রধর্মকেই ফুটিয়ে তোলে।

সুরুচির ধ্বজা।। প্রগতিশীলবাবুদের ‘প্রগতি’র নামে উৎকট আচার-আচরণ এবং ব্রাহ্মদের ভণ্ডামি ও নীতিহীন আদর্শ রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচিত হয়েছে। ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত রাখালদাস ভট্টাচার্যের এই প্রহসনটি নব্য সংস্কৃতি নির্ভর রীতিনীতির প্রতি তথাকথিত শিক্ষিত ‘ভদ্রলোক’বাবুদের উৎকট আসক্তি এবং তার দরুন প্রচলিত মূল্যবোধের বিপর্যকে তুলে ধরতে চেয়েছে। নাটকটিতে নাম না করেও ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের ‘ভারত আশ্রম’-এর প্রতি ব্যঙ্গ আছে। যদিও ‘ভারত আশ্রম’ ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দেই আভ্যন্তরীণ নানান গোলোযোগে বন্ধ হয়ে যায়, তবুও ১৮৮৬ সালে অর্থাৎ প্রায় দশ বছর বাদে লেখা প্রহসনেও এর জের আছে। সমকালীন সমাজে ব্রাহ্মদের এই একসঙ্গে আহার-বিহার এবং উপাসনাগৃহে ব্রাহ্ম-বিবাহের প্রথা পর্যন্ত এই প্রহসনের পরিসরে আলোচিত হয়েছে। ব্রাহ্মধর্মে ধর্মান্তরিত করতে শিক্ষিত বাবুদের কীভাবে নানান উপায়ে প্রভাবিত ও প্ররোচিত করা হত, তারও চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক। সেকালে ব্রাহ্মদের নামে, বিশেষত কেশবচন্দ্র সেনের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে এ জাতীয়

অভিযোগ-কুৎসাও রটনা নিত্যনৈমিত্তিক ছিল।[৭৭] হিন্দু রক্ষণশীলরা তো বটেই, কোচবিহার বিবাহের ঘটনার পর ব্রাহ্মদের এক অংশও কেশবচন্দ্র ও তাঁর 'ভারত আশ্রমে'র নামে নানাবিধ অনৈতিক অভিযোগ ও কুৎসা নিয়ে আলোড়ন তোলে। শিক্ষিত প্রগতিশীল ব্রাহ্মবাবুদের ক্রিয়াকলাপ সমালোচিত হয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু প্রমুখ মূল ধারার লেখকদের রচনাতেও। নেটিভ ম্যারেজ বিল নিয়ে বিতর্ক, ব্রাহ্মরা হিন্দু কি না এ বিষয়ে বিতর্ক, সেইসঙ্গে সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার প্রতিবাদ ব্রাহ্মদের এ সময় কোণঠাসা করে ফেলে। শিবনাথ শাস্ত্রী এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এইসময় হইতেই দেশের লোকের মনের উপরে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি অল্পে অল্পে হ্রাস পাইতে লাগিল। আমরা অনুভব করিতে লাগিলাম, কেশবচন্দ্র সেন আর পূর্ব্বের ন্যায় নব্যবঙ্গের অবিসংবাদিত নেতা রহিলেন না; এবং যুবক দলের তাঁহার দিকে আর সে প্রবল আকর্ষণ থাকিল না। ওদিকে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই তাঁহার বিরোধী দল দেখা দিল; ..... যুবক দলের উপর হইতে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি চলিয়া গেল।'[৭৮] হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের পর্বে বটতলার প্রহসনকাররা হতশ্রী ব্রাহ্মধর্মের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকতে বদ্ধ পরিকর ছিল। প্রগতিশীলবাবুদের প্রসঙ্গে এ কারণেই বারবার ব্রাহ্মবাবুরা সমার্থক হয়ে যাচ্ছেন দেখা যায়। একইসঙ্গে ব্রাহ্ম-মহিলাদের স্বাধীন ও অবাধ জীবনাচরণও অতিশয়োক্তির মধ্যে দিয়ে লোকমানসে বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল। 'সুরুচির ধ্বজা' প্রহসনে প্রগতিশীল ব্রাহ্মবাবু-বিবিদের সেই জীবনাচরণ ও ভাবনার সম্ভব-অসম্ভব একটি আভাস আছে।

প্রহসনটিতে দেখা যায়, বাঙাল গিরিধারী একজন সহজ সরল গ্রাম্য ধনী জমিদার। তাঁর পুত্র লালচাঁদ শহরে এসে নব্যবাবু হয়ে উঠেছে। ইতিপূর্বে পিতা তার বিবাহ দিলেও, সে আদৌ সেই বিবাহ মেনে নিতে রাজি নয়। কারণ হিসাবে চারুচন্দ্রকে সে বলেছে, তার পত্নীটি একটি 'damn nasty creature; না পারে নাচতে, না পারে গাইতে, না পারে ইংরেজিতে দুটো কথা কইতে'; স্ত্রী সুশীলার Higher education কিছু নেই, 'সারাদিন কেবল লোকজনের সুই নিয়ে পড়ে থাকে, আর বুড়োর পায়ে হাত বুলোয়; Gentleman-এর Society-তে move কর্ত্তে আদৌ জানে না।' অতএব এইরকম 'স্ত্রী'রূপী 'জানোয়ার' নিয়ে ঘর করা অসম্ভব বলে লালচাঁদ বন্ধু চারুকে এ থেকে পরিত্রাণের উপায় জিজ্ঞাসা করেছে। চারু ব্রাহ্ম। মনে তার গোপন অভিসন্ধি। আপাতত সে লালচাঁদকে সহানুভূতি জানিয়ে বলেছে, 'Accomplished wife বিনা এই পার্থিব জীবনই বৃথা। মানুষের progress-এর অর্ধভাগ wife-এ help করেন। বিশেষত সভ্য সমাজে আর আজকালকার দিনে wife নিয়েই পসার।' দৃষ্টান্ত হিসাবে লালচাঁদকে সে তার এক বন্ধুর কথা বলেছে, যে 'accomplished wife'-এর কারণেই বড়ো বড়ো সভা-সমিতির মেম্বার সেক্রেটারি কিংবা প্রধান প্রধান সামাজিক আন্দোলনে 'leading post' নিচ্ছেন। প্রগতিশীলদের মধ্যে সে বাবুর বড়োই পসার। অথচ উনিশ শতকের শিক্ষিত বাবু হয়েও লালচাঁদ যে এতদিন ধরে তার অশিক্ষিত স্ত্রীকে সহ্য করে এসেছে, এতে চারুচন্দ্র অবাক হয়েছে।

চারু লালচাঁদকে প্রগতিশীলতার পথ প্রদর্শন করে। সম্প্রতি তাদের ব্রাহ্মসমাজে একজন 'enlightened সৎ কুলোদ্ভবা যুবতী' যোগ দিয়েছেন। দেখতে 'মোলায়েম', বয়স পঁচিশের কাছাকাছি, 'সতী' তো বটেই; 'beautiful' এঁরই সঙ্গে লালচাঁদের ভাগ্যকে সম্মিলিত করবার চেষ্টা করেছে চারু। লালচাঁদের এতে সায় আছে কারণ, স্ত্রীর দরুন তার 'নাম সম্ভ্রম তো সব ডুবেছে। Bad wife-এর জন্য আমি একেবারে মজলেম। নইলে এতদিন কোন কালে C.I.E সমেত রাজা title পেতেম। শুদ্ধু এক হতভাগা stupid স্ত্রীতে আমাকে

খেয়েছে।' তার কাছ থেকে জানা যায়, বড়ো বড়ো কয়েকজন European friends তার স্ত্রীর সঙ্গে একবার নাচতে ইচ্ছে করেন; কিন্তু অশিক্ষিত স্ত্রী বলে বন্ধুদের সেই 'ইচ্ছে' পূরণ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। অথচ তাঁরা চাইলেই লালচাঁদ রাজা হতে পারত, কারণ, 'তাঁদের খুশি কর্ত্তে পাল্লে ধোপা নাপিতের ছেলে অনায়াসে রায় বাহাদুর রাজা হতে পারে— সামান্য যুতাওয়ালা পর্যন্ত নবাব হয়।' কিন্তু লালচাঁদের কপালে তা হয়ে উঠল না, কারণ তাঁর কথায় 'my wife is the great obstacle in the way of my progress'।

সে চারুকে আরও জানিয়েছে, সরকার থেকে তাকে রাজা উপাধি দেওয়া এবং কিছু তোপের ব্যবস্থা করার ভাবনাচিন্তার কথা জানানো হয়েছে। যদিও তোপের জন্য যে বারুদ নষ্ট হবে তার খরচ এবং আরও কিছু সেপাইয়ের খরচ বৎসরান্তে সরকারকে দিতে হবে। লালচাঁদের তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু অশিক্ষিত স্ত্রী রানি হবে এ সে মেনে নিতে পারছে না। চারু তাকে স্ত্রীকে Divorce দিতে বলেছে। অবশ্য যদি 'Fair and straight forward decline'-এই কাজ হয়, তবে আদালতে না গেলেও চলে। আপনি বিদায় নিলে 'ক্ষমা ও তিতিক্ষাই পরম ধর্মের মুখ্য অঙ্গ।' স্ত্রীকে ত্যাগ করলে ধর্মের কাছে লালচাঁদ পতিত হবে না বলে চারু তাকে আশ্বস্ত করেছে। কারণ 'religion and theology are two different things altogether.' তা ছাড়া, নতুন ladyটি 'উঁচু কায়দার' ইংরেজি জানে। তার প্রবন্ধ বিলিতি 'Young ladies journal'-এ গৃহীত হয়। বস্তুত 'ওরূপ humerous article বাঙালির idea-তেও আসে না।'

ব্রাহ্মসমাজের আচার্য সব কথা শুনে সমস্ত ব্যাপারটি সাগ্রহে অনুমোদন করেছেন। তাঁর মতে, 'আপনার (লালচাঁদবাবুর) নাবালক অবস্থায় জ্ঞান ও বিবেকের অভাব কালে যখন আপনার পিতা কর্তৃক আপনার প্রথম বিবাহ সংঘটিত হয়েছে, যেন এ দ্বিতীয় পরিণয় সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত এবং ঈশ্বরানুমোদিত।' আচার্য শুধু ব্রাহ্মসমাজেরই হোতা নন। সম্প্রতি 'অবলা-রঞ্জন' নামে ব্রাহ্ম ভগিনী হতে ইচ্ছুক ভগিনীদের সভায় তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সারাবছরই তাঁকে প্রচারের কাজে ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াতে হয়। আমের সিজিনে তিনি মালদায় প্রচার করতে চান, গ্রীষ্মকালে দারুণ কষ্ট সহ্য করে দার্জিলিং, সিমলা প্রভৃতি স্থানে ছুটোছুটি করেন। বিপদসংকুল রেলভ্রমণে বোম্বে, মাদ্রাজ ভ্রমণ করেন। উকিল প্যায়ারি তখন বিবাহিত স্ত্রীকে ত্যাগ করতে হবে বলে তাঁর নামে মিথ্যা কলঙ্ক আনবার কথা জানায় লালচাঁদকে। তখন আচার্য উকিলের 'বিবেক' ও 'কর্তব্যবুদ্ধি'র উচ্চ প্রশংসা করেন। এই মহান কর্ম করতে গিয়ে লালচাঁদ যেন অশিক্ষিতা স্ত্রীর প্ররোচনায় না ভোলেন, 'superstitious' বাবা-মায়ের বাক্যে যেন না টলেন, এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। 'অবলারঞ্জন' সভার জন্য সমাজের একটি building তৈরির খরচ হিসাবে প্রায় লাখ দুই টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি তিনি আদায় করে নিয়েছেন লালচাঁদের কাছ থেকে। বিনিময়ে লালচাঁদকে 'রাজা' খেতাব দেওয়ার আন্দোলন সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় 'আর্টিকেল' লিখে ছড়িয়ে দেওয়া হবে বলে আচার্য জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে লালচাঁদের পিতা গিরিধারী লালচাঁদকে ডাকতে এলে সে তাঁকে 'কু-পিতা', গায়ে ছুঁচোর মতো গন্ধ', 'অশিক্ষিত' বলে গালিগালাজ করে বিতাড়িত করেছে।

অন্দরমহলে এসে লালচাঁদ স্ত্রীকে মানে মানে বিদায় হবার জন্য বলেছে। স্ত্রী কান্নাকাটি করে তাকে ছাড়বে না জানায়, মা উপদেশ দিয়ে লালচাঁদকে বোঝাতে চেষ্টা করে। বিনিময়ে লালচাঁদ গিরিধারীকে বলে যে, তিনি ইচ্ছে করলে লালচাঁদের স্ত্রীকে নিয়ে 'রাখতে পারেন'। ছেলের মুখে এ জাতীয় 'শিক্ষা'র কথা শুনে গিরিধারী পালিয়ে পথ পান না।

চারু-কথিত enlightened যুবতী সুরুচি বিবাহিতা। তার স্বামী কালাচাঁদ গ্রাম্য, বঙ্গজ এবং মূর্খ। সুরুচিকে বিবাহ করার জন্য কালাচাঁদ তার জাতি, কুল, বাবা-মা— সব কিছু ত্যাগ করেছিল। সুরুচি

এতদিন তাকে দোহন করে এসেছে। এখন কালাচাঁদের অর্থ নিঃশেষিত, তাই সে তাকে ছেড়ে লালচাঁদকে বিবাহ করবে। কারণ, সে চারুর মুখে জেনেছে, লালচাঁদের প্রচুর টাকা। তবে লালচাঁদ অশিক্ষিত শুনে সে চারুকে আশ্বস্ত করেছে 'Oh! that I will myself makeup. কারিগরের হাত ভেড়া পিটিয়ে ঘোড়া করে।' অতএব সুরুচি কালাচাঁদকে অবিলম্বে বিতাড়ন করেছে। সে বলেছে, 'তোমার মত স্বামী এ বয়সে ঢের দেখ্‌লেম।... তোমার সঙ্গে যে চিরকাল friendship থাক্‌বে, আবার যদি কখন কপাল ফেরে তবে আবার দেখাসাক্ষাৎ হবে।' অন্যদিকে লালচাঁদকে সে প্রেমের কথায় বশীভূত করেছে। লালচাঁদ তার জন্য বাড়িতে নাচের (ball) ব্যবস্থা করেছে।

গিরিধারি বাড়িতে ব্রাহ্ম ভ্রাতা-ভগিনীদের নিয়ে 'বিলিতি খ্যামটা নাচ' হবে শুনে বারণ করতে গিয়ে লালচাঁদের হাতে চূড়ান্ত অপদস্ত হন। বাবুদের সামনে বিব্রত লালচাঁদ বাবাকে 'father-এর bottler' বলে পরিচয় দিয়েছে। 'ভাই-ভগ্নী মিলিয়া মাতি প্রেম সুধা পানে। হিপ্ হিপ্ হুররে, হিপ্ হিপ্ হুররে' গানের শেষে সুরুচি লালচাঁদকে পরামর্শ দিয়েছে, সে যেন সমস্ত valuable জিনিসপত্র, টাকাকড়ি অবিলম্বে সরিয়ে ফেলে সুরুচির বাড়িতে এসে আশ্রয় নেয়। কারণ, লালচাঁদ এখন 'শত্রুরপুরে'। লালচাঁদের চেয়ে তার টাকার প্রতিই সুরুচির আগ্রহ বেশি। কিন্তু গিরিধারি সব ষড়যন্ত্র টের পেয়ে আগেই বাড়ির চারদিকে সতর্ক পাহারা বসালে লালচাঁদ শূন্য হাতে সুরুচির সামনে উপস্থিত হয়, ফলে সুরুচি তাকে প্রত্যাখ্যান করে। লালচাঁদের সঙ্গে ইতিমধ্যে পনেরো যোলোটি বিবাহ হওয়া কাহারের মেয়ে কানা গৌরমণির বিবাহ দেবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু লালচাঁদ সে প্রস্তাব নাকচ করে ইতিমধ্যে সুরুচিকে দেওয়া চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকার জুয়েল ফেরত চায়। কিন্তু সেসব ফেরত তো দেওয়া দূর অস্ত, তাকে বেরিয়ে যওয়ার কথা বললে লালচাঁদের প্রত্যয় হয়, 'হারের কপাল। ধর্মের আচ্ছাদনে আপনারা কি ভয়ানক দস্যু! নর পিশাচ!!'

আলোচ্য প্রহসনে ব্রাহ্মবাবুদের প্রতি প্রহসনকারের অসূয়া গোপন থাকে না। ব্রাহ্মবাবুদের ভণ্ড, ধর্মজ্ঞানহীনা, নীতিহীন হিসাবে চিহ্নিত করা প্রগতিশীলবাবুদের প্রতি রক্ষণশীল সমাজের অবস্থানকেই চিহ্নিত করে। লালচাঁদও প্রগতিশীল যুবক। সেইসঙ্গেই খেতাবলোভী। ব্রাহ্মসমাজের তথাকথিত প্রগতির আলোয় সে-কালের আরও অনেক বাবুর মতো তার চোখও ঝলসে গেছে। তবে উদ্দেশ্যমূলক এই রচনায় শেষপর্যন্ত ধর্মান্তরিত হতে চাওয়া হিন্দু লালচাঁদের মতি ফিরিয়ে আনেন লেখক। নাট্যচরিত্রে অতিশয়োক্তি থাকলেও উন্নতশীল ব্রাহ্মবাবু এবং প্রগতিশীল নব্যপন্থী বাবুদের চরিত্রে সমসাময়িক সমাজ-বাস্তবতার প্রভাব পড়েছে তা অনস্বীকার্য।

অবলা ব্যারাক।। 'সুরুচির ধ্বজা'র লেখক রাখাল দাস ভট্টাচার্যের ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত 'অবলা ব্যারাক' প্রহসনেরও বিষয়বস্তু ব্রাহ্মবিবাহ এবং প্রগতিশীলবাবুর অশেষ দুর্গতি।[৮০] বস্তুত কেশবচন্দ্র সেনের 'ভারত আশ্রম' সুদীর্ঘকাল স্থায়ী না হলেও, তার প্রভাব রক্ষণশীল বিরুদ্ধবাদীদের মনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল। ব্রাহ্মধর্মের এই একত্রে বহু পরিবারের ভ্রাতা-ভগিনী হিসাবে বাস এবং শিথিল বিবাহ-ব্যবস্থা তথা নারী-পুরুষের সম্পর্ক রক্ষণশীল হিন্দুদের কাছে নিন্দার বিষয় হয়ে উঠেছিল। যদিও বাস্তবে এই শিথিলতা ও অসম মিলনের ব্যাপারটি এমনটি 'শিথিল' ছিল না আদৌ। তবুও রক্ষণশীলদের মনে আশঙ্কামিশ্রিত ভীতি কাজ করছিল বোঝা যায়। যার দরুন ব্রাহ্মবাবুদের বিভীষিকাময় চিত্র উপস্থাপিত করে ব্রাহ্ম হতে চাওয়া বা ব্রাহ্মদের প্রগতিশীল ভেবে হিন্দু প্রগতিশীলবাবুদের ধর্মান্তরীকরণের আগ্রহকে প্রশমিত করতে চেয়েছিল এ জাতীয় প্রহসন।

উদ্দেশ্যমূলক রচনা 'অবলা ব্যারাকে' কাহিনি খুব সামান্যই। পূর্ববঙ্গ নিবাসী জনৈক ধনীবাবু ভাগ্যধর তলাপাত্র তাঁর ভাইঝি চপলার সঙ্গে এসে উঠেছেন কলকাতায়। তাঁর কথা থেকেই স্পষ্ট যে তিনি কলকাতায় এসেছেন আরও অর্থ উপার্জন করতে। চপলার রূপ-যৌবনের সাহায্যে ধনীবাবুদের মোহগ্রস্ত করে বিনিয়োগের অর্থ জোগাড় করাই তাঁর উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যে চপলা এন. রায় নামে এক ব্যারিস্টারকে মোহগ্রস্ত করে অনেক টাকা হাতিয়েছে। সেই টাকায় ভাগ্যধর ওষুধ বিক্রির ডিসপেন্সারি খুলেছেন। এবার তিনি চান চপলা সাবধানে আরও অনেক টাকা এনে দিক, যাতে তিনি একটি মদের দোকান খুলতে পারেন। চপলা তাঁকে ধীরে চলতে বলেছে; ব্রান্ডির আলাদা দোকান দেবার যৌক্তিকতা জিজ্ঞাসা করেছে। তাঁর কথায় : 'ব্রান্ডির দোকান আলাদা করনের কাম কি? মদ্রিকা বিক্রয় তো dispensary হতে চলচে। আলাদা মদ্রিকার দোকান কল্লে ত আপনি এ সমাজের চলতি পারবেন না, তাহলি মানসম্ভ্রম যে সকল যাবে, টাহার জন্য অত ক্যান?'

ভাগ্যধর  অবশ্য শুধু টাকার জন্য ক্ষেপে ওঠেননি। তাঁর অন্য আরেকটি লক্ষ্যও আছে। কালীপদ নামে জনৈক উন্নতশীল বাবু 'অবলা ব্যারাক' নামে একটি আশ্রম খুলেছে। সেখানে 'উন্নতশীলা' মহিলারা থাকেন। সেই আশ্রমবাসিনী মনোমোহিনীকে দেখে ভাগ্যধরের হৃদয় চঞ্চল হয়েছে। তিনি চপলাকে মনোমোহিনী চাকীর সঙ্গে তাঁর ব্যাপারে কথা বলতে বলেছেন। তাঁর কথায়: 'তাঁর লগে আমার মিলমিশটা ভালই হইবো। আমারও যুবা কাল তাঁরও তাই, তবে তিনি আমার ক্যাশগুলার লগি একটু আপত্তি করচেন, তা আমি ক্যাশ সুরবানি তেল লাগাইয়ে সারি ফেলম, আর ইংরাজিও পড়তি সুরু করচি। সেকেন্ড বুকের অশ্বের কাহিনি প্রায় সারা করচি, আর বাক্যও পশ্চিমা ধরনের হইচে।' মনোমোহিনীকে প্রভাবিত করতে তিনি তাকে গয়নায় মুড়ে দেবেন বলেছেন। সেইসঙ্গেই টাউনে তিনি সম্প্রতি বাগানবাড়ি তৈরি করতে শুরু করেছেন, সেটাও মোহিনীকে জানাতে বলেছেন। শুধু তাই নয়, মোহিনীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলে ভাগ্যধর মোহিনীকে বলেছেন, 'দ্যাহেন আপনকার লাগি আমি গৃহশয্যা করে ভাবতেছি, পঞ্চশত টাকার পুস্তক খরিদ করে লাইবারি করচি, কাওয়া ফুক্‌রানি বৃহৎ ঘটিকা ক্রয় করচি, ভাল ভাল চিত্রপট, টেবল মঞ্চে দলান ভঙ্গচি। আর কেমন ময়ডন আনচি একবার চাকি দ্যাখ্‌বেন?'

ভাগ্যধরের সঙ্গে মনোমোহিনীর কথোপকথনে জানা যায়, ভাগ্যধরের প্রতি মোহিনীও যদিও কৃপাদৃষ্টিদানে ইচ্ছুক, তবু যেহেতু ভাগ্যধর বয়সে 'প্রাচীন', ফলে, মোহিনীর একটু দ্বিধা আছে। এখন উন্নতিশীল দলে পরিগণিত হলেও তিনি 'নবজীবন লাভ করেও পূর্বজন্মের কুসংস্কার একেবারে ছাড়তে পারেননি, আর সহজে যে পারবেন এমন আশা করাও যায় না।' ভাগ্যধর অবশ্য মোহিনীর জন্য সব মেনে নেবেন বলেছেন। তা ছাড়া নিজের বয়স মাত্র ৫৭ বছর বলেও তিনি জানান। মোহিনী নার্সের কাজ করে, ফলে পাঁচ জায়গায় যেতে হয় তাকে। ভাগ্যধরকে বিবাহ করলেও সে এই প্র্যাকটিসটি ছাড়তে নারাজ। তা ছাড়া, যদিও মোহিনীর উপার্জনও ভাগ্যধরেরই, তবু মোহিনী তার পাঁচ ছেলে-মেয়ের জন্য কিছু রেখে যেতে চায়। তার সন্তানসন্ততি ছেলেতে-মেয়েতে মাত্র সাতটি। প্রথম পক্ষের বড়ো ছেলে চাকরি-বাকরি করে। দ্বিতীয় পক্ষের দু'টি মেয়ে একটি ছেলে প্রায় সাবালক হয়ে উঠল, তৃতীয় পক্ষের দুইটি ছেলে ও একটি মেয়ে এখনও নাবালক— তাদের জন্য মোহিনীর ভাবনার অন্ত নেই। বাকি পক্ষের কোনো সন্তানাদি হয়নি। ভাগ্যধরের সঙ্গে বিয়ে হলে তিনি হবেন অষ্টম পক্ষের স্বামী। আশ্রমের সম্পাদক বিপিন গোস্বামী এ বিবাহে পূর্ণ সম্মতি দেয়। মোহিনী তার প্র্যাকটিসের জন্য পাঁচশো টাকার বই, আর instrument ক্রয় করার অর্থ হস্তগত করে ভাগ্যধরের কাছ থেকে।

মোহিনীর সন্তানদের কথোপকথন থেকে জানা যায়, মায়ের 'তিনকালে গিয়ে এককালে ঠেকেছে' যদিও তবু যে মা বিয়ে করছেন এতে তাদের আপত্তি আছে। তবে বিপিনকে যে মা বিবাহ করছেন না, এটাই আশার কথা। কারণ, 'সে যে একটা ছোঁড়া, yonger than myself.' যদিও তাদের মায়ের এই ছোঁড়াটির উপরই 'favourably inclined' ভাব ছিল। তবে এখন ভাগ্যধর তলাপাত্রের প্রতি মা সদয়। যদিও বুড়ো তলাপাত্রকে father বলে ডাকতে হবে ভেবে তারা শঙ্কিত; বিরক্তও। মনোমোহিনী এসে, ভাগ্যধরের সঙ্গে তার বিবাহের ব্যাপারে ছেলের মত চেয়েছে। যদিও তাঁর নিজের মতে, পাত্রটি উপযুক্ত। তবুও ছেলেদের সে বলেছে, 'তোমরা একটু ভালো করে examine করে দেখ, জান ত Love is always blind!' ভাগ্যধর বাবু এইসময় এসে তাঁর ইংরেজি জ্ঞান দেখাতে চান। 'শালা ভগ্নিপতির ন্যায় তামাশা' করেন মোহিনীর সন্তানদের সঙ্গে।

এদিকে কালীপদ উন্নতশীল ব্রাহ্মবাবু। সে 'অবলা ব্যারাকে'র সম্পাদকও বটে। আশ্রমের সুহাসিনীর সঙ্গে তার বিশেষ খাতির। সুহাসিনী তাকে নিজের 'Male friend' বলে পরিচয় দেয়। মি. ভাদুড়ী নামে এক বিলেত ফেরত নব্য যুবকের সঙ্গে কালিপদর পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে সুহাসিনী কালিপদ সম্পর্কে বলেছে, 'কালিপদ বাবু খুব highly educated, সর্ব বিষয়ে উচ্চ culture রাখেন। A great champion of the weaker sex, and a great genius too.' আশ্রমের আচার্য বিপিনের সঙ্গে এ-হেন কালিপদ বলেছে, 'যশ চাহিনা, মান চাহিনা, অর্থ চাহিনা, গৌরব চাহিনা, চাহি কেবল একমাত্র প্রেমময়ের সর্বব্যাপী বিশ্বজনীন প্রেম। সেই প্রেমে ভ্রাত ভগিনীগণের মনপ্রাণ অভিষিক্ত হোক এইমাত্র এই ক্ষুদ্র আত্মার প্রার্থনা। যতদিন তা না হবে, ততদিন এ দেহে প্রাণ শান্ত হবে না।' তার এই বিশ্বজনীন প্রেমের প্রার্থিনী কেবল সুহাসিনী নয়, হেমাঙ্গিনী নামে আর এক আশ্রমবাসিনী। যদিও কালিপদ বিপিনের সঙ্গে প্রেম বিনিময় করতে বলে হেমাঙ্গিনীকে।

পরিশেষে 'অবলা ব্যারাকে' গণ্ডগোল বেধে যায়। বিপিনের সঙ্গে মনোমোহিনী প্রবেশ করলে ভাগ্যধর মোহিনীর আঁচল ধরে টানাটানি করে মোহিনীর ছেলেদের হাতে লাঞ্ছিত হন। কালিপদকে নিয়েও সুহাসিনী ও হেমাঙ্গিনীর দক্ষযজ্ঞ বেধে যায়। প্রতারিত ভাগ্যধর মনোমোহিনীকে প্রদেয় টাকা দাবি করলেও 'অসভ্য বাঙ্গাল' বলে মোহিনী তাকে অবজ্ঞা করে বিপিনকে নিয়ে চলে যায়। বাবু সাজতে বসা ভাগ্যধর উচিত শিক্ষা পেয়ে প্রত্যয় ফিরে পায়।

আলোচ্য কাহিনিতেও প্রগতিশীল ব্রাহ্মবাবুদের লাম্পট্য ও অবাধ যৌন জীবনের অতিশয়োক্তিপূর্ণ চিত্র আছে। উন্নতশীল ব্রাহ্মবাবুদের জীবনযাপন ও চিন্তা-চেতনার প্রতি কটাক্ষ আছে। গুরুপদ নিয়ে বিরোধ ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরীণ বিরোধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রগতিশীলবাবুদের প্রতি সার্বিকভাবে বিবমিষা মূলক ব্যঙ্গপ্রবণ মনোভাব লক্ষ্য করা যায় প্রহসনটিতে।

**সভ্যতার পাণ্ডা**।। প্রগতিশীল বাবু-বিবিদের জীবনযাপন, ভাবনাচিন্তা সম্পর্কে অতিশয়োক্তিমূলক উৎকট চিত্র প্রদর্শন করে নাটক-প্রহসনগুলি রক্ষণশীলদের পক্ষ থেকে একদিকে যেমন প্রগতিশীলতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে চিরাচরিত সংস্কারকে রক্ষা করতে চেয়েছিল, তেমনি হিন্দুধর্মকে আসন্ন অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। প্রগতিশীলতা যে অধঃপতনের নামান্তর— একথা বিশ্বাস করতেন অনেক রক্ষণশীল নাটক-প্রহসনকার। ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সভ্যতার পাণ্ডা' প্রহসনটি ঠিক

এই ভূমিকাটিই পালন করেছিল। আলোচ্য পঞ্চরংটিতে গল্প কিছুই নেই। প্রগতিশীলদের বিবাহ ও সম্পর্ক বিষয়ে টুকরো টুকরো কিছু চিত্র এবং লেখকের কটাক্ষ আছে। প্রহসনের সূচনায়, নতুন বছরকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে 'সভ্যতা' যা বলেছে, তা আসলে প্রগতির বিরুদ্ধে রক্ষণশীলদের আশঙ্কারই প্রতিফলন, 'এ কি কেউ সম্ভব ভেবেছিল, হিঁদুতে মুরগি খাবে? বামুন খৃস্টান হবে? কুলের বধূ মেম সেজে হাওয়া খাবে, পূজায় সাহেবের খানা হবে, বাপ-ব্যাটায় গার্ডন পার্টি করবে, বেশ্যার সঙ্গে স্ত্রীর আলাপ করে দেবে, বাপ-মাকে পৃথক করবে?' নতুন আর্থিক ব্যবস্থায় পুরাতন জীবনযাপনের ছক বদলে যাচ্ছিল দ্রুত। চাকরি নির্ভর প্রগতিশীল মধ্যশ্রেণির বাবুরা যৌথ পরিবার ভেঙে ছোটো পরিবারের নিশ্চিত নিরাপত্তার মধ্যে আসতে চাইছিলেন। জীবনযাপনে অনেক আগে থেকেই প্রবেশ করেছিল সাহেবি ধরন, তা শতক শেষে সর্বগ্রাসী হয়ে উঠতে চাইছিল। মেয়েদের বাইরে বেরিয়ে আসা কিংবা গড়ের মাঠে হাওয়া খাওয়ার ঘটনায় আলোড়িত হচ্ছিল অচল অনড় রক্ষণশীল সমাজ। প্রহসনকারদের এক বড়ো অংশ এই হিন্দু রক্ষণশীলতার প্রতিভূ বলেই, এ জাতীয় আচরণ-প্রবণতা ও পরিবর্তন তাঁদের মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁর রক্ষণশীল হিন্দুত্ব 'সভ্যতার পাণ্ডায়' এই আশঙ্কারই দু'চারটি রেখাচিত্র আঁকতে চেষ্টা করেছেন।[৮১]

প্রহসনের সূচনায় সভ্যতার মুখে সংযোজিত 'গীত'টি প্রগতিশীলবাবুদের চরিত্রমাহাত্ম্য সম্পর্কে রক্ষণশীলদের দৃষ্টিকোণ উন্মোচিত করেছে,— যদিও নারীর বকলমে গানটি গাওয়া হয়েছে, তবুও গানটির মুখ্য উদ্দেশ্য সামগ্রিকভাবে প্রগতিশীলতার স্বরূপ উন্মোচন—

'আমার মুখে হাসি চোখে ফাঁসি
ভুবনমোহিনী।
মাদকতা প্রবঞ্চনা চিরসঙ্গিনী॥
অনাচার আমার কণ্ঠহার,
দাসী হয়ে চরণসেবা করে ব্যভিচার,
আমি মধুমাখা কথা কয়ে আগে ভোলাই
কামিনী॥
হৃদাসনে সমতলে পুজি অহঙ্কার
সে যে প্রাণপতি আমার,
আমার হৃদয়-রতন, যতনের ধন,
জোর করি ত তার,
আমি তার গরবে গরবিনী আদরে আদরিণী॥'

প্রবঞ্চনা, অনাচার, ব্যভিচার, ভণ্ডামি, অহংকার— প্রগতিশীলতার এই লক্ষণগুলিকে প্রথমেই নির্দেশ করেছেন প্রহসনকার। যদিও প্রহসনে প্রগতিশীলবাবুদের স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে আন্দোলন অন্দরমহলের স্ত্রীদের বহির্মুখী বিবিতে পরিণত করে কী ভুল করেছে, তার পরিচয়ই পাওয়া যায়।

ভবতারিণী যেমন তার বান্ধবী তৃতীয়বার বিয়ে করতে যাওয়া বিশ্বেশ্বরীকে বলেছে, 'তেমন কি কপাল দিদি, তেমন কি কপাল! কর্ত্তা কি আর সত্যি সত্যি মরতে পারতো না, তা কৈ, রাজী হয় কৈ! দুটো বে আমার বরাতে নেই, আমি বুঝেছি।' কর্তাটি অর্থাৎ নীলকান্তবাবুও বেশ প্রগতিশীল। ছেলে সৃষ্টিধর বিলেত

যাবে ঘেসেড়াগিরি শিখতে, তা শিখতে বছর দশেক লাগবে। অতএব ছেলে থাকতে থাকতেই নিজের মুখাগ্নি, ডেথ সার্টিফিকেট পাস এবং শ্রাদ্ধশান্তি করে ফেলেছেন তিনি। একইসঙ্গে গাউন পরিয়ে মর্গে একটি লাশকে ভবতারিণী সাজিয়ে তারও ডেথ সার্টিফিকেট বের করে এনেছেন। একইসঙ্গে পাঁচজন বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণও করে এসেছেন, 'ছিষ্টিধর বলেছে, শ্রাদ্ধের পর গার্ডেন পার্টি হবে।' আনন্দ দু'গুণ। ছেলের হাতে শ্রাদ্ধশান্তি হল, আবার ডেথ সার্টিফিকেট তৈরি হওয়ায় নতুন বিবাহেরও আর অসুবিধা রইল না। নীলকান্তবাবু ফ্যান্সি মার্কেটে গিয়েছেন নতুন কনে কিনতে, ভবতারিণীও সাতপুকুরের বাগানে বরের নিলামে বর কিনতে গিয়েছেন। সেখানে বৃদ্ধা ধনমণি পোদ্দার একাই পাঁচ-পাঁচটা বর কিনেছেন; তাঁর কথায়, কী জানেন, পাঁচটা স্বামী আমার মারা গিয়েছে, গোটা পাঁচ ছয় কিনে রাখি, যেটা মরে, যেটা থাকে। নতুন প্রগতিশীল বরের পরিচয় দিতে গিয়ে নিলামঘরের 'ক্রায়ার' বলেছে, 'বয়েস আটাশ, খাটবে এটা ওটা ফাইফরমাস, গান গাবে, হারমোনিয়াম শেখাবে, জ্যুয়োলজিকাল গার্ডেন দেখাবে। আর হাই সার্কেলে ইন্ট্রোডিউস করে দেবে।' প্রগতিশীল বাবুদের স্ত্রী-বাধ্য এই ভূমিকা রক্ষণশীলদের পক্ষ থেকে বারে বারেই নিন্দিত হয়েছে।

সমগ্র প্রহসনটিতে প্রগতিশীলবাবুদের 'রমণীতুল্য' এবং প্রগতিশীল 'বিবি'দের পুরুষ-প্রবণতা মোটা দাগে চিত্রিত। সমসাময়িকভাবে প্রগতিপন্থীরা নানান কারণে নিন্দিত, উপহাসিত হচ্ছিলেন; গিরিশচন্দ্র তার অন্যতম কারণ হিসাবে স্ত্রীস্বাধীনতা নিয়ে প্রগতিশীলবাবুদের অতি সক্রিয় ভূমিকার নিন্দা করেছেন আদতে।

বাবু।। বঙ্কিমের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, 'বাবু শব্দ নানার্থ হইবে'। উনিশ শতকের শেষ লগ্নে 'বাবু' শব্দটি 'নানার্থে' ব্যবহৃত হলেও, চরিত্রগত দিক দিয়ে বাবুতে বাবুতে বিশেষ ভেদ ছিল না। বিশেষ করে প্রগতিশীলতা, স্ত্রীস্বাধীনতা, পাশ্চাত্যমুখীনতা, দেশাত্মবোধ ও দাসত্ববোধে উনিশ শতকের বাবুরা এক সমমাত্রিক রূপ লাভ করেছিলেন। ভীরুতা ও দেশহিতৈষণার বীরত্ব, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও দাসত্বপ্রীতির এক অদ্ভুত সহাবস্থানে নতুন কালের বাবুরা প্রগতিশীলতার নামে কূপমণ্ডুকতার দর্শনে স্থির হয়েছিলেন। শতক শেষে বাবুদের সেই কূপমণ্ডুকতাকে চিনিয়ে দিতে চেয়েছে ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত অমৃতলাল বসু'র 'বাবু' নামক নাটকটি।[৮২] এ নাটকে আদি-মধ্য-অন্ত্য সমন্বিত কোনো নিটোল কাহিনিবিন্যাস নেই, কিন্তু প্রগতিশীলবাবুদের নানান প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে তাঁদের মানসিক ভূগোলকে স্পষ্ট করে দিতে চেয়েছেন নাট্যকার। দেশহিতৈষীবাবু, বৈজ্ঞানিকবাবু, সংস্কারকবাবু, ধর্মধ্বজবাবু, ছোকরাবাবু, কেরানি বেচারি বাবু— বাবুত্বের সে এক উজ্জ্বল বৈঠকখানা। প্রত্যেকে এসেছেন, নিজের নিজের গুণপনার ব্যাখ্যান দ্বারা চরিত্রকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন এবং তার মধ্যে দিয়ে টুকরো টুকরো ভাবে প্রগতিশীলবাবুদের সামগ্রিক মনন-বিশ্বের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাহিত্যমূল্যে তুচ্ছ হলেও অমৃতলাল বসু'র এই নাটকটি শতক শেষে 'বাবু'কেন্দ্রিক নাটকের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য রচনা, কিছু হলেও যে নাটকের সামাজিক মূল্য রয়েছে।

কেন্দ্র চরিত্র বিশেষভাবে কেউ না থাকলেও, আপাতভাবে ষষ্ঠীকৃষ্ণ বটব্যাল নামক দেশহিতৈষীবাবুর মোহ ও মোহভঙ্গের কাহিনি নাটকটির মুখ্য অবলম্বন বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। ষষ্ঠীকৃষ্ণ যে সে দেশহিতৈষী নয়, সে একটি কাগজের সম্পাদক। তার চালচলন সাহেবি। শ্বশুরবাড়িতে শ্যালকের সঙ্গে দেখা করবার জন্য এলে সে সরাসরি ঘরে না ঢুকে আগে চাকরের হাতে 'মি. এস. কে. ভ্যাটাভ্যাল' লেখা টিকিট পাঠায়। 'এটিকেট'-এর (Etiquette) কারণেই ষষ্ঠীকৃষ্ণ এমনটি করে। সর্বদাই তার মুখে ইংরেজি বুলি, বেগতিক বুঝলে তবেই তার মুখ দিয়ে বাংলা বেরোয়। গ্রামের দুর্ভিক্ষ মোচন করতে সরকারের দৃষ্টি

আকর্ষণের জন্য ষষ্ঠীর সাহায্যপ্রার্থী ভজহরি ষষ্ঠীর শ্যালক ফটিকচাঁদকে বলেছে, 'হামেসা সাহেববাড়ি যাওয়া আসা আছে, তাই ইংরেজি চাল হয়ে গেছে।'

গ্রামে দু'বছর ফসল হয়নি, শ'য়ে শ'য়ে মানুষ মরছে, ভিটে মাটি ছেড়ে পালাচ্ছে, অতএব কর মকুবের জন্য ষষ্ঠীচরণের কাগজে দু'কলম লিখতে হবে, নিদেনপক্ষে দুর্ভিক্ষের খবর ছেপে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে শুনে 'দেশহিতৈষী' ষষ্ঠী উক্ত গ্রামের কেউ তার কাগজে 'subscribe' করে না বলে সাহায্য করতে অসম্মত হয়েছে। পরে অনুরোধ করলে, প্রথমে সে শর্ত রাখে, তার কাগজ দশখানা করে নিতে হবে, তার দরুন বার্ষিক মূল্য একশো টাকা অগ্রিম দিতে হবে। তার ছবি এক ডজন বিল হবে, যার দাম চব্বিশ টাকা এবং উদ্ধার ফান্ডের চাঁদা একান্ন, মোট একশো পঁচাত্তর টাকা দিলে 'এডিটোরিয়ালে হবে না, লোকাল একটি প্যারা লিখে দেব তখন।' এত টাকা গ্রামের ঘটি-পাথর বেচলেও জোগাড় হবে না, তা ছাড়া গ্রামের কেউ ইংরেজি জানে না বলে কাগজ পড়তে পারবে না,— ভজহরির মুখে একথা শুনে ষষ্ঠী গ্রামের সব গোরু-লাঙল বেচে তার হাতে টাকা তুলে দিতে বলেছে। তাহলে সে ইংরেজি শিক্ষার স্কুল করে দেবে, কারণ 'আগে ইংরেজি পড়তে শিখুক্, তবে তাদের জন্য আমাদের মত সভ্য লোকেদের দয়া হবে, Sympathy পাবে।' তা ছাড়া, জনসংখ্যা বেশি বলে কিছু মানুষের দুর্ভিক্ষে মরাও উচিত বলে সে ম্যালথসের থিয়োরির কথা উল্লেখ করেছে।

ষষ্ঠীর মতো একজন দেশহিতৈষীকে উপযুক্তভাবে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছে সে। গ্রামে দুর্ভিক্ষের প্রতিকার করতে গেলে তাকে ফার্স্ট ক্লাসে টিকিট কেটে নিয়ে যেতে হবে, কেলনারের হোটেলে খাওয়া ও লেকচারের ব্যবস্থা করতে হবে; একজন সাহেব রিপোর্টার সঙ্গে যাবে, তার সেকেন্ড ক্লাসের ভাড়া ও ফি দিতে হবে, রাজশাহি, ঢাকা, যশোর, সিলোন, পাটনা, বেনারস, মাদ্রাজ, বোম্বাই ইত্যাদি যেসব জায়গায় কাগজের ব্রাঞ্চ অফিস আছে, সেখানে টেলিগ্রাম পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিতে হবে। স্টেশন থেকে গ্রামে যাবার জন্য পালকির ব্যবস্থা রাখতে হবে, গ্রামে ঢোকার মুখে দেবদারু পাতা দিয়ে 'নিশেন টিশেন' করা একখানি ফটক তৈরি করতে হবে, রাত্রে আলোর ব্যবস্থা, নহবত এবং কলকাতা থেকে একদল শখের কনসার্ট নিয়ে যেতে হবে। দেশহিতৈষী ষষ্ঠীচরণের মুখে এহেন দেশোদ্ধারের প্রস্তুতির কথা শুনে ফটিক ঠাট্টা করে বলেছে, 'আর দেখ, অমনি একটি ছাওয়াল-ছোয়ালগোছের কনে ঠিক করে রেখ। বাবু আসবার সময় বিবাহ করে আসবেন, তা হলেই তোমাদের গ্রামের দুর্ভিক্ষ দূর হবে।' অবশ্য গ্রামের জমিদারের নাম শুনে ষষ্ঠী বিনামূল্যেই সব করে দেবে বলেছে, কারণ উক্ত জমিদার তার কাগজখানা নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন, উদ্ধার ভাণ্ডারের চাঁদা বাবদ মাত্র পঞ্চাশ টাকা দিয়েছেন। ভজহরিকে বিদায় করে ষষ্ঠীচরণ শ্যালককে আত্মপ্রসাদের সঙ্গে বলেছে, 'পাবলিকম্যান হওয়ার একবার ঝঞ্ঝাটটা দেখছ, পরের কাজ করতে করতেই গেলেম।'

মৌতাতি ব্রাহ্মণ তিতুরাম ঠাকুর ষষ্ঠীচরণকে ট্যাক্স অফিসের কাজ পাইয়ে দিয়েছিলেন, ষষ্ঠী এখন তাঁকে চিনতেই পারে না। কাগজে লিখে ষষ্ঠী দেশ থেকে আফিম উঠিয়ে দিতে চাইছে বলে তিতুরাম খুব ক্রুদ্ধ। তিনি ষষ্ঠীকে বলেছেন, সেইসঙ্গে সাহেবদের মদের ভাঁটিগুলিও যেন বন্ধ করে দেওয়ার কথা সে লেখে তার কাগজে। কারণ, আফিম অপেক্ষা মদ থেকে দেশের ক্ষতি হচ্ছে বেশি। ফটিক বলেছে, 'বিলেতের সাহেবরা সময়ে সময়ে যখন দয়াল হন, তখন আমার একটু একটু পিলে চমকে ওঠে। ... আবার এই আফিমের করুণা জেগে উঠেছে— আমাদের টেক্সর টাকা ভেঙে কমিশনের খরচা চলছে, তা ত চলবেই... বিলেতে কোন

কোন বড় লোকেরও নিজের মদের ভাঁটি আছে, তাতেই করুণার অর্থটা কেমন কেমন ঠেকে।' ষষ্ঠী এ সব কথা শুনে অধৈর্য হয়, সে আসলে তার স্ত্রী নীরদাকে নিয়ে যেতে এসেছে। কারণ, কাল তার বাড়িতে 'Conversazione হবে, বিস্তর লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন এক সঙ্গে মিলবেন; রাজনৈতিক, সামাজিক তর্ক হবে।' নীরদাকে তার হোস্টেস হতে হবে। এসব শুনে ফটিক বলেছে, 'শালারা দেশহৈতিষী হয়ে, আছে একরকম মন্দ নয়, খালি চাঁদা তুলছে, আর লম্বা লম্বা চাল চালছে।'

দেশহিতৈষণার নামে সাহেবি চালে চলা আর সাহেবদের অনুকূলে কাজ করে নিজের স্বার্থরক্ষা করাই দেশহিতৈষীবাবুদের মূল কাজ। সমসাময়িক কংগ্রেসি আন্দোলন ও তার চালকদের প্রতি প্রত্যক্ষ কটাক্ষ আছে। তেমনি কটাক্ষ আছে ব্রাহ্মবাবু সজনীকান্ত এবং বৈজ্ঞানিকবাবু অশনিপ্রকাশের প্রতি। অশনিপ্রকাশ সব কিছুতেই 'সায়েন্স' খোঁজে। অসম্ভব উৎকট নানান বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডে তার মাথা সর্বদা ঠাসা। সায়েন্সের সাহায্যে সে দেশ উদ্ধারের স্বপ্ন দেখে। সে বলেছে, 'ভারত-উদ্ধার যদি হয়, লেক্‌চার দিলেও হবে না, বিধবার বে দিলেও হবে না; আমরা যদি কখনও স্বাধীন হই, তা নিশ্চয় জানবেন সে সায়েন্সের সাহায্যেই হবে।.... আমি রোজ দু'বেলা খানিকটা করে ইলেকট্রিসিটি খাই,— তা হলে এই ইলেকট্রিসিটির দ্বারাই জাতিভেদ উঠিয়ে দেব, বিধবার বে দেওয়াব, মেয়েদের ঘোড়ায় চড়াব, এই ইন্ডিয়াতে পার্লামেন্ট বসাব, আরও কত কি করবো।' অবাস্তব, অযৌক্তিক, অসম্ভব সব পরিকল্পনা, যার সঙ্গে বাস্তব কল্যাণের কোনো যোগ নেই, এমন পরিকল্পনা করাই কিছু উচ্চশিক্ষিত বাবুর চরিত্র-লক্ষণ। এর সাহায্যে দেশোদ্ধারের কোনো উপায় নেই।

সংস্কারকবাবু ও তার চেলা সজনীকান্ত ও দামোদরের কথোপকথনে জানা যায়, ভ্রাতা-ভগিনী নিয়ে তাঁরা 'ঘেঁচু-কুটির' করেছেন। সেখানে ভ্রাতা-ভগিনীদের অবাধ মিলনে বাধা নেই। অসহায়, দুর্বল, অশিক্ষিত মানুষদের কথার জালে ফেলে তাঁরা তাদের সংস্কারবাদী ধর্মের দীক্ষা দেন। বিধবা বিবাহ দিয়ে ভারত-উদ্ধার করবার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের। সদাই পরের দুঃখে তাঁদের প্রাণ কাঁদে। ফলে, নাড়াজোলের সাঁওতাল ভ্রাতা-ভগিনীদের জন্য দামোদরের প্রাণ কাঁদে। যদিও সে তার পৌত্তলিক সহোদরকে বাস্তুচ্যুত করবার জন্য মামলা করেছে। সজনীকান্ত তাকে আশ্বস্ত করে যে, পৌত্তলিক ভ্রাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি দামোদরকে সাহায্য করবেন। 'হাসি' যেহেতু তাঁদের চোখে 'অশ্লীল', তাই এহেন কাজের পর 'দুদিন বেশি করে অনুতাপ করে' নেবেন তাঁরা, ফলে পরমপিতার ক্ষমা পাওয়া যাবে। এদিকে তিনকড়ির সঙ্গে গরিব গুরুচরণ এসে সজীনকান্তকে অনুরোধ করে, তাঁদের সমাজ-মন্দিরের রাস্তা দিয়ে সে তার মৃত মা'র দেহ দাহ করতে নিয়ে যাবার অনুমতি যেন তাকে দেওয়া হয়। কোম্পানির রাস্তা দিয়ে নিয়ে যেতে গেলে অনেক ঘুরপথ হয়ে যায়। এতে সজনীকান্ত তাকে দিন পনেরো কুড়ি অপেক্ষা করতে বলে। কারণ সব কমিটির মিটিং-এ তার দরখাস্ত প্রেজেন্ট করতে হবে, মেজরিটির মত হলে জেনারেল মিটিং কল করা যাবে দিন পনেরোর পর। তাতে 'রেজোলিউশন' পাস হলে গুরুচরণ মাকে নিয়ে যেতে পারবে। গুরুচরণ অবশ্য খুব আশাহত হয়ে চলে যায় এই বলে, 'খুব দয়ার কথা শুনেছিলেম বটে বাবুদের।'

সজনীকান্ত ব্রাহ্ম হওয়ায়, তাঁর নিজের মতে, তাঁর দৃষ্টি, মন সব উদার হয়েছে— 'প্রেমের বলে আমাদের হৃদয় এমন উদার হয়েছে, আত্মায় কিছুমাত্র মলা নাই, তাইতে করে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে হিন্দুমাত্রেই মিথ্যাবাদী, প্রতারক, অত্যাচারী, রমণীপীড়নকারী— তারা সকলেই নরকে যাবে।' সজনী

জনৈক বরদার কথা উল্লেখ করেন, যিনি আগে ব্রাহ্ম হয়েছিলেন, পরে গেরুয়া পরে হরিবোল হরিবোল করে অবতার সেজে বসেছেন। এই উল্লেখ স্মরণ করিয়ে দেয় ব্রাহ্ম নেতা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কথা, যিনি পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে পৃথক আশ্রম তৈরি করেন। সজনীকান্তের স্ত্রীর অনেকগুলি বিবাহ। মেয়েদের আইবুড়ো রাখা তাঁর ইচ্ছে, কারণ— 'সকল স্ত্রীলোককে যে বিবাহ করতে হবে, এমন কিছু কথা নেই। কন্যা চিরকুমারী থাকলে দেশের অনেক উপকার করতে পারে।' নতুন ব্রাহ্ম বাঞ্ছারাম প্রেমধর্মে আকুল। সে কলুর ছেলে হয়েও ব্রাহ্মণ-কায়স্থের সঙ্গে এখন একাসনে খেতে বসে তাঁদের ধন্য করে। যাবতীয় পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তার এখন সদাজাগ্রত ঘৃণা। তার আত্মারঞ্জিনী ভগিনী-পত্নী ক্ষমাসুন্দরী উন্নতশীলা ব্রাহ্ম। দুর্ভিক্ষপীড়িতদের মধ্যে থেকে তাকে সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখিয়ে বার করে এনে বাঞ্ছারাম বিবাহ করেছে। ক্ষমাসুন্দরীর গহনাও সে আত্মসাৎ করেছে। ক্ষমাসুন্দরী বামুনের বিধবা। সে প্রতিশ্রুতি মতো সুখী জীবন কাটাতে না পেরে বাঞ্ছারামকে প্রহার করে থানায় নিয়ে যায়।

অন্যদিকে কন্দর্পকান্ত ছোকরাবাবু। শৈশবে মা মারা যাওয়ার পর তার মাতামহী আজিমা তাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন। কন্দর্প কলকাতায় গিয়ে ইংরেজি শিখে পাশ দিয়ে এসে নতুন দেশোদ্ধারে ব্রতী। সজনীকান্ত তাকে বুঝিয়েছেন যে, বিধবার বিয়ে না দিলে দেশ উদ্ধার হবার আশা নেই। সে তাই তার আজিমাকে বিধবা বিবাহ করতে বলে, নইলে সে আর 'সোমাজে মু' দেখাইতে, পারছে না। সে পাত্রও ঠিক করেছে— ষষ্ঠীবাবুর ছাপাখানার প্রিন্টার সেবকরাম, যার বয়স পঁচিশ, পাঁচটাকা বেতন বাড়ালেই সে বিধবা বিবাহ করতে রাজি। কন্দর্প বলেছে, 'আমি আপন আইতে টাহা দিমু; আবার তোমার শাখা সিন্দুর পরাইমু, অঙ্গে চিকণ শারী দিমু, বাঁশীর প্রায় নাসায় নলক দোলাইমু, পা দুটিতে পাইজর পরাইমু, জুমুর জুমুর ক'রে তুমি ব্যাড়াইবে, আমার হাতিখানা গোরের মাঠের মতন অইব;— আর ই না দ্যাখ্যে সকল সৈভ্য লোক কইবন যে, কন্দর্পকাণ্ড এট্টা করত-সন্তান বটে, আপন আজিমার বিধবা বিবাহ দিল— দ্যাশ উদ্ধার করল।' বিবাহের পর আজিমা লেখাপড়া শিখবেন, ইংরেজি পড়বেন, সভায় যাবেন, কার্পেট বুনবেন, হারমোনিয়াম বাজাবেন; সেইসঙ্গে কতদিন পর ইলিশ মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেতে পারবেন, যদিও এ জাতীয় প্রলোভনে আজিমা রাজি হন না। তাই সে আজিমাকে 'বড়ই অসৈভ্যা' বলেছে। তারপর নকল দাড়ি লাগিয়ে, চোখে ফেট্টি বেঁধে সমাজ-মন্দিরে গেছে। দাড়ি না থাকলে সভ্য বলে মান থাকে না, অন্যদিকে কলকাতার রাস্তায় কত মেয়ে আছে, তাদের দিকে চোখ পড়লে সে 'অশ্লীল' হয়ে যাবে। তা ছাড়া ঘোড়া, গাধা, গোরু, কুকুর সব 'উলঙ্গ অইয়ে সরকে গতায়াত কর্‌চে, তাগোর পানে তাকাইবো কেমন! মনে কুপ্রভাব আস্‌বো না!' ছোকরাবাবু কন্দর্পের মাথা খারাপ হয়েছে ভেবে তার আজিমা 'কবচ' খুঁজতে যান।

ষষ্ঠী দেশোদ্ধার করে, পরের দুঃখে সংবাদপত্রে 'আর্টিকেল' লেখে; অথচ সে তার মাকে ভালো করে খেতে পরতে দেয় না। মাসে মা'কে তিনটাকা করে খোরাকি দিচ্ছিল সে, এখন বারো পয়সা কম দিতে শুরু করেছে। কারণ মাসে দু'টি একাদশী পড়ে এবং একাদশীর দিন বিধবা মা'র উপোস। সে মা'কে গলাধাক্কা দিয়েছে এবং নিজের খোরাকি নিজেকেই জোগাড় করতে বলেছে। ষষ্ঠী কেবল এক মাতাকেই ভক্তি করে, সে মাতা 'ভারতমাতা, ভারতমাতা, দেশ— দেশ, যাকে মাদার কান্ট্রি বলে।' দেশোদ্ধারের জন্য সে পত্নী নীরদাকে নিয়ে ইডেন গার্ডেনে হাওয়া খেতে নিয়ে যায়। পথে স্কুলের ছেলেদের কথোপকথনে ধরা পড়ে, তারা ফিস্ট, বার্ডসাইয়ের জন্য মা-বাবার কাছ থেকে পয়সা চুরি করে। স্কুলে দেরিতে ঢুকলে মাস্টার যদি

বকেন, তবে স্কুল ছুটির পর তাঁকে ঠ্যাঙানি দিয়ে ষষ্ঠীবাবুর স্কুলে ভর্তি হবে তারা। তাদের গানে রয়েছে তাদের জীবনদর্শনের দিশা—

'হাঃ হাঃ হাঃ কেয়া মজা পাই কেয়া মজা পাই।
ফূর্ত্তি করে স্কুলেতে ভর্তি হতে যাই॥
লেখাপড়া হয় বা না হয়,
আর ত নাইক বেতের ভয়,
হালের ছেলে স্বাধীন,
সবে লেক্‌চারেতে বাজাই তাই।
আর গ্রামার পড়ব না, তেরিজ কসে মরব না,
ডিগ্‌বাজীতে প্রাইজ পাব,
ভ্যালা, মোদের প্রতাপ, ভাই;-
কর্‌বে আলো ফিউচার নেশন,
এডুকেশন হল হাই॥'

পিতৃসম গোবিন্দবাবু তাদের বোঝাতে গেলে তারা যাচ্ছেতাই ভাষায় তাঁকে অপমান করে। এদিকে শিক্ষীদীক্ষায় অষ্টরম্ভা, কিন্তু প্রগতিশীলবাবু হওয়ার ছকটা বেশ আয়ত্তে। তাদের একজন চন্দ্র বলেছে, 'চল যাওয়া যাক্ একবার স্কুলটা বেড়িয়ে, আজ সকাল সকাল বেরিয়ে পড়্‌তে হবে, বঙ্কিমবাবু কল্‌কেতায় এসেছেন, তাঁর কাছে লাইব্রেরির জন্য খান-কতক বই গাপ্ করতে হবে।' প্রগতিশীল নবীন বাবুদের মুখের ভাষা, সংস্কার, ভদ্র-অভদ্র জ্ঞান সবই যেন এক অধঃপতনের দিকে দিকনির্দেশ করেছে।

অতঃপর, ষষ্ঠীদের সাহস বোঝা যায়। সাহেবের হাতে ষষ্ঠীর স্ত্রী আক্রান্ত হলে, তাকে না বাঁচিয়ে দূর থেকে ষষ্ঠী বলে— 'এ অত্যাচার আমি কখনোই সহ্য কর্‌বো না, কখনোই নয়;— আমি য়্যাজিটেসন কর্‌বো, টাউনহলে মনস্টার মিটিং কন্‌ভিন্ কর্‌বো, সমস্ত কাগজে করেস্‌পন্ডেন্স লিখব, শেষে পার্লামেন্ট পর্য্যন্ত যাব,— দেখি আমার স্ত্রী আচায় হয় কি না।' সজনী ও বাঞ্ছারাম চাঁদার খাতা ও বিজ্ঞাপনের ফর্ম নিয়ে তক্ষুনি বেরোতে চেয়েছে। ষষ্ঠী স্ত্রীকে আশ্বস্ত করেছে, 'প্রিয়ে তুমি, ভেব না নিশ্চিন্ত হও, তুমি জেন যে, তোমার প্রতি যে এই অত্যাচার, এ হতে ভারতের অনেক মঙ্গল হবে, উপযুক্ত চাঁদা আদায় হয় যদি, আমি স্বয়ংই ডেলিগেট হয়ে বিলেত যাব, সেখানে পার্লামেন্টে মহা আন্দোলনের ঢেউ তুলব, ষষ্ঠীকৃষ্ণ যে কত বড়ো বীর, জগৎ তা টের পাবে।' প্রগতিশীবাবুদের বাকসর্বস্ব দেশোদ্ধার ব্রতের প্রতি সুগভীর কটাক্ষ আছে। সমকালে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রমুখেরা প্রবন্ধ রম্যরচনায় এ জাতীয় প্রগতিশীল বাবুদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন (প্রবন্ধ-রম্যরচনা ইত্যাদিতে বাবু অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে)। নাটকে অবশেষে জানা যায়, ষষ্ঠীর সাহসিকতা ও দেশভক্তি পরীক্ষার জন্য তার শ্যালক ফটিকই সাহেব সেজে এই নাটকটি করেছিল। সে আশা করেছে, সাহসিকতা ও দেশভক্তি পরীক্ষার জন্য তার শ্যালক ফটিকই সাহেব সেজে এই নাটকটি করেছিল। সে আশা করেছে, এর পরে ষষ্ঠীকৃষ্ণের মতো প্রগতিশীল দেশোদ্ধারব্রতী বাবুদের চৈতন্যোদয় ঘটবে।

বস্তুত, বর্তমানে নাটকে প্রগতিশীলবাবুদের বিশেষ করে ব্রাহ্মবাবু এবং ব্রাহ্ম মনোভাবাপন্ন 'ভদ্রলোক' বাবুদের প্রতি নাট্যকারের ক্ষোভ, ক্রোধ, ব্যঙ্গ অপ্রকাশ্য থাকেনি। প্রগতিশীলবাবুদের মনোজগতের গহন

অন্ধকারকে আলো ফেলে দেখাতে চেয়েছেন নাট্যকার। অমৃতলাল বাবুদের প্রসঙ্গে নাট্যসূচনায় নান্দীর গীতে বলেছেন—

> 'কাঁচে আঁখি ঢাকা, শিরে সিঁথি বাঁকা,
>     কথা বাঁকা বাঁকা,
> বাঁকা মুখে রাখা, কিবা দাড়ি আবরণ।
> অঙ্গে পরা কোট, বাক্যে ভরা ঠোঁট,
>     মুখে যত চোট,
> কাজেতে চম্পট, তুলিতে পটোল সতত যতন॥
>     কখন বা বাবু কখন মিসটার,
> পিতা হন ভ্রাতা, বনিতা সিস্টার,
>     সম্বোধনে নাহি সম্বন্ধ-বিচার,
> কিম্ভূত কিমাকার যেন কিমের মতন॥'...

এই গীতের ইঙ্গিতে স্পষ্ট হয় 'প্রগতিশীলবাবু' বলতে অমৃতলাল 'ব্রাহ্মবাবু'দের বুঝিয়েছেন। রক্ষণশীলদের দৃষ্টিকোণ থেকে অতিরঞ্জিত ঘটনা ও চরিত্রচিত্রণের মাধ্যমে নাট্যকার 'বাবু' সম্পর্কে সমকালের তাচ্ছিল্যমিশ্রিত ঘৃণাকেই তুলে ধরেছেন।

**বৌমা**॥ ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত অমৃতলাল বসু'র 'বৌমা' প্রহসনের প্রধান লক্ষ্য, নব্যবাবুদের স্ত্রী স্বাধীনতার বাড়াবাড়ি এবং তজ্জনিত দূরবস্থা।[৮৩] এই প্রহসনেও কাহিনি অংশ বিশেষ কিছু নেই, বাবু সম্পর্কে লেখকের পূর্বালোচিত নাটকের ধ্যানধারণা এখানেও ব্যক্ত হয়েছে। প্রগতিশীলবাবুদের বাগাড়ম্বর, কর্মহীন অলীককুসুম কল্পনা, স্ত্রীস্বাধীনতার নামে অনৈতিকতা, ভ্রান্ত দেশোদ্ধারের আদর্শ এই প্রহসনে অতিরঞ্জিত ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। তবে প্রগতিশীল অর্থে এখানে কেবল ব্রাহ্মবাবুদের ধরা হয়নি, ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু নব্যবাবুদেরকেও তার অন্তর্গত বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। নব্যপন্থী বাবুদের প্রগতিশীলতার সঙ্গে আর একটি প্রশ্ন বড়ো হয়ে উঠছিল শেষ দশকেও যে, মেয়েরা শিক্ষাদীক্ষার হাত ধরে প্রগতিশীল হয়ে উঠলে 'আর কি তাদের তেমন পাবে?' তা ছাড়া ব্রাহ্মবাবুদের প্রধান প্রধান নেতৃবৃন্দের মহত্বের প্রতি এখানে প্রশংসা করেছেন নাট্যকার— রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এমনকী কেশবচন্দ্র সেন পূতচরিত্র বলে উল্লেখ করেছে নাটকের মতিলাল নামের নব্য যুবকটি। সেদিক দিয়ে প্রহসনটি কিঞ্চিৎ অভিনবত্বের দাবি রাখে, সন্দেহ নেই।

প্রহসনে, বাবুরাম একজন নব্য যুবক। সে চাকরি-বাকরি করে না। ইংরেজের কাছে চাকরি করা মানে 'পরের গোলামি করা'। অতএব মা তাকে চাকরি করতে বললে সে 'তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে'। সে নিজেকে 'ভারত সন্তান' বলে মা'কে জানিয়েছে যে, ভারত সন্তানরা কখনো পরের গোলামি করে না। মা মূর্খ বলে তিনি বুঝতে পারবেন না। তাঁকে সে বউমাকে জিজ্ঞাসা করে শিখে নিতে বলেছে। কী যে 'ঘোর কর্তব্য' তার মাথায় রয়েছে, তার ঠান্ডাতেই সে ব্যাকুল। মতিলালে জিজ্ঞাসায় বাবুরাম জানিয়েছে, 'আসামের সেই আলুলায়িতাকেশা, বিগলিতবেশা, কটাক্ষলোচনা, অবলা, সরলা কুলি রমণীদের প্রতি' যে 'ভয়ঙ্কর অত্যাচার হয়', তাদের কথা চিন্তা করে তার 'বুক ফেটে যায়।' যদিও বাবুরাম এদের কথা তার 'বাঙ্গালা

কাগজে' লেখে, তবু মায়ের কথা থেকেই স্পষ্ট হয়, তার কাগজে তেমন চলে না। তাতে অবশ্য বাবুরাম ভাবিত নয়। সে বড়ো বড়ো সাহেবদের কাছে চিঠি লেখবার কথা বলেছে। মতিলাল যেহেতু 'রিফরমেশন'-এ হাত দেয়নি, তাই সে এসব বুঝবে না বলেই বাবুরামের ধারণা। তার ব্যস্ততার কথা বলতে গিয়ে সে বলেছে, 'আরও কত বিষয়ের জন্য আমায় ভাবতে হচ্ছে, দিনে খাওয়া রাতে ঘুম হয় না, আমি আবার চাকরী কর্ত্তে যাব! ভারতের চারিদিকে দুর্ভিক্ষ, বিধবার ক্লেশ, বম্বে-প্লেগ, চ্যারিটেবল সোসাইটি— উঃ উঃ উঃ! আমায় কত দেখতে হচ্ছে!' মতিলাল যদিও তাকে বুঝিয়েছে যে, সবাইকে কৃষ্ণদাস পাল, কেশব সেন, মনোমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্র বাড়ুয্যে হতে হবে তার কোনো মানে নেই। আপনার মা-বাপ ভাই-বোন এঁদের খেতে-পরতে দেওয়ার সুবন্দোবস্ত করাও 'নোবল্ এসপিরেশন্।' তবে শিক্ষিত প্রগতিশীল বাবুরামের সাফ জবাব, 'আমি যে এ জীবনট্য কেরানির ডেস্কেতে বা স্কুলমাস্টারি করে কাটিয়ে যাব, তা হবে না। আমার ছেলেবেলা থেকেই পব্লিক কাজে টেস্ট, স্কুলে পড়বার সময়েই আমি লাইব্রেরী আর চরিত্র-সংশোধনী সভা করেছিলেম। পাব্লিক্ম্যান হবার আমার বরাবর সখ, যদি একটা নামই না রেখে গেলেম, তবে পৃথিবীতে এলেম কেন?'

মতিলাল যথার্থই বলেছে, 'এই নাম-বাজান একটা রোগ দাঁড়িয়ে গেছে। ... বাপই না খেতে পেয়ে মরুক আর মা টোক্লাই সাধুক, নিজে একটা রাজা-বাহাদুর কি অনারেবল না হলেই নয়।' বাবুরাম তার কাগজের জন্য মায়ের কাছে তিনশো টাকা চেয়েছে। মা ইতিমধ্যেই দু'দুবার ছ'সাতশ' টাকা দিয়েছেন। এবার দিতে অস্বীকৃত হন। বাবুরাম জানায়, সে এবার কাগজ চালাতে নতুন পরিকল্পনা করেছে। গ্রাহকদের প্রত্যেককে ইমারত প্রস্তুতের কোনো একটি আবশ্যকীয় দ্রব্য উপহার দেবে সে। অতঃপর ভেতরের কথা জানা যায়, কলুদের ভেঙে ফেলা ঠাকুরবাড়ির পুরোনো বরগা কিনে তাই এক একটা পাঠিয়ে দেবে সে। তার উপর 'এক বৎসরের মধ্যে যে সকল গ্রাহক মরে যাবে, তাদের স্ত্রীরা যদি ছমাসের ভিতর বিধবা বিবাহ করে, তা হলে তাদের প্রত্যেককে এক একখানি পুরুষপীড়ন শাড়ি ও একজোড়া করে তরুবালা ইয়ারিং উপহার দিব;... স্ত্রীর অনুরোধে অনেককেই গ্রাহক হতে হবে; আমারও কাগজের শ্রীবৃদ্ধি, সমাজ-সংস্কার এক সঙ্গে দুই কাজই হবে।' এ ছাড়া পেটেন্ট মেডিসিন কিনে নিজের বলে তাই 'চালিয়ে' দেবার কথাও সে ভেবেছে।

বাবুরামের স্ত্রী কিশোরী দশটার সময় ঘুম থেকে ওঠে। উঠেই চা না পেলে বাড়ি মাথায় করে। বৃদ্ধা শাশুড়ি সংসারের সব কাজ করেন। ঝি না এলে শাশুড়ি তাকে ভাতের হাঁড়িটা একটু লক্ষ রাখতে বললে, সে বলেছে, 'আসুন, আমার সঙ্গে আসুন, আলমারি খুলে সমস্ত বই আপনার সামনে ফেলে দিচ্ছি, দেখে বলুন যে, তার মধ্যে যত নায়িকা আছে, তারা কি হেঁসেলে গিয়েছিল?' বাবুরাম স্ত্রী-অন্ত প্রাণ। বটতলা-মার্কা কিশোরী নাম পরিবর্তন করে তার স্ত্রী নতুন নাম রেখে উলঙ্গিনী— 'উল কিনা পশম, যা আমরা বুনি, সেই পশমের মতো অঙ্গ যার— অর্থাৎ নরম।' যে বাবুরাম সংসারের কুটোটি নাড়ে না, সে স্ত্রীকে নিজেই চা করে খাওয়াতে ছুটেছে। প্রগতিশীলবাবুরা ক্রমশ স্ত্রৈণ হয়ে পড়বেন, স্ত্রীস্বাধীনতার বিষময় ফল তাঁদের জীবনে অভিশাপ হয়ে দেখা দেবে, এমন ভাবনা সমকালের বটতলার প্রহসনকারদের মনে কাজ করছিল। তথাকথিত মূলধারা নাট্যকাররাও যে সে আশঙ্কা করছিলেন, অমৃতলাল বসু'র নাটকই তার প্রমাণ।

ব্রাহ্মবাবুদের লাম্পট্য ও বিকৃত যৌনজীবনের প্রতিও তীব্র কটাক্ষ আছে। হিড়িম্বাদেবী সম্পর্কে পিতার বয়সি কাকাকে বিবাহ করেছে, আবার বামাদাসের আত্মীয় যুবক সুচারুকেও নেকনজরে দেখে,

সুচারু বলেছে, 'তোমার করুণায়' আমার কোন্ সুখের অভাব? কি না তুমি আমায় দিচ্ছ? টাকাকড়ি, ছড়ি ঘড়ি, ঘোড়া গাড়ি। শুভক্ষণে বামাকাকিকে তুমি দাম্পত্য জালে আবদ্ধ করেছিলে, তাই এমন ভগ্নি-স্নেহভরা বামাকাকী পেয়েছি।' তবে ভণ্ড-লম্পট বাবুদের বিরুদ্ধেই প্রহসনকার এই ব্যঙ্গ করেছেন।

প্রহসনের শেষে পেটেন্ট ওষুধ জাল করার অপরাধে বাবুরাম গ্রেপ্তার হয় এবং মতিলালের চেষ্টায় মুক্ত হয়ে তারপর তার চৈতন্যোদয় হয়। উল্লেখযোগ্য যে, এই প্রহসনের বাবুরাম, মতিলাল নামগুলি বাবু-কাহিনির গোড়ার দিকে লেখা প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলালে'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শতক শেষের এই প্রহসনে নামগুলির পুনরাধিকার এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন ভূমিকায় নিতান্ত কাকতালীয় মনে হয় না।

প্রগতিশীলবাবুদের প্রতি সমকালীন সমাজের রক্ষণশীল গোষ্ঠীর আশঙ্কা ও বীতরাগ 'বৌমা' সহ প্রায় সমস্ত নাটক-প্রহসনেই প্রকাশিত হয়েছে দেখতে পাই। তবে প্রগতিশীলবাবুদের যেসব কাজ প্রকৃত সৎ-সুন্দর, তাঁর কোনো চিহ্ন ধরে রাখেনি এ জাতীয় নাটক-প্রহসনগুলি। এতে একপক্ষের দেখাই প্রধান হয়ে উঠেছে বলতে হয়।

আমাদের আলোচিত দৃষ্টান্তগুলি ছাড়াও, উনিশ শতকে প্রগতিশীলবাবুদের নিয়ে আরও অজস্র প্রহসন রচিত হয়েছে। এই জাতীয় প্রহসনগুলি আবার কখনো কখনো বিভিন্ন পেশাগতভাবে প্রগতিশীল বাবুদের লোভ, লালসা, বিকৃতি, অন্ধকারকে ধরতে চেয়েছে। যেমন— ডাক্তারি পেশা নিয়ে লেখা ভুবনমোহন সরকারের 'ডাক্তারবাবু' (১৮৭৫), রাজকৃষ্ণ রায়ের 'ডাক্তারবাবু' (১৮৯০), কুঞ্জবিহারী দেব-এর 'ঠেঙ্গাপাথিক ভুঁইফোঁড় ডাক্তার' (১৮৮৭) ইত্যাদি প্রহসনের বিষয় প্রগতিশীল ডাক্তারবাবুদের অনাচার-লাম্পট্য, নীতিহীনতা ও বিকৃতি; রমানাথ সান্যাল (অথবা যোগীন্দ্রনাথ সান্যাল)-এর 'নব্য উকিল' (১৮৭৫), জানকীনাথ বসু'র 'বারবাহার' (১৮৯১) ইত্যাদি ওকালতি পেশায় যুক্ত বাবুদের অন্ধকার জীবনের কথা। কেরানি জীবনের দুঃখ-দুর্দশা, পদস্খলনের কথাও পাওয়া যায় প্রাণকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কেরানি চরিত' (১৮৮৫), যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের 'কেরানি দর্পণ' ইত্যাদি প্রহসনে। তবে, সাধারণভাবে বলা যায়, প্রগতিশীলবাবুদের কথা বলতে গিয়ে বা নাটক-প্রহসনে তাঁদের ছবি আঁকতে গিয়ে লেখকেরা অনিবার্য কিছু সূত্রকে মান্যতা দিয়েছেন, যা তাঁদের বিশেষ দৃষ্টিকোণের পরিচায়ক। যথা—

ক) প্রগতিশীলবাবুরা অনেকক্ষেত্রেই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নির্দিষ্ট; প্রগতিশীল হিন্দুবাবুর কথা যত না পাওয়া যায়, তার চেয়ে বেশি মেলে প্রগতিশীল ব্রাহ্মবাবুদের অনাচার, লাম্পট্য, অনুদারতার কথা।

খ) শিক্ষার দরুন প্রগতিশীলবাবুরা সকলেই প্রায় হিন্দুসমাজের প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে দেখা যায়; কেউ কেউ সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত;

গ) পাশ্চাত্য প্রভাবিত দেশোদ্ধার, স্বদেশীয়ানা, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি আগ্রহ বা অতি আসক্তি এঁদের স্বভাব বৈশিষ্ট্য।

ঘ) স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতি পক্ষপাত এবং প্রায়শই বাড়াবাড়ি প্রগতিশীলবাবুদের চারিত্রিক ধর্ম;

ঙ) এঁরা কথায় যতটা পটু, কাজে ততটা নয়; কার্যক্ষেত্রে 'যঃ পলায়তি সঃ জীবতি' নীতিই মেনে চলেন এঁরা;

চ) লাম্পট্য তথা অবাধ যৌনতার প্রতি এঁদের একপ্রকার আসক্তি লক্ষ করা যায়;

ছ) পেশাগতভাবে কেউ সংবাদপত্রের সম্পাদক, কেউ উকিল, কেউ ডাক্তার, কেউ বা সমাজ-সংস্কারক; নিছক নিশ্চেষ্ট বা শিক্ষাদীক্ষাহীন 'নববাবু' বা 'ফোতোবাবু'দের সঙ্গে এঁরা তুলনীয় নয়; এঁদের স্বধর্ম অনেকটা 'নব্যবাবু'দের সঙ্গে;

জ) এঁরা অনেকসময়ই ভাববাদী; অলীক অবাস্তব দেশ, জাতি, সমাজ গঠনের চিন্তায় সাধারণ ধর্মাধর্ম ও কাণ্ডজ্ঞানরহিত;

ঝ) শিক্ষিত বলেই এঁদের প্রযুক্ত ভাষা অনেক মার্জিত;

ঞ) ব্রাহ্মকেন্দ্রিক জীবনযাপন, বিবাহ-বিধি, 'উন্নতশীল' সমাজগত নিয়মকানুনের প্রতি প্রগতিশীল বাবুদের উপলক্ষ্য করে ব্যঙ্গ করা হয়েছে সবচেয়ে বেশি।

ট) সর্বোপরি, প্রগতিশীলবাবুদের কথা বলতে গিয়ে কেবল নঞর্থক দিকটিকেই প্রধান করে দেখানো হয়েছে। নতুন যেকোনো প্রকার সামাজিক সংস্কারকেই অপ্রয়োজনীয় বিধায়ে সমালোচনা করা হয়েছে। তবে আশার কথা, প্রগতিশীলবাবুরা মদ্যাসক্তি থেকে যে অনেকটা মুক্ত হতে পেরেছেন, আলোচিত প্রহসনগুলি বিচার করে দেখলেই সে সত্য স্পষ্ট হয়।

উনিশ শতকের বাংলা প্রহসনে বাবুদের ভূমিকা নিছক ব্যঙ্গের, উপহাসের, ভর্ৎসনার। কোনো সদর্থক ভূমিকায় তাঁদের দেখা মেলা ভার। মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' (১৮৬১) লিখতে বসে যখন জয়পুররাজ জগৎসিংহের চরিত্রটি সৃষ্টি করেন, তখন তাতে মিশিয়ে দেন সমকালের বাবু-বাঙালির typeটি।[৮৪] ধনদাস হল জগৎসিংহ নামক বাবুর খলিফা। সে রাজাকে সন্ধান এনে দেয় জয়পুর এবং তার আশেপাশের রাজ্যের 'সকল ফুলের'। রাজা রাজকার্য বিস্মৃত হয়ে ওই নিয়েই মত্ত থাকেন তাঁর নিকুঞ্জবনে। জগৎসিংহের 'বিলাসকানন' যে সমকালের বাগানবাড়ি, তা বেশ বোঝা যায়। সেকালের ভ্রষ্টচরিত্র, বিলাসকুতুহলী, নিন্দাপঙ্কে নিমজ্জিত বাবুদের আদর্শে পরিকল্পিত জগৎসিংহের চরিত্রটিও ছোট হলেও, তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও খলিফা ধনদাসের চরিত্রটি সুঅঙ্কিত অন্যতম সক্রিয় চরিত্র হিসাবে তার চরিত্রের যাবতীয় মন্দত্ব নিয়েই আমাদের চোখে পড়ে। তবে এই নাটকেও বাবুরূপী জগৎসিংহের চরিত্রটি কেবল উপরিতলের অন্ধকার নিয়েই উঠে আসে; স্রষ্টার কোনো সহানুভূতি এই চরিত্রের বিনির্মাণে চোখে পড়ে না। 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদের মতো ব্যতিক্রমী চরিত্রের পিছনে স্রষ্টার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি থাকলেও, তা নিছকই অনন্য পররহিত। উনিশ শতকের বাংলা নাটকে ও প্রহসনে মূলত মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' এবং অশিক্ষিত তথাকথিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের ভূমিকাই সমালোচিত। এঁদের প্রতি সামাজিক সহৃদয়ের কোনোপ্রকার সহানুভূতি বা সহমর্মিতার ভাব দেখতে পাওয়া যায় না। প্রহসন ও নাটকগুলি থেকে সময়ের আর্থিক কাঠামোর বদলটিও অনুভব করা যায়। ইচ্ছে থাকলেও বাবুয়ানা সম্ভব নয়, কারণ 'বাবুয়ানা' যে আর্থিক সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে, নতুন কালের 'বাবু'দের তা নেই। অথচ শখ আছে ষোলো আনা। অতএব তাঁরা নানান উপায়ে সে শখ পূরণের চেষ্টা করেন, প্রয়োজনে চুরি বা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে হলেও। চিরকালীন মহাজনের গদির গুরুত্ব ও ভূমিকা এইসময় অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে। তবে বাবুর শখ-আহ্লাদের মধ্যে সভা-সমিতি প্রীতি, সংবাদপত্র সেবা, দেশোদ্ধার, নারী-কেন্দ্রিক আন্দোলন— ইত্যাদির প্রতি আসক্তিও দেখা যায় শতক শেষের মধ্যশ্রেণির মধ্যে বিশেষত। এ ছাড়া মদ্যাসক্তি ও বেশ্যাগিরির মতো চিরকালীন প্রবৃত্তিগুলিও নতুন কালের বাবুদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে

স্থলবিশেষে। তবে অশিক্ষিত ও শিক্ষিত বাবুদের প্রভেদ কিছু প্রহসনে অন্তত স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। বোঝা যায়, কাল বদলের সঙ্গে সঙ্গে বাবুদেরও রূপান্তর, পরিবর্তন ঘটছে। বাংলা নাটক-প্রহসনগুলি উনিশ শতকের কালসীমায় সেই রূপান্তর, আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের বাস্তবতাকেই ঈষৎ অতিরঞ্জনসহ ধরে রাখতে চেয়েছে। 'বাবু' হয়ে উঠেছে বাঙালি পুরুষের এক শতকের বিবর্তনের ধারক।

## টীকা ও সূত্রনির্দেশ


১. নাট্যশাস্ত্রের সময়কাল সম্পর্কিত আলোচনার জন্য দ্র. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুরেশচন্দ্র এবং চক্রবর্তী, ড. ছন্দা অনূদিত এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুরেশচন্দ্র সম্পা., 'ভরত নাট্যশাস্ত্র', প্রথম খণ্ড, ভূমিকা, তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৯৭; নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ১২-১৯।

২. Raha, Kironmoy, 'Calcutta Theatre' 1835-1944; Chaudhuri, Sukanta edi, 'Calcutta The Living City' vol-1.fifth impression 2011, OXFORD UNIVERSITY PRESS, New Delhi, p.186.

৩. বাৎসায়ন, ড. কপিলা, 'ভারতের নাট্য-ঐতিহ্য বিচিত্র প্রবাহ'; অনূ: চৌধুরী, নারায়ণ, সংস্করণ অনুল্লিখিত, ১৯৯৫, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়াদিল্লি, পৃ. ১৪-১৫।

৪. ঘোষ, বিনয়, 'টাউন কলকাতার কড়চা', 'কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত', ২য় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯৭, বাক্‌সাহিত্য প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ১১।

৫. Carey, W.H. 'The Good Old Days of Honorable John Company', edi by Ray, Nisith, R., Riddhi edi 1980, Riddhi India Kolkata, p. 111.

৬. তদেব, পৃ. ১৩৩।

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস ১৭৯৫-১৮৭৬', ষষ্ঠ সংস্করণ ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃ. ১৫।

৮. তদেব, পৃ. ১৬।

৯. Raha, Kironmoy, 'Calcutta Theatre', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬।

১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

১১. সুর, ড. অতুল, 'সে আর এক কলকাতা', প্রথম সংস্করণ ১৯৯৭, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃ. ১৯।

১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-৩১।

১৩. ঘোষ, লোকনাথ, 'কলকাতার বাবু-বৃত্তান্ত', অনু. সেন, শুদ্ধোদন, অয়ন, কলকাতা, পৃ. ১৭৭।

১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০।

১৫. তদেব, পৃ. ২৩।

১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুরেশচন্দ্র এবং চক্রবর্তী, ড. ছন্দা অনূদিত এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুরেশচন্দ্র সম্পাদিত, 'ভরত নাট্যশাস্ত্র' তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৬, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ৩৭।

১৭. দত্ত, মহেন্দ্রনাথ, 'কলিকাতার পুরাতন কাহিনি ও প্রথা', চতুর্থ মুদ্রণ ১৯৮৩, দি মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, কলকাতা, পৃ. ৩৭-৩৮।

১৮. Gray, Martin, A Dictionary of Literary Terms', 2nd impression 2009, Pearson Education, New Delhi, p. 116.
১৯. Cuddon, J.A, 'Literary Terms and Literary Theory, 'Fourth edition, Penguin edi 1999, Penguin Books, London, England, p.307.
২০. তদেব, পৃ. ৩০৭।
২১. Nicoll, A, 'Dramatic Theory', আখ্যাপত্র বিনষ্ট, p. 117.
২২. দ্র. গোস্বামী, ড. জয়ন্ত, 'সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন', প্রথম সংস্করণ ১৩৮১ বঙ্গাব্দ, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, পৃ.- ১৯।
২৩. বসু, ড. যূথিকা, 'বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ রচনা উনিশ শতক', প্রথম সংস্করণ ১৯৮২, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, পৃ. ৩-৪।
২৪. Baldick, Chris, 'The Oxford Dictionary of Literary Terms', 3rd edi 2008, Oxford University Press, New York, p. 299.
২৫. রায়, সিদ্ধেশ্বর, 'বঙ্গসাহিত্যে নাটক সৃষ্টি', নব্যভারত, পৌষ ১২৯৬ সাল।
২৬. দ্র. গোস্বামী, ড. জয়ন্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।
২৭. তদেব, পৃ. ২১।
২৮. মুখোপাধ্যায়, ড. অমিতাভ, 'উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি', প্রথম সংস্করণ ১৯৭১, কলকাতা পৃ. ৮৫-৯১ দ্র.।
২৯. বক্সী, ড. সন্ধ্যা সম্পাদিত, 'রামনারায়ণ তর্করত্ন রচনাবলী', প্রথম সং ১৯৯১, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃ. ৭৯।
৩০. চট্টোপাধ্যায়, বসন্তকুমার, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি', পাল, প্রশান্তকুমার সম্পা,. প্রথম সংস্করণ ২০০২, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, পৃ. ৩৬।
৩১. গোস্বামী, ড. জয়ন্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭২।
৩২. Fulcher, James, 'Capitalism', 1st edi 2004, Oxford University Press, New York, p. 8-9.
৩৩. বসু, স্বপন, 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস', ৩য় সংস্করণ ২০০০, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ২৩।
৩৪. মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ, 'চার ইয়ারে তীর্থযাত্রা', ১৮৫৮;
দ্র. সাহা, অর্ণব সম্পাদিত, 'দুষ্প্রাপ্য বাংলা সাহিত্য', ৩য় খণ্ড, প্রথম সং ২০১৩, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ২১-৬৯ দ্র।
৩৫. দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ, ১৮৬০;
দ্র. গুপ্ত, ক্ষেত্র সম্পাদিত, 'মধুসূদন রচনাবলী', একাদশ মুদ্রণ ১৯৯০, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ২৫৫-৬৮।
৩৬. তর্করত্ন, রামনারায়ণ, 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল', ১৮৬৫;
দ্র. বক্সী, সন্ধ্যা সম্পাদিত, 'রামনারায়ণ তর্করত্ন রচনাবলী', প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৯-১৭২।

৩৭. চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন 'জেল-দর্পণ', ১৮৭৫;
দ্র. সরদার, মহঃ আবদুর রফিক, 'বাংলা দর্পণ-নাটক সংগ্রহ', প্রথম সংস্করণ ২০০৪, সাহিত্যলোক, কলকাতা পৃ. ২৮৭-৩৩২।

৩৮. ঘোষ, গিরিশচন্দ্র, 'বেল্লিকবাজার', ১৮৮৬;
দ্র. ভট্টাচার্য, দেবীপদ এবং রায়, রথীন্দ্রনাথ সম্পাদিত, 'গিরিশ-রচনাবলী', ১ম খণ্ড, ৩য় মুদ্রণ ১৯৯১, সাহিত্য-সংসদ, কলকাতা, পৃ. ১১৩-১২৮।

৩৯. দ্র. ভূমিকা; তদেব, পৃ. তেতাল্লিশ।

৪০. নববিভাকর-সাধারণী, ১২৯৪;
উদ্ধৃতঃ- ভট্টাচার্য, দেবীপদ এবং রায়, রথীন্দ্রনাথ সম্পাদিত, 'গিরিশ-রচনাবলী', ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. তেতাল্লিশ।

৪১. বসু, অমৃতলাল, 'রাজাবাহাদুর', ১৮৯২;
দ্র. ড. ক্ষেত্র, গুপ্ত ও গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ সম্পাদিত, 'অমৃতলালের শ্রেষ্ঠ প্রহসন' প্রথম সং ১৯৯৪, পুঁথি প্রকাশনা, কলকাতা, পৃ. ১৩৮-১৬৮।

৪২. বসুচৌধুরী, অঘোরনাথ, 'বিলাতী যুবা', ১৮৯৬, আখ্যাপত্র বিনষ্ট।

৪৩. দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন, 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান', ২য় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ ১৯৯৪, সাহিত্য-সংসদ, কলকাতা, পৃ. ১৪৪৪।

৪৪. তদেব, পৃ. ১৪৬৫।

৪৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, 'বঙ্গীয় শব্দকোষ', ২য় খণ্ড, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৯৯৬, সাহিত্য-অকাদেমি, নতুন দিল্লি, পৃ. ১৪১৯।

৪৬. মিত্র, প্যারীচাঁদ, 'আলালের ঘরের দুলাল'। দ্র. মোহাম্মদ মণিরুজ্জামান সম্পাদিত, 'প্যারীচাঁদ রচনাবলী', ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ ২০০৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৫২।

৪৭. মধ্যস্থ, চৈত্র ১২৮০ সাল।

৪৮. নাগ, অরুণ সম্পাদিত, 'সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা', ২য় সংস্করণ ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, পৃ. ২১৪।

৪৯. গোস্বামী, ড. জয়ন্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৪।

৫০. উল্লেখিতঃ- গোস্বামী, ড. জয়ন্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৩।

৫১. গৃহীত পাঠঃ- গোস্বামী, ড. জয়ন্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮২-৪৮৪।

৫২. পালিত, প্রিয়নাথ, 'টাইটেল দর্পণ বা সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়', ১৮৯৪।
দ্র. সরদার, রফিক, সম্পা., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩-৩৫৪,

৫৩. দ্র. গোস্বামী, ড. জয়ন্ত, প্রাগুক্ত, পৃ.।

৫৪. ওদুদ, কাজী আবদুল, 'ব্যবহারিক শব্দকোষ', তৃতীয় সংস্করণ ২০০৯, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ১৭৬।

৫৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, 'বঙ্গীয় শব্দকোষ', ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০০।

৫৬. লাহা, অবতারচন্দ্র, 'সমাজ সংস্কার', পৃ. ৫।
উল্লেখিত:- গোস্বামী, ড. জয়ন্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৬-৪৭৭।

৫৭. মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ, 'আপনার মুখ আপুনি দেখ', ১৮৬৩।
দ্র. বসু, কাঞ্চন সম্পাদিত, 'দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য-সংগ্রহ' ২য় খণ্ড, সপ্তম মুদ্রণ ২০০৪, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ১৯।

৫৮. মিত্র, দীনবন্ধু, 'সধবার একাদশী', ১৮৬৬;
দ্র. গুপ্ত, ক্ষেত্র সম্পাদিত, 'দীনবন্ধু রচনাবলী', চতুর্থ মুদ্রণ ১৯৯২, সাহিত্য-সংসদ, কলকাতা, পৃ. ৯৭-১২২।

৫৯. উদ্ধৃত:- ভূমিকা, তদেব, পৃ. ৩৫-৩৬।

৬০. বসু, রাজনারায়ণ, 'আত্মচরিত';
দ্র. ঘোষ, বারিদবরণ সম্পাদিত, 'রাজনারায়ণ বসু নির্বাচিত রচনা-সংগ্রহ', প্রথম সংস্করণ ১৪০২ বঙ্গাব্দ, কলেজ স্ট্রিট পাবলিকেশন প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ৩০।

৬১. মিত্র, কালীচরণ, 'কাপ্তেন বাবু', ১৮৮৯;
দ্র. বিশ্বাস, হার্দিকব্রত সম্পাদিত, 'প্রহসনে কলিকালের বঙ্গমহিলা' ১৮৬০-১৯০৯; প্রথম সংস্করণ ২০১১, চর্চাপদ, কলকাতা, পৃ. ৩৮৯-৪১৬।

৬২. গঙ্গোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র, 'গিরিশচন্দ্র'; মজুমদার, স্বপন সম্পাদিত, দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ২৭২।

৬৩. তদেব, পৃ. ২৭২।

৬৪. ঘোষ, গিরিশচন্দ্র, 'সপ্তমীতে বিসর্জন', ১৮৯৪;
দ্র. ভট্টাচার্য, দেবীপদ সম্পাদিত, 'গিরিশচন্দ্র রচনাবলী', ৩য় খণ্ড, তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৯২, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ৭৭৫-৭৮৬।

৬৫. বসু, স্বপন, 'বাংলার নবচেতনার ইতিহাস', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

৬৬. 'হিন্দু সমাজ', 'অমৃতবাজার পত্রিকা', ০১.০৯.১৮৭০;
দ্র. মামুন, মুনতাসির, 'উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র', প্রথম সংস্করণ ২০০৬, অনন্যা, ঢাকা, পৃ. ১২৪।

৬৭. 'সভ্যতার অত্যাচার', 'কল্পনা', ১২৯৩, পৃ. ৫।

৬৮. 'ইংরাজ কি সর্বাংশে আমাদের আদর্শস্থানীয়?', ঢাকা প্রকাশ, ১৩.০৯.১৮৮৫;
দ্র. মামুন, মুনতাসির, 'উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র', নবম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ২০০০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৭৮।

৬৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

৭০. তদেব, পৃ. ৫৯।

৭১. দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, 'একেই কী বলে সভ্যতা'! ১৮৬০;
দ্র. গুপ্ত, ক্ষেত্র সম্পাদিত, 'মধুসূদন রচনাবলী', একাদশ মুদ্রণ ১৯৯০, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ২৪১-২৫৪।

৭২. চট্টোপাধ্যায়, বসন্তকুমার, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।
৭৩. বসু, করা, 'ভারতাশ্রমের সংঘ জীবন', 'কেশবচন্দ্র সেন ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', প্রথম সংস্করণ ১৪০১ বঙ্গাব্দ, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ১২২।
৭৪. ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, 'কিঞ্চিৎ জলযোগ', ১৮৭২;
দ্র. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজিত্ সম্পাদিত, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র', ১ম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ২০০২, সাহিত্য-সংসদ, কলকাতা, পৃ. ৩১১-৩২৭।
৭৫. অজ্ঞাত, 'মা এয়েচেন!!!', ১৮৭৩;
দ্র. বিশ্বাস, অদ্রীশ সম্পাদিত, 'বটতলার বই', ২য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ২০১১, গাঙ্চিল, কলকাতা, পৃ. ২০৫-২৩১।
৭৬. ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, 'এমন কর্ম্ম আর করব না', ১৮৭৭;
দ্র. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজিত্ সম্পাদিত, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক সমগ্র', ১ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮-৩৫৯।
৭৭. দ্র. শর্ম্মা, চিরঞ্জীব, 'কেশবচরিত', আখ্যাপত্র বিনষ্ট, পৃ. ১৭৯।
৭৮. শাস্ত্রী, শিবনাথ, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', দ্বিতীয় সংশোধিত নিউ এজ সংস্করণ ২০০৭, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ২০৫।
৭৯. ভট্টাচার্য্য, রাখালদাস, 'সুরুচির ধ্বজা', ১৮৮৬;
দ্র. বিশ্বাস, হার্দিক ব্রত, 'প্রহসনে কলিকালের বঙ্গমহিলা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩-২৯৯।
৮০. ভট্টাচার্য্য, রাখালদাস, 'অবলা-ব্যারাক', ১৮৮৭;
দ্র. বিশ্বাস, হার্দিকাব্রত, তদেব, পৃ. ৩০১-৩২৫।
৮১. ঘোষ, গিরিশচন্দ্র, 'সভ্যতার পাণ্ডা', ১৮৯৪;
দ্র. ভট্টাচার্য, দেবীপদ সম্পাদিত, 'গিরিশ রচনাবলী', ২য় খণ্ড, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৫, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ৬৪৫-৬৬৪।
৮২. বসু, অমৃতলাল, 'বাবু', 'অমৃত-গ্রন্থাবলী', ৩য় ভাগ, সংস্করণ কাল অনুল্লিখিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, পৃ. ১-৩৬।
৮৩. বসু, অমৃতলাল, 'বৌমা', ১৮৯৭;
দ্র. গুপ্ত, ক্ষেত্র ও গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ সম্পাদিত, 'অমৃতলাল শ্রেষ্ঠ প্রহসন', প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪-২৭৮।
৮৪. দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, কৃষ্ণকুমারী নাটক, ১৮৬১;
দ্র. গুপ্ত, ক্ষেত্র সম্পাদিত, 'মধুসূদন রচনাবলী', একাদশ মুদ্রণ ১৯৯০, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ৩০৩-৩৫০।

ষষ্ঠ অধ্যায়:

# নকশায় বাবু-জীবন

'নকশা', বা 'নক্সা' শব্দটি এসেছে আরবি 'নক্'শ্' থেকে; যার অর্থ চিত্রের কাঠামো বা খসড়া অথবা রেখাচিত্র।[১] মূল ছবির প্রাথমিক রেখাঙ্কনকেই সম্ভবত নকশা বলা হত। শব্দটির ব্যবহার সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিতান্ত অপ্রচলিত ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে লেখা, ঘনরাম চক্রবর্তীর 'শ্রী ধর্মমঙ্গল', কাব্যে পাওয়া যায়, 'তারপর বৌদ্ধ কল্কি করিল নকস। অবতার অসংখ্য লিখিল মাত্র দশ।।'[২] উনিশ শতকের কালসীমায় সম্ভবত ইংরেজি 'Sketch' শব্দের সম্পূরণ হিসাবে 'নকশা' শব্দের ব্যবহার প্রচলিত হয় এবং শব্দটির অর্থ-সংক্রম ঘটে। সম্ভবত ১৮৬১ সালে হুতোম তাঁর রচনাকে 'নকশা' নামাঙ্কিত করার পর থেকে বাংলায় 'নকশা' রচনার জোয়ার আসে এবং শব্দটির আর একটি অর্থ দাঁড়ায় হাস্যরসাত্মক বা ব্যঙ্গধর্মীরচনা।[৩] হতেই পারে, ১৮৬১-তে হুতোম কর্তৃক ব্যবহারের পূর্বে ইংরেজি 'Sketch' শব্দের পরিপূরক হিসাবে 'নকশা' শব্দটি আর কেউ ব্যবহার করেছিলেন। তবে হুতোমের রচনার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার (১৮৬২ খ্রি.) পর, design বা রেখাচিত্রের পাশাপাশি হাস্যরসাত্মক ব্যঙ্গধর্মী রচনা হিসাবেও 'নকশা' শব্দটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

J. A. Cuddon সাহিত্যের রূপগত বিভাগের আলোচনায় 'Sketch' প্রসঙ্গে বলেছেন, 'Sketch' হল 'a short piece of prose (often of perhaps a thousand to two thousand words) and usually of a descriptive kind. Commonly found in newspapers and magazines: In some cases it becomes very nearly a short story.'[৪] দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি চার্লস ডিকেন্সের 'Sketches by Boz'-এর উল্লেখ করে বলেছেন, 'A Series of Sketches of life and manners.'[৫] পাশাপাশি, হাস্যরসাত্মক চটুল এক ধরনের নাটককেও 'স্কেচ' বলা হয়। উনিশ শতকে বাংলায় অসংখ্য প্রহসন বা সামাজিক নাটককে 'সামাজিক নকশা' বলে চিহ্নিত করতে দেখা যায়, যেগুলি ব্যঙ্গ ও হাস্যের সমবায়ে আদতে সামাজিক নানান প্রবণতা, বিষয়, আচার-আচরণ ইত্যাদির সমালোচনামূলক অভিব্যক্তি। Cuddon-এর বক্তব্যকে গ্রহণ করলে বলতে হয়, 'স্কেচ' হল বর্ণনামূলক, প্রায় ছোটোগল্পের আদলবিশিষ্ট সংক্ষিপ্ত গদ্যরচনা, যা প্রচলিত সামাজিক জীবন ও তার মূল চরিত্রলক্ষণকে অল্পকথার আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলে। 'Oxford Dictionary of Literary Terms' -এর মতে , স্কেচ হল, 'a short composition, dramatic, narrative or descriptive. ... As a kind of prose narrative, a sketch is more modest than a short story, showing less development in plot or characterization. The Term is also applied to brief descriptions of people or places'.[৬] অর্থাৎ, সংক্ষিপ্ততা 'স্কেচে'র অন্যতম প্রধান লক্ষণ। অন্যদিকে নাটকীয়তা, লেখকের নিজের জবানিতে বলা বা লেখা আখ্যান কিংবা বর্ণনামূলক গদ্যে 'স্কেচে'র বিষয়বস্তু প্রকাশিত হয়। প্লট বা চরিত্র গঠনের তোয়াক্কা না করেই 'স্কেচ'ধর্মী লেখায় লেখক নিজের কথা বলে চলেন। কখনো কখনো ব্যক্তি বা স্থানিক জীবনের বর্ণনাও এই সংজ্ঞানুযায়ী, স্কেচে বর্ণিত হয়। 'হাস্যরস' স্কেচের অন্যতম গুণ বা শর্ত।[৭] তবে তার ব্যতিক্রম যে নেই, তা বলা চলে না। বস্তুত, প্রবহমান সামাজিক জীবনের বর্ণনা, ব্যক্তিচরিত্র ও জীবনের ভ্রান্তি, অসংগতি, যুগলক্ষণ ও যুগ বদলের নানান সত্য ঈষৎ রম্যতার সঙ্গে পরিবেশিত হয় 'স্কেচ'ধর্মী রচনায়। এ জাতীয় রচনায় রয়েছে চেয়ে দেখার আনন্দ। লেখকের চোখে কিছুই বাতিল নয়, কিছুই ফেলাছড়ার বা উপেক্ষার নয়, সকল বিষয়-সকল চরিত্র-সকল ঘটনাই স্কেচের দরবারে সাদরে গৃহীত। আপাত রম্যতার ছদ্ম আবরণে 'স্কেচ' নিজেকে মুড়ে নিতে চায়, গোপন করতে চায় কখনো-বা চেয়ে দেখার প্রতিক্রিয়াটুকু। 'Sketch'-এর লেখক বিষয় সম্পর্কে নির্মোহ বা

নিরপেক্ষ থাকতে পারেন, নাও পারেন। সামাজিক জীবনের উৎকট অসংগতি, ব্যভিচার-দ্বিধাদ্বন্দ্ব-অন্ধকার যে সময় প্রবল হয়ে ওঠে, সে সময়ের কথা বলতে গিয়ে 'স্কেচ'ধর্মী লেখক আপাততরল কিন্তু তীব্র ব্যঙ্গে সমুদ্ভাসিত জীবন-সত্যকে ফুটিয়ে তোলেন। ফলে আধুনিক কালে স্কেচের সঙ্গে হাস্যতরল সমাজ-সমালোচনার সম্পর্ক অতি নিকট হয়ে পড়েছে। এসব ক্ষেত্রে লেখকের পক্ষে আর নিরপেক্ষ থাকা সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। সময়ের ভ্রান্তি ও বিকৃতিকে তুলে ধরে এক সার্বিক পরিশুদ্ধির ভাবনায় লেখক আমাদের উত্তেজিত-সচেতন করতে চান। তবে, এমনটি যে করতেই হবে, তেমন বাধ্যবাধকতা নেই।

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে 'নকশা'র কারিগরেরা ইংরেজি 'Sketch'-এর ধারণার দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছেন সন্দেহ নেই। 'স্কেচ' তার আয়তন-সংক্ষিপ্ততার শর্তের জন্য বিস্তৃত বর্ণনাকে এড়িয়ে চলে, সেইসঙ্গেই পাত্র-পাত্রীর প্রত্যক্ষ উক্তি-প্রত্যুক্তির পরিবর্তে কাহিনি-কথক হিসাবে 'সর্বজ্ঞে'র ভূমিকা গ্রহণ করে। উনিশ শতকের বাংলা নকশার লেখকেরা আয়তন সংক্ষিপ্ততার শর্ত সর্বদা মেনে চলতে না পারলেও, প্রত্যক্ষ উক্তি-প্রত্যুক্তি কিংবা বর্ণনার বাহুল্য অনেকাংশেই পরিত্যাগ করেছেন। যতীন্দ্রমোহন ঘোষ তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে নকশা' প্রবন্ধে (পঞ্চপুষ্প, আশ্বিন, ১৩৩৭ সন) নকশার মূল চরিত্রলক্ষণ স্থির করেছেন, যথেষ্ট পরিমাণে হাস্যরস, সামাজিক অনাচার বা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি বিদ্রূপ, সামাজিক দোষ দূর করতে শিক্ষাদান, ব্যঙ্গকে উচ্চকিত করতে অতিরঞ্জন, লঘু ভাষা ব্যবহার, ইঙ্গিতপূর্ণ বর্ণনা ও নাতিদীর্ঘ আকৃতি।[৮] কেউ কেউ এর সঙ্গে যুগললক্ষণকেও যোগ করা উচিত বলে মনে করেছেন।[৯] তবে, নকশাকারের উদ্দিষ্ট যেহেতু প্রত্যক্ষ সমাজ ও সময়, ফলে অনিবার্যভাবেই নকশার পরিসরে 'যুগলক্ষণ' ধরা পড়ে। আসলে, যুগলক্ষণের নানান উপাদানের মধ্যে থেকেই নকশাকাররা তাঁদের দেখবার ও দেখাবার বিষয় খুঁজে পান। 'নকশা'কে তাই যুগের প্রতিবিম্বন বলেও মনে করা যেতে পারে। সমালোচকের ভূমিকাও তাঁদের নিতে হয় স্বাভাবিকভাবেই। কখনো প্রত্যক্ষভাবে, কখনো-বা পরোক্ষ উপায়ে নকশা যুগচরিত্রের সমালোচনার মাধ্যমেই সহৃদয় সামাজিককে সচেতন করতে চায়। পাণ্ডিত্যের দুরূহ ছদ্মবেশ অপেক্ষা আপাততরল হাস্যরস, লঘু ভাষা (সচরাচর যা সাধারণের মুখের ভাষা, প্রবাদ, প্রবচন ও স্ল্যাং সমেত) এবং সমসাময়িক সমাজ ও ব্যক্তির প্রতি লঘু বা তীব্র ব্যঙ্গ ও শ্লেষের প্রয়োগে নকশা তার ইপ্সিত লক্ষ্য— সামাজিক পরিশুদ্ধির দায়িত্ব পালন করে। মনে রাখতে হবে, সমাজজীবনে বিকৃতি, অনাচার, চিন্তার দৈন্য প্রকট হয়ে উঠলে, কথায় ও কর্মে তীব্র বৈপরীত্য সূচিত হলেই নকশা তার প্রকাশের ভাষা ও উদ্দেশ্য খুঁজে পায়। সুস্থিত, সাধারণ নিস্তরঙ্গ সমাজজীবন সচরাচর নকশার জন্ম দিতে পারে না। নকশাকার সাধারণ দৃষ্টিকোণে যেন শাসনকর্তা। নির্মম ব্যঙ্গের চাবুক হাতে যেন শাসন করে চলেন সামাজিক অনাচার ও বিকৃতিকে। কিন্তু আসলে তিনি সামাজিক শুভার্থী হিসাবে সমাজকে পচন-গলনের হাত থেকে রক্ষা করতে চান। এ বিষয়ে 'নকশা'র লেখকদের সঙ্গে satirist-দের সাদৃশ্য রয়েছে। নকশাকার 'তাঁর সিদ্ধান্তকে উপস্থিত করতে গিয়ে বিশেষ বিশেষ দৃশ্য অথবা চরিত্রকে কখনো বাড়ান (magnifies) কখনো ছোটো করেন (diminishes) কখনো-বা ভাঙাচোরা (distorts) করেও দেখান বা ঠকান (cheats)।'[১০] তবে সাধারণ ব্যঙ্গরচনার সঙ্গে নকশার ব্যঙ্গের তফাত হল, নকশাকার এমনভাবে তাঁর ব্যঙ্গের লক্ষ্য বা উদ্দিষ্টকে প্রকাশ করেন যে, পাঠক সহজেই তা অনুধাবন করতে পারেন। ব্যক্তিবিশেষই হোক কিংবা সামাজিক কোনো বিষয়, পাঠক নকশার মাধ্যমে তার হাস্যকর ভ্রান্তি কিংবা ভর্ৎসনাযোগ্য বিকৃতিকে লক্ষ করে হাসেন, অস্বস্তি বোধ করেন এবং কখনো-বা আত্মদর্শনের মধ্যে দিয়ে সার্বিক পরিশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা

উপলব্ধি করেন। এমনটি হলেই নকশার উদ্দেশ্য সফল হয়। এ কারণেই নকশা সাধারণের মুখের ভাষায়, আপাত লঘুতায় নিজেকে পরিবেশনযোগ্য করে তুলে বৃহত্তর পাঠকের কাছে পৌঁছোতে চায় এবং সার্বিকভাবে যুগসংকটের চেহারাকে তুলে ধরে বৃহত্তর কল্যাণের সঙ্গে নিজেকে সচরাচর যুক্ত করতে চায়। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, নকশাকারের ভূমিকা কখনো সমাজদ্রষ্টা মহর্ষির, কখনো-বা তিনি আড্ডাধারী কথক, আবার কখনো শাস্তিবিধানকারী গুরুমহাশয়ের। নকশার মধ্যে এই প্রসারতা আছে বলেই আখ্যানের আপাত স্রোতের মধ্যে মিশে থাকে আখ্যানহীনতা, প্রবন্ধ বা সমালোচনার গভীরতা ঢাকা পড়ে আপাত লঘু পরিবেশনে, একইসঙ্গে উচ্চকিত হাসির আবহে ঢেকে দেওয়া হয় হৃদয়বিদারক দীর্ঘনিঃশ্বাস। সুগভীর সমাজদৃষ্টি, নিপুণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, গভীর সহানুভূতি না থাকলে সার্থক নকশার জন্ম দিতে পারেন না স্রষ্টা। ‘নিছক হাসি’র জন্য নকশার আয়োজন নয়, আদতে সে ভাবাতে চায়, আলোচিত করতে চায়, প্রাণিত করতে চায়। তথ্য ও তত্ত্ব, মনন ও মেধা নকশার ভিয়েনে উপভোগ্য আস্বাদনের রোমাঞ্চে পরিণত হয়, সমসাময়িক সমাজ ও জীবনের সত্যকে যার আধারে প্রত্যক্ষ করে আমরা সচকিত হয়ে উঠি, লজ্জিত হই এবং আত্মসংশোধনের পথ খুঁজি।

উনিশ শতকীয় বাংলার সমাজ-পরিবেশ ছিল নকশার সার্থক বীজতলি। নতুন শহর কলকাতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল যে নাগরিক জীবনমনন সংস্কৃতি, বাংলার এতদিনকার প্রচলিত সমাজ সংস্কৃতির নিরিখে তা ছিল নিঃসন্দেহে ছন্নছাড়া। ভূমিকেন্দ্রিক গ্রামীণ অর্থনীতির পরিবর্তে সেখানে বিকশিত হয়েছিল পুঁজিভিত্তিক ধনতান্ত্রিকতা। চির পরিচিত জাতি-ধর্ম-বর্ণের বিন্যাস গিয়েছিল বদলে। প্রচলিত সামাজিক বিন্যাসে মধ্যশ্রেণির অথবা প্রান্তিক এমন অনেক মানুষই সেদিন পুঁজির জোরে ভুঁইফোঁড় সমাজশ্রেষ্ঠতে পরিগণিত হচ্ছিলেন। তাঁদের নিয়ে স্বভাবতই বিমিশ্র নাগরিক জনসাধারণের কৌতূহল ও ঔৎসুক্য ছিল বেশি। নতুন নাগরিক জীবনে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আধিপত্য বিনষ্ট করে বিশেষ করে কায়স্থ ও সুবর্ণবণিকেরা বুদ্ধি ও পুঁজির জোরে উঠে এসেছিলেন পাদপ্রদীপের আলোয়। ভক্ষক হয়ে ওঠা রক্ষকের সঙ্গে সান্নিধ্যের সুবাদে হঠাৎ নবাবও দেখা দিচ্ছিলেন ইতিউতি। টাকার জোরে তাঁরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পুষেছেন, নিজেদের স্বার্থে বদলে দিয়েছেন পুরাতন রীতিনীতি-সংস্কার; আবার তাঁরাই অপরের মূল্যবোধের বিচ্যুতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, সভাসদ, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও মোসাহেবদের আনুকূল্যে ‘জাত-কাছারি’র প্রধান হিসাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন নাগরিক জীবনের বিমিশ্র সমাজ-সংস্কৃতির গতিপ্রকৃতি। এই দ্বান্দ্বিকতা মাত্রা পেয়েছে পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত, চাকরিজীবী এক নতুন শ্রেণির উত্থানে। দেশীয় যেকোনো মূল্যবোধ ও সংস্কারকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এঁরা হয়ে উঠেছেন জ্ঞানে-মননে-আচরণে পাশ্চাত্যমুখী। পুরাতন মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই লেগেছে সংঘর্ষ-বিরোধ। সতীদাহপ্রথা রোধ, বিধবা বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে এক নতুন চেতনার ঢেউ তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন এই নতুন শ্রেণি। ধর্মের ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছিল সাময়িক বিপন্নতা। খ্রিস্টানধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম প্রভৃতির মিলিত আগ্রাসনে শিক্ষিত শ্রেণি ক্রমশ হিন্দুধর্মের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন, তেমনি জীবনযাপনেও এসেছিল পাশ্চাত্যমুখীনতা। ক্রমে উচ্চশিক্ষা ও ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ ক্রমপ্রসারিত হওয়ায় তথাকথিত মধ্যশ্রেণিও সীমিত আর্থিকক্ষমতাসম্পন্ন কিন্তু আপাতভাবে উচ্চশিক্ষিত ‘ভদ্রলোক’ হিসাবে পৃথক স্বাতন্ত্র্য দাবি করলেন। এঁদের মনন অবশ্য দ্বিধামুক্ত ছিল না পরিপূর্ণভাবে। একইসঙ্গে পাশ্চাত্যের প্রতি টান, অন্যদিকে দেশীয় মূল্যবোধের প্রতি আনুগত্য সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছিল। অন্তরালে তখন পট পরিবর্তিত হচ্ছিল।

দেশীয় শিল্পে নতুন পুঁজি বিনিয়োগ হচ্ছিল না, আবার গ্রামীণ শিল্পগুলিও নগরমুখী স্বভাবের কারণে হয় উপেক্ষিত হচ্ছিল, নয়তো বিনষ্ট হয়েছিল। সরকারি চাকরির অপ্রতুলতা, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ না বাড়ায় জন্ম দিচ্ছিল হতাশা, বেকারত্ব এবং তার দরুন অসহিষ্ণুতার। আর্থিক দিক থেকে দীন, অথচ আকাঙ্ক্ষায় উদ্‌বেল শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি সামান্য বেতনভুক কর্মচারীর ভূমিকায় দেখা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে সাহেবকুলের প্রসন্নতাপ্রার্থী, অথচ ব্যক্তিগত বিশ্বাসে ভক্তিহীন এক বিশেষ দ্বান্দ্বিকতার জন্ম দিয়েছিল কেরানিবাবুদের মধ্যে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এক শতক জুড়ে এমনই নানান রূপ-রূপান্তর, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের মুখোমুখি হয়েছিল নকশার জগৎ। সমাজ বদলের নানান বৃত্তে যেহেতু মুখ্যভাবে জড়িয়েছিলেন বাবুকুল, নকশার জগৎ খুব স্বাভাবিকভাবেই বিষয় হিসাবে তুলে এনেছেন তাঁদের। লাম্পট্য থেকে মদ্যাসক্তি, শিক্ষা থেকে স্ত্রীস্বাধীনতা— সকল প্রসঙ্গেই বাবুদের ভূমিকা সমালোচিত হয়েছে। কখনো পক্ষে, কখনো বিপক্ষে নকশা গ্রহণ করেছিল সমাজ-পরিশোধকের ভূমিকা। অনিবার্যভাবেই বাবুদের প্রসঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল সমসাময়িক সমাজ, সময়, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি। হয়তো নিরপেক্ষ ছিল না নকশার ভূমিকা। হয়তো কোথাও রক্ষণশীলদের কণ্ঠস্বর অনেক বেশি শোনা গিয়েছিল বাংলা নকশায়। তবুও তার ভিতর থেকেই বাংলার স্বনামখ্যাত বাবুকুলের চারিত্রিক ও মানসিক কাঠামোটুকু সহজেই বুঝে নিতে পারা যায়। বাংলার বাবুসমাজের সর্বাধিক প্রভাব পড়েছিল সম্ভবত নকশার উপরেই। বাবু-কথনে তাই নকশার ভূমিকা ঐতিহাসিক দিক থেকেই অপরিসীম, অনবদ্য বলা যায়।

বাংলা নকশার যাত্রা শুরু হয়েছিল সাময়িকপত্রের পাতায়। সমাজজীবনের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন নানান চিত্র ছিল সেই নকশার প্রধান অবলম্বন। বাবু-বিষয়ক আখ্যান নির্ভর নকশার প্রথম দেখা মেলে 'সমাচার দর্পণে'র পাতায়। 'বাবুর উপাখ্যান' নামক এই রচনা প্রকাশিত হয় ১৮২১-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি ও ৯ জুন সংখ্যায়। এটিকে গল্প-কাহিনি, আখ্যানের প্রাথমিক খসড়া হিসাবে গ্রহণ করে আমরা 'বাবু'বিষয়ক আখ্যান, গল্প, উপন্যাস পর্বে আলোচনা করতে চাই। এটিকে কেউ কেউ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা বলে মনে করেন,[১১] কারণ, ১৮২৫-এ প্রকাশিত ভবানীচরণের (১৭৮৭-১৮৪৮) বাবু-বিষয়ক গ্রন্থ 'নববাবুবিলাসে'র ভাষা ও কিছু বর্ণনার সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে। সম্ভবত, 'বাবুর উপাখ্যান' নামক আখ্যানকেই পরবর্তীকালে 'নববাবুবিলাসে'র প্রাথমিক উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেন ভবানীচরণ; হতে পারে, পূর্বোক্ত রচনাটি ছিল 'নববাবুবিলাসে'র আদি খসড়া। যাই হোক, ১৮২৫-এ প্রকাশিত 'নববাবুবিলাস'কে বাবুকেন্দ্রিক নকশা সাহিত্যেরই শুধু নয়, বাবু-বিষয়ক বাংলা সাহিত্যের ভগীরথ বলা উচিত। এই গ্রন্থ রচনার প্রায় ৩৫ বছর পর হুতোম তাঁর নকশা লিখতে বসেও এই গ্রন্থের অনেক সূত্রকে পরোক্ষভাবে মান্যতা দিয়েছেন, প্রত্যক্ষভাবেও 'নববাবুবিলাসে'র প্রভাব অপরাপর নকশা সাহিত্যও এড়িয়ে যেতে পারেনি।

ইতিপূর্বে ছড়া-কবিতা-পাঁচালিতে বাবুদের প্রভাব বিষয়ক আলোচনায় (চতুর্থ অধ্যায়) ভবানীচরণের বাবু-বিষয়ক 'দূতীবিলাস' (১৮২৫) ও 'নববিবিবিলাস' কাব্য প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি কী বিচিত্র জীবন-অভিজ্ঞতা ছিল ভবানীচরণের। তাঁর জন্ম হয়েছিল এমন একটি সময়ে, যখন দেওয়ানি-বেনিয়ানি-দালালি-মুৎসুদ্দিগিরি করে একশ্রেণির ভুঁইফোঁড় বিত্তপতি ক্রমশ কলকাতার সমাজজীবনে জঁকিয়ে বসেছেন। এঁদের অর্থবিত্তের জোর যতটা ছিল, শিক্ষা ও সংস্কৃতি তাদৃশ ছিল না। নাগরিক সংস্কৃতির প্রাথমিক আবহে যে স্থূলতা, তা মূলত এঁদেরই দান। শাসকশ্রেণি নিজেদের স্বার্থেই এঁদের উপর নির্ভর করে এক নতুন

ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করেছিলেন এবং দেশীয় সমাজের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছিলেন। ভুঁইফোঁড় 'হঠাৎ নবাব' তথা আদিবাবুরাও আপন আপন স্বার্থে শাসকশ্রেণির সখ্যতা কামনা করেছিলেন। তাঁদের স্থূল জীবনযাপনের সংস্কৃতিকে শাসকশ্রেণি প্রথমদিকে প্রশ্রয়ই দিয়েছে। বাইজি নাচের আসর, বাগানবাড়ির সংস্কৃতি, বেশ্যাগমন ও মদ্যপান প্রাথমিক পর্বে শাসকশ্রেণির আনুকূল্য লাভ করেছে। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে কেউ কেউ অংশগ্রহণও করেছেন এই জাতীয় রুচি-সংস্কৃতিতে। শিক্ষাদীক্ষাহীন এই সময়ে বেড়ে উঠে জীবনযাপনের তাগিদে ভবানীচরণ কী না করেছেন— সদর-মেট, মুৎসুদ্দিগিরি, পারমিটের দারোগাগিরি, সরকার, হেডসরকার, বেনিয়ানি, সেরেস্তাদারি, হুগলি কালেক্টরেটের খাজাঞ্চিগিরি ইত্যাদি। ১৮১৮-এর দিকে কলকাতায় ফিরে আসেন পাঁচ বছর উইলিয়াম ক্যারের সঙ্গে 'প্রচুরার্থ উপার্জনের' জন্য পশ্চিম প্রদেশে কাটিয়ে। অতঃপর কলকাতার বহু ধনী ও প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী মহলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। রামমোহনের সমকালে ভবানীচরণ আপন যোগ্যতাবলেই সমাজের একজন কেওকেটা হয়ে উঠেছিলেন, বিশেষত রক্ষণশীলদের তিনি ছিলেন একজন প্রধান মাতব্বর। ১৮২৩-এ নিজস্ব কলুটোলা প্রেস থেকে প্রকাশিত 'কলিকাতা কমলালয়' কড়চা-জাতীয় রচনা। কলকাতার সমাজ-ইতিহাস, বিশেষ বাবুকেন্দ্রিক সমাজ-ইতিহাসের ক্ষেত্রে একটি অত্যাবশ্যকীয় এবং উল্লেখযোগ্য রচনা। এই গ্রন্থেই তিনি প্রথম 'বিষয়ি ভদ্রলোকদের' চারটি শ্রেণিতে ভাগ করে বাবুত্বের যে ক্রমনির্দেশ করেন, তা উনিশ শতকীয় বাংলার সমাজ-ঐতিহাসিকেরা আজও গ্রহণ করে থাকেন। বিষয়ী ভদ্রলোকদের মধ্যে প্রথমোক্ত শ্রেণি অর্থাৎ যাঁরা 'দেওয়ানি বা মুচ্ছুদ্দিগিরি কর্ম্ম করিয়া থাকেন,'[১২] তাঁদেরকে আদিবাবু বলা যায় সহজেই। মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র ভদ্রলোক শ্রেণি দু'টির পরিচয় দিয়ে তিনি বলেছেন 'অসাধারণ ভাগ্যবান' লোকের কথা, 'ভগবানের কৃপাতে যাঁহারদিগের প্রচুরতর ধন আছে সেই ধনের বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ হইতে কাহার বা জমীদারির উপসত্ব হইতে ন্যায্য ব্যয় হইয়াও উদ্বৃত্ত হয়'[১৩] তাঁরাই বস্তুত 'নববাবু'। প্রত্যক্ষভাবে এঁদের ধনোপার্জনের প্রচেষ্টা করতে হয়নি, পিতৃ-পিতামহের সঞ্চিত অপরিমিত অর্থই এঁদেরকে নির্ভরতা-নিশ্চয়তা দিয়েছিল, ফলে শিক্ষাদীক্ষাহীন স্থূল বিলাস ও সংস্কৃতির ব্যক্তিগত অভ্যাসেই এঁরা মগ্ন হয়েছিলেন। নববাবুদের সেই 'হয়ে' ওঠার ইতিহাসই নকশার ছলে তুলে ধরেছেন ভবানীচরণ 'নববাবুবিলাস' গ্রন্থে এবং অন্ত্য-পরিণামের অভিঘাতে ও উপদেশে স্পষ্ট করে দিয়েছেন নকশাকার হিসাবে তাঁর সমাজকল্যাণকামী ভূমিকার কথা।

'নববাবুবিলাসে'র সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে জানিয়েছেন,[১৪] রাজধানী কলকাতা এবং তার সন্নিকটস্থ চিৎপুর, খিদিরপুর, ভবানীপুর, সেইসঙ্গে গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী শালিকা (শালকিয়া), শিবপুর, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর ইত্যাদি অঞ্চলে 'বাস্তবিক বাবু সন্দর্শনে মহাহৃষ্টচিত্ত' হয়ে তিনি 'নববাবুবিলাস' নামক কাল্পনিক অথচ 'বাস্তবিক' গ্রন্থে নববাবুদের স্বরূপ বর্ণনা করতে অনুরুদ্ধ হয়েছেন। এই গ্রন্থ যে, তথাকথিত নববাবুদের রুষ্ট করবে, তা স্বীকার করেও তাঁর আশা, শেষ পর্যন্ত তাঁরা 'বিবেচনাপূর্ব্বক তাবদ্গ্রন্থার্থাবলোকনাধীন স্ব স্ব রোষদোষ বিমোচন হইবেক।' নকশার উদ্দেশ্যমূলকতার দু'টি বিষয় তিনি স্পষ্ট করে দেন,—

(ক) বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত সামাজিক বিকৃতি-অনাচারের বিস্তৃত বিবরণ দান;

এবং (খ) এই বিবরণ প্রকাশের মাধ্যমে উদ্দিষ্ট শ্রেণি অর্থাৎ নববাবুদের চৈতন্যোদয় ঘটানো ও সামাজিক পরিশুদ্ধি প্রতিষ্ঠা।

'অথ অঙ্কুর খণ্ড অর্থাৎ বাবু রূপ বৃক্ষের অঙ্কুর' শীর্ষক অংশে তিনি নববাবুদের পিতৃ-পিতামহের পরিচয় দান প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক যাথার্থ্য রক্ষা করেই জানিয়েছেন, ইংরেজ কর্তৃক কলিকাতা নগরীর উত্থানের পরবর্তীকালে 'বাবুদিগের পিতা কিংবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা' এসে প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজের সংস্পর্শে থেকে কাজ করে অথবা অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বন করে 'কিঞ্চিৎ অর্থসংগতি করিয়া কোম্পানির কাগজ কিংবা জমিদারি ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন।'[১৫] তাঁদের অর্থোপার্জনের পশ্চাতে সর্বদা যে সদুপায় অবলম্বিত হত না, সে কথাও ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছেন। এঁরাই হলেন আদিবাবু। পণ্ডিত-পারিষদদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে বাবু 'জনগণ সন্নিধানে স্ব স্ব নাম সম্ভ্রমাভিলাষী' হয়ে পাঁচ বছর বয়স্ক পুত্রকে শিক্ষাদীক্ষার জন্য গুরুমশাই নিযুক্ত করেন। লক্ষণীয় আদিবাবুরা অনেকেই শিক্ষাগত যোগ্যতায় হীন ছিলেন, কিন্তু ইংরেজ পোষিত নাগরিক কলকাতার বুধমণ্ডলীতে প্রাধান্য পেতে গেলে শিক্ষার যে প্রয়োজন আছে তা তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন, ফলত পরবর্তী প্রজন্মকে অল্পবয়সেই বিদ্যাশিক্ষা দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। এজন্য গুরুমশাইও নিযুক্ত হয়েছেন।

বদলে যাওয়া আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিকে ভবানীচরণ গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। কৃষিকর্ম থেকে বাংলার সমাজজীবনের একটি বড়ো অংশ যে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে 'অর্থকরী' নানান পেশায় নিযুক্ত হচ্ছিলেন, এ সত্যকে স্পষ্ট করেছেন তিনি। কলকাতা নিকটবর্তী কিংবা সুদূর মফস্সল থেকেও অল্প বিদ্যাশিক্ষা করেই নতুন সামাজিক পরিস্থিতির সুযোগে অনেক কৈবর্ত্য সহ নানা জাতি, দুঃস্থ কায়স্থরা কলকাতায় এসে গুরুমশাইয়ের কাজ করছেন দেখতে পেয়েছেন তিনি। অবশ্য ব্রাহ্মণেরাও গুরুমশাই হিসাবে বিত্তবান বাবুদের বাড়িতে অগ্রাধিকার পেতেন এবং একইসঙ্গে কুলদেবতার পূজা ও রসুয়ে বামুনের ভূমিকাতেও তাঁদের প্রায়শই দেখা যেত। আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে অধিকতর অর্থ উপার্জনের প্রয়োজন এবং তার দরুন তাঁদের এই 'একই অঙ্গে এত রূপ'। এঁদেরই কেউ বাবুদের বিদ্যাশিক্ষায় নিযুক্ত হতেন।

কিন্তু তাঁদের শিক্ষার গোড়াতেই গলদ। গুরুমশাই প্রথমে তালপাতা, পরে কলাপাতায় অক্ষর, বানান, অঙ্ক, শুভঙ্করী, জমাখরা, জমাবন্দি ইত্যাদি শেখানোর চেষ্টা করতেন। কিন্তু বলা বাহুল্য অনেকসময়েই বাবুরা পড়াশোনায় শৈথিল্য দেখাতেন। গুরুমশাই তার দরুন শাসন করলে নববাবুর পিতা তাদের মারধর করতে নিষেধ করতেন, তার পরিবর্তে 'অনুনয় বিনয়' করে বুঝিয়ে শুনিয়ে খোশামোদ করে শেখাতে বলতেন— 'তুমি রাঢ়দেশী ব্রাহ্মণ কিছুই নীতিজ্ঞান নাই ভাগ্যবান্ লোকের সন্তানদিগকে বাবু বলিতে হয় সর্ব্বদা স্নেহবাক্যে তুষিতে হয় তবে তাহারা সুমেজাজে লেখাপড়া অভ্যাস করে।'[১৬] বলা বাহুল্য, এতে গুরুও সব বুঝে-শুনে হতোদ্যম হতেন এবং 'বাবুগণে এই কথা শ্রবণে মহা আনন্দ মনে প্রায় ঘুড়ি বুলবুল মনিয়া খেলাইতে থাকেন', ইচ্ছে হলে পাঠশালায় আসেন। কোনোরকমে সামান্য বিদ্যাশিক্ষা হলেই গুরুমশাইরা এসে বাবুর পিতাকে পুত্রদের শিক্ষার পরীক্ষা নিতে বলেন। আদিবাবুটি নিজেই অশিক্ষিত, অতএব পুত্রের মুখে যাই শোনেন, সে যাই লেখে, তাতেই সন্তুষ্ট হন। এরপর মোসাহেবদের স্তুতিতে তিনি ভাবতে শুরু করেন, তাঁর পুত্ররত্নটি বাস্তবিকই তাঁর বংশের মুখ উজ্জ্বল করবেন। এই মোসাহেবদের ভবানীচরণ ধর্মজ্ঞানহীন, কর্তার ছায়াসঙ্গী, মিষ্টভাষী প্রবঞ্চক 'অভাগা' বলেছেন।[১৭] এঁদের পরামর্শে অর্থকরী পারসি ভাষা শিক্ষার কারণে বাবুর জন্য মুসলমান মুনশি নিযুক্ত হয়।

নকশার নববাবুটির জন্য যে মুনশি নিযুক্ত হয়, সে আদতে বালবর কোম্পানির বোট অফিসের মাঝি। বৃদ্ধ হওয়ায় তার চাকরি গেছে, তবে ইংরেজিতে লেখা সার্টিফিকেট আছে দেখে বাবুর অশিক্ষিত পিতা

এঁকেই নিযুক্ত করলেন। কোম্পানির প্রসাদভোগী হওয়ার অভিলাষ সেকালে বিত্তপতি বাবুদের মনে কীভাবে লুকিয়ে ছিল এবং শাসকশ্রেণির প্রতি সমর্থনজ্ঞাপক আনুগত্যও কী প্রকার ছিল, এই ঘটনাই তার প্রমাণ। দুই বছর যাবৎ এঁর কাছেই বাবুরা পারসি ভাষা শিক্ষা করলেন। তারপর বাবুরা নিজেরাই ইংরেজি শেখবার আকাঙক্ষায় দিনকয়েক 'আরাতুন, পিৎরুস, ডিকরুস কালস' ইত্যাদি সাহেবদের স্কুলে যেতে শুরু করলেন। কিন্তু সাহেবি স্কুলের বিদ্যাশিক্ষা তাঁদের বুদ্ধির অগম্য হল। সুতরাং তাঁদের জন্য এবার একজন সাহেব মাস্টার নিযুক্ত হল। উপনিবেশের মানুষদের মধ্যে শাসকের বদান্যতা লাভ করতে হলে শাসকের ভাষা-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। নির্দিষ্ট সূত্র থেকে জানা যায়,[১৮] কম-বেশি ১০,০০০ হাজার বাঙালি ১৮২০-র দিকে ইংরেজি জানতেন। অতএব বাবুরা যে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন তাতে আর আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অতএব, বাবুদের জন্য 'কোনো হিন্দুস্থানী বেশ্যা কিম্বা বাঙালি বেশ্যা অথবা মেথরানীগর্ভজাত একজন সাহেব' এসে মাস্টার নিযুক্ত হলেন। তখনকার ধনীবাবুদের সঙ্গে সাহেবদের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ছিলেন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা। দো-আঁশলা সংস্কৃতির ধারক বোঝাতেই সম্ভবত নকশাকার বিদ্রূপ করেছেন এঁদের প্রতি। এঁদের শিক্ষায় বাবুদের আচার-আচরণে অনেক সাহেবিয়ানা অনুসৃত হল, তা ছাড়া ইংরেজি অনেক 'স্ল্যাং' শিখে তা ব্যবহারও করতে লাগলেন কথাবার্তায়। অল্প শিক্ষাতেই বাংলার সঙ্গে ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলতে লাগলেন এবং দু'একটি ইংরেজি চিঠিও পড়তে পারলেন। অতএব নিজের নামটিও তাঁরা ইংরাজী ধরনে বলতে লাগলেন, যেমন—তোতারাম দত্ত না বলে টোটারাম ডট্ট; যদিও 'বাবুসকল যেরূপ ইংরেজি পত্রাদি লিখিয়া থাকেন তাহা অন্য কাহার সাধ্য নাই যে পাঠ করেন বাবু বুঝিতে পারেন।'[১৯] বড়োবাবুর মোসাহেবরা এতেই তাঁকে তুষ্ট করে পুত্রের বিষয়কর্মে নিযুক্তির পরামর্শ দিলেন।

প্রথম খণ্ডে নববাবুদের শিক্ষার বিস্তৃত ছবি আঁকলেন ভবানীচরণ, সম্ভবত বাবুদের অশিক্ষার দৈন্যটি তুলে ধরতে। গোটা উনিশ শতক জুড়েই 'তথাকথিত' শিক্ষিত বাবুদের ভিড়ে কলকাতা গুলজার। রুচি ও সংস্কৃতির যথার্থ গুণগ্রাহী হতে গেলে প্রকৃত বাল্যশিক্ষার প্রয়োজন, এই সত্য তুলে ধরাই নকশাকারের অভিপ্রেত। উত্তরকালে টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলালে' মতিলাল বাল্যশিক্ষার অভাববশতই 'হঠাৎবাবু' হয়ে বসে এবং সর্বস্বান্ত হয়।

'অথ পল্লবখণ্ড অর্থাৎ বাবুরূপ বৃক্ষের পল্লব' নামক দ্বিতীয় খণ্ডে মূলত বাবুর 'নববাবু' হয়ে ওঠার বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। সেকালে তথাকথিত হঠাৎবাবুদের জীবনযাপনের একটি নির্ভরযোগ্য চিত্র এর থেকে পাওয়া যায়। জানা যায়, বাবুরা নানান বাহারি পোশাক ব্যবহার করতেন বাইরের কর্মকাজে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। এ ছাড়াও পালকি, পেয়াদা, ছাতা, পিনাস, পানসি, গাড়ি ইত্যাদিও থাকত। যাঁরা সাহেব-কুঠির বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি প্রমুখ, তাঁরা উপযুক্ত পোশাক পরে কেউ গাড়িতে, কেউ পালকিতে করে প্রথমে টালা কোম্পানি, টেলর কোম্পানি ইত্যাদি দু'তিন রকম নীলাম ঘরে যেতেন। নীলাম ঘরে জিনিস কেনা বাবুদের অন্যতম 'ফ্যাশান' ছিল। এরপর কেউ বাগবাজারের ঘাটে পানসি রেখে, কেউ ঘোড়ার গাড়িতে চেপে বড়ো আদালতে উপস্থিত হয়ে আদালতের রীতিনীতি, নিয়ম-নির্দেশ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতেন। ইংরেজ শাসকের আইন সম্পর্কে তখনও পর্যন্ত দেশীয় ভাষায় কোনো বই ছিল না। ফলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আইন-আদালত- প্রশাসন সম্পর্কে বাবুদের অভিজ্ঞতা অর্জিত হত। দুই-তিন ঘণ্টা আদালতে কাটিয়ে বাড়ি ফেরার সময় চিনাবাজারে যেতেন তাঁরা। অতঃপর ঘরে ফিরে বাইরের পোশাক ছেড়ে মিষ্টান্ন

জলযোগ করে বৈঠকখানায় উচ্চ গদির উপর পাশবালিশে হেলান দিয়ে সোনা-রূপা বা পেতলবাঁধা হুঁকায়, কেউ গুড়গুড়িতে, কেউ-বা আলবোলাতে তামাক সেবন করতেন। ইতিমধ্যে নানান মোসাহেব এসে জুটত। তারা বাবুকে নানারকম রসিকতা করে, তোষামোদ করে তুষ্ট করার চেষ্টা করত। বাবুও প্রয়োজনমত তাদের আইন-আদালত ঘটিত পরামর্শ দিতেন, কখনো-বা নিজের 'জ্ঞান' নিয়েই পণ্ডিত-শাস্ত্রজ্ঞের বিচার শুনে মীমাংসা করে দিতেন।

এদের মধ্যেই থাকত কিছু ধুরন্ধর 'অতিপ্রত্যাশাপন্ন' মোসাহেব, যাঁরা সে যুগের প্রচলিত অন্যান্য নববাবুদের নাম করে বাবুকে বলতেন, 'শুন বাবু টাকা থাকিলেই বাবু হয় না ইহার সকল ধারা আছে।'[২০] কৌতূহলী বাবুকে অতঃপর তারা অধঃপতনের পথ নির্দেশ করত। ভবানীচরণ এখানে এঁদের মুখ দিয়ে নববাবুর যে 'নবধা' লক্ষণ নির্দেশ করেছেন, উনিশ শতকের প্রথমার্ধের প্রথম তিন-চার দশক ধরে তাই ছিল নববাবুদের প্রতিষ্ঠিত লক্ষণ—

'মনিয়া বুলবুল আখড়াই গান,
খোষ পোষাকী যশমী দান,
আড়িঘুড়ি কানন ভোজন,
এই নবধা বাবুর লক্ষণ।'

পাখি পোষা, বুলবুল লড়াই, আখড়াই গান, খুশি থাকা, পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি যত্ন, যশ অর্জনের জন্য উপযুক্ত কাজ করা, দানধ্যান, ঘুড়ি ওড়ানো এবং বনভোজন— এই নয়টি বিলাসিতার লক্ষণ নববাবুদের চরিত্রান্তর্গত 'সখ' হিসাবে চিহ্নিত করে দিলেন লেখক। মোসাহেব বাবুকে এ জাতীয় লক্ষণ অর্জনের জন্য কয়েকটি উপযুক্ত পথ নির্দেশ করেছে। যথা—

প্রথমত, ভট্টাচার্য প্রভৃতি পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের কথা না শোনা, তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ না করা, সাহায্য না করা বা করলেও অনেকবার ঘুরিয়ে প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য দান করা। মোসাহেবের মতে, 'স্মৃতিপুরাণ পড়িলেই পণ্ডিত হয় না, বুদ্ধি অপেক্ষা করে, শ্রীশ্রীঁ বুদ্ধি দেন নাই, যদি তাহা থাকি তবে এত ক্লেশ পাইতে না।'[২১]

দ্বিতীয়ত, গান-বাজনা কিছু কিছু শিক্ষা করতে হবে, কারণ এতে মন ভালো থাকে। সেইসঙ্গে বাইজি ও বেশ্যাদের গৃহে মাঝে মাঝে যেতে হবে এবং প্রধান প্রধান বেশ্যাদের 'সর্ব্বদা ধনাদি দ্বারা তুষ্ট' রাখতে হবে। বিশেষ করে মুসলমান বারাঙ্গনাদের সম্ভোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, কারণ তাঁদের সঙ্গে সম্ভোগের আনন্দ অতুলনীয়।

একইসঙ্গে বেশ্যাসংসর্গজনিত পাপবোধ প্রসঙ্গে 'খলিফা' আশ্বস্ত করেছে যে, 'যদি বল যবনী বেশ্যা গমন করিব ইহাতে পাপ হইবেক তাহা কদাচ মনে করিবা না। সুখজনক কর্ম্ম করিলে যদি পাপ হইবে তবে কি শ্রী শ্রী ঁ সুখসাধন ইন্দ্রিয়কে সজনক কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেন।... যাহাদিগের পূর্বজন্মে অনেক তপস্যা থাকে তাহারাই উভয় স্ত্রী সম্ভোগ করে, অল্প তপস্যায় উত্তম স্ত্রী সম্ভোগ হয় না, যদি বেশ্যাগমনে পাপ থাকিত তবে কি উর্বশী, মেনকা, রামরম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি বেশ্যার সৃষ্টি হইত।'[২২] এতে যদি কেউ বাবুকে 'লুচ্চা' বা লুচ্চ বলে তবে তা 'তুচ্ছ' জ্ঞান করতে বলেছে খলিফা। 'লুচ্চ' হলেই বাবুয়ানার চরম হয়। ধনদৌলত, আত্মীয়স্বজন সব কিছুকে তোয়াক্কা না করে 'বেশ্যাবাজি'-তে গা ভাসিয়ে দেওয়াই বাবুর একমাত্র কাজ—

'অন্য অন্য সুখের সৃষ্টি    করি বিধি পরে মিষ্টি,
করিলেন সুখের সৃজন।
বেশ্যাকুচ বিসর্জ্জন    যতনেতে আলিঙ্গন,
আর তার শ্রীমুখ চুম্বন॥
বেশ্যার আলয়ে বসি,    এইরূপ দিবানিশি,
তুমি বাবু কর আচরণ।
ইহাতে অন্যথা কভু,    মনে না ভাবিবে বাবু,
হইবেক দুখ বিমোচন॥'[২৩]

লক্ষণীয় এই যে, 'বাবুত্বে'র লক্ষণ হিসাবে অবাধ বারাঙ্গনা সম্ভোগকে প্রধান কর্তব্য হিসাবে নির্দিষ্ট করা হচ্ছে। নববাবুদের প্রধান চরিত্রধর্ম এই 'বেশ্যাসক্তি' নব্যবাবুদের রুচির কারণে বদলে যায়, সাময়িকভাবে তিরোহিত হয় একথা জানিয়েছেন রাজনারায়ণ বসু।[২৪]

তৃতীয়ত, খলিফার উপদেশ হল, 'প্রতি রবিবারে বাগানে যাইবা মৎস্য ধরিয়া সকের যাত্রা শুনিবা নামজাদা বেশ্যা ও বাই ইহারদিগের নিমন্ত্রণ করিয়া বাগানে আনাইবা বহুমূল্য বস্ত্র হার হীরকাঙ্গুরীয়ক অর্থাৎ হীরার আংটি ইত্যাদি প্রদান কবিয়া তুষ্ট করিবা আমি সঙ্গে থাকিব দেখিবা কি মজা হইবেক।'[২৫]

চতুর্থত, যাঁর পাশা, পায়রা, পরদার, পোশাক— এই চারটি 'প' পূর্ণ হবে তিনি 'হাপবাবু' হবেন; যাঁর এই চার 'প'-র সঙ্গে চার 'খ' পূর্ণ হবে তিনি 'ফুলবাবু' হিসাবে পরিণত হবেন। চারটি 'খ' হল— খুসি, খানকি, খানা, খয়রাত। আচরণগত দিক নিয়ে বাবুত্বের এই শ্রেণিবিভাগ নিঃসন্দেহে সমকালীন সমাজের বাবুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের দিকে ইঙ্গিত করে। প্রথম চারটি বৈশিষ্ট্যে নিছক ব্যক্তিগত সুখভোগের ব্যাপার রয়েছে। পরের চারটি উপভোগ করতে হয় সমষ্টির সঙ্গে। এর সঙ্গে দানখয়রাতের প্রসঙ্গটি যুক্ত করে, অভিজাত বাবুদের আর্থিক কৌলীন্যের ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সবাই চাইলেও যে 'ফুলবাবু' হতে পারবেন না, এই বক্তব্য তারই ইঙ্গিতবাহী। এর দরুন 'ফুলবাবু'দের অনেকের সঙ্গেই সাধারণ জনজীবনের একটি যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল এবং 'ফুলবাবুত্ব' প্রশ্রয়মিশ্রিত ভর্ৎসনায় অভিসিঞ্চিত হয়। উত্তরকালে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি যতই বদলে গেছে, ততই বাবুত্বের এই আটটি লক্ষণ থেকে এক একটি লক্ষণ অন্তর্হিত হতে হতে ব্যক্তিগত সুখভোগের দু'চারটি লক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। ফলে বলা যায়, 'ফুলবাবু'ত্বের কাল নববাবুতেই শুরু, নববাবুতেই শেষ।

খলিফা নববাবুটিতে বৈঠকখানা হতে মুনশি ও মুহুরিদের বিদায় করে দিয়ে একখানি বেশ্যা এনে রাখতে বলেছে, যাতে সর্বদা 'মজা' করতে পারা যায়। তার মতে, 'এই সংসার মজার বাজার, যদি মজা করিতে পার তবে তাহাই থাকিবেক মরিয়া গেলেও দশ এয়ার ও রাঁড় ইহারা নাম করিবেক, আর কহিবেক অমুক বড় মজাদার লোক ছিল।'[২৬] লেখাপড়া না জানলেও পূর্বজন্মের কর্মফলে 'ধনোপার্জ্জন' হয়ে থাকে, খলিফার এই উপদেশে খুশি হয়ে বাবু সব ভুলে 'বাবুয়ানা'র সুখেই মগ্ন হলেন।

'অথ কুসুম খণ্ড' নামক তৃতীয় খণ্ড মূলত বাবুয়ানার বর্ণনা। এখানেই 'ফুলবাবু অর্থাৎ বাবু ফুল হইলেন।' বারাঙ্গনাদের সঙ্গে বিহার-সম্ভোগের প্রয়োজনে বাবুরা কী প্রকারে অর্থ সংগ্রহ করতেন তার একটি বিস্তৃত ও বাস্তব ছবি তুলে ধরেছেন লেখক। আমাদের এই বাবুটি এখনও নাবালক; খলিফার পরামর্শে 'কাপ্তেনবাবু' হয়েছেন। ফলে এরকম ক্ষেত্রে বাবুদের টাকা ধার দেবার জন্য মহাজনেরা তৈরি থাকতেন। মোসাহেব ও

দালাল মারফত মহাজনের সঙ্গে বাবুর যোগাযোগ ঘটত। অনেক ক্ষেত্রেই বাবুর সঙ্গে মহাজনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটত না। দালালদের সঙ্গে মোসাহেব বা 'খলিফা'র ব্যবস্থা থাকত। টাকা ধার দেবার আগে মহাজনেরা বাবুর নাম, ধাম, বংশপরিচয়, আর্থিক কৌলীন্য এসব দেখে টাকা ধার দিতেন। শহরের ধনী গৃহস্থদের নিজস্ব তালিকা থাকত মহাজনদের কাছে। সেখানে 'কোন লোক ধনী অবিরোধী অজাতুল্য এবং সন্তানকে অধিক স্নেহ করে', এসব তথ্য সংগ্রহ করা থাকত। অতঃপর যত টাকা প্রয়োজন, তার দু'গুণ বা চতুর্গুণ টাকার অঙ্কলেখা হ্যান্ডনোট বাবুকে দিয়ে সই করিয়ে নেওয়া হত এবং প্রদেয় টাকা থেকেই দালালেরা তাদের প্রার্থিত কমিশন ও বকশিস আদায় করত। ফলে বাবুর হাতে পৌঁছোত প্রার্থিত অর্থের তুলনায় অনেক কম অর্থ। ফলে বাবুকে আবার ধার করতে হত। বারংবার এই ধারের ফলে বাবুর মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সাবালক হবার আগেই বিকিয়ে যেন মহাজনের গদিতে।

আমাদের বাবুটিও এভাবেই টাকা ধার করেছেন। মহাজনের খাতায় তাঁর নাম, ধাম, বংশকৌলীন্যের পরিচয় মেলে। বাবুর নাম জগদ্দুর্ল্লভ নাগ, পিতার নাম রামগঙ্গা নাগ। হরেক রকম ব্যাবসাবাণিজ্য আছে, বেলেঘাটায় চুনের গোলা, জকসনের ঘাটে 'থ্যালার দোকান', খাতাবাটিতে মুটের সরদারি সব মিলিয়ে প্রায় দুই লক্ষ টাকার সম্পত্তি। অতএব খলিফা, দালাল, মহাজন সকলে মিলে দুই হাজার একশো টাকার নোটে সই করে বাবুর হাতে পাঁচশো টাকা তুলে দিয়েছে। টাকা পাবার পর মহাজনের তরফে তিনজন লোক সাক্ষী স্বরূপ বাবুকে জিজ্ঞাসা করে গেছে যে, তিনি যত টাকার নোটে সই করেছেন তার সমপরিমাণ টাকা পেয়েছেন কি না। খলিফাটি একটি ফোতোবাবু। এককালে কাপ্তেনি করে সর্বস্বান্ত হয়ে তিনি এখন বড়োমানুষের মোসাহেব হয়েছেন। তাঁর পরামর্শে বাবু জানিয়েছেন, তিনি নোটের 'বেবাক' টাকা পেয়েছেন। এভাবেই সর্বনাশেরও বীজ রোপণ করেছেন।

এরপর বাগানবাড়িতে বেশ্যাসংসর্গে বাবু 'মজাতে' মত্ত হয়েছেন। মদ, মাংস, গাঁজা, সিদ্ধি, চরসসহ নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য, গন্ধদ্রব্য, ইয়ারবকশি, খানসামা, খেদমদগার, হুঁকাবরদার, পাঙ্খাবরদার ও ভৃত্যসমেত বাবু গিয়ে বাগানে উঠেছেন। সেখানে প্রধান একজন বেশ্যাসহ অনেক বেশ্যা মজুত থাকতেন, তাঁদের সঙ্গেই বাবু রভসযামিনী আনন্দে কালযাপন করেছেন। বাবুয়ানার চরম বোঝাতে নকশাকার বাবুর স্নান দৃশ্যের উল্লেখ করেছেন [২৮], সেখানে বাবু আতর মর্দন করে, কাঁচাগোল্লা দিয়ে মাথা ঘষে, পুকুরে স্নান করার পরে গোলাপজলে শরীর ধৌত করে নানান দামি বস্ত্র থেকে পছন্দমত বস্ত্র সকলকে দান করে নিজে পরে তারপর বেশ্যাসংসর্গে পানভোজন ও অন্যান্য আনন্দে লিপ্ত হয়েছেন। নিজের বাগানবাড়ি ও বেশ্যাগৃহ ছাড়াও মাহেশের স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে বেশ্যাবিহার এই সময়ের পূর্ব থেকেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল মনে হয়। 'সমাচার দর্পণে' এ বিষয়ে অনেক অনৈতিক কর্মকাণ্ডের সংবাদ ও চিঠিপত্রাদি প্রকাশ হতে দেখা যায়।[২৯] বাবুয়ানায় অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণে অনেকসময় বাজার থেকেও আর ধার মিলত না। তখন স্ত্রীর গয়নাই ছিল ভরসা। স্ত্রীরাও অনেক সময়েই বাবুর টাকার গরজ বুঝতে পেরে নানান শর্তসাপেক্ষে গয়না তুলে দিতেন।

এই প্রসঙ্গেই উনিশ শতকীয় বাঙালি জীবনে অন্দরমহলের যৌনতার অবৈধ আখ্যানের কথাও ছুঁয়ে যান নকশাকার। আপাতভাবে রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারে বারবিলাসী বাবুর অনুপস্থিতিতে বাড়ির স্ত্রীলোকেরা অনেকেই অবৈধ যৌনতায় লিপ্ত হতেন। অকাল বিধবা কিংবা স্বামীর মুখ দ্বিতীয়বার না দেখা কুলীন কন্যাদের পাশাপাশি সধবা পরিবারস্থ স্ত্রীরাও এ জাতীয় অবৈধ যৌনতায় উৎসাহিত হতেন।

নকশাকার এজন্য অবশ্য বাবুদের বেশ্যাগমনের মতো 'অসুখ'কেই প্রকারান্তরে দায়ী করেছেন। বর্তমান নকশার বাবুটির স্ত্রীও গয়না দেবার আগে বাবুকে দিয়ে বারংবার প্রচার করিয়ে নেন যে, 'আমি এক্ষণে দুই মাসাবধি প্রতিদিন বাটীর মধ্যেই শয়ন করিতেছি।'[৩০] চতুর্থখণ্ড 'অথ ফল কাণ্ড অর্থাৎ বাবুরূপ বৃক্ষের ফল' অংশে আমরা দেনার দায়ে সর্বস্বান্ত বাবুকে আক্ষেপ করতে দেখি, 'হা বিধাতা এক দিবস স্ত্রীসহিত বাস করিলাম না তথাপি হলো যাতনা, পরে করে গেল সুখ আমার ভাগ্যে ছিল দুঃখ,'[৩১] অতএব বাবু একে একে পাঁচ কন্যার বিবাহ দিয়ে পথে বসলেন।

বাবুদের ধারদেনার পরিমাণের উপর মহাজনরা তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন। তাঁদের হিসাব অনুযায়ী বাবুদের নিজস্ব সম্পত্তির মূল্য যতখানি, ধার দেনার পরিমাণ মহাজনের হিসাব মতো সেই অঙ্ক ছুঁলেই বাবুকে অর্থ জোগান বন্ধ হত। ধার বাকির দায়ে অবশেষে টাকা দিতে অপারগ বাবুর নামে ওয়ারেন্ট বেরোত এবং কখনো কখনো বাবুকে জেলে যেতে হত। যেসব বারাঙ্গনার সঙ্গে মাসোহারার বন্দোবস্ত থাকত, তাঁরাও কখনো কখনো সুযোগ বুঝে মাসোয়ারা-বাকির দায়ে বাবুর নামে নালিশ করতেন। তার অনাদায়েও বাবুর জেল হত কিংবা জেলের মেয়াদ বৃদ্ধি পেত। কাপ্তেনবাবুদের ক্ষেত্রে অনেকসময় পিতা বা বয়োঃজ্যেষ্ঠরা দেনা মিটিয়ে খালাস করে আনতেন বটে, কিন্তু অন্যবাবুদের ক্ষেত্রে এমনটি সচরাচর ঘটত না। আলোচ্য নকশার বাবুটিকে অবশ্য তাঁর পিতা সমস্ত ধারদেনা শোধ করে ছাড়িয়ে আনেন। মোসাহেবের দল ইতিমধ্যে অন্তর্হিত হয়েছে। অভিজাত বারাঙ্গনারাও আর বাবুকে গ্রহণ করে না। অতএব বাবু বাঁশতলার গলির বয়স্ক ও নিম্নশ্রেণির বেশ্যার কাছে যাতায়াত শুরু করলেন। দু'টি পুত্রসন্তানও হল সেই বারাঙ্গানার গর্ভে। কিন্তু বাবুটি নানারূপ যৌনরোগাক্রান্ত হলেন। ইতিমধ্যে পিতার মৃত্যু ঘটলে জ্ঞাতিকুটুম্ব নববাবুকে একঘরে করলেন। যদিও 'শ্রাদ্ধের উপলক্ষ্যে সমন্বয়' হল। নতুন বাড়ি বানিয়ে এবং পাঁচ মেয়ের বিয়ে দিয়ে বাবু একেবারে পথে বসলেন। শেষপর্যন্ত টালার বাগানে আরেক 'ভাগ্যবানের অধিকারে' বাস করতে লাগলেন মোসাহেব হিসাবে। আলোচ্য অংশে যবনী বেশ্যা সংস্পর্শে বাবুর জাতিচ্যুত হওয়া এবং শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে সমন্বয়ে অতি পরিচিত একটি সামাজিক ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। রাজনারায়ণ বসু জানিয়েছেন, 'হাটখোলার বিখ্যাত দত্তবংশীয় কালীপ্রসাদ দত্ত সর্ব্বনীতি বিরুদ্ধ, বিশেষতঃ হিন্দু নীতিবিরুদ্ধ এক কার্য্য করেন, তাহাতে তিনি জাত্যান্তরিত হয়েন ও তাঁহার পক্ষীয় লোকেরা তাঁহাকে সমন্বয় করিয়া জাতিতে তুলেন। তাহাতেই কালীপ্রসাদী হেঙ্গামের উৎপত্তি হয়।'[৩২] কালীপ্রসাদ বিবি আনর নামে এক মুসলমান বেশ্যাকে উপপত্নী রেখে একত্রে বাস করেছিলেন কিছুকাল। তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে এই হাঙ্গামা ও সমন্বয়ের কাজটি হয়। একাজে দত্তবংশের কৃপাপুষ্ট, পরবর্তীকালের সুবিখ্যাত ধনী রামদুলাল সরকারের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা ছিল। সেকালের সমাজে আলোড়ন তোলা এই ঘটনার কথা পরবর্তীকালেও স্মরণ রেখেছেন কেউ কেউ। রাজনারায়ণ বসু যেমন, তেমনি হুতোম প্যাঁচার নকশাকারও এই ঘটনার কথা প্রকারান্তরে উল্লেখ করেছেন রূপকের মাধ্যমে। ভবানীচরণ তাঁর নকশা লিখতে বসেই এভাবেই সমকালকে ছুঁয়ে যান।

দেখা যাচ্ছে, ভবানীচরণ 'নববাবুবিলাসে' বাবুত্বের সকল লক্ষণ ও চরিত্রকে ধরতে চেয়েছেন। কাপ্তেন হয়ে ওঠা নববাবুর পরিচয় প্রসঙ্গে তাঁর নামোল্লেখ করা হলেও রচনার স্থানে স্থানে 'বাবু', 'ফুলবাবু', 'নববাবু', 'লুচ্চ' ও 'কাপ্তেন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। মনে করা সংগত যে, পৃথক নামোল্লেখের সীমায় সংহত না করে, নববাবুদের একটি সাধারণ type সৃষ্টি করতেই চেয়েছিলেন তিনি। ভূমিকায় এ কারণেই

'বহু অভিজ্ঞতার' কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। নববাবুদের যে সার্বজনীক model-টি তিনি নির্মাণ করেছেন, উত্তরকালেও তা থেকে সরে আসা এমনকী হুতোমের পক্ষেও সর্বদা সম্ভব হয়নি। নকশাকে যদি সমাজের প্রতিবিম্বন হিসাবে গ্রহণ করতে হয়, তবে বলতেই হবে 'নববাবুবিলাস' উনিশ শতকের বাবুবিলাসের প্রাথমিক পর্বের বাবুদের একটি সাধারণীকৃত প্রতীক। একইসঙ্গে নববাবুদের অনুতাপও পরিশুদ্ধির ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি সমসময়ের ক্ষমামিশ্রিত সহানুভূতির চিত্রটিও স্পষ্ট করে দেন। আলোচ্য বাবুটি প্রথমে কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে নিজের মৃত্যু কামনা করেছেন, পরে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করে ইহকাল ও পরকালেও সুখভোগের পরামর্শ দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, এ পরামর্শ আদতে নকশাকারের। বস্তুত, ভবানীচরণের 'নববাবুবিলাস' বাবুকেন্দ্রিক নকশা-সাহিত্যের প্রথম ও অন্যতম সার্থক সৃষ্টি। বাঙালি অভিজাত পুরুষের জীবনযাপন ও মনোভাবের অন্দরমহলের ঢোকার এমন দুর্লভ চিত্র উনিশ শতকের প্রথমার্ধে আর নেই। প্রমথনাথ শর্ম্মণঃ নামে প্রকাশিত এই রচনাপ্রসঙ্গে ১৮২৫-এর অক্টোবর সংখ্যা 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' যথার্থই বলেছে : 'The knowledge of the author respecting the subject he handles, must necessarily be more correct than that which a foreigner could acquire, and his descriptions may therefore be reclived with great confidence. Though the work is highly satirical and though some of its strokes of ridicule may be too deeply touched, we cannot venture to pronounce it a caricature. Every opportunity we have enjoyed of examining the subject has confirmed us in its justness. The humour of the work, however is sometimes too broad, its different parts are not invariably in good keeping with each other, its episodes are occasionally dull and languid, and its poetry often in harmonious as well as prosing, but with all its defects, it is a valuable document; it illustrates the habits and economy of rich native families, and affords us a glance behind the scenes.' [৩৩]

ভবানীচরণের পর দীর্ঘকাল বাংলায় নকশা জাতীয় গ্রন্থ রচিত হওয়ার কোনো প্রমাণ মেলে না। সমসাময়িক প্রায় সকল পত্রিকার নামমাত্র যেহেতু পাওয়া যায়, ফলে এমনটিও বলা সম্ভব নয় যে সংবাদপত্রের পাতায় নকশা জাতীয় কোনো রচনাদি প্রকাশিত হয়নি। তবে এ জাতীয় গ্রন্থ যে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে আর কোনো একটি প্রকাশিত হয়নি বলাই যায়। ১৮৬১ সালে হুতোম তাঁর সুবিখ্যাত নকশার প্রথম খণ্ড নিয়ে আবির্ভূত হলেন। ১৮৬২-তে এই গ্রন্থের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হবার পরই বলা চলে জনপ্রিয়তায় গ্রন্থটি তুঙ্গ স্পর্শ করে এবং একইসঙ্গে একাধিক নকশাকারকে প্রণোদিত করে। কেবলমাত্র বাবুকেন্দ্রিক নকশা হিসাবেই নয়, সমালোচকের মতে, 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলিকাতার ধনীসমাজের এবং কলিকাতা শহরের যে চিত্র বইটিতে আঁকা আছে তাহার ঐতিহাসিক মূল্য তুচ্ছ নয়।'[৩৪] হুতোম ভবানীচরণের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কিনা জানা যায় না, তবে ভবানীচরণ যেমন নকশার শুরুতেই পেশাগতভাবে 'হঠাৎ নবাব' হয়ে ওঠা ভুঁইফোঁড় আদিবাবুদের কথা বলে মূল বাবুদের কথায় প্রবেশ করেছেন, হুতোমও তদ্রূপ। কারোর কারোর মতে, 'হুতোমের চলিত ভাষার স্বচ্ছতা, বর্ণনায় ডিটেল্‌স বা অনুপুঙ্খের সমারোহ, পার্শ্বচরিত্রগুলির প্রতি মনোযোগ তাঁর পূর্বসূরীদের মধ্যে একমাত্র টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্রের ''আলালের ঘরের দুলালে''ই (১৮৫৮) কিছুটা মেলে।'[৩৫] তবে, ভবানীচরণ কিংবা প্যারীচাঁদ,— সাদৃশ্য যাঁদের সঙ্গে যতটাই থাক না কেন, সে সাদৃশ্য প্রধানত অবলম্বিত বিষয়ের। কিন্তু বৈসাদৃশ্য কম নেই। ভবানীচরণ ও প্যারীচাঁদের অভিমুখ ছিল

বাংলার তথাকথিত বাবু এবং তার বিলাসিতা ও লাম্পট্য। অন্যদিকে হুতোমের পরিকল্পনা আরও ব্যাপ্ত, ব্যাপক। শুধুমাত্র বাবু নয়, বৃহৎ অর্থে উনিশ শতকের ছয়ের দশক পর্যন্ত প্রসারিত সময় ও বিশেষ করে কলকাতার সমাজজীবনের চিত্রই তাঁর অভীপ্সিত। এ কারণেই, ঐতিহাসিক দিক থেকেই হুতোমের রচনা অনেক বেশি গভীর ও মূল্যবান। দ্বিতীয়ত, ভবানীচরণের 'নববাবুবিলাস' আখ্যানধর্মী নকশা এবং প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' ক্ষুদ্র-উপন্যাস। প্রত্যক্ষত একটি কাহিনি-সূত্রে উভয়ের রচনা বাবুত্বের একটি সাধারণীকৃত রূপ নির্মাণ করেছে। অন্যদিকে হুতোম নকশার দিক থেকে অনেক বেশি যথার্থ এবং সংযত। টুকরো টুকরো রচনায় বাবুত্বের নানান দৃষ্টান্ত ও চোখে দেখা কিংবা কানে শোনা অভিজ্ঞতাকে তিনি বুনে গিয়েছেন মূলত তৎকালীন সমাজ-পরিবেশকে মূর্ত করার উদ্দেশ্যে। বাবুই তাঁর নকশার সমাজ নয়, সমাজের অন্যতম উপাদান বা অংশমাত্র। ফলে বাবু ছাড়াও কে নেই তাঁর রচনায়? সাহেব, গোমস্তা, ব্রাহ্মণ, কেরানি, ব্যাপারী, গাঁটকাটা, টুলো ব্রাহ্মণ, ভণ্ড গুরুদেব, ব্রাহ্ম আচার্য, টিকিট কালেক্টর, পুস্তক-বিক্রেতা, মেছুনি, সং সাজা ভণ্ড— এককথায় হুতোমের রচনা যেন বহুচরিত্রের মিছিল। আপাতভাবে পরস্পরবিচ্ছিন্ন এইসব চরিত্র একত্রে নির্মাণ করেছে আর এক অখণ্ড চরিত্র,— কলকাতার বিমিশ্র নাগরিক সমাজের সাধারণীকৃত রূপটি যার থেকে স্পষ্ট হয়। এ ধরনের ব্যাপ্তি পূর্বসূরিদের রচনায় নেই। তৃতীয়ত, ভবানীচরণ ও প্যারীচাঁদ যে বাবুদের কথা বলেছেন, তাঁদের তাঁরা পেয়েছেন চোখে দেখা অভিজ্ঞতার সত্যে। প্যারীচাঁদ যদিও ডিরোজিয়ান ছিলেন তথাপি নব্যবাবুত্বের লক্ষণগুলি তাঁর জীবনাচরণে তেমন প্রভাব বিস্তার করেনি। বরং উত্তরকালে ভূত-ভগবান-আত্মা-পরমাত্মায় বিশ্বাসী নিষ্ঠাবান থিয়োলজিস্ট হিসাবে তাঁর ভূমিকা নব্যবাবুদের মুক্তচেতনার পরিপন্থী। অতএব, ভবানীচরণ ও প্যারীচাঁদের পক্ষে নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে বাবুদের দেখা ও তাঁদের ভূমিকার পর্যালোচনা করা তুলনায় সহজ ছিল। কিন্তু, হুতোম নিজেই উনিশ শতকের এক প্রখ্যাত বাবু। দ্বিধাদ্বন্দ্বে, চিন্তা ও কর্মের বৈপরীত্যে একইসঙ্গে নিন্দিত ও অভিনন্দিত বাবুটির এ এক সুকঠিন আত্মদর্শন। স্বশ্রেণির মাঝে থেকে স্বশ্রেণির ত্রুটি-বিচ্যুতি, অনাচার, ভণ্ডামির এহেন অকুণ্ঠ সমালোচনা যেমন অভিনব, তেমনি দুরূহ। হুতোম তাঁর নকশায় সেই দুরূহ কাজটিই করেছেন অনায়াস-স্বাচ্ছন্দ্যে। নকশার প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় হুতোম নিজেই বলেছেন, 'কি অভিপ্রায়ে এই নক্‌শা প্রচারিত হলো, নক্‌শাখানির দু'পাত দেখ্‌লেই সহৃদয় মাত্রেই তা অনুভব কত্তে সমর্থ হবেন, কারণ এই নক্‌শায় একটি কথা অলীক বা অমূলক ব্যবহার করা হয় নাই— সত্য বটে অনেকে নক্‌শাখানিতে আপনারে আপনি দেখ্‌তে পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক সেটি যে তিনি নন তা বলা বাহুল্য, তবে কেবল এই মাত্র বল্‌তে পারি যে, আমি কারেও লক্ষ করি নাই অথচ সকলেরেই লক্ষ করিচি, এমনকি স্বয়ং ও নক্‌শা মধ্যে থাকিতে ভুলি নাই।'[৩৬]

হুতোমের নকশার অবলম্বন ছিল, উনিশ শতকীয় কলকাতার চোখে দেখা নাগরিক সমাজ এবং অনুবর্তী নানান ঘটনা, হুজুক, কেচ্ছা ও কিংবদন্তী। নাগরিক সমাজকে তিনি দেখেছেন উৎসব-পার্বণের ভিড়ে কিংবা রেলের কামরায়। উৎসব-পার্বণ ছাড়া অন্য সময়ে জীবন সাধারণত গতানুগতিক, নিস্তরঙ্গভাবে বাহিত হয়। উৎসব-পার্বণেই আমাদের অন্তর্গত প্রবৃত্তিগুলি পরিতৃপ্তির পথ খোঁজে, বাইরের আমিকে ঠেলে সরিয়ে বেরিয়ে আসে ভিতরের আমি। একইসঙ্গে, উৎসব-পার্বণেই বাবুরা বাবুগিরি ও বিলাসিতার চরমে পৌঁছোতেন। বাবুতে বাবুতে শুরু হত প্রতিযোগিতা। এর দেখাদেখি সাধারণ অর্থ-সামর্থ্যযুক্ত নাগরিকের মনেও জেগে উঠত পোশাকি বাবুগিরির আকাঙক্ষা। ফলে বাবুত্ব তখন আর ব্যক্তিবিশেষের থাকত না, তা

এক সার্বজনীন আস্বাদনে পরিণত হত। সম্ভবত, এ কারণেই হুতোম নানান উৎসব-পার্বণের অবকাশে বাবুত্বের চেহারাকে পর্যবেক্ষণ ও পরিবেশন করেছেন। প্রয়োজনে বিধায়ে নানান কিংবদন্তী বা ইতিহাসসিদ্ধ ঘটনাকেও তুলে এনেছেন তিনি। অন্যদিকে, নকশার প্রথম খণ্ডের 'হুজুক' শিরোনামযুক্ত অংশগুলি মূলত সমকালীন নানা ঐতিহাসিক ঘটনার অনুক্রম যেমন— সিপাহি বিদ্রোহ, নানা সাহেব, কৃশ্চানী হুজুক, জাল প্রতাপচাঁদ, পাদ্রি লং ও নীলদর্পণ ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলি। এগুলিতে বাবু কিংবা বাবুয়ানার আগে কোনো চিত্র উপস্থিত করেননি হুতোম। এমনকী সাধারণ রসিকতার ছলে এগুলির বর্ণনা দিলেও বিষয়গুলির গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য আদৌ লঘু হয়নি। কেউ কেউ যে বলেছেন,[৩৭] হুতোম 'প্রকৃত ঘটনা, হুজুক ও গুজবে'র মধ্যে কোনো পার্থক্য না করে 'বহুজনজ্ঞাত, শোরগোল-জাগানো যেকোনো বিষয়'কেই 'হুজুক' বলে গ্রহণ করেছেন, এটি প্রকৃত সত্য নয়। হুতোম বা জনতার কোনো 'অজ্ঞতা'র ধারণা নেই এখানে। আরবি 'হজ্‌ব্' বা ফারসি 'হুজুস্' থেকে আগত হুজুক বা হুজুগ শব্দের অর্থ হচ্ছে দু'টি[৩৮]— ক) মূল অর্থ, সাময়িক আন্দোলন, খ) পরবর্তীকালে প্রচলিত অর্থ জনরব বা গুজব। হুতোম বস্তুত এই দু'টি অর্থেই 'হুজুক' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। মিউটিনী, প্রতাপচাঁদ, লালা রাজাদের বাড়ি দাঙ্গা, মিউটিনী, নানা সাহেব, লক্ষ্ণৌয়ের বাদশা, পাদ্রি লং ও নীলদর্পণ ইত্যাদিতে যেসব ঘটনা সাময়িকভবে কলকাতার জনসমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল সাময়িকভাবে, তারই পরিচয় তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে ছেলেধরা, মহাপুরুষ, মরা ফেরা, সাত পেয়ে গোরু ইত্যাদি জনরব বা গুজব সম্পর্কেও তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন। শিক্ষা ও মুক্তচিন্তার সঠিক অনুপানের অভাবে যেকোনো সমাজেই এ ধরনের গুজব বা হুজুগের প্রভাব পড়ে, হুতোম সমসাময়িক ঘটনা থেকে তারই কিছু তুলে ধরেছেন মাত্র। এরই সঙ্গে, 'বুজরুকী' শীর্ষক অংশে হুতোম সামাজিক নানান আপাত ঘটনার পিছনের ভণ্ডামির স্বরূপ তুলে ধরেছেন। এগুলি সমকালীন সমাজের সাধারণ লোকচরিত্র বোঝার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক।

উৎসব পার্বণাদি উপলক্ষ্যে বাবুদের প্রসঙ্গ তুলে ধরতে গিয়ে হুতোম বাবুকেন্দ্রিক নানান কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির ইঙ্গিত করেছেন কখনো সরাসরি, কখনো আভাসে। কুৎসা রটনার পিছনে কেবল গ্রামীণ সংস্কৃতির উত্তরাধিকার কাজ করে কি না তা তর্কসাপেক্ষ, তবে অপরের স্খলন-পতন-ত্রুটি-বিচ্যুতি-অন্ধকার সম্পর্কে মানুষের প্রবৃত্তিগত কৌতূহল শহর ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই এক। শুধু শহরের ক্ষেত্রে তার অভিঘাত গ্রামের তুলনায় সংগঠিত নয়। উনিশ শতকের কলকাতার ক্ষেত্রে এমনটি বলা সম্ভব নয়, কারণ বিশ শতকের প্রথম দিকেও কলকাতা তার চেহারা থেকে গ্রাম্যশ্রী পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারেনি। উনিশ শতকের শেষপর্যন্ত শহরের অধিকাংশ অংশই স্বচ্ছন্দ পুর-পরিষেবার আলো দেখেনি যথাযথভাবে। এই গ্রাম্যতার আবহে জীবনযাত্রাও ছিল খুব মন্থর গতির। উনিশ শতকের প্রথম থেকেই আদি, নব, নব্যবাবুদের দিকে আপাত শহর কলকাতার কৌতূহল-ঔৎসুক্য ক্রমজাগ্রত দেখা যায়। উনিশ শতকের শেষের কয়েক দশক বাদ দিলে তখনও পর্যন্ত নাগরিক জীবনে নানান প্রতিষ্ঠিত, অভিজাত বাবুদের প্রাধান্য ও নিয়ন্ত্রণ ছিল শাসক-স্বীকৃত। এঁদের প্রত্যেকেরই ছোটো-বড়ো নানান সামাজিক দল ছিল। নগরজীবনে প্রাধান্য ও বেশি সংখ্যক মানুষের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য এক দল বাবুসহ অন্যদলের নানান ত্রুটি-দুর্বলতার সন্ধান করে বেড়াত। উপযুক্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চোখে পড়লে তা থেকে বড়োসড়ো খাণ্ডবদাহনে দ্বিধা করতেন না বাবু অপিচবাবুদের 'দল'। কেচ্ছায় যেমনটি হয়— বাস্তব সামান্য ঘটনাও অনেকসময় আত্মগোপন করে থাকে রূঢ় বাস্তব। বাবুদের সম্বন্ধে এ জাতীয় কেচ্ছা প্রায়শই কুৎসা এবং তা থেকে খিস্তিখেউড়ে গিয়ে

পর্যবসিত হত। চড়ক প্রভৃতি পার্বণ উপলক্ষ্যে কাঁসারিপাড়ার সঙের দল এ জাতীয় কুৎসার শহরময় প্রচার করত।[৩৯] অতিরঞ্জনের পিছনে কোনো কারণ বা কিঞ্চিৎ সত্যতা থাকত, অসূয়া বা ব্যঙ্গের কারণে তাকেই পল্লবিত করা হত। বাবু-সম্বন্ধীয় এ জাতীয় কুৎসার সমাজতত্ত্বগত মূল্য অস্বীকার করবার নয়। হুতোমও তাঁর নকশায় এ কারণেই কুৎসা বা কেচ্ছার শীলিত প্রয়োগ করেছেন। সমকালীন সময়ে, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের 'সম্বাদ রসরাজ' কিংবা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'পাষণ্ড-পীড়ন' ইত্যাদি সংবাদপত্র বড়োলোক বাবুদের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির অতিরঞ্জিত এবং অশ্লীল যেসব কাহিনি প্রকাশ করত, হুতোমের রুচি তার ধারে-কাছেও আসে না। শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন যে, 'ইহাদের অধিকাংশ পরস্পরের প্রতি অভদ্র গালাগালিতে পূর্ণ হইত। ''প্রভাকর'' ও ''ভাস্কর'' এরূপ অভদ্র কটূক্তি চলিত যে তাহা শুনিলে কানে হাত দিতে হয়। ''প্রভাকর'' ও ''ভাস্করে''র পদবীর অনুসরণ করিয়া ''রসরাজ'' ও ''যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল'' প্রভৃতি কতিপয় পত্রে এরূপ কবির লড়াই আরম্ভ করিল যে, তাহার বর্ণনা অসাধ্য।'[৪০] হুতোম তাঁর রচনায় বাবুদের নানান কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি উল্লেখ করলেও ভাষাপ্রয়োগ ও হাস্যরসে কদর্যতা প্রকাশ করেননি। এ জাতীয় কেচ্ছাগুলির মধ্যে— মদ্যপান, বেশ্যাসক্তি, যৌন-দুর্নীতি, সামাজিক ভণ্ডামি, অধর্মাচরণ, পারিবারিক বিবাদ ইত্যাদিই প্রাধান্য পেয়েছে। এ ছাড়া বাবুদের কতকগুলি সাধারণ চরিত্রধর্ম প্রসঙ্গেও কটাক্ষ আছে, যেগুলি ব্যক্তিবিশেষের লক্ষ্যেই প্রয়োগ করেছেন লেখক।

হুতোমের নকশায় ছদ্ম-পরিচয়ের আড়ালে আত্মগোপন করে রয়েছেন অনেক কেচ্ছাধারী বাবু। বাগাড়ম্বর বাবু, প্যালানাথ, ছুঁচো শীল, প্যাঁচা মল্লিক কিংবা অঞ্জনারঞ্জন বাহাদুর প্রমুখদের সমকালীন সমাজ যাতে চিনতে পারে এমনভাবেই তাঁদের উপস্থিত করেছেন লেখক। পরনিন্দা, পরচর্চার জন্য নিছক এই কেচ্ছার উল্লেখ এমনটি নয়, হুতোম নিজেই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের (১৮৬২) গৌরচন্দ্রিকায় এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, 'তবে বল্‌তে পারেন্ ক্যানই বা কলকেতার কতিপয় বাবু হুতোমের লক্ষ্যান্তবর্তী হলেন, কি দোষে বাগাম্বর বাবুর প্যালানাথকে পদ্মলোচনকে মজলিসে আনা হলো,... কোন দোষে অঞ্জনারঞ্জন বাহাদুর ও বর্ধমানের হুজুর আলী আর পাঁচটা রাজারাজ্‌ড়া থাক্‌তে আসরে এলেন? তার উত্তর এই যে, হুতোমের নক্‌শা বঙ্গ সাহিত্যের নূতন গহনা, ও সমাজের পক্ষে নূতন হেঁয়ালি; যদি ভাল করে চকে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া না হয়, তা হলে সাধারণে এর মর্ম্ম বহন কত্তে পাত্তেন না ও হুতোমের উদ্দেশ্য বিফল হতো। অ্যামন কি, অ্যাত ঘরঘ্যাঁশা করে এনেও অনেকে আপনারে বা আপনার চিরপরিচিত বন্ধুরে নক্‌শায় চিন্‌তে পারেন না ও কি জন্য কোন গুণে তাঁদের মজলিশে আনা হল, পাঠ করবার সময় তাঁদের সেই গুণ ও দোষগুলি বেমালুম বিস্মৃত হয়ে যান।'[৪১] অর্থাৎ 'বাবু' সমাজের অনাচার, বিকৃতি, ভণ্ডামি নামক 'গুণ'গুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো এবং তদ্বিধায় তাঁদের সচেতন করাই হুতোমের লক্ষ্য। এ কারণেই তাঁর যত উদ্যোগ। সমাজ-পরিশুদ্ধির এই উদ্দেশমূলকতা নকশার সাধারণ বৈশিষ্ট্য 'হুতোম পাঁচার নকশা'ও সেই বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত নয়।

আগেই বলা হয়েছে, নকশাকার 'হুতোম' তথা কালীপ্রসন্ন সিংহ নিজেকেও এই গ্রন্থের অভিমুখ করেছেন। তার কারণ, জোড়াসাঁকোর খ্যাতনামা সিংহ পরিবারের এই সন্তান নিজেও উপরে বর্ণিত বাবুদেরই একজন। তাঁর জীবনও বিচিত্র এক স্ববিরোধিতায় ভরা, উচ্ছৃঙ্খল আবার স্থিতধী, বেশ্যা ও মদ্যাসক্ত কিন্তু হৃদয়বান, ধার্মিক কিন্তু প্রচলিত ধর্মীয় সংস্কারের প্রতি অনাস্থাভাজন। নকশা প্রকাশিত হওয়ার পর হুতোমের নিন্দুকেরা একাধিক রচনায় তাঁর চরিত্রের প্রতি, বাবুয়ানা ও লাম্পট্যের প্রতি

ইঙ্গিতপূর্ণ ধিক্কার জানিয়েছেন, কিন্তু অতি বড়ো নিন্দুকেও স্বীকার করেছেন যে, 'সহরের দোল, দুর্গোৎসব, চড়ক প্রভৃতি পার্ব্বণের কথা, কতক কতক হুতুম প্যাঁচা বোলে গ্যাচেন, তিনিও যে তাঁর নক্সাতে নাই এমত নহে। ইহা তিনি আপনিই স্বীকার করেচেন। হুতুম আজকাল যেমত প্যাঁচা বলিয়া পরিচিত আছেন, কালে তাহা ছিলেন না। তিনি একজন বনেদি ধনাঢ্য ব্যক্তির সন্তান, আমারই মতন বিপুল বিভবের অধিপতি হইয়া সত্বরেই সর্ব্বস্বান্ত করেচেন। তাহার মহত্ত্বতা গুণের পরিসীমা ছিল না, ভগবান ব্যাসদেব যেমত আপন জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনে লজ্জিত হন নাই, সেইরূপ হুতুম আপনার নক্সাখানিতে আপনার অনেক কথা বলিয়াছেন, তবে লোকালয়ে যেগুলো অত্যন্ত ঘৃণাস্কর তাহাই বলেন নাই।'[৪২]

জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবার সেকালে অত্যন্ত ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবার বলে পরিচিত ছিলেন।[৪৩] তাঁর প্রপিতামহ শান্তিরাম সিংহ ছিলেন স্যার টমাস রামবোল্ড ও মিস্টার মিড্‌লটনের অধীনে মুর্শিদাবাদ ও পাটনার দেওয়ান। ওড়িশায়ও তাঁর বিস্তৃত জমিদারি ছিল। দেওয়ানি কাজে প্রভূত অর্থ উপার্জন করে তিনি জোড়াসাঁকোর বসতি স্থাপন করেন। তাঁর দুই পুত্র— প্রাণকৃষ্ণ ও জয়কৃষ্ণ। জয়কৃষ্ণের একমাত্র পুত্রই নন্দলাল। স্বল্পজীবী নন্দলালের একমাত্র পুত্র হলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। Calcutta Courier-এ প্রকাশিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা থেকে অনূদিত সংবাদে জানা যায়, ১৮৪০-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি জোড়াসাঁকোর সিংহবাড়িতে কালীপ্রসন্নের জন্ম উপলক্ষ্যে নাচের আসর বসেছিল।[৪৪] অল্প বয়সেই নন্দলাল সিংহ মারা গেলে সিংহদের প্রতিবেশী, ডিরোজিয়ান হরচন্দ্র ঘোষ কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্পত্তির অছি নিযুক্ত হন। সেকালে সততা ও নিয়মানুবর্তিতায় হরচন্দ্র ঘোষের খ্যাতি ছিল সুবিদিত। এ কারণেই তাঁকে স্মল কোর্টের জাজও নিযুক্ত করা হয়। তাঁর তত্ত্বধানে যতদিন ছিলেন কালীপ্রসন্নের পক্ষে সম্পত্তি উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু কালীপ্রসন্ন সাবালক হলে সম্পত্তির অধিকার পান এবং তার প্রায় দশ-পনেরো বছরের মধ্যেই সর্বস্ব উড়িয়ে নিঃস্ব হয়ে যান। অপরিমিত মদ্যপান এবং তাঁর নিন্দুকদের মতে 'লাম্পট্য ও বেশ্যাবাজি'[৪৫], সভা-সমিতি, থিয়েটারের শখ, দানধ্যান ইত্যাদি বাবুয়ানায় তিনি চরম দুরাবস্থায় পড়েন। শেষজীবনে, 'কলিকাতার নুকোচুরি'র সাক্ষ্যকে গ্রহণ করলে কাশী মিত্রের ঘাটের নিকটস্থ স্থানে চরম দুরাবস্থার মধ্যে মাত্র ৩০ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। কৃষ্ণদাস পাল, কালীপ্রসন্নের এই বাবুয়ানা এবং অপরিমিত অর্থব্যয়কে আদৌ সমর্থন করতে পারেননি; ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছেন : 'Babu Kaliprossunno like many a young heir come to a splendid fontune early contracted the discase of extravagance,– indeed the seeds of the disease had been sown earlier – and he died a victim to it – a warning to others similarly circumstanced and similarly inclined!'[৪৬] এরকম একজন মানুষ, যিনি তেরো বৎসর বয়সেই নিজের চেয়ে বয়সে বড়ো সভ্যদের নিয়ে বিদোৎসাহিনী সভা প্রস্তুত করেন, যার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন খ্যাতনামা অনেকেই, সেইসঙ্গেই অখ্যাতনামা মোসাহেবের দল, সমালোচকের অনুমান,[৪৭] সৎকাজে ধনী পৃষ্ঠপোষকতার আমন্ত্রণেই খ্যাতনামারা এই সভার সঙ্গে যুক্ত হলেও, 'বাদবাকি সভ্যরা বিনা পয়সায় পানভোজনের লোভেই মনে হয় আসতেন,' নাহলে 'প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের নিজ গুণে আকৃষ্ট হওয়ার মতো কোনো কারণ তখনো পর্যন্ত ঘটেনি।' সংগত অনুমান, আমাদের মতও এমনটিই।

হুতোম সম্পর্কে এত পরিচিতির অর্থ একটিই যে, নকশাকার স্বয়ং ছিলেন উচ্ছৃঙ্খল, স্ববিরোধিতায় ভরা, বিলাসী অথচ শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদেরই প্রতিনিধি। এ কারণেই তাঁর ব্যক্তিগত জীবন-উল্লেখের প্রয়োজন ছিল। তা ছাড়া পরবর্তীকালের বেশ কয়েকটি নকশা হুতোমের প্রতি বিরুদ্ধতাবশত তাঁকে কটাক্ষ

বা ব্যঙ্গ করেই রচিত। সেখানে হুতোমের জীবন প্রসঙ্গে অতিরঞ্জিত অর্ধসত্য-সত্য অনেক উপাদানই মিশে আছে। ফলে নির্ভরযোগ্য একটি রূপরেখা প্রয়োজনীয় বলেই মনে হয় তাঁর জীবন সম্পর্কে। মনে রাখতে হবে, কয়েকটি নাটক রচনার পাশাপাশি ১৮৬০ থেকে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সেকালের অনেক পণ্ডিতদের সাহায্যে কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্পাদনায় সতেরো খণ্ডে মূল মহাভারতের সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদের মতো অবিস্মরণীয় কাজ, বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে মাইকেল মধুসূদনকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন (১৮৬১), 'নীলদর্পণ' মামলায় অর্থদণ্ড প্রাপ্ত জেম্‌স লঙের মুক্তির জন্য হাজার টাকা দান (১৮৬১), বিধবা বিবাহকারীদের প্রত্যেককে হাজার টাকা পুরস্কার দান, বহুবিবাহ নিবর্তক আন্দোলনে বিদ্যাসাগরকে সাহায্যদান করেছেন এই আপাত মদ্যাসক্ত, 'লম্পট' (!), বিলাসী বাবুটিই। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র মতো কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনও এই দ্বন্দ্বের কারণেই বাবু-ইতিহাসের অবশ্য উল্লেখযোগ্য বিষয়।

হুতোমের নকশার প্রথম খণ্ডের প্রথম রচনা 'কলিকাতার চড়ক পার্ব্বণ'-এ বৎসরের শেষে চড়ক উপলক্ষ্যে সামগ্রিকভাবে কলকাতার সমাজজীবন কীভাবে আলোড়িত হত এবং বাবুরাই বা কী প্রকারে আমোদিত হতেন, তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে। লেখক রচনার প্রায় গোড়াতেই বাবুদের বংশপরিচয়-ঠিকুজি-কুলুজি দাখিল করেছেন ইতিহাসসম্মতভাবেই—

> 'কোম্পানির বাংলা দখলের কিছু পরে, নন্দকুমারের ফাঁশী হবার কিছু পূর্ব্বে আমাদের বাবুর প্রপিতামহ নিমকের দাওয়ান ছিলেন, সেকালে নিম্‌কীর দাওয়ানীতে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় ছিল; সুতরাং বাবুর প্রপিতামহ পাঁচ বৎসর কর্ম্ম করে মৃত্যুকালে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা রেখে যান— সেই অবধি বাবুরা বড় মানুষ হয়ে পড়েন। বনেদি বড় মানুষ কব্‌লাতে গেলে বাঙ্গালী সমাজে যে সরঞ্জামগুলি আবশ্যক, আমাদের বাবুদের তা সমস্তই সংগ্রহ করা হয়েচে— বাবুদের নিজের একটি দল আছে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কুলীনের ছেলে, বংশজ, শ্রোত্রিয়, কায়স্থ, বৈদ্য, তেলী, গন্ধবেণে আর কাঁশারী ও ঢাকাই কামার নিতান্ত অনুগত— বাড়িতে ক্রিয়ে কর্ম্ম ফাক্ যায় না, বাৎসরিক কর্ম্মেও দলস্থ ব্রাহ্মণদের বিলক্ষণ প্রাপ্তি আছে; আর ভদ্রাসনে এক বিগ্রহ, শালগ্রাম শীলে ও আকবরী মোহর পোরা লক্ষ্মীর খুঁচীর নিত্য সেবা হয়ে থাকে।'[৪৮]

কলকাতার তথাকথিত বনেদিবাবুরা যে 'ভুঁইফোঁড়' শ্রেণি, একইসঙ্গে দেওয়ানি-বেনিয়ানির নামে সৎ-অসৎপথে বিলক্ষণ অর্থ উপার্জন করে 'বনেদি বড় মানুষ কব্‌লানো' সম্ভব হত, একথা বলে হুতোম বাবুদের বনেদিয়ানা এবং আভিজাত্যের ধারণার উপরই প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিয়েছেন। শহর কলকাতার বুকে বাবুয়ানার ধারকবাহকদের তিনি অনুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করেছেন। হুতোমের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, এঁরা প্রধানত দু'টি শ্রেণি— বাপ-পিতামহের অর্জিত সম্পত্তি ভোগকারী শিক্ষাদীক্ষাহীন তথাকথিত হিন্দুবাবু এবং ইংরেজি শিক্ষিত নব্যবাবু। ইংরেজি শিক্ষিত নব্যবাবুদের তিনি আবার দু'টি উপশ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন— প্রথম দল 'উঁচুকেতা সাহেবের গোবরের বস্ট' অর্থাৎ 'ওল্ড ক্লাস'[৪৯]; দ্বিতীয় দল, 'ফিরিঙ্গীর জঘন্য প্রতিরূপ'[৫০]। এঁদের বৈশিষ্ট্য থেকে মনে হয় ইংরেজি শিক্ষিত নব্যবাবু এবং ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদেরই হুতোম বোঝাতে চেয়েছেন। নব্যবাবুদের মধ্যে রয়েছে নানান সদ্‌গুণ, কিন্তু ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের তিনি 'সাপ হতেও ভয়ানক, বাঘের চেয়ে হিংস্র' মনে করেছেন। প্রথম দল অর্থাৎ 'ওল্ড ক্লাস' নব্যবাবুদের আচার-আচরণ সম্পর্কে হুতোম গভীর সরস মন্তব্য করেছেন :

‘প্রথম দলের সকলি ইংরাজি কেতা, টেবিল চেয়ারের মজলিস, পেয়ালা করা চা, চুরুট, জগে করা জল, ডিকান্টরে ব্রাণ্ডী ও কাচের গ্লাসে সোনার ঢাক্‌নি, সালু মোড়া,— হরকরা, ইংলিসম্যান ও ফিনিকস্‌ সামনে থাকে, পোলিটিকস্‌ ও বেস্ট নিউজ অব্‌ দি ডে নিয়েই সর্ব্বদা আন্দোলন।... এঁরা সহৃদয়তা, দয়া, পরোপকার, নম্রতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত; কেবল সর্ব্বদাই রোগ, মদ খেয়ে খেয়ে জুজু, স্ত্রীর দাস,— উৎসাহ, একতা, উন্নতীচ্ছা একেবারে হৃদয় হতে নির্ব্বাসিত হয়েছে।’[৫১]

হুতোমের সময়ে ‘ওল্ড ক্লাস’ নব্যবাবুরা প্রায় সকলেই বৃদ্ধ, উৎসাহরহিত, পারস্পরিক ঐক্য বলতে কিছু নেই। ডিরোজিওর ছাত্রদের মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, চন্দ্রশেখর দেব প্রমুখ ‘ওল্ড ক্লাস’ নব্যবাবুরা সকলেই ‘মধুপানরতঃ সম্যগ্‌ দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞান বর্জিতা:’[৫২] ছিলেন। ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণেই অকালে মৃত্যুবরণ করেন। দয়া, পরোপকার, নম্রতা, সহৃদয়তায় এঁরা সমকালে প্রণম্য হলেও মদ্যপানের প্রাবল্যের কারণে নিন্দিতও ছিলেন। তবে হুতোম এঁদের শিক্ষা, রুচি, হৃদয়বোধের প্রশংসা করে বাবুদের মধ্যে এঁদের উচ্চ আসন দিয়েছেন।

কিন্তু ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির ‘ভদ্রলোক’বাবুদের অন্তত একটি অংশকে ‘ভয়ানক জানোয়ার’ বলে তিনি আক্রমণ করেছেন। তাঁর মতে, এঁরা হলেন ভণ্ড এবং স্বার্থপর— নিজেদের ভালোর জন্যই এঁরা স্বদেশহিতৈষীর ভেক ধরেন। কিন্তু আদতে, ‘‘ক্যামন করে আপনি বড় লোক হব’’ ক্যামন করে সকলে পায়ের নীচে থাক্‌বে এই এঁদের নিয়ত চেষ্টা— পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে আপনার গোঁপে তেল দেওয়াই এঁদের পলিসি, এঁদের কাছে দাতব্য দূরপরিহার— চার আনার বেসী দান নাই!’[৫৩]

সাবেকি বাবুয়ানার দিন যে ফুরিয়েছে, তা হুতোম স্পষ্ট করেই বলেছেন। তাঁর মতে, ‘এখন আর সে কাল নাই; বাঙ্গালি বড় মানুষদের মধ্যে অনেকে সভ্য হয়েচেন। গোলাপ জল দিয়ে জলশৌচ, ঢাকাই কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে পরা, মুক্ত ভস্মের চুণ দিয়ে পান খাওয়া আর শোনা যায় না। কুকুরের বিয়ের লাক টাকা খরচ, যাত্রায় নোট প্যালা, তেল মেখে চার ঘোড়ার গাড়ি চড়ে ভেঁপু বাজিয়ে স্নান কত্তে যাওয়া শহরে অতি কম হয়ে পড়েচে। আজ্ঞা হুজুর, উঁচুগদি, কার্তিকের মতো বাউরি চুল, এক পাল বরাখুরে মোসাহেব, রঞ্চিত বেশ্যা আর পাকান কাছা— জলস্তম্ভ আর ভূমিকম্পের মত ‘‘কখনো’’র পাল্লায় পড়েছে।’[৫৪] হুতোম যেসব বড়োমানুষির দৃষ্টান্ত শেষ হয়ে গিয়েছে বলেছেন, সেগুলি আদি ও নববাবুদের দ্বারা সংঘটিত কয়েকটি ঘটনা। কলিকাতার প্রসিদ্ধ বাবুদের মধ্যে হাটখোলার দত্তবংশের খ্যাতনামা মদনমোহন দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামতনু দত্ত ওরফে তনুবাবুর দ্বারা সংঘটিত কয়েকটি বাবুয়ানার দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরেছেন লেখক। জনৈক লেখকের কথায়, ‘শৈশবাবস্থা হইতেই লক্ষ্মীর ক্রোড়ে পালিত হইয়া কি করিয়া যে অর্থ উপার্জন করিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন না। অর্থের সদ্ব্যবহার করা তো দূরের কথা তাহা লইয়া সর্ব্বদাই বাবুয়ানার চরমসীমায় খরচ করিতে তিনি সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। সেই সময়ের লোকে তাঁহাকে ‘‘বাবু তো বাবু তনুবাবু’’ বলিয়া সম্বোধন করিত এবং তাঁহার পরবর্তীকালেও লোকে বাবুয়ানার উপমা দিতে হইলে সর্ব্বদাই তনুবাবুর সম্বন্ধে কোনো একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া তাঁহার ঐ সম্বন্ধে মহিমা প্রচার করিত।’[৫৫] ঢাকাই কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে পরা, গোলাপজলে শৌচ ইত্যাদি ঘটনাগুলি তনুবাবুকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল এবং দেখা যাচ্ছে হুতোমের কাল পর্যন্ত তা কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল প্রায় এবং এসে পড়ে হুতোমের কালেও।

কিন্তু এই সাবেকি বাবুয়ানাকে কতটা সমর্থন করেছেন হুতোম, সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। কারণ, 'বারোয়ারি' প্রসঙ্গেই তিনি 'নবো মুনসী, ছিরে বেণে ও পুঁটে তেলি'র রাজা হওয়ার প্রতি কটাক্ষ করেছেন। তাঁদের পাওয়া 'রাজা' খেতাব সম্পর্কেও হুতোমের অশ্রদ্ধা চোখে পড়ার মতো — 'সেপাই পাহারা, আসা সোটা ও রাজা খেতাব ইন্ডিয়া রবারের জুতো ও শান্তিপুরের ডুরে উড়ুনির মতো রাস্তায়, পাদাড়ে ও ভাগাড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগ্‌ল।'[৫৬] জন্মগত আভিজাত্যের বদলে ভুঁইফোঁড় কর্মগত আভিজাত্যকে নকশাকার তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। পাশাপাশি জন্মগত আভিজাত্য বলতে তিনি নাম করেছেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, মানসিংহ, নন্দকুমার, জগৎ শেঠ প্রমুখদের। কালের নিয়মে বংশগত আভিজাত্যের চেহারা বদলে দিয়ে এল রুচিহীন হঠাৎ নবাবের নতুন বিলাসী সংস্কৃতি। এইসব বংশকৌলীন্যহীন বাবুদের হাত ধরে হুতোমের মতে, রুচিহীন হাফ আখড়াই, যাত্রা ও পাঁচালির দল কলকাতার সাংস্কৃতিক সমাজ দখল করে। তাঁর মতে, এইসময় শ্যামবাজার, রামবাজার, চকবাজার ও জোড়াসাঁকোর বড়ো বড়ো বাবুরা এক একটি হাফ আখড়াই দলের মুরুব্বি হয়েছিলেন।[৫৭] এমনকী এই হাফ আখড়াইয়ের ছুতোয় অনেক পূজারি বামুনের অবস্থা পর্যন্ত ফিরে গিয়েছিল। নববাবুদের দলে ঝকমারি ও পক্ষীর অনুগামী এই দু'টি দলবিভাগ হয়েছিল। হুতোমের ভাষায়, 'টাকা বংশগৌরব ছাপিয়ে উঠলেন। রামা মুদ্দফরাস, কেষ্টা, বাগদি, পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীল কলকেতার কায়েত বামুনের মুরুব্বী ও সহরের প্রধান হয়ে উঠলো।'[৫৮] বোঝাই যায়, বংশকৌলীন্যহীন, আভিজাত্যহীন, বর্ণবিন্যাসের দিক থেকে প্রান্তিক অবস্থানে চিহ্নিত ও হঠাৎ নবাবদের বিমিশ্র নাগরিক সমাজও গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করছে। অন্তত সমাজের রক্ষণশীল শ্রেণি মনে মনে যে বিরূপতার ভাব পোষণ করতেন, তা স্পষ্ট। তা ছাড়া, বাবু-কালচারের সঙ্গে হীনতার, তুচ্ছতার, অপকৃষ্টতার যে একটি তকমা লেগে আছে, তা-ও সম্ভবত এই আলোকে বিচার্য যে, আভিজাত্যহীন কৌলীন্যহীন ভুঁইফোঁড় অর্থবানদের মধ্যে সুস্থ সংস্কৃতি উপভোগের যে রুচি, তা গড়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব। ফলত হাফ আখড়াই বা কবি গানের তথাকথিত অশ্লীল খিস্তিখেউরে প্রথম যুগের বাবুরা যে আনন্দ পাবেন, তাতে আর সন্দেহ কী? বাবুত্বের কৌলীন্য অর্থবান শ্রেণির হাতে পড়েই বিনষ্ট হয়েছে, এই হল হুতোমের সাফ কথা।

এঁরা ছাড়া যেমন বাবুত্বের ইতিহাসবৃত্ত অসম্পূর্ণ থাকে, তেমন অসম্পূর্ণ থাকে হুতোম কথিত সেইসব পাড়াগেঁয়ে জমিদার বা রাজাদের কথা না বললে, যাঁরা মামলামোকদ্দমা বা অন্যান্য নানান কাজে কলকাতায় আসতেন মাঝে মাঝেই। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি কর্তৃক সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হয় এবং কলকাতার চৌহদ্দির মধ্যে সংঘটিত অপরাধের মামলার ভার এই কোর্টের উপর ন্যস্ত হয়। অপরপক্ষে, কলকাতার চৌহদ্দির বাইরের মামলার জন্য সদর দেওয়ানি ও সদর নিজামত এই দু'টি কোর্ট স্থাপিত হয়, যে দু'টি ১৮৬২ খ্রি. ৩০ জুন হাইকোর্ট স্থাপিত হলে অবলুপ্ত হয়। শহর এবং মফস্সলের বাবুরা প্রায়শই নানান ধরনের মামলামোকদ্দমায় ব্যস্ত থাকতেন। 'চড়ক-পার্ব্বণে'র নকশায় হুতোম দেখিয়েছেন যে, 'সকালবেলা বড়ো মানুষদের (অর্থাৎ বাবুদের) বৈঠকখানা উকিলের বাড়ির হেড কেরানি, পাওনাদার, মহাজন, বিলসরকারে পূর্ণ থাকে এবং ''শমন'', ''ওয়ারিন'', ''উকীলের চিঠি'' ও ''সফিনে'' বাবুর অলঙ্কার হয়েছে।'[৫৯] মফস্সলের জমিদার ও রাজাদেরও এইসব আইন-আদালত ঘটিত কার্যে কলকাতায় এসে মাসের পর মাস থাকতে হবে তাতে আর আশ্চর্য কী। এঁরা সচরাচর ভবানীপুর অঞ্চলে উঠতেন। তবে অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে অনেকসময়ই প্রতারকের হাতে পড়ে এঁদের সর্বস্বান্ত হয়ে ফিরতে হত। মফস্সল

থেকে বা গ্রাম থেকে জমিদার কিংবা ধনী ব্যক্তিরা এলেই দালালরা ছেঁকে ধরত তাঁদের। এরপর বাবুকে বশীভূত করে বাবুর জন্য বাড়ি ভাড়া করা, গাড়ির জোগাড় করা, খ্যামটা নাচের বায়না করা ইত্যাদি কাজের বরাত নিতেন এবং পলিটিকাল এজেন্টরাও কাজ করতেন। সেইসঙ্গে কলকাতা দেখানো উপলক্ষ্যে বাবুকে দুই এক নামজাদা বেশ্যার কাছে নিয়ে যেতে পারলেই কাম ফতে হত। কিছুকাল আমোদ-আহ্লাদের পর পুঁজি নিঃশেষিত হলে বাবুরা হয় দেনা করতেন, নয় ফেরত যেতেন। আর একবার দেনা করলেই দালাল, উকিল এঁদের পোয়াবারো হত। অনেকসময় বাবুকে দেশের জমিজমা বন্ধক রেখে বা সর্বস্বান্ত হয়ে দেনা পরিশোধ করতে হত।

কোনো কোনো গ্রামীণ জমিদার বারো মাসই কলকাতায় থাকতেন। হুতোমের মতে, 'ইনি একজন বনগাঁর শেয়াল রাজা, বুদ্ধিতে কাশ্মীরী গাধার বেহদ্দ— বিদ্যায় মূর্ত্তিমান মা!'[৬০] এঁরা দশ-বারোজন মোসাহেব সহ গাড়িঘোড়া চেপে, মহার্ঘ পোশাক-আশাকে ভূষিত হয়ে, বাইজি, বেশ্যাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ফূর্তি করতেন। সেইসঙ্গেই এঁরা 'বিসর্জন বারোইয়ারি, খ্যামটা নাচ আর ঝুমুরের প্রধান ভক্ত— মধ্যে মধ্যে খুনি মামলার গ্রেপ্তারী ও মহাজনের ডিক্রীর দরুন গা ঢাকা দেন। রবিবার পাল পার্ব্বণ বিসর্জ্জন আর স্নান যাত্রায় সেজেগুজে গাড়ি চড়ে বেরোন।'[৬১] এঁদেরই প্রায় দোসর হঠাৎবাবু ও কাপ্তেনবাবুরা। হুতোম বলেছেন যে, এঁরা সব বড়ো মানুষের ছেলে, অল্প বয়সে বিষয় হাতে পেয়ে বাবুগিরিতে মত্ত হয়েছেন। হুতোম নিজেও এই দলেরই একজন ছিলেন। এইসব বাবুদের ঘিরে একদল উমেদার, মোসাহেব সবসময় বিরাজ করত এবং সকলেই বাবুর পিতার পরম বন্ধু কিংবা 'দূর সম্পর্কের নিকট আত্মীয়' সেজে বাবুকে তোষামোদে তুষ্ট করত। হুতোমের ভাষায়, 'আসল মতলব দ্বৈপায়ন হ্রদে ডোবান রয়েচে— সময়ে আমলে আস্‌বে।'[৬২] দালালরা এঁদের মতো বাবুদের আশায় বসে থাকত। মহাজন নিযুক্ত দালালদের কাজই ছিল বাবুদের নাড়ীনক্ষত্র সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করে আনা। কার বাড়ি বিক্রি হবে, কোন বাবু বাগানবাড়ি করবেন, কার টাকা ধার করা প্রয়োজন— এসব জানা গেলেই 'দালাল শীকার ধরে আনে— বাবু আড়ে গেলেন।'[৬৩] কোনো কোনো পাড়াগেঁয়ে বাবুরা কাশীপুর, বড়িশা, ভবানীপুর ও কালীঘাটে বাসা ভাড়া করেও দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা 'সোনাগাছীতেই কাটান', মারদাঙ্গায় জড়িয়ে পড়েন, আবার বেশ্যা 'প্রিয়তমা'র হাত ধরে বয়েসে প্রবীণ অভিভাবকের সাহায্যে পুলিশি ঝামেলা থেকে মুক্ত হতে আসেন, ধারকর্জ করে বিলাসিতা করেন। তবে, পাড়াগেঁয়ে সব বাবুরাই যে এমন নন, হুতোম তা স্বীকার করে নিয়েছেন : 'দুই একজন জমীদার মধ্যে মধ্যে কলকাতায় এসে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা নিয়ে যান। তাঁরা সোনাগাছীতে বাসা করেও সে রঙ্গে বিব্রত হন না; বরং তাঁদের চালচুল দেখে অনেক সহুরে তাক্ হয়ে থাকেন।'[৬৪] রমেশচন্দ্র দত্তের 'সমাজ' ও 'সংসার' উপন্যাসে ভবানীপুর অঞ্চলে বসবাসকারী পাড়াগেঁয়ে বাবুদের এই প্রশংসাসূচক ভূমিকার ছবি সহজলভ্য।

বড়োসড়ো বিলাসিতার পুরোনো চাল ফুরিয়ে হুতোমের কালে, 'সহরের বাবু'দের নতুন কেতা চালু হয়েছে দেখা যায়। বিকেলে সূর্যের উত্তাপ কমে এলে (যেমন, চৈত্র মাসে পাঁচটা বাজলে) 'সহরের বাবুরা ফেটিং, সেল্‌ফ ড্রাইভিং বগী ও ব্রাউহ্যামে করে অবস্থাগত ফ্রেন্ড, ভদ্রলোক, বা মোসাহেব সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন, কেউ বাগানে চললেন— দুই চার জন সহৃদয় ছাড়া অনেকেরি পেছনে মালভরা মোদা গাড়ী চল্লো পাছে লোকে জান্তে পারে এই ভয়ে কেউ সে গাড়িরই সইস কৌচম্যানকে তক্‌মা নিতে বারণ করে দেচেন— কেউ লোকাপবাদ তৃণজ্ঞান, বেশ্যাবাজী বাহাদুরীর কাজ মনে করেন; বিবিজানের সঙ্গে

একত্রে বসেই চলেচেন, খাতির নদারৎ!—’[৬৫] নতুন রুচির কারণে, মদ্যাসক্তি ও বেশ্যাবাজি একশ্রেণির বাবুদের কাছে ‘চক্ষুলজ্জা’র কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখা যাচ্ছে। সাবেকি বাবুয়ানার এই দু’টি লক্ষণ তাঁরা ছাড়তে পারেননি বটে, তবে প্রকাশ্য বেশ্যাবাজি আর মদ্যপান থেকে লোকলজ্জার ভয়েই তাঁরা বিরত হয়েছেন। আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে রাজনারায়ণ বসু ‘সেকাল আর একালে’ এই ‘অপ্রকাশ্যভাবে বেশ্যাবাজি বৃদ্ধি’র কথা বলেছেন। তবে এর মধ্যেও এক শ্রেণির বাবুরা লোকাপবাদের তোয়াক্কা না করে প্রকাশ্যেই এসব চালাতেন, তা-ও লক্ষ করার মতো।

চড়ক-পার্বণ, রথ, রামলীলা, বারোয়ারি কিংবা পারিবারিক পূজা উপলক্ষ্যে বাবুরা আমোদপ্রমোদে মেতেছেন ঠিকই, তবে সর্বত্র আর আগেকার জাঁকজমক নেই দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া এ জাতীয় সামাজিক উৎসবে তাঁদের ততক্ষণ আগ্রহ জন্মায় না, যতক্ষণ না ব্যক্তিগত সুখভোগ ও ইন্দ্রিয়াসক্তির ব্যবস্থা হয়। ‘চড়ক-পার্বণে’ যেমন বাবু সেজেগুজে ফিটনে চড়ে বাগানবাড়িতে যেতে প্রস্তুত, এমন অবস্থায় গাজনতলায় ডাক পড়লে তিনি ‘শুনেই অজ্ঞান’ হন। অবশেষে নিয়মরক্ষার্থে ‘কাঁদ কাঁদ মুখে রেশমি রুমাল গলায় দিয়ে একধারে দাঁড়িয়ে রইলেন।’[৬৬] ব্যক্তিগত উদ্যোগে পূজার সংখ্যা এ সময় থেকে কমে আসে মনে হয়, কারণ, হুতোমের রচনা থেকে বোঝা যায় স্বনামধন্য অনেক বাবুই এসময় থেকে বারোয়ারি পূজায় প্রধান উদ্যোক্তা হিসাবে আসরে নামেন। যেমন, ‘কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা’র বীরকৃষ্ণ দাঁ। আদতে ঢাকার লোক, কিন্তু হাটখোলায় গদি। দশ-বারোটা খন্দ মালের আড়ত, বেলেঘাটায় কাঠ ও চুনের পাঁচপাঁচটি গোলা, দাদন ও চোটায় খাটা নগদ দশ বারো লক্ষ টাকা, এ ছাড়াও কোম্পানির কাগজ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সম্পত্তির অধিকারী বাবুকেও দেখি বারোয়ারি পূজার অধ্যক্ষ হিসাবে নিজের আমমোক্তার কানাইধন দত্তকে ‘বারোইয়ারি পূজার বার্ষিক’ সাদ্‌তে পাঠিয়েছেন। মহাজন, গোলদার, দোকানদার, হেটোরাই উদ্যোগী হিসাবে সারাবছর ‘বর্দ্ধিষ্ণু ও ইয়ার গোচের সৌখিন লোকের’ কাছে অল্প অল্প করে টাকা জমা রাখেন, সেই টাকাতেই পূজা হয়। এ ছাড়া শহরের অন্যান্য ধনীবাবুদের কাছ থেকে ‘চাঁদা আদায় করা, চাঁদার জন্য ঘোড়া ও বারোইয়ারি সং ও রং তামাসার বন্দোবস্ত করাই তাঁর ভার হয়।’[৬৭] হুতোমের কালে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বাবুদের দিন বিগত হয়েছে দেখা যায়; তাঁর মতে, ‘বেণে’রাই এখন মোসাহেব রেখে প্রকৃত অর্থে বাবুগিরি করেন। অতএব বীরকৃষ্ণ দাঁ-রা যে নতুন কালের ‘ইয়ার গোচের বাবু’ হিসাবে বারোইয়ারির অধ্যক্ষ হবেন, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

অর্থকরী অবস্থার পতনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কারণেও পারিবারিক পূজার সংখ্যা সীমিত হয়ে ‘বারোইয়ারি পূজা’র সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, এমনটিও হতে পারে। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত তাঁর ‘কলিকাতার ইতিবৃত্তে’ জানাচ্ছেন, ‘পূর্ব্বে যে যে গৃহে পূজার মহা আড়ম্বরে পল্লী আমোদিত হইত, এখন তাঁহাদের অনেক পরিবার হীনবস্থ হওয়ায়, পূজা বন্ধ হইয়াছে। এখনকার কালে যাঁহারা সহরে নূতন ঐশ্বর্যবান হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা যে কার্পণ্য প্রযুক্ত পূজা আনয়ন করেন না, তাহা বলিতে পারি না, তাঁহাদের বিবিধ প্রকার ব্যয়ভূষণেও তাহা বলে না। ইংরাজী শিক্ষা আর ব্রাহ্মসমাজের নিরাকার ঈশ্বরজ্ঞানই তাঁহাদিগকে পৌত্তলিকতা হইতে দূরে রাখিতেছে তাহার সন্দেহ নাই।’[৬৮] কিন্তু এই যুক্তি সর্বদা সত্য কি না, সে বিষয়ে সংশয় থেকেই যায়। হুতোম নিজেই ব্রাহ্মবাবুর বাড়িতে মা-পিসিমা বেঁচে এই অজুহাতে দুর্গাপূজার কথা বলেছেন। হুতোমের লক্ষ্য যে, তৎকালের প্রধান ব্রাহ্ম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ির দুর্গাপূজা, তা অনুমিত হয়। এ প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘আত্মজীবনী’তে বলেছেন : ‘দশ বৎসর হইল তত্ত্ববোধিনী সভা

সংস্থাপিত হইয়াছে, এখনো আমাদের বাড়িতে পূজা হয়,— দুর্গাপূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজা। সকলের মনে কষ্ট দিয়া, সকলের মতের বিরুদ্ধে, আমাদের ভদ্রাসন বাড়ী হইতে চিরপ্রচলিত পূজা ও উৎসব উঠাইয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে না। আমি আপনিই ইহাতে নির্লিপ্ত ও স্বতন্ত্র থাকি, তাহাই ভাল। আমাদের পরিবারের মধ্যে, কাহারো যদি ইহাতে বিশ্বাস থাকে, কাহারো ভক্তি থাকে তাহাতে আঘাত দেওয়া অকর্ত্তব্য। আমার ভ্রাতাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, তাঁহাদের সম্মতি লইয়া, ধীরে ধীরে পূজা উঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।'[৬৯] যদিও, দেবেন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছেন, জগদ্ধাত্রী পূজা বন্ধ করা গেলেও, 'দুর্গাপূজা চলিতেই লাগিল।'

পৌত্তলিকতার প্রভাব যে ইয়ং বেঙ্গল নব্যবাবুদের মধ্যেও পড়েছিল, দ্বিতীয় ভাগের 'দুর্গোৎসব' শীর্ষক রচনায় সেকথা জানিয়েছেন হুতোম। তবে এঁদের পূজার 'কিছু রিফাইণ্ড কেতা'। ব্রাহ্মণভোজনের বদলে ইয়ারদোস্ত, এমনকী 'ফিমেল ফ্রেন্ড'দের আমন্ত্রণ করে 'মদ-ভাতে প্রসাদ পান।' অন্যান্য হিন্দু বাড়িতে প্রণামীর টাকা পুরোহিত ব্রাহ্মণ নিয়ে গেলেও, শিক্ষিত 'এজুকেটেড' শ্রেণির বাবুদের বাড়ির পূজায় প্রণামী বাবুর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হয়। সেইসঙ্গেই 'প্রতিমের সামনে বিলিতী চরবীর বাতি জ্বলে ও পুজোর দালানে জুতো নিয়ে ওঠবার অ্যালাওয়েন্স থাকে। বিলেত থেকে অর্ডার দিয়ে সাজ্ আনিয়ে প্রতিমে সাজান হয়— মা দুর্গা মুকুটের পরিবর্তে বনেট্ পরেন, শ্যাণ্ডউইচের শেতল খান্ আর কলাবউ গঙ্গাজলের পরিবর্ত্তে কাৎলীকরা গরম জলে স্নান করে থাকেন, শেষে সেই প্রসাদী গরম জলে কর্মকর্ত্তার প্রাতরাশের টী ও কফি প্রস্তুত হয়।'[৭০] হুতোমের বর্ণনায় অতিশয়োক্তি আছে সন্দেহ নেই। তবে ইংরেজি শিক্ষিত নব্যবাবুরাও যে পৌত্তলিকতার দিকে ঝুঁকেছিলেন, কিছুটা সংস্কার করে পূজা-আচ্চার উদ্যোগ আয়োজন করতেন, এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। পরবর্তীকালের উৎসব-কেন্দ্রিক বাঙালি সংস্কৃতির আদল দেখলেই হুতোমের বর্ণনার ঐতিহাসিকতা প্রমাণ হয়।

তবে এর পাশাপাশি কিছু বনেদি বাড়ি ও নতুন বাবুরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে আড়ম্বরের সঙ্গেই দুর্গাপূজা করতেন। পূজা উপলক্ষ্যে বাবুর দলস্থ মোসাহেব, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কাপড়চোপড় এবং নগদ বিদায় পেত। হুতোমের সময়ও পূজা উপলক্ষ্যে বাইনাচের মজলিশ বসতে দেখা যায়; সেইসঙ্গেই চলত নেশা 'বওয়াটে পিল ইয়ার ছোকরা' বাবুদের প্রধান শখ। পূজা বাড়ির কর্তাবাবুটিও খোদ মজলিশ জমাতেন— 'বৈঠকখানায় পাঁচো ইয়ার জুটে নেউল নাচানো, ব্যাং নাপানো, খ্যামটা ও বিদ্যাসুন্দর আরম্ভ করেছেন অ্যাক অ্যাক বারের হাসির গররায়, সিয়াল ডাকে ও মদন আগুনের তানে— দালানে ভগবতী কাঁপচেন, সিঙ্গি চোরাকে কামড়ান পরিত্যাগ করে ন্যাজ গুটিয়ে পালাবার পথ দেখ্‌চে লক্ষ্মী সরস্বতী শশব্যস্ত।'[৭১] পূজা উপলক্ষ্যে বা বিনা উপলক্ষ্যে মদ্যপান করাটা বাবুদের সংস্কারে পরিণত হয়েছিল। এইরকম এক বাবু —দনুবাবুর কথা বলেছেন হুতোম, যিনি 'সমরভেকেসনে' ইয়ারদোস্ত সহ আকণ্ঠ মদ্যপান করে 'ইংরাজি ইস্‌পিচ ও টেবিল চাপ্‌ড়ে' চেঁচিয়ে হেসে আমোদ-আহ্লাদ করছিলেন। দনুবাবুর বৃদ্ধ পিতা চণ্ডীমণ্ডপে মালা জপতে জপতে এইরকম চিৎকার-চেঁচামেচিতে বিরক্ত হয়ে দনুবাবুকে যাচ্ছেতাই বলে গালমন্দ দিতে থাকলে, দনুবাবু ও তাঁর এক ফ্রেন্ড এসে বৃদ্ধকে 'ইয়াং বেঙ্গালি ( বাঁদুরের বাড়া) ঘুসি' মারলেন এবং বৃদ্ধ পিতা সেখানেই ঘুরে পড়লেন। এমতাবস্থায় দনুবাবুর মা যখন অন্দরমহল থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এসে বাবুকে যথোচিত তিরস্কার করছেন, তখন করুণাপরবশ বাবুটি মাকে বলতে লাগল, 'মা বিদ্দেসাগর বেঁচে থাক্! তোমার ভয় কি! ও ওল্‌ড ফুল মরে যাক্ না কেন, ওকে আমরা চাইনি, এবারে মা এমন বাবা

এনে দেবে যে তুমি, বাবা ও আমি একত্রে তিনজনে বসে হেল্‌থ করবো ও ওল্‌ড ফুল মরে যাক, আমি কোয়াইট রিফরম্‌ড বাবা চাই।'[৭২] শিক্ষা, বিশেষত পাশ্চাত্য শিক্ষা একদল উদ্‌ভ্রান্ত বাবুশ্রেণির জন্ম দিয়েছিল যাঁরা সংস্কারের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে যাবতীয় সুস্থিতিকেই বদলে দিতে চাইত। সেকথা বোঝাতেই হুতোম তাঁর নকশায় এ জাতীয় ক্যারিকেচারের আমদানি করেছেন, আবার কাহিনির মধ্যে কিঞ্চিৎ সত্যতা থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু রিফর্মেশনের এই বাতিক বা নব্যবাবুদের এইরকম বোহেমিয়ান মনোভাব আদৌ কি হুতোমের সমর্থন পেয়েছে? হুতোম 'বারোইয়ারি'তে নবকৃষ্ণের কথা বলেছেন, বাগবাজারের পক্ষীর দলের কথা বলেছেন। নবকৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষকতায় রামবসু, হরঠাকুর, নীলু ঠাকুর প্রমুখ প্রসিদ্ধ কবিয়ালদের কথা বলেছেন। নবকৃষ্ণের সময়কে 'ইংলন্ডের কুইন এলিজাবেথের আমলে'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। হুতোম আদিবাবুদের ও নববাবুদের কালের ছবি আঁকতে গিয়ে বলেছেন :

> 'পূর্ব্বের বড় মানুষেরা এখনকার বড় মানুষদের মত ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েসন, এড্রেস, মিটিং ও ছাপাখানা নিয়ে বিব্রত ছিলেন না, প্রায় সকলেরই একটি একটি রাঁঢ় ছিল, (এখনও অনেকের আছে) বেলা দুপুরের পর উঠ্‌তেন আহ্নিকের আড়ম্বরটাও বড়ো ছিলো — দু তিন ঘণ্টার কম আহ্নিক শেষ হতো না, তেল্‌ মাখ্‌তেও ঝাড়া চার ঘণ্টা লাগ্‌তো— চাকরের তেল মাখানীর শব্দে ভূমিকম্পো হতো — বাবু উলঙ্গ হয়ে তেল্‌ মাখ্‌তে বস্‌তেন, সেই সময় বিষয় কর্ম্ম দেখা, কাগজ পত্রে সই ও মোহর চল্‌তো, আঁচাবার সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য্যদেব অস্ত যেতেন। এদের মধ্যে জমিদাররা রাত্তির দুটো পর্য্যন্ত কাছারি কত্তেন; কেউ অমনি গাওনা বাজনা জুড়ে দিতেন। দলাদলির তর্ক কত্তেন ও মোসাহেবদের খোসামুদিতে ফুলে উঠতেন— গাইয়ে বাজিয়ে হলেই বাবুর বড় প্রিয় হতো, বাপান্ত কল্লেও বক্‌সিস্‌ পেতো, কিন্তু ভদ্দর লোক বাড়ি ঢুক্‌তে পেতো না; তার বেলা নাঙ্গা তরওয়ালের পাহারা, আদব কায়দা! কোন কোন বাবু সমস্ত দিন ঘুমুতেন— সন্ধ্যার পর উঠে কাজকর্ম্ম কত্তেন— দিন রাত ছিল ও রাত দিন হতো।'[৭৩]

এই বিস্তৃত বর্ণনায় বোঝা যায়, হুতোম বাবুয়ানার এই অস্বস্তিকর স্থূল আদি আদলটাকে মেনে নিতেও পারছেন না। ফলে রামমোহন রায়ের উদ্যোগ, হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা, হেয়ারের কাজের প্রশংসা করেন তিনি, কারণ এসবের দ্বারাই 'সৎকর্ম্মে বাঙ্গালিদের চোক্‌ ফুটে উঠ্‌লো!'[৭৪] কিন্তু শিক্ষার নামে, সংস্কার-মুক্তির নামে ভ্রান্ত সাহেবিয়ানা, অপ্রকাশ্য বেশ্যাবাজি ও মদ্যপান, সভা-সমিতি সংবাদপত্র ও স্বাদেশিকতার ভণ্ডামি, — এসবকে 'নব্যবাবুয়ানা' বলে মেনে নিতে তিনি রাজি নন। 'রামলীলা' শীর্ষক রচনায় তীব্র শ্লেষের সঙ্গে হুতোম বলেছেন : 'কল্‌কেতা সহরের এই একটী আজব্‌ গুণ যে, মজুর হতে লক্ষপতি পর্য্যন্ত সকলের মনে সমান শক্‌।'[৭৫] বামুন-কায়েতদের পাশাপাশি তথাকথিত নিম্নবর্গও পড়াশোনা করে সভ্য হয়ে উঠল এবং অভিজাত-অনভিজাতের মধ্যে বিমিশ্রণ চলতে থাকল— শহর কলকাতার সমাজজীবনের এই বৈশিষ্ট্যটিকে হুতোম বারবার তির্যক মন্তব্যে ক্ষত-বিক্ষত করেছেন। ঠাট্টা করে বলেছেন যে, হঠাৎ 'ভদ্রলোক'বাবু হয়ে ওঠা নিম্নশ্রেণিও রাতে দুগোছ রুটি ও কুমড়োর তরকারির বদলে 'ফাউলকরী ও রোল রুটি ইন্ট্রোডিউস' করল।[৭৬] আভিজাত্যহীন বাবুয়ানা প্রসঙ্গে 'বারোইয়ারি' শীর্ষক রচনায় তীব্র মন্তব্য করেছেন, 'ক্ষুদ্র নবাব— ক্ষুদ্র নবাব দিব্যি দেখতে— দুদে আলতার মত রং— আলবর্ট ফেসানে চুল ফেরানো— চীনের শূয়ারের মত — শরীরটা ঘাড়ে গদ্দানে— হাতে লাল রুমাল ও পিচের ইষ্টিক—

সিমলের ফিনফিনে ধুতি মাল কোচা করে পরা, হঠাৎ দেখলে বোধ হয় রাজরাজড়ার পৌত্তুর, কিন্তু পরিচয়ে বেরোবে ''হিদে জোলার নাতি''!'[৭৭] এই অসূয়া ও অসহিষ্ণুতা স্পষ্টতই বাবুয়ানার সাধারণীকরণে অসহায় উচ্চবর্ণের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।

তবে সামগ্রিকভাবে, শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের বাগাড়ম্বর ও ভণ্ডামির প্রতি তিনি খড়্গহস্ত ছিলেন। যেমন প্রকৃত সৎকাজের জন্য ব্রাহ্মবাবুদের প্রশংসা করতে ছাড়েননি, তেমনি ভণ্ড ব্রাহ্ম, সাহেব সাজা হিন্দু, স্বার্থপর দেশভক্ত বাবুদেরও তিনি রেয়াত করেননি। ভদ্রশিক্ষিত বাবুরা সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও যে বাবু সাজতে বসেন, হুতোম একেই তীব্র ভর্ৎসনায় আঘাত করেছেন :

> 'বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন সং বড় চমৎকার!— বাবুর ট্যাসল দেওয়া টুপি, পাইনা পেলের চাপকান, পেটি ও সিল্‌কের রুমাল, গলায় চুলের গার্ড্‌চেন অথচ থাকবার ঘর নাই মাসীর বাড়ী অন্ন লুসেন, ঠাকুরবাড়ী শোন, আর সেনেদের বাড়ী বসবার আড্ডা। পেট ভরে জল খাবার পয়সা নাই, অথচ দেশের রিফরমেসনের জন্যে রাত্তিরে ঘুম হয় না। (মসারির অভাবও ঘুম না হবার একটি প্রধান কারণ) পুলিস্ বড় আদালত, টালার নিলেম, ছোট আদালতে দিনের বেলা ঘুরে বেড়ান, সন্ধ্যে ব্যালা ব্রহ্মসভায় মিটিং ও ক্লাবে হাঁফ ছাড়েন— গোয়েন্দাগিরী, দালালী, খোসামুদী ও ঠিকে রাইটরী করে যা পান, ট্যাসলওয়ালা টুপি ও পাইনাপেলের চাপকান রিপু কত্তে ও জুতো বুরুসেই সব ফুরিয়ে যায়! সুতরাং মিনি মাইনের স্কুল মাষ্টারী কখন কখন স্বীকার কত্তে হয়!'[৭৮]

মধ্যশ্রেণির তথাকথিত শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের 'বাবুয়ানা'র অন্তঃসারশূন্য ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিয়েছেন হুতোম। শিক্ষার ক্রমপ্রসার আদৌ বাঙালিবাবুদের মন ও মানসিকতাকে বদলাতে পারেনি, এ সত্য সার বুঝেছিলেন তিনি। পোশাকি সাহেবিয়ানার দ্বারা যে প্রকৃত প্রগতিশীল, আধুনিক মুক্তচিন্তার অধিকারী হওয়া যায় না, বারবার তাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। তথাকথিত নব্যবাবু তথা ইয়ং বেঙ্গলদের টেবিলে বসে খানা খাওয়ার বাড়াবাড়িরকম সংস্কার, ভয়ংকর গরমেও কোট-প্যান্ট, চাপকান পরে থাকা, বিলক্ষণ দেখতে পেলেও নাকে চশমা আঁটাকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করেছেন; দেখিয়েছেন যাঁরা 'রাত্তিরে খানায় পড়ে' থাকেন মাতাল হয়ে, তাঁরাই আবার 'দিনের ব্যালা রিফরমেসনের স্পিচ করেন'।[৭৯] 'রামলীলা'র মতো অবাঙালি উৎসবের ছুতো ধরে প্রকাশ্য ময়দানের ধারে গাড়িতে বেশ্যাসহ ইয়ারদোস্ত নিয়ে নির্লজ্জ 'মজা'র সংস্কৃতিও তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। চিনের কোট ও চুলের চেন পরা শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুরাও যে অনৈতিক, অশ্লীল আমোদে পিছপা হন না, এমনকী কতগুলি 'পিল ইয়ার' ছোকরাবাবুও যে 'ইস্কুলের বই বেচে পয়সা সংগ্রহ করে গোলাবি খিলি ও চরসে মজা লুট্‌চে',[৮০]— এই বাবুয়ানাকে তিনি সমর্থন করবেন কীভাবে?

হুতোম যেমন মেনে নিতে পারেনি প্রান্তিকতার ক্ষেত্রে থাকা মানুষগুলোর যেনতেনপ্রকারেণ অর্থ উপার্জন করেই 'বাবু' সাজার শখকে, তেমনি তথাকথিত শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'দের বাবুয়ানার নামে কতকগুলি কুপ্রথা-কুরীতির অনুসরণকেও তিনি অসহ্য মনে করেছেন। তাঁর আপত্তি তিনটি ক্ষেত্রে—

(ক) বাহ্যআড়ম্বরপূর্ণ শূন্যগর্ভ আপাত শিক্ষার প্রতি;
(খ) শিক্ষাবিহীন পোশাকি আভিজাত্যের প্রতি, এবং
(গ) আভিজাত্যহীন বাবুত্বের প্রতি।

সমকালে যে বাবুদের তিনি কলকাতার সমাজে ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন তাঁদের মধ্যে এই তিনটি লক্ষণ অত্যন্ত প্রকট ছিল। সম্ভবত এ কারণেই নকশার প্রথম ভাগের অন্তত দু'টি রচনায়— 'বাবু পদ্মলোচন দত্ত ওরফে হঠাৎ অবতার' ও 'স্নানযাত্রা' এবং দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্গত 'রেলওয়ে' শীর্ষক রচনায় প্রান্তিক মানুষদের বাবুয়ানার শখ ও তার ন্যক্কারজনক রূপ, শিক্ষাবিহীন পোশাকি আভিজাত্য এবং বাহ্যআড়ম্বরপূর্ণ শূন্যগর্ভ আধুনিক বাবুদের প্রতি তাঁর তীব্র শ্লেষ ও ব্যঙ্গ অসূয়ার রূপ নিয়েছে। এই তিনটি রচনায় অতি সংক্ষিপ্ত আয়তনের মধ্যেই অনেকটা আখ্যানের ঢঙে তিনি নতুন যুগের বাবুত্বের ধরনগুলিকে স্পষ্ট করে দিতে চেয়েছেন। নগরায়নের বিমিশ্র আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে কোনোগতিকে অর্থসংগ্রহ করতে পারলেই যে 'বাবু' সাজা যায়, রুচি-সংস্কৃতি-সামর্থ্য না থাকলেও যে সম্মিলিত অর্থে বাবুয়ানার আনন্দ নেওয়া যায় এবং তার দরুণ বাবুয়ানার যে সংস্কৃতি উঠে আসে, তা যে আদৌ গ্রহণযোগ্য কিংবা সমর্থনযোগ্য নয়,— সম্ভবত এই সত্যকে স্পষ্ট করে দিয়ে হুতোম চেয়েছিলেন সমকালীন জীবনে সাধারণীকৃত বাবুত্বের অবাধ গতিকে রোধ করতে এবং অবশ্যই এই প্রচেষ্টার দ্বারা সমাজ ও সহৃদয় সামাজিককে পরিশুদ্ধ করতে। এ কারণেই আমাদের চিরচেনা পরিচিতের বৃত্ত থেকে উঠে আসে পদ্মলোচন দত্ত, গুরুদাস গুঁই কিংবা প্রেমানন্দ-জ্ঞানানন্দ বা ব্রাহ্মবাবুর মতো এক-একটি চরিত্র।

'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র প্রথম ভাগের 'বাবু পদ্মলোচন দত্ত ওরফে হঠাৎ অবতার' ভুঁইফোঁড়-আভিজাত্যহীন বাবুর 'হঠাৎ অবতার' হয়ে ওঠার কাহিনি। পদ্মলোচনের চরিত্র নির্মাণের পিছনে সমকালের এক বা একাধিক বাবুকে চোখে দেখার অভিজ্ঞতার উপাদান ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু সার্বিকভাবে 'পদ্মলোচন' এমন একটি চরিত্র, যাঁর মধ্যে আসলে মিশে আছে উনিশ শতকের আদিবাবুদের একটি type। পদ্মলোচনের জন্ম নাউপাড়ামুযুলী গ্রামের মিত্তিরদের বাড়ি। মিত্তিররা আগে সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন, কিন্তু নানান কারণে এবং শরিকি ভাগ-বাটোয়ারার ফলে তাঁদের অবস্থা পড়ে গেছে। তবে দরিদ্র হয়ে পড়লেও গ্রামের লোকেদের কাছে তাঁদের মানের কিছুমাত্র অভাব হয়নি। গ্রামের মুসলমান জমিদার মজফ্ফর খাঁ প্রজাপালক ছিলেন, হিন্দু-মুসলমান সকলকে সন্তানের মতো দেখতেন, তবে 'ধোপা নাপিত বন্ধ করা হুঁকা মারা চ্যালাফ্যালা ও বিয়েভাটির হুকুম' তিনি মিত্তিরদেরই উপর ন্যস্ত করেছিলেন। এমনি এক পরিবারে এক ঘন বর্ষার রাতে পদ্মলোচনের জন্ম। তাঁর জন্মের একমাস পর গাঁয়ের পঞ্চানন্দতলায় ষষ্ঠীর পুজো দিয়ে ক্সআঁতুড় ওঠানো হয়'। প্রথমত, পদ্মলোচন নানারূপ খেলা যেমন, গুলিডান্ডা, কপাটি, চোর চোর, তেলী হাত পিছলেন গেলি প্রভৃতিতে বেশ দক্ষতা অর্জন করে প্রসিদ্ধ হয়ে পড়েন। অতঃপর, পাঁচ বছরে হাতেখড়ি হলে, পাঠশালার গুরুমশাইয়ের ভয়ে তিনি পুকুর পাড়ে, নলবনে ও বাঁশবাগানে লুকিয়ে থাকতেন, পেট কামড়ানি ও গা বমি বমি প্রভৃতি 'অন্তঃশীলে রোগেরও' অভাব হল না। কিন্তু কিছুকাল পরেই পদ্মলোচনের পিতৃবিয়োগ হল, মা সতী হলেন, অন্যান্য নিকট আত্মীয়েরাও একে একে মারা গেলেন এবং অপরাপর আত্মীয়রাও পদ্মলোচনের আর্থিক সামর্থ্য দেখে একে একে 'সরে পড়লেন'। জমিজমাও এই অবস্থায় হাতছাড়া হল, কতক দেনার দায়ে বিকিয়ে গেল, ফলে 'অল্প বয়সে পেটের জন্য' পদ্মলোচনকে 'অদৃষ্ট ও হাতযশের' উপর নির্ভর করে কলকাতায় আসতে হল।

কলকাতায় এসে পদ্মলোচন প্রথমে একদল বাসাড়েদের বাসায় 'পেটভাতে ফাইফরমাস কাপড় কোঁচানো ও লুচিভাজা প্রভৃতি কর্ম্মে ভর্ত্তি হলেন,— অবকাশমত হাতটাও পাকান হবে— বিশেষত কুঠেলরা লেখাপড়া শেখাবেন প্রতিশ্রুত হলেন।'[৮১] ভদ্রলোকের ছেলে হয়েও তাঁকে বাসাড়েদের জন্য

অমানুষিক খাটতে হত— কাপড় কোঁচান, জলতোলা, বাজার করা, লুচি ভাজা প্রভৃতি সব কাজই তিনি করতেন। লুচি ভাজায় তাঁর দক্ষতা দেখে বাসাড়েরা তাকে 'মেকর' খেতাব দেয়, ফলে সেদিন থেকে তিনি মেকর পদ্মলোচন দত্ত নামে বিখ্যাত হলেন। কিছুকাল এভাবে চালানোর পর পদ্মলোচন জনৈক বড়োমানুষের অনুগ্রহ লাভের জন্য তাঁর কাছে উমেদারি করতে লাগলেন। এক বছর নাগাড়ে উমেদারি করার পর দু-চারখানা সই সুপারিশ জোগাড় হলে একজন সহৃদয় মুৎসুদ্দি নিজের কুঠিতে সিপ্সরকারির কাজে নিযুক্ত করলেন। এই কাজে নিযুক্ত হওয়ার দিন থেকেই পদ্মলোচনের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল। পদ্মলোচনের চালাকি ও কাজের হুঁশিয়ারিতে সাহেবরা সন্তুষ্ট হলেন। অতঃপর হাউসের সদরমেট কাজে জবাব দিলে সাহেবরা মুৎসুদ্দিকে অনুরোধ করে পদ্মলোচনকেই উক্ত সদর মেটের কাজ দিলেন।

সিপ্সরকার হয়েও পদ্মলোচন বাসাড়েদের আশ্রয় ত্যাগ করেননি, কিন্তু সদরমেট হয়ে আর সেখানে থাকা ভালো দেখায় না বলে অন্য জায়গায় একটু জায়গা ভাড়া করে একটি খোলার ঘর তৈরি করে বাস করতে লাগলেন। এরপর যে মুতসুদ্দির অনুগ্রহে তিনি সিপ্সরকারের কাজ পেয়েছিলেন, সেই মুৎসুদ্দি সঙ্গে সাহেবদের বনিবনা না হওয়ায় তিনি কাজ ছেড়ে দিলে সাহেবরা বিনা টাকাতেই মুৎসুদ্দি নিযুক্ত হলেন। মুৎসুদ্দির হওয়া মাত্রই তাঁর ওই খেলার ঘরেই দালাল, উমেদার, পেয়াদা, গদিওয়ালা, পাইকারে ভরে গেল। শহরময় মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল— 'পদ্মলোচন একজন মস্ত লোক'। এইসব মোসাহেব, উমেদারদের পরিচয় দিতে গিয়ে হুতোম তাঁদের 'বেকার জয়কেতু' বলেছেন অর্থাৎ— 'যখন যার নতুন বোলবলাও হয়, তখন তাঁরা সেইখানে মেশেন, তাঁকেই জাতের শ্রেষ্ঠ দেখান ও অনন্য মনে তাঁরই উপাসনা করেন; আবার যদি তাঁর চেয়ে কেউ উঁচু হয়ে পড়েন তবে তাঁরে পরিত্যাগ করে উঁচুর দলে জমেন।'[৮২] এঁদের মধ্যে শিক্ষিত-অশিক্ষিত দুই-ই থাকতেন। বেশিরভাগই পৌত্তলিক, কুলীন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ কুলীন, বেকার, পেনশনভোগী ইত্যাদি। পদ্মলোচনের মতো 'হঠাৎবাবু'দের পেলে এঁরা অচিরেই মোসাহেব-উমেদারের দলে নাম লেখাতেন এবং বাবুকে ফুলিয়ে -ফাঁপিয়ে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেন। পদ্মলোচন বাবুও এঁদের কথায় 'অ্যামবিসনের দাস' হয়ে 'প্রকৃত হিন্দুর মুকোস পরে' তাঁর বৈঠকখানা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতে ভরিয়ে তুললেন। তিনি প্রকাশ্যে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পায়ের ধুলো খান, পা চাটেন, দলাদলি ও হিন্দুধর্মের ঘোঁট করেন। সমাজে এই সব কারণে পদ্মলোচনবাবুর 'জোরদণ্ড প্রতাপ'।

হুতোম বলেছেন, 'বাঙ্গালী বদমায়েস ও দুর্ব্বুদ্ধির হাতে টাকা না থাকলে সংসারের কিছুমাত্র ক্ষতি কত্তে পারে না, বদমায়েসী ও টাকা একত্র হলে হাতি পর্য্যন্ত মারা পড়ে।'[৮৩] মোসাহেব এবং আর পাঁচজনের কুপরামর্শে অতএব পদ্মলোচনও কিছু বদমায়েসি আরম্ভ করে দিলেন— পৃথিবীসুদ্ধ লোকের নিন্দা, ঘোঁট পাকানো ও টিটকারি দেওয়াই হল তাঁর কাজ। শেষে নিজেকেই 'অবতার' ভাবতে থাকলেন। মোসাহেবরা নিজস্বার্থে অবতার বলেই তাঁর স্তব-তোয়াজ করতে লাগল, নিন্দুকেরা 'হঠাৎ' অবতার খেতাব দিল। নিজের অবতারত্ব প্রমাণে, পদ্মলোচন নানা সত্য-মিথ্যা গুজব তুলে আপনার নাম প্রচার করতে থাকলেন। টাকা হওয়ায় নাগরিক সমাজে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়ে গেল। উচিত-অনুচিত নানান উপায়ে পদ্মলোচনের যত উপার্জন হতে লাগল, ততই তিনি বড়োলোকি চালে অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন। নিজের অবস্থার উপযুক্ত বাড়ি কিনলেন। বড়োলোকি চাল চালতে গেলে যেসব জিনিসপত্র ও উপাদানের প্রয়োজন, বাবুর প্রয়োজনে সভাস্থ আত্মীয় ও মোসাহেব সেসব কিনে বাড়ি ভর্তি করে ফেললেন। অতঃপর সুবর্ণবর্ষে অর্থাৎ ৫০ বছর বয়সে বাবু স্বয়ং পছন্দ করে একটি 'রাঁড়ও রাখলেন'।

বাবু ইতিহাসের আদি পর্যায় থেকে বাবুয়ানার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল— রক্ষিতা পোষণ। মোগল যুগের নবাব বা আমির-ওমরাহ্দের 'হারেম কালচার'-এর পরোক্ষ প্রভাব এ জাতীয় মনোবৃত্তির মধ্যে কাজ করলেও করতে পারে। হুতোম অন্তত শহর কলকাতার আদি পর্বেই বাবুত্বের অন্যতম লক্ষণ হিসাবে বেশ্যাসক্তিকে চিহ্নিত করেছেন— 'বেশ্যাবাজীটি আজকাল এ শহরে বাহাদুরীর কাজ ও বড় মান্যের এলবাত পোসাখের মধ্যে গণ্য, অনেক বড় মানুষ বহুকাল হলো মরে গেছেন কিন্তু তাঁদের রাঁড়ের বাড়িগুলি আজও মনিমেন্টের মত তাঁদের স্মরণার্থ রয়েচে— সেই তেতলা কি দোতলা বাড়িটি ভিন্ন তাঁদের জীবনে আর য়্যামন্ কিছু কাজ হয়নি যা দ্যেখে সাধারণে তাঁরে স্মরণ করে।'[৮৪] সেইসঙ্গেই হুতোম জানিয়ে দেন গুহ্য সংবাদ যে— কলকাতার অনেক 'প্রকৃত হিন্দু দলপতি' ও রাজারাজড়ারা রাত্রে বেশ্যাগৃহে কাটান বলে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয় না এবং তাঁদের অনুপস্থিতিতে বাড়ির প্রধান আমলা, দেওয়ান, মুৎসুদ্দিদের সঙ্গে বাবুর স্ত্রীর অনৈতিক অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কোনো কোনো বাবু এ বিপত্তি আটকাবার জন্য নিজের স্ত্রীকে বাড়ির ভিতরে চাবিবন্ধ করে রেখে বাইরের বৈঠকখানায় সারারাত্রি বেশ্যাবাজি করেন এবং সকালবেলার তোপ পড়ার আগেই বেশ্যাটি গাড়ি বা পালকি করে চলে গেলে বাবু ভিতরবাড়িতে এসে শয়ন করেন। ছোকরা বাবুদের কেউ কেউ পিতা-মাতার ভয়ে নিজের শোবার ঘরে একজন চাকর-বাকর-বেয়ারা কাউকে শুতে বলে বেরিয়ে যান, স্ত্রী তুলসীপাতা ব্যবহার করে খাটে শুয়ে থাকেন, শেষ রাতে বাবু আমোদ করে ফিরে এলে চাকর নিঃশব্দে দরজা খুলে দিয়ে বাইরে চলে যায়, বাবু ভিতরে এসে শয়ন করেন। বস্তুত বেশ্যাবাজি প্রসঙ্গে হুতোমের ক্ষোভ ও ব্যঙ্গ ঝরে পড়েছে, পাশাপাশি বাবুত্বের এই শখটি যে অন্দরমহলে নানান অনৈতিক ব্যভিচার— অনাচারের জন্ম দিচ্ছে, তার দিকেও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পাশাপাশি বাবুদের লাম্পট্যের কথাও জানতে ভোলেন না তিনি। এই লাম্পট্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে দ্বিবিধ—

এক. সম্পূর্ণ অনাত্মীয়, প্রতিবেশী গৃহস্থ ঘরের সুন্দরী বউ কি মেয়ে কি অন্য কাউকে টাকা ও অন্যান্য সুখের লোভ দেখিয়ে ঘরের বার করে ভোগ করা এবং 'ধর্ম্ম নষ্ট করে শেষে তাড়িয়ে দেওয়া' ফলে, বেশ্যাবৃত্তি করা ছাড়া তার আর কোনো উপায় থাকে না।

দুই. অন্দরমহলের স্ত্রী ছাড়াও অন্যান্য স্ত্রী লোক— ভগ্নি, ভাগনি, শাশুড়ি, নাতনি, কন্যা, খুড়ি, নাতবৌ ইত্যাদির সঙ্গেও বাবুরা অনেকেই জোর করে ভোগলালসা মেটাতেন। অনেক মেয়ে এর দরুন আত্মহত্যা করতেন, অনেকে আবার ভ্রূণহত্যার মতো পাপ করতে বাধ্য হতেন। হুতোম জানিয়েছেন, অনেক বড়ো মানুষের বাড়ি এর জন্য মাসকাবারি হিসাবে ভ্রূণহত্যার সামগ্রী— রক্তকম্বলের শিকড়, চিতের ডাল, করবীর ছাল নেওয়া হত।

বাবুদের ব্যভিচারী স্বভাব প্রসঙ্গে হুতোমের পেশ করা এই খতিয়ান যে আদৌ অসত্য নয়, 'সমাচার দর্পণ' কিংবা বিশেষত 'সম্বাদ রসরাজ' পত্রিকায় প্রকাশিত একাধিক সংবাদ ও চিঠিতে তার যাথার্থ্য সমর্থিত হয়।[৮৫] হুতোম এর দায়ভার চাপিয়েছেন একইসঙ্গে বাবু এবং তাঁর ধর্মজ্ঞানহীন নীতিহীন মোসাহেবদের উপর। এইরকম 'পশুবৎ কদাচারে'র জন্যই তাঁর মতে, 'কল্‌কেতা সহর এই মহাপুরুষদের জন্য বেশ্যাসহর হয়ে পড়েচে, এমন পাড়া নাই যেথায় অন্তত দশ ঘর বেশ্যা নাই; হেথায় প্রতি বৎসর বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্চে বই কম্‌চে না।'[৮৬] মনে রাখতে হবে, হুতোমের এই মন্তব্যের পরবর্তীকালে ১৮৬৭ সালে তৎকালীন

হেল্‌থ অফিসার ফেবার টনার যে মেমৌরেন্ডাম প্রস্তুত করেন, তার হিসাব অনুযায়ী কলকাতায় তখন বেশ্যার সংখ্যা ৩০,০০০।[৮৭] এই হিসাব সরকারি, এর বাইরেও সংখ্যাটি প্রসারিত হতে পারে। হুতোম স্পষ্টই বলেছেন, 'যেখানে হিন্দুধর্মের অধিক অধিক ভড়ং, যেখানে দলাদলির অধিক ঘোঁট ও ভদ্রলোকের অধিক কুৎসা, প্রায় সেখানেই ভেতর বাগে উদোম এলো।'[৮৮]

পদ্মলোচনের বাবুত্বকে হুতোম ক্রমপ্রসারিত করেছেন তাঁর কাল পর্যন্ত। পলাশির যুদ্ধের পর প্রায় একশো বছর বিগত হয়েছে ইংরেজদের সংস্পর্শে এসেছে বাঙালিরা, একইসঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও রুচির স্বাদও পেয়েছে। তা-ও তাঁর আক্ষেপ যে তাতে আমাদের মানসিক রুচির বদল ঘটেনি : 'সেই নবাবী আমলের বড় মান্‌ষী কেতা, সেই পাকানো কাচা, সেই কোচান চাদর, লপেটা জুতো ও বাবরী চুল আজও দ্যাখ্যা যাচ্চে, বরং গৃহস্থ মধ্যস্থ লোকের মধ্যে পরিবর্ত্তন দেখা যায়, কিন্তু আমাদের হজুরেরা য্যামন তেমনিই রয়েচেন।'[৮৯] কোনো 'রিফাইন্ড গোছের বড় মান্‌ষী'র পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁরাও কীর্তিমান হতে পারতেন, কিন্তু অর্থগুলো সে কাজে ব্যয় না করে বেশ্যাবাজি ও বিলাসিতায় খরচ করাই এইসব হঠাৎবাবুদের লক্ষ্য।

পদ্মলোচন তাঁর জ্যেষ্ঠ ছেলের বিয়েতে পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করেন। এই উপলক্ষ্যে দু'লক্ষ সামাজিক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মধ্যে ত্রিশ হাজার জোড়া শাল, সোনাওয়ালা লোহা এবং ঢাকাই শাড়ি বিতরণ করা হয়; অন্যান্য বড়ো মানুষদের বাড়িতেও আরও অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে সওগাত পাঠানো হয়। বিয়েতে বাইনাচ ও অন্যান্য আমোদের আসর বসে। সং, ব্যান্ড, ঢাক, ঢোল ইত্যাদির অগণন আয়োজন সহ শোভাযাত্রা করে পদ্মলোচনবাবুর ছেলের বিবাহ হয়। এত সমস্তের মধ্যেও পদ্মলোচন তাঁর রক্ষিতার বাড়ি রাত কাটাতে গিয়েছিলেন। অন্যদিন সাতটা-আটটার সময় তিনি নিজের বাড়ি ফেরেন, ছেলের ফুলশয্যার দিন বলে একটু আগে ফিরতে হয়েছে তাঁকে, তফাত এটুকুই। তবে পদ্মলোচন একা নন, আরও অনেক বাবুই যে প্রত্যহ 'রাঁড়ে'র বাড়ি রাত কাটান এবং সকালবেলা প্রাতঃস্নান করে ফোঁটা কেটে তসরের থান পরে, গায়ে নামাবলী জড়িয়ে ফেরেন যাতে 'লোকে মনে কত্তে পারে শ্রীযুত গঙ্গাস্নান করে এলেন', সে সত্যও উন্মোচন করে দেন হুতোম। সেকালে প্রায় সম্ভবত ধনীবাবুদের বাড়িতেই বিবাহ, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধাদি উৎসব-কর্মে অর্থের বিপুল অপচয় চলত। আর্থিক ক্ষমতা প্রদর্শন করে অপর বাবুকে হীন প্রমাণ করা এবং একইসঙ্গে সমাজে নিজের যশ বৃদ্ধি করাই মূল লক্ষ্য ছিল। রাজা নবকৃষ্ণ তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে নয় লক্ষ টাকা খরচ করেন।[৯০] তাঁর পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণ মুসলমান 'নক্কীবাই'কে রেখেছিলেন। শুধুমাত্র তাঁর খাতিরে বিশাল শোভাযাত্রা সহ বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে মহরমের তাজিয়া বের করেছিলেন।[৯১] স্বয়ং কালীপ্রসন্ন সিংহের পিতা ছাতুসিংহ এরকমই বাবু ছিলেন। কালীপ্রসন্নের জন্ম উপলক্ষ্যে নাচের আসর বসে জোড়াসাঁকোর সিংহবাড়িতে, পূর্বেই তা উল্লেখিত হয়েছে।

বাবুদের মধ্যে যাঁরা বাইরে 'হিঁদুয়ানির ভেক' ধরতেন, তাঁদের বাড়িতে নিত্য নৈমিত্তিক দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি বারো মাসে তেরো পার্বণ চলত। এমনকী ঘেঁটু পূজাতেও চিনির নৈবেদ্য ও শকের যাত্রার আয়োজন হত। রক্ষিতার বাড়ি এবং অনুগত দশ-বারো জন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদের বাড়ির পূজাতেও দেদার খরচ করতেন বাবুরা। রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্মের প্রভাবে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারের ফলে এই বাবুয়ানা মধ্যে কমে এলেও উনিশ শতকের মাঝামাঝি তা আবার ফুলেফেঁপে ওঠে বলে নকশাকার জানান আমাদের। অথচ, উৎসব-আমোদে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা বাবুরা 'দেশের ভালোর জন্য অ্যাক দিনও উদ্যত

হন নি— শুভ কর্ম্মে দান দেওয়া দূরে থাকুক, সে বৎসরের উত্তর পশ্চিমের ভয়ানক দুর্ভিক্ষে (১৮৬১ খ্রি.) ও কিছুমাত্র সাহায্য করেন নি, বরং দেশের ভালো করবার জন্য কেউ কোন প্রস্তাব নিয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত হলে তারে কৃশ্চান ও নাস্তিক বলে তাড়িয়ে দিতেন।'[৯২]

অনেক বড়োলোক বাবুর পরিবারেই নানান সংস্কার ও রক্ষণশীলতার কারণে শিক্ষাদীক্ষার বালাই বিশেষ ছিল না। ইংরেজি শিখে সন্তান 'কৃশ্চান' হয়ে পড়বে এই ভয়ে ইংরেজি শিক্ষা থেকে রক্ষণশীলরা দূরে সরে থাকতেন, অন্যদিকে শূদ্রের সংস্কৃতে অধিকার নেই— এই অজুহাতে সংস্কৃতও পড়াতেন না। অনেক পরিবারেই 'শুদ্ধ নাম সই কত্তে পাল্লেই' যথেষ্ট মনে করা হত। পদ্মলোচনবাবুর পরিবারেও এমনটি চালু ছিল। এই সুযোগেই মধ্যশ্রেণির হাত ধরে শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারটি বিস্তৃত হয় এবং মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুরা সমাজে দেখা দিতে থাকেন। এ কাহিনির পদ্মলোচন নানারূপে বাবুয়ানির যশ রেখে ৮০ বৎসর বয়সে পরলোকে যান। হুতোম স্পষ্টই বলেছেন, পদ্মলোচন নিছক একজন ব্যক্তিমাত্র নয়, 'সহরের বড় মানুষদের মধ্যে অনেকেই পদ্মলোচনের জুড়িদার, কেউ কেউ দাদা হতেও সরেস!'[৯৩] এঁদের চরিত্র সংশোধিত না হলে বাংলার সামগ্রিক উন্নতিও যে সুদূরপরাহত— একথা হুতোম জানিয়েছেন। শহরের বাবুরা এক এক জন এক এক রকমের, তার মধ্যে হুতোমের ভাষায় 'উঁচুকেতার খাস হিন্দুদল'ভুক্ত 'হঠাৎবাবু'রাই পদ্মলোচনের দৃষ্টান্তে রূপলাভ করেছে। এই শ্রেণির বাবুদের প্রতি তাঁর অবজ্ঞামিশ্রিত ঘৃণা সহজেই অনুমান করা যায়।

পদ্মলোচন ভাগ্যের ফেরে প্রচুর অর্থের অধিকারী হয়ে 'হঠাৎ অবতার' রূপে তাঁর বাবুয়ানার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, তাঁর তবুও আর্থিক সামর্থ্য ছিল। কিন্তু উনিশ শতকের মধ্যভাগে এসে হুতোম এমন একদলকে দেখেছেন যাঁদের আর্থিক সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও বাবুগিরির শখ ষোলোআনা। শিক্ষা-সংস্কার-আভিজাত্য, সর্বোপরি অর্থসংস্থান না থাকা সত্ত্বেও একদল অশিক্ষিত 'বাবু'রা কীভাবে সমাজজীবনকে দূষিত করতেন, তারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ হুতোম প্রথমভাগের 'মাহেশের স্নানযাত্রা' শীর্ষক রচনায় সেরুড কোম্পানির বাড়ির তিরিশ টাকা মাইনে এবং দশ টাকা উপরি রোজগেরে গুরুদাস গুঁইকে হাজির করেছেন। গুরুদাস নিতান্তই নিম্নবিত্ত একজন, যাঁর চাঁপাতলা অঞ্চলে একটি খোলার বাড়ি আছে। সংসারে লোক বলতে— বৃদ্ধ মা, বালিকা স্ত্রী, এক বিধবা পিসি এবং তিনি নিজে। কিন্তু 'বড় সাখরচে লোক' বলে কায়ক্লেশে তাঁকে সংসার চালাতে হয়। কখনো কখনো মাস কাবারের আগেই গয়না বা অন্যান্য জিনিস বাঁধা দিতে হয়। শ্রাবণ মাসে ইলিশ মাছ ওঠবার পূর্বে ঢ্যালা ফ্যালা পার্বণে তাঁর দুমাসের মাইনেই খরচ হয়ে যায়, এরপর ভাদ্রমাসের অরন্ধন, পৌষ পার্বণের পিঠে পুলিতেও অনেক খরচ হয় তাঁর। এহেন গুরুদাস স্নানযাত্রার সময় 'বাবুগিরি'র আমোদে আমোদিত হলেন। লক্ষণীয়, হুতোম গুরুদাস গুঁইয়ের মাসিক খরচের যে তালিকা তুলে ধরছেন, তা নিছক অপ্রয়োজনে নয়। সাধারণ আর্থিক সামর্থ্যযুক্ত মানুষের জীবন কীভাবে অতিবাহিত হত, তার একটা আন্দাজ এর থেকে করা চলে। মনে রাখতে হবে, গুরুদাস আসবাবপত্রের দোকানের সামান্য মেট মিস্ত্রী, কিন্তু সেকালে, উনিশ শতকের শেষদিকে সাধারণ শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদেরও অবস্থা এর চেয়ে খারাপ বই ভালো ছিল না। সরকার নিযুক্ত ১৮৮৬ সালের 'ম্যালারিজ কমিশন রিপোর্ট' থেকে জানা যায়, মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। অনেকেরই নুন আনতে পানতা ফুরানোর মতো ব্যাপার। কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০ বছর আগে অর্থাৎ ১৮৬৬-র দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্র্যাজুয়েট একশো বা তার চেয়ে কিছু

বেশি বেতনের চাকরি পেত, কিন্তু রিপোর্ট পেশের সময় ত্রিশ টাকা বেতনেরও চাকরি পাচ্ছে না।[৯৪] এর দ্বারাই অনুমান, সমাজে একশ্রেণির হঠাৎবাবুদের হাতে যখন পুঞ্জীভূত অর্থ জমা হচ্ছে, অপচয়ের শেষেও যার পরিমাণ কম নয়, সেখানে শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের আর্থিক সামর্থ্য সীমাহীন বঞ্চনার ওপারে পড়ে। অতএব, তার চেয়েও আর্থিক ও সামাজিক বিচারে যাঁরা প্রান্তিক, তাঁদের অবস্থা কী নিদারুণ হবে, তা সহজেই অনুমেয়। অথচ, এমনই শ্রেণির অন্যতম গুরুদাস গুঁই সীমিত আর্থিক সামর্থ্য নিয়েই বাবুয়ানার উদ্‌যাপনে প্রস্তুত হন মাহেশের স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে।

মাহেশের স্নানযাত্রা কতখানি পুরাতন, সে বিষয়ে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[৯৫] প্রাচীন চৈতন্য সম্পর্কিত কাব্যে কিংবা বৈষ্ণব গ্রন্থগুলিতে মাহেশের স্নানযাত্রার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। ত্রিবেণীর কৃষ্ণদাস মল্লিকের পৌত্র দর্পনারায়ণ মল্লিক মুসলমানদের উৎপীড়নের ভয়ে কলকাতায় এসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁরই পুত্র নয়ানচাঁদ বা কমলনয়ান মল্লিক অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাহেশের মন্দির ও ধর্মশালা নির্মাণ করেন। অন্যদিকে শ্যামবাজারের দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসু লবণের দেওয়ানিতে প্রভূত অর্থ লাভ করে মাহেশের বিখ্যাত রথ নির্মাণ করান। পরবর্তীকালে হুগলি কালেক্টরের দেওয়ান থাকাকালীন তিনি অনেক ভূসম্পত্তি মাহেশের মন্দিরকে দান করেন। সম্ভবত অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে মাহেশের স্নানযাত্রার জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে এবং একে কেন্দ্র করে বাবুগিরির এক নতুন আমোদ বিকশিত হতে থাকে। রথযাত্রা এবং স্নানযাত্রা উভয় পার্বণেই মাহেশকে কেন্দ্র করে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হতে থাকে, তবে তাঁদের মধ্যে প্রকৃত ভক্তের সঙ্গে সঙ্গে হুজুকে বাবুরা ছিল প্রধান। স্নানযাত্রার সময় জুয়া খেলা হত। কখনো কখনো সর্বস্বান্ত হয়ে কেউ কেউ নিজের স্ত্রীকে বিক্রি করত অপর বেশ্যাদের কাছে।[৯৬] ১৮১৯-এর ৫ জুনের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে, 'এই যাত্রা (স্নানযাত্রা) দর্শনার্থে অনেক অনেক তামসিক লোক আবাল-বৃদ্ধবনিতা আসিবেন ইহাতে শ্রীরামপুর ও চাতরা ও বল্লভপুর ও আকনা ও মাহেশ ও রিসিড়া এই কয়েক গ্রাম লোকেতে পরিপূর্ণ হয় এবং পূর্ব্বদিন রাত্রিতে কলিকাতা ও চুঁচুড়া ও ফরাসডাঙা প্রভৃতি শহর ও তন্নিকটবর্ত্তি গ্রাম হইতে বজরা ও পিনিস ও ভাউলে এবং আর আর নৌকাতে অনেক ধনবান লোকেরা নানাপ্রকার গান ও বাদ্য ও নাচ অন্য অন্য প্রকার ঐহিক সুখসাধন সামগ্রীতে বেষ্টিত হইয়া আইসেন পরদিন দুই প্রহরের মধ্যে জগন্নাথদেবের স্নান হয়। যে স্থানে জগন্নাথের স্নান হয় সেখানে প্রায় তিন চার লক্ষ লক্ষ লোক একত্র দাঁড়াইয়া স্নান দর্শন করে।'[৯৭] ধনীবাবুদের স্নানযাত্রায় পারমার্থিক প্রত্যাশার চেয়ে 'ঐহিক সুখসাধনে'র আকাঙ্ক্ষাই যে প্রধান ছিল, সংবাদদাতার তা চোখ এড়ায়নি। উনিশ শতকের মধ্যভাগেও সে স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে বাবুদের এই ঐহিক সুখভোগের বিলাস সমমাত্রায় জাগরূক, তা ছদ্মবাবু গুরুদাস গুঁইয়ের উন্মাদনা থেকেই প্রমাণিত হয়।

যেহেতু 'স্নানযাত্রাটি পরবের টেক্কা, তাতে আমোদের চূড়ান্ত হয়ে থাকে, সুতরাং স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে গুরুদাস প্রায় নাওয়া-খাওয়া ভুলে জোগাড়যন্ত্রে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে সমমনস্ক ইয়ার জুটে গেল। যদিও গুরুদাসের 'বুজুম্ ফ্রেন্ড'রা থাকতে না পারায় গুরুদাস কিছুটা মন খারাপও করলেন। বন্ধুরা প্রত্যেকেই গুণের আধার ছিলেন। চাঁপাতলা হলধর বাগ কিছুদিন আগে একটি চুরির মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে দু'বছরের জন্য জেলে গেছেন, মতি বিশ্বাস মদ খেয়ে কুয়োয় পড়ে পা ভেঙে ঘরে শুয়ে, এবং হারাধন দাস ধারদেনার বাকির দায়ে ফরাসডাঙায় (অর্থাৎ চন্দননগরে) পালিয়ে গেছেন। অপত্য গুরুদাস ব্যথিত মনেই বাকি ইয়ারদোস্তসহ স্নানযাত্রার আয়োজন করতে লাগলেন। পাঁচ ইয়ার উদ্‌যোগ করে সব

জিনিস জোগাড় করতে লাগলেন। গোপাল একখানি বজরা ভাড়া করলেন; নবীন দায়িত্ব নিলেন আতুরি, আনিস, রস ও গাঁজার; ব্রজ ফুলুরি ও বেগুন ভাজার বায়না নিয়ে এলেন এবং স্বয়ং গুরুদাস ভার নিলেন গোলাবি খিলির দোনা, মোমবাতি, মিঠেকড়া তামাক ও অন্যান্য বাকি জিনিসের।

হুতোম আক্ষেপ করে বলেছেন, 'পূর্ব্বে স্নানযাত্রার বড় ধূম ছিল— বড় বড় বাবুরা পিনেস, কলের জাহাজ, বোট ও বজরা ভাড়া করে মাহেশে যেতেন, গঙ্গায় বাচ খ্যালা হত, স্নানযাত্রার পর রাত্তির ধরে খ্যামটা ও বাইয়ের হাট ল্যেগে য্যেতো। কিন্তু এখন আর সে আমোদ নাই— সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই— কেবল ছুতর, কাঁশারি, কামার ও গন্ধবেণে মশাইরাই যা রেখেচেন, মধ্যে মধ্যে দু' চার ঢাকা অঞ্চলের জমিদারও স্নানযাত্রার মান রেখে থাকেন, কোন কোন ছোকরা গোছের নতুন বাবুরাও স্নানযাত্রায় আমোদ করেন বটে।'[৭৮]

নির্দিষ্ট দিন গুরুদাসের ইয়াররা সেজেগুজে গুরুদাসের বাড়িতে হাজির হয়েছে। প্রত্যেকেরই আর্থিক অবস্থা তথৈবচ, কিন্তু মনে শখ কম নয়। যে যার সামর্থ্য মতো ভালো পোশাক পরে এসেছেন। গোপাল যেমন পেতলের বড়ো বোতামওয়ালা সবুজ রঙের একখানা ফতুয়া ও গুলদার ঢাকাই ওড়না, আঙুলে বিলিতি পেতলের শিল আংটি, পায়ে একজোড়া লাল রঙের মোজা পরে 'সুদুপায়ে' এসেছেন; 'তাড়াতাড়িতে জুতো' কেনা হয়নি তাঁর। নবীন বহুকাল ধোবাবাড়ির মুখ না দ্যাখা কালোপেড়ে ফুলদার ঢাকাই এবং ব্রজ গত বছর পুজোয় কেনা ন সিকের ধুতি চাদর পরে এসেছিল। সেকালে বাবুরা উৎসব-পার্বণ উপলক্ষ্যে নিজেরা তো বটেই; সঙ্গের মোসাহেবদেরও নতুন নতুন পোশাক-আশাকের ব্যবস্থা রাখতেন। কিন্তু গুরুদাসের আর্থিক সংগতি তেমন ছিল না, অতএব তাঁর ইয়ারবক্সদের যে খুব ভালো আর্থিক সংগতি থাকবে, এমনটি ভাবাই অন্যায়। গুরুদাস প্রধান বাবু— তিনি চল্লিশ টাকা দামের একখানি সরেস গুলদার উড়ুনি গায়ে দিয়েছিলেন, 'কেবল কাটের কুচো বাঁদবার দরুন চার পাঁচ জায়গায় একটু একটু খোঁচে গেছলো', সঙ্গে ছিল লাল বিলিতি ঢাকা পিরান, নীল রঙের হাফ চায়না কোট, 'বেঁচে থাকুক বিদ্দেসাগর চিরজীবী হয়ে' পেড়ে শান্তিপুরি ফরমাশি ধুতি এবং জুতো জোড়াটিতেও রুপোর বকলস দেওয়া। আর্থিক সংস্থানের ইঙ্গিতবহ ছবি গুরুদাস ও তাঁর ইয়ারদের পোশাকের পার্থক্যের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। একইসঙ্গে সীমিত সামর্থ্যেও গুরুদাসের বাবুয়ানির শখটিও স্পষ্ট করে দেন হুতোম।

অতঃপর ইয়ারদের সঙ্গে একটি হুঁকোতে তামাক টেনে, মাটির সরায় পান্তা ভাত ও তেঁতুল দিয়ে মাছের টক 'বহুমান' করে খেয়ে দিন-এর জোয়ারে মাহেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া ঠিক হল। সুতরাং গির্জার ঘড়িতে দশটা বাজলে পান-তামাক খেয়ে, তোবড়াতুবড়ি নিয়ে, দুর্গা দুর্গা বলে তাঁরা যাত্রা করলেন। ইতিমধ্যে বাড়ির লোকেরা যাঁর যাঁর পছন্দমত জিনিসের ফরমাশও দিয়ে রেখেছেন— মা আনতে বলেছেন একটি পাখা ও দুটো ধামা; স্ত্রী আগের রাতেই চিত্র আঁকা হাঁড়ি, ঘুনসি ও গুরিয়া পুতুল এবং বিধবা পিসি একটি খাজা কোয়াওলা ভালো কাঁঠাল, 'কলা কানাইবাঁশী ও কুলী বেগুন' আনতে বলেছেন। বিধবা পিসির অতৃপ্ত মৌনাকাঙ্ক্ষা বোঝাতে 'কলা কানাইবাঁশী ও কুলী বেগুনে'র এই ব্যবহার হুতোমের সমাজ-সচেতন সুতীক্ষ্ণ মনটিরই প্রমাণ দেয়।

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে বজরা বাঁধা ছিল। তখনও জোয়ার আসেনি, মাঝিদের খাওয়াও সারা হয়নি। গুরুদাস ও তাঁর ইয়াররা এসে উপস্থিত হয়ে নৌকায় উঠে বসলেন। সেখানে কেদার, জগ, হরি ও নারাণ তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। নৌকায় চড়ে বসেই তা ছাড়ার আগেই আতুরি ও জবাবির বোতলের

সদ্‌ব্যবহার শুরু হল, ব্রজ গাঁজায় টান দিলেন, ফুলুরি ও বেগুনিরাও পড়ে রইল না। নারাণ ও কেদার বাঁয়ার সংগতে গান শুরু করে দিলেন নেশার ঘোরে—[৯৯]

'হেঁসে খেলে নেওরে যাদু মনের সুখে।
কে কবে, যাবে শিঙ্গে ফুঁকে॥'

গানটি বস্তুত বাবুদের জীবনের মর্মসত্যকেই নির্দেশ করে। নিছক আনন্দ-বিলাসিতা-ফুর্তি, জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নাই বাবুসাজা বাঙালিদের কাছে। স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে শহরজুড়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আমোদপ্রমোদ, তীর্থদর্শনের যে ধূম পড়ে গেছে, মেয়ে-বউ-ভাদ্দরবউ-শাশুড়িতে পরিবৃত হয়ে অনেক বাবু যে মাহেশে গিয়ে কৃষ্ণ সাজবেন,— এই ইঙ্গিতও দেন হুতোম। তাঁর ভাষায় 'মাহেশ আজ দ্বিতীয় বৃন্দাবন।'[১০০] গঙ্গাবক্ষেও বোট, বজরা, পিনাস ও কলে জাহাজের ভিড় এবং 'সকলগুলি থেকেই মাত্‌লামো রং, হাসি ও ইয়ার্‌কির গব্‌রা উঠ্‌চে, কোনটিতে খ্যামটা নাচ হচ্চে, গুটি ত্রিশ মোসাহেব মদে ও নেশায় ভোঁ হয়ে রং কচ্চেন; মধ্যে ঢাকাই জালার মত, পেল্লাদে পুতুলের মত ও তেলের কুপোর মত শরীর, দাঁতে মিসি, হাতে ইষ্টিকবচ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তাতে ছোট ছোট ঢোলের মত গুটি দশ মাদুলী ও কোমরে গোট, ফিন্‌ফিনে ধুতি পরা ও পৈতের গোচ্চা গলায়— মৈমন সিং ও ঢাকা অঞ্চলের জমিদার সরকারী দাদা ও পাতান কাকাদের সঙ্গে খোকা স্যেজে ন্যাকামি কচ্চেন।'[১০১] বস্তুত স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে আদতে ধর্মের নাম করে নেশা ও নিষিদ্ধ আমোদের যে কী বিপুল আয়োজন চলত, আর এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন অর্থবান পাড়াগেঁয়ে ভূস্বামীরা (যদিও তাঁরা একা নন, তাঁরা ছিলেন শহুরে বাবুদের অন্ধ অনুগামী মাত্র), সে কথাই স্পষ্ট করে দিতে চেয়েছেন হুতোম।

স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে হুতোম নতুন কালের যে যে বাবুদের এ জাতীয় অনৈতিক আমোদে উৎসাহিত দেখেছেন, তাঁরা হলেন —

(ক) গ্রাম্য কিন্তু অর্থবান ধনী জমিদার;

(খ) ইংরেজি শিক্ষিত শহুরে নব্যবাবু;

(গ) সামান্য সামর্থ্যের হিন্দু নবশাখ বাবু, যাঁরা মেয়েমানুষের অভাবে পিসতুতো ভাই, ভাগনে ও ছোটো ভাইটিকে নিয়ে চলেছেন। গুরুদাস গুঁই শেষোক্ত দলভুক্ত। যদিও হুতোম তৃতীয় শ্রেণির বাবুদের কথা বলতে গিয়ে মেয়ের অভাবে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সমকামী সম্পর্ক ও 'গুহ্যগমনে'র (তথা পায়ুকাম) স্পষ্ট ইঙ্গিত দেন, তাতে উনিশ শতকে বাবুদের যৌনতার এলাকা যেমন সম্প্রসারিত হয়ে পড়ে, তেমনি বিকৃত কামনার সঙ্গে বাবুয়ানার যোগটিও স্পষ্ট হয়ে যায়। হিন্দুদের প্রধান প্রধান তীর্থক্ষেত্রগুলিকে কেন্দ্র করে বেশ্যাবৃত্তি বা বারাঙ্গনা বৃত্তির যে সুপ্রাচীন ইতিহাস গড়ে উঠেছে, তার মূলে আছে অর্থবান, অর্থসামর্থ্যহীন, শিক্ষিত অশিক্ষিতভেদে বাবুদের এইরকম মানসিক বিকৃতি।

চারিদিকে খ্যামটা নাচ ও শখের মেয়েমানুষদের ভিড় দেখে গুরুদাসের ইয়াররা গুরুদাসকে 'একটি মেয়েমানুষ না হলে তো স্নান যাত্রার আমোদ হয় না' বলায়[১০২] নেশার ঘোরে 'মেজাজ আলী' গুরুদাস যেকোনো মূল্যে একটি মেয়েমানুষ জোগাড় করে আনতে বলেছেন। সকলে বেরিয়ে গেলেও, শেষে নিজেও তিনি মেয়ে মানুষের সন্ধানে পড়েছেন। কিন্তু সিঁদুর পট্টী, শোভাবাজার, বাগবাজার, সিদ্ধেশ্বরীতলা— সব চষে ফেলেও মেয়েমানুষ জোগাড় করতে না পেরে শেষে গুরুদাস নিজের বাড়িতেই ফিরে গিয়ে বিধবা

পিসিকে তাঁদের সঙ্গে স্নানযাত্রায় যেতে অনুরোধ করেছেন; তাঁর মতে, 'সকলেই একটি দু'টি মেয়েমানুষ নিয়ে স্নানযাত্রায় যাচ্চে, কিন্তু পিসি সুদুই বা ক্যামন করে যাওয়া হয় আমার নিজের জন্য যেন না হলো কিন্তু পাঁচো ইয়ারের সুদু নিরিমিষ রকমে যেতে মন হচ্ছে না— তা পিসি আমোদ কত্তে কত্তে যাবো, তুমি কেবল বসে যাবে, কার সাদ্দি তোমারে কেউ কিছু বলে।'[১০৩] পিসির মনে যাওয়ার ইচ্ছে প্রবল, অতএব সামান্য 'গাঁইগুঁই' করে শেষে 'ভাইপোর সঙ্গে স্নানযাত্রায় গ্যালেন'। সেকালে স্নানযাত্রায় স্বল্পসামর্থ্যের 'শৌকিন বাবু'দের মেয়েমানুষের অভাবে আপন স্ত্রী, ভগ্নী, ভাগিনী, বিধবা পিসি প্রমুখদের নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি দুর্লভ ছিল না।[১০৪]

এরপর সমস্ত রাত আমোদ-আহ্লাদ চলতে লাগল। চাঁদনিরাতে বাবুরা সবাই আপন আপন পিনাসের ছাতে মেয়েমানুষ সহ মজলিশে মেতেছেন, কোথাও স্নানের ঘাটে স্নানরত মেয়েমানুষের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকেছেন, নেশার ঘোরে গান, নাচ, নরক গুলজার চলছে। গুরুদাসরা ও ফুলুরি ও গোলাপি খিলি শেষ হয়ে যাওয়াতে আতুরি, আনিস ও রস দিয়েই সেবা করছেন। অন্ধকার নৌকায় 'স্নেহময়ী পিসি' কেবল 'আঁচল দিয়ে বাতাস কচ্চেন'। স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে যেসব বাবুদের খড়দা, পেনেটি, আগড়পাড়া, কামারহাটি প্রভৃতি স্থানে বাগানবাড়ি আছে, তাঁরা সেসব স্থানে একদিন, দু'দিন কিংবা তার বেশিদিন বারাঙ্গনা বা ফুঁসলিয়ে আনা মেয়েমানুষ নিয়ে 'আয়েস ও চোহেলের হদ্দ' করেন। বাগানওয়ালা বাবুদের মধ্যে 'কেউ কেউ বাচ্ খেলারও ব্যবস্থা করতেন। স্নানযাত্রায় গিয়ে পুণ্য অর্জন যে মূল লক্ষ্য নয় তা বোঝা যায় যখন বাবুদের কেউ কেউ নৌকাতেই রইলেন, দুই এক জন ওপরে উঠ্‌লেন' [১০৫] এই একটি মাত্র সূক্ষ্ম অথচ তির্যক মন্তব্যেই।

বস্তুত, হিন্দুদের নানান পার্বণ ও উৎসব উপলক্ষ্যে বাবুদের মধ্যে যে বিলাস-উন্মত্ততা দেখা দিত। মদ্যপান ও বেশ্যাবাজির অনুঘটক হিসাবেই উৎসবগুলিকে দেখা হত, হুতোম তা এই নকশায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন। বিকৃত আমোদ চরিতার্থ করতে প্রয়োজনে বাবুরা সমস্ত নীতি-নৈতিকতা, ধর্ম-অধর্ম ভুলে পরিবারস্থ মেয়েদেরও লালসার উপকরণ করে তুলতে দ্বিধা করতেন না, এই তথ্য ঘৃণাজনক হলেও, উনিশ শতকের বাবু-মনা বাঙালি পুরুষের স্বাভাবিক চরিত্রধর্ম ছিল। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে মাইকেল মধুসূদনও 'একেই কী বলে সভ্যতা'?'য় ইঙ্গিতে দাদা ও বোনের মধ্যে অবৈধ সম্পর্কের কথা জানান দেন। বাবুয়ানার বিষময় ফল যে শিক্ষাদীক্ষার প্রসার সত্ত্বেও তথাকথিত নব্যবাবুদের মনেও বিকৃতির জন্ম দিয়েছিল, গুরুদাস গুঁইয়ের প্রসঙ্গে সে কথাই বলতে চেয়েছেন হুতোম। আর্থিক সামর্থ্যহীন মধ্যশ্রেণির বাবুদের সার্বিক অধঃপতনের মধ্যেই নিহিত আছে বাঙালিবাবুদের প্রতি সামাজিক ব্যঙ্গের মূল কারণটি, একথা বলাই যায়।

নকশার দ্বিতীয় পর্বে 'রেলওয়ে' শীর্ষক রচনায় হুতোম অত্যন্ত সংক্ষেপে দু'একটি আঁচড়ে রেলভ্রমণগামী দু'জন বৈষ্ণব বাবাজি এবং একজন নব্যবাবু, যিনি আবার ব্রাহ্মও বটে, তাঁদের স্বরূপ ও চরিত্র উদ্ঘাটন করতে প্রয়াসী হয়েছেন। দুর্গোৎসবের ছুটিতে হাওড়া থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত রেলওয়ে চালু হয়েছে এবং দু'ধরনের লোক অতএব রেল-ভ্রমণে তৎপর— এক. তীর্থযাত্রী, দুই. কেবল 'আমোদ'প্রিয়। শ্রীপাঠ নিমতলার প্রেমানন্দ দাস বাবাজি প্রথম দলে পড়েন। তিনি জোড়াসাঁকোর প্রধান মঠের একজন 'কেষ্টবিষ্টু' এবং তাঁর ইচ্ছা বারাণসী দর্শন করা, পরে বৃন্দাবন যাওয়া। বাবাজির বিশাল বপু, স্থূল শরীর, তৈল-চিক্কণ চেহারা, বাইরে তিলক ও পোশাক-আশাকের ব্যবহারিক বাহার তাঁর অন্য সব মোহশূন্য কেবলমাত্র কৃষ্ণগত প্রাণের যোগ্য বটে! বাবাজির পরম বন্ধু এবং যাত্রাসঙ্গী শ্রীপাঠ কুমার নগরের জ্ঞানানন্দ বাবাজির সূত্রে জানা যায়, প্রেমানন্দ বাবাজির একজন সেবাদাসীও আছেন। বাবাজির গাড়ির সন্ধানে বেরিয়ে

চিৎপুরে 'বেশ্যালয়ের বারণ্ডার নীচে দাঁড়িয়ে' থাকাও বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ। জ্ঞানানন্দ জ্বর ও কাশিতে দীর্ঘকাল ভুগে ভুগে অস্থিচর্মসার, কিন্তু নস্যি নেবার অভ্যাসটি আছে। মাঝে মাঝেই এক টিপ করে নস্যি নেন এবং তার ফলে 'নস্য ও সর্দ্দি মিশ্রিত কফজল' সর্বদাই গড়িয়ে পড়ে। তাতে জ্ঞানানন্দের কোনো হুঁশ নেই। প্রেমানন্দ বাবাজির সঙ্গে দুই শিষ্য তল্পিদার আসলে মালবাহক ও ছড়িদার অর্থাৎ আজ্ঞাবহ অধস্তন কর্মচারীও রয়েছেন। ধর্মীয় কৃচ্ছ্রসাধনের নামে বাবাজিদের বিলাস-ব্যসনপূর্ণ জীবনযাপনের প্রতি কটাক্ষই হুতোমের উদ্দেশ্য।

কেরাঞ্চি ভাড়া করে তাতে সওয়ার হয়েও বিপত্তি। প্রেমানন্দের বিশাল বপু এবং জ্ঞানানন্দের 'কৃশ' কঙ্কালসার শরীরের বৈপরীত্যে গাড়ি সহজে না নড়লে পথচলতি ফচকে ছোঁড়া এবং উপরের বারান্দার বেশ্যারা নানান অকথাকুকথা বলেছে। এর দরুন প্রেমানন্দ সাময়িক ঘৃণা ও ক্রোধে জ্ঞানানন্দকে, শহরের স্ত্রীলোকদের 'ব্যাপিকা' বলেছেন। 'ব্যাপিকা' শব্দের অর্থ চঞ্চল প্রগল্‌ভা নারী। বাবাজির এহেন স্মিত সম্বোধনও তাৎপর্যপূর্ণ এবং শেষে নিজেই 'প্রভো তোমার ইচ্ছা' বলাও গভীর ইঙ্গিত বহন করে। এই দু'টি চরিত্র সৃজনের পিছনে প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত 'যৎকিঞ্চিৎ' উপন্যাসের প্রত্যক্ষ ক্যারিকেচার আছে। এটিকে 'যৎকিঞ্চিৎ'-এর প্যারোডিও বলা যায়। কোনো কোনো মতে,[১০৬] প্রেমানন্দ হলেন প্যারীচাঁদের এবং জ্ঞানানন্দ হলেন ব্রাহ্ম নেতা শিবচন্দ্র দেবের ক্যারিকেচার। 'যৎকিঞ্চিৎ'-এ দুই ঈশ্বরবিশ্বাসী বন্ধু প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দের উত্তর ভারত ভ্রমণ উপলক্ষ্যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস-অবিশ্বাস, উপদেশ ও আধ্যাত্মিকতার নানান প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছিল। হুতোমের লক্ষ্য অবশ্য আধ্যাত্মিকতা নয়, ধর্মের ভেকধারীদের কথা ও জীবনাচরণের মধ্যে বৈপরীত্য নির্দেশ করা। জ্ঞানানন্দ প্রেমানন্দের কথার অনুষঙ্গে জানান যে, 'রামারজ্ঞিকা' না পড়ার ফলেই বেশ্যাদের এই অবস্থা— 'ওঁএ্যাদের রাঁমারঁঞ্জিকার পাঁঠ দেওয়া উচিত।'[১০৭] 'রামারঞ্জিকা' ও (১৮৬০) প্যারীচাঁদ রচিত স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কিত একখানি গ্রন্থ। মোট কুড়িটি পরিচ্ছেদে হরিহর ও তার স্ত্রী পদ্মাবতীর কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে স্ত্রীশিক্ষার মাধ্যমে সৎ স্ত্রী কীভাবে তার স্বামীকে মনে রাখে, ধর্মপরায়ণা হতে গেলেই বা কী করতে হবে ইত্যাদির আলোচনা আছে। বারাঙ্গনাদের 'রামারঞ্জিকা'র পাঠ দেওয়ার কথা বলে আদতে হয়তো ভেকধারী ধার্মিকদের সততা ও চারিত্রিক বিশুদ্ধির দিকেই প্রশ্ন তুলে দেন হুতোম।

এসবে প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দ উভয়ে প্রেমোন্মত্ত হয়ে সংগীত আরম্ভ করলে 'ভাঙ্গা ও খোনা আওয়াজের' সেই যুগলবন্দিতে পথের মধ্যে সাময়িক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই অবসরেই একজন 'শহুরে নব্যবাবু' বাবাজিদের গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে জাঁকিয়ে বসেছেন। হুতোম নব্যবাবুর যে পরিচয় দিয়েছেন, তার থেকে জানা যায়, তিনি একজন বিখ্যাত ব্রাহ্ম। কলিকাতার কাছেই তাঁর কর্মস্থল। সেখানে তিনি মোটা মাইনের চাকরি করেন, আবার একটি ব্রাহ্মসভা স্থাপন করে স্বয়ং তার সম্পাদকও হয়েছেন। প্রেমানন্দকে নিজের নাম বলেছেন তিনি, কৈলাসমোহন। ট্রেনে চড়ে তিনি কর্মস্থলে ফিরে যাচ্ছেন। কলকাতায় এসেছিলেন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের ফার্নিচার ও লাইব্রেরির বই কিনতে। হুতোম জানিয়েছেন, 'নববাবু রিফরমড্ ক্লাসের টেক্কা ও সমাজের রঙ্গের গোলাম স্বরূপ ছিলেন, দিবারাত্র "সামিগ্রী কত্তেন" ও সর্ব্বদাই ভরপুর থাকতেন— শনিবার ও রবিবার কিছু বেশী মাত্রায় কারগো নিতেন, মধ্যে মধ্যে বানচাল হওয়ারও বাকি থাকত না।'[১০৮] এবং বই ও ফার্নিচার যদিও বাহ্য উদ্দেশ্য ছিল কলকাতায় ফিরে আসার, তবুও একইসঙ্গে এই সুযোগে নব্যবাবুটির 'কদিন খোঁড়া ব্রহ্মের সমাজেই প্রকৃতির প্রীতি ও প্রিয়কার্যসাধন

করে বিলক্ষণ লাভ করা হয়।'[১০৯] 'খোঁড়া ব্রহ্মের সমাজ' অর্থাৎ গণিকাপল্লিতে এসে প্রকৃতি অর্থাৎ প্রিয় বেশ্যার প্রীতিজনক কাজ করা এবং তার দরুন তাকে খুশি করাই ছিল নব্য ব্রাহ্মবাবুটির মূল উদ্দেশ্য। হুতোম নকশারই অন্যত্র, প্রথমভাগের শেষে, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, রামমোহন ইত্যাদি ব্রাহ্ম আচার্যদের মহৎ হৃদয় বলে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেও, সাধারণ ব্রাহ্মবাবুদের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নিতান্ত অনুকূল ছিল না। সম্ভবত রক্ষণশীলদের মতোই তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, সাধারণ ব্রাহ্মবাবু মাত্রেই বেশ্যা ও সুরাসক্ত, ভণ্ড, সামাজিক বিশৃঙ্খলার ধারকবাহক, সর্বোপরি সংস্কারহীন। এই ধারণা অবশ্য উনিশ শতকের শেষদিকে আরও তীব্রতর হতে থাকে। কিন্তু হুতোমের রচনার ১৮৬০-এর কাছাকাছি সময়ে ব্রাহ্ম সাধারণ বাবুদের সম্পর্কে যে অশ্রদ্ধার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ সমাজ ইতিহাসের কাছে। রামকৃষ্ণ পরমহংস, বঙ্কিম, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখদের হাত ধরে যে হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আকাঙ্ক্ষার পুনর্জন্ম ও সফল বিকাশ সম্ভব হয়েছিল, ব্রাহ্মবাবুদের আচার-আচরণঘটিত অসংযম ও অনাচার, মানসিক বিকৃতি তার পূর্ব-পটভূমিকা তৈরি করে দিয়েছিল। রামমোহন পরিমিত হলেও মদ্যপান করতেন এবং তাঁর দেখাদেখি ব্রাহ্মসমাজেও প্রথমদিকে পরিমিত মদ্যপান প্রচলিত হয়। বস্তুত মদ্যপান অনেক ব্রাহ্মবাবুদের কাছেই ছিল সংস্কারমুক্তির প্রথম ধাপ। রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচরিতে' জানিয়েছেন, 'যেদিন আমরা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করি, সেদিন বিস্কুট ও সেরী আনাইয়া ঐ ধর্ম গ্রহণ করা হয়। খানা খাওয়া ও মদ্যপান করা রীতির জের রামমোহন রায়ের সময় হইতে আমাদিগের সময় পর্যন্ত টানিয়াছিল, কিন্তু সকলেই যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের দিন ঐরূপ করিতেন এমন নহে। আমি এই সময়ে অতি পরিমিত রূপে পান করিতাম।'[১১০] ক্রমে এই জাতীয় বাহ্য আচারগুলিই সংস্কারের মতো ব্রাহ্মবাবুরা পালন করতে থাকেন এবং এই সংস্কারই একসময় তাঁদের গ্রাস করে।

কৈলাসমোহনও মদ্যাসক্ত। দিনদুপুরেই গাড়ির মধ্যে বসে প্রেসিডেন্সি মেডিক্যাল হল লেবেল দেওয়া একটি ফায়েল বার করে সিসির সমুদায় আরকটুকু গলায় ঢেলে দিয়েছেন। অনেক ওষুধের দোকানেই তখন মদ বিক্রি হত। কখনো প্রকাশ্যে, কখনো গোপনে। মাতাল হলেও কৈলাসমোহনের পোশাকে-আশাকে নব্যবাবুর ছাপ পুরোপুরি বর্তমান। প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দের চোখে পড়েছে : 'বাবুর একটি কাল বনাতের পেন্টুলেন ও চাপকান পরা ছিল, তার ওপোর অ্যাক্টা নীল মেরিনোর চাইনা কোট, মাথায় অ্যাক্টা বিঙর হেয়ারের চোঙ্গাকাটা ট্যাসল লাগানো ক্যাটিকৃষ্ট ক্যাপ ও গলায় লাল ও হলদে রঙ্গের জাল বোনা কম্‌ফরটার, হাতে একটি কারপেটের ব্যাগ ও অ্যাক্টা বিলিতি ওকের গাঁট বাই করা ক্যোঁদো কোঁতকা, ততভিন্ন বাবুর সঙ্গে একটি ওয়াচ্ ছিল, তার নিদর্শন স্বরূপ একটি চাবি ও দু'টি শিল চুলের গার্ড চ্যেনে ঝুল্‌চে, হাতের আঙুলে একটি আংটিও পরা ছিল, ... সেটির ওপরে ''ওঁ তৎসৎ'' খোদা রয়েচে।'[১১১] পোশাকের বাহার, চরিত্রে তিনি ভয়ানক দুর্বৃত্ত। হুতোম তাঁকে 'মাতালবাবু' সম্বোধন করে দেখিয়েছেন, অন্য ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা ও ব্যঙ্গ এঁদের চরিত্রের স্বভাব ছিল। বাবাজিকে সে মাতাল হয়ে নিজের পরিচয় দিয়েছে যে, 'আমরা ইয়ার লোক, প্রাণ গড়ের মাঠের মত খোলা'[১১২], এই বলে 'চায় মন চিরদিন, পূজিতে সেই পুতুলে' বলে একটি রসের গান গেয়েছে। পোশাকি সাহেবিয়ানা ও আপাত শিক্ষার আড়ালে হুতোম দেখাতে চেয়েছেন ব্রাহ্ম তথা নব্য 'ভদ্রলোক'বাবুদের একশ্রেণির আসল স্বরূপ। মাতাল, দুশ্চরিত্র, পরমত অসহিষ্ণু, অহংসর্বস্ব এবং সংস্কারহীন এই বাবুদের দেখিয়েই হুতোম যেন তার বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে চেয়েছেন কলকাতা দর্শনের ছলে বাবুদর্শনের কাজটিরও। রেল টারমিনাস আসতে হয়তো ব্রাহ্মবাবুটি বাবাজি

দুজনকে অল্পবিস্তর আঘাত করে নেমে গেছেন, কিন্তু হুতোম ততক্ষণে আপনার উদ্দেশ্যমতো তথাকথিত প্রগতিশীল ব্রাহ্মবাবুদের আসল স্বরূপ দেখিয়ে দিয়েছেন আমাদের।

'রেলওয়ে' শীর্ষক রচনায় এরপরও চকিতে দেখা মেলে টিকিট বুকিং ক্লার্ক বাবুটির, যিনি 'সন্ধ্যাপূজার অবসরমত ঝোপ্ বুজে কোপ্ ফেলচেন। কারো টাকা নিয়ে চার আনার টিকিট ও দুই দোওয়ানি দেওয়া হচ্চে, বাকি চাবা মাত্র চোপ্‌রও ও নিকালো, কারো শ্রীরামপুরের দাম নিয়ে বালির টিকিট বেরুচ্চে, কেউ টিকিটের দাম দিয়ে দশ মিনিট চীৎকার কচ্চে, কিন্তু সেদিদকে ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই।' [১১৩] প্রেমানন্দের থেকেও চিনি একইভাবে ফেরত পয়সা আত্মসাৎ করেছেন। অথচ ফার্স্ট ক্লাসে সাহেব-বিবিরা যেখানে টিকিট কাটছেন, সেখানকার বুকিং ক্লার্ক বিরস বদনে ঠিকমতো মূল্য ফেরত দিয়ে উচিত টিকিট দিচ্ছেন। কেরানিবাবুদের মধ্যে দিয়ে হুতোম এক আশ্চর্য স্বদেশবাসীকে দেখান, যাঁরা আপন স্বার্থে পরস্ব অপহরণ করতে দ্বিধাবোধ করে না, স্বদেশীয়দের প্রতারণা করে আত্মস্বার্থসিদ্ধিই যাঁদের মোক্ষ, 'উপরি'র প্রতি অতিরিক্ত মোহে যথার্থই হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, এবং অশিক্ষিত। বুকিং ক্লার্কের মুখে গান 'ইচ্ছা হয় যে উহার করে প্রাণ সপে সই হইগে দাসী' তাঁর চারিত্রিক অধঃপতনের দিকেও ইঙ্গিত করে।

অর্থাৎ হুতোম স্পষ্ট করে দেন, আর্থিক সামর্থ্যের বদলেও বাবুত্বের নানান চারিত্রিক ও মানসিক লক্ষণগুলি এভাবেই সঞ্চারিত হয়ে চলেছিল এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে। তথাকথিত শিক্ষার ভ্রান্তি একপ্রকার অদ্ভুত বাবুর জন্ম দিয়েছিল, যাঁরা ব্যক্তিগত সুখভোগ ও আত্মস্বার্থে কিছু বুঝতেন না। আর্থিক সংগতির অভাব থাকলেও এঁদের মানসিক ভূগোল ও চাহিদা, শখ ও বিলাসিতার বাসনা নববাবুদের চেয়ে ভিন্ন ছিল না। অপরকে ঠকানোর মতো পাপ করেও কেরানিবাবুটির প্রফুল্ল এবং রসার্দ্র ব্যবহার প্রমাণ করে দেয় নতুন কালের অধঃপতিত বাবুরা ধর্মাধর্মজ্ঞান এবং পাপবোধ নামক বিবেকের দংশনটিকেও হারিয়েছেন। এ কারণেই উনিশ শতক যদি অস্তগামী হয়েছে, ততই প্রহসনে, নকশায়, কথনে-চিন্তায় উক্ত বাবু শ্রেণির প্রতি সম্ভ্রম, সহানুভূতি কিংবা নিতান্ত কৌতূহলের ভাব বিস্মৃত হয়েছে সমাজের সাধারণ অংশের মন থেকে। হুতোম 'রেলওয়ে' নামক রচনায় কেরানিবাবুটির চরিত্র তুলে ধরে উনিশ শতকের বাবু-বৃত্তান্তের একটি পরিণামী ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন।

বস্তুত বাবু-বিষয়ক যাবতীয় নকশার মধ্যে হুতোমের 'নকশা'টি নানা কারণেই অতুলনীয় এবং অভিনব। উনিশ শতকের প্রায় মধ্যপর্বে লেখা এই 'নকশা'য় হুতোম বাবুসমাজের আদি-মধ্য-অন্ত্যের যেন এক পূর্ণাঙ্গ চালচিত্র তুলে ধরেছেন। হুতোমের আগে বা পরে নকশা সহ অন্য যেকোনো গ্রন্থে বাবুদের প্রায় শতাব্দীকালের এহেন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আর একটিও নেই। নকশাকার তাঁর নিজের সময়ের বাবুদের চেহারা তুলে ধরতে গিয়ে বাঙালি বাবুয়ানার মূলগত উৎসে ফিরে গেছেন। দেখিয়েছেন, নবাবি আমলের রীতিনীতির পরিশেষ কীভাবে ঢুকে পড়ে বাবুয়ানার মূল স্বভাব-লক্ষণকে পরিপুষ্ট করে তুলেছে। শাসক ইংরেজ এবং তার শাসন সূচনার রীতিনীতি ও চিরস্থায়ী ভূমিব্যবস্থা অনুঘটক হিসাবে ভুঁইফোঁড়, অনভিজাত বাবুত্বকে পূর্ণরূপ দিয়েছে। ক্রমে পাশ্চাত্য অনুকরণের হাত ধরে এর মধ্যে মিশে গেছে পোশাকি সাহেবিয়ানা, সংস্কারমুক্তি ও প্রগতির নামে কদর্থক কিছু রীতিনীতি এবং ভণ্ডামি। হুতোম বাঙালিবাবুদের চালচিত্রে উনিশ শতকের বাঙালি পুরুষের বিবর্তনের স্বরূপটিকে স্পষ্ট করে তুলেছেন যথার্থভাবে।

দ্বিতীয়ত, হুতোমের রচনায় বাবুদের বহুবিচিত্র শ্রেণিভেদের রৈখিক কিন্ত অমোঘ পরিচয় মেলে। আদিবাবু, নববাবু, নব্যবাবু, 'ভদ্রলোক'বাবু থেকে কেরানিবাবুরা যেমন উপস্থিত, তেমনি বাহ্য ধরন নির্ভর

হঠাৎবাবু, কাপ্তেনবাবু, ফোতোবাবু, ব্রাহ্মবাবুরাও সমানভাবে উপস্থিত। বস্তুত হুতোমের আলোচ্য শ্রেণিবৈচিত্র্য অন্য কোনো গ্রন্থেরই লভ্য নয়।

তৃতীয়ত, হুতোমের নকশাও উদ্দেশ্যমূলক। সামাজিক মঙ্গলসাধনের লক্ষ্যেই তাঁর গ্রন্থে আপনার মুখ আপনি দেখবার এই আয়োজন। কিন্তু দু'একটি আত্মকথন ছাড়া কোথাও সেই উদ্দেশ্যমূলকতা বাবুদের স্বভাব ও পরিণতির কোনো কল্পচিত্র রূপায়ণে ব্যস্ত নয়। হুতোম নির্মম, নিষ্ঠুর ব্যঙ্গে, যথাযথ বাস্তবতা রক্ষা করেই হুবহু বাবু-চিত্র তুলে ধরেছেন। এইরকম দৃষ্টিভঙ্গি দু'একটি রচনা বাদে উনিশ শতকের কালসীমায় রচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলিতে দুর্লভ।

চতুর্থত, কাহিনির সামান্য ইঙ্গিতবাহী দু'একটি রচনা বাদে টুকরো টুকরো চোখে দেখা ছবির মধ্যে মধ্যেই 'বাবু' নামক বিচিত্র শ্রেণিটি তাঁর লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। যেগুলি একত্র করলে বহুবিচিত্র বাবুর বহুবিচিত্র কিন্তু সাধারণীকৃত কতগুলি type আমাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে যায়। নকশার সাধারণ ধর্মকে বজায় রেখেই হুতোম সমকালীন সমাজ ও সময়ের বর্ণনার মধ্য থেকেই বাবুত্বের চেহারা ও চরিত্রগুলিকে তুলে আনতে চেয়েছেন। পরবর্তীকালের লেখকেরা হুতোমের নিন্দা করেও এ জাতীয় প্রবণতা অনুসরণ করতে চেয়েছেন, কিন্তু বলা বাহুল্য প্রায়শই ব্যর্থ হয়েছেন।

পঞ্চমত, হুতোমের অননুকরণীয় ভাষার নিন্দা ও প্রশংসা যাই হোক না কেন, বাবু-সাহিত্যের পক্ষে যে উপযুক্ত এবং তুলনাহীন, তা অনস্বীকার্য। নকশার বিষয় এবং বর্ণনার মধ্যে যে খণ্ডিত সমকালীনতা থাকে, হুতোমের নকশার ভাষা ও বর্ণনায় সরসতা সেই সমকালীনতার জীবন্ত রূপটিকে ধরে রেখেছে। সাধু ও চলিত মেশা, কলকাতার সমকালীন ভাষারুচি ও 'করনি' মিশ্রিত এই ভাষা হুতোম-পরবর্তী বহু নকশার শিরোধার্য হয়েছে। বলা বাহুল্য, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রথম 'আলালের ঘরের দুলালে' এ জাতীয় ভাষার দ্বিধামিশ্রিত ব্যবহার করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই লেখা হুতোমের বর্ণনায় এই দ্বিধার কোনো চিহ্ন নেই। শব্দ ইতর কী ভদ্র— এই সংস্কারে তিনি আদৌ মাথা ঘামাননি। যে ভাষায় যে শব্দে তাঁর উদ্দিষ্ট মনোভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হতে পারবে, সেই ভাব, সেই শব্দ, সেই ভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন। এ কারণেই হুতোমের বর্ণনায় বাবুরা হয়ে উঠেছেন এত সজীব, এত প্রাণবন্ত, এত প্রত্যক্ষ।

সর্বোপরি, হুতোম ব্যঙ্গ ও সরসতার ছদ্মবেশে বাঙালির জাতীয় জীবনের একটি তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা উপস্থিত করেছেন। শুধুমাত্র নকশা বলেই রূপকের ব্যবহার আছে, নতুবা তাঁর বর্ণনায় ঐতিহাসিক সত্য আদৌ বিকৃত না করে যথাযথভাবে রক্ষিত। আসলে কল্প-কল্পনার চেয়ে, হুতোম জোর দিয়েছিলেন সমকাল ও সমকালের ঔরসজাত বাবুদের সম্পর্কে সাধারণ সামাজিকের মনোভাব প্রকাশে। সে মনোভাব নিরপেক্ষ নয় সবসময়, কখনো রক্ষণশীল, কখনো উদার, কখনো-বা সমালোচনামূলক কিন্তু কোথাও সাপেক্ষতার নামে অনৈতিহাসিক কিছু তিনি বর্ণনা করেননি। ফলে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' ভবানীচরণের 'কলিকাতা কমলালয়ে'র মতো উনিশ শতকের আর একটি সাহিত্যগ্রন্থ, যা একইসঙ্গে ইতিহাসের মর্যাদাও পেয়েছে। এবং সে ইতিহাস, কলকাতার শতাব্দীপ্রাচীন বাবুত্বের ইতিহাস।

একথা ঠিক যে, হুতোম মূলত কলকাতা-কেন্দ্রিক বাবুদেরই লক্ষ্য করেছেন। বাংলার মফস্সল বা গ্রামপ্রদেশগুলিতেও বাবুয়ানার যে অন্তঃস্রোত মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, তার পরিচয় নেই তাঁর গ্রন্থে। এক্ষেত্রে বলা যায়, কলকাতার বিমিশ্র নাগরিক সংস্কৃতি, নতুন বিচিত্র সামাজিক কাঠামো, অর্থের সীমাহীন অসম বন্টন এবং একপ্রকার সুবিধাভোগী শ্রেণির হাত ধরেই যে বাবুত্বের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল

তা বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ অনেকেই মেনে নিয়েছেন। উনিশ শতকের যে শেষ কয়েক দশকে কলকাতার বাইরেও বাবুত্বের সীমানা সম্প্রসারিত হয়েছিল, তা হুতোমের পক্ষে ১৮৬১-৬২-তে হুবহু জানা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তিনি তার ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। 'মাহেশের স্নানযাত্রা'য় থাকা অঞ্চলের দু'একটি জমিদার নিম্নশ্রেণির রুচিবিকারের মান রেখে থাকেন, একথা হুতোমই বলে গেছেন।

মনে রাখতে হবে, সমকালীন সমাজে হুতোমের রচনা বহুতর সমালোচনা, একইসঙ্গে জনপ্রিয়তারও মুখোমুখি হয়। 'আলালের ঘরে দুলালে'র সঙ্গে সমালোচনা টেনে উনিশ শতকের এক সাহিত্য-ইতিহাসকার বলেছেন, 'কালে এই ''আলালী ভাষা''র অভিনব সংস্করণ হইয়াছিল, — ''হুতোম''। দিন কতক এই হুতোম ও আলালী ভাষা কলিকাতা ও তন্নিকটবর্তী সমাজগুলিকে তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছিল। সমাজের স্থূল চিত্রগুলি এবং গ্রাম্যভাবগুলি অঙ্কিত করিয়া দেখানোই এই দুই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।'[১১৪] অবশ্যই তা নয়, 'দিন কতক' নয়, উত্তরকালেও হুতোমের ভাষা বাংলা নকশাসাহিত্যেকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল। বিশেষত বাবু- সংস্কৃতি প্রসঙ্গে হুতোম প্যাঁচার এই নকশা অভিন্ন। সেইসঙ্গেই, কেবল স্থূল চিত্র ও গ্রাম্যতা প্রদর্শন করাই লক্ষ্য ছিল হুতোমের। বাবুসমাজ আপনাদের স্বভাব-বিকৃতিগুলির ছবি দেখে তার স্থূলতা উপলব্ধি করে যদি তাকে পরিহার করতে পারেন, এই বৃহত্তর সামাজিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার কথা হুতোম নিজেই গ্রন্থের নিবেদন অংশে স্বীকার করে গেছেন। বাংলা বাবু-সাহিত্যে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' এই বহুগুণে গুণান্বিত বলেই আজও অদ্বিতীয়। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য 'পুরাতন প্রসঙ্গে' বলেছেন,

> 'হুতোম প্যাঁচার মধ্যে যথেষ্ট লোকজ্ঞতা ও পরিহাস-রসিকতা প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক স্থলেই তখনকার ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কটাক্ষপাত আছে। পাথুরিয়াঘাটার কোনো ধনী প্রবীণ বয়সে নিজের জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষ্যে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের বিদ্রূপবাণ তাঁহার উপর বর্ষিত হইল, 'নক্সা'য় পাথুরিয়াঘাটা 'নুড়িঘাটা'য় রূপান্তরিত হইল। মাহেশে রথের সময় বাচখেলা, মেয়েমানুষ সঙ্গে লইয়া দ্বাদশগোপাল দেখিতে যাওয়া ইত্যাদি তিনি নিপুণহস্তে চিত্রিত করিয়াছেন। ইংরেজরা ঠাট্টা প্রসঙ্গে যাহাকে Arry বলে অর্থাৎ যে সকল সামান্য লোক ইয়ার্কির উপলক্ষে বেইক্তার হইয়া নানা প্রকার বাঁদরামি করিয়া থাকে, সস্তায় আমোদ করিবার চেষ্টা করে, নক্সায় সেই প্রকৃতির লোকদিগের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও বঙ্গসমাজে এইরূপ লোক দেখিতে পাইবে।' 'Satire হিসাবে ''হুতোম প্যাঁচা'' যে খুব effective হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। But as an early specimen of that type of writing it deserves not to be forgotten।'[১১৫]

যদিও কৃষ্ণকমল 'Satire হিসাবে ''হুতোম প্যাঁচা'' যে খুব effective' হয়নি, তা মনে করেছেন, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে হুতোমের নকশা প্রকাশিত হবার পর হুতোমের নকশাখানিকে বিদ্রূপ করে বেশ কয়েকটি নকশা ও প্রহসন রচিত হয়েছে। হুতোমের ব্যঙ্গ যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে বিঁধেছে তাতে আর সন্দেহ থাকে না। বিশেষত, নকশায় যেসব পরিবার বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কটাক্ষ আছে, তাঁদের তরফ থেকে নকশা লিখে, প্রত্যুত্তরের ছলে, হুতোমরূপী কালীপ্রসন্ন এবং তাঁর পরিবারের চরিত্রহনন অনিবার্য বলে মনে হয়েছিল। ফলে দেখা যায়, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আপনার মুখ আপুনি দেখ' (১৮৬৩), ক্ষেত্রমোহন

ঘোষের 'কাকভুষুণ্ডীর কাহিনী' (১৮৬৫) এবং টেকচাঁদ ঠাকুর জুনিয়ার বা চুনিলাল মিত্রের 'কলিকাতার নুকোচুরি' (১৮৬৯) বিরুদ্ধপক্ষীয়দের তরফ থেকেই বাবুসমাজের কলঙ্ক-প্রদর্শনের ছলে হুতোমকেই উদ্দিষ্ট করেছিল। তিনটি গ্রন্থই আপাত আখ্যানমূলক, তিনটি গ্রন্থই পরিণামে দ্বিতীয় খণ্ডে কাহিনির সমাপ্তির কথা জানিয়েছে, কিন্তু কোনো গ্রন্থই দ্বিতীয় খণ্ডের মুখ দেখেনি। হুতোম তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের তাঁকে লেখা চিঠি উদ্ধার করে জানিয়েছেন যে, ভোলানাথ দ্বিতীয় খণ্ডের মুদ্রণভার কালীপ্রসন্ন যাতে গ্রহণ করেন, তার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। যদিও বাস্তবে কালীপ্রসন্ন কোনো সাহায্য করতে অসম্মত নন। 'কলিকাতার নুকোচুরি'র লেখক চুনিলাল মিত্র 'আলালের ঘরের দুলালে'র লেখক এবং প্রসিদ্ধ বাগ্মী প্যারীচাঁদ মিত্রের কনিষ্ঠ পুত্র। এই গ্রন্থ রচনার জন্য প্যারীচাঁদ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে ত্যাজ্য করেন এবং তাঁর সঙ্গে সমস্ত রকম সম্পর্ক ছিন্ন করেন। অতএব হুতোমের 'নকশা'কে ঘিরে সামান্য হলেও আলোড়ন যে 'বরাঘুরে' বাবুসমাজে দেখা দিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

বটতলার বহু গ্রন্থ প্রসবিনী ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 'আপনার মুখ আপুনি দেখ'-তে (১৮৬৩) হুতোমের নকশার মতো দৃষ্টান্তের সাপেক্ষে সাধারণ সত্যে উপনীত না হয়ে, সাধারণ সত্যের অনুবর্তী দৃষ্টান্তের উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মূল লক্ষ্য কালীপ্রসন্নের 'ব্যক্তিজীবনের কালিমাপ্রকাশ'। যদিও 'ভূমিকা'য় ভোলানাথ বলেছেন, 'ইহার মধ্যে কোন ব্যক্তিকে আমি লক্ষ করি নাই। বিষ্ণু শর্ম্মা হিতউপদেশ পুস্তকখানির মধ্যে যেমত পশুপক্ষের গল্পছলে মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, সন্ধি ও বিগ্রহ বোলে নানাপ্রকার উপদেশ দিয়ে গ্যাচেন, আমিও এই পুস্তকখানির মধ্যে কতগুলি কাল্পনিক নাম দিয়ে আবকারী অসভ্যতা, বেশ্যা, অত্যাচার, যদেচ্ছা অহার, অন্যায় বিচার, অপব্যয়, উঁচু চাল, অন্য প্রতি দ্বেষ প্রভৃতি যে ক এক দোষে এদেশ উচ্ছন্ন যাচ্চে, তাহাই গল্পছলে বলিয়া স্থলে স্থলে উপদেশ দিয়েচি।'[১১৬] লেখকের এইসকল সৎ 'উপদেশ' অবশ্য সার্বিকভাবে বাবু সমাজের ছলে কালীপ্রসন্নকে লক্ষ করেই নিক্ষিপ্ত। আপাতভাবে তিনটি কাহিনিকে একসূত্রে গাঁথা হয়েছে—

(ক) কাহিনির কেন্দ্রিয় চরিত্রের পিতা কর্তাবাবুর বাবুয়ানা ও লাম্পট্য;
(খ) কেন্দ্রিয় চরিত্র গুণচন্দ্রের কাপ্তেনি তথা মদ্যাসক্তি ও বেশ্যাবিলাসের উদ্‌যোগ;
(গ) জনৈক চন্ননবিলাসবাবু ও তাঁর রক্ষিতা চন্ননবিলাসীর কাহিনি।

'নববাবু' গুণচন্দ্রের মোসাহেব বোসজা, পণ্ডিতমশায়, যশচন্দ্র— যাঁদের অনেকে তাঁর পিতার কাছেও 'মোসাহেবী' করতেন, তাঁরা এই কাহিনির সূত্রধার। কাহিনি অসমাপ্ত; বিশেষ করে নববাবু গুণচন্দ্রের শেষ পরিণাম হঠাৎ বিবৃত হয়েছে মাত্র, কোনো নিটোল কাহিনিসূত্রে সমাপতিত হয়নি। হুতোমের মতো কলকাতার বিমিশ্র সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের তেমন পরিচয় ধরা নেই রচনায়। মদ্যাসক্তি, বেশ্যাবাজি ও লাম্পট্যের নিরিখে বাবুদের অধঃপতনের চিত্র উঠে আসে কাহিনি বর্ণিত দৃষ্টান্তগুলি থেকে।

প্রথম কাহিনি অর্থাৎ গুণচন্দ্রের পিতা 'কর্ত্তাবাবু'র কথা বলতে গিয়ে লেখক জানান যে, কর্তাটি একসময় ধর্মজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, পরিশ্রমী সৎ এবং নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু ধনাঢ্য হয়ে পড়লে তৎকালীন সমাজের স্বাভাবিক নিয়মে কতকগুলি ধর্মহীন, নীতিভ্রষ্ট, অসৎ-চরিত্র মোসাহেব জুটে যায় এবং তাঁর চরিত্রও বদলে যায়। ভোলানাথ নির্মম ব্যঙ্গ করে বলেছেন, 'খোষমেজাজী বাবু হোলে চিড়িয়াখানার

সক্ হয় এবং তাহাদিগের নিকটে মোসাহেব নামক এক প্রকার জানোয়ারও আসিয়া পোষ্ মানে।'[১১৭] এঁদের সম্পর্কে লেখক কতকগুলি রূঢ় সত্য নির্দেশ করেন গ্রন্থের সূচনাতেই, যা সূত্রাকারে এই—

(১) এঁরা বাবুদের সব কথারই প্রতিধ্বনি করে অর্থাৎ নিজস্ব বোধ-চিন্তা ইচ্ছে করেই গুপ্ত রেখে বাবুর তোষামোদ করে যায়।

(২) 'সর্ব্বদাই আষাড়ে গল্প, পরের নিন্দা ও নূতন নূতন সংবাদ বলিয়া বাবুর অত্যন্ত প্রিয় হয় এবং ''ধর্ম্ম অবতার'' ব্যতিত বাবুকে অন্য শব্দে সম্বোধন করে না।'[১১৮]

(৩) এঁরা অনেকেই নির্দিষ্ট বেতনভোগী হলেও সময়ে-অসময়ে প্রায়ই 'হাওলাত' বলে বাবুর তহবিল থেকে অর্থ নেন;

(৪) বাবুকে অধঃপতনের পথ দেখিয়ে নিঃস্ব করতে কিম্বা বিপদে ফেলতে মোসাহেবদের ভূমিকা প্রধান;

(৫) তাঁদের উপর রীতিনির্ধারিত কোনো নির্দিষ্ট কাজের ভার থাকে না। চাটুকারি, তোষামোদি, বাবুর আমোদ বিলাসের দ্রব্যাদি জোগাড় এবং সহ-ভোগই এঁদের কাজ। বাবুদের মনোরঞ্জনের জন্য এঁরা কর্ত্তে পারেন না, এমন কর্ম্ম নেই;

(৬) পোষ্টাবাবুর সুখের সময়ে তাঁকে ঘিরে থাকলেও, তাঁর বিপদের সময় এঁরাই সর্বাগ্রে পালিয়ে যান। লেখকের মতে, 'দুগ্ধকলা দিয়া কালসর্প পুষিলে যেমন ফল লাভ হয় তাহাদিগকে প্রতিপালন করাও সেইরূপ জানিবে।'[১১৯]

এহেন মোসাহেবদের পরামর্শে ও প্ররোচনায় আরও অনেক ধনী ব্যক্তির মতো কর্তাবাবুও বাগানবাড়ি যাওয়া এবং আনুষঙ্গিক আমোদপ্রমোদ, লোকনিন্দা ও পরপীড়ন, ধর্মচিন্তা থেকে বিরত হয়ে সর্বদাই কু-চিন্তায় কালক্ষেপণ, সেইসঙ্গেই 'কোথায় কোন কুলটা পতিকুলে জলাঞ্জলি দিয়া অবস্থান করিতেছে তাহার অনুসন্ধান— কোথায় কোন কুল-কামিনীকে কুলনাশ, করণার্থে উৎসাহপ্রদান— কোথায় কোন পতিপ্রাণা লাবণ্যসুতার পাতিব্রত্যভঙ্গের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।'[১২০] তাঁর লজ্জা, ভয়, ঘৃণা সবই দূর হয়ে গেছে ক্রমে ক্রমে।

কর্তাবাবুটির লাম্পট্যকর্মের সহায়ক এক ব্রাহ্মণ— 'ঠাকুরপূজা এবং ঠাকুর বাটীর প্রসাদ বহিয়াই জীবিকানির্ব্বাহ' হয় তাঁর, লোকসম্ভাষণে যিনি 'দাদাঠাকুর' নামে খ্যাত। দাদাঠাকুর নানা বাড়িতে নিত্য পূজা- আচ্চা করতে যান, সংস্পর্শে আসেন অন্দরমহলের; ফলে অন্দরমহলের বাসিন্দাদের নানান দুঃখ, হতাশা, অকথিত আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনার সন্ধান রাখেন তিনি। আর সেইসব খবর বড়োলোক বাবুদের কাছে সরবরাহ করে এবং 'কুট্টনী'র কাজ করে দাদাঠাকুরের অতিরিক্ত এবং লাভজনক উপার্জনটি হয়। ধনীবাবুদের সঙ্গে সংসর্গের ফলে দাদাঠাকুর দু'চারটি ইংরেজি কথা শিখেছেন, কথায়-বার্তায় তাই ব্যবহার করে থাকেন। তিনি কর্তাবাবুকে এসে জানান কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারে চারজন নারী 'বেরিয়ে' আসার জন্য পা বাড়িয়ে রেখেছে। তাদের ভিতরে একজন কর্তাবাবুর পরিচিত। মেয়েটির বয়স এখন মাত্র চৌদ্দ, সে যখন খুব ছোটো ছিল কর্তাবাবুর বাড়িতে বেড়াতে আসত। কর্তাবাবু বয়সে প্রবীণ, অতএব অল্পবয়সি বালিকা মেয়ের কথা শুনে তিনিও আগ্রহী হন। তবে দাদাঠাকুর মেয়েদের অভিভাবক খুড়িমাকে খুশি করতে অর্থ লাগবে বলে জানালে কর্তাবাবু সব শর্তেই রাজি হয়ে উদ্‌যোগ করতে বলেন। সেই অনুযায়ী দাদাঠাকুর নিত্যপূজা উপলক্ষ্যে গিয়ে নববিবিকে বশীভূত করেন, খুড়িমাও অর্থের প্রলোভনে রাজি হয়ে যান এবং চারটি মেয়েই ঘরের বার হয়। কিন্তু ফেলে আসা একটি গয়না আনতে গিয়ে হঠাৎ বিপর্যয়ে

বাড়ির সবাই জেগে ওঠে, ফলে সেই মেয়েটির আর পালানো হয় না। এই কাজের বিনিময়ে খুড়িমা পান পাঁচশো টাকা, দাদাঠাকুর পান দুইশত টাকা বকশিস। এঁরা গিয়ে উঠলেন বাবুর বাগানবাড়িতে।

নকশাকার এই উপলক্ষ্যে নববিবিদের বাড়ির পুরুষদের সান্ধ্যকালীন জীবনযাপনের যে চিত্র অঙ্কন করেন, তার মধ্যে দিয়ে সেকালের স্খলিত, নেশাসক্ত বাবুদের চারিত্রিক মহিমা অনুভূত হয়। নকশাকার বলেছেন, 'বাটীতে গুণপুরুষ পুরুষগণ কেহই নাই, বুড়ো বুড়ো কর্তাপক্ষেরা নস্যের ডিপে ট্যাঁকে গুঁজে গাঁজার আড্ডায় দিব্য মজা মারচেন, মধ্যে মধ্যে গান হচ্চে,... হাসির, কাশীর, হাত্তালির এবং নাচনীর হেঙ্গামাতে মেদিনী কেঁপে উট্চে। কোথাও বা বাটীর আদবুড় কুলচূড়রা তোড়যোড় যুড়ে পাখি, মার্চেন, চক্ষু যেন কোঠরের ভিতর ঢুকে যাচ্চে, গায়ের শিরগুলো সব যেন ভেসে উঠছে, হাত পাগুলো ছিনে মেরে গেছে, উদরী রোগের মতন কেবল পেটটা মোটা হয়েছে, সর্ব্বদাই চোক বুজে ঝিমুচ্চেন কাছে কোন মনুষ্য এলে চেয়ে দেখেন না পাছে নেশা ছুটে যায়। ছোক্‌রা দলেরা সন্ধ্যা না হোতে হোতেই বাটী হোতে বেরিয়ে গিয়ে কারণ নিয়ে মেতেচেন। যে বাটীর পুরুষদিগের এইরূপ চরিত্র হয়, তাহাদিগের বাটীর স্ত্রীলোকেরা যে দুশ্চরিত্রা হইবেক তাহার আর সন্দেহ কি?'[১২১] নেশার দাস বাবুদের চরিত্রশৈথিল্য এবং পারিবারিক ক্ষেত্রে অমনোযোগিতা যে বহু নারীর 'মন্দ'জীবন গ্রহণ করার কারণ, একথা স্পষ্ট বলেছেন ভোলানাথ। নারীর কুলত্যাগকে সমর্থন না করেও তাঁদের কুলত্যাগের কারণ হিসাবে বাবুদের চারিত্রিক ত্রুটিকে দায়ী করে লেখক বাবুদের সম্পর্কে সমকালের দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার করে দেন। আলোচ্য কাহিনির লম্পট কর্তাবাবুটির মতো অনেকেই নেশাগ্রস্ত বাবুর দুর্বলতার সুযোগেই নিজের নিজের লোভ-লালসা পূরণ করার সুযোগ পেতেন।

কর্তাবাবুটি অবশ্য এরপর দুরারোগ্য ব্যাধিতে পীড়িত হয়ে কয়েক মাসের পুত্রসন্তান, অল্পবয়স্কা স্ত্রী ইত্যাদি রেখে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর বিশাল বৈভব উলইপত্র সইসাবুদ করে একজিকিউটর বাবুকে দিয়ে গেলেন, 'বয়ঃপ্রাপ্ত' হলে তাঁর পুত্ররত্নটিকে ওই সম্পত্তি হিসাবমতো বুঝিয়ে দেওয়ার কড়ারে। এই নাবালক পুত্রটিই হচ্ছেন দ্বিতীয় বা কেন্দ্রিয় বাহিনীর প্রধান চরিত্র, নববাবু গুণচন্দ্র। নববাবু গুণচন্দ্র কিছু বড়ো হলে তাঁর শিক্ষার জন্য গুরুমশাই নিযুক্ত করা হয়। তবে হাতেখড়ির সময় থেকেই পড়াশোনার প্রতি নববাবুর তেমন আগ্রহ দেখা যায়নি। গুরুমশাই নিযুক্ত হলে তিনি লেখাপড়ার ভয়ে চাকরদের কাছে লুকিয়ে থাকতেন। মাঝেমধ্যে পড়াশোনায় বসতেন কিংবা পড়াশোনার ছলে গল্প শুনেই কাটিয়ে দিতেন। দশ বছর বয়স হলে গুরুমশাইয়ের শিক্ষায় 'দশুকে পর্যন্ত পাঠশালার বিদ্যা' হল। অতঃপর ইংরেজি পড়ে 'টুং টাং কর্মের উপযুক্ত' করে তুলতে একজিকিউটরবাবু গুণচন্দ্রকে কালেজে ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু গুণচন্দ্র 'স্কুল যমালয় হতেও ভয়ঙ্কর, পণ্ডিত ও মাস্টরদিগকে বাগ বিবেচনা কোত্তে লাগলেন।' লেখাপড়ায় তাঁর মন ছিল না। টিফিনের ছুটি হলেও প্রায়ই গুণচন্দ্র স্কুল পালাতেন। গুণচন্দ্রের শিক্ষার নমুনা তুলে ধরেন নকশাকার : 'দিবসে কালেজে কতকগুলো বদমাইসী বাহাত্তুরে বালকদিগের সহিত মিশিয়া মালীর ঘরে একটার সময়ে তামাক ও চরসের শ্রাদ্ধ কোত্তেন, এবং গোলদীঘির মাঠে ফড়িং ধোরে খ্যালা কোরে বেড়াতেন। কোন দিন বা স্কুলে যাই বোলে ইয়ারদিগের বাটীতে গিয়া ইয়ার্কি দিতেন। স্কুল থেকে বাড়িতে এসে পুরাতন চাকরদিগের নিকটে বোয়ে যাবার গল্প শুনতেন। পেট থেকে পোড়েই কেউ গবেট শ্রাদ্ধে যায় না, দেখতে শুনতে ক্রমে ক্রমে ও কর্ম্ম হয়। কয়েকখানা কদর্য্য ভাষার বই পোড়ে, একটু রসবোধ হোতেই একরকম বিদ্বান্ হোলেন। সংস্কারের মধ্যে জেঠামটী খুব বেড়ে উঠলো।'[১২২]

গুণচন্দ্র 'জ্যেঠা' হয়ে উঠতেই 'ভিটেতে ঘুঘু চরাবার উপযুক্ত' কতগুলি ইয়ার এসে জুটলো এবং এইসব মোসাহেবদের সহবাসে তিনি অচিরেই 'বিলক্ষণ কৌতুক মোদী হোয়ে পোড়লেন।' প্রথমে একটি ইংরেজি ক্লাব স্থাপন করা হল। কিন্তু বাবুও যেমন, তাঁর মোসাহেবরাও তেমনি শিক্ষিত। অতএব কয়েক বার কয়েক বিষয়ের 'এসে' নিয়ে নাজেহাল হয়ে শেষপর্যন্ত সেই ইংরেজি ক্লাবের মেম্বারদের নিয়ে একটি বঙ্গসমাজ স্থাপন করলেন। দুই এক জন ন্যায়বিচারে দক্ষ পণ্ডিত অধ্যাপককে বেতন দিয়ে রাখলেন। নিজে স্বয়ং সম্পাদকের আসনে বসলেন। প্রতিটি 'সমাজে' অর্থাৎ সভায় নতুন নতুন প্রবন্ধ পাঠ এবং তৎসম্পর্কিত তর্ক-বিতর্ক শেষ হয়ে গেলেও সমাজ ভঙ্গ হয় না। ধনাঢ্য বলে নববাবুর সভায় ক্রমেই লোকজন সভ্য হয়ে দেখা দিতে লাগলেন এবং 'যাহারা সকল খোর, যাহাদিগের অসভ্যতার ধ্বজা উড়িতেছে তাহারাও সমাজের অধ্যক্ষ হোলেন।'[১২৩] কালীপ্রসন্ন তাঁর বাড়িতে প্রথমে একটি Debating Club স্থাপন করেন। কৃষ্ণদাস পাল, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য এই সভার সভ্য ছিলেন। পরে এটি 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' হিসাবে বঙ্গসাহিত্যের সেবামূলক কার্যে ব্রতী হয়। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য জানিয়েছেন : 'কালী সিংহ সভার নাম দিয়াছিলেন "বিদ্যোৎসাহিনী সভা"; দুষ্ট লোকে তাহার নামকরণ করিল "মদ্যোৎসাহিনী সভা"। তিনি সভার patron গোছ ছিলেন। কখনো কোনও প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন কিনা মনে পড়ে না। মধ্যে মধ্যে সভ্যদিগের ভোজনাদির ব্যবস্থা হইত; আমি কিন্তু কখনও আহারাদিতে যোগদান করি নাই।'[১২৪] সেকালে শিক্ষিত-অল্পশিক্ষিত সকল 'ভদ্রলোক'বাবুরই অন্যতম 'প্রেজুডিস' (Prejudice) ছিল, সভা-সমিতি স্থাপন, সংবাদপত্রের সম্পাদক হওয়া, দেশহিতৈষণার নানান সম্ভব-অসম্ভব পরিকল্পনা গ্রহণ, এইসব। কালীপ্রসন্ন অপিচ আমাদের আলোচিত নব্যবাবু গুণচন্দ্রও সেই 'প্রেজুডিসে'র কারণেই সম্ভবত অল্পশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েই সভা-সমিতি ও আনুষঙ্গিক কাজকর্মের প্রতি উৎসাহিত হয়েছে। যদিও নববাবুদের এই স্বভাবের প্রতি লেখক কটাক্ষ করে বলেছেন : 'যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলে নব্যবাবুরা যেন একটু মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠেন, তখন তাহাদিগের বিদ্যালোচনার প্রতি এক রকম স্বতন্ত্র অন্তঃকরণ হোয়ে উঠে। নিত্য নিত্য স্থানে স্থানে সমাজ স্থাপন, দাতব্য বিদ্যালয়ের আনুকূল্য করা, ছাত্রদিগকে পুস্তকাদি বিতরণ, যোগ্য ছাত্রগণকে ছাত্রবৃত্তী ও স্বর্ণ রজত নির্ম্মিত পদক প্রভৃতি পুরস্কার প্রদান, অবৈতনিক শিক্ষক পদ গ্রহণ ও বিদ্যালয় মাত্রেরই তত্ত্বাবধায়ক হইয়া এককালে দেশের দুর্ভাগ্যকে দূর করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু অল্প দিবসের মধ্যে তাহা অলীক কুসুমের ন্যায় সুখাইয়া যায়।'[১২৫] নব্যবাবু গুণচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং আরও অনেক নব্যবাবুকে এখানে ব্যক্তিগত অসূয়ার কারণে একাকার করে ফেলা হয়েছে। যদিও শেষদিন পর্যন্ত চারিত্রিক নানাবিধ ত্রুটি-দুর্বলতা সত্ত্বেও কালীপ্রসন্নর দেশহিতৈষণা ও পরোপকার-প্রচেষ্টা সমভাবে জাগরূক ছিল।[১২৬] বর্তমান নকশার গুণচন্দ্র মাতৃভাষার উন্নতি এবং 'আমোদে'র জন্য সভার পক্ষ থেকে বাংলা নাট্যাভিনয়ের উদ্‌যোগ করেন। 'নাটকের দ্বারা দেশাচার সংশোধন' করাই ঘোষিত লক্ষ্য ছিল, কিন্তু বলা বাহুল্য অশ্লীল আমোদ ছাড়া আর কিছু হয়নি।

ইতিমধ্যে মোসাহেবরা নব্যবাবুকে 'ওয়াইন্' সম্পর্কে উৎসাহিত করে তোলে এবং তাদের মুখ থেকেই জানা যায়, 'রাজার শাসনে যথেচ্ছ আবগারি বিক্রির উপর যেমন নিষেধাজ্ঞা আছে, তেমনি নিয়মশৈথিল্যের কারণে 'কতকগুলির গৃহস্থগোচ ভদ্রলোকের ছেলেরা যে মাতাল হয়ে "উটেচেন" তাও স্বীকার্য। প্রথম দিন মায়ের কাছ থেকে কোনোক্রমে দশ টাকা জোগাড় করে মদ আনানো হল, পরে মোসাহেবদের পরামর্শে দোকানে খাতা খোলা হল। মোসাহেবদের মধ্যে বোসজার উৎসাহ সবচেয়ে বেশী।

তিনি নিজেই একজন বড়োমানুষের ছেলে ছিলেন। কিন্তু হঠাৎবাবু হয়ে মদেই সর্বস্বান্ত হন, যদিও পরের পয়সায় ''ফোতো নবাবী'' তাঁর এখনও যায়নি। সুরাপান বিষয়ে নব্যবাবু নিজে প্রথমে নিরুৎসাহী ছিলেন, কিন্তু মোসাহেবরা শাস্ত্রের নানা স্বকপোলকল্পিত বচন উদ্ধার করে, রাজার শাসনে ''রাজপুরুষদিগের সুরা অত্যন্ত আদরণীয়া'' বলে বাবুকে উৎসাহিত করলে বাবু ক্রমে সুরার দাস হয়ে পড়লেন।'

সুরাসক্ত গুণচন্দ্রকে অধঃপতনের আরেকটি পথ দেখালেন 'ফোতোবাবু' বোসজা। তাঁর মতে, নির্ধন ব্যক্তি সুরাপান করলে সমাজে নিন্দনীয় বলে গণ্য হয়। কিন্তু, অর্থবান বাবুরা মাতাল হলে এবং রক্ষিতা পুষলে কোনো দোষ হয় না। তাঁর কথায় : 'মদ্যপান এবং বেশ্যাগমন এ দু'টী দোষের কাজ বটে; কিন্তু আজকাল আর আর কত লোক যে কত দোষের কাজ কোচ্চে, তার চেয়ে সুরাপান এবং বেশ্যাগমন নিন্দার কার্য্য নহে।'[১২৭] নকশাকারের মতে অবশ্য প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত বাবুরা কখনো মদ ও মেয়েমানুষের দাসত্ব করেন না। কিন্তু অর্ধশিক্ষিত বাবুরাই 'অবিদ্যাবশত কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ এবং মাৎসর্য্যের অধীন হয়'। চিরকাল তাঁদের সমানভাবে যাবে এই ধারণায় তাঁরা যথাসর্বস্ব এমনকী 'আয়ের অতিরিক্ত ব্যয়' করেন মদ ও মেয়েমানুষের নেশায়। নকশার মতে, 'স্নানযাত্রা দ্বাদশ গোপাল কালীঘাট ও উদ্যান ভ্রমণ প্রভৃতি দিন্ দিন্ একটী একটী নূতন নূতন আমোদ, নিত্য নিত্য সুরার মহোৎসব, মধ্যে মধ্যে অবিদ্যার নূতন নূতন অলঙ্কার, বেশভূষা ও অনিয়মিত নিত্য ব্যয় করিয়া বিপুল বিভব অল্পদিবসের মধ্যে ব্যয় করিয়া ফেলে।'[১২৮] সমাজে এই দু'টি নেশা বাবুদের হাত ধরে ক্রমশ এমন সর্বগ্রাসী হয়েছে যে নকশাকারের মতে, 'বেশ্যা এবং পানদোষে আমারদিগের যে এদেশ এককালে যেতে বোসেছে, এমত পল্লী দেখিনে, যেখানে বেশ্যা নাই এবং এমত বেশ্যালয় নাই, সেস্থলে সুরার ব্যাপার না হয়।'[১২৯] এই দু'টি নেশায় আসক্ত মানুষেরা হল —

ক. ধনী, বংশকৌলীন্য ও অর্থকৌলীন্যযুক্ত অনেক রাজা, আমীর-ওমরাহ্ এবং 'হঠাৎ নবাব';

খ. সাধারণ 'অল্পায়ী' বাবু যাঁদের পরিবারে যথেষ্ট অভাব আছে, কিন্তু তাঁদেরও 'একটি রাঁঢ় ও দৈনিক সুরাসেবনে'র শখ পুরোমাত্রায়;

গ. বিদেশি ব্যবসায়ীর গোমস্তা; এঁরাও বাবুগিরি করে বেড়ান সমস্ত রাত;

ঘ. অর্ধশিক্ষিত 'অল্পায়ী' কিন্তু লজ্জা-সম্ভ্রমহীন কুলচন্দ্র বাবুরা;

ঙ. সর্বোপরি রয়েছেন, 'কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ইংরাজী লেখাপড়া শিখেচেন, এবং যাহার যেমন বিদ্যা, তিনি উপার্জ্জনও তেমনি কোচ্চেন, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালির চেলে আর চলেন না, কোঁচা কাচা দিয়ে কাপড় পরা প্রায় ছেড়ে দিয়েচেন, ঘাড়ের চুল কম কোরে কাটেন'[১৩০] এমন 'বাবু'। এঁরা স্বাভাবিক বাঙালি খাবারের পরিবর্তে হোটেলের সাহেবি খানা পছন্দ করেন, প্রচলিত হিন্দুধর্মের পরিবর্তে ব্রাহ্ম প্রভৃতি অন্যান্য ধর্মে তাঁদের উৎসাহ, কেউ-বা নাস্তিক। নকশাকার এই দলে ফেলেছেন ইয়ং বেঙ্গল, ব্রাহ্মবাবু প্রমুখদের। এঁরা শিক্ষিত হয়েও মদ ও বেশ্যার প্রতি আসক্তি ত্যাগ করতে পারেননি। যদিও তাঁর মতে, 'পেনটুলেন পরলে, ঘাড়ের চুল কাটলে, হোটেলীখানা খেলে ও সুরাপান কোল্লেই দেশাচার সংশোধন হইবেক না।... কেবল ইংরাজী বিদ্যা অধ্যয়ন করিলেই দেশাচার সংশোধন হইবেক এমত জোর বলিতে পারা যায় না। সুরা এবং বেশ্যা এই দুইটীই দেশের দোষের কারণ, যতদিবস পর্য্যন্ত এ দুটীর প্রতিকার না হোচ্চে ততদিন পর্যন্ত এ দেশও দোষের বটে।'[১৩১]

গুণচন্দ্র অবশ্য শিক্ষাদীক্ষার ধার ধারে না। মোসাহেবরা সকলেই কম-বেশি বেশ্যাসক্ত। এর মধ্যে সরকার বাবু বিবিজান নামে এক বেশ্যার কথা বলেছেন, যে রূপে-গুণে অদ্বিতীয় এবং 'ঝুমুর' গায়। নব্যবাবু

উৎসাহিত হয়ে উঠলে, মোসাহেব লাহিড়ী বলেছেন যে বিবিজানের সঙ্গে কর্তাবাবুর প্রণয় ছিল। নব্যবাবু গুণচন্দ্র লাহুড়ির কথা উড়িয়ে দিয়ে নিজের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছে—

এক. 'বাজারে এক দোকানের জিনিস কি বাপবেটায় কিনে খেতে পারে না?'[১৩২]

দুই. কর্তাবাবু জীবিত থাকলেও কিছু চক্ষুলজ্জা ছিল, তিনি যেহেতু এখন বেঁচে নেই, অতএব একই বেশ্যার কাছে গমনে কোনো দোষ নেই।

লাম্পট্য ও বেশ্যাবাজির স্বপক্ষে নব্যবাবুর এই যুক্তি যতই ঘৃণ্য ও কদর্য হোক, সেকালে বিষয়টা খুব সাধারণ লক্ষণ ছিল। আমরা ইতিপূর্বে ছড়া, পাঁচালি প্রভৃতি অংশে এ প্রসঙ্গে কবিয়ালদের বক্তব্য দেখেছি। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এই প্রসঙ্গে জানিয়েছে,[১৩২] 'এই কলিকাতা নগরের প্রতি পল্লীতে এ প্রকার সমূহ ব্যক্তির অধিষ্ঠান আছে, যাহারা ক্রমাগত দলবদ্ধ হইয়া বিবিধ কুকর্ম্মসূচক আমোদেই লিপ্ত থাকে।... বিশেষত বালকেরা যখন শাসনকর্তা পিতা-ভ্রাতা প্রভৃতিকে অহরহ দুষ্কর্ম্ম পঙ্কে পতিত হইতে দেখে, তখন আপনারা তৎপথ অবলম্বন করিতে কেন শঙ্কা করিবে? ইহা কি শতস্থানে প্রত্যক্ষ হয় নাই, যে পিতার রক্ষিতা গণিকার গৃহে অতি বালকপুত্রাদি গমনাগমন করিতেছে?' অতএব নব্যবাবু গুণচন্দ্র যে তাঁর স্বপক্ষে যুক্তি দেবেন, তাতে আর আশ্চর্য কী!

নকশাকার অবশ্য এইক্ষেত্রে গণিকা বিবিজানকে বাবুদের তুলনায় 'সুসভ্য' ও সুসংস্কৃত বলে দেখান। গুণচন্দ্রের পরিচয় পেয়ে কর্তার ছেলে বলে তিনি প্রথম মাতৃবৎ আচরণ করেন। পরে বাবুসহ মোসাহেবরা অন্য আমোদের কথা পাড়লে বিবিজান তা মেনে না নিয়ে তাঁদের চলে যেতে বলেন। কারণ— যদিও তিনি বেশ্যা, তথাপি এ কাজ তাঁর রীতিবিরুদ্ধ। এতে তাঁর মুখে সকলে 'চুন কালী দিবে'। অতএব গুণচন্দ্রকে ক্রুদ্ধ হয়ে ফিরে আসতে হয়। তথাকথিত রূপোপজীবীকে এহেন মহৎ চরিত্র হিসাবে এঁকে লেখক বাবুদের ধর্মজ্ঞানহীন, নীতি নৈতিকতাবিহীন অধঃপতনের চিত্রটিকেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যে সামান্য সংস্কার, সুসভ্যতা তথাকথিত বারাঙ্গনাদের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়, তা গুণচন্দ্রের মতো নব্যবাবুদের মধ্যে অনুপস্থিত। তৃতীয় কাহিনিতেও চন্নবিলাসীর পালিতা মা বেশ্যা রামমণিকে পাই, যে জাতে বাইজি ছিল, স্বামীর মৃত্যু হলে 'বাজারে' এসে পড়ে, কিন্তু কালীঘাটে তীর্থদর্শন করতে গিয়ে বাবুদের অবাধ মদ্যপান ও প্রকাশ্য 'ঢলাঢলি' দেখে ভর্ৎসনা না করে পারেনি। বস্তুত, বেশ্যাদেরকে মানবিকবোধ সম্পন্ন হিসাবে দেখিয়ে বাবুদের অ-সভ্য, অ-সংস্কৃত চরিত্রের হীনতা প্রদর্শনই লেখকের উদ্দীষ্ট। এ জাতীয় বেশ্যাচরিত্রে উত্তরকালের শরৎচন্দ্রের পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

বিবিজান কর্তৃক বিতাড়িত নব্যবাবু সমাজে ফিরে এসে মদ্যপান সহ বেশ্যাগমনের ভালো-মন্দ দিক নিয়ে আলোচনা, তর্কবিতর্ক করেছেন। প্রসঙ্গত কর্তাবাবুর কথাও এসেছে। সরকারবাবু জানিয়েছেন, কর্তাবাবুকে কেউ মদ্যপান ও বেশ্যালয়ে যাবার কুফলের কথা বললে তিনি উক্ত ব্যক্তির প্রতি রুষ্ট হতেন। সরকারবাবুর মতে, 'আজকালের প্রধান সভাই বেশ্যালয়',[১৩৩] ইতিমধ্যে বামুন পণ্ডিত 'বেশ্যাগমন'কে 'কুপ্রবৃত্তি' বলে এ বিষয়ে তাঁর অনীহা প্রকাশ করলে গুণচন্দ্র রুষ্ট হন এবং জোর করে তাঁর টিকি কেটে এবং হোটেলের নিষিদ্ধ কাবাব জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করে তাঁকে অপদস্থ করেন। এ প্রসঙ্গেও কালীপ্রসন্নের অপযশ ছিল।[১৩৪] রক্ষণশীলদের পক্ষ থেকে ভোলানাথ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এই লাঞ্ছনাকে বাবু কর্তৃক সমস্ত উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণসমাজের লাঞ্ছনা বলেই দেখাতে চেয়েছেন। যদিও, যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কুট্‌নীবৃত্তি করে গৃহস্থ মেয়েদের বেশ্যাগৃহের পথ দেখান, তিনি কতটা নিষ্পাপ-ধার্মিক-নৈতিকতাযুক্ত হতে পারেন, সে প্রসঙ্গে ভোলানাথ নীরব।

গুণচন্দ্রের সমাজের নতুন সভ্য যশচন্দ্র বাবু আদতে গুণচন্দ্রের 'ক্ল্যাস ফ্রেন্ড'। তিনিও ধনী ব্যক্তির পুত্র এবং সংস্কারকে তুচ্ছ করা মানুষ। তাঁর মতে, বাঙালি হিন্দুসমাজের জাত-পাত, বর্ণাশ্রম প্রথাই যত নষ্টের মূল। সেইসঙ্গে রয়েছে কুসংস্কার। শহরে বসে যবনী গমন, হোটেলের খানা ভক্ষণ, বাসি হ্যাম নিয়ে কাড়াকাড়ির পর এক হুঁকোতে বন্ধু-স্বজনের সঙ্গে তামাক খেলেও জাত যায় না, অথচ 'বিলাত গেলেই সব গেলো।' পণ্ডিতমশায় তাঁর কথার প্রতিবাদ করে, ব্রাহ্মবাবুদের প্রসঙ্গে নানান অনাচারের কথা তুলেছেন বলেই যশচন্দ্র বাবুকে উৎসাহিত করেন তাঁকে 'পানিশ' করার জন্য। তারই ফলে পণ্ডিতমশাইয়ের এই লাঞ্ছনা। যশচন্দ্র সত্য, শিক্ষিত মানুষ। বাবুর রক্ষিতা থাকলে, তার কাছে গিয়ে দু'দণ্ড আমোদ-আহ্লাদ করতে পারেন, 'নতুবা পবলিক্ জায়গায় যেতে তিনি বড় লাইক' করেন না। মুখে মেয়েমানুষের বাড়ি যাওয়া অপছন্দ করেন বললেও, চক্রবর্তী মশাই যখন নতুন 'সুশ্রী ডংঞ্জের মেয়ে মানুষে'র কথা বলেন, তখন তাঁর আর তর সয় না। শিক্ষিতবাবুদের এই মৌখিক আদর্শহীনতার ভণ্ডামি এবং চারিত্রিক অন্তঃসারশূন্যতা প্রকট হয়ে যায় এই উদাহরণ থেকে।

যশচন্দ্র তাঁর 'ক্ল্যাস ফ্রেন্ড' গুণচন্দ্রকে হোটেলের 'প্রাইভেট ডাইনীং রুমে' বসে আহারাদির ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন; বলেছেন, 'আজকাল ও খাওয়াটি সেকালের লোকের কাছে মান খাওয়া বটে, কিন্তু একালে অনেক লোকের কাছে মানের খাওয়া হয়েচে।'[১৩৫] ভেতরের শিক্ষাদীক্ষা অপেক্ষা তার বাহ্য দেখানেপনাই যে নতুন কালের তথাকথিত 'নব্যবাবুদের' লক্ষণ, তা-ও স্পষ্ট হয়ে যায় যশচন্দ্রের কথায়। জানতে পারা যায়, এমন এক বাবুর কথা যিনি ইংরেজি না জেনেও পাঁচ ইয়ারের সঙ্গে মিলে 'ইংরাজী ধরণে চোল্‌তেন'। চেয়ার-টেবিলে চা-পান, 'চুরুট, জগে করা জল, ডিকনটারে ব্রাণ্ডি কাঁচের গ্লাস, সোলার ঢাক্‌নি, সকলই ইংরাজী কেতার সরঞ্জাম'। বাবু ইংরেজি না জানলেও গ্লাসকেস ভর্তি ইংরেজি বই, মেঝেতেও কিছু লুটানো থাকত, ইংরেজি খবরের কাগজগুলি সব রাখতেন, যদিও অন্যে না বুঝিয়ে দিলে 'বাবু আপনার চোকে নিউশপেপারের লাইনগুলি কেবল কাশি বোধ কত্তেন।'[১৩৬] সেই বাবুও 'বাবুত্ব' রাখার জন্য হোটেলে খেতে যেতেন। যাঁরা এককালে 'নীচু চালে' চলে সাহেবের কুঠিতে মুতসুদ্দিগিরি কী দেওয়ানি করেছেন, তাঁদের ছেলেদের পোশাক-আশাক, হাবভাব, আদবকায়দা সবই 'উঁচুচেলে'। এমনকী আগেকার মতো বড়োমানুষের ছেলে হলেই এখন মূর্খ হয় না, অনেকেই শিক্ষিত হয়েও সাহেবি চালে চলেন, মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তিতে বিলক্ষণ রুচি আছে, বেশ্যাদের গৃহের পার্টিতে এক রাত্রে বাবু ও তাঁর মোসাহেবরা 'দশ বারোটি বোতল এম্‌টি' করে ফেলেন। বস্তুত, যশচন্দ্রের বয়ানে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় তথাকথিত কুলীন, অর্থবান, শিক্ষিত, আপাত সভ্যবাবুদের সার্বিক অধঃপতন এবং নৈতিক অবক্ষয়ের চিত্রটিকে বার বার তুলে ধরতে চান। ইতিপূর্বে তিনি 'প্রকৃত শিক্ষা' থাকলে কখনোই বাবুরা অধঃপতিত হন না বলে জানিয়েছিলেন আমাদের, অপ্রত্যক্ষভাবে সমকালীন পাশ্চাত্য শিক্ষার সমালোচনা করে সম্ভবত তিনি বলতে চেয়েছেন যে, প্রচলিত পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বারা কখনোই 'প্রকৃত শিক্ষা' সম্ভব নয়। আর এর ফলেই, আপাত শিক্ষা সত্ত্বেও সমাজে নৈতিক অধঃপতিত শিক্ষিত বাবুর সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোকে'র সার্বিক শিক্ষাসংকটই যে তাঁর রুচিহীনতার কারণ, এই বিশেষ দৃষ্টিকোণের দিকে নকশাকার আমাদের সচেতন করেন।

যশচন্দ্রের মতো বন্ধু এবং বোসজা, সরকারবাবু, লাহুড়ি বাবুদের মতো মোসাহেবের শিক্ষায় অতএব নব্যবাবু গুণচন্দ্র বেশ তৈরি হয়ে উঠলেন। ইতিমধ্যে একজিকিউটর সাবালক গুণচন্দ্রের হাতে তাঁর প্রাপ্য

সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি বুঝিয়ে দিলেন। এবং 'নববাবু বিষয় পেয়ে ''হঠাৎবাবু'' হোয়ে পোড়লেন। হাতটা ভারি দরাজ বোলে সৎকর্ম্মে ও অসৎকর্ম্মে বিস্তর টাকা ব্যয় কোত্তে লাগলেন।'[১৩৭] এভাবে চলে পাঁচ-সাত বৎসরের মধ্যেই 'বাবুআনাতে' সমস্ত বিষয় উড়িয়ে দিলেন। এরপর জায়গা-জমি বন্ধক রেখে ও বিক্রয় করে এবং ধারদেনা করেও কুড়ি-পঁচিশ বৎসর বাবুয়ানা চলল। কিন্তু যিনি একদিন শীতকালে প্রতিদিন নতুন নতুন বারাণসী শাল গায়ে দিতেন, তিনি 'উঁচু চেলে' চলে শেষে কপর্দকশূন্য অবস্থায় ঘোড়ার কম্বল গায়ে দিয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। যদিও এ অবস্থাতেও বেশ্যার শখটি তাঁর যায়নি, ফলে মাঝে মাঝে সিদ্ধেশ্বরীতলা ও নাথের বাগানের বেশ্যাপল্লীগুলিতে তাঁকে দেখা যেত। অবশেষে এইরকম বেশ্যাপল্লীতে ঘুরে বেড়ানোর সময় কুকুরের কামড়ে 'হাইড্রোফোবিয়া' হয়ে বিনা চিকিৎসায় তাঁর মৃত্যুও হয়। ভোলানাথ এখানে মূল কাহিনির নব্যবাবু গুণচন্দ্রকে বাবুয়ানার উপযুক্ত শাস্তিবিধান করতে তাঁর যতদূর দুর্দশা হয়, ততদূর দেখিয়েছেন। রক্ষণশীলদের পক্ষ থেকে নব্যবাবু গুণচন্দ্র অপিচ হুতোমকে হীনরূপে চিত্রিত করার এই প্রচেষ্টা কোথাও কোথাও উচ্চকিত স্পষ্ট হয়ে কাহিনির গুণকে নষ্ট করলেও এবং হুবহু বাস্তবকে অনুসরণ করে 'হুতোমে'র চরিত্র চিত্রিত না হলেও, সাধারণভাবে গুণচন্দ্রের মতো বাবু উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের পরেও যে সুলভ ছিল, এই সত্যকে অস্বীকার করা যায় না।

গুণচন্দ্রের প্রধান কাহিনি প্রসঙ্গেই আখ্যানধর্মী এই নকশায় এসেছে চন্ননবিলাসী বাবু, তাঁর রক্ষিতা চন্ননবিলাসী এবং চন্ননবিলাসীর পালিতা মা রামমণির কালীঘাট ভ্রমণের বৃত্তান্ত। সেই প্রসঙ্গে বাবুদের বেশ্যাবাজির মধ্যে যে অশিক্ষা এবং অবিমৃষ্যকারিতা আছে, তার কথাও। চন্ননবিলাসীর মা রামমণি বিধবা, জাতে বাইজির মেয়ে। দশ আনা মাইনেতে বাবুদের বাড়ি ঝি-গিরি করত। তারপর কোনো বাবুর নজরে পড়ে সে রক্ষিতা হয়। তখন থেকেই 'পোঁটাচুন্নি' রামমণি হয়ে পড়ে। তারপর বাবু তাকে খানকতক গয়না দিয়ে সাজিয়ে দেওয়ায় সে 'রামমণি বিবি' হয়ে ওঠে। অল্পদিনের মধ্যেই বাবুর কৃপায় তার নিজের বাড়ি, দু'তিন সেট গয়না ও 'এলবাক পোষাক' হয়ে 'পাঁচটি বড় বড় মেয়েমানুষদের মধ্যে গণ্য হোলো।'[১৩৭] রামমণির কাছে কর্মরত চাকরানি ভূতির মেয়ে হল চন্ননবিলাসী। ভূতি মরবার আগে চন্ননবিলাসীকে রামমণির হাতে সমর্পণ করে এবং সুশ্রী চন্ননবিলাসী রামমণির শিক্ষা-সহবতে একজন প্রধান বেশ্যা হয়ে দাঁড়ায়।

চন্নবিলাসবাবু চন্ননবিলাসীকে নিয়ে কালীঘাট যাবার সময় মোসাহেব-ইয়ার এবং চন্ননবিলাসীর মা ও সই পাতানো আর বেশ্যাদের জন্য মোট পঁচিশটি ভালো গাড়ি ভাড়া করেন, নইলে তাঁর 'মান' থাকে না। নকশাকার মন্তব্য করেছেন, 'বাবুরা যখন বাইরে বাবুয়ানা কোত্তে বেরোন, তখন কোনো বিষয়ে ''প্যাচপাঁও'' হন না, কিসে ঘোষনাম হবে তাই চান।'[১৩৮] কালীঘাটে গিয়ে বাড়িভাড়া করে আর আর বিবিদের 'রিসিভ' করে মোসাহেবরা ভিতরে নিয়ে গেলেন। বাবু ও বিবি সবশেষে পৌঁছোলেন। ভাড়াবাড়িতে ঢুকে বিবির সঙ্গে সঙ্গে বাবুও বিবির মা অর্থাৎ রামমণি এসেছেন কিনা সংবাদ নেন। নকশাকারের তির্যক মন্তব্য, 'আজকাল অনেক বাবুতে রাঁড়ের মাকে মা বোলে ডাকে, কেহ কেহ গিন্নীও বলে; গিন্নী বলাতে বাবুর অপযশ হয়, যেহেতু শাশুড়ীকে কেহই গিন্নি বলে না।'[১৩৯] কালীঘাট পৌঁছে 'মাতৃদর্শনে'র পূর্বেই বাবু ব্র্যান্ডির বোতল খুলে চন্ননবিলাসীকে খেতে বললে, চন্ননবিলাসী ক্রুদ্ধ হয়েছে;— কারণ : এক. আগে তার সঙ্গে আসা ফ্রেন্ডদের তথা সইদের মদ দিতে হয়, সেটাই সহবত; দুই. ধুলো পায়ে 'মাতৃদর্শন' করে তবে মদ খেতে হয়। অবশেষে বাবু রক্ষিতার মন রাখার জন্য তাই স্বীকার করেন। তবে ঠাকুর-দেবতায় তাঁর বিশেষ ভক্তি নেই বলে কোনোমতে চন্ননবিলাসীর পেড়াপিড়িতে একটি সিকি দিয়ে প্রণাম করলেন। যদিও তাঁর কালীঘাটের খরচ 'আড়াই শ টাকার উপর বরাদ্দ হয়েচে।'

অতঃপর ফিরে এসে মদ, ভাজা মাছ নিয়ে বাবু, বিবি, মোসাহেবরা সবাই মেতে উঠেছেন। রামমণি যদিও বেশ্যা, তবুও নকশাকারের ভাষায় 'সেকেলে মেয়েমানুষ, অনেক ভদ্র লোকের সহবত পেয়েছে',[১৪০] ফলে সে এই তীর্থস্থানে এসে লাগামছাড়া মদ্যপান ও বেলেল্লাপনা সমর্থন করতে পারেনি। যদিও তার অন্য গুণগুলি যথাযথ আছে। চন্ননবিলাসীকে রামমণি বাবুর কাছ থেকে ভালোমতো কিছু গুছিয়ে নিতে, কারণ, 'উহারা পরের ছেলে, আজ আছে কাল নাই; ওদের ঠেঁয়ে নগদ টাকা, এলবাক্ পোষাগ, এক অক্ষর (ণ) আন বিদ্যার কাছে পরাজয় হন।... চুরিই করুক, শিঁদই কাটুক, কিম্বা মেগের গয়নাই বেচুক, তাকে তা আন্‌তেই হবে।'[১৪১] এভাবে কত বড়ো বড়ো ধনীবাবুকে রামমণিকে বেশ্যার জন্য সর্বস্বান্ত হতে দেখেছে। রামমণির কথায় বেশ্যাসক্ত বাবুসমাজের বিচারবিবেচনাহীন, ইন্দ্রিয়াসক্ত, অপরিণামদর্শী চেহারার ছবি ফুটে উঠেছে। চন্ননবিলাসীও সে কথা জানে বলেই 'আগড়ম বাগড়ম পট-ফটনা নিয়ে 'পঞ্চাশ-ষাট টাকার পিতল, কাঁসার জিনিস কিনে ফিরেছে। বেশ্যাদের প্রতি বাবুদের এত খরচ, অথচ গরিব-দরিদ্র ভিক্ষুকেরা চাইলে একটি পয়সাও তাঁরা অপব্যয় করেন না দেখা যায়। ফলে কালীঘাটের কাঙালিদের বাবুর কাছ থেকে শুধু হাতেই ফিরতে হয়।

বাবুরা সবসময় আমোদ-আহ্লাদের ছুতো খোঁজে। অতএব বড়োদিনের মতো সাহেবিপাড়ার উৎসবেও চন্ননবিলাসবাবুর মতো বাবুদের সামিল হবার আগ্রহ জাগে। আগে বাবুরা বড়োদিনে সাহেবদের বাড়িতে ভেট পাঠাতেন মূলত শাসকশ্রেণিকে খুশি রাখবার জন্য। কিন্তু ক্রমে বাহ্য সাহেবিয়ানার ভড়ং দেখাতে শিক্ষিত বাঙালিদের কাছে বড়োদিন 'বাঙ্গালীদেরও পরবের টেক্কা হোয়েচে।'[১৪২] ফলে, মোসাহেবের পঁচিশ টাকার ফর্দ বাবুর না-পসন্দ হয়েছে। বাবু বলেছেন, 'আপনাদেরই কেবল পেটগুলির ফর্দ্দ দিলে, আপনারা কবেই না খাওয়া যায়? বড়দিন! দশজন মানুষকে নেমন্তন্ন কোত্তে হবে, তাদের মেয়েমানুষ আছে এবং আমাদের আলাপী মেয়েমানুষও সব রোয়েচে, সকলকে না বোলে চুপিচুপি ঘরে ঘরে বড়দিন কোল্লে শেষে আর কি লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারা যাবে?'[১৪৩] অতএব লোকের কাছে মুখ দেখানোর জন্য তথা বাবুর মান বজায় রাখতে বাবুর বাগানবাড়িতে বড়োদিনের জন্য বিশাল আয়োজন করা হয়।

চন্ননবিলাসবাবুর বাবুয়ানার গল্পে নতুনত্ব কিছু নেই, নতুনত্ব যা তা হল, চন্ননবিলাসবাবুর বাবুয়ানা দেখে চার-পাঁচজন 'গেরস্ত গোচ বাবু'র 'ক্ষেপে' ওঠা এবং ধারকর্জ করে হোক— স্ত্রীর গয়না বাঁধা দিয়ে হোক অর্থ জোগাড় করে মেয়েমানুষ ভাড়া করে বড়োদিনের আনন্দে মেতে ওঠা। বাবুগিরি যে কীভাবে সাধারণ মধ্যশ্রেণির তথাকথিত 'ভদ্রলোক'বাবুদেরকেও প্রভাবিত করে তার কদর্যতার শেকড় চারিয়ে দিয়েছিল এই ঘটনাই তার প্রমাণ। অতএব, পঞ্চাশ টাকা চাঁদায় পেটভাতায় কয়েকজন বেশ্যা জোগাড় করে মোট বারোজন মিলে বাগানবাড়ি ভাড়া করে মধ্যশ্রেণির 'অভাবী' বাবুদেরও বড়োদিনের উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বাবুয়ানার এই সম্প্রসারণ যে ক্রমশ সাধারণ মধ্যশ্রেণির বাবুদেরও অনুকরণীয় চরিত্রধর্মে পরিণত হতে যাচ্ছে, তার এক গভীর তাৎপর্যবাহী ছবি দাখিল করেছেন নকশাকার। হুতোমের 'গুরুদাস গুঁই' এবং ভোলানাথের 'গেরস্ত গোচ বাবু'রা আসলে একই অর্থনৈতিক মানদন্ডে থেকে বাবুবিলাসের স্বপ্ন দেখেছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত হয়েও 'রামলীলা'র ময়দানে হুতোম দেখেছিলেন নির্বিচার সার্বজনীন বাবুত্বের শিউরে ওঠা ছবি, ভোলানাথও বড়োদিনের উৎসব উপলক্ষ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন সার্বজনীন বাবুআনার শখের বিভীষিকাময় রূপ। ধনীবাবুদের সামর্থ্য ছিল। ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি পৌঁছেও : 'কোনদিন বাবু কোন রাঁড়ের মা'র শ্রাদ্ধে হাজার টাকা দিলেন, কোনদিন কোন মোসাহেবের বাপের শ্রাদ্ধে

পাঁচশ টাকা দিলেন, কোনদিন আপনার বাড়ীতে পুজোতেই কত টাকা ব্যয় কোল্লেন, কোনদিন অবিদ্যার বাড়ীর পূজতে হাজার দু'হাজার টাকা গ্যালো। কোনো দিন কোনো মোসাহেবের বাজার দেনার জন্য বাবু হাজার টাকা দিলেন। এই রকম চেলে চোল্‌তে চোল্‌তে বাবুরা স্বয়ং বাজার দেনার দায়ে দায়ী হোয়ে পড়েন। আজ অমুক বাড়ীখানা বাঁদা পোড়লো, আজ অমুক বাগানখানা বাঁদা দিলেন, আজ অমুক তালুকখানা বিকিয়ে গ্যালো।... তবু বদমাইসী কুমন্ত্রিণী মোসাহেবদিগের কুমন্ত্রণার জন্য সে উঁচু চালটী ছাড়তে পাল্লেন না।'[১৪৪] কিন্তু, মোসাহেবের কুমন্ত্রণায় ধনীবাবুর অধঃপতিত হওয়া এবং সর্বস্বান্ত হওয়ার যুক্তি নাহয় মানা যায়; উনিশ শতকের সামান্য বৃত্তিভোগী চাকুরে মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের তো মোসাহেব ছিল না। বিত্তনির্ভর সামর্থ্যও তাঁদের নেই। বড়লোক বাবুর 'বড়দিনের' মোচ্ছবের দিকে তাকিয়ে যে মধ্যশ্রেণি বলে, 'চন্ননবিলাসবাবু আজ বড়দিন উপলক্ষ্যে যে টাকাটা খরচ কোচ্চে, তাহার শিকি টাকা আমরা পেলে স্ত্রীকে পাঁচখানা গয়না দিয়েও স্বপরিবারে এক বচ্ছর সুখে খেতে পারি'[১৪৫], তাঁরাই যখন 'বাবুগিরি'র শখে মনের অতল থেকে তুলে আনেন বিকৃতির অন্ধকারকে, তখন বোঝা যায়, বাবুয়ানাকে আমরা আমাদের চরিত্রধর্মের অন্যতম সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসাবেই মিশিয়ে নিয়েছি। সংস্কৃতায়িত, সুসভ্য বাঙালি আপাত শিক্ষা ও সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে বসেও তাই দেখতে পারে বিলাসী বাবুয়ানার স্বপ্ন। এই সার্বিক অধঃপতনের মুখে দাঁড়িয়েই ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় এবং হুতোম একাকার হয়ে যান।

'আপনার মুখ আপুনি দেখ' উদ্দেশ্যমূলক রচনা। লেখক ভূমিকায় পাদটীকায় স্বয়ং বলেছেন, 'হুতোমপ্যাঁচা মহাশয় দেশাচার সংশোধনার্থে লেখনী ধরিয়াছেন, আমিও সেই বিষয়ে লেখনী ধরিয়াছি।'[১৪৬] কিন্তু, হুতোমের দেখায় যে বহুব্যাপ্তি ছিল, তা ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখায় অনুপস্থিত। প্রথম ও দ্বিতীয় কাহিনির মধ্যে যোগসূত্র থাকলেও, তৃতীয় কাহিনি অর্থাৎ চন্ননবিলাস ও চন্ননবিলাসীর কাহিনি অযথা প্রলম্বিত এবং নিছক বাবু-বিবির অসংযত জীবনের বিস্তৃত বর্ণনা ছাড়া আর কিছু নয়। কাহিনিভিত্তিক নকশায় এই অংশটি আপাতভাবে একটি স্বতন্ত্র কাহিনি হিসাবেই দেখা দেয়। কিন্তু বাবুত্ব প্রসঙ্গে লেখাবার দৃষ্টি নিবদ্ধ মূলত বাবুগিরির দু'টি মূল লক্ষণ— মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালিবাবুরা যে আরও অনেক রূপেই দেখা দিচ্ছেন, শিক্ষাদীক্ষা-সংস্কৃতির আপাত পোশাকে জন্ম নিচ্ছে বিচিত্র বাবুয়ানার ইতিহাস, তার দু'একটি ইঙ্গিত থাকলেও, স্পষ্ট কোনো চিত্র উপস্থাপিত হয়নি। সেদিক থেকে সামাজিক ইতিহাস হিসাবে হুতোমের রচনা যে নির্ভরযোগ্যতায় গৃহীত হয়, 'আপনার মুখ আপুনি দেখ' তার বিশেষ ব্যক্তিনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যমূলকতার কারণেই ইতিহাস হিসাবে তেমন গৃহীত হতে পারে না। তবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও তথাকথিত শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে কিঞ্চিৎ সংকীর্ণ রূপে হলেও বাঙালি যে বাবুত্বের ইতিহাস বহমান রেখেছে, সেই সত্যটি বেশ অনুভব করতে পারা যায় 'আপনার মুখ আপুনি দেখ' থেকে।

'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র চাপান-উতোর হিসাবে রচিত নকশাগুলির বিষয়ের মধ্যে সমধর্মিতা ছিল স্বাভাবিকভাবেই। মূলত মদ্যপানজনিত কুফল, তার দরুন অর্থনাশ এবং লাম্পট্য ছিল এগুলির বিষয়। সাধারণত আখ্যানমূলক এই নকশাগুলির কোনোটিরই তেমন হুতোমী বহুদর্শিতা ছিল না। হুতোমের লক্ষ্য ছিল— তদানীন্তন সমাজ ও সমাজগত বাবুরা, অন্যদিকে বিরুদ্ধপক্ষীয়দের লক্ষ্য ছিল— মূলত হুতোম। ফলে ব্যক্তিনির্ভর হওয়ায় নকশাগুলির আবেদন অনেকখানি সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে সন্দেহ নেই। তবে সমকালে এই চাপান-উতোর সাধারণ পাঠকের মধ্যে তুমুল আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল, সন্দেহ নেই।

অমৃতলাল বসু বলেছেন, ''হুতোম প্যাঁচার নক্সা'' রচনার পর হইতে নাটক বা উপন্যাস সাহিত্যে কে কার জবাব দিল ইহাই সকলে জানিতে চেষ্টা করিত।'[১৪৭] এই ধারাতেই রচিত হয় ক্ষেত্রমোহন ঘোষের 'কাকভুষুণ্ডীর কাহিনী' (১৮৬৫)। নকশার চাপান-উতোর পর্বের এটি একটি দুর্বলতম রচনা। আখ্যানমূলক এই নকশার কেবল প্রথম ভাগ লভ্য। কাহিনি অসমাপ্ত। মফস্সলের জমিদার জয়হরিবাবুকে নিয়ে এ কাহিনির সূচনা। অল্পবয়স থেকেই জয়হরি ইয়ার গোছ বন্ধু ও মোসাহেবদের প্ররোচনায় কীভাবে মদ ও অন্যান্য নেশার দ্রব্য চিনলেন, কীভাবে মাতালসর্বস্ব হলেন, তারই বিস্তৃত বিবরণ আছে। অতঃপর জয়হরির নজর গিয়ে পড়ে গৃহস্থের বউ-মেয়েদের উপর। অতএব কুট্টনী নিয়োগ করে জয়হরি গৃহস্থবধূ ফুঁসলানোর চক্রান্ত করেন, এখানেই প্রথম ভাগের কাহিনি সমাপ্ত। বৈশিষ্ট্য-বর্জিত এই নকশায় মদ ও লাম্পট্যের প্রতি নববাবুদের আসক্তির কথা জানানো হয়েছে, আক্ষেপও করেছেন লেখক, কিন্তু সবদিক দিয়েই বৈশিষ্ট্যহীন এই রচনাটি কলকাতার অন্তঃপাতি মফস্সলেও বাবুয়ানার প্রভাব যে ছড়িয়ে পড়ছে, সেইসঙ্গেই তার বিষময় দিকগুলি প্রভাবিত করছে গ্রাম ও মফস্সলের আপাতত রক্ষণশীল সমাজকে, এটুকু বক্তব্যই তুলে ধরে।

'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র দ্বিতীয় ভাগের 'রেলওয়ে' নামক রচনায় পিতা প্যারীচাঁদ মিত্র এবং শ্বশুর শিবচন্দ্র দেব— উভয়ের প্রতি কটাক্ষপাতে অসহিষ্ণু হয়ে প্যারীচাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র চুনিলাল মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর (জুনিয়ার) রচনা করেন 'কলিকাতার নুকোচুরি' নামক গ্রন্থটি (১৮৬৯)। গ্রন্থটি উৎসর্গীকৃত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়কে। চুনিলালের নিজের কথামতো 'মানস ছিল না যে ছাপা হইবে', তবে তাঁর উৎসাহদাতা ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'বিশেষ উদ্‌যোগে'র ফলে তা প্রকাশিত হয়।[১৪৮] সমালোচকের মতে, 'ভোলানাথ, বোঝা যায় হুতোমের নির্মম প্রত্যাখ্যানের রাগ ভুলতে পারেননি।'[১৪৯] অবশ্য চুনিলালের গ্রন্থভূমিকা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি যখন এই গ্রন্থ রচনা করছেন, তখন হুতোম প্রমুখেরা অস্তমিত প্রায়, 'আমার বাণ বড় আর দরকার হয় না'।[১৫০] প্রায় কর্পদকহীন অবস্থায় মদ্যাসক্ত কালীপ্রসন্নের মৃত্যু হয় ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে, অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলেই, চুনিলাল যখন এই গ্রন্থ রচনা করছেন, তখনই যে হুতোম বেশ অসুস্থ, বোঝা যাচ্ছে। তাও 'বদমায়েসদের আক্কেল গুড়ুম করে দেওয়ার' লক্ষ্যে টেকচাঁদ ঠাকুর (জুনিয়ার) 'কলিকাতার নুকোচুরি' লেখেন।

গ্রন্থটিতে আপাতশিথিল একটি আখ্যানের সূত্রে আর একটি উপআখ্যান এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, কাহিনির সঙ্গে যোগসূত্রহীন আরেকটি আখ্যানের সূত্রে অনেকগুলি বাবু এবং তাঁদের ইয়ারদোস্ত-মোসাহেবদের সঙ্গে পাঠকদের পরিচিতি ঘটে। আখ্যানের কেন্দ্রে রয়েছেন যে বাবুটি, তাঁর নাম পামরলাল মিত্র, 'বড় বোনিয়াদী ঘরের দৌহিত্র সন্তান'। এঁর কাহিনি বর্ণিত হয়েছে গদাধর ঘোষের মুখে, বিশ বছর বয়সেই পিতা পোনেরো কড়ি ঘোষের রেখে যাওয়া বিপুল বিত্তসম্পত্তি 'কুপথে' নষ্ট করে যিনি এখন 'ফোতোবাবু'তে পরিণত হয়েছেন। গদাধরের আদি নিবাস বলাগড়। তাঁর পিতা বিষয়কর্ম ভালো বুঝতেন, চালাকচতুর ছিলেন, ফলে তিনি পুত্রকে আইন-আদালত ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়েছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর গদাধর কলকাতায় আসে এবং প্রথম কিছুদিন চা ও ব্যাঙ্কের শেয়ার, কোম্পানির কাগজ, আফিমের অংশীদারি ইত্যাদিতে অর্থ লগ্নি করে অনেক বিষয়-আশয় নষ্ট করেন। এরপর বড়োবাজারে ফাট্‌কায় অর্থ নিয়োগ করেও তাঁর লোকসান হয়। গদাধর অতএব পক্ষীর দলে এসে ভেড়েন। সে সময় বাগবাজার, বটতলা, বউবাজার প্রভৃতি স্থানে এক একটি গাঁজার আড্ডা ছিল। বউবাজারের দলকে লোকে পক্ষীর দল বলত।

এর নেতৃত্ব 'শিবঠাকুর' দিলেও, পক্ষীরাজ ছিলেন রূপচাঁদ দাস মহাপাত্র ওরফে রূপচাঁদ পক্ষী। সেকালে কলকাতার বাবুদের মধ্যে গাঁজার জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে দেওয়ার পিছনে এই পক্ষীদলের ভূমিকা ছিল সর্বাধিক।[১৫১] গদাধরও এই দলের সভ্য ছিল, এমন সময় 'সুরাপাননিবারিণী সভা' স্থাপিত হলে তিনিও এই সভার সভ্যপদ গ্রহণ করেন। সভায় অনেক কেষ্টবিষ্টু বাবুরা ছাড়াও অনেকেই সভ্য হয়েছিলেন। তবে 'ইঁহারা দিবসে সভার সভ্য হইয়া সুরাপান নিবারণের জন্য গবর্ণমেন্টে আবেদন করেন, রাত্রে পুনর্ব্বার আমার সহিত পাখির দলে ঢুকিয়া উড়েন।'[১৫২] এমনকী, গদাধর একদিন ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে তাঁদের 'চারইয়ারির দলে'র অনেককে দেখতে পান, যাঁরা 'দিবসে যে কার্য্য না করেন, এমন কর্ম্ম নাই ও রাত্রে স্থান বিশেষে পরমহংস নন।'[১৫৩] ব্রাহ্মবাবুদের দ্বৈত জীবনের যে আভাস পাওয়া যায় 'কলিকাতার নুকোচুরি'তে, পরবর্তীকালের নকশায়, বিশেষ করে প্রহসনে তার সুপ্রসার দেখা যায়। হিন্দু রক্ষণশীলদের ভূমিকা এই প্রসঙ্গে অনস্বীকার্য নয়।

গদাধর বর্তমানে পামরলাল মিত্রের মোসাহেব, পামরলালবাবু ধনী পিতার সন্তান, এ কাহিনির 'কাপ্তেন বাবু'। ছেলেবেলা থেকেই পিতার আদরে 'আলালের ঘরের দুলাল' হয়ে উঠেছিলেন। গদাধরের বর্ণনায়— 'লেখাপড়ায় সরস্বতী কণ্ঠস্থ, দেখতে কার্ত্তিকের ন্যায়, বয়েস তরুণ, পেটটী গণেশের মত, লক্ষ্মী বিরাজমানা, আর বড় খোরচে ছিলেন। তিনি আমাদের চারইয়ারির দলের কাপ্তেন।'[১৫৪] পামরবাবুর পৈত্রিক বাটী খানাকুল কৃষ্ণনগর, তবে বর্তমানে আহিরিটোলায় বাস। এঁর বৈঠকখানা সবসময়েই ইয়ারদোস্ত ও মোসাহেবদের দিয়ে পূর্ণ থাকে। পেইন কোম্পানির মদ ও উইল্‌শনের খানায় সর্বদাই সবার 'গলা অহরহ ভিজান ও উদর পূর্ণ থাকতো'। সর্বস্বান্ত গদাধরকে বাবুর 'এ.ডি ক্যাম্প' (Aiddecamp) হিসাবে 'বাবু হাই তুল্লে তুড়ী দিতে হোতো ও হাঁচলে জীবো বোল্‌তে হোতো।'[১৫৫] চিরকাল বাবুগিরি করা গদাধরের এতে কষ্ট হত খুব। ইতিমধ্যে বাবু পাঁচুহরি কোম্পানির মুতসুদ্দি হলে, গদাধরকে সদরমেট করলেন। যদিও কাজ বিশেষ ছিল না, 'কর্ম্মের মধ্যে আফিসে গিয়ে চাপকান খুলিয়া "বাতাস দেরে" বোলে চোদ্দ পো হতেম, ও মধ্যে মধ্যে বরফ দিয়া একটু একটু পাকা মাল টান্‌তেম।'[১৫৬] তবে অচিরেই কোম্পানি ফেল করায় তাঁরা 'পুনর্মূর্ষিক ভবঃ' হলেন।

হুজুকের শহর কলকাতায় নানান হাঙ্গামা। বাবুদের নানান কীর্তিকলাপ, উদয়-অস্তে শহর সর্বদাই 'গুলজার'। এখানে 'বাচ বিচার নাই'। মদ্যপান ও ইংরেজি শিক্ষার মোহে বড়ো বড়ো বাবুরা উচ্ছন্নে যেতেন, এমনকী সাধারণ ছোকরাবাবুরা 'ফোঁটা ফোঁটা ইংরাজী কহিতে আরম্ভ করিল, তাদের মাথামুণ্ডু কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, ইংরাজী কহিতে কহিতে অমনি বাঙ্গালা কথা এনে বসে, কিন্তু ইংরাজীও না কহিলে নয়।' সাধারণ ইংরেজি শিক্ষার মোহে দেশীয় সংস্কার, মায় মাতৃভাষাকে তুচ্ছজ্ঞান করার 'শিক্ষা'য় শিক্ষিত হচ্ছে যেসব 'ভদ্রলোক'বাবুরা, উত্তরকালের প্রহসনে-নকশায় তাঁরাই হয়ে উঠবেন ব্যঙ্গের লক্ষ্য। নকশাকার অন্যত্র বলেছেন, 'এদানী আমাদিগের নব্যবাবুরা ইংরাজদিগের নকল করিতে গিয়া কেবল তাহাদের অধিকাংশ দোষ প্রাপ্ত হয়, গুণ প্রায় অল্প লোকে পান।?... আমরা কেবল তাহাদের মদিরিকা পানের নকল প্রাপ্ত হইয়াছি, আর কিছু নয়। অনেকেই সাহেব হতে ইচ্ছা করেন, তাহা মুখে না বলিয়া কাজে করিলেই বড় সুখজনক হয়।'[১৫৭] নব্যবাবু বলতে নকশাকার 'ইয়ং বেঙ্গল'দের কথা বলতে চেয়েছেন। তবে ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের প্রশংসা করে তাঁদের শ্রীবৃদ্ধি কামনা এক অর্থে নতুন দৃষ্টিকোণ বটে— 'মধ্যবিত্ত লোকেদের ছেলেরা অনেক ভাল, এবং তাহাদের গুণও আছে; ঈশ্বর করুন ইহাদের দল দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি হউক।'[১৫৮]

পামরবাবুও একজন শিক্ষিত 'ইয়ং বেঙ্গল', কিন্তু শুধু সুরায় নয়, অন্য আসক্তিতেও তিনি বেশ দড়ো। তাঁর পিতাও যে লাম্পট্যদোষে দুষ্ট ছিলেন তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, পামরবাবুর সভাপণ্ডিত গোপালরাম চূড়ামণির কথায়। গোপালরাম স্বভাব দুর্বৃত্ত। বড়োমানুষ বাবুদের মোসাহেবি করে, তাঁদের পক্ষে নিদান দিয়েই তাঁর দিন গুজরান হয়। উপযুক্ত 'কাপ্তেনবাবু'র জন্য তিনি সর্বদাই লালায়িত, আবার বেশ্যাবাজিতেও অরুচি নেই। তিনি বাবুকে পুরাণের দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করে দেন যে শিব, কৃষ্ণ প্রমুখ দেবতা যখন পরস্ত্রীগমন করতেন, তখন 'এ বিষয়ে কিছু মাত্র পাপ কি নুকোচুরি নাই!' পামরলালবাবু শিক্ষিত মানুষ। নিজের যা ইচ্ছে হত, তাই করতেন। যেখানে যেমন সেখানে তেমন অর্থাৎ পরিস্থিতি বুঝে তিনি কখনো বৈষ্ণব, কখনো হিন্দু, কখনো সাহেব ইত্যাদি সাজতেন। নকশাকারের ভাষায়, 'খড়দহ অঞ্চলে গ্যালে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলতেন, কালীঘাটে গ্যালে মায়ের প্রসাদে অরুচি ছিল না, সুপাচক উইল্‌শনের বাড়ীতেও আহারাদি অনায়াসে চোল্‌তো, বেশ্যালয়ের হোল্‌দে ভাতেও ঘৃণা ছিল না।' [১৫৯] মদ্যাসক্ত, লম্পট বাবুটি ইংরেজি শিক্ষিত পণ্ডিত, অতএব সভায় বিধবা বিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষা দেওয়া, বারাঙ্গনাদের শহর থেকে বহিষ্কার করা বিষয়ে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে দেশের দুর্ভাগ্য দূর করার চেষ্টা করেন। নব্যবাবুদের বাগাড়ম্বরপ্রিয়, শূন্যগর্ভ চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন নকশাকার, সভা উপলক্ষ্যে বাবুটির খানা-খাওয়া এবং মদ্যপানই আসল উদ্দেশ্য। সেইসঙ্গে আনুষঙ্গিক দোষ তো আছেই। শিক্ষা, বিশেষত ইংরেজি শিক্ষা এদেশের নব্যবাবুদের কদাচারের দিকেই ঠেলে দিচ্ছে, তাঁদের চৈতন্যের মুক্তি ঘটছে না, এই সত্য নির্দেশ করাই নকশার অভিপ্রেত।

বাবুর মনোরঞ্জনার্থে 'মজা' করার জন্য মোসাহেবরা নৈতিক-অনৈতিক উপায় অবলম্বন করতেন। চূড়ামণি পামরবাবুর জন্য নিজ গ্রামের এক দরিদ্র ঘরের সুন্দরী মেয়ের কথা বলে 'ব্যবস্থা' করে দেখবেন বলেছেন। এদিকে সভার হুজুকে ব্রাহ্মণ-মোসাহেব ক্ষেত্রনাথের বিবাহের উদ্‌যোগ করা হয়। ওই রাতেই হলুদের বদলে জাফরান মাখিয়ে ক্ষেত্রর গায়ে হলুদ হল এবং উইল্‌শনের বাড়ির খানা আনিয়ে আইবুড়ো ভাতও খাওয়া হল। অতঃপর সিদ্ধি খাইয়ে সন্ন্যাসী কলুর কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ দেওয়া হল। পরদিন ভোরে সব জানতে পেরে অপমানে-ঘৃণায় স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে ক্ষেত্র চূড়ামণির বাসায় গিয়ে লুকিয়ে থাকল। চূড়ামণির বাসা ছিল সোনাগাছির শিবি গোয়ালিনীর বাড়িতে। কিন্তু সেখান থেকে কলুর অভিযোগমতো পুলিশ উভয়কে গ্রেপ্তার করল এবং ক্ষেত্রনাথের মাসিক দশ টাকা স্ত্রীর ভরণপোষণের খরচ নির্ধারিত হল। যদিও ক্ষেত্রর তখন কর্পদকহীন অবস্থা। অবশ্য পামরবাবু তার টাকা দিতেন, এমন ইঙ্গিত কাহিনিতে আছে।

ইতিমধ্যে পামরবাবুর চৈতন্যোদয় হলে তিনি অনুতপ্ত হলেন এবং স্ত্রীর কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে পশ্চিমে যাত্রা করলেন। গদাধরের কাছে তাঁর স্বীকারোক্তিতে আমরা জানতে পারি মদ্যপান, অগম্যাগমন, বেশ্যাবাজি এবং পরস্ত্রীর অমঙ্গল ও 'কুপথগামিনী' করার অপরাধ তিনি করেছেন। পামরবাবুকে এরপর আমরা কাশীতে দেখি এবং তখন তিনি পরিবর্তিত এক মানুষ। মদ্যপান করেন না, বেশ্যা সংঘর্ষ তো দূর সদাই নিজ স্ত্রীর কথাই মনে ভাবেন। তিনি কলকাতাতে ফিরেও আসেন। কারণ, কাশীর জলবায়ু তাঁর পছন্দ হলেও 'বাকি সব ফক্কা! রাঁড়, ষাঁড়, ঘাট এই তিনটি নিয়ে কাশী! আর যে সকল কদর্য কর্ম্ম এখানে হচ্ছে; বোধ হয় মহাদেবও এখানে না থাকলেও থাকতে পারেন।' পরমার্থ বিষয়ে পামরবাবু আগ্রহী হয়ে ফিরে এসেছেন কিন্তু বেশিদিন তাঁর পক্ষে সুখভোগ সম্ভব হয়নি। কারণ, পুরোনো অত্যাচারের ফলে তিনি

অসুস্থ হয়ে অচিরেই মারা গেলেন। বস্তুত, নকশায় চরিত্রবিকাশের সুযোগ নেই, তাহলেও বলা যায় পামরবাবুর আকস্মিক চরিত্র পরিবর্তন বাস্তবসম্মত হয়নি। কিন্তু মূল কাহিনির শেষে লেখক স্বয়ং বলেছেন যে, কলকাতাসহ অন্যান্য 'সহরের কতক কতক নব্যবাবুরাও হাফ ভূত, কেবল মজা নিয়ে আছেন। আজ কালীঘাট, কাল বারাকপুর, তারপর মধুর শনিবার। রবিবারের বাগান তো আছেই, তাহার কথা নাই; বাড়িতে ব্যায়ারামই হোগ, কর্ম্ম কাজই থাক, অথবা আকাশ ভেঙে পড়ুক, বাগান যেতেই হবে। বাছাদের এত আটা যদি লেখা পড়ায় হতো, তাহলে আমাদের দেশের মঙ্গল।'[১৬০] অর্থাৎ ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় যাকে 'প্রকৃত শিক্ষা' বলেছেন, টেকচাঁদ ঠাকুর (জুনিয়ার)ও মনে করেন যে, প্রকৃত শিক্ষার অভাবেই নব্যবাবুরা এই সর্বাত্মক অধঃপতনের দিকে এগিয়ে চলেছেন।

পামরবাবুর কাশীগমন অংশে আমরা আরেক 'ফোতোবাবু' কুমার শশীনাথের সঙ্গে পরিচিত হই। কুমার বাহাদুর শশীনাথ রাজা ফটিকচাঁদের পুত্র, নিবাস দক্ষিণ, কলকাতায় লেখাপড়া করার জন্য ইংরেজি মিশিয়ে ছাড়া ভালো বাংলা বলতে পারেন না। ফটিকচাঁদের তালুক আছে সরকারকে কর দিয়ে টিয়ে মাসিক আয় ১৬/০ তাতেই কোনোরকমে পিতাপুত্রের দিন চলে। কিন্তু বাবুয়ানার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, অতএব শশীনাথ হ্যান্ডনোট কাটে। পূর্বে শেলাইপাড়া নিবাসী দালাল, পরে যাত্রার অধিকারী রামলাল তাঁর ১ টাকা মাসিক বেতনের মাস মোসাহেবে। পামরবাবুর সভা ভঙ্গ হওয়াতে কর্মহীন ক্ষেত্রনাথ ও চূড়ামণি এসে ভিড় জমিয়েছেন বাবুর সভায়। মদসহ নিষিদ্ধ খাদ্য কোনো কিছুতেই শশীনাথের আপত্তি নেই। শশীনাথের চাকরের স্বগোতোক্তি থেকে জানতে পারা যায়, নব্যবাবুরা সকলেই দ্বিচারী— 'বাবুদের এদিকে ঢাল সমুর হচ্ছে, আবার ওদিকে হিন্দুসমাজে গিয়া সনাতন ধর্ম্ম যাতে বজায় থাকে তারও উপায় কচ্ছেন।'[১৬১] পামরবাবুকে বারবার মদ খাওয়ার কথা বললে পামর আক্ষেপ করে বলেছে, 'ইদানী কি প্রথা হইয়াছে তাহা কিছুই বলিতে পারি না, ভদ্রলোকের কাছে গেলেই আগেকার মতন পান তামাক দেয় না! এখন কেবল ব্রাণ্ডি; স্থান বিশেষে কাঁচের গ্লাস না চোল্লে, রূপার গ্লাস বেরোয়, একি সামান্য দুঃখের বিষয়!'[১৬২] মদ্যপান সম্পর্কে 'প্রেজুডিসে'র সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার নব্যবাবুদের নতুন ফ্যাশন হচ্ছে— নিত্যনতুন বই লেখা, সভা স্থাপন করা, থিয়েটার দল করে শখের অভিনয় করা— আর এসবের মধ্যে দিয়েই 'নতুন নতুন বাবু হচ্ছে'।

শশীনাথকে কলকাতায় পামরবাবুর কাছ থেকে হাজার টাকা ধার করতে দেখা যায় দু'মাসের মধ্যে ফেরত দেবার কড়াড়ে। যদিও পামরবাবু তার প্রতারণা বুঝতে পেরেও তাঁকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেন। সর্বস্ব হারিয়ে 'ফৌত' হওয়া বাবু গদাধরকেও আমরা দেখি পামরবাবুর সুহৃদ হিসাবে সবসময় তাঁর পাশে পাশে থাকতে। রামলাল ও শশীনাথের কথোপকথন থেকে জানা যায়, কলকাতায় শশীনাথের নামে পাঁচ-ছয়টি ওয়ারেন্ট ঝুলছে। কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার আগে টালার হরগোবিন্দবাবুর বাগানবাড়ির মদ্যপানের আসরে অপরিমিত মদ্যপান করে বেহুঁশ শশীনাথের হাজার টাকা চোট যায় এবং এরপরই পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হয়ে তিনি জেলে যান এবং ওলাওঠাতে মারা যান। 'ফোতোবাবু' শশীনাথ শিক্ষিত কিন্তু দুর্বৃত্ত। বস্তুত নব্যবাবুয়ানার প্রতি নকশাকার অন্যতর দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছেন। তিনি ইংরেজদের মহত্বের প্রশংসা করেছেন[১৬৩] তাঁদের চারিত্রিক সততা ও একনিষ্ঠতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার শেষ নেই, কিন্তু এদেশে প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষার প্রতি লেখকের মোহ নেই দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত, তাঁর মত, ভ্রান্ত ইংরেজিয়ানাই নব্যবাবুদের জন্মের কারণ। একইসঙ্গে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা নব্যবাবুদের যতটা না ইন্দ্রিয়াসক্ত করে তুলেছে,

তার সামান্যও চরিত্রবান, সৎ, সুসভ্য করে তুলতে পারছে না। অতএব, প্রথাগত বাবুয়ানার অনিবার্য আকর্ষণে শিক্ষিত বাবুরাও আকৃষ্ট হচ্ছেন এবং সে কারণেই তাঁদের মহাপতন ঘটছে।

'কলিকাতার নুকোচুরি'র একাদশ অধ্যায়ে 'আবদারে বাবু' উচিতচাঁদ পালের কথা আখ্যানের গল্পাংশের সঙ্গে আপাত সম্পর্করহিত। তবে যদি কলকাতার বাবুসমাজের স্বরূপটিকে তুলে ধরবার প্রয়োজনেই লেখক আরও একজন বাবুর দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন, তবে তা আলাদা কথা। উচিতচাঁদ পালের কাহিনি পড়ে খুব সহজেই অনুমান করা যায় তিনি কে। তিনি 'আবদারে বাবু' বলে খ্যাত ছিলেন। তাঁর পিতা কলকাতার 'টিঃ' স্থলে বাস করতেন। তিনি অল্প বয়সে মারা যাওয়ার আগে সব সম্পত্তি ছেলে সাবালক হওয়া অবধি একজিকিউটারের তত্ত্বাবধানে রেখে যান। আবদারে বাবুর পড়াশোনায় তেমন মতি ছিল না। অল্পকিছুদিন পরেই সরস্বতীকে চিরবিদায় জানিয়েছেন। সামান্য বড়ো হতে না হতেই আবদারে বাবু 'এঁচোড়ে পেকে' উঠলেন এবং সমধর্মী বন্ধুবান্ধব জুটে গেল। এঁদের নিয়ে প্রথমত একটি ইংরেজি মত ক্লাব, পরে সমাজ স্থাপিত হল। সমাজের তরফ থেকে পত্রিকাও প্রকাশিত হল। এরজন্য টাকার প্রয়োজন হতেই উচিতচাঁদ মায়ের কাছে কেঁদে-কেটে আবদার করে দশ-কুড়ি-দুশো-হাজার এইভাবে টাকা আদায় করতে লাগলেন। কখনো-বা আত্মহত্যার ভয় দেখিয়েও মায়ের কাছ থেকে টাকা আদায় করতেন। এরপর কিছুদিন শখের থিয়েটারে পেয়ে বসল বাবুকে। সে শখ মিটলে গাঁজা ও চরসের ভক্ত হলেন। আবদারে বাবু চরসকে রাবণ ও গাঁজাকে রাম নাম দিলেন। তাঁর ইচ্ছেমত মোসাহেবরা এইপ্রকার 'রাম' ও 'রাবণ'কে এনে হাজির করত। এরপরই সুরায় তাঁর দীক্ষা হল। কিন্তু এর ফলে ব্যয়ভার বেড়ে যেতে মায়ের কাছ থেকে নেওয়া টাকায় 'আমোদের চূড়ান্ত হোতোনা'। অতএব বাবু ইহুদি আতরওয়ালাকে ৪৮% সুদে হ্যান্ডনোট লিখে দিয়ে টাকা ধার করলেন। কাপ্তেনবাবুদের জন্যই এরা সুযোগ বুঝে থাকত; টাকা ধার দিতে দ্বিধা করত না; জানত 'বড় মানুষের ছেলে', অতএব 'বয়েস প্রাপ্ত হলেই বিষয় পাবেন।' এরপর আবদারে বাবু যথেচ্ছ সুদে যথেচ্ছ টাকা ধার করতে লাগলেন। প্রথম প্রথম লুকিয়ে-চুরিয়ে বেশ্যাদের নিয়ে এসেও আমোদ চলতে লাগল। নকশার ভাষায়, 'ক্রমে বাবু এমনি তৈয়ারি হয়ে উট্‌লেন যে যার বাড়িতে যেতেন, তার বাস্তুর মাথা কেঁপে উঠ্‌তো আর থরহরি কম্প লাগিয়ে দিতেন।'[১৬৪] কিন্তু বাবুর হ্যান্ডনোট ক্রমে 'ডিউ' হতেই প্রথমত রিনিউ করে কিছুদিন বাঁচলেও অচিরেই ডিক্রি জারি হল। শেষপর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে আবদারে বাবুর মা একজিকিউটারকে বলে ধারদেনা শোধ করে বাবুকে বাঁচালেন।

সাবালক হতেই একজিকিউটার আবদারে বাবুকে তাঁর প্রাপ্য বিষয়-সম্পত্তি সব বুঝিয়ে দিলেন। বিষয় পেয়েই উচিতচাঁদ পালবাবুর 'বাবুয়ানা' বেড়ে গেল। এখন 'যখন যা মনে আসে তাই করেন। কখন হোটেলের খানা আনিয়ে আমোদ-আহ্লাদ কচ্চেন, কখন তেলেভাজা ফুলুরি বেগ্‌নি সহ রকমারি নিয়ে ইয়ারকি দিচ্ছেন। আজ স্যামপেন ঢালোয়া— কাল ব্রান্ডির মোচ্ছব— পরশু পাঁচরকম লোক এসে জোটে। কোথায় কাহাকে টিকি সন্দেশের সঙ্গে ফ্যান্সি বিষকূট দিয়ে খাওয়াচ্চেন। কোথাও কাহাকে ডাবের জলে এমিটিক দিয়ে খাওয়াচ্চেন। ... কোথাও কেহ দু'টো হাত তুলে ইংরাজী লেকচার দিচ্চে, কোথাও কেহ বাঙ্গালায় বক্তৃতা কোচ্চে। আবদারে বাবুর চকড়বা ও আমোদ-আহ্লাদের পরিসীমা ছিল না!'[১৬৫] হিন্দু হয়ে দোল-দুর্গোৎসবে আমোদ-আহ্লাদ করতেন আবদারে বাবু, আবার ব্রাহ্ম হয়ে সকল ধর্মে জলাঞ্জলি দিতেও তার দ্বিধা হত না। নকশাকার আবদারে বাবুর ভেকসর্বস্ব, অধঃপতিত স্বরূপটিকেই উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন। দেখিয়েছেন, অনিয়মিত আয়ের অতিরিক্ত খরচের ফলেই স্বল্পশিক্ষিত 'কাপ্তেনবাবু'রা কীভাবে

সর্বস্বান্ত হতেন। কীভাবে আবদারে বাবুর মতো বাবুরা দেনার দায়ে 'আজ তালুকখানা, কাল ভালো বাড়িখানা, পরশু ভদ্রাসন ও বাগান', এমনি করে 'ক্ষয় রোগে'র মতো দিন দিন ধ্বংসের শেষ সীমায় গিয়ে দাঁড়াতেন। সর্বস্ব হারিয়ে, ওয়ারেন্টের ভয়ে রাত দশটা পর্যন্ত লুকিয়ে থেকে (কারণ রাত দশটা থেকে ভোর পর্যন্ত আর ওয়ারেন্টের দায়ে গ্রেপ্তার হওয়ার ভয় ছিল না তখনকার আইন অনুযায়ী) আবার মদ ও বেশ্যার তৃষ্ণা দমন না করতে না পেরে বেরোতেন। আবদারে বাবুর বাবুয়ানা তখন যায়নি। বিবাহের পত্রবাহকদের সাধ্যের অতিরিক্ত টাকা দিতে বলতে তাই তিনি দ্বিধা করেন না। উচিতচাঁদ পাল ওরফে আবদারে বাবুর শেষ পরিণাম এই খণ্ডে আর পাওয়া যায় না। বাকি বিষয় দ্বিতীয় খণ্ডে লেখার জন্য প্রতিশ্রুত হলেও উক্ত খণ্ডটি আর রচিত বা প্রকাশিত হয়নি।

আবদারে বাবুর কথা শেষে লেখক বলেছেন, 'আবদারে বাবুর বিষয়ে আমরা কাহাকেও লক্ষ করি নাই। এইবান্‌কে ছেলের গল্প ছলে, বুঝে চলার উপদেশ দিলাম।'[১৬৬] যদিও বাবুটি সম্পর্কে লেখক যেসব ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা থেকে বাবুটি যে কালীপ্রসন্ন সিংহ ওরফে হুতোম প্যাঁচা, সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। ভোলানাথও প্রায় একই অপরাধ বা অনৈতিক কাজের ছবি এঁকে 'আপনার মুখ আপুনি দেখ'র গুণচন্দ্র তথা কালীপ্রসন্নকে এঁকেছেন। প্রথমে ইংরেজি ডিবেটিং ক্লাব, পরে ১৮৫৫-র দিকে তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভা স্থাপন করেন। উক্ত সভার পক্ষ থেকেই ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার স্থাপিত হয়। তাঁর পত্রিকা প্রকাশ সম্পর্কে যে ইঙ্গিত দিয়েছেন 'কলিকাতার নুকোচুরি'র লেখক, সে সম্পর্কে বলা যায়, ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি ভাষায় সুপণ্ডিত ও সুলেখক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'মুখার্জীজ ম্যাগাজিন্' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করলে কালীপ্রসন্নই বহুমূল্য মুদ্রাযন্ত্র কিনে বিনামূল্যে তাঁকে দান করেন।[১৬৭] ওই বছরই ১৪ জুন 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র বিখ্যাত সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অতিরিক্ত মদ্যপানজনিত কারণে মারা গেলে, কালীপ্রসন্ন নিজেই ৫০০০ হাজার টাকায় পত্রিকার সমস্ত স্বত্ব কিনে নিজেই পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণের টিকি কেটে সন্দেশের সঙ্গে বিস্কুট খাওয়ানোর প্রসঙ্গ ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় এবং টেকচাঁদ ঠাকুর (জুনিয়ার) দুজনেই উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে 'অর্ঘ্য' সম্পাদক অমূল্যচরণ সেন লিখেছেন, 'একটা জনশ্রুতি আছে যে, কালীপ্রসন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের টিকি কাটিয়া দিয়াছিলেন। লোকমুখে এখনও আমরা শুনিতে পাই, টাকা দিয়া কালীপ্রসন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে বশীভূত করিয়া তাঁহাদিগের টিকি ক্রয় করিতেন, পরে ঐগুলি কাটিয়া লইয়া আলমারিতে সাজাইয়া রাখিতেন; কাহার টিকি কত মূল্যে ক্রীত, তাহাও এক টুকরো কাগজে লিখিত হইয়া ঐ টিকির সঙ্গেই সংলগ্ন থাকিত। এই ঘটনা যে মিথ্যা তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, এই জনশ্রুতি এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, কলিকাতায় তিনি ''টিকি কাটা জমিদার'' আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক সে সময়ে ''টিকি কাটা জমিদার'' বলিলে লোকে উঁহাকেই বুঝিত।'[১৬৮] মদ্যপান এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক দোষ বিষয়েও নানান কথা প্রচলিত ছিল। আসলে, সে সময় ও সামাজিক পরিবেশে, যে বিলাস-বৈভবের অমিত স্রোতের মধ্যে কালীপ্রসন্ন জন্মেছিলেন, তা থেকে নিজেকে সঠিক পথে ধরে রাখা অনেকের ক্ষেত্রেই সম্ভব হত না, কালীপ্রসন্নের ক্ষেত্রেও হয়নি। 'কাপ্তেনবাবু' পেলেই মোসাহেবরা জুটে যায় এবং নানারকম কুপরামর্শ দিয়ে বাবুকে বিপথে পরিচালিত করে নিজেদের আখের গোছায়। কালীপ্রসন্নের ক্ষেত্রে ঠিক তেমনটিই ঘটেছিল। আসলে, এই অন্ধকারের স্রোতের মধ্যে ভেসেও যে তাঁর অন্য আরেকধরনের আলোময় হৃদয় ছিল, তা হুতোমের নিন্দা করতে বসেও 'কলিকাতার নুকোচুরি'র লেখক স্বীকার করতে

বাধ্য হয়েছেন— এক. হুতোমের আত্মসমালোচনার সৎসাহস; নকশার ভাষায়, 'তাহার মহত্বতা গুণের পরিসীমা ছিল না, ভগবান ব্যাসদেব যেমত আপন জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনে লজ্জিত হন নাই, সেইরূপ হুতুম আপনার নক্সাখানিতে আপনার অনেক কথা বলিয়াছেন, তবে লোকালয়ে যেগুলো অত্যন্ত ঘৃণাষ্কর তাহাই বলেন নাই।'[১৬৯] দুই. হুতোমের অসংখ্য অসৎকর্মের পাশেও তাঁর সৎকর্ম্মপ্রবণ প্রাণনা— 'তিনি সর্ব্বগুণালঙ্কৃত, হেন সৎকর্ম্ম কি অসৎকর্ম নাই যে তিনি করেননি। মন্দের ভাগই অধিকাংশ, সতের মধ্যে ভারতে মহাভারত ভিন্ন আর কেহ কিছু বলত না।'[১৭০] লেখক না স্বীকার করলেও, কেবলমাত্র মহাভারত অনুবাদ নয়, কালীপ্রসন্নের মহৎ ও সৎকর্মের সংখ্যা সেকালের তথাকথিত বাবুদের তুলনায় অবিস্মরণীয় তাতে সন্দেহ নেই। ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বিদ্বেষাপন্ন হয়েই নকশাকারের সত্যের এই অপলাপ। যদিও নকশার এই অতিকথিত বাবুত্বের বিবরণ পড়ে সহৃদয় সামাজিকেরা সচেতন হবেন এবং সমাজ সংশোধিত হবে বলেই তাঁর বিশ্বাস।

উদ্দেশ্যমূলক, মূলত ব্যক্তিনির্দিষ্ট 'কলিকাতার নুকোচুরি' সাহিত্যমূল্যে নয়, নতুন কাল কীভাবে ইংরেজি শিক্ষিত নব্যবাবুদের দেখছে, সে ব্যাপারে বৈশিষ্ট্যমূলক রচনা। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আপনার মুখ আপুনি দেখ' গ্রন্থের প্রভাব আলোচ্য নকশার পামরলালবাবু, শশীনাথ বাবুর চরিত্রচিত্রণে লভ্য। চূড়ামণি চরিত্রটিও ভোলানাথের 'দাদাঠাকুরে'র যৎকিঞ্চিৎ অনুসরণ। তা সত্ত্বেও টেকচাঁদ ঠাকুর (জুনিয়ার) রচিত এই নকশায় উঠে আসা বাবুদের বিষয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন কথন—

ক. ইংরেজি শিক্ষিত 'ইয়ং বেঙ্গাল' শ্রেণি নতুন যুগে অনাচার ও বিকৃতিমূলক 'বাবুয়ানা'র প্রধান পেট্রন;

খ. মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুরা তুলনায় বাবুয়ানার প্রভাব থেকে অনেকটা মুক্ত;

গ. মদ্যপান, বেশ্যাবাজি ও লাম্পট্য তথাকথিত ইংরেজিয়ানায় অভ্যস্ত বাবুদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে; ইতিহাসসিদ্ধ 'ইয়ং বেঙ্গল'বাবুরা শেষের দু'টি দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন;

ঘ. পাশ্চাত্য ধারার ইংরেজি শিক্ষা 'প্রকৃত শিক্ষা' নয় বলেই নতুন প্রজন্ম 'বাবুয়ানা'র দোষ-অনাচার থেকে বিমুক্ত হতে পারছে না;

ঙ. বাবুদের নতুন শখ হিসাবে থিয়েটারচর্চায় উদ্যমের প্রসঙ্গটি নতুন; একইসঙ্গে তাঁর অভিযোগ, 'থিয়েটারে গেলেই যে মন্দ হয় তা নয়, থিয়েটারে নুকোচুরি চলে, এবং সেই নুকোচুরিতেই সর্বনাশ হচ্চে! থিয়েটরে মদ ও চোরা গোপ্তান চলে অর্থাৎ ছোকরাদের সন্তোষের জন্য তাহাদের বাগানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং মদ দেওয়া ও বেশ্যাদের সহিত সহবাস করানো হয়, সুতরাং আর লেখাপড়া করবার সময় থাকে না!'[১৭১]

চ. সর্বোপরি, বাবুয়ানার স্রোত কেবল কলকাতা শহরের বাবুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তা ক্রমশ বাংলা হারিয়ে কাশীর মতো বাঙালি অধ্যুষিত স্থানেও প্রসারিত হচ্ছে।

বস্তুত, নকশার ধর্ম যে সমাজ-চিত্র প্রদর্শন, 'কলিকাতার নুকোচুরি'র স্থানে স্থানে তার পরিচয় সুলভ। ১৮৬৮-৬৯-এর সময়কার বাঙালিবাবুদের ভণ্ডামি, বিবৃতি, দেখানেপনা, অমিতাচারের সঙ্গে সঙ্গে যে গ্রন্থ পামরলালবাবুদের মতো অনুতপ্ত বাবুরও ছবি ফুটিয়ে তোলে। একে আত্মবিস্মৃত বাঙালিবাবুদের ক্ষণিকের চৈতন্যোদয় কি বলতে পারি আমরা?

হুতোমের নকশা প্রকাশিত হলে বিরুদ্ধপক্ষীয়রা যেমন সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি হুতোমের স্বপক্ষীয়রাও কেউ কেউ বিরুদ্ধ দলের প্রতি কটাক্ষপাত করতে এগিয়ে এসেছিলেন। তবে, ব্যক্তিগত কোনো আক্রমণ কিংবা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কুৎসাপ্রকাশের চেয়ে এঁরা সার্বিকভাবে হুতোম-কথিত বাবুসমাজের ধ্বস্ত রূপটিকেই নানাদিক থেকে আলো ফেলে দেখাতে চেয়েছিলেন। সম্ভবত, হুতোম নিজে তাঁর নকশায় বাবুসমাজের সার্বিক অবক্ষয়ের যে চেহারাটা ফুটিয়ে তুলেছেন, তা যে মিথ্যা নয়, একান্ত সত্য,— এঁদের রচনায় তাঁরই সমর্থনজ্ঞাপক চিত্র তুলে ধরতেই চেয়েছিলেন নকশাকারেরা। নিশাচর প্রণীত 'সমাজ কুচিত্র' (১৮৬৫) এইরকমই একটি নকশা, যার মূল লক্ষ্য নাগরিক কলকাতার বাবুসমাজের নানান বিকৃতি, ভণ্ডামি, অনাচার বা দেখানেপনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং 'বাবুয়ানা' নামক ব্যভিচারের মূলোচ্ছেদ করে সমাজ-পরিশোধন। আখ্যাপত্রের উদ্ধৃত পরিচয়ে যে বাবুদেরকে, স্বয়ং লেখক 'The Evils of our Society' বলে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থধৃত তিনটি রচনাতেই এ প্রকার 'সামাজিক শয়তান'বাবুদের নানান ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে পরিচিত হই আমরা।

নিশাচর তথা ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়[১৭২] (১৮৪২-১৯১৬) তাঁর গ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন 'সাহসের অদ্বিতীয় আশ্রয়' শ্রীযুক্ত হুতোমচাঁদ দাসকে। বাঙালি সমাজকে তার 'স্বভাবপটে' প্রকাশ করে হুতোম যে অসামান্য কাজ করেছেন, তাঁর দৃষ্টান্তেই 'সমাজ-কুচিত্র' পাঠ করে পাঠকেরা 'সৎকর্ম্ম হইতে দুর্গন্ধগুলি দূর' করবেন, এই হল লেখকের অভিপ্রায়।[১৭৩] গ্রন্থে তিনটি রচনা সংকলিত— 'আলীপুরের কৃষিপ্রদর্শন', 'সরস্বতী পূজা' ও 'পল্লীগ্রামতীর্থ'। প্রথম দু'টি কলকাতার সমাজচিত্র এবং তৎপ্রসঙ্গে বাবুদের নানান কীর্তির কথা, তৃতীয়টি কলকাতার অন্তঃপাতি মফস্সলগুলিতে বেশ্যাদের ক্রমপ্রসার এবং বাবুদের বিকৃতির চকিত-চিত্র।

এদেশের কৃষিব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রথম সচেতন হন পাদরি উইলিয়াম কেরী। শ্রীরামপুর মিশন সংলগ্ন উদ্যানে নানা ধরনের ফুলফলের বীজ, গাছগাছড়া, ওষধির চাষ করে এ বিষয়ে প্রথম হাতেখড়ি তাঁর। শ্রীরামপুরের বাগানটি ১৮১৪ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কৃষিপ্রধান বাংলার সর্বত্র যাতে উন্নত প্রথায় চাষবাস হয় এজন্য কেরী আন্তরিকভাবেই উদ্যোগী হন এবং তাঁর উদ্যোগেই ১৮২০ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর কলকাতার টাউন হলের একটি সভায় 'কৃষি-সমাজ' বা 'কৃষিবিষয়ক সমাজ' বা 'এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটী' স্থাপিত হয়। দেশীয় বাবুরা যথারীতি সমাজ স্থাপিত হবার আগে কেরীকে আশ্বাস দেন এবং এরকম বত্রিশজন সম্ভ্রান্ত বাবুর স্বাক্ষরও কেরী সংগ্রহ করেন; কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে টাউন হলের সভায় উপস্থিত হন মাত্র সাতজন।[১৭৪] মৌখিক বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও কার্যক্ষেত্রে পিঠটান দেওয়ার চরিত্রধর্ম সেই গোড়ার দিক থেকে বাবুদের চরিত্র-স্বভাবের সঙ্গে অঙ্গীভূত ছিল, সন্দেহ নেই। যাই হোক, বিশিষ্ট বাবু রামকমল সেনকে সম্পাদক করে 'কৃষিসমাজ' স্থাপিত হয়। কেরী নিজে এই সমাজের অস্থায়ী সম্পাদক হন। প্রথম সাত বৎসর সমাজের বাগানটি ছিল ব্যারাকপুরের গভর্নমেন্ট উদ্যানের সংলগ্ন টিটাগড়ে। পরে আলীপুরে বজবজ রোডের মুখে আক্রায় এটি স্থানান্তরিত হয়। ১৮৩৬-এ এটি নতুন করে গড়ে ওঠে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের ভিতরে। অতঃপর ১৮৬০-এর পর সম্ভবত এটি স্থানান্তরিত হয় বর্তমান আলিপুরের ঠিকানায়।[১৭৫] সেকালের অনেক বিখ্যাত বাবু ও 'ভদ্রলোক' নানাসময়ে এর সদস্য হন, যেমন— দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রুস্তমজী কাওয়াসজী, রাধাকান্ত দেব, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখেরা। টিটাগড়ে থাকবার সময় থেকেই সমাজটি 'নিজস্ব বাগানে এবং অন্যত্র উৎপাদিত কৃষিদ্রব্যের বাৎসরিক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান' করে আসছিলেন এবং এই উপলক্ষ্যে চাষীদের বিভিন্ন কৃষিবীজ বিনামূল্যে

দেওয়া হত।[১৭৬] ১৮২৮ সালে একশো নয়জন কৃষককে উৎকৃষ্ট ফলমূল উৎপাদনের জন্যে পদকাদি পুরস্কার দেওয়া হয় এবং জলসেচের যন্ত্র নির্মাণে কৃতিত্ব দেখিয়ে জনৈক উদ্ভাবক বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন। বোঝা যায়, উনিশ শতকের অন্তত শেষদিক পর্যন্ত 'কৃষিসমাজ' বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে। উল্লেখ্য যে, কালীপ্রসন্ন সিংহ স্বয়ং এই সমাজের উৎসাহী পেট্রন ছিলেন।

১২৭০ বঙ্গাব্দের ৬ মাঘ (১৮৬৪) তদানীন্তন ছোটোলাট স্যার সিসিল বিডনের কার্যভার গ্রহণের দিন আলিপুরের কৃষি সমাজে 'নানা দেশের কল, ফল, শস্য ও পশুপাখী'র একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে 'বিস্তর ভদ্রলোক' উপস্থিত হয়েছিলেন, যদিও তাঁদের মধ্যে কতজন প্রকৃত উৎসাহী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। নিশাচর দর্শকদের তিনটি দলে ভাগ করেছেন—

(ক) 'গুণগ্রাহী'র দল— এঁরা প্রকৃত বোদ্ধা বাবু, ফলে নানা কলের কারিগরি, কাজ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ, যদিও সংখ্যায় অল্প।

(খ) 'গোষ্ঠ ও রাসযাত্রার সঙের ন্যায় কল ও জন্তুগুলি দেখে বেড়াবার' দল অর্থাৎ সাধারণ দর্শক, যাঁদের আগ্রহ বা অনাগ্রহ কিছুই তেমন প্রবল নয়।

এবং

(গ) হুজুকে দল, যাঁরা 'কৃষিপ্রদর্শনে'র ছুতোয় 'আপনাপন দুষ্প্রবৃত্তির ভোজ্যদ্রব্য খুঁজে নিতে'ই এসেছেন।

বস্তুত, তৎকালীন আপাত শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের মধ্যে এই তিন শ্রেণির স্পষ্টভেদকেই নিশাচার খুঁজে পেয়েছেন। দেখেছেন, কৃষি প্রদর্শনীতে দেশীয় বাবুদের অন্যতর রূপ— সাহেবের কৃপাপ্রার্থনায় আজ যাঁদের দেহে-মনে 'আরবীয় অশ্ব'সম গতি-স্ফূর্তি। কিন্তু, নকশাকার অনুসরণ করেছেন 'হুজুকে দল'কেই, কারণ, সংখ্যায় তাঁরাই ভারী।

আলিপুর সংলগ্ন ভবানীপুরের বেশ্যাপল্লীটি নিতান্ত কম জাঁকজমকপূর্ণ নয়, যদিও উত্তরের বনেদি বেশ্যালয়গুলির কাছে এটি নেহাতই তুচ্ছ। হুতোম তাঁর নকশায় পল্লী অঞ্চলের হঠাৎবাবুদের ভবানীপুর অঞ্চলে বাসের কথা বলেছেন এবং দালাল মারফত বেশ্যাগমনের কথাও উহ্য রাখেননি।[১৭৭] ভবানীপুরের সেই বেশ্যাপল্লীতে আলিপুরের কৃষিপ্রদর্শন উপলক্ষ্যে দেখা যায় বেশি ভিড়। বেশ্যারাও অধিক খদ্দেরের আকাঙ্ক্ষায় দরমার ছিটে দেওয়া বারান্দায় সার সার এসে জমেছেন। আবার অনেক বাঁধা বাবু আজ প্রদর্শনীতে গিয়েছেন বলে আসতে পারবেন না, ফলে তাঁদের রক্ষিতারা মুখ অন্ধকার করে রয়েছে। একইসঙ্গে মদের দোকানেও 'ভারি ধুম'। সন্ধ্যে হলে প্রদর্শনীস্থল ফাঁকা বটে, কিন্তু বেশ্যাপাড়ায় 'ভিড়ে ভিড়াক্কার'। প্রথম দিন প্রদর্শনীর প্রবেশ মূল্য ছিল পাঁচ টাকা, ফলে নিতান্ত সম্ভ্রান্ত বাবুদেরই আগমন হয়েছিল। কিন্তু নকশাকার উক্ত শ্রেণির বেশিরভাগকেই হুজুগে বলেছেন এবং কৃষি প্রদর্শনীর প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে এঁরা যে আদৌ উৎসাহী নন, সে ইঙ্গিতও স্পষ্ট করেছেন।

দ্বিতীয় দিন টিকিটের মূল্য এক টাকা হওয়ায় অনেক 'মাঝারি কেতার ভদ্রলোক' অর্থাৎ মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক' বাবুরা এসেছেন। এঁরাও অনেকেই গাড়ি চড়ে এসেছেন। কলের নানান কারিগরি দেখতে যেমন ভিড় জমেছে, পশুপাখির খাঁচার সামনেও ভিড় কম নয়। তবে সবচেয়ে বেশি ভিড় তাঁবু খাটানো উইলসন ও স্পেন্স হোটেলের ব্রাঞ্চের সামনে। মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'রা, যাঁদের মধ্যে নকশাকার ব্রাহ্মবাবুদেরও বোঝাতে চেয়েছেন, তাঁরা নব্যবাবুদের মতোই খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে সংস্কারমুক্ত ছিলেন।

রাজনারায়ণ বসু প্রমুখের নানান বক্তব্য ইতিপূর্বেই আমরা বহু স্থলে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছি যে, খাদ্যাদি বিষয়ে রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করা ছিল ব্রাহ্মবাবুদের উদারনৈতিক ধর্মসংস্কারের প্রাথমিক আচার। অতএব এইসব বাবুদের উৎসাহে জিব, ক্ষুর, হ্যাম, ফাউল, মটন, সেরি, স্যাম্পিন, কগনেস ও ব্রাণ্ডী 'বেধড়ক বিক্রি হচ্ছে'। অবশ্য দেশি কচুরি, ফুলুরিরাও আজ ব্রাত্য নন। ওয়েলার, ফেটন প্রভৃতি গাড়ি চড়ে আসা বাবুরা অবশ্য সন্ধ্যার পর পর রাস্তা কাঁপিয়ে চললেন। নিশাচর তাঁদের অনেককেই আবিষ্কার করেছেন, বেশ্যাপল্লীতে— 'আমাদের নবরসিক কুঞ্জরেরা তেমনি, পাছে কেউ দেখে, এই ভয়ে মুখে চোখে কাপড় ঢেকে, লাহোরের ধারের দরোজার ভিতর ঢুকে পড়্ছেন।'[১৭৮] এঁদের মধ্যে যেমন পুরাতন দাশু রায়ের গীতের ভক্তরা আছেন (অর্থাৎ বয়সে প্রবীণ), তেমনি খুঁজে পেতে 'ডজন ডজন ক্লেবার ফেলো'ও দেখা গেছে।

ইতিপূর্বেই আমরা বলেছি যে, ব্রাহ্মবাবুদের প্রতি রক্ষণশীল হিন্দুদের ক্ষোভ ছিল সর্বাধিক। কারণ এঁরা দেশীয় মানুষ হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে অন্যান্য ধর্মের মিশ্রণে নিজেদের নতুন ধর্মমত ও তার ক্রিয়াকর্মে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। অতএব নকশাকারেরা প্রায় সকলেই ব্রাহ্মবাবুদের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন। একই প্রকার ভাব দেখা যায় প্রহসনকার ও পরবর্তীকালের আখ্যান-রচয়িতাদের অনেকের মধ্যে। ব্রাহ্মবাবুদের 'অনেককে' নিশাচরের মতে, 'ব্রাহ্মসমাজের শাখায় বসে চোখ বুজে ঢুলতে ও কাঁদতে দেখা গ্যাচে। তাঁহাদের আর অন্যত্র বাসা নাই, জাতিভেদেরও তক্কা রাখেন না, সকলই সেখানে সম্পন্ন হতে পার্‌বে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁরা ভাল ঘরে ঢুক্‌তে পারেননি, মনে মনে সামাজিকতার ভয় আছে, পাছে কোন চেনা লোকের সঙ্গেই দেখা হয়ে পড়ে।'[১৭৯] অবশ্য নকশাকার যে সকল ব্রাহ্মবাবুকেই লম্পট ও বেশ্যাসক্ত ভাবছেন তা নয়, পাদটীকায় তিনি জানিয়ে দেন যে, ব্রাহ্মবাবুরা মূলত দু'প্রকার— ১. প্রকৃত ও নিরপেক্ষ ব্রাহ্ম এবং ২. 'বকবিড়াল' অপেক্ষাও ভণ্ড ব্রাহ্ম।[১৮০] বলা বাহুল্য, লেখকের উদ্দিষ্ট বেশ্যাগামী ব্রাহ্মবাবুরা হলেন দ্বিতীয় শ্রেণির। এঁরা সমাজে গিয়ে ধর্মের ধ্বজা ধরেন, আবার কৃষিপ্রদর্শনী দেখবার ছুতায় বেশ্যাগৃহে জমায়েত হয়ে 'স-মধু বারবধূর মুখামৃত পান করে আমোদ' করেন। লেখকের মতে, এই ভণ্ড ব্রাহ্মবাবুরাই ব্রাহ্মদের অপদস্থ হওয়ার মূল কারণ। মূলত দলের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য বাদ-বিচার না করে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করার ফলেই ভণ্ড ব্রাহ্মবাবুরা আজ সমাজের 'evil power'-এ পরিণত হয়েছেন। বেশ্যাসঙ্গে মদ্যপান করে দু'একজন ভক্ত ব্রাহ্মবাবু বলেছেন, 'আমরা সুপারিস্টেশনের চেইন ভেঙে সমাজমধ্যে লিবার্টি লাভ করেচি, সেকেলে বুড়ো ফুলদিগের মত জাতবিচার ও সন্ধ্যা আহ্নিক করে কাল কাটাতে হয় না। হে পরমাত্মন্। তুমি আমাদিগকে তোমার সৎপথের পথিক কর, আমরা তোমারি দত্ত ইনটুইশন প্রভাবে তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে প্রাণপণে ত্রুটি কচ্চি না। ওঁ তৎ সৎ!'[১৮১]

ব্রাহ্মবাবুদের দেখে ভুবনচন্দ্র যেমন ব্যঙ্গে-নির্মম উপহাসে মুখর হয়ে উঠেছেন, তেমনি আবার কেরানিবাবুদের আট আনা মূল্যের টিকিট কেটে দলে দলে ঢুকতে দেখে তাঁর সহানুভূতিপূর্ণ সহাস্য মন্তব্য : 'নকলনবিস কেরানীরা কখনো ভাল করে খেতে পরতে ও আমোদ কর্ত্তে পান না। আজ সহরের পাঁচ প্রকার তামাশা দেখে আহ্লাদে আত্মবিস্মৃত হয়ে গেলেন, কেউ কেউ বাঁধা গরুর দড়ি ছেঁড়ার মত দু একটা আন্‌কা গৈলে ঢুকলেন।'[১৮২] কেউ কেউ অবশ্য 'মোদাগাড়ি'তে উঠে জনৈক 'ঢাকাইচাঁদবাবুর বরানগরের বাগানে'র ভোজে যোগ দিতে তাড়াতাড়িই চলে গেছেন। এঁরা শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে কেউই কৃষিবিদ্যা তথা দেশের প্রকৃত উন্নতিসাধক কোনো কাজের সম্পর্কেই উৎসাহহীন। নকশাকারের মতে, 'বাঙ্গালা দেশে লম্পটের ভাগই অধিক।... লাম্পট্যের সহিত আলস্যের হ্রাস না হলে তাহা পূর্ণ হবার সম্ভাবনা নাই।'[১৮৩]

বস্তুত, কৃষিপ্রদর্শনী উপলক্ষ্যে লেখক তথাকথিত শিক্ষিত-ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত বাবু বিশেষত ব্রাহ্মবাবুদের ভণ্ডামি, বিকৃতি এবং স্বদেশীয় ব্যাপারে উৎসাহহীনতার ছবিই তুলে ধরেছেন। লেখকের মতে, কলকাতার তৎকালীন বাবুসমাজের যাঁরা 'সুবিধাভোগী শ্রেণী', তাঁরা যেহেতু লাম্পট্য ও বাহ্য সংস্কারমুক্তির চেষ্টাতেই মশগুল, তাঁদের দ্বারা দেশীয় জীবনের প্রকৃত মঙ্গলসাধন সম্ভব নয়। তবে একইসঙ্গে সৎ ও প্রকৃত ব্রাহ্ম-বাবুদের তিনি অকাতরে প্রশংসাও করেছেন, এ কথাটি স্মরণে রাখতে হবে অবশ্যই।

দ্বিতীয় রচনা 'সরস্বতী পূজা' উপলক্ষ্যেও আমরা কলকাতার নাগরিক বাবুদের বিকৃতি, ব্যভিচার ও অনৈতিক আমোদপ্রমোদের চিত্র ফুটে উঠতে দেখি। যেকোনো উৎসবই ছিল আদতে লাম্পট্য-দোষ উদ্‌যাপনের ছুতো মাত্র। যে সরস্বতী মূলত বিদ্যার দেবী রূপে পূজিতা, তাঁকে বাবুরা অবিদ্যার দেবী বলে মনে করে মদ-মাংসাদি সহ পালনের হুজুকে মাতেন। সমকালীন 'সুলভ সমাচার' পত্রিকার প্রতিবেদনে উল্লেখিত হয়েছে— 'হিন্দু পর্ব্বের মধ্যে কার্ত্তিক ও সরস্বতী পূজার প্রতি বেশ্যাদিগের কিছু অধিক অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। সন্তান কামনা করিয়া লোকে কার্ত্তিক পূজা করে এবং বিদ্যালাভের জন্যে সরস্বতী পূজা করে। বেশ্যাদের পক্ষে এ প্রকার কামনা নিতান্ত অনধিকার চর্চ্চা, তথাপি কার্ত্তিক ও সরস্বতী পূজায় খুব ধুমধাম করিয়া থাকে।'[১৮৪] বস্তুত পূজা-উৎসবে 'ভক্তি' ব্যাপারটি তুচ্ছ কিংবা আদৌ অনুপস্থিত। অতএব মকর সংক্রান্তির স্নান শেষে ডুরে চাদর, রবারের জুতো, নিনু, মল্‌মলের পিরান পরে, আলবার্ট বা ওয়েল্‌সী ফ্যাশনে 'চুল ফিরিয়ে' বাবুরা প্রস্তুত হন সরস্বতী পূজার উদ্যোগ-আয়োজনে। তার জন্য দশদিন আগে থেকেই সোনাগাছি, বাগবাজার, সিমলা, মেছোবাজার, গরাণহাটা, বাঁশতলা, মাথাঘষা, চোরাবাগান, সিদ্ধেশ্বরীতলা, চাঁপাতলা, হাড়কাটা, সেন্ট জেম্‌স চার্চ, বউবাজার, চাঁদনি, জানবাজার ইত্যাদি অঞ্চলের খ্যাতনামা বেশ্যাপল্লীগুলিতে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। লক্ষণীয় যে, নিশাচর যে অঞ্চলগুলিতে সরস্বতী পূজার রমরমার কথা বলেছেন, সেই বেশ্যাপল্লীগুলি কলকাতার উত্তর অংশে অবস্থিত। এইসব অঞ্চলেই বনেদিবাবুদের উত্থান ও আবাসস্থল। বনেদিবাবুদের পরবর্তী প্রজন্ম শিক্ষাদীক্ষার স্পর্শ পেলেও সম্ভবত উনিশ শতকের সাতের দশকে পৌঁছেও তাঁরা 'বেশ্যাবাজি'র মতো কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করতে পারেননি। লেখক স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ভবানীপুরের বেশ্যারা গোত্রবিচারে নিতান্তই নিম্নবর্গ, অন্যদিকে উত্তরের বেশ্যারা 'সাঁচ্চা'। নকশাকারের মতে, 'বিশেষতঃ বাইজী, খেমটাওয়ালী, কীর্ত্তনী ও কল্‌কেতার কোন কোন তেলি, সোনার বেণে, শুঁড়ী ও ছুতোর বড়মানুষদের রাখিত মেয়েমানুষগুলির সজ্জা ও গৃহশোভা সর্বাপেক্ষা চমৎকার।'[১৮৫] বোঝা যাচ্ছে যে, বনেদিবাবুদের জাতিবদল ঘটেছে। কায়স্থ ও ব্রাহ্মণবাবুরা আর নতুন যুগের তথাকথিত 'বনেদি'বাবু নন, এ যুগ বণিকবাবুদের বনেদিয়ানার যুগ। ফলত, তেলি, সোনার বেনে, শুঁড়ী, ছুতোর প্রভৃতি জাতির বাবুরাই অর্থবিত্তের জোরে রক্ষিতার গৃহ সুন্দর করে সাজিয়ে দিতে পারছেন। হুতোমের গুরুদাস গুঁই নিছক ব্যতিক্রম নয়।

বস্তুত, সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে যেন লাম্পট্য ও বেশ্যাবাজির ঢল নেমেছে বাবুদের মধ্যে। নকশাকারের চোখে পড়েছে : 'সকল বেশ্যাবাড়ির দরজাতেই প্রায় জুড়ি, তেঘুড়ি, চৌঘুড়ি খাড়া রয়েচে। গৃহমধ্যে লালপানির ক্‌চক্‌চ, চেনাচুরের ছপ্‌ছপ ও বোতল গেলাসের ঠন্ ঠন্ শব্দ শুনা যাচ্চে।'[১৮৬] অবশ্য এরই মধ্যে বাবু কর্তৃক রক্ষিতাকে বেত্রাঘাত, কোথাও বা রক্ষিতার শাড়ি-গয়না নিয়ে পালানো— এসবও চোখে পড়ে। সার্বিকভাবে বাবুসমাজে সেদিন একটাই উৎসব— বেশ্যাবাজি এবং একটিই অনুপান— মদ। 'সুলভ পত্রিকা'র প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, 'এতদ্দেশীয় প্রায় অধিকাংশ লোক, শিশুকালাবধি কি গৃহে,

কি অন্যত্রে, সর্ব্বদাই কুসংসর্গজালে জড়িত হইয়া থাকেন। গৃহমধ্যেই তাঁহারা পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজনকে অহরহ অপরিমিত পানদোষে ও বেশ্যাবিলাসাদি বহুবিধ কুকর্ম্মে জীবনযাপন করিতে দেখেন; তবে তাঁহারা ঐ সমস্ত প্রেয় পদার্থের স্বাদুগ্রহ করিতে কেন লজ্জা ও আশঙ্কা করিবেন;... প্রত্যক্ষ গোচর করা গিয়াছে, যে অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্র বংশেও গুরুজনের দৃষ্টান্তনুবর্ত্তি হইয়া ক্রমে ক্রমে সকলেই ঘোরতর মদিরামত্ত বা লম্পট হইয়া উঠেন।'[১৮৭] অতএব, সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যেও শহর জুড়ে মদিরামত্ত বেশ্যাবাজ বাবুদের উল্লাস। এবং কলকাতা এই বাবুদের কাছে উক্ত দু'টি কারণে তীর্থক্ষেত্রে পরিণত— 'এখানে গৃহস্থবাড়ির চেয়ে বেশ্যাবাড়ির সরস্বতী পুজোর সংখ্যা ও জাঁকজমক শতগুণে অধিক। অনেক বড়মানুষ নিজ বাড়িতে বুট ও বীরখণ্ডী বরাদ্দ করে, মুদীর দোকানে বরাৎ দিয়ে, দু হাজারী তোড়া নিয়ে নূতন বাড়িতে হাজির হলেন। এখানকার বাবু, পুজো, ধর্ম্ম, ঠাকুর ও বেশ্যাদিগকে ধন্যবাদ।'[১৮৮]

সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে বেশ্যালয়ের ছোটো ছোটো মেয়েদের 'নাম ফিরিয়ে নাম রাখার' প্রথা প্রচলিত ছিল। অনেকের গান-বাজনা ইত্যাদির তালিম শুরু হল এই উপলক্ষ্যেই। তা ছাড়া শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়া নবীনা বেশ্যাদের বাবুসংসর্গের প্রথম দিনও কোথাও কোথাও পালিত হত। ফলে সব মিলিয়ে লম্পট বাবুদের উৎসাহিত হওয়া স্বাভাবিক। কোনো কোনো বাবু আবার এই উপলক্ষ্যে যাত্রা, পাঁচালি, খেমটা, হাফ আখরাই ইত্যাদি অসংগত বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে মত্ত হতেন। এমনকী ইংরেজি স্কুল থেকে বেরোনো শিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত 'জ্যাঠা'বাবুরা 'ক্রিস্টমাস্ ও বিলিতী নব বৎসর' উদ্‌যাপন করে যাঁরা কিছুটা আর্থিক কারণে, কিছুটা শারীরিকভাবে পেরে উঠতে না পেরে ম্রিয়মাণ হয়ে আছেন, তাঁদের ভিতরেও কেউ কেউ 'ভিতরে ভিতরে বাগান, বিবি ও শুঁড়ীর সঙ্গে ক্রেডিটে বন্দোবস্ত' করে রেখেছেন।[১৮৯]

এই নকশাতেও ব্রাহ্মবাবুদের প্রসঙ্গ এসেছে। নকশাকার 'ইয়ং বেঙ্গল' ও ব্রাহ্মবাবুদের এক করে দেখেছেন। সংস্কারমুক্তির ব্রাহ্ম পথ তাঁর ব্যঙ্গের লক্ষ্য। একইসঙ্গে ব্রাহ্মবাবুদের ভণ্ডামিও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে ভোলেন না তিনি। সেদিন ব্রাহ্মবাবুরা অনেকেই পরিবারের দোহাই দিয়ে, অনেকে প্রতিবেশীর অনুরোধের অজুহাত দিয়ে বাড়িতে দোল, দুর্গোৎসব, সরস্বতী পূজা করতেন। নকশাকার ব্যঙ্গ করে বলেছেন: 'এক জন ব্রাহ্ম মাটির সরস্বতীর চুড়োর উপর ''ওঁ তৎ সৎ'' লিখে পৌত্তলিকদের ঢাকঢোলের পরিবর্ত্তে পিয়ানো এবং হারমোনিয়ম বাজিয়ে দু'দণ্ড আয়েস কর্ব্বেন স্থির করেচেন। তিনি এজন্য দোষী হতে পারেন না। যখন ব্রাহ্মশ্রাদ্ধ, ব্রাহ্ম অন্নপ্রাশন, ব্রাহ্ম জাতকর্ম্ম, ব্রাহ্ম সূতিকাপুজো ও ব্রাহ্ম উপনয়ন প্রভৃতি চল্‌চে, তখন ব্রাহ্মমতে সরস্বতী পুজো ও দুর্গোৎসব না হতে পারে কেন?'[১৯০] ইতিপূর্বে উল্লেখিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখদের বাড়ির দোল-দুর্গোৎসব-অন্নপ্রাশন ইত্যাদির প্রসঙ্গে এই বক্রোক্তি মনে করা যেতে পারে। উল্লেখযোগ্য যে, দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পিতার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে হিন্দুমতে পারলৌকিক ক্রিয়ায় অংশ না নিয়ে ব্রাহ্মমতে কঠোপনিষৎ পাঠ করে শ্রাদ্ধ সারেন। তাঁর নিজের কথায়, 'ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরোধে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের এই প্রথম দৃষ্টান্ত।'[১৯১] পরবর্তীকালের বিখ্যাত বাংলা কার্টুন-পত্রিকা 'বসন্তক'-এও ব্রাহ্মধর্মের এ জাতীয় ক্রিয়াকর্মগুলির প্রতি ব্যঙ্গ করা হয়েছে প্রায়শই। নিশাচর মত প্রকাশ করেছেন যে, এই দ্বিচারিতার জন্যই ব্রাহ্মধর্ম 'ছেলেদের খেল্‌বার লাটিম ও দুর্গাবাড়ির লাড়ু মুড়কির দলে গণ্য' হচ্ছেন।[১৯২] এমনকী ব্রাহ্মদের প্রার্থনাসভার গান-বাজনাকে খেমটার সঙ্গেও তুলনীয় বলে তিনি উপহাস করেছেন।[১৯৩]

এঁদের পাশাপাশি সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে কোনো কোনো বাবু বাড়িতেই ইয়ারদোস্ত নিয়ে মদের আসরে মেতেছেন; এমনকী নেশার ঘোরে পিতাকে 'মাইডিয়ার বাবা' বলে তাঁর নতুন রক্ষিতার বাড়িতে

নিয়ে যেতে চেয়েছেন।[১৯৪] কেউ কেউ আবার প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে বাবুয়ানা দেখাতে নিমন্ত্রিতদের ও দর্শনার্থীদের উপর গোলাপ বৃষ্টি করছেন, আতর ছড়িয়ে অভ্যর্থনা করছেন। নিশাচরের মন্তব্য, 'আদরের সামগ্রী যেরূপে গ্রহণ কর্ত্তে হয়, কল্‌কেতার বাবুরা তাহা বিলক্ষণ জানেন।'[১৯৫] যদিও এইরকম ছবি খুব কম বাবুদের বাড়িতেই দেখা গেছে। বাকি বাবুরা সকলেই নিজ নিজ রক্ষিতার বাড়িতেই আমোদ-আহ্লাদে মত্ত হয়েছেন। বস্তুত, নিশাচরের রচনা থেকে মনে হতে পারে, কলকাতার অধিকাংশ বাবুই তখন বেশ্যাবাজির মতন নিকৃষ্ট আমোদে মত্ত। উপসংহার অংশে লন্ডন ও প্যারিসে বেশ্যার সংখ্যা যথাক্রমে ৮০,০০০ ও ৯০,০০০ হাজার বলে উল্লেখ করেও কলকাতার ক্রমবর্ধমান বেশ্যাসংখ্যার জন্য উদ্‌বেগ প্রকাশ করেছেন। এমনকী ভদ্রপল্লীর গা ঘেঁষে গড়ে ওঠা বেশ্যাপল্লীগুলির খাতক কে, এ বিষয়ে তিনি প্রত্যক্ষ ইঙ্গিতই করেছেন বিত্তবান বনেদি ও ভুঁইফোঁড় উভয় শ্রেণির বাবুদের প্রতিই।

'পল্লীগ্রাম তীর্থ' নামক শেষ নকশায় মূলত কলকাতার দৃষ্টান্তে মফস্সল ও অন্যান্য গ্রাম-শহরে ক্রমাগত জন্ম নেওয়া বেশ্যাপল্লীগুলি তাঁর লক্ষ্য। পূর্বে কিছু ধীবরকন্যা এই কাজ গুপ্তভাবে করত জানিয়ে ১২৪২ সালের শ্রাবণ মাসে জনৈক ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিজগ্রামে বেশ্যাপল্লী স্থাপনের পরই এই কাজ পল্লীঅঞ্চলে বৃদ্ধি পেয়েছে বলেছেন তিনি। তবে এই দৃষ্টান্ত স্বকপোলকল্পিত বলেই মনে হয়। সাধারণত, বেশ্যাগমন নাগরিক জীবনেরই অঙ্গ। কারণ, যেখানে নগর গড়ে ওঠে সেখানে নানান কাজের খাতিরে বহু লোকের সমাগম হয়। বিশেষত বিদেশি আগন্তুকদের মধ্যে যাঁরা নগরে আসতেন, সুপ্রাচীন কাল থেকে তাঁরাই ছিলেন গণিকাদের প্রধান ঘাতক। কিন্তু নিশাচর দেখিয়েছেন, বর্তমানে এই অভ্যাস ক্রমশ পল্লীজীবনেও সুপ্রচলিত। এঁদের উপভোক্তাদের মধ্যে শৌখিন গাড়োয়ান থেকে রসুয়ে ব্রাহ্মণ, দারোয়ান থেকে নায়েব, গোমস্তা, পেস্কার থেকে গোয়ালা, কাছারির আমলা থেকে অকর্মণ্য হুজুর তথা বাবুরা সকলেই রয়েছেন। অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সামান্য অর্থের বিনিময়ে গ্রামাঞ্চলে এইসব রূপোপজীবিনী নারীরা খাতকদের মনোরঞ্জন করতেন। নিশাচরের মতে, 'এই সকল স্থানে যে সকল ভদ্র গণেশ আগমন করেন, তাঁহাদের বাঁকা সোজা সিঁথি করা চুল ফিরোনো, পটোলডাঙার পম্প ও গরাণহাটার বার্নিস করা বাছুর পায়, পাকানো উড়ুনি কাঁধে ও ফুরফুরে তুলো করা আতর কানে। অবশিষ্টদের খালি পা ও গামছা কাঁধে।'[১৯৬] অর্থাৎ উপভোক্তা শ্রেণির মধ্যে বিত্তগত ফারাক সীমাহীন, অথচ বিকৃত আমোদের দিক থেকে উভয়েই সমান মানসিক সংস্কৃতি বহন করেন।

বস্তুত, কলকাতার দৃষ্টান্তে পল্লীঅঞ্চলের নিয়ম-শৃঙ্খলা, ধর্মভাবনা, সংস্কার সবই যে ভেঙে পড়েছে, এ সত্য স্বীকার করেছেন তিনি। পরশ্রীকাতরতা, দ্বেষ, দলদাসত্ব এবং 'জুয়াচুরি বাবুগিরিই' প্রধান হয়ে উঠেছে। নিশাচর উল্লেখ করেছেন, মূলাজোড়ের এক ধনীবাবু তাঁর এক উমেদারের স্ত্রীকে ভোগ করে তাকে চাকরি দেন। এইসব দৃষ্টান্তে বাবুয়ানার বিষময় ফলটিই ফুটে ওঠে। 'সরস্বতী পূজা' শীর্ষক রচনায় তিনি বলেছিলেন, 'কেউ একটু মনে মনে বড়লোক হলে, সখের যাত্রা, সখের পাঁচালি, হাফ আখড়াই ও গুলীর আড্ডা করে জাঁকিয়ে বসেন। কিছুদিন গৌণে মদের ভাঁটি বস্‌বে। এখানে এখন কেবল শূন্যগর্ভ, আড়ম্বরপূর্ণ, বৃথা বাক্যব্যয়, ঘোরতর আত্মাভিমান, অদ্ভুত উপহাস-রসিকতা ও অসম্ভব লম্পটতাই বিদ্যমান রোয়েচে।'[১৯৭] কলকাতার বাবু প্রসঙ্গে উক্ত এই বক্তব্য পল্লীগ্রামের বাবুয়ানার শখযুক্ত মানুষগুলির সম্পর্কেও প্রযোজ্য। বিশেষত পল্লীগ্রামের বেশ্যাবাজিতে শহরের মতো অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় না বলে, অল্পসাধ্যযুক্ত যেকোনো পেশার মানুষই এঁদের উপভোক্তা হতে পারেন। সে কারণেও, মফস্সল ও পল্লী অঞ্চলে দ্রুত বেশ্যাদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং পুরুষদের মধ্যে লাম্পট্যদোষের প্রসার ঘটছে বলা যায়।

নকশাকার নিশাচর শেষপর্যন্ত অবশ্য শুভবুদ্ধির উপর আস্থা রেখেছেন এবং কামনা করেছেন, বাবুরা প্রকৃত 'সুসভ্য' হলে এ জাতীয় দোষ থেকে শতহস্ত দূরে থাকবেন।

নিশাচর তথা ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'সমাজ-কুচিত্র' কেবলমাত্র হুতোম-পক্ষীয় শিবিরের রচনা হিসাবেই নয়, উনিশ শতকের মধ্যপর্বের সমাজজীবন তথা বাবুদের ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য উপাদান হিসাবেও উল্লেখের দাবি রাখে। লেখকের দৃষ্টিকোণ স্বতন্ত্র আকারে প্রকাশিত, যথা—

এক. কলকাতার বাবুসমাজের প্রধান দোষ হিসাবে 'লাম্পট্য'কে নির্দেশ;

দুই. ব্রাহ্মবাবুদের প্রকৃত ও ভণ্ড— এই দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত করে ভণ্ড ব্রাহ্মদের প্রধান দোষ হিসাবে লাম্পট্য ও অনৃতভাষণকেই দায়ী করা হয়েছে;

তিন. কলকাতার নাগরিক জীবনে ক্রমপ্রসারিত বারাঙ্গনা গমনের বিকৃতিকে নানা দিক থেকে দেখবার চেষ্টা হয়েছে;

চার. কোনো সৎ বা মহৎ কার্যে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ অপেক্ষা আনুষঙ্গিক বিষয়ে মত্ত হওয়া যে বাবুদের অন্যতম লক্ষণ, তা বলা হয়েছে;

পাঁচ. সর্বোপরি, গ্রামাঞ্চলে (এবং মফস্সলে) কলকাতার বাবুদের প্রভাবে ক্রমবর্ধমান লাম্পট্য ও বেশ্যাগমনের প্রসঙ্গটিকেও গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে।

সব মিলিয়ে নিশাচর প্রণীত 'সমাজ-কুচিত্র' উনিশ শতকের মধ্যভাগের বাবুদের জীবনের অনাচার, ভণ্ডামি ও লাম্পট্যের অন্ধকার আলো ফেলে উক্ত শ্রেণিকে সচেতন করতে চেয়েছে বলাই যায়।

'শ্রীযুক্ত দশ অবতারের এক অবতার কর্তৃক প্রণীত' নকশা 'পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব' (১৮৬৮)-এর প্রকৃত লেখক রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ। ইনি সংস্কৃত কলেজের একজন কৃতী ছাত্র। প্রথমে পটলডাঙা ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনে, পরে বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন কলেজ ও বউবাজার শাখা বিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত শিক্ষক হিসাবে সাধারণের নিকট ইনি সমধিক পরিচিত। রামসর্বস্বের জন্ম চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত কোদালিয়া গ্রামে। সংক্ষিপ্ত এই পুস্তিকায় গ্রামীণ জীবনে বাবুদের রূপ বিশেষ একটি উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়েছে। ইতিপূর্বে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তথা নিশাচর 'সমাজ-কুচিত্র' গ্রন্থে পল্লীগ্রামগুলিতে নিষ্কর্মা বাবুসহ সাধারণ ভদ্র-অভদ্র পুরুষের লাম্পট্য ও বিকৃত আনন্দের চিত্র উপস্থিত করেছিলেন। একইসঙ্গে গ্রামীণ জীবনের আপাত সুস্থিতি যে ভেঙে পড়েছে, কলকাতার অনুকরণে নব্য বাবুয়ানার দোষগুলি অতি দ্রুত নিজেদের প্রসার বৃদ্ধি করেছে, সেই চিত্র উপস্থাপিত হয়েছিল। রামসর্বস্ব অবশ্য ব্যভিচারের ইঙ্গিতমাত্র দিয়েছেন। তাঁর মূল লক্ষ্য দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে হিন্দু জমিদার বাবুদের ধর্মজ্ঞানহীন দেখানেপনা, ভণ্ডামি, মদ্যাসক্তি ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে তিনি সচেতন ছিলেন এবং পাঠকদের তিনি বলেছেন, 'আমরা আজকে বাবুদের সব রকম সুখ ও সব রকম দুঃখ দেখে নয়ন সার্থক করেছি। কেবল একটা বিষয়ে বাবুদের অঙ্গহীন ছিল। আমরা তাঁদের ইয়ারকি মহলে ''সব্ চুলো'' দেখিনি, তবে যদি সময় বুঝে আনা হয়ে থাকে তো, জানতে পারি নে। যা হোক যখন আমরা তা দেখতে পাইনে, তখন আপনারা কোত্থেকে দেখবেন, কাজেই ঐটিতে ক্ষোভ রেখে দিন।'[১৯৯] যদিও নকশাকারের এইরকম কোনো ব্যভিচার চোখে পড়েনি, তবে 'আনা হয়ে থাকা'র বক্তব্যের মাধ্যমে বোঝা যায়, গ্রামাঞ্চলেও এসব ব্যাপার আনা-নেওয়া চলত। নিশাচরের পূর্বতন উদ্বেগের সমর্থন মেলে রামসর্বস্বের ইঙ্গিতে।

সাধারণভাবে, হিন্দুবাঙালির সর্বপ্রধান উৎসব দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে গ্রামীণ জীবনে যে সাময়িক আনন্দ ও উদ্দীপনার পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তা নকশাকারের চোখে পড়েছে। তবে শহরের বাবুদের মতো গ্রামীণ বাবুদের বাড়ির পূজায় জাঁকজমক যেমন কম, আপ্যায়ণও তেমনি সীমিত। গ্রাম্যবাবুদের বাড়ি জাতি ও অবস্থাভেদে তিন প্রকার রূপ। সাধারণত লুচি-মণ্ডার দেখা মেলে না, তবে—[২০০]

(ক) 'বামুনবাড়ি হলে কেবল ভাতের কেত্তন হয়, চাষাভুসোরা তাই খেয়ে থাকে; তবে সন্ধ্যাবেলা আরতির সময় এক সের ময়দার লুচি ভেজে, দুর্গাকে দেখান হয়, শেষে বাড়ির ছেলেপিলেরা তাই খায়। তেতো-গুড়ের নারিকেল লাড়ু, আর আধরাঙা মুড়কি, এ তো অপর সাধারণের জন্য বরাদ্দই আছে।'

(খ) কায়স্থ বা অন্যান্য জাতির বাড়ি দুপুরবেলা দু-পাঁচজন ব্রাহ্মণের ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়, তবে লুচি-সন্দেশের মান অতিশয় খারাপ;
এবং

(গ) তিলি মালী গন্ধবেণের বাড়ি ব্রাহ্মণভোজনও হয় না, কেবল পূজাটুকুই সার।

মনে রাখতে হবে যে, আর্থিক সামর্থ্য না থাকলে দুর্গাপূজার মতো বড়ো উৎসব করা সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে অসম্ভব। অতএব গ্রামীণ জীবনে অবস্থাপন্ন বাবুদের একটি সামাজিক বিন্যাস পাওয়া যায়, সে বিন্যাস যতটা না বিত্তগত, তার চেয়েও বেশি রুচিগত—

(ক) ব্রাহ্মণেরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণবাবুরা বিত্তবান এবং রচিসম্পন্ন, ফলে তেতো-গুড়ের নারকেল নাড়ু হলেও প্রজাদের কপালে জোটে;

(খ) কায়স্থবাবুরা বিত্তবান হলেও ব্রাহ্মণবাবুদের তুলনায় অনুদার; রুচি ও আয়োজনের মানও যথাযথ নয়;

(গ) তিলি মালী গন্ধবেণেদের বিত্ত থাকলেও রুচি নেই; সামাজিক অনুদারতাও তাদের মানসিক অবস্থান বুঝিয়ে দেয়।

গ্রামীণ জীবনে বাবুত্বের শ্রেণিবিন্যাস কেমন ছিল, এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়। একইসঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণির বাবুদের প্রতি সমাজের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিচয় মেলে।

তবে, নকশাকারের উদ্দিষ্ট বাবুটি বেশ সংগতিপন্ন। হুতোমের প্রতিধ্বনি করে নকশাকার জানিয়েছেন : 'প্রায় দু-শ বৎসর হলো, আমাদের বাবুর পিতামহ নবাবের সরকারে চাকরি করে বেশ দশ টাকার সংগতি করে যান, তারপর স্বর্গীয় কর্ত্তামহাশয়ও নানা ফলে কৌশলে তা হতে বেশ রোজগার করেন; করে, একখানি তালুক ও কিঞ্চিৎ জমি জমাৎ ও আবাদ করে যোত্রাপন্ন হয়ে উঠেন, কাজেই দোল দুর্গোৎসব রাস প্রভৃতি ফাঁক দিতেন না।'[২০১] বনেদি বড়োমানুষ বলতে যা বোঝায়, বাবুরা হলেন তাই। ইংরেজের হাত ধরে অবস্থার সুযোগ নিয়ে কিংবা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের হাত ধরে বাবুরা ভুঁইফোঁড় 'হঠাৎবাবু' হয়ে ওঠেননি। বর্তমান বাবুটি 'বিলক্ষণ হিন্দু', অতএব পিতৃ-পিতামহের আমলে উৎসব প্রথানুযায়ী তিনিও পালন করে থাকেন। ব্রাহ্মণ-সজ্জনদের বিদায়-আদায়ও দিতে হয় তাঁকে। নকশাকারের বুদ্ধিদীপ্ত পর্যবেক্ষণে বাবুর অন্য খরচও ধরা পড়েছে : 'এ ছাড়া সময়ে সময়ে বলাৎকার ও দাঙ্গাহেঙ্গামারও কিছু কিছু জরিমানা ব্যয় করে থাকেন।'[২০২]

বস্তুত এই একটি মন্তব্যে আমাদের আলোচ্য বাবুটির সমস্ত মানসিক চরিত্রটি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়। বলাৎকার ও দাঙ্গাহাঙ্গামার মতো ঘটনা মাঝে মাঝেই ঘটাতেন নিশ্চয়ই, নাহলে মাঝে মাঝেই জরিমানা দেওয়ার প্রশ্নই উঠত না। দেশে আইন থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র অর্থবিত্তের জোরে বাবুরা অনেকসময় নিছক জরিমানা মাত্র দিয়েই যে কীভাবে ফাঁক পেয়ে যেতেন, বর্তমান নকশার এহেন বক্তব্যে সেই ভয়ংকর ছবিই দেখতে পাওয়া যায়।

বাবুটির প্রসঙ্গে এসেছে ছোটোবাবুর কথা। এমনিতে বাবুরা গোঁড়া হিন্দু, যদিও পূজাবাড়িতে লুচিমণ্ডার সঙ্গে 'বিফ্‌স্টিক' পর্যন্ত পাওয়া যায়। কিন্তু ছোটোবাবু ব্রাহ্ম হয়েছেন, এমনকী দেশে নিজের উদ্যোগে একটি ব্রাহ্মসমাজও গড়ে তুলেছেন। ইতিপূর্বে নিশাচর ব্রাহ্মবাবুদের কথা বলতে গিয়ে প্রকৃত নিরপেক্ষ ব্রাহ্ম এবং ভণ্ড ব্রাহ্মের কথা বলেছিলেন। ছোটোবাবুটি দ্বিতীয় শ্রেণির, এঁর রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশব সেনের উপর ভক্তি প্রবল। আবার পূজা হলে অঞ্জলি না দিয়ে জলগ্রহণ পর্যন্ত করেন না। পূজার মধ্যে উপাসনার দিন পড়লে বিকেলে সমাজে গিয়ে 'ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্' করেন আবার আরতির সময় 'বাজনার তালে তালে' হাততালি দিয়ে আরতি শেষে প্রণামও করেন।

ব্রাহ্মদের মধ্যে এই ভণ্ড শ্রেণির কথা হুতোম বলেছেন, নিশাচর সমালোচনা করেছেন। নিরপেক্ষ ও সৎ ব্রাহ্মদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এইসব ভণ্ড-দ্বিচারী ব্রাহ্মদের জন্যই যে প্রকৃত ব্রাহ্মদের এবং ব্রাহ্মসমাজেরও ক্ষতি হচ্ছে, সেকথা রামসর্বস্বও উল্লেখ করেছেন : 'এইরূপ ব্রাহ্ম হতেই তো ব্রাহ্মধর্মের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা কমে আসচে। ফলতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম নিত্যধর্ম্ম, এবং অনেকেই প্রকৃত ব্রাহ্ম আছেন। যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মে অনেক ''বক বিড়ালকে'' দেখতে পাওয়া যায় সকল ধর্ম্মেই তেমন আছে, তাতে ধর্ম্মের দোষ কি?'[২০৩] বস্তুত ব্রাহ্মবাবুদের উপর নকশায়, প্রহসনে, আখ্যানে রক্ষণশীলদের নঞর্থক দোষারোপ এবং আক্রমণের প্রেক্ষিতে এই উদার নিরপেক্ষ দৃষ্টি নকশাকারের দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতার প্রমাণ বহন করে।

ছোটোবাবুর যে বন্ধুরা কলকাতা থেকে পূজা উপলক্ষ্যে এসেছেন গোরুর গাড়িতে চেপে, তাঁরা সকলেই গাড়িতে বসে মদ্যপান করায় টুপ ভুজঙ্গ হয়ে আছেন দেখা যায়। এঁরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছেন, প্রত্যেকের একটি করে কারপেটের ব্যাগ আছে, তার মধ্যে একটি প্রকাণ্ড চামড়ার ব্যাগে এক ডজন 'নাম্বার ওয়ান রেস্ত' আছে। তার মধ্যে তিনটি গলাধঃকরণ করার ফলেই তাঁদের বেশবাস, হুঁশ সবই নেশার জগতে গতাসু হয়েছে। শহুরে বাবুদের এই মদ্যাসক্তি, নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে অসংস্কৃত ব্যবহার শহুরে বাবুদের চারিত্রিক রুচিহীনতা, প্রকৃত শিক্ষার অভাব এবং চারিত্রিক দীনতারই প্রমাণ দেয়। ছোটোবাবু তাঁর কলকাতার বন্ধুদের অভ্যর্থনা করে ঘরে তোলার আগেই অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে তাঁরা 'পপাত ধরণীতলে'। পাড়াগেঁয়ে ছেলেরা পর্যন্ত তাঁদের এই বেলেল্লাপনায় উপহাস করেছে। সপ্তমী পূজার দিনও তাঁদের মদ্যপানের কমতি নেই।

বাড়ির বড়োবাবুটি গ্রামসমাজে দলপতি, 'দলস্থ ও গ্রামস্থ বামুন কায়েতদের জাত রাখবার ও জাত মারার কত্তা'।[২০৪] সম্প্রতি এক ব্রাহ্মণের ছেলেকে মুসলমানের দোকানের বিস্কুট খাওয়ার জন্য এবং এক কায়স্থকে নিজ মেয়েকে বিদ্যালয়ে পড়ানোর জন্য যথাক্রমে জাতিচ্যুত ও দলচ্যুত করেছেন। এহেন বাবুটি নিজে রাত দশটা বাজলেই মৌতাতে বসেন। নানারকম আমোদ-আহ্লাদ করে, তারকেশ্বরের বামুনের বাঁধা 'বাইপেডের কারি' খেয়ে কোনোরকমে কাঁচা ঘুম ভাঙতে বাসি মুখেই জল-লবঙ্গ চিবুতে চিবুতে চেলীর জোড় পরে অঞ্জলি দিতে বসেন। পুজোর দিনে খাসির নিমখাসা রকমের 'রোস্ট' করার আদেশ দেন। মদের

নেশায় মানভঞ্জন পালায় হনুমানের লঙ্কাদাহন খোঁজেন। ইয়ারদোস্তসহ মদমত্ত হয়ে অধিকারীকে ঘিরে নাচতে থাকেন। অথচ এঁরাই দলপতিবাবু। নকশাকার গোঁড়া হিন্দু দলপতির অন্তর্গত বিকৃতি, ভণ্ডামি, মিথ্যাচারের স্বরূপ দেখিয়ে বাবুদের সার্বিক অধঃপতিত চরিত্রকে তুলে ধরতে চান। যিনি অন্যকে জাতিচ্যুত বা দলচ্যুত করেন তাঁর নিজের পাপ ও অনাচার পাহাড়প্রমাণ।

ছোটোবাবুটিও কম যান না। ব্রাহ্ম-ভজনার নাম করে মদ্যপান করে বেহেড হয়ে বন্ধুবর্গ সহ তিনি 'রিফরমেশনে'র আনন্দ অনুভব করেন। বুধবার দিন অষ্টমী পড়ায় পূজারতির পর সমাজে গিয়ে পূর্ব্ববৎ ভজনা করেন। এমনকী নবমীর বলিদানের পর কোমর বেঁধে রক্ত-কাদায় গড়াগড়ি করতেও দেখা যায় তাঁকে এবং আরও অনেক ব্রাহ্মবাবুকেই। আবার যাঁরা সাহেবি মনোভাবাপন্ন, বাইরে কোনো 'হিঁদুয়ানি' সংস্কার বা পৌত্তলিকতার প্রতি মনের অবিশ্বাস জ্ঞাপন করেন, সাহেবদের সঙ্গে খানা খেয়ে সংস্কারমুক্ত হতে পেরেছেন বলে ভাবেন, অথচ এদিন পূজা ও বলিদানের পর 'কোমর বেঁধে কাদামাটি করবেন'। নকশাকার এই আপাত শিক্ষিত বাবুদের এককথায় 'হিপোক্রিট' বলে পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচীন রক্ষণশীল এবং নব্য প্রগতিপন্থী উভয় দলকেই 'ভণ্ড' আখ্যা দিয়ে লেখক বলেছেন : 'যাঁরা প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁরা হরিনামের ভান দেখিয়ে গোপনে যাবতীয় ঘৃণিত কর্ম্মে আসক্ত হয়ে থাকেন; আর যাঁরা নব্যসম্প্রদায়, তাঁরা তো ইংরেজদের কাপি কর্ত্তে গিয়ে মদ মুরগী খেয়ে ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের ন্যায়, প্রথম কাকের দল, শেষে ময়ূরের দল হতেও চ্যুত হচ্ছেন।'[২০৫] এই আদ্যন্ত ভণ্ডামির কারণেই বাঙালিবাবুরা যে কোনো মহলেই গ্রহণযোগ্য হতে পারলেন না, স্বদেশের উপকারে আসতে পারলেন না, সেকথা নকশাকার মনে করেন। আসলে, উনিশ শতকের মধ্যপর্বে মূলত শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির ব্রাহ্মদের হাত ধরেই বাঙালি জীবনে প্রগতি, আধুনিক শিক্ষার চর্চা, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, স্বদেশিয়ানা ইত্যাদি প্রবেশ করেছিল। প্রকৃত ব্রাহ্মদের হাতে চর্চিত হয়ে এগুলি যেমন বাঙালির চিন্তা ও রুচির ব্যাপক পরিবর্তন করে, তেমনি পোশাকি প্রগতির আড়ালে অনেক ভণ্ড সুযোগসন্ধানীও ব্রাহ্মবাবুর ভেক ধরেছিল। গ্রন্থসূচনায় সংযোজিত গানে লেখক সমকালের প্রেক্ষাপট ও বাবুদের অনাচারকে ধরতে চেয়েছেন—

'কি মজার বাঙ্‌লা দেশ।
ছেলে বুড়োয় মদে রাঁড়ে, মুরগী মারে এক শেষ॥
দেখ আশেপাশে লোকে হাসে, কিবা সিঁতি কাটা বেশ;
হলো চাষার ঘরে ধর্ম্মপুত্র, বড়মানুষের ধর্ম্মে দ্বেষ।
    যাঁরা হিঁদুর টোপর ধরে, তারা লোকসমাজে তরে,
কিন্তু, লুকিয়ে লুকিয়ে মদ মারে, রেতে ঐ নটবর বেশ।
    খাবার সময় ব্রাহ্মধর্ম্ম, সদা তাই করে অধর্ম্ম,
না বোঝে ধর্ম্মের মর্ম্ম, ওঁ ওঁ কেবল মুখেই শেষ॥'[২০৬]

বোঝা যায়, সমকালীন জীবনে বাবুদের সার্বিক নঞর্থক ভাবনা-চিন্তাকে, সংস্কারহীন পাশ্চাত্যমুখী জীবনদর্শনকে যেমন তিনি মেনে নিতে পারেননি, তেমনি রক্ষণশীলতার নামে নানান কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন যেসব বাবু, তাঁদেরও সমালোচনা করেছেন। একইসঙ্গে নিশাচরের মতো তিনিও বাংলার পল্লীজীবনে বাবু-সংস্কৃতির আগ্রাসন বা থাবা যে ক্রমপ্রসারিত, সেই সত্যের কথা স্বীকার করেছেন। উনিশ শতকের বাবু ইতিহাসে এজন্যই 'পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব' ক্ষুদ্র পুস্তিকা হলেও, তুচ্ছ নয়।

উনিশ শতকে কলকাতা শহরের নৈতিক স্বাস্থ্য বিশেষ ভালো ছিল না। কলকাতা জুড়ে তখন কয়েকটি প্রধান বেশ্যালয়, এ ছাড়া নির্দিষ্ট অঞ্চলের বাইরেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে অগণিত বেশ্যাগৃহ। হুতোম তো বলেইছেন, 'বেশ্যাবাজীটি আজ কাল এ সহরে বাহাদুরীর কাজ ও বড় মান্‌ষের এলবাত পোসাখের মধ্যে গণ্য, ... কল্‌কেতা সহর এই মহাপুরুষদের জন্য বেশ্যাসহর হয়ে পড়েচে, এমন পাড়া নাই যেথায় অন্তত দশ ঘর বেশ্যা নাই। হেথায় প্রতি বৎসর বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্চে বই কম্‌চে না।'[২০৭] যেকোনো রাজধানী শহরের ক্ষেত্রেই এটা অবশ্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য— বহু বিচিত্র মানুষের বহু বিচিত্র চাহিদার যেখানে একত্র সম্মিলন ঘটে, সেখানে আলোর মাঝে মাঝে অন্ধকার সযত্নে নিজের ঠাঁই করে নেয়। হুতোম অবশ্য পৃথিবীর আদিম পেশার প্রতি বাবুদেরই আত্যন্তিক টান এবং সেই কারণে বেশ্যাদের সংখ্যাবৃদ্ধির কথা বলেছেন, তবে, বাবুদের পাশাপাশি বেশ্যাবাজির বৃদ্ধিতে ইংরেজ সৈনিকদের অবদান যে কম ছিল না, সিপাহি বিদ্রোহের অনতিকাল পরেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়। ১৮৬০-এর দিকে জানা যায়, ফোর্ট উইলিয়ামের সৈন্যদলের এক-তৃতীয়াংশ সিফিলিস রোগে আক্রান্ত। শাসকের পক্ষে উদ্‌বেগজনক এই সংবাদের ফলে সরকারের টনক নড়ে এবং এ বিষয়ে হেল্‌থ অফিসার ফেবার টনারের ১৮৬৪ সালের রিপোর্টে কলকাতার নৈতিক স্বাস্থ্য বিষয়ে উদ্‌বেগ প্রকাশ করা হয় এবং এর জন্য দায়ী করা হয় নিম্নবর্ণের নেটিভ ও খ্রিস্টানদের, যাঁদের দরুন শহরে বেশ্যাদের রমরমা বাড়ছে এবং একইসঙ্গে প্রায় দ্রুতগতিতে সিফিলিস প্রভৃতি যৌন ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ছে।[২০৮] আমরা ইতিপূর্বেই জানিয়েছিলাম টনারের হিসাব মতো ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় দেহপসারিণীর সংখ্যা ৩০,০০০ হাজারেরও বেশি। ভারতীয় বারঙ্গনাদের সঙ্গে ইংরেজ সৈনিকদের যৌন-সম্বন্ধকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং যৌনরোগের প্রকোপ থেকে নিস্তার পেতে বিদেশি শাসকশ্রেণি ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের 'চোদ্দ আইন' বা 'The Indian Contagious Diseases Act, 1868' প্রণয়ন করেন, যা চালু হয় ১৮৬৯ সালের ১ এপ্রিল থেকে। একইসঙ্গে মি. টনারের পরামর্শ অনুযায়ী এ জাতীয় রোগের চিকিৎসার জন্য ডাঃ লকের নামাঙ্কিত 'লক্ হাসপাতাল'ও চালু করা হয়। এই আইন প্রণয়নের ফলে কলকাতার বারাঙ্গনাদের মধ্যে প্রভূত আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, অনেকে পেশা বন্ধ হয়ে সমূলে বিনষ্ট হবার আতঙ্কে ফরাসি অধিকৃত চন্দননগরে পালিয়ে যান। বেশ্যাদের তরফে ভয় ছিল ভিটে-মাটি উচ্ছেদ হওয়ার, পেশা বন্ধ হয়ে গেলে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের; অন্যদিকে বাবুদের ভয় অন্যত্র— এই পেশা বন্ধ হয়ে গেলে তাঁদের শখ-আহ্লাদ মাটি হয়ে যাবে; যৌনরোগাক্রান্ত বেশ্যাসংসর্গে যৌন ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হলে তাঁদেরও চিকিৎসা করাতে হবে এবং তার ফলে লোকসমাজে তাঁরা হতমান হয়ে পড়বেন। শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে কলকাতার বহু বাবুই তখন 'বেশ্যাবাজি'র মাদকতায় মোহগ্রস্ত। অতএব বেশ্যাদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরও আতঙ্কিত হওয়া স্বাভাবিক।

সমকালে বটতলার লেখকেরা 'চোদ্দ আইন' নিয়ে চুপ করে ছিলেন না। ১৮৬৯ থেকে ১৮৭২-এর মধ্যে একাধিক প্রহসন ও গদ্যপুস্তিকা প্রকাশিত হয়, যেমন— অজ্ঞাত লেখকের 'বাহবা চোদ্দ আইন' (১৮৬৯), তারিণীচরণ দাসের 'বেশ্যা বিবরণ নাটক' (১৮৬৯), অজ্ঞাত লেখকের 'বেশ্যানুরক্তি বিষম বিপত্তি' (১৮৬৯), অঘোরচন্দ্র ঘোষের 'পাঁচালি কমলকলি' (১৮৭২), প্রিয়লাল দত্ত ও ললিতমোহন শীলের 'ভারত দর্পণ' (১৮৭২) ইত্যাদি। আনুমানিক ১৭ বৎসর বয়স্ক প্রাণকৃষ্ণ দত্ত 'চোদ্দ আইনকে' কেন্দ্র করে বাবু-বিবি ও সমাজের প্রতিক্রিয়াকে কেন্দ্র করে এই সময়েই রচনা করেন 'বদ্‌মাএস জব্দ' (১২৭৬ সাল; ১৮৬৯)। আখ্যাপত্রে উদ্ধৃত বক্তব্য অনুযায়ী এ গ্রন্থের বিষয়, '১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের চতুর্দ্দশ বিধি প্রচলনে

কলিকাতার দুষ্ট ব্যক্তিগণের ভাব পরিবর্ত্তন।'[২০৯] গ্রন্থ সূচনায়, যৌনরোগের প্রকোপ বৃদ্ধি এবং বেশ্যাবাজির প্রসার রোধের জন্য ইংরেজ শাসকের প্রভূত প্রশংসা করা এবং সেইসঙ্গেই অতীতে স্বাধীন রাজবৃত্তের অধীনে আমাদের জীবনযাত্রার প্রতি তুলনায় ইংরেজ আমল অনেক সুশাসিত বলা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' মধ্যশ্রেণির শাসকপ্রীতির সাক্ষ্য বহন করে। মেকলে ইংরেজি শিক্ষার মধ্যে দিয়ে যে শিক্ষিত কিন্তু বশংবদ রাজভক্ত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক' বাবুদের স্বপ্ন দেখেছিলেন, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত উক্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের দৃষ্টিকোণ থেকেই 'চোদ্দ আইন'কে বিচার করেছেন এবং কলকাতার বাবুদের 'বেশ্যাবাজি' বন্ধের সম্ভাবনায় উল্লসিত হয়েছেন।

নকশাটি ধরে রেখেছে ১৮৬৯ সালের ১ এপ্রিল, যেদিন থেকে 'চোদ্দ আইন' কার্যকর হবে, তার আগের দিনের ছবি। কাল থেকে 'চোদ্দ আইন' চালু হবে বলে বেশ্যারা যেমন চিন্তিত ও শোকাকুল, বাবুদের চিন্তা তার থেকে কিছু কম নয়। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ চোদ্দ আইনের নিয়মাবলী পাঠ করছেন, কেউ-বা ব্যাখ্যা করছেন, কেউ হাসি বা উপহাসের ছলে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখাবার কথা ভাবছেন, কেউ-বা নিন্দা করছেন আবার 'কাহারো মুখে কাষ্ঠ হাসি ও অন্তরে হৃত কম্প হইতেছে।' কারণ, নিয়মানুযায়ী, যাঁরা বেশ্যাদের গ্রাহক, তাঁদেরও নাম, ধাম, পরিচয় লেখাতে হবে থানায় গিয়ে, ফলে তাঁদের মনে যুগপৎ ভয়, লজ্জা ও আক্ষেপ :[২১০]

'কি হোল কি হোল মরি হায় হায় হায়।
নূতন আইন একি ঘটাইল দায়॥
মজালে মজালে মোরে মজালে এবার।
রেজিস্টারি না করিলে বার হত্তো ভার॥...
না করিলে বন্ধ হবে বেশ্যালয়ে যাত্তা।
বিষ সম বোধ হবে বসন্তের হাওয়া॥'

বেশ্যাসক্ত বাবুদের কাছে 'বেশ্যাবাজি' বন্ধ হওয়া মানে 'মৃতবৎ' বেঁচে থাকা। ফলে দেখা যায়, দিনরাত নেশা ও বেশ্যাবাজিতে ডুবে থাকা বাবুর আড্ডায় সকলেই ম্রিয়মাণ। কারণ ইয়ার বলেছে, 'দেখ না কেন তুমি একটী ইয়ারের শীরমণী তামাম দিন এতগুলি নেসা কল্লে কিন্তু রাত্তিরে একবার সিদ্ধেশ্বরীতলা কিম্বা বালা খানা টোল না দিলে বাঁচনা কিন্তু এখন আর তা হবার যো নেই, রেজিস্টারি না কোরে দরজায় মাথা গলালেই জরিমানা।'[২১১] দরিদ্র বাবুরা অর্থদণ্ড দিতে পারবে না, অতএব সেই ভয় তাদের আর বেশ্যাগৃহে যাওয়া হবে না। যারা অর্থবান, তাঁদের আবার চক্ষুলজ্জা, বাইরে মানসম্মানের ভয়। কেউ কেউ অবশ্য ভেবেছে চুরি করে হলেও যদি ভালো কাপড়, জুতো পরে সোনাগাছিতে 'বাবু হয়ে' যাওয়া যায়, তবে ছাড় পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু জানা যায় যখন, কারোর নিস্তার নেই চোদ্দ আইনের হাত থেকে, সে ভদ্র 'বাবু'ই হোক বা দরিদ্র, তখন বাবুদের আক্ষেপ, ইংরেজি শাসকেরা 'এটা ছোট বিলেত কোর্ব্বে এখানে আর বাঙ্গালী থাকতে দেবে না।'[২১২]

বাবুদের এই আড্ডার থেকেই জানা যায়, কোম্পানি প্রথমে আবগারির উপর নিয়ন্ত্রণ বসিয়েছিল, কিন্তু বাবুরা শুঁড়ির দোকানে যেতেন পিছনের দরজা দিয়ে, ফলে কোনো অসুবিধা ছিল না। কিন্তু কোম্পানি এই 'লুকোচুরি' টের পেয়ে আবগারির দর আকাশছোঁয়া করলে বাবুদের খুব অসুবিধা হয়েছে। এখন

বেশ্যাগমনেও এভাবে বিধিনিষেধ আরোপ করায় 'লোচ্চা' বাবুদের 'বিলাপধ্বনি'র আর শেষ নেই। তা ছাড়া, নতুন আইনে একজনের বেশি দু'জনের একসঙ্গে একটি মেয়েমানুষের কাছে গিয়ে 'ফূর্তি' করার জো নেই। অতএব, যেসব বাবুরা ইয়ারদোস্ত-মোসাহেব নিয়ে রক্ষিতা সংসর্গে 'ইয়ারকি' দিতে যেতেন, তাঁরা খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন দেখা যায়।

এঁদের পাশাপাশি প্রতিক্রিয়া দিতে দেখা যায় 'নব্য কুটিওলা' এবং 'প্রবীণ অফিসার'দের। সাদা ধুতি চাপকান ও পাট করা মলমলের চাদর-শোভিত 'নব্য কুটিওলা'রা যে ইংরেজি শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবু তা টের পাওয়া যায়, যখন তাঁদের কেউ কেউ বলেন যে, 'ডেলি নিউসে ওর গোড়াগুড়ি সব পড়িচি'।[২১৩] ইংরেজি সংবাদপত্র 'দি ডেলি নিউজ' একটি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র, ১৮৫৭ সালে 'দ্য মর্নিং ক্রনিকাল' সংবাদপত্রের অবলুপ্তির পর এই সংবাদপত্রটি জন্ম নেয়। সেকালের ইংরেজি শিক্ষিত অভিজাতদের মধ্যে এই পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা ছিল। প্রথম প্রকাশের দু'সপ্তাহ পরেই সংবাদপত্রটি 'ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজ' নাম নিয়ে প্রকাশিত হতে থাকে। এই পত্রিকাটি পড়ে 'চোদ্দ আইনে'র মূল দিকগুলি জানতে পারার কথা থেকে কুঠিয়াল বাবুদের শিক্ষা ও আভিজাত্যটি বোঝানো হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, তাঁদের যত শিক্ষাই থাক, 'বেশ্যাবাজি'র শখে কেউ কম যান না। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ পিতৃপুরুষের আমল থেকে কলকাতায় বাস করছেন, কেউ কেউ কর্মসূত্রে মফস্সল বা গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় আছেন। বেশ্যাগমনে কোনো বাবুরই অবশ্য আপত্তি নেই। কলকাতায় বহিরাগত, মফসসল থেকে আগত বাবুটি অবশ্য থানায় গিয়ে নিজের নাম, ধাম, বংশপরিচয় লিখিয়ে আসতে সংকোচ বোধ করে না। কারণ, 'এখানে কুটুম বাড়িও নেই আর শ্বশুরবাড়িও নেই যে মুখে চুনকালি দেবে।'[২১৪] কিন্তু যাঁরা খাস 'সহুরে বাবু' তাঁরা বিষম বিপদে পড়েছেন। কারণ 'আমাদের তো তোমাদের মতন জাওয়া নয় আমাদের ইয়ারকি দিতে যাওয়া তা তো হবার যো নেই বদমাএসির দফা একবারে সাল্লে।'[২১৫] 'সহুরে বাবু'রা একা একা বেশ্যাবাড়িতে যান না, দু'-চারজন ইয়ার নিয়ে না গেলে তাঁদের মজা হয় না। কিন্তু নতুন আইনে, রাত দশটার পর অনেকের একত্রে বসে আনন্দ-স্ফূর্তি করা বা মদ্যপান নিষিদ্ধ, ফলে সংগতভাবেই বাবু বিমর্ষ। লক্ষণীয়, 'বেশ্যাবাজি'র উদ্‌যাপনের লক্ষণ বিচারেও গ্রাম-শহরের বাবুদের মধ্যে বিভাজন রেখা তৈরি হয়েছে। গ্রাম্য বাবুরা সম্ভবত আর্থিক কৌলীন্যের অভাবে কিংবা শহুরে সহবতের অভাব একাকী বেশ্যাগমনকেই যথার্থ বলে মনে করেন, কিন্তু শহুরে অভিজাত 'কুটিয়ালবাবু'দের ইয়ারদোস্ত-মোসাহেব নিয়ে একত্রে মদ্যপান ও স্ফূর্তি না করলে মান থাকে না। 'বেশ্যাবাজি'র ধরনের মধ্যে দিয়েও অভিজাত-অনভিজাত বাবুদের এই রূপভেদ সে যুগের বাঙালি শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের নৈতিক বিকৃতিকেই নির্দেশ করে। কুঠিয়াল নব্যবাবুদের কেউ কেউ তো 'বড় কন্নে ভাতার পুত সব কর্ব্বে নাতি' বলে আইন থাকলেও তাঁদের 'বেশ্যাবাজি' ঠিক চলবে, এই ইঙ্গিত দেন। কলকাতার নাগরিক বাবুসমাজের নৈতিক বিকৃতির ছবি দেখলে শিউরে উঠতে হয়।

প্রবীণ অফিসার বলতে ঠিক কোন শ্রেণিকে নকশাকার বোঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট না হলেও, 'চোদ্দ আইন' সম্পর্কে এঁদের মনোভাব আইনটির অনুকূলে। এঁরা উল্লসিত হয়েছেন যে, আইনটি একবার প্রযুক্ত হলে শহর থেকে ক্রমশ বাবুকৃত 'বেশ্যাবাজি' বন্ধ হয়ে যাবে। এঁদেরকে কি শিক্ষিত, মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক' বাবুদের মধ্যে যথার্থ প্রগতিশীল, ভোলানাথের ভাষায় 'প্রকৃত শিক্ষা'র অধিকারী বলে গ্রহণ করা চলে না? এঁদের কথোপকথন থেকে জানা যায়, অনেক বাবুই, যাঁরা ঘরে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও 'বেশ্যার বাড়ি ঢলাঢলি করে', তাঁরা বেশ ফাঁপরে পড়েছেন। শিক্ষিত, চাকরিজীবী নতুন প্রজন্মের 'ভদ্রলোক'বাবুরাও যে মদ ও

বেশ্যাবাজির ফাঁদে পড়ে নীতিজ্ঞানহীন, তার ছবি পাওয়া যায় জনৈক অফিসারের কথায়। বক্তার পুত্রটি উচ্চশিক্ষিত দশ টাকা রোজগারও করে। কিন্তু হলে কি হবে, 'আবাগের ব্যাটাক মদে আর রাঁঢ়ে একেবারে খেয়ে রেখেছে মাইনেটী পাবার সময় আশ্চে আর অমনি একটা না একটা ছুতো খুঁজে ঝকড়া আরম্ভ কোত্তে লাগল ক্রমে বেড়ে বেড়ে ঝকড়াটী পাকায়ে বাড়ী থেকে চলে গেল তার মধ্যে মাইনেটী পেলে, দিন কতক খুব আমোদ কোল্লে তারপর সেগুলি ফুরিয়ে গেল, তখন বাড়িতে এসে মানুষের মত দিন কতক থাকবে।'[২১৬] আর্থিকভাবে সীমাবদ্ধ চাকরিজীবী 'বাবু'দের বাবুয়ানার শখ মেটানোর এবং বিশেষ পদ্ধতি যেমন অভিনব, তেমনি ন্যক্কারজনক চরিত্রকে তুলে ধরে। বৃত্তিজীবীদের আর্থিক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও যেভাবে তাঁরা অশিক্ষিত-অল্পশিক্ষিত ধনীবাবুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন এবং নিজের সামর্থ্যের মধ্যেই কীভাবে বাবুয়ানা করা যায়, তার নতুন পন্থা খুঁজে নিয়েছেন, দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। ব্যক্তিগত স্তরে সমাজ-বিচ্ছিন্ন বাবুদের এই বিকৃত মানসিকতা ও আচার-আচরণের জন্যই উনিশ শতকের শেষপাদেই শুধু নয়, বাঙালি সংস্কৃতিতে বাবু-কালচার এবং ঘৃণা তুচ্ছ, ব্যঙ্গাত্মক, উপহাস্যাস্পদ শ্রেণির নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আলোচ্য বক্তার বক্তব্য থেকে জানা যায়, তাঁর ছেলেটি স্ত্রীবিয়োগের পর বাড়ির ঝিয়ের সঙ্গে থাকতে শুরু করে। পরিবারে আপত্তি উঠলে বাবুটি মেয়েটিকে নিয়ে গিয়ে বাইরে ঘরভাড়া করে রাখে। কিছুদিনের মধ্যেই ঝগড়া হয়ে উভয়ের মধ্যে গণ্ডগোল হয়; মেয়েটি থানায় অভিযোগ জানালে বাবুকে ধরতে বাড়িতে পুলিশ আসে। কোনোরকমে লুকিয়ে থেকে রক্ষা পায় সে। কিন্তু এমন ঘটনা থেকেও বাবুটি শিক্ষা লাভ করেনি, 'এখন আবার ভূতে ধরেছে।'

বস্তুত, উনিশ শতকের গোটা সময় পরিধি জুড়েই বাবুরা যথার্থ অর্থেই মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তির দ্বারা ভূতগ্রস্ত। সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাব খুব কম সংখ্যক বাবুদের জীবনেই পড়েছিল। খুব কম সংখ্যক বাবুই যোগ্য 'পুরুষপ্রবর' হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। সমাজে নগেন্দ্র কিংবা গোবিন্দলালদের সংখ্যাই ছিল বেশি। উনিশ শতকের গোড়ায় 'বাবুত্ব' ছিল আর্থিক কৌলীন্যের চিহ্ন কিংবা স্বভাব, উনিশ শতকের শেষে পৌঁছে 'বাবুত্ব'ও তার আভিজাত্য খুইয়ে সর্বসাধারণের উপভোগ্য কিংবা আচরণযোগ্য 'বেশ্যাবাজি' ও 'মদ্যপানে'র বিকৃত সংস্কারে পরিণত হতে চলেছে দেখতে পাই আমরা। বাবুকে রক্ষিতার নাম লেখানোর প্রশ্নে বাবু জানায়, সে তো যাবেই, 'আমি ছেড়ে যদি বাড়ি শুদ্ধ লোককে নিয়ে যেতে হয় তো তাও নিয়ে যাব।'[২১৭] তবুও, বাবুটি 'বেশ্যাবাজি' ছাড়তে রাজি নয়।

'চোদ্দ আইন' প্রযুক্ত হওয়ায় অর্থবান বাবুরা প্রাথমিকভাবে দমে গেলেও হতোদ্যম হয়নি। চন্দননগর ছিল ফরাসিদের অধীনে, ফলে সেখানে ইংরেজের আইন প্রযুক্ত হওয়ার উপায় ছিল না। এই সুযোগ নিয়ে দলে দলে বেশ্যারা সেখানে চলে যায়। চন্দননগরের বেশ্যালয়গুলিতে বাড়ি ভাড়া ও চাহিদা পাঁচগুণ বেড়ে যায়। কলকাতা থেকে আর্থিক সামর্থ্যযুক্ত বাবুরা গিয়ে চন্দননগরে 'গুলজার করে তুললেন এবং চন্দননগরের প্রতিষ্ঠিত 'বাবু'রা তো ছিলেনই। কিন্তু যাঁদের কর্মসূত্রে এবং আর্থিক সামর্থ্যের অভাবশত; দলে কলকাতাতেই থেকে যেতে হল তাঁরা 'বদমাএসী'র উপকরণ— কালাপেড়ে ধুতি নয়নসুখের চাইনাকোর্ট লাক্চাঁদির বাড়ির যুতো আড় কাটায় তুলে রেখে বাইসমানি, এনগ্রেভিং, প্রেসম্যানি ইত্যাদি নিজ নিজ শিক্ষিতি কার্য্যে বেরোতে লাগিলো।'[২১৮] শিক্ষিত, চাকরিজীবী মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের প্রসঙ্গে নকশাকার আরও একটি অভিযোগ এনেছেন। তাঁর মতে, 'যে যা কর্ম্ম করে অক্লেশে তাতে দিনযাপন হতে পারে কিন্তু তার ভিতর লাকপতি বাবু হতে গেলেই হাত টান শিখতে হয় কারণ যে ব্যক্তি

ছয় টাকা মাহিনার কর্ম্ম করে তার পায় এক জোড়া ছয় টাকা দামের জুতা প্রতি শনিবারে বেশ্যালয়ে দশ টাকা খরচ কিন্তু কোম্পানির কাগজ নাই কোথা থেকে এত বাবুগিরী চলে, চুরি ভিন্ন কখনই হইতে পারে না।'[২১৯] বস্তুত, 'বাবুয়ানা'র শখ মেটাতে যে কাঞ্চনমূল্যের দরকার হয়, সাধারণ মধ্যশ্রেণির নির্দিষ্ট মাহিনাজীবী বাবুরা সেই অর্থ সংগ্রহ করতেন কোথা থেকে এ ব্যাপারে সংগত প্রশ্নই তুলেছেন নকশাকার। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 'আপনার মুখ আপুনি দেখ'তে মধ্যশ্রেণির বাবুদের সংগৃহীত সম্মিলিত অর্থের দ্বারা 'বাবুয়ানা'র ছবি এঁকেছেন। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত 'বদ্‌মাএস জব্দ' এই মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের নৈতিক সততার প্রতি সংগত কিছু যুক্তিনির্ভর প্রশ্ন তুলে দিলেন।

প্রাণকৃষ্ণ দত্তের 'বদ্‌মাএস জব্দ' নকশা হিসাবে বিশেষ একটি আইন উপলক্ষ্যে বাবুদের প্রতিক্রিয়াকেই তুলে ধরতে চেয়েছে। বাবুসমাজের সমকালীন সার্বিক ভালো-মন্দের সুলুকসন্ধান তাঁর উদ্দীষ্ট ছিল না। ফলে একদেশদর্শীর মতো কেবল বাবুসমাজের 'বেশ্যাবাজি' নামক বিকৃতির ছবিই এই রচনায় অল্প পরিসরে আভাসিত। লক্ষণীয়, এই নকশার বাবুরা মূলত শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি। এঁরা চাকরি সূত্রে কেউ কলকাতায় থাকেন, কেউ-বা কলকাতারই আদি বাসিন্দা, কিন্তু আর্থিক সামর্থ্যে প্রায় সবাই সমশ্রেণির। তবে মাস-মাইনের টাকাতে প্রয়োজন হলে নিজ সংসারকে অবহেলা বা উপেক্ষা করেও 'বাবুয়ানা'র দু'টি বিশেষ শখ— মদ ও বারাঙ্গনা-গমন বজায় রাখতে এঁরা যত্নবান। তবে ধারদেনা, হ্যান্ডনোট কেটে বেশ্যাবাজি করার প্রবণতা থেকে এঁরা অনেকটা সরে এসেছেন। কেউ কেউ টাকা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই স্ফূর্তি করেন, শেষ হলে বাড়িতে কাটান। 'কাপ্তেনবাবু'দের কমতি ছিল না অবশ্যই, কিন্তু মধ্যশ্রেণির তথাকথিত 'ভদ্রলোক'বাবুরা যে 'ফোতো বাবুয়ানা' সম্পর্কে কিছুটা ভিন্ন রুচির পথে হাঁটতে শুরু করেছেন, অনুভব করা যায়। তবে, হ্যান্ডনোটের বদলে উৎকোচ গ্রহণ, অসাধুতা যে এই শ্রেণির অবলম্বিত পথ হতে যাচ্ছে এই ইঙ্গিতও হুতোমই দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর নকশার দ্বিতীয় ভাগের 'রেলওয়ে' শীর্ষক রচনার টিকিটের বুকিং ক্লার্কের মধ্য দিয়ে। প্রাণকৃষ্ণের 'বদ্‌মাএস জব্দ' আরেকবার সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছে সন্দেহ নেই।

ভাঁড় সংকলিত 'সচিত্র গুলজারনগর' (১৮৭১) উনিশ শতকের অন্যতম আখ্যানধর্মী নকশা। এই শতকে লেখা এবং পাওয়া নকশাগুলির মধ্যে কাহিনির পূর্ণ বৃত্ত একমাত্র 'সচিত্র গুলজারনগরে'ই লভ্য। 'সুলভ সমাচারে' প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে গ্রন্থটিকে 'হাস্যরসের আশ্চর্য উপাখ্যান' বলে জানানো হয়েছে, এটিতে 'কলিকাতা নগরের কয়েক বৎসর পূর্ব্বের অবস্থা, সামাজিক নিয়ম ও শাসন-প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে।'[২২০] গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণকালে সম্পাদক জানিয়েছেন, 'কয়েক বৎসর' বলতে ১৮৫০ থেকে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে কাহিনিটি বিধৃত।[২২১] কাহিনির লেখক নকশার বৈশিষ্ট্য মেনে সমকালীন সমাজজীবনের কিছু সাধারণ চিত্র এঁকেছেন, একইসঙ্গে ইতিহাসসম্মত কিছু বাস্তব ঘটনারও উল্লেখ করেছেন, যেমন— ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত সংস্কৃত ও হিন্দু স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে দাঙ্গা; ১৮৫৪-র ১ মে কাজে যোগ দেওয়া ফ্রেডারিক হ্যালিডে, যিনি হলেন প্রথম ছোটোলাট; ১৮৬৯-এর ২২ ডিসেম্বর ডিউক অব এডিনবরার কলকাতায় আগমন এবং সেই সম্পর্কে সাধারণ মানুষের আগ্রহ ইত্যাদি। তবে লেখকের মূল লক্ষ্য— নীতিবিবর্জিত, তোষামোদপুষ্ট, শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে সংস্রবহীন, প্রগতি সম্পর্কে উদাসীন এক বাবু এবং তাঁর আশ্রয়পুষ্ট এক ভাগ্যবিড়ম্বিত যুবক, যে ডফ্ সাহেবের স্কুলে পড়ত কিন্তু বই কেনার সামর্থ্য না থাকায় তাকে স্কুল ছাড়তে হয়। আশ্চর্যজনকভাবে সেই স্বল্পশিক্ষায় ভাগ্যবিড়ম্বিত যুবকটি

যেভাবে অসীম গুণের আধার হয়ে উঠেছে, তাতে শিক্ষাদীক্ষা, রুচি-সংস্কৃতির গুণে কীভাবে যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠা যায়, তার একটি আদল সম্ভবত তৈরি করেছেন নকশাকার। তবে সমালোচকের মতে, 'শিক্ষার আলোক ও বিবেকবুদ্ধি বঞ্চিত সেই সব ভাগ্যবিড়ম্বিত, চাটুকারশোভিত বিত্তবান শ্রেণীর চিত্রই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। দর্পণের মাধ্যমে ''ভাঁড়'' এদের ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রের (অথবা চরিত্রহীনতার) প্রতিফলন তুলে ধরেছেন। সাধারণভাবে ''বাবু''দের আচরণের ভালো-মন্দ, সঙ্গতি-অসঙ্গতির দিক তাঁর আলোচ্য বিষয় নয়। তিনি যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তা নিছক একদেশদর্শী চিত্র পরিবেশকের ভূমিকা। সংস্কারকের ভূমিকা তিনি সাধ্যমত পরিহার করেছেন।'[২২২] আখ্যান নির্মাণে ডিকেন্সের 'অলিভার টুইস্টে'র ভাগ্যবিড়ম্বিত কিশোরের প্রভাব আছে।

আখ্যানধর্মী এই নকশার কেন্দ্র চরিত্র হেমাঙ্গ নামের এক ভাগ্যবিড়ম্বিত যুবক। পূর্বেই মাতৃহীন হেমাঙ্গ মাত্র পনেরো বৎসর বয়সে তার পিতাকেও হারানোর পর ছিন্ন শৈবালের মতো গুলজার নগরের পথে পথে ভেসে বেড়িয়েছে। একটি পয়সার জন্য, কিছু খাদ্যের জন্য সে শহরের বিত্তবান বাবুদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেরিয়েও নিরাশ হয়েছে, কিন্তু এই সূত্রেই সে দেখেছে নানান বাবুদের। নিতান্তই চকিত দেখা, কিন্তু তার মধ্যেই উঠে আসে উক্ত বাবুদের অন্তর্গত স্বভাবের সারটুকু। এভাবেই ভাসতে ভাসতে অবশেষে এক ধনী'বাবু'র বাড়িতে তার আশ্রয় জোটে। উক্ত বাবু নীরদচন্দ্রের অর্থের উৎস সম্পর্কে কোনো বক্তব্য রাখেননি লেখক। তবে বাবুটির বিলাস-ব্যসনের বহর দেখে অনুমান করা অসংগত হবে না যে, বেশ কয়েক লক্ষ টাকার 'হঠাৎবাবু' তিনি। এই বাবুর বাড়িতেই হেমাঙ্গ নানান ঘটনার সম্মুখীন হয় এবং বিচ্ছেদ-মিলনের মধ্যে দিয়ে শেষপর্বের নকশাটি একটি সুখী জীবনের আভাষে শেষ হয়।

নকশার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, বিশেষত 'বাবু' বিষয়ে লেখকের সমকালীন অভিজ্ঞতার কথা পাওয়া যায় মূল কাহিনি পূর্বে 'আভাষ' তথা 'হাটের সেরা হুজুক খোঁজে' শীর্ষক দীর্ঘ অংশে। গ্রন্থ রচনার সমকালীন অর্থাৎ ১৮৭০-৭১-এর সময়ে বাবুত্বের বদলে যাওয়া নানান রূপের সঙ্গে এই অংশে লেখক আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন।

গ্রন্থের এই 'আভাষ' অংশ থেকেই স্পষ্ট যে, 'আপাতশিক্ষায়' শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির তথাকথিত 'ভদ্রলোক' বাবুদের 'এলিট' অংশের প্রতি তাঁর কিঞ্চিৎ বীতরাগ আছে। এর জন্য তিনি দায়ী করেছেন বিদ্যালয়ে 'নীতিশিক্ষার অভাব'কে, স্কুলের শিক্ষাপ্রণালীকে এবং একইসঙ্গে 'পুঁথিগত বিদ্যার প্রতি ঝোঁক'কে। নব্যবাবুরা প্রথম শিক্ষার ঝোঁকে সকলেই সংবাদপত্র প্রকাশ করেন এবং তার সম্পাদক হন, কিন্তু সেই 'হুজুগ' অচিরেই ফুরায়, ফলে সংবাদপত্রের দ্বারা দেশের সেবা কল্পনাতেই থেকে যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাবুদের ভাঁড় 'বাটপাড় বাবু' বলেছেন। কারণ, বাটপাড় বাবুদের সবই লোকদেখানো ভড়ং— ধর্মকর্ম, রীতিনীতি, শিষ্ট-অশিষ্ট সকল কিছু বিস্মৃত হয়ে নিজ স্বার্থের প্রয়োজনে রূপ বদলান — 'টেক্কা হিঁদু কখন মগলের পোষাক, কখন মোল্লার পোষাক, কখন সাহেবি পোষাক, গায়ে লট্‌কান, আহ্নিকের সময় হিঁদু হন, প্রজা ও ঘাতকের গলায় ছুরী দেন, রাঁড়ী ভুঁড়ীর সর্বনাশ করেন, গুণের মধ্যে তিনি দাতায় চসম্‌খোর, আর হিঁদুয়ানিতে ভক্ত বিটেল।'[২২৩] কেউ কেউ আবার পোশাকে রক্ষণশীল হিন্দু সাজেন, ঘরে 'ধর্ম্মসভা' স্থাপন করে সমাজের চোখে ভাঁওতা দেন। অন্যদিকে যেসব বাবু 'বিলেত ফেরৎ' তাঁদেরও যে বিদ্যাবুদ্ধি এমন কিছু আহামরি তা নয়। অথচ বিলেত থেকে ফিরে এসে এঁরা মাতৃভাষা বিস্মৃত হন, ইংরেজি ছাড়া কথা বলেন না; অথচ সাহেবদের কাছে প্রতিনিয়ত গলাধাক্কা খান।

নতুন কালে 'বাবুত্ব' তার আভিজাত্য হারিয়ে সর্বসাধারণের সামগ্রী হয়ে উঠেছে এবং এই অনভিজাত পোশাকি বাবুদের নকশাকার 'কাগুজে বাবু' বলেছেন। তাঁর মতে 'আজকাল চাষাধোপারা বাবুর প্রধান।'[২২৪] শাসকশ্রেণি এইসকল 'কাপুড়ে বাবু'কে নিজেদের তোষামোদকারী জো হুজুর গোত্রের মনে করে নানারকম title বা খেতাব দিয়ে তাঁদের 'হতমান উদ্ধার করচেন'। তাঁর মতে, 'শোনা যাচ্ছে এবার লর্ড মেও কাউকে আর বাহাদুর করতে বাকী রাখবেন না,.... আমাদের বহুকেলে কেষ্টা হাড়ি, ছোট আদালতের খোচো উকীল, হাট- খোলার সর সা আর পোস্ট-আপিসের প্যায়দা রায়বাহাদুর ও খাঁবাহাদুর সাজবেন।'[২২৫] ইংরেজ শাসক কবে থেকে এইসব title দিচ্ছে দেশীয় রাজন্যবর্গ এবং বাবুদের, তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও, কেউ কেউ অনুমান করেছেন,[২২৬] ১৮৭১-এর সময় থেকেই এই খেতাবের ব্যাপারটি চালু হয়। কিন্তু 'সচিত্র গুলজারনগরে' এই সাক্ষ্য থেকে মনে হয়, ১৮৭১-এর অনেক আগে থেকেই খেতাব দান করা হতে থাকে বরং ১৮৭১-এর দিকে ধীরে ধীরে খেতাবগুলির বহুল প্রাদুর্ভাবের ফলে, এগুলি সম্পর্কে সাধারণের বিস্ময়বোধ লঘু হতে থাকে। নিতান্ত অশিক্ষিত, অ-সংস্কৃত, 'অন্দরমহল পর্যন্ত ভাড়া'য় বিকিয়ে যাওয়া কতকগুলি বিত্তহীন বাবুরা 'রাজা' খেতাব পেয়ে ধন্য হয়েছে। বিত্তহীন বাবুদের প্রতি নকশাকার ক্ষমাহীন। 'ভেতরে ছুঁচর কের্ত্তন বাইরে কোঁচার পত্তন'ওলা 'ফোতনবাবি' অর্থাৎ ফোতোবাবুদের যে জীবনযাপনের পরিচয় মেলে, তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের প্রভেদ খুব অল্প— 'বাবু বড় সাখরচে একটী পয়সার মা বাপ, সোণালি রূপালি (মুড়ি-মুড়কি) জলযোগ করেন, সকাল বেলা এঁর পূর্বপুরুষের নাম কল্লে পেটের ভাত চাল হোয়ে যেত.. ঐ ভয়ে তাঁর চলিত ডাক নাম ফোস্কেচাঁদ হয়ে পড়ে।... কাপুড়ে বাবু বেশ্যার চরণদাস, তুমি আমি তাঁর মজলিসে খবরে আসি না, সোনারবেণে শুঁড়ীর এক সানকের ইয়ার, তাদের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ, তাঁর একখানা পালকী গাড়ি আর একটী ঘোড়া আছে।'[২২৭] তবে অধিক খরচের ভয়ে অনেক বিত্তবান বাবু যে গাড়িঘোড়ায় না চড়ে 'পাঁওদলে পাড়ী মারেন', তা থেকেই স্পষ্ট হয়, তথাকথিত বিত্তবান বাবুর কাল তখন অস্তমিত। ৩০-৪০ টাকা মাসোহারার 'কেরানিবাবু'ও তখন পোশাকি বাবু সাজতে চায়। কারণ, একালে, নকশাকারের মতে, 'সোনার ঘড়ী আর চেন ঝুলিয়ে সিমলে ফরেসডাঙার ফিণফিণে ধুতি পোরে, একটী ঘেরাটক গায়ে মাখা চোকে পরকলা দিয়ে বাবু সাজা বড় সহজ।'[২২৮] কেরানিবাবুদের কেউ ৪০ টাকা বেতন পেলে '৩০ টাকা গাড়ীতে যায় বাকী টাকা কল্মীশাগ আর বুক্ড়ি চালে' যায়।[২২৯] কেউ আবার ভাগের গাড়িতে যান। ঘরে অভাব, তবু title -এর প্রতি লোভ আর বেহিসেবি ব্যয় করে বাবুয়ানার শখেই মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোকে'রা ফুরোলেন।

'আভাষ' অংশ থেকে বোঝা যায় যে, উনিশ শতকের ১৮৭১-এর মধ্যেই, 'বাবু'দের অস্তিত্ব ও সংস্কৃতিতে গভীর বদল ঘটেছিল। যথা—

(ক) বিত্তবান এবং অভিজাত, বংশকৌলীন্যযুক্ত বাবুদের যুগ প্রায় শেষ;

(খ) বাবুত্ব আর চরিত্রের অন্তর্নিহিত স্বভাব নয়, নিতান্তই বাহ্যিক আচার-আচরণ পালনকারী কতকগুলি সাধারণ ক্রিয়া মাত্র;

(গ) নব্য-সভ্যতার আমদানির ফলে বাবুত্ব দেশীয় সংস্কারের বদলে আঁকড়ে ধরেছে পাশ্চাত্য রীতিনীতি, আদবকায়দা ইত্যাদি প্রায় সব কিছু;

(ঘ) বাবুয়ানা আর্থিক সামর্থ্যের অভাববশত সংকুচিত; সীমাবদ্ধ এবং 'শিক্ষার অভাবে' পরিমার্জনাহীন;

(ঙ) নতুন যুগের বাবুখ্যাতি মূলত টাইটেল বা খেতাবের উপর নির্ভরশীল। ইংরেজ প্রবর্তিত খেতাব দানের এই বিশেষ ঔপনিবেশিক কৌশল বশংবদ একশ্রেণির বাবুদেরই জন্ম দিয়েছে কেবল।

(চ) বাবুদের জীবনযাপনের সঙ্গে অতি সাধারণ 'ভদ্র' মানুষের জীবনযাপনের ফারাক ক্রমেই কমে আসছে;

(ছ) সর্বোপরি, বাবুত্বের সীমানা সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে বাবুত্ব সম্পর্কে সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমেই কৌতূহল শূন্য, নিরাসক্ত হয়ে পড়ছে। ব্যঙ্গবিদ্রূপের উপলক্ষ্যেও 'বাবু'দের প্রসঙ্গ পরিত্যাজ্য মনে হয়েছে।

ভাঁড় 'আভাষ' অংশে আদৌ নকশাসুলভ তরল গাম্ভীর্যকে নিছক কলকাতা বর্ণনার কারণে ব্যবহার করেননি। বরং এই সমাজের বৃত্তিভোগী বাবুদের প্রতি তাঁর ক্ষোভ ব্যক্ত করতেই এই অংশটি তিনি সংযোজিত করেছেন। যদিও মূল আখ্যানের সঙ্গে সরাসরি এই 'আভাষ' অংশের যোগ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তবে সমকালীন সময়ে সমাজে বাঙালিবাবুদের অবস্থান বিচারের ক্ষেত্রে এই 'আভাষ' যে অনেকটাই প্রয়োজনীয় তথ্যাদির খোঁজ দিতে পারে, তা বলা বাহুল্য।

মূল কাহিনির কেন্দ্র চরিত্র হেমাঙ্গ, পিতৃমাতৃহীন বালক। আশ্রম ও আহারের সন্ধানে তার ব্যাকুল নগর পরিক্রমার সুযোগে হেমাঙ্গর পরিচয় ঘটেছে শহরের তথাকথিত 'বাবু' নামধারী মানুষজনের সঙ্গে। যেমন— সিম্‌লের ডাকুবাবু। ইনি ম্যাক্-কাট্-থ্রোটের বাড়ির মুৎসুদ্দি। ব্যাবসায় রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি হওয়ায় বর্ত্মানে তাঁর মেজাজ তিরিক্ষে, অবস্থাও আশানুরূপ বলে মনে হয় না। এঁর অন্তরঙ্গ মোসাহেবও মাত্র একজন। তাঁর মাথার চুল সব রুপোলি হয়ে গেছে, দাঁতও আর বিশেষ নেই। তিনি 'বৈঠকখানায় (সাক্ষাৎ ভেটেরাখানা) ময়লা, তুল বেরণ, ছারপোকাপোরা তাকিয়ে হেলান দিয়ে হুঁকয় একটা বড় ভেঁপুর মতন কলাপাতের নল লাগিয়ে ভড়ভড় কোরে তামাক খাচ্চেন, এক একবার কাস্‌চেন, আর ঘরেই থুতু ফেল্‌চেন, কাছে একটী দস্তার নস্যদান আর একখানা ভাঙ্গা চস্‌মা পোড়ে আচে।'[২৩০] ডাকুবাবুর বৈঠকখানার এই চেহারা, তাঁর অসংস্কৃত অভ্যাস ও অতি সাধারণ জীবনযাপনের বাধ্যতা প্রমাণ করে, মুৎসুদ্দিবাবুদের প্রচুর মুনাফা ও আভিজাত্যের যে কাল নববাবুদের সময় পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পৌঁছে তা একাধারে শ্রীহীন, আভিজাত্যহীন এবং অস্তমিতপ্রায়। হেমাঙ্গ 'নবশাক' জাতীয় শুনে তিনি তাকে সামান্য এক পয়সা সাহায্য করতে অপারগ হন। বাবুয়ানার আদি যুগে 'নবধা' লক্ষণের মধ্যে 'দান' ছিল অন্যতম শর্ত, যা বাবুরা পালন করতেন কখনো সংস্কারবশত, অনেকসময়েই নাম-যশের মোহে। কিন্তু শ্রীহীন বাবুদের কাছে এ প্রকার নাম- যশের চেয়ে ডাকু বাবুর মতো পাঁচ-সাত টাকার দালালির ব্যাপারে বেশি উৎসাহিত অনেক রাজা-গজাদের বাড়িতে তো কাঙালি ঢুকবার হুকুম পর্যন্ত নেই, তাই ফাটক থেকেই হেমাঙ্গকে ফিরে আসতে হয়। কোনো বাবুর বাড়িতে দুপুর থেকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রাতে মেলে— কাঙালি বিদেয়— 'সিকি মাল্‌সা চিড়ে মুড়্‌কী'! অবক্ষয়িত বাবুত্বকে এভাবে নানা দৃষ্টান্তে তুলে ধরেছেন ভাঁড়, মূলত হেমাঙ্গর চোখ দিয়ে সে চোখে ধরা পড়ে, অর্থবান কিন্তু অনভিজাত, নির্মম, ধর্মের ভেকধারী বাবুত্ব। বাঙাল বাবুটির নাম চতুশ্চরণ সাহা, চার-চরণ-সা-মশায়। মূলত তিনি পান্না প্রভৃতি রত্নের কারবারি। বাবুটির বৈঠকখানার যে রূপের পরিচয় পাওয়া যায়, সেসব যদিও তাঁর বিত্তবান শ্রেণির উপযুক্ত নয়, তবে পোশাকে তিনি ভেক ধরেছেন— 'বাবুর নাকে তেলক কাটা, চুল ফেরাণ, জেকেট আস্তিনে চাইনাকোট গায়ে, বার্ণিশ ইস্প্রিংয়ের জুত পায়ে, দাঁতও বার্ণিশ করা, বাবু

বাহার দিয়ে টেবিলের উপর একখান এক্সচেঞ্জ গেজেট গদ্‌গদ ভাবে দেখছেন।'[২৩১] বিশজন মুটেতে যাঁর টাকার থলি বয়ে আনে, কিন্তু হেমাঙ্গকে একটি পয়সাও দিয়ে সাহায্য করেন না তিনি। হৃদয়হীন, নিছক আত্মসর্বস্ব এইসকল বাবুদের কারণেই উনিশ শতক যত ফুরিয়ে এসেছে, ততই বাবুত্বের প্রতি সাধারণের ব্যঙ্গ, তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে।

ভাগ্যচক্রে ভাসমান, অসহায় হেমাঙ্গ শেষপর্যন্ত প্রথমে সাহায্য, পরে ঠাঁই পায় বিত্তবান বাবু নীরদচন্দ্রের কাছে। ইনি বয়সে তরুণ, ন্যূনধিক ২৫ বছর বয়েস দেখতে শুনতে ভালে, সমকালের 'বাহাল ফেসিয়ান' মেনে পাট্টাই দাড়ি রেখেছেন। ইনি বাবু হটুরাম চন্দ্রের পুষ্যিপুত্তুর। তাঁর 'স্বভাব কুলবধূর ন্যায় বাহ্যোক লজ্জাশীল, বাক্য সরস ও মিষ্ট, শরীর স্বভাবত দুর্বল।'[২৩২] সকাল আটটাতেই তাঁর বাড়ির নাচঘরে খেমটা নাচের আয়োজন হয়েছে এবং বাবুর ইয়ারদোস্ত সব হাল ফ্যাশনের জামাকাপড় পরে উপস্থিত আছেন। কিন্তু পোশাক-আশাকে সুসভ্য হলেও, শিক্ষাদীক্ষা, মানসিকতায় নীরদাস্তে ইয়ারদোস্তরা প্রায় সকলেই নিম্নশ্রেণির। খেমটা নাচের আসরে মদ ও অন্যবিধ নেশায় উন্মত্ত হয়ে, বেশ্যা ও বাইজিদের সঙ্গে যে জাতীয় আমোদপ্রমোদে লিপ্ত হয়েছে বাবুর দল, তাকে তার যাই হোক সুসভ্যতার নিদর্শন বলা চলে না। 'হঠাৎবাবু' নীরদচন্দ্রের মধ্যে যেন নববাবুদের কালের ছাপ। যদিও নীরদচন্দ্র যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের উচ্ছৃঙ্খল বিত্তবান বাবু তা বোঝা যায়, যখন দেখা যায় খেমটা নাচ উপভোগ করার অতিরিক্ত 'বেশ্যাবাজি'র দোষ থেকে তিনি মুক্ত। স্ত্রী উজ্জ্বলকামিতা ও নীরদের বৈবাহিক জীবনের ছবি থেকে বোঝা যায়, নীরদের দুর্বলতা মদ ও অন্যান্য নেশায় এবং বন্ধুবান্ধব, মোসাহেবদের আপ্যায়নে ও আনন্দবিধানে। তা ছাড়া সহৃদয় হিসাবেও তাঁকে চিত্রিত করেছেন নকশাকার। অভাবী হেমাঙ্গকে প্রথম দিন এক টাকা এবং দ্বিতীয় সাক্ষাৎ-এ বাড়িতে খাওয়া এবং বৈঠকখানায় শোবার ব্যবস্থা করে দেন। উত্তরকালেও হেমাঙ্গকে তিনি যথোচিত সাহায্য করেন এবং হেমাঙ্গ ওস্তাদের কাছে খেয়াল- টপ্পায় পারদর্শী হয়ে ওঠায় নীরদচন্দ্র তাকে মাসে ৩০ টাকা মাহিনা বরাদ্দ করেন।

নীরদচন্দ্রের মোসাহেবরা প্রত্যেকেই এক-একজন 'বাবু' বিশেষ। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য— ভেড়াকান্ত নাগ B.A.B.L (Big Ass+ Bedlamite at Law) । ইনি নীরদচন্দ্রের 'সাবেক স্কুল ফ্রেন্ড', চাকরি- বাকরির আশা নেই দেখে পেটের খাতিরে নীরদচন্দ্রের মোসাহেব হয়েছেন। কেবল পুঁথি গলাধঃকরণ করা শিক্ষিত বাবুদের 'প্রকৃত শিক্ষা' সম্পর্কে ভাঁড় সন্দিহান ছিলেন। ভেড়াকান্ত নাগের শারীরিক বর্ণনায় তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন নকশাকার— এঁদের 'শরীর রাতজেগে পোড়ে মুখস্থ কোরে পুঁয়ে নাগের মতন, — পুঁয়েপাওয়া ছেলের মতন পাকিয়ে গেছে,— এঁড়েলাগা ছেলের মতন পেটটি পীলেতে গ্যাঁড়্‌গ্যাঁড়্‌ কোচ্চে, হাত-পা খড়্‌কের মতন লিকলিক কোচ্চে, মাথা চাপ্‌ড়ালে ধূল ওড়ে,— চোক্‌ দুট নেবাতে হলুদপণা, তার কোলে রক্ত নাই,— অন্তরের গ্লানিতে শরীর গর্ভিণী স্ত্রীর মতন আইঢাই কোচ্চে,— গায়ে হাত দিলে খড়ি ওটে নিশ্বেস ফেল্‌বার অবকাশ নাই, কেবল পড়া কেবল পড়া, এজন্যে বোকা পাঁঠার মতন তাঁর চাঁপদাড়ি গজিয়েছে।'[২৩৩] পুঁথিগত বিদ্যা যে 'প্রকৃত শিক্ষা' নয়, সম্ভবত ভাঁড়ও তাই-ই বলতে চেয়েছেন। নিছক হৃদয়ের যোগ ছাড়া কেবলমাত্র কর্মসহায়ক হিসাবে বাঙালি মধ্যশ্রেণির বাবুরা শিক্ষাকে দেখেছিল। আর সে কারণেই শিক্ষার কোনো অন্যবিধ সুফল সমাজে দেখা যায়নি। শিক্ষিত বাবুরা অতি মানী, অহংকারী ছিলেন; শিক্ষা জাহির করতে তাঁরা ইংরেজি-বাংলা মিশ্রভাষাতে কথা বলতেন। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য উপায় না থাকলে বড়োলোক

বাবুদের ‘মোসাহেবী’ কিংবা ‘ভাট’ হতেন। আর লেখকের মতে, ‘ভাটেদের গুণের মধ্যে তাঁরা বাবুর নাড়ীনক্ষত্রের বিষয় আগমনি গেয়ে তাঁকে সদ্যঃ স্বর্গে তোলেন, অথচ বাবু নেশা ও রাঁড়েতে ডুবে আছেন।’[২৩৪] নির্লজ্জ চাটুকারিতা, স্বার্থমগ্নতা, মিথ্যাচার, ভণ্ডামি— শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদেরকে ভাঁড় এভাবেই দেখতে পেয়েছেন। ভেড়াকান্ত নাগ প্রাইভেট টুইসনে২/০ সিকে মাইনে পান, অথচ কেরানিগিরি কিংবা স্কুলমাস্টারি করতে দ্বিধাবোধ করেন। এ দ্বিধা শিক্ষিত সমাজের অভিমানিতার ফল যা এই সমাজকে ক্রমশই নিঃসঙ্গ করে তুলেছে। দিনকয়েক ছোটো আদালতে প্র্যাকটিস করতে গিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছেন। শিক্ষা স্বল্প, কিন্তু বড়াই পাহাড়প্রমাণ। নীরদচন্দ্রের মজলিশে তাঁর কাজ ‘কোন প্রসঙ্গের উত্থাপন হতে তিনি সুবিধামতে লগ্নমাফিক ওপিনিয়ান দেন ও নজির দেখান,— হরহরির আকারের মতন ইংরেজি-বাংলা দোআঁশ্‌লা কথা কন, সময় বিশেষে তার মাথামুণ্ড থাকে না।’[২৩৫] নাগবাবুর রূপকে সমস্ত আপাতশিক্ষিত মধ্যশ্রেণির কর্মবিমুখ বাবুদেরকেই ভাঁড় ‘সাক্ষাৎ গোবরগণেশ’ বলেছেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শেষভাগে পরিকল্পিত আলোচ্য গ্রন্থের নীরদচন্দ্র বাবুর চরিত্রটি শতাব্দী প্রাচীন বাবুবংশের সনাতন রীতি-পদ্ধতি মেনেই প্রায় অঙ্কিত। নীরদচন্দ্র সাধারণ শিক্ষিত যুবক, নানারকম নেশার দাস, শখ বলতে খ্যামটা নাচ দেখা, খেয়াল-টপ্পা শোনা এবং অবশ্যই মদ্যপান। নিজের ‘কুঁড়েমি’ কাটাতে প্রায়ই বাগানবাড়িতে খ্যামটা নাচ ও খানাপিনার আয়োজন করেন। এ ব্যাপারে তাঁর কথা পড়তে পায় না, উদ্‌যোগী মোসাহেবরা মুখের কথাতেই সফল আয়োজন সেরে ফেলে। এরকমই এক ভোজসভায় আয়োজন উপলক্ষ্যে ‘কুকের বাড়ির ১০ খানা জুড়ীগাড়ী— ছাঁচড়াগাজীর রাইবাঘিনী বাই, আর এক সম্প্রদায় কনসার্টওলার বায়না’ হয়েছে। উক্ত ভোজসভায় সিদ্ধি-গাঁজা-গুলি-মদ ইত্যাদি প্রায় সকল নেশার দ্রব্য, গান-বাজনা এবং প্রায় ৩০-৩২ রকম পদের খাবারে ‘ছয়লাপ’; আবার ভোজশেষে ‘মদের ধূমধাক্কা লেগে গেল’। এই বাগানবিলাস ভবানীচরণের ‘নববাবুবিলাসে’র নববাবুর বাগানযাত্রা কিংবা ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের ‘আপনার মুখ আপুনি দেখ’র চন্ননবিলাসবাবুর বড়োদিন উপলক্ষ্যে বাগানবাড়িতে মজলিশের উত্তরাধিকার বহন করছে। এ জাতীয় জমকালো ভোজসভার প্রচলন আদিবাবু ও নববাবুদের হাত ধরে কলকাতায় প্রবেশ করেছিল, একইসঙ্গে ছিল নাচের উত্তরাধিকার। এ জাতীয় বর্ণনার পিছনে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মরকতকুঞ্জের আয়োজিত ভোজসভা ও নাচের আসরের প্রভাব থাকলেও থাকতে পারে। সেকালে বিত্তবান বাবুরা নানান উৎসবে কিংবা বিনা উৎসবে এ জাতীয় আমোদ-আহ্লাদের আয়োজনের মাধ্যমে পরিচিত মহলে যশ অর্জন করতে চাইতেন এবং একইসঙ্গে নিজেদের বিত্ত ক্ষমতার যেনতেনপ্রকারেণ প্রদর্শনের মাধ্যমে কলকাতার বিমিশ্র সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করতে চাইতেন।

কাহিনিতে, হেমাঙ্গর প্রতি নীরদের অধিক প্রীতিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে নীরদচন্দ্রের মোসাহেব আচাভূয়া ডাঁশ হেমাঙ্গর ক্ষতি করতে তৎপর হয়। তারই ষড়যন্ত্রে নীরদচন্দ্রের চুরি যাওয়া চেন, ঘড়ি, গয়না ইত্যাদি মেলে হেমাঙ্গর ডেস্কে। নিজের সমর্থনে কিছু প্রমাণ দিতে না পারায় হেমাঙ্গ জেলে যায়। একইসঙ্গে মিথ্যা স্বাক্ষর করে হেমাঙ্গর সঙ্গে নীরদবাবুর পত্নী উজ্জ্বলকামিনীর অবৈধ সম্পর্ক চলছে বলেও মিথ্যা চিঠির সাক্ষ্যও সে উপস্থিত করে। অবশ্য হেমাঙ্গর সততা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ নীরদচন্দ্র সত্য জানবার জন্য জনৈক দুর্বৃত্তকে গোয়েন্দাগিরিতে নিয়োগ করেন এবং আচাভূয়ার সকল ষড়যন্ত্র জানতে পারা যায়। পরিণামে হেমাঙ্গর সঙ্গে নীরদচন্দ্রের পুনর্মিলন হয় এবং আচাভূয়া দেশান্তরে পালায়। সামগ্রিকভাবে পরিণামমুখী এই আখ্যানে,আচাভূয়ার ষড়যন্ত্র যেমনই হোক না কেন, হেমাঙ্গর সঙ্গে নীরদচন্দ্রের পত্নীর অবৈধ সম্পর্কের

ষড়যন্ত্রের মধ্যে একটি বাস্তব ইঙ্গিত আছে। সেকালে বারমুখী বাবুদের দ্বারা অবহেলিত হয়ে বিবাহিতা পত্নীর অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার ছবি সমকালীন নাটক-প্রহসন-উপন্যাস ইত্যাদিতে বিরল নয়। সেকালের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির বিষয় সমৃদ্ধ পত্রিকাগুলিতে এ জাতীয় সংবাদ হামেশাই মেলে। ভবানীচরণ থেকে হুতোম, ভোলানাথ প্রমুখেরা তাঁদের নকশায় সেই চিত্র এঁকেছেন অথবা ইঙ্গিত দিয়েছেন। সমকালীন নাটক-প্রহসনে কিংবা অন্য নকশায় যা বিষয় হিসাবে গৃহীত, ভাঁড় 'সচিত্র গুলজারনগরে' তাঁকেই অভিযোগের আকারে উত্থাপন করেছেন। যদিও আখ্যানের শেষে উক্ত অভিযোগটি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয় এবং আচাভূয়া নিজ মুখে তার ষড়যন্ত্রের খতিয়ান পেশ করে, তবুও সমকালীন সমাজ-জীবনের প্রেক্ষিতটি মনে রাখলে বলা চলে, অভিযোগটি সম্পূর্ণ মিথ্যাও নয়। বাবুদের বহির্মুখী স্বভাবের দোষেই এ জাতীয় পাপাচার দানা বাঁধত অন্দরমহলের অন্ধকারে। প্রকারান্তরে লেখক নীরদচন্দ্রের মতো বিলাসী বাবুদের কাছে সেই বক্তব্যই রাখতে চেয়েছেন বলে মনে হয়।

কলকাতার বাবুদের আরেক রকম অনাচারের সন্ধান দেন লেখক গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে, যেখানে হেমাঙ্গ নিছক কৌতূহলবশে 'নিষ্কলঙ্ক' কর্তাভজা সম্প্রদায়ের শুক্রবারের পরবে ঢুকে পড়েছে। 'কর্তাভজা'রা বৈষ্ণব ধর্মের একটি রূপান্তরিত শাখা সম্প্রদায়। সাধক আউলচাঁদ প্রতিষ্ঠিত এই সম্প্রদায় কঠিন শাস্ত্রজ্ঞান ও কঠোর সাধনার পথ ছেড়ে সহজিয়া পন্থায় ঈশ্বরকে পাবার জন্য গুরু বা কর্তাকেই ঈশ্বরের প্রতিনিধিজ্ঞানে ভজনা করতেন। মহাত্মা দুলাল পাল ঘোষপাড়ায় এই ধর্মের আখড়া স্থাপন করেন। প্রথমত, এই ধর্ম প্রান্তিক মানুষদের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়। শিক্ষিত, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন বৈষ্ণবেরা এই শাখাকে এড়িয়ে চলতেন। এই শাখার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল গুরুপ্রসাদী প্রথা। কুমারী মেয়েরা বিবাহযোগ্য হলে গুরুই তাঁদের ধর্মের নামে ভোগ করবার প্রথম রাতের অধিকার লাভ করতেন। ক্রমে এই প্রথার সুযোগে ব্যভিচার প্রবেশ করে এবং রমণীভোগ্য হিসাবে এই ধর্মের প্রতি অনেক বাবুই আসক্তি দেখাতে থাকেন। হুতোম তাঁর নকশায় কর্তাভজাদের 'গুরু-প্রসাদী প্রথা' সম্পর্কে প্রচলিত একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তবে সে ছিল মেদিনীপুরের পশ্চিমাঞ্চলের ঘটনা। খাস কলকাতার বুকেও বাবুরা যে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ব্যাপারে উৎসাহিত, তা জানায় যায় ভাঁড়ের নকশা থেকে হুটুম গোঁসাইয়ের আখড়া পাথুরিয়াঘাটার এক কুচনীপাড়ার মধ্যে। তাঁর সেবাদাসীটি হলেন 'ছোটদিদি'— 'রকমারী মেয়েমহলের মিশনরি', 'মেয়েমজানোর কল'।[২৮] গাঁজা প্রভৃতি নেশা, ব্যভিচার ও লাম্পট্য এসবের নেশায় অনেক বাবুরাই সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে ভিড় জমাতেন কর্তাভজার সভায়। নকশায় কর্তাভজার গুরুটির প্রধান শিষ্য বটুক সাঁইয়ের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, বটুক উচ্চপদস্থ চাকুরে অটল লাহিড়ীর পুত্র। অটল লাহিড়ীর আয় ভালো, তার উপর 'উপরি (চুরি)' আছে, তিনি বল্‌দে ব্রাহ্মণদের ১০ টাকা সাহায্য করেন আবার পূজা-আচ্চাতেও ১০ টাকা খরচ করেন। বাড়িতে বিগ্রহ আছে, সকলে তার প্রসাদ খান। বাইরে অটলের একটি বাঁধা রক্ষিতা আছে। তারই পরামর্শে অটল বটুকের স্ত্রীর অসুখ ভালো করতে হুটুম গোঁসাইকে ডেকে আনেন। বটুকের স্ত্রীকে 'হক্তেলভস্মে' আর ঝাড়ফুঁক করে ভালো করে দেওয়ায় অটলেরা সপরিবারে কর্তাভজার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য, যৌন ব্যভিচার, বিকৃতি, বাবুয়ানার হুজুকেই কর্তাভজারা অল্প হলেও কলকাতার নাগরিক সমাজজীবনে নিজেদেরকে প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছিল। অটল লাহিড়ীর মতো বাবুরাই এ জাতীয় অনাচারের পৃষ্টপোষকতা করতেন। সন্দেহ নেই, ভাঁড় সম্পূর্ণ এক নতুন বিষয়ের সঙ্গে বাবুসংযোগ নিয়ে আলোকপাত করেছেন।

ভাঁড়ের রচনায় আরেকটি দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। সে দীর্ঘনিঃশ্বাস কেরানিবাবুদের নিয়ে। বিভিন্ন সাহেবি কোম্পানিতে চাকরির সুবাদে কেরানিবাবুদের বেশ রমরমা। কিন্তু কাজে ব্যস্ততা যতটা, পরিণামে লাভ ততটা নয়। লেখকের ভাষায়, 'কেরানিগিরিতে আর রস্ নাই। কেলেসোনা, আঁধারে মাণিক, গোষ্ঠীর তিলকরা শুন্‌তে মোটাসোটা মাইনে পান, কিন্তু তাঁদের গাড়ীর খরচে, মদের খরচে, বাকী মেয়ের বিয়েতে ''ডাইনে আন্‌তে বাঁয়ে কুলায় না'' শেষে বাড়ী বাঁধা পড়ে।'[২৯] অর্থাৎ কেরানিবাবুরাও তাঁদের নির্দিষ্ট আয়ের মধ্যে থেকেই বাবুয়ানার শখে নিমজ্জিত। এ কারণেই যে মাহিনায় সাধারণভাবে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন চলত, সেই মাহিনাতে আর তাঁদের বাবুয়ানার শখ মিটিয়ে সংসার চালানো দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উনিশ শতকের শেষার্ধ মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবু, বিশেষ করে কেরানিবাবুদেরই কাল। বাবুয়ানার চোরাগোপ্তা অভিঘাতে তাঁরা তখন দিশেহারা। বিত্তনির্দিষ্ট বাবুত্বের দিন শেষ হলেও বাঙালি মধ্যবিত্তের মনে— আচরণে 'বাবু'রা বেঁচেই রইলেন এইভাবে। শুধুমাত্র বাবুয়ানার বাহ্যআড়ম্বরটুকু অনেকটাই সংকুচিত ও জাঁকজমকহীন হয়ে গেল, এইমাত্র।

ভাঁড় সংকলিত 'সচিত্র গুজলারনগর' এ কারণেই নানান দিক থেকে গুরুত্বলাভ করে বাবু-ইতিহাসে। ভাঁড়, সন্দেহ নেই, বেশ কিছু নতুন দিক থেকে আলো ফেলেছেন এই ইতিহাসে, যথা—

(ক) আপাত নিরপেক্ষতার সঙ্গে ভালো-মন্দ কোনো দিকের প্রতি আনুকূল্য না রেখে সমকালীন কলকাতার নাগরিক প্রেক্ষাপটে বাবুদের নানান রূপের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেয় এই নকশা;

(খ) বিত্তমুখী বাবুত্বের পাশাপাশি স্বল্পবিত্তভোগীরাও যে বাবুত্বের অন্ধ আকর্ষণে মোহগ্রস্ত, তার ছবি পাওয়া যায়;

(গ) কর্তাভজা প্রভৃতি নিম্নবর্গের ধর্মজীবনও অনাচার ও ব্যভিচারের সুযোগে বাবুদের অবলম্বিত ধর্ম হয়ে উঠেছে দেখা যায়;

(ঘ) সম্ভ্রান্ত ও বিত্তবান বাবুদের নৈতিক জীবন বিশেষ সুখকর ছিল না;

(ঙ) মদ ও বেশ্যাবাজির সঙ্গে সঙ্গে অনেক বাবু বিশেষ সংগীতরসিক হয়ে উঠেছেন দেখতে পাই। এ কাহিনির বাবু নীরদচন্দ্র কেবল খেমটা নাচ আর বাইজির গানই শোনে না, নিজের স্ত্রীকে গান শেখাবার জন্য একটি 'মধ্যমগোচ' ওস্তাদও রেখেছেন, দেখতে পাই।

সব মিলিয়ে, 'সচিত্র গুলজারনগর' একটি বিশিষ্ট রচনা। সর্বোপরি, সাধারণ দরিদ্র মানুষের আশ্রয়লাভ, চুরির অভিযোগে জেলে যাওয়া, সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য গুপ্তচর নিয়োগ এবং নানান রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির মধ্যে থেকে সত্য উদ্‌ঘাটন, নকশার মধ্যে সেন গোয়েন্দা কাহিনির পূর্বাভাস পাওয়া যায়। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'দারোগার দপ্তর' তখনও কালের গর্ভে, কিন্তু বাবু-সাহিত্যের হাত ধরে যেন গোয়েন্দা কাহিনিরও আবির্ভাব ঘটল বলা যায়।[২৩৬]

নকশার ধাঁচে রচিত দু'খণ্ড 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়' (প্রথম খণ্ড-১৮৭৫ খ্রি. দ্বিতীয় খণ্ড-১৮৭৭ খ্রি.) উনিশ শতকের শেষার্ধের একখানি উল্লেখযোগ্য রহস্য-সন্দর্ভ। নকশার বাহ্য আপাত তরলতা এখানে প্রায় অনুপস্থিত, আবার প্রবন্ধের গুরুভার চিন্তার প্রকাশও নেই; কিন্তু প্রায় কয়েক দশকের বাঙালিসমাজ তথা বাঙালি 'নব্যবাবুদের' বদলের চিহ্নগুলি এখানে ধরে রাখা হয়েছে। উনিশ শতকের বাঙালি জীবনে নিতান্ত পরিচিত কিন্তু পরলোকগত কিছু কৃতী পুরুষের স্বর্গোদ্যানে উপস্থিতি পারস্পরিক কথোপকথন মত বিনিময়ের সূত্রে নব্যবাবু এবং বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের সাধারণ চরিত্র

পর্যালোচিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, এঁদের মধ্যে পরলোকগত হুতোম তথা কালীপ্রসন্ন সিংহও আছেন। সভার মধ্যমণি বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬)। তাঁকে ঘিরে যাঁরা তৎকালীন বঙ্গদেশে ও বঙ্গীয় যুবকদের হাল-হকিকত শোনাতে উদ্যোগী, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, দ্বারকানাথ মিত্র, কালীপ্রসাদ ঘোষ, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ। প্রিন্স দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর 'বঙ্গভূমি' কীদৃশ বেশবিন্যাসে ও কীদৃশ ব্যক্তিবৃন্দে বিভূষিত' হয়েছে, তা জ্ঞাপন করাই এই মজলিশের লক্ষ্য। দ্বারকানাথের মৃত্যু অর্থাৎ ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে গ্রন্থরচনার কাল অর্থাৎ ১৮৭৫/৭৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় তিরিশ বছরের বাঙালিবাবুর পরিবর্তনকে ধরতে চেয়েছেন গ্রন্থকার। মনোধর্মে রক্ষণশীল ও কিছুটা পুরাতনপন্থী গ্রন্থকার (এই গ্রন্থের আখ্যাপত্রে লেখকের কোনো নাম নেই। তবে বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে এবং শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষের 'সাহিত্যসেবক মঞ্জুষা'য় হরনাথ ভঞ্জকেই 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়' গ্রন্থের লেখক বলা হয়েছে বলে, গ্রন্থের নতুন সংস্করণের সুযোগ্য সম্পাদক হরনাথ ভঞ্জকেই লেখক হিসাবে গ্রহণ করেছেন।[২৩৭] উল্লেখ্য যে, গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছিল হরনাথের অগ্রজ দ্বারকানাথ ভঞ্জের 'বাল্মীকি যন্ত্র' থেকে)। অবশ্য সে পরিবর্তনে গুণ অপেক্ষা দোষের দিকেই বাবুদের টান অনুভব করেছেন। পুরাতন কালধর্মের প্রেক্ষিতে নতুন কালের চেহারা তাঁর চোখে আদৌ সুন্দর রূপে প্রতিভাত হয়নি। এ দিক থেকে রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একালে'র সঙ্গে তাঁর গ্রন্থের সাদৃশ্য রয়েছে। তবে, রাজনারায়ণ বসু পরিণামে 'আশাবাদী', কিন্তু 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়ের' লেখকের আশার চেয়ে নৈরাশ্যই বেশি। প্রথম খণ্ডের 'বিজ্ঞাপন' অংশে অবশ্য লেখকের বক্তব্য হল : 'অধুনাতন কালের বঙ্গসমাজে যে সকল মহা দোষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহা দর্শন করিয়া মধ্যে মধ্যে মনে অতিশয় দুঃখের উদয় হয়, সেই দুঃখই আমাকে এই গ্রন্থ প্রকাশে প্রবৃত্ত করিয়াছে। বন্ধুভাবে সুমিষ্ট স্বরূপাধ্যান বর্ণনা, সেই দোষ সকল প্রতিকারের প্রধান উপায় মনে করিয়া গ্রন্থের সকল স্থানে আমি তাহা অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিয়াছি।'[২৩৮] যদিও বিষয়-বর্ণনায় নৈরাশ্যর ভাগটিই প্রবল ও প্রধান হয়ে উঠেছে।

মনে রাখতে হবে, পূর্বোক্ত নকশাগুলির মতো মদ্যপান ও বেশ্যাবাজির সমালোচনা কিংবা দোষ বর্ণনা করা গ্রন্থ লেখকের অভিপ্রায় নয়। শিক্ষিত বাঙালিবাবুদের পরিবর্তন রুচি, সংস্কৃতি, মনন-চিন্তন সহ জীবনযাপনের যাবতীয় দোষগুণ তুলে ধরাই তাঁর লক্ষ্য। বাঙালি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির যে রূপান্তর রাজনারায়ণ বসুকে 'সেকাল আর একাল' লিখতে প্রাণিত করে, যে মানসিক ভাঙনে ব্যথিত গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'প্রফুল্ল'র মতো নাটক লিখতে বসেন, স্বভাবের সেই গূঢ়তর রূপান্তর ও ভাঙনের স্বরূপকে নকশাকার চোখে আঙুল দিয়ে যেন দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন। অবশ্য যে বদল বা রূপান্তরকে তিনি আকস্মিক বলে ভেবেছিলেন, উনিশ শতকের প্রায় শুরু থেকেই সেই বদলে যাওয়া চোখে পড়ছিল আরও কারোর কারোর। ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮২১ সংখ্যার 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত চিঠির বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, 'এ প্রদেশীয় কতকগুলি বিশিষ্ঠানুশিষ্ঠ সন্তানদের অন্তঃকরণে সর্ব্বদাই অভিমান আছে যে আমি কিম্বা আমরা বিশিষ্ট লোক অমুক ইতর লোক এই অভিমানে সর্ব্বদাই মুগ্ধ থাকেন কিন্তু ব্যবহারে এবং বাক্যে কিছুই ইতর বিশেষ হয় না।'[২৩৯] পত্রলেখক এই প্রসঙ্গে কতকগুলি ব্যবহার স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন[২৪০], যথা—

এক. নিজের পিতৃ-মাতৃবংশের সম্যক ধারণা নেই, কেবল পিতা ও পিতামহের নাম বলতে পারেন। এর বেশি জিজ্ঞাসা করলে ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, 'আমি কি ঘটক!'

দুই. সুপুরুষ সাজতে প্রয়োজনে স্ত্রীলোকের ব্যবহার্য অলংকারাদি পর্যন্ত পরিধান করেন। ‘বেশ বিন্যাস দেখিলে বোধ হয় না যে কোন সভায় কিম্বা সাহেব লোকের দরবার যাইতেছেন স্পষ্ট বুঝা যায় যে বেশ্যালয়ে গমন হইতেছে।’

তিন. বাক্যবিন্যাস অশ্লীল, অমার্জিত, ভাবনাচিন্তাহীন অথচ মনে মনে নিজেকে ‘সুবক্তা’ ভাবেন;

চার. কিছু ‘বিলিতি অক্ষর’ লিখতে শিখে এবং দুই তিনশো ইংরেজি শব্দ আয়ত্ত করে বাংলাভাষা প্রায় আর বলেন না, বাংলায় পত্র লেখা তো দূরের কথা। সে পত্র লিখলে তার অর্থোদ্ধার স্বয়ং লেখক ছাড়া আর কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। দু’চারপাতা ইংরেজি পড়েই তাঁদের মুখে সর্বদা ‘হুট গোটেহেল ডোনকের ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করা আছে’।

পত্রলেখক বিদ্যার অভিমান ত্যাগ করে ‘প্রকৃত শিক্ষা’র দ্বারা শ্রদ্ধা ও বিশিষ্টতা অর্জনের পন্থা নির্দেশ করেছেন। একটু সচেতনতার সঙ্গে লক্ষ করলে বোঝা যাবে, ‘সুরলোকে গ্রন্থের পরিচয়ে’র লেখকের বক্তব্য এবং তার পঞ্চাশ বছর আগে প্রকাশিত পত্রলেখকের বক্তব্যে কোনো আকাশ-পাতাল প্রভেদ নেই। আসলে সাহেবি শাসনে অন্য ধরনের সংস্কৃতির স্পর্শে অল্প অল্প করে বদলাতে শুরু করেছিলেন বাঙালিবাবুরা। হতে পারে সেই বদল নঞর্থক, হতে পারে সেই বদল সদর্থক, কিন্তু ‘রূপান্তরে’র প্রক্রিয়াটি ক্রিয়াশীল ছিল যাবতীয় সমালোচনা-সমর্থনের আবহাওয়াতেও। নব্যবাবুদের হাত ধরে পাশ্চাত্য শিক্ষার স্থায়ী ও সুদৃঢ় ভিত গড়ে উঠেছিল, প্রাত্যহিক সংস্কারেরও পরিবর্তন সাধন হয়েছিল। আর এসবের দরুনই মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত ‘ভদ্রলোক’বাবুরা আসরে দেখা দিয়েছিলেন। আবার আর্থ-সামাজিক কারণে তাঁদের মধ্যে থেকেই উঠে এসেছিলেন কেরানিবাবুরা। এই ধারাবাহিক কিন্তু ধীর পরিবর্তনের কোনো একটি বা দু’টি দশককে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তার অভিঘাত তীব্র বলে মনে হয়। বর্তমান গ্রন্থলেখক তেমনটিই করতে চেয়েছেন। সমালোচকের ভাষায়, ‘‘ইংরেজি শিক্ষিত’’ সম্প্রদায় এই গ্রন্থের নায়ক — কীভাবে তাঁরা বাঙালিসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন, এবং আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর গোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছেন,— দেখানোই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য।’[২৪১] যদিও মনে রাখতে হবে, উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে এই ‘ইংরেজি শিক্ষিত’ সম্প্রদায়ে বৃহৎ বাঙালিসমাজের ভগ্নাংশ মাত্র। তবুও গ্রন্থকারের আশঙ্কা থেকে মনে হয়, বদলে যাওয়া জীবনচর্যার দৌলতে ইতিমধ্যেই তাঁরা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছেন এবং একইসঙ্গে সমাজ ভয় পাচ্ছে, ‘ইংরেজি শিক্ষিত’ ভদ্রলোকবাবুদের প্রভাবে সমাজের বাকি শ্রেণির মধ্যে সংক্রমণের। এ কারণেই এমন সমালোচনা এবং প্রতিরোধের প্রচেষ্টা।

লেখক মূলত গ্রন্থে ‘ইংরেজি শিক্ষিত’ বাবু, যাঁদের তিনি দ্বিতীয় খণ্ডে ‘নবযুবা’ বলেছেন,[২৪২] তাঁদের প্রসঙ্গেই সমধিক বলেছেন। এ ছাড়াও নতুন কালের কেরানিবাবুরাও দু’একটি ক্ষেত্রে তাঁর সন্ধানী দৃষ্টির আলোয় পড়েছেন। ‘নবযুবা’দের প্রসঙ্গে প্রথম খণ্ডের ‘ইংরেজি শিক্ষিত’ শীর্ষক রচনায় বলা হয়েছে, এঁদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, প্রাচীনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন দূরে থাক, তাঁদের অশ্রদ্ধা-অবহেলা করা। এঁরা সামান্য ইংরেজি শিক্ষার গুণে নিজেদের সবজান্তা বলে মনে করেন এবং কোনো প্রসঙ্গ না বুঝলেও সে ব্যাপারে কারোর সঙ্গে পরামর্শ না করে নিজে যা মনে ভাবেন তাই করেন। শাস্ত্রনিরূপিত ধর্মে এঁদের আস্থা বা শ্রদ্ধা নেই। নিজেদের বংশকৌলীন্য সম্পর্কে অজ্ঞ হলেও ‘বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের সাত পুরুষের নাম চক্ষের নিমেষে উচ্চারণ করেন।’[২৪৩] বাংলা বই পড়ার আগ্রহ না থাকলেও বেছে বেছে ইংরেজি পুস্তক পাঠ করেন এবং তাঁর দরুন অহংকারে স্ফীত হন। এঁদের পোশাক-আশাক পুরোপুরি ইংরেজ অনুসারী, ‘সম্বাদতত্ত্বে’ও

বলা হয়েছে, এঁদের মধ্যে যাঁরা চাকরিজীবী, তাঁরা প্রায় সকলেই 'প্যানটুলেন চাপকান ব্যবহার করিতেছেন। যবনের ন্যায় সকল হিন্দুই শ্মশ্রুধারী হইয়াছেন।'[২৪৪] যদিও গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সাহেবদের শীতপ্রধান দেশের ন্যায় পোশাক কতদূর যুক্তিসংগত, সে বিষয়ে লেখক প্রশ্ন তুলেছেন।

এঁদের মধ্যে যাঁরা উচ্চশিক্ষিত, তাঁরা প্রায় সকলেই 'বিলাতের প্রথানুসারে' বি.এ, এম.এ, বি.এল্ ইত্যাদি উপাধি (ডিগ্রি লাভ ও ব্যবহার করেন। কেউ কেউ বিলাতে গিয়ে ব্যারিস্টারি, ডাক্তারি ইত্যাদি পাঠ করেন এবং শিক্ষান্তে দেশে ফিরে এসেই ইংরেজ-মহল্লায় গিয়ে বাস করতে থাকেন। এঁদের খাদ্যাভ্যাস, জীবনযাপন, পোশাক-পরিচ্ছদ সবই সাহেবদের অনুগামী। কোট প্যান্টুলান পরেন এবং 'উইলসনের হোটেল হইতে তাঁহাদিগের ভক্ষ্য দ্রব্য আসিতেছে'[২৪৫] লেখকের মতে, এঁদের কাছ থেকে পিতা-মাতা, স্বদেশ-স্বজন কিছুই আশা করতে পারে না। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভারতীয় ও 'বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার দেশীয় সভ্য নিযুক্ত হয়েছেন। তবে দুই একজন ছাড়া 'সকলেই ইংরাজদিগের অভিপ্রায়ে ক্রমাগত সম্মতিসূচক শিরশ্চালন দ্বারা ভিটো' দেন। উল্লেখযোগ্য, যে ব্যবস্থাপক সভা উচ্চবর্গের অভিজাত শিক্ষিতদের সভা, দেশের উন্নতি এর বাহ্য আদর্শ হলেও মূল কাজ ছিল ব্রিটিশদের স্বার্থরক্ষা করা। প্যারীচাঁদ মিত্রের মতো মানুষেরা এই সভার সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে, 'এই পদে দুই বৎসর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কায়মনে স্বদেশের কল্যাণসাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।'[২৪৬] প্যারীচাঁদ প্রমুখেরা দু'একজন ব্যতিক্রম, কিন্তু বাকি সভ্যরা সকলেই শাসকশ্রেণির সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর দিতেন মাত্র। বাঙালি হয়েও, গ্রন্থকারের মতে, 'নিদারুণ দুঃখের কথা কি কহিব, বাঙালিবাবুরা বাঙালির সভাতে নিরবচ্ছিন্ন ইংরাজী বক্তৃতা করিয়া, মাতৃভাষার প্রতি অরুচির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।'[২৪৭] এই অভিযোগ অবশ্য নব্যবাবু থেকে ইংরেজি শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'দের বিরুদ্ধে বারংবার উচ্চারিত হয়েছে। পূর্বোদ্ধৃত 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত চিঠির বক্তব্য স্মরণীয়।

নব্যশ্রেণিরা অনেকেই খৃষ্টধর্মের অনুরাগী। বিলিতি পোশাকও তাঁদের অনুরাগ থেকে বঞ্চিত নয়। অনেকেরই পিতা-মাতা কাল-ধর্ম অনুযায়ী এই সাহেবিয়ানাকে সমর্থন করেন। অনেকেই নিজ পুত্রদের বড়োবাবু, মেজোবাবু, সেজোবাবু নামে সম্মোধন করেন। লেখক ব্যঙ্গ করে বলেছেন যে, প্রণম্য বাঙালিকে প্রণাম না করলেও যেমন-তেমন গোছের সাহেব হলেই সেলাম করার শিক্ষা পিতামাতারা দিয়ে থাকেন। ফলে 'ইংরাজীর প্রাদুর্ভাব হইয়া বঙ্গীয় পুরুষেরা প্রায় সকালেই স্বজাতীয়ভাব বিসর্জ্জন দিয়াছেন। কেবল যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষা পাইয়াছেন এমন নহে, ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ প্রাচীনদিগকেও ইংরাজী ভাব সংক্রামক রোগের ন্যায় আক্রমণ করিয়াছে এবং তাঁহাদিগেরও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ জন্মাইয়া দিয়াছে।'[২৪৮] এই সাহেবিয়ানার প্রতি বাবুদের আসক্তি এমন প্রবল যে দেশীয় 'নিগারদের' সঙ্গে বাস করার চেয়ে চট্টগ্রাম, চন্দননগর, চুনোগলির 'নকল সাহেবদের' অনুসারে চলতেই তাঁরা বেশী পছন্দ করেন।[২৪৯] সাহেবদের অনুকরণে এঁরা যানবাহন অর্থাৎ অশ্ব ও গাড়ি কিনতে কেউ কেউ যথাসর্বস্ব নিঃশেষ করেন, এমনকী অশ্বের গাত্রাবরণের মূল্য পিতার পরিহিত পোশাকের মূল্য অপেক্ষা মহার্ঘ। সেইসঙ্গে খাদ্যবস্তুর জন্যও এঁরা কম অর্থ ব্যয় করেন না। চুলের নানাবিধ 'ফ্যাশন ফেরাতে' এঁদের ন্যূনধিক এক ঘণ্টা ব্যয় হয়। যদিও লেখকের মতে, 'উচ্চতর ভদ্রপরিবারস্থ যুবাদিগের তাদৃশ কেশানুরাগ নাই',[২৫০] যদিও সমকালীন সমাজে তার বিপরীত সাক্ষ্যই পাওয়া যায়। পটলডাঙা, হুগলি, ঢাকা, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি বিখ্যাত গভর্নমেন্ট কলেজের ছাত্ররা, যাঁরা উচ্চশিক্ষিত এবং তর্কপ্রবণ, তাঁদের দম্ভ সর্বাধিক। এঁরা অনেকেই মোকদ্দমা-প্রিয়। সর্বদাই

পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে তৎপর এবং প্রয়োজনে সর্বস্বান্ত হয়েও মামলা-মোকদ্দমা করে থাকেন সামান্য অজুহাতেই।

ইংরেজি শিক্ষার মারফত এঁরা 'জাতীয়তা' নামক নতুন হুজুগের সঙ্গে পরিচিত ও মত্ত হয়েছেন। ফলে, সাধারণভাবে স্বদেশে উন্নতির লক্ষ্যে, জাতীয় মেলা, জাতীয় সভা, জাতীয় বিদ্যালয়, জাতীয় সংবাদপত্র ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে। মেলায় মাতৃভাষায় প্রবন্ধ পাঠ করা চললেও 'জাতীয় বিদ্যালয়ে ভিন্ন জাতীয় অর্থাৎ ইংরাজী ভাষার আলোচনা হইয়া থাকে'।[২৫১] 'জাতীয়তা'র প্রতি এই অনুরাগ যে নিতান্ত পুঁথিগত, হৃদয়জাত নয়, 'নবযুবা'দের আচরণে তারই প্রতিফলন। এদিকে জাতীয়তার কথা বলেন, অথচ ইংরেজ প্রভুর অফিসের একটি চাকরির জন্য সবরকম হীন কাজ করতেও এঁরা দ্বিধাবোধ করেন না। পিতা, মাতা, ভাই, বোন, এমনকী গুরুদেরও এঁরা যথোচিত ভক্তি শ্রদ্ধা দেখান না। এঁরা আত্মীয়পরিজনের কাছে অতিথিবৎসল নন। তবে স্ত্রীর প্রতি আনুগত্য এঁরা 'শিভল্যরী' বলে মনে করেন। সেইসঙ্গে, স্ব-বলে স্ত্রীকে রক্ষা করার মতো শারীরিক ও মানসিক সাহস না থাকলেও এঁরা প্রায় সকলেই 'স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা প্রদানে একান্ত প্রোৎসাহী, প্রাপ্তযৌবনা না হইলে কন্যাগনের বিবাহদানে ইচ্ছুক নহেন। কামিনীগণকে প্রকাশ্য স্থানে লইয়া পরিভ্রমণ করাই ইঁহাদিগের প্রিয় প্রধানতম কার্য্য।'[২৫২] স্ত্রী সহ প্রকাশ্যে পরিভ্রমণ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকেই শুরু হয়েছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা দেখালেও তাঁর উত্তরপুরুষদের এই প্রগতিশীলতা গ্রন্থকার রক্ষণশীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে মেনে নিতে পারেননি বলেই বোধ হয়।

এত যাঁরা প্রগতিশীল ও আধুনিক, সেই 'নবযুবা'রা প্রচলিত 'বাবুগিরি'র প্রতি আসক্ত হয়ে বাবুয়ানার ভ্রান্ত পথে চলতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হতে দ্বিধাবোধ করেন না। বাড়িতে ভালোভাবে খাওয়া জোটে না, অথচ 'চারি টাকা মূল্যের ইংরাজী পাদুকা চাহি। নিকটস্থ কার্য্যালয়ে গমনাগমনের গাড়ী পাল্কীভাড়া ও শনিবার নাটকাভিনয় দর্শন লালসা পরিতৃপ্তির ব্যয় চাহি।'[২৫৩] যদিও, এঁদের পূর্বপুরুষেরা 'বাবুত্ব জানতেন না', লেখকের এই বক্তব্য আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ যে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মুখে এই উক্তি ব্যবহৃত হয়েছে, তিনি কম বাবু ছিলেন না। তাঁর 'হিন্দু থিয়েটার' দিয়েই বাঙালির শখের থিয়েটারের যাত্রা শুরু একথা ভুলে গেলে চলবে না। লেখক বলেছেন, 'এক্ষণকার উচ্চতর বাবুদের সকলই বাবুয়ানায় যায়; অথচ আলোচনা করিয়া দেখিলে তাঁহারা যাবজ্জীবনের মধ্যে স্মরণের উপযুক্ত কোন কার্য্য করিয়াছেন, এমত দেখা যায় না।'[২৫৪] বস্তুত, এই কথা অনেক বাবুদের সম্বন্ধেই ঘটে। নব-নব্য-ভদ্র বাবুদের অনেকেই ব্যক্তিগত সুখের অভিপ্রায়ে অকাতরে অর্থব্যয় করেছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ সামাজিক মঙ্গলের জন্য কিছুমাত্র ব্যয় করেননি। তবে এর ব্যতিক্রমও পূর্বে সুলভ ছিল, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির বদল হলে, নির্দিষ্ট বেতনভুক কর্মচারীর পক্ষে বাবুগিরির ব্যক্তিগত শখ মিটিয়ে আর অন্য খরচের উপায় থাকত না, অতএব দানধ্যান প্রভৃতি পুণ্য কাজে অর্থ ও সময়দান প্রায় বিলোপ হতে বসেছিল। অবশ্য লেখকের বক্তব্য অনুসরণ করলে বলা যায়, প্রচলিত পাশ্চাত্য শিক্ষার কাঠামোয় সেই মানসিক উদারতার ভিত তৈরি সম্ভব হয়নি 'ভদ্রলোক'বাবুদের মধ্যে। তবে সমাজে কিছু মানুষ আশ্চর্যজনকভাবে এই স্বভাবের আওতার বাইরে ছিলেন। নব্য শ্রেণির 'বাবুত্ব' প্রসঙ্গে লেখক ব্যঙ্গ করে বলেছেন, 'কনিষ্ঠাঙ্গুলের অগ্রভাগ চর্ব্বণ বা লেহন করা, দণ্ড বা অধরোষ্ঠ দ্বারা লেখনী ধারণ করা, উভয়পার্শ্বস্থ পকেটে হস্ত সন্নিবিষ্ট করিয়া দণ্ডায়মান থাকা উচ্চতর বাবুত্বের লক্ষণ!! তপন-তাপে সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত, মস্তকের মস্তিষ্ক শুষ্ক হইতেছে, তথাপি স্বহস্তে ছত্রধার করা হয় না।'[২৫৫]

নবীন বাবুদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি যে হীনবল হয়েছে, এ ব্যাপারে লেখক দৃঢ়প্রত্যয়। তাঁর মতে, এঁরা রুগ্ন, অনেকেই বারোমাস রোগ-অসুখে পীড়িত, শারীরিক সামর্থ্য কম, পরিশ্রমবিমুখ। নিজেদের ভোগ-সুখের জন্য এঁরা পিতা-মাতাকে পর্যন্ত কষ্ট দিতে দ্বিধা বোধ করেন না। উপকারীর উপকার স্বীকার করা, বেশ-বাস-পরিচ্ছদ অপেক্ষা মানসিক রুচি ও সম্মানের উপযুক্ত হিসাবে নিজেদের গড়ে তোলার বিষয়ে এঁরা অনেকেই অপারগ। এঁরা নিজেদেরকে অপরের চেয়ে সবসময় শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন বলে 'অতি হেয় হইলেও আপনাকে ক্ষুদ্র প্রাণী বিবেচনা করেন না।'[২৫৬] সমস্ত গ্রন্থের কোথাও লেখক নব্যযুবাদের বেশ্যাগমন, লাম্পট্য বা মদসহ নানাপ্রকার নেশার প্রতি আসক্তি বিষয়ে প্রায় নীরব। কেবল, 'নববাবুদে'র স্বভাব বর্ণনা করতে গিয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন, 'ইদানীং ইহাঁরা যৌবন মদে মত্ত হইয়া শারীরিক নিয়ম ভঙ্গ করেন, সেই হেতু ইহাঁদিগের মধ্যে নিরন্তর অকাল-মৃত্যু বিচরণ করে—'।[২৫৭] সম্ভবত অতিরিক্ত মদ্যপান এবং আনুষঙ্গিক নানান দোষ ও বিকৃতির প্রতিই লেখক ইঙ্গিত করেছেন।

ইংরেজি শিক্ষিত বাবুদের মধ্যে 'উকীলপদ লাভের জন্য মনের বিষম বেগ' লক্ষ করেছেন লেখক। যদিও উকিলদের অবস্থা তখন আর তেমন ভালো ছিল না, তবুও ওকালতিতেই নবযুবাদের আগ্রহ বেশি ছিল বলে লেখক মন্তব্য করেছেন। এবং একবার উকিল হতে পারলে 'তাঁহারা অনেকে "আমরা উকীল" এই গরিমায় ব্রহ্মাণ্ডকে পোস্তদানার অপেক্ষা ক্ষুদ্রবোধ করেন; তাঁহারা আপনাদিগের অপেক্ষা সকল প্রকার পদস্থ লোককে হীনাবস্থ বিবেচনা করেন এবং কেহ কেহ স্পষ্টাক্ষরে বলেন— "We are above the ordinary class of people"'[২৫৮] এঁদের অনেকের কাছে দেশীয় শাস্ত্র 'হাস্যাস্পদ ও অসংলগ্ন পদার্থ' বলে বিবেচিত। এদিকে জাতীয়তার জাগরণে সচেষ্ট, অন্যদিকে দেশীয় যা কিছুর প্রতি তাঁদের আন্তরিক ঘৃণা। লেখক উপহাস করে বলেছেন যে, এদেশের শাস্ত্র-সাহিত্য অভিনয়ের প্রাচীনত্ব এমন, যখন সাহেবরা এসব বিষয় ভাবতে পারত না। তখন এদেশের পণ্ডিতেরা উক্ত বিষয়ে শাস্ত্রাদি গ্রন্থসমূহ রচনা করে গিয়েছেন।[২৫৯]

মধ্যশ্রেণির ইংরেজি-শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের মধ্যে যদিও নঞর্থক গুণের চিহ্নই তিনি খুঁজে পেয়েছেন বেশি, তবে তাঁদের চরিত্রের কিছু গুণের কথাও বলেছেন তিনি। প্রকৃতপক্ষে, বিগতকালের সঙ্গে তুলনা করে তাঁর মনে হয়েছে, সেকালের প্রাচীনদের চেয়ে 'ভদ্রলোক'বাবুরা 'অনেক বেশী সভ্য'। আগেকার দিনের পুরুষের মতো নগ্ন গাত্রে, মুণ্ডিত মস্তকে, অশ্লীল শব্দ ও অমার্জিত ভাবভঙ্গি সহকারে আলাপ ও বন্ধুতার রীতি পরিত্যক্ত হয়েছে। শিক্ষিত ভদ্রলোক দেশের উন্নতি বিষয়ে আলাপ-আলোচনায় উৎসাহী। আগেকার দিনের বাবুদের মতো এঁরা 'উৎকোচ-লোভী' নয়। এঁদের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন একটি বিশিষ্ট ঘটনা। এর ফলে 'সাধারণের মনের মালিন্য বিনষ্ট' হয়েছে এবং 'অন্তঃপুরের ইতর ভাষা অন্তর্হিত' হয়েছে।[২৬০] আগেকার দিনে সাধারণ বিষয়ী লোকের বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানালোচনা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুরা অনেকেই জীবনের শেষভাগ পর্যন্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য বই পড়ে থাকেন। বিদ্যাশিক্ষার প্রতি আগ্রহ সাহেবদের প্রভাবে সাধারণের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে বলেও সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে।

একথা যথার্থ যে, 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়ে'র লেখক পুরোপুরি নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে ইংরেজি শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের বিচার করতে পারেননি, কখনো-বা নতুনদের প্রগতির লক্ষণকে কদর্থক সংস্কার ভেবে ভুল করেছেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের যে শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের প্রতি তাঁর অভিযোগ, তাঁরা গ্রন্থেবর্ণিত দোষগুলি থেকে কি সম্পূর্ণ বিমুক্ত

ছিলেন! যদি তাই হতেন, তবে নাটক-প্রহসনে, আখ্যানে, প্রবন্ধে, ছড়ায়, গানে, এমনকী অন্যতর নকশাতে উক্ত নব্যবাবুদের প্রতি যে ব্যঙ্গ, যে ভর্ৎসনা সঞ্চিত হয়ে আছে, তার সঙ্গে বাস্তবতার যোগ ক্ষীণ বলতে হয়। কিন্তু আমাদের সামগ্রিক আলোচনাতেই আমরা দেখেছি যে, উনিশ শতকের সাহিত্য মূলত সমাজ-মানসের অনিবার্য ফল। অতএব, নব্যবাবুদের মধ্যে গ্রন্থে বর্ণিত অভিযোগ অনুযায়ী চরিত্রধর্ম একেবারে ছিল না, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একালে'ও সমসাময়িক নব্যবাবুদের বিরুদ্ধে এমনি বহুতর অভিযোগ তোলা হয়েছিল। অতএব লেখক রক্ষণশীল এবং নিরপেক্ষ নন, একথা বলেও 'নবযুবা' অর্থাৎ শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির ভদ্রলোকবাবুদের বিষয়ে তাঁর পর্যালোচনাকে আদৌ উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। সেইসঙ্গেই, হতে পারে, লেখকের দেখা নব্যবাবুরা মূলত কলকাতা তথা শহরকেন্দ্রিক। কিন্তু গ্রামজীবনেও যে বাবুয়ানির স্রোত আছড়ে পড়েনি, বদলে দেয়নি গ্রামীণ বাবুদের মানসিক ও আচার-আচরণগত বিশেষত্ব, তা বলা যায় না। নিশাচর ও রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণের রচিত নকশার কথা স্মরণ করতে পারি আমরা; বুঝতে পারি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক চরিত্র যেমন বদলে যাচ্ছে তেমনি পল্লীগ্রামগুলিরও চরিত্র বদলে যাচ্ছে। আত্মম্ভরিতা, স্বার্থপরতা, বিলাসিতা ইত্যাদি চরিত্রধর্মগুলি শহরের গণ্ডিকে ছাড়িয়ে দ্রুত মিশে যাচ্ছে পল্লীর বাবুদের মধ্যে। অতএব গ্রন্থকারকে তাঁর মুক্তদৃষ্টির জন্য সাধুবাদ জানাতেই হয়।

লেখক তাঁর গ্রন্থে কেরানিদের প্রসঙ্গে কিছু কথা বলেছেন। কেরানিবাবুরা যে দ্রুত সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করবেন তাঁর বক্তব্য থেকে সেকথা স্পষ্ট হয়। কায়স্থরাই কেবল আর কেরানিগিরি বা সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে একমাত্র দাবিদার নন। ব্রাহ্মণ, ধোপা, নাপিত, কামার, কুমোর প্রভৃতি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে অনেকেই কেরানিবাবু হতে তৎপর। কেরানিবাবুরা দাসত্ব করতে সদা তৎপর, কিন্তু স্বাধীন বৃত্তির প্রতি আসক্তি কম। তাঁদের আয় পরিমিত, বুদ্ধিশক্তিও তদ্রূপ।[২৬১] বেলা দশটা থেকে সাহেবের অফিসে বসে ঘাড় মুখ গুঁজে তাঁদের হিসাব মেলাতে হয় এবং অন্যান্য পরিশ্রম করতে হয়। পঞ্চান্ন বছরের বেশি কেউ কেরানি-বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকতে পারেন না। কোনো কোনো সৌভাগ্যবান কেরানি মাসিক সাত-আটশত টাকা পর্যন্ত রোজগার করেন, বাকিদের প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ সীমিত।[২৬২] তবুও এই কেরানি-বৃত্তির জন্য শিক্ষিত বাবুরা যে লালায়িত, তার দ্বারাই আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির ভয়ংকর অবস্থাটি আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। উনিশ শতক শেষ হবার আগেই অবশ্য কেরানিবাবুরা দেখা দিয়েছিলেন এবং হুতোম থেকে শুরু করে অখ্যাত অজ্ঞাতনামা প্রহসন-নাট্যকারদের লেখায় তাঁরা ভিড়ও জমিয়েছিলেন।

'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়ে'র প্রথম খণ্ডে লেখক একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করেছেন, title বা খেতাব প্রসঙ্গে। তাঁর মতে, 'রাজা, O.S.T, K.C.S.T প্রভৃতি সম্ভ্রমসূচক উপাধি অনেকে পাইতেছেন যাঁহাদের নিজে খাদ্য বস্তু ক্রয়ার্থে নিত্য হাটবাজারে না যাইলে চলে না, তাঁহারা পর্য্যন্ত রায়বাহাদুর হইতেছেন।'[২৬৩] বিষয়টি তুচ্ছ করবার মতো নয়। ১৮৭৫-এর মধ্যেই ইংরেজ প্রদত্ত খেতাবগুলি তাদের আভিজাত্য হারিয়ে প্রায় সর্বসাধারণের আসরে এসে দাঁড়িয়েছিল। শিক্ষা, রুচি, বিত্ত— এসবের অপেক্ষা সাহেবদের তোষামোদ ও চাটুকারিতায় এসব title বা খেতাব মিলত; উৎকোচ দিয়েও যে খেতাব কেনা যেত, ইতিপূর্বেই নাটক -প্রহসনের দৃষ্টান্তে তা আমরা দেখেছি। ভাঁড়ও তাঁর 'সচিত্র গুলজারনগরে' খেতাবের এহেন সম্ভ্রমহানির ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। উনিশ শতকের শেষার্ধে বাঙালি নব্যবাবুদের আভিজাত্যের নিদর্শন যে খেতাবগুলি, তার প্রতি সমাজের সাধারণ মানুষের ধারণা যে কত তুচ্ছ,

উপহাস্যাস্পদ, এ জাতীয় বক্তব্যগুলি তারই ইঙ্গিত বহন করে। যে বাবুয়ানা জাতিচ্যুত হয়েছিল, আভিজাত্যের উচ্চ আসন থেকে নেমে এসেছিল সর্বসাধারণের আসরে, কোনো খেতাবই তাকে আর জাতে তুলতে পারেনি, বরং খেতাবেরই জাতি-কুল-মান সব নষ্ট হয়েছিল।

হরনাথ ভঞ্জের 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়' নকশার আদলে সমকালীন সমাজে ইংরেজি শিক্ষিত বাবুদের সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধিৎসু রচনা, লেখকের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার প্রশংসা করতেই হয় যে, নব্যশিক্ষিত বাবুদের চরিত্রের সাধারণ লক্ষণগুলি তিনি তুলে ধরেছেন। যথার্থ প্রগতির প্রতি, মুক্তচিন্তার প্রতি লেখকের মানসিক সমর্থন আছে, তা নাহলে স্ত্রীশিক্ষার প্রশংসা তিনি করতেন না। কিন্তু ভণ্ড বাবুদের প্রতিই তাঁর যত অভিযোগ। যাঁরা স্বদেশের প্রতি বিন্দুমাত্র অনুরাগ না থাকা সত্ত্বেও জাতীয়সভার হুজুগে মাতে, উদ্দেশ্যহীন সভায় আত্মম্ভরিতার উৎসব করে, দেশীয় সংস্কার শাস্ত্র-গ্রন্থাদিকে তুচ্ছজ্ঞান করে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিশ্বাস-শ্রদ্ধা-সহমর্মিতার লেশমাত্রও দেখায় না, সাহেবিয়ানার অন্ধ অনুকরণ ও দাসত্বকেই যাঁরা জীবনের পরম লক্ষ্য বলে মনে করে, সেই 'ইংরেজি-শিক্ষিত' বাবুদের ভণ্ডামির প্রতিই তাঁর ক্ষোভ। তবু গ্রন্থশেষে, দ্বারকানাথ ঠাকুরের মুখ দিয়ে নিরাকার বাণীই হয়তো গ্রন্থাকারের মনোভাবের পরিচয় দেয়। উনিশ শতকের আলোর ঝলকানির নীচে অন্ধকারের যে অন্তঃস্রোত বাহিত ছিল, 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়ে' সমাজ ও চরিত্র সংশোধনের অভিপ্রায়ে, তার কথাই বলতে চেয়েছেন লেখক তাঁর নিজের মতো করে। সর্বোপরি, সমকালীন সমাজজীবন থেকে পরলোকগত কিন্তু বাস্তব চরিত্রদের গ্রহণ করে, তাঁদের মুখ দিয়ে জাতীয় জীবনের তথা 'ইংরেজি শিক্ষিত' নবযুবাদের চরিত্র বর্ণনার শৈলীটি বাংলা নকশা সাহিত্যে বেশ অভিনব সন্দেহ নেই।

ভাঁড় এবং 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়ে'র লেখক উভয়েই শাসক কর্তৃক দেশীয়দের মধ্যে অসংগত title বিলির প্রসঙ্গে ব্যঙ্গ করেছিলেন; আর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেন সেই প্রাপক ও তাঁর title প্রাপ্তির পূর্বাপর ধরে রাখতে চাইলেন 'মুচিরামগুড়ের জীবন চরিত' নামক (বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশ ১২৮৭ আশ্বিন; গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১৮৮৪ খ্রি.) রচনায়। 'বঙ্গদর্শনে' রচনাটি শ্রীদর্পনারায়ণ পূতিতুণ্ড প্রণীত বলে প্রকাশিত হয়। আখ্যানমূলক এই রচনাটিকে কেউ বলেছেন 'বড়ো ব্যঙ্গগল্প,'[২৬৪] কেউ বলেছেন 'ইতিহাস অথবা জটিল উপন্যাস,'[২৬৫] আবার কেউ 'ব্যঙ্গাত্মক কাহিনি'।[২৬৬] পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় গ্রন্থটির 'বিজ্ঞাপনে' লেখক স্বয়ং বলেছেন যে, 'পাঠকদিগকে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, এই গ্রন্থ কোন ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণিবিশেষের লোককে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয় নাই। সাধারণ সমাজ ভিন্ন, কাহারও প্রতি ইহাতে ব্যঙ্গ নাই। ইহাতে পাঠক যেরূপ মনুষ্যচরিত্র দেখিবেন, সেরূপ মনুষ্যচরিত্র সকল সমাজে, সকল কালেই বিদ্যমান।'[২৬৭] অর্থাৎ লেখক নিজেই বলেছেন, 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' হল 'সাধারণ সমাজ চিত্র' তথা নকশা। যদিও বঙ্কিম এই নকশায় কোনো ব্যক্তিবিশেষ উদ্দীষ্ট নয় বলেছেন, তথাপি কেউ কেউ সন্দেহ করেন,[২৬৮] নকশার 'মুচিরাম গুড়' তৎকালীন সমাজের ইংরেজি-শিক্ষিত এক বিশিষ্ট বাঙালি খ্রিস্টান। এ বক্তব্য সত্য হলেও বলা যায়, শেষপর্যন্ত ব্যক্তিকতাকে ছাড়িয়ে মুচিরাম গুড় হয়ে উঠেছেন title লোভী, অকর্মণ্য, সুযোগসন্ধানী, শাসকের কৃপাভিক্ষু অগণন বাঙালি শিক্ষিত-অশিক্ষিত বাবুদের প্রতিনিধিস্বরূপ। ডেপুটি ম্যাজিস্টেট হিসাবে বঙ্কিমের নিজস্ব অভিজ্ঞতার বৃত্ত থেকেও কাহিনির উপাদান সংগৃহীত হতে পারে। স্মরণীয় যে, ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে প্রথম সরকারি খেতাব 'রায়বাহাদুর লাভ' করেন। এই উপলক্ষ্যে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য'

পত্রিকায় ১২৯৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত একখানি প্রবন্ধে 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' লেখকের এই খেতাব-গ্রহণের বিরুদ্ধে বক্রোক্তি করেন।[২৬৯] তবে, ভালো করে ভেবে দেখলে বোঝা যায়, বঙ্কিমের বিরূপতা খেতাবের বিরুদ্ধে নয়, খেতাব দানের প্রক্রিয়া ও তার প্রাপকদের বিরুদ্ধে। বংশকৌলীন্য, শিক্ষা, সংস্কার, নানান কাজে পারদর্শীতার চেয়ে তোষামুদি, চাটুকারিতা, অনৈতিক recommendation ইত্যাদিই ছিল সেদিন এ জাতীয় খেতাব-প্রাপ্তির প্রচলিত পদ্ধতি। খুব কম ব্যক্তিই এই প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যে না গিয়েই তাঁর নিজস্ব যোগ্যতায় উক্ত titleগুলি লাভ করতেন। ফলে দেখা যেত, নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তি, সামাজিক জীবনে যাঁর কোনো অবদান বা ভূমিকা নেই, তিনিও এই চাটুকারিতা ও অনৈতিক পদ্ধতির প্রয়োগে নানাপ্রকার সরকারি খেতাবের মধ্যে একটি বা তার বেশি খেতাব লাভ করতেন। কোনো কোনো ব্যক্তি উৎকোচ দিয়ে কিংবা অন্য কোনো অসাধু উপায়ে খেতাব লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হতেন। শাসকের নিজস্ব বিচার পদ্ধতির ভুলেই যেকোনো প্রভাবশালী সাহেবের সুপারিশে 'খেতাবে'র যোগ্য বলে বিবেচিত হতেন সামাজিক বিচারে অযোগ্য ব্যক্তিও। বঙ্কিমচন্দ্র এই ভ্রান্ত পদ্ধতির প্রতিও ব্যঙ্গ করেছেন।

মনে রাখতে হবে, title বিলির প্রক্রিয়ার বহিরঙ্গে শাসকের সদিচ্ছার তকমা থাকলেও, আদতে এই title ছিল শাসকের অন্যতর গূঢ় রাজনৈতিক অভিসন্ধির ছদ্মবেশ মাত্র। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিয়ে একাধিক উচ্চশক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুরা ক্রমে উঠে আসতে থাকেন সমাজধারক হিসাবে। পাশ্চাত্যের আদর্শে স্বদেশচিন্তা, দেশভক্তি, জাতীয়তাবাদী ভাবনায় প্রথমদিকে এঁরা একজোটও হতে থাকেন। সমাজের নানাবিধ সংস্কারমূলক আন্দোলনে এঁরা যেমন অংশ নিয়েছিলেন, তেমনি শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে ক্ষোভ-বিক্ষোভ-অসহিষ্ণুতাও এঁদের একত্রিত করছিল। ১৮৫৭-র পর শাসকশ্রেণি শিক্ষিত গোষ্ঠীর এই যূথবদ্ধতাকে ভালো চোখে দেখেনি। এদিকে উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও কৌলীন্য, বিত্ত ও জাত্যাভিমানের গৌরব মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। শাসকশ্রেণি তাকে নিজেদের স্বার্থেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যূথবদ্ধতার বিনষ্টি চাইল এবং শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে থেকে মেকলের স্বপ্ন অনুযায়ী, বিশ্বস্ত-অনুগত এবং শাসকশ্রেণির স্বার্থবাহী একদল মানুষকে তাঁদের 'শ্রেষ্ঠত্বে'র স্বীকৃতির ছলে বিচ্ছিন্ন করতে চাইল। ইংরেজ-প্রকল্পিত এই বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রকল্পের একটি প্রধান পথ হল title প্রদান। মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'দের মধ্যে তখন এলিট ও প্রান্তিক এই দু'টি উপশ্রেণি গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে থেকেই title প্রদানের মাধ্যমে তৃতীয় একটি স্বতন্ত্র উপশ্রেণি গড়ে তুলতে চেয়েছিল শাসকেরা এবং তাঁদের এই রাজনৈতিক কৌশলে ইংরেজ অনুগত খেতাবধারী বাবুরা অচিরেই দেখা দিয়েছিলেন, অনেকে দেখা দেবার জন্য উমেদারি প্রভৃতি পন্থা অবলম্বন জারি রেখেছিলেন, যাঁদের প্রধান কাজই হল ইংরেজি শাসকের স্বার্থবাহী হিসাবে তাঁদের শাসন ও শোষণের প্রক্রিয়াকে সুনিশ্চিত করা। অনেকসময়ই title লাভের আগে যেমন, তেমনি পরেও নানান শর্ত আরোপিত হত। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে প্রিয়নাথ পালিতের 'টাইটেল দর্পণ' প্রহসনে এরকম তথ্যের ব্যবহার আছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে কুলীন বাবুরা— যাঁদের মধ্যে রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল, দু'দলেরই মানুষ ছিলেন, তাঁরাও 'খেতাব'গুলি কৌলীন্যের নতুন মানদন্ড হিসাবে ভাবতে শুরু করেন। প্রাথমিকভাবে এরূপ খেতাবধারীদের সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পায়। এঁদের অনেকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুনিশ্চিত করতে সহায়ক হন। বিশেষ করে, বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই চরমপন্থীদের হাতে ব্যতিব্যস্ত শাসকদের দমন-পীড়ন নীতির একপ্রকার স্তম্ভে পরিণত হত খেতাবধারী

বাবুরা। বঙ্কিমচন্দ্র অকর্মণ্য, অপদার্থ লম্পট চরিত্রগুণসম্পন্ন মুচিরামের খেতাবধারী হয়ে এলিটত্ব লাভের প্রসঙ্গে মূর্খ বাবু এবং মূর্খ শাসকশ্রেণি— উভয়কেই ব্যঙ্গের লক্ষ্য করেছেন। অনেক আগেই, 'বঙ্গদর্শনে'র দ্বিতীয় বর্ষে 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টই বলেছিলেন, 'পরাধীন ভারতবর্ষে উচ্চশ্রেণিস্থ লোকে স্বীয় বুদ্ধি, শিক্ষা, বংশ, এবং মর্য্যাদানুসারে প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন না। যাহার বিদ্যা এবং বুদ্ধি আছে, তাহাকে যদি বুদ্ধি সঞ্চালনের এবং বিদ্যার ফলোৎপত্তির স্থল না দেওয়া যায়, তবে তাহার প্রতি গুরুতর অত্যাচার করা হয়। আধুনিক ভারতবর্ষে এরূপ ঘটিতেছে।'[২৭০] title বা খেতাব দানের ক্ষেত্রেও ব্যক্তির চারিত্রিক বা মানসিক কিংবা কর্মনৈতিক উৎকর্ষতা না দেখে নিতান্ত প্রভুভক্তি ও আনুগত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ যে কাউকেই title প্রদান করা হত। উনিশ শতকের মধ্যপর্ব থেকে বাবুরাও নিজের অবস্থান ও যোগ্যতার কথা না ভেবেই খেতাব লাভের পিছনে ছুটতেন, কেউ কেউ খেতাবের আকাঙ্ক্ষায় সর্বস্বান্ত হতেন। তবে এর মধ্যে দিয়ে একটি সত্য স্পষ্ট হয়, নিছক 'বাবুত্বের' মহিমা অবলুপ্ত বলেই শাসক প্রদত্ত 'খেতাবে'র শিরোভূষণ প্রার্থনা করছেন বাবুরা। 'বাবু'র সামাজিক অবনমনের হাত থেকে বাঁচবার সে এক প্রাণান্তকর এবং শেষ প্রচেষ্টাই বলা যায়।

মুচিরাম গুড় যে তেমন উচ্চবংশীয় নন, একথা লেখক পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা কৈবর্তের ব্রাহ্মণ। পিতা-মাতার এক মাত্র সন্তান হিসাবে মুচিরাম সাধ্যমত স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতিপালিত। শৈশব থেকেই কাজ আদায়ের জন্য 'মিছাকান্না', অপরিমেয় লোভের ফলে 'গুরুভোজন দোষ' এবং স্থান মাহাত্ম্যে 'পিতা-মাতাকে অশ্লীল বাক্যে সম্বোধন'— এই তিন 'গুণ' তিনি অর্জন করেন। মায়ের ইচ্ছা সত্ত্বেও গ্রামে পাঠশালা না থাকায় এবং পিতারও তেমন বিদ্যা না থাকায় মুচিরামের শিক্ষার সুযোগ সংকুচিত হয়। তবে পুঁথিগত শিক্ষা হলেও 'গাছে ওঠা, জলে ডোবা এবং সন্দেশ চুরি'— এই শিক্ষাগুলি তিনি উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন। নয় বছর বয়সে তাঁর উপনয়ন হয় এবং পরের এক বছর তাঁর পিতা তাঁকে সন্ধ্যা-আহ্নিক শেখান। যদিও মুচিরাম কতটা সন্ধ্যা-আহ্নিক শেখেন, সে বিষয়ে লেখক সংশয়ের কথা তুলেছেন।

ইতিমধ্যে পিতার হঠাৎ মৃত্যুতে মুচিরাম সেসব ছেড়ে যাত্রা দলের সঙ্গে ভিড়ে যান। মুচিরামের একটি গুণ ছিল যে তিনি সুমিষ্ট কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। যাত্রা, গান এসবেও তাঁর প্রীতি ছিল। কিন্তু যাত্রা দলের অধিকারীর প্রহারের ভয়ে মুচিরাম পালিয়ে যান এবং এক সহৃদয় ভদ্রলোক ঈশানবাবুর কাছে আশ্রয় পান। ঈশানুবাবু কোনো জেলায় ফৌজদারি আপিসের হেড কেরানি ছিলেন। তিনি 'ক্ষুদ্র ব্যক্তি— ল্যাজে খাটো, বানরত্বে খাটো— কিন্তু মনুষ্যত্বে নহে।'[২৭১] তিনি মুচিরামকে পাঠশালায় ভর্তি করে দেন। সেখানে পড়াশোনা যেমনই শিখুন, আর একটি গুণ অর্জন করেন, সুন্দর হাতের লেখা। অতঃপর মুচিরামকে ইংরেজি স্কুলে পাঠানো হয়। একে বয়সে 'ধেড়ে', তার উপর বিদ্যাবুদ্ধিতে তথৈবচ বলে পাঁচ-সাত বছর স্কুলে পড়েও 'কিছু হইল না।' অতএব ঈশানবাবু তাঁকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে বলে-কয়ে মুচিরামকে একটি দশ টাকার মুহুরিগিরি পাইয়ে দিলেন। মুচিরামের হাতের লেখা ভালো, মুহুরিগিরির তিনি উপযুক্ত। ঈশানবাবু তাঁকে 'ঘুষঘাক্স' নিতে না বললেও মুচিরাম শর্মা প্রথম দিনই আট গণ্ডা পয়সা ঘুষ নিয়ে একটি হুকুমের জাল নকল দিয়ে তাঁর কর্মকুশলতার শুভসূচনা করলেন। মুচিরামের অন্য চারিত্রিক গুণের কথাও জানা যায় এই ঘটনা সূত্রে। মুচিরাম প্রাপ্ত ঘুষের টাকা সন্ধ্যাবেলায় তাঁর এক 'প্রতিবাসিনীবিশেষের পাদপদ্মে উৎসর্গ' করেন। মুচিরাম অতএব অপদার্থ, অশিক্ষিত, ঘুষখোরই কেবল নয়, তিনি একজন লম্পটও।

ঈশানবাবু ইতিমধ্যে পেনশন নিয়ে স্বগ্রামে ফিরে গেলেন। এতকাল মুচিরাম তাঁরই ভয়ে কিছু সংযত ছিলেন। অন্তত প্রকাশ্যে কোনো অনৈতিক কাজ করতেন না। এখন তিনি মনের আনন্দে বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন উপায়ে উৎকোচ গ্রহণ করতে লাগলেন। তাঁর কাজ হল— পয়সাকড়ি নিয়ে (১) মিথ্যে জবানবন্দি লেখা, ও (২) মিথ্যে পরওয়ানা লেখা। ম্যাজিস্ট্রেটের অকর্মণ্যতা ও দুর্বলতার সুযোগে মুহুরিরা এরকম কাজ সর্বত্র করে থাকতেন। এভাবে 'নানান ফিকির ফন্দী'তে টাকা উপার্জন— 'তিনি একা নহেন, সকলে করিত—তবে মুচি কিছু অধিক নির্লজ্জ — কখন কখন লোকের ট্যাঁক হইতে টাকা কাড়িয়া লইত।'[২৭২] অতএব, অচিরেই মুচিরাম অর্থের দিক দিয়ে দেখলে বেশ 'বড়মানুষ' হয়ে উঠেছিলেন। সেকালে বড়োমানুষ হলেই যে যে গুণগুলি অনিবার্যভাবে অচিরেই বাবুদের কাছে এসে জুটত, তেমনই হল। লেখকের পর্যবেক্ষণে—

> 'মুচি শীঘ্রই বড়মানুষ হইয়া উঠিল— অচিরাৎ সেই অকৃতনাম্নী প্রতিবাসিনী স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইল। মদ, গাঁজা, গুলি, চরস, আফিম— যাহার নাম করিতে আছে এবং যাহার নাম করিতে নাই— সকলই মুচিবাবুর গৃহকে অহর্নিশি আলোক ও ধূমময় করিতে লাগিল। মুচিরামের চেহারা ফিরিতে লাগিল— গালে মাস লাগিল— হাড় ঢাকিয়া আসিল— বর্ণ জাপান লেদার ছাড়িয়া দিল্লীর নাগরায় পৌঁছিল। পরিচ্ছদের বৈচিত্র্য জন্মিতে লাগিল— শাদা কালো, নীল, জরদা, রাঙ্গা, গোলাপী প্রভৃতি নানা বর্ণের বস্ত্রে মুচিরাম সর্বদা রঞ্জিত। রাত্রি দিন মাথায় তেড়ি কাটা, অধরে তাম্বুলের রাগ এবং কণ্ঠে নিধুর টপ্পা। সুতরাং মুচিরামের পোয়াবারো।'[২৭৩]

লক্ষণীয়, মুচিরাম কোনো ভুঁইফোঁড় জমিদার বা হঠাৎ-নবাব নয়। মুৎসুদ্দি, দেওয়ানি বা অন্যান্য যে যে কাজে নিযুক্ত থাকলে সেকালে 'বড়মানুষ কব্‌লানো যেত', তেমনটিও তিনি করেন না। পারিবারিক সূত্রে বিত্ত অর্জন করেও তিনি 'হঠাৎবাবু' হয়ে বসেননি। অথচ জেলা শহরের সামান্য একজন মুহুরি তাঁর নির্দিষ্ট আয় এবং অনির্দিষ্ট উপরির অর্থে অচিরেই বাবুগিরির উপযুক্ত হয়ে ওঠেন। বিত্তবান কুলীনে 'বাবুগিরি'র দিন ফুরিয়ে এসেছিল, বংশানুক্রমে অভিজাতরা তখন সংকুচিত, কিন্তু এরই মধ্যে কিছু অর্ধশিক্ষিত-অল্পশিক্ষিত কেরানিবাবুরা চাটুকারিতা, তোষামোদের দ্বারা সাহেব-প্রভুকে প্রীত করে, ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে উৎকোচ গ্রহণ করে 'বাবুয়ানা'র ঐতিহ্য বজায় রাখতে নিজেরাই 'বাবু' বনে গেলেন। বাঙালিবাবুদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে যে উৎকোচপ্রিয়তা ও অসাধুতার কথা বলা হয়ে থাকে, কেরানিবাবুরা সন্দেহ নেই সেই 'মিথে'র প্রধান সূত্রধার।

ইংরেজ-রাজত্বে কেরানিবাবুরা বোকা, অকর্মণ্য, অপদার্থ হলেও ক্ষতি ছিল না, মিষ্টি কথায় তোষামোদ করতে পারলেই সাহেবরা প্রীত হতেন এবং সাহেবদের প্রীত হওয়া মানেই 'পদোন্নতি'। মুচিরামও সাহেবদের প্রীতি উৎপাদন করে, সাহেবদের আনুকূল্যে মুহুরি থেকে মীর মুনশি হলেন। তিন বছর মীর মুনশিগিরি করার পর কালেক্টরির পেস্কারির পদে আবেদন করলেন। পেস্কারির বেতন পঞ্চাশ টাকা— উপরি উপার্জন অফুরন্ত। দরখাস্ত লেখার ক্ষমতা মুচিরামের ছিল না। অতএব তাঁরও পরামর্শে 'খারাপ ইংরেজি'তে গোটা কুড়ি 'মাই লর্ড' ও 'ইওর লর্ডশিপ' শব্দ দিয়ে জনৈক কৃতবিদ্য তাঁর দরখাস্ত লিখে দিত। অতঃপর দরখাস্ত সুপারিশ ও যথাযোগ্য সাজসজ্জা সমেত মিষ্টি কথায় এবং 'মাই লর্ডে'র তোষামুদিতে

মুচিরামই পেস্কারির পদ লাভ করলেন। লেখক এই সূত্রে দেখিয়েছেন ইংরেজ-রাজত্বে কেরানি ও উচ্চশিক্ষিত উভয়ের সম্পর্কে শাসকের মনোভাবের পুঙ্খানুপুঙ্খ। বড়ো বড়ো ইংরেজিনবিশ, স্কলারশিপ হোল্ডারদের কালেক্টরেট বলেছেন, 'I dare say you are well up in Shakespeare and Milton and Bacon and so forth. Unfortunately we don't want quotations for Shakespeare and Milton and Bacon in the office. It is not the most learned man who is best fitted for this kind of work. So you can go, Baboo.'[২৭৪] সাহেবের প্রয়োজন, 'a poor man who will work for his bread.'[২৭৫] ইংরেজ-শাসকের প্রকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার মূলে পরাধীন জাতিকে জ্ঞানদীপ্ত করার কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল না। ছিল একশ্রেণির চাটুকার, শাসকের ধামা-ধরা, বশংবদ কেরানির প্রয়োজনভিত্তিক চাহিদা। প্রকৃত উচ্চশিক্ষিত বাবুদের প্রতি শাসকশ্রেণির বরং ভীতিই ছিল। এ কারণেই অল্পশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত মায় অশিক্ষিত কেরানিবাবুদের হাতে নকলনবিশের কাজ দিয়ে তাঁরা নিশ্চিন্ত হতেন। তা ছাড়া যাঁরা খাদ্যের জন্য (Neef for Bread) চাকরি করতেন, সাহেবের প্রীতি ও অপ্রীতির উপর যাঁদের চাকরির স্থায়িত্ব নির্ভর করত, তাঁদেরকে অতি সহজেই বশংবদ শ্রেণিতে পরিণত করা সুবিধা হত। এর ফলে শাসন ও শোষণের যাবতীয় অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে বসেও শাসকশ্রেণি নিশ্চিন্ত থাকতেন। বাঙালি কেরানিবাবুরাই তাঁদের নিশ্চিন্ততা-ভরসা জোগাতেন। আত্মমর্যাদাজ্ঞানহীন, পরমুখাপেক্ষী, অপদার্থ এবং পরজীবী কেরানিবাবুরা মধ্যশ্রেণির তথাকথিত 'ভদ্রলোক'দের এক করুণ পরিণতি; আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের প্রেক্ষিতে যা একপ্রকার অনিবার্য ছিল।

পেস্কার হয়ে মুচিরাম 'বাবু' হয়ে পড়লেন। ভজগোবিন্দ চক্রবর্তী নামে এক তাইদনবিশ বারো বছর কালেক্টরেটে ছিল। সেসব কাজ ভালোভাবে জানলেও মুরুব্বির অভাবে এবং বলিয়ে-কইয়ে নয় বলেই একই কাজে পড়ে আছে। বাসাখরচও চলে না। মুচিরামবাবু তাকে নিজের বাড়িতে এনে রাখলেন এবং সাহায্যের বিনিময়ে ভজগোবিন্দের দ্বারাই নিজের কাজ উদ্ধার করে সাহেবদের কাছে প্রশংসা কুড়াতে লাগলেন। অনেক টাকা জমে গেলে মুচিরাম ভজগোবিন্দের পরামর্শমতো ভজগোবিন্দেরই বোন ভদ্রকালীকে বিবাহ করলেন এবং স্ত্রীর নামে-বেনামে প্রচুর সম্পত্তি 'ছলে, বলে, কৌশলে' কিনে ফেললেন। নকশার সূক্ষ্ম ব্যঙ্গে : 'ভদ্রকালী হঠাৎ জেলার মধ্যে একজন প্রধানা ভূম্যধিকারিণী হইয়া দাঁড়াইলেন।'[২৭৬] ইতিমধ্যে ভদ্রকালীর পীড়াপীড়িতে মুচিরাম শ্যালককে একটি মুহুরিগিরি কাজ জুটিয়ে দেওয়ায় তাঁর নিজের কাজ চলা অসম্ভব হয়ে পড়ল। নতুন সাহেবের রিপোর্টের জেরে মুচিরাম ডেপুটিগিরির কাজ দিতে বাধ্য হলেন। ডেপুটি হয়েই মুচিরাম প্রথমেই মুহুরিকে বলে 'গুড়' পদবি ত্যাগ করে 'রায়' পদবি নিলেন। তিনি এখন 'শ্রীযুক্ত মুচিরাম রায়, রায়বাহাদুর।'

উল্লেখ্য যে, বঙ্কিম নিজেও ডেপুটি ছিলেন এবং কর্মজীবনে বারংবার বঙ্কিমকে আদর্শ ও বাস্তবের সংঘর্ষে পড়ে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়েছে। উচ্চশিক্ষিত কেরানিবাবুদের চেয়ে অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত কেরানিবাবুদের কদর তিনি নিজের অভিজ্ঞতা সূত্রে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। মুচিরামের মতো অযোগ্য এবং ভণ্ড ডেপুটিদের নিতান্ত মিষ্ট কথা এবং না বুঝে ডিক্রি জারি করে শাসকের আয় বাড়ানোর কৌশলে নিজেদের আখের গোছানোর প্রক্রিয়া তিনি সম্ভবত নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই নকশায় ব্যবহার করেছেন। কমলাকান্ত দেশি হাকিমকে 'কুষ্মাণ্ড'র সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। মুচিরামবাবুও তার ব্যতিক্রম নয়। ইতিমধ্যে মুচিরামকে চট্টগ্রামে ডেপুটি কালেক্টর করে পাঠানো হলে মুচিরাম প্লীহার ভয়ে চাকরি ছেড়ে

দিলেন। যদিও নকশাকার ডেপুটিবাবুদের মতো সামান্য চাকরি করার প্রয়োজন ছিল না বলেই মুচিরামের এই ইস্তফা, সে কথা জানান, কেননা 'মুচিরামের জমীদারীর আয় এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, ডিপুটিগিরির সামান্য বেতন, তাঁহার ধর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল না।'[২৭৮] কেরানিবাবুদের অসাধুতা এবং চারিত্রিক কদর্যতার প্রতি এই ব্যঙ্গ আঘাত করে নিপুণভাবে।

অতঃপর বাবুর উপযুক্ত জীবনযাপনের তাগিদে মুচিরামবাবু কলকাতার কালীঘাট সংলগ্ন অঞ্চলে বাড়ি কিনলেন এবং সস্ত্রীক কলকাতার বাসিন্দা হলেন। হুতোম বলেছিলেন যে, পাড়াগেঁয়ে জমিদারেরা কলকাতায় এলে ভবানীপুর অঞ্চলে বাসা ভাড়া করেন বা বাড়ি কিনে সম্বৎসর থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের পতনের পথ প্রস্তুত করতে কিছু উপযুক্ত দালাল, মোসাহেবও জুটে যায়। মুচিরামবাবুরও এরকম জুটতে দেরি হল না। পাড়ার যত 'জুয়াচোর, বদমাশ, মাতাল, লম্পট, নিষ্কর্মা ভালো ধুতি চাদর, জুতো ও লাঠিতে অঙ্গ পরিশোভিত করিয়া, চুল ফিরাইয়া, বাবুকে সম্ভাষণ' করতে জুটে গেল।[২৭৯] এবং তামাক, মদ, তাস, পান, পোলাও, কালিয়া সহ নানারকম প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কিনে মুচিরামবাবুর টাকার শ্রাদ্ধ করতে লাগল। এতে তাদেরও বারো আনা মাত্র লাভ থাকত। অবশেষে 'প্রথম শ্রেণির বাটপাড়' রামচন্দ্রবাবু— যাঁর আস্তাবলে ঘোড়া, তিনখানা গাড়ি, 'সোনাবাঁধা হুঁকা, হীরাবাঁধা গৃহিণী, হ্যান্ডনোটে বাঁধা ইংরেজ খাদক এবং তাড়াবাঁধা কাগজ' — সবই ছিল, তিনি গ্রাম্য, নির্বোধ কিন্তু বাবুগিরি করতে আসা অশিক্ষিত মুচিরামকে সর্বস্বান্ত করার ফিকির করলেন।

তাঁর প্রযত্নে প্রথমত, মুচিরামবাবুর দু-খানা দামি গাড়ি, বহু দামের ঘোড়া, গৃহসজ্জার মূল্যবান জিনিসপত্র কেনা হল; দ্বিতীয়ত, বিত্তবান বলে কলকাতার অন্য সকল বর্ধিষ্ণু ব্যক্তির সঙ্গে সখ্যতা জন্মাল, তৃতীয়ত, ইংরেজ মহলে প্রভাব-প্রতিপত্তি জন্মাল, ফলে তিনি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের চেম্বার হয়ে বছর বছর চাঁদা দিতে লাগলেন, এই সুযোগে মুচিরাম মাথামুণ্ডু বকেও 'সুবক্তা' হিসাবে খ্যাত হলেন এবং বেলভেডিয়ারে যাতায়াতের সুবাদে লেফটেনান্ট গভর্নরের চোখে পড়ে 'বাঙ্গাল কৌন্সিলে' অনারেব্‌ল বাবু মুচিরাম অভিষিক্ত হলেন। তবে, বাবুগিরির খেসারত হিসাবে মুচিরামবাবুর দুই একখানি তালুক রামচন্দ্রবাবুর কাছে বাঁধা পড়ল এবং অর্থের জোগানে টান দেখা দিল। এমন অবস্থায় শ্যালকের পরামর্শে তালুকে আদায় উপলক্ষ্যে গিয়ে মুচিরামবাবুর ভাগ্য সদয় হল।

প্রজাদের দেয় অর্থে মুচিরামের চেস্ট ভরে গেল। সে বছর উক্ত অঞ্চলে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। মুচিরামের কাছে আগত প্রজারা বাবুর বাগানে নিজেরাই রাঁধাবাড়া করে খাওয়ার সময় জেলার ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টরের চোখে পড়াতে তিনি একজন চাষাকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে মূর্খ চাষা না বুঝে উত্তর দেওয়ায় সাহেব রিপোর্ট পাঠালেন— 'Babu Muchiram Ray, Zeminder of Chinnapur– feeds every day a large number of his ryots.'[২৮০] রিপোর্ট পেয়ে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট বাবু মুচিরাম রায়, রায়বাহাদুরকে 'রাজা' মুচিরাম রায় বাহাদুর খেতাব দিলেন।

সমগ্র নকশার মধ্যে বঙ্কিম ব্যঙ্গ ও উপহাসের তীব্র শ্লেষে দেখিয়ে দিতে চান নতুন কালে 'বাবু' সেজে বসা কতকগুলি নিষ্কর্মা, অপদার্থ, অসৎ চরিত্র মানুষদের স্বরূপ এবং শাসকের বদান্যতায় তাঁদের খেতাবলাভের নেপথ্য ইতিহাসটিকে। রচনার শুরুতে মুচিরামের জন্মতারিখ না পাওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বাংলায় ইতিহাসের অভাব আছে বলে আক্ষেপ করেছিলেন। 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' প্রবন্ধেও সে আক্ষেপ পূর্বেই করেছিলেন তিনি। আলোচ্য নকশায় যেন বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ শতকের শেষার্ধের বাবুদের 'বাবু' হয়ে

ওঠার ইতিহাস ধরে রাখতে চেয়েছেন। সমালোচকের মতে, 'মূর্খতা, অপমানসহিষ্ণুতা এবং খোশামুদিতে অদ্বিতীয় নৈপুণ্যের জোরেই মুচিরাম অসামান্য সফলতা লাভ করিয়াছে। বিদেশীয় রাজকর্মচারীরা এদেশের লোকের গুণের আদর করিতে আরম্ভ করলে তাহাদের নিজেদের প্রাধান্যবোধ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে; গুণের তো কোন বিশিষ্ট জাতি নাই।'[২৮১] লক্ষণীয় যে, লেখক মুচিরামবাবুকে সৃষ্টি করতে গিয়ে একজন সাধারণ মানুষের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, শাসনতন্ত্রের সহায়তা কীভাবে তার 'বাবুগিরির' সহায়ক হয়ে ওঠে, তার একটি বাস্তবসম্মত এবং ধারাবাহিক চিত্র দাখিল করেছেন।

দ্বিতীয়ত, বংশগত বা বিত্তগত আভিজাত্য না থাকা সত্ত্বেও, জাতগোত্রহীন মানুষেরাও অবস্থাগতিকে কীভাবে বাবু হয়ে উঠতেন এবং নানারকম title বা খেতাব লাভ করতেন শাসকশ্রেণির বদান্যতায়, তার একটি নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়।

তৃতীয়ত, মুচিরামের জীবনচর্যাই প্রমাণ করে অসাধুতা এবং লাম্পট্য— এগুলি সাধারণ বাঙালির মজ্জাগত চরিত্রধর্ম। এর জন্য বাবু হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, তবে 'বাবু' হয়ে উঠলে এগুলির প্রকোপ বেড়ে ওঠে।

চতুর্থত, উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে এলিট বাবুদের মানদন্ড হয়ে ওঠা 'খেতাব' লাভের প্রসঙ্গটিকে অন্য কোনো নকশায় এর আগে ব্যঙ্গের উপলক্ষ্য করে তোলা হয়নি, এ বিষয়ে বঙ্কিমই প্রথম। তথাকথিত খেতাব বা title-এর অন্তঃসারশূন্যতা যেমন প্রকটিত হয়, তেমনি খেতাবগুলির দ্বারা বাবুদের এলিটত্ব বিচারের পদ্ধতিতেও বড়ো প্রশ্নচিহ্ন পড়ে যায়।

পঞ্চমত, উনিশ শতকের শেষদিকে উচ্চশিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুরা অবস্থাবৈগুণ্যে এবং রুচির দ্বারা পরিশীলিত হওয়ার কি তাঁদের মধ্যে বাবুগিরির আকর্ষণ কিছু কমে গিয়েছিল? প্রহসন বা অন্যত্র যে মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের দেখি তাঁদের মধ্যে ভোলানাথের ভাষায় 'প্রকৃত শিক্ষা'র অভাব ছিল। এইরকমই এক 'প্রকৃত শিক্ষা'য় শিক্ষিত না হওয়া, ব্রাহ্মণ হয়েও জাতবর্ণের বিচারে প্রান্তিক মুচিরামের কাঁধে নতুন প্রজন্মের বাবুদের দায়ভার চাপিয়ে, নিজ এলিট মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'দের প্রতিভূ বঙ্কিম কি নিজ শ্রেণির বাবুদের আড়াল করতে চেয়েছেন? রক্ষণশীল এলিট 'ভদ্রলোকে'রা প্রান্তিকদের সঙ্গে 'বাবুত্ব' ভাগ করে নিতে চায়নি কোনোদিনই, উনিশ শতকের শেষ দিকে তাই 'বাবু' শব্দটিই ক্রমশ অচ্ছুত হয়ে পড়ে এবং নিন্দার্থে প্রযুক্ত হতে থাকে। এরকম একটি সময়ে, 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে' প্রান্তিক মানুষের বাবু হয়ে ওঠা এবং 'রাজাবাহাদুর' খেতাব লাভের আখ্যান তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। 'বাবুত্ব' নয়, শেষপর্যন্ত যেন 'মুচিরাম গুড়' তাঁর অখ্যাত-অজ্ঞাত শ্রেণিপরিচয়ের কারণেই ব্রাত্য হয়ে পড়েন। বাবুত্ব এবং খেতাবের পরিশুদ্ধি রক্ষার্থে রক্ষণশীলদের তরফ থেকে এও একপ্রকার প্রতিরোধী-তত্ত্ব কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়।

তবে, পরিশেষে একথাও বলতে হয়, তাবৎ নকশার মধ্যে 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' লেখকের রচনাগুণে অসামান্য। বাবুত্বের বিশেষ বিশেষ কিছু লক্ষণ, যা অন্য নকশাগুলির সিংহভাগ প্রায়ই অধিকার করে থাকে, বঙ্কিমচন্দ্র তার ইঙ্গিতমাত্র দিয়েই কার্যোদ্ধার করেছেন। অসংযতচিত্ত বাবুদের লাম্পট্য ও অন্যান্য বদগুণগুলি প্রমাণের জন্য যে এসবের বিশদ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন, সাহিত্যিক রুচির বিচারে হানিকর, বঙ্কিমের 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র পরে এটিই সম্ভবত সাহিত্যিক রুচির গুণ সবচেয়ে স্বাদু নকশা, অবশ্যই উনিশ শতকের কালসীমায় রচিত নকশাগুলির মধ্যে, একথা বলা যেতেই পারে।

উনিশ শতকের উপান্তে নকশার আদলে লেখা 'ভ্রমণ-উপন্যস' কিংবা ভ্রমণ-গাইড-বুক 'দেবগণের মর্ত্তে আগমন' (১৮৮৬) সমাজ ইতিহাসেরও একটি বিশিষ্ট দলিল। মূল গ্রন্থে অস্বাক্ষরিত এই রচনাটি প্রাজ্ঞদের মতে,[২৮২] দুর্গাচরণ রায়ের (১৮৪৭-৯৭) লেখা। গ্রন্থের আখ্যাপত্রে অবশ্য প্রকাশক হিসাবে দুর্গাচরণ রায়ের নাম মুদ্রিত আছে। ১৮৫৩ সালে ভারতবর্ষের বোম্বেতে প্রথম রেল চলাচল শুরু হলেও বাংলার মানুষের জীবনে রেলওয়ের ভূমিকা শুরু ১৮৫৪-র ১৫ আগস্ট। প্রথম পর্যায়ে হাওড়া থেকে হুগলি পর্যন্ত ট্রেন চলাচল শুরু হয়। দিন পনেরোর মধ্যেই ১ সেপ্টেম্বর তা পাণ্ডুয়া পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। ১৮৫৫-র ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে হাওড়া ও রানিগঞ্জের মধ্যে রেল চলাচল শুরু হয়ে যায়। ধীরে ধীরে এই যাত্রাপথ সম্প্রসারিত হতে হতে এলাহাবাদ, কাশী থেকে দিল্লি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। অগণিত বাঙালি যাত্রাপথের প্রথম উত্তেজনায় সেদিন থেকেই সম্ভবত ভ্রমণবিলাসীতে পরিণত হয়। 'দেবগণের মর্ত্তে আগমন' ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে বাঙালির বিস্ময়ের রেলযাত্রার প্রধান প্রধান গন্তব্যস্থলকে। বাঙালির অহংকারের কলকাতা অবশ্যই রচনার সিংহভাগ জুড়ে আছে, কারণ তখন পর্যন্ত ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার সাধের রাজধানী—কলকাতা। ঔপনিবেশিক পর্বের পর্ব-অহংকার, ইংরেজ-বন্দনা ও তার জয়ঘোষণায় এ গ্রন্থ হয়ে ওঠে শাসিতের কলমে শাসকেরই আখ্যান। আখ্যান-নির্ভর 'নকশা'র চরিত্ররা ব্রহ্মা, নারায়ণ, মহেশ্বর, ইন্দ্র, বরুণ প্রমুখেরা কিন্তু তাঁরা পুরাণজীবী আপামর হিন্দুর দেবতা নয়, একান্তভাবেই বাঙালিত্ব-সর্বস্ব ও বাঙালির নিজস্ব দেবতায় পরিণত হয়েছেন। বরুণদেব তাঁদের আধুনিক ভাষায়, ট্যুর গাইড। এ নকশা বাবুকেন্দ্রিক নকশা নয় ঠিকই, কিন্তু নানান প্রসঙ্গে বাঙালিবাবুদের কথা এসে পড়েছে। প্রাথমিকভাবে লেখক এই গ্রন্থে সেই সেই প্রধান স্টেশনগুলিতে থেমেছেন, যেগুলিতে—

ক) বাঙালি তীর্থ করতে অথবা ভ্রমণের উদ্দেশ্য সবচেয়ে বেশি যেত;

খ) কর্মসূত্রে কিংবা স্থায়ী বসবাসের সূত্রে বহু বাঙালির বাস এমন স্থান।

তীর্থক্ষেত্রগুলিতে কোনো বাঙালির কীর্তি বা অবদান থাকলে তা উল্লেখ করা হয়েছে জ্ঞানবুদ্ধিমতে, কখনো কখনো ইঙ্গিতবাচক বাক্যে ঝলসে উঠেছে বাঙালির জাতীয় চরিত্রের আপাত লক্ষণগুলি। আবার, কর্মসূত্রে যে যে অঞ্চলে অধিক সংখ্যায় বাঙালি বাস করেন, সেখানেও সম্ভবমতো দেবতারা উঁকিঝুঁকি মেরেছেন বাঙালি জীবনে এবং একসময় উপনীত হয়েছেন 'মর্ত্তের রাজা' ইংরেজদের খাস-উপনিবেশ ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতায়। সংগতভাবেই দ্রষ্টব্য স্থান দেখতে দেখতে, কীর্তিমান বাঙালির কীর্তির পরিচয় নিতে নিতে চোখে পড়েছে বাঙালিবাবুদেরও। সার্বিকভাবে সমাজের প্রকৃত চেহারাও অনুধাবন করেছেন দেবতারা। উপলব্ধি করেছেন রাজধানীর অন্ধকারময় জীবনের লুকানো স্বভাবটিকেও। সাধারণভাবে ইংরেজি শিক্ষিতবাবু ও ব্রাহ্মবাবুদের কথা কয়েকটি অংশে এসে পড়লেও লেখকের দৃষ্টি অনেক বেশি অনুসরণ করেছে কেরানিবাবুদের। তাঁদের দুঃখ-হতাশা-দারিদ্র-হাস্যকর ও অসংগত বাবুয়ানার চকিত চিত্র 'দেবগণের মর্ত্তে আগমনে' নিতান্ত দুর্লভ নয়। সব মিলিয়ে, বাবুকেন্দ্রিক নকশা না হয়েও গ্রন্থটি থেকে উক্ত প্রসঙ্গের কিছু নির্যাস যে আহরণ করা সম্ভব, তা অনস্বীকার্য।

গ্রন্থের সূচনা থেকেই আমরা দেখতে পাই, তথাকথিত বাবুয়ানার প্রকোপ থেকে স্বর্গবাসী দেবতারাও নিস্তার পাননি। বিশেষ করে, কৈলাসবাসী মহাদেবের আক্ষেপ যে তাঁর দু'টি ছেলেই আশ্বিন মাসে মামাবাড়ি গিয়ে মর্ত্যের নানান ফ্যাশন শিখে এসে রাতদিন তা নিয়েই পড়ে থাকে। কার্তিক প্রসঙ্গে যখন তিনি বলেন যে, সে 'ঘোর ইয়ার হয়ে উঠেছে, রাতদিন কেবল আয়না ব্রূস নিয়েই আছে; তার ল্যাবেণ্ডার ওডিকোলন,

প্রভৃতি কি ছাই ভস্মগুলো মাথায় লেপ্‌ছে। বেটা কালোপেড়ে সিমলার ধুতি না হলে পরেন না এবং পাঁচ টাকা দামের চীনেম্যানের বাড়ীর জুতো না হলে পায়ে দেন না। আমি পয়সা বাঁচিয়ে বাঘছালে লজ্জা নিবারণ করে বেড়াই—বেটা আবার সিল্কের পাঞ্জাবী পোরে তেড়ী কেটে বাবু সেজে বেড়ান'[২৮৩], বেশ বোঝা যায়, মর্ত্যের বাবুয়ানা থেকে দূরে সরে থাকা কার্ত্তিকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে পোশাক-আশাকে সে পুরোপুরি বাবু। ইতিপূর্বে 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়ে'র লেখক নবযুবাদের দীর্ঘক্ষণ আয়না ও চিরুনি হাতে চুল ফেরানোর ফ্যাশনের কথা বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, এখানেও মহাদেবের কণ্ঠে সদৃশ ক্ষোভ ব্যক্ত হয়েছে। অন্যদিকে, গণেশকেও দেখা যায় প্রতিদিন আধমণ করে সিদ্ধি সেবন করতে। বাবু-কালচারের দু'টি বিশেষ লক্ষণ মহাদেবের পুত্রদেরকেও গ্রাস করেছে দেখে কৌতুক হয় আপাতভাবে, কিন্তু বাবুত্বের সর্বগ্রাসী স্বভাব যে ক্রমশ নিষ্কর্মা করে দিচ্ছে তরুণবাবুদের, সে বিষয়েও সংকট অনুভূত হয়।

জামালপুর থেকে কলকাতা— মর্ত্যের যেখানেই বাঙালিবাবুদের বাস, সেখানেই চোখে পড়েছে কেরানিবৃত্তির প্রতি বাঙালির চূড়ান্ত আসক্তির কথা। শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে বাঙালিবাবুরা প্রার্থনা করে কেরানির জীবন, স্বাধীন জীবিকায় তাঁদের কোনো আসক্তি নেই। কলকাতায় ঢুকে গঙ্গাস্নান করার মুহূর্তে দেবতাদের চোখে পড়েছে অফিসের কেরানিবোঝাই নৌকা ঘাটে এসে ভিড়েছে। অফিসের উপযুক্ত বেশবাস পরে চাচার কাছ থেকে পাঁউরুটি-বিস্কুট কিনে খেয়ে কোনোমতে অফিসে ছুটেছেন তাঁরা। এঁরা কলকাতার সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে বাস করেন। অতি ভোরে সামান্য আহার করে বেরিয়ে দশ-পনেরোজনে এক-একটি নৌকা ভাড়া করে গন্তব্যে আসেন। এঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ সহ সব জাতের লোকই আছেন। তবে উনিশ শতকের শেষে পৌঁছে খাদ্যাদি সম্পর্কে কেরানিবাবুদের আর কোনো সংস্কার নেই দেখা যায়, ফলে মুসলমানের দোকানের পাঁউরুটি-বিস্কুটে জাত যাবার ভয় তাঁদের তেমন নেই।

কেরানিদের জীবন সুখের নয়। অফিসে তাঁদের কপালে জোটে বড়ো সাহেবের গাল-মন্দ, কখনো কখনো পদাঘাত। সাহেবরা আবার দু'ধরনের— খাঁটি সাহেব এবং সাহেবিভাবাপন্ন বাঙালিবাবু। শেষোক্তরাই ভয়ানক, লেখকের মতে, 'বিলাতীগুলি অনেক ভাল, তাঁহারা কখন কখন কামড়ায় বটে; কিন্তু দেশীগুলোর ন্যায় দিন রাত ঘেঁউ ঘেঁউ চীৎকার করেন না।'[২৮৪] ইংরেজিশিক্ষিত সাহেবিভাবাপন্ন বাবুদের প্রতি উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই সামাজিক জীবনে সাধারণের দৃষ্টিকোণ থেকে অবজ্ঞা, ঘৃণা ও অসূয়ার প্রকাশ দেখা যায়, উনিশ শতকের শেষে পৌঁছে তা তীব্র উপহাসের রূপ নিয়েছে দেখতে পাই।

কেরানিদের জীবন দুর্বিষহ। ছ্যাকরা-গাড়ির কোচ্‌ম্যানও এঁদের সম্মান করে না। বেশ্যারা মুখের উপর বলে দিতে পারে যে, তাদের মতো সাতটা কেরানিবাবুদের তারা পুষতে পারে।[২৮৫] এঁরা ঘরে-বাইরে সর্বদা উপহাসের পাত্র। সকালবেলা কোনোরকমে মৎসহীন ভাত, ডাল, তরকারি ও জল মেশানো দুধ সময়াভাবে একসঙ্গে মিশিয়ে গিলে আসেন। সঙ্গে জোটে স্ত্রীর গঞ্জনা। ঘুম থেকে উঠেই তাঁদের প্রথম কাজ হয় ছেঁড়া পোশাক সেলাই করা। আবার অফিসে সমস্তদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর ফিরে এসে বাড়ির অভাবের মুখোমুখি হওয়া। অতএব ধূলি পায়ে টাকা ধার করে আনতে বেরোতে হয়। লেখক বলেছেন, 'কেরাণীদিগের টাকা যেমন আসে তেন্নি যায়; কারণ, ইঁহারা সমস্ত মাসে দোকানে উঠ্‌না খাইয়া থাকেন, তদ্ভিন্ন যে পয়সা উপার্জ্জন করেন, তাহাতে অনেকের তেঁতুল-মাখা ভাত জুটে না, তাহার উপর লৌকিকতা ও আচার-ব্যবহার সকলই আছে। ইঁহারা আবশ্যক হইলে চারি পয়সা সুদেও টাকা কর্জ্জ করেন; শেষে পরিশোধের সময় দেখেন, এক টাকায় সুদে-আসলে তিন টাকা হইয়া আছে। কেরাণীদিগের এন্নি

কপাল!'[২৮৬] তা সত্ত্বেও এই বৃত্তির প্রতি শিক্ষিত-অল্পশিক্ষিত সকল বাঙালিবাবুদেরই আত্যন্তিক মনের টান। অবশ্য তা না থেকে উপায়ও ছিল না। ইংরেজ সুকৌশলে এদেশের কুটির শিল্পগুলিকে ধ্বংস করেছিল, বৃহৎ বা ভারিশিল্প এদেশে তেমন গড়ে তোলেনি, দেশীয় শিল্পের বিকাশেও স্বার্থের কারণেই মনোযোগ দেয়নি। কাঁচামাল সংগ্রহ করে নিজদেশে নিয়ে গিয়ে শিল্পের উৎপাদন প্রক্রিয়াকে চালু রেখেছে; আবার উৎপাদিত শিল্পের বাজার হিসাবেও তারা এই উপনিবেশগুলিকেই ব্যবহার করেছে। অতএব, স্বাধীন কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় উনিশ শতকের অন্তিমে প্রায় সকল বাঙালিবাবুই চাকুরিজীবী শ্রেণিতে পরিণত হয়েছে। ব্রহ্মা আশ্চর্য হয়ে দেখেছেন যে, পরাধীন জাতির পরাধীন থাকবার কী প্রচণ্ড অধ্যবসায়। যার দরুণ 'দেশ উৎসন্ন' যাচ্ছে, শিল্প বিনষ্ট হচ্ছে, বাঙালি কেরানিবাবুদেরকে লক্ষ করে ব্রহ্মা তাবৎ বাঙালিকেই 'বোকা জাতি' বলেছেন।[২৮৭] বরুণ তাঁকে সমর্থন করে বলেছেন, 'চাকরী করা বাঙ্গালীজাতির সংক্রামক-রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নচেৎ যে অধ্যাপকের জগৎ জুড়ে মানসম্ভ্রম, যাঁহার গৃহে বিদায়ের ঘটি, বাটি, থালা, ঘড়া রাখিবার স্থান হয় না, তিনিও নিজ ব্যবসায়ে ধিক্কার দিয়া পুত্রকে পনের টাকার কেরাণী প্রস্তুত করিতেছেন। যে কবিরাজ ধন্বন্তরি নামে পরিচিত হইয়া অর্জ্জিত ধন বহন করিয়া আনিতে পারিতেন না, তিনিও নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া পুত্রকে ইংরাজী শিখাইয়া কেরাণী প্রস্তুত করিতেছেন।... এইরূপে ধোপা, নাপিত, মেথর, মুদ্দফরাস সকলেই কেরাণী হইবার জন্য হাত ধুইয়া বসিয়া আছে।'[২৮৮] কেরানিবৃত্তির প্রতি বাঙালিবাবুদের এই আকর্ষণের পিছনে নকশাকার বাঙালি শিক্ষিত বাবুদের এক গভীর মানসিক সংকটের দিকে ইঙ্গিত দেন। সেকালের পরিকল্পনা অনুযায়ী বাঙালি শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুরা মেরুদণ্ডহীন, সাহেবলাঞ্ছিত এক পরজীবী অথচ বশংবদ শ্রেণিতে পরিণত হয়েছেন। ফলে, উপেক্ষিত হচ্ছে বাঙালির নিজস্ব সংস্কার, মূল্যবোধ, শিল্প ও বৃত্তির চিরকালীন ছন্দটুকু। বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতিই যে লুপ্ত হতে বসেছে, সেই ইঙ্গিতই দিয়েছেন গ্রন্থকার, আজ যা পরম সত্যে পরিণত।

সেদিনের নতুন কেরানিবাবুরা, বিশেষ করে যাঁরা স্বল্প বেতনভুক কেরানি, তাঁরা অনেকেই সামান্য খোলার ঘরে আট-দশআনা ভাড়া দিয়ে বাস করত। নিজেরা হাত পুড়িয়ে রান্না করে। পরিবারকে কাছে রাখা সম্ভব নয় সীমিত আর্থিক ক্ষমতার কারণে। বরং মাস এক-দুবার বাড়ি থেকে শাকসবজি বোঝাই করে এনে তাতেই গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে হয়। এঁদের মধ্যে যাঁরা সুদূর প্রবাসী, তাঁরাও অর্থের অপ্রতুলতার কারণে মেস করে থাকতেন। তবে তাঁদের জীবনযাত্রা কিছুটা বাধাবন্ধনহীন এবং বাবুয়ানার প্রকোপও তাঁদের মধ্যেই বেশি। জামালপুর অঞ্চলের ট্রাফিক অফিসের কেরানি জনৈক বাঙালিবাবু কাশীনাথ ঘোষাল ইন্দ্রকে জানিয়েছেন, বাবুরা সাধারণ সময়ে কচু-ঘেঁচু দিয়ে একটি ধোঁকার তরকারি, কুচোকাঁচা মাছ দিয়ে ঝোল, একটা ডাল ও একটি চাটনি সচরাচর খেয়ে থাকে। কখনো কখনো পাঁঠারও আয়োজন হয়। তবে অন্যবিধ আমোদ বহুপ্রকার। তাঁর কথায় : 'সকল মেসে একপ্রকার আমোদ চলিতেছে না, কোন বাসায় বাবুরা অনবরত দাবা-বোড়ে চেলে অন্যকে মাত করে নিজেই মাত হ'চ্চেন। কোন বাসায় অষ্টপ্রহরই দুই, চার, ছক্কা শব্দে পাশাপাশি চলছে এবং বিন্তি, ফেরাই শব্দে তাসের পটাপট শব্দ হচ্ছে। কোন কোন বাসায় বাবুরা বসে একমনে সংবাদপত্র ও পুস্তকাদি পাঠ করছেন। কোন বাসায় গুলি, গাঁজা, চরস, চণ্ডু — চারি রঙ্গের নেশা চল'ছে। কোন বাসায় বাবুরা আহারান্তে পাচক-ব্রাহ্মণসহ বারবিলাসিনী-ভবনে মদ্যপানে মাতোয়ারা হয়ে আমোদপ্রমোদে উন্মত্ত আছেন।'[২৮৯] বোঝা যায়, বাঙালিবাবুরা কেরানিতে পরিণত হয়েও শতাব্দী প্রাচীন বাবুত্বের দোষগুণগুলি আয়ত্ত করতে দ্বিধা করছেন না। মুঙ্গের অঞ্চলে বাঙালি কেরানিদের

দোষগুণ প্রসঙ্গে বরুণ ব্রহ্মাকে জানিয়েছেন,[২৯০] কেরানিদের মধ্যে যাঁরা সরকারি অফিসের, তাঁরাই কিছু অপব্যয়ী। এঁদের চাকরির স্থায়িত্ব অনেক বেশি, অবসরগ্রহণের পর পেনশনও পান। ফলে চাকরিতে থাকাকালীন এঁরা অর্থসঞ্চয়ে বিশেষ মনোযোগ দেন না। যাত্রা থিয়েটার, খেমটা, বাইনাচ ইত্যাদির পিছনেই সেসব অর্থ উড়িয়ে দেন। তুলনায়, চাকরির স্থায়িত্ব সম্পর্কে স্থিরতা না থাকায়, বেসরকারি কেরানিবাবুরা কিছুটা মিতব্যয়ী। শতাব্দী প্রাচীন বাঙালিবাবুদের অন্তিম 'অবতার', বঙ্কিমের মতে, যে 'কেরানিবাবু'রা তাঁদের সম্পর্কে এ জাতীয় অভিনিবিষ্ট পর্যালোচনা অন্য নকশায় প্রায় দুর্লভই বলা চলে।

এঁদের পাশাপাশিই দেবতাদের চোখে পড়েছে, নতুন কালের ইংরেজি শিক্ষিত নব্যপন্থী বাঙালিবাবুরা। এঁদের মধ্যে অবস্থা পল্লীগ্রামের বিত্তবান অথচ মূর্খ জমিদাররাও আছেন, বাবু সাজার শখ যাঁদের কিছুমাত্র কম নয়। নতুন বাবুরা ইংরেজি পড়েছেন বলে দেশীয় সংস্কার, খাদ্যাদি প্রভৃতি সকল বিষয়েই উন্নাসিক। এঁদের মধ্যে রয়েছেন নাস্তিক এবং ব্রাহ্ম (অর্থাৎ প্রচলিত হিন্দুধর্মে অবিশ্বাসী) দুই শ্রেণির মানুষ। ইন্দ্রকে এঁদের সম্পর্কে বরুণ জানিয়েছেন : 'ইহাদের মেজাজ ইংরাজী ধরণের। ইহাদের সভ্যতা ও চালচলনও সাহেবীগোছের। অনেকে হিন্দুধর্ম বিশ্বাস করেন না, একমাত্র নিরাকার ঈশ্বর স্বীকার করেন, কিন্তু কাজেও তাহা দেখান না। ধুতি চাদর পরিধান ও মাছের ঝোলভাত অনেকের ভালো লাগে না, হ্যাট কোট পরিধান করিয়া টেবিলে বসিয়া মদ্য-মাংসাহার বেশী পছন্দ করেন। ইঁহাদের স্ত্রীই সর্বস্ব। অনেকে মাতাকে মাতা বলিয়া পরিচয় না দিয়া বাপের পরিবার বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই উনবিংশ শতাব্দীতে পৈতা ফেলা ও ব্রাহ্ম হওয়া লোকের একটা সংক্রামক রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই শতাব্দীতে বাপের গায়ে পা ঠেকিলে 'বেগ ইওর পার্ডন' বলিয়া ক্ষমা চায়। নিজে গাড়ী জুড়ী হাঁকান এবং বাপকে বাজার কর্‌তে পাঠান। পরিবার রাঁধলে পাছে অসুখ হয় এই জন্য মাকে দিয়া রাধানো হয়। স্ত্রী-পুরুষে কথোপকথন পাছে বাপ-মার কানে যায়, এজন্য নীচের অন্ধকার ঘরে তাঁদের শুতে দেন।'[২৯১] দেখা যাচ্ছে, নব্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের নকশাকার সহ উনিশ শতকের বাবুকেন্দ্রিক তাবৎ সাহিত্যই নঞর্থক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন। শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের কোনো আদর্শ বা সৎ-চরিত্র-মাহাত্ম্য তাঁদের চোখে পড়েনি। তবে পিতা-মাতার প্রতি লাঞ্ছনা-গঞ্জনার ছবি এই সময় থেকেই প্রাধান্য পেতে থাকে বাবু-চরিত্র আলোচনায়। উনিশ শতকের শেষভাগে আর্থ-সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন যতই দ্রুত হচ্ছে, ততই যৌথ পরিবার ভেঙে বাঙালিবাবুরা একক পরিবারের ধারণায় আসতে চাচ্ছেন বা চাইতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু সাধারণের দৃষ্টিকোণে এই বিচ্ছিন্নতা আদৌ শ্রদ্ধা বা সমর্থন আদায় করতে পারেনি। হুগলি জেলার এক বাবুর কথা জানায় এই নকশা, যিনি তাঁর বাবার বিরুদ্ধে মামলা করে বাবাকে সর্বস্বান্ত করে আহ্লাদিত হয়েছিলেন।[২৯২] কোনো কোনো বাবু স্ত্রী-প্রগতির হুজুগে অপর লম্পট বাবুর সঙ্গে স্ত্রীকে পালিয়ে যাওয়ারই সুযোগ করে দিয়েছেন।[২৯৩] বেশ্যাসক্ত বাবুদের পারিবারিক দায়িত্বপালনে অক্ষমতা[২৯৪] আবার স্ত্রীকে দুর্বৃত্তদের হাত থেকে রক্ষা করতেও অক্ষম বাবুদের কথা জানায় নকশাটি। সব মিলিয়ে শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের যে আদল ফুটে ওঠে, তা আদৌ প্রশংসাব্যঞ্জক নয়, বলাই যায়।

উনিশ শতকের শেষদিকে পৌঁছে নকশাকারের চোখে পড়েছে, নতুন কালের বাবুদের একটি প্রধান দোষ—'বেশ্যাবাজি'। নগরজীবনের সঙ্গে বেশ্যারা যে অঙ্গীভূত হয়ে গেছেন, বাবুদের চেহারা যে ক্রমেই সার্বজনীন হয়ে পড়ছে, বেশ্যাগমন যে দোষজনক-পাপজনক কিছু বলেও আর বিবেচিত হচ্ছে না, বরুণ সেকথা পূর্বেই জানিয়েছিলেন, 'আজকাল পৃথিবীর সর্ব্বত্রই খারাপ স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব

বেশ্যার নিকট দিয়া যাইলে পাপ হয়, যে নগরে বেশ্যা থাকে তথায় বাস করিলে পাপ হয়, এত বিচার করে চল্‌তে হলে আর মর্ত্ত্যে আগমন হয় না।'[২৯৫] বিশেষ করে, বাবুদের দৌলতে কলকাতা তখন 'বেশ্যানগরী' হয়ে উঠেছে। লাম্পট্য তার স্বভাব-দোসর। বাবুরা বেশ্যাসংসর্গে বাগানবাড়িতে আমোদ করছেন এবং অন্দরমহলে স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত, এ দৃশ্য শতকের শেষেও সমানভাবে বিরাজমান।[২৯৬] শহরে প্রধান প্রধান অঞ্চলে এবং রাস্তার দু'পাশে, সেইসঙ্গে চিৎপুর-সিদ্ধেশ্বরীতলা প্রভৃতি অঞ্চলে অগণিত বেশ্যাগৃহ গড়ে উঠেছিল। এমনকী অল্পবয়স্ক বালকেরাও এদের খাতক ছিল।[২৯৭] বেশ্যাপল্লীগুলিকে কেন্দ্র করে আনুষঙ্গিক ব্যবস্থারও বিকাশ ঘটেছিল এসব অঞ্চলে। সব জাতির প্রাধান্য ছিল খদ্দেরদের মধ্যে, তবে নতুন কালে বেণে, সোনার বেণেদের বাবুগিরিই বেশি চোখে পড়েছে নকশাকারের। মনে হয়, নতুন কালে শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে 'বেশ্যাবাজি'টি কমলেও, বিত্তবান অথচ স্বল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত অন্য বৃত্তিজীবীদের মধ্যে প্রথাগত বাবুয়ানার প্রচলন জারি ছিল। হুতোম গুরুদাস গুঁইয়ের মধ্য দিয়ে তার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমনে' তার প্রসার লক্ষ্য করা যায়।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে, গ্রন্থকার উপাধি বা title প্রাপ্তির প্রসঙ্গটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেছেন। উনিশ শতকের শেষদিকে শাসক প্রবর্তিত খেতাব-প্রাপ্তির পদ্ধতির ভ্রান্তি-ত্রুটি এবং দুর্বলতার দিকগুলি দেখিয়েছেন ভাঁড়, হরনাথ ভঞ্জ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখেরা। 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমনের' লেখকও একই প্রসঙ্গে খেতাব-প্রাপ্তির সহজ পথ জানানোর ছলে ব্যঙ্গ করেছেন। সাধারণভাবে বিষয়ী লোক সৎকাজ করলেই রাজা উপাধি প্রাপ্ত হবেন, লেখকের মতে, এই ছিল ইংরেজ শাসকের ঘোষিত নীতি। কিন্তু সামান্য অর্থ কৌশলে খরচ করতে পারলেই যে সহজে title পাওয়া যায়, একথাও জানাতে ভোলেন না তিনি। এককালীন বেশ কিছু টাকা দান করে সংবাদপত্রে নিজের দানের ব্যাপারটি ফলাও করে প্রচার করাতে পারলেই শাসকের পক্ষ থেকে 'স্বদেশহিতৈষী' বাবুটি রায়বাহাদুর ইত্যাদি খেতাব পেয়ে যাবেন। খেতাব-প্রাপ্তির পর আর দান না করলেও ক্ষতি নেই, বরং খেতাব লাভের জন্য যে অর্থ ব্যয় হয়েছে, 'প্রজা পীড়ন' করে কিংবা অন্য উপায়ে সেই টাকা সহজেই তুলে নিতেন অনেকে। ব্রহ্মার সক্ষোভ মন্তব্য যথার্থ : 'আজিকালিকার দানটা ঐরূপই হইয়াছে বটে; লোকে নিজের স্বার্থের জন্যই দান করিয়া থাকে, পরোপকারের জন্য নহে।'[২৯৮] খেতাব- লোভী বাবুরা এরকম দানই করতেন এবং তাঁদের সংখ্যা শতক শেষে কম ছিল না।

বস্তুত এভাবেই ভ্রমণ-বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে দেশ-কাল-পাত্র, বিশেষ করে বাঙালিবাবুদের স্বরূপ পরিচয় তুলে ধরেছেন। নতুন কালের বাঙালিবাবুদের কথাই তাঁর রচনায় উঠে এসেছে। হয়তো জাত-ধর্ম-বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অভিমান এবং কিঞ্চিৎ রক্ষণশীলতা তাঁর রচনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। কিন্তু তিনিই আবার শাসকশ্রেণির ভূয়সী প্রশংসা করে প্রগতির, আধুনিকতার নানান স্বরূপ লক্ষণগুলিকে সাদর অভ্যর্থনা করেছেন। আপাতভাবে তাঁর রচনায় বাবুদের বিস্তৃত পরিচয় নেই সত্যি। কিন্তু যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন অল্প কথায় শতক শেষের বাবুসমাজের একটি সার্বিক চেহারা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর রচনায় বাবুদের যে কয়টি বিশিষ্টতা চোখে পড়ে , তা হল—

ক. শতক শেষে কেরানিবাবুরাই প্রধান হয়ে উঠেছেন। আর্থিক সামর্থ্যের দিক দিয়ে সরকারি ওবেসরকারি দু'টি দল। বাবুয়ানাতে প্রথম দলই শ্রেষ্ঠ।

খ. আর্থিক অকুলীনতার কারণে কেরানিবাবুরা বিলাসিতার থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন;

গ. ইংরেজি শিক্ষিত বাবুদের মৌখিক দেশপ্রীতি থাকলেও, দেশের সংস্কার, ধর্ম, শিক্ষা কোনো কিছুকেই তাঁরা গ্রহণ করতে অসম্মত ছিলেন।

ঘ. ধর্মীয় দলাদলি শিক্ষিত বাবুদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল।

ঙ. বেশ্যাসক্তি শতক শেষেও বাঙালিবাবুদের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল। নিশাচরের 'সমাজ-কুচিত্র'র মতকে যেন সমর্থন করেছে এই নকশা, কলকাতা বাঙালিবাবুদের হাতে তখন 'বেশ্যানগরী'তে পরিণত।

চ. সর্বোপরি, বাঙালিবাবুদের সার্বিক অবনমনে নকশাকারের বেদনা গোপন থাকেনি। এই সহানুভূতির সিংহভাগ যদিও কেরানিবাবুদের জন্য বরাদ্দ। তবুও সার্বিকভাবে সামাজিক মঙ্গলকামনায় তিনি এই অবস্থার পরিবর্তনকামী এবং কেরানি সহ সব বাবুদেরই চরিত্রমোক্ষণ প্রার্থী, উপলব্ধি করা যায়।

বাবুকেন্দ্রিক বাংলা নকশার আলোচনায় প্রাপ্ত নকশাগুলির পর্যালোচনায় উপলব্ধি করতে পারা যায় যে, নকশার প্রকৃত উদ্দেশ্য যে সামাজিক চিত্র প্রদর্শন এবং নিরপেক্ষ সমালোচনা, বাংলা নকশাগুলির ক্ষেত্রে তা সর্বদা সম্ভব হয়নি। বাংলা নকশাকারেরা অনেকেই ছিলেন রক্ষণশীল দলের প্রতিনিধি। বাবুদের সমালোচনাতে তার জন্য প্রাধান্য পেয়েছে সেই সব চারিত্রিক লক্ষণ, যেগুলি প্রচলিত হিন্দুধর্মের বিপরীতে হাঁটতে চেয়েছে। দ্বিতীয়ত, নকশাকারেরা মূলত নঞর্থক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন উনিশ শতকের শেষার্ধের বাবুদের। ফলে বাবুদের দোষ-ত্রুটি, বিচ্যুতি-স্খলন যেমনটি চোখে পড়েছে তাঁদের, বাবুদের সৎকাজগুলির উল্লেখমাত্র তাঁরা করেননি। স্ত্রী-প্রগতি, শিক্ষা, দান, দেশহিতৈষিতার মতো প্রসঙ্গ কেবল নঞর্থকভাবেই দেখা হয়েছে। এই নেতিবাচক একদেশদর্শিতা সমাজ-ইতিহাসের সত্যকে আবৃত করে মাত্র। তৃতীয়ত, নববাবুদের কাল বিগত হলেও নকশার বাস্তবকে সত্য বলে গ্রহণ করলে বলতে হয়— মদ্যাসক্তি এবং বেশ্যাবাজি, শতকশেষেও এই দু'টিই বাবুদের বাবুয়ানার প্রধান লক্ষণ। চতুর্থত, ইংরেজি শিক্ষিত বাবুরা— যাঁদের মধ্যে রয়েছেন— নব্যবাবু, ব্রাহ্মবাবু, মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবু, কেরানিবাবু— এঁরা সবাই নকশার উদ্দিষ্ট ব্যঙ্গের লক্ষ্য। তবে দু'চারজন বিত্তবান হঠাৎবাবুও নকশার আসরে দেখা দিয়েছেন সন্দেহ নেই। পঞ্চমত, আখ্যানমূলক নকশাগুলির মধ্যে বিষয়গত বৈচিত্র্য কম। বড়োলোকের 'হঠাৎবাবু' কিংবা 'কাপ্তেনবাবু' সন্তানদের বিলাসিতা, সর্বস্বান্ত হওয়া এবং আক্ষেপের যে type ভবানীচরণ বেঁধে দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালের নকশাকারেরা অনেকেই তার ছাঁচকে অস্বীকার করতে না পেরে, আত্মসমর্পণ করেছেন। ষষ্ঠত, নকশাগুলি বিশেষত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হুতোমের লেখা নকশা দু'টি উনিশ শতকের বাংলা বাবুকেন্দ্রিক নকশাগুলির মধ্যে সর্বোত্তম, কারণ এই দু'টি নকশায় কেবলমাত্র ব্যঙ্গই উপলক্ষ্য নয়, সমসাময়িক সমাজ-বাস্তবতার পূর্ণ প্রতিফলনও কাম্য। ফলে উনিশ শতকের সমাজ-ইতিহাস রচনায় এই দু'টি নকশার বিশেষ গুরুত্ব স্বীকৃত। সর্বোপরি, নকশাগুলির আপাত নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ সত্ত্বেও, সামাজিক মঙ্গলসাধনের লক্ষ্যে নকশাকারদের যে এই আয়োজন, তা গোপন থাকে না। কোনোপ্রকার বাবুয়ানাই আর উনিশ শতকের শেষার্ধের লেখকদের সহানুভূতি বা সমর্থন লাভ করেনি। কেউ কেউ 'নকশা'র ছলে 'আপনার মুখ আপুনি দেখেছেন', ফলে বাবু-সাহিত্যে নকশাই একমাত্র মাধ্যম, এখানে বাবুদের আত্ম-সমালোচনার ছাপটি লভ্য। বাবুয়ানার প্রকোপ যে 'প্রকৃত শিক্ষিত' মহলে অনেকটাই ফিকে হয়ে এসেছিল, তার জন্য আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে নকশার ধারাবাহিক সমালোচনার ভূমিকা কম ছিল না। উনিশ শতকের বাবু-সাহিত্যের আলোচনায় এ কারণে, নকশার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

## টীকা ও সূত্রনির্দেশ


১. হক, কাজী রফিকুল, 'বাংলা ভাষায় আরবী, ফারসী, তুর্কী, হিন্দী, উর্দু শব্দের অভিধান', প্রথম সংস্করণ ২০০৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২০৪।

২. চক্রবর্তী, ঘনরাম, 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল', মহাপাত্র, পীযূষকান্তি সম্পাদিত, ২০১২, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

৩. ওদুদ, কাজী আবদুল, 'ব্যবহারিক শব্দকোষ', তৃতীয় সংস্করণ ২০০৯, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরি, কলকাতা, পৃ. ৫০৮।

৪. Cuddon, J.A, 'The Penguin Dictionary of Library Terms and Literary Theory', 1998, Penguin Books, London, p. 833.

৫. তদেব, পৃ. ৮৩৩।

৬. Baldick, Chris, 'The oxford Dictionary of literary Terms', Third edition 2008, oxford University Press, New York, p. 310.

৭. Ghosh, Gouri Prasad edi, 'Everyman's Dictionary', Reprint 2005, Ramkrishna Pustakalaya. Kolkata, p. 1494

৮. পঞ্চপুষ্প, আশ্বিন, ১৩৩৭ সন;
উল্লেখিত:- নাগ, অরুণ সম্পাদিত, 'সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা', ভূমিকা; দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, পৃ.২।

৯. ভৌমিক, নির্মলেন্দু সম্পাদিত, 'উনিশ শতকের বাংলা নক্শা', ভূমিকা; ১৯৮৪, কলকাতা।

১০. বসু, ড. যূথিকা, 'বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ রচনা', প্রথম সংস্করণ ১৯৮২, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, পৃ. ১১।

১১. দ্র. ভূমিকা। সর, রমেনকুমার সম্পাদিত, 'ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসংগ্রহ', প্রথম সংস্করণ ২০১৩, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, পৃ. ২২।

১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, 'রসরচনাসমগ্র', গুপ্ত, সনৎকুমার সম্পাদিত, প্রথম নবপত্র সংস্করণ ১৯৮৭, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ৭।

১৩. তদেব, পৃ.৭-৮।

১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, 'নববাবুবিলাস', 'রসরচনাসমগ্র', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

১৫. তদেব, পৃ. ৩৫।

১৬. তদেব, পৃ. ৩৬।

১৭. তদেব, পৃ. ৩৮।

১৮. Acharya, Poromesh, 'Education in old Calcutta'! choudhuri, Sukanta edi, 'Calcutta The Living City", vol.1 Fifth impression 2011, Oxford University Press, New Delhi, p. 90

১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, 'নববাবুবিলাস', প্রাগুক্ত, পৃ.-৪০।

২০. তদেব, পৃ. ৪১।

২১. তদেব, পৃ. ৪৩।
২২. তদেব, পৃ. ৪৩।
২৩. তদেব, পৃ. ৪৫।
২৪. বসু, রাজনারায়ণ, 'আত্মচরিত'; ঘোষ, বারিদবরণ সম্পাদিত, 'রাজনারায়ণ বসু নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ', প্রথম সংস্করণ ১৪০২, কলেজ স্ট্রিট পাবলিকেশন্‌স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ.৩০।
২৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, 'নববাবুবিলাস', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।
২৬. তদেব, পৃ. ৪৬।
২৭. তদেব, পৃ. ৪৬।
২৮. তদেব, পৃ. ৫০।
২৯. দ্র. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত ও সম্পাদিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা।
৩০. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, 'নববাবুবিলাস', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।
৩১. তদেব, পৃ. ৫৫।
৩২. বসু, রাজনারায়ণ, 'সেকাল আর একাল'; ঘোষ, বারিদবরণ সম্পাদিত, 'রাজনারায়ণ বসু নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪।
৩৩. 'The amusements of the Modern Baboo, A work in Bengalee, printed in Calcutta, 1825', Frinds of India, October 1825.
উদ্ধৃত:- সর, রমেনকুমার সম্পাদিত, 'ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসংগ্রহ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৭।
৩৪. সেন, সুকুমার, 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য', প্রথম আনন্দ সংস্করণ ১৯৯৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ৬৮।
৩৫. দ্র. ভূমিকা; নাগ, অরুণ সম্পাদিত, 'সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২।
৩৬. তদেব, পৃ. ২১।
৩৭. তদেব, পৃ. ২।
৩৮. হক, কাজী রফিকুল সংকলিত ও সম্পাদিত, 'বাংলাভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪-৩৩৫।
৩৯. দত্ত, মহেন্দ্রনাথ, 'কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা', চতুর্থ মুদ্রণ ১৯৮৩, দি মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, কলকাতা, পৃ. ৩৭।
৪০. শাস্ত্রী, শিবনাথ, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', ঘোষ, বারিদবরণ সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংশোধিত নিউ এজ সংস্করণ ২০০৭, নিউ এজ, কলকাতা, পৃ. ১৬৭।
৪১. নাগ, অরুণ সম্পাদিত, 'সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।
৪২. ঠাকুর, টেকচাঁদ (জুনিয়ার), 'কলিকাতার নুকোচুরি', ভূমিকা;
দ্র. বসু, কাঞ্চন সম্পাদিত, 'দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ', প্রথম খণ্ড, সপ্তম মুদ্রণ ২০০৪, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ১৯৭।
৪৩. Ghose, Loknath, 'The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas and Zaminders, etc.' Part II, 1881, p. 89

৪৪. উল্লেখিত :- গ্রন্থ-পরিচয়, রায়, অলোক; ঘোষ, মন্মথনাথ, 'মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ', প্রথম পারুল সংস্করণ ২০০৮, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. xii।
৪৫. দ্র. পূর্বোক্ত টেকচাঁদ ঠাকুর (জুনিয়ার)-এর 'কলিকাতার নুকোচুরি', ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আপনার মুখ আপুনি দেখ' ইত্যাদি।
৪৬. Hindoo Patriot, July 25, 1870.
৪৭. নাগ, অরুণ সম্পাদিত, 'সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা', ভূমিকা; প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।
৪৮. তদেব, পৃ. ৩০-৩১।
৪৯. তদেব, পৃ. ৪৬।
৫০. তদেব, পৃ. ৪৬।
৫১. 'কলিকাতার চড়ক পার্ব্বণ', হু. প্যাঁ. ন. (হুতোম প্যাঁচার নকশা), পৃ. ৪৬।
৫২. দ্র. পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর উদ্ধৃত, 'পঞ্চপুষ্প', ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, কার্ত্তিক।
৫৩. ''কলিকাতার চড়ক পার্ব্বণ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।
৫৪. 'কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা', হু. প্যাঁ, ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩-৭৪।
৫৫. দত্ত বর্মা, ললিতাপ্রসাদ, 'কলিকাতার আটবাবু', কায়স্থ পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩২৬।
দ্র. রায়, নিশীথরঞ্জন ও উপাধ্যায়, অশোক সম্পাদিত, 'প্রাচীন কলকাতা', প্রথম সংস্করণ ১৩৯০, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃ. ২০৬।
৫৬. 'কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।
৫৭. তদেব, পৃ. ৭৬।
৫৮. তদেব. পৃ. ৭৬।
৫৯. 'কলিকাতার চড়ক পার্ব্বণ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।
৬০. তদেব, পৃ. ৪৪।
৬১. তদেব, পৃ. ৪৫।
৬২. তদেব, পৃ. ৪৮।
৬৩. তদেব, পৃ. ৪২।
৬৪. তদেব, পৃ. ৪৫।
৬৫. তদেব, পৃ. ৩২।
৬৬. তদেব, পৃ. ৩৪।
৬৭. 'কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।
৬৮. দত্ত, প্রাণকৃষ্ণ, 'কলিকাতার ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য রচনা', বসু, দেবাশিস সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৯৯১, পুস্তক-বিপণি, কলকাতা, পৃ. ১২২-১২৩।
৬৯. ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথ, 'আত্মজীবনী', আমেদ, অসীম সম্পাদিত, চতুর্থ চ্যারিয়ট সংস্করণ, চ্যারিয়ট, কলকাতা, পৃ. ৯২।
৭০. 'দুর্গোৎসব', হু. প্যাঁ, ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০।
৭১. তদেব, পৃ. ২৪৫।

৭২. ‘কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা’, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।
৭৩. তদেব, পৃ. ১০৫-১০৬।
৭৪. তদেব, পৃ. ১০৬।
৭৫. ‘রামলীলা’, হু. প্যাঁ. ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬।
৭৬. ‘কলিকাতার চড়ক পার্ব্বণ’, হু. প্যাঁ. ন. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।
৭৭. ‘কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।
৭৮. তদেব, পৃ. ৮৩।
৭৯. তদেব, পৃ. ৮৩।
৮০. ‘রামলীলা’, হু. প্যাঁ. ন. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮।
৮১. ‘বাবু পদ্মলোচন দত্ত ওরফে হঠাৎ অবতার’, হু. প্যাঁ. ন. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪।
৮২. তদেব, পৃ. ১৯৬।
৮৩. তদেব, পৃ. ১৯৭।
৮৪. তদেব, পৃ. ১৯৯।
৮৫. পাঠক এ বিষয়ে দেখতে পারেন— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ‘ব্রজবিলাস’, অর্ণব সাহা সম্পাদিত ‘যৌনতা ও বাঙালি’ (অনুষ্টুপ, ২০০৯) ইত্যাদি।
৮৬. ‘বাবু পদ্মলোচন দত্ত ওরফে হঠাৎ অবতার’, হু. প্যাঁ. ন. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০।
৮৭. Balhachet, Kenneth, 'The Contagious Diseases and contonments Acts In India', 'Race, Sex and Class under the Raj, Imperial Attitudes and Policies and their Critics, 1793-1905', 1st edition 1979, Vikas Publishing House Pvt. Ltd, New Delhi.
৮৮. ‘বাবু পদ্মলোচন দত্ত ওরফে হঠাৎ অবতার’, হু. প্যাঁ. ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১।
৮৯. তদেব, পৃ. ২০২।
৯০. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ, ‘কলিকাতা দুইশত বৎসর পূর্ব্বে’, নব্যভারত, কার্তিক ১২৯০।
দ্র. চৌধুরী, সত্যজিৎ ও সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর সম্পাদিত, ‘হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ’, ৪র্থ খণ্ড, প্রথম সং ১৯৮৯, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, পৃ. ৭২।
৯১. শ্রীবৃদ্ধ, ‘সেকালের কথা’, কায়স্থ পত্রিকা, ভাদ্র ১৩২৬।
দ্র. রায়, নিশীথরঞ্জন ও উপাধ্যায়, অশোক সম্পাদিত, ‘প্রাচীন কলকাতা’, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৬।
৯২. ‘বাবু পদ্মলোচন দত্ত ওরফে হঠাৎ অবতার’, হু. প্যাঁ. ন. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮।
৯৩. তদেব, পৃ. ২১০।
৯৪. Report of the Government of Bengal to Revise the Salaries of Ministerial offices, and to Reorganise the system of Business in Executive offices 1885-86, Calcutta,1886, p. 208.
উদ্ধৃত :- পাদটীকা, মামুন, মুনতাসীর, ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্তোত্তর পূর্ববঙ্গের সমাজকাঠামো ও শ্রেণীবিন্যাস’; মামুন মুনতাসীর সম্পা., ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালি সমাজ’, পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ ২০০২, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ১৩২।

৯৫. দত্ত, প্রাণকৃষ্ণ, 'কলিকাতার ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য রচনা', বসু, দেবাশিস সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮।
৯৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', প্রথম খণ্ড, চতুর্থ মুদ্রণ ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, পৃ. ২৫৬।
৯৭. তদেব, পৃ.২৫৬।
৯৮. 'মাহেশের স্নানযাত্রা', হু. প্যাঁ. ন. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫।
৯৯. তদেব, পৃ. ২১৮।
১০০. তদেব, পৃ. ২১৯।
১০১. তদেব, পৃ. ২১৯।
১০২. তদেব, পৃ.২২০।
১০৩. তদেব, পৃ. ২২৩-২৪।
১০৪. দ্র. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত,
১০৫. 'মাহেশের স্নানযাত্রা', হু. প্যাঁ. ন. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯।
১০৬. দ্র. সর্ব্বাধীকারী, দেবপ্রসাদ, 'স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র', কায়স্থ পত্রিকা, ২৮ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৬, পৃ. ৩৮৬-৮৭।
১০৭. 'রেলওয়ে', হু. প্যাঁ. ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫।
১০৮. তদেব, পৃ. ২৬৭।
১০৯. তদেব, পৃ. ২৬৭।
১১০. বসু, রাজনারায়ণ, 'আত্মচরিত', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।
১১১. 'রেলওয়ে', হু. প্যাঁ, ন. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০।
১১২. তদেব, পৃ. ২৭২।
১১৩. তদেব, পৃ. ২৭৩-৭৪।
১১৪. রক্ষিত, হারাণচন্দ্র, 'ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য', চট্টোপাধ্যায়, অরুণা সম্পাদিত, প্রথম পারুল সংস্করণ ২০০৯, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ১৪৯।
১১৫. গুপ্ত, বিপিনবিহারী, 'পুরাতন প্রসঙ্গ', বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার সম্পাদিত, প্রথম পুস্তক বিপণি সংস্করণ ১৯৮৯, পুস্তক-বিপণি, কলকাতা, পৃ. ৪৬-৪৭।
১১৬. মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ, 'আপনার মুখ আপুনি দেখ', ১৮৬৩।
দ্র. বসু, কাঞ্চন সম্পাদিত, 'দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ', ২য় খণ্ড, সপ্তম মুদ্রণ ২০০৪, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ১৮।
১১৭. তদেব, পৃ. ১৮।
১১৮. তদেব, পৃ. ১৮।
১১৯. তদেব, পৃ. ১৯।
১২০. তদেব, পৃ. ১৯-২০।
১২১. তদেব, পৃ. ২৫-২৬।

১২২. তদেব, পৃ. ৩০।
১২৩. তদেব, পৃ. ৩১।
১২৪. গুপ্ত, বিপিনবিহারী, 'পুরাতন-প্রসঙ্গ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।
১২৫. 'আপনার মুখ আপুনি দেখ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।
১২৬. দ্র. ঘোষ, মন্মথনাথ, 'মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ', প্রাগুক্ত।
১২৭. 'আপনার মুখ আপুনি দেখ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।
১২৮. তদেব, পৃ. ৪৬।
১২৯. তদেব, পৃ. ৪৬।
১৩০. তদেব, পৃ. ৪৯।
১৩১. তদেব, পৃ. ৫০-৫১।
১৩২. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮৪৫, উদ্ধৃত:- দাস, পরেশচন্দ্র, 'বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ', দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৫, উদয়নী পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৭-৮।
১৩৩. 'আপনার মুখ আপুনি দেখ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।
১৩৪. দ্র. ভূমিকা; রায়, অলোক; ঘোষ, মন্মথনাথ, 'মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ' প্রাগুক্ত।
১৩৫. 'আপনার মুখ আপুনি দেখ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।
১৩৬. তদেব, পৃ. ৮৮।
১৩৭. তদেব, পৃ. ৯১।
১৩৮. তদেব, পৃ. ৯২।
১৩৯. তদেব, পৃ. ৯৩।
১৪০. তদেব, পৃ. ৯৯।
১৪১. তদেব পৃ. ১০৯।
১৪২. তদেব, পৃ. ১১৫।
১৪৩. তদেব, পৃ. ১১২।
১৪৪. তদেব, পৃ. ১২৬-২৭।
১৪৫. তদেব, পৃ. ১১৭।
১৪৬. তদেব, পৃ. ১৭।
১৪৭. মিত্র, ড. অরুণকুমার সম্পাদিত, 'অমৃতলাল বসুর স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি', প্রথম সংস্করণ ১৯৮২, সাহিত্যলোক, কলকাতা।
১৪৮. গুপ্ত, সনৎকুমার সম্পাদিত, 'আপনার মুখ আপুনি দেখ', ভূমিকা, ১৩৬৮, কলকাতা।
১৪৯. দ্র. ভূমিকা; নাগ, অরুণ সম্পাদিত, 'সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।
১৫০. ঠাকুর (জুনিয়ার), টেকচাঁদ, 'কলিকাতার নুকোচুরি' ১৮৬৯ঃ
দ্র. বসু, কাঞ্চন সম্পাদিত, 'দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ', ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫।
১৫১. শাস্ত্রী, শিবনাথ, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', প্রাগুক্ত, পৃ.
১৫২. 'কলিকাতার নুকোচুরি', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬।

১৫৩. তদেব, পৃ. ১৯৭।

১৫৪. তদেব, পৃ. ১৯৭।

১৫৫. তদেব, পৃ. ১৯৮।

১৫৬. তদেব, পৃ. ১৯৮।

১৫৭. তদেব, পৃ. ২১৩।

১৫৮. তদেব, পৃ. ২১৩।

১৫৯. তদেব, পৃ. ২০০।

১৬০. তদেব, পৃ. ২৩৭।

১৬১. তদেব, পৃ. ২২১।

১৬২. তদেব, পৃ. ২২৪।

১৬৩. তদেব, পৃ. ২১৩।

১৬৪. তদেব, পৃ. ২৩০।

১৬৫. তদেব, পৃ. ২৩১।

১৬৬. তদেব, পৃ. ২৩৪।

১৬৭. ঘোষ, মন্মথনাথ, 'মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

১৬৮. অর্ঘ্য, অগ্রহায়ণ, ১৩১৮;
উদ্ধৃত :- সূত্রাবলী, ঘোষ, মন্মথনাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

১৬৯. 'কলিকাতার নুকোচুরি', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭।

১৭০. তদেব, পৃ. ১৯৭।

১৭১. তদেব, পৃ. ২৩৮।

১৭২. নিশাচর যে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সেই আলোচনার জন্য দ্র. ভূমিকা; বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত সম্পাদিত, 'হুতোম প্যাঁচার নকশা, সমাজ কুচিত্র, পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব', নতুন সংস্করণ ১৩৫৫, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪২১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃ. অনুল্লিখিত।

১৭৩. তদেব, পৃ. ১১৯।

১৭৪. বাগল, যোগেশচন্দ্র, 'কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র', প্রথম সংস্করণ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৩৬।

১৭৫. এ প্রসঙ্গে শ্রীবাগল যে প্রায় চল্লিশ বৎসর শিবপুরে সভাটির অবস্থানের কথা বলেছেন, তা সম্ভবত যথার্থ নয় বলেই মনে হয়। কারণ, নিশাচরের এই রচনায় ভবানীপুরের উল্লেখ ইত্যাদি প্রমাণ করে যে, রচনার সমকালীন সময়ে কৃষি-সমাজটি আলিপুরের বর্তমান ঠিকানায় উঠে আসে। 'সমাজ কুচিত্র' ১৮৬৫-তে প্রকাশিত হয়; অতএব ১৮৬০-এর পর কোনো সময়ে এই স্থানান্তরিকরণটি সম্পন্ন হয়ে থাকবে।

১৭৬. বাগল, যোগেশচন্দ্র, 'কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

১৭৭. হুতোম পল্লীগ্রামের জমিদারদের সম্পর্কে যা বলেছেন ইতিপূর্বেই উক্ত নকশার প্রসঙ্গে তা তুলে ধরা হয়েছে (বর্তমান অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

১৭৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত সম্পাদিত, 'হুতোম পাঁচার নকশা, সমাজ কুচিত্র, পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব', প্রাগুক্ত, 'আলীপুর', পৃ. ১২৩।

১৭৯. 'সমাজ কুচিত্র', প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

১৮০. তদেব, পৃ. ১২৪।

১৮১. তদেব, পৃ. ১২৫।

১৮২. তদেব, পৃ. ১২৬।

১৮৩. তদেব, পৃ. ১২৭।

১৮৪. সুলভ সমাচার। ১৫ মাঘ। ১২৮০।
উদ্ধৃতঃ- রায়, ছন্দা, 'বাংলা সাহিত্য ও সংবাদ সাময়িকপত্রের দর্পণে কলকাতা', প্রথম সংস্করণ ২০০৩, পুস্তক-বিপণি, কলকাতা, পৃ. ২৪৪।

১৮৫. 'সমাজ কুচিত্র', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০।

১৮৬. তদেব, পৃ. ১৩১।

১৮৭. সুলভ পত্রিকা, ১২৬০ আশ্বিন।
দ্র. ঘোষ, বিনয়, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', ৩য় খণ্ড, প্রথম প্যাপিরাস সংস্করণ ১৯৮০, প্যাপিরাস, কলকাতা, পৃ. ১২৩-২৪।

১৮৮. 'সমাজ কুচিত্র', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩।

১৮৯. তদেব, পৃ. ১৩৭।

১৯০. তদেব, পৃ. ১৩৭।

১৯১. ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ, 'আত্মজীবনী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

১৯২. 'সরস্বতী পূজা', 'সমাজ কুচিত্র', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

১৯৩. তদেব, পৃ. ১৩৯।

১৯৪. তদেব, পৃ. ১৫০।

১৯৫. তদেব, পৃ. ১৪২।

১৯৬. 'পল্লীগ্রাম তীর্থ', 'সমাজ কুচিত্র', পৃ. ১৫২।

১৯৭. 'সরস্বতী পূজা', 'সমাজ কুচিত্র', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।

১৯৮. ভূমিকা:- বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত সম্পাদিত, 'হুতোম প্যাঁচার নকশা, সমাজ কুচিত্র, পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব', প্রাগুক্ত, পৃ. অনুল্লিখিত।

১৯৯. 'পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব', তদেব, পৃ. ১৬৪।

২০০. তদেব, পৃ. ১৫৯।

২০১. তদেব, পৃ. ১৬০।

২০২. তদেব, পৃ. ১৬০।

২০৩. তদেব, পৃ. ১৬০-১৬১।

২০৪. তদেব, পৃ. ১৬১।

২০৫. তদেব, পৃ. ১৬৬।

২০৬. তদেব, পৃ. ১৫৯।

২০৭. নাগ, অরুণ, 'সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯-২০০।

২০৮. Ballhatchet, Kenneth, 'Race, Sex and Class under the Raj', First edi 1980, Weidenfield and Nicolson, London, p. 40-50 দ্র.।

২০৯. দত্ত, প্রাণকৃষ্ণ, 'বদমাত্রস জব্দ', ১৮৬৯;
দ্র. বসু, দেবাশিস সম্পাদিত; দত্ত, প্রাণকৃষ্ণ, 'কলিকাতার ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য রচনা', ১ম সংস্করণ ১৯৯১, পুস্তক-বিপণি, কলকাতা, পৃ. ৩৫৭।

২১০. তদেব, পৃ. ৩৫৯-৬০।

২১১. তদেব, পৃ. ৩৬১।

২১২. তদেব, পৃ. ৩৬২।

২১৩. তদেব, পৃ. ৩৬২।

২১৪. তদেব, পৃ. ৩৬২।

২১৫. তদেব, পৃ. ৩৬৩।

২১৬. তদেব, পৃ. ৩৬৩।

২১৭. তদেব, পৃ. ৩৬৪।

২১৮. তদেব, পৃ. ৩৬৫।

২১৯. তদেব, পৃ. ৩৬৫।

২২০. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত সম্পাদিত, 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. অনুল্লিখিত।

২২১. দ্র. ভূমিকা; ভাঁড় সংকলিত, 'সচিত্র গুলজারনগর'; বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত, পুস্তক-বিপণি, প্রথম সং ১৯৮২, পুস্তক-বিপণি, কলকাতা, পৃ. দুই।

২২২. দ্র. 'কথামুখ', রায়, নিশীথরঞ্জন, প্রাগুক্ত, পৃ. ঊনত্রিশ।

২২৩. 'সচিত্র গুলজারনগর', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

২২৪. তদেব, পৃ. ৬।

২২৫. সান্যাল, অবন্তীকুমার, 'বাবু', প্রথম সংস্করণ ১৯৮৭, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৬৪।

২২৬. 'সচিত্র গুলজারনগর', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

২২৭. তদেব, পৃ. ১১।

২২৮. তদেব, পৃ. ৯।

২২৯. তদেব, পৃ. ২১।

২৩০. তদেব, পৃ. ২৮।

২৩১. তদেব, পৃ. ৩১।

২৩২. তদেব, পৃ. ৩৮।

২৩৩. তদেব, পৃ. ৩৮-৩৯।

২৩৪. তদেব, পৃ. ৪৪।

২৩৫. তদেব, পৃ. ৬০।

২৩৬. ড. সুকুমার সেনের 'ক্রাইম কাহিনির কালক্রান্তি' গ্রন্থে অবশ্য 'সচিত্র গুলজারনগরে'র এই ভূমিকার উল্লেখ নেই। দ্র. সেন, সুকুমার, 'ক্রাইম কাহিনির কালক্রান্তি', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

২৩৭. দ্র. ভূমিকা; রায়, অলোক সম্পাদিত, 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে) ; প্রথম গ্রন্থন সংস্করণ ১৯৭৬; পুনঃপ্রকাশ ১৯৭৯; পরিবেশক : প্যাপিরাস, কলকাতা, পৃ. নয়।

২৩৮. তদেব, পৃ. ১।

২৩৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও সম্পাদিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', প্রথম খণ্ড, চতুর্থ মুদ্রণ ১৪০৮, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃ. ১২৩।

২৪০. তদেব, পৃ. ১২৩-১২৪।

২৪১. রায়, অলোক, ভূমিকা, তদেব, পৃ. ছয়।

২৪২. 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০।

২৪৩. 'ইংরাজী শিক্ষিত', সু.ব.প, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

২৪৪. 'সম্বাদতত্ত্ব', সু.ব.প, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫।

২৪৫. তদেব, পৃ. ৭।

২৪৬. শাস্ত্রী, শিবনাথ, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

২৪৭. 'সম্বাদতত্ত্ব', সু.ব.গ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

২৪৮. তদেব, পৃ. ১১।

২৪৯. 'অনুরাগ-তত্ত্ব', সু.ব.প, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

২৫০. তদেব, পৃ. ৪৯।

২৫১. তদেব, পৃ. ৫২।

২৫২. 'সম্বাদতত্ত্ব', সু.ব.প, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৭।

২৫৩. 'অনুরাগ-তত্ত্ব', সু.ব.প, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১।

২৫৪. তদেব, পৃ. ৫১-৫২।

২৫৫. তদেব, পৃ. ৫২।

২৫৬. 'নবযুবা', সু. ব.প, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬০।

২৫৭. তদেব, পৃ. ১৬০।

২৫৮. 'ইংরাজী শিক্ষিত', সু.ব.প, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

২৫৯. 'শাস্ত্র', সু.ব. প, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪-১৪৫।

২৬০. 'উন্নতি', সু.ব.প, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

২৬১. 'দাসত্ব', সু.ব.প, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

২৬২. 'সম্বাদতত্ত্ব', সু.ব.প, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

২৬৩. তদেব, পৃ. ৮।

২৬৪. সেন, সুকুমার, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ৩য় খণ্ড, সপ্তম সংস্করণ ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ১৯৪।

২৬৫. সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র, 'বঙ্কিমচন্দ্র', তৃতীয় এ. মুখার্জি সংস্করণ ১৯৯৭, এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ১৩১।

২৬৬. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, 'বঙ্কিমচন্দ্রজীবনী', ১ম সং ১৯৯১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ৫৩৫।

২৬৭. বাগল, যোগেশচন্দ্র সম্পাদিত, 'বঙ্কিমরচনাবলী', ২য় খণ্ড, নবম মুদ্রণ ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ১০২৯-১০৩১।

২৬৮. সেন, সুকুমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১।

২৬৯. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৪-৫৬।

২৭০. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা', 'বিবিধ প্রবন্ধ';
দ্র. বাগল, যোগেশচন্দ্র সম্পাদিত, 'বঙ্কিম-রচনাবলী', ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪।

২৭১. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত';
দ্র. বাগল, যোগেশচন্দ্র সম্পাদিত, 'বঙ্কিম-রচনাবলী', ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

২৭২. তদেব, পৃ. ১১৮।

২৭৩. তদেব, পৃ. ১১৮।

২৭৪. তদেব, পৃ. ১১৯।

২৭৫. তদেব, পৃ. ১১৯।

২৭৬. তদেব, পৃ. ১২০।

২৭৭. 'কমলাকান্ত', 'বঙ্কিম-রচনাবলী', ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, দ্রষ্টব্য।

২৭৮. 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত', প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

২৭৯. তদেব, পৃ. ১২৪।

২৮০. তদেব, পৃ. ১২৭।

২৮১. সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র, 'বঙ্কিমচন্দ্র', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২।

২৮২. দ্র. নিবেদন; রায়, দুর্গাচরণ, 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন', প্রথম সংযোজিত সংস্করণ ২০০১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৬।

২৮৩. তদেব, পৃ. ১৫।

২৮৪. তদেব, পৃ. ২৭০।

২৮৫. তদেব, পৃ. ২৯৪।

২৮৬. তদেব, পৃ. ২৯৫।

২৮৭. তদেব, পৃ. ৩১৫।

২৮৮. তদেব, পৃ. ৩১৫।

২৮৯. তদেব, পৃ. ১২২।
২৯০. তদেব, পৃ. ১৪৭।
২৯১. তদেব, পৃ. ২৮৮।
২৯২. তদেব, পৃ. ২২১।
২৯৩. তদেব, পৃ. ২৩৮।
২৯৪. তদেব, পৃ. ৩০০।
২৯৫. তদেব, পৃ. ৯৯।
২৯৬. তদেব, পৃ. ২৭৩।
২৯৭. তদেব, পৃ. ৩৬৬।
২৯৮. তদেব, পৃ. ৩০০।

## সপ্তম অধ্যায়:

# গল্প-উপন্যাসে বাবু

উনিশ শতকের 'বাবু'রা উক্ত শতকের লোককবি, ছড়াকার কিংবা নাট্যকার বা প্রহসন-রচয়িতাদের যেভাবে উদ্‌বেজিত করেছিলেন, উপন্যাস-রচয়িতাদের সেভাবে নয়। পূর্বোল্লিখিত মাধ্যম দু'টির উপভোক্তা ছিলেন ধনী-দরিদ্র, ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ, কিন্তু উপন্যাসের লেখক ও পাঠক ছিলেন মোটের উপর শিক্ষিত, সামাজিক বিচারে উঁচু থাকের 'ভদ্রলোক' শ্রেণি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শিক্ষা যতই সুগম ও সুলভ হয়েছে, 'ফিমেল এডুকেশনে'র হাত ধরে সর্বতোগামী হতে চেয়েছে, ততই শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে উপন্যাস পাঠের আগ্রহ ও চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। মনে রাখতে হবে, এই সময় পর্যন্ত এদেশে বিনোদনের মাধ্যম ছিল মূলত কথন নির্ভর কিংবা অভিনয়-আশ্রয়ী। লোককবি, ছড়াকার, অভিনয় শিল্পী কিংবা কথক ঠাকুর— সকলেই perform করতেন; সর্বসাধারণ— শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে শ্রুত্য ও দৃশ্য সেই বিনোদন উপভোগ করতেন। এ রস ছিল সম্মেলকের উপভোগের সামগ্রী। কিন্তু 'নভেল' কিংবা 'উপন্যাস' পাঠের রোমাঞ্চ ঠিক এমন নয়। যদিও উনিশ শতকের পরিবেশে একজন উপন্যাস পাঠ করছেন এবং অন্যান্যরা শুনছেন, এ দৃশ্য দুর্লভ নয়; তবুও নভেল-পাঠ মূলত ব্যক্তির নিজস্ব আকাঙ্ক্ষার বিষয় এবং ব্যক্তিগতভাবেই এ রস উপভোগ্য। উপন্যাসের ভাষা, চিন্তা, উপস্থাপনা, রসক্ষরণ তখনও পর্যন্ত সাধারণের ভাষা-চিন্তার জগৎ থেকে অনেকটাই দূরে। সেইসঙ্গেই ইউরোপের মতো এক্ষেত্রেও উপন্যাসের রূপকল্প বিকাশের আদি নির্মাণ কল্পে প্রবন্ধ ও কথা (story)-র সহাবস্থান ঘটেছে অনেক ক্ষেত্রেই। ফলে নির্ভেজাল গল্পরস তখনও দুর্লভ ছিল অধিকাংশ ঔপন্যাসিকের রচনায়। এমনকী বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো কোনো উপন্যাসেও এই লক্ষণ বিদ্যমান, যদিও লেখকের মুনশিয়ানায় তা শিল্পে পরিণত। কিন্তু যে কারণে হরিনাথ মজুমদারের 'বিজয় বসন্ত' (১৮৫৯) জনপ্রিয় হয়, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪) আবেগসর্বস্ব গল্প নিয়েই অতিক্রম করে বঙ্কিমের জনপ্রিয়তা ও গ্রন্থের মুদ্রণ-সংখ্যাকে, সেই একই কারণে ইতর ভাবালুতাপূর্ণ, ককনি-সংবলিত হালকা চালের প্রহসন বা গদ্য-পদ্য মিশ্রিত নকশা অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সাধারণের কাছে। এ কারণে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত প্রায় পাঁচশোটি উপন্যাস লেখা হলেও[১] তার অধিকাংশই সমকালে অপঠিত ও উপেক্ষিত হয়েছে।

সাধারণভাবে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের অনুপ্রবেশ যে একটু দ্বিধার মধ্যে দিয়ে, তাতে সন্দেহ নেই। এর কারণ নিহিত আছে উনিশ শতকের সমাজ-ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক কাঠামোর মধ্যে। আমরা জানি, উপন্যাস ফিউডাল সমাজ ব্যবস্থার ফল নয়, কোনো অভিজাত ভূস্বামীর নির্দেশে বা পৃষ্ঠপোষকতায় তার জন্ম হয়নি; উপন্যাস একান্তভাবেই বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার উপজাত। সেইসঙ্গেই এর রূপ-আঙ্গিক-আত্মা একান্তভাবেই নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মনসিজ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যেমন বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভবের ফলে ধনতন্ত্র ও বণিকতন্ত্রের সখ্যতার পরিবেশে অনিবার্যভাবেই ভিড় জমিয়েছিলেন শ্রমিক, ভৃত্য, শিক্ষানবিশ, কেরানি প্রভৃতি বহুবিচিত্র শ্রেণির মানুষ। অবসর বিনোদনের জন্য এঁরা ভিড় করতেন ক্লাব, কফি-হাউস কিংবা থিয়েটারে। এঁরা 'eager for amusement delighting in infinite personal gossip and talking over its own peculiarities with ceaseless interest in coffee houses, clubs and theatres'.[2] এর পাশাপাশি ছিল অবসর সময়ে গল্প-উপন্যাস পড়তে আগ্রহী মহিলা পাঠকদের দাবি। এইসব শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত এবং মহিলা পাঠকদের চাহিদার কারণে ধনতন্ত্রের আওতায় বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার মধ্য থেকে ইউরোপে উপন্যাসের আবির্ভাব।

এই প্রেক্ষিতে যদি আমরা উনিশ শতকীয় কলকাতার দিকে তাকাই তবে দেখব শিক্ষিত বাবুদের নিজস্ব ক্লাব, সভা-সমিতিতে দ্বিতীয়ার্ধের কলকাতা সরগরম; অভিজাত বাবুদের পৃষ্ঠপোষকতা ছেড়ে নাটক,

থিয়েটার এগিয়ে চলেছে public entertainment-এর দিকে, যার দর্শক, অভিনেতা ও প্রযোজক মধ্যবিত্ত বা উচ্চমধ্যবিত্ত জনগণ, দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাবসায়িক; পাশাপাশি প্রাচীন সংস্কারের গিঁট ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারা কতিপয় হিন্দু এবং সংখ্যায় ভারী ব্রাহ্ম পরিবারে বালক-যুবাদের পাশাপাশি অন্দরমহলেও স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন চলছে। অন্যদিকে ধনতন্ত্র ও বণিকতন্ত্রের মিলিত সৌহার্দ্যে নতুন গড়ে ওঠা নগরজীবনে কাজ পাবার আশায় ভিড় জমিয়েছেন শ্রমিক, ভৃত্য, শিক্ষানবিশ, কেরানি, শিক্ষক, উকিল, মোক্তার, দালাল প্রভৃতি বিচিত্র চরিত্র। এবং এই সূত্র ধরেই উচ্চ শ্রেণির বৌদ্ধিক নবজাগরণের ভিত্তি প্রস্তুত হয়েছিল। মনে রাখতে হবে, 'Without commerce or industry there can be no middle class; where you had no middle class, you had no renaissance.'[৩] যদিও মধ্যবিত্ত সমাজের উত্থান ও 'ভাববিপ্লব (renaissance) সর্বব্যাপ্ত ছিল না, তার সীমানা ও পরিধি ছিল নির্দিষ্ট ও সংকীর্ণ।[৪] তা ছাড়া বিচিত্র চরিত্রের কলকাতা নগরীর জীবনাচরণ পুরোপুরি বুর্জোয়া হয়ে উঠতে পারেনি স্বভাবে ও চরিত্রে, বিগত ফিউডাল রীতিনীতি ও সংস্কৃতির প্রতি চোরা টান ছিল মানুষের মনে। আদিবাবু, নববাবুদের কাল তখন অতীত, নব্যবাবুরাও খাতায়-কলমে প্রায় অদৃশ্য, 'ভদ্রলোক' বাবুরা আসর জাঁকিয়ে বসেছেন। আধুনিকতার নানান উপাদান— শিক্ষা, স্বাস্থ্য, হোটেলের খানা, থিয়েটার হলের আমোদ, সর্বোপরি পাশ্চাত্য থেকে ধার করা স্বদেশীয়ানার মোহে তখন 'ভদ্রলোক' শ্রেণি হাবুডুবু খাচ্ছেন, কিন্তু অন্তর থেকে তা মেনেও নিতে পারছেন না পুরোপুরি। এই কালপর্বের অধিকাংশ ঔপন্যাসিক দ্বিধাবিভক্ত— একদল সচেতনভাবে এড়িয়ে গেলেন নগরজীবন ও 'ভদ্রলোক'বাবুদের অন্তর্দ্বন্দ্বের বিষয়টি, পাড়ি দিলেন সুদূর অতীতে কিংবা ফেলে আসা ফিউডাল সংস্কৃতির আখ্যানে; অন্যদল ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে-উপহাসে নঞর্থক চশমা এঁটে বিচার করতে বসলেন 'ভদ্রলোক'বাবুদের; এঁদের চোখে আধুনিকতার ভালো কিছুই ধরা পড়ল না, গুটিগুটি পায়ে ফিউডাল রক্ষণশীলতাকে ফিরিয়ে আনাই ছিল তাঁদের গোপন অভিপ্রায়। ফলে বাঙালি 'বাবু'দের বিবর্তনের স্বরূপ এই সময়ের উপন্যাসে প্রায় অকথিতই রয়ে গেল।

এইসব লেখকেরা অধিকাংশই ছিলেন শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' শ্রেণি তথা মধ্যবিত্তদের প্রতিনিধি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আদি, নব ও নব্যবাবুদের আনুষঙ্গিক দোষ-গুণগুলি বহনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন যেন এই মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুরাই। সমকালীন প্রহসন ও নকশাগুলিতে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় বিদ্যমান। ঔপন্যাসিক রূপে আবির্ভূত হয়ে শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' শ্রেণি স্বীয় শ্রেণির স্খলন-পতন-পাপাচারের নিরপেক্ষ সমালোচনা করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। 'আপনার মুখ আপুনি দেখ'তে কেউই উৎসাহিত বোধ করেননি। বরং উপন্যাসে এক কল্পিত-মার্জিত সংস্কৃতির বলয় তৈরি করতে গিয়ে তাঁরা সরে এলেন প্রকৃত বাস্তবতা থেকে। এ অবশ্য বাঙালির রোমান্টিসিজ্‌ম-ভক্তির অনিবার্য ফল। এমনকী বঙ্কিমের উপন্যাসেও খাস কলকাতা শহরের বাবু-বিবিরা প্রায় অদৃশ্য। একমাত্র 'রজনী' উপন্যাসের অমরনাথকে বাঙালি মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের আদর্শায়িত প্রতিনিধি বলা চলে। যদিও ভাববিহ্বলতায়, আবেগে অমরনাথ প্রায় কল্পস্বর্গের দেবতাতে পরিণত। অবশ্য প্রথম সংস্করণের অমরনাথ দোষে-গুণে, লাম্পট্যে-কপটতায় অনেকটা বাস্তবতার কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন। তথাকথিত শিষ্ট সাহিত্যে বাঙালিবাবুদের ক্রমবিবর্তনের রূপ কিংবা নিরপেক্ষ আত্মসমালোচনার চিহ্ন প্রায় মেলে না বললেই চলে। টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮), রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসার' (১৮৮৬) ও 'সমাজ' (১৮৯৪), ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কল্পতরু' (১৮৭৪), যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'মডেল ভগিনী' (১৮৮৬-১৮৮৮; দুই খণ্ড একত্রে)

কিংবা ‘বাঙালি চরিত’ (তিনখণ্ড ১৮৮৫-৮৬)), ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ‘কঙ্কাবতী’ (১৮৯২) উপন্যাসের খেতু ইত্যাদি অতি অল্পকিছু উপন্যাসেই বাঙালিবাবুদের নব্য আদলটি চোখে পড়ে। যদিচ টেকচাঁদ ঠাকুরের ‘আলালের ঘরের দুলাল’ই একমাত্র বিষয়গতভাবে ‘বাবু’কেন্দ্রিক উপন্যাস। অবশ্য বিষয় হিসাবে বাঙালি ‘ভদ্রলোক’বাবুদের উঠে আসতে বিশ শতকে পৌঁছোতে হয়েছিল। উনিশ শতকের উপন্যাসের জগৎ অন্তত নারীকেন্দ্রিক।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে রামমোহন এবং পরবর্তীতে মুখ্যত নব্যবাবুরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবনাচরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর অগ্রাধিকারের প্রশ্নে নানান সংগত আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই আন্দোলনের রাশ ধরেন মুখ্যত ঈশ্চরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সেইসঙ্গেই কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখেরা। বস্তুত মধ্যবিত্ত ‘ভদ্রলোক’বাবুদের কতকটা prejudice হয়ে দাঁড়ায় নারী-বিষয়ক সংস্কার ও আন্দোলনের বিষয়টি। শিক্ষিত ‘ভদ্রলোক’বাবুদের নারী-আন্দোলনের প্রসঙ্গে চিন্তকের মন্তব্য অতিশয়োক্তি মনে হতে পারে যে,[৫] ‘উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বাধীনভাবে উহার সূচনা হইতে দেখা যায় এবং শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বেই তাহা এত শক্তিশালী হইয়া উঠে যে, পৃথিবীর যে কোনও দেশের নারী আন্দোলনের সহিত তাহার তুলনা চলে। এমনকী, কোন কোন বিষয়ে প্রগতিশীলতায় এদেশ ইউরোপকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিল।’ কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে শিক্ষিত ‘ভদ্রলোক’ বাঙালিবাবুরা পক্ষে-বিপক্ষে নারীপ্রগতি বিষয়ক আন্দোলন বা বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন এবং সাহিত্য, সংস্কৃতি ও চিন্তার প্রতিটি ক্ষেত্রে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছিল। ব্রাহ্মবাবুরা এ বিষয়ে যথার্থ প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করেন। উপন্যাস যেহেতু ছিল শিক্ষিত ‘ভদ্রলোক’বাবুদের মননের প্রতিচ্ছবি, সেহেতু বিষয় হিসাবে নারীর প্রচলিত কিংবা কাঙ্ক্ষিত ভূমিকার কথা বেশি করে উঠে এসেছে সেখানে। উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৫৫ সালে রাধানাথ শিকদার ও তাঁর সহযোগী প্যারীচাঁদ মিত্র ‘মাসিক পত্রিকা’ নামের সাময়িকী প্রকাশ করেন যার ঘোষিত বক্তব্য ছিল : ‘এই পত্রিকা সাধারণের, বিশেষত স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে; যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।’[৬] অর্থাৎ শুধু বিষয় হিসাবেই নয়, বাঙালি নারী তখন উপন্যাসের উদ্দিষ্ট পাঠকও। শুধুমাত্র বিনোদন নয়, স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্যও গোপন ছিল না। অতএব, বাঙালি বাবুদের নিন্দাজনক কথা অপেক্ষা সংসার জীবনে নারীর ভূমিকা বা চরিত্র গঠনের উপর অনেকাংশে আলো ফেলা হয়েছে উনিশ শতকের কালপর্বে, উপন্যাসের পাতায়। ফলে অনালোকিত থেকে গেছে বাঙালিবাবুদের ক্রমিক রূপান্তরের প্রসঙ্গটি।

প্রায় গোটা উনিশ শতক জুড়ে উপন্যাসের আদর্শ নিয়ে একটি বিভ্রান্তি ছিল। কেউ প্রবন্ধ-নিবন্ধাদির মতো সিরিয়াস বিষয়ের বিপরীতে সাধারণের উপভোগ্য রচনা হিসাবে ধরছেন উপন্যাসকে,[৭] কেউ ইংরেজি ‘নভেলে’র অনুরূপ ধরছেন[৮], কেউ-বা বালকপাঠ্য ‘রূপক ইতিহাস’ হিসাবে দেখছেন 'Novel'-কে।[৯] ইউরোপের মতোই এক্ষেত্রেও নভেলের মধ্যে মিশে যাচ্ছে Sketch বা নকশার গুণ। বাস্তবতা অর্থে সমসাময়িক সমাজজীবনের অসংগতির হুবহু বর্ণনাকেই আধেয় করা হচ্ছে। ফলে, প্রথম উদ্যমের প্রক্রিয়ায় মিশে আছে উপন্যাসের আদল, নকশার রস কিংবা নকশার আদল, উপন্যাসের রস। বিষয়টি অনিবার্য ছিল। প্রথমত, নতুন শিক্ষা ও রুচি বিকাশের ফলে সমসাময়িক প্রসঙ্গগুলি অনুধাবন ও বিচারের ব্যাপারটি গুরুত্ব পাচ্ছিল শিক্ষিত মহলে; দ্বিতীয়ত, রূপকথা-উপকথার আদল থেকে ‘নভেলে’র

রসকে পৃথক ও স্বতন্ত্র শ্রেণিতে পরিণত করার একটি ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠতে দেখা গেল। উল্লেখযোগ্য, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের 'সুশীলার উপাখ্যান' (১৮৫১), হানা ক্যাথরিন ম্যুলেন্স-এর 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২) কিংবা টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)— প্রথম তিনটি উপন্যাস-লক্ষণাক্রান্ত রচনারই অবলম্বন প্রত্যক্ষ সমসাময়িক। কোনো গভীর সামাজিক দায়বদ্ধতা হয়তো এসব উপন্যাসের রসবিচারে মেলে না, তবুও এগুলি যে ড্যানিয়েল ডাফোর উপন্যাসের মতো 'the objective representation of contemporary social reality' [১০], তা অনস্বীকার্য। যদিও এই 'objective representation' যথাযথ বা পূর্ণাঙ্গ হতে পারেনি, কারণ শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' শ্রেণি আত্মদর্শনে পরান্মুখ ছিলেন। এমনকী বঙ্কিমের মতো সাহিত্যিকও নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলালকে সেই সুযোগ দিলেন না, এই দুই শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবু তাঁদের অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে অনালোকিতই থাকলেন সূর্যমুখী কিংবা ভ্রমর-রোহিণীর তুলনায়। লেখকের দৃষ্টি যেহেতু নিবদ্ধ ছিল অন্যতর সামাজিক আদর্শ প্রতিষ্ঠায়, ফলে বাঙালিবাবুদের মনের দ্বন্দ্বমুখর বাস্তবতা অলক্ষ্যেই থেকে গেল।

উপন্যাস ব্যক্তি-মননের প্রতিচ্ছবি; এবং এই ব্যক্তি যেহেতু সামাজিক মানুষও, অতএব উপন্যাসে ব্যক্তির 'হয়ে ওঠা'র সামাজিক ইতিহাসটিও অগোচর নয়। সমালোচকের ভাষায় : ' One looks to the novel less for its significance in the history of Ideas than of its connections with social history, of which it is often a transposition or more or less a deliberate commentary. It may show us the physical manner in which people at a particular date but it is also likely to deal with the personal relationships of people living together in a social group and regulated in their conduct by the prevailing conventions.'[১১] এই 'deliberate Commentary'-র প্রয়োগ ইউরোপে 'Novel' রচনার প্রথম পর্বে যেমন লক্ষণীয়, তেমনি উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাসের গঠন-যুগেরও সত্য। তাবৎ উনিশ শতকীয় উপন্যাসের ক্ষেত্রেই, দু'চারটি ব্যতিক্রম ছাড়া, বাকি উপন্যাস রচিত হয়েছে 'কলাকৈবল্যবাদী'দের রীতি অনুযায়ী নয়; 'সমাজের জন্য শিল্প'— এই ভাবনা থেকেই। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' শীর্ষক রচনায় স্পষ্ট বলেছেন, 'যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।'[১২] অর্থাৎ 'সৌন্দর্যতত্ত্বে'র পাশাপাশি 'সামাজিক মঙ্গলসাধনে'র বিষয়টি তখন লেখার অন্যতর আদর্শ। ঈষৎ গদ্য-পদ্য মিশ্রিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নকশা 'নববাবুবিলাস' সামাজিক মঙ্গলসাধনের ইচ্ছাতেই রচিত। উপন্যাসের দিক থেকে মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের 'সুশীলার উপাখ্যান', হানা ক্যাথরিন ম্যুলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ', টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'ও সামাজিক হিতের বিষয়টিকেই মাছের চোখ ভেবে এগিয়েছে।

প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'ই উল্লিখিত উপন্যাসগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম ও একমাত্র, যাতে বিগত বাবুসমাজের একটি নিটোল ছবি উপস্থিত করা হয়েছে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস' (১৮২৩) 'নক্শা' জাতীয় রচনা, কাহিনি অংশ যৎকিঞ্চিৎ। কিন্তু প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' উদ্দেশ্যে, ব্যাপ্তিতে যথার্থ উপন্যাস।[১৩] উপন্যাসে সংযোজিত ইংরেজি ভূমিকায় (Preface) লেখক বলেছেন, 'The above original Novel in Bengali being the first work of the kind, ... The work has been written in a simple style and to foreigners desirous of acquairing an idiomatic

knowledge of the Bengali language and acquintance with Hindu domestic life'.[১৪] ১৮৫৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে 'Hindu Domestic Life'-এর ভাষা ও পরিচয় সম্বলিত উপন্যাসটি রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত মহিলাদের উপযোগী সাময়িকী 'মাসিক পত্রিকা'র প্রথম বর্ষের সপ্তম সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় (১৮৫৫)। 'সাধারণের বিশেষত স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা'[১৫] হচ্ছে এমন পত্রিকায় নববাবুদের চরিত্রদোষ ও তার পরিণাম দেখানো হল 'আলালের ঘুরের দুলালে'; এর কারণ সম্ভবত দ্বিবিধ,— এক. নববাবুদের এই কাহিনি মহিলা ও সাধারণ পাঠকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে, অতএব কাহিনি অংশ পাঠে কোনোরূপ উচ্চতর মানসিক প্রস্তুতির সাহায্য ছাড়াই উপন্যাসের রসগ্রহণ সম্ভব। দুই. খাতায়-কলমে এই উপন্যাস রচনার সময় নববাবুদের যুগ বিগত হলেও খাস কলকাতার এবং কলকাতার অদূরবর্তী অঞ্চলে উক্ত বাবুয়ানার আবিল স্রোত কম-বেশি তখনও প্রবহমান। বাঙালি পুরুষের অভিজাত বর্গের অনেকেরই নৈতিক চরিত্রের মান শিথিল। অনিবার্যভাবে উজাড় হয়ে যাচ্ছে অর্ধশতক আগের ভুঁইফোঁড় বাবুদের দল। অতএব 'আলালের ঘরের দুলাল' পাঠে অন্দরমহলগুলিতে স্ত্রীশিক্ষা সঠিক ও সুদৃঢ় হলে, বাবুয়ানার অবশ্যম্ভাবী পতন ও স্খলনের কাহিনি থেকে শিক্ষা ও সচেতনতা লাভ করলে এই অনৈতিকতার স্রোত রুদ্ধ হয়ে বাঙালি বাবুরা নিষ্কলঙ্কচিত্ত হয়ে উঠবেন। দেশের 'হিতসাধনে'র এই অভিপ্সা উপন্যাসে স্থানে স্থানেই ব্যক্ত হয়েছে। আর একটি ব্যাপার উল্লেখযোগ্য— প্যারীচাঁদ নিজে নব্যবাবু তথা ইয়ং বেঙ্গলদের গোষ্ঠীভুক্ত। তাঁর শৈশব ও যৌবনের দিনগুলিতে 'আলালের ঘরের দুলালে'র নববাবু মতিলালের মতো অগণন চরিত্রদের স্খলন-পতনকে তিনি কাছ থেকে দেখেছেন। এই অভিজ্ঞতা বাবু চরিত্রের বাস্তবতা নির্ধারণে তাঁকে সাহায্য করেছে। অন্যদিকে ইয়ং বেঙ্গলদের উদ্ভ্রান্তি, দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হলেও স্বশ্রেণির অর্থাৎ নব্যবাবুদের সমালোচনা ও চিত্রপ্রদর্শনে তিনি অপারগ। আগেই বলা হয়েছে, 'আপনার মুখ আপুনি দেখা'র সৎসাহস সকলের ছিল না। অবশ্য তা হলেও 'আলালের ঘরের দুলাল' নববাবুদের যে ছবি ধরে রেখেছে মতিলালের মধ্য দিয়ে, তা যথেষ্ট প্রশংসনীয়।

হুতোমের ভাষায়, 'কোম্পানির বাংলার দখলের কিছু পরে, নবকুমারের ফাঁশী হবার কিছু পূর্ব্বে'[১৫] কিছু ভাগ্যান্বেষী সুযোগসন্ধানী মানুষ কোম্পানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানান কাজকর্ম করে অচিরেই 'বনেদি বড় মানুষ' হয়ে পড়েন। 'আলালের ঘরের দুলালে'র বাবুরামবাবু তেমনিই একজন ভুঁইফোঁড় বনেদি বড়োমানুষ। মাল ও ফৌজদারি আদালতের কাজ করে, 'তোষামোদ ও কৃতাঞ্জলি দ্বারা সাহেবসুবোদিগকে বশীভূত' করে বাবুরাম বাবু অল্পদিনের মধ্যেই প্রচুর ধন উপার্জন করে সুদৃশ্য অট্টালিকা, বাগ-বাগিচা, তালুক ও অন্যান্য ঐশ্বর্য-সম্পত্তি অর্জন করে 'বড়মানুষ' হয়ে পড়লেন। লেখক অত্যন্ত সুকৌশলে মন্তব্য করেছেন, 'এদেশে ধন অথবা পদ বাড়িলেই মান বাড়ে, বিদ্যা ও চরিত্রের অদৃশ্য গৌরব হয় না।'[১৬] উনিশ শতকের বাবুদের ইতিহাস ঘাঁটলেই এই মন্তব্যের সত্যতা সপ্রমাণিত হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জানিয়েছেন, 'অতএব পলাশি যুদ্ধের পরই মুর্শিদাবাদ অবসন্ন হইতে লাগিল এবং কলিকাতার জাঁক বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে কোম্পানির চাকরি করিয়া কলিকাতার লোকে খুব বড়োমানুষ হইতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে নীলমণি ঠাকুর, পাথুরিয়া ঘাটার ঘোষেরা ও জোড়াসাঁকোর সিংহেরা প্রধান। এইসময় পল্লীগ্রাম হইতে অনেক উদ্যমশীল ব্যক্তি বড়োমানুষ হইবার আশায় কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কলিকাতায় যে সকল বড়ো বড়ো বাটি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মূল অন্বেষণ করিতে গেলে কাপ্তেন ধরা ব্যবসায়ই

দেখিতে পাওয়া যাইবে।'[১৭] শিক্ষাদীক্ষায় অত্যন্ত সাধারণ হয়েও ইংরেজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কর্মের সুযোগে অনতিকালের ভিতরই অর্থ ও স্থানে স্থানে পদ, এবং কালে সেই অর্থ ও পদের গৌরবে এঁরা গৌরব ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। বাবুরামবাবুও তেমনই একজন। তফাত এটুকুই যে ধন উপার্জন করে কোম্পানির কর্ম থেকে প্রত্যক্ষভাবে অবসর নিয়ে বৈদ্যবাটীতে স্বগ্রামে ফিরে ইনি জমিদারি কর্ম করতে থাকেন। এঁর অবস্থা পূর্বে নিতান্ত মন্দ থাকায়, দু'একজন ছাড়া কেউ তাঁর খবরও রাখত না। বর্তমানে অর্থের কারণে এঁর বাড়ি সবসময় লোকে লোকারণ্য—

'বাবুরামবাবুর বাটীতে যখন যাও তাঁহার নিকট লোক ছাড়া নাই — কি বড় কি ছোট, সকলেই চারিদিকে বসিয়া তুষ্টিজনক নানা কথা কহিতেছে, বুদ্ধিমান ব্যক্তির ভঙ্গিক্রমে তোষামোদ করিতে আর এলোমেলো লোকেরা একেবারেই জল উঁচু নিচু বলিত।'[১৮]

তাদের তোষামোদে ও সান্নিধ্যে বাবুরামবাবুর একমাত্র চিন্তা কীভাবে বিষয়-বৈভব বাড়বে, কীভাবে দশ জন লোকে তাঁর কথা ও তাঁর ঐশ্বর্যের কথা জানবে, গ্রামের সমস্ত লোককে অর্থের দম্ভে ও প্রতিপত্তিতে কিভাবে 'করজোড়ে' রাখবেন, সাম্বাৎসরিক নানান ক্রিয়াকর্মই বা কী প্রকারে 'সর্বোত্তম' হবে— এইসব। হুতোমের নকশার সাক্ষ্যে বোঝা যায় যে 'বনেদি বড়মানুষ কব্‌লানো'র [১৯] এই গুণগুলি বিশেষ নয়, সাধারণ। বাবুরাম বাবু সেকালের আদিবাবুদের প্রতীক-রূপ।

নববাবু মতিলাল এঁরই সন্তান। বাল্যকাল থেকে অতিরিক্ত আদর ও প্রশ্রয় পেয়ে সে স্বভাব-দুরন্ত, অশিষ্ট ও 'বেআদব' হয়ে উঠেছে। প্রথমে পাঠশালার গুরুমশাই, পরে বাড়ির পূজারি ব্রাহ্মণ, তৎপরে ফারসি পড়ানোর শিক্ষক মুনশি হবিবল হোসেন তাকে নানাপ্রকার ভাষা-শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছেন। জুটেছে কেবল ছাত্রের হাতে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা আর অপমান। এঁরা সকলে পত্রপাঠ বিদায় নিলে বাবুরাম বাবু পুত্রকে অর্থকরী ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে বালীতে তাঁর আত্মীয় বেণীবাবুর বাড়ি পাঠালেন। বাবুরামের একান্ত ইচ্ছা, বেণীবাবু মতিলালকে কলকাতার কোনো ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করে দেন। কিন্তু একবেলাতেই মতিলালের পরিচয় পেয়ে বেণীবাবু সহ বালীর সকলের ত্রাহিমাম অবস্থা। 'গলায় মাদুলি — কানে মাকড়ি, হাতে বালা ও বাজু' মতিলাল কখনো পথিকদের ঢিল মেরে, বাগানের ফুল-ফল ছিঁড়ে, কারোর ঘিয়ের হাঁড়ি কিংবা জলের কলসী ভেঙে, কারোর মুখে থুতু দিয়ে গ্রামজ সকলের চক্ষুশূল হয়েছে। একদিনের ভিতরেই গ্রামের সমমনস্ক 'চেংড়া' ছোঁড়াদের নিয়ে সে নরক গুলজার করেছে। এখানেই শেষ নয়। তার চরিত্রের অন্যান্য গুণগুলিও অচিরেই প্রকাশ পেয়েছে। এই বয়সেই সে তামাক-খোর। অম্বুরি কিংবা ভেলসায় তার নেশা হয় না, 'কড়া তামাকের উপর তামাক' খায় সে। রাত্রে আহারের পর তামাক খেয়ে ঘুম না আসাতে সে অল্পবয়সি ছোকরা হয়েও প্রাপ্তমনস্ক 'নীলু ঠাকুরের সখীসংবাদ অথবা রাম বসুর বিরহ' গাইতে লেগেছে। বেশ বোঝা যায়, বাবুত্ব অর্জনের প্রাথমিক পর্বের শিক্ষা— নানাপ্রকার নেশার দ্রব্য সেবন, দেহভাব, অকালপক্কতা — সে ভালোভাবেই অর্জন করেছে।

উত্যক্ত বেণীবাবু পরদিনই মতিলালকে নিয়ে কলকাতায় এসে বাবুরামবাবুর জনৈক কুটুম্ব বেচারামবাবুর বাড়িতে তাঁর অনুমতিক্রমে মতিলালের থাকবার ব্যবস্থা করেছেন এবং শরবোরণ সাহেবের স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছেন। শরবোরণ সাহেবের স্কুল সম্ভবত ১৭৮৪ সালে স্থাপিত শেরবোর্ন সেমিনারি। এখানকার ছাত্র ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, হরকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ বিখ্যাত মানুষেরা। ১৮১৭ সালে হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠার পরে বাঙালিদের কাছে এই স্কুল বেশি

গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে এবং শেরবোর্ন সেমিনারির গুরুত্ব কমতে থাকে। বাবুরামবাবু কর্মের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছিলেন ইংরেজি ভাষা না শিখলে মতিলাল করে-কর্মে খেতে পারবে না। আলোচকের মতে, 'বস্তুতঃ ব্যবসা কিংবা চাকরি করতে চাইলে বাঙালীদের তখন শিখতে হত একাধিক ভাষা— ফারসী, কারণ ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ফারসীই ছিল রাষ্ট্রভাষা; ইংরেজি, কারণ ইংরেজি হয়ে উঠেছিল বাণিজ্যের ভাষা; প্রাচীন ভাষাও শিক্ষিতরা অনেকেই লালন করতেন।'[২০] শেরবোর্নের স্কুলটি জোড়াসাঁকোতে ছিল, পরে ১৮৩১-এর দিকে এই স্কুল বউবাজারে স্থানান্তরিত হয়।[২১] এইসময় পর্যন্ত শেরবোর্ন নিজে স্কুলটির পরিচালনা করতেন। অতএব ধরে নেওয়া যায়, উপন্যাসের মতিলাল ১৮৩১-এর পর কোনো এক সময় শেরবোর্নের স্কুলে ভর্তি হয়। অর্থাৎ তার বাবুত্বের বেড়ে ওঠা নব্যবাবুদের কালে, কিন্তু সে আচার-আচরণে বহন করে চলেছিল নববাবুদের স্বভাব ও লক্ষণ। অবশ্য মতিলাল শেরবোর্ন সেমিনারিতে দু'একদিন পড়েই জনৈক কালুস সাহেবের স্কুলে ভর্তি হল। কিন্তু ওই নামেই। নিঃসন্তান বেচারামবাবুর দুই ভাগ্নে হলধর ও গদাধর প্রায় একই স্বভাবের ছিল। অতএব রতনে রতন চিনল। 'এক মা'র পেটের তিনটি ভাই'-এর মতো তিনজনই 'গোকুলের ষাঁড়ের ন্যায় বেড়ায়।' সপ্তাহে দু'এক দিন স্কুলে যায় ও কোনোরকমে বসে থাকে; তাদের 'সর্বদা মন উডু উডু, কতক্ষণে সমবয়সীদের সঙ্গে ধূমপান ও আহ্লাদ আমোদ' করবে। অন্যদিন—

'যাহা মনে যায় তাই করে- কাহারো কথা শুনে না-কাহাকেও মানে না। হয় তাস—নয় পাশা—নয় ঘুড়ি—নয় পায়রা-নয় বুলবুল, একটা না একটা লইয়া সর্বদা আমোদেই আছে। খাবার অবকাশ নাই — শোবার অবকাশ নাই — বাটীর ভিতর যাইবার জন্য চাকর ডাকিতে আসিলে, অম্‌নি বলে— যা বেটা যা, আমরা যাব না । ... ক্রমে ক্রমে পাড়ার হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া— উনপাজুরে—বরাঘুরে ছোঁড়ারা জুটিতে আরম্ভ হইল। দিবারাত্রি হট্টগোল — বৈঠকখানায় কানপাতা ভার — কেবল হো হো শব্দ— হাসির ছররা ও তামাক চরস গাঁজার ছররা, ধোঁয়াতে অন্ধকার হইতে লাগিল। কার সাধ্য সে দিক দিয়া যায়— কার বাপের সাধ্য যে মানা করে।'[২২]

নতুন স্কুলে মতিলালের শিক্ষা কিছুই হয়নি, উপরন্তু স্কুল পালিয়ে জুয়া খেলতে গিয়ে সে পুলিশ কর্তৃক 'বেনিগারদে' চালান হল। ধরা পড়ার সময় তার সামান্য অনুতাপ হয়েছিল বটে কিন্তু 'বেনিগারদে যাওয়াতে তাহার কিছুমাত্র ভাবনা বা ভয় বা অপমানবোধ হয় নাই।'[২৩] মতিলালের গারদে আটক হবার পর অনুসন্ধানে বাবুরামবাবুর সামনে উঠে এল এ তথ্য যে, সে মাঝে মাঝে বাড়িতে এসে মায়ের কাছ থেকে নানাপ্রকার ছল করে টাকা নিয়ে যেত। বেচারামবাবুর সাক্ষাতে জানা গেল, রাত্রে ঠাকুর ঘরে গিয়ে মতিলাল 'বোতল বোতল মদ খায়', চরস-গাঁজার ধোঁয়াতে কড়িকাঠ কালো করে তুলেছে, রূপা ও সোনার জিনিস চুরি করে বিক্রি করেছে, আবার শালগ্রাম শিলা পুড়িয়ে চুন করে পানের সঙ্গে খাবে বলেছে। এককথায় গুণধর মতিলালের গুণের শেষ নেই।

তবুও ঠকচাচার ব্যবস্থাপনায় শেষপর্যন্ত মতিলাল মিথ্যা সাক্ষ্যের সাহায্যে বেকসুর খালাস পেল। বাবুরামবাবু তার অধিক বিদ্যালাভের আশা পরিত্যাগ করে মতিলালকে বৈদ্যবাটীতেই ফিরিয়ে আনলেন। বাড়ি ফিরে এসেও মতিলালের স্বভাব বদলাল না। কলকাতার দিনগুলিতে তার কুকর্মের যত সহযোগী হলধর, গদাধর, রামগোবিন্দ, দোলগোবিন্দ ও মানগোবিন্দ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বৈদ্যবাটীতে এসে জুটল। এইসঙ্গে স্থানীয় সমমনস্ক বখাটে ইয়ার কেবলরাম, বাঞ্ছারাম, ভজকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, শ্রীদাম, সুবলের

দলও এসে ভিড়ল। প্রথম প্রথম প্রাচীর টপকে সে কুকর্ম করে বেড়াত, ক্রমে মরিয়া হয়ে উঠে নানারকম 'অভদ্র অসৎ কর্ম' করতে আরম্ভ করল। তার মনের গোপন ইচ্ছা,— বাবুরামবাবু একবার চোখ বুজলেই 'মনের সাধে বাবুয়ানা' করা। বাপ-মা'র কাছে সে নানারকম ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করত। কাজকর্মে কিছুই নাই,—

'মতিলাল ধুমধামে সর্বদাই ব্যস্ত— বাটিতে তিলার্ধ থাকে না। কখনও বনভোজনে মত্ত— কখন যাত্রার দলে আকড়া দিতে আসক্ত— কখনও পাঁচালির দল করিতেছে— কখন সংকর দলের কবিওয়ালাদিগের সঙ্গে দেওরা করিয়া চেঁচাইতেছে— কখন বারোয়ারী পূজার জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতেছে— কখনও খেমটার নাচ দেখিতে বসিয়া গিয়াছে— কখন অনর্থক মারপিট, দাঙ্গা হাঙ্গামে উন্মত্ত আছে। নিকটে সিদ্ধি, চরস, গাঁজা, গুলি, মদ অনবরত চলিতেছে— গুড়ুক্ পালাই পালাই ডাক ছাড়িতেছে। বাবুরা সর্বদা ফিটফাট— মাথায় ঝাঁকড়া চুল, দাঁতে সিসি, সিপাই পেড়ে ঢাকাই ধুতি পরা বুটোদার এক্‌লাই ও গাজের মেরজাই গায়ে, মাথায় জরির তাজ, হাতে আজব ভুরভুরে রেশমের হাত রুমাল ও এক এক ছড়ি, পায়ে রূপার বগলসওয়ালা ইংরাজী জুতা। ভাত খাইবার অবকাশ নাই কিন্তু খাস্তার কচুরি, খাসা গোল্লা, বরফি, নিখুঁতি, মনোহরা ও গোলাবি খিলি সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে।'[২৪]

মতিলাল নববাবুত্বের এক নিখুঁত Identification । এই সময় কলকাতায় নব্যবাবুদের কাল শুরু হয়ে গেছে। নববাবুদের বাবুয়ানার কাল অস্তমিত, পরিধি সীমিত। কিন্তু কলকাতার অনতিদূরে মফস্সলের কিংবা আধা-গ্রামে নববাবুরা দেখা দিচ্ছেন। শহর কলকাতার ছেড়ে যাওয়া জীর্ণ বাস তাঁদের পরনে। কলকাতার বাবু কালচার তখন ঢুকে পড়ছে মফস্সলের ভুঁইফোঁড় 'হঠাৎ নবাব'দের মধ্যে। কলকাতার বাবুদের আনুষঙ্গিক দোষত্রুটিগুলিও নির্বিচারে দেখা দিতে শুরু করেছে এই 'হঠাৎ নবাব'দের মধ্যে। মতিলাল ও তার মোসাহেব সঙ্গীরা রাস্তা দিয়ে যাওয়া জেনানার পালকি আটকে তাঁর সম্ভ্রমহানি করার চেষ্টা করেছে। অবশ্য মতিলালের মা'র কারণে কন্যাটি রক্ষা পেয়েছে। বাবুদের এভাবে পালকি আটকানো, ডাকাতি ও শ্লীলতাহানি প্রায়শই ঘটত। ১৮২৫ সালের ৯ জুলাই 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান বাবু পীতাম্বর ঘোষ এভাবেই শ্লীলতাহানির অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছেন।[২৫] অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ জাতীয় অপরাধ অত্যাচারিতা সমাজের ভয়ে মুখ বুজে মেনে নিতেন বা নীরব থাকতেন, অতএব বাবুরা সেই সুযোগে এরূপ অপকর্ম করতেন আরও। প্যারীচাঁদ এই জাতীয় কোনো ঘটনার স্মৃতিতে মতিলাল চরিত্রে এই প্রকারের ঘটনা যুক্ত করেছেন।

এহেন মতিলালের বিবাহ হয়েছে মণিরামপুরের দাঙ্গাবাজ মাধববাবুর কন্যার সঙ্গে। তবে পারিষদবর্গের সান্নিধ্যে মতির স্বভাবের বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। কারণ, ''বেলেল্লা ছোঁড়াদের আয়েসে আশ মেটে না, প্রতিদিন তাহাদের নূতন নূতন টাটকা টাটকা রং চাই।'[২৬] তাদের আমোদপ্রমোদের জ্বালায় সাধারণ গৃহস্থ থেকে ব্রজনাথ কবিরাজ কেউ নিস্তার পাননি। ইতিমধ্যে মতিলালের পিতা বাবুরামবাবু বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেছেন এবং অনতিকালের মধ্যে রোগভোগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে প্রিয় পুত্র মতিলালকে সর্বদা খুঁজলেও 'মতিলালের চুলের টিকি দেখা ভার, তিনি আপন দলবল লইয়া বাগানে বনভোজনে মত্ত আছেন, বাপের পীড়ার সম্বাদ শুনেও শুনেন না। বেণীবাবু এই ব্যবহার দেখিয়া বাগানে তাহার নিকট লোক পাঠাইলেন কিন্তু মতিলাল মিছামিছি বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমার অতিশয় মাথা ধরিয়াছে কিছুকাল পরে বাটীতে যাইব।'[২৭]

বাবুরামবাবুর মৃত্যুর পর মতিলাল বাটীতে 'গদিয়ান' হয়ে বসল। কুকর্মের সঙ্গীদের পরামর্শে মা, বিমাতা, ভাই, বোন প্রভৃতির হাতে যাতে টাকাকড়ি পড়তে না পায়, তার ব্যবস্থা করল। বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচার মতো ধুরন্ধর পারিষদের কুমন্ত্রণায় ধারকর্জ করে বিপুল ব্যয়ে পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান আয়োজন করেছে সে। যদিও নানান গণ্ডগোলে সে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ভূতের কেত্তন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতঃপর মতিলাল অসৎ সঙ্গীদের পরামর্শে বাবুয়ানার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে :

'যে লোকের ভিতরে সার থাকে সে লোক উচ্চপদ অথবা বিভব পাইলেও হেলে দোলে না, কিন্তু যাহাতে কিছু পদার্থ নাই, তাহার অবস্থার উন্নতি হইলে বানের জলের ন্যায় টলমল করিতে থাকে। মতিলালের মনের গতি সেইরূপ হইতে লাগিল। রাত দিন খেলাধূলা, গোলমাল, গাওন বাজনা, হো হো হাসি খুশি, আমোদ প্রমোদ, মোয়াফেল, চোহেল, স্রোতের ন্যায় অবিশ্রান্ত চলিতে আরম্ভ হইল, সঙ্গীদিগের সংখ্যায় হ্রাস নাই— রোজ রোজ রক্তবীজের ন্যায় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ... আয় ব্যয়ের কিছু নিকেশ প্রকাশ নাই— পরিবারের ও দেখাশুনা নাই— কে কোথায় থাকে— কে কোথায় খায়— কিছুই খোঁজ খবর নাই ... কিন্তু মতিলাল বাবুয়ানায় এমতো বেহুঁশ যে এসব কথা শুনিয়েও শুনে না।' [২৮]

ইতিমধ্যে সে মায়ের গায়ে হাত তুলেছে, মা কন্যাকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন; সঙ্গীদের কুমন্ত্রণায় রামলালকে বাড়ি ঢুকতে বারণ করে দিয়েছে এবং এভাবে 'নিষ্কণ্টক' হয়ে 'বাবুয়ানা'র নানান ফন্দিফিকির খুঁজে ফিরেছে। আয়-ব্যয়ের ঠিক-ঠিকানা না রাখায় তার অর্থের অপ্রতুলতা দেখা দিয়েছে। অথচ বাবুয়ানা না করলেই নয়। 'স্নানযাত্রা'র মরশুমে 'বজরা ভাড়া করিতে আছে— খেমটাওয়ালীদের বায়না দিতে আছে— সন্দেশ মিঠাইয়ের ফরমাইশ দিতে আছে— চরস, গাঁজা ও মদও আনাইতে হইবে',[২৯] কিন্তু সে সবের জোগাড় করা ভার। কেউ আর তাকে ধার দিতে চায় না। 'স্নানযাত্রা'র এই বিলাসিতা ছিল নববাবুদের মজ্জাগত। ধর্মকে সামনে রেখে নানরকম অনাচার, দুষ্কর্ম ও জঘন্য অনুষ্ঠানে মত্ত হওয়াই ছিল বাবুদের আসল উদ্দেশ্য। স্নানযাত্রার সমারোহে বাবুদের বাবুত্বের মাত্রা নির্ণীত হত, ফলে 'যাঁহার যাহাতে মনোরঞ্জন হয় তিনি তাহার মত দ্রব্যাদি এবং লোক লইয়া যান কেহ কেহ গায়ক গুণী কেহবা বেশ্যা কেহবা ভাঁড় কেহবা বাই লইয়া বজরা অথবা পিনীষ কিম্বা কয়াটর ভাউলে পানসী ডিঙ্গী এবং জেলে ডিঙ্গী প্রভৃতি যাহার যেমত শক্তি তাহাই ভাড়া' করে [২৯] যান। হুতোমের আমলে দেখা যায় যে, নববাবুদের কাল বিগত হলেও বাবুয়ানায় অভ্যস্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত শ্রেণি 'বাবুয়ানা'র অন্যতম অঙ্গ হিসাবে 'স্নানযাত্রা'কে মান্যতা দিচ্ছেন।[৩০] সেরুড কোম্পানির মেট মিস্ত্রী গুরুদাস গুঁই পাঁচ ইয়ারের পরামর্শে স্নানযাত্রার আয়োজন হিসাবে বজরা ভাড়া করা, আতর ইত্যাদি সংগ্রহ, রম-গাঁজার জোগাড় করেছেন কোনোপ্রকারে। কিন্তু মেয়েমানুষ জোগাড় করার আর অর্থ না থাকায় শেষপর্যন্ত নিজের বিধবা পিসিকে বুঝিয়ে সুজিয়ে সঙ্গে নিয়ে চললেন এবং 'নৌকোর ইয়াররা গুরুদাসকে মেয়েমানুষ নিয়ে আসতে দেখে হুর্‌রে ও হরিবোল ধ্বনি দিয়ে বাঁয়ায় দামামার ধ্বনি কত্তে লাগলো'[৩১]। যদিও হুতোম স্পষ্ট বলেছেন :

'পূর্ব্বে স্নানযাত্রার বড় ধুম ছিল— বড় বড় বাবুরা পিনেস, কলের জাহাজ, বোট ও বজরা ভাড়া করে মাহেশে যেতেন, গঙ্গায় বাচ খ্যালা হত, স্নানযাত্রার পর রাত্তির ধরে খ্যামটা ও বাইয়ের হাট ল্যেগে য্যেতো। কিন্তু এখন আর সে আমোদ নাই— সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই— কেবল ছুতর, কাঁশারি, কামার ও গন্ধবেণে মশাইরাই যা রেখেছেন, মধ্যে মধ্যে দু চার ঢাকা অঞ্চলের জমিদারও স্নানযাত্রার মান রেখে থাকেন, কোন কোন ছোকরা গোছের নতুন বাবুরাও স্নানযাত্রায় আমোদ করেন বটে।'[৩২]

নতুন রুচি, নতুন শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত 'ভদ্রলোক'বাবুরা আর স্নানযাত্রার দিকে ঝুঁকতেন না সহজে, কিন্তু খোদ 'বাবুত্ব'ই তখন নতুন শ্রেণিকে আশ্রয় করে সম্প্রসারিত হয়েছে। অভিজাত বিত্তপতি শ্রেণি কিম্বা মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক' শ্রেণী আর তার পৃষ্ঠপোষক নন, নতুন যুগের 'বাবুয়ানা' সামাজিক কাঠামোয় অধোশ্রেণির কুক্ষিগত এবং তারই অনুষঙ্গ হিসেবে গুরুদাস গুঁইয়ের অর্থাৎ ছুতোর, কামার, কাঁশারি, গন্ধবণিকের দল 'স্নানযাত্রা'র ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছেন। যদিও ইংরেজি শিক্ষিত নব্যবাবু এবং কিছু মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুরাও যে এর মধ্যে সামিল হতেন, হুতোম তাও জানিয়েছেন।[৩৩]

স্বল্পসময়ে বিপুল অর্থলাভের বাসনায় মতিলাল অতঃপর বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচার পরামর্শে বিলেত থেকে সম্প্রতি আগত জনৈক জান সাহেবের মুৎসুদ্দি হয়ে 'সৌদাগরি কর্মে' রত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জান সাহেব কর্পদকশূন্য সাহেব। তাঁর মূলধন কিছু নেই, ব্যাবসার 'ব'ও জানেন না, কলকাতার অভিজাত মহলে সহজে তাই কল্কে পান না। মতিলালকে এজেন্ট নিযুক্ত করে তিনি আমদানি-রপ্তানির ব্যাবসা চালু করতে চান। এই সময় অবশ্য কলকাতায় এজেন্সি হাউস সংখ্যায় যেমন বেড়েছে, তেমনি প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে কেউ কেউ ক্ষতিগ্রস্তও হচ্ছেন। সেকালে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা যে সকল দেশীয় ব্যক্তি বা ধনাঢ্য কৃষ্ণাঙ্গ দেশীয় ব্যবসায়ীর প্রতিনিধির মাধ্যমে এখানে ব্যাবসা করতেন, তাঁদের বলা হত 'বেনিয়ান'। এই বেনিয়ান'রা 'দোভাষী, হিসাবরক্ষক, প্রধান সচিব, প্রধান দালাল, মূলধন সরবরহকারী ও মূলধন রক্ষক এবং সাধারণভাবে গোপনীয়তা রক্ষাকারী।'[৩৪] অযোগ্য হলে, দূরদর্শী না হলে এজেন্সি হাউসগুলি অচিরেই ব্যাবসায় লালবাতি জ্বালত। তা ছাড়া, প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির ফলে ১৮৩০ থেকে ১৮৩৪-এর মধ্যে পামার অ্যান্ড কোং, আলেকজান্ডার অ্যান্ড কোং, ম্যাকিন্টস, কলভিন, ফারগুসন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত ও নামি কোম্পানিগুলি হয় ব্যাবসা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়, নতুবা ব্যাবসার ক্ষেত্র সংকুচিত করে ফেলে।[৩৫] ফলে অপদার্থ ও অযোগ্য 'বেনিয়ান' মতিলালের হাতে পড়ে কর্পদকহীন জান সাহেবের কোম্পানি ও বিত্তলাভের স্বপ্ন অচিরেই মুখ থুবড়ে পড়েছে।

মতিলাল অশিক্ষিত, অপদার্থ; ফলে হিসাবরক্ষকের যে দায়িত্ব বেনিয়ান হিসাবে তার পালন করার কথা, তা করতে সে অপারগ। উপরন্তু হিসাবের খাতার মর্মোদ্ধার করতে না পেরে তার কাগজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে মতিলাল ও তার দলবল কান খোঁচানোর কাজে লাগিয়েছে। এই সুযোগে ঠকচাচা ও বাঞ্ছারাম নানাপ্রকার 'ফন্দিফিকির' করে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েছে। মতিলালের সেদিকে নজর দেবার সময় নেই। সে এসে উঠেছে সোনাগাছিতে। সেখানে ইয়ারবকশি সঙ্গে নিয়ে সে বাবুয়ানার চূড়ান্ত করেছে :

'তামাক মুহুর্মুহুঃ আসিতেছে — ধূঁয়া কলের জাহাজের ন্যায় নির্গত হইতেছে। চাকরেরা আর তামাক সাজিতে পারে না — পালাই পালাই ডাক ছাড়িতেছে। দিবারাত্রি নৃত্য, গীত, বাদ্য, হাসিখুসি, বড়ফাট্টাই, ভাঁড়ামো, নকল, ঠাট্টা বটকেরা, ভাবের গালাগালি, আমাদের ঠেলাঠেলি, চড়ুইভাতি, বনভোজন, নেশা একাদিক্রমে চলিয়াছে। যেন রাতারাতি মতিলাল হঠাৎ বাবু হইয়া উঠিয়াছেন।'[৩৬]

মতিলালের 'বাবুত্ব' প্রাপ্তি সম্পর্কে পাঠকের অবশ্য কোনো সংশয় থাকে না। তাকে 'হঠাৎবাবু' বলাও সংগত নয়। বাল্যকাল থেকেই তার স্বভাব, জীবনচর্যা, কুসঙ্গ ও কুঅভ্যাসের বশবর্তী হয়ে নানাপ্রকার অসামাজিক কার্যকলাপ, ভবানীচরণ কথিত নববাবুর 'নবধা' লক্ষণ আয়ত্ত করা— সব কিছুর মাধ্যমেই সে ক্রমে বাবুয়ানার চরমে পৌঁছেছে, আত্মধ্বংসের দিকেও।

তার বিষয়বুদ্ধি ছিল না মোটেই, কেবল ছিল আমোদ-উপভোগের প্রতি আসক্তি। অন্যদিকে সাহেবের অবস্থাও তদ্রূপ— 'যেমন সাহেব, ততোধিক তাহার মুৎসুদ্দি; তিনি গণ্ডমূর্খ— না তাঁহার লেখাপড়াই

বোধশোধ আছে— না বিষয়কর্মই বুঝিতে শুঝিতে পারেন। সুতরাং তাহাকে দিয়া কোনো কর্ম করানো কেবল  গো-বধ করা মাত্র।'[৩৭] অতএব ঠকচাচা ও বাঞ্ছারাম এই সুযোগে তহবিল তছরুপ, হাওলা নিয়ে ধারকর্জ করে দুই-এক বছরের ভিতরেই ব্যাবসা লাটে তুলে দিয়ে বেপাত্তা হয়েছে। অন্যদিকে পাওনাদার ও মহাজনের তাগাদায়, জেলে যাওয়ার ভয়ে ছদ্মবেশে মতিলালকে বৈদ্যবাটী পালিয়ে আসতে হয়েছে। ইতিমধ্যে কাগজ জাল করার অপরাধে ঠকচাচা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে এবং অপরাধ প্রমাণ হওয়ায় ' যাবজ্জীবনে'র সাজা পেয়েছে। বাবুয়ানার জন্য অর্থপ্রাপ্তির শেষ উপায় হিসাবে সদলবলে মতিলাল যশোরের জমিদারিতে এসেছে এবং প্রজাদের 'সেলামি'র অর্থ পাওয়ায় প্রাথমিকভাবে সে খুশি হয়েছে। কিন্তু গণ্ডমূর্খ, বিষয়-অনভিজ্ঞ, অমিতাচারী মতিলাল সেখানেও আমোদ-আহ্লাদে মত্ত থাকায় নায়েবের চক্রান্তে তার সে জমিদারিও গেছে। অন্যদিকে তার স্ত্রী ও বিমাতাকে গৃহচ্যুত করে তার ভদ্রাসন ও বিষয়-আশয় কৌশলে বাঞ্ছারাম দেনাবাকির দায়ে দখল করেছে। ভগ্নমনোরথ মতিলাল সব হারিয়ে যশোহর থেকে বারাণসীতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সুসময়ের সঙ্গীরা তার এই দুঃসময়ে বেগতিক দেখে চম্পট দিয়েছে। এরপর নীতিগল্পের ধাঁচে মতিলালের অনুতাপ ও চিত্তশুদ্ধি, বরদাপ্রসাদবাবুর আনুকূল্যে ভাই রামলাল, মা, ভগ্নীর সঙ্গে পুনর্মিলন,  বৈদ্যবাটীতে ফিরে পুনরায় নিজ সম্পত্তি কিনে নিয়ে পরিবারের সকলকে নিয়ে সুখে কালযাপন করা। বাস্তবে  যদিও এত সহজে বাবুদের চিত্তশুদ্ধি সম্ভব ছিল না।

প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' বাস্তবিক উপন্যাস, নকশা নয়। উপন্যাসের সর্বাংশ জুড়ে আছে 'বাবু' মতিলাল। তার জীবন বিকাশের প্রতিটি পদক্ষেপের সুচারু চিত্র এঁকে লেখক ধরে দিতে চেয়েছেন বাবুত্ব অর্জনের আর্থ-সামাজিক, সেইসঙ্গে পারিবারিক কারণগুলিকে। সাধারণভাবে এ কেবল এক মতিলালের কথা হলেও, আসলে সে যুগের 'বাবুজন্ম অভিলাসী' অসংখ্য মতিলাল হয়ে ওঠার ইতিহাস। কেবল বিত্তপতিদের ঘরে জন্মালেই 'বাবুত্ব' অর্জিত হয় না, 'বাবুত্ব' আসলে কোনো আচার-আচরণগত অর্জন নয়, এ হল একপ্রকার মানসিক অধ্যাস। একই বিত্তবান পিতার পুত্র হয়েও রামলাল ভদ্র শিক্ষিত মান্যবাবু হয়ে উঠেছে, কিন্তু মতিলাল তার মানসিক অধ্যাসের ভিন্নধর্মী গঠনের জন্য নিন্দিত 'নববাবু'তে পরিণত হয়েছে। অতএব বিত্তই যে বাবুত্বের একমাত্র কারণ, এই অতি সরলীকরণের তত্ত্বে বিশ্বাস রাখতে পারেননি লেখক।

ছলে-বলে-কৌশলে ইংরেজ বাংলার প্রভু হয়ে ওঠার পর একশ্রেণির ভুঁইফোঁড় মানুষ নানান কার্যকারণসূত্রে তাদের সান্নিধ্যে আসেন এবং অচিরেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। এঁদের মধ্যে আবার যাঁরা বিত্তে ও ক্ষমতায় অগ্রগণ্য ছিলেন, কলকাতার বিমিশ্র নতুন সমাজকাঠামোয় তাঁরা পরিগণিত হলেন সমাজপতি হিসাবে। আদিবাবু এঁদের মধ্যে কেউ কেউ। এঁরা অপরিমেয় বিত্ত অর্জন করেছিলেন যেমন, তেমনি দানধ্যান-আড়ম্বরে অকাতরে সেই বিত্তের একাংশ ব্যয়ও করেছিলেন। কিন্তু এঁদের সেই ব্যয় আসলে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের বাসনায় লগ্নীকৃত মূলধন। যে আদিবাবু যত বেশি মূলধন বিনিয়োগ করতে পারতেন, তাঁর সামাজিক খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার পারদ তত ঊর্ধ্বমুখী হবে। বিমিশ্র নাগরিক জীবনে যে আদিবাবুর যত বেশি খ্যাতি ও প্রভাব, ইংরেজ-প্রভুদের সঙ্গে ব্যাবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে তাঁর তত বেশি গুরুত্ব ও সমাদর। এবং এই গুরুত্ব ও সমাদর যত বেশি হবে, তত বেশি অর্থ ফিরে আসবে নিয়োজিত মূলধনের দ্বিগুণ-তিনগুণ হয়ে। অতএব আদিবাবুদের আড়ম্বর প্রদর্শন বা উৎকট পারস্পরিক প্রতিযোগিতা নিছক ব্যক্তিগত অহংবোধের পরিতৃপ্তির কারণে নয়, একইসঙ্গে কৌশলী বিনিয়োগও। সে

কারণে আদিবাবুদের আড়ম্বরের আতিশয্য যতই উৎকট বা গ্রাম্য হোক না কেন, অশালীন ছিল না। সামাজিক প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য একদিকে তাঁর বংশগত কৌলীন্য, সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদিকে যেমন মান্যতা দিয়ে চলতেন, তেমনি ব্যাবসায়িক কারণে ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কখনো কখনো আপোষ-রক্ষার নীতিও নিতে হত তাঁদের। আড়ম্বর প্রদর্শন এবং নিয়ন্ত্রিত ও সতর্ক বিলাসিতার পাশাপাশি আদিবাবুদের একটা সময় ব্যয়িত হত অর্থ-বিত্ত ও ব্যাবসার চিন্তায়। নবকৃষ্ণ কিংবা রামদুলাল দে'র মতো আদিবাবুরা ছিলেন অক্লান্তকর্মা, ব্যাবসায়িক কূটবুদ্ধিসম্পন্ন, নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের প্রতীক। এঁরা উঠে এসেছিলেন প্রায় কর্পদকহীন অবস্থা থেকে, হয়ে উঠেছিলেন কলকাতার আদিবাবুদের মধ্যে অগ্রগণ্য। ফলে আদিবাবুদের জীবনে বৈষয়িক কর্ম ও বিলাসিতার মধ্যে একপ্রকার মাত্রাসমতা ছিল। ভবানীচরণ 'কলিকাতা কমলালয়ে' বিষয়ী ভদ্রলোকের মধ্যে যাঁরা 'প্রধান কর্ম্ম' তথা দেওয়ানি বা মুতসুদ্দিগিরি করে থাকেন তাঁদের জীবনযাপনের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে এই মাত্রাসমতারই পরিচয় মেলে।[৩৮]

কিন্তু নববাবুদের ক্ষেত্রে বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। পিতৃ-পিতামহের যথেষ্ট সঞ্চিত ধন থাকায় এঁদের অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে ব্যাবসাবাণিজ্য বা বৈষয়িক কর্মে নিযুক্ত হতেন না। ফলত, এঁদের জীবনটা ছিল অলস, মন্থর।[৩৯] আদিবাবুদের সংস্কার গড়ে উঠেছিল দেশীয় সমাজ-সংস্কৃতির পুরাতন কাঠামোর মধ্যে; কিন্তু নববাবুদের ক্ষেত্রে পুরাতন ও নতুনের একটা দ্বিধাবিভক্ত মিশ্রণ দেখা দেয়। তাঁদের শিক্ষাও তাই পুরাতন আরবি-ফারসি সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে অর্থকরী নতুন ইংরেজি ভাষার বিমিশ্রিত রূপ। যেহেতু অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান এবং সামাজিক বংশগত প্রতিষ্ঠা নিয়ে তাঁদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়নি, বিষয়কর্মে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হতে হয়নি কিংবা ওইরূপ মানসিকতা তাঁদের ছিল না, ফলে এঁরা উদ্দাম-আয়েশি জীবনযাপনে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। দেশীয় রীতিনীতি বা সংস্কারের প্রতি এঁদের বিশ্বাসের ভিত তেমন শক্তপোক্ত ছিল না, বিজাতীয় সংস্কৃতির দ্বিধাহীন পরিগ্রহণেও এঁরা অপারগ ছিলেন। ফলে ত্রিশঙ্কুর মতো এঁরা উভয় সংস্কৃতির কিছু সহজতর, রুচিহীন অভ্যাসকেই মান্য করলেন। কাজ চালানো গোছের ইংরেজি শিক্ষাও অনেকের হল না, বা বলা ভালো, মতিলালের মতো সে-শিক্ষার তাগিদ তাঁরা অনুভব করলেন না। ব্যাঙের ছাতার মতো সেইসময় গজিয়ে উঠছে ইংরেজি শিক্ষার স্কুল। ১৮৫০ সালের মধ্যেই কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই বেসরকারি স্কুলের সংখ্যা ৬০-এরও বেশি।[৪০] গৌরমোহন আঢ্যির ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, রামমোহন রায়ের ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল রীতিমত পাল্লা দিচ্ছে হিন্দু স্কুলের সঙ্গে। কিন্তু কারা পড়তেন এইসব স্কুলে? তথ্য পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সন্তানেরাই এইসব স্কুলের দিকে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। কারণ, নাগরিক কলকাতায় এই শ্রেণি তখনও অর্জিত আভিজাত্যের আওতাভুক্ত হননি। বিত্ত অর্জনের চেয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠা তাঁদের লক্ষ্য। অতএব ইংরেজ-ঘনিষ্ঠ হওয়ার তাগিদে, সেইসঙ্গে সরকারি কর্মে নিযুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তাঁরা ভিড় জমিয়েছেন এইসব ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার ছত্রছায়ায়। মতিলালের পিতা বাবুরামবাবুর মতো অনেকেরই মনের কথা— 'ফার্সীর চলন উঠিয়া যাইতেছে, এখন ইংরাজী পড়ানো ভালো।'[৪১] নববাবুদের স্বভাবমতো মতিলাল অবশ্য কোনো শিক্ষার প্রতিই আগ্রহী ছিল না। তা ছাড়া বেসরকারি ইংরেজি শিক্ষার স্কুলগুলির পড়াশোনার মান ও পরিবেশ কেমন ছিল, কারাই বা কেমনভাবে পড়াতেন, কালুস সাহেবের স্কুলে মতিলালের শিক্ষার চিত্রে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। কতকগুলি বিলিতি রকমের রুচিহীন আমোদপ্রমোদ ও কুশিক্ষা সঙ্গে করে মতিলালের মতো

নববাবুরা অকালেই পেকে উঠতেন। বিলিতি মদ্যপান ও অন্যান্য নেশার দ্রব্য গ্রহণ, তৎকালের বিচারে বিজাতীয় খাদ্যাদি ভক্ষণ— এসবকেই নববাবুরা মান্যতা দিলেন। পূর্বতন সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাবোধ ছিল না; নতুন সংস্কৃতির পরিগ্রহণেও তাঁরা অক্ষম ছিলেন। অতএব চরিত্রের উন্মার্গগামী শিথিল স্বভাবের অনুকূল বলে সাধারণ কিছু লক্ষণকেই আসক্তি বশে গ্রহণ করলেন। মতিলালের মতো নববাবুরা এই মানসিকতার উপজাত।

পাশাপাশি হিন্দু সামাজিক সংস্কার ও পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রশ্রয়ও মতিলালের মতো যুবকদের 'বাবুত্বে'র নরকে পৌঁছে দিয়েছে। বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র হওয়ায় বাল্যকাল থেকেই নানাপ্রকার অপকর্ম ও দুষ্টুমি করা সত্ত্বেও মতিলাল পিতা-মাতার সস্নেহ প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে। হিন্দু সংস্কার অনুযায়ী অগ্রজ পুত্র পারলৌকিক সংস্কার পালন না করলে স্বর্গসুখ থেকে বঞ্চিত হবেন পিতা-মাতা। পাছে শাসন করলে অপমৃত্যু বা অন্য কোনো কারণে পুত্রের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে এবং স্বর্গসুখ অনায়ত্ত থেকে যায়, অতএব পিতা-মাতা পুত্রের যাবতীয় দুষ্কার্যের পরও তাকে সমর্থনের ব্যাপারে ছিলেন মুক্তহস্ত। ফলে মতিলালের মতো বাবুরা যে কোনোপ্রকার দুষ্কার্য করার ব্যাপারে বিবেকের প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত হয় না; কোনোপ্রকার অনুতাপের আগুন দগ্ধ করতে পারে না তাদের। স্বকৃতকর্মকে 'যথাযথ' ভাবারও একটা শিক্ষা তারা অর্জন করে পারিবারিক এই প্রশ্রয়ের ছায়ায়। মতিলাল তো আসলে এক প্রতীক; যে যে কারণে সে 'বাবুত্ব' অর্জন করে ক্রমশ 'ফুলবাবু'তে রূপান্তরিত হয়েছে, সেই একই কারণে সেদিন বিত্তবানদের ঘরে ঘরে অনেক নববাবু 'হয়ে' উঠছেন। মতিলালের পরস্ত্রী- হরণের প্রসঙ্গটি অতি সংক্ষেপে সেরেছেন প্যারীচাঁদ, তার সোনাগাছিতে ব্যাবসার কারণে এসে ওঠা আমোদ- আহ্লাদের ইঙ্গিতময় বর্ণনায় বেশ্যা-সংসর্গের ব্যাপারটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে। সম্ভবত, মহিলা ও সাধারণ পাঠকের জন্য প্রকাশিত পত্রিকার জন্য রচিত বলে, রুচিবিহর্গিত ও অনৈতিক বিধায়ে লেখক এই প্রসঙ্গ বিস্তারিত করেননি। কিন্তু তাঁর ইঙ্গিতের মধ্য দিয়েই মতিলালের অধঃপতন স্পষ্ট হয়েছে। উপন্যাসের অন্তিমে তার চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়ে লেখক মধুরেন সমাপয়েৎ করেছেন বটে, কিন্তু বাস্তব এত সুখের ছিলনা কখনই। নববাবুদের অমিতাচার ও বিষয়বুদ্ধিহীন নির্বিচার ব্যয়ের কারণে অনেক বিত্তবান বংশই অন্ধকারে তলিয়ে গেছেন। চরম সর্বনাশ ও দূরবস্থার মুখোমুখি হয়েও তাঁদের চিত্তশুদ্ধি ঘটেনি। দৃষ্টান্তস্বরূপ আশুতোষ দেবের (সাতুবাবু) কথাই বলা যায়। বুলবুল লড়াই, বিড়ালের বে', বেশ্যাবাজি, শখের যাত্রা ইত্যাদি করে পূর্বপুরুষের সঞ্চয়ীকৃত ধন নিমেষে উড়িয়ে দিয়েও তাঁর চিত্তবিকার ঘটেনি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের দুরবস্থা মোচনে 'হিন্দুমেলা'র কর্তৃপক্ষদের উদ্যোগী হয়ে অর্থসাহায্য করতে হয়।[৪২]

কিন্তু ১৮৫৫-তে এসে কেনই-বা বিগত নববাবুদের কথা লিখতে বসলেন প্যারীচাঁদ? কেবল কি গল্পের খাতিরে, বিশুদ্ধ অতীতচারিতার তাগিদে? সম্ভবত তা নয়। মনে রাখতে হবে, 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসের নায়ক নববাবু 'মতিলাল' কলকাতায় নয়, অদূর মফস্সল বৈদ্যবাটীতে তার লীলাখেলার চূড়ান্ত করেছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, নাগরিক কলকাতার 'বাবুত্ব' নামক উপসর্গে ক্রমশ আক্রান্ত হচ্ছে অনাগরিক বিত্তবান বাঙালিরাও। এই উপসর্গ আর 'বিশেষ' হয়ে থাকছে না, স্বচ্ছল বাঙালিমাত্রেই এ জাতীয় উপসর্গকে আপন করে নিচ্ছে বা তার লক্ষণ প্রকট হচ্ছে। এই রচনার কিছু পরেই হুতোম তার নকশায় গুরুদাস গুঁইয়ের চিত্র উপস্থাপন করে আমাদের এই বক্তব্যকে মান্যতা দিয়েছেন, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কুড়ি বছরের মধ্যেই 'বাবুয়ানা' যে বাঙালি চরিত্রের অঙ্গাঙ্গি উপাদানে পরিণত হয়েছে, একের পর

এক প্রকাশিত নকশাগুলিতে তার সুস্পষ্ট স্বীকৃতি মেলে। ফলে, আমাদের মনে হয়, প্যারীচাঁদ কোনো বিশেষ 'বাবু'র গল্প মতিলালের কাহিনিকে আশ্রয় করে বলতে চাননি। নিছক কোনো বাবুত্বের সাধারণ লক্ষণগুলি বলাও তাঁর উদ্দেশ্য নয়। আসলে তিনি রোগ নয়, রোগের উপসর্গগুলিকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, রোগ হওয়ার মূলগত কারণগুলিকে ধরতে চেয়েছেন। যে আর্থ-সামাজিক ও সংস্কারগত প্রেক্ষিতগুলি অসংখ্য 'বাবু'র জন্ম দিচ্ছিল এবং দিয়ে চলবে, সেগুলিকে চিহ্নিত করে তিনি সতর্ক-সচেতন করে দিতে চেয়েছিলেন আপামর বাঙালিকেই। প্যারীচাঁদ বাবুত্বের হয়ে ওঠার একটি Structure নির্মাণ করে দিয়েছেন। মহৎ ঔপন্যাসিকদের দু'টি গুণ– নিরাসক্তি (detachment) ও সহানুভূতি (sympathy)। প্যারীচাঁদ সহানুভূতিশীল ছিলেন, কিন্তু পুরোপুরি নিরাসক্ত হতে পারেননি। বাবুত্ব নামক উপসর্গ বাঙালির জাতীয় চরিত্রের পক্ষে হানিকারক, এই সত্যে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই, মনের মতো করে মতিলালের বিপরীতে রামলালের মতো শিক্ষিত, সুশীল 'ভদ্রলোক'বাবুর ছবিও উপস্থিত করেন। বস্তুত, মতিলাল যদি নববাবুদের উচ্ছিষ্ট হয়, রামলাল তবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম পদের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের প্রতিনিধি। সে নম্র, ভদ্র, শিক্ষিত, পরোপকারী। অবস্থাগতিকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তাকে নিজস্ব উদ্যোগেই উঠে দাঁড়াতে হয়েছে, প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে নিজের পরিচয়। এ যেন ইঙ্গিতে মধ্যশ্রেণির আত্মপ্রতিষ্ঠার রূপক। অর্থবিত্তহীন মধ্যবিত্তরা শিক্ষা ও শ্রমকে উপজীব্য করে যেমন করে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নিজস্ব শ্রেণি পরিচয়, রামলাল তাঁদেরই প্রতিনিধি।

অন্যদিকে মতিলালের পক্ষে তা অসম্ভব ছিল। বেণীবাবুর মুখ দিয়ে লেখক তার কারণ স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন :

'যে ব্যক্তি বাল্যকালাবধি সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় ও কখন বিপদে না পড়িয়া কেবল সম্পদেই বাড়িতে থাকে তাহার নম্রতা প্রায় হওয়া ভার— সে ব্যক্তি অন্যের মনের গতি বুঝিতে পারে না, অর্থাৎ কি বা পরের প্রিয়, কি বা পরের অপ্রিয়, তাহা তাহার কিছুমাত্র বোধ হয় না, কেবল আপন সুখে সর্বদা মত্ত থাকে— আপনাকে বড়ো দেখে ও তাহার আত্মীয়বর্গ প্রায় তাহাদের সম্পদেরই খাতির করিয়া থাকে। এমত অবস্থায় মনের গর্মি বড়ো ভয়ানক হইয়া উঠে— এমতো স্থলে নম্রতা ও দয়া কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। এই কারণে কলিকাতার বড়োমানুষের ছেলেরা প্রায় ভালো হয় না। একে বাপের বিষয়, তাতে ভারি ভারি পদ সুতরাং সকলের প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া বেড়ায়। চোট না খাইলে— বিপদে না পড়িলে মন স্থির হয় না। মানুষের নম্রতা অগ্রেই আবশ্যক।'[৪৩]

এই আপ্তবাক্য অনুসরণ করেই লেখক 'বিপদের মধ্যে ফেলে' মতিলালের চিত্ত-পরিবর্তন করেছেন। একইসঙ্গে রামলালের চরিত্র সহানুভূতির সঙ্গে উপস্থিত করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' মধ্যশ্রেণির প্রতি তাঁর নৈতিক সমর্থনের কথাটিও।

'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে মতিলাল ও রামলালের চরিত্র-বৈপরীত্যের ছবি এঁকে প্যারীচাঁদ তৎকালীন ভ্রান্ত শিক্ষার 'মডেল' বিষয়ে একটি বড়োসড়ো প্রশ্ন রেখেছিলেন। যে কারণে মতিলাল 'হঠাৎবাবু' হয়ে উঠে বাবুগিরির চূড়ান্ত করে সর্বস্বান্ত হলেন, তার কারণ যেমন পারিবারিক প্রশ্রয় ও সামাজিক সংস্কার, তেমনি কলকাতার বিলিতি স্কুলের ভ্রান্ত শিক্ষার মডেল ও শিক্ষণ-পদ্ধতিও দায়ী। অন্তত প্যারীচাঁদ বাঙালি 'এলিট' মধ্যবিত্ত হিসাবে বিলিতি শিক্ষার মডেলের পরিবর্তে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা এ-দেশীয় একটি ছাঁচকে যে মান্যতা দিচ্ছেন, তা গোপন থাকে না।

বরদাপ্রসাদবাবুর চরিত্রটি লেখকের এইপ্রকার মনোভাবের ফল বিশেষ। চরিত্রটি পরিকল্পনায় ব্রাহ্মবাবুদের প্রভাব থাকাই সম্ভব। প্রতিদিন প্রাতে উঠে পরমেশ্বরের নামগান করা, বিষয়কর্মের তদারকির ফাঁকে 'সৎগ্রন্থাদি পাঠ', নানান সামাজিক কাজে যোগদান, পরোপকার করা, সন্ধ্যার পর 'পরিবারের সহিত সদালাপ ও পড়াশুনা'— এই জীবনযাপন তৎকালীন ব্রাহ্মবাবুদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মনে রাখতে হবে, 'এলিট' মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুরা প্রথমত ব্রাহ্ম-বাবুদেরই উদ্দেশ্য করে ব্যবহৃত হত। 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনার সময় পর্যন্ত ব্রাহ্মবাবুরা গতানুগতিকতার চর্চায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েননি বা মানসিক ও চারিত্রিক অবক্ষয়ও দেখা দেয়নি। তাঁদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিকোণ তখন আপোশরফার, সহিষ্ণুতার। এহেন বরদাপ্রসাদবাবুর বাড়িতে থেকে তাঁর সান্নিধ্যে রামলালের শিক্ষালাভ এবং 'ফোতোবাবু' হয়ে ওঠার পরিবর্তে সৎ ও আদর্শবান মানুষের পরিণত হওয়ার আখ্যান বুনে প্রাচীন দেশীয় শিক্ষার ছাঁচটিকেই মান্যতা দিলেন প্যারীচাঁদ। লেখক স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেনঃ

'বরদাপ্রসাদবাবু বহুদর্শী ছিলেন— অনেক কালাবধি শিক্ষার বিষয়ে মনোযোগী থাকাতে শিক্ষা দেওনের প্রণালী ভালো জানিতেন, তিনি যে প্রকারে শিক্ষা করাইতেন তাহাতে সার শিক্ষা হইত। এক্ষণে সরকারী বিদালয়ে যে প্রকার শিক্ষা হয়, তাহাতে শিক্ষার আসল অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না কারণ মনের শক্তি ও মনের ভাবাদির সুন্দররূপ চালনা হয় না, ছাত্রেরা কেবল মুখস্থ করিতে শিখে। তাতে কেবল স্মরণশক্তি জাগরিত হয় — বিবেচনা শক্তি প্রায় নিদ্রিত থাকে, মনের ভাবাদির চালনার তো কথাই নাই। ... মনে সদ্ভাবাদির চালনা সমানরূপে করা আবশ্যক।'

মতিলালের ক্ষেত্রে এমনটাই হয়েছিল। কলকাতার সাহেবি স্কুলে মুখস্থ বিদ্যা আয়ত্ত করাবার চেষ্টা করা হলেও (যদিও সেই প্রক্রিয়াও ত্রুটিপূর্ণ, ভ্রান্ত), তার বিবেচনাশক্তি ও মনের ভাবকে সৎ আদর্শের প্রতি চালনা করা সম্ভব হয়নি। অতএব কলকাতার সাহেবি স্কুল থেকে মতিলাল বিন্দুমাত্র শিক্ষা অর্জন করেনি, তার মনোভাব তৈরি হয়নি, সদ্‌গুণ বিকশিত হয়নি। উপরন্তু বিচিত্র শহর কলকাতার দূষিত সামাজিক পরিবেশ থেকে সে কতকগুলি অসদ্‌গুণ আয়ত্ত করে 'বাবু' হয়ে উঠেছে। কিন্তু রামলালের ক্ষেত্রে তা হয়নি। বরদাপ্রসাদের ভিন্নতর শিক্ষার দ্বারা সে হয়ে উঠেছে হৃদয়বান, সৎ, স্বাভাবিক যথার্থ 'মানুষ'।

উনিশ শতকের তিনের দশক থেকেই যে মডেলটি 'এলিট'বাবুদের মান্যতা পাচ্ছিল, তার ধাঁচা ছিল বিদেশি। কিন্তু ছয়ের দশক থেকেই নিছক পাশ্চাত্য মডেলের পরিবর্তে প্রাচ্য-পাশচাত্যের মিশ্রিত মডেলটি ক্রমশ গৃহীত হতে থাকল। ইংরেজি শিক্ষার বর্জন নয়, কিন্তু দেশীয় শিক্ষাকেও সমান গুরুত্ব দানের বিষয়টি ভাবা হল। মনে রাখতে হবে, 'ফিমেল এডুকেশন' তখন চালু হয়ে গেছে; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, এক দশকের মধ্যেই যেখান থেকে 'গ্র্যাজুয়েট' ভদ্রলোক মধ্যশ্রেণি বেরিয়ে আসবেন এবং ক্রমশ পরিণত হবেন কেরানিবাবুতে, অতএব নববাবুদের ও নব্যবাবুদের তথাকথিত রুচিবিগর্হিত সংস্কৃতি ও জীবনদর্শন থেকে মুক্তির উপায় একমাত্র এই মিশ্র শিক্ষা, যা শুধু স্মরণশক্তি বাড়ায় না, বিবেচনাশক্তি ও মানসিক ভাববিকাশের বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে। অর্থাৎ পুরাতন বাবুতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্যারীচাঁদ দাঁড় করাচ্ছেন নতুন শিক্ষার মডেলটিকে, যার ধাঁচা থেকে উৎপন্ন হয়েছে রামলাল, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবু। অন্যদিকে কোনো সাহেব বা সরকারি স্কুলের সাহেবি মনোভাবাপন্ন কেউ নয়, বরদাপ্রসাদবাবুর মতো প্রাচ্য সংস্কৃতি ও শিক্ষায় আস্থাবান মানুষ তার 'মেনটর'। বোঝা যাচ্ছে, 'বাবু'কেন্দ্রিক আখ্যানের অন্তরালে দেশীয় ছাঁচে 'ভদ্রলোক' মধ্যশ্রেণি তথা নতুন যুগের 'বাবু' নির্মাণের

একটি প্রক্রিয়া চলছে। একইসঙ্গে কলকাতার পরিবেশ ও স্কুলগুলিকে আর নির্দ্বিধায় মান্যতা দিতে পারছেন না তাঁরা। নাগরিক জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি হয়তো তাঁদের অসহিষ্ণু করে তুলেছে। কলকাতার আকাশে-বাতাসে তখন যেন বিষ, যা নিমেষেই সম্মোহিত করে, প্রতারিত করে মফঃস্বল থেকে আসা যুবকদের, তারা 'বাবুয়ানা'র ফন্দিফিকির শিখে 'বাবু' হয়ে ওঠে।

এ কারণেই বোধ হয়, প্যারীচাঁদের পর বাংলা উপন্যাসকে ইতিহাস মিশ্রিত রোমান্স কল্পনার দিকে নিয়ে গেলেন যে বঙ্কিমচন্দ্র, সন্ধান দিলেন অন্যতর বাস্তবতার, তিনিই তাঁর প্রথম সামাজিক বিষয় নির্ভর উপন্যাস 'বিষবৃক্ষে'র (বৈশাখ ও ২৭৯ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত। পুস্তককারে প্রকাশ ১৮৭৩) 'বাবু' নামাঙ্কিত দশম পরিচ্ছেদে দেবেন্দ্র চরিত্রের উত্থাপনে কলকাতার রুচিগত আবহাওয়ার কথা তথা অবনমনের কথা প্রকারান্তরে নয়, সরাসরি বলেন :

'দেবেন্দ্র এক্ষণে স্বাধীন। কলিকাতার পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া দেবেন্দ্র অতৃপ্ত বিলাসতৃষ্ণা নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তজ্জনিত যে কিছু স্বচিত্তের অপ্রসাদ জন্মিত, তাহা ভুরি ভুরি সুরভিসিঞ্চনে ধৌত করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাহার আর আবশ্যকতা রহিল না— পাপেই চিত্তের প্রসাদ জন্মিতে লাগিল। কিছুকাল পরে বাবুগিরিতে বিলক্ষণ সুশিক্ষিত হইয়া দেবেন্দ্র দেশে ফিরিয়া আসিলেন, এবং তথায় নূতন উপবনগৃহে আপন আবাস সংস্থাপন করিয়া বাবুগিরিতে প্রবৃত্ত হইলেন।'[৪৫]

শ্রেণিগতভাবে দেবেন্দ্র নববাবু বা নব্যবাবু নন, তাঁর অবস্থান মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের দলে। দেবেন্দ্র বড়ো হয়েছেন দেবীপুরের নিঃশেষিত জমিদারির আবহাওয়ায়। পূর্বপুরুষের স্বোপার্জিত ধনসম্পত্তি যেহেতু আর বাকি ছিল না, অতএব জীবনধারণের প্রয়োজনেই লেখাপড়ায় তাঁকে বিশেষ যত্নবান হতে হয়েছে, তাঁর 'প্রকৃতিও সুধীর ও সত্যনিষ্ঠ ছিল' সেইসময়। কিন্তু এরপরই বৈবাহিক গোলযোগে ক্ষুব্ধ দেবেন্দ্রর কলকাতায় আগমন এবং পঞ্চ ম-কারের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে 'বাবু' হয়ে পড়া। বেশ্যাগমন, অপরিমিত মদ্যপান, নানারকম নেশার দ্রব্য গ্রহণ, চারিত্রিক শিথিলতা— এসমস্ত গুণ 'বাবু'র সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে তখন সমাজে নির্দিষ্ট এবং নিন্দিত। দেবেন্দ্রও এই গুণগুলি আয়ত্ত ও আচরণ করায় 'বাবু'ত্বে উপনীত। কিন্তু 'ত্রহো বাহ্য'। নতুন সামাজিক দৃষ্টিকোণে বাবুত্বের এলাকা আরো সম্প্রসারিত। বঙ্কিম স্বয়ং 'বাবু' নামক রম্য প্রবন্ধে সেই সম্প্রসারিত নতুন এলাকাগুলির পরিচয় দাখিল করেছেন।[৪৬]— 'কেরাণী, মাস্টার, ব্রাহ্ম, মুৎসুদ্দী, ডাক্তার, উকিল, হাকিম, জমিদার, সম্বাদপত্র সম্পাদক এবং নিষ্কর্ম্মা।' এই পরিচয়ের নিরিখেও দেবেন্দ্র 'বাবু', কারণ সে ব্রাহ্ম :

' কলিকাতা হইতে দেবেন্দ্র অনেক প্রকার ঢং শিখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি দেবীপুরে প্রত্যাগমন করিয়া রিফর্‌মর্‌ বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেন। প্রথমেই এক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত করিলেন। তারাচরণ প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্ম জুটিল; বক্তৃতার আর সীমা রহিল না। একটা ফিমেল স্কুলের জন্যও মধ্যে মধ্যে আড়ম্বর করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাজে বড় বেশী করিতে পারিলেন না। বিধবাবিবাহে বড় উৎসাহ। এমন কি, দুই চারিটা কাওরা তিওরের বিধবা মেয়ের বিবাহ দিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু সে বরকন্যার গুণে। জেনানারূপ কারাগারের শিকল ভাঙ্গার বিষয় তারাচরণের সঙ্গে তাঁহার এক মত— উভয়েই বলিতেন মেয়েদের বাহির কর। এ বিষয়ে দেবেন্দ্র বাবু বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন— কিন্তু সে বাহির করার অর্থবিশেষে।'[৪৭]

লক্ষণীয়, সে মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুরা নববাবুদের আত্মকেন্দ্রিক শিথিল জীবনযাপন কিংবা নব্যবাবুদের উন্নাসিক আত্মম্ভরিতা থেকে বাঙালিবাবু তথা শিক্ষিত পুরুষের চিন্তাকে দেশগঠনে, ধর্মীয় ও

সামাজিক সংস্কারে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে পৃথক মাত্রা দিতে চাইলেন, তাঁদের সিংহভাগ ছিলেন ব্রাহ্ম। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুরা এই প্রগতিশীল আচরণকে ভালো চোখে দেখলেন না। বরং স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ, ধর্মীয় উদারতার আচরণকে নিন্দনীয় ও অশাস্ত্রীয় বলে এ জাতীয় আচরণকারীদের ঠেলে দিলেন 'বাবু'দের দলে। মনে রাখতে হবে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বাবু মূলত দু'টি অর্থে অধিক ব্যবহৃত— ক. অভিজাত, সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত পুরুষের সম্বোধন হিসাবে, এবং খ. নির্দিষ্ট কিছু নিন্দনীয় আচরণ পালনকারীর শ্রেণিগত নীচতা বোঝাতে। ব্রাহ্মদের ধর্মীয় কৃত্যাদি ও সামাজিক আচরণসমূহকে দ্বিতীয় অর্থের সীমানা বন্দি করে তাঁদের শ্রেণিগত নীচতা প্রমাণ করতে চাইলেন উক্ত রক্ষণশীল গোষ্ঠী। অতএব 'রিফরমার' ব্রাহ্মদের 'রিফর্ম' করতে চাওয়ার দিকটি বাবুয়ানার অঙ্গ হিসাবেই বিবেচিত হতে থাকে এই সময় থেকে। ফলে 'বিষবৃক্ষে'র দেবেন্দ্রর মতো ব্রাহ্মবাবুরা নাটকে-প্রহসনে, কিছু সামাজিক নকশায়, উপন্যাসে নিন্দনীয় 'বাবু' অর্থেই ব্যবহৃত ও আলোচিত হতে থাকেন। যদিও দু'একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে সিরিয়াস উপন্যাসের কেন্দ্রাতিগ শক্তি হিসেবে সাধারণভাবেই 'বাবু'রা নিতান্ত অবহেলিত। নিছক ব্যঙ্গ কিংবা নিন্দনীয় হিসাবে উপস্থাপন করার প্রবণতা দেখা গেলেও নিরপেক্ষ সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন যুগের বাবু ও বাবুত্বের স্বরূপসন্ধানে উনিশ শতকের ঔপন্যাসিকেরা ব্যর্থ কিংবা উদ্যমহীন।

লক্ষণীয়, 'বিষবৃক্ষে'র অন্যতম প্রধান চরিত্র নগেন্দ্র, রক্তসম্পর্কে দেবেন্দ্রর খুড়তুতো ভাই হলেও, ব্রাহ্ম নয়। আর সে কারণেই বোধ হয় স্ত্রী বর্তমান থাকতেও বিধবা কুন্দনন্দিনীর প্রতি আসক্তি ও সম্পর্কস্থাপন সত্ত্বেও নগেন্দ্রর জন্য শেষপর্যন্ত অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্তের অবকাশ রাখা হয়, কিন্তু দেবেন্দ্রকে 'কদর্য্য রোগগ্রস্ত' হয়ে মরতে হয়। বঙ্কিমের অপর সামাজিক উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'ও (১৮৭৮) গোবিন্দলালের স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও বিধবা রমণীর প্রতি আসক্তি ও প্রেম, তাকে নিয়ে গৃহত্যাগ ও স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়ে বাস, মদ্যপান ও আনুষঙ্গিক ভোগবিলাস— এতৎসত্ত্বেও গোবিন্দলাল প্রায়শ্চিত্তের অবকাশ ও সুযোগ লাভ করেন। তবে গোবিন্দলালের স্বভাব ও আচরণ যে 'বাবু'দের স্বভাব ও আচরণের কথা মনে করিয়ে দেয়, তা অনস্বীকার্য। চারিত্রিক শৈথিল্য, আত্মকেন্দ্রিকতা, প্রকৃত ব্যক্তিত্বের অভাব, অবৈধ-অনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি মানসিক টান— অধিকাংশ উনিশ শতকীয় পুরুষদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। শিক্ষা-সংস্কৃতির হাত ধরে নূতন রুচি-মানসিকতার সম্মুখীন হয়েও একটি বৃহৎ অংশের 'ভদ্রলোক'বাবুদের মানসিক পরিশুদ্ধি ঘটেনি। নববাবু ও নব্যবাবুদের মানসিক গড়নের দোষ-গুণগুলি গোচরে-অগোচরে বহন করে চলেছিলেন তাঁরাও। নতুন ও পুরাতন মানস-সংস্কৃতির সংস্কার ও সম্মিলনের কালে বসে মনে হচ্ছে, 'বাবুত্ব' ক্রমশ বাঙালি পুরুষের সাধারণ চরিত্র বৈশিষ্ট্যে উন্নীত হতে চলেছে। দেবেন্দ্র, নগেন্দ্র, গোবিন্দলাল চরিত্রে সে সত্যেরই প্রতিষ্ঠা।

আসলে, উনিশ শতকের মধ্যপর্বের বাঙালিবাবুরা, তা সে রক্ষণশীল 'হিন্দু পুনরুত্থানবাদী'ই হোক, কিংবা সংস্কারপন্থী ব্রাহ্ম, তাঁরা উভয়েই ছিলেন মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'এলিট' 'ভদ্রলোক'। এঁদের মানসিক গড়ন ও সংস্কার পাশ্চাত্য শিক্ষার কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল আদর্শ ও অভিলাষ। রক্ষণশীল মধ্যশ্রেণির জাতীয়বাদী ভাবধারা ও অতীত আশ্রয়ী সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ভাবনার বীজও যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল, ব্রাহ্মবাবুদের সংস্কার ও সমন্বয়ের উদ্যোগ ও সীমাবদ্ধতাও তেমন ওই পাশ্চাত্য শিক্ষার সহবাসে উদ্গত। শিবনাথ শাস্ত্রী যথার্থই বলেছিলেন,[৪৮] এই উভয়শ্রেণির প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা সকলেই পাশ্চাত্য শিক্ষার হাত ধরে তাঁদের ভাব ও ভাবনার ঘর সাজিয়েছিলেন। তাঁদের আচার-আচরণেও সেই শিক্ষার ফল

প্রতিফলিত হত। তৎসত্ত্বেও যে, রক্ষণশীল মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত ‘হিন্দু’ ভদ্রলোকেরা ব্রাহ্মবাবুদের গতিরোধ করতে উদ্যত হলেন, নকশায়-প্রহসনে, ছড়ায়, উপন্যাসে ব্রাহ্মবাবুদের নিন্দাপঙ্কে নিমজ্জিত হতে হল, নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হল ‘বাবুত্বে’র এলাকা এবং ব্রাহ্মবাবুদের নির্দিষ্ট করা হল উক্ত এলাকার সীমায়, তার কারণ সম্ভবত নিহিত আছে আধিপত্য হারানোর আশঙ্কার মধ্যে। উনিশ শতকের মধ্যপর্বে হিন্দুমেলা, ভারতসভা ইত্যাদির ক্রমপরিণতিতে যখন জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হল ১৮৮৫-তে, তখনও সে দলে ব্রাহ্ম ‘ভদ্রলোক’দের অংশগ্রহণ ও উদ্যোগ আনুপাতিক হারেই বেশি। রক্ষণশীল হিন্দুরা এর ফলে 'Political Subordination'-এর আশঙ্কায় আশঙ্কিত হচ্ছিলেন, সেইসঙ্গেই ব্রাহ্মধর্ম তাঁদের এতকালের সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক হয়ে দেখা দিয়েছিল।[৪৯] কলকাতার দেশীয়  নাগরিক সমাজ এবং তাঁদের দল জন্মলগ্ন থেকেই বাংলার সামাজিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। অবশ্য বিদেশি শাসকের  প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতও তাতে কার্যকর ছিল, কারণ তাহলেই শাসকের নিজস্বার্থ রক্ষা হয়। কলকাতার নাগরিক সমাজের আদিপর্বের দল ও তার মুখপাত্রেরা প্রায় সকলেই ছিলেন ভুঁইফোঁড়, অভিজাত এবং একইসঙ্গে হিন্দু। কিন্তু রামমোহন ও ডিরোজিওর যুগ্মপ্রভাবে নাগরিক হিন্দুর বিশ্বাস ও সংস্কারের ভিত টলে যাওয়ায় তিনের দশক থেকেই আধিপত্য হারানোর ভয়ে হিন্দু দলপতিরা প্রতিরোধের চেষ্টা শুরু করেন। কিন্তু প্রথমত ইংরেজি শিক্ষিত নব্যবাবু এবং পরে মধ্যশ্রেণির ব্রাহ্মবাবুদের অপ্রতিহত উদ্যম ও সংস্কারের সামনে তাঁরা অসহায় হয়ে পড়ছিলেন। যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি প্রথমত তাঁরা বিমুখ ছিলেন, অবশেষে তা গ্রহণ করেই রক্ষণশীল হিন্দুরা খুঁজে পেলেন প্রতিরোধের উপযুক্ত পথ ও পাথেয়। এইখানে বলে রাখা ভালো যে, ‘রক্ষণশীল’ শব্দটি একটু বিভ্রান্তিকর; কারণ তথাকথিত রক্ষণশীল হিন্দুদের ব্রাহ্ম প্রতিরোধের সময় ও তৎপরবর্তীকালে যে হিন্দুধর্ম ও সংস্কার আমরা পেলাম, তা হুবহু প্রাচীনের প্রতিরূপ নয়, অনেক সংস্কার ও সমন্বয়ের টানাপোড়েনের চিহ্ন তার মধ্যে রয়ে গেছে। দক্ষিণেশ্বর থেকে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মধ্যশ্রেণির নাগরিক হিন্দুসমাজকে যেভাবে এক নতুন সমন্বয়বাদী হিন্দুধর্মের সন্ধান দিলেন এবং আচ্ছন্ন করলেন, তা নিঃসন্দেহে অভিনব। ব্রহ্মবাদীরা পরমেশ্বর এক এই হিসাবে মূর্তিপূজা, আচার-অভিচার ইত্যাদি বর্জন করে একেশ্বরের উপাসনাকেই মুখ্য করেছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব  দেব-দেবীর বৈচিত্র্য, পূজার্চনা ইত্যাদি আচরণের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রেখেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয়ের সন্ধান দিলেন। যীশু-মহম্মদ-চৈতন্যকে তিনি এক করে দেখলেন, তাঁদের আরাধ্যকেও এক হিসাবেই দেখালেন। এই সঙ্গেই সহজিয়া ভক্তিধর্মের নতুন এক রূপ প্রত্যক্ষ করলেন পুনরুজ্জীবিত হতে চাওয়া হিন্দুত্ববাদীরা। গৃহীর ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ও সহজতর এক হিন্দুধর্মের দিশা দেখালেন তিনি। ভক্তি ও বিশ্বাসের এই সহজতর পথেই উনিশ শতকের শেষার্ধে হিন্দু নাগরিক মধ্যশ্রেণি উজ্জীবিত ও একজোট হলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মতো শিক্ষিত, বাগ্মী পুরুষ গুরুর নির্দেশ মেনেই যুক্তি ও মত প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে নতুন এই হিন্দুধর্মের কাঠামোটিকে স্থায়িত্ব দিলেন। নতুন করে কলকাতার নাগরিক সমাজে রক্ষণশীল হিন্দু মধ্যশ্রেণি তাঁদের আধিপত্য ফিরে পেতে শুরু করলেন। ইতিপূর্বে ব্রাহ্মদের দ্বারা সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার উভয় ক্ষেত্রেই পিছু হটে যে মানসিক বিচ্ছিন্নতার (Alienation) শিকার হয়েছিলেন এই রক্ষণশীল মধ্যমশ্রেণি, তা থেকে মুক্ত হতে পেরে নিশ্চিন্ত হলেন তাঁরা।

অন্যদিকে, ব্রাহ্মরাও ক্রমশ নিজ গোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছিলেন। হিন্দুধর্মের জাতপাত নির্দিষ্ট, আনুষ্ঠানিকতা মুখ্য, সংস্কারবদ্ধ রূপ থেকে আলাদা হতে গিয়ে যে ব্রহ্মবাদ ও তার উপাসনাকে তাঁরা

আশ্রয় করেছিলেন একসময়, তা ক্রমশ গতি হারিয়ে অন্যতর আচার ও অনুশাসনের নিগড়ে বন্দি হয়ে গেল। দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখদের অন্তর্বিরোধে ব্রাহ্মসমাজ ভেঙে দু'তিন টুকরো হয়ে গেল, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মতো ব্রাহ্মনেতা বৈষ্ণবধর্মের আশ্রয়ে ফিরে গেলেন; সামাজিক সংস্কার, স্ত্রীস্বাধীনতা ও শিক্ষার বিষয়টি ক্রমশ হাস্যকর বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌঁছোল। বিপজ্জনকভাবে সংস্কারের সুযোগ নিয়ে একদল শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি এর অপপ্রয়োগও করতে থাকলেন। বিশ্বাস ও সংস্কার যখন হুজুগে পরিণত হয়, তখন তা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, অনেক আবিলতার জন্ম হয়। ব্রাহ্মবাবুদের পক্ষে সেই বিপদ, সেই আবিলতা থেকে মুক্ত থাকা সম্ভবপর হল না। কেউ কেউ আবার গোপনে হিন্দু ও ব্রাহ্ম— দুই রকমের সংস্কারই পালন করতে লাগলেন প্রয়োজন মাফিক। এ ধরনের দ্বিচারিতা হিন্দু রক্ষণশীল মধ্যশ্রেণির সুবিধা করে দিল। 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র, 'সাধারণী'তে অক্ষয়চন্দ্র সরকার, 'বঙ্গবাসী'তে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭২-এর কালপর্বে হিন্দুধর্মের যুক্তিভিত্তিক ও সময়োপযোগী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মত প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ব্রাহ্মধর্মের ও ব্রাহ্মবাবুদের আচার-আচরণের সমালোচনা করতে লাগলেন। শুধুমাত্র ধর্মীয় স্বার্থরক্ষার প্রসঙ্গটি কারণ হলে রক্ষণশীল মধ্যশ্রেণি মুসলমানদের আচরিত ইসলাম ধর্ম এবং খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধেও যুক্তি ও প্রতিরোধ শাণিত করতেন। তা কিন্তু হয়নি। বরং সামাজিক আধিপত্যের প্রশ্নটিই প্রধান হওয়ায় রক্ষণশীল মধ্যশ্রেণি ব্রাহ্মদেরই প্রধান প্রতিপক্ষ স্থির করে নিলেন।

এই কারণেই ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৯-১৯৭১) 'কল্পতরু' (১২৮১ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রটি, একজন ব্রাহ্মবাবু, নাম নরেন্দ্রনাথ। সে 'নবীন ব্রাহ্ম'। তার আদি বাড়ি যদিও রানাঘাট, তবুও অবস্থাগতিকে অগ্রদ্বীপে এসে তাদের বসতি করতে হয়েছে। পিতার অবর্তমানে জ্যেষ্ঠ মধুসূদনই ভাইয়ের যাবতীয় খরচ নির্বাহ করেন। তাঁর 'সামান্য গোছের একটি চটের দোকান' থেকেই সংসারের গ্রাসাচ্ছাদন এবং নরেন্দ্রনাথের খরচ চলে। নরেন্দ্রনাথ কলকাতার হাটখোলায় একটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে এবং এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষা দেবে। যদিও পরীক্ষা অপেক্ষা অন্যান্য ব্যাপারেই তার আগ্রহ বেশি। বিশেষ করে মেয়েদের দুর্দশামোচনে সে সদাতৎপর। হিন্দুসমাজের দুর্দশা দেখে সে ব্যথিত, 'ভ্রাতৃ' সম্বোধনে সে সকলকেই আপ্যায়িত করে, অথচ সহোদর মধুসূদন দেখতে কুৎসিত এবং 'মুখ্যু' বলে বন্ধুমহলে তার পরিচয় করায় 'বাটীর সরকার' বলে। দাদার সঙ্গে তার সম্পর্ক কেবল টাকার। প্রতিবার কলেজ ছুটির পর কলকাতা ফিরবার সময়, যতদিন থাকতে হবে, তা অনুমান করে, খরচের টাকা একসঙ্গে নিয়ে আসে। অনেক কাল পর পর মনে পড়লে এক-আধটা চিঠি দেয়, যদিও 'খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ, কৃশ' এবং কাফরির মতো চুলবিশিষ্ট অগ্রজকে চিঠিতে 'পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত অগ্রজ মহাশয়' বলতে তার ঘৃণা বোধ হয়। শিক্ষাভিমানী নরেন্দ্র তার ফলে নিতান্ত প্রয়োজন না হলে কুশল সংবাদ দেয় না, নেয়ও না।

কিন্তু নিজের অশিক্ষিত সহোদরের প্রতি ঘৃণা পোষণ করলে কী হবে, সামাজিক সংস্কার ও নারীজাতির উন্নতিবিধানে সে সদাচিন্তিত ও অতিতৎপর। ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন ও বক্তৃতায় সে নিয়মিত উপস্থিত থাকে। বক্তৃতায় 'দেশের দুর্দ্দশা, স্ত্রীগণের অধীনতাই যাহার দেদীপ্যমান সাক্ষী স্বরূপ'— এই প্রসঙ্গ উঠলেই তার দু'চোখে বান ডাকে। তার ভাব দেখে খুব শীঘ্রই যে সে সমাজের 'উপাচার্য্য' হবে, একথা সকলে বলাবলি করে। পরমেশ্বরের প্রতি তার ভক্তি কতখানি তা জানা না গেলেও, স্ত্রীজাতিকে দেখলেই তাঁদের 'ব্রাহ্মিকা' করে ঘরের 'বাহির' করতে তার ইচ্ছা প্রবল আকার ধারণ করে।

যে বাড়ির দ্বিতলে সে ভাড়া থাকে, তার উত্তরে মাত্র দেড়হাত এঁদোগলির দূরত্বে অটল বাপান্তবাগীশের একতলা বাড়ি। সোনাগাছি, সিদ্ধেশ্বরতলা প্রভৃতি জায়গায় বাপান্তবাগীশের অনেকগুলি যজমান ছিল। তাঁদের দানদাক্ষিণ্যেই বাপান্তবাগীশের সংসার প্রতিপালিত হত। স্ত্রী, সপ্তমবর্ষীয়া কন্যা ছাড়াও সতেরো বৎসরের 'একমেটে, ঝুলবর্ণা, বড়ীনাকী এক বিধবা ভ্রাতৃবধূ, আর ছত্রিশ বছরের বেঁটে চুল-কাটা, চোখ-কটা গোলাকৃতি বামা' নামের এক পরিচারিকা ছিল তাঁর সংসারে। নরেন্দ্রর নজর পড়েছিল প্রথমত বামা দাসী, পরোক্ষে বিধবা ভ্রাতৃবধূর উপর। তাদের সে ঘরের বার করে স্ত্রী-স্বাধীনতার চরম দৃষ্টান্ত স্থাপনে আগ্রহী ছিল। সন্ধ্যার পরে নরেন্দ্রনাথ তার জানালার ধারে পড়তে বসলে কিংবা 'বায়ু সেবনে'র উদ্দেশে হাজির হলে বামা ও বিধবা বধূটিও উপস্থিত হত। 'নবীন ব্রাহ্ম' নরেন্দ্র নিতান্ত 'কচি ছেলে নয়, তায় ধর্মজ্ঞান-বিশিষ্ট; অতএব—

'সন্ধ্যার পর দাসীকে স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রী-শিক্ষা, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি সৎপ্রসঙ্গের উপদেশ দিতে নরেন্দ্রনাথের ত্রুটি ছিল না বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে মাছের তেলে মাছ ভাজিবার একটু মতলব ফল্গুনদীর মত তাঁহার হৃদয় মধ্যে নিয়ত প্রবাহিত ছিল। নরেন্দ্রনাথ মনে করিতেন,— যে দাসী, সে সহায়-সম্পত্তি-বিহীনা, তাহার ব্রাহ্মিকা হইলেই কি, আর না হইলেই কি? তবে পৃথিবীশুদ্ধ যদি হয়, তবে প্রকৃত মঙ্গল বটে। যত দিন তাহা না হইতেছে, ততদিন তাঁহার উপদেশের প্রকৃত পাত্রী স্বতন্ত্র, যথা বাপান্তবাগীশের ভ্রাতৃবধূ।'[৫০]

বিধবা 'ভ্রাতৃবধূ'টি এলে 'মনুষ্য-মাত্রেই ভাই এবং ভগিনী— এবং আপন পর ভেদ রাখা মহাপাপ; তুমি আমার, আমি তোমার' এই বলে সে উপদেশ দেয়। যদিও বাপান্তবাগীশ অচিরেই সব জানতে পেরে নরেন্দ্রর এই নারীউদ্ধার ব্রতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। বাড়ির মেয়েদের ছাদে ওঠা বন্ধ হয়। 'অবৈধ সামাজিক নিয়মে বিধবাকে, অবলাকে কষ্ট দিবে, ইহা অসহ্য বোধ' হওয়াতে রাত্রি দু'টোর সময় আরশি দেখে 'চুল ফিরিয়ে', গরনেটের চায়না-কোট গায়ে দিয়ে, তার উপর কাশ্মীরের চাদর জড়িয়ে, পায়ে জুতা ও স্টকিন পরে, কয়েক খিলি পান খেয়ে, রুমালে ঠোঁটের কোণ মুছে, হাতে থাকা দশ টাকা সম্বল করে সে বাড়ি থেকে বের হল। নরেন্দ্রর মনে তখন এক সংকল্প :

'আমার যাহা আছে, হে প্রেয়সি, সর্বস্ব দিয়াও তোমাকে তোমার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক— তোমার উপস্থিত দুর্দ্দশা হইতে উদ্ধার করিব। আমার ধন যাউক, মান যাউক, শীল যাউক, বন্ধু যাউক, স্বজন যাউক, আমি নিশ্চিত তোমাকে উদ্ধার করিব। ধর্ম্মের জন্য কত মহাত্মা দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, আমি এই সামান্য ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিব না?'[৫১]

যদিও অবশ্য পরমেশ্বর সহায় না হওয়ায় নরেন্দ্র নর্দমাতে পড়ে কর্দমাক্ত হল এবং বাপান্তবাগীশের মুখোমুখি হয়ে সে রাত্রেই কলকাতা ছেড়ে রেলে চড়ে রানিগঞ্জে পালিয়ে গেল।

তার কীর্তি এখানেই শেষ নয়। রানিগঞ্জ স্টেশনে নেমে সৌভাগ্যবশত নিকটস্থ রাজহাট গ্রামের সম্ভ্রান্ত জমিদার কালীনাথ ধরের গৃহে ঠাঁই পেল এবং কুড়ি টাকা বেতনে কালীনাথের ছেলে এবং গ্রামের অন্যান্য ছেলেদের ইংরেজি শিক্ষার ভার নিল। কিন্তু সে কাজে তার বিশেষ হাতযশ বাড়ল না। পক্ষান্তরে ধরজীর ডাকের চিঠির ঠিকানা লিখতে সে 'ভবিষ্যৎ কেরাণীগিরির বীজ' রোপন করল। ধরজীর বাড়ির আত্মীয়-কুটুম্বের কাঁথা সেলাই এবং পরিবারের সকলের রিফুর কাজ করে সূচীকর্ম্মে তার ব্যুৎপত্তি জন্মাল। পাশাপাশি গ্রামের দুই চারিজনের নাড়ি টিপে, ওষুধ দিয়ে ডাক্তার-বদ্যি হিসাবেও পরিচিতি লাভ করল, এই সূত্রেই অনেক পরিবারের মধ্যে তার যাতায়াত শুরু হল। আর এই যাতায়াতের সূত্রেই জনৈক কুলীন কন্যা বিমলাকে সে উদ্ধার করতে কৃতসংকল্প হল। কারণ :

'পাপময় কুলপ্রণালীতে ইহাদের সর্বনাশ করিয়াছে এবং করিতেছে। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার উপায় নাই। এখন যাহাদিগকে উদ্ধার করিলে দেশের মঙ্গল, তাহারা আর হীনাবস্থায় হিন্দু-কুসংস্কারের জালে জড়িত হইয়া কষ্ট না পায়, ইহা করা চাই।'[৫২]

বিমলা কুলীনের মেয়ে, কুলীনের বউ। তার বয়স এখন তেইশ। বয়ঃপ্রাপ্তি হবার পর জনৈক রামকিশোর চট্টোপাধ্যায় নামক কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। সে তার স্বামীর আটচল্লিশ নম্বর পত্নী। বিবাহের পর রামকিশোর দুইবার মাত্র রাজহাটে এসেছিলেন। তাঁর শেষবার আসার পর দেড় বৎসর কেটে গেছে। অতএব 'নবীন ব্রাহ্ম' নরেন্দ্রনাথকে পেয়ে তার পীড়া 'শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় প্রতিক্ষণেই বাড়িতেছিল'।

অতঃপর শুভযোগে নরেন্দ্রর সঙ্গে বিমলার কুলত্যাগ এবং গোপালপুরের শ্রীরূপদাস বাবাজির আখড়ায় আশ্রয়লাভ। এরপর কাজের সন্ধানে বিমলাকে উক্ত আখড়ায় রেখে নরেন্দ্রর কলকাতা-গমন, ইত্যাবসরে বিমলার চরম দুরাবস্থা— গোপনে ঔষধ দিয়ে তার গর্ভপাত ঘটানো, নানা কু-কাজে তাকে বাধ্য করা এবং পরিণামে বিমলার মৃত্যু। নরেন্দ্রনাথ অবশ্য সেই মৃত্যুসংবাদ পেয়ে অনুশোচনায় কাতর হয়নি, দুঃখবোধও করেনি; ভীত হয়েছে ধরা পড়ে শাস্তি পাবার ভয়ে। শেষ পর্যন্ত শাস্তি সে পায়নি। বরং জনৈক ভদ্রলোকের সাহায্যে পঁচিশ টাকা বেতনের চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে। পূজার সময় বাড়ি গিয়ে সে মধুসূদনের সঙ্গে বিবাদ করে পৃথগন্ন হয়েছে; যুক্তি হিসাবে দশজনকে বলে বেড়িয়েছে যে, 'যুক্ত পরিবারের নিয়ম হইতেই আমাদের সামাজিক সমস্ত অনিষ্ট উদ্ভূত হয়।'[৫৩] সেইসঙ্গে মধুসূদন অনেক ঋণ করেছেন বলে (উক্ত ঋণ যদিও নরেন্দ্রনাথের কারণেই) সে দাদাকে পৈত্রিক সম্পত্তির কোনো অংশই দেয়নি। 'নবীন ব্রাহ্ম' নরেন্দ্রনাথের বৃত্তান্ত এখানেই শেষ করেছেন গ্রন্থকার।

উপন্যাসের অন্তঃকাঠামো থেকে স্পষ্ট হয় যে, নরেন্দ্রনাথ তথা মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত ব্রাহ্মবাবুদের হৃদয়হীন, পাষণ্ড, ধর্মজ্ঞানহীন, কপট ব্যভিচারী ও সামাজিক নানান কুরীতির আকর হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন গ্রন্থকার। উপন্যাসে সমাজমন্দিরে মেয়েদের অংশগ্রহণের কথা আছে (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : 'কৃষ্ণমোহন লাহিড়ীর কন্যা সমাজগৃহ হইতে বাটী যাইতেছেন, সপ্তাহ কাল আর এখানে আসিবেন না...' ইত্যাদি)। 'নবীন ব্রাহ্ম' নরেন্দ্রর লীলাখেলার কাল অতএব অনুমিত হয় ১৮৬৬ সালের জানুয়ারির শেষে যে মাঘোৎসব হয়, তার পরেই হবে। কারণ ওই মাঘোৎসবেই সমাজে বেদীর পূর্বদিকে পর্দার আড়ালে মেয়েদের তথা ব্রাহ্মিকাদের বসবার ব্যবস্থা করেন কেশবচন্দ্র সেন। এবং 'ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাসে সর্বপ্রথমে নারীগণ এই প্রকাশ্য উপাসনা-মন্দিরে পুরুষগণের সহিত বসিলেন।'[৫৪] এইসময় থেকেই কেশবচন্দ্রের প্রেরণায় যুবক ব্রাহ্মরা অত্যুৎসাহী হয়ে পড়েন এবং ১৮৬৬-র ১১নভেম্বর 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করে তাঁদের কর্মকাণ্ড বিস্তৃত করবার প্রয়াস পান। শিবনাথ শাস্ত্রী জানিয়েছেন যে,

'১৮৬৭ সাল হইতে যুবকদলের প্রচারোৎসাহ আগুনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। অনেকে কল্যকার চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া প্রচার ব্রত গ্রহণ করিলেন; এবং অর্দ্ধাশনে ও অনশনে দিন কাটাইতে ও পাদুকাবিহীন পদে কলিকাতা সহরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই প্রচারোৎসাহের ফলস্বরূপ দেশের নানাস্থানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইতে লাগিল; এবং ব্রাহ্মবিবাহের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল।'[৫৫]

কিন্তু এই অত্যুৎসাহ যে সবক্ষেত্রে শুভঙ্কর হতে পারেনি, বরং সমুদ্র মন্থনে অল্প অমৃতের পাশে সুপ্রচুর গরল উত্থানের মতো অকল্যাণকর হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। অত্যুৎসাহের বশে এইসকল ব্রাহ্ম যুবকেরা অনেক সময়ই নানাপ্রকার অনৈতিক কাজ করে বসত। ভণ্ড ব্রাহ্মদের সংখ্যাও দিনদিন বেড়ে চলেছিল। 'নব্যভারত' পত্রিকায় এ ব্যাপারে সখেদে বলা হয়[৫৬] :

'ভাইভগিনীগণ! তোমরা কি জান না, আমাদিগের কি ভয়ানক নিন্দা উঠিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে শান্তি নাই। ব্রাহ্মগণ যেরূপ সামাজিক অনুষ্ঠানে রত, তাহার উপযোগী আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানে তাহাদিগের নিষ্ঠা নাই। লব্ধ জ্ঞান জীবনে পরিণত করিবার জন্য তাঁহাদিগের যত্ন ও চেষ্টা নাই।'[৫৭]

সামাজিক অনুষ্ঠান বলতে ব্রাহ্মিকাদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে এবং ব্রাহ্মিকা-বিবাহে সচেষ্ট হওয়া, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে গুরুতর আগ্রহ দেখানো, ব্যক্তিগত ভোগসুখের লোভে কুলরমণীদের ঘরের বাইরে নিয়ে আসা ইত্যাদি নানাপ্রকার কার্যকলাপের দিকেই সম্ভবত লেখক ইঙ্গিত করে থাকবেন। প্রবন্ধের জন্যও অবশ্য লেখক কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন— 'বিচ্ছিন্নতা, একদেশদর্শিতা, সাধারণ মঙ্গলজনক বিবিধ কার্য্যে যত্নশিথিলতা, অপ্রসারিত প্রেম ও ব্রহ্মসন্তানগণের নিত্য ভোগ্যলব্ধ ধন বিতরণে অনুদারতা।'[৫৮] এসব কারণেই যে রক্ষণশীল হিন্দুরা সাংস্কৃতিক আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে চাইলেন, প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন স্বাধিপত্য, বলাই বাহুল্য। ইন্দ্রনাথও এই একই কারণে নরেন্দ্রনাথের চরিত্র উপস্থিত করেছেন। কুলীন ব্রাহ্মণ রামদাস, পেশায় 'ভুশিমালের' দালাল এবং 'কাপ্তেন' ধরবার খলিফাবিশেষ, সেই নরেন্দ্রনাথের স্বরূপ যথার্থ চিনেছিল :

'বাবু, তোমরা ত লক্কা পায়রা। বড় লোক, লাড়কেনি মার, আর ঘুরে ঘুরে বেড়াও।'[৫৯]

অতএব প্রথম আলাপেই নরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে মেছোবাজারের মধ্য দিয়ে সে অস্থানে উপস্থিত হয়েছে এবং আমোদপ্রমোদ করেছে। নরেন্দ্র রামদাসের কথার ইঙ্গিত উপলব্ধি করতে পেরেছে। 'লক্কা পায়রা'র মতো তার বাবুয়ানির চেহারা যে রামদাসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেছে এ সত্য উপলব্ধি করেও তাই সে প্রতিবাদ করেনি। বরং হাস্যকর কুযুক্তি দিয়ে মনে মনে নিজেই সান্ত্বনা পেতে চেয়েছে :

'নবীন ব্রাহ্মের সংস্কার ছিল, কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। কি জানি, রামদাসের বিরুদ্ধবাদী হইলে পাছে তাহার মনে ক্লেশ জন্মে; বিশেষত: সাধু অভিপ্রায়ে নরক পর্য্যন্ত যাওয়া যায়, বরং যাওয়াই উচিত— নরকের যদি কোন হিত করিতে পারা যায়। তদ্ব্যতীত সর্ব্বত্রই জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে— ''কুস্থানাদপি কাঞ্চনম্''।' [৬০]

শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির এই আত্মপ্রবঞ্চনা, 'ভদ্রলোক'বাবুদের জাত চিনিয়ে দেয়। নববাবুরা নৈতিক-অনৈতিকের তোয়াক্কা করতেন না, অর্থের দম্ভে দিনকে রাত তার রাতকে দিন করতেন নির্দ্বিধায়; সামাজিক সম্মান ছিল তাদের বশংবদ। অন্যদিকে, নব্যবাবুরা সযত্নে এড়িয়ে চলতেন যাবতীয় রুচিহীন আমোদপ্রমোদ; মদ্যপান কী গোমাংস ভক্ষণকে তাঁরা আঁকড়ে ধরেছিলেন বিলিতি বলেই। বেশ্যাগমনের রুচিকে তাঁরা গ্রহণ করতে পারেননি অশিক্ষিতের রুচি বলেই। সামাজিক সম্মানকে তাঁদের অর্জন করতে হয়েছিল, তাকে ধরে রাখতেও তাঁদের ছিল প্রাণান্তকর প্রয়াস। কিন্তু মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের মন ছিল দ্বিধাবিভক্ত। অনৈতিক, রুচিবিগর্হিত পথের দিকে তাঁদের ছিল চোরাটান, আবার পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত বলে শিক্ষাভিমানীর দল হিসাবে তাঁরা দাবি করতেন সামাজিক সম্মান। 'ঘোমটার আড়ালে খেমটা নাচ' শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। শুধু ব্রাহ্মদের মধ্যেই নয়, তথাকথিত রক্ষণশীল হিন্দু মধ্যশ্রেণির বাবুদের মধ্যেও এই জাতীয় চরিত্রস্বভাব দুর্লভ ছিল না। সামাজিক আধিপত্যের প্রশ্নে ইন্দ্রনাথ হয়তো ব্রাহ্মবাবুদের অনৈতিক জীবন প্রণালীর দিকে দিক্‌নির্দেশ করেছেন, কিন্তু স্বীয় শ্রেণির মধ্যেও যে এ জাতীয় চরিত্র কম মিলত না, সমকালীন নকশা ও প্রহসনে তার পরিচয় সুপ্রচুর। অতএব নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম হন বা না হন, তিনি যে সমকালীন শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদেরই প্রতিরূপ, এমনটিও ভাবা যেতে পারে।

'বঙ্গদর্শনে'র পৌষ ১২৮১ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় 'কল্পতরু'র সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছেন যে উপন্যাসের 'এই সকল চিত্র প্রকৃতিমূলক— কিন্তু তাহাদিগের কার্য্য আত্যন্তিকতাবিশিষ্ট।'[৬১] অর্থাৎ উপন্যাসের চরিত্র-চিত্রণ ও ঘটনা-প্রবাহে কিছু অতিরেক থাকলেও, তার সমাজবাস্তবতার দিকটি বঙ্কিম স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর মতে, 'কল্পতরু'র উদ্দেশ্য যেহেতু 'ব্যঙ্গ' এবং লেখক যেহেতু 'মনুষ্যচরিত্র' দেখে 'ঘৃণাযুক্ত', অতএব আখ্যান-প্রদর্শিত অতিরেক গ্রহণযোগ্য। লক্ষণীয়, বঙ্কিম 'ব্রাহ্মচরিত্র' দেখে ঘৃণা জাগরণের কথা বলেননি, সাধারণভাবে 'মনুষ্যচরিত্রে'র কথা বলেছেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ যতই শেষের দিকে এগিয়ে চলেছিল, ততই মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুরা এ জাতীয় দ্বিধাবিভক্ত সত্তার অধিকারী হয়ে পড়ছিলেন। স্বয়ং বঙ্কিমের নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলাল ব্রাহ্মবাবু ছিলেন না, কিন্তু পাপের পথে তাঁদের আসক্তি কম ছিল না। 'কল্পতরু'তে ইন্দ্রনাথ বাঙালি 'ভদ্রলোক'বাবুদের অন্ধকার দিকটিকেই দেখাতে চেয়েছেন। এই অন্ধকার একটি-দু'টি-তিনটি বাবুর মধ্যে দেখা দিলে রক্ষণশীলদের এত ভয়ভীতি থাকত না, কিন্তু এই অন্ধকার ক্রমে এক থেকে বহুতে পরিব্যাপ্ত হয়ে চলেছিল বলেই প্রতিরোধের এত নিদারুণ প্রচেষ্টা। প্যারীচাঁদের মতো ইন্দ্রনাথ অবশ্য সুনীতির বা আশ্বাসের কোনো বাণী শোনাননি। 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' ঘটানো তাঁর লক্ষ্য ছিল না। তাঁর উদ্দেশ্য পাপের, অন্ধকারের, অস্বস্তির চিত্র তুলে ধরে আমাদের বিবেকের জানালাটা, বোধের দুয়ারটা খুলে দেওয়া। অতএব তাঁর অঙ্কিত মধ্যবিত্ত বাবুদের চরিত্র একদেশদর্শী। চাঁদের একপিঠের কলঙ্কের মতো তা অর্ধেক। বঙ্কিমের ভাষায় :

'যিনি মনুষ্যের ক্ষুদ্রতা, নীচাশয়তা, স্বার্থপরতা এবং বুদ্ধির বৈপরীত্য দেখিতে চাহেন, তিনি ইহাতে যথেষ্ট পাইবেন। যিনি তমোভিভূত ভীরু , নির্ব্বোধ, ভণ্ড, ইন্দ্রিয়পরবশ আধুনিক যুবা দেখিতে চাহেন, তিনি নরেন্দ্রনাথকে দেখিবেন। ... যে সকল বন্য জন্তুগণ অনতিপূর্ব্বকালে সাহেবের কাছে নথি পড়িয়া অর্থ ও মেদ সঞ্চয় করিত, কালিনাথ ধরে, তাহারা জাজ্বল্যমান..'[৬১]

অর্থাৎ 'ভণ্ড ইন্দ্রিয়পরবশ আধুনিক যুবা' অর্থাৎ শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের একটি অংশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন নরেন্দ্রনাথ। এ জাতীয় চরিত্র তখন ঘরে ঘরে, কলকাতা সেই শিক্ষার পীঠভূমি। ইন্দ্রনাথেরই 'ক্ষুদিরাম' নামক 'গালগল্প' তথা ব্যঙ্গোপন্যাসে (১৮৮৭) নরেন্দ্রনাথ ক্ষুদিরামের রূপকল্পে আবার ফিরে আসবেন। ব্রাহ্মবাবুর ক্লেদাক্ত চরিত্র উদঘাটনচ্ছলে বাঙালি মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোকে'র মানসিক অন্ধকারের ছবিও কি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না এভাবে? সমাজসংস্কার, জাতীয়বাদ এসবে আসক্ত বাঙালিবাবুর এও এক অন্তর্সত্য। আর কালিনাথ ধরের কাছে থাকাকালীন ডাকের চিঠিগুলিতে ঠিকানা লিখে দিয়ে নরেন্দ্রনাথের মতো বিশ্ববিদ্যালয়-পড়ুয়া বাঙালি নবযুবারা যে 'ভবিষ্যৎ কেরানিগিরির বীজ রোপন' করলেন, এই অমোঘ সত্যের দিকেও তো ইন্দ্রনাথ ইঙ্গিত করেছেন।

১৮৮৭-তে প্রকাশিত 'ক্ষুদিরাম'কে আখ্যাপত্রে 'গালগল্প' বলা হয়েছে। লেখকের স্বরচিত জীবনস্মৃতি অনুযায়ী 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার অনুরোধে এই 'গালগল্প'টি তাঁকে লিখে দিতে হয়।[৬২] রচনাটিতে গল্পাংশের ভাগ সামান্য, উদ্দেশ্যমূলক নকশার গুণ প্রবল। যদিও জাতিগঠনের দিনে উপন্যাসে নকশার গুণ প্রবল হয়ে ওঠা অসম্ভব নয়। ক্ষুদিরাম বিশ্বাস জাতিতে কৈবর্ত। পিতার মৃত্যুর পর তার মা পদ্ম-জেলেনি মাছ বেচে, যৎসামান্য সোনা-রূপার গয়না বিক্রি করে ক্ষুদিরামের পড়ার খরচ চালিয়েছেন। কেবল সোনার একখানি নথ ভাবী পুত্রবধূর জন্য রেখে দিয়েছেন। লেখাপড়ায় ক্ষুদিরাম ভালো। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ পরীক্ষার পাশ করেছে। কিন্তু শিক্ষিত হয়েই স্বজাতির প্রতি তার ঘৃণার অন্ত নেই। ঘৃণার কারণ ত্রিবিধ—

মায়ের মাছ বেচা পেশা; পিতার অতুল ঐশ্বর্য-সম্পত্তি রেখে না যাওয়া এবং সামাজিক নানান সংস্কার ও 'কু'প্রথা। অতএব :

'মানুষের তিন পর্দ্দা। একপর্দ্দা মুখে, এক পর্দ্দা মনে, শেষ আর এক পর্দ্দা হাড়ে। ক্ষুদিরামও মানুষ, সুতরাং ক্ষুদিরামেরও এই তিন পর্দ্দা। প্রথম পর্দ্দা, মুখে ক্ষুদিরাম সংসারের পরম বন্ধু। দ্বিতীয় পর্দ্দা, মনে ক্ষুদিরাম সংসারের মুরুব্বি। আর তৃতীয় পর্দ্দা, হাড়ে ক্ষুদিরাম সংসারের উপর চটা।'[৬৩]

ক্ষুদিরাম হাড়কাটা-গলির দোতলা একটি বাড়ির উপরের তলায় মেস-ভাড়া নিয়ে থাকে। গ্রামের বাড়িতে বিশেষ যায় না। কৃষ্ণনগরে এল.এ পড়ার সময়েও সে বছরে একবার করে বাড়ি যেত। কিন্তু কলকাতায় আসার পর বি.এ পাশ না করে আর বাড়ি যায়নি। তাও একবারই মাত্র বি.এ পাশের পর ক্ষুদিরাম তার ধীবরপাড়ার বাড়িতে এসেছিল। কিন্তু তিনরাতের বেশি টিকতে পারেনি। কারণ :

'বৈঠকখানা নাই, বসিবার বিছানা নাই, বন্ধু-বান্ধবের সম্বর্দ্ধনা করিবার কোন বন্দোবস্তই নাই। রান্নাঘর নিয়ে মোটে দুখানি মেটে ঘর, তাহাও নিতান্ত ছোট। নিত্য নিত্য নিকায় বলিয়া সে ঘরও যেন স্যাঁত স্যাঁত করে, তায় আবার গোবরের গন্ধ, মা এখনও মাছ বেচে, আমিষের ঘ্রাণে বাতাসও যেন বোঝাই হইয়া রহিয়াছে। দুটা-দশটা মাছিও উড়িতেছে।— সকল দিকেই স্বাস্থ্যরক্ষার বিষম ব্যাঘাত। এমন ভয়ঙ্কর স্থানে, ভদ্রলোকে কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে?'[৬৪]

মা'কে সে প্রণামও করেনি। কারণ, প্রণামের প্রণালীটি 'বিশ্রি',—'ভদ্রলোকের সাক্ষাতে কোনমতেই তেমন করিয়া প্রণাম করা যায় না।' তা ছাড়া abstract মাতাকে অর্থাৎ মাতৃত্বের সকল গুণের 'স্মৃতিরূপা মাতা'কে আন্তরিক ভক্তি করলেও, রক্তমাংসের concrete মা'কে প্রণাম করতে 'ভদ্রলোক' ক্ষুদিরামের দ্বিধাবোধ হয়। বাড়িতেও তিষ্ঠোবার উপায় নেই। অতএব গ্রামের এল.এ ফেল মাস্টারবাবুর বাসায়, কখনো ক্রোশ খানেক তফাতের পোস্ট অফিসে পোস্টমাস্টারবাবুর কাছে তার কেটেছে দু'একদিন। তার উপর এক জেলের মেয়ের সঙ্গে মা বিবাহের উদ্‌যোগ করলে ক্ষুদিরাম চিরদিনের মতো মা'কে ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় ফিরে এসেছে। মা'কে বলেছে তার 'ডেপুটি' হওয়ার শখের কথা।

কলকাতার প্রতি ক্ষুদিরামের টানের কারণ বহুবিধ। এক. যে মেসে সে থাকে, তার বছর পঁয়ত্রিশের কিন্তু দেখতে পঁচিশ বৎসর লাগা ঝি; তার সঙ্গে ক্ষুদিরামের অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক রয়েছে। বামুনঠাকুরের সঙ্গে ঝি'র বাগবিতণ্ডায় স্বাভাবিকভাবেই 'শিভাল্যরি'র খাতিরে সে ঝি'র পক্ষ অবলম্বন করে, কারণ 'বামুনঠাকুর — অতি অসভ্য, কাণ্ডজ্ঞানহীন গণ্ডমূর্খ, কাহার সঙ্গে কি প্রকার ব্যবহার করিতে হয়, সে বোধ নাই, পাচকব্রাহ্মণ বাবুর্চ্চির জাত— স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা বুঝে না; ইংলন্ডে, আমেরিকাতে, এমনকি জাপানে এই কাণ্ড হইলে বামুনঠাকুরকে নিশ্চয় চাবুক খাইতে হইত...।'[৬৫] যদিও রোমান্সের নায়কের মতো ক্ষুদিরাম শেষরক্ষা করতে পারেনি, বাড়ির সামনের জনৈক কাঠের দোকানদার এসে বামুনঠাকুরের পক্ষ নেওয়ায় ক্ষুদিরাম রণেভঙ্গ দিয়েছে 'কাজ নাই ছোটলোকের সঙ্গে কোন্দল কোরে', এই ভেবে। কাণ্ডজ্ঞানহীন, পাত্রাপাত্রবোধশূন্য, স্বার্থযুক্ত 'শিভাল্যরি'র এই দৃষ্টান্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের চরিত্র স্বভাব উদ্‌ঘাটন করে। মুখে অনেক আস্ফালন করলেও কার্যক্ষেত্রে 'য পলায়তি সঃ জীবতি'র দৃষ্টান্তই তাঁরা মেনে চলতেন। মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের এই স্বভাবটি ক্রমে বাঙালি পুরুষের জাতীয় চরিত্রে পরিণত হয়েছে।

দুই. কলকাতার শিক্ষিত, আপাত শিক্ষিত মানুষজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ও সহবাসের আকাঙক্ষায়ত্ত ক্ষুদিরাম কলকাতার প্রতি টান অনুভব করত। পাড়াগাঁয়ে 'ভদ্র-পল্লী'র আশা করা অন্যায়;

কারণ, ‘ভদ্রলোকই নাই, ভদ্র-পল্লী হইবে কোথা হইতে?’ ‘ভদ্রলোক’বাবুদের পীঠস্থান হল কলকাতা, অতএব সেই স্থান ত্যাগ করা ‘ভদ্রলোক’ ক্ষুদিরামের পক্ষে বাতুলতার সামিল।

তিন. ভুসীভোজন রায় ওরফে ভুসীবাবুর মতো অভিন্নহৃদয় বন্ধুর এবং বন্ধুপত্নী শ্রীমতী নিস্তারের সান্নিধ্যলাভের আকাঙক্ষা এবং তাদের স্থাপিত ‘প্রেমনিকেতন’ নামক ব্রাহ্মসমাজ গৃহের আকর্ষণও ক্ষুদিরামের কলকাতার প্রতি আকর্ষণের অন্যতম প্রধান কারণ।

ভুসীভোজন ওরফে ভুসীবাবু একজন করিতকর্মা ব্যক্তি। তিনি একজন ঘোরতর ব্রাহ্ম, ‘ভ্রাতৃভাবাক্রান্ত ভদ্রলোক’। বিলাতি শিক্ষায় শিক্ষিত বলে ‘জাতিকুলের তত্ত্ব’ নেওয়াকে তিনি ভয়ংকর অপরাধ বলে বিবেচনা করেন। ‘জগতের ছোট বড় উচ্চ নীচ লঘু গুরু ইত্যাদি বৈষম্যসূচক সম্বন্ধের সারবত্তা তিনি স্বীকার করেন না। পিতৃপরিচয় জানতে চাওয়াও তাঁর কাছে বিরাট “অসভ্যতা” কারণ, “পরমেশ্বরই” তাঁর চোখে, “সকলের একমাত্র পিতা”। এই কারণে ব্রাহ্মভাবানুসারী কোনো কোনো সংবাদপত্রে তিনি ‘ভ্রাতা ভুসীভোজন’ নামে কীর্তিত হন। এঁর বাল্যকালের কথা কিছু জানা না গেলেও, যৌবনে ইনি কলকাতার কোনো এক কায়স্থ বাড়িতে ‘বাস, গ্রাস ও আচ্ছাদনের বিনিময়ে গুপ্ত শিক্ষকতা’ করতেন এবং একইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতেন। উক্ত সময়েই ওই বাড়ির একটি বিধবা ‘ভগিনী’র ‘বৈধব্যের প্রতিবিধান’ করতে তিনি তাঁকে নিয়ে ওই বাড়ি ত্যাগ করেন এবং বিবাহ করে স্বাধীনভাবে অন্যত্র থাকতে শুরু করেন। এই সময়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনাতেও তিনি ইতি দেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত উপাধির প্রতি উপেক্ষা করে নিষ্কাম প্রচারকার্যে ব্রতী হন। তাঁর পত্নী শ্রীমতী নিস্তারও ‘ভগিনী’দের আলোকিত ও উদ্ধার করার কাজে স্বামীর অনুসরণ করেন। যে বাড়িতে তাঁরা থাকতেন, সেটি ক্রমে ব্রাহ্ম ভ্রাতৃ-ভগিনীভাব প্রচারের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে, বিশেষ স্বভাব অনুযায়ী ওই গৃহের নাম হয় ‘প্রেমনিকেতন’।

নারীর দুরবস্থা নিয়ে ভুসীবাবুর চিন্তার অন্ত নেই। সামাজিক নানান প্রথার উপরেও তিনি খড়গহস্ত। ‘প্রচ্ছন্ন পাপের স্রোতে যে ভারতবর্ষ ভেসে যাচ্ছে’ এ ব্যাপারে তাঁর সন্দেহ নেই। ক্ষুদিরাম এদেশে নারীর যে ‘অবরোধ প্রথা’ আছে, তা তুলে দিতে চায়। কারণ তার মতে, বিশুদ্ধ বায়ু শরীরে না লাগলে মানুষ বাঁচতে পারে না। বাইরে বেরোতে পারলে একইসঙ্গে নারীর ব্যায়ামটাও হয়। ভুসীবাবু এত সংকীর্ণ সংস্কারের কথা ভাবেন না। সব বিষয়েই নারীদের ‘চূড়ান্ত স্বাধীনতা’র তিনি পক্ষপাতী; তাঁর মতে :

‘তিন বিষয়ে লক্ষ্য কোত্তে হবে। প্রথম, ঈশ্বরের অভিপ্রায়, দ্বিতীয় বিবেক, তৃতীয় নীতি, চতুর্থ যুক্তি। প্রত্যেকের উপরেই প্রত্যেক নির্ভর করে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কি? না, স্বাধীনতা। বিবেক তাতে কি বলে? সেই স্বাধীনতাই বলে। যুক্তির দ্বারাও তাই আসচে, কেননা পুরুষের আত্মাতে যেমন স্ফূর্তির আবশ্যক স্ত্রীলোকের আত্মাতেও, সেইরূপ স্ফূর্তির আবশ্যক, তবে যখন আত্মায় আত্মায় পবিত্র মিলন হোয়ে যায়।’[৬৬]

এ কারণে ভুসীবাবু বিধবাদের ধরে ধরে বিবাহ দিতে চান, কারণ ‘যুবতীর বৈধব্য— ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কখনই হোতে পারে না।’ ক্ষুদিরাম, যে নিজে কিনা মেসের ঝি’র সঙ্গে অবৈধ সংস্পর্শে লিপ্ত, যুবতী বিধবাদের চরিত্র সম্পর্কে তার সন্দেহ প্রকাশ করেছে। মধ্যশ্রেণির ‘ভদ্রলোক’বাবুরা সহজে নিজের দোষ দেখতে পান না, কিন্তু অন্যের ভূরি ভূরি দোষ-সন্ধানে এবং কথনে তাঁদের অসীম উৎসাহ। ভুসীবাবু অবশ্য তাকে আশ্বস্ত করেছেন এই বলে :

‘বিবেচনা করে দেখুন, পাপ আর পুণ্য কেবল প্রবৃত্তি নিয়ে বৈ ত নয়। পবিত্র প্রণয় হোলো ঈশ্বরের অভিপ্রেত, তাতে আত্মার তৃপ্তি হয়, সেই জন্যে বিবেকের বিদ্রোহ হয় না, কিন্তু চিত্ত যদি পশুভাবে আক্রান্ত হয়, যাতে আত্মার সম্বন্ধ নাই, দেখুন তা হোলে কি ভয়ানক অবস্থাই ঘটে।”[৬৭]

‘ভয়ানক অবস্থা’ বলতে বাল্যবিবাহের ফলে অকাল-বৈধব্যের কথা বোঝানো হয়েছে। ভুসীবাবুর উদ্দেশ্য সম্প্রতি কুলত্যাগ করা সুন্দরী যুবতী বিধবার সঙ্গে ক্ষুদিরামের ব্রাহ্মবিবাহ দেওয়া। সে কাজে তিনি অসফলও হননি। কুলত্যাগ করা যুবতীটি ‘সুন্দরী’ শুনে ক্ষুদিরাম যারপরনাই আগ্রহী হয়ে উঠেছে এবং শনিবারে নিকেতনের সভায় উপস্থিত হয়েছে।

প্রেম নিকেতনের ব্রাহ্মসভাতেই কুলত্যাগিনী ‘পতিসোহাগিনি, পতিপরায়ণা’ কিন্তু বিধবা হয়ে ‘জনম-দুখিনী’ হওয়া শ্রীমতী নিরয়িণী ঘোষালের সঙ্গে ক্ষুদিরামের সাক্ষাৎ ও ব্রাহ্মবিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। ক্ষুদিরামের ‘সাহস, সত্যনিষ্টা এবং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা’র দৃষ্টান্তে সকলে চমৎকৃত হয়েছে। ‘প্রাণদায়িনী’ নামক সংবাদপত্র, যা নিজের বাপান্ত না করে জলগ্রহণ করে না (‘সৎসাহস’), কুলকামিনীর কলঙ্কের কথা ফলাও করে বলে (‘সুরুচি’) এবং প্রিয়-অপ্রিয় সু-কু সব কথাই নির্দ্বিধায় বলে (‘সত্যনিষ্ঠা’), সেই কাগজে তাদের এহেন প্রণয়ের ও পরিণামী বিবাহের কথা প্রকাশ করে আনন্দ জ্ঞাপন করা হয়েছে। সেইসঙ্গে ভ্রাতা ভুসীবাবুর প্রশংসা করা হয়েছে এই বিবাহ সংঘটন করানোয় উদ্যোগী হওয়ার জন্য।

ভুসীবাবুর প্রসঙ্গে লেখক ‘বাবুত্বে’র পরিবর্তিত ও প্রসারিত রূপ-তাৎপর্য সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেছেন। তাঁর মতে :

‘নামের কিয়দংশে বাবু জুড়িয়া দিলে সকল কাজও চলিয়া যায়। জলযোগে ত কথাই নাই, পংক্তি-ভোজনেও কেহ প্রশ্ন করে না। আসা-যাওয়া, খাওয়া-দাওয়া, শোয়া বসা, সবই যদি চলে, তাহা হইলে উপাধির উপসর্গ মিছামিছি কেন লোকে বহিয়া মরিবে? যদি বল বিবাহ, — তাহাও বোধ হয় বড় একটা বাধে না। কলিকাতার কীর্তি কারখানা কাহারই বা জানা নাই? অতএব বাবুতেই বস্।’[৬৮]

বঙ্কিমচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে বটতলার অনামা লেখক ‘বাবুত্বে’র প্রসঙ্গে কলকাতার প্রতি খড়গহস্ত। কলকাতার আকাশে বাতাসে যেন বাবুয়ানার স্রোত বয়ে যাচ্ছে। সেই ‘পঙ্কিল’ স্রোত থেকে যেন শিক্ষিত-অশিক্ষিত বাঙালিযুবার মুক্তি নেই। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কলকাতা সেদিন তাবৎ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভু হয়ে উঠতে চাইছে। যেকোনো শ্রেণিরই হোক না কেন, চূড়ান্ত আধিপত্য বিস্তার ও স্থাপন করাই তার মূল লক্ষ্য। ধনতন্ত্র এ কাজে তার সহায়ক। কলকাতায় তখন জমা হচ্ছে পুঁজি, বিনিয়োগ হচ্ছে শিল্পের পাশাপাশি শিক্ষা-সংস্কৃতি বিনোদনেও। নিজের স্বার্থেই ধনতন্ত্র আরও অন্যান্য অনেক কিছুর মতো এই তিন জরুরি ক্ষেত্রকেও বিপণনযোগ্য করে তুলছে। তার গোপন অভিসন্ধিতে এগুলিও ধনতন্ত্রের বিনিয়োগ। উনিশ শতকের সূচনায় যে বাবুয়ানা ছিল শ্রেণিবিশেষের ব্যক্তিগত শখ-আহ্লাদের বিষয়, উনিশ শতকের শেষে পৌঁছে সেই বাবুয়ানা আর শ্রেণিবিশেষের থাকে না, নির্বিশেষ শ্রেণির আচরণগত বৈশিষ্ট্যে উপনীত হয়। ‘বাবুয়ানা’ যতক্ষণ ব্যক্তিবিশেষের, ততক্ষণ তা ধনতন্ত্রের পরিপোষণ করে না, কিন্তু তা নির্বিশেষের হয়ে পড়লে, ‘বাবুয়ানা’র আনুষঙ্গিক উপকরণগুলি ধনতন্ত্রের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। লোভ-লালসা-বিনোদনও এভাবেই সার্বজনীন হয়ে যায় এবং ধনতন্ত্রের ভাঁড়ার পূর্ণ করে। আদি বা নববাবুরা ব্যক্তিগত শখ-আহ্লাদে নীতি-নৈতিকতার ধার ধারতেন না ঠিকই, কিন্তু মনের অগোচরে বহন করা পাপবোধ থেকেই কখনো মন্দির প্রতিষ্ঠা করে, কখনো লঙ্গর বসিয়ে, দেবার্চনায় নিয়মিত ব্যয় করে মানসিক পাপস্খলনের (Purgation) চেষ্টাও করতেন। মদ্যপান, বেশ্যাসক্তি, পরনারী লোলুপতা এই গুণগুলি তাঁদের মধ্যে দেখা যেত ঠিকই, হয়তো ভয়ে-ভক্তিতে সাধারণের সমর্থনও মিলত, কিন্তু সমাজের বৃহৎ অংশের কাছে এই আচরণগুলি আদৌ ‘গুণ’ হিসাবে নয়, দোষ হিসাবে

পরিগণিত হত। কিন্তু নব্যবাবু এবং 'ভদ্রলোক' মধ্যশ্রেণির বাবুরা ধনতন্ত্রের গোপন কৌশলে এগুলিকে সামাজিক অভ্যাস বলে গ্রহণ করলেন। ব্যক্তিগত রুচি সার্বজনিক অভ্যাসে পরিণত হল। মনে রাখতে হবে, নতুন গড়ে ওঠা কলকাতার বিমিশ্র জাতি-সংস্কৃতিতে নির্বিচার মিলন ও সংস্কারমুক্তির একটা ধূয়া তোলা বেনিয়া বিদেশি প্রভুর নিজের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনেই জরুরি হয়ে পড়েছিল। দেশীয় প্রথাগুলি ভালো না মন্দ তা ভিন্ন বিতর্কের বিষয়, কিন্তু ঔপনিবেশিক প্রভুর উদ্দেশ্য পরিষ্কার। প্রচলিত সমাজ কাঠামোকে ভেঙে ফেলতে পারলে, কলকাতাকে কেন্দ্র করে শিক্ষা-সংস্কৃতি-বিনোদনের দৃষ্টান্তে ব্যক্তিগত নৈব্যর্ক্তিক অভ্যাসে পরিণত করতে পারলে, আখেরে তারই লাভ। অতএব উনিশ শতকের সূচনায় কিংবা প্রথমার্ধের শেষেও গুটিকতক বাবুর দেখা মিললেও, উনিশ শতকের কলকাতায় যেন বাবুর বাজার বসেছিল। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুরা মদ্যপান, পরনারীপ্রীতি, স্ত্রীশিক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলিকে তাঁদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত হিসাবে দেখতে শুরু করেছেন তখন। 'বাবুত্ব' আর বংশগত বা স্বভাবগত কোনো বৈশিষ্ট্য নয়, তা সহজেই অর্জন করা যায় এবং আচরণগত অভ্যাসমাত্র। ইন্দ্রনাথ বিস্তৃতভাবে বাবুত্বের এই আভিজাত্যহীন অভ্যাসগত সম্প্রসারণের কথা বলেছেন :

'বাবু সেকালেও ছিল, কিন্তু এমন ছিল না, এত বেশীও ছিল না। তখন একটা পরগণা খুঁজিয়া এক ঘরে বেশী বাবু মেলা ভার হইত। বাবুগিরির খরচও ছিল। অতিথি-অভ্যাগতের আশ্রয়, ব্রাহ্মণ-সজ্জনের সম্মানকর্ত্তা, দীন-দুঃখীর অন্নদাতা, দাস-দাসীর প্রতিপালক, লোকসমাজের পরিচালক— এ সব না হইলে আর বাবু হইত না। কিন্তু এখনকার দিনে বাবু হইতেও যেমন সুবিধা, হইলেও তেমন সুবিধা। যাহার পাটকরা চুল, পাটভাঙা জামা, আর পায়ে বুটজুতা, সে ত এখন পহিলা নম্বরের বাবু। জাতি লুকাইবার প্রয়োজন থাকিলে, পিতৃপুরুষের পরিচয় দিতে সঙ্কোচ বোধ হইলে— সর্ব্বাপেক্ষা সহজ পন্থা— বাবু হওয়া। বাপ-পিতামহ চাই না, বাড়ী ঘর চাই না, বাস্তভিটা চাই না, বার তিথি চাই না, আচারবিচার চাই না— শুধুই বাবু। তাই এখন আদালতের আমলা বাবু, কারখানার কেরাণীবাবু, মালগুদামের মার্কাবাবু, পাড়াগাঁয়ে পোষ্টবাবু।'[৬৯]

বঙ্কিমের 'বাবু' প্রবন্ধের বক্তব্য যেন প্রতিধ্বনিত হয়েছে ইন্দ্রনাথের কণ্ঠে। জাতি-কুলশীল রহিত মিশ্রণের প্রতি, ব্রাহ্মবাবুদের নির্বিচার সংস্কার ও আধুনিকতার নামে প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টিকোণের বিপরীত বিচারের প্রতি ইন্দ্রনাথের রক্ষণশীল দৃষ্টিকে চেনা যায়, কিন্তু 'বাবু' প্রসঙ্গে তথাপি তাঁর মত ঐতিহাসিক সত্যেরই আনুগত্য করেছে। নতুন যুগের বাবুরা বংশগত কিংবা জাতিগত পরিচয় হারিয়ে বাবু হয়ে বসেননি, খোদ 'বাবু'ই তার বংশগত, জাতিগত আভিজাত্য, পরিচয় হারিয়ে সাধারণের বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোকে'র আচরণগত ধর্মে পরিণত হয়েছে। চাকরিজীবী মধ্যশ্রেণির পক্ষে দানধ্যান, অতিথি-পালন, দীন-দুঃখীর প্রতিপালন ইত্যাদি কর্মে নির্বিচার সংস্রব রাখা সম্ভব ছিল না, ফলে সমাজের 'অপর' অংশ থেকে কোনো আনুগত্য, সমর্থন বা সহানুভূতি লাভে তাঁরা বঞ্চিতই রয়ে গেছেন। ছড়া-কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বলেছিলাম, আদি ও নববাবুদের প্রতি কলকাতার সাধারণ লোকায়ত সমাজের একটি গোপন সহানুভূতির ভাব ছিল। ফলে, তাঁদের দোষ-ত্রুটি দেখিয়েও লোকায়ত-সমাজের প্রসন্ন প্রশ্রয় গোপন থাকেনি, কিন্তু নব্যবাবু এবং 'ভদ্রলোক'বাবুরা কেবল ব্যক্তিগত বাবুয়ানার সুখভোগে ব্যস্ত রইলেন বলে, আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে উক্ত বাবুয়ানার সূত্রে লোকায়ত সমাজের সঙ্গে কোনো আদানপ্রদানের সূত্র স্থাপিত হল না বলে, সর্বোপরি দেশীয় সমাজ-কাঠামোকে অস্বীকার ও সংস্কার করতে

চাইলেন বলে, লোকায়ত সমাজ ও সমাজের রক্ষণশীল অংশ তাঁদের প্রতি বিরূপ হয়ে পড়লেন। 'বাবু' শব্দটি যে ক্রমশ আভিজাত্যজ্ঞাপক অর্থ ত্যাগ করে হাসিঠাট্টা ও ব্যঙ্গের অর্থে প্রযুক্ত হতে শুরু করল, তার কারণ, নতুন কালের 'বাবু'দের প্রতি লোকায়ত সমাজের সংগত বিদ্বেষ, সহানুভূতিহীন মানসিকতা; যার দায় নতুন কালের 'বাবু'দেরই।

কিন্তু বিধবা বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা তথা সামগ্রিক নারীমুক্তির বিষয়টি তো কেবল ব্রাহ্মবাবুদেরই একচেটিয়া হয়ে থাকেনি, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ এর পক্ষে-বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছে বা করতে চেয়েছে। সাধারণভাবে নারীমুক্তি বা নারীস্বাধীনতার প্রসঙ্গে হিন্দু রক্ষণশীলদের দৃষ্টিকোণ বলিষ্ঠ হলেও সংস্কারপন্থী হিন্দুরা এ ব্যাপারে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। কিন্তু তবুও একথা মেনে নিতেই হয় যে, কলকাতার সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত পরিবারের কেউ, কলকাতার বিমিশ্র সমাজে যাঁদের আধিপত্য ও প্রভাব ছিল, তাঁরা সেভাবে এগিয়ে না আসায় বিধবা বিবাহ রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে সেভাবে গৃহীত হয়নি। ১৮৭৬-এ 'ইন্ডিয়ান মিরার' স্পষ্টই জানিয়েছেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গৌরবজনক ভূমিকা সত্ত্বেও 'there is hardly a single instance of a widow marriage in a high and respectable Hindu family'.[৭০] কিন্তু ব্রাহ্ম নয়, অথচ বিধবা বিবাহে আগ্রহী এমন হিন্দু যুবকেরাও যে কেউ কেউ ছিলেন, তা অনুমান করাই যায়। সমকালীন কোনো পত্রিকায় বিধবা বিবাহ করতে ইচ্ছুক পাত্রদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'ইহার মধ্যে হিন্দু আছেন, ব্রাহ্ম আছেন ও নাস্তিক আছেন। কাহার বা এক স্ত্রী অদ্যাপী বর্ত্তমান।'[৭১] বিশেষ করে কলকাতায় পাঠরত কিংবা 'কলেজ-শিক্ষিত' বাবুদের এ বিষয়ে যথেষ্ট সুনাম বা দুর্নাম ছিল। রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসার' উপন্যাসের (১৮৮৬) শরৎ মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবু। সে ব্রাহ্ম নয়, হিন্দু। কলকাতায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। বালবিধবা সুধাকে সে সমাজের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকে আমল না দিয়েই বিবাহ করেছে। দামোদর মুখোপাধ্যায়ের 'বিমলা' (১৮৭৭) উপন্যাসে নরেন্দ্র শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবু। বহুপ্রচলিত সামাজিক রীতিকে লঙঘন করেই সে বালবিধবা মনোরমাকে বিবাহ করেছে, তার জন্য কোনোরকম দ্বিধা-সংকোচ তার মধ্যে দেখা যায়নি। আদর্শে উজ্জ্বল, কর্তব্যে বলিষ্ঠ নরেন্দ্রবাবু মুক্তমনেই অবশ্যকর্তব্য বলে মনোরমাকে নির্বাচন ও পাণিগ্রহণ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শৈশব সহচরী' (১৮৭৮) উপন্যাসের বালবিধবা কুমুদিনীকে বিবাহ করতে চেয়েছে অবিবাহিত শরৎকুমার এবং বিপত্নীক রজনীকুমার। তারকনাথ বিশ্বাসের 'কমলা' (১৮৮৩) উপন্যাসের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক' প্যারীবাবু মাত্র আট-ন'বৎসরে বিধবা কমলাকে বিবাহ করতে চেয়েছে এবং সমাজ যদি এর অনুমোদন না করে তবে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে :

'আমি ঈশ্বর সাক্ষী করে তোমায় বিবাহ করব। সমাজের ভ্রূকুটি পদতলে বিদলিত করে, তোমার হৃদয়ে ধারণ করে প্রাণ জুড়াব। আমি যতটুকু লেখাপড়া শিখেছি তাতে এক প্রকারে তোমায় সুখে স্বচ্ছন্দে রাখ্‌তে বোধ হয় কখনই অকৃতকার্য হব না।'[৭২]

একই কথা বলেছে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুখানি ছবি' (১৮৮৮) উপন্যাসের নায়ক বিনয়। সে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, সংস্কারপন্থী মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'। বাল্যবিবাহকে সে অন্তর থেকে ঘৃণা করে বলেই কৈশোরে বিবাহ করেনি। যে আধুনিক শিক্ষায় সে শিক্ষিত, তার প্রভাবেই বিবাহকে সে নিতান্ত এক সামাজিক অনুষ্ঠান বা দেশাচার বলে মেনে নিতে চায়নি; তার কাছে :

'দুই ব্যক্তির মিলন সাধনের নামই বিবাহ— একজন আর একজনের কল্যাণসাধনে জীবন উৎসর্গ করিবে — নিজের প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে আর একজনকে ডুবাইবে ইহারই নাম বিবাহ। বিবাহ, পাপ ও মলিনতা হইতে মানুষকে রক্ষা করিবে, একথা বলিলে বিবাহ বস্তুটাকে অতি হীনভাবে দেখা হয়।'[৭৩]

এভাবেই সে অন্তরের টান অনুভব করে এবং বিধবা প্রেমমালাকে বিবাহ করে।

শরৎ, নরেন্দ্র, প্যারী, বিনয় এরা সব fictional character , বাস্তবে 'কলেজ পড়ুয়া' মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক' বাবুরা যে এতখানি উদারতা বা সৎসাহস দেখাতে পারতেন, এমন নয়। হয়তো পারতেন না বলেই সংস্কারপন্থী লেখকেরা মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুর কল্পিত কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত রূপে বিনির্মাণ করলেন। বাস্তবে সেটির অভাব পীড়াদায়ক, কল্পনার বাস্তবে তাকেই নির্মাণ করতে চায়। আর তার ফলে, শরৎ-নরেন্দ্র-প্যারী-বিনয় — এঁরা সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত, উদার, ইংরেজি শিক্ষার দ্বারা একইসঙ্গে জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত আবার দেশাচারের সংকীর্ণ প্রভাব বিমুক্ত, এঁদের চলনে-বলনে শিক্ষার গরিমা ফুটে বেরোয়, নারীমুক্তির প্রসঙ্গটিকে এঁরা অবশ্যপালনীয় কর্তব্য বলে মনে করেন, অবসর সময়ে সভা-সমিতি, 'সৎগ্রন্থপাঠ', আলাপ-আলোচনায় সময় অতিবাহিত করেন; একইসঙ্গে এঁরা সকলেই প্রায় রাজদ্বারে চাকরিপ্রার্থী। কেউ উকিল, কেউ সওদাগরি অফিসের কেরানি, কেউ পোস্টমাস্টার; কিন্তু প্রত্যেকেই অন্য পাঁচজনের মতো নয়, সাধারণের থেকে স্বতন্ত্র— জীবনযাত্রায়, চিন্তা চেতনায়, কাজেকর্মে, উনিশ শতকের শেষপাদে, ক্ষয়িষ্ণু-অসার-অনুকরণসর্বস্ব থেকে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির চরিত্র-বিকল্প বিনির্মাণে এভাবেই এগিয়ে এলেন সাহিত্যের বিচারে জনপ্রিয় নন, কিন্তু সামাজিক বিচারে প্রয়োজনীয় কিছু লেখক। বাঙালির জাতীয় চরিত্র বিনির্মাণ করতে গিয়ে তাঁরা ফুটিয়ে তুললেন আকাঙ্ক্ষিত বাস্তবের রূপ— শরৎ-নরেন্দ্র-প্যারী-বিনয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

১৮৫৭-তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পর যখন কেবলমাত্র কলকাতার নাগরিক মধ্যশ্রেণিই শুধু নয়, সুদূর মফস্সল থেকে সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্তরাও এগিয়ে এলেন শিক্ষার সুফল গ্রহণ করতে, এই শহরে, তখন শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির মধ্যেও একপ্রকার প্রতিরোধ ও শ্রেণি-সচেতনতার বোধ গড়ে উঠল। আসলে এর মধ্যেও মিশে রয়েছে আধিপত্যের প্রসঙ্গটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যখন সক্ষম সকল শ্রেণির জন্যই উন্মুক্ত হল, শিক্ষিত 'ভদ্রলোকে'র গোত্রভুক্ত হওয়া আর উচ্চবর্ণ, মধ্যশ্রেণির একচেটিয়া হয়ে রইল না, নিম্নমধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নবিত্তরাও তার অধিকারী হলেন বা হওয়ার সম্ভাবনা জেগে রইল, তখন আধিপত্যের প্রশ্নেই শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোকে'বাবুরা একজোট হতে চাইলেন। একে নিছক ধর্মীয় বা সামাজিক সংস্কার বলা যাবে না, এ একপ্রকার সাংস্কৃতিক-সংস্কার, যা সাংস্কৃতিক-আধিপত্যের (Cultural Hegimony) রূপ ধরে স্বশ্রেণির মধ্যেই 'সম্ভ্রান্ত' (Elite) ও 'প্রান্তিক'তার (Subalturn) অবস্থান চিহ্নিত করে। বিশ্ববিদ্যালয়- শিক্ষায় শিক্ষিত একদল 'ভদ্রলোকে'র লক্ষ্য ছিল জীবিকা— সরকারি বা বেসরকারি চাকরি লাভ, কারণ এর সূত্রেই জীবনযাপন এবং বর্তমান অবস্থান-বিন্দু থেকে উত্তরণ সম্ভব। বিশেষ করে সুদূর মফস্সল বা গ্রাম থেকে উচ্চশিক্ষার তাগিদে ভিড় করা শ্রেণি একেই পাখির চোখ দেখতেন। সভা-সমিতি, মিটিং-মিছিল, গ্রন্থরচনা, সামাজিক সংস্কার বা নারীমুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে এঁরা ততটুকুই যুক্ত হতেন, যতটুকু ব্যক্তিগত উন্নতির ক্ষেত্রে সহায়ক। সংখ্যাবিচারে এঁরাই বৃহত্তর অংশের প্রতিনিধি। কালক্রমে উনিশ শতকের শেষে এঁরাই 'কেরানিবাবু'-তে পরিণত হলেন। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবু হয়েও এঁরা তাই প্রান্তিকতার অবস্থানে আসীন। অন্যদিকে, আর এক দল মানুষ, যাঁরা মূলত কলকাতা ও তৎসন্নিহিত

অঞ্চলের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি, অর্থনৈতিক অবস্থান মোটের উপর স্থিতিশীল, সভা-সমিতিতে নিছক অংশগ্রহণ নয় বক্তব্যও রাখেন, গ্রন্থ রচনা দ্বারা নিজেদের মতামত চিন্তাকে প্রকাশ করার কথা ভাবেন, সামাজিক-সংস্কারে অংশ নিয়ে নিজেদের প্রগতিশীল ও স্বতন্ত্র বলে চিহ্নিত করতে চান,— এঁরা শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'দের মধ্যে 'এলিট' বলে চিহ্নিত হলেন। এঁদের জীবনযাপনে, মননে-চিন্তনে ইউরোপের প্রবল উপস্থিতি। এঁরা কেউ ব্রাহ্ম, কেউ হিন্দু প্রগতিশীল বাবু; কিন্তু এঁদের সকলেই একটি স্বতন্ত্র পরিচয়ে এক— 'এলিট'।

প্রান্তিকতার অবস্থানে চিহ্নিত বাবুদের কাছে এই 'এলিট' বাবুরা এক মারাত্মক প্রলোভন বিশেষ। অতএব সামান্য অর্থনৈতিক সুস্থিতি দেখা দিলেই বা তার সম্ভাবনা দেখা দিলেও এঁরা কেউ হতে চান 'এলিট'বাবুদের মতো সংবাদপত্রের সম্পাদক, ইংরেজি স্কুলের পরিচালক, 'সৎগ্রন্থে'র রচয়িতা হিসাবে সুনীতির পরিপোষক কিংবা নারী-প্রগতির ক্ষেত্রে কীর্তিস্থাপক। দেশ, দেশোদ্ধার, জাতীয়তা, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদির সূত্রে এইসময় থেকেই ব্যক্তিপূজার ফ্রেমে 'এলিট' বাবুরা চিহ্নিত হচ্ছেন। তা ছাড়া উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে সরকারি খেতাব হিসাবে 'বাবু বাহাদুর' কিংবা শুধুই 'বাবু' প্রচলিত হলে,[৭৪] 'বাবু' অভিধার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল শাসকের ইচ্ছে-অনিচ্ছে বা recognition-এর প্রসঙ্গটি। শাসকদলের পক্ষে সহায়ক শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের একজোট করাই ছিল শাসকের লক্ষ্য। 'য়ুরোপীয়' জীবনযাপনের অভ্যাস, শাসকের হিত চিন্তা, ছদ্ম-জাতীয়তাবাদ, আবেদন-নিবেদনের ছলে ভিক্ষানীতি— অনেক 'এলিট' বাবুর এইসব বৈশিষ্ট্যগুলিকে শাসকের সুনির্দিষ্ট প্রকল্প হিসেবেই ভাবা সংগত। প্রান্তিক 'ভদ্রলোক'রা কেউ কেউ এসবকে অনুকরণ করতে চাইলেন, বেশিরভাগ অংশই নিশ্চেষ্ট রইলেন নিজস্ব সীমিত সাধ্যের জগতে। যেখানেই 'প্রান্তিক' হয়ে উঠতে চেয়েছে 'এলিট' বা এলিটের 'মত', সেখানেই 'এলিট' মধ্যশ্রেণি ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে তার নিজস্ব শ্রেণিস্বাতন্ত্র্যের অভিমানে 'প্রান্তিকে'র অবস্থান ও অধিকারের এলাকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'এলিট'দের মধ্যে একইসঙ্গে আনুগত্য ও আধিপত্যের দ্বন্দ্বের (subordination and dominance) কথা বলেছেন।[৭৫] একদিকে নিজের স্বার্থেই (পার্থ চট্টোপাধ্যায় যদিও অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁরা এরকম করতেন বলেছেন, কিন্তু সংগত কারণেই সেই ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করা গেল না) এঁরা বিদেশি শাসকের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছেন, অন্যদিকে এঁরাই আবার দেশীয় জনসমাজের উপর দেশ, জাতীয়তা ইত্যাদি ভাবনার সূত্রে আধিপত্য স্থাপন করেছেন। সন্দেহ জাগে, এই আধিপত্য বিস্তারে ছলে তাঁদের প্রতি অনুগত যে শ্রেণি এঁরা সৃষ্টি করতে চাইলেন, প্রকারান্তরে তা কি শাসকশ্রেণির প্রতিই অনুগত হল না? তা ছাড়া, নিজেদেরকে মধ্যশ্রেণির চেয়ে কিছুটা হলেও উচ্চ অবস্থানে চিহ্নিত করতে চেয়ে যে উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম দিলেন এঁরা, তার দরুন বৃহত্তর মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের কাছে এই এলিট শ্রেণি নিজেরাই প্রান্তিকতার ক্ষেত্রে চলে গেলেন, যাকে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন 'Subalternity of an Elite'। এ এক অদ্ভুত অবস্থা! মধ্যশ্রেণিরই ইংরেজি শিক্ষিত যে 'এলিট'বাবুরা প্রান্তিকতার অবস্থানে ঠেলে দিতে চেয়েছেন বৃহত্তর শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির মানুষদের, তাঁরা নিজেরাই 'প্রান্তিক'। কিন্তু তৎসত্ত্বেও 'এলিট' হয়ে উঠতে চাওয়া 'প্রান্তিক'দের তাঁরা সহজে গ্রহণ করতে চাইলেন না, 'কেরানিবাবু'দের থেকে সসম্ভ্রম দূরত্বে সরে রইলেন, এবং ছদ্ম-এলিটদের ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে ক্ষতবিক্ষত করতে চাইলেন।

চন্দ্রনাথ বসু-র 'পশুপতি-সম্বাদ' তেমনই এক ছদ্ম-এলিট বাবুর কাহিনি। বঙ্কিম সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে'র দশম বর্ষ, ১৮৮৩ নভেম্বর সংখ্যায় 'উপন্যাস' এই গোত্র নির্দেশে রচনাটির প্রকাশ শুরু হয়, শেষ হয় ডিসেম্বর ১৮৮৩ সংখ্যায়। কলকাতার অনতিদূরে গোধনপুর গ্রামের পশুপতি জাতিতে ব্রাহ্মণ, ভট্টাচার্য বংশের সন্তান। তার পিতা উমাপতি ভট্টাচার্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। পুত্র কালক্রমে 'মহা পরাক্রমশালী দ্বিগ্বিজয়ী মহাপুরুষ' হয়ে উঠবে এই আকাঙক্ষায় উমাপতি পুত্রকে গ্রামের পাঠশালায় দাখিল করে দিয়েছেন। কিন্তু পশুপতির পড়ায় মন নেই। পাঠশালায় যাওয়ার নাম করে সে নানারকম দুষ্কার্য করে বেড়ায়। প্রথমত গুরুমশাই তাকে শাসন করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে উমাপতির কাছে ছেলের দুষ্কর্ম সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন; পিতা কর্তৃক ভর্ৎসিত হয়ে পশুপতি বাবার তামাক চুরি করে গুরুমশাইকে ভেট দিয়ে তাঁর মুখ বন্ধ করেছে। অবশেষে গুরুমশাইয়ের চারিত্রিক দোষঘটিত একটি গোপন সত্য জেনে সে প্রায় অবধ্য-অদম্য হয়ে উঠেছে। এই সূত্রেই গুরুমশাইয়ের অবৈধ প্রণয়িনী সাবিত্রী গোয়ালিনীর সঙ্গে তার কিছু 'হৃদ্যতা'র সম্পর্কও গড়ে উঠেছে। কিন্তু পশুপতির দৌরাত্ম্য ক্রমে বৃদ্ধি পেলে 'কিঞ্চিৎ ইংরেজি লেখাপড়া শেখানো'র অভিপ্রায়ে পশুপতিকে তার পিতা কলকাতায় নিয়ে এলেন। সেখানে উমাপতির জনৈক অবস্থাপন্ন যজমান পটলডাঙার কাঙালিচরণ চক্রবর্তীর বাড়িতে সভাপতির থাকা ও খাওয়ার বন্দোবস্ত হয়েছে, অন্যদিকে 'অপকৃষ্ট এবং অপযশদূষিত' পল্লীর জনৈকা 'প্রাচীনা এবং সঙ্গতিপন্না ব্রাহ্মণী শিষ্যা' তার ইস্কুলের বেতন ও বইপত্র কেনার ভার নিয়েছে।

কিন্তু কলকাতার স্কুলে পশুপতির ভর্তি হওয়াই সার। ইস্কুলে গিয়ে ক্বচিৎ-কদাচিৎ সে ক্লাসে উপস্থিত থাকে, বাকি সময়টা কপাটি খেলে, মালীর ঘরে মিঠাই ও তামাক খেয়ে কাটিয়ে দেয়। এভাবেই সে আট-আটটি বছর পার করেছে। মাঝে মাঝে গোধনপুর গিয়ে সাবিত্রী গোয়ালিনীর কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে কলকাতায় ফিরে রকমারি খাবার খেয়ে ও থিয়েটার দেখে কাটিয়েছে। অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে গিয়ে পাশের একজন নিরীহ ভালোমানুষ ছেলেকে মারধরের ভয় দেখিয়ে তার কাছ থেকে জেনে এবং বাকিটা বই থেকে লুকিয়ে নকল করে পশুপতি শুধু যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তাই নয়, একটি ছাত্রবৃত্তিও লাভ করেছে। অতঃপর 'পাস দেওয়া' পশুপতিকে তার পিতা কিছু অলংকার এবং নগদ টাকার বিনিময়ে বিবাহ দিয়েছেন। এরপর :

'... শ্রীমান্ পশুপতি ভট্টাচার্য্য দেখিলেন যে, তাঁহার বিবাহ হইয়াছে এবং তিনি একটা 'পাস'ও করিয়াছেন। অতএব তিনি এখন একটা মানুষ— একটা দ্গিজ পণ্ডিত বলিলেই হয়। অতএব আর পড়াশুনা অনাবশ্যক, বৃথা valuable সময় নষ্ট করা বই নয়।'[৭৬]

লেখাপড়া ছেড়ে পশুপতি দু'টো জিনিসে মন দিয়েছে,— এক. একজন Patriot হয়ে ওঠা, দুই. কাঙালিচরণের আঠারো বছরের বিধবা কন্যা কুঞ্জকামিনী দেবীকে 'অধিক রাত্রে গোপনে লেখাপড়া'শেখানো। নিন্দনীয় নানাপ্রকার কর্মে স্বাভাবিকভাবে অভ্যস্ত এই শ্রেণির patriot-রা চন্দ্রনাথ বসুর মতে, দুই-চারটি বড়ো বড়ো নীতিসূত্রে আউড়ে অপবাদ-স্খলনের চেষ্টা করে, পশুপতিও করেছে। ঘরের বাইরেও পশুপতিবাবু 'পরোপকার ব্রতে ব্রতী' :

'অতএব স্বয়ং পড়াশুনা ঘোর selfishness মনে করিয়া তিনি সাধারণের উপকারার্থ বক্তৃতা আদি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেশের যাহাতে উন্নতি হয়, প্রাণপণে সে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।' [৭৭]

এই উদ্দেশ্যে প্রথমেই পাড়ার কতকগুলি ছেলেদের নিয়ে সে 'Pataldanga Debating Club'-এর পত্তন করেছে এবং নিজে ওই ক্লাবের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে। এই ক্লাবে প্রতি সপ্তাহে 'ধর্ম্মবিষয়ক, নীতিবিষয়ক, ইংরেজ রাজার দৌরাত্ম্য বিষয়ক, এবং আরো অনেক বিষয় বিষয়ক প্রবন্ধ পঠিত' হত এবং প্রবন্ধ পাঠের শেষে ভূমিতে, টেবিলে ও কপালে পদাঘাত-মুষ্ট্যাঘাত-করাঘাত সহ তর্কবিতর্ক করে দেশোদ্ধারের কাজ চলত। দুই-এক মাস তর্কবিতর্ক চলার পর সভ্যরা সকলেই যে সিদ্ধান্তে একমত হয়েছেন, সে হল 'উদ্ধার' :

'ধর্মের উদ্ধার, নীতির উদ্ধার, জাতির উদ্ধার, দেশের উদ্ধার, বালবধূর উদ্ধার, বালবিধবার উদ্ধার, সমস্ত ভারতমহিলার উদ্ধার, বিদ্যার উদ্ধার, অবিদ্যার উদ্ধার, উদ্ধার উদ্ধার উদ্ধার।'[৭৮]

পশুপতি এখন গোধনপুর গ্রামের অশিষ্ট পশুপতি ভট্টাচার্য নয়, সে এখন রীতিমতো 'পশুপতিবাবু'। বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে এহেন পশুপতির সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত শুনে সকলে বাহবা দিয়ে উঠেছে। সে বঙ্কিমের চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসের নৈতিক দুষ্টতা সম্পর্কে সরব হয়েছে। একবার গৃহের অবরোধ ভেঙ্গে বের হওয়া সূর্যমুখীকে আবার সেই সংসারে ফিরিয়ে দেওয়া, বালবিধবা হীরাকে চূড়ান্ত যন্ত্রণা দিয়ে পাগল করে দেওয়া, বালবিধবা রোহিনীকে গুলি করে মেরে ফেলা— এইসব অনৈতিক ব্যাপার ঘটানোর জন্যই তার মতে 'বঙ্কিমবাবু'—

'হিন্দু রমণীর শত্রু— হিন্দু বিধবার শত্রু! তিনি আমার শত্রু, তোমার শত্রু, আমার স্ত্রীর শত্রু, তোমার স্ত্রীর শত্রু, তিনি শত্রুময়! তিনি দেশের শত্রু, ভারতের শত্রু, 'ভারতমাতার শত্রু।'[৭৯]

অতএব ক্লাবে যতগুলি বঙ্কিমের পুস্তক ছিল, সব পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। ক্লাবের 'উদ্ধারব্রতে' সামিল বাবুরা বুক বাজিয়ে নিজেদের 'Practical men' বলেছে, তাদের কথায়ও যা কাজেও তা। অবশ্য এরপর সভ্যগণ আর অপেক্ষা করতে পারেনি। 'রাত ন'টা' বাজে দেখে, বিশেষ 'দোকান' বন্ধ হবার আশঙ্কায় তারা দ্রুতবেগে ধাবিত হয়েছে।

পরের শনিবার আগের দিনের অসমাপ্ত ভাষণের জের টেনে পশুপতি কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'কপিবর' আখ্যা দিয়েছে। সে যেসব প্রশ্ন তুলেছে এবং সেই সূত্রে নিজস্ব অকাট্য সিদ্ধান্তে অটল থেকেছে, সেগুলি হল— এক. 'কবিতাবলী'র প্রথম সংস্করণে 'সংগতময়, সাহসময়, সম্ভূয় সমুত্থান 'কবিতা' 'ভারত-সঙ্গীত' থাকলেও, দ্বিতীয় সংস্করণে 'দুষ্ট, দুর্দ্দান্ত, দুর্ম্মতি, দূরভিসন্ধি, দুর্ব্বল সাহেবের ভয়ে' তা তিনি কি চুরি করে সরিয়ে রাখেননি? অতএব, সিদ্ধান্ত হল, হেমচন্দ্র চোর। দুই. 'বৃত্রসংহার কাব্যে' ইন্দ্রের অন্তঃপুরের অবরোধ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা শচীকে কেন আবার imprisonment করবার চেষ্টা করলেন হেমচন্দ্র? তাঁর সিদ্ধান্ত, শচী নিশ্চয়ই হেমচন্দ্রের কুৎসিত, কদর্য, কাতর অনুরোধ রক্ষা করেননি, ফলে বালবিধবা শচীর উপর ব্যক্তিগত রাগের কারণে হেমচন্দ্র শচীকে যৎপরোনাস্তি শাস্তি দিয়েছেন। তিন. হেমচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা' আসলে দশজন 'মহাবিদ্যা' তথা বারাঙ্গনার কথা। এদের সঙ্গে হেমবাবুর ব্যক্তিগত সম্পর্ক না থাকলে তিনি জানলেন কি করে এঁদের স্বরূপ? অতএব, তার সিদ্ধান্ত হল, হেমচন্দ্র বারাঙ্গনাসক্ত কদর্য পুরুষ এবং লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্যই বেদান্তসংহিতার 'অবিদ্যা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই প্রসঙ্গেই তার ব্যক্তিগত মত হল :

'বারবিলাসিনীর সহিত আমরাও আলাপ করিয়া থাকি; শুধু আলাপ কেন, প্রণয়ও করিয়া থাকি, এবং সুবিধা দেখিলে তাহাদের সহিত ঘরকন্নাও করি। কিন্তু আমাদের কথা এক, হেম বাবুর কথা আর এক।

আমরা বারবিলাসিনীদিগকে উদ্ধার করিব বলিয়া তাহাদের সহিত প্রণয় করি। হেমবাবু কি জন্য তাহাদের সহিত প্রণয় করেন? তিনি উদ্ধারের কত প্রয়াসী, তাহা তো দেখাই গিয়াছে।'[৮০]

এইখানেই শেষ নয়, অতঃপর সমকালীন অন্যান্য কবিদের সমালোচনা করে পশুপতি বলেছে :

এক. নবীনচন্দ্র সেনের 'নবীন বয়সে' কিছু 'তেজ' থাকলেও, তিনি এখন প্রাচীনের দলে, ফলে তাঁর কাছ থেকে কোনো কিছুরই উদ্ধারের আশা নেই।

দুই. কালীপ্রসন্ন ঘোষ 'প্রভাতচিন্তা'-'নিভৃতচিন্তা'র মতো বই লিখে প্রমাণ করেছেন তিনি শুধু চিন্তাই করতে পারেন, কাজের কাজ কিছু হয় না। কিন্তু একালের সভ্য শিক্ষিত বাবুদের 'moral courage' আছে, তাই তাঁরা কাজ খোঁজেন, অযথা চিন্তা করেন না।

তিন. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সেকেলে দ্বিজবর', বৃথা দর্শন নিয়েই তিনি থাকেন। তাঁর দ্বারা উদ্ধারের আশা তো নেইই, বরং তাঁকেই উদ্ধার করা উচিত। তবে সে কাজ দুরূহ বলে বারবিলাসিনীদেরই উদ্ধারের দায়িত্ব তাঁরা নিতে চান।

চার. অক্ষয়চন্দ্র সরকার খুব 'চোট্‌চাট্' বলতে পারলেও, আদতে তিনি নির্বোধ। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'সাধারণী' কেবল দেশের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন। বুদ্ধিমান হলে দেশের পক্ষে হিতকর এবং বাবুদের পরমপ্রিয় দাবা, শত-রঞ্চ, দশ-পঁচিশ প্রভৃতি বিষয়ে ভালো ভালো প্রবন্ধ লিখতেন।

পাঁচ. রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়সে ঝুড়ি ঝুড়ি কবিতা লিখলেও, যেহেতু তাঁর কোনো কবিতাতেই 'স্বদেশ', 'ভারত', 'ভারতমাতা', 'উদ্ধার' প্রভৃতি শব্দ দেখা যায় না, অতএব তাঁকে তারা কবি বলতে রাজি নয়। যতদিন বঙ্গে patriot আছে, ততদিন রবীন্দ্রনাথের কবিতার স্বীকৃতি মিলবে না। বিশ-পঞ্চাশ বছর পর বঙ্গে patriot দেখা যাবে না, কারণ বঙ্গ ক্রমেই অবনতির পথে চলেছে। এইসব সাহিত্য এবং সাহিত্যিকই তার প্রমাণ। সেদিন রবীন্দ্রনাথের কবিতা গৃহীত হতে পারে এবং বৃদ্ধ বয়সে patriot শূন্য বঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'কপীন্দ্ররূপে শোভা পাইবেন'।

ছয়. রামদাস সেন এবং রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কেবল প্রত্নতত্ত্ব নিয়েই কাটালেন, তার দ্বারা মানুষ-উদ্ধার সম্ভব নয়।

সাত. চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্ভ্রান্ত প্রেম' একটি জঘন্য বই, কারণ তাতে মরা মানুষের প্রতি ভালোবাসার কথা আছে। লেখক স্বয়ং অকর্মণ্য। পশুপতির বক্তব্য এই যে :
'আমরা যাহাকে ভালোবাসি, সে মরিয়া গেলে আর তাহাকে ভালোবাসি না। ভালোবাসা যত প্রচারিত হয়, ততই দেশের মঙ্গল, সমাজের মঙ্গল, বিশ্বের মঙ্গল। সেইজন্য আমরা বিবাহ করিয়া একটী রমণীতে ভালবাসা গুটাইয়া রাখিতে চাই না, অসংখ্য রমণীতে ভালবাসা এড়াইয়া দিই।'[৮১]

আট. তবে নেতিবাচক এত দৃষ্টান্তের মধ্যে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর 'ভারতোদ্ধার' পশুপতির মতে, 'বঙ্গের দিগের একমাত্র বাইবেল।'

পশুপতির এই সাহিত্য-সমালোচনা থেকে একটি সত্য কিন্তু স্পষ্ট হয়। ইংরেজি স্কুলের বিদ্যা তার যতই ফাঁকিতে শেষ হোক, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যতই সে দূরে থাকুক, সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তার জ্ঞান কম নয়। অন্তত সে যে সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি বিষয়ে ওয়াকিবহাল, তা বেশ বোঝা যায়। হতেই পারে যে উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে সাহিত্যের রস গ্রহণের ক্ষমতা সে লাভ করেনি, তার

অনুভূতি পরিপক্ক ও যথার্থ নয়। কিন্তু সে যে পড়ুয়া, তাতে সন্দেহ নেই। উনিশ শতকের শেষদিকে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির মধ্যে গ্রন্থপাঠ, গ্রন্থচর্চা এবং গ্রন্থরচনার প্রসার ঘটেছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে, এ জাতীয় আচরণ শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির গর্বের বিষয় ছিল। সম্ভ্রান্ত 'এলিট' বাবুরা সকলেই গ্রন্থরচনা, গ্রন্থ-সম্পাদনা কিংবা গ্রন্থ-প্রকাশে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নব্যবাবু বাংলায় একাধিক পুস্তক রচনা-সংকলন-অনুবাদ করেন; প্যারীচাঁদের সঙ্গে রাধানাথ শিকদার 'মাসিক পত্রিকা' সম্পাদনা করেছেন; প্যারীচরণ সরকার মদ্যপানবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে জনমত গঠন করেছেন; ব্রাহ্মবাবুরা যেমন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখেরা গ্রন্থরচনা ও সংবাদপত্রে মতপ্রকাশকেই সামাজিক-যুদ্ধের হাতিয়ার হিসাবে দেখেছেন। এমনকী রাধাকান্ত দেবের মতো পুরাতনপন্থী বাবুও গ্রন্থ-প্রকাশে ও সম্পাদনায় এগিয়ে এসেছেন। আসলে গ্রন্থরচনা ও সম্বাদপত্রে মত প্রকাশকে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'এলিট' বাবুরা ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপূরক হিসাবেই ভাবতে শিখেছিলেন। বাবুত্বের কালোপযোগী নতুন সংস্করণে এই অভ্যাসটিও গুণ হিসাবে তথা বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা হচ্ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু পশুপতিরা যেহেতু 'ভদ্রলোক'বাবুদের 'এলিট' অংশ নন, ফলে তাঁদের শখ থাকলেও, সাধ্য কম বলেই, এভাবে উপহাসিত হতে হয়েছে। মনে রাখতে হবে, 'বিষবৃক্ষ' বা 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র পরিণতি উত্তরকালের রসিক সমালোচকের মনেও ঔচিত্যবোধের সংগত প্রশ্ন তুলেছে। হেমচন্দ্রের 'ভারতসঙ্গীত'-এর অপসারণ ও তার কারণ যেমন বাস্তব, 'বৃত্রসংহারে'র ঔচিত্য ও রসসৌন্দর্য তেমনই প্রশ্নের অপেক্ষা রাখে। অতএব পশুপতির মতো 'প্রান্তিক' ভদ্রলোকবাবুরা তুলনায় যতই কম শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত হোন না কেন, তাঁদের বোধের ভাঁড়ার যে একেবারে শূন্য, এমন কথা বলা চলে না।

কেউ কেউ এমনটি মনে করেন, পশুপতি চরিত্রটির মধ্য দিয়ে চন্দ্রনাথ সমকালীন সংস্কারপন্থী হিন্দুদের, বিশেষ করে ব্রাহ্মবাবুদের আক্রমণ করেছেন। ব্রাহ্মবাবুদের সমাজ-সংস্কার প্রয়াস, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার উদ্যোগ, বিধবা বিবাহ ইত্যাদি সম্পর্কে তীক্ষ্ণ ক্যারিকেচার করাই চন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য।[৮২] চন্দ্রনাথ হিন্দু সংস্কারপন্থীদের ক্যারিকেচার করলেও, ব্রাহ্মবাবুদের সম্পর্কে তাঁর নিরুৎসাহ হওয়াই স্বাভাবিক। হিন্দু রক্ষণশীলরা ব্রাহ্মদের 'হিন্দু' বলে আদৌ স্বীকার করত কি? রক্ষণশীল হিন্দু চন্দ্রনাথও 'ব্রাহ্মণ' পশুপতির অধঃপতন আঁকলেন কারণ, কলকাতার বিমিশ্র সংস্কৃতিতে শিক্ষার সুযোগে জাতপাতের সংস্কৃতি বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। প্রচলিত হিন্দু ধর্মের আওতা ত্যাগ করে যাঁরা ব্রাহ্ম হয়েছিলেন, রক্ষণশীল চন্দ্রনাথ উক্তবাবুদের জন্য বিলাপ করেননি। পশুপতি ব্রাহ্মণ, অথচ ব্রাহ্মণের কৃতকর্ম কিছুই পালন করে না, এর ফলেই চন্দ্রনাথ বেশি আতঙ্কিত। জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছেন, 'পশুপতিকে কখনোই সমকালীন ব্রাহ্ম বা হিন্দু মতাদর্শে বিশ্বাসী অগ্রণী এলিটদের পংক্তিভুক্ত করা যায় না। পশুপতির আচার-আচরণ, শিক্ষা-দীক্ষা, অভিব্যক্তির ভিতর এমন এক ধরনের গ্রাম্যতা, শিক্ষাহীনতা ও অপরিশীলতা রয়েছে, যে, পশুপতিকে, চন্দ্রনাথের সমতুল্য অন্য কোনো প্রতিপক্ষ গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে ভাবা অসম্ভব। পশুপতির ভিতর এমন এক ধরনের Subalternity রয়েছে, যার ফলে পশুপতিকে কোনোভাবেই চন্দ্রনাথের প্রভাববলয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।'[৮৩] কিন্তু পশুপতি বা পশুপতির মতো মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোকে'র বৃহদংশই যেখানে 'এলিট' গোত্রভুক্ত নন, সেখানে তাকে 'এলিটদের পংক্তিভুক্ত' করার চেষ্টাই বা করবেন কেন চন্দ্রনাথ? তা ছাড়া তথাকথিত 'প্রান্তিকরাই' বৃহংদশ বলে, 'এলিট' বাবুরাই

Subaltern হয়ে পড়েন। সেইস্থান থেকেই Subaltern এলিট বাবুরা আধিপত্য বা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে চান 'গ্রাম্য, অশিক্ষিত, অপরিশীল' পশুপতিদের উপর। পশুপতির আচার-আচরণে গ্রাম্যতা ও অপরিশীলন থাকতে পারে, কিন্তু সে পুরোপুরি 'শিক্ষাহীন' ছিল এমনটিই বলা যায় কি? 'এলিট' মধ্যশ্রেণি যখন সমালোচনার ছলে অন্যের উদ্ধার করেন কিংবা ব্যক্তিগত মত চাপিয়ে দিতে চান, সেও একপ্রকার অপরিশীলন নয় কি? পশুপতির ব্যক্তিগত মত, ভাবনা, তার রুচি-শিক্ষা অনুযায়ী স্বাধীনভাবে ব্যক্ত হয়েছে বলেই কি শিক্ষিত উচ্চবর্ণের এত জ্বালা? মনে রাখতে হবে, পশুপতি অল্পশিক্ষিত হলেও তার বাংলা গ্রন্থবিষয়ে জ্ঞান, সভাস্থ সকলের উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা, তাৎক্ষণিক বুদ্ধি এবং অবশ্যই ভণ্ডামিটি খাঁটি। পশুপতির মতো মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের 'এলিট'বাবুরা সংশোধনের মাধ্যমে সত্যিই কি নিজ গোত্রভুক্ত করতে চান? তাই চায় কেউ কখনো?

পশুপতির মতো বাবুদের দোষ অনেক। সভা ভঙ্গ হবার পর মদ্যপান কিংবা বেশ্যালয়ে গমনজনিত দোষে তারা দুষ্ট। কিন্তু এই দোষ সমকালীন কলকাতার অনেক 'এলিট'বাবুরই ছিল। 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র প্রখ্যাত সম্পাদক, উনিশ শতকের অন্যতম উজ্জ্বল বাঙালি হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী জানিয়েছেন যে, প্রথম পত্নীর মৃত্যুর পর তাঁর নবপরিচিত ধনী বন্ধুরা তাঁকে সুরাপান ও অন্যান্য নিন্দিত আমোদে লিপ্ত করে তাঁর শোক কাটানোর চেষ্টা করেন এবং হরিশচন্দ্র এই অভ্যাস উত্তরকালে আর ছাড়তে পারেননি।[৮৪] এই অভ্যাসগুলি ক্রমশ নাগরিক বাঙালির Social taboo-তে পরিণত হয়েছিল বোধ হয়। নববাবুদের মধ্যে এই অভ্যাসের অতিরেক দেখা যেত, নব্যবাবুরা রুচিস্বাতন্ত্র্যে বেশ্যাগমনের অভ্যাস থেকে নিজেদের সযত্নে সরিয়ে রেখেছিলেন। মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক' শ্রেণিও অর্থকরী কারণেই এবং নতুন শিক্ষার প্রভাববশত প্রথমত এসব থেকে দূরে সরে থাকলেও, ক্রমে স্ত্রীস্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ ইত্যাদির তাৎক্ষণিক আবেগের ঢেউ প্রশমিত হতেই, এইসব সূত্র ধরেই অন্ধকার জমে উঠল। সংস্কার ও স্বাধীনতার ছলে অনেক ক্ষেত্রেই সর্বনাশ হল নারীদের। পাশাপাশি ছিল নতুন গড়ে ওঠা নাগরিক পরিবেশে বিভিন্ন শ্রেণির চাহিদার কারণে ভিড় জমিয়ে তোলা হতভাগ্য বারাঙ্গনাদের প্রলোভন। পশুপতি উভয় রসের রসিক। সে যেমন বারাঙ্গনা পল্লীতে যায়, তেমনি ঘরে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও কাঙালিচরণবাবুর আঠারো বছরের বিধবা মেয়ে কুঞ্জকামিনীর সঙ্গেও অবৈধ সংসর্গ গড়ে তোলে। অবশেষে সভার পরদিন 'বাবার অসুস্থতার অজুহাতে' সে কুঞ্জকামিনীকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে অন্যত্র থাকতে শুরু করেছে। পটলডাঙা ডিবেটিং ক্লাবের সভ্যগণও 'উদ্ধারকার্য একজন সভ্যের নয়, সমস্ত সভ্যের' ক্লাবের এই নিয়মানুযায়ী পশুপতির গোপন আশ্রয়ে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। অতঃপর "Pataldanga Debating Club" -এর সুশিক্ষিত সুরুচিসম্পন্ন দেশহিতৈষী সভ্য মহাশয়গণের উদ্ধার প্রণালী' দেখে কুঞ্জকামিনী ঘৃণায় আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে।

পশুপতির পিতা সত্যই অসুস্থ ছিলেন। পশুপতিও তা জানত। কুঞ্জকামিনীকে নিয়ে পালানোর দিন সকালে তার এক অভিন্ন সুহৃদ প্রমোদাকে 'মৌতাত' ভঙ্গ করে, ঘুম থেকে তুলে ক্লাবের অস্থায়ী president-এর পদ নিতে অনুরোধ করছে এবং বাবার অসুস্থতার কথা শুনে প্রমোদা সেই 'old fool যখন পটল pluck' করবে, তখন খবর দিতে বলেছে। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির এই নির্মম রসিকতা, কিংবা বলা ভালো নির্বোধ আচরণ প্রসঙ্গে লেখক মন্তব্য করেছেন :

'এখনকার শিক্ষিত বাবুদের একটা রোগ হইয়াছে— তাঁহারা মনে করেন যে তাঁহাদের শ্রীমুখ হইতে যাহাই নির্গত হয়, তাহাই রসিকতা। তাই তাঁহারা দিবা রাতির রসিকতা করিবার নিমিত্ত শরীরের বত্রিশটা

নাড়ী ধরিয়া টানাটানি করেন, এবং রসিকতা করিতে পারুন আর নাই পারুন, প্রতি কথায় জোর করিয়া বেয়াড়া হাসি হাসিয়া প্রমাণ করিয়া থাকেন যে তাঁহারা বড় রসিক।'[৮৫]

পশুপতিও অতএব উক্ত নির্বোধ রসিকতার প্রত্যুত্তরে 'হা হা' করে প্রতিহাসি হেসেছে। কিন্তু কুঞ্জকামিনীর মৃত্যুর পর গোঁফজোড়া কামিয়ে সে কলকাতা থেকে পালিয়ে গোধনপুরে ফিরে এসেছে এবং 'গয়ায় বাবার উদ্ধারের জন্য একেবারে পিণ্ডদান করে এসেছে,' এমন কথা বলে সকলের প্রশংসার ভাগীদার হয়েছে।

পশুপতির গোধনপুরে ফিরে আসার একটি গুরুতর কারণ ছিল, অনেকদিন কামাই করায় ছাত্রবৃত্তি বন্ধ হওয়া। শ্বশুরবাড়িতেও সে ক্ষোভবশত থাকতে চায়নি। কারণ তার স্ত্রী রত্নমঞ্জরি পশুপতির অনেকবার বলা সত্ত্বেও কলকাতার 'ক্লাবের সভ্যগণের সহিত আলাপ প্রণয় এবং পান ভোজন' করতে সম্মত হয়নি; সে কেবল পশুপতিকেই ভালোবাসতে পারে। 'যে পত্নী দশজনকে প্রেম ভাগ করিয়া দিতে সম্মত হয় না', এমন পশ্চাদ্‌পর স্ত্রীর বাপের বাড়িতে পশুপতি কেমন করে থাকে? অতএব সে গোধনপুর ফিরে এসে গ্রামের ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বংশীয় যুবকেরা, যারা কলকাতায় চাকরি করে এবং শনিবার শনিবার বাড়ি ফেরে, তাদের নিয়ে 'দেশের উদ্ধার গোধনপুরকে সভ্য ও উন্নত' করার কাজে ব্রতী হল। এই উদ্দেশ্যে গোধনপুর গ্রামে এক রবিবার বিকাল বেলা পশুপতিকে সভাপতি করে বিরাট এক সভার আয়োজন করা হল। এই সভায় পশুপতি হাত মুখ নেড়ে, বুক চাপড়ে ও টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করে 'গোধনপুরের আপামর সাধারণের মনের অন্ধকার নিবাইয়া জ্ঞানের আলোক জ্বালাইয়া' দিতে 'গোধনপুরের রমণীকুলকে উদ্ধারে'র শপথ নিয়েছে। দু'টি স্ত্রীশিক্ষার স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। একটি বালিকাবিদ্যালয়, যেখানে দিনের বেলা বালিকারা লেখাপড়া শিখবে। অন্যটি নৈশ বিদ্যালয়— 'যে সকল বৈক্লব্য বিমোহিনী বিবাহিতা বা বিধবা স্ত্রী' আছেন, তাঁদের জন্য। কলকাতা থেকে মেমসাহেব ('বিবি') এসে পড়াবেন এবং এই স্কুল হবে অবৈতনিক। ইস্কুলের সমস্ত খরচ পশুপতিবাবুরাই বহন করবে। গ্রামের সাধারণ মানুষের দ্বিধা পণ্ডিতপ্রধান ন্যায়-বাগীশ মহাশয়ের স্বার্থপ্রসূত সমর্থনে কেটে গেছে। কলকাতা থেকে মিস্ এলিজেবেথ জালিয়ানী এবং মিস্ ক্যাথরিন মুচিরানী নামে দুই শিক্ষয়িত্রী এসেছেন Feminine Night School-এ পড়ানোর জন্য।

অতঃপর গ্রামের সব যুবকই কলকাতার চাকরি ছেড়ে Feminine Night School-এর উন্নতিসাধনে ব্রতী হল। স্কুলের খরচ চালানোর জন্য patriot যুবকেরা বাড়ির মেয়েদের খাবার অর্ধেক করে দিলেন, তাঁদের গায়ের গয়নাগুলিও দুই শিক্ষিকার বেতন হিসাবে চলে গেল। Kate-এর বেতনের জন্য পশুপতি রুগ্ন মৃত্যুমুখী মেয়ের গলার হারটি ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেছে। ইতিমধ্যে পশুপতিবাবু গোধনপুরে একটি Public Library স্থাপন করেছেন। কিন্তু গ্রামের মেয়েদের গয়না আগেই নিঃশেষিত বলে লাইব্রেরিতে বই কেনার মতো অর্থ- সংস্থান ছিল না। ফলে গ্রন্থকারদের কাছে বই চেয়ে পাঠানো হলে দু'একজন দু'একটি বই পাঠালেও বঙ্কিমবাবু বইদিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করায়, পশুপতি ক্রুদ্ধ হয়ে প্রত্যুত্তর পাঠিয়েছে :

'আমরা practical men , কেবল ভবিষ্যৎ দেখি। সার কথা এই— আমরা patriot, দেশের লোকের উপকারার্থ এবং আপনাদিগের ন্যায় ন্যায্য, অন্যায্য নয়নচকোর গ্রন্থাকারদিগের উপকৃতকারার্থ Public Library স্থাপন করিয়াছি।'[৮৬]

সে তিনমাসের মধ্যে নিজে গ্রন্থ লিখে বাকি সব বইকে এবং বইয়ের লেখকদের ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেছে।

যেমন কথা তেমনি কাজ। সাতদিনের ভিতর পশুপতি 'আশ্চার্য্য কাশীবাসী' উপন্যাস লিখে একমাসের মধ্যে ছেপে এবং মফসসলের বাংলা সংবাদপত্রের সম্পাদককে বলে কয়ে ভালো সমালোচনা প্রকাশ করেও বাজারে বই বিক্রি হয়নি। কলকাতার অভিজাত কাগজগুলি— অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'সাধারণী', চন্দ্রনাথ বসুর 'ক্যালকাটা রিভিউ'— 'অবক্তব্য কলঙ্করাশি' বলে বিলক্ষণ নিন্দা করেছে পশুপতির বইয়ের। তখন টাইটেল পেজ ছিঁড়ে ফেলে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ লিখে বিজ্ঞাপন দিলেও বই বিক্রি হল না। অতঃপর ছাপাখানা থেকে উকিলের চিঠি পেয়ে পশুপতিবাবু তার শেষ সম্বল ৪ বিঘা ব্রহ্মোত্তরের মধ্যে সাড়ে তিন বিঘা বিক্রি করে ছাপাখানার পাওনা একশো পঞ্চান্ন টাকা তেরো আনা দুই পয়সা মেটালেন।

দেশোদ্ধারের কাজে ব্রতী পশুপতিবাবুর এই দুর্দশা কেবল তার একার নয়; 'গোধনপুরের সমস্ত বাবুদিগের আজ এই দশা'। কেউ পেট ভরে খেতে পায় না, কেবল সন্ধ্যার পর তামসিক বিদ্যালয়ে কোথা থেকে দুধ আসে, 'বাবুরা তাহাই একটুকু আধটুকু খাইয়া থাকেন'। গ্রামের গোপকৃষকেরা তাদের মেয়েদের ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে। ব্যথিত পশুপতি দেশোদ্ধারের কাজে সাহায্য করতে এবার একটি গীতিকাব্য লিখেছে। একেবারে ১০০০ কপি ছাপা হলেও বই বিক্রি না হওয়ায় Copyright বিক্রি করবার চেষ্টা করেছে সে। কিন্তু কোনো সম্ভ্রান্ত পুস্তক বিক্রেতাই কপিরাইট কিনতে রাজি না হওয়ায় ওজনদরে বইগুলি বিক্রি করেছে ছোটো এক দোকানদারকে ছয় টাকা মূল্যে।

এর মধ্যে তার মায়ের মৃত্যু হয়েছে, স্ত্রীও শয্যাগতা। গোধনপুরে ফিরে আসতে না আসতেই শিয়ালদহের ছোটো অদালত থেকে তার নামে শমন এসেছে। ছাপাখানার ১৮৩ টাকা সাত আনা তিন পয়সার দাবি জানিয়ে। নির্দিষ্ট দিন আদালতে উপস্থিত হয়ে পশুপতিবাবু সাফ জানিয়েছে :

'আমরা patriot, যাহারা patriot তাহারা কি নিজের জন্য খায়, নিজের জন্য পরে, নিজের জন্য বিবাহ করে, নিজের জন্য বই লেখে, নিজের জন্য বই ছাপায়? কখনই নয়। তাহারা সব পরের জন্য করে। অতএব দেশের লোকের কর্ত্তব্য যে তাহারা patriotদিগকে খাওয়ায়, বিবাহ দিয়া দেয়, বই লিখিতে কাগজ কলম দেয়, বই ছাপাইবার খরচ দেয়। সকলের নিতান্ত, নিরূপম, নির্ব্বীয্য, নির্ব্বন্ধাতিশয় কর্ত্তব্য যে তাহারা patriotদিগকে যথাসর্ব্বস্ব দেয়, নইলে patriot-গণ কেমন করিয়া দেশকে তাহাদের হৃদয় সর্ব্বস্ব দিবে?'[৮৭]

পশুপতির এহেন যুক্তিতে অবশ্য আদালতের বিচারক সাহেবের প্রত্যয় হয়নি। পশুপতিকে ধার বাকির অপরাধে জেলে যেতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সাবিত্রী ঠাকুরানির উদ্যোগে পশুপতি খালাস পেয়ে দু'জনে একসঙ্গে 'হাবড়ার ইস্টিশনে গাড়িভাড়া করিয়া দেশ ছাড়িয়া উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে চলিয়া গেলেন' এবং তার ফলে 'দেশ যথার্থই উদ্ধার' হয়েছে।

লক্ষণীয়, পশুপতির জীবনবৃত্তান্তের আদিকাণ্ডে তথা তার বাল্যকাল, বিদ্যাশিক্ষায় 'আলালের ঘরের দুলালে'র ছায়া স্পষ্ট। কিন্তু প্যারীচাঁদ মতিলালের জন্য শেষপর্যন্ত একটি সহিষ্ণু বাতাবরণের সৃষ্টি করে তার চরিত্র সংশোধনের ব্যবস্থা করে দেন এবং সংশোধিত চরিত্র মতিলাল শেষপর্যন্ত পারিবারিক চেনা পরিবেশে পুনর্গৃহীত হয়। কিন্তু পশুপতিবাবুর জন্য সে সুযোগ দিতে নারাজ রক্ষণশীল 'এলিট' বাবুরা। তাকে দেশছাড়া হতে হয়। দু'ভাবে ব্যাপারটি ভাবা যেতে পারে। এক. ছদ্মশিক্ষিত 'বাবু'দের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে সমাজ। অসংযতপ্রবৃত্তি, অমার্জিত, নিন্দিত চরিত্রের বাবুরা নতুন সামাজিক বীক্ষায় আর

গৃহীত হচ্ছেন না। বাবুদের কাল শেষ। তাঁদের জন্য কোনো সহানুভূতি বা প্রশ্রয়ের চাদর বিছিয়ে রাখতে নারাজ সমাজ। দুই. ব্যাপারটি এত সহজ-সরল নয়। এ লড়াই বাবুয়ানার সঙ্গে সামাজিক দৃষ্টির লড়াই নয়, এ লড়াই মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক' বাবুদের নিজস্ব শ্রেণিদ্বন্দ্ব— এলিট ও প্রান্তিক মধ্যশ্রেণির বাবুদের দ্বন্দ্ব। তথাকথিত patriotism সম্পর্কে পশুপতির মূল্যায়ন বা বোধ হাস্যকর হতে পারে, নির্বোধ বলে মনে হতে পারে; কিন্তু সমকালে পশুপতি-কথিত এলিট patriot-দের যে এ জাতীয় মানসিকতা দেখা যায়নি, তাই-বা কে বলবে? যে ইউরোপ এলিট বাবুদের জ্ঞানে-মননে-চিন্তনে নবরূপ পেয়েছিল মূলত ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে, সেই ইংরেজি শিক্ষা শেষপর্যন্ত জাতীয় জীবনে মেকি বাবুদের জন্ম দিয়েছিল— মেকি দেশপ্রেম, মেকি সাহিত্যরুচি, মেকি আদর্শবাদ, ছদ্ম জাতীয়তার ধারণা; patriot-দের সম্পর্কে তাঁরা যে মেকি অনুভবের তোষণ করবেন, তাতে আর সন্দেহ কী? পশুপতি সেই সত্যকে জনসমক্ষে নিয়ে এসেছে মাত্র। নতুবা ইংরেজ সম্পর্কে, ইউরোপ এবং ইউরোপের শিক্ষা সম্পর্কে একজাতীয় মোহভঙ্গ তৎকালীন সমাজের সবচেয়ে প্রগতিশীল অংশ ব্রাহ্মদের মধ্যেই ঘটেছিল। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (অগ্রহায়ন ১৯৯৮ শক। ৪০০ সংখ্যা) জনৈক লেখক সংগত প্রশ্ন তুলে বলেছেন : 'যখন দেখিতেছি যে, পাশ্চাত্য বশীকরণ শক্তি তোমার বিদ্যা বুদ্ধি সমস্তই গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, তখন কেমন করিয়া বলিব যে, পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণে তুমি শক্তির উপাসনা কর না। ... ইংরাজেরা শক্ত লোক, তাহারদের প্রলোভন শক্ত প্রলোভন, তাহারদের বাহুবলে শক্ত বাহুবল, অতএব ইংরাজি আচার ব্যবহার রীতি সকলই মস্তকে করিয়া পূজা করিতে হইবে; ইহাকেই শক্তির উপাসনা বলে। .... আমারদের নিজের দেশের পূর্ব্বাপর অবস্থা এবং লোকের ভাবগতি বিবেচনা করিয়া যে, দেশহিতার্থে কোনো সদুপায় অবলম্বন করিব, তাহা আমারদের দ্বারা হইবে না। তবে, ইংলন্ড দেশে যে যে প্রকার উপায় অবলম্বিত হইতেছে তাহার উপরে যদি দাগা বুলাইতে বল, তাহাতে আমরা আছি।'[৮৮] নব্যবাবুরাও সাহেবিভাবাপন্ন ছিলেন, তাঁদের মননে-চিন্তনে ইউরোপ অনুধ্যেয় ছিল। কিন্তু তাঁদের কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। স্বদেশের যাবতীয় রুচি-সংস্কৃতিকে তাঁরা নির্দ্বন্দ্ব ঘৃণা করতে, বিচার করতে কিংবা অস্বীকার করতে পারতেন কোনো ভান ছাড়াই। কিন্তু মধ্যশ্রেণির সাহেবিপনা একটু ভিন্ন। নব্যবাবুদের মতো এঁরা অনুসরণ করতেন না, অনুকরণ করতেন। চাকরি ও অন্যান্য নানান ব্যক্তিস্বার্থে সাহেব-প্রভুদের প্রসন্ন করতে এঁরা ইউরোপকে অনুকরণ করতেন, আবার দেশীয় সংস্কারের প্রতি দুর্বলতাও তাঁদের মধ্যে ছিল। কিন্তু 'দেশ' বলতে ফেলে আসা ফিউডাল কাঠামোকে আপাদমস্তক ভুলে গিয়ে নতুন ইউরোপীয় তাত্ত্বিকতার সর্বস্বকে মেনে নেওয়াও এঁদের পক্ষে কষ্টকর ছিল। অতএব 'কাষ্ঠ-পুত্তলিকার পার্লিয়ামেন্ট' স্থাপন করে বিদেশি ধরনে কিছু Nation-এর কথা বলে মধ্যশ্রেণির বাবুরা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করবার, গরিষ্ঠ সংখ্যক সাধারণ মানুষের উপর 'রাজনৈতিক নেতৃত্ব' নামক ফিউডাল-সুলভ আধিপত্য বিস্তারের পথ প্রস্তুত করেছিলেন।

পূর্বোক্ত প্রবন্ধেই লেখক নতুন যুগের বিদ্যাশিক্ষার হাত ধরে গড়ে ওঠা মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের সামাজিক অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন : 'এক্ষণে যদি কোন ব্যক্তির বিদ্যাশিক্ষা সাঙ্গ হইল, অমনি একদিক হইতে ওকালতি, একদিক হইতে ডাক্তারি এবং একদিক হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং এই তিন ব্যবসায় তিন দিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করে। যাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ পাথেয় সংস্থান আছে তাঁহারা ওকালতির মৃগতৃষ্ণিকার দিকে ধাবিত হন, এবং সেই পাথেয় যত শেষাবস্থার নিকটবর্ত্তী হয়, ততই পণ্ডিতি বা মাস্টারি পদ তাঁহাদিগকে আকাঙ্ক্ষা করিতে থাকে। যাঁহারা নিতান্তই নিঃসম্বল, তাঁহারা হয় ডাক্তারি নয়

ইঞ্জিনিয়ারিং— এই দুয়ের একটি বৃত্তি অবলম্বন করেন। যাঁহারা সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি তাঁহারা অবিরল-নিপতিত সংবাদপত্র-ধারায় অবগাহন করতঃ রাজনীতিজ্ঞমণ্ডলীর মধ্যে গণ্য হইতে ইচ্ছা করেন। পরন্তু দেশের হিত সাধনের জন্য বিদ্যাশিক্ষা করেন এমন একজন ব্যক্তিও এক্ষণে দুর্লভ।’[৮৯] লক্ষণীয়, শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির এই বিন্যাসে ‘এলিট’ বাবুদের হাতেই রাজনীতিক হওয়ার চাবিকাঠি সুরক্ষিত, কারণ তাঁরা ‘সঙ্গতিপন্ন’। যদিও তার দ্বারা ‘দেশের হিত সাধন’ প্রকৃত কতটা সম্ভব, সে সংশয়ও বক্তার গলায় ধরা পড়েছে। পশুপতির মতো নিম্নকোটির ‘ভদ্রলোক’ বাবুরা ‘সঙ্গতিসম্পন্ন’ নয়, উপরন্তু শিক্ষাদীক্ষা সম্পূর্ণ না থাকা সত্ত্বেও ‘এলিট’বাবুদের ‘রাজনীতিজ্ঞমণ্ডলী’র সভ্য হতে ইচ্ছুক; অতএব অনুকরণপ্রিয়। উচ্চবর্ণের মধ্যশ্রেণিরবাবুরা এ কারণেই তাঁদের সঙ্গে লক্ষণীয় দূরত্ব স্থাপন করতে চেয়েছেন। পশুপতির নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, বালিকা বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার স্থাপন কিংবা প্রকল্প গ্রহণ আদতে উচ্চকোটির মধ্যশ্রেণির বাবুতে উন্নীত হওয়ার প্রচেষ্টামাত্র। অতএব এই প্রকল্পগুলির প্রতি আগ্রহ ও রূপায়ণ যে উচ্চকোটির ‘এলিট’ মধ্যশ্রেণির অন্যতম ‘হুজুক’ হয়ে দেখা দিয়েছিল, তা বলাই যায়।

‘পশুপতি-সম্বাদ’ উনিশ শতকের শেষপর্বের মধ্যশ্রেণির ‘ভদ্রলোক’বাবুদের এক গুরুত্বপূর্ণ আখ্যান, যেখানে স্পষ্ট হয়ে যায় পরিবর্তিত ‘বাবুত্বে’র চেহারা ও চরিত্রগুলি। নতুন এই কালে ব্যক্তিগত রুচি, প্রবৃত্তি, অসদাচারের মুখ ঢাকতে ‘দেশোদ্ধার’ নামক খুড়োর কল ব্যবহৃত হচ্ছে। নববাবুদের ‘নবধা’ লক্ষণের মধ্যে দানধ্যান-পরহিতৈষিতার গুণটিও নির্দিষ্ট ছিল, মধ্যশ্রেণির ‘ভদ্রলোক’বাবুরা এ সমস্ত গুণ রহিত হয়ে ব্যক্তিসুখকেই ক্রমশ বড়ো করে দেখতে শুরু করলেন। এই আত্মকেন্দ্রিকতা নতুন কালের বাবুদের মধ্যে প্রকট বলেই সমাজ তাঁদের প্রতি এত নির্মম, নিষ্ঠুর, ব্যঙ্গপ্রবণ। উনিশ শতকের সাতের দশক থেকে মধ্যশ্রেণির ‘ভদ্রলোক’বাবুরা ‘দেশোদ্ধার’রে স্বপ্ন দেখতে দেখতে, স্বায়ত্বশাসন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার মোহে ক্রমশ শাসকশ্রেণির বশংবদ শ্রেণিতে পরিণত হলেন। জাত, চরিত্র খুইয়ে ক্রমশ কেরানিবাবুতে পরিণত হওয়াই হয়ে উঠল মধ্যশ্রেণির ‘ভদ্রলোক’ শিক্ষিত বাবুদের ভবিতব্য। আখ্যান হিসাবে ‘পশুপতি-সম্বাদ’ কতখানি যথার্থ তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়, কিন্তু নতুন যুগের মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত ‘ভদ্রলোক’বাবুদের গোত্রনির্ণয়ে সে যে সফল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই।

উনিশ শতকের শেষের দিকে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুরা এক নতুন ধরনের পরিবার কল্পনাকে মান্যতা দিতে থাকেন। স্ত্রী-সন্তানসহ গড়ে ওঠা এই প্রকল্পে প্রাচীন যূথবদ্ধতার কোনো স্থান ছিল না। যৌথ পরিবারগুলি একের পর এক ভাঙছিল। মূলত অর্থনৈতিক কারণে চাকরিজীবী বাঙালির পক্ষে যৌথ পরিবারের দায়িত্বগ্রহণ ক্রমশ অসম্ভব হয়ে উঠছিল। বিশেষত নগর-জীবনে যৌথ পরিবারের ধারণা ক্রমশ এক অলীক বাস্তব রূপে প্রতীয়মান হচ্ছিল। ছোটো পরিবার হল পারস্পরিক বিশ্বাস-নির্ভরতা, সুখী দাম্পত্যের মূল কারণ— এই নবলব্ধ পাশ্চাত্য বিশ্বাসে আস্থাশীল শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি কাব্যে-কবিতায়, আখ্যানে-প্রবন্ধে এই প্রকল্পকে রূপ দিতে তৎপর ছিল। যৌনতার ধারণাটিও ভিক্টোরিয়ান শুচিতার হাত ধরে গোপন, অশ্লীল, পাপজনক ‘কিছু’ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছিল। নব্যবাবুরা এই ধারণার প্রথম উদ্‌গাতা, কিন্তু মধ্যশ্রেণির ‘ভদ্রলোক’বাবুরা প্রকল্প হিসাবে লালনপালন ও প্রতিষ্ঠা দিলেন। কলকাতার নগরজীবন বিকাশের আদিপর্বে এবং নববাবুদের কাল পর্যন্ত বিমিশ্র নাগরিক সংস্কৃতিতে যৌনতার বোধ ও চরিত্র অনেক শিথিল ছিল। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য ও পারস্পরিক নির্ভরতা তথা কর্তব্যবোধ সম্পর্কে তাত্ত্বিক ধারণাকে পাশ্চাত্য প্রকল্প থেকে তুলে আনলেন নব্যবাবুরা। অতএব কিছু ‘সম্ভ্রান্ত নেটিভ’ এবং জনা কয়েক যাজকের

দাবি মেনে ১৮৫৬ সালের ১৪ নম্বর আইন অনুযায়ী কোম্পানির রাজত্বের এলাকায় অশ্লীল বই প্রকাশ, নাচ, গান, অঙ্গভঙ্গি, কথাবার্তা নিষিদ্ধ হল। ১৮৫৭ সালের সংবাদপত্র সম্পর্কিত ৩০ নম্বর আইনে এবং ১৮৬২ সালের পেনাল কোড (সেকশন ২৯২-৯৪)-এও অশ্লীলতা সম্পর্কিত ধারাটি জোরদার করা হয়। আর এসবের ধারা মেনেই শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুরা একজোট হয়ে ১৮৭৩ সালে 'দ্য সোসাইটি ফর দ্য সাপ্রেশন অব অবসিনিটি ইন ইন্ডিয়া' নামক সভা স্থাপন করলেন এবং 'যৌনতা' নামক ধারণাটির উপরে নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হল। ব্যবহারিক জীবনে সামাজিক প্রকল্প হিসাবেই 'একগামীতা' স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কে অবশ্যমান্য হয়ে উঠল। 'যৌনতা' নামক ক্রিয়াটিকে আত্মসংযম ও ধর্মপালনের মোড়কে পরিশীলিত করার চেষ্টা শুরু হল। ১৮৮৬ সনের 'চিকিৎসা-সম্মিলনী' পত্রিকায় ধনীবাবুরা সন্তান-সৌভাগ্যে বঞ্চিত থাকার কারণ হিসাবে বলা হল, [৯০] 'সাধারণতঃ আমাদের দেশীয় ধনীসম্প্রদায় যেমন শারীরিক পরিশ্রম বিমুখ, অথচ পাপ-ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য প্রতিনিয়তই মহাব্যস্ত, এমন আর কোন দেশের লোককেই দেখা যায় না। বলা বাহুল্য যে, এদেশীয় ধনীসম্প্রদায় উক্ত অসৎকার্যের ফলও নানারূপে ভোগ করিয়া থাকেন।' সেইসঙ্গেই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে 'ধনী সম্প্রদায় বলাতে কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে, আমরা কেবল ২/৫ লক্ষ টাকা আয়শালী ধনীর সম্বন্ধেই এতকথা বলিলাম। ফলতঃ এস্থলে আমাদের বক্তব্য নিতান্ত বিলাসী এবং ঘোর-ইন্দ্রিয়-পরায়ণ অথচ একেবারে পরিশ্রমবিমুখ ব্যক্তির প্রতি। যেহেতু মাসিক অন্তত ৫০ টাকা আয়বান ব্যক্তির মধ্যেও অনেকে উপরোক্ত দোষে দোষী সুতরাং ফলভোগীও হইতে দেখা গিয়া থাকে।'[৯১] অর্থাৎ নৈতিক অশুচিতা, ইন্দ্রিয় শৈথিল্য আর অর্থবান নববাবুদের একচেটিয়া নয়, সাধারণ চাকরিজীবী মধ্যশ্রেণির মধ্যে এই 'দোষ' বা 'গুণ'গুলি বর্তমান। এর কারণ হিসাবে পরিশ্রমবিমুখতা, অতিরতি, বেশ্যাগমন, মদ্যপানের অতি আসক্তির সঙ্গে আপন স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসাহীনতাকেই বলা হয়েছে । অন্যত্র বলা হয়েছে, 'সংযম শক্তির অভাবেই এদেশীয় লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট তন্নিবন্ধন ধীশক্তির হ্রাস, ধর্ম্ম প্রবৃত্তির শিথিলতা উপস্থিত হইতেছে।... প্রথম বয়সে ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য উপস্থিত না হইতে পারে, যদি এপ্রকার ব্যবস্থা করা হয় এবং যদি প্রথম বয়স হইতেই সদ্ব্যবস্থা দ্বারা সংযম শক্তি প্রবল করিয়া দেওয়া হয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গেই সংযমশক্তি যাহাতে ক্রমেই বৃদ্ধি পায় এ প্রকার বিধান করা হয় তাহা হইলেই মঙ্গল। তাহা হইলেই নিরাশ্রয় ভারত-সন্তানদিগের শরীর সুস্থ হইতে পারে। বুদ্ধি তেজস্বী হইতে পারে এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল সমুন্নত হইতে পারে।' [৯২] লক্ষণীয়, অসংযত যৌনতার অতিরেক ধনীবাবুদের আওতা পার হয়ে মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের জীবনেও প্রবেশ করেছে এবং তার প্রতিবিধান হিসাবে সংযম, ধর্মপালন, জাতীয়তার ধারণাকে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭০), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮)-এ ঠিক এই ধারণাকেই মান্যতা দিচ্ছেন। এমনকী 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪)-র প্রফুল্লকে যাবতীয় দুঃসাহসিক কার্যকলাপ ও ভাগ্য পরিবর্তনের পরও নিতান্ত বাধ্য স্ত্রীর মতো সেই স্বামীর কাছেই ফিরতে হয়, যে স্বামীর প্রত্যাখ্যানেই তার জীবন ভিন্ন খাতে বয়ে গিয়েছিল। প্রগতিশীলতার আপাত ধারণার চারপাশে এ এক অদৃশ্য শৃঙ্খল, যেখানে প্রগতির গতি নির্দিষ্ট সীমা বিন্দু পর্যন্তই।

কিন্তু কেন এত দুর্ভাবনা? কেনই-বা ধর্ম, জাতীয়তা, সংযমের ধারণার সঙ্গে যৌনতাকে যুক্ত করার এত প্রচেষ্টা? তার কারণ, প্রদীপের তলায় অন্ধকারের মতো মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের নীতি-নৈতিকতার মান সেদিন বৃহৎ প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন। সভা-সমিতি স্থাপন করে, নীতি ও সংযমের ধ্বজা উড়িয়ে, নভেলি নৈতিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেও শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত বাঙালিবাবুদের আত্মধ্বংসের পথ রুদ্ধ করা

যাচ্ছে না। কলকাতা সেই আত্মধ্বংসের লীলাক্ষেত্র। সাধারণভাবে নগর জীবনের চরিত্রভিত্তি তুলনায় শিথিল। কাঁচা পয়সার লোভে নানান চরিত্রের মিছিল শহরজীবনে। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় জানিয়েছেন, 'তৎকালে বিদেশে পরিবার সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রথা অপ্রচলিত থাকাতে, প্রায় সকল আমলা, উকীল বা মোক্তারের এক একটী উপপত্নী আবশ্যক হইত। সুতরাং তাঁহাদের বাসস্থানের সন্নিহিত স্থানে স্থানে গণিকালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে গ্রীস দেশে যেমন পণ্ডিত সকলও বেশ্যালয়ে একত্রিত হইয়া সদালাপ করিতেন, সেইরূপ প্রথা এখানেও প্রচলিত হইয়া উঠিল। যাঁহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত নহেন, তাঁহারাও আমোদের ও পরস্পর সাক্ষাতের নিমিত্ত এই সকল গণিকালয়ে যাইতেন। সন্ধ্যার পর রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্যন্ত বেশ্যালয় লোকে পরিপূর্ণ থাকিত।'[৯৩] চাকুরিজীবী মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের 'যৌনতা'র এক মুখে প্রতিরোধ, অন্য মুখে চতুর্গুণ। একটি পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, [৯৪] ১৮৫৩ সনে ৪ লক্ষ মানুষের এই শহরে ১২,৭১৯ জন বেশ্যার বাস, ১৮৬৭ সনেই তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩০,০০০-এ। কলকাতার বাবুদের নৈতিকতা ও সুরুচির চরিত্র স্পষ্ট হয়ে যায় এর থেকেই। অতএব প্রদীপের তলায় অন্ধকার। বাবুদের প্রকাশ্য জীবনের অন্তরালে গুপ্ত, ক্লেদাক্ত, অন্ধকারময় আরেক জীবন বর্তমান। বটতলা তথা জনপ্রিয় সস্তা বইয়ের বাজার সেদিন জমজমাট বাবুদের এই গোপন কেচ্ছার বিবরণে। যেহেতু 'কেচ্ছা' ফলে অতিরেক, অতিরঞ্জন, বাড়াবাড়ি রকমের অতিনাটকীয়তা, টানটান ঔৎসুক্য সবই আছে তাতে, আবার 'কেচ্ছা' বলেই এইসব 'অতি' কথার স্তূপ ঘেঁটে কখনো কখনো পৌঁছে যাওয়া যায় বাস্তব-সত্যের মূলদেশে। 'রজ্জুতে সর্পভ্রম' যে হয় না এমনটি নয়, কিন্তু তদ্‌বিপরীত দৃষ্টান্তও নিতান্ত দুর্লভ নয়। কালের নিষ্ঠুর পরিহাসে; সুস্থ, সুন্দর, রুচিশীল যৌনতার আচরণকে 'দাম্পত্যে'র মোড়কে যখন নির্মাণ করা হচ্ছে, তখনই সে প্রকল্পের সমান্তরালে বিনির্মিত হচ্ছে যৌনতার আরেক জগৎ— যা উদ্দাম, নৈতিকতাহীন, গর্হিত, সামাজিক সুস্বাস্থ্যের পরিপন্থী। নতুন যুগে এই দ্বিতীয় প্রকল্পের ধারকবাহক বিত্তবান ধনীমাত্র নন, মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত চাকরিজীবী 'ভদ্রলোক'বাবুরাও। 'গুপ্তকথা'র নানান চরিত্রের ভিড়ে অতএব এঁদেরই আনাগোনা।

বাংলা ভাষায় গুপ্তকথার আদি লেখক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৪২-১৯১৬) এবং তাঁর প্রেরণাপুরুষ ইংরেজ লেখক ই. ডবলিউ. এস. রেনল্ডস্ (১৮১৪-১৮৭৯)। রেনল্ডস্-এর ১৮৪৫ সনে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'দি মিস্ট্রিজ অব লন্ডন', ১৮৪৮ সনে প্রকাশিত বিখ্যাত সিরিজ 'দ্য মিস্ট্রিজ অব দ্য কোর্ট অব লন্ডন' ইত্যাদি আখ্যানগুলিতে যেমন ভিক্টোরিয়ান শুচিতার আড়ালে অবদমনের অন্ধকারে ডুবতে থাকা লন্ডনের বাবু-বিবির গুপ্তজীবনের ছবি মেলে, তেমনি রেনল্ডস্-এর ছায়াবলম্বনে লেখা ভুবনচন্দ্র প্রমুখের 'গুপ্তকথা'য় বাস্তবিক শিষ্ট-সভ্য-মার্জিত-রুচিশীল উনিশ শতকীয় বাবু-বিবিদের নৈতিকতাহীন গোপন জীবনের ছবি চিত্রিত। প্রিয়রঞ্জন সেনের মতে, [৯৫] ছয়ের দশক থেকেই রেনল্ডস্ বাঙালির কাছে পরিচিত নাম, ১৮৭০-এ বাংলায় 'এই এক নূতন! আমার গুপ্তকথা!! অতি আশ্চর্য!!!' ধারাবাহিকভাবে খণ্ডে খণ্ডে রচনা করে তাঁকে মান্যতা দেন ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আর তাঁর পোষ্টা, উৎসাহদাতা এবং ঘোষিত রচয়িতা হলেন শোভাবাজারের 'রাজকুল-কিশোর' শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর। মোট ৮৭০ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি ১৮৭০ সনের ডিসেম্বর থেকে ক্রমিক হিসাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে ১৮৭৩ সনের বসন্তকালে শেষ হয়। এরই মার্জিত-সংস্কৃতায়িত রূপ 'আর এক নূতন! হরিদাসের গুপ্তকথা' ১৯০৪ সনে প্রকাশ করেন ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বিশ শতকের কালসীমায় প্রকাশিত এই গ্রন্থটি সম্ভবত বাংলার সর্বাধিক জনপ্রিয় 'গুপ্তকথা'র বই।

১৮৭০-৭৩ সনে প্রকাশিত 'হরিদাসের গুপ্তকথা'র অসংস্কৃত আদি রূপটি অভিজাত-বিত্তবান বাবুদের নানান অসংযত যৌনাচার ও সম্পর্কের হদিশ দেয়। বর্ণনায় এ গ্রন্থ পর্ণোগ্রাফি না হলেও, বিষয়গতভাবে রুচিহীন, অশ্লীল। সমস্তই বড়োঘরের বড়ো কথা। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ভুঁইফোঁড় বিত্তবান, কাপ্তেন বা হঠাৎ নবাব বাবুদের মুখ্যত গোপন যৌনাচারের হদিশ দেওয়াই এ গ্রন্থের মূল লক্ষ্য। যৌনাচারের ক্ষেত্রে বাবুরা যে আত্ম-পর কোনো সম্পর্কের তোয়াক্কা করেন না, বোঝা যায়। বিমাতা, আপন ভগিনী, খুড়ি-মা, বাড়ির দাসী— সকলেই বাবুর লক্ষ্য, ছলে-বলে-কৌশলে কিংবা পারস্পরিক সম্মতিতে সকলের সঙ্গেই বাবুর যৌনাচারের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সেইসঙ্গেই রয়েছে অজাচার, নারী ও পুরুষের সমকাম, চোর-প্রতারক-ভণ্ড সাধু প্রভৃতির সঙ্গে বাড়ির মেয়েদের অবৈধ-সম্পর্কের আখ্যান। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে অনুপস্থিত স্বামী-স্ত্রীর শৃঙ্গার বা কামনার প্রসঙ্গ। এর একটি কারণ হতে পারে— স্বাভাবিক সম্পর্কের মিলন-ব্যাখ্যানে পাঠকের অন্যতর রসতৃপ্তির সুযোগ নেই, নেই অবৈধ মিলন-দর্শনের উত্তেজনা, কৌতূহল। প্রাচ্য-সাহিত্যের তাত্ত্বিকতায় এ জাতীয় বর্ণনা মান্যতাপ্রাপ্ত। অতএব 'গুপ্তকথা'য় জনরুচির চাহিদা ও তাগিদে দাম্পত্য-মিলন কথা অনুপস্থিত। কিন্তু চাঁদের এ যদি আলোময় দিক হয়, অন্ধকার দিকটি কি তবে, সমাজের অপ্রকাশ্য শিথিল যৌনতায় এ জাতীয় ক্লেদাক্ত চিত্র যে অস্বাভাবিক ছিল না, তারই ইঙ্গিত? ১৮৮৫ সনে প্রকাশিত 'বঙ্গের গুপ্তকথা' বইয়ে লেখক অম্বিকাচরণ গুপ্ত বিস্তৃত ভূমিকায় গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন : 'বঙ্গের গুপ্তকথা নাম শুনিলেই অনেকে মনে করেন উহা কোন ইংরাজী মিস্ট্রীর অনুবাদ না হয় ছায়া।... আমাদিগের আপন জাতীয় এবং সামাজিক রহস্য পাঠ করা নিতান্ত আবশ্যক। আমাদিগের দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা, আমাদিগের দেশের রাজদরবারে, ধনীর অট্টালিকায়, গৃহস্থ গৃহে, দরিদ্র কুটীরে, কৃষক পরিবারের মধ্যে কিরূপ ঘটনা ঘটিতেছে, সমাজ মধ্যে কি কি অনিষ্ঠ অঙ্কুরিত হইয়া বিষময় ফল প্রসব করিতেছে, কি উপায় অবলম্বন করিলে সেই সকল অনিষ্টের মূলোৎপাটিত হইতে পারিবে।... পাপের উন্নতি, ধর্মের অবনতি ও অধঃপাতে সমাজবন্ধন দিনে দিনে শীর্ণ ও নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে, সেই সকল পাপে বঙ্গীয় সমাজ এবং জাতির দারুণ দুষ্কৃতী সঞ্চিত হইতেছে। এইসকল মহাপাপের প্রশ্রয়ে যে বঙ্গীয় রাজা-রাজড়া, ধনীমহাজন, গৃহস্থ দরিদ্র, উকীল মোক্তার, ডাক্তার-বৈদ্য, কেরানী-মোহরী-পুলিশপ্রহরী, জজ ম্যাজিস্ট্রেট, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, অতিথি সন্ন্যাসী বালক বৃদ্ধ যুবা ঘোষিত বঙ্গসমাজ কলঙ্কিত করিতেছেন, তাঁহাদিগের প্রতিকৃতি প্রকৃত রূপে অঙ্কিত করাই বঙ্গের গুপ্তকথার উদ্দেশ্য।'[৯৬] বেশ বোঝা যাচ্ছে, অনৈতিকতার অধর্মীয়-রীতিবিরুদ্ধ যৌনতার বিনির্মাণ নয়, বরং রুচিশীল দাম্পত্য নির্মাণ প্রকল্পের সহায়তা করছে গুপ্তকথাগুলি। ক্লেদাক্ত পাঁক-ঘাঁটা আসলে পাঁক অপসারণের প্রয়োজনেই। সেইসঙ্গেই লক্ষণীয়, অনৈতিক যৌনাচারের এলাকা সম্প্রসারিত হয়েছে। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের জাতীয়তাবাদী রূপকল্প নির্মাণের মধ্যে বসেই অবদমিত যৌনতার এই বিস্তার আশ্চর্যের। তা ছাড়া, রক্ষণশীল 'গুপ্তকথা'র লেখকদের শাসনের তর্জনী যতটা না উন্মার্গগামী বাবুদের প্রতি, তার শতগুণ নারীদের প্রতি। স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতার বিষময় ফল হিসাবে সমাজ উচ্ছন্নে যাবে, ঘরে ঘরে পাপ ও বিকৃত যৌনাচারের ব্যাপকতা দেখা যাবে, অতএব সাধু সাবধান। এই সতর্কবাণী কি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির মধ্যে থেকে উঠে আসা আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বর? কারণ, গোটা উনিশ শতক জুড়েই নব্যবাবু এবং পরবর্তীকালে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোকে'রা সবচেয়ে চিন্তিত, উদ্দীপ্ত ও আন্দোলনমুখী যে বিষয় নিয়ে, তা নারীমুক্তি, নারীস্বাধীনতা। কিন্তু তার সীমানা ও ধরন নিয়ে উনিশ শতকের কালসীমা পেরিয়ে বিশ শতকেও এই শ্রেণি সবচেয়ে বেশি

দ্বিধাগ্রস্ত, চিন্তিত। আসলে গুপ্তকথাগুলি প্রায় সবই লেখা হয়েছে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে। অতএব আত্মদোষ-স্খলনে লম্পট পুরুষ অপেক্ষা নারীর দিকেই তার অভিযোগের আঙুল। অধিকাংশ গুপ্তকথাই তাই নারীর বয়ানে লেখা। খ্রিস্টীয় কনফেশনের মতো স্বকৃত পাপের কারণে অনুতাপ; কিন্তু অনুতাপের আড়ালে পুরুষদের দোষ'টিকে লঘু করে দেখার চেষ্টা। নারীমুক্তি, নারীস্বাধীনতার ফলে নারীরা সহজেই পুরুষদের সঙ্গে মিশতে পারছেন, ফলে পুরুষের চিত্তবিকার ঘটছে, তারা অধঃপতনে যাচ্ছে; অতএব মেয়েদের যদি 'কুলধর্ম্ম শেখানো যায়', তবেই 'সবদিক যথাযথ রক্ষা পায়'। 'গুপ্তকথা' আসলে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির আধিপত্য প্রয়োগের নতুন রূপ।

পঞ্চানন রায়চৌধুরীর 'কুল-কলঙ্কিনী বা কলিকাতার গুপ্তকতা' (১৯০৪)-এর 'প্রতিপাদ্য সেই কলকাতা। তার বিলাস, বাবুয়ানা, অনাচার, কদাচার আর ভ্রষ্টাচার।'[৯৭] কাহিনির নায়িকা কাদম্বিনী প্রবাসী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের কন্যা। বাবা কানপুরে কমিশরিয়টে কাজ করেন। কাদম্বিনী বাড়িতে মিসিবাবার কাছে লেখাপড়া শেখে। বয়স্ক কুলীন পাত্রের সঙ্গে কাদম্বিনীর বিবাহ হলে, অসন্তুষ্ট কাদম্বিনী ফুলশয্যার রাতেই পাড়ার এক 'ওস্তাদি কায়দার' ঠানদিদির সাহায্যে মাতাল স্বামীকে ফেলে শহরেরই অন্য ঠিকানায় ওঠে। যেখানে বাড়ির কর্ত্রী একজন সুন্দরী বউ, কোনো পুরুষ নেই। অতঃপর সম্প্রতি বিপত্নীক, বড়োঘরের ছেলে পরিচয়ে রমণীমোহন ঘোষাল নামের এক সুদর্শন, সপ্রতিভ ছেলের সঙ্গে পুনর্বিবাহ করে সটান কলকাতায়। 'নকল স্বামী' রমণীমোহন তাকে তুলল 'সোনাগাচি লেনে'র পদ্ম বাড়িওয়ালির বাড়ি। কাদম্বিনী বুঝতে পারে সে কোথায় এসে উঠেছে; কিন্তু পদ্মমাসির কাছে আত্মসমর্পণ ভিন্ন তখন অন্য উপায় নেই। রমণীকে অবশ্য অচিরেই গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হল। কাদম্বিনীর জীবনে এল এক নতুনবাবু। এই বাবুটির পিতা মুদিদোকান থেকে এখন ভুঁইফোঁড় বড়োলোক। মোসাহেব পরিবৃত হয়ে সে এসেছে। কুড়ি বছরের বেশি বয়স নয়, গোঁফের সামান্য রেখা উদয় হলেও, 'দেহটি মাংসপিণ্ডময়'। কাদম্বিনীর সেকেলে নাম পালটে 'গোলাপবিবি' রেখেছে বাবুটি। মুখে মুখে এক সুট জড়োয়া গহনার ফর্দ করেছে, মাসে তিনশো টাকা মাসোহারা, গাড়ি ও বাড়ি কিনে দিতেও প্রতিশ্রুত হয়েছেন। নতুন কাপ্তেনবাবুটি 'গোলাপবিবি'র জন্য উচ্চ সুদে টাকা ধার করেছে, অবশেষে ফতুর হয়েছে। অতএব কাদম্বিনীর জীবনে এসেছে নতুন বাবু।

এই বাবুটি নাম ঘনশ্যাম কাঞ্জিলাল। ইনি একজন ব্রাহ্ম সংস্কারক। জাতের কথা ওঠায় 'তিনি দুই চক্ষু উপর দিকে করিয়া গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন, আমি পুরুষ জাতি ভিন্ন আর কিছু জানি না, এই নিরাকার ঈশ্বরের রাজ্যে স্ত্রী ও পুরুষ ভিন্ন অন্য কোন জাতি নেই।' প্রথম সাক্ষাতে কাদম্বিনীকে 'ভগ্নী' বলে সম্বোধন করলেও কার্তিক পূজার দিন পদ্মমাসির ডেরা থেকে পালিয়ে গিয়ে 'শান্তিনিকেতন' নামক উদ্ধার-আশ্রমে পৌঁছে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পাতাতে তাঁর দ্বিধা হয়নি। এই উদ্ধার-আশ্রমেও অনাচার। অতএব ঘনশ্যাম কাদম্বিনীর গহনা নিয়ে উধাও হলে, কাদম্বিনীও আশ্রমের আর এক সংস্কারকের সঙ্গে পালিয়ে কলেজ স্ট্রিটের ভাড়াবাড়িতে। এই সংস্কারক একজন অধ্যাপক, মাস মাইনে দেড়শো টাকা। এরপর হেয়ার স্কুলের প্রথম শ্রেণিতে ওঠা এক তরুণ, তারপর অবস্থা বিপর্যয়ে ক্রমশ আত্মহননের দিকে এগিয়ে যায় কাদম্বিনী। যদিও গঙ্গার ঘাটে আত্মহননের মুহূর্তে পিতা কর্তৃক উদ্ধার হয়ে বৃন্দাবনে ঠাঁই হয় তার।

এই আখ্যানের মধ্যে কাদম্বিনীর জীবনে আসা পুরুষদের সামাজিক অবস্থানভূমি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। রমণীবাবু দরিদ্র পুরুতের সন্তান, দ্বিতীয় বাবুটি আদতে মুদির ছেলে, ঘনশ্যাম ব্রাহ্মবাবু, অন্য বাবুটিও ব্রাহ্মবাবু— পেশায় অধ্যাপক, পরের বাবুটি নতুন শিক্ষিত তরুণ। অর্থাৎ কাদম্বিনীর জীবনে

যেসব বাবুরা আসছেন, সামাজিক পরিচয়ে তাঁরা রক্ষণশীল হিন্দু কাঠামোর বিচারে 'প্রান্তিক'। অর্থকৌলীন্যেও দ্বিতীয় কাপ্তেনবাবু নববাবুদের আভিজাত্য ও বিত্তের ধারেকাছে আসে না। রক্ষিতার এক পূজার ফর্দ জোগাতেই সে ফতুর হয়। বাকি বাবুদের অর্থনৈতিক অবস্থান সঙ্গিন। অথচ শখ ষোলোআনা। রক্ষিতার গহনা, অর্থ আত্মসাৎ করার মধ্য দিয়েই অন্তঃসারহীন, অক্ষম বাবুয়ানার কঙ্কালটি বেরিয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা বা দৈন্য শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি বা উচ্ছৃঙ্খল হঠাৎ ধনীদের 'বাবুয়ানা'র গতিতে লাগাম টেনে ধরেছে। উনিশ শতকের শেষদিকে হিন্দু রক্ষণশীল বাঙালি সাহিত্যিকদের একাংশ ভণ্ড ও মেকি বাবু অর্থে ব্রাহ্মবাবুদের প্রায় সমার্থক করে তুলেছেন। বিশেষণ হিসাবে 'বাবু' শব্দের প্রয়োগ ক্রমশ নিন্দার্থ বা হীনার্থ বোঝাচ্ছে। নিছক উপহাসের বদলে দেখা দিচ্ছে বিষতিক্ত কটাক্ষ। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে সামাজিক সংস্কার, নারী-শিক্ষা থেকে পুরুষ ও নারীর অবাধ মেলামেশা ইত্যাদি বহু প্রসঙ্গেই ব্রাহ্মদের ভূমিকাতে দেখা হচ্ছে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পরিচালিত এতাবৎ প্রচলিত সমাজ-কাঠামোর প্রতিস্পর্ধী অবস্থান থেকে। অতএব বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু থেকে শুরু করে বটতলার জ্ঞাত-অজ্ঞাত লেখকেরা সকলেই 'বাবু' হিসাবে ব্রাহ্মদের negative image তৈরিতে ব্যস্ত। এবং তারই সূত্র ধরে নারীর অবাধ গতিবিধি, শিক্ষা ও স্বাধীনতা কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন।

ব্রাহ্মদের সংস্কারবাদকে আক্রমণ করে, হিন্দু রক্ষণশীল সামাজিক নিয়মগুলির যথাযথ স্থিতি কামনা করে উনিশ শতকের শেষার্ধে হিন্দু পুনরুত্থানবাদী ধারণার যে নতুন বিকাশ, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (১৮৫৪-১৯০৫) এবং তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা (প্রথম প্রকাশ ১৮৮১) সেই ভাবান্দোলনের নতুন মুখটি। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর ইংরেজি আত্মজীবনীতে, ব্রাহ্মসংস্কারের বিরুদ্ধে হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের গোঁড়া অবস্থানের পিছনে 'বঙ্গবাসী'র তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন।[৯৮] ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু এবং ইন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ ভাবশিষ্য যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু— এই ত্র্যহস্পর্শে 'বঙ্গবাসী' ব্রাহ্মবর্জিত এক আদর্শায়িত ভারতের কল্পনায় বিভোর ছিল। অতএব সংস্কারপন্থী ব্রাহ্ম এবং আপোশকামী হিন্দু— উভয়েই যোগেন্দ্রচন্দ্রের ব্যঙ্গবিদ্রূপের লক্ষ্য ছিলেন। ড. সুকুমার সেনের মতে, 'বইগুলির প্রধান প্রধান ভূমিকায় কোন না কোন সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা হইয়াছে।'[৯৯] অবলম্বন যিনিই হোন না কেন, উদ্দিষ্ট চরিত্রগুলি এক নয়, বহুর প্রতিনিধিত্ব করেছে। তাঁর সুবৃহৎ ও সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাস 'মডেল ভগিনী'র (প্রথম খণ্ড ১৮৮৬, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৯) 'মুখবন্ধে' গ্রন্থটিকে নিছক উপন্যাস বলতে চাননি তিনি। স্পষ্টই বলেছেন :

'বঙ্গের পূর্ব্ব ইতিহাস অনেকেই লিখিয়াছেন, কিন্তু নব্যবঙ্গের ইতিহাস কেহই বড় একটা লেখেন নাই। নব্যবাঙ্গালীর জীবনচরিতও এ পর্য্যন্ত কিছুই প্রকাশিত হয় নাই। মডেল ভগিনী গ্রন্থে নব্যব্যঙ্গের ইতিহাস এবং নব্যবাঙ্গালীর জীবনচরিত একধারে দুই পদার্থ দেখিতে পাইবেন।'[১০০]

অতএব, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এই 'না-উপন্যাসে' নব্য বাঙালির জীবন-চরিত প্রকাশই লেখকের লক্ষ্য। যদিও ঘোষিত এই লক্ষ্যে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে দেয় না এই 'না-উপন্যাস'। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের এবং সেই ধর্মের হোতা ব্রাহ্মণের গুণ ও ধর্মপ্রাণতার প্রতিষ্ঠাকেই তাঁর প্রকৃত লক্ষ্য বলে সহজেই চিনে ফেলা যায়।

এই উপন্যাসের কেন্দ্রে আছে কমলিনী; প্রগতিশীল আধুনিক এক নারী। আর তাকে কেন্দ্র করেই আকর্ষণ ও বিকর্ষণের দ্বন্দ্বে ঘুরতে থাকা একদল পুরুষ। কমলিনী 'বড় ঘরের মেয়ে; লেখাপড়া শিখেছেন; কেতাবের সঙ্গে চোখের এক তিল বিচ্ছেদ নাই; কাজেই ওঁদের একটুতেই অসুখ করে।' সে অসুখও

অন্যরকম। যদিও বাল্যকালে বয়সে বড়ো কোনো এক কুলীন ব্রাহ্মণ 'রায়মশাই'-এর সঙ্গে তার বিবাহ হয়, তবু সে বাবার কাছেই থাকে। শ্বশুরবাড়ি যেতে বললেই 'দুর্দান্ত পীড়ায়' শয্যাশায়ী হয়। সর্বদাই পায়ে 'এস্টাকীন এঁটে', রং- বেরঙের পোশাক পরে শেক্সপিয়র-শেলি প্রমুখের গ্রন্থ পাঠ, কবিতা লেখা, গুণমুগ্ধ ভক্ত— অধ্যাপক নগেন্দ্র, ডাক্তার মহেন্দ্র, কৃপা প্রত্যাশী নবঘনশ্যাম, বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাস, স্থানীয় স্কুলের ছাত্র কৈলাস প্রমুখদের পত্রাদি লেখা বা প্রত্যুত্তর পাঠানো, হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করা— এসবেই সে ব্যস্ত থাকে। আবার রাতবিরেতে কুট্টনী দাসীর সাহায্যে গোপন অভিসারেও তার অরুচি নেই। তার রাগ কেবল হিন্দুধর্ম ও সংস্কারের প্রতি এবং তার ব্রাহ্মণ স্বামী রায়মশাইয়ের প্রতি। কমলিনী আসলে ব্রাহ্মিকা, যদিও তার বিবাহের সময় ব্যাপারটি গোপন ছিল এবং তার স্বামী রায়মশাইও ব্যাপারটি সম্পর্কে অবগত নন।

এই সূত্রেই কমলিনীর পিতা ডেপুটি বাবু শ্রীরামদাসের প্রসঙ্গ বিস্তৃত করেছেন লেখক। শ্রীরামদাসের আদি বাড়ি কৃষ্ণনগরের কোনো গ্রামে। তাঁর পিতা নরহরি ঘোষাল তালুকদার, অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। বাল্যশিক্ষাটা গ্রামে সমাপ্ত হওয়ার পর গ্রামের সমস্ত ভদ্র প্রবীণ ব্যক্তিদের পরামর্শে রামদাসকে কলকাতায় 'ইংরেজি শিক্ষার্থে' পাঠানো হয়। সেখানে 'রামদাস' নামের অন্য অর্থে ব্যতিব্যস্ত হয়ে তিনি 'রামচন্দ্র' ঘোষাল নাম পরিগ্রহ করেন এবং অযথা উৎপাত থেকে রক্ষা পান। বারো বছর ধরে রামচন্দ্র কলকাতায় ইংরেজি শিক্ষা করেন, ফলে—

'পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ শিক্ষাদীক্ষাও পাইয়াছিলেন; ''ঊনবিংশ শতাব্দীর'' সেই সবে সূত্রপাত; সুতরাং সহবৎ, সদালাপ, সুনীতি, সুরুচি; এসবের কতকটা তিনি আভাসও পাইয়াছিলেন। কেমন করিয়া 'ইংরাজীতে বক্তৃতা করিতে হয়, তাহাও তিনি একটু আধটু শিখিয়াছিলেন।'[১০১]

পূজাবকাশে বাড়ি এলে রামচন্দ্র পিতা-মাতার সঙ্গে কথোপকথনে ইংরেজি বেশি, বাংলা কম মিশ্রিত ভাষায় কথা বলতেন। তার মর্মোদ্ধার করতে না পারায় 'পিতা-জাতীয় লোকগুলি'র 'মোটাবুদ্ধি', 'অনুদারচিত্ততা' ও অজ্ঞানতা, রাজনৈতিক আন্দোলন ও সমাজ-বিপ্লব সম্পর্কে অজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত হন। যদিও এই 'মূর্খ' নরহরির চেষ্টাতেই রামচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। প্রথমদিকে কাজের সূত্রে কখনো জলপাইগুড়ি, কখনো রাঁচি, কখনো বালেশ্বর— এইরকম দূরবর্তী স্থানে রামচন্দ্রকে বদলি হতে হয়। অবশেষে 'মূর্খ' পিতার সাহায্যেই হুগলিতে এসে গঙ্গাতীরে বাগানবাড়ি ভাড়া নিয়ে তিনি থিতু হন। এর আগে যে যে জায়গায় তিনি ডেপুটিগিরি করেছেন, সেখানে সেখানেই সবার আগে তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয় খুলে তার পরিচালক হতেন। সেইসঙ্গে একটি সভাও স্থাপন করতেন। এইসভায় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কোনো বিষয়ে বক্তৃতা হত না; পরন্তু 'স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-অধিকার, স্ত্রী-স্বাধীনতা, মদ্যপান, ভ্রাতৃভাব, স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি বিবিধ-বিষয়িণী বক্তৃতা' হত। বলা বাহুল্য যে, সভার সব অধিবেশনেই তিনি হতেন সভাপতি।

হুগলিতে আসার পর তিনি শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী হয়ে পড়লেন। আরও অনেকের মতো বিশ্বাস করলেন যে, 'কেশববাবুর নূতন ধর্ম্ম প্রবর্তনে, ভারত নিশ্চয় উদ্ধার হইবে'। অতএব প্রতি শনিবার কাছারির কাজ শেষ করে রামচন্দ্র কলকাতায় কেশববাবুর প্রার্থনাসভায় যেতেন এবং সমস্ত রবিবার কেশববাবুর সঙ্গে উপাসনা সেরে জ্ঞানবৃদ্ধি ও মনের অন্ধকার দূর করে সোমবার হুগলি পৌঁছে কাছারিতে যেতেন। কিছুদিন এইভাবে যাতায়াত করার পর ব্রাহ্মধর্মের সারটুকু বুঝে নিয়ে রামচন্দ্র 'নূতন ব্রাহ্ম' হয়ে

পড়লেন। তাঁর বেশবাস, ধরন-ধারণ, আদকায়দা, গৃহসজ্জা সবই পালটে গেল। 'ভ্রাতৃভাবে' প্রাণিত হয়ে তিনি বাড়ির নাপিতকে পর্যন্ত আলিঙ্গন করতে উদ্যত হলেন। মূর্খ পিতার নানান বাধাদানে রামচন্দ্র বিরক্ত ছিলেন, গুরু কেশবচন্দ্র যদিও তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন 'Let the dog bark' বলে, অবশেষে সেই পিতার মৃত্যু হলে তিনি 'সেই নিরাকার ঈশ্বরের রাজপদের কৃপায়' প্রকৃতই হাতে স্বর্গ পেলেন। 'পাপী পিতা'র জন্য তিনি কাঁদলেন না, অনুতাপ করলেন না, বরং গুরুজীকে লিখে পাঠালেন, 'কবে অনুতাপ করিতে হইবে, দিন স্থির করিয়া লিখিলেই, কলিকাতা গিয়া আপনার সহিত একত্র অনুতাপ করিব'। পিতার মৃত্যুতে হিন্দুর প্রচলিত কোনো পারলৌকিক কাজই তিনি করলেন না —

'কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুর ন্যায় তিনি কাচা গলায় দিলেন না, খালি পায়ে বেড়াইলেন না, একবেলা হবিষ্যান্নও খাইলেন না, — কেবল সভ্যসমাজ-অনুমোদিত সুপ্রথা অবলম্বন করিলেন। একমাসকাল কালো কাপড় সর্ব্বদা পরিয়া রহিলেন এবং কালো কোটের উপর এক কালো রঙের ফিতা বসাইয়া দিলেন। উচ্চ-হৃদয়ের কি অপূর্ব্ব ভাব! পিতৃ-বিয়োগজনিত এক ফোঁটা জলও একদিন তাঁহার চোখ দিয়া পড়িল না। প্রতিবেশী প্রিয়বন্ধুগণ পরস্পর বলাবলি করিল ''বাবুর মত এমন পবিত্র, স্বর্গীয় আত্মা ত কখনও দেখি নাই— পিতার মৃত্যু হইল তথাচ তিনি একদিনও কাঁদিলেন না— তাঁহার চিত্ত কি মহান্''।' [১০২]

একই কারণে বংশের গুরুদেবকে তিনি প্রণাম করলেন না। নিজের অশিক্ষিতা স্ত্রী ও সন্তান হুগলিতে নিয়ে এসে কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় ত্যাগ করলেন।

রামচন্দ্র শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবু, তায় আবার 'নূতন ব্রাহ্ম'। অতএব ক্রমে সেই অশিক্ষিতা স্ত্রীকে তিনি তাঁর উপযুক্ত করে গড়ে নিতে চাইলেন। অন্নপূর্ণা অশিক্ষিতা গ্রাম্য হলেও 'প্রকৃতই লক্ষ্মীরূপিণী, পতি-অনুগামিনী, সতীসাধ্বী সহধর্ম্মিনী'। কিন্তু 'সর্বাঙ্গ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন'। অতএব নাকে তিলক, গলায় তিনকণ্ঠি তুলসীর মালা, হাতে শাঁখা, সিঁথিতে সুরকির গুঁড়োর মতন কীসব লাল পদার্থ পরিহিত স্ত্রীকে দেখে তিনি বিরক্ত হবেন, এটাই স্বাভাবিক। ঘরে পেঁয়াজ ঢুকলেই স্ত্রীটি নাকে কাপড় দেয়, বাজারের জল-খাবার খায় না, মুসলমানের দোকানের পাঁউরুটি যেখানে থাকে, সেখানে গোবরজলের ছড়া দেয়, ভাতের হাঁড়িতে হাঁসের ডিম সিদ্ধ করতে চায় না, মান্যবর জনৈক বন্ধুর রান্না করা মাংস নিজে তো খানই না, উপরন্তু স্বামী ও তাঁর বন্ধুবর্গকে কলাপাতায় পরিবেশন করেন, মুরগি ভুলেও ছুঁয়ে দেখেন না— এরূপ শতদোষযুক্ত স্ত্রীকে নিয়ে রামচন্দ্রের মনের সুখ অন্তর্হিত। অতএব গুরুর পরামর্শে রামচন্দ্র স্ত্রীকে প্রতিদিন 'উন্নতি-বিধায়িনী শিক্ষা' দিতে লাগলেন। শিক্ষার সুফল ফলতে অবশ্য দেরি হল না। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই অন্নপূর্ণার 'মনের আঁধার ঘুচিতে লাগিল'। নবমীতে লাউ ভক্ষণ সম্বন্ধীয় নিষেধ যে কুবিধি, তা বুঝতে পারলেন। তিনকণ্ঠি তুলসীর মালা নিতান্ত 'অঙ্গভার' হিসাবে পরিত্যক্ত হল; পেঁয়াজ সাদরে গৃহীত হল। 'রমণীকুল চিরদিন পুরুষের পদানত থাকিবে' না এই 'দিব্যজ্ঞান' লাভ করেই স্বামীর ইচ্ছেমত মাথায় আধঘোমটা দিয়ে স্বামীর বন্ধুবান্ধবের 'সাক্ষাতে স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে' বের হতে লাগলেন। একটি ভৃত্য সঙ্গে করেই ছেলেপুলে সঙ্গে নিয়ে যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, গড়ের মাঠ দেখে এলেন কলকাতায় গিয়ে। স্বামীর সঙ্গে নৌকার ছাদে উঠে গঙ্গার হাওয়া খেতে বেরোলেন। একে একে অন্ধ-আতুরকে ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ হল, বামনি-রাঁধুনির বদলে মুসলমান বাবুর্চি রান্নার ভার নিল, মুসলমান ওস্তাদের কাছে 'ঈশ্বরসঙ্গীত' শিখতে লাগলেন এবং অবশেষে 'সুসভ্যতার' শিক্ষা শেষ হলে, 'অন্নপূর্ণা বেশভূষায় ভূষিতা হইয়া ঈশ্বরানুরক্ত ভ্রাতৃগণের সমক্ষে স্বয়ং হারমোনিয়ম্ বাজাইয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন।' শুধুমাত্র একটু কলঙ্কের মতো মাথার সিঁদুর আর হাতের নোয়ার কুসংস্কারটি অন্নপূর্ণা ছাড়তে পারলেন না।

মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত ‘ভদ্রলোক’ রামচন্দ্রের চরিত্রটি বিস্তৃত করতে গিয়ে যোগেন্দ্রচন্দ্র ব্রাহ্ম-নেতা কেশবচন্দ্রের প্রসঙ্গ এনেছেন। রামচন্দ্র যে কেশব সেনের বাড়িতে যেতেন প্রার্থনা ও সাক্ষাৎ করার জন্য, এর থেকে অনুমিত হয় রামচন্দ্রের কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কাল ১৮৬৪-র আশেপাশে হবে। কারণ, শিবনাথ শাস্ত্রী জানাচ্ছেন,[১০৩] ওই বৎসর আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর কেশব সেন ও তাঁর অনুগামীরা প্রথম প্রথম খুব অসুবিধায় পড়েন; কারণ, একসঙ্গে প্রার্থনা কিংবা দেখাসাক্ষাৎ করার কোনো নির্দিষ্ট স্থান তখনও ছিল না। কলকাতা কলেজের একটি কক্ষ ভাড়া নিয়ে সপ্তাহান্তিক প্রার্থনার আয়োজন করা হলেও কেশব সেন নানান কারণে সেখানে উপস্থিত হতে দ্বিধাবোধ করতেন। কিন্তু তাঁর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ও বাগ্মিতায় মুগ্ধ অনুগামী ও নতুন নতুন ভক্তরা তাঁর বাড়িতেই প্রত্যহ সাক্ষাৎ করতেন, প্রার্থনায় বসতেন এবং সভামন্দির স্থাপনের ও কার্যপরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করতেন। তাঁর সাহচর্যে ও প্রচেষ্টায় অনেক তরুণই সেদিন ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ব্রাহ্মধর্মের অনুরক্ত হয়ে পড়ে। এঁদের মধ্যে মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত ‘ভদ্রলোক’ সংখ্যায় ছিলেন বেশি। রক্ষণশীল হিন্দুরা এই ঘটনাটিকে যে ভালোভাবে গ্রহণ করেননি, তা বেশ বোঝা যায়। ব্রাহ্মদের খ্রীষ্টধর্মসুলভ জীবনযাত্রা, উদারনৈতিক চিন্তাভাবনা, কার্যকলাপ ক্রমশ শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের জাতিগত চরিত্র বৈশিষ্ট্যে পরিণত হবে, এই আশঙ্কায় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর মতো অনেক সাহিত্যিকই সেদিন প্রতিরোধকামী।

রামচন্দ্রের কন্যা কমলিনীর জীবনে বহু পুরুষ এসেছে। এঁরা সকলেই শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির ‘ভদ্রলোক’। অবশ্য কপিলের মতো ‘ব্রাহ্ম’ খানসামার সঙ্গেও তার ‘ইতর’ সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক। কপিল জাতিতে সদ্‌গোপ। কেশব সেনের স্নেহচ্ছায়ায় বড়ো হয়েছে। রামচন্দ্রের ব্রাহ্ম-গুণ দেখে প্রীত কেশব সেন কপিলকে পাঠিয়েছেন এ বাড়িতে। অতএব, কপিলকে নিতান্ত অশিক্ষিত বলা যায় না। কিন্তু কমলিনীর কাছে সমাগত প্রধান প্রধান বাবুদের মধ্যে আছেন—

১. নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি কলেজের অধ্যাপক; সম্ভবত, ব্রাহ্ম নন, কিন্তু ব্রাহ্ম ভাব-আদর্শ-জীবনযাপনের প্রতি, বিশেষ করে নারীস্বাধীনতার প্রতি এঁর আগ্রহ অসীম। ইনি কমলিনীর সাহিত্য-শিক্ষক। ইংরেজি সাহিত্য কমলিনী এঁর কাছেই শেখে। এঁর পায়ে ডসনের বাড়ির জুতো। সেই সঙ্গে দীর্ঘ দেহে রেশমের এক দীর্ঘ পারসি কোট শোভা পাচ্ছে। আর আছে, ‘ফরেসডাঙ্গার উৎকৃষ্ট কালাপেড়ে ধুতি। একগাছা খুব মোটা সোনার চেন, অর্দ্ধচন্দ্র রেখায় বুকে ঝুলিতেছে। অধর ওষ্ঠ, লালবর্ণ। ... মাথায়, চেরা-সীঁথি।’ বছর পঁচিশের এই বাবুটির পোশাক-আশাক ধরনধারণ নববাবুদের মতো। পাশ্চাত্য, নবাবি ও দেশীয় রুচির মিশ্রণে এক বিমিশ্র সংস্কৃতির পরিচয় মেলে। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির জীবনযাপনে কোথাও কি নববাবুদের জীবনযাপনের অনুক্রমণ দেখা দিচ্ছিল কোথাও কোথাও?

২. মহেন্দ্রনাথ রায়। পেশায় ডাক্তার। খর্বকায়, শ্রমসহিষ্ণু ও কর্মক্ষম। তাঁর পরিধানে— ‘শাদাজিনের পেন্টুলন, কালো আলপাকার চাপকান চোগা এবং মাথায় মখমলের টুপী। বক্ষে সোনার চেন ঘড়ী। ডান হাতে পিচের স্টিক। আর বামহস্তে সেই মোহনবাঁশী — “স্টিথিসকোপ”।’ মহেন্দ্রের পোশাকে-আশাকে, জীবনযাপনে পাশ্চাত্যের প্রতি টান লক্ষ করা যায়। কমলিনীর অসুস্থতার অজুহাতে বিনা দ্বিধায় তাকে নিয়ে মহেন্দ্র কাশীর অনতিদূরে রোহিণীতে গিয়ে থেকেছে। তার লাম্পট্য, নীতিহীনতা, মিথ্যাচার মধ্যশ্রেণির ‘ভদ্রলোক’বাবুদের সাধারণ চরিত্রস্বভাব হিসাবে দেখেছেন লেখক। ‘বাবু’ যে ক্রমশ ‘নিন্দার্হ’ হয়েছে, মহেন্দ্রর মতো মানুষেরাই তার কারণ।

৩. 'ডি. এন চাটর্জি, এস্কোয়ার ব্যারিস্টার অ্যাট ল।' বিলাত-ফেরত চাটর্জি শুধু ব্যারিস্টার নন— বিশেষ কৃতবিদ্য বলে পরিচিত। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, প্রত্নতত্ত্ব, জ্যোতিষ, ধর্মগ্রন্থ, সাহিত্য বিশেষত ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর জ্ঞান অগাধ। বক্তৃতা-বিলাসী পুরুষ। বাঙালির মাথায় ইংরেজের মতো হ্যাট কেন থাকা উচিত; পেঁয়াজ, মুরগি, মহামাংস এই তিনের একত্রে সংযোগে যে রাসায়নিক মহাদ্রব্য প্রস্তুত হয়, তার সাহায্যে বাঙালি নীরোগ হতে পারে; স্বদেশীয় পূর্বপুরুষেরা যে বানর ছিল— ইত্যাদি নানান বক্তৃতায় তিনি সকলকে মুগ্ধ করেছেন। সেইসঙ্গেই তিনি, 'বাঙ্গালা কথা এক রকম ভুলিয়া গিয়াছেন। বুঝিতে পারুক, আর না পারুক — প্রায় পনের আনা লোকের সঙ্গে তিনি ইংরেজিতে মনের ভাব বদল করেন। যেখানে নিতান্ত উপায় নাই— সেখানে তাঁহার ভাষা হিন্দী। তবে কদাচিৎ দু-এক স্থলে ব্যতিক্রম আছে— তখন ভাষা, বাঁকা বাঁকা বাঙ্গালা।' ইংরেজি-অজ্ঞ দেশীয় লোকের মূর্খতায় পীড়াবোধ করেন তিনি, অনুকম্পার চেয়ে ক্রুদ্ধ হন এই ভেবে যে, দেশীয় লোক এখনও সাহেব হয়ে উঠতে পারল না। ঘোর কৃষ্ণবর্ণের 'সাহেব' সাজা 'বাবু'টির বক্তৃতাপ্রীতি, দেশ ও জাতির উন্নতির সেবক হিসাবে স্বদেশীয় ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণা, বাগাড়ম্বর, সাহেবি 'দেশপ্রেমে' তদ্‌গত অবস্থা মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের তৎকালীন হুজুগের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। মূলগত নিষ্ঠার অভাবেই যে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুরা দেশের আপামর জনসাধারণের কাছ থেকে শ্রদ্ধা আদায় করতে পারেনি, বরং বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন, তা এই 'ডি. এন চাটর্জি' চরিত্রে সু-অঙ্কিত। পুরানাম না বলে নামের আদ্যক্ষর ব্যবহার করে, সাহেবি উচ্চারণে তা আউড়ে এই শ্রেণির চরিত্রেরা ক্রমশ হাস্যাস্পদ করে তুলছিলেন নিজেদেরই। প্রহসন ও নকশায় এ জাতীয় বাবুরা ধিকৃত হয়েছেন সম্ভবত সবচেয়ে বেশি।

৪. ঘনশ্যাম নন্দী। অর্থবান, দ্বিতীয়ত ডেপুটি বাবুর বিশেষ অনুগৃহীত, তৃতীয়ত বি.এ পাশ। 'এডুকেশন গেজেটে' কবিতা লিখে থাকেন। জাতি কায়স্থ; বয়স ২৪ বৎসর। হুগলি জেলার কোনো গ্রামে বাড়ি এবং জমিদার। বাড়িতে দোল, দুর্গোৎসব হয়। গভীর রাতে বজরা করে অভিসারে যান। বাম হাতে গোলাপ ফুল, ডান হাতে মিহি ছড়ি, চেরা সিঁথি, আঙুলে হীরের আংটি, টাটকা ইস্ত্রি করা ডবলব্রেস্ট কামিজ পরনে, হাতে জড়ানো বেল ফুলের মালা, গায়ে ল্যাভেন্ডারের জল ছড়ানো— ঘনশ্যামের চেহারা-চরিত্র, পোশাক-আশাক তার লাম্পট্যের অনুরূপ। তাকে একালের নববাবু বলে ভ্রম হয়, কেবল গণ্ডমূর্খ নববাবুদের মতো পড়াশোনায় লবডঙ্কা নয় সে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ পাশ। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুরা অনেকেই লাম্পট্যে, অধর্মাচরণে যেন নব'বাবু'ত্বে উন্নীত হচ্ছেন। শিক্ষা কেবল আলংকারিক ডিগ্রি-প্রাপ্তির উপায় মাত্র। মধ্যশ্রেণির তথাকথিত শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের মধ্যে যার ফলে রুচি-সংস্কৃতির অভাব দেখা যাচ্ছিল কোনো কোনো ক্ষেত্রে। প্রকারান্তরে লেখক অবশ্য ব্রাহ্মবাবুদের নারীস্বাধীনতাকেই দুষেছেন যদিও, তবে তা পুরোপুরি ঠিক নয়। শিক্ষার দ্বারা এই জাতীয় অর্থবান বাবুদের অন্তর শুদ্ধি যতদিন না ঘটছে, যতদিন শিক্ষা কেবল পুঁথিগত পাঠেই আবদ্ধ থাকবে, ততদিন বাঙালি শিক্ষিত 'বাবু' সংস্কৃতি ক্রমশ মফসসলের অর্থবান নতুন শিক্ষিত শ্রেণিকে প্রভাবিত করছে এবং বাবুয়ানার চোরা স্রোত ক্রমশ বাঙালি পুরুষের সার্বজনীন চরিত্র বৈশিষ্ট্যে পরিণত হচ্ছে।

ঘনশ্যামের প্রসঙ্গ দীর্ঘায়িত করেননি লেখক। বরং অভিসারকালে বিদ্যালয়ের ছদ্মবেশী বালকদের দ্বারা 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়'-এর ব্যবস্থা করে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর এই নব 'বাবু'ত্বের প্রবণতাকে চপেটাঘাত করে লোকশিক্ষা দিতে চেয়েছেন।

৫. কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ব্রাহ্মণ-সন্তান, কিন্তু পড়াশোনায় কিংবা সত্যবাদিতায় কিংবা নীতি-নৈতিকতায় নরাধম বিশেষ। হুগলি ব্রাহ্ম স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্র। এই ব্রাহ্মস্কুলেই দু'দুবার এন্ট্রান্স ফেল করেছেন। এর আগে দীর্ঘদিন চুঁচুড়া ব্রাহ্মস্কুলে অনেকবার এন্ট্রান্স ফেল করে নাম কাটা যাওয়ায় হুগলি ব্রাহ্মস্কুলে ভর্তি হয়েছেন। বয়স— তেইশ-চব্বিশ বৎসর। এঁর 'চেহারা পাতলা ছিপ্‌ছিপে গৌরবর্ণ, ডবলব্রেস্ট কামিজ, সোনার বোতাম, এলবার্ট টেড়ি, গোঁফের ঘোর কৃষ্ণবর্ণ রেখা, আংটি ইত্যাদি' সমস্তই বিদ্যমান। এন্ট্রান্স ফেল করায় কোনো অনুশোচনা নেই তাঁর। কমলিনীর সঙ্গে গোপন প্রণয়ে লিপ্ত ছিল, কিন্তু আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল ঘনশ্যামকে অধিক মনোযোগ দেওয়ায় কৈলাস প্রতিপক্ষকে অতর্কিত আক্রমণে পর্যুদস্ত করেছে। কমলিনীর প্রতি ক্ষোভে তার নামে আদিরসাত্মক কেচ্ছা ছড়ার আকারে জনে জনে বলে বেড়িয়েছে। নতুন যুগের শিক্ষা বাঙালি তরুণ শিক্ষিতবাবুদের নীতি-নৈতিকতার ভিত, চরিত্রের দৃঢ়তা যে গঠন করতে পারেনি, কৈলাস চরিত্রই তার প্রমাণ। কৈলাস স্বভাব-দুর্বিনীত। কমলিনীর প্রকৃত স্বামী সদ্‌ব্রাহ্মণ রাধাশ্যাম রায় মহাশয়ের সঙ্গে ট্রেন-ভ্রমণের প্রাক্কালে হ্যাট-বুট কোট-শোভিত হয়ে, মুখে চুরুট ধরে কৈলাস 'সাহেব' সাজার প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছেন। দেশীয় স্ত্রীলোক ও তার সন্তানকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা করেছেন 'নিগার' বলে। রাধাশ্যামকেও প্রথমত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য অপমান করেছেন। পরে সদ্‌ব্রাহ্মণের উদারতায় দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে কৈলাস তাঁর প্রশংসা করেছেন। 'কখনও হিন্দী, কখনও বাঁকা বাঙ্গালা, কখন ইংরেজি, কখন বা এই ভাষাত্রয় মিশ্রিত এক অপূর্ব্ব খিচুড়ী' ভাষায় সে কথা বলেছেন। স্বদেশবাসীর প্রতি এইসকল মেকি পণ্ডিতবাবুদের ঘৃণা শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের জাত চিনিয়ে দেয়। রায় মহাশয়কে কমলিনীর স্বামী জেনে গুরুজ্ঞানে গুরুপত্নীগমনের পাপ করায় তাঁর যে লজ্জা ও অনুতাপ হয়েছে, তা সাময়িক। সন্ন্যাসগ্রহণের পরেও রোহিণীতে লুকিয়ে কমলিনীর সঙ্গে দেখা করে তথাকথিত 'গুরু-পত্নী'কে প্রেমনিবেদন করেছেন তিনি। 'অনৈতিক' জেনেও তাঁর এহেন কীর্তি তাঁর অসংযত চরিত্রবৃত্তিরই বহিঃপ্রকাশ। শিক্ষা শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের চরিত্রগঠনে যে কোনো সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারেননি, লেখকের এমনটিই মত।

উপন্যাসের তৃতীয়ভাগে সদ্‌ব্রাহ্মণ রাধাশ্যাম রায়ের সামনে সংবাদপত্র-বিলাসী, সভা-সমিতিপ্রিয়, মেকি দেশভক্ত, মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের প্রতিনিধি নগেন্দ্র এবং সাহেব-সাজা অল্পশিক্ষিত মধ্যশ্রেণির কৈলাসকে উপস্থিত করে লেখক অবশ্য তাঁর অভিপ্রায় সিদ্ধ করেছেন। প্রাচীন হিন্দু সংস্কার-জ্ঞান ও চরিত্রমহিমার কাছে এই উপরচালাক 'ভদ্রলোক'বাবুরা নতজানু হতে বাধ্য হয়েছে। সেইসঙ্গেই শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের জীবনযাপন ও চিন্তার নিকৃষ্টতার ব্যাপারটিও প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন লেখক।

সন্দেহ নেই, শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির ভদ্রলোকবাবুদের এইপ্রকার চরিত্রচিত্রণ রক্ষণশীল লেখকের অত্যুৎসাহের ফল। এমন নয় যে, সকল শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুরাই লম্পট, চরিত্রহীন, উন্মার্গগামী। কিন্তু সমকালে বাঙালি মধ্যশ্রেণির বাবুদের একটি বৃহৎ অংশ আত্মকেন্দ্রিক, নীতিভ্রষ্ট, ছদ্ম-জাতীয়তাবাদের মোহে বিভ্রান্ত, সেইসঙ্গেই স্বদেশের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসাবোধহীন ছিলেন, এই সত্যকেও পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না। শাসক শ্রেণির প্রতি আনুগত্য, বিজাতীয় সংস্কৃতিতে আস্থাশীল এই শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির নিজেদের মধ্যেও কোনো একতা ছিল না। প্রভুত্বের প্রশ্নে সকলেই একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন এবং আত্মশ্লাঘায় আস্থাশীল। এমনকী যে ব্রাহ্মবাবুরা ছিলেন উনিশ শতকের সবচেয়ে প্রগতিশীল অংশ, নিজেদের মধ্যে প্রভুত্ব কিংবা নেতৃত্বের প্রশ্নে তাঁরাও এই শতকের শেষে পৌঁছে দ্বিধাবিচ্ছিন্ন; জ্ঞান ও চরিত্রের ঔদার্য কেবল নিছক আনুষ্ঠানিকতার সংস্কারে আবদ্ধ।

শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের শাসকপ্রীতি এবং হীনমন্যতাবোধ, তাঁদের চরিত্রধর্মের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। নব্যবাবুরা ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতিকে তাঁদের চেতনা-মুক্তির উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার সূত্র ধরে যে নবীন মন তাঁদের মধ্যে বিকশিত হয়েছিল, তার আলোয় তাঁরা যাচাই করে নিতে চেয়েছিলেন দেশীয় আচারবিচার-সংস্কৃতিকে। হয়তো যথেষ্ট প্রগতিশীল মনে না হওয়ায় সেসবের বিরুদ্ধে মনের ঘৃণাও কখনো কখনো ব্যক্ত করে থাকবেন তাঁরা। কিন্তু পাশাপাশি, এও সত্য যে, তাঁদের সাহেবিপনার মধ্যে কোথাও ফাঁকি ছিল না। মনে-প্রাণে তাঁরা 'ইংলন্ডীয়'ই হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন। নিজেদের দেশীয় হিসাবে ভাবতে চাননি বলেই এ ব্যাপারে কোনো দ্বিধা বা হীনমন্যতার স্থান ছিল না তাঁদের মধ্যে। তা ছাড়া তাঁদের ইংরেজি ভাষা-শিক্ষাপ্রীতির কারণ নিছক অর্থনৈতিক বা কর্মভিত্তিক ছিল না। কিন্তু মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'দের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ছিল অন্য। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি তাঁরা আকৃষ্ট হন মূলত অর্থনৈতিক ও কর্মনৈতিক প্রয়োজনে। তাঁদের ইংরেজি শিক্ষা কিছু ব্যবহারিক গুণ অর্জনে সহায়তা করেছিল। মানসিক চেতনাকে পুষ্ট করে তুলতে পারেনি। এক দ্বৈত জীবন-মননের বাসিন্দা ছিলেন এঁরা। নিজেদের দেশীয় পরিচয়কে তাঁরা বিস্মৃত হননি, দেশীয় প্রথা-সংস্কারকে গোপনে মান্যতা দিতে তাঁরা দ্বিধাহীন ছিলেন। আবার, শাসকশ্রেণির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে, অর্থনৈতিক কারণেই তাঁরা বাধ্য ছিলেন। তাঁরা যে শাসিত, ফলত শাসকের তুলনায় অবস্থানগতভাবে তাঁরা নিম্নকোটির, এই হীনমন্যতাবোধ থেকে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি মুক্ত ছিলেন না। অন্যদিকে, শাসকও চেয়েছিলেন, শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির সুনিশ্চিত প্রসার। কারণ, সুমিত সরকারের ভাষায়, 'Colonialism no doubt wanted English Education to produce clerks to run the administration cheaply and create an to alicnated loyalist group, the actual consequences revealed sufficient Indian initiative and appropriation to quickly make the "educated babu" the principal butt of racist ridicule.'[১০৪] অতএব, শাসক ও শাসিতের পারস্পরিক চাহিদায় মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের দল দ্রুত প্রস্তুত হচ্ছিলেন 'loyal, cheap' কিন্তু শাসকের শাসনযন্ত্র পরিচালনায় সহায়ক ভূমিকা পালনের জন্য। এই হীনমন্যতাবোধ শিক্ষিত মধ্যশ্রেণিকে শাসকের জ্ঞান ও চিন্তার সমগোত্রীয় বলে ভাবতে বাধা দিয়েছে, ফলে 'educated babu'-রা পাশ্চাত্য শিক্ষা অর্জন করার পরও শাসক থেকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র এক শ্রেণি হিসাবে প্রথমত নিজেদের অবস্থান সুনির্দিষ্ট করেছে। আবার, স্বল্পশিক্ষিত, দেশীয় শিক্ষার কাঠামোয় পরিবর্তিত কিংবা নিতান্ত অশিক্ষিত বৃহত্তর দেশীয় জনসমাজ থেকে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি যে উচ্চতর ও গৌরবজনক অবস্থানে রয়েছে, তার দরুন আত্মশ্লাঘা থেকে এই শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি দেশীয় জনসমাজের সঙ্গে লক্ষণীয় দূরত্ব তৈরি করে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই উভমুখী বিচ্ছিন্নতার কারণেই উনিশ শতকের শেষার্ধে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুরা শাসক ও দেশীয় জনসমাজ উভয়েরই কৃপা ও ব্যঙ্গের পাত্রে পরিণত হয়েছেন।

এতৎসত্ত্বেও উনিশ শতকের শেষার্ধে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ ইংরেজি শিক্ষার হাত ধরে এই বিচ্ছিন্নতার বলয়ের বাসিন্দা হতে চাইলেন মূলত রুজি-রোজগারের তাগিদে। এই সময় থেকে কলকাতার দেশীয় সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিতে বাংলা শিক্ষার হাল শোচনীয় হয়ে ওঠে। তবে এই প্রবণতা যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের আগে থেকেই দেখা দিতে শুরু করেছিল তা বোঝা যায়, দ্বি-ভাষিক 'দ্য বেঙ্গল স্পেকটেটর'-এর এই প্রসঙ্গে আক্ষেপ থেকে যে,[১০৫] এমনকী সবচেয়ে প্রাচীন হিন্দু কলেজেও বাংলা শিক্ষার প্রতি মনোযোগ না দেওয়ায়, ছাত্ররা উক্ত ভাষার প্রতি অবহেলার ভাব পোষণ করে। অতএব উনিশ শতকের

শেষার্ধে পৌঁছে, ইংরেজি শিক্ষার হাত ধরে বিচ্ছিন্ন হতে চাওয়া মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুরা ক্রমশ যে সংখ্যায় বাড়বেন এবং রক্ষণশীল দেশীয় প্রাচীন সমাজের নিন্দাভাজন হবেন, এতে আর আশ্চর্য কী?

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'মডেল ভগিনী' নগেন্দ্র, রমেন্দ্র, কৈলাস প্রমুখের সূত্র ধরে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের আত্মধ্বংসের ও বিচ্ছিন্নতার সেই তত্ত্বটিকেই মান্যতা দিতে চেয়েছে। সেইসঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির অসম্পূর্ণ অর্জন মধ্যশ্রেণির তথাকথিত শিক্ষিত বাবুদের ক্ষেত্রে যে কী বিষম পরিণাম হয়ে দেখা দিয়েছে, সে বিষয়টিকে তুলে ধরাও লেখকের অভিপ্রেত। রক্ষণশীল হিন্দুদের কাছে শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুরা তখন এক গভীর বিপদ হিসাবেই বিবেচিত। যাঁদের দরুন ধর্ম-নীতি-সুরুচি, পারিবারিক সম্পর্ক-বিশ্বাস-স্থিতি ভেঙে পড়বার মুখে। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় 'কিম্ভূত কিমাকার'[১০৬] এই মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' বাবুদের নিষ্ঠুর-নির্মম ব্যঙ্গ প্রতিরোধ করাই ফলত 'মডেল ভগিনী'র অন্যতম লক্ষ্য।

'মডেল ভগিনী' উপন্যাসে যোগেন্দ্রচন্দ্র ব্রাহ্ম কমলিনীকে কেন্দ্রে রেখে শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের পাপ ও পদস্খলনের বৃত্তান্ত তুলে ধরেছিলেন। যদিও তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল, নব্যবঙ্গে নারীস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষার 'হুজুগ' কীভাবে হিন্দু নারীর তথাকথিত সতীত্ব, পাতিব্রত্য ও পারিবারিক জীবনের অন্তরায় হয়ে উঠছে, তা প্রদর্শন। কিন্তু 'মডেল ভগিনী'র প্রত্যুত্তরে লেখা অজ্ঞাত লেখকের 'মডেলভ্রাতা বা আদর্শ যুবক' (১৮৮৬) উপন্যাসের প্রধান লক্ষ্য তথাকথিত শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবু। লেখক 'বিজ্ঞাপনে' জানিয়েছেন, 'এ গ্রন্থখানি কি উপন্যাস?— না না, শুধু উপন্যাস বলিলে জোর হয় না, এখানি— সমাজ চিত্র, না না তাহাও নয়, অশিক্ষিত উদ্ধত যুবক চিত্র বলিলেই ভালো হয়।' 'মডেল ভ্রাতা'কে নিছক উপন্যাস না বলতে চেয়ে লেখক সম্ভবত এই উপন্যাসে কল্পনার দায়ভাগ যে কম, সেটাই ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন। আবার নিছক 'সমাজ চিত্র' তথা 'নক্শা'র মতো বিচ্ছিন্ন সূত্র সাজাতেও তিনি অনাগ্রহী; অতএব বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা ও সমসময়ের প্রবণতাকে সামান্য কল্পনার সূত্রে নিটোল আখ্যানের সাহায্যে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। আবার সেই আখ্যান তাঁকে বহু আয়াসে খুঁজে পেতে হয়নি, সেদিন বাংলার মধ্যশিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের মধ্যে এই নিটোল আখ্যান সদাই জায়মান।

'মডেল ভ্রাতা'র তথাকথিত 'অশিক্ষিত উদ্ধত যুবক'টি হলেন বর্ধমানের অন্তঃপাতি মজিলপুর গ্রামের নগেন্দ্রবাবু। তাঁরা পড়তি বংশ। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। বছর পঁচিশ বয়স, দেখতে মোটা-সোটা, কালো, 'ঘাড়ে গর্দ্দানে এক, একটি বিয়ারের পিঁপে বিশেষ'। লেখকের মতে, নগেন্দ্র একধারে বোকা, ন্যাকা এবং দুষ্টু। বাল্যকাল থেকেই তাঁর প্রতিভা বিকশিত। বাবাকে 'Old-fool' এবং মা'কে 'জল্দি rice give' বলতে অভ্যস্ত নগেন্দ্র সম্ভবত এন্ট্রান্স ফেল করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-বিহীন। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের 'ভদ্রলোক'বাবুরা সেদিন চাকরিমুখীন। কিন্তু অবস্থা এমন, যে 'বি.এ, এম. এ ২০৲২৫৲ টাকার চাকরীর জন্য লালায়িত', কিন্তু 'বাজারগরম' বলে চাকরি অপ্রতুল। Unemployment উনিশ শতকের শেষদিকে মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের হৃদয়ে শাসকশ্রেণির প্রতি গোপন অসহিষ্ণুতার জন্ম দিচ্ছিল, কিন্তু সেই অসহিষ্ণুতা বিশেষ উচ্চকিত ছিল না, অন্ততপক্ষে কার্যক্ষেত্রে নয়। কারণ শাসকশ্রেণির সরাসরি বিরোধিতায় ইংরেজি শিক্ষিতবাবুদের সায় ছিল না। চাকরির ক্ষেত্রে শাসকের অনুগ্রহের অপেক্ষা রাখতেন তাঁরা। অতএব, শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের এই প্রক্ষোভ পত্র-পত্রিকায়, সংবাদপত্রে গরম গরম সমালোচনায়, সভা-সমিতির আপাত নির্বিষ-উত্তেজন ভাষণে, জাতীয়তাবাদের নামে আবেদন-নিবেদনেই সীমাবদ্ধ থাকত। কালে এই বৈশিষ্ট্যগুলি অর্জন ও মান্যতা জানানো 'ভদ্রলোক'বাবুদের একটা 'ফ্যাশান'

হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমনকী দেশোদ্ধার, জাতীয়তাবাদের যে ধারণাগুলি 'ভদ্রলোক'বাবুরা মুখে মুখে চর্চা করতেন, সেই 'জাতীয়তাবাদ'ও ছিল এক প্রকার ছদ্ম-আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ। অনুরাধা রায় বলেছেন, 'উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদীদের মনে একটা পরাধীনতার বেদনাও ছিল, ব্রিটিশের প্রতি বিরাগও যে ছিল না তা নয়। কিন্তু মুশকিল হল, ব্রিটিশ শাসনের বিকল্প এঁরা কল্পনাও করতে পারতেন না। মাথার উপর যেমন 'আকাশ', তেমনই ছিল এঁদের কাছে ব্রিটিশ শাসন। অগত্যা সেই শাসনকে সকৃতজ্ঞভাবে মেনে না নিয়ে উপায় কি?'[১০৮]

'মডেল ভ্রাতা'র নগেন্দ্রও চাকরি না মেলায় অসহিষ্ণু, কিন্তু ইংরেজ ও ইংরেজিভাষার প্রতি তার মোহ ও আনুগত্য নিঃসংশয়াতীত। সে এন্ট্রান্স পাশ করতে না পারলেও কিছু কিছু সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজি পড়েছে। ইংরাজি না-জানা লোক তার কাছে 'illiterate person'। অতএব বুঝুক, না বুঝুক সে শেক্সপিয়ার পড়ে। কথায় কথায় বায়রন, চসার, শেক্সপিয়র ইত্যাদি থেকে ভুল উদ্ধৃতি দেয়। ইংরেজি না মিশিয়ে সাধারণ বাংলায় কথা বলাকে অসম্মানজনক জ্ঞান করে। ব্যাকরণগত অশুদ্ধ প্রয়োগ করেও বড়ো বড়ো কথা বলতে তার বাধে না; তার মতে, 'এখন মিহি সুর খাটে না, সাহেবি গলায় সাহেবি ধরণে উচ্চারণ করতে হয়।'[১০৯] তার গুণের এখানেই শেষ নয়, —

'নগেন্দ্রবাবু বাঙ্গলা, ইংরাজি, সংস্কৃত তিন তিনটী ভাষা শিখুন না শিখুন পড়িয়াছেন ত? বুঝুন না বুঝুন সেক্সপীয়ার পড়েন ত? পড়ুন না পড়ুন, গীতার কথা পাড়েন ত? আর সকলের উপর এক কথা, সংবাদপত্রে সংবাদ লেখেন, আঙ্গুল গুণিয়া পয়ার লেখেন। লোকে অবাক্, নগেন্দ্রবাবু মুচকি হাসেন।'[১১০]

তার একান্ত ইচ্ছা, তার স্ত্রী প্রমোদা লেখাপড়া শিখে 'সভ্যতা' শিখবে। স্ত্রী 'জামা-জাঙ্গিয়া-জ্যাকেট-বডি' পরে না বলে লজ্জায় সে অধোবদন হয়; বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আলাপ-প্রণয় না করতে চাওয়ায় ক্ষিপ্ত হয় স্ত্রীর প্রতি, এমনকী স্ত্রী মধুসূদনের কাব্যের উদ্ধৃতি বুঝতে পারে না বলে নগেন্দ্রর স্ত্রীর প্রতি আক্ষেপ আর যায় না। তাঁর মতে, 'শিক্ষিত স্বামী স্ত্রীর সহিত ভাসা ইয়ারকি ভালবাসে না, intelectual talk বর্ষিত হয়', এটাই অভিপ্রেত। কিন্তু প্রমোদা তা পারে না বলে, নগেন্দ্র বাল্যবিবাহের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে এবং প্রমোদাকে পরিত্যাগ করে জ্ঞানদাকে পুনর্বার বিবাহ করেছে। জ্ঞানদা 'বিদ্যাসুন্দর' পড়ে, অভিসারের টীকাভাষ্য রচনা করে, ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে জামাইবাবু দেবেন্দ্রর সঙ্গে আলাপ করে, চিঠি লিখে মনের ভাব জানায়— অর্থাৎ প্রগতির চূড়ান্ত ধরন জ্ঞানদার মধ্যে রয়েছে। নগেন্দ্র জ্ঞানদাকে পেয়ে প্রাথমিক ভাবে খুশি।

কিন্তু নানান গুণে বিভূষিত হয়েও প্রগতিশীল 'ভদ্রলোক'বাবু নগেন্দ্র সামান্য ১৫ টাকা বেতনের চাকরি করেছে প্রথমদিকে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিদেশবাসী জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কৃতবিদ্য সন্তান অমরচন্দ্রের অধীনে সংবাদপত্রের কাজ। সংবাদপত্রের সংবাদ সংগ্রহ, প্রুফ দেখা, চিঠিপত্র লেখা, নাম-ঠিকানা লিখে পোস্টে বিলি করার ব্যবস্থা করা— সমস্তই নগেন্দ্রকে করতে হত। বাইরে সে নিজেকে পরিচয় দিত সহকারী সম্পাদক হিসাবে। আগে 'শেয়ালখেকো পাঁঠি গোছ দুই একটি প্রবন্ধ' লিখত বটে, কিন্তু অমরবাবুর অনুপস্থিতিতে স্থানীয় জজ সাহেবের বিরুদ্ধে হুজুগে প্রবন্ধ লিখে বিপত্তি ঘটানোয়, সে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় তাকে। অমরবাবুর খাসচাকর রামও তাকে সুবিধামত দু'চার কথা শুনিয়ে দিতে কসুর করে না।

কিন্তু নগেন্দ্র 'বাল্যাবধি হুজুগ প্রিয় ... হুজুগই তাঁহার জীবনের ইষ্ট মন্ত্র'।[১১১] অতএব হুজুগ-প্রধান একটি সংবাদপত্রের সম্পাদক হওয়ার বাসনা তার বহুদিনের। অবশেষে নগেন্দ্রর এক বন্ধু, সামান্য লেখাপড়া জানা

জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস রায় নগেন্দ্রর প্রস্তাবে রাজি হয় এবং তার পৃষ্ঠপোষকতায় নগেন্দ্র হুজুগ-প্রিয় সংবাদপত্র 'স্বদেশবাসী'র সম্পাদক হয়ে বসে। সুলভ সংবাদপত্র 'স্বদেশবাসী'র গ্রাহক-সংখ্যা কিছু বেশি হলেও তার বাজারে অনেক দেনা, প্রেস বাঁধা দেওয়া, কাগজওয়ালার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে পোস্টেজ জমা দিতে হয়। তবে কাগজের এহেন দীনাবস্থা হলেও সম্পাদক নগেন্দ্রর চেহারায় তার ছাপ বিশেষ নেই,—

'পদযুগল আনশ্লাই ডটকিনে সুশোভিত, তাহা আবার ড-সনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বুটে আচ্ছাদিত, পরিধান লালবাগের মিহি কালোপেড়ে ধুতি, অঙ্গে সুন্দর সিল্কের টাইট্ কোট শোভা পাইতেছে। দিব্য চুনোট করা চাদর স্কন্ধদেশে স্থিত, হস্তে আইভরি হ্যাণ্ডেল সংযুক্ত বেতের ছড়ি।'[১১২]

রেলভ্রমণে ব্রাহ্মিকা যুবতীকে দেখে নগেন্দ্র 'ধড়ফড়ায়িত হৃদয়ে' নিজের পরিচয় দিয়েছে, বি.এ পাঠরতা যুবতীর সামনে ইংরেজি সাহিত্যের জ্ঞান জাহির করতে গিয়ে হাস্যাস্পদ হয়েছে কেবল নয়, তার মূর্খামি দেখে বিরক্ত যুবতী শীতল ব্যবহার করলেও সে নির্লজ্জের মতো তাঁকে নিয়ে 'Female Emancipation' বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে চেয়েছে।

কিন্তু নগেন্দ্র যতই চলনে-বলনে সাহেব সাজার চেষ্টা করুক না কেন, শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক যে প্রভু-ভৃত্যেরই থাকে, তা প্রমাণ হয়ে যায় বর্ধমানের রিফ্রেশমেন্ট রুমের ঘটনায়। বেকন, হ্যাম, বিফরোস্ট সহ ব্র্যান্ডি-সোডা 'চরণামৃতের ন্যায় পান'রত নগেন্দ্রকে খাঁটি সাহেব কর্তৃক লাঞ্ছিত হতে হয়। জনৈক সাহেব তাকে 'fat nigger' বলে উল্লেখ করে তার সংবাদপত্রকে পায়ের জুতোর সঙ্গে তুলনা করে বলে যে, স্বদেশবাসীর সম্পাদক আদতে 'illiterate mudikhana shop keeper'। একইসঙ্গে 'স্বদেশবাসী'র ব্যঙ্গ কলামটিকে (Buffoonery) ঠাট্টা করা হয় 'wonderful genius' -এর কলাম বলে। অপমানিত নগেন্দ্র উত্তেজিত হয়ে ম্যানেজার সাহেবকে ডাকলে দ্বিতীয় সাহেব নগেন্দ্রকে পদাঘাত করেছে। ম্যানেজার সাহেব এলেও তার অপমানের সুরাহা হয়নি। মুখে কিছু প্রতিবাদের সাহস করেনি নগেন্দ্র, কেবল মনে মনে জ্বলে উঠে প্রতিজ্ঞা করেছে, সংবাদপত্রে কলাম লিখে সে ইংরেজদের অবশ্য জব্দ করবে। সেইসঙ্গে যে জনৈক বেশ্যা তাকে অপমান করেছিল কোনোদিন, তাকেও সে ছাড়বে না বলে ঠিক করে।

কামরায় ফিরে এসে সে ব্রাহ্মিকা যুবতীর প্রতি অসংযত আচরণ করেছে। যুবতীর বারংবার করা সতর্কবার্তা কানে না তুলে তাকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হয়েছে সে। যুবতীর আর্ত চীৎকারে জনৈক সাহেব তাঁকে উদ্ধার করে নগেন্দ্রকে পশ্চাদ্দেশে পদাঘাত করে প্ল্যাটফর্মে ফেলে দিয়েছে। মাতাল, অপ্রকৃতিস্থ নগেন্দ্র বলেছে — [১১৩]

'আচ্ছা বাবা রাঙ্গা মুখ দেখে মজ্‌লে, আচ্ছা যাও, আমিও don't care. সোনাগাছিতে প্রচুর অপর্যাপ্ত। কিন্তু এর শোধ নবুই নবো। ব্রাহ্মী ব্রাহ্মকাকে দেখ্‌বো। ভ্রাতা ভগিনী গিরি বার করব, করবই — করব, এতে মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন, না না নূতন বয়েদ শোন — "মন্ত্রের সাধন কিম্বা কাগজ ওঠ্‌ন"।'

দুর্বিনীত, অসৎ নগেন্দ্র সংবাদপত্রে সত্য-মিথ্যা লিখে প্রতিপত্তি অর্জন করতে চায়। সাধারণ ব্রাহ্মণ চন্দ্রভূষণ তর্কবাগীশকে সে তার কলমের জোরে 'অচিরে দেশবিখ্যাত' করে তোলার প্রতিশ্রুতি দেয়। সংবাদপত্রকে সে সত্যের লড়াইয়ের হাতিয়ার মনে করলেও আদতে 'স্বদেশবাসী' কাগজখানি তার ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উপায় হয়ে উঠেছে। পূর্বে সে বিধবা বিবাহ সমর্থন করলেও পরে ভেবে দেখেছে বিবাহ না দিয়ে বিধবাদের ঘরে রাখলে, 'দাসী ভাবে' মনে করলে অনেক 'লাভ আছে'। অতএব নগেন্দ্র হিন্দু রক্ষণশীলদের পক্ষ নিয়ে বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে তার কাগজে কলাম লেখে। আবার সেই, বিনা

দোষে, প্রথম পত্নীকে পদাঘাত করে ঘর থেকে  বের করে দেয়, কারণ প্রমোদা 'আধুনিকা' নয়। অবশ্য তার 'আধুনিকা' দ্বিতীয় পত্নী জ্ঞানদার কাছ থেকে সে চরম আঘাতটি পেয়েছে। জামাইবাবু, বি.এ পাস, কিন্তু মন্দবুদ্ধি দেবেন্দ্রকে লেখা চিঠিতে জ্ঞানদা বাল্যকাল থেকে বহু যুবকের সঙ্গে অবৈধ সংসর্গের কথা বলে জানিয়েছে যে, সে দেবেন্দ্রকে ভালোবাসে। এই চিঠি নগেন্দ্রর জীবনে আকস্মিক বজ্রপাতের মতো। তার কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা দেখে পাঠক পরিতৃপ্তির মুচকি হাসি হাসেন।

'মডেল ভ্রাতা'র প্রথম ভাগের (পরবর্তী কোনো ভাগ বিজ্ঞাপন সত্ত্বেও প্রকাশিত হয়নি সম্ভবত) নগেন্দ্র চরিত্রের এই বিনির্মাণ তৎকালীন 'হুজুগ-প্রিয়' মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের দ্বান্দ্বিক চরিত্রকেই তুলে ধরে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই একের পর এক সংবাদপত্র প্রকাশ এবং সভা-সমিতি স্থাপন 'ভদ্রলোক' বাবুদের জাতীয় চরিত্র হয়ে ওঠে। একটি হিসাব থেকে খোদ কলকাতা এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলের দেড়শোর কাছাকাছি সভা-সমিতির সন্ধান মেলে।[১১৪] এগুলি হল সরকারি রেজিস্ট্রিকৃত সভা-সমিতির হিসাব। এর বাইরে ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্থাপিত, রেজিস্ট্রিকৃত নয় এমন সভা-সমিতিও কম ছিল না। এগুলির সমস্তই মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'দের সভা-সমিতি ছিল এমন নয়, কিন্তু মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'রাই সভা-সমিতি গঠন এবং এর মুখপাত্র স্বরূপ সংবাদপত্র প্রকাশে অধিক উৎসাহী ছিলেন, এ সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। এর কারণ, উনিশ শতকের পরিবর্তিত ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড়ো বিপর্যয় বা প্রশ্নচিহ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিলেন শিক্ষিত মধ্যশ্রেণিই। অর্থনৈতিক কারণে এঁরা ব্রিটিশ-শাসিত সরকারের নানান কাজকর্মে মূলত কেরানি  হিসাবে যুক্ত থাকতেন, [১১৫] ফলে শাসকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে জীবিকার্জনের তাগিদেই তাঁরা বাধ্য ছিলেন। আবার, কর্মক্ষেত্রে 'নেটিভ' হওয়ার অপরাধে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের কারণে-অকারণে লাঞ্ছিত হতে হত। অথচ, শাসকের প্রতি ক্ষোভকে তাঁদের গোপন করতে হত চাকরির স্থায়িত্বের কথা ভেবেই। এই সময় বাংলায় শিল্পায়নের বিকাশ খুব আশাব্যঞ্জক ছিল না। দেশীয় উদ্যোগপতি প্রায় ছিলেন না বললেই চলে। প্রধান প্রধান বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল প্রত্যক্ষভাবে বিদেশি মালিকানাধীন। সেখানেও মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত বাবুদের একটি বৃহৎ অংশ নিয়োজিত ছিলেন। অতএব এক্ষেত্রেও অন্যায় বা অসাম্য সত্ত্বেও শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুরা আপোশ-রফার মধ্য দিয়ে চলতে বাধ্য হতেন। পুঁজির অভাবে কোনো স্বাধীন পেশায় আত্মনিয়োগ এঁদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। ঔপনিবেশিক প্রভুরা আসার পূর্বে, বাংলায় মানুষ-প্রচলিত সামাজিক শ্রেণিভেদ ও রীতি অনুযায়ী বংশানুক্রমিকভাবে নিজস্ব পেশায় নিযুক্ত হত। ফিউডাল কাঠামোয় জমিদারকে কর দিতে হলেও, সেসব পেশা বা জীবিকায় আপাতভাবে তাঁরা ছিলেন স্বাধীন।  ঔপনিবেশিক প্রভুদের হাতে কলকাতা গড়ে ওঠবার পর নানা শ্রেণির নানান পেশার মানুষ নিজ নিজ কর্মদক্ষতা বা অদক্ষতা নিয়েই ভিড় জমিয়েছিলেন এখানে। শ্রেণি বা রীতিভেদের সামাজিক ভ্রূকুটি খাস কলকাতার বুকে কিঞ্চিৎ শিথিল হয়ে পড়েছিল। শাসকের কৌশলী পরিকল্পনায়, মেকলের ধুরন্ধর শিক্ষা-কাঠামোয় ক্রমশ ছাঁচে ঢালা-বশংবদ-শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'দের দল বংশানুক্রমিক স্বাধীন বৃত্তি থেকে বিযুক্ত হয়ে শাসকের মুখাপেক্ষি শ্রেণিতে পরিণত হল। শিক্ষার অহংকার ও আত্মাভিমান এঁদের বংশানুক্রমিক স্বাধীন বৃত্তিতে নিযুক্ত হতে বাধা দিল, আবার জীবিকা অর্জন বা আর্থিক-সংস্থানের তাগিদে সরকারি বা আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বল্পবেতনের চাকরিতে নিযুক্ত হতেও এঁরা বাধ্য হলেন। আগের অবস্থানে ফিরে যাওয়ার উপায় নেই, আবার অদূর ভবিষ্যৎ আশাব্যঞ্জক নয়। অতএব হতাশাব্যঞ্জক বর্তমানকে ভুলতে সভা-সমিতি ও সংবাদপত্রের আশ্রয়ে আবেদন-নিবেদন, মৃদু তর্জন-গর্জন

কিংবা শাসকের শেখানো জাতীয়তা ও দেশোদ্ধারের বুলি আওড়ানোই হয়ে উঠল তাঁদের জাতীয় চরিত্র; মনের প্রক্ষোভ দূর করার সহজতম উপায়। পাশাপাশি, অনেক ক্ষেত্রে এই সংবাদপত্রগুলি হয়ে উঠেছিল নির্দিষ্ট দল কিংবা ব্যক্তিবিশেষের আত্মপ্রচার ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের প্রচার-ভূমি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি থেকেই অজস্র সংবাদপত্র স্বদেশসেবার নামে রক্ষণশীল কিংবা সংস্কারিচ্ছুদের কোনো একটি পক্ষ অবলম্বন করে পারস্পরিক খিস্তি-খেউড়ে মেতে উঠেছিল। শিক্ষা এঁদের বড়ো একটি অংশের মানসিক উদারতার প্রসার তো ঘটাতেই পারেনি, বরং মধ্যশ্রেণির ‘ভদ্রলোক’ বাবুদের প্রায়শই কূপমণ্ডুকে পরিণত করেছিল। যে শাসকের সর্বাংশেই অনুসরণ করতে চাইতেন এঁরা, তাঁদের চোখে এঁরা ছিলেন অনুগত ভৃত্যমাত্র; ফলে ইংরেজি শিক্ষা ও আদবকায়দায় সুশিক্ষিত হয়েও নগেন্দ্রর মতো তাঁদের কপালে জুটত অপমান, ঘৃণা, অনুকম্পা। ফলে একদিকে যেমন এঁদের মধ্যে শাসকশ্রেণির প্রতি ভাবদ্বৈতের জন্ম দিয়েছিল— সমর্থন ও অসহযোগিতা, আনুগত্য ও বিরূপতা, মুগ্ধতা ও মোহমুক্তির; অন্যদিকে তেমন দেশীয় সমাজে আপনাকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনায় সংকীর্ণ আত্মগরিমারও জন্ম হয়েছিল। সবদিক দিয়েই দু' কূল হারানো এক অনিশ্চিত আর্থ-সামাজিক বর্তমান ও ভবিষ্যতের মাঝে দাঁড়িয়ে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির ‘ভদ্রলোক’বাবুরা ক্রমশই সুযোগসন্ধানী হয়ে উঠেছিলেন। নগেন্দ্রর মতো এঁরাও কিল খেয়ে কিল চুরি করতেন, লাভালাভের প্রেক্ষিতে মিত্র ও শত্রুর সঙ্গে পরস্পরবিরুদ্ধ আচরণ করতেন, সাহেবদের কাছে কল্কে না পেয়ে দেশীয়দের কাছে সাহেবিয়ানার চূড়ান্ত করতেন এবং প্রগতির নামে সংকীর্ণ মত ও পথের অনুসরণ করতেন। ‘হুজুগ-প্রিয়’ মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত বাবুদের এহেন ভণ্ডামিগুলিকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ‘মডেল-ভ্রাতা বা আদর্শ যুবক’ নগেন্দ্র। কেবল ব্রাহ্ম নয়, তথাকথিত প্রগতিশীল হিন্দু মধ্যশ্রেণির ‘ভদ্রলোকদের’ মনের অন্ধকারকেই প্রত্যক্ষ করি আমরা। ‘ভদ্রলোক’বাবুদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টি ক্রমশ যে নির্মম থেকে নির্মমতম হচ্ছে, সহানুভূতিহীন ব্যঙ্গের চাবুকে ক্ষতবিক্ষত করতে চাইছে ‘বাবু’ নামের শ্রেণিবিশেষ এক, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের শেষদিকে এভাবেই ‘বাবু’ ক্রমশ উপহাসাস্পদ শ্রেণিতে রূপান্তরিত হচ্ছিল। আরেকটি ব্যাপার লক্ষণীয়,— ‘মডেল ভ্রাতা’য় রেলভ্রমণের অংশে যে ব্রাহ্মিকা যুবতীর সঙ্গে আমরা পরিচিত হই, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ পাঠরতা, রুচিশীলা, মার্জিত, আত্মসম্ভ্রমবোধে উদ্দীপ্ত ও আত্মসচেতন একজন নারী। ‘মডেল ভগিনী’র কমলিনীর মতো উদ্ভিন্ন চরিত্রের নয়। এই যুবতীর প্রখর ব্যক্তিত্ব ও রুচির পাশে নগেন্দ্রর মতো হিন্দু প্রগতিবাদী নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। বরং প্রতিপদে নগেন্দ্রের অশিক্ষা, রুচিহীন ভণ্ডামি ধরা পড়ে গিয়েছে। অনুমান করা অসংগত হবে না যে, ‘মডেল ভ্রাতা’র অজ্ঞাত লেখক সম্ভবত ব্রাহ্ম ছিলেন কিংবা ছিলেন ‘ব্রাহ্ম-আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ফলে, ‘মডেল ভ্রাতা’কে এক হিসাবে ব্রাহ্ম আদর্শের দিক থেকে হিন্দু প্রগতিশীল ‘ভদ্রলোক’ শ্রেণির সমালোচনা বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

উনিশ শতকের শেষ দিকে পারস্পরিক মতবিরোধ, ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙক্ষা এবং অন্যান্য বহুবিধ কারণে ব্রাহ্মসমাজের ভিত নড়বড়ে হয়ে পড়েছিল। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে যে কেশবচন্দ্র সেন ‘কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ’ থেকে বেরিয়ে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে ‘ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ’ স্থাপন করেছিলেন, তাঁর সঙ্গেই মতবিরোধের কারণে শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রমুখেরা ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ‘সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ’ গঠন করে বিভক্ত হয়ে গেলেন। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ৬ মার্চ। বিখ্যাত বা কুখ্যাত কুচবিহার-বিবাহের সূত্র ধরে এই বিভাজন সংঘটিত হয়। ১৮৮০-র জানুয়ারি থেকে কেশবচন্দ্র সেন ‘নব-বিধান’ নামে স্বতন্ত্র সমাজ গঠন করেন। ইতিমধ্যে ব্যক্তিপূজা, সমাজের সম্মানজনক আচার্য পদের লোভ ব্রাহ্মদের

তলে তলে ক্ষয়িষ্ণু করে তুলেছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী-আনন্দচন্দ্র মিত্রের মতো ব্রাহ্ম-নেতা 'এই কি ব্রাহ্মবিবাহ' এবং 'কপালে ছিল বিয়ে কাঁদলে হবে কি?' পুস্তিকায় কেশবচন্দ্র, এমনকি তাঁর পত্নীকে পর্যন্ত আক্রমণ করে বসেন। পরবর্তীকালে শিবনাথ শাস্ত্রী নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে— 'এরূপ দলাদলির মাথায় ধর্ম টেকে না।... ব্রাহ্মসমাজ এতৎদ্বারা লোকসমাজে যে হীন হইয়াছে, তাহা আজিও সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না।'[১১৬] এর পাশাপাশি, কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণ পরমহংসের সান্নিধ্যে এসে তাঁর ভক্ত হয়ে ওঠেন। অবতার-তত্ত্ব, মূর্তি-পূজা ইত্যাদিও ধীরে ধীরে প্রচলিত হতে থাকে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মতো প্রভাবশালী ব্রাহ্ম-নেতা হরি-ভক্তির আশ্রয়ে বৈষ্ণব-ধর্মে ফিরে যান। সব মিলিয়ে ব্রাহ্মসমাজ দলাদলিতে শতধা বিদীর্ণ, আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে হীনবল হয়ে পড়তে থাকে। এই অবস্থায় তথাকথিত হিন্দু প্রগতিশীল এবং হিন্দু রক্ষণশীলদের হিন্দু-জাতীয়তার বিকাশ অনেক সহজতর হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মবাবুদের প্রতি ঝাঁঝও ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে পড়ে। উনিশ শতকের শেষদিকে পৌঁছে বরং আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে পড়েন তথাকথিত হিন্দু প্রগতিকামী বাবুরা। মূলত হিন্দু কাঠামোর মধ্যে থেকেই এঁরা স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা ইত্যাদি ব্রাহ্ম-সংস্কারগুলিকে সমর্থন ও অনুসরণ করতে থাকলে, তাঁরাই হয়ে পড়েন ব্যঙ্গবিদ্রূপের নতুন লক্ষ্য। নতুন নতুন বিষয়, নতুন নতুন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই বাবুরা উনিশ শতকের একেবারে শেষের দিকে আত্মপ্রকাশ করেন, এবং এইসব শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুরাই বিশ শতকের প্রথম দশকে ব্যঙ্গরচনার বিষয় হয়ে উঠতে থাকেন। তা ছাড়া, উনিশ শতকের শেষ দিকেই শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক' মূলত 'কেরানিবাবু' হিসাবেই পরিচিত হতে থাকেন। এই শ্রেণির বাবুদের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য বোঝাতে 'এলিট' মধ্যশ্রেণি নানাপ্রকার Title বা খেতাব-শোভিত হয়ে ওঠেন। ঔপনিবেশিক প্রভুরা শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও উচ্চাশাকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকেন। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে মতিলাল ঘোষ প্রমুখের চেষ্টায় Indian League এবং ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে Indian Association বা ভারতসভা প্রতিষ্ঠিত হয়; যা ছিল মুখ্যত শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'দের নিজস্ব সভা। এইসব সভার চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপের সূত্রে কোনোভাবেই যাতে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি একজোট হতে না পারে তার জন্য এইসময় থেকে নানারকম খেতাব— রাজা, রাজা-বাহাদুর, রায়-বাহাদুর ইত্যাদি প্রদান করে শাসকেরা সুকৌশলে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের মধ্যে 'এলিট' ও 'প্রান্তিক' বিভাজনকে রাষ্ট্রের তরফ থেকে মান্যতা দেন, এমনকী 'এলিট' 'ভদ্রলোক'দের মধ্যেও টাইটেলের নানান স্তরভেদ ঘটিয়ে তাঁদের নিজেদের মধ্যেও বিভাজন তৈরি করেন। 'প্রান্তিক' মধ্যশ্রেণি এইসময় কেরানির জীবনযাপন করতে শুরু করে, অন্যদিকে 'এলিট' মধ্যশ্রেণি টাইটেল-লোভী হয়ে ওঠেন এবং টাইটেল-প্রাপ্তির অলিখিত শর্ত হিসাবে শাসকশ্রণির স্তাবকতা ও স্বার্থরক্ষার কাজ করতে থাকেন। ফলে, বাঙালি 'ভদ্রলোক'বাবুরা এইসময় থেকে আত্মকলহে দীর্ণ, ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠায় উন্মুখ, ছদ্ম-জাতীয়বাদের ধারণায় আস্থাশীল এবং জাতিগত অনৈক্যের প্রতীক হয়ে উঠতে থাকেন। নৈতিকতা ও পাপবোধ সম্পর্কেও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির তর-তম ভেদ দেখা দেয়। নতুন নিয়মে যাঁরা 'এলিট' মধ্যশ্রেণি এবং প্রভাবশীল, তাঁদের অন্যায় সমাজের সমর্থন লাভ করলেও একই অন্যায় 'প্রান্তিক' মধ্যশ্রেণির পক্ষে ক্ষমাহীন বলে বিবেচিত হতে থাকে। 'নেড়া হরিদাস' (১৯০১) উপন্যাসে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ব্যঙ্গোচ্ছলে বলেছিলেন[১১৭] :

'তেজস্বী ব্যক্তির দোষ, সাধারণতঃ তত দোষ বলিয়া গণ্য হয় না। তুমি একদিন বেশ্যাবাড়ি যাও,— পাড়ায় অম্নি হৈ-চৈ পড়িবে। কিন্তু অমুক বড় লোক, সহরের বুকের মধ্যে দিয়া জুড়ি করিয়া, গড় গড় শব্দে

প্রত্যহ বেশ্যাবাড়ি যাইতেছেন,— তাহাতে তত দোষ হয় না। কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ত আপন গৃহেই বেশ্যাকে আশ্রয় দিয়াছেন,— তাহা ত আশ্রয়দাতার গুণ বলিয়াই গণ্য হইবে।'

এটি নিছক কথার কথা নয়। শাসকশ্রেণির স্তাবকতা ও স্বার্থরক্ষার সূত্র ধরে অনেক অযোগ্য ব্যক্তিও টাইটেল বা খেতাবের জেরে 'এলিট' 'ভদ্রলোক'দের গোত্রভুক্ত হয়ে পড়েন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' নকশার কথা স্মরণ করা যেতে পারে (নকশা অংশে আলোচনা করা হয়েছে)। টাইটেলধারী 'এলিট' মধ্যশ্রেণির বাবুরাও এভাবেই হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠেন একসময়। তাঁদের প্রতি সার্বিকভাবে সমাজের আস্থাও শিথিল হয়ে পড়ে। শিক্ষিত ভদ্রলোকদের চারিত্রিক দৈন্য শাসক-প্রবর্তিত শিক্ষা সম্পর্কেও সাধারণের মধ্যে নানান প্রশ্ন তুলে দেয়।

যে শিক্ষার হাত ধরে মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুরা ধীরে ধীরে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রমাণ করছিলেন, বিশেষ এক শ্রেণি হিসাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম আদায় করতে সমর্থ হয়েছিলেন, কালক্রমে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হওয়ায় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোকে'রা সংখ্যায় ভারী হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁদের এই সংখ্যাবৃদ্ধিই তাঁদেরকে 'বিশেষ' থেকে 'সাধারণে' পরিণত করে। শিক্ষিত মানুষের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি বিস্ময় ও সম্ভ্রমের বোধ রূপান্তরিত হয় সংশয় ও সমালোচনায়। সরকার-পোষিত কলেজ-বিদ্যালয়ে মাতৃভাষার পরিবর্তে ইংরেজি এবং দেশীয় সংস্কৃতির পরিবর্তে পাশ্চাত্য নীতি-রীতি গঠনেই বেশি জোর দেওয়া হত। কারণ, মেকলে চেয়েছিলেন, এই শিক্ষাব্যবস্থা কেবল 'Cheap Clerks' তৈরি করবে না, একইসঙ্গে 'to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern– a class of persons Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals, and in intellect.'। রক্ষণশীল শ্রেণি এবং দেশীয় প্রথায় শিক্ষিতবাবুরা এতে সিঁদুরে মেঘ দেখতে থাকেন। সরকার-পোষিত শিক্ষার মডেলটিকে তাঁরা দেশীয় সংস্কৃতি ও জাতীয়তার আশু বিপদ রূপে দেখতে থাকেন। শরীরে ভারতীয়, মননে ইউরোপীয় এইসকল 'ভদ্রলোক'বাবুদের প্রতি যে কারণে তাঁদের অসূয়া গোপন থাকেনি। এমনকী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইউরোপের প্রভূত দানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েও এইসকল রক্ষণশীল সে শিক্ষা, সে আদবকায়দা, সংস্কৃতিকে মন থেকে গ্রহণ করতে পারেননি। এর ফলে উনিশ শতকের শেষদিকের 'নভেল'গুলিতে পাশ্চাত্য আদবকায়দা-শিক্ষায় শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের প্রতিস্পর্ধী হিসাবে দেশীয় প্রথায় শিক্ষিত পণ্ডিতের ভূমিকা নির্মাণ করা হয়েছে এবং পরিশেষে দেশীয় পণ্ডিতদের শিক্ষাকেই শ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রতিরোধ কিংবা অস্বীকার একদিকে যেমন সরকার-পোষিত শিক্ষার মডেলের প্রতি, অন্যদিকে তেমনি দেশীয় সংস্কৃতি-সহবত ভুলতে বসা মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের সেই অংশের প্রতি, যাঁরা মূলত দেহে ভারতীয়, মনে ইউরোপীয়।

১৮৯৬ সনে প্রকাশিত জহরলাল ধরের 'সচিত্র কলিকাতা-রহস্য' উপন্যাসে পূর্বকথিত প্রতিরোধ-প্রত্যাখ্যানের ভাষ্যটি সহজলভ্য। এই উপন্যাস পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের 'পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আধ্যাত্মিক তেজে সুগঠিত' লেডি-ডাক্তার সোহাগিনী বসুর মোহ ও মোহভঙ্গের কাহিনি; এবং সেই মোহ ও মোহভঙ্গের সূত্র ধরেই কাহিনি ও উপ-কাহিনিতে এসেছে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যারিস্টার এম. এন. মিত্র ওরফে মন্মথনাথ মিত্র, তাঁর বন্ধু ডাক্তার রমেন্দ্র এবং তাঁদের বিপরীতে জ্ঞানে-শিক্ষায় আধুনিক কিন্তু দেশীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষায় শিক্ষিত 'বাবু' সত্যেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত শিরোমণি। সত্যেন্দ্রনাথ ওরফে শিরোমণি

আধুনিক চেতনা-সম্পন্ন। নারী-পুরুষের একত্রে মদ্যপান, ধুম্রসেবন, বিজাতীয় খাবার ভক্ষণকে তিনি মেনে নেন কিংবা যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে সমর্থন জানান। এদেশের মানুষের মাংসভক্ষণ ও মদ্যপান সম্পর্কিত বিতর্কিত বিষয়টিকেও তিনি বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তিবাদী মন দিয়ে বিচার করতে চান। আবার দেশীয় ধর্ম, তন্ত্র, যোগ, দর্শন ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা ও জ্ঞান বিস্ময়কর। বেদান্ত-দর্শন সম্পর্কে অতি সুললিত ভাষণে তিনি সোহাগিনীর চেতনা জাগ্রত করেন। 'ব্রাহ্মণত্ব' সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মত, 'ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম যদি কঠিন নাই হবে, তবে ব্রাহ্মণ নারায়ণের ন্যায় পূজ্যবান্ হ'বেন কেন?'[১১৮] সংসার সম্পর্কে বীতস্পৃহ এই ব্রাহ্মণ 'বাবু'টি মোহমুক্ত সোহাগিনীকে নিয়ে কাশী, গয়া, বৃন্দাবন ইত্যাদি তীর্থ ঘুরে হিমালয়ে চলে গেছেন। সত্যেন্দ্র শিরোমণি প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষার আদর্শে গঠিত রক্ষণশীলদের আকাঙ্ক্ষিত নির্মাণ। যিনি উইলসনের হোটেলেও যান আবার 'হিঁদুর ঘরে জন্মে ও হিঁদুর ছেলে হয়ে গো-মাংসটা খাওয়া' উচিত নয় মনে করেন, কারণ, 'যার দুধ খেয়ে মানুষ, সে সামান্য জন্তু হ'লেও মাতৃ-স্বরূপ। অতএব মাতৃবধ করা সুসভ্য জাতির কাজ নয়।' বাবু সত্যেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত শিরোমণির যুক্তি, ব্যক্তিত্ব ও মেধার সামনে পাশ্চাত্যের ডিগ্রিধারী মন্মথ বা রমেন্দ্র ম্লান হয়ে গেছেন।

রমেন্দ্র ডাক্তার। সে 'বাপের অগাধ পয়সা'র জোরে বিলেত থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসেছে। এ ব্যাপারে তার স্পষ্ট অভিমত হল, [১১৯] 'কেবল টাকার জোরে টাইটেল কিনেচি বই'ত নয়।' শিক্ষা যেমন-তেমন হলেই হল। নামের পাশে ডিগ্রি থাকলেই 'বাবু' হিসাবে এ সময় সমাজে বিশেষ থাকে ওঠা সম্ভব। রমেন্দ্র এ ব্যাপারে স্পষ্টবক্তা :

১) 'টাইটেল,— টাইটেল। যত লেখা পড়া শেখা হোক্ আর না হোক, ইউনিভারসিটির চাপ্‌রাস্ থাক্‌লেই হ'লো।'[১২০]

২) 'ঐত মজা। আজকালের বাজারে বিদ্যে কি মাথায় আচে? বিদ্যে পকেটে। যার টাকার জোর— সেই পণ্ডিত। আমেরিকায় যে টাইটেল বিক্রি হয়।'[১২১]

মন্মথও রমেন্দ্রকে সমর্থন করেছে। শিরোমণিও বলেছেন, 'আমাদের দেশে এমন বড়লোক অনেকেই আছেন, যাঁরা টাইটেলের জন্য পাগল।'[১২২] জনৈক সুশীল চন্দ্র ঘোষ ফলে টাকার জোরেই এ (A) থেকে জেড্ (Z) সব টাইটেল পেয়েছেন। কিন্তু স্পষ্টবক্তা হলেও রমেন্দ্র নৈতিকতার দিক থেকে হীন। ভালো চাকরি পাবার আশায় সে নিজের স্ত্রী সুরমাকে টমসন সাহেবের কাছে পাঠিয়েছে এবং সাহেবের কোলে বসে তাঁকে চুম্বন প্রদানে সুরমাকে বাধ্য করেছে। রবিবার দিন দুপুরবেলা সোনাগাছির গলিতে বন্ধু মিত্তির সাহেবের সঙ্গে 'সিল্‌কের ছাতি মাথায় দিয়ে ইয়ারকি দিতে' বেরোন। বারাঙ্গনা কিরণশশীর সঙ্গে হাসি-মশকরায়ও তাঁর আগ্রহ কম নয়। যদিও চারিত্রিক অসততা এবং কাজেকর্মে অমনোযোগিতার কারণে বিলিতি ডিগ্রিধারী রমেন্দ্রর বহু কীর্তি করে পাওয়া চাকরিটি চলে গেছে। কলকাতা-মহল্লায় তাঁর বদনাম রটায় পসার পড়ে গেছে, ফলে মফস্‌সলে তাঁকে আমরা কাজের সন্ধানে ব্যাপৃত-ব্যস্ত থাকতে দেখি। অর্থের বিনিময়ে টাইটেল-প্রাপ্ত রমেন্দ্র তথা শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের প্রতি সমাজের দৃষ্টি সহানুভূতিশূন্য নির্মম ব্যঙ্গের, তাতে সন্দেহ নেই।

এই নির্মম ব্যঙ্গদৃষ্টিতেই রূপ পান আর এক শিক্ষিত 'ভদ্রলোক', সোহাগিনীর স্বামী মিস্টার এম. এন. মিট্টির। ইনি একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টার। সাহেবি কেতায় জীবন কাটাতেই পছন্দ করেন মিস্টার এম. এন মিট্টির। এঁর প্রকৃত নাম মন্মথনাথ মিত্র। 'কিন্তু তাঁহাকে মিত্তির সাহেব না বলিয়া মন্মথবাবু বলিলে

বড়ই চটিয়া যাইতেন।'[১২৩] 'বাবু' শব্দটির প্রতি মন্মথর অনীহা তাৎপর্যপূর্ণ। উনিশ শতকের শেষপাদে 'বাবু'র পরিচিতি বিশেষ থেকে সাধারণে পর্যবসিত। অতএব 'বাবু' শব্দটি আভিজাত্য হারিয়ে মোটের উপর শিক্ষিত 'ভদ্রলোকে'রই সাধারণ পরিচিতি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল এই সময়। সাধারণ 'ভদ্রলোক'দের থেকে 'এলিট' মধ্যশ্রেণি নিজেদের পৃথক করবার তাগিদে সচরাচর প্রযুক্ত হতে থাকে। ফলে বঙ্গীয় পুরুষকুলের মধ্যে যাঁরা 'এলিট' মধ্যশ্রেণি, তাঁরা 'মিস্টার' শব্দের সমগোত্রীয় শব্দ হিসাবে 'শ্রী' বা 'শ্রীযুক্ত' ব্যবহার করতে থাকেন। 'বাবু' শব্দ ও শব্দগুচ্ছগুলির ব্যবহার সম্ভ্রান্ত 'ভদ্রলোকে'র নামের পূর্ব থেকে দ্রুত অদৃশ্য হতে থাকে। মন্মথর মতো ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণির মানসিক অভিপ্রায় ছিল 'বাবু' বর্জনের মাধ্যমে এবং 'মি:' গ্রহণের দ্বারা নিজেদের সাহেবত্ব প্রমাণ করা। একইসঙ্গে তাঁরা যে 'প্রান্তিক' শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোকে'র চেয়ে কিছু স্বতন্ত্র সেটা প্রতিষ্ঠিত করা। ফলে থ্যাকার স্পিঙ্ক অ্যান্ড কোং কোনো চিঠির শিরোণামায় 'বাবু' এম.এন. মিত্তির' লিখে পাঠানোয় মন্মথ যারপরনাই চটেছে এবং রাগে চিঠি ছিঁড়ে কোম্পানিকে লিখেছে, 'ফের যদি তোমরা আমার পত্রের শিরোনামায় ''মিস্টার'' না লিখিয়া ''বাবু'' লেখ, তাহা হইলে আমিও তোমাদিগকে ''বাবু'' শব্দে সম্বোধন করিব।'[১২৪] যদিও এখন সোহাগিনীর 'বাক্য জ্বালায়' তিনি 'বাবু মন্মথনাথ মিত্র, ব্যারিস্টার অ্যাট্ ল' বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন, তবুও মন থেকে তা মেনে নিতে পারেন না মন্মথ।

মিত্তির-সাহেবের বাড়ি 'ভরপুর সাহেবি কেতায় বানানো ও ঘরগুলি সমস্ত ইংরাজি ফ্যাসানে সাজান।' তাঁর হাবভাব-আদবকায়দাও সাহেবি। সোহাগিনীকে বিবাহের আগে প্রণয় নিবেদনে প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে তিনি চমকে দিয়েছেন। হৃদয়ের নিভৃত কথাকে এমন উচ্চকিতভাবে বলার মধ্য দিয়েই বোঝা যায়, মিত্তির-সাহেব বাহ্য-আড়ম্বরের প্রতিই অধিক আসক্ত। সোহাগিনীকে লাভ করার পর সেই আসক্তি স্বাভাবিকভাবেই স্তিমিত হয়েছে। ভরদুপুরে বন্ধু রমেন্দ্রর সঙ্গে বারঙ্গনা কিরণশশীর বাড়িতে 'ইয়ারকি দিতে' যেতে তাঁর দ্বিধাবোধ হয় না। কিরণশশীর উপরোধে তাকে বাঁধা রক্ষিতা রাখতেও সম্মত হন মন্মথ। বেশ্যাসক্তি ক্রমশই বেড়ে গেছে তাঁর। মক্কেলকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার হাজার টাকা আত্মসাৎ করে খিড়কির দরজা দিয়ে কিরণশশীর বাড়ি 'লম্বা' দিতে তাঁর বিবেকে বাধেনি।

মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'দের 'এলিট' অংশ পাশ্চাত্য শিক্ষার উপরের খোলসটিই কেবল অর্জন করেছিলেন, তাঁদের চেতনাকে সে শিক্ষা আদৌ আলোকিত করে তুলতে পারেনি। শিক্ষা এক শ্রেণির কাছে পণ্যসামগ্রীতুল্য। মিত্তির-সাহেব বলেছেন, 'আজ কালের বাজারে যার টাকা আচে সেই পণ্ডিত, ও বুদ্ধিমান। আর যার টাকা যাই, সে মহা পণ্ডিত হলেও অগ্রাহ্য।'[১২৫] অথচ, অর্থের বিনিময়ে যে উপরিতলের শিক্ষা তিনি আয়ত্ত করেছেন, সেই অসম্পূর্ণ শিক্ষার অহমিকায় তিনি শিরোমণির বক্তব্যের বিরোধিতা করে বেদান্তকে 'হাম্‌বাগ্' বলেছেন। বেদান্তের 'মায়াবাদ' আদৌ বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত নয়, 'সকলই ঈশ্বর' তত্ত্ব অতীব নিন্দনীয় — এই সকল মত দৃঢ়তার সঙ্গে বলে তিনি প্রাচ্য দর্শন-শাস্ত্র-সংস্কৃতির সব কিছুকেই তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। গো-মাংস ভক্ষণ থেকে গ্রেট ইস্টার্নের বিজাতীয় খাদ্য, মদ-গাঁজা-গুলি কিছুতেই তাঁর অনাসক্তি নেই। পাশ্চাত্য শিক্ষা হয়তো-বা এঁদের শিক্ষিত করে তুলেছে, কিন্তু সুসভ্য করতে পারেনি। Educated Class মানেই যে Cultured নয়, মিত্তির-সাহেবের চরিত্রই তার প্রমাণ। উনিশ শতকের শেষে পৌঁছে শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' শ্রেণির প্রকৃত শিক্ষা কতখানি, তার মূল্যায়ন জরুরি হয়ে পড়েছিল। কারণ এতদূর শিক্ষার শেষেও সাধারণভাবে কলকাতার শিক্ষিত

'বাবু'দের নৈতিক চরিত্র যে খুব সুউন্নত হতে পেরেছিল এমনটি নয়। কোনো এক রবিবারের নগর-চিত্রে লেখক আমাদের দেখান :

'আজ ইয়ার মহলে মহা ধুম্। অনেকেই বেশ্যা ও মদ নিয়ে, সোনাগাজি, নয় বাগানে মেয়ে আমোদে গড়াচ্ছেন। আহারান্তে অনেক ভদ্রলোক, তাস, পাসা ও দাবা নিয়ে কিস্তি মাৎ কচ্চেন। অনেক বড় লোকের ঘরে বিলিয়ার্ড খেলা হচ্চে। কেউবা দিসি ও বিলিতি সুন্দরী সুন্দরী মেম্ নিয়ে, স্কেটিং খেলায় মত্ত হয়েছেন। ... কেউ লেখা-পড়া, কেউ মাচ্ ধরা, আবার কেউবা শয়নে পদ্মনাভ বিবেচনা করে, সোমত্ব পরিবার নিয়ে, রবিবারের সুখের দিন অবসান ক'চ্চেন।'[১২৬]

এ যেন হুতোমের নকশায় আঁকা ১৮৬২-৬৪-র নাগরিক বাবুদের জীবন-চিত্রের সামান্য রূপভেদ। শিক্ষিত ভদ্রলোকবাবুদের প্রসার ঘটলেও জীবনযাপনের রুচি ও সংস্কৃতির বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। মদ্যপান ও বেশ্যাবাজি মধ্যশ্রেণির চাকরিজীবী 'ভদ্রলোকে'রাও অনুসরণ করছেন। নতুন বিনোদন বলতে 'সৌখিন গোচ্ পোসাক প'রে, ইডেন গার্‌ডেন, বিডন্‌গারডন্, সারকাস্ ও থিয়েটার' দেখে বেড়ানো। হিন্দুত্বের পুনর্জাগরণে রঙ্গমঞ্চগুলির একটি বড়ো ভূমিকা ছিল। লেখকের মতে, বঙ্গীয় রঙ্গালয়ে কোনো প্রহসন অভিনয় করতে হলে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিদ্রুপাত্মক রচনাই প্রাধান্য পায় এবং এ জাতীয় বিষয়-নির্ভর প্রহসনের অভিনয় না করলে 'অডিএন্‌স হয় না'। [১২৭] বিদেশি সার্কাস বিশেষ করে 'উইলসন'স গ্রেট ওয়ার্ল্ড সার্কাস ও 'চিয়ারিনি'স ইটালিয়ান সার্কাস ছিল বাঙালিবাবুদের কাছে লোভনীয় বিনোদন। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮২-র ১৫ নভেম্বর গড়ের মাঠে উইলসনের সার্কাস দেখে বিমুগ্ধ হন।[১২৮] তবে বাঙালিদের মধ্যে নবগোপাল মিত্রই সর্বপ্রথম ১৮৮৩-র শেষদিকে 'ন্যাশনাল সার্কাস' চালু করেন। সেই প্রয়াস অচিরেই মুখ থুবড়ে পড়ে প্রকৃত কর্মকুশল খেলোয়াড় ও আর্থিক অভাববশত। ১৮৮৭-তে প্রিয়নাথ বসু 'ন্যাশনাল সার্কাস'কে কিনে নিয়ে 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' নামক বিখ্যাত দল তৈরি করেন। ১৯১৫ পর্যন্ত এই সার্কাস বাঙালির অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণের কেন্দ্র ছিল। পাশাপাশি হিন্দু স্কুলের ব্যায়ামশিক্ষক এবং নবগোপাল মিত্রের জামাই রাজেন্দ্রলাল সিংহের 'গ্রেট ইন্ডিয়ান সার্কাস'ও বাঙালিবাবুদের বিনোদনের শর্ত পূরণ করেছিল। ১৮৯৯-এ এই দল মিশে যায় প্রিয়নাথ বসুর দলের সঙ্গে।[১২৯] বাঙালিবাবুরা সপ্তাহান্তে এই নতুন বিনোদনে মত্ত হয়েছিলেন। পাশাপাশি ছিল জুড়ি-কোম্পাস্-চৌঘুড়ি কিংবা দুর্লভ বাইসাইকেলে চড়ে পথভ্রমণের শখ।

একটি গুরুতর প্রভেদ চোখে পড়ে তা এই, বাঙালি শিক্ষিত বাবুদের বিনোদন এখন আর নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার নয়, তা সপ্তাহান্তিক। শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের বেশিরভাগই ছিলেন কেরানিজীবী— তা পূর্বেই বলা হয়েছে। অতএব নববাবুদের মতো তাঁরা রোজকার বিনোদনে মত্ত হতে পারেননি, তাঁদের অপেক্ষা করতে হয় শনিবার সন্ধ্যে ও রবিবারের জন্য। প্রহসনগুলিতে এই সপ্তাহান্তিক বিনোদন নিয়ে অনেক শ্লেষ, অনেক ব্যঙ্গ আছে। কেরানি জীবনে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুরা একটি বিশেষ জীবনযাপনের বলয়ে ঢুকে পড়েছেন দেখতে পাই। উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক হলেও সামাজিক বিচারে গুরুত্বপূর্ণ আত্মপরিচয়ে লেখক জানিয়েছেন, 'আমার পাড়ার সমবয়স্ক ছেলেরা সকলেই দশটার সময় খেয়ে, পেন্টুলেন চাপকান পরে, ঘড়ি চেন ঝুলিয়ে, ফিট্-ফাট্ হ'য়ে, পান চিবুতে চিবুতে আফিসে যাইত।'[১৩০] লেখকের পিতা-মাতারও সাধ ছিল লেখক সাহেবি অফিসের কেরানির চাকরি করুন। যদিও তিনি স্বাধীন বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সে নেহাত ব্যতিক্রম মাত্র। কেরানিবাবুদের সাধ ও সাধ্যের মধ্যে বিস্তর ফারাক ছিল।

সামান্য মাস-মাহিনায় তাঁদের জীবনযাপন করতে হত, পরিবার প্রতিপালন করতে হত। এঁদের অনেকেরই জমিজমা বা অন্য সূত্র থেকে আয় ছিল না। ফলে সংযত-নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনে মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত কেরানিবাবুরা অভ্যস্ত হচ্ছিলেন। নববাবুদের মতো আড়ম্বর সহকারে বাবুয়ানা করা এঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। এ কারণেই উনিশ শতকের শেষ দিকে কেরানিবাবুদের 'ছুট্‌কো' বাবুগিরিতে সাধারণ মানুষ কোনো বিস্ময়ের বা বিহ্বল সম্ভ্রমের চমক খুঁজে পায়নি। অতএব ভালোলাগার পরিবর্তে এইসব দলছুট কেরানিবাবুদের বাবুগিরি ব্যঙ্গ ও নির্মম উপহাসের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে। লেখক বলেছেন, 'পাঞ্জাবি-শিখ ও গুরখা শারীরিকভাবে সক্ষম বলে তাদের সেনাবিভাগে নিযুক্ত করেন ইংরেজরা; অন্যদিকে 'অকর্ম্মণ্য বাঙ্গালী কেবল কেরাণীগিরির উপযুক্ত, সুতরাং তাঁহাদিগকে কেরাণীর পদে অভিষিক্ত করিলেন।'

মন্মথ অবশ্য 'কেরাণীকুলের' মধ্যে একটু উচ্চদরের। বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পড়ে এসে জনৈক সাহেবের অধীনে তিনি কাজ করতেন। তবে কিরণশশীর প্রেমে উন্মত্ত হয়ে বাড়ি ও কাজকর্ম ছেড়ে পড়ে থাকায় সমাজে তাঁর দুর্নাম রটে এবং বার-কাউন্সিল থেকে তাঁর নামও কাটা যায়। জাল-জুয়াচুরি করে কিছু টাকা-পয়সা জোগাড় হয় বটে, কিন্তু যে মন্মথ একদিন মহাজনের কাছ থেকে দু'হাজার টাকার হ্যান্ডনোট লিখে এক হাজার টাকা নিয়ে পার্টি দিয়েছেন, তাঁকেই কিরণশশীর বাড়ি থেকে বিতাড়িত হতে হয়। দেনার দরুন ওয়ারেন্ট বের হলে তিনি গা ঢাকা দেন। এই পরিণাম আসলে সমাজ-কাঙিক্ষত দৃষ্টিভঙ্গির ফল। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'দের দল, বিশেষ করে যাঁরা পাশ্চাত্য ভাবধারায় অত্যুৎসাহী ও অভ্যস্ত, তাঁদের প্রতি সাধারণ শিক্ষিত-অশিক্ষিতের দৃষ্টিভঙ্গি অনুকূল ছিল না। যে ইংরেজের শাসন প্রথম পর্যায়ে চোখে বিস্ময়ের ঝিলিক তুলেছিল, উনিশ শতকের শেষে পৌঁছে শাসক ও শাসনের প্রতি ক্ষোভ ও সমালোচনা পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। সরকারি কিংবা বেসরকারি চাকরির সুযোগ সীমিত হওয়ায়, ক্রমশ কর্মহীন শিক্ষিত 'ভদ্রলোকে'র সংখ্যা বেড়ে চলেছিল, সেই কারণে বাড়ছিল শাসকের প্রতি হতাশা ও ক্ষোভ। অতএব, কতিপয় সুবিধাভোগী মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের কার্যকলাপ আরও বেশি করে অসহিষ্ণুতার শিকার হচ্ছিল। নববাবুদের বাবুগিরিতে অনৈতিক কর্মকাণ্ড থাকলেও যেহেতু দানধ্যান ক্রিয়াকর্মের মধ্যে দিয়ে সাধারণের সঙ্গে তাঁদের একটি সম্পর্ক তৈরি হত, ফলে অনৈতিক-দূষিত কাজকর্মের পরেও তাঁরা প্রসন্ন কৌতূকের লক্ষ্য হয়েছিলেন। কিন্তু সুবিধাভোগী শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির এই কতিপয় 'ভদ্রলোক'বাবুদের সমাজ সেই প্রসন্নতা দেখাতে অন্তত নিরুৎসাহ ছিল। উপন্যাসের শেষে দীর্ঘ নীতিবাক্যের মধ্য দিয়ে লেখক বলেছেন[১৩১] :

'পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে আজ কাল অনেকেই দু-একদিনের জন্য কাপ্তেনি করে থাকেন। কিন্তু, হায়! সে বাবুগিরিতে সুখ কি? একজন না খেয়ে না দিয়ে বিষয় করে গেল, আর একজন আল্‌টপ্‌কা পেলে, আর তিন দিনে উড়িয়ে দিলে। যে না খেয়ে না দিয়ে বিষয় করে, তার মতন পাপিষ্ঠ ও নরাধম আর জগতে নাই। কারণ, নিজে যদি দানধ্যান না কল্লে আর পাঁচজনকে আমোদ ক'রে না খাওয়ালে, তবে অর্থের সার্থকতা কি হ'ল? কেবল ভূতের ব্যাগার খেটে, চিনির বলদ্ হ'য়ে জকের মতন বিষয় রেখে ম'লেন, শেষে ছেলে ব্যাটা কাপ্তেনি ক'রে সব উড়িয়ে দিলে। সুতরাং এরূপ বিষয় করাও ঝকমারি আর বিনা পরিশ্রমে বাপের বিষয় অনর্থক নষ্ট করাও বাঁদ্‌রামি।'

অর্থাৎ, নতুন কালের বাবুদের কাপ্তেনি তথা বাবুগিরিতে যে ব্যয়, তার অভিমুখ নিতান্ত ব্যক্তিগত। দান-ধ্যান-সম্মেলক ভোজন-উৎসব অনুষ্ঠান ইত্যাদির সূত্রে এই ধনের কিয়দংশ ব্যয়িত হয় না বলে,

সাধারণের সঙ্গে এই বাবুদের কোনো আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। আবার, বাবুরা শিক্ষার অভিযানে সাধারণ শ্রেণির প্রতি অবজ্ঞা ও অনুকম্পার ভাব পোষণ করেন। সেই কারণেও সাধারণভাবে সমাজ নতুন কালের বাবুদের প্রতি নির্মম। এই বাবুদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেলে দেশীয় সংস্কার-সংস্কৃতি-সমাজ বিপন্ন হয়ে পড়বে এই আশঙ্কাও সমাজের ছিল। অথচ নতুন কালের রীতি অনুযায়ী পাশ্চাত্য শিক্ষাকে পুরোপুরি অস্বীকার করায়ও অসম্ভব। সুতরাং মন্মথ-রমেন্দ্রর মতো বাবুদের নির্মম ভর্ৎসনায় 'বাঁদর' আখ্যা দিয়ে তাঁদেরকেই ঠেলে দেওয়া হল প্রান্তিকতার ক্ষেত্রে। নির্মাণ করা হল, নতুন যুগের আদর্শ শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'কুলের type-কে।

এ কারণেই আমরা দেখি, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৭-১৯১৯) 'কঙ্কাবতী' (১৮৯২) উপন্যাসের খেতু কলকাতায় লেখাপড়া করেও ধীর-স্থির-রুচিশীল। ইংরেজি পড়েও স্বধর্ম-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল; ফলে, হিন্দুদের মূর্তিপূজা সম্পর্কে পাদ্রিসাহেব হাসিঠাট্টা করলে, শিবপূজার কারণে খেতুকে ভর্ৎসনা করলে এবং 'বাঙালিজাতি মিথ্যাবাদী, ফেরেবী, জালিয়াত, বদমায়েশ, পাষণ্ড, নরাধম, দাস, দাসের বেটা দাস, দাসের নাতি দাস' বলে গালমন্দ করলে খেতুও খ্রিস্টধর্মানুশীলনকারীদের আপাত-পবিত্রতার মুখোশ খুলে দিয়েছে। যাঁড়েশ্বরের বাড়িতে মুসলমান বাবুর্চির পরিবেশিত খাবার, বিদেশি হোটেলের 'বিলিতি শূকরের মাংস ও মুরগী' অভক্ষ্য কাটলেট প্রত্যাখ্যান করেছে; এমনকী জোর করে তার মুখে ব্র্যান্ডি ঢেলে দিতে গেলে সে শারীরিক বলে সকলকে নিরস্ত ও ভাঙচুর করে আপন ধর্মরক্ষা করেছে। এহেন খেতু আবার স্ত্রীশিক্ষার প্রতিও বিশেষ যত্নবান। অতএব কঙ্কাবতীকে তিনি নিজ উদ্যোগে লেখাপড়া শেখান। অর্থাৎ শিক্ষা খেতুকে উৎকেন্দ্রিক করে তোলেনি; নিজধর্ম-সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুৎ করতে পারেনি, কিন্তু তার মানসিক প্রসারতা বৃদ্ধি করেছে, তার চেতনাকে আলোকিত করে তুলেছে।

অন্যদিকে, সাহেবি-মনোভাবাপন্ন শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের 'ব্যাঙ-সাহেব' রূপে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। যে ব্যাং-সাহেব কঙ্কাবতীর সঙ্গে হাস্যকর ইংরেজিতে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করেছে, কারণ, 'লোকে যদি শুনে যে, তিনি বাঙলা কথা কহিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার জাতি যাইবে, সকালে তাঁহাকে ''নেটিব'' মনে করিবে।'[১৩২] 'মহাশয়', বলে সম্বোধন করায় ব্যাং-সাহেব ক্রুদ্ধ হয়েছে, 'মিস্টার গমীশ্' বলে সম্বোধন করতে বলেছে তাকে। খবরের কাগজে কবিতা ছাপানোর আকাঙক্ষা পোষণ করেছে মিস্টার গমীশ। সাহেব-সাজার কারণ হিসাবে কঙ্কাবতীকে সে জানিয়েছে, 'সাহেব না হইলে লোকে মান্য করে না। সেইজন্য এই সাহেবের পোশাক পরিয়াছি।...'[১৩৩] সাহেব-সাজা বাঙালিকে সকলে মান্য করবে, ভয় পাবে, এই তার বক্তব্য। 'নেটিভ' বলে যতই সাহেবি-পোশাক পরুক না কেন, তাকে উঠতে হবে রেলের তৃতীয় শ্রেণির কামরায়। তবে দেশীয় লোক তার সাহেবি-পোশাক দেখে ভয় পেয়ে ওই কামরা সাহেবের জন্য সংরক্ষিত ভেবে উঠবে না, এই তার মনোগত বাসনা। 'ব্যাঙ-সাহেবে'র রূপকে সাহেব-সাজা ইংরেজি শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের প্রতি নির্মম হুল হেনেছেন ত্রৈলোক্যনাথ। ইংরেজি শিক্ষার দ্বারা বাঙালিবাবুরা কখনো সাহেব হয়ে ওঠে না, সাহেবদের চোখে তারা 'নেটিভ'ই থেকে যায়। অথচ সাহেব-সাজার প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়ে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির সাহেব-ঘেঁষা বাবুরা স্বশ্রেণির সঙ্গেই দূরত্ব তৈরি করেন। শিক্ষার প্রাথমিক লক্ষণই হল আত্মবোধের বিকাশ। কিন্তু সাহেব হতে চাওয়া বাঙালি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির আত্মবোধও পাশ্চাত্যের কাছ থেকে ধার করা; পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী নকল আত্মবোধ। সাহেবদের কাছ থেকে তৎসত্ত্বেও উপযুক্ত সাড়া না পেয়ে এঁরা শিক্ষিত-সাধারণের কাছেই ধার করা স্বাতন্ত্র্যের বড়াই করেন

এবং 'ব্যাঙ-সাহেবে'র মতনই বিরক্তিকর ও হাস্যজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। বাস্তববুদ্ধি-বিবর্জিত, স্বশ্রেণি থেকে বিচ্যুত, পুঁথিগত বিদ্যায় পারদর্শী, আত্মিক বোধের দিক থেকে দীন, নকলনবিশ এই 'নেটিভ-সাহেব'বাবুদের দল উনিশ শতকের অন্তিমে ক্ষমাহীন ব্যঙ্গে, নির্মম হাস্যরসিকতায় ক্রমেই বিদ্ধ হচ্ছিলেন। এঁদের প্রতি সমাজের কোনো সহানুভূতি কিংবা অনুকম্পার বোধও ছিল না। বরং খেতুর মতো শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোকে'র কাঙ্ক্ষিত type অনেক বেশি করে মান্যতা পেল।

উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাসের সমান্তরাল দু'টি ধারা— একটি প্রত্যক্ষ বাস্তব-ঘেঁষা জীবনের কথা, অন্যটি অপ্রত্যক্ষ কল্পনারসে জারিত অতীত ইতিহাস বা কল্প-ইতিহাসের কাহিনি। আপাতভাবে দু'টি ধারা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন মনে হতে পারে। একটিতে সমসময়ের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের, তাগিদ ও সমন্বয়ের, দ্বিধা ও দ্বিধামুক্তির নানান চিহ্ন সুপরিস্ফুট, অন্যটিতে কল্পনার ঠাসবুনটে গৌরবজনক অতীতের পুনর্নির্মাণ। জনৈক সমালোচকের ভাষায়, উনিশ শতকে 'নবজাগ্রত জাতীয়বাদ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন ছিল ঔপনিবেশিক ইতিহাসকে খণ্ডন করে প্রাচীন ভারতে এক স্বর্ণযুগের অস্তিত্বের উপর আস্থা স্থাপন। ... স্বাজাত্যাভিমানের উন্মেষের জন্য কাহিনির মধ্য দিয়ে অতীতের পুনর্গঠন ও ইতিহাসের তাত্ত্বিক অনুসন্ধান— দুই প্রক্রিয়াই পাশাপাশি চলছিল।'[১৩৪] কিন্তু উনিশ শতকীয় প্রেক্ষাপটে নতুন জাতি ও দেশ গঠনের লক্ষ্যে ইতিহাস বা কল্প-ইতিহাস নির্মিত হয় উপন্যাসে আধারে— এ সত্যকে মেনে নিলে বলতে হয়, প্রত্যক্ষ সময়ভিত্তিক জীবনের কথাও উপন্যাসে উঠে এসেছিল একই অভিপ্রায়ে। প্রচলিত সমাজ ও সামাজিকের নানান দোষ-ত্রুটি অসংগতি পাওয়া। না-পাওয়ার দ্বান্দ্বিক মুখরতার কথা তুলে ধরে বাস্তব-ঘেঁষা কাহিনি আদতে জাতির চরিত্র-শোধনের ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল। আর কে না জানে, চরিত্র শোধিত হলে তবেই জাতি নতুন এক আদর্শ সমাজ গড়ে তুলতে পারে। অতএব, প্রত্যক্ষ সময়ভিত্তিক উপন্যাস এবং ইতিহাস কল্প-ইতিহাসের প্রকল্প আসলে একই— যাবতীয় অসংগতি ও দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটিয়ে এক নতুন জাতি-রাষ্ট্র গঠন করা। প্রত্যক্ষ সময়ে বাঙালি বাবুদের যে রূপকল্প ধরা পড়েছিল, তাতে ছিল নানান অসংগতি ও অন্ধকার। ভীরু, দুর্বল, অস্থিরচিত্ত, শিথিল চরিত্র, পরানুকরণপটু, আত্মবোধবিমুক্ত, ব্যক্তিত্বহীন এই বাবুদের বিপরীতে ইতিহাস বা কল্প-ইতিহাস নির্মিত যে চরিত্র স্থাপিত হল তিনি বীর, অকুতোভয়, লক্ষ্যে অচঞ্চল, দৃঢ় চরিত্র-বিশিষ্ট, স্বাজাত্যাভিমানে স্থির, আত্মস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল, ব্যক্তিত্ববান পুরুষ। একদিকে বাস্তব, অন্যদিকে আকাঙ্ক্ষিত কল্প-বাস্তব।

'বাবু'কেন্দ্রিক উপন্যাস কিংবা বাংলা উপন্যাসের বাবুরা এই বাস্তব ও কল্প-বাস্তবের প্রকল্পতেই ধরা পড়েছেন। বাঙালি পুরুষের জীবনযাপনের একটি পৃথক type উনিশ শতকের আদিপর্ব থেকে একটু একটু করে নির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছিল। ব্যক্তিগত জীবনে শিথিল ও অনৈতিক কর্মে উৎসাহীবাবুরা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত রক্ষণশীল ও আদর্শবাদী, এমনটি দেখা যেত প্রায়শই। প্রগতি ও রক্ষণশীলতা, নৈতিকতা ও কদাচার, আদর্শ ও ভ্রষ্টাচার— এহেন দ্বান্দ্বিকতা থেকে নববাবুরা, নব্যবাবুরা, শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুরা, এমনকী কেরানিবাবুরাও কেউ মুক্ত ছিলেন না। ব্যতিক্রম ছিল না এমন নয়, কিন্তু সমসাময়িক পত্রপত্রিকার আকর উৎসগুলির দিকে তাকালে বোঝা যায় বাঙালি পুরুষের চেতনায় ঘরে সেদিন এত ঘন অন্ধকার যে, দু'চারটি প্রদীপের আলোয় সে অন্ধকার দূর হবার নয়। ফলে প্যারীচাঁদ থেকে অখ্যাত জহরলাল ধর পর্যন্ত সকলেরই এক লক্ষ্য— অন্ধকারের স্বরূপ দেখিয়ে বাবুদের চেতনার আলোয় আনা। বাঙালি পুরুষের সামনে ইতিহাস বা কল্প-ইতিহাসগুলি যে আদর্শায়িত নায়কের রূপকল্প খাড়া

করেছিল, প্যারীচাঁদ, ইন্দ্রনাথ প্রমুখের লক্ষও ছিল সেই আদর্শের উপযুক্ত করে বাঙালিবাবুদের গড়ে তোলা। অতএব কাহিনি বুনতে গিয়ে অনিবার্যভাবেই নীতিকথাসুলভ লক্ষণ থেকে তাঁরা সরে আসতে পারেননি। ব্যঙ্গের সুনিপুণ আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে আঘাতকারীর চোখে ছিল অশ্রু। বাংলা উপন্যাসের শুরুর দিকে বাঙালিবাবুদের মদ্যাসক্তি ও ব্যভিচার দোষই সমালোচনার মুখ্য হয়ে উঠেছে, কিন্তু অচিরেই মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের আদর্শগত নানান দ্বন্দ্ব ও কার্যকলাপ, কথায় ও কাজের গুরুতর অসংগতিই প্রধান আলোচ্য হয়ে উঠেছে। ব্রাহ্মবাবুরা এর একটি বড়ো অংশ জুড়ে আছেন, কারণ তাঁরা ছিলেন প্রাথমিকভাবে শিক্ষিত প্রগতিশীল মধ্যশ্রেণির প্রতিনিধি। অন্যদিকে তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্বের ভাগও ছিল প্রবল। পারস্পরিক মতবিরোধ, ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা, অসূয়া  এসবের সূত্র ধরে ক্রমেই তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিলেন শ্রেণি থেকেই। এই বিচ্ছিন্নতা ছিল সমাজের সাধারণ শ্রেণির কাছ থেকেও। ফলে মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'কুলের সর্ববৃহৎ প্রতিনিধি ব্রাহ্মবাবুরা উপন্যাসগুলিতে প্রায়শই নিন্দিত হয়েছেন, ব্যঙ্গবিদ্রূপ-উপহাসের লক্ষ হয়েছেন।

ব্রাহ্মবাবুদের মধ্যে দ্বন্দ্ব যতই থাক, তাঁদের প্রগতিচেতনাকে অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি সংস্কারমুখী হিন্দুবাবুদের পক্ষেও। পুঁথিগত বিদ্যার প্রভাবে এঁরা ব্রাহ্মবাবুদের ন্যায় প্রগতিশীল এবং শাসকের ন্যায় আধুনিক হয়ে উঠতে চেয়ে এক হাস্যকর অসংগতির জন্ম দিয়েছিলেন। স্থূল বিলাতিয়ানার অন্ধ অনুকরণ এবং নারীমুক্তির সংকীর্ণ প্রয়োগকেই অ-ব্রাহ্ম শিক্ষিত মধ্যশ্রেণিরবাবুরা আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন। অতএব ব্রাহ্মপ্রভাব স্তিমিত হলে উপহাসের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠলেন এঁরাই। পাশাপাশি আপোশকামী রক্ষণশীল হিন্দুরা নির্মাণ করতে থাকেন আদর্শায়িত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের রূপকল্প, যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত, কিন্তু বেদ-বেদান্ত-স্বদেশীয় সংস্কৃতির প্রতি আস্থাশীল, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতাকে সংকীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করতে আগ্রহী, ব্যভিচার-দোষমুক্ত, চেতনাবান এবং স্বীয় সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অবশ্য এই নির্মাণ প্রকল্প উনিশ শতক পেরিয়ে বিশ শতকেও সম্প্রসারিত হয়েছিল। তবে মোটের উপর, উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাসের সীমিত পরিসরে বাঙালিবাবুদের নানান প্রতিনিধিত্বের সূত্রে বাজার সরগরম ছিল বলা যায়। সেইসঙ্গেই বলা যায়, বাংলা উপন্যাস কেবল বাবুদের নির্মম সমালোচনাই নয়, তাঁদেরকে নতুন করে গড়তেও চেয়েছিল।

### টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. দ্র. উনিশ শতকে প্রকাশিত উপন্যাসের সম্ভাব্য তালিকা; হাসান, ড. বদরুল, 'উনিশ শতক: নবজাগরণ ও বাঙ্‌লা উপন্যাস', জগৎমাতা পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ ১৯৯০, কলকাতা, পৃ. ১৭৩-১৮৮।

২. Stiffen, Lesly, 'History of English Thought in the Eighteenth Century', IInd ch, p.12. দ্র. উল্লেখিত:-ভট্টাচার্য, দেবীপদ, 'উপন্যাসের কথা', দে'জ সংস্করণ ২০০৩, দে'জ, কলকাতা, পৃ. ২৫।

৩. Polland, A.F, 'Factors of Modern History', 1932, আখ্যাপত্র বিনষ্ট;  p. 44.

৪. দ্র. ঘোষ, বিনয়, 'বাংলার নবজাগৃতি'।

৫. গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র, 'বাংলার নারী-জাগরণ', পুনমুর্দ্রণ ১৯৯৭, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলকাতা, পৃ. ১।
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত সম্পা., 'আলালের ঘরের দুলাল', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, তৃতীয় সংস্করণ ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, ভূমিকা, কলকাতা, পৃ. ১/০ দ্র.
৭. ভূমিকা; মিত্র, প্যারীচাঁদ, 'আলালের ঘরের দুলাল', ও মোহাম্মদ, মণিরুজ্জামান সম্পা. প্যারীচাঁদ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, ১ম সংস্করণ ২০০৩, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৩৯।
৮. ভূমিকা; ঘোষ, গোপীমোহন, 'বিজয়বল্লভ'।
উদ্ধৃতঃ হাসান, ড. বদরুল, 'উনিশ শতক : নবজাগরণ ও বাঙ্‌লা উপন্যাস', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।
৯. প্রথমবারের বিজ্ঞাপন দ্র. মজুমদার, হরিনাথ, 'বিজয়-বসন্ত' (১৮৫৯)।
চৌধুরী, আবুল আহসান সম্পা., 'কাঙাল হরিনাথ মজুমদার নির্বাচিত রচনা', প্রথম সংস্করণ ১৯৯৮, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৩৮৯।
১০. ভট্টাচার্য, দেবীপদ, 'উপন্যাসের কথা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।
১১. Brereton, Geoffrey, 'A short History of French Literature', Penguine Books, London, 1956 edi, ch. 8, p. 108.
১২. বাগল, যোগেশচন্দ্র সম্পা., 'বঙ্কিম-রচনাবলী', ২য় খণ্ড, নবম মুদ্রণ ১৩৯২, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ২৭২।
১৩. 'আলালের ঘরের দুলালে'র বাংলা ভূমিকায় 'উপন্যাসাদি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন লেখক। দ্র. মণিরুজ্জামান, মোহাম্মদ সম্পা., 'প্যারীচাঁদ রচনাবলী', প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।
১৪. তদেব, পৃ. ৩৯।
১৫. নাগ, অরুণ সম্পা., সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা, সুবর্ণরেখা সংস্করণ, ২য় সং ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, পৃ. ৩০।
১৬. 'আলালের ঘরের দুলাল', 'প্যারীচাঁদ রচনাবলী', প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।
১৭. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ, 'কলিকাতা দুইশত বৎসর পূর্বে'; চৌধুরী, সত্যজিৎ ও সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর সম্পা., 'হরপ্রসাদ রচনাবলী', ৪র্থ খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৯, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, পৃ. ৭১।
১৮. 'আলালের ঘরের দুলাল', 'প্যারীচাঁদ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।
১৯. নাগ, অরুণ সম্পা., 'সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।
২০. বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রসাদ, '৩০০ বছরের কলকাতায় শিক্ষা ও শিক্ষক', 'বিষয় কলকাতা' প্রথম সং ১৯৯৩, জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, কলকাতা, পৃ. ৪১।
২১. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, পঞ্চম মুদ্রণ ১৪০১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃ. ৬৬১।
২২. 'আলালের ঘরের দুলাল', 'প্যারীচাঁদ রচনাবলী', প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।
২৩. তদেব, পৃ. ৬৯।
২৪. তদেব, পৃ. ৭০।

২৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, চতুর্থ মুদ্রণ ১৪০৮, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃ. ১৩১।
২৬. 'আলালের ঘরের দুলাল', 'প্যারীচাঁদ রচনাবলী', প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।
২৭. তদেব, পৃ. ৯৮।
২৮. তদেব, পৃ. ১০৩-১০৪।
২৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।
৩০. হুতোম প্যাঁচার নকশা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪-২৩০ দ্র.।
৩১. তদেব, পৃ. ২১৮।
৩২. তদেব, পৃ. ২১৫।
৩৩. তদেব, পৃ. ২১৯।
৩৪. Calcutta Review vol. xxxv, p. 184-185, Calcutta in the older Times — its people থেকে উদ্ধৃত। দ্র. রায় এ. কে, 'কলিকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', ভাষান্তর, সেন, শুদ্ধোদন, প্রথম সংস্করণ ১৯৮২, ঋদ্ধি-ইন্ডিয়া, কলকাতা, পৃ. ৩১১।
৩৫. তদেব, পৃ. ৩১৪।
৩৬. 'আলালের ঘরের দুলাল', প্যারীচাঁদ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।
৩৭. তদেব, পৃ. ১০৯।
৩৮. ইতিপূর্বে উল্লিখিত : তৃতীয় অধ্যায় দ্র.।
বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, 'কলিকাতা কমলালয়', 'রসরচনাসমগ্র', প্রথম নবপত্র প্রকাশ ১৯৮৭, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ৭।
৩৯. তদেব, পৃ. ৮।
৪০. আচার্য, পরমেশ, 'বাঙালি ভদ্রলোকের শিক্ষাচিন্তা : উনিশ শতক', বসু, স্বপন ও চৌধুরী, ইন্দ্রজিৎ সম্পা., 'উনিশ শতকের বাঙালি-জীবন ও সংস্কৃতি', প্রথম সং ২০০৩, পুস্তক-বিপণি, কলকাতা, পৃ. ২৩০।
৪১. 'আলালের ঘরের দুলাল', প্যারীচাঁদ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।
৪২. দ্র. বাগল, যোগেশচন্দ্র, 'হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত'।
৪৩. 'আলালের ঘরের দুলাল', প্যারীচাঁদ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮-৭৯।
৪৪. তদেব, পৃ. ৮১।
৪৫. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, 'বিষবৃক্ষ'; বাগল, যোগেশচন্দ্র সম্পা., বঙ্কিম-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, দশম প্রকাশ ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, সাহিত্য-সংসদ, কলকাতা, পৃ. ২২৪।
৪৬. 'বাবু', 'লোকরহস্য'; বাগল, যোগেশচন্দ্র সম্পা., বঙ্কিম-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, নবম মুদ্রণ ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, সাহিত্য-সংসদ, কলকাতা, পৃ. ১১।
৪৭. 'বিষবৃক্ষ'; প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪।
৪৮. দাস, প্রফুল্লকুমার সম্পা., 'বর্তমান সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্য', 'শিবনাথ শাস্ত্রীর অপ্রকাশিত বক্তৃতা ও স্মারকলিপি', কলকাতা, ব্রাহ্মসমাজ, ১৯৭৫ দ্র.।

৪৯. Sen. Amiya. P, 'Hindu Revivalism in Bengal (1872-1905)', 1st Edi, 1993, Delhi, p. 4.

৫০. বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ, ‘কল্পতরু’।
বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন সম্পা., ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রথম দীপ সংস্করণ ২০০৭, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ২৬।

৫১. তদেব, পৃ. ৩০।

৫২. তদেব, পৃ. ৫৬।

৫৩. তদেব, পৃ. ১০৪।

৫৪. শাস্ত্রী, শিবনাথ, ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’; সম্পা., ঘোষ, বারিদবরণ; নিউ এজ সংস্করণ ২০০৭, নিউএজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ১৮১।

৫৫. তদেব, পৃ. ১৮২।

৫৬. পাইন, কানাইলাল, ‘ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ সমীপে বিনীত নিবেদন’, ‘নব্যভারত’, চৈত্র ১২৯৫ সাল, পৃ. ৬৪০।

৫৭. তদেব, পৃ. ৬৪৩।

৫৮. তদেব, পৃ. ৬৪৩।

৫৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ, ‘কল্পতরু’; ইন্দ্রনাথ-গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪।

৬০. তদেব, পৃ. ২৪।

৬১. বঙ্কিম-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯৭।

৬২. ‘ইন্দ্রনাথের স্বরচিত জীবনী’, ইন্দ্রনাথ-গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

৬৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ, ‘ক্ষুদিরাম’;
বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন সম্পা., ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী ২য় খণ্ড, প্রথম দীপ সংস্করণ ২০০৭, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ৫।

৬৪. তদেব, পৃ. ২৮।

৬৫. তদেব, পৃ. ২৭।

৬৬. তদেব, পৃ. ৩৮।

৬৭. তদেব, পৃ. ৩৯।

৬৮. তদেব, পৃ. ১৩।

৬৯. তদেব, পৃ. ১২-১৩।

৭০. ‘ইন্ডিয়ান মিরর’, ০৬.০৮.১৮৭৬।
বসু, স্বপন সংকলিত ও সম্পাদিত, ‘সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ’, প্রথম সংস্করণ ২০০৩, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, পৃ. ১৬৫।

৭১ ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’, ২৩.০৯.১৮৬৯।
বসু, স্বপন সংকলিত ও সম্পাদিত, ‘সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ’, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।

৭২. বিশ্বাস, তারকনাথ, 'কমলা', তারকনাথ-গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড,১৩০৬ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা, পৃ. ৩৩৭।
৭৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ, 'দু'খানি ছবি', ১৮৮৮ (১২৯৫ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৬-১৭।
৭৪. দ্র. পাদটীকা। সান্যাল, অবন্তীকুমার, 'বাবু' প্রথম সং ১৯৮৭, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন্‌স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ৬৪।
৭৫. Chatterjee, Partha, 'The Nation and Its Fragments'; Colonial and Post-Colonial Histories, New Delhi, 1993, p. 36-37 দ্র.।
৭৬. বসু, চন্দ্রনাথ, 'পশুপতি-সম্বাদ'; বসু, কাঞ্চন সম্পা., দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, সপ্তম মুদ্রণ ২০০৪, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন্‌স, কলকাতা, পৃ. ২৪৭।
৭৭. তদেব, পৃ. ২৪৭।
৭৮. তদেব, পৃ. ২৪৮।
৭৯. তদেব, পৃ. ২৪৯।
৮০. তদেব, পৃ. ২৫১-৫২।
৮১. তদেব, পৃ. ২৫৩।
৮২. মজুমদার, করুণাময়, 'চন্দ্রনাথ বসু : জীবন ও সাহিত্য', প্রথম সংস্করণ ১৯৮৪, কলকাতা, পৃ. ১৯১-৯৬।
৮৩. সাহা, অর্ণব, 'পশুপতি-বৃত্তান্ত', 'অবভাস', এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০০৫, সম্পাদক : চক্রবর্তী, পার্থ, কলকাতা, পৃ. ২০৩।
৮৪. শাস্ত্রী, শিবনাথ, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭।
৮৫. বসু, চন্দ্রনাথ 'পশুপতি-সম্বাদ', পৃ. ২৫৪।
৮৬. তদেব, পৃ. ২৬৪।
৮৭. তদেব, পৃ. ২৬৯।
৮৮. 'অধুনা আমাদের দেশে বিদ্যা ফলবতী হয় না কেন?', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৭৯৮ শক, ৪০০ সংখ্যা। দ্র. ঘোষ, বিনয়, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', পঞ্চম খণ্ড, প্রথম প্যাপিরাস সংস্করণ, ১৯৮১, প্যাপিরাস, কলকাতা, পৃ. ৫৩।
৮৯. তদেব, পৃ. ৫৪।
৯০. বসু, প্রদীপ সংকলিত, সাময়িকী, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ২১০।
৯১. তদেব, পৃ.২১১।
৯২. 'ভারতের অবনতি', অণুবীক্ষণ, পৌষ ১২৮২ বঙ্গাব্দ (১৮৭৫)।
বসু, প্রদীপ সংকলিত, সাময়িকী, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯।
৯৩. পাল, নিমাইচন্দ্র সম্পাদিত, 'দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্ম-জীবনচরিত', প্রথম স্বদেশ সংস্করণ ২০০৫, স্বদেশ, কলকাতা, পৃ. ৩৭-৩৮।
৯৪. শ্রীপান্থ, 'এই এক নূতন! আমার গুপ্তকথা! অতি আশ্চর্য!!", 'বটতলা', প্রথম সংস্করণ ১৯৯৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ৬৬।

৯৫. দ্র. Sen, Priyoranjan, 'Western influence in Bengali Novel,' Firma KLM PVT LTD, Calcutta, 1931.

৯৬. উদ্ধৃত :- সাহা, অর্ণব, ‘গুপ্তকথা’, ‘চিরন্তন’, সম্পা., চট্টোপাধ্যায়, সোমনাথ, ১৬ শ্রাবণ ১৪১৭, ১ আগস্ট ২০১০, শ্যামনগর, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পৃ. ১৯।

৯৭. শ্রীপান্থ, ‘এই এক নূতন! আমার গুপ্তকথা!! অতি আশ্চর্য!!’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

৯৮. দ্র. Pal, Bipinchandra, 'Memories of My Life and Times', vol. I &II, Calcutta.

৯৯. সেন, সুকুমার, ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ১৪০১ বঙ্গাব্দ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ৪৭৩।

১০০. সাহা, অর্ণব, সম্পা., ‘দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ’, ৩য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ২০১৩, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ৭৩।

১০১. তদেব, পৃ. ১৩৫।

১০২. তদেব, পৃ. ১৪৭।

১০৩. Sastri, Sivanath, 'History of the Brahma Samaj', 2nd Edi 1974, Reprint 1993, Sadharan Brahmo Samaj, Kolkata, p. 129.

১০৪. Sarkar, Sumit, 'The City Imagined', 'Writing Social History', Eighth Impression 2004, Oxford University Press, New Delhi, p. 171.

১০৫. দ্র. ঘোষ, বিনয়, ‘সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র’, ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্যাপিরাস সংস্করণ ১৯৮৩, প্যাপিরাস, কলকাতা, পৃ. ১৩৭-৪১।

১০৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ, ‘জাতিভেদ’।
বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন সম্পা., ‘ইন্দ্রনাথ-গ্রন্থাবলী’, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০।

১০৭. অজ্ঞাত, ‘মডেল ভ্রাতা বা আদর্শ যুবক’, ১৮৮৬।
দ্র. সাহা, অর্ণব সম্পা., ‘দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ’, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৭।

১০৮. রায়, অনুরাধা ‘বাঙালি বুদ্ধিজীবীর চোখে ব্রিটিশ শাসন’; দ্র. বসু, স্বপন ও চৌধরী, ইন্দ্রজিৎ সম্পা., ‘উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি’, প্রথম সং ২০০৩, পুস্তক-বিপণি, কলকাতা, পৃ. ২৫৪।

১০৯. সাহা, অর্ণব সম্পা., ‘দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য-সংগ্রহ’, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৮।

১১০. তদেব, পৃ. ৪২৯।

১১১. তদেব, পৃ. ৪৩৩।

১১২. তদেব, পৃ. ৪৪০।

১১৩. তদেব, পৃ. ৪৫০।

১১৪. দ্র. Sanyal, Rajat, 'Voluntary Association and the Public Life in Urban Bengal', First Edi 1980, Riddhi-India, Kolkata, p. 244-57.

১১৫. Sarkar, Sumit, 'Rereissance and Kaliyuga', 'Writing Social History', Ibid, p. 190.

১১৬. শাস্ত্রী, শিবনাথ, ‘আত্মচরিত’, প্রথম দে’জ সংস্করণ ২০০৩, দে’জ কলকাতা, পৃ. ১৫১-১৫২।

১১৭. বসু, যোগেন্দ্রচন্দ্র, 'নেড়া হরিদাস'।
দাশ, ড. নির্মল সম্পা., যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৬, গ্রন্থমেলা, কলকাতা, পৃ. ২৫।
১১৮. ধর, জহরলাল, 'সচিত্র কলিকাতা রহস্য', ১৮৯৬; প্রথম পরশপাথর সংস্করণ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, পরশপাথর প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ১৫৬।
১১৯. তদেব, পৃ. ১৭।
১২০. তদেব, পৃ. ১৮।
১২১. তদেব, পৃ. ১৮।
১২২. তদেব, পৃ. ১৯।
১২৩. তদেব, পৃ. ১২৬।
১২৪. তদেব, পৃ. ১২৬-২৭।
১২৫. তদেব, পৃ. ১৮।
১২৬. তদেব, পৃ. ১০-১১।
১২৭. তদেব, পৃ. ১৩।
১২৮. শ্রীম, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পঞ্চম ভাগ, দশম পুনর্মুদ্রণ ১৩৮২ বঙ্গাব্দ, কথামৃত-ভবন, কলকাতা, পৃ. ১৫-১৬।
১২৯. বসু, দেবাশিস সম্পা., 'প্রোফেসর বোসের অপূর্ব্ব ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', কারিগর সংস্করণ ২০১৩, কারিগর, কলকাতা, পৃ. ২২১-২৪ দ্র.।
১৩০. 'সচিত্র কলিকাতা-রহস্য', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।
১৩১. তদেব, পৃ. ১৬০।
১৩২. মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ, 'কঙ্কাবতী'; ত্রৈলোক্যনাথ-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, সাহিত্যম্ সংস্করণ ২০০৫, সাহিত্যম্, কলকাতা, পৃ. ১১৩।
১৩৩. তদেব, পৃ. ১১৬।
১৩৪. মুখোপাধ্যায়, মীনাক্ষী, 'উপন্যাসে অতীত : ইতিহাস ও কল্প-ইতিহাস, প্রথম সংস্করণ ২০০৩, থীমা, কলকাতা, পৃ. ১৪-১৫।

অষ্টম অধ্যায়ঃ

# রম্যরচনা, স্মৃতিকথা, প্রবন্ধ ইত্যাদিতে বাবু

উনিশ শতকের পূর্বে যে বাংলা গদ্য লেখ্যরূপে সচরাচর ব্যবহৃত হত কড়চা জাতীয় গ্রন্থে[১] কিংবা দলিল-দস্তাবেজ অথবা চিঠিপত্রের পরিসরে, উনিশ শতকের সূচনা লগ্ন থেকে সেই বাংলা গদ্যই হয়ে উঠল আত্মপ্রকাশে উন্মুখ বাঙালি-মানসের ভাবপ্রকাশক অন্যতম প্রধান মাধ্যম। উনিশ শতকে বাংলা গদ্যের এই নতুন আবেগের পিছনে কিছুটা ছিল শাসকশ্রেণির নিজস্ব তাগিদ। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার কলেজ অফ ফোর্ট উইলিয়াম স্থাপিত হয় ইউরোপীয় সিভিলিয়ানদের শিক্ষাদানের প্রয়োজনে। শাসিতের ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এই সময় থেকে অনুভব করে উক্ত কলেজে অন্যান্য দেশীয় ভাষার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই বাংলা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রয়োজনে মূলত উইলিয়াম কেরীর উদ্যোগে রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ মুন্সী প্রমুখেরা বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। একইসময়ে শ্রীরামপুরের দিনেমার মিশন খ্রিষ্টধর্মবিষয়ক কিছু কিছু পুস্তক বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারেও মূল উদ্যোগী ছিলেন উইলিয়াম কেরী। বলা বাহুল্য, সাহিত্যসেবার কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এইসব গ্রন্থ রচিত হয়নি, তা হয়েছিল মূলত ক্ষুদ্র ধর্মীয় স্বার্থরক্ষার তাগিদ থেকেই। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা গদ্যগ্রন্থগুলি কতটা সাধারণের নাগালে এসেছিল, সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শ্রীরামপুরের দিনেমার মিশন মুদ্রিত খ্রিস্টধর্মবিষয়ক গ্রন্থ ও পুস্তিকাগুলির পরিসরও ছিল সীমিত। সুতরাং এইসব গ্রন্থের মাধ্যমে উনিশ শতকে বাংলাগদ্যের নবরূপ-নির্মাণের তত্ত্ব অনেকাংশেই খারিজ হয়ে যায়। এইসব গ্রন্থে বাংলা গদ্যের যে প্রায়-সুললিত ছাঁচ পাওয়া যায়, তার ভিত্তি একদিনে গড়ে ওঠা সম্ভবপর নয়। দীর্ঘদিনের উপযুক্ত অনুশীলন ও ক্রমবিকাশের পর্ব পেরিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই বাংলা গদ্য রীতিমত সুদৃঢ় ভিত্তি লাভ করেছিল। অতএব সমালোচকের অনুমান যথার্থ বলেই মনে হয় যে,[২] 'সপ্তদশ শতকে বা তারও আগে বাংলা গদ্যে হয়ত কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, গ্রন্থ না হলেও অন্তত উন্নতমানের চিঠিপত্রাদি অবশ্যই রচিত হয়ে থাকবে।' যদিও কালের প্রহরা পেরিয়ে সে-সবের সন্ধান আজ আর মেলে না, তবুও অনুমান করতে কষ্ট হয় না, একটি সমৃদ্ধ বাংলা লেখ্য গদ্যের উত্তরাধিকার এসে পৌঁছেছিল উনিশ শতকে এবং নতুন কালের আত্মপ্রকাশোন্মুখ বাঙালি উক্ত গদ্যকেই নিজভাব প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সম্ভবত এ কারণেই উনিশ শতকের গোড়ার দিকে রামমোহন (১৭৭২-১৮৩৩) তাঁর উপনিষদ ব্যাখ্যা ও নতুন ভাবপ্রকাশের বাহন হিসাবে বাংলা গদ্যকেই বেছে নিয়েছিলেন, পদ্য বা কবিতাবন্ধকে নয়।

কিন্তু উনিশ শতকে বাংলা গদ্যকে প্রাসঙ্গিকভাবে সর্বতোমুখী ও বহুপ্রসবা করে তোলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো অবদান বাংলাভাষায় প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকীগুলির। এই শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই বাংলা সংবাদ-সাময়িকীগুলি একে একে প্রকাশিত হতে থাকে এবং ক্রমশ তর্কপ্রিয় বাঙালির জাতীয় জীবনের মুখপাত্র স্বরূপ হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্রের আগমন হয় গোয়ায়, পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের বছরে অর্থাৎ ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে। এর ঠিক ২২২ বছর পর ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে হুগলিতে রাজকর্মচারী চার্লস উইলকিন্‌সের তত্ত্বাবধানে 'এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যানগুয়েজ' বই ছাপা হলে বাংলায় মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবের কাজটি শুরু হয়। কোনো কোনো গবেষকের মতে,[৩] প্রথম মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার সালটি আরও এক বছর আগের, ১৭৭৭-এর দিকে, গ্রন্থটি একটি পঞ্জিকা— 'Calendar for the Year of our Lord', মুদ্রাকর সম্ভবত জেম্‌স অগাস্টাস হিকি। অষ্টাদশ শতাব্দীর কলকাতায় হিকি হলেন সেই ঐতিহাসিক পুরুষ, যাঁর সম্পাদনায় বাংলা তথা কলকাতা পেয়েছিল তার প্রথম সংবাদপত্র 'হিকিস বেঙ্গল

গেজেট অর দি অরিজিনাল ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভারটাইজার'। ১৭৮০-র জানুয়ারিতে প্রকাশিত ইংরেজি এই সংবাদপত্রটির উদ্দিষ্ট পাঠকগোষ্ঠী ছিলেন কলকাতা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের ইউরোপীয়রা। তখনও পর্যন্ত সংবাদপত্র ব্যাপারটি ছিল এবঙ্গের ইংরেজি অনভিজ্ঞ মানুষের পাঠ-অভিজ্ঞতার বাইরের জিনিস। সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়ে সরকারি কাজকর্মের সমালোচনায় মুখর 'হিকিস্ বেঙ্গল গেজেট' অবশ্য বন্ধ হয়ে যায় ১৭৮২-র মার্চেই। কিন্তু হিকির দেখানো পথে ১৭৮০-র নভেম্বরেই লবণের গোলাদার পিটার রিড ও থিয়েটারওয়ালা বি. মেসিঙ্কের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে ছাপা দ্বিতীয় সংবাদপত্র 'ইন্ডিয়া গেজেট'। হিকির কাগজের অপমৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় সরকারি কাগজ 'ক্যালকাটা গেজেট' (১৭৮৪ থেকে); ১৭৮৫-তে প্রকাশিত হয় তিন তিনটি সংবাদপত্র— উললিয়াম দুনের 'বেঙ্গল জার্নাল', এ ছাড়া 'ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন' ও 'মাদ্রাজ ক্যুরিয়র'; ১৭৮৬-তে 'ক্যালকাটা ক্রনিকল'। সরকারে সমালোচনায় মুখর সংবাদপত্রগুলির (সরকারি কাগজ 'ক্যালকাটা গেজেট' ছাড়া) প্রতি বিরূপতায় এবং শাসিতের উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল হওয়ার ভয়ে অতঃপর ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ওয়েলেসলির বিখ্যাত অথবা কুখ্যাত সংবাদপত্র আইন। ১৮১৮-তে পৌঁছে এই আইনই হেস্টিংস কর্তৃক সংশোধিত আকারে সম্পাদককুলের উপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। যদিও ততদিনে ছাপাখানা এবং সংবাদপত্রের প্রতি এ বঙ্গের শিক্ষিত মানুষের কৌতূহল ও ক্ষুধা উদগ্র হয়ে উঠেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলকাতার ছাপাখানা ছিল সাকুল্যে ১৭টি, সংবাদপত্র ও সাময়িকী ছাপা হত আঠারোখানা, বই ছাপা হয়েছিল কমপক্ষে তিনশো, যার মধ্যে খান যোলো বাংলা বই। কিন্তু এগুলি সবই ছিল সাহেবদের উদ্যোগে, সাহেবদের জন্য, সাহেব কর্তৃক রচিত বা সম্পাদিত প্রচেষ্টা। কিন্তু সেদিনের ভোজে বাঙালির ডাক না পড়লেও, দূর থেকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিল তারা। ক্রমশ ইংরেজ এবং ইংরেজি ভাষার সঙ্গে প্রয়োজনীয় সান্নিধ্য গড়ে ওঠায় বাঙালির মানসলোকে পরিবর্তন ঘটে চলেছিল। এতকাল সাহেবদের উদ্যোগে, সাহেবদের প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার জন্য স্থাপিত হয়েছিল কলকাতার প্রথম বিদ্বৎসভা 'রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি' (১৭৮৪)। ১৮১৫-তে বাঙালিটোলায় রামমোহন রায় 'আত্মীয়সভা' নামে এদেশীয়দের প্রথম বিদ্বৎসভা গড়ে তুললেন। ১৮১৭-তে স্থাপিত হল হিন্দু কলেজ এবং ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি; ১৮১৮-তে ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি। ইতিপূর্বে ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হলে বাঙালিরা ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে শুরু করেন। ১৭৭৪-এই জনৈক রামনারায়ণ মিশ্র শোভাবাজারে ইংরেজি পাঠশালা স্থাপন করেন। ১৭৯১-তে রামজয় দত্ত কলুটোলায় ইংরেজি স্কুল পত্তন করেন। এ ছাড়াও রামমোহন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু, ভূষণমোহন দত্ত, শিবু দত্ত প্রমুখ বাঙালিরা ছোটো-বড়ো ইংরেজি স্কুল গড়ে তোলেন। তবে অভিজাতরা ইংরেজ পরিচালিত স্কুলের দিকেই প্রাথমিকভাবে আগ্রহ দেখান। যেমন, ১৭৮৪-তে স্থাপিত শেরবোর্ন স্কুলে পড়তেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে ডেভিড ড্রামন্ডের বিখ্যাত ধর্মতলা একাডেমির ছাত্র ছিলেন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান হেনরি ডিরোজিও। বাঙালি প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি স্কুলের মধ্যে প্রথমদিকে বিখ্যাত ছিল ভবানীপুরের ইউনিয়ন স্কুল। ১৭৯৩-এ প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কাগজের বিখ্যাত সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখার্জি। পরবর্তীকালের আরেকটি সফল ও জনপ্রিয় উদ্যোগ হল ১৮২৩-এ স্থাপিত গৌরমোহন আঢ্যর 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি'। হিন্দু কলেজের পর এটিই ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় বাঙালি পরিচালিত ইংরেজি শিক্ষার স্কুল। পাশাপাশি, গোবিন্দচন্দ্র বসাক ও

প্যারীচাঁদ মিত্রের যথাক্রমে চিৎপুর ও নিমতলার স্কুল ছিল বাঙালি 'ভদ্রলোক' মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তদের জন্য স্থাপিত ফ্রি-স্কুল (Free-School)। আড়পুলির 'দি হিন্দু ফ্রি স্কুলে'র ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৫০ জন। অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শেষদিক থেকেই বাঙালিরা প্রস্তুত হচ্ছিলেন যুগান্তরের। ১৮২০-র দিকেই প্রায় ১০,০০০ জন বাঙালি মোটামুটি ইংরেজি ভাষাশিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন বলে জানা যায়।[৪] অতএব, অনুমান করা অসংগত হবে না যে, পাশ্চাত্য শিক্ষার হাত ধরে পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল সূত্রগুলি সম্পর্কে এঁরা ওয়াকিবহাল ও সচেতন হচ্ছিলেন, এবং সংবাদ-সাময়িকীগুলিকে সেই সভ্যতার অন্যতম লক্ষণ হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। সমসাময়িক নানান ঘটনার সূত্রে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া থেকে সুগভীর চিন্তার প্রকাশ সংবাদপত্রে যতটা সুলভ, অন্যতর ক্ষেত্রে ততটা নয়। তা ছাড়া স্বল্প মূল্যে জ্ঞান ও চিন্তার রসদ জোগান দেয় সংবাদপত্রগুলি। নতুন ভাব ও আদর্শে জেগে ওঠা বাঙালি তার জন্যই উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন। ১৮১৮-তে নিজস্ব ছাপাখানা ক্রয় করে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য বের করেন তাঁর বিখ্যাত 'বাঙাল গেজেটি'। তবে বাংলা সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র প্রকাশে প্রথম উদ্যোগ শ্রীরামপুরের দিনেমার মিশনের। ১৮১৮-র এপ্রিলে সাময়িকী 'দিগদর্শন' এবং মে থেকে সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ করতে থাকেন তাঁরা। এই দৃষ্টান্ত ধরে শিবপ্রসাদ শর্মার বকলমে রামমোহন রায় প্রকাশ করেন 'ব্রাহ্মণসেবধি' (১৮২১), তারাচাঁদ দত্ত ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিলিত উদ্যোগে প্রকাশিত হয় 'সম্বাদ কৌমুদী' (ডিসেম্বর ১৮২১), পরের বছর ১৮২২-এর মার্চে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাচার চন্দ্রিকা', ১৮২৩-এ 'সম্বাদ তিমিরনাশক', ১৮২৯-এ নীলরত্ন হালদারের 'বঙ্গদূত', ন্যায়ালঙ্কারের 'শাস্ত্রপ্রকাশ'(১৮৩০), ১৮৩১-এ সাপ্তাহিক 'সংবাদ-প্রভাকর' (১৮৩৯ থেকে দৈনিক হিসাবে প্রকাশিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র), দক্ষিণানন্দন মুখোপাধ্যায়ের 'জ্ঞানান্বেষণ' (১৮৩১), রামগোপাল ঘোষের 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' (১৮৪২), অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩), রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১), দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮), প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সম্পাদিত স্বলায়ু 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪), উমেশচন্দ্র দত্তের 'বামাবোধিনী পত্রিকা' (১৮৬৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) ইত্যাদি পত্রপত্রিকা উনিশ শতকের বাঙালি-মননের দর্পণ হিসাবে প্রতিভাত হতে থাকে।

যেকোনো সভ্য দেশেই সংবাদপত্রের ভূমিকা জাতিসত্তার বিকাশে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায়। উনিশ শতকের বাংলাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। জনৈক গবেষকের মতে, 'বাংলা সংবাদ সাময়িকপত্র এমনি এক সময় প্রকাশিত হতে শুরু করে যখন শিক্ষা, রুচি ও আর্থিক ক্ষমতার নিরিখে কলকাতাবাসী বাঙালি জনসমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা যায় না অথচ সেই বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ হওয়ার প্রবণতা সেই জনসমাজে স্পষ্ট লক্ষ করা যায়।'[৫] সংবাদপত্রগুলি যখন প্রকাশিত হতে শুরু করে তখন নববাবুদের কাল অস্তমিত প্রায়, বাবুকুলের তৃতীয় অবতার তথা ইংরেজি শিক্ষিত নব্যবাবুরা দেখা দিয়েছেন; চতুর্থ অবতার তথা মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুরা সাজঘরে প্রস্তুতি নিচ্ছেন, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এঁরাই হয়ে উঠবেন বাঙালি বাবুকুলের প্রতিনিধি— একইসঙ্গে আত্মসমালোচক এবং আত্মপ্রবঞ্চক। সরকারি নীতির ভালো-মন্দ বিচার, নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যবিধান ও পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থার প্রতিকার প্রার্থনা, ধর্ম-অধর্ম বিষয়ে মতামত জ্ঞাপন, সামাজিক সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা-সমালোচনায় তৎপর। যদিও গবেষকের মতে, 'বাংলা পত্রপত্রিকার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের পর্বে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের চরিত্রস্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট

হতে সময় লেগেছিল। সংবাদপত্রে দীর্ঘ নিবন্ধ ও রসরচনা এবং সাময়িকপত্রে সংবাদপত্রের ঢঙে দৈনন্দিন খুঁটিনাটি সংবাদ পরিবেশনের রেওয়াজ চলেছিল দীর্ঘকাল ধরে।'[৬] তবে সেকারণেই বাবুদের নানান কীর্তিকলাপ যেমন কখনো নিছক সাংবাদিক-সুলভ নিরাসক্তিতে সংবাদ হিসাবে উদ্ধৃত, তেমনি আবার কখনো তা ব্যঙ্গে, রহস্যে, রসিকতায় রম্যরচনার স্তরে উন্নীত। সর্বদা সাংবাদিক-সুলভ নিরাসক্তি ধরে রাখা সম্ভব হয়নি বলে বাবুদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব কিংবা অকারণ অসূয়ার ভাবও চিহ্নিত করা যায়। তবে গঠনমূলক সমালোচনার দৃষ্টিকোণ থেকেই বাবুরা সংবাদপত্রগুলিতে আলোচিত-সমালোচিত হয়েছেন সবচেয়ে বেশি। সেকালের অধিকাংশ পত্রপত্রিকার ফাইল আজ আর পাওয়া সম্ভব নয়, কালের করাল গ্রাসে তা চিরতরে লুপ্ত। ইতিউতি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন সংকলন থেকে প্রাপ্ত উপাদান যথেষ্ট নয়। ফলে হাতে আসা সামান্য কিছু উপাদান দিয়েই সংবাদপত্রে বাবুদের আলোচনা-সমালোচনার স্বরূপ সম্পর্কে সাধারণ কিছু ধারণারই কেবল মুখোমুখি হতে পারি আমরা।

এ ব্যাপারে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণে'র ভূমিকার কথা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। ১৮১৮ সালে মিশনারিদের উদ্যোগে 'সমাচার-দর্পণ' যখন প্রকাশিত হয়, তখন নববাবুদের কাল, যদিও অপরাহ্ন বেলা। নববাবুদের জীবনযাপন, রুচি-প্রবৃত্তি মিশনারিদের নিজস্ব কর্মকাণ্ড ও ধর্মপ্রসারের অন্তরায় বলে তাঁরা শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন সম্ভবত। সেইসঙ্গেই অশিক্ষিত নববাবুদের অনুসরণে শাসিত শ্রেণি উচ্ছৃঙ্খল, একগুঁয়ে হয়ে উঠলে শাসকশ্রেণির বিপদ অবশ্যম্ভাবী। এই গড্ডালিকা-প্রবাহকে রোধ করে ইংরেজি শিক্ষা ও খ্রিস্টধর্মের আওতায় আনতে পারলে শাসকের অনুগত শ্রেণির সৃষ্টি হতে পারে, ফলে শাসকের শোষণ-প্রক্রিয়াও সহজ হয়ে যায়। এহেন গোপন উদ্দেশ্য নিয়েই নববাবুদের কদাচার, অনাচার প্রভৃতির প্রতি 'সমাচার দর্পণ' খড়গহস্ত। 'সমাচার-দর্পণে'র ২৪.২.১৮২১ এবং ০৯.০৬.১৮২১ এই দুই সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাবুর উপাখ্যান' সম্ভবত বাংলায় প্রকাশিত 'বাবু'বিষয়ক প্রথম রচনা। কেউ কেউ অনুমান করে থাকেন,[৭] এই রচনার লেখক সম্ভবত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮)। লেখক যিনিই হন, রচনাটি অত্যন্ত সুললিত; ঈষৎ ব্যঙ্গ ও রম্য উপন্যাসের গুণ মিশ্রিত সুচিন্তিত নিবন্ধ-বিশেষ। রচনাটি অনুসরণে আদিবাবু ও নব্যবাবুদের সম্পর্কসূত্র, নব্যবাবুদের স্বভাবের সাধারণধর্ম সঠিকভাবে চিনে নেওয়া যায়।

হুতোম নববাবুদের আর্থিক স্বাচ্ছল্যের পিছনে তাঁদের পূর্বপুরুষ তথা পিতৃ-পিতামহের 'নিমকির দাওয়ানি' কর্মের কথা বলেছিলেন তাঁর নকশায়[৮], তার প্রায় একচল্লিশ বছর আগের প্রকাশিত 'বাবুর উপাখ্যানে' নববাবুর পিতার পরিচয় সূত্রে ঐতিহাসিক যাথার্থ্য মেনেই রাজকীয় ও জমিদারি সংক্রান্ত নানান কাজের সঙ্গে 'আফীমের কুঠীর দেওয়ানি কর্ম্মে'র কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৯] কৃত্রিম-অকৃত্রিম আফিম প্রস্তুত করে তিনি বিলক্ষণ 'ধনশালী' হয়ে ওঠেন। বয়সকালে পুত্র হওয়াতে ইনি যথেষ্ট দানধ্যান এবং টিকটিকির নাচ ও ভেকের গান ইত্যাদি মাঙ্গলিক ক্রিয়া করেন। তাঁর একটি সভা আছে। মোসাহেব-উমেদারে পরিপূর্ণ সেই সভার পণ্ডিত ও কুলাচার্য নবকুমারের অনেক 'সুলক্ষণ' আছে বলে তার নাম তিলকচন্দ্র বা কুলীনচন্দ্র রাখার প্রস্তাব করেন। কেউ-বা পরামর্শ দিলেন, কালক্রমে 'ইনি অতি বড় সুখী মহাবাবু হইবেন ইহার আপন কর্ম্মানুযায়ী নাম আর দেখি না বরং মধুমক্ষিকার চাকনাশক বাবু নাম রাখহ।'[১০] বাবুত্বের নবধা-লক্ষণ তার এক বয়স্যের দ্বারা এই রচনাতেই প্রথম সুনির্দিষ্ট হল— 'ঘুড়ী তুড়ী জস দান আখড়া বুলবুলি মণিয়া গান। অষ্টাহে বনভোজন এই নবধা বাবুর লক্ষণ।'[১১] পরবর্তীকালে

‘নববাবুবিলাস’ নকশায় (১৮২৫) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সদৃশ লক্ষণের বয়ান উদ্ধৃত করেছেন। এটি কি সমকালে প্রচলিত বাবুচরিত্র নির্দেশক লোকসমাজপ্রচলিত ছড়া, নাকি অজ্ঞাত লেখক কিংবা ভবানীচরণের নিজস্ব নির্মাণ, তা নিঃসন্দেহে বলার উপায় নেই।

তিলকচন্দ্র বাবু বড়ো হতে না হতেই সবাইকে কটুকাটব্য করেন, মারধর করেন, কিন্তু বাবুর পিতার ভয়ে সকলেই কৃত্রিম আহ্লাদ প্রকাশ করেন। পুত্র কুকর্ম করলে আদিবাবু পিতা তাঁকে শিখিয়ে দেন মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে উক্ত কর্মের দায় অস্বীকার করতে। নববাবু পিতার প্রশ্রয়ে বিদ্যাভ্যাস করেননি, সর্বদাই ঘুড়ি বুলবুলির খেলাতে মন নিমগ্ন। তাঁর সঙ্গী কতকগুলি ‘অর্থী ও স্বার্থপর খোশামুদে মিষ্ট মুখো’ পারিষদ, তাঁদের প্রশংসায় বাবুরা ধরাকে সরাজ্ঞান করেন। ষোলো বছর বয়স হলে বাবুই শাস্ত্র-আলোচনা থেকে সামাজিক বিচার— সর্বদা শেষ কথা বলেন। বাবু একমাস ইংরেজি শিক্ষার চেষ্টা করেছিলেন, তাতেই তাঁর যথেষ্ট বুৎপত্তি জন্মেছে, চিঠিপত্র হাতে আসামাত্রই বুঝবার ভান করেন। বাবুর নিজের চিন্তায়:[১২]

‘আমি আপ্ত বিস্মৃত সকলেই আমাকে বিজ্ঞ ও পণ্ডিত কহে আর আমার আপনাআপনিও বোধ হয় যে আমি পণ্ডিত বটি তবে কি নিমিত্তে অন্য অন্য লোকের মতো ক্লেশ লয়ে বিদ্যা শিক্ষা করিব আমি মুহরি কিম্বা মুনসী অথবা কেরানীগিরি করিব না আমার দানাদি দ্বারা যথেষ্ট পুণ্য হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত অনুপার্জিত বিদ্যাও হইয়াছে অতএব এ অনিত্য সংসারে কেবল শারীরিক সুখ ভোগই সত্য কোন দিন মরিয়া যাইব যত সুখ করিয়া লইতে পারি সেই কর্ত্তব্য।’

অতএব এই বিবেচনায় বাবু ‘নবগুণ অথবা ধর্ম্মপ্রতিপালনপূর্ব্বক আমোদে কালক্ষেপ করেন’ বলা বাহুল্য, এই ‘নবগুণ’ বা ‘ধর্ম্ম’ হল বাবুত্বের নির্ধারিত নয়টি লক্ষণ।

ইতিমধ্যে বাবুর পিতার মৃত্যু হলে বাবু সকল ধনসম্পত্তি লাভ করে কর্তা হয়ে বসেন। তাঁকে ঘিরে নির্ধন দরিদ্র খোশামুদে মোসাহেবও জুটে যায়। বাবু ইচ্ছেমতো পিতৃসঞ্চিত ধনরাশি ব্যয় করেন। কিছুদিন পর বাবুর খেয়াল হয়, পিতা দেওয়ানির চাকরি করতেন বলে তাঁর বিলক্ষণ সম্মানপ্রাপ্তি ঘটত, অতএব বাবুকেও সম্মান পেতে গেলে কোনো উপযুক্ত চাকরি করতে হয়। কিন্তু, নববাবুর কোনোরূপ যোগ্যতা না থাকাতে বহু যাতায়াত করেও কোনো চাকরি জোটে না। উমেদার এবং মোসাহেব না থাকলে সভা থাকে না। সভা না থাকলে বাবুর মানমর্যাদাও থাকে না। অতএব বাবু প্রতারণা করে নিজের অচিরেই চাকরি হবার সংবাদ ঘোষণা করেন। বাবুকে ঘিরে ফলে চাকরির উমেদারের সংখ্যা বাড়তেই থাকে। কখনো কখনো বাবু রাজদরবারে যাওয়ার নাম করে সকলকে চমৎকৃত করেন। বাবুর দেওয়ানি-কর্ম লাভের আশায় সকলে বুক বাঁধে। বাবুও কুঠি যাবার নাম করে নিলাম ঘর থেকে ঘুরে এসে যৎকিঞ্চিত আহার করে নিদ্রা যান, অতঃপর মজলিসে এসে বসেন।

কোনোরকম বিদ্যাশিক্ষা না করেও বাবু শাস্ত্রাদি সম্পর্কে যেহেতু বিচার করতে পারেন এবং বস্তুত শেষ কথা তিনিই বলেন, অতএব ‘আত্মাভিমানী’ বাবু ‘সাহেব লোকের মতো হওয়া’র প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকেন, কারণ তবেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায়। সাহেবরা সকালে বিকালে গাড়ি বা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বের হন। অতএব বাবুও চাকরকে হুকুম দেন ‘তোপের পূর্ব্বে’ ঘুম থেকে উঠিয়ে দিতে, তিনি ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণে বেরোবেন। বাবু অনেক রাত পর্যন্ত বেশ্যালয়ে ছিলেন, ভোররাত্রে কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে চাকর তুলে দিলে বাধ্য হয়ে ঘুম চোখে বাবু ঘুরতে যান এবং ঘোড়া পিঠ থেকে ফেলে দিলে ছাই-ভস্ম মেখে সহিসের কাঁধে হাত দিয়ে ঘরে ফেরেন।

সাহেবরা সচরাচর কথা দিয়ে কথা রাখেন। বাবুও মাতৃ-পিতৃদায় বা অন্য কারণে কোনো কৃপাপ্রার্থী বা ভিক্ষুক এলে তাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করেন। কোনো মান্য লোকের সুপারিশ নিয়ে তাঁদের কেউ দ্বিতীয়বার উপস্থিত হলেও বাবু তাঁদের খালি হাতেই বিদায় দেন। কারণ একবার 'দেব না' বলে ফিরে দিলে সত্যের অন্যথা করা হয়, তিনি 'বাঙ্গালির মত করিতে' চান না, তাঁর আদর্শ যেহেতু সাহেব, ফলে তাঁর এককথা। ব্যঙ্গের সুতীব্র কশাঘাতে বাবুত্বের ভণ্ডামি উন্মোচিত।

সাহেবরা বিবাদ-ঝগড়া করলে পরস্পর ঘুষাঘুষি, ডুয়েল লড়াই ইত্যাদি হয়। অতএব বাবুও আত্মীয়-পরিজন, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, দাস-দাসী যার উপর রাগ করেন, তাঁকে ইংরেজি মতে প্রহার করেন, গালিগালাজ দেন। সাহেবরা যেহেতু রবিবার গির্জায় যান, অন্যান্য বার কাজকর্মে ব্যস্ত থাকেন। বাবুও তেমনি অন্যান্য দিন ধর্মকর্ম সন্ধ্যা আহ্নিক পরিত্যাগ করেন এবং রবিবার বাগানে গিয়ে কখনো মুসলমান বাইজির গান শোনেন, কখনো শখের যাত্রা কিংবা খেউড় গান শোনেন। সাহেবরা সৌজন্যবশত বিপদগ্রস্ত লোককে সাহায্য করেন যথাসাধ্য। বাবুও কোনো লোক দায়গ্রস্ত জানতে পারলে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হন এবং দায় থেকে মুক্ত করার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভিতর-বাড়িতে গমন করেন এবং 'স্ত্রীলোক কোন দিকে থাকে তাহার অনুসন্ধান করেন ঐ চেষ্টাতে প্রত্যহ যাতায়াত করেন।' লাম্পট্য-কদাচার বাবুদের চরিত্রের অন্যতম প্রধান দোষ বা লক্ষণ।

সাহেবরা অনেকে আদালতে বিচার করে থাকেন। বাবুও অনুরূপ তাঁর বৈঠকখানায় সালিশি সভা ডেকে বিচার করেন। যে পক্ষের প্রতি তিনি দয়ালু কোনো বিশেষ কারণে, সেই পক্ষেরই জয় হয়, তার অপরাধ প্রমাণিত হলেও শাস্তি হয় না। বাবু সত্যের জয় হল বলে পরম পরিতোষ লাভ করেন। সাহেবরা এদেশীয় ভাষা সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারেন না, অতএব বাবুরাও বাংলায় কথা বলতে গেলে এমনকী নিজের নাম বলতে গেলেও বিকৃত উচ্চারণ করে থাকেন।

দেখা যাচ্ছে, ওই সময় থেকেই ধীরে ধীরে বাঙালিবাবুদের সাহেব সাজার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আদি ও নববাবুরা প্রধানত কদাচারী, আড়ম্বরপ্রিয় কিংবা লম্পট হলেও, সাহেবদের সান্নিধ্য সত্ত্বেও নিজধর্ম স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলতেন। কিন্তু নববাবুদের পড়ন্ত বেলায় নিজ স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ করেও তাঁরা সাহেব হয়ে উঠতে চাইছেন। ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করেও যেমন কাক কাক-ই থাকে, তেমনি আদবকায়দায় সাহেব হয়ে উঠলেও, শাসকের কাছে এই অনুকরণ অস্বস্তির, বিরক্তি উদ্রেককারী এবং স্থলবিশেষে হাস্যজনক। এই সত্য অনুধাবন করতে পরবর্তীকালের নব্যবাবুদেরও দীর্ঘসময় লেগেছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্তের মতো কারোর কারোর মোহভঙ্গও হয়েছিল। সেই সত্যই ফুটে উঠেছে বাবুর উপাখ্যানের দ্বিতীয় ভাগে। প্রথমভাগে বাবুর পরিচয় সূত্রে কিঞ্চিৎ গল্পরসের অবতারণা করা হলেও 'বাবুর উপাখ্যান', রচনাটির তিলকচন্দ্র ওরফে 'বাবু' প্রতীকী রূপায়ণ। সমসাময়িক নববাবুদের জীবনযাপন ও মনযাপনের একটি ছক ফুটিয়ে তোলা হয়েছে রচনাটিতে। বিদ্যাশিক্ষার প্রতি বাবুদের অনীহা, ছোটো-বড়ো নির্বিশেষে অন্যায় আচরণ ও কপটতা, নিষ্কর্মা হয়ে আমোদপ্রমোদে মত্ত থাকা, বেশ্যানুরক্তি, লাম্পট্য, কদাচার থেকে শুরু করে সাহেব সাজার প্রাণান্তকর অথচ হাস্যব্যঞ্জক প্রয়াস এখানে নিরাসক্তির মুখোশে তীব্র শ্লেষের সঙ্গে উপস্থিত করা হয়েছে। বাংলায় 'বাবু'দের এই প্রথম সমালোচনা একদিকে যেমন ঐতিহাসিক, অন্যদিকে তেমনি বাস্তবতার মাত্রাকেও ছুঁতে চায়। পরবর্তীকালে 'বাবু'কেন্দ্রিক নকশা ও রসরচনার বীজভূমি হিসাবেও 'বাবুর উপাখ্যান'-এর গুরুত্ব ঐতিহাসিক।

'সমাচার দর্পণে' সম্ভ্রান্ত লোকের নামের পূর্বে 'শ্রীযুত', 'শ্রীযুত বাবু' কিংবা শুধুমাত্র 'বাবু' সম্বোধনের ব্যবহার দেখা যায়। এগুলি মহাশয় অর্থে কিংবা সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার একাধিক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নাম একত্রে উল্লিখিত হলে সর্বাধিক বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত নামের ক্ষেত্রে 'শ্রীযুত বাবু', অন্যদের ক্ষেত্রে 'শ্রীযুত'-র ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, ৮ মার্চ ১৮২৩-এ প্রকাশিত হিন্দু কলেজে অনুষ্ঠিত এক সভার বিবরণে রাধাকান্ত দেব 'শ্রীযুত বাবু' বলে আখ্যাত হচ্ছেন, কিন্তু চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারিকানাথ ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকমল সেন প্রমুখেরা 'শ্রীযুত' সম্বোধনের দ্বারা নির্দিষ্ট হচ্ছেন।[১৩] আবার উক্ত বৎসরই ২৭ সেপ্টেম্বর ও ২০ ডিসেম্বর 'গৌড়ীয় সমাজ' শীর্ষক প্রতিবেদনে যথাক্রমে কুমার ঠাকুর এবং কালীশঙ্কর ঘোষাল 'শ্রীযুতবাবু' হিসাবেই আখ্যাত হচ্ছেন।[১৪] তবে পরের দিকে 'বাবু' শব্দের ব্যবহার কমে আসে। সম্ভবত সামাজিক ভাবে 'বাবু' শব্দটির অর্থসংক্রম ঘটলে, অনভিজাত-ব্যঙ্গ চিহ্নিত শব্দটি আর সম্ভ্রান্ত বা বিশিষ্ট নামের পূর্বে ব্যবহার করতে চাননি 'সমাচার দর্পণ' কর্তৃপক্ষ। তবে 'বাবু'দের নানান কীর্তিকলাপ পরিবেশনে পত্রিকাটি দ্বিধাহীন।

২৩ জুন ১৮২১-এ প্রকাশিত 'শৌকীন বাবু' শীর্ষক প্রতিবেদনে স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে নববাবুর বিকৃত শখ ও তার দুঃখজনক পরিহাসের কথা বলা হয়েছে।[১৫] স্নানযাত্রায় বজরা, পিনেস, ভাউলে ইত্যাদি ভাড়া করে বাই-বেশ্যা-ভাঁড় সঙ্গে নিয়ে মোচ্ছব করা সেকালে বাবুদের বড়ো আমোদের বিষয় ছিল। হুতোমের সময়, এমনকী তার পরবর্তীকালেও এই কুৎসিত প্রথা সমাজের বুকে প্রচলিত ছিল। যদিও শিক্ষার প্রসারের ফলে এবং আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে তার জাঁকজমক কমে আসে। হুতোমের ভাষায়, 'পূর্ব্বে স্নানযাত্রার বড় ধুম ছিল— বড় বড় বাবুরা পিনাস, বা কলের জাহাজ, বোট ও বজরা ভাড়া করে মাহেশে যেতেন, গঙ্গায় বাচ খ্যালা হত, স্নানযাত্রার পর রাত্তির ধরে খ্যামটা ও বাইয়ের হাট ল্যেগে য্যেতো। কিন্তু এখন আর সে আমোদ নাই—।'[১৬] উক্ত শৌখিন বাবুও শখ করে একটি হাফ বজরা ভাড়া করে স্ত্রীকে নিয়ে স্নানযাত্রা দেখতে গিয়েছিলেন। বজরার উপর উঠে চতুর্দিকে অন্যান্য বজরায় তিনি দেখতে পেলেন নানান বয়সি বাইরা গান গাইছে, নৃত্য করছে ইত্যাদি। তিনি স্ত্রী-ভিন্ন অন্য কোনো মেয়েমানুষ নিয়ে যাননি। অতএব নিজে খেমটা বাদ্য বাজিয়ে বাবুয়ানার মান রাখতে স্ত্রীকে খেউড় গীত গেয়ে নাচতে বাধ্য করলেন। সকালে মাহেশের ঘাটে বজরা ভিড়লে স্নানযাত্রার মুহূর্তে স্নানের জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেলে বাবুর স্ত্রীটি সেই ভিড়ের হট্টগোলের মধ্যে 'আপন নৌকা চিনিতে না পারিয়া অন্য কোন পুণ্যবানের নৌকাতে পদার্পণ করিয়া পবিত্র করিলেন কিম্বা কাহারো সহিত সঙ্কেতইবা ছিল', আর বাবুটি স্ত্রীকে ফিরে পেলেন না। প্রেরিত সংবাদের শেষে অতঃপর নিবেদন জানান হয়েছে, 'হে শৌকীন মহাশয়েরা এই মত শৌক শুনিয়া বমি উঠে সাবধান সাবধান এমত কর্ম্ম আর কেহ না করেন।'

বাবুদের নানান শখ সুখ দুর্বলতাকে দর্পণ-সম্পাদক সর্বদাই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে সমালোচনায় বিদ্ধ করেছেন। বাবুয়ানার শখ বাঙালি পুরুষের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা এবং হাতে কিঞ্চিৎ অধিক কর্ম থাকলেই এই শখ তাঁদেরকে গ্রাস করে, ফলে গোটা সমাজের পারিবারিক-সামাজিক সুস্থিতি-শৃঙ্খল ভেঙে পড়ে। আবার স্বচ্ছল মানুষগুলির পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া খ্রিস্টধর্মের প্রসার আমাদের সমাজে সম্ভব নয়। অতএব ব্যঙ্গবিদ্রূপ তাঁদের সচেতন করে তুলে একটি অনুকূল সহনীয় সামাজিক স্থিতিশীলতা কামনা করেছিলেন দর্পণ-প্রকাশক মিশনারিরা। ৭ জুলাই ১৮২১ সংখ্যায় প্রেরিত পত্রে দেখা যায়,[১৭] জনৈক নববাবুর অজ্ঞতা ও

অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে তথাকথিত সুযোগসন্ধানী ব্রাহ্মণরাও মাতৃশ্রাদ্ধ, দানসাগর, সামাজিক ও ধর্মীয় যশ ও পুণ্যের নামে কীভাবে শোষণের প্রক্রিয়া চালান, সেই কথা। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮২১-এর প্রেরিত পত্রে দেখা যায়, সম্ভ্রান্ত কুলীন নববাবুদের অহেতুক 'আত্মাভিমান কিভাবে তাঁদের সামাজিক দিক থেকে ক্রমশ নিঃসঙ্গ করে দিচ্ছে তার কথা।[১৮] চিঠির মতে—

এক. সম্ভ্রান্ত নববাবুরা প্রায়শই তাঁদের বংশ-আভিজাত্য বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল নন। এ বিষয়ে অধিক প্রশ্ন করলে তাঁরা ক্রোধযুক্ত হন।

দুই. পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে দুর্বলতা এঁদের স্বভাব-সুলভ। তাঁদের 'সুপুরুষ হইতে মহাসাধ মনে ভাবেন বড় মানুষের ঘরে জন্মিয়াছি যদি সৌন্দর্য্য না দেখাই তবে লোকে ছোট লোক কহিবেক...' অতএব তাঁরা বহুমূল্য বস্ত্র-অলংকারে সর্বদা সুশোভিত থাকেন। অবশ্য পত্রপ্রেরক বলেছেন বাবুর এই সাজসজ্জা ও কেশবিন্যাস দেখলে বাবুকে বড়োলোক নয়, 'ছোটলোক' বলেই বেশি মনে হয় এবং 'দেখিলে বোধ হয় না যে কোনো সভায় কিম্বা সাহেব লোকের দরবার যাইতেছেন, স্পষ্ট বুঝা যায় যে বেশ্যালয়ে গমন হইতেছে।' নতুন কালে পোশাক-মাহাত্ম্য দ্বারাও যে বাবুরা শ্রেণি-বিশেষ হয়ে উঠছেন, স্পষ্ট বোঝা যায়।

তিন. বাক্যবিন্যাসে অযথা আরবি-ফারসি-ইংরেজির সঙ্গে সঙ্গে সহজ বাংলা শব্দগুলির বিকৃত উচ্চারণকেই সুবক্তার কাজ বলে তাঁরা মনে করেন। মাতৃভাষার প্রতি বিজাতীয় মনোভাব পোষণ এই নতুন বাবুদের বৈশিষ্ট্য।

চার. দুই-তিনশো' ইংরেজি শব্দ শিখেই তাঁরা নিজেদের মহাপণ্ডিত ভাবতে থাকেন। বাংলা চিঠি পড়া বা লেখাকে তাঁরা ঘৃণা করেন। সর্বদাই ইংরেজিতে চিঠি লেখেন, যদিও সে চিঠির সারমর্ম উদ্ধার করা সাহেবদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

অতএব, এখানেও ছদ্ম-শিক্ষাভিমানী নববাবুদের প্রতি পত্রকারের আবেদন, 'অভিমান ত্যাগ করিয়া বিদ্যোপার্জন কর তাহাতেই ভাল ব্যবহার হইবেক ও ভাল বাক্য কহিতে পারিবা তখন লোকের নিকট বিশিষ্ট লোক আমি বড় লোকের সন্তান বলিতে হইবেক না অনায়াসে লোকে বুঝিতে পারিবেক।'[১৯]

'সমাচার দর্পণ' বাবুদের চারিত্রিক ও সামাজিক আচার-আচরণগত অসংগতি দূর করবার যেন ভার নিয়েছিলেন প্রথম থেকেই। ১৬ মার্চ ১৮২২ প্রকাশিত পত্রে দেখা যায়,[২০] নববাবুরা পিতৃপুরুষের মতো ধর্মকর্ম, দানধ্যান, ব্রাহ্মণসেবা, ইষ্টপূজা সন্ধ্যাহ্নিক না করে কেবল 'কুজন সহবাসে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মে প্রায় বিরত হইয়া নিন্দিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন' বলে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। পত্রকারের মতে, এই জাতীয় 'কুশীল' বাবুরা নিজেরা ধন-উপার্জন করেন না বলে তার মর্যাদা বোঝেন না; পিতৃপুরুষের কষ্টসাধ্যে সঞ্চিত ধন বাবুয়ানায়-বিলাসিতায় ব্যয় করেন। কিছু বয়স্য আছেন যাঁরা বাবুকে তোষামোদ করে নিজেদের উদরপূর্তির জোগাড় করেন। অতএব তাঁরা বাবুর যাবতীয় কু-কার্য সমর্থন করেন। বাবুও 'অনায়াসাধ্য চুল কাটা পইতা মোটা লম্বা কাছা উড়ে কোঁচা করিয়া লম্পটাভিমানী হয়'। অবশ্য এ-কালে এই জাতীয় আচরণ করলেই সমাজে খ্যাতিলাভ হয়; অথচ যেসব ভদ্রবাবু এমত পন্থা অবলম্বন না করে সৎ ও সংযমী জীবনযাপন করেন, সমাজে 'বাবু' বলে তাঁদের কোনো খ্যাতিবৃদ্ধি হয় না। পত্রলেখক অবশ্য 'ভাগ্যবান লোকদের' সদুপদেশ দিয়েছেন যে, তাঁদের উচিত নিজেদের সন্তানদের ছোটো থেকেই শাসন করা যাতে তারা 'কুসংসর্গ ত্যাগ' করে 'সৎসঙ্গ সদালাপ করেন'।

নববাবুদের লাম্পট্য, কদাচারের সংবাদ-পরিবেশনে 'দর্পণ-সম্পাদক' নির্ভীক। ৯ জুলাই ১৮২৫-এ প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় পটলডাঙা-মিরজাপুরের অভিজাত বাবু সীতারাম ঘোষের পুত্র বাবু পীতাম্বর ঘোষ কর্তৃক এক কায়স্থ-বধূর বলাৎকারের ঘটনার কথা।[২১] বধূটি অবশ্য নির্ভীকভাবে পটলডাঙা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন এবং পীতাম্বর ঘোষ গ্রেপ্তার হয়ে বিচারের জন্য প্রেরিত হন। ২১ নভেম্বর ১৮২৯ সংখ্যায় 'সমাচার চন্দ্রিকা' থেকে উদ্ধৃত পত্রে[২২], শিক্ষিত নব্যবাবুদের সম্পূর্ণ নাম না লিখে ইংরেজি রকমে সংক্ষেপে লেখার নিন্দা করা হয়েছে (যেমন, রামগোপাল রায় যদি R.Roy লেখেন তবে কি করে বোঝা যাবে তাঁর নাম রামগোপাল, রামকানাই বা রামনাথ ইত্যাদি নয়— এই প্রশ্ন তোলা হয়েছে)। একইসঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় K. Banerjee, কৃ. বানরজী লিখলে এই 'বানরজী'র অর্থ কি, সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। হিন্দু কলেজের নব্যবাবুদের 'জাবনিক রুটি ভক্ষণে'র অবশ্য প্রকারান্তরে সমর্থন করেছেন মিশনারিদের এই কাগজ।[২৩]

পাশাপাশি বাবু রূপলাল মল্লিকের বাড়িতে রাসলীলা উপলক্ষ্যে বহুব্যয়ের বিবরণ, শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্যে বাবুদের জাঁকজমকের প্রসঙ্গে সেকাল-একালের তুলনা, রামদুলাল সরকারের শ্রাদ্ধে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু আশুতোষ দেবের জাঁকজমকপূর্ণ ব্যয় ও দানধ্যানের সংবাদ ইত্যাদিও যথাযথভাবে স্থান করে নিয়েছে। বাবুদের শখের যাত্রা-খিস্তি-খেউড় প্রীতি বুলবুল লড়াইয়ের বিবরণও সেকালের পত্রপত্রিকার পাতায় মেলে। পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে, বিভিন্ন সভা-সমিতির আয়োজনে বাবুদের উদ্যোগের কথাও বিস্তারিতভাবে ছাপা হত এ-কালের পত্রপত্রিকাগুলিতে। সতীদাহ, বিধবা বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি প্রসঙ্গে রক্ষণশীল বাবুদের সঙ্গে সংস্কারপন্থী নব্যবাবুদের তর্ক-বিতর্ক, বিরোধের ইতিহাসও ধরে রেখেছে প্রাথমিক পর্বের সংবাদপত্রগুলি। 'সমাচার দর্পণ' মিশনারিদের কাগজ হওয়ায় নববাবুদের কার্যকলাপ নিন্দিত-ধিক্কৃত হয়েছে, কিন্তু নব্যবাবুদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণও প্রচ্ছন্ন সমর্থন পেয়েছে। লাম্পট্য, মদ্যপান, বেশ্যাগমন, অকারণ অর্থব্যয়, বিলাসিতা ইত্যাদি বাবুয়ানার সাধারণ motif-গুলি নিয়ে নববাবুরা উঠে এসেছেন পত্রিকার পাতায়। তাঁদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিকোণ যতই প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি ধারণ করুক না কেন, প্রগতিশীল নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে তা নিন্দাযোগ্যই বিবেচিত হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে, পৃথকভাবে সিরিয়াস প্রবন্ধের বিষয় হিসাবে এ জাতীয় বাবুরা খুব কমই উঠে এসেছেন। প্রথম থেকেই সমাজের শিক্ষিত অংশ বাবু নামক বিশেষ শ্রেণিভুক্ত মানুষদের অবহেলা ও উন্নাসিকতার দৃষ্টিতে দেখে এসেছে। ফলে তাকে নিয়ে সিরিয়াস প্রবন্ধ লেখবার কথা ভাবেননি প্রায় কেউই। চকিত চমকের মতো দু'একটি 'বাবু'কেন্দ্রিক প্রবন্ধের দেখা মেলে ইতি-উতি। তবে পরিবেশিত সংবাদ থেকে বাবুদের কাল ও তাঁদের মানসিক স্বভাবকে সহজেই অনুমান করে নেওয়া সম্ভবপর হয়।

তবে নববাবুদের কাল অস্তমিত হওয়ার আগেই যিনি কলকাতার বাবু বিষয়ে সিরিয়াস গ্রন্থ রচনা করলেন, তিনি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮)। কলিকাতা সমাচারচন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৮২৩ সালে প্রকাশিত 'কলিকাতা কমলালয়' ভবানীচরণের এক ঐতিহাসিক কীর্তি। নগর কলকাতার 'বিষয়ি ভদ্রলোকদের ধারা' বুঝতে এ গ্রন্থ ছাড়া অন্য গতি নেই। সংসারের দায় সামলাতে মাত্র ষোলো বছরেই ভবানীচরণ শুরু করেছিলেন তাঁর বিচিত্র কর্মজীবন, যার অনেকটাই অতিবাহিত হয়েছিল কলকাতায়। ডকেট কোম্পানির অফিসে সরকারি কর্মে নিযুক্তি থেকে শুরু করে কলকাতা দুর্গের মেজর জেনারেল সাহেবের মুৎসুদ্দিগিরি, কলকাতার পারমিটের দারোগাগিরি, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ব্রাশেট

সাহেবের কেরানিগিরি, বিশপ্‌স কলেজের প্রধান সচিব, ইংলিশম্যান পত্রিকার ব্যবস্থাপনার কাজ, রাজস্ব অফিসের দেওয়ানি, পরিশেষে হিকি বেলি কোম্পানির অফিসে প্রধান পদস্থ কর্মচারীর কার্যভার গ্রহণ— এই হল কলকাতায় ভবানীচরণের কর্মজীবনের অতি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা। ফলে কলকাতার নতুন গড়ে ওঠা বাবুদের জীবনযাপন তিনি দেখেছেন খুব কাছ থেকে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছেন বাবুদের দ্বন্দ্বমুখর জীবনের সত্যকে। ভবানীচরণের জন্ম হয়েছিল আদিবাবুদের কালপর্বে, অন্যদিকে মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের উত্থানের কালে তাঁর প্রয়াণ। ফলে আদি-নব-নব্য— এই তিনকালের বাবুদের সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল প্রত্যক্ষ। তবে 'কলিকাতা কমলালয়ে'র প্রকাশকাল যেহেতু ১৮২৩, সে কারণে এই গ্রন্থে ধরা রয়েছে আদি ও নব্যবাবুদের জীবনযাপন ও মানসিক দর্শনের প্রতিচিত্র।

কলকাতা তখন সত্যিই 'কমলালয়'। কলকাতার আকাশে-বাতাসে উড়ছে টাকা, শুধু ফন্দিফিকির করে, বুদ্ধি খরচ করে খুঁজে নিতে পারলেই হয়। অতএব কলকাতার আকাশে-বাতাসে উড়তে থাকা সেই টাকার টানে সেদিন এই নগরে কত না পেশার, কত না বৃত্তির মানুষের ভিড়। এঁদের মধ্যে সকলের হয়তো কপাল ফেরেনি, কেউ-বা এই নগরে এসে শেষ কপর্দকটুকু হারিয়ে সেদিন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর, আবার কোনো কোনো সুযোগসন্ধানী কপালে পুরুষ কর্পদকশূন্য অবস্থায় এসে সাহেবদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলে জাহাজ ধরে কিংবা লবণ বা আফিমের গোলায় 'দাওয়ানি' করে অচিরেই 'হঠাৎ নবাব' হয়ে বসেছে। সেদিনের কলকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত পুরুষই আসলে 'হঠাৎ নবাব'। নবকৃষ্ণ, নীলমণি ঠাকুর, রামদুলাল দে প্রমুখেরা সব এমনি ভুঁইফোঁড় বড়োলোক। আবার কৃষ্ণ পান্তির মতো হতদরিদ্র সাধারণ মানুষও পলাশির ষড়যন্ত্রে ক্লাইভের সহায়তা করে হয়ে বসেন সমাজের গণ্য-মান্য কেওকেটা। কলকাতার সাহেবদের সংস্পর্শ তখন কোনো কোনো মানুষের কাছে পরশপাথর পাওয়ার সামিল। অন্যদিকে দেশীয় পুঁজিপতিদের চাহিদাও সাহেবদের কাছে কম নয়। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে টাকা ধার দিতে তাঁরা সদা তৎপর, উপুড়হস্ত। তা ছাড়া দেশের বাজার দখল করতে হলে, শোষণের মায়াফাঁদ পাততে হলে দেশীয় মানুষের সাহায্য ব্যতীত তা সম্ভব নয়। আবার সে মানুষ যেমন-তেমন হলে চলবে না। এমন মানুষ, সাধারণ জনজীবনে যাঁর নিয়ন্ত্রণ আছে, যাঁর প্রভাব- প্রতিপত্তি প্রয়োজন যেকোনো সংকটের মোকাবিলায় শাসকশ্রেণির সহায়ক হবে। প্রায় গ্রামীণ চরিত্র বিশিষ্ট কলকাতা ও তৎসলগ্ন এলাকাকে নিজেদের চেষ্টায় নগর করে তোলা শাসকেরা অতএব নবকৃষ্ণের মতো মানুষকে তুলে আনেন। সমাজপতি হিসাবে যাতে নবকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠা পেতে পারেন, সে ব্যাপারে নবকৃষ্ণের চেয়ে শাসকের আগ্রহ কম ছিল না। অতএব বংশকৌলিন্যে এবং বাংলার সামাজিক ইতিহাসে ইতিপূর্বে অখ্যাত-অজ্ঞাত কতিপয়বাবু সমাজপতি হয়ে বসেন— যাঁদের মূল কাজ শাসক ও স্বীয় স্বার্থরক্ষা, জাত-পাত-ধর্ম-সংস্কারে জরাজীর্ণ জাতির উপর নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা গ্রহণ এবং শাসকের বশংবদ হিসাবে শোষণের সহায়তা করা। এঁরাই হলেন আদিবাবু। শাসকের আনুকূল্যে ন্যায়-অন্যায় উভয় পন্থায় এঁরা সঞ্চয় করেছেন প্রভূত বিত্ত সম্পত্তি এবং তাও অতি অল্প সময়ে, অর্থের সুনিপুণ ব্যবহারে কুটো বাঁধা করে রেখেছেন ধর্ম-সামাজিক সংস্কার নীতি নিয়মকে, নগর কলকাতার দেশীয় জীবনে হয়ে উঠেছেন শেষ কথা। এঁদেরকে কেন্দ্র করে নাগরিক সাধারণ শিক্ষিত 'ভদ্রশ্রেণি'র বিকাশ ঘটছে। আবার, এঁদের পুত্র-প্রপৌত্ররা অর্থ-বিত্তের পাহাড়ে বসে ধরাকে সরাজ্ঞান করছেন, বিলাস-বৈভবের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিচ্ছেন, কর্মহীন নিশ্চেষ্ট জীবন অতিবাহিত হচ্ছে বাইজি-বিলাসে, পরস্ত্রী লোলুপতায়, বেশ্যাগমনে, বুলবুল লড়াই কিংবা তাস-পাশা মদ্যপানের নেশায়, আর এভাবেই এক-দু'পুরুষে সঞ্চিত অর্থ তিলে তিলে ফুরিয়ে ফেলছেন। এই বিশেষ কালের কথাই সুকৌশলে ধরতে চেয়েছেন ভবানীচরণ।

তাঁর গ্রন্থে ভবানীচরণ ‘কড়চা’ জাতীয় বাংলা গদ্যের পূর্ব প্রচলিত ছাঁচটিকে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ প্রশ্নোত্তরের ছলে উভয়পক্ষের যুক্তি ও সাক্ষ্যকে উপস্থিত করেছেন তিনি। সুদূর মফস্সল থেকে আগত এক ব্যক্তি কলকাতার বাবুদের সম্বন্ধে যা শুনেছেন, সেসবের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে তার যাথার্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করছেন এবং উত্তরদাতা আপন অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর বক্তব্যের খণ্ডন বা আংশিক সমর্থন করছেন। আর এভাবেই উভয় পক্ষের বক্তব্য থেকে কলকাতার উনিশ শতকের প্রথমদিকের বাবুসমাজের সামগ্রিক রূপ ও স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লেখক বিশেষ কৌশলে উত্তরদাতাকে দিয়ে অনেকসময়ই ‘এ হইতে পরে অমূলক কথা কখন হয় না আমি ইহার বিশেষ জানি না কোন জাতি বিশেষের হইবেক’[২৪] বলে প্রশ্নকর্তার অভিযোগ বা বক্তব্যকে আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন, আবার কখনো হাস্যজনক যুক্তি দিয়ে অপ্রিয় সত্যকে প্রকারান্তরে সমর্থন করেছেন, কখনো আবার উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ সহ প্রশ্নকর্তার বিবৃতিকে খণ্ডন করেছেন অথবা প্রশ্নকর্তার ‘অমূলক’ সন্দেহের নিরসন ঘটিয়েছেন।

গ্রন্থের প্রথমেই রূপক আশ্রয় করে কলকাতায় যে নানাস্থান থেকে আসা অর্থের স্রোত-প্রতিস্রোত চলেছে এবং সেই স্রোতে অবগাহনের জন্য গাঁ-গঞ্জ থেকে মানুষজন জমায়েত হচ্ছে কলকাতায় এই সত্যকে স্পষ্ট করেছেন। এরপরই কলকাতার ‘অনেক লোক’ তথা সম্ভ্রান্ত বাবুদের দল যে ‘আচারভ্রষ্ট’ হয়ে পড়েছেন, এই অভিযোগের উত্তরে ‘বিষয়ি ভদ্রলোকের ধারা’র সম্যক পরিচয় উপস্থিত করেছেন। প্রশ্ন ও উত্তরের ক্রম অনুসারে লেখক কর্তৃক উপস্থাপিত বাবুদের বিষয়প্রসঙ্গ নিম্নরূপঃ

এক. বাবুদের শ্রেণিগত পৃথকীকরণ;
দুই. দানধ্যানকর্মাদি বিষয়ে বাবুদের ভূমিকা বিচার;
তিন. ইংরেজি ও পারসি শিক্ষা বিষয়ে কথা;
চার. বাবুদের দান বিষয়ে অপারগতা;
পাঁচ. দল-উপদলে বিভক্ত বাবুসমাজ এবং বাবুদের নিজস্ব ‘দলে’র বৃত্তান্ত;
ছয়. দলে কায়স্থ সমাজপতিদের প্রাধান্য বিষয়ে কথা;
সাত. বাবুদের আপন আপন সন্তানের শিক্ষাবিষয়ে অমনোযোগিতার কথা;
আট. পুস্তক-প্রীতি তথা পুস্তক-সজ্জা বিষয়ে প্রশ্ন;
নয়. পাঠশালা ও শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে বাবুদের মনোভাব;
দশ. নববাবুদের বারাঙ্গনা আসক্তি; এবং
এগারো. মোসাহেব ও উমেদারদের প্রসঙ্গ।

শুরুতেই বাবুদের শ্রেণিগত পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি চতুর্বর্গ ভাগ করেছেন। যথা—

ক) প্রথম থাকের বাবু। এঁরা মূলত দেওয়ানি-মুতসুদ্দিগিরি করে থাকেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে বহু লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর এঁরা যে যাঁর পছন্দমতো তেল দিয়ে গা মর্দন করান, তারপর স্নান-পূজা শেষ করে ভোজন করেন। এরপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে অফিসের পোশাক পরিধান করে পালকি বা ঘোড়ার গাড়িতে কর্মস্থানে যান। সেখানে কাজ অনুযায়ী থেকে বাড়ি ফিরে এসে বাইরের পোশাক ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে ‘গঙ্গোদক স্পর্শে পবিত্র’ হয়ে সায়ংসন্ধ্যা শেষে জলযোগ করে বৈঠকখানায় গিয়ে বসেন। সেখানে ধীরে ধীরে অনেক লোকসমাগম হয়। কেউ কাজে, কেউ অকাজে, কেউ-বা বাবুকে শুধু সঙ্গ দিতে হাজির হন। বাবুও অনেকসময় কারোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বের হন। অর্থাৎ স্বাধীন কিন্তু ছকে-বাঁধা জীবন

প্রথম থাকের বাবুর। এঁরা অর্থোপার্জনের জন্য পরিশ্রম করে থাকেন। ধর্ম-কর্ম-সংস্কারেও মতি আছে। অর্থোপার্জনে অনেকটা সময় ব্যস্ত থাকেন বলে স্বভাবের দিক থেকে সচরাচর বারমুখো নন। এঁরা হচ্ছেন আদিবাবু বা বাবু-বংশের সূচনা ঘটেছিল এইসকল কর্মোদ্যোগী পুরুষের হাত ধরে।

খ) মধ্যবিত্ত লোক। এঁরা 'ধনাঢ্য' নন, তবে অন্নবস্ত্রের তেমন অভাব নেই। প্রথম থাকের বাবুর মতোই ছক-বাঁধা ব্যস্ত জীবন, 'কেবল দান বৈঠকি আলাপের অল্পতা আর পরিশ্রমের বাহুল্য'। এঁরা প্রভূত বিত্ত-সম্পত্তির অধিকারী না হলেও স্বচ্ছল। পরিশ্রম করে অর্থ-উপার্জন করেন, ধর্ম-কৃত্যাদিও সংক্ষেপে হলেও করে থাকেন, বৃহৎ ব্যয় বা দানধ্যান সম্ভব না হলেও একেবারে অপারগতাও দেখান না। সামর্থ্য অনুযায়ী দানধ্যান কিংবা ব্যয় করে থাকেন। এঁদের জীবন সচরাচর লাম্পট্যদোষমুক্ত।

গ) দরিদ্র অথচ ভদ্রলোক। এঁরা মূলত প্রথম ও দ্বিতীয় থাকের বিষয়ী ভদ্রলোকদের অধীনে কেউ মুহুরি, কেউ মেট, কেউ-বা বাজার সরকারের কর্ম করে থাকেন। সারাদিনই এঁদের নানা কাজে 'বিস্তর পথ হাঁটতে হয়', রাত্রে গিয়ে দেওয়ানজীর কাছে কাজকর্ম বোঝাতে ও বুঝতে হয়, তাঁদের ফাইফরমাশ খাটতে হয়, ফলে এঁদের 'আহার ও দানাদি কর্ম্মের লাঘব আছে আর শ্রমবিষয়ে প্রাবল্য'। তবে এঁদের জীবনও ছকে-বাঁধা। অর্থ উপার্জনের জন্য দ্বিতীয় থাকের মধ্যবিত্ত বাবুদের তুলনায় এঁদের পরিশ্রম অধিক। কর্মদাতা ও অন্নদাতা প্রথম ও দ্বিতীয় থাকের বাবুদের কাছে এঁদের সবসময় অনুগত থাকতে হয়। বিশেষত দেওয়ান-মুৎসুদ্দি প্রভৃতি প্রথম থাকের বাবুদের মেজাজ-মর্জি বুঝে এঁদের চলতে হয়। পরাধীন বৃত্তিভোগী বলে এঁদের জীবনে স্বচ্ছলতা কম। তবে দরিদ্র হলেও সেই দারিদ্র্য সামাজিক নয়, আর্থিক। এঁরাও বিষয়কর্মে ব্যাপৃত থাকা ভদ্রলোক, এঁদের সঙ্গে সামাজিক অবস্থানগতভাবে যাঁরা দরিদ্র তাঁদের মিশিয়ে ফেললে চলবে না।

ঘ) অসাধারণ ভাগ্যবান লোক তথা প্রকৃত বাবু। এঁরা পিতৃপুরুষের সঞ্চিত ধনে প্রভূত বিত্তশালী। বিষয়কর্ম এঁদের কিছুই করতে হয় না বা এঁরা করেন না। ভাগ্যবলে এঁদের 'প্রচুরতন ধন আছে সেই ধনের বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ হইতে কাহার বা জমীদারির উপস্বত্ব হইতে ন্যায্য ব্যয় হইয়াও উদ্বৃত্ত হয় তাঁহারা প্রায় আপন আলয়ে থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত রীতন্যুসারে সন্ধ্যা বন্দনাদিপূর্ব্বক মধ্যাহ্নকালে ভোজন করিয়া প্রায় অনেকেই নিদ্রা যান, চারি বা ছয় দণ্ড বেলা স্বত্বে আপন বিষয়ে দৃষ্টি করেন, কেহ-বা পুরাণাদি শ্রবণ করিয়া থাকেন।'[২৫] লেখক সংগত কারণেই এই সকল বাবুদের বিষয়ে কিঞ্চিৎ মিতভাষী। এইসব পিতৃপুরুষের ধনে বাবু হয়ে ওঠা ভাগ্যবান, লোকেরা অনেকেই বেহিসেবি, উচ্ছৃঙ্খল-বিলাসী জীবনযাপন করতেন, মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তি ছিল সাধারণ ধর্ম, লাম্পট্য ও নিষ্কর্মা আমোদ ছিল এঁদের স্বভাবসুলভ। পরবর্তী নকশা 'নববাবুবিলাসে' (১৮২৫) ভবানীচরণ এঁদের কথাই বিস্তারিতভাবে বলবেন।

ভবানীচরণ বাবুদের শ্রেণিগত পরিচয় দিতে গিয়ে আর্থিক সংগতি অনুযায়ী এবং বিষয়কর্ম অনুযায়ী প্রথম তিন থাকের অবস্থান চিহ্নিত করেছেন, চতুর্থ শ্রেণির বাবুরা বিষয়-কর্মরহিত আর্থিক স্বাচ্ছল্যের কারণে বাবু, ফলে তাঁদের অবস্থান স্বতন্ত্র। প্রথম তিন থাকের বাবুদের মধ্যে প্রকৃত বাবু কেবল দেওয়ান, মুৎসুদ্দি প্রমুখেরা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় থাকের বিষয়ী ভদ্রলোকেরা মূলত এঁদেরই অধীনে কর্মরত ছিলেন। এই বাবুরাই আদিবাবু এবং এঁদের সঞ্চিত অর্থের প্রসাদেই চতুর্থ থাকের নববাবুদের উদ্ভব। আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী সেকালের বিষয়ী ভদ্রলোকদের ক্রমঅবস্থানগত একটি মডেল নির্মাণ করেছেন ভবানীচরণ। যদিও এই মডেলটি নগরজীবনে সমাগত ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রযোজ্য নয়, তবে আর্থিক সংগতিযুক্ত শ্রেণির অবস্থান ও জীবনযাপনটি অল্প কথায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। বাবুদের শ্রেণিগত অবস্থানটিই এই মডেল নির্মাণের যে মূল লক্ষ্য, পরবর্তী বিষয়বিন্যাস সে কথাটি স্মরণ করিয়ে দেয়।

কলকাতার নতুন কালের বাবুরা দানধ্যান-ধর্মীয় কৃত্যাদি সব পরিত্যাগ করেছেন এই অভিযোগের প্রত্যুত্তরে জানানো হয়েছে যে, 'ভাগ্যবান লোকেরা' অর্থাৎ নববাবুরা স্মার্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রমুখের পরামর্শে মন্দির নির্মাণ, দেব প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, দোল-দুর্গোৎসব ইত্যাদিতে ব্যয় করেন। পিতা-মাতার শ্রাদ্ধ উপস্থিত হল তো কথাই নেই। ধনী লোকেরা স্বজাতি জ্ঞাতি বন্ধুবান্ধব পুরোহিত অধ্যাপকদের নিমন্ত্রণ করে 'আশ্চর্যসভা' করেন। সোনা-রূপার দানসাগর করে থাকেন। নৈয়াকি পণ্ডিতেরা ১০০ থেকে ৮০ টাকা পর্যন্ত দক্ষিণা, ঘড়া, গাড়ু, স্মার্ত পণ্ডিত ৫০ থেকে ৩০ টাকা, গাড়ু, থালা, বাটা ইত্যাদি পেয়ে থাকেন। রাত্রে কাঙালিবিদায় উপলক্ষ্যে ২ টাকা থেকে এক আনা পর্যন্ত সকলকেই কিছু না কিছু দেওয়া হয়। এ খবর অবশ্য অতিশয়োক্তি নয়। সেকালে ধনীবাবুরা, বিশেষ করে নববাবুরা বেশ ঘটা করেই মাতৃ-পিতৃশ্রাদ্ধ করতেন। সমকালের সংবাদপত্রের পাতায় এ জাতীয় শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কথা অনেক পাওয়া যায়। বিশেষ করে, ভবানীচরণের পৃষ্ঠপোষক গোপীমোহন দেবের মাতৃশ্রাদ্ধে সোনা ও রূপার দানসাগর হয়। সেই রাজকীয় দানসাগরের বিস্মৃত বর্ণনা 'সমাচার দর্পণে' ১৫ জুলাই ১৮২০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।[২৬] শুধুমাত্র রবাহুত ব্রাহ্মণ ও কাঙালি প্রভৃতির সংখ্যাই ছিল আনুমানিক এক লক্ষ এবং তাঁদের প্রত্যেককে যথাযোগ্য দান দ্বারা পরিতুষ্ট করা হয়। ভবানীচরণ সম্ভবত এই অনুষ্ঠানের কথা স্মরণে রেখেই বলে থাকবেন।

প্রশ্নকর্তার বক্তব্য সূত্রে মনে হয়, লেখক কালের গতি অনুভব করতে পেরেছিলেন। আদিবাবুদের কাল আগেই বিগত হয়েছিল, নববাবুদের কালও যে বিগত, ইংরেজি অনুরাগী দেশীয় সংস্কারে পরান্মুখ আর এক নতুন শ্রেণি যে দ্রুত উঠে আসছেন, তা তাঁর অগোচরে ছিল না। নতুন কালের বাবুর আর সংস্কৃত শাস্ত্রাদির প্রতি অনুরক্ত নন, বাংলা ভাষা তখন থেকেই অচ্ছুত; তার বদলে অর্থকরী পারসি ও ইংরেজির প্রতিই অধিক মনোযোগ লক্ষ করা যায়। আমরা পূর্বেই বলেছি, উনিশ শতকের প্রথম থেকেই একের পর এক ইংরেজি শিক্ষার স্কুল গজিয়ে উঠছিল। প্রতিষ্ঠাকামী বাঙালিবাবুরা আপন আপন সামর্থ্য অনুযায়ী নিজেদের সন্তানদের এইসব স্কুলে পড়াতেন। এমনকী সাধারণ মধ্যবিত্তরাও ফ্রি স্কুলে ভর্তি হয়ে পারসি ও ইংরেজি শিক্ষা করতেন। নতুন শিক্ষার প্রভাবে এঁরা মাতৃ-পিতৃশ্রাদ্ধকে 'কুৎসিত কর্ম্ম' মনে করতেন, চুল-দাড়ি কাটার প্রথাকে ঘৃণা করতেন, অশৌচ অবস্থায়ও কুঠি যাবার কারণ দেখিয়ে ক্ষৌরকর্ম করতেন, জলের বদলে ব্র্যান্ডি পান করাকেই শ্রেয় মনে করতেন, পোশাক-আশাকেও ধুতি প্রভৃতি বর্জিত হয়ে ইজের, জামা, চামড়ার জুতো ইত্যাদি পরার প্রথা প্রচলিত হয়। বাবুরা অনেকেই মুসলমানের দোকানের পাঁউরুটি, নিষিদ্ধ মাংস, মিঠাই ইত্যাদি ভক্ষণ করতে থাকেন। বাড়িতেও কুলগোত্রহীন পাচক ব্রাহ্মণ রেখে রান্নার প্রথা চালু হয়েছিল। অর্থাৎ, ভবানীচরণের ১৮২৩-এর এই লেখা থেকেই প্রমাণিত হয় ডিরোজিও কর্তৃক হিন্দুস্কুলের ছাত্রদের নব্যবাবু করে তোলার প্রথম দাবির মিথটি কত ভ্রান্ত। আসলে নববাবুদের মধ্যে আগেই এ জাতীয় প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। হয়তো তখন সামাজিক কারণে বিষয়টি কিছুটা গোপন ছিল, নব্যবাবুদের হাত ধরে তা সামাজিক সংস্কারে পরিণত হওয়ার প্রবণতা দেখায়।

ভবানীচরণ প্রত্যুত্তরে 'এ তাবৎ সত্য বটে' বলে মেনে নিয়েছেন সমস্ত অভিযোগ। তবে এইসকল বাবুদের তিনি 'ভদ্রলোক' বলতে রাজি হননি। তাঁর মতে, যাঁরা ভদ্রলোক, তাঁরা অফিস যাওয়ার সময় ইংরেজি ধরনে পোশাক পরলেও, বাড়িতে বা অন্যান্য কর্মে দেশীয় পোশাকই পরতেন। বাড়িতে স্মার্ত পণ্ডিত যাঁরা থাকতেন, তাঁদের কাছে সংস্কৃত শাস্ত্রাদির আলোচনাও শুনতেন। পারসি ও ইংরেজি যেহেতু 'অর্থকরী বিদ্যা', অতএব 'অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য' বলে তিনি দ্রুত প্রশ্নকর্তার সঙ্গে

প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছেন। ভবানীচরণের দ্বিধার কারণ স্পষ্ট। সত্যের খাতিরে তাঁকে মেনে নিতেই হয়েছে উপরের বক্তব্য, আবার এ প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে বলাটাও দুষ্কর, কারণ পৃষ্ঠপোষক নববাবু ক্ষুণ্ণ হবেন। ভাষা ব্যবহারে নতুন কালের বাবুরা স্বজাতীয় ভাষায় কারণে-অকারণে আরবি-পারসি-ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করতেন। ভবানীচরণ অবশ্য জানিয়েছেন, সংস্কৃত ও বাংলায় সমজাতীয় অর্থবোধক শব্দ না থাকার দরুণই এরকমটি ঘটেছে। যদিও প্রশ্নকর্তার দাখিলকৃত তালিকা থেকে এই বক্তব্য সত্য বলে প্রতিপন্ন হয় না। সম্ভবত লেখকের গোপন অভিপ্রায়ও ছিল এই যে, প্রকৃত সত্যটি উদ্ঘাটিত হোক। তা ছাড়া তাঁর একটি অকাট্য যুক্তি আছে, 'যখন যে জাতি রাজা হয়েন তখন তদ্‌জাতীয় অনেক বাক্য চলিত হইয়া থাকে বিশেষত রাজ বিচার সম্পর্কীয় ব্যাপারের কথাসকল ব্যবহার না করিলে উপায় নাই।'[২৭]

বাবুরা ধর্মভীরুতাবশত কিংবা পারলৌকিক পুণ্য অর্জনের জন্য দানধ্যান করতেন না। তা ছিল তাঁদের 'অতিমানিতা' ও 'দম্ভে'র বহিঃপ্রকাশ। অনেকে এই অতিমানিতা ও স্থূল প্রশংসালাভের আকাঙ্ক্ষায় দান-ধ্যানে বেহিসেবি ব্যয় করে সর্বস্বান্তও হন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, অমিত বিত্তশালী রামদুলাল দে'র জ্যৈষ্ঠ পুত্র আশুতোষ দেব (সাতুবাবু) বিলাসিতায় ও অহংকৃত-প্রতিযোগিতামূলক দানধ্যানে মৃত্যুকালে সর্বস্ব খুইয়ে বসেন। ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, তাঁর মৃত্যুর পর সাতুবাবুর বিধবা পত্নীকে অর্থসাহায্য করা হয় হিন্দুমেলার অনুষ্ঠানে অর্থসংগ্রহ করে।

প্রশ্নকর্তার কলমে স্পষ্ট হয়, সেকালে কলকাতার বাবুদের মধ্যে অনেকগুলি দল ছিল। এই দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক রেষারেষি তথা দলাদলি ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। বাবুদের নিজেদের মধ্যে কোনো সদ্ভাব না থাকায় সামাজিক জীবনেও সময় সময় অস্থিরতা সংক্রামিত হত। উত্তরকর্তা যথার্থই বলেছেন যে, 'দলপতিত্ব সম্মান অমৃতাভিষিক্ত আছে তাহাপ্রাপ্তি নিমিত্ত অনেকেরই বাঞ্ছা'[২৮], অতএব অনৈক্য অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য তাঁর মতে, দলপতি হবার ইচ্ছা থাকলেই হয় না, সমাজের জ্ঞানী গুণী বিশিষ্ট জনেদের সমর্থন ছাড়া কেউ দলপতি হতে পারেন না। তবে কাঞ্চনমূল্যে যেহেতু দলপতিরা এহেন মানী-গুণীদের পুষতেন, সহজেই অনুমেয়, আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকলেই সুষ্ঠু সংঘটন, সভাস্থ ব্যক্তিদের বিবাদে মীমাংসা এবং দানাদি কর্মে তালিকা প্রস্তুত ও অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করাই দলপতির লক্ষ্য, এই বক্তব্যকে কোনোমতেই মেনে নেওয়া যায় না। সমাজে দলপতির মূল লক্ষ্য, শাসকের ও নিজের স্বার্থ সুনিশ্চিত করা, দেশীয় জীবনের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠা, জাত-পাত-সামাজিক বিচারে সর্বপ্রধান ভূমিকা পালন এবং অবিমিশ্র প্রতিষ্ঠা লাভ। একইসঙ্গে বলা যায়, আর্থিক কৌলিন্য থাকলে দলপতি হওয়া কঠিন ছিল না, এবং দলপতি হলে সামাজিক নানান সংস্কারকে অবলীলায় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো সম্ভব হত। কালীপ্রসাদী হেঙ্গাম নিয়ে হিন্দুসমাজ যখন আলোচিত, তখন শোভাবাজারের গোপীমোহন দেবের দল এবং বিপক্ষে রামদুলাল দে সরকারের দল পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। রামদুলাল কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে সেযুগে কালীপ্রসাদকে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত করান এবং কালীপ্রসাদের মাতৃশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজন ও ব্রাহ্মণবিদায়ও হয়। রাজনারায়ণ বসু জানিয়েছেন, 'এই ঘটনা উপলক্ষ্যে রামদুলাল সরকার বলিয়াছিলেন, "জাতি আমার বাক্সের ভিতর" ও অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।'[২৯]

দলপতি বাবুদের দলস্থ ব্রাহ্মণ, পণ্ডিতদের নির্দিষ্ট মাসোহারা ছাড়াও বাবুর নিজ গৃহের উৎসব-পার্বণ উপলক্ষ্যে দান দিতে হত। দলস্থ অন্যান্য ব্যক্তিদেরও পূজার সময়, মাতৃদায়-পিতৃদায় উপস্থিত হলে কিছু কিছু সাহায্য করতে হত। কখনো কখনো দলপতি সম্পূর্ণ অর্থই নিজে দিয়ে দিতেন দলস্থ কৃপাপ্রার্থী

সদস্যদের। বাবুর দলভুক্ত হতে ইচ্ছুক ব্যক্তি দলপতির ইচ্ছা হলে তবেই দলস্থ হতে পারতেন এবং দলপতির ফর্দে তাঁকে নিজ নাম লেখাতে হত। কোনো ব্যক্তি কোনোপ্রকার দোষ করলে দলপতি দলস্থ সকল ব্যক্তিকে ডেকে যা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতেন, তাকেই মেনে চলতে হত। কেউ কোনো কুকর্ম করলে দলপতি যেমন তাকে বর্জন বা গ্রহণ করতে পারতেন, তেমনি সময়বিশেষে দলপতির সুনজরে থাকলে যাবতীয় অপবাদ করেও উক্ত ব্যক্তির 'জাতি রক্ষা পায়'। বাবুদের নিজ নিজ এলাকাতে বসবাসকারী ব্যক্তিদের ইচ্ছেয় হোক বা অনিচ্ছেয় হোক দলপতির দলে নাম লেখাতে হত। নাহলে বাবুদের নির্দেশে তাঁকে একঘরে হতে হত। কোনোপ্রকার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ গ্রহণ তো দূরের কথা, সাধারণ আলাপ পরিচয়ও কেউ তাঁর সঙ্গে করতেন না। অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত বাবুর এলাকার অলিখিত শর্তই ছিল দলস্থ হবার।

দলপতি সচরাচর কাউকে ত্যাগ করতেন না। দলস্থ লোককে ত্যাগ করলে বাবুর দলের অন্যান্য লোকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে দলত্যাগ করতে পারেন। দল সংখ্যায় ছোটো হলে বাবুর মানসম্ভ্রমের হানি হয়, তা ছাড়া তাঁর অখ্যাতিও রটতে পারে। এই কারণে বাবুরা দলের ভাঙনরোধেই যত্নবান হতেন। যদিও দলস্থ যে কেউ এক বাবুকে ছেড়ে অন্য বাবুর দলে যোগ দিতে পারত।

প্রত্যেক জাতিরই এক একটি দল থাকত এমন নয়। বাবুর অধীনে যে দল থাকত তাতে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থর সঙ্গে কামার, কুমার, তিলি, মালি, গন্ধবণিক প্রমুখেরাও থাকতে পারতেন। তবে আহার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে মিশ্রণ ঘটত না, সেখানে স্ব স্ব জাতির পৃথক দল বা বন্দোবস্ত থাকত। কেবল সুবর্ণবণিকেরা পৃথক দল তৈরি করেন, যা ছিল কেবলমাত্র সুবর্ণবণিক নিয়েই গঠিত। অন্যান্য দলগুলির দলপতি বাবুরা সাধারণত ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ ছিলেন। লেখকের মতে, 'ধনবান্ ও রাজদত্ত মানে মান্যমান লোক দলপতি হয়েন এমত নহে ধনবান ক্রিয়াবান বিবেচক মর্য্যাদক লোক দলপতি হইয়া থাকেন।'[৩০]

সেকালে বাবুদের সামাজিক মান নির্ধারিত হত বাবুর দল আছে কি না, তার উপর। খাস কলকাতায় সামাজিক প্রভাবের নিরিখে প্রায়শই দলপতির ভূমিকা বদল হল। আদি কলকাতার প্রথম দলপতি হিসাবে দু'জন প্রসিদ্ধ ছিলেন— একজন রাজা নবকৃষ্ণ, অন্যজন মদনমোহন দত্ত। এঁদের পারস্পরিক রেষারেষি সেকালে অনেক গল্পের জন্ম দিয়েছে। মদনমোহনের পুত্র রামতনু দত্ত নববাবুদের মধ্যে অগ্রগণ্য হিসাবে স্বীকৃতি পেতেন। নবকৃষ্ণ প্রথমত অবশ্য দলপতি ছিলেন না। কলকাতার প্রাচীন দুই দলপতি ছিলেন মদনমোহন দত্ত এবং কৃষ্ণচরণ মিত্র। কৃষ্ণচরণ ছিলেন কুমারটুলির বাসিন্দা কলকাতার অন্যতম 'ব্ল্যাক জমিদার' গোবিন্দরাম মিত্রের পৌত্র। ইনি ছিলেন ঢাকার সমাহর্তার দেওয়ান। এঁর মধ্যমপুত্র রাজচন্দ্রের বিবাহ উপলক্ষ্যে তদানীন্তন বড়োলাট লর্ড কর্ণওয়ালিস তাঁকে তাঁর বাড়িতেই দু'টি তোপ দাগবার দুর্লভ মর্যাদা দিয়েছিলেন।[৩১] নবকৃষ্ণ প্রথমত এঁর দলেরই সদস্য ছিলেন। হেস্টিংসের অনুগ্রহে নবকৃষ্ণ, গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ এবং কান্ত বাবু জাত কাছারির সভাপতি নির্বাচিত হলে নবকৃষ্ণ পৃথক দল গঠন করেন। নবকৃষ্ণ কুলীন কায়স্থদের ডেকে এনে কলকাতায় বসতি স্থাপন করান। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার এবং রাধাকান্ত তর্কবাগীশের মতো পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের তিনি বসবাসের জন্য ভূমি ও গৃহদান করেন। নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে নবকৃষ্ণ মহাআড়ম্বরে উচ্চবংশীয় কুলীন কায়স্থ ঘরে বিবাহ দেন। ফলে সমাজে তাঁর প্রতিপত্তিও বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন জাতিভিত্তিক দলগুলির দলপতি হিসাবে হয় ব্রাহ্মণ নচেৎ কায়স্থরা প্রাধান্য পেতে থাকেন।[৩২] নবকৃষ্ণের পৌত্রের সমকালে তথা রাধাকান্ত দেবের আমলে কলকাতার অন্যূন পাঁচজন দলপতি বাবুরা ছিলেন যথা— আশুতোষ দেব, উদয়চাঁদ দত্ত, কালাচাঁদ

বসু, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাধাকান্ত দেব।[৩৩] অবশ্য উনিশ শতকে ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জাত-কাছারি এবং দলগুলির গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে কলকাতার শিক্ষিত সমাজের কাছে। কোম্পানি জাত-কাছারি ও দলগুলিকে প্রথম দিকে যে উৎসাহ দিতেন, পরবর্তীতে তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়। দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে ছোটোলাট-বড়োলাট সহ কোম্পানি-কর্তাদের ঘনিষ্ঠ সখ্যতায় লাগাম টেনে ধরা হয়। ফলে প্রচলিত নাগরিক সমাজ জীবনে ভবানীচরণ কথিত দলগুলি আরও দশ-কুড়ি বছরের মধ্যেই অস্তমিত হয়। তার জায়গা দখল করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নগরবাসী বুদ্ধিজীবীদের নানান রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক দলসমূহ।

উনিশ শতকের প্রথম দিকের দলগুলিতে কায়স্থ-প্রাধান্য ছিল। দু'একটি ক্ষেত্র ব্যতীত কায়স্থদের মধ্যে থেকেই দলপতি নির্বাচিত হত। দলপতি কুলীন কায়স্থ হলে তাঁর অহংকারের সীমা থাকত না। ব্রাহ্মণরা অতি দ্রুত নিজেদের বদলে ফেলেন এবং ব্যক্তিগত লাভালাভের জন্য কায়স্থকেই দলপতির স্বীকৃতি দেন। বিনিময়ে শ্রাদ্ধ-শান্তি ছাড়াও অন্যান্য ক্রিয়াকর্মে বাবুর কাছ থেকে উপযুক্ত সাম্মানিক লাভ করতেন। দলপতিবাবুদের চেষ্টাতেই 'পূর্বে যাঁরা কোনোপ্রকার মাঙ্গলিক কর্মে' অধ্যাপক ও ব্রাহ্মণদের ডাকতেন না, তাঁরাও 'দলপতির অনুরোধে এবং আপন ধর্ম ও সুখ্যাতি ও ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করণার্থে' অধ্যাপক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ এবং সাম্মানিক প্রদান চালু করেন। সন্দেহ নেই, বাবুদের এই উদ্যোগ তাঁদের প্রতি ব্রাহ্মণদের দৃষ্টিকোণকে সহানুভূতিশীল করে তুলতে পেরেছিল। দলপতিরা যে মোটা টাকার বিনিময়ে (সেযুগের ক্ষেত্রে ১০/২০/২৫ হাজার টাকা নিঃসন্দেহে বিপুল অঙ্কের টাকা) সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণদের আপন দলভুক্ত করেন, বিপথের উক্তি থেকেই তা স্বতঃপ্রমাণিত হয়।

বাবুরা সাধারণভাবে শিক্ষার প্রতি তেমন আকৃষ্ট বোধ করতেন না। কাজ-চালানোর মতো কিছু ইংরেজি ও অঙ্কের ক্ষেত্রে জমাখরচের হিসাব জানলেই চলত। তবে জমিদারি কর্ম, ব্যাবসা, কুঠির দেওয়ানি প্রভৃতি কর্মে যাঁরা প্রভূত ধনসঞ্চয় করে থাকতেন, তাঁদের গৃহের সন্তানরাই সচরাচর শিক্ষার ব্যাপারে অমনোযোগী হত। কিন্তু 'যাঁহারদিগের পিতা-পিতামহ বিদ্যার দ্বারা ধন উপার্জ্জন করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা মান্যও হইয়াছেন তাঁহারই বিদ্যার মর্ম্ম জানেন এবং সন্তানদিগ্যেরোও মনোযোগ পূর্ব্বক বিদ্যা শিক্ষা করান।[৩৪] ভাগ্যবান নববাবুরা অনেকেই লেখাপড়া না জানলেও পারসি, ইংরেজি, আরবি পুস্তক কিনে কাচের আলমারিতে সাজিয়ে রাখতে পছন্দ করতেন। 'অধিক পুস্তক গৃহে রাখিলে সরস্বতী বদ্ধ থাকেন' এই বিবেচনায় পুণ্যসঞ্চয় হেতু, সেইসঙ্গে ঐশ্বর্য-আড়ম্বর প্রমাণের কারণে বই সাজানো হত। পুস্তকগুলি পাঠে বাবুদের কোনো ঐহিক লাভ হত না, ফলে তাঁরা উক্ত পুস্তকগুলি পড়তেন না, ভবানীচরণের এই উক্তিটি গ্রহণ করা অসম্ভব। বাহ্য-আড়ম্বর প্রদর্শনে অভ্যস্ত বাবুদের কাছে বই সাজানোও ছিল নিছক এক বিলাস মাত্র। তা ছাড়া 'ধনী লোক মাত্রেই পুস্তকের মর্ম্ম বুঝে এবং গ্রাহক হয় এমত নহে,' অপিচ এই সত্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সাধারণভাবে পুস্তক পাঠের প্রতি বাবুদের ছিল চূড়ান্ত অনীহা।

সাধারণ মধ্যবিত্ত বাবুদের সন্তানেরা সাহেবদের স্কুলে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাও শিখত। তবে ইতিপূর্বে দেখানো হয়েছে যে, এই বাংলা শিক্ষার মান ও মনোযোগ দুই-ই ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। লেখক এই সূত্রেই হিন্দু কলেজ, স্কুলবুক সোসাইটি এবং ডেভিড হেয়ার সাহেবের যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করেছেন। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পশ্চাৎ-এ মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর এবং বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুরের অবদানকেও

তিনি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। তবে সকল দেশীয় বাবুরাই যে শিক্ষার ব্যাপারে সমান উদ্যোগী ছিলেন না, প্রকারান্তরে সে কথাও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

'এতন্নগরে অনেক নববাবু ও বাঙালি বারাঙ্গণা সকল গীত বাদ্যাদি বিদ্যায় নিপুণতর, তুম্বুরুতুল্য কালোওয়াত, গায়ক বাদক হইয়াছে', প্রকারান্তরে এ জাতীয় আমোদপ্রমোদ বিলাসিতার কথা স্বীকার করে নববাবুদের কালোয়াতিকে 'কাঁঠালের আমসত্ব' বলে উপহাসও করেছেন লেখক। বাবুরা সচরাচর 'মোসাহেব' পরিবৃত হয়ে থাকতেন। কর্মপ্রার্থী, উমেদার, দায়গ্রস্ত, সুযোগসন্ধানী, নিষ্কর্মা অনেক লোকেরাই রাত্রি দুই প্রহর পর্যন্ত যাতায়াত করতেন, বাবু সবসময় কর্ম দিতে অপারগ হলে কিংবা দায় থেকে উদ্ধার করতে না পারলেও মিথ্যে আশ্বাস দিয়েও কৃপাপ্রার্থীকে বেঁধে রাখতেন। ফলে বারংবার উক্ত কৃপাপ্রার্থী বাবুর কাছে যাতায়াত করতেন ফলে বাবুরও তাতে কিঞ্চিৎ খ্যাতিবৃদ্ধি হত। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত থেকে গণ্ডমূর্খ মোসাহেব— বাবুর মর্জিমাফিক প্রিয়ভাষী হতে পারলে 'বাবুর প্রসাদে তাহার উদর পূর্তির' কোনো অভাব হত না। সেকালে কলকাতায় আত্মপ্রশংসালোভী বাবুদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এই প্রকার অনেক লোকই জীবনধারণ করতেন, ভবানীচরণের লেখা থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ভবানীচরণ 'কলিকাতা কমলালয়ে' এভাবেই উনিশ শতকের প্রথম দিকের বাবু সম্প্রদায়ের একটি নিখুঁত চিত্র উপস্থিত করেছেন। তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধটি মূলত বস্তুধর্মী, নানান তথ্যের আকর বিশেষ। 'কড়চা' জাতীয় রচনায় স্বাভাবিকভাবেই নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষ— উভয় মতই প্রকাশিত হয় বলে বিষয়টি একদেশদর্শী হয়ে পড়ে না। তথ্যসমৃদ্ধ এই প্রবন্ধে ভবানীচরণ বাবুদের আচরণগত স্বাতন্ত্র্য ও সাধারণ ধর্ম, আদবকায়দা, রীতি-নীতির সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিয়ে দেন, নিজে সচরাচর অদৃশ্য থেকে। বাবুদের প্রতি সাধারণভাবে লেখকের মনোভাব পক্ষপাতিত্বমূলক না হলেও সহানুভূতি বঞ্চিত নন। তা ছাড়া পৃষ্ঠপোষকগত বাধ্যবাধকতার জন্য বাবুদের শিক্ষাপ্রীতি, বারাঙ্গনা সংসর্গ ইত্যাদি কিছু ব্যাপারে তিনি নীরব থেকেছেন। কিন্তু সরব হয়ে সত্যের অপলাপ করে এই বাস্তবতামূলক তথ্যসমৃদ্ধ নিবন্ধকে অনৃতভাষণের আকর করে তুলতে চাননি। সাধারণ ভাষায়, ঋজু ভঙ্গিতে, সরল বাক্যগঠনে আলোচ্য গ্রন্থটি বাবুসমাজের প্রথম দিককার যে নিবিড় চিত্র তুলে ধরেছে, উনিশ শতকে এহেন দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয়টি নেই। ফলে 'বাবু'দের ইতিকথা স্মরণে 'কলিকাতা কমলালয়ে'র ভূমিকা ও প্রাসঙ্গিকতা ঐতিহাসিক।

১৮৩০-এর কাছাকাছি সময় থেকে নববাবুদের দল দ্রুত অদৃশ্য হতে থাকেন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, সর্ববিধ সংস্কার মুক্ত নব্যবাবুরা দ্রুত ফেলে যাওয়া আসন পরিপূর্ণ করেন। নব্যবাবুরা মূলত মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণিরই অগ্রপুরুষ। কেবল তাঁদের পাশ্চাত্য-প্রীতির উগ্রতা মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। পরবর্তীকালে মাত্র এক দশকের ভিতরেই মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের উত্থান ঘটলে নব্যবাবুরা তাঁদের স্বভাবজ বৈশিষ্ট্যগুলি কম-বেশি গ্রহণ বর্জন করে মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণির সঙ্গে মিশে যান। মধ্যশ্রেণির ভদ্রলোকবাবুরা ছিলেন আপোশকামী— প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একটি সুষম মেলবন্ধনে তাঁরা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য। নব্যবাবুদের মতো উগ্র পাশ্চাত্যপ্রীতিকে এঁরা ভালো চোখে দেখেননি। আবার মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষাকে গ্রহণ করে এঁরা হয়ে উঠেছিলেন যথেষ্ট প্রগতিশীল, কিছুটা উন্নাসিকও। সমকালীন শিক্ষিত সমাজেরই আর একটি অংশ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাবুদের এই উন্নাসিকতাকে, অহংকারকে, প্রগতির নামে স্থবির গণ্ডীবদ্ধ চিন্তাধারাকে, সর্বোপরি দেশের মানুষকে হেয়-তুচ্ছ করার প্রবণতাকে একেবারেই সমর্থন করেননি। বিভিন্নভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে যুক্তি আদেশ ও

অনুরোধের ছলে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁরা। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সোমপ্রকাশ' পত্রটিও এই দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই এ জাতীয় ছদ্ম-প্রগতিশীল বাবুদের নির্মমভাবে সমালোচনা করেছেন।

'সোমপ্রকাশ' কলকাতার চাঁপাতলা অঞ্চল থেকে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ১৫ নভেম্বর ১৮৫৮ (১ অগ্রহায়ণ ১২৬৫)। বিদ্যাসাগরের প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকাশিত 'সোমপ্রকাশ' অচিরেই হয়ে ওঠে বাঙালিমননের নির্ভরযোগ্য প্রতিফলন। 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশিত হওয়ার আগে আর কোনো বাংলা সাময়িকপত্রে বাঙালির সামাজিক জীবন, মধ্যবিত্তের কণ্ঠস্বর এত স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। ঐতিহাসিকের মতে, 'তার প্রধান কারণ, আলোচনা ও সমালোচনার মূলে যে রাজনৈতিক চেতনা থাকা প্রয়োজন, সেই চেতনা বাঙালী মধ্যবিত্তের মধ্যে তেমন সঞ্চারিত হয়নি। সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে এই চেতনার দ্রুত সঞ্চার হতে থাকে এবং তার উত্থান-পতনের সঙ্গে ''সোমপ্রকাশ'' ও তরঙ্গায়িত হতে থাকে।'[৩৫] পত্রিকাটি প্রায় প্রথম থেকেই পাশ্চাত্য গরিমা ও জীবনযাপনে গৌরবান্বিত বাঙালি শিক্ষিত ভদ্রলোকবাবুদের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন, নিবন্ধ প্রকাশ করে ধারাবাহিকভাবে বাঙালিবাবুদের চিত্তশুদ্ধির প্রচেষ্টা করেছে। মূলত সাহেবিয়ানার মোহে বিভ্রান্ত বাঙালি নব্যবাবু এবং মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুরাই ছিলেন 'সোমপ্রকাশে'র আক্রমণের লক্ষ্য।

৫ অগ্রহায়ণ ১২৭৩ বঙ্গাব্দ সংখ্যার 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত হয় 'নবদলে ময়ূরসজ্জা' নামক একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদনে সাহেবদের অনুকরণে মদ্যপান ও সাহেবি দ্রব্য ভক্ষণে উদ্‌গ্রীব 'নব্যদলের কতকগুলি অসার লোক'-এর বিরুদ্ধে পত্রিকাটি কলম ধরেছে। অথচ বাহ্য কতকগুলি আদবকায়দায় অভ্যস্ত বাবুদের 'হিন্দু ও ইংরেজ উভয় দলই' অগ্রাহ্য করেছেন। কারণ, 'তাঁহারা হিন্দুদিগের নিষিদ্ধ অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান করেন বলিয়া হিন্দুরা ঘৃণা করেন। আর সাহেবরা অসার ও অপদার্থ ভাবিয়া অশ্রদ্ধা করেন।'[৩৬] প্রতিবেদনকারের মতে, ইংরেজদের আত্মোন্নতির মূল পানভোজনে নয়, 'বিশেষ গুণ ও বিশেষ ক্ষমতা' নিহিত আছে। অতএব 'নব্যদলে'র বাবুরা যেন পানভোজনে রত না থেকে ইংরেজদের সদৃশ গুণ অর্জনে সচেষ্ট হন। প্রয়োজনে 'নব্যদলে'র বাবুদের 'সমাজদোষ সংশোধন করিয়া সেই বিঘ্ন অতিক্রম করিবার চেষ্টা' করতে হবে। অধিক সংখ্যক মানুষের চরিত্র-ভাবনা সংশোধিত হলে হিন্দুসমাজ দোষ অনেকটাই সংশোধন করা সম্ভব হবে বলেই প্রতিবেদক মনে করেন। প্রতিবেদন অনুযায়ী এই সমাজদোষ সংশোধনে প্রয়োজন 'একতা, অধ্যাবসায় ও সৎক্রিয়াসাহস।'[৩৭] অতএব এই শ্রেণির বাবুদের কাছে প্রতিবেদকের অনুরোধ, তাঁরা যেন স্ত্রীজাতিসুলভ পানভোজনে মত্ত না হন এবং পুরুষোচিত কাজে প্রবৃত্ত হন।

১২৭৭ বঙ্গাব্দের ১৯ শ্রাবণ সংখ্যা 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত 'বিলাতী গাম্ভীর্য্য বা আত্মগরিমা' নামক প্রবন্ধে (প্রবন্ধটি মূল ফাইলে খণ্ডিত, অবশিষ্টাংশ বিনষ্ট হওয়ায় এই সুচিন্তিত প্রবন্ধটির সম্পূর্ণ পাঠ থেকে এ কালের পাঠকেরা বঞ্চিত) লেখক স্পষ্ট জানিয়েছেন যে,[৩৮] মানুষমাত্রেই অনুকরণপ্রিয় এবং অনুকরণই সামাজিক উন্নতির মূল। কিন্তু বিভিন্ন জাতির, বিশেষত বিজিত জাতি যদি নিজে তার সদ্‌গুণগুলি অনুকরণ করে তবে সেই বিজিত জাতিরও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বাঙালিবাবুদের ক্ষেত্রে এই অনুকরণ অনুকরণকারির অবিমৃষ্যকারিতায় 'বিষময় ফল' হয়ে দেখা দিয়েছে। মোগল রাজত্বকালে আমরা মোগল বাদশাহ বা প্রাদেশিক মোগল শাসনকর্তার অনুকরণ করতে গিয়ে না-মোগল, না-আর্য ছিলাম। এখন

'ইংরাজ রাজত্বে রাজপুরুষগণের অনুকরণ করিয়া আর্য্য-মোগল-ইংরাজি প্রথা সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া ত্র্যহস্পর্শ দোষ ঘটিয়া গিয়াছে।'[৩৯] উভয় জাতির সদ্‌গুণগুলি অনণুকৃতই থেকে গেছে, বাবুরা 'আপাত মনোরম কুনিয়মগুলি' আয়ত্ত করে সমাজকে কলুষিত করছেন। 'মোগলদের ভোগবিলাস এবং ইংরাজগণের বাহ্যাড়ম্বর' বাঙালি বাবুরা আয়ত্ত করে এক বিচিত্র চরিত্রের প্রাণীতে পরিণত হয়েছেন। লেখকের মতে,[৪০]

'মোগল শাসনাধীনে থাকিয়া বাঙ্গালী এক্ষণেও বিলাসী, আবার ইংরাজ অনুকরণে বঙ্গবাসী বচনবাজি ও গলাবাজিতে সুনিপুণ ও কার্য্যকলাপ বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ।' সেইসঙ্গেই লেখক শিক্ষিত বাবুদের মধ্যে 'বিলাতী গাম্ভীর্য্যে'র 'কলঙ্ক' দেখতে পেয়েছেন। আত্মম্ভরিতা ও আত্মগরিমার মোহে আচ্ছন্ন বাঙালিবাবুদের নিবন্ধকার 'এক অদ্ভুত জন্তু' বলে ব্যঙ্গ করেছেন। সম্ভবত ইংরেজি শিক্ষার যে অভিমান মধ্যবিত্ত 'এলিট'বাবুদের কারোর কারোর মধ্যে দেখা দিয়েছিল, দেশীয় শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষদের প্রতি যে উপেক্ষা, দয়া ও অমর্যাদা তাঁরা প্রদর্শন করতেন, দেশীয় জীবনযাপনের সরলতার পরিবর্তে বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ জটিল আত্মপ্রচারমূলক জীবনাদর্শের প্রতি যে গভীর পক্ষপাত ছিল এঁদের, তাদেরই তীব্র ব্যঙ্গ নিক্ষেপ করেছেন লেখক। তিনি মনে করেন, ইতিপূর্বে সম্ভ্রান্তবাবুরাও অনেকসময়ই কায়িক শ্রমের বিনিময়ে সাধারণ ব্যক্তির উপকার করতেন; কিন্তু শিক্ষিতাভিমানী বাবুরা তাঁদের ভয়ংকরী অল্পবিদ্যা নিয়েই এতটা আত্মতৃপ্ত যে, অপরের উপকারের কথা তাঁরা স্বপ্নেও কল্পনা করেন না। আর যে বাঙালিবাবুরা দেশীয় মানুষের প্রতি উপেক্ষা ও ঘৃণার ভাষা নিয়ে দেশের মঙ্গলের কথা ভাবেন, তাঁরা কখনো দেশ ও জাতির উপকারে আসতে পারেন না। আলোচ্য খণ্ডিত প্রবন্ধে শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' মধ্যশ্রেণিদের শিক্ষার অভিমান বাঙালিবাবুর নির্বিশেষ চরিত্রধর্ম হিসাবে দেখানো হয়েছে।

১ শ্রাবণ ১২৭৯ বঙ্গাব্দের 'বাংলা দেশের একটি শোচনীয় অবস্থা' প্রতিবেদনে সমকালীন ইতর-ভদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত বাবুদের বিলাসব্যসনে অধিক মনোযোগের কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে।[৪১] প্রতিবেদকের মতে, অধিকাংশ লোকেই আমোদপ্রমোদে কালক্ষেপ করেন। গান-বাজনা-যাত্রা-অভিনয় এসব নিয়েও অনেকে ব্যতিব্যস্ত। পাপের প্রতি এঁদের ঘৃণা কম। কুকর্ম করলেও সমাজে কেউ কিছু বলে না। কিছু মানুষ লেখাপড়া করে সুশিক্ষিত হয়েছেন বটে, কিন্তু 'এ দলেরও অধিকাংশ ব্যসনের হস্ত হইতে মুক্ত নহেন।' বাঙালিবাবুদের এহেন মতিগতি দেখে প্রতিবেদক এর কতকগুলি সম্ভাব্য কারণ নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন, যথা—

প্রথমত, বাঙালিবাবুদের মধ্যে অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ভাগ অধিক হওয়ায় ইউরোপীয়দের সদ্‌গুণগুলি তাঁদের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু 'দোষগুলি জয় করিয়া লইয়াছে' সহজেই।

দ্বিতীয়ত, আগে শাস্ত্রের ভয়ে নানাপ্রকার নিষিদ্ধ কর্ম কিংবা আচরণ করার আগে শাস্ত্রনির্দিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘনের পাপ জন্মাবে, এমন ভয়েই লোকে উক্ত আচরণ বা কর্ম থেকে বিরত থাকত। কিন্তু 'এখন সুরাপানাদি করিলে ধর্ম্মে পতিত অশ্রদ্ধেয় ও অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া থাকিতে হয় না।'

তৃতীয়ত, পূর্বের তুলনায় 'বাণিজ্য প্রভাবে' ও অন্যান্য সংগত কারণে অধিকাংশ লোক স্বচ্ছল এবং আর্থিক সংগতি আছে বলেই নিরুদ্বিগ্নভাবে নির্দ্বিধায় 'ব্যসন-বাসনা' চরিতার্থ করবার সুযোগ পায়।

চতুর্থ, কোনো পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজে বাঙালির আগ্রহ বা অংশগ্রহণ প্রায় নেই বললেই চলে। তার পরিবর্তে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের ভোজন ও শয়নেই অধিক মনোযোগী। সেইসঙ্গেই রয়েছে নানাপ্রকার অসৎ বিলাসব্যসনের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ।

আসলে, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে কলকাতার বাবুদের মধ্যে অনেকের দু'দিনেই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছিল। একথা যথার্থ নয় যে, ঔপনিবেশিক বাংলায় চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছিল কিংবা ব্যাবসাবাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু সুযোগসন্ধানী কিছু উদ্যোগী পুরুষের অভাবনীয় শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল এই সময়পর্বে। উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁদের কিংবা তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। অন্যদিকে তথাকথিত শিক্ষিতবাবুরাও নিজেদের Isolated করে দিয়েছিলেন। এহেন পরিস্থিতিতে বাবুদের চারিত্রিক উৎকর্ষ ঘটা সম্ভবপর হয়নি।

১২৭৯ বঙ্গাব্দের ১ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'সোমপ্রকাশে' অর্ধশিক্ষিত, আপাত নিশ্চেষ্ট, সুযোগসন্ধানী লম্পট বাবুদের 'সামাজিক লোফার' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৫২] এঁরা অর্ধশিক্ষিত, কিন্তু মুখে এমন ভাব দেখান যেন এঁদের মতো পণ্ডিত আর দু'টি নেই। বইপত্র না পড়েও এবং দেশ-বিদেশের সংবাদ-রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে ন্যূনতম জ্ঞান না থাকলেও এঁরা 'মিলের শেষ গ্রন্থের দোষগুণ ও প্রিন্স বিসমার্কের শেষ কার্য্যের নিগূঢ় তাৎপর্যের বিষয়ে কথোপকথন' করতে পারেন। এঁরা নিজেদের সর্ববিষয়ে কথা বলবার অধিকারী বলে মনে করেন। তবে 'নিকৃষ্ট দলে বাহাদুরী করা এই সকল লোকের অভ্যাস।' সরল-সাদাসিধা আপাত অল্পবুদ্ধি লোকেদের কথার জালে বন্দি করে এই সামাজিক 'লোফার'বাবুরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে। প্রবন্ধকার বলেছেন:

'সামাজিক লোফার পরিশ্রম করে না। মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র কাহারই নিমিত্ত ইহারা চিন্তা করে না। আপনার তৃপ্তি হইলেই হইল।'[৫৩]

এঁরা উৎকৃষ্ট পোশাক ছাড়া পরেন না। সাদা ভাতকে 'শূকরের আহার' স্বরূপ গণ্য করেন। অম্বুরি তামাক ছাড়া খান না। এক কথায় সব সেরা জিনিস না হলে 'লোফার'বাবুদের বিলাসব্যসনে পরিতৃপ্তি হয় না। সম্ভবত অর্ধশিক্ষিত পড়তি নববাবুদের কিংবা ভ্রষ্টচরিত্র মধ্যবিত্ত তথাকথিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের 'সামাজিক লোফার' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এঁরা সুযোগসন্ধানী পুরুষ। তেমন কোনো দুর্বলচিত্ত নির্বোধ ভদ্র 'বাবু'কে পেয়ে গেলে তাঁদের কাঁধে চড়ে বসেন এবং তাঁর 'ভীটায় ঘুঘু না চরিয়ে ছাড়েন না'। শুধু তাই নয়, 'যে সে প্রকারে তাহার টাকা লওয়া হয়, এবং সুবিধামত উপকারকের স্ত্রী, ভগিনী, কন্যা প্রভৃতিকে কুপথগামিনী করিতে পারিলেও ছাড়ে না এইরূপে নিজের ব্যয় চলে।'[৫৪] নিজ পরিবারের দায়িত্ব পালনে 'সামাজিক লোফার' বাবুরা অবশ্য উন্নাসিক। পরিবার প্রতিপালনের সামর্থ্য না থাকায় এঁরা 'মায়াবাদে'র কথা বলেন। 'ব্যভিচার, চুরি, প্রতারণা, বৈরনির্য্যাতন স্পৃহা' এঁদের চরিত্রের মহৎ গুণ।

এঁরা যাঁর স্কন্ধে ভর করেন এবং অর্থ নেন, তাঁদের মিথ্যা স্তোকবাক্য দিয়ে ভুলিয়ে রাখেন যে, অচিরেই অবস্থা ফিরবে এবং দুই-এক বছরের মধ্যে রাজা হওয়া তো কেবল সময়ের অপেক্ষা। এই মিথ্যা আশ্বাস দিয়েই তাঁরা সাধারণ মানুষকে দোহন করেন এবং কার্যক্ষেত্রে প্রতারণা করে পালিয়ে যান। উপকারীর অর্থ আত্মসাৎ করে কার্যক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করার আগে উপকারীর সঙ্গে বিবাদ করে 'লোককে জানায়, যে তৎপ্রদত্ত উপকার সে তুচ্ছজ্ঞান করে'। এঁরা প্রকৃত কৃতঘ্ন, আবার আত্মাভিমান শিখরস্পর্শী। কৃতজ্ঞতা স্বীকারকে এঁরা অপমান বলে মনে করেন, তা ছাড়া বিষয়টি লোক জানাজানি হলে তাঁদের প্রতারণা-ব্যাবসার ক্ষতি হতে পারে ভেবেও এঁরা উপকারীকে অস্বীকার করতে চান। সেইসঙ্গে 'সমবয়স্ক মাত্রেই' এঁরা সহ্য করতে পারেন না। নিজের বড়ো হওয়ার যোগ্যতা না থাকলেও, উপযুক্ত ব্যক্তিদের পতন সে কামনা করে এবং তার জন্য 'সামাজিক লোফারে'র চেষ্টার অন্ত থাকে না। যদিও লেখক জানিয়েছেন, এ জাতীয়

প্রতারকদের প্রতারণা চিরকাল চলতে পারে না, ফলে যেদিন এঁদের প্রতারণা সর্বজনসমক্ষে আসে, সেদিনই এঁরা 'আত্মীয়হীন সমাজচ্যুত ও দরিদ্র' হয়ে পড়েন। লেখকের মতে, 'জীবনের শেষাংশ প্রায় জেলে অতিবাহিত হয়। চিন্তা, আত্মভর্ৎসনা, পৃথিবীর উপর বিরক্তি এইগুলি লোফারের জীবনের পরিণাম।'[৪৫]

এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 'সামাজিক লোফার'রা দেখা দিয়েছিলেন। একথা সত্য যে, এই সময় থেকেই বনেদি বাড়িগুলির ভিত নড়বড়ে হতে শুরু করে। পূর্বেকার বনেদি নববাবুরা প্রায় সকলেই অদৃশ্য হন কিংবা ব্যক্তিগত খামখেয়ালিপনায় সর্বস্ব উড়িয়ে পুড়িয়ে হতদরিদ্র হয়ে পড়েন। উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদ মূলত মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের দ্বারা পালিত, নিয়ন্ত্রিত। পুরোনো বনেদিবাবুদের অনুরূপ শিক্ষাদীক্ষা না থাকায় অনেকেই জীবনধারণের জন্য মিথ্যার, প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু বাবুসমাজের ইতিহাসে ঘটনাটি কিছু নতুন নয়। এই প্রসঙ্গে নববাবুদের অন্যতম বাবু চুচুঁড়ার বিখ্যাত বা কুখ্যাত প্রাণকৃষ্ণ হালদারের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। কোম্পানির নোট জ্বালিয়ে ধূমপান করে, লাট-বড়োলাটকে ডেকে জাঁকজমক সহকারে দুর্গাপূজার মোচ্ছব করে কলকাতার বাবুদের বেকায়দায় ফেলে দেওয়া প্রাণকৃষ্ণর রমরমা পিছনে ছিল কোম্পানির নোট জাল করার কীর্তিকলাপ। ১৮৩০-এ প্রাণকৃষ্ণ ধরা পড়ে আন্দামানে নির্বাসিত হন। তাঁর বাড়িটি টালা অ্যান্ড কোম্পানি নিলামে তোলেন।[৪৬] পরে এখানে সরকারের তরফে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৮৩৬ সাল নাগাদ। প্রাণকৃষ্ণের ভাই নীলকৃষ্ণ হালদারও উক্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে শাস্তি পান। বাবুয়ানা নিয়ে এই নীলমণি হালদারের সঙ্গে এককালে প্রতিযোগিতায় নামতেন বাবুদের শিরোমণি 'তনুবাবু', যিনি ছিলেন মদনমোহন দত্তের পুত্র। প্রাণকৃষ্ণ অসুস্থ অবস্থায় ফিরে এসে বেশিদিন বাঁচেননি। সামান্য তামাকের জন্য তাঁকে ভিক্ষে করতে হয় বলে জানা যায়।[৪৭] উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থনৈতিক অবস্থানের হেরফের ঘটায় বনেদি লাম্পট্য ও প্রতারণার ক্ষেত্রেও রুচির দীনতা দেখা দেয়। বাবুয়ানায় অভ্যস্ত কিন্তু বর্তমানে অপারগ বাবুদের কাছে প্রতারণা কিংবা উঞ্ছবৃত্তি ছাড়া আর কোনো পথ যে খোলা ছিল না, তা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়।

'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত 'বাবু' সম্বন্ধীয় রচনা ও প্রতিবেদনের মূল সুরটি ছিল সিরিয়াস। কিন্তু ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে হুতোমের নকশার দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হলে বাংলায় নকশা সাহিত্যের জোয়ার আসে এবং বাবুরাও নব-নব্য নির্বিশেষে রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুকের বিষয় হয়ে পড়েন। উনিশ শতকীয় নকশার সিংহভাগেরই কেন্দ্রে রয়েছেন 'বাবু' এবং হাস্য-পরিহাস-উপহাসের মাধ্যমেই তাঁরা উপস্থাপিত হয়েছেন। সেইসঙ্গেই নকশার স্থানে স্থানে ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি আমন্ত্রণ বা বিদ্বেষ, ভাষা ও শব্দ ব্যবহারে যথেচ্ছাচার, ব্যক্তিগত অসূয়াপ্রসূত ভাব বা চিত্র সংযোগ— এ জাতীয় গুণগুলিও দেখা দেয়। এর ফলে সিরিয়াস প্রবন্ধের বিষয় হিসাবে বাবুরা আর তেমন গৃহীত হচ্ছিলেন না। তা ছাড়া বাংলা নকশা প্রকাশের প্রথম যুগে যে বাবুরা নকশার পাতায় ভিড় জমাচ্ছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই নব কিংবা নব্যবাবু। অর্থবান, অথচ অশিক্ষিত বাবুদের লাম্পট্য-ব্যভিচার অসংযত বিলাসের মুখপাত হিসাবেই নকশাগুলিকে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু সমকালীন মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের মধ্যেও যে বাবুদের এক ভিন্ন স্বর শোনা যাচ্ছিল, সে বিষয়ে নকশা প্রায়শই নীরব। উচ্চশিক্ষার ছাঁচে ঢালাই এইসব 'ভদ্রলোক'বাবুদের অতলস্পর্শী আত্মাভিমান, শাসকশ্রেণির প্রতি প্রীতি, যা কিছু বিদেশি তথা সাহেবি তার প্রতি অন্ধ মোহ, স্বজাতীয় সাধারণ শ্রেণির প্রতি ঘৃণা, দেশীয় যাবতীয় প্রাচীন ধর্ম-সংস্কারের প্রতি অবিমিশ্র অশ্রদ্ধা প্রচলিত নকশায়

যেন না-বলাই রয়ে গিয়েছিল। অথচ তখন জাতীয়তা এবং হিন্দু পুনরুত্থানবাদের ভাববীজ অঙ্কুরিত-পল্লবিত হচ্ছিল। অতএব এই শ্রেণির বাবুদের প্রতি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আরেক অংশের উপেক্ষা-উপহাস-বিরক্তি আত্মপ্রকাশের এক নতুন মাধ্যম অনুসন্ধান করছিল, যা নকশার মতো আপাততরল-ব্যক্তিগত বিদ্বেষপূর্ণ-ইতর রসপ্রধান নয়, আবার সিরিয়াস প্রবন্ধের গাম্ভীর্য, তত্ত্ব ও তথ্যের জটিল ও বহুমাত্রিক উপস্থাপনও যাতে অনুপস্থিত, কিন্তু একইসঙ্গে ভাব ও লক্ষ্যের দিক থেকে যা সিরিয়াস ও মহৎ। সেই অতৃপ্তি দূর হল অনেকাংশেই ১৮৭২-এ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মাসিক 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পর। প্রথম সংখ্যা থেকেই (১২৭১ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ) 'ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুলে'র মতো রম্যপ্রবন্ধ সেই অনাস্বিত রোমাঞ্চ এবং অভাবিতপূর্ব সম্ভাবনার সন্ধান দিল, যার দ্বারা প্রবন্ধের ভাবগাম্ভীর্যকে ক্ষুণ্ণ বা তরল না করেই তার প্রকাশকে হাস্য-পরিহাস-ব্যঙ্গের সুমিত ঐশ্চর্যে সকলের উপভোগ্য করে তোলা যায়।

'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত এবং পরবর্তীকালে 'লোকরহস্য' (১৮৭৪) গ্রন্থের অন্তর্গত 'ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুলে'র মূল motif   অশিক্ষিত অথচ সভাপ্রিয় 'বাবু'দের কার্যকলাপ ও চিন্তাভাবনার হাস্যকর উদ্ভ্রান্তি। বাবুরা 'যদৃষ্টং তল্লিখিতং' তত্ত্বে বিশ্বাস করেন, যেকোনো ঘটনার সাপেক্ষেই সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন, যুক্তি-তর্ক দিয়ে ঘটনাকে যাচাই করা তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত, সভা বলতে কেবল অপরের নিন্দা-মন্দ বা সমালোচনা বোঝেন, অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত হলেও শিক্ষিত হওয়ার ভান করেন, নিজেদের ছাড়া অপরকে 'পশু'তুল্য জ্ঞান করেন। এঁরা অবশ্য সব কাগুজে বাঘ, উপযুক্ত পরিবেশে পিঠটান দিতে দ্বিধা করেন না। মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত বাবুদের মধ্যে আছেন 'বানর'তুল্য সমালোচকগণ। এঁরা ভীরু, কাপুরুষ এবং নির্বোধ। বুঝে না বুঝে কেবল সমালোচনা করার জন্যই এঁরা সমালোচনা করেন। সমালোচনা করেই আত্মতৃপ্ত হন। নিছক সমালোচনার দ্বারা দেশ-উদ্ধার এঁদের কাজ। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ভারত উদ্ধার কাব্যে' এই উভয় শ্রেণির (কাব্য-কবিতা-ছড়া অধ্যায়ে ইতিপূর্বেই আলোচিত) পরিচয় যথাযথভাবে তুলে ধরেছিলেন। সন্দেহ নেই, সমকালীন জীবনে এই উভয় শ্রেণির মানুষের সাক্ষাৎ মিলত অতি সহজেই, কালে যা বাঙালি-চরিত্রের সাধারণ ধর্মে পরিণত হয়েছে, বঙ্কিম তাকেই উপলক্ষ্য করেছেন।

'ইংরাজস্তোত্র' ('লোকরহস্য'; বঙ্গদর্শন ১২৭৯ বঙ্গাব্দ অগ্রহায়ণ) এবং 'বাবু' ('লোকরহস্য'; বঙ্গদর্শন ১২৭৯ বঙ্গাব্দ ফাল্গুন) নামক প্রবন্ধদ্বয় আমাদের আলোচ্য বিষয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা। দু'টি প্রবন্ধেই লেখক মহাভারতের ভাষাদর্শ গ্রহণ করেছেন। কারণ, সমালোচকের ভাষায়, '... সোজাসুজি বিদ্রূপ করিলে তাহার ''রহস্য'' চলিয়া যায়; ব্যঙ্গ গালাগালিতে পরিণত হয়। সুতরাং লঘু ব্যঙ্গের জন্য তিনি মহাভারতের গুরু-গম্ভীর ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। মহাভারতের ভাষার প্রয়োগ বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাকে প্রসারিত করিয়াছে; যাহা নিন্দনীয় তাহা শ্রদ্ধেয় বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই শ্রদ্ধেয়তা একটা মুখোশ মাত্র।'[৪৮] 'ইংরাজস্তোত্রে' আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের ইংরেজ-ভজনা ও রাজভক্তির গভীরতার সঙ্গে। ইংরেজের প্রবল প্রতাপ ও কৌশলী শাসনের কাছে মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত বাবুরা সেদিন নতজানু। কীসে শাসক তুষ্ট হন, কী করলে শাসকের সুনজরে আসা যায়, কীভাবে শাসককে খোশামোদ করে নিজের আখের সুনিশ্চিত করা যায়, সে কারণেই এই ইংরেজ-ভজনা। অতএব বঙ্কিমের দেখা বাবু[৪৯] চাকরির জন্য শামলা মাথায় বেঁধে ইংরেজের পিছু পিছু ঘোরেন; শাসকের খোশামোদ করে, প্রিয় কথা বলে, মনরাখা কাজ করে 'বড়ো' হওয়ার চেষ্টা করেন। নতুন কালের বাবুদের তা না করেও উপায় নেই। কারণ শাসক প্রদত্ত সম্মান বা টাইটেল তখন শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের একমাত্র আরাধ্য,

নতুবা সমাজে মান থাকে না। আবার এর দরুনই মধ্যশ্রেণির মধ্যে 'এলিট' গোষ্ঠীভুক্ত হওয়া চলে। অতএব 'ভদ্রলোক'বাবুর মনোগত প্রার্থনা, 'আমায় টাইটল দাও, খেতাব দাও, খেলত দাও— আমাকে তোমার প্রসাদ দাও— আমি তোমাকে প্রণাম করি।'[৫০] সেকালের সংবাদপত্রে টাইটেল বা খেতাবের তালিকার পাশাপাশি আর কোনো কোনো শিক্ষিত বাবু খেতাব পাওয়ার উপযুক্ত, তদ্‌বিষয়ক সংবাদও প্রকাশিত হত। বলা বাহুল্য, অনেক ক্ষেত্রেই এটি ছিল নিজের ঢাক নিজে পেটানোর মতো ব্যাপার। 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' (১৮৮৪) নাটক রহস্য রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এই বিষয়টি নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন।

শুধুমাত্র শাসক খুশি হলেই এ জাতীয় খেতাব-প্রাপ্তি সম্ভব। অতএব—

'আমি যাহা কিছু করি, তোমাকে ভুলাইবার জন্য। তুমি দাতা বলিবে বলিয়া আমি দান করি; তুমি পরোপকারী বলিবে বলিয়া আমি পরোপকার করি, তুমি বিদ্বান্ বলিবে বলিয়া আমি লেখাপড়া করি। অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।'[৫১]

অতএব, বাবুরা, শাসককে খুশি করার জন্য শাসকের ইচ্ছাতেই দাতব্য করে, স্কুল প্রতিষ্ঠা করে, শাসককে যথোপযুক্ত চাঁদা দিয়ে তুষ্ট রাখে। দেশীয় পোশাক ছেড়ে বুট-প্যান্টালুন পরে, প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক নাকে চশমা আঁটে, কাঁটা-চামচ দিয়ে টেবিলে বসে আহার করে। ভাতের পরিবর্তে পাঁউরুটি খায়। 'নিষিদ্ধ মাংস' না হলে ভোজন হয় না। 'কুক্কুটে'র মাংসের নানান আহার্যে জলপান চলে।

ইতিপূর্বে নানান আলোচনায় আমরা স্পষ্ট করতে চেয়েছি যে, উনিশ শতকের সাতের দশক থেকেই ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধমূলক মনোভাব ক্রমে রক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যে ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। এবং একথা তো অসত্য নয় যে, ব্রাহ্মরা ছিলেন তৎকালীন শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' বাবুদের গরিষ্ঠ এবং যথার্থ প্রতিনিধি। ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মধর্মের উত্থান হলেও, ক্রমে ধর্মীয় চিন্তার সঙ্গে এসে যুক্ত হয় সমাজ-সংস্কার, প্রগতিচিন্তা, জাতীয়তাবাদী ধারণার মতো বিষয়গুলি। সাধারণ জীবনে কিংবা সদ্যোত্থিত রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকেও ব্রাহ্মবাবুরাই ছিলেন অগ্রপথিক এবং উদ্যোগী পুরুষ। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন রক্ষণশীল হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের অন্যতম মুখ। যদিও বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবাদ দিয়েই তিনি প্রাচীন হিন্দুধর্ম ও সংস্কারের সমর্থন করেছেন। কিন্তু তাঁর চিন্তাভাবনা যথেষ্ট উদার ছিল না, অন্তত প্রচলিত হিন্দুসমাজের সংস্কারের ক্ষেত্রে। অতএব সাধারণ শ্রদ্ধা থাকলেও সাধারণভাবেই বঙ্কিমচন্দ্রের অবস্থান ছিল ব্রাহ্মদের বিপরীতে। আলোচ্য 'ইংরাজস্তোত্র' প্রবন্ধেও দেখি তিনি শিক্ষিত 'বাবু' বলতে ব্রাহ্মকেই বুঝিয়েছেন। যদিও সঙ্গে সঙ্গে এও লক্ষণীয় যে, বঙ্কিমের এই প্রবন্ধ রচনার সময় 'বাবু' তাঁর আভিজাত্যপূর্ণ অর্থ পরিত্যাগ করে সাধারণ 'কেরানি' অর্থে ব্যবহৃত, অতএব শিক্ষিত শ্রেণির কাছে অপাঙ্‌ক্তেয়। ফলে শাসকের মনতুষ্টির জন্য এবং টাইটেল লাভের জন্য শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুরা বলেছেন—[৫২]

'আমি মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া তোমার ভাষা কহিব; পৈতৃক ধর্ম্ম ছাড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বন করিব; বাবু নাম ঘুচাইয়া মিস্টর লেখাইব।...

'আমি বিধবার বিবাহ দিব; কুলীনের জাতি মারিব, জাতিভেদ উঠাইয়া দিব— কেন না, তাহা হইলে তুমি আমার সুখ্যাতি করিবে।...'

এবং সেইসঙ্গেই শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের একান্ত প্রার্থনা—[৫৩]

'হে সর্ব্বদ! আমাকে ধন দাও, মান দাও, যশঃ দাও;— আমার সর্বকামনা সিদ্ধ কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি।

'যদি তাহা না দাও, তবে আমাকে ডিনারে অ্যাট্‌হোমে নিমন্ত্রণ কর, বড় বড় কমিটির মেম্বার কর, সেনেটের মেম্বর কর, জুস্টিস কর, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট্ কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি।'

নতুন সমাজবিন্যাসে শাসিতের পক্ষে শুদ্ধ পাণ্ডিত্যের চর্চা কিংবা পরোপকারের মহত্ত্ব দেখিয়ে আর সামাজিক সম্মান পাওয়া সম্ভব নয়। শাসকের অনুকম্পামিশ্রিত দয়াদাক্ষিণ্য ছাড়া যথার্থ 'বাবু' হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। ১৮৭১ পর্যন্ত শাসকের অনুগ্রহপুষ্ট বিশিষ্ট সামাজিক জনের সংখ্যা সর্বমোট ১৫৭ জন।[৫৪] এই তালিকা কেবলমাত্র বাঙালি খেতাবধারী বিশিষ্ট সামাজিকের তালিকা। মহারাজা, রাজাবাহাদুর, রাজা, কুমার, রায়বাহাদুর, খাঁবাহাদুর, সিম, সর্দার, বাবুবাহাদুর, নবাব বাহাদুর— এই খেতাবগুলি (Title) তখন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এঁদের মধ্যে 'মহারাজ রাজাবাহাদুরেরা পৈতৃক বিষয় পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের খেতাব পাইয়া থাকেন। যাঁহারা রাজাবাহাদুর প্রভৃতি খেতাব সকল পাইয়াছেন, তাঁহারা কোন কোন ভাল কাজ করাতে গবর্নমেন্ট তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া সেই সকল খেতাব দিয়াছেন।'[৫৫] বস্তুত, এই খেতাব ছিল শাসকের পক্ষে শাসিতের গলার রজ্জু। এর বিনিময়ে চির আনুগত্য, ন্যায়-অন্যায় সব কাজেই সমর্থন ও সাহায্য, সেইসঙ্গে উক্ত শ্রেণির বাবুদের দ্বারা সাধারণ মানুষের উপর শাসকের নিয়ন্ত্রণ ও শোষণ অব্যাহত থাকতে পারে। ইংরেজ-শাসিত সমাজজীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠার মোহে বাবুরা এতটাই মত্ত ছিলেন যে, এই সত্য তাঁদের না-বোঝাই ছিল। অন্যদিকে Industrial Capitalism বা শিল্পপুঁজিবাদের গোপন অভিসন্ধিও ছিল এর পিছনে। দেশীয় পুঁজিপতি ও সহায়কদের Title বা খেতাব দানের মাধ্যমে আর্থিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠা দিলে তাঁদের নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়। এই সময় থেকেই তালুকদার বা জমিদারশ্রেণিকে এ জাতীয় খেতাব দানের মাধ্যমে বশংবদ শ্রেণিতে পরিণত করার প্রক্রিয়াটি শুরু হয়। ইতিপূর্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের হাত ধরে ভূমিমুখীন অভিজাত শ্রেণি সৃষ্টি হলেও, সেখানে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক ছিল পরোক্ষ শিথিল নিয়ন্ত্রণে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যা করদান ও গ্রহণের সীমাবদ্ধতায় শেষ হত। কিন্তু শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির মধ্যে আনুগত্যের উন্মাদনার আধিক্য লক্ষ করে ধনতন্ত্র এঁদেরকেই শোষণ প্রক্রিয়ায় উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেন এবং টাইটেল বা খেতাব দিয়ে যেমন বশংবদ বাবুদের একজোট করেন, তেমনি অন্যান্য শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির সঙ্গে বিভাজন তৈরি করে এঁদের ঐক্যের সম্ভাবনাকেও বিনষ্ট করে শোষণের প্রক্রিয়াকে নিরবচ্ছিন্ন করেন। অন্যদিকে খেতাব প্রাপ্তির জন্য কিংবা খেতাব প্রাপ্তির পর যে ধরনের সাহেবি আদবকায়দা ও জীবনযাপনে এঁরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, তার দরুন শিল্পপুঁজিবাদের সহায়তা হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন।[৫৬] এর দরুন বৃদ্ধি পাওয়া বাবুয়ানা ও বিলাসিতা প্রকৃতপক্ষে এদেশে বিদেশি বেনিয়াদের শিল্পের বাজার তৈরি হয়েছে, চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে, সেইসঙ্গেই বিপুল লভ্যাংশ প্রাপ্তির পথও সুনিশ্চিত করেছে। যদিও শাসকের এই গোপন অভিসন্ধি বোঝার মতো সচেতনতা কিংবা সদিচ্ছা মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত বাবুদের ছিল না। পরানুকরণ ও পরানুগৃহীত হওয়ার বাসনায় তাঁরা আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন।

শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের এই আত্মবিস্মরণকে বঙ্কিম ক্ষমা করতে পারেননি। বিধবা বিবাহ, বাল্যবিবাহ, খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে তাঁর রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে মেনে নিয়েই বলা চলে, সর্ববিদ্যাবুদ্ধিরহিত যুক্তিবর্জিত অন্ধ আনুগত্য যে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের আত্মধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে, এই সত্যে তাঁর সন্দেহ ছিল না। জ্ঞানচর্চা থেকে পরোপকার ব্রত— শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'দের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের পিছনে শাসকের গোপন প্রকল্পকে দূরদর্শী বঙ্কিম চিনতে পেরেছিলেন।

জাতীয়তাবাদের নামে ইংরেজ তোষণ কিংবা শাসকেরই প্রকল্পিত পথে আবেদন-নিবেদন জানানো ছিল শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের বৈশিষ্ট্য। মনে রাখতে হবে, জাতীয়তাবাদের সেই গঠন যুগে প্রধান প্রধান নেতৃবৃন্দ ছিলেন ব্রাহ্ম এবং উচ্চশিক্ষিত। 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫)-এর 'পলিটিক্স' প্রবন্ধে বঙ্কিম দেখিয়েছেন যে, বাঙালি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের জাতীয়তাবাদ আসলে ইংরেজের মুখাপেক্ষী এবং তা আসলে উপযোগিতাবাদ, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই শ্রেণির স্বার্থ। সমালোচকের ভাষায়, বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন, 'The only politics which is suited to the country is begging. So he observed humorously that politics is a subject fit for cultivation by the tittle-holders, flatterers, deceivers, beggars and editors.' [৫৭] এ কারণেই শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের প্রতি বঙ্কিম বীতরাগ পোষণ করেন। শাসকশ্রেণির নিরন্তর এবং স্বার্থবাহিত প্রশংসা করে চলে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাঙালিবাবুরা যে নিজেদের দীনতারই প্রমাণ দিচ্ছেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই লেখকের। 'লোকরহস্যে'রই 'গর্দভ' প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন ১২৮০ শ্রাবণ) তিনি শাসক ও ভক্তিভাজনকারী মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত বাবুদের গর্দব আখ্যা দিয়েছেন। শাসকশ্রেণির প্রশংসা কিংবা কৃপাভিক্ষা লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব এই বাবুরা 'বঙ্গদেশে সমালোচক হইয়া অবতীর্ণ' হয়েছেন।[৫৮] সমকালীন মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের এই দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁদের কার্যকলাপের প্রতি তাঁর এই অসমর্থন প্রমাণ করে যে, জাতীয়তাবাদের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির রচিত তত্ত্বে বঙ্কিমের প্রভাবের কথা যতই বলা হোক না কেন, ব্যক্তিগত বিশ্বাসের দরুন বঙ্কিম স্বয়ং এই জাতীয়তাবাদের ধারণার সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেননি। বরং অসহিষ্ণুতাই প্রকাশ করেছেন।

বস্তুত শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের ভণ্ডামি, পরানুকরণ প্রবৃত্তি, উন্মার্গগামী আচরণকে বঙ্কিম কখনোই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে পারেননি। বিত্তাশ্রয়ী বাবুত্বের কাল শেষ হলে শিক্ষার হাত ধরে যে বাঙালি পুরুষেরা প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মুখোমুখি হতে পেরেছেন। তাঁদের মনের অন্ধকার দূর হয়ে সমাজের বুক থেকে 'বাবুত্ব' নামক জঞ্জালটি অপসারিত হবে ভাবা গিয়েছিল। কিন্তু নব্যবাবুদের পাশ্চাত্যমুখী উন্মার্গগামিতা তাকে ভুল প্রমাণ করল— পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি বলতে তাঁদের অনেকেই মদ্যপান, সাহেবি ভাষায় কথা বলা এবং স্বদেশীয় সমাজ-সংস্কৃতিকে তুচ্ছ করার মানসিকতা অর্জনই বুঝলেন। অর্ধশিক্ষিত বা আপাতশিক্ষিত নব্যবাবুদের হাত ধরে নববাবুদের মতো লাম্পট্য দোষও ধীরে ধীরে ঢুকে পড়েছিল অনেক ক্ষেত্রে। কারণ এই সব 'আপাত' নব্যবাবুরা আদবকায়দায় বিলেতিমুখী হলেও, ধ্যানে-ধারণায় বহন করছেন নব্যবাবুদের সেই লাম্পট্য দোষ। চাকরিজীবী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাবুরা এ ব্যাপারে সচেতন থাকবেন আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু চাকরি ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা, আর্থিক সীমাবদ্ধতা ও সামাজিক উপেক্ষার দরুন তাঁরাও নব ও নব্যবাবুর মতো পঞ্চ ম-কারের সাধনায় মগ্ন হলেন। ব্যয়সাধ্য উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হবার সুযোগ সকলের ছিল না। ফলে কিছু ভাগ্যবান উচ্চশিক্ষার গণ্ডি পেরোতে পারলেও সমাজের বৃহৎ অংশই রয়ে গিয়েছিল অশিক্ষা ও অর্ধশিক্ষার বলয়ে। তাঁদের কাছ থেকে নৈতিক ও চারিত্রিক শুচিতা আশা করা অন্যায়। আবার অর্ধশিক্ষার আনুষঙ্গিক দোষগুলি ও আত্মাভিমান তাঁদের ছিল পুরোদমে। ফলে দেশের বৃহৎ জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এঁরা নিজেদের এক স্বতন্ত্র বলয় গড়ে তুললেন। উদ্যোগ ও উদ্যমহীন, অন্তঃসারশূন্য এই বাঙালিবাবুদেব বঙ্কিম স্বভাবতই নিন্দাবাদ জানিয়েছেন।

'বঙ্গদর্শনে'র ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাবু' প্রবন্ধটি মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'বাবু'দের প্রতি বঙ্কিমের সেই মানসিক অসহিষ্ণুতার বহিঃপ্রকাশ। আঠারো শতকের শেষদিকে বাবুর জন্ম হয়েছিল

বিত্ত নির্দিষ্ট আভিজাত্যের ঘেরাটোপে। বিত্তহীন বা অল্পবিত্ত বাবুরা তখন ছিলেন সোনার পাথরবাটির মতোই অলীক ব্যাপার। কিন্তু উনিশ শতকের শেষদিকে পৌঁছে বোঝা গেল, বাবুত্ব নামক প্রবণতাটি আর বিত্তনির্দিষ্ট আভিজাত্যের একচেটিয়া লক্ষণ নয়। এটি এক ধরনের মানসিকতা, যা ধনী-নির্ধন সকলের মধ্যেই দেখা দিতে পারে। এই সময়ে পৌঁছে খুব স্বাভাবিকভাবেই বাবু শব্দটি 'নানার্থ' হয়ে পড়েছিল। লেখক স্পষ্ট করে বলেছেন:

'যাঁহারা কলিযুগে ভারতবর্ষে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া, ইংরাজ নামে খ্যাত হইবেন, তাঁহাদিগের নিকট ''বাবু'' অর্থে কেরানী বা বাজার সরকার বুঝাইবে। নির্ধনদিগের নিকটে ''বাবু'' শব্দে অপেক্ষাকৃত ধনী বুঝাইবে। ভৃত্যের নিকট ''বাবু'' অর্থে প্রভু বুঝাইবে। এ সকল হইতে পৃথক্, কেবল বাবুজন্মনির্ব্বাহাভিলাষী কতকগুলিন মনুষ্য জন্মিবেন;...'[৫৯]

এই 'বাবুজন্মনির্ব্বাহাভিলাষী' মানুষ বলতে লেখক শিক্ষিত মধ্যশ্রেণিকেই নির্দিষ্ট করেছেন। এঁরা বিচিত্রবুদ্ধি, উদরসর্বস্ব, আহার-নিদ্রায় পারঙ্গম, বহুভাষী, মিষ্টান্নপ্রিয়, চশমা এঁদের আবশ্যিক ভূষণ। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি যে 'বাক্যে অজেয়', তার প্রমাণ সভা-সমিতির বক্তৃতায় এবং বহুভাষণে। এঁরা জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে এবং শাসকের প্রীতিলাভের জন্য মাতৃভাষার বিরোধিতা করে 'পরভাষা' তথা রাজভাষায় পারঙ্গম হয়ে ওঠেন। বঙ্কিম তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বলেছেন যে, কোনো কোনো 'মহাবুদ্ধিসম্পন্ন' বাবু তো মাতৃভাষায় বাক্যালাপেও অসমর্থ। স্বভাব ভীরু, কাপুরুষ, দুর্বলচিত্ত হওয়ায় মুখে বীরত্ব দেখালেও শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি কার্যক্ষেত্রে পলায়নকেই মহৎ ব্রত বলে গ্রহণ করেন। তবে কেরানিবৃত্তিতে এবং বেতন গ্রহণে তাঁরা উপযুক্ত। শাসক কিংবা বিদেশি প্রভুর শত লাঞ্ছনাতেও এঁরা অটল থাকেন। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের 'শিক্ষা'র উদ্দেশ্য ও উপায়ও স্বতন্ত্র।— এঁরা, 'বিনা উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করিবেন, সঞ্চয়ের জন্য উপার্জ্জন করিবেন, উপার্জ্জনের জন্য বিদ্যাধ্যয়ন করিবেন, বিদ্যাধ্যয়নের জন্য প্রশ্ন চুরি করিবেন।'[৬০] সমকালে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও কুফল সম্পর্কে পত্রপত্রিকাগুলি সরব ছিল। শিক্ষা ছিল কেবল ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যম, তার জন্য অসদুপায় অবলম্বন করতে কেউ দ্বিধাবোধ করতেন না, কারণ সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য ডিগ্রিলাভ ছিল আবশ্যকীয়, নতুবা চাকরি জোটা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এই শিক্ষা ছিল নিতান্ত পরমুখাপেক্ষী। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায় কোনো স্বাধীন চিন্তা বা সামর্থ্যের বিকাশ সম্ভব ছিল না। 'সোমপ্রকাশ' ১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় 'ইংরাজী শিক্ষায় ভারতবর্ষের প্রকৃত উপকার কি হইল?' শীর্ষক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে নির্দ্বিধায় জানিয়েছেন: [৬১]

'কোন বিষয়ে তাঁহাদিগের ক্ষমতা জন্মিয়াছে? ক্ষমতার মধ্যে তাঁহারা চাকুরী করিতে পারেন এইমাত্র। চাকুরে দল অপদার্থ দল বলিলে হয়।'

বঙ্কিমের অসহিষ্ণুতা সেখানেই। উচ্চশিক্ষার দ্বারা স্বাবলম্বী না হয়ে শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুরা শাসকের ধামাধারী হয়ে ওঠায় দেশের কোনো মঙ্গল সাধন সম্ভব নয়, এ সত্য তিনি অনুধাবন করেছিলেন। একইসঙ্গে রাজভক্তির নিদর্শন হিসাবে অপরিচিত মদ্যপান এবং চুরুটসেবন, সেইসঙ্গেই বারাঙ্গনাবিলাস এঁদের নৈতিক চরিত্রকেও দূষিত করে তুলেছিল।

শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবু মাত্রেই 'অনন্তজ্ঞানী', একথা মনে করলে ভুল হবে। অনেকেই অর্ধশিক্ষিত, কিন্তু শিক্ষিতের ন্যায় ভাণ করেন। কাব্য-কবিতা বুঝুন না বুঝুন, তদ্‌বিষয়ে সমালোচনায় এবং আপন আপন মতপ্রকাশে অক্লান্ত। নিজেদের এঁরা 'অনন্তজ্ঞানী' মনে করেন, সংগীতশাস্ত্রকে মনে করেন জন্মগত অধিকার,

যদিও 'বারঘোষিতের চিৎকার' অপেক্ষা সংগীতের ন্যূনতম জ্ঞান এঁদের অধিকাংশেরই ছিল না। পরিশ্রমসাধ্য কর্মের প্রতি শিক্ষিত বাঙালি চিরকালই অনাগ্রহী, কিন্তু কথায় দড়ো। এঁদের ধর্মাধর্মবোধও উপযোগিতাভিত্তিক। ফলে এঁরা 'উৎসবার্থ দুর্গাপূজা করিবেন, গৃহিণীর অনুরোধে লক্ষ্মীপূজা করিবেন, উপগৃহিণীর অনুরোধে সরস্বতীপূজা করিবেন এবং পাঁঠার লোভে গঙ্গাপূজা করিবেন,'[৬২] এটাই স্বাভাবিক। লেখক উপহাস করে এঁদের ত্রিগুণসমন্বিত বলেছেন— মহাদেবের মতো এঁরা 'মাদকপ্রিয়', ব্রহ্মার মতো প্রজাসিসৃক্ষু' এবং বিষ্ণুর মতো 'লীলা-পটু'। বিশেষ করে, বিষ্ণুর সঙ্গে এঁদের গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। বিষ্ণুর মতোই এঁদের গৃহিণী ও উপগৃহিণী থাকবেন। এঁরা হবেন নিষ্কর্মা, অলস, নিদ্রাপটু, 'অনন্তশয্যাশায়ী'। সেইসঙ্গেই অননুকরণীয় ভাষায় বঙ্কিম সমস্ত শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'দেরই 'বাবু'ত্বের গোষ্ঠীভুক্ত করে নিয়েছেন:[৬৩]

'বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহাদিগেরও দশ অবতার— যথা কেরানী, মাস্টার, ব্রাহ্ম, মুৎসুদ্দী, ডাক্তার, উকিল, হাকিম, জমিদার, সম্বাদপত্র সম্পাদক এবং নিষ্কর্মা। বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহারা সকল অবতারেই অমিতবলপরাক্রম অসুরগণকে বধ করিবেন। কেরানী অবতারে বধ্য অসুর দপ্তরী; মাস্টার অবতারে বধ্য ছাত্র, স্টেশান মাস্টার অবতারে বধ্য টিকেটহীন পথিক, ব্রাহ্মাবতারে বধ্য চালকলাপ্রত্যাশী পুরোহিত; মুৎসুদ্দি অবতারে বধ্য বণিক ইংরাজ; ডাক্তার অবসারে বধ্য রোগী; উকিল অবতারে বধ্য মোয়াক্কল; হাকিম অবতারে বধ্য বিচারার্থী; জমিদার অবতারে বধ্য প্রজা; সম্পাদক অবতারে বধ্য ভদ্রলোক এবং নিষ্কর্মাবতারে বধ্য পুষ্করিণীর মৎস্য।'

লক্ষণীয় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিভিন্ন পেশাভিত্তিক বাবুত্বের যে উপবিভাগগুলি গড়ে উঠেছিল, বঙ্কিম তার সবটুকুকেই গ্রহণ করেছেন। সমসময়ে 'বাবুত্ব' নামক মানসিক প্রবণতার সংক্রমণ যে কত সুদূরপ্রসারী ছিল তা সহজেই অনুমেয়। উনিশ শতকের শেষপাদে পৌঁছে বাবুত্বের এলাকা ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছিল, যদিও তখন 'বাবুত্বে'র গা থেকে খুলে গিয়েছিল বিত্ত নির্দিষ্ট আভিজাত্যের আলখাল্লা। বাবু হতে গেলে আগে যেমন 'নবধা' লক্ষণ অর্জন করতে হত, চার 'ঘ' ও চার 'প'-এর যোগ্যতামান থাকতে হত, 'খলিফা'র মধ্যস্থতায় বাবু-বলয়ে প্রবেশ করা যেত, বর্তমানে আর সেসব বহিরাঙ্গিক নিয়মকানুন, আদবকায়দা না মানলেও চলে। কারণ, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা। চাকরিজীবী মধ্যশ্রেণির বাবুদের পক্ষে নববাবুদের মতো বিশাল ব্যয়ভার গ্রহণ সম্ভব নয়, আবার শখ-আহ্লাদ থেকেও তাঁরা বঞ্চিত হতে চান না। অতএব বাবুত্বের মানসিকতা নিয়ে বাঙালি মধ্যশ্রেণি চিরকালের জন্য 'বাবু' হয়ে বসল এবং তা-ও খলিফার মধ্যস্থতাকে স্বীকার না করেই, সরাসরি। ইতিপূর্বে নববাবুরা অর্থ সামর্থ্যের কারণে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে শখের নাট্যশালা স্থাপন করে তাতে অভিনয়ের ব্যবস্থা করতেন। সেসব নাটক দেখার সৌভাগ্য ঘটত বাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়পরিজন এবং সাহেব-মোসাহেবদের। কিন্তু নতুন পরিস্থিতিতে তা আর সম্ভব ছিল না। অতএব সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগের পরিবর্তে, যৌথ মালিকানাভিত্তিক 'সাধারণ রঙ্গালয়' তথা ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭২-এ, শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের তীর্থে পরিণত হয় এই রঙ্গমঞ্চ। ইতিপূর্বে কতিপয় অর্থবান বাবুদের উদ্যোগে 'পাবলিক থিয়েটার' নামক বস্তুটি স্থাপনের প্রচেষ্টা হলেও, সেখানে সাধারণের চাহিদার কোনো মূল্য ছিল না। ১৮৬৮ সালের 'নব-প্রবন্ধ' লেখেন:[৬৪]

'বিশুদ্ধ নাট্যামোদ যে এ দেশে বহুকাল স্থায়ী হইবে, তাহার অনুমাত্র ভরসা নাই। আমরা প্রায় প্রত্যেক নাট্যালয়ে গমন করিয়া তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছি যে, যে সকল অভিনেতৃগণ অভিনয় কার্য্যে

নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশই সৌখিন, নেহাত ইয়ারলোক ও সৌখীন অভিমানে পরিপূর্ণ। সর্ব্বদা তাহাদের মনের মত মন যোগাইতে না পারিলে অথবা কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে অমনি মুখভার করিয়া বসেন এবং অভিনয়েও আর তাদৃশী আস্থা প্রকাশ করেন না। কেহ কেহ ''ড্যাম থিয়েটার'' বলিয়া রঙ্গস্থল হইতে বাহির হন, আর ভুলেও সে পথে পদার্পণ করেন না।'

'অভিনয় সংক্রান্ত সৌখীন বাবুদিগের' এই ব্যক্তিগত অতিমানিতার হাত থেকে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' যে আপাতভাবে মুক্তি দিয়েছিল এবং নাট্যশালাকে সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ক্রমে থিয়েটার হলগুলিতে মেয়েরা অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। তাঁরা আসতেন মূলত বারাঙ্গনাপল্লী থেকে। এই সময় থেকেই হিন্দু রক্ষণশীলরা থিয়েটার হলগুলির উপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। তা ছাড়া অভিনয় দর্শনকালে সব জাতের সহজ মিশ্রণকেও সমাজের এক অংশ ভালো চোখে নেননি। এই অবস্থায় শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি অবশ্য আহ্লাদিত হয়েছিলেন এবং বাবুদের সান্ধ্যকালীন গন্তব্য হিসাবে গড়ের মাঠের পাশাপাশি সাধারণ রঙ্গালয়গুলিও যুক্ত হয়েছিল। বঙ্কিম স্বাভাবিকভাবে তাঁর রক্ষণশীল মানসিকতার কারণে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের এই থিয়েটার-কালচারকে মেনে নিতে পারেননি।

যেমন তিনি মেনে নিতে পারেননি বাবুদের উদ্দেশ্যহীন সংবাদপত্র সম্পাদন এবং ভণ্ডামিকে। কারণ, বাবুরা 'মিসনরির নিকট খ্রীস্টিয়ান, কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্ম, পিতার নিকট হিন্দু এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকট নাস্তিক'; তাঁরা 'নিজগৃহে জল খান, বন্ধুগৃহে মদ খান, বেশ্যাগৃহে গালি খান, এবং মুনিব সাহেবের গৃহে গলাধাক্কা খান'; তাঁদের 'যত্ন কেবল পরিচ্ছদে, তৎপরতা কেবল উমেদারিতে, ভক্তি কেবল গৃহিণী বা উপগৃহিণীতে, এবং রাগ কেবল সদ্‌গ্রন্থের উপর।' সর্বোপরি, বাবুদের 'বাক্য মনোমধ্যে এক, কথনে দশ, লিখনে শত এবং কলহে সহস্র।' মনে রাখতে হবে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃত পণ্ডিত, যথার্থ শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' শ্রেণিকে বাবু বলে গণ্য করতে চাননি। কেবল রাজপদপ্রার্থী, কৃপাভিক্ষু, শাসকের মদতপুষ্ট, আপাত শিক্ষিত তথা ডিগ্রিধারী অশিক্ষিত, নৈতিক শৈথিল্যযুক্ত মধ্যশ্রেণির বাবুদেরই উপলক্ষ্য করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর (১৮৫৭) এঁদের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছিল। আবার এঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন অর্ধশিক্ষিত মধ্যশ্রেণির তথাকথিত 'ভদ্রলোক'বাবুরা, যাঁরা মনে করতেন 'তাম্বুল চর্বণ করিয়া উপাধান অবলম্বন করিয়া দ্বৈভাষিকী কথা কহিয়া এবং তামাকু সেবন করিয়া ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধার' করবেন। আগেই বলা হয়েছে, জাতীয়তাবাদের উদ্‌যোগে মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'কুলের কার্যকলাপ বঙ্কিম সংগত কারণে মেনে নিতে পারেননি। কারণ তিনি বুঝেছিলেন, এই কার্যকলাপের পিছনে আদর্শ নেই, আছে তাৎক্ষণিক উন্মাদনা ও যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা।

তাঁর এই মনোভাব সম্পূর্ণ যথাযথ, এমনটি হয়তো নয়। কারণ, ১৮৫৭-র সিপাহি বিদ্রোহের পর বাঙালি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি শাসকের অভাবিত বিরূপতার সম্মুখীন হয়েছিল। চাকরির সুযোগ লক্ষণীয়ভাবে কমে গিয়েছিল, অথচ সারা দেশের মধ্যে বাংলায় কলেজ এবং শিক্ষিতের হার ছিল সর্বাধিক।[৬৪] প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রসংখ্যার ৫ শতাংশেরও কম ছাত্র আসত উচ্চবিত্ত পরিবার থেকে। অধিকাংশ কলেজেই ছাত্র আসতেন মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে। এই সময় থেকে ফ্রি-স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, দেশীয় উদ্যোগে বা পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত স্কুলগুলিতে ইংরেজি শিক্ষা সুলভ হয়। বাঙালি মধ্যশ্রেণি বুঝেছিলেন, উচ্চশিক্ষা ছাড়া অল্প চাকরির এই প্রতিযোগিতার বাজারে টিঁকে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু উনিশ শতকের শেষদিকে বাঙালিবাবুরা যে রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠেছিলেন, তার কারণ যতটা না আদর্শগত, তার চেয়েও বেশি জীবন ও জীবিকার তাগিদ। অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে,[৬৫]

'মধ্যবিত্তের প্রথম দাবি হয় অধিক সংখ্যক চাকুরি; দ্বিতীয়, বাণিজ্য সংরক্ষণ নীতি ও স্বদেশী শিল্প বিস্তার, তৃতীয়, সর্বস্তরে ব্যয়বৃদ্ধি ও করবৃদ্ধির প্রতিবাদ; চতুর্থ, ভূমি রাজস্বের ও খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এগুলি অভিজাত থেকে কৃষক কোনো ভারতীয়ের কথাই বাদ দেয়নি। শেষ পর্যন্ত দাবি আদায় করতে তারা সক্রিয় কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক পথ নেয়।'

শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের এই 'নিয়মতান্ত্রিক পথ' থেকেই ১৮৮৫-তে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ সব ক্ষেত্রে, সভা-সমিতি, আন্দোলন-প্রতিবাদ বাবুদের বিলাসিতা ছিল না। একথা সত্য, যেকোনো আন্দোলনেই আদর্শের পাশাপাশি হুজুগে লোকের দল অনেকসময়েই বেনো জলের মতো ঢুকে পড়ে এবং আন্দোলনের চরিত্র বদলে দেয়। উনিশ শতকের শেষ পাদে নিরীহ, ভীরু বাঙালিবাবুরাও সবাই আদর্শে অটল ছিলেন না, সুযোগসন্ধানীদের ভিড় ছিল বেশি। অতএব বঙ্কিম-নির্মিত শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের মডেলটি আদর্শ হলেও সম্পূর্ণ যথাযথ এমন বলা যায় না। তা ছাড়া 'বাবুজন্মনির্ব্বাহবিলাসী'দের আর্থিক স্বাচ্ছল্য কিংবা পিতৃদত্ত ধন না থাকলে শুধুমাত্র চাকরিজীবী হয়ে বিলাসিতার চরম করা সম্ভব ছিল না। নববাবুদের ন্যায় এঁদের বাবুত্ব প্রদর্শনে আড়ম্বর ছিল না, ছিল শখ। এই শখ সামাজিক বিচার দুষ্ট হতে পারে, তবে তা শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির একটি অংশের জন্যই প্রযোজ্য, আপামর শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' শ্রেণির জন্য নয়।

'হনুমদ্বাবুসংবাদ' (লোকরহস্য; বঙ্গদর্শন ১২৮৯ মাঘ) প্রবন্ধেও দেখি, হনুমানের সঙ্গে 'বুট, কোট, প্যান্টালন, চেন, চসমা, চুরুট, চাবুকধারী টুপ্যাবৃতমস্তক এক নব্যবাবু'র কথোপকথনে 'local Self-government' -এর কথা এসেছে। মাতৃভাষায় কথোপকথনে কুণ্ঠিত বাবুটি জানিয়েছেন যে, এ হল 'স্থানীয় আত্মশাসন', অর্থাৎ 'যদি রাজা দয়া করিয়া আপনার কাজ আমাদের কিছু ছাড়িয়া দেন,'[৬৬] যাকে 'কমলাকান্তে' বঙ্কিম 'কুকুরের পলিটিক্স' বলেছেন।[৬৭] হনুমানের মুখ দিয়ে বঙ্কিম সারসত্যটি বলিয়ে নিয়েছেন যে, 'তাহলে সে রাজারই লাভ। তিনি আপনার কাজ পরের ঘাড়ে দিয়া পাটরানী নিয়ে রঙ্গ করুন, আর আমরা তাঁর খাটুনি খেটে মরি।'[৬৮] শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের আবেদন-নিবেদনমূলক পলিটিক্স বঙ্কিমচন্দ্র মেনে নিতে পারেননি। আমরা 'বসন্তক'এর রচনাসূত্রে কিংবা ইন্দ্রনাথ-যোগেন্দ্রচন্দ্রের রচনাতেও এই শ্রেণির প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ লক্ষ করেছি। সমকালীন সময়ে বাবুদের মধ্যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বুঝে, না বুঝে কিংবা গোপন স্বার্থসিদ্ধির অভীপ্সায় যুক্ত হবার যে হুজুগ উঠেছিল তার প্রতিই বঙ্কিম অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেছেন, যথার্থ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও তার কুশীলব শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের প্রতি তাঁর অসূয়া ছিল না বলেই মনে হয়।

'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাবু' নামক রচনাটি প্রকাশের অল্প কয়মাস পর পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত জনপ্রিয় ও দীর্ঘজীবী সংবাদপত্র 'ঢাকা প্রকাশে'র ২ আষাঢ় ১২৮০ বঙ্গাব্দ (১৫ জুন, ১৮৭৩) সংখ্যায় 'বাবু' নামের একটি দীর্ঘ রচনা মুদ্রিত হয়। রচনাটি লেখার পিছনে বঙ্কিমের 'বাবু' রচনার প্রভাব আছে বলেই মনে হয় আমাদের, কিন্তু রচনাটির উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। বঙ্কিমের মতো বর্তমান রচনার লেখকও স্বীকার করে নিয়েছেন যে 'আজি কালি বাবু বলিলে অনেককেই বুঝায়,[৬৯] কিন্তু রচনার উদ্দিষ্ট 'বাবু' সেই আপামর শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক' বাবুরা নয়; এমনকী পুরুষানুক্রমে যাঁরা 'বাবু' নামে আখ্যাত, তাঁরাও নন। যাঁরা অর্থবিত্তে রীতিমতো 'বড় মানুষ'— সংসারের কাজকর্ম নিজেরা কিছু করেন না, আশ্রিত আত্মীয়পরিজনদের দিয়ে করান, নিজে বিলাসব্যসনে দিন কাটান এবং যাঁরা পিতৃদত্ত ধনে ধনী কিংবা কোনো ধনী ব্যক্তির ভাই বা ভাগ্নে, যখন যা খেয়াল হয় তখনই তা ব্যয় করতে পারেন,— এই উভয় শ্রেণিই লেখকের উদ্দিষ্ট 'বাবু'র প্রতিনিধি। অর্থাৎ লেখক 'বিত্তনির্দিষ্ট' বাবুদের কথাই বলতে চেয়েছেন।

কলকাতা, ইংরেজের হাতে ভারতের প্রথম রাজধানী হওয়ার আগে, মোগল আমলে ঢাকাই ছিল বাংলার কেন্দ্রীয় নগর। ফলে ঢাকার নাগরিক জীবন বিকশিত হয়েছিল অনেক আগেই। 'ঢাকা-প্রকাশ' এ জাতীয় বাবুদের ঢাকায় না বাংলায় সর্বত্র দেখেছেন তা উল্লেখ করেননি। তবে অনুমান করা অসংগত নয়, কলকাতার বাবু-কালচারের ঢেউ ঢাকায় পৌঁছেছিল কিংবা ঢাকায় পূর্ব থেকেই এ জাতীয় বাবুদের রমরমা ছিল। দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের সাক্ষ্যে আমরা আগেই দেখেছি যে, আরেক নাগরিক শক্তিকেন্দ্র কৃষ্ণনগরেও এ জাতীয় বাবুদের রমরমা ছিল। অতএব বাবুদের সীমানা শুধু কলকাতা অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল না, মফস্সলী শহর বা নগরগুলিতেও সম্প্রসারিত হয়েছিল। তা ছাড়া উচ্চশিক্ষার সূত্রে ঢাকা ইত্যাদি অঞ্চল থেকে অনেক নবযুবাই কলকাতায় বসবাস করতেন। তাঁদের দ্বারা বাহিত হয়েও এ জাতীয় প্রবণতা মফস্সলের শহরগুলিতে সংক্রামিত হতে পারে।

লেখক বঙ্কিমের অনুসরণে এই সকল বাবুদের 'বিষ্ণু'র অবতার সদৃশ মনে করেছেন। এঁদের জীবনযাপনের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তার সঙ্গে ভবানীচরণের 'কলিকাতা-কমলালয়ে'র নববাবুদের সাদৃশ্য রয়েছে। বেলা এক প্রহরে এঁদের প্রাতঃকাল হয়। ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুতে না ধুতেই মৌমাছির মতো 'ইয়ারবর্গ' এসে উপস্থিত হন। অতঃপর তড়িঘড়ি করে মুখ ধুয়ে গতকাল রাতের কৃতকাজের পর্যালোচনা এবং আসন্ন রাতে অনুষ্ঠিতব্য কাজের, লেখকের মতে 'বদমায়েসীর' পরিকল্পনা করা হয়। স্নানের আগে পর্যন্ত কোনো খেলা, নিরর্থক গল্পগুজব, ইতর কৌতুক, বেসুরো গান-বাজনা কিংবা মাদক-সেবন শেষে এঁরা স্নান করে খেয়ে-দেয়ে দিবানিদ্রা দেন। এরপর অনেক বাবু রাত্রি এক প্রহর না হলে ঘুম থেকে ওঠেন না। অনেকে আবার অল্পবেলা থাকতে উঠে সন্ধ্যার পরেই 'ফিরতে' বের হন। এই সময় 'পাষণ্ডগোছের' খুব ঘনিষ্ঠ ইয়ারবর্গই কেবল বাবুর সঙ্গে থাকেন। বেড়ানোর ছলে আসলে 'বদমায়েসীর অনেক ফাঁদাপাতা' হয়ে থাকে। বেশ্যাদের দেখা ও রাত্রিতে আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা করাতেই এঁদের মন চঞ্চল বা ব্যাপৃত থাকে। সন্ধ্যার পর মদ, মাদক সহযোগে এঁরা বিলাসের চূড়ান্ত করেন। এইসময়—

'মানীর অপমান, নির্দোষের দণ্ড, পূতচরিত্র ব্যক্তিকেও পাপকূপে নিমজ্জন এবং দুর্বলা অবলাকুলের সতীত্ব নাশ প্রভৃতি ভয়ানক ভয়ানক দুষ্কার্য্য সকল ইহাদিগের দ্বারা যত অনুষ্ঠিত হয়, বোধ হয় না অন্য কোনো দুষ্কর্মীর দ্বারা তত হইয়া থাকে।'[৭০]

এরপর ভোরবেলা শরীর ও মন ক্লান্ত হলে এঁরা নিদ্রা যান। এই জীবনযাপনের সঙ্গে 'কলিকাতা-কমলালয়ে'র অশেষ 'ভাগ্যবান'বাবুর এবং 'নববাবুবিলাসে'র নায়কটির জীবনযাপনের কোনো বৈসাদৃশ্য নেই।

লেখকের মতে, বাবুরা লজ্জা-ভয়-অনুতাপশূন্য হন। ভোগের নিবৃত্তির জন্য এঁরা যেকোনো প্রকার ব্যয় ও ত্যাগ করতে পিছপা হন না। অবশ্য 'বাবুদিগের বেশবিন্যাস, আহার পরিচ্ছেদ এবং বাহ্য আমোদপ্রমোদ দেখিয়া ইহাদিগকে যেরূপ সুখী মনে হয় প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাদিগের মনে সেরূপ সুখ কিছুই নাই।'[৭১] এঁদের মনের মধ্যে সর্বদা কামনা-বাসনার আগুন এবং তা নিবারণের ফন্দিফিকির ঘোরে, ফলে লেখকের ভাষায়, এঁদের মন 'নরকবৎ'। কোনো কোনো বাবুর মনে সামান্য আত্মগ্লানি উপস্থিত হলেই উপযুক্ত পাপকাজ করে সেই আত্মগ্লানিকে তিনি দূর করে দেন। কেউ কেউ আবার পাপ করে করে এত পাষাণ হয়ে গিয়েছেন যে, তাঁদের মনে ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোনো অনুশোচনাই দেখা যায় না। বাবুদের 'পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী ও ভার্য্যা প্রভৃতি পরমাত্মীয়গণ পর এবং পরম শত্রুস্বরূপ দুশ্চরিত্র সহচর অনুচর ও পুশ্চলী প্রভৃতিরা আত্মীয়' হয়ে

ওঠে। স্ত্রীর সঙ্গে এঁদের সাক্ষাৎ প্রায় হয় না। কেউ কেউ স্ত্রীর উপর এমন বিকৃত আচরণ করেন বা করতে বাধ্য করান যে বারাঙ্গনাদের সঙ্গেও তেমনটি হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সকল বাবুদের সঙ্গে পত্নীর মানসিক বিচ্ছেদ ঘটে। কোনো কোনো বাবুর স্ত্রী 'দুশ্চারিণী' হন, কিন্তু পাষণ্ড বাবুদের তাতে কিছু যায় আসে না। লেখকের মতে—

'বস্তুতঃ অধিকাংশ বাবুর যাবতীয় গুহ্য চরিত্র অবগত হইলে তাহাদিগকে ইতর জন্তু অপেক্ষাও অপকৃষ্টতর বোধ হইয়া থাকে। ইহারা অনেক প্রকার দুষ্ক্রিয়ার পরিচালক এবং বদমায়েশদিগের চূড়ামণি স্বরূপ।'[৭২]

প্রবন্ধে বর্ণিত বাবুদের এই চরিত্র-মাহাত্ম্য নতুন কিছু নয়। প্রবন্ধটির স্বাতন্ত্র্য এই যে, বাবুদের 'বাবুগিরি'র কুফল বর্ণনার পাশাপাশি একটি সুফলের কথাও বলা হয়েছে। বাবুরা আপন সঞ্চিত অর্থ নির্বিচারে ব্যয় করে বিলাসব্যসনে ডুবে থাকেন সত্য, কিন্তু 'ইহাদিগের দ্বারা এই স্থানের সঞ্চয়ীকৃত অর্থগুলি নানা স্থানে বিস্তারিত হওয়াতে অনেকেরই কিছু হাত লাগিয়া যায় এবং ইহাদিগের কাজকর্ম করিয়া অনেকে প্রতিপালিত হয়।'[৭৩] বাবুগিরির এই অর্থকরী সুফলের দিকে অন্য কোনো প্রাবন্ধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি। বাবুগিরির সূত্রে অনেকে সংসার প্রতিপালন করে, এই সত্যও অস্বীকার করার নয়। দ্বিতীয় যে স্বাতন্ত্র্যের কথা উল্লেখ্য তা হল, এই প্রবন্ধেই প্রথম বাবুগিরিকে একটি অসামাজিক কাজ হিসাবে বিবেচনা করে এর বিরুদ্ধে বিধিবদ্ধ নতুন ফৌজদারি আইন চালু করার কথা বলা হয়েছে। লেখকের মতে, 'যে সকল ব্যক্তি সংসারের কোনো কার্য্য না করিয়া দিবারাত্র কেবল ইন্দ্রিয় পরিতর্পণেই ব্যাপৃত থাকে, তাহারা বদমায়েশ শব্দে অভিহিত হইবে এবং সাধারণ বদমায়েশের ন্যায় তাহারও দণ্ডার্হ হইবে।'[৭৪] একমাত্র আইন প্রণয়ন করেই বাবুদের শ্রীবৃদ্ধি এবং তার ফল ঘটমান সামাজিক দূষণ বন্ধ করা সম্ভব বলে প্রবন্ধকারের বক্তব্য। বাবুগিরিকে একটি সামাজিক অপরাধ হিসাবে গণ্য করা এবং আইন-প্রণয়ন করে এ জাতীয় মানসিকতার রাশ টেনে ধরার ভাবনাটি অভিনব সন্দেহ নেই। সমসাময়িক শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির একাংশ যে বাবু ও বাবুগিরিকে নিন্দাজনক মনে করে সমাজের বুক থেকে এর জড় উপড়ে ফেলতে উন্মুখ, তা অনুভব করা যায়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই 'বাবু'দের গৌরবসূর্য পশ্চিমমুখী হয়েছিল। বঙ্কিম যুগে তা পুরোপুরি অস্তমিত না হলেও তার গোত্রান্তর ঘটেছিল। উচ্চ-মধ্য যেমন শ্রেণিরই হন না কেন, শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' মাত্রেই 'বাবু' শব্দটির প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করতেন এই সময়, যদিও তাঁদের অনেকের জীবনযাপন ও মানসিক-ভাব 'বাবু'দের চেয়ে পৃথক কিছু ছিল না। কিন্তু সামাজিক বিচারে উনিশ শতকের শেষ দিকে 'বাবু' শব্দটি তুচ্ছার্থে বা অপকর্ম রূপে ব্যবহৃত হতে থাকায়, সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'রা এই শব্দটির প্রতি মোহ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তা ছাড়া সমকালীন পত্রপত্রিকায় এই সময় থেকে ধারাবাহিকভাবে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির আচার-আচরণ বা কার্যকলাপের প্রতি ভর্ৎসনা ও উপহাসের সুর শোনা যেতে থাকে। সবসময় যে 'বাবু'দের প্রসঙ্গেই এমনটি করা হয়েছে তা নয়, প্রসঙ্গক্রমে 'বাবু'দের কথা উত্থিত হয়েছে এবং এই অবসরে লেখক তাঁর অন্তর্জ্বালা প্রকাশ করেছেন। সেকালের পত্রপত্রিকার মধ্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু-প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গবাসী' (২৬ অগ্রহায়ণ, ১২৮৮; ১০ ডিসেম্বর ১৮৮১ থেকে সাপ্তাহিক এই পত্রিকাটির জন্ম) এ ব্যাপারে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক' এবং ব্রাহ্মবাবুদের প্রতি ধারাবাহিক বিরূপতা ও সমালোচনা প্রকাশ করে এসেছে। পত্রিকাটির ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল 'জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার'।[৭৫] বলা বাহুল্য, এই জ্ঞান,

হিন্দু রক্ষণশীলতার চশমা দিয়ে দেখা সমসাময়িক সমাজ ও জীবনধর্ম বিষয়ক জ্ঞান এবং সে জ্ঞানে আলোর চেয়ে অন্ধকারের হদিশই বেশি। পত্রিকাটি ব্রাহ্মবাবুদের এবং শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের সাহেব-ঘেঁষা আদবকায়দা ও অনুকরণ প্রবৃত্তির যারপরনাই নিন্দামন্দ করেছে প্রথম থেকেই। 'বঙ্গবাসী'র ঘনিষ্ঠ সহযোগী লেখক ও পৃষ্ঠপোষক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও নানা প্রসঙ্গে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির তথাকথিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের ভণ্ডামি, অনাচার ও সাহেব-প্রীতির কঠোর সমালোচনা করেছিলেন।

রক্ষণশীল হিন্দুত্বের অন্যতম প্রধান মুখ ছিলেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সাহেব-সাজার প্রাণান্তকর প্রতিযোগিতা তাঁর কাছে ছিল চক্ষুশূল। ধর্মাদিকৃত্যহীন, নিজের স্বজাতির সামাজিক সংস্কারগুলিকে থোড়াই কেয়ার করা 'বাবু'দের মিঠে-কড়া ভাষায় তিনি ভর্ৎসনা করেছেন সে কারণেই। সমকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা তাঁর মতে ছিল ভ্রান্ত এবং একইসঙ্গে 'বাবুত্বে'র জড় এবং এই জড় উপড়ে ফেলতে না পারলে দেশ ও জাতির সমূহ সর্বনাশ। 'ঘৃণা ও পাপ-বোধ সমান নহে' (বঙ্গবাসী, ১৪ ফাল্গুন ১৩১৬ বঙ্গাব্দ) প্রবন্ধে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পর্যালোচনা করতে বসে সুশিক্ষিত, অশিক্ষিত এবং কুশিক্ষিত— এই তিন শ্রেণির 'বাবু'দের কথা বলেছেন তিনি। তাঁর মতে,

'সম্প্রতি কুশিক্ষারই প্রবল স্রোত বহিতেছে। এই কুশিক্ষার ফলে ''বাবু'' দলের উৎপত্তি হইয়াছে। ''বাবুরা'' হিন্দুর ছেলে বটে, কিন্তু হিন্দুর শিক্ষা কয়জন ''বাবু'' পাইয়া থাকেন, বলিতে পারি না। ''বাবু'' দলের লোক প্রায়ই কুশিক্ষিত। আমদের দেশের যে সকল লোককে এখন আমরা অশিক্ষিত লোক বলিয়া থাকি, বাবুদের সহিত তুলনা করিলে মনে হয়,— সেই অশিক্ষিতেরাই যেন স্বর্গ, আর ''বাবু''রাই যেন সাক্ষাৎ নরক।'[৭৬]

ইন্দ্রনাথের আশঙ্কা ছিল প্রধানত দু'টি;— এক. মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের প্রভাবে (যাঁদের তিনি কুশিক্ষিত 'বাবু' বলে মনে করেন) সমাজ থেকে হিন্দুর বর্ণাশ্রম প্রথা বিলুপ্ত হবে, ফলে, জাতিভেদ-স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যতার কোনো ভেদ থাকবে না; সুতরাং ব্রাহ্মণের ধর্ম ও গৌরব দুই-ই লাঞ্ছিত হবে। এবং দুই. 'ভদ্রলোক' বাবুরা ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত— 'জনকতক কুশিক্ষিত বাবু সমাজে অন্তর্দ্রোহ উপস্থিত করিয়া, লোকের অন্তর্দাহ জন্মাইয়া, সমাজ-বিপ্লব ঘটাইতে নিরন্তর চেষ্টা করিতেছে।'[৭৭] অজ্ঞ লোকেদের ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা এবং এইভাবে বিদ্বেষের বীজ বপন করে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে সমাজের বাকি অংশকে একজোট করাই এই সকল 'কুশিক্ষিত' বাবুদের লক্ষ্য। সেইসঙ্গেই, এঁদের কারোর কারোর প্রভাবে শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'কুল সন্ধ্যাহ্নিক ত্যাগ করে, বিজাতীয় সংস্কৃতিকে আপন করে ক্রমশ দেশ ও জাতির সমূহ সর্বনাশ করছেন, এই তাঁর বিশ্বাস।

শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুরা যে প্রচলিত দেশীয় সংস্কার-ধর্মকৃত্যাদি এসবকে মান্যতা দিচ্ছেন না, একথা আংশিকভাবে সত্য। কিন্তু এই প্রবণতার জন্য মধ্যশ্রেণিই দায়ী কিংবা এই প্রবণতা ব্রাহ্ম-সংসর্গের ফলেই ঘটেছে এমনটি নয়। নাগরিক বাঙালিবাবুদের ধর্মপ্রাণতা প্রথম থেকেই শিথিল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৩ সালেই 'বিষয়ি ভদ্রলোক'দের প্রসঙ্গে তাঁদের অনাচার ও ধর্মজ্ঞানহীনতার অভিযোগ উপস্থিত করেছেন।[৭৮] এ অভিযোগ ডিরোজিও কর্তৃক নব্যবাবু সম্প্রদায় সৃষ্টির অভিযোগের অনেক পূর্ববর্তী, অতএব নব্যবাবু বা মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের হাত ধরে হিন্দুধর্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হল কিংবা ব্রাহ্মবাবুরা হিন্দুধর্মের সর্বনাশ ঘটালেন, এই অভিযোগ সর্বাংশে সত্য নয়। তবে উনিশ শতকের শেষদিকে শিক্ষিত শ্রেণির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রচলিত ধর্মে ও সংস্কারে অনাস্থার বিষয়টি ব্যাপকতা পায়। ইন্দ্রনাথের আশঙ্কা সেদিক

থেকে সত্য হলেও হতে পারে। 'জাতিভেদ' (নায়ক, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ) নামক পুস্তিকার সূচনাতেই জাতিভেদ অস্বীকার করা বাবুদের 'বাবুত্বে'র সমালোচনা করে তিনি প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকেই দায়ী করেছেন। তাঁর মতে, বাবুরা হিন্দুর ছেলে হয়েও 'হিন্দুয়ানী শিখিবার সুযোগই মোটে পান না',[৭৯] তার কারণ, তাঁরা ছয়-সাত বৎসর বয়স থেকেই ইংরেজি ধরনের স্কুলে ভর্তি হয়ে বিশ বৎসর বয়সে বেরিয়ে আসেন। অতএব পারিবারিক ক্ষেত্র কিংবা দেশীয় স্কুল থেকে যে ধর্মসংস্কারের চেতনা গড়ে উঠতে পারত, তা তাঁদের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। তাঁরা স্কুল-কলেজে অতি সামান্যই সংস্কৃত শিক্ষা করেন অথবা করেন না। পারিবারিক সংসর্গের সুযোগ না মেলায় সেদিক থেকেও উক্ত বাবুদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। অথচ ইংরেজি স্কুলে পড়ে 'বাবুবুদ্ধিতে' একটি বিষম অভিমান জন্মায় যে, তাঁরা 'সবজান্তা'। শিক্ষা কম হলেও দেখানেপনাতে তাঁরা নিতান্ত দড়ো। 'বাবু'দের নির্দেশক সূচক সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন লেখক:

'সংসারে প্রবেশ করিবার সময়ে কিম্বা সংসারে প্রবেশ করিয়াও হিন্দু সন্তান কিম্ভূতকিমাকারই হইয়া উঠেন, আর সেই কিম্ভূতকিমাকারকেই আমি ''বাবু'' বলিয়া থাকি।'[৮০]

এই সকল 'কিম্ভূতকিমাকার' বাবুরা যে কেবল হিন্দুর ধর্ম-সংস্কৃতিকে অবহেলা করেন বা মান্যতা দেন না তাই নয়, এঁরা শাসকের দ্বারা উপকৃত হয়েও 'উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতাশূন্য'। লেখকের মতে, মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুরা 'ইংরেজী গন্ধে বাসিত' হয়ে সর্বার্থে 'ইংরেজের শিষ্যই হন'। ইংরেজের আদবকায়দা, আচার-আচরণ সব কিছুকেই এঁরা 'যথাশক্তি নকল' করেন, ইংরেজের গৌরবে গৌরবান্বিত হন, কিন্তু ইংরেজের প্রতি এঁরা আবার 'হাড়ে চটা'। অতএব, তাঁর মতে, 'বাবুর বুদ্ধি মার্জিত হয় বটে, কিন্তু সুশিক্ষা কিছুই হয় না'।[৮১] যার ফলে এই বিপত্তি ঘটে।

১৮৫৭-র বিদ্রোহের পর শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি ক্রমে ক্রমে শাসকের সদুদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হচ্ছিলেন এবং সরকারি চাকরির সুযোগ কমতে থাকায় ও নতুন চাকরির ক্ষেত্র তৈরি না হওয়ায় শাসকের বিরুদ্ধে তাঁদের ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। এর সঙ্গেই ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার হাত ধরে শেখা, জাতীয়তাবাদের উন্মাদনা। হতে পারে এই জাতীয়তাবাদ ভ্রান্ত, দিশাহীন, শাসক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিকল্পিত, তবুও শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি যে ক্রমশ বিক্ষুব্ধ হচ্ছিলেন এ সত্যও অস্বীকার করবার নয়। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর আত্মজীবনী 'সত্তর বৎসরে' (১৩৬২ বঙ্গাব্দ) জানিয়েছেন,[৮২] ম্যাৎসিনি এবং Young Italy-র সভ্যেরা নিজেদের মাতৃভূমিকে অস্ট্রিয়ার শাসন শৃঙ্খল থেকে কীভাবে মুক্ত করার চেষ্টা করেন— সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির মুখে সে কাহিনি শুনেই তাঁদের মনে নতুন স্বদেশ-প্রেমের প্রেরণা জাগে। শিবনাথ শাস্ত্রী এই প্রেরণাকে সম্বল করে একটি 'ছোট কর্মী বা সাধক দল' গড়বার চেষ্টা করেন। তিনি এই 'সাধক দলে'র জন্য যে প্রতিজ্ঞাপত্র তৈরি করে দেন তার মূল কথা হল, এবং

এক. প্রতিমা-পূজা না করা এবং তার কোনো ব্যাপারে যুক্ত না থাকা;

দুই. জাতিভেদ-অস্বীকার এবং তার দূরীকরণে চেষ্টা করা;

তিন. পরিবারে স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা;

চার. একুশ বছরের আগে বিবাহ না করা;

পাঁচ. স্ত্রীশিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষার প্রসার ঘটাতে সাহায্য করা;

ছয়. ব্যায়ামচর্চার প্রসার; এবং

সাত. ‘আমরা একমাত্র স্বায়ত্তশাসনকেই বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট শাসনব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করি; তবে দেশের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ কল্যাণের মুখ চাহিয়া এখন যে বিদেশীর রাজ-শাসন প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার আইনকানুন মানিয়া চলিব; কিন্তু দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্দশা দ্বারা নিপীড়িত হইলেও এই গভর্নমেন্টের অধীনে কখনই দাসত্ব স্বীকার করিব না।’[৮৩]

বস্তুত, এই প্রতিজ্ঞাপত্রকে তৎকালীন শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের মানসিক চাহিদা বলে গ্রহণ করতে পারি। শাসকের আইনকানুন ও শাসন মেনে নিয়েও তার অধীনতা অস্বীকার— এহেন দ্বৈত-বোধ, যাকে ‘সোনার পাথরবাটি’ও বলা যায়, বহন করে চলতেন শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্ভবত এই প্রবণতার প্রতিই কটাক্ষপাত করে থাকবেন।

‘পাঁচুঠাকুর’ গ্রন্থের (১৮৮৪-১৮৮৫) ‘পঞ্চানন্দের বক্তৃতা’ শীর্ষক রচনায় জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত অথচ শাসকশ্রেণির কৃপাভিক্ষু এবং পদতলাশ্রিত বাঙালি মধ্যশ্রেণির সমালোচনাগৃহে ইন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন এঁদের সুবিধাবাদী ভণ্ডামির স্বরূপ। বাঙালি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুরা সাহেবি-অনুসরণে সভাপ্রিয়। লেখক ব্যঙ্গ করে বলেছেন, ‘সকলেই যাহা দেখিতেছে, সকলেই যাহা শুনিতেছে, সকলেই যাহা জানিতেছে, তাহাই দেখিবার জন্য, তাহাই শুনাইবার জন্য, তাহাই জানাইবার জন্য বক্তৃতা করিতে হয়। ... আপনা-আপনি জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তরস্বরূপ একটা বক্তৃতাও করিতে হয়। বক্তৃতাই সমাজের জীবনীশক্তি।’[৮৪] তবে বক্তৃতায় মনের ভাব বুঝে-শুনে গোপন করেন মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত বাবুরা। বুঝে-শুনে কথা বলতে পারলে শাসকের উৎপীড়ন সইতে হয় না, সত্য কথা না বলে যেখানে ব্যক্তিগত লাভালাভ আছে, অথচ ‘সাপও মরে, লাঠিখানিও ভাঙে না’, সেখানে বাবুরা বক্তৃতা করতে বসে সত্য-মিথ্যার প্রয়োজনীয় ব্যবহারে আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন। তা ছাড়া ‘ইংরেজি ভাষা আর গোমাংস’ দুই-ই এঁদের উদরে বর্তমান, কিন্তু হিন্দুর ছেলে হয়ে হিন্দুসমাজে যাতে চলাফেরা করা যায়, অতএব দয়াপরবশ হয়ে এঁরা বাংলাতেও বক্তৃতা করে থাকেন। এবং এঁদের বক্তৃতার প্রতিপাদ্য এক, যদিও ভারতবাসী পরাধীন, তবুও শাসকশ্রেণি তথা ইংল্যান্ডের দয়ায় দেশের এবং জাতির সমধিক উন্নতি হয়েছে। তিনি ঠাট্টা করে বলেছেন, ‘ভারতবর্ষ পূর্ব্বকালে নিতান্ত অসভ্য ছিল, এ কথায় যে বিশ্বাস করে না, সে ইংরাজী ইতিহাস পড়ে নাই— ইংলন্ড তাহাকে সভ্য করিয়াছেন, ইহাও নিঃসংশয়।’[৮৫]

শাসকের চোখ দিয়ে দেশকে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন সেদিনের মধ্যশ্রেণির ‘ভদ্রলোক’বাবুরা। সে ইতিহাস ভ্রান্ত কি সঠিক— এই প্রশ্ন জাগেনি তাঁদের মনে। পাশ্চাত্যের প্রতি মোহ এত তীব্র ছিল যে, সাহেবদের প্রভাবে নিজ দেশ-কাল জাতি-কুল-মান সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে পরানুগত হয়েছিলেন তাঁরা। বহির্দেশীয় যুদ্ধে টাকার জোগান দেওয়াকেও শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি কর্তব্য বলে মনে করতেন। তার দরুন ভারতবর্ষের কোনো উন্নতি হচ্ছে কি না, এ জিজ্ঞাসা তাঁদের মনে জাগেনি। শাসকের নানান ভবন-নির্মাণে, বড়োলাট-ছোটোলাটের সপারিষদ সিমলা ভ্রমণে, রাজকার্যে অর্থের জোগান দেওয়ার ব্যাপারে কোনো ক্ষোভও স্বভাবতই এঁদের মনে দেখা দেয়নি। তার বদলে শাসকশ্রেণি আমাদের দিয়েছে শিক্ষা, জ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতির বোধ। পঞ্চানন্দের ভাষায়:[৮৬]

‘পূর্ব্বে ভারতবর্ষ অরাজক ছিল...। এখন সে দুর্দ্দশা নাই; ভারতবাসী রাজনীতি জানে, সমাজনীতি বোঝে, ধর্মনীতির বিচার করে, অথচ রাজ্যের চিন্তা তাহাকে করিতে হয় না, ইংলন্ড স্বয়ং ভারতের হইয়া সেটা করিয়া লন; সমাজের জন্য তাহাকে ভাবিতে হয় না, ভগবান্ এক প্রকার চালাইয়া লন; আর ধর্ম্মের

ভার লইতে হয় না, খোলা হাওয়ায়, খোলা প্রাণে দুইটা উচ্চ-বাচ্য করো, উত্তম, না করো, নাই। এ সুখের কর্তা— ইংলন্ড।'

মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত বাবুরা স্বার্থের কারণেই ইংরেজ শাসকের মুখাপেক্ষী ছিলেন। শিক্ষার দরুন স্বাভাবিক উপায়ে জীবিকা অর্জন যতই অসম্ভব হচ্ছিল, ততই শাসকের গুণকীর্তনকারী, চাকরিপ্রার্থী বাঙালিবাবুর সংখ্যাবৃদ্ধি হচ্ছিল। পাশাপাশি ছিল আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল বাঙালিবাবুদের জাতীয়তাবাদী ভাববিলাস, যে জাতীয়তাবাদ আবার শাসকের দ্বারাই পরিকল্পিত। পঞ্চানন্দ শাসক প্রকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে 'রাজভক্তি শিখাইবার ব্যবস্থা' বলে কটাক্ষ করেছেন। সমকালীন বাবুদের মধ্যে ফলত রাজভক্তির কোনো কমতি ছিল না। তাঁদের অন্তর্সংগীত ছিল: [৮৭]

'খাও পরো টেক্স দাও,
গৌর-প্রেমে মত্ত হও,
রাজনীতি, রাজনতি, গৌররূপে কর মতি,
গৌর করিবেন গতি, চরণে শরণ নাও।'

সবদিক দিয়েই সাহেব-প্রভুর নকল করার মানসিকতা রক্ষণশীল সামাজিকেরা সহজেই মেনে নেননি। 'ন্যাকারামের পত্র' রচনায় বিলেত ফেরত বাঙালি ব্যারিস্টার চৈতন্য চরণ দাসের মাধ্যমে এই শ্রেণিকে উপহাস করেছেন ইন্দ্রনাথ। চৈতন্য চরণ দাস সাহেবি মতে নিজের নাম সম্পূর্ণ না বলে বিকৃত উচ্চারণে বলেন, 'ছি ছি ড্বস্।' পঞ্চানন্দ তাঁকে 'বাবু' বলে সম্বোধন করায় ছি ছি ড্বস্ যারপরনাই রুষ্ট হয়েছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, 'বাবু' শব্দটির অর্থ সামাজিক অধোগতির কারণে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের চক্ষুশূল হয়ে পড়েছিল। মদ-মাংসে আকণ্ঠ ডুবে থাকা ছি ছি ড্বস্ও তার ব্যতিক্রম নয়। এই শ্রেণির বাবুদের প্রতি পঞ্চানন্দ তথা ইন্দ্রনাথের উপহাসে ক্রোধ আছে, সমবেদনা নেই, জ্বালা আছে, অনুশোচনা নেই; ব্যঙ্গের বিষাক্ত হুল আছে, গোপন অশ্রুজল নেই। নতুন যুগের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুরা কোনোমতেই সমাজের বৃহৎ অংশের সমবেদনার পাত্র হয়ে উঠতে পারেননি। হয় অপমান, কিংবা উপহাস, নয় উপেক্ষাই তাঁদের প্রাপ্তিযোগ ঘটেছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, বাবুত্বকে সাধারণ সামাজিক আর গৌরবজনক, অনুকরণযোগ্য মনে করছেন না, ফলে বাবুর প্রতি, বাবুয়ানির প্রতি সমবেদনাহীন তীব্র ও নির্মম ব্যঙ্গে দ্বিধাহীন তাঁরা।

ইংরেজ প্রকল্পিত ও প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার ফলেই যে হিন্দু বাঙালি মধ্যশ্রেণির এই পরিণতি, এ বিশ্বাসে অবিচল ছিলেন ইন্দ্রনাথ। 'ভদ্র লোকের ছেলে মানুষ করিবার প্রকরণ' শীর্ষক রম্যরচনায় দেখা যায়, ঘোষেদের ছোটো বউয়ের ছেলে ননীগোপাল পাঁচ বছর বয়সে 'বাঙ্গলা বিদ্যালয়ে' ভর্তি হয়ে কড়ানিয়া, ষট্‌কিয়া, নামতা, বাংলা ইত্যাদি শিখলেও পরকালের খাতিরে বাড়িতে 'উপশিক্ষক' রেখে ইংরেজি শিখেছে। অতি ভোরে উঠে সামান্য জলযোগ করে ননীগোপাল পড়াশোনা করতে বসে; ন'টায় স্নান-আহার করে বিদ্যালয়ে গিয়ে 'পড়া দেয়, আবার পড়া লয়'। বিকেলে বাড়ি ফিরেই গৃহশিক্ষকের কাছে আবার 'কোমল প্রাণ সমর্পণ করে'। এভাবেই দশ বছর বয়স হতে না হতেই ননী 'বাঙ্গালা সাহিত্যে পারদর্শী, বাঙ্গালা ব্যাকরণে কৃতবিদ্যা, প্রাচীন ও নব্য সমগ্র ইতিহাসে ব্যুৎপন্ন, ভূগোলে নখদর্পণ, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারে তৎপর, অর্থনীতি শাস্ত্রে পণ্ডিত, পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ক্ষেত্রব্যবহার, জরীপ, স্থিতিবিজ্ঞানের যন্ত্রজ্ঞান, গণিত-বিজ্ঞানে বেগমান্ প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধকাম হইয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্যেও উন্নতি করিতে লাগিল।'[৮৮] এবং বিশ বছর বয়সেই কৃতবিদ্য হয়ে

ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে লাভ করল জ্বর, শিরঃপীড়া, উদরাময়, অগ্নিমান্দ্য। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের পুঁথিগত শিক্ষা হলেও, জীবনে বাস্তবতার শিক্ষা তাঁরা অর্জন করেন না। তার কোনো সুযোগ ইংরেজি প্রকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থায় নেই। ফলে মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত বাবুরা যথার্থ মানুষ না হয়ে, ইন্দ্রনাথের ভাষায় 'কিম্ভূতকিমাকার বাবু' হয়ে ওঠেন।

উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রলোকের শিক্ষাচিন্তা কোনোদিনই বিশুদ্ধ জ্ঞানকেন্দ্রিক ছিল না, তা ছিল উপযোগিতাবাদভিত্তিক। ইংরেজি শিক্ষার হাত ধরে বাঙালি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি যখন শাসকের অনুগত এক বশংবদ শ্রেণির জন্ম দিচ্ছে, তখন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শাসকের শাসনকে এবং বিজাতীয় ভাষার শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করে একের পর এক বিদ্রোহ, অসন্তোষ, প্রতিবাদ দেখা দিচ্ছে।[৮৯] মাতৃভাষায় শিক্ষাদান সংক্রান্ত 'উড্ ডেসপ্যাচে'র সীমিত সুপারিশের আগেই ১৮৪৭ সালে বোম্বেতে জগন্নাথ শঙ্কর শেঠ, ফ্রামজি কাওয়াসজি ও মোহম্মদ ইব্রাহিম স্যাকরার মতো শিক্ষা সংস্কারকেরা মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার পক্ষেও সওয়াল করেছিলেন।[৯০] বাংলায় কিন্তু চিত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সামান্য দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া বাঙালি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও সমর্থন ছিল চোখে পড়ার মতো। দেশের অন্যপ্রান্তের অধিবাসীরা যখন নিজ নিজ জাতিসত্তার সংরক্ষণ ও বিকাশে যত্নবান, তখন বাঙালি মধ্যশ্রেণির বাবুরা স্বীয় সংস্কৃতি পরিত্যাগ করে অতিদ্রুত অভ্যস্ত হয়ে পড়ছেন বিজাতীয় সংস্কৃতিতে। শাসকের স্বার্থরক্ষার তল্পিবাহক হিসাবে এইসব বাবুদের ভূমিকা যে যথেষ্ট নিন্দনীয়, একথাই বারবার মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লেখকেরা।

কলিযুগে বিষ্ণুর দশ অবতারের মতো বাবুরাও দশরূপ প্রাপ্ত হবেন, এ কথা জানিয়েছিলেন বঙ্কিম। উক্ত দশরূপের কয়েকটির ঈষৎ কৌতুকজনক চিত্রদর্শনের সুযোগ মেলে বিপিনবিহারী বসু রচিত 'বিটকেলের দপ্তর' (১৮৮৭) নামক রচনায়। এটি বিশুদ্ধ রম্যরচনা, নকশা নয়।[৯১] কেরানিবাবু, সাহেববাবু, দালাল, উকিলবাবু, ডাক্তারবাবু, বিশুদ্ধবাবু, ব্রাহ্মবাবু— এই সাত শ্রেণির বাবুর সংক্ষিপ্ত রূপরেখায় লেখক এঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন, উপহাস করেছেন, তবে সে উপহাসে বঙ্কিমের কমলাকান্তের মতো ক্রোধ ও অশ্রু যুগপৎ অপেক্ষা করে নেই। লেখক সহাস্যে এইসব বাবুদের পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং নিরাসক্ত চিত্তেই পর্যবেক্ষণের ফল প্রকাশ করেছেন। উনিশ শতকের শেষ পাদে পৌঁছে বাঙালি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির স্বাভাবিক পরিণতি ছিল, কেরানিগিরি। সরকারি চাকরির সুযোগ সংকুচিত হওয়ায়, বেসরকারি সাহেবি প্রতিষ্ঠানে স্বল্পমূল্যে, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা-অপমান সয়ে, অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হত বঙ্গীয় কেরানিকুলকে। তৎসত্ত্বেও প্রতিবাদী হয়ে ওঠার সৎসাহস দেখানো সম্ভব ছিল না, তাহলে কর্মচ্যুত হতে হবে। অতএব মূক পশুর মতো সাহেব-মনুষ্যের অত্যাচার ও গঞ্জনা সহ্য করে, কিল খেয়ে কিল হজম করে কেরানিকুল আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। বাঙালিবাবুদের দশরূপের ক্ষেত্রে কেরানিবাবুদেরই সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। 'বিটকেলের দপ্তরে' বাবুশ্রেণির সেই মানহীন সর্বাধিক সংখ্যক প্রতিনিধির চিত্রকে প্রথমে উপস্থিত করে লেখক কালের অমোঘ সত্যকে ঘোষণা করেছেন।

'কেরানী রহস্য' রচনায় কেরানিদের 'পশ্বাবলির ভিতরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' বলা হয়েছে।[৯২] 'ঠিক মানুষের মতন' দেখতে কেরানিদের প্রসঙ্গে লেখক মন্তব্য করেছেন, 'কেরানী বানরজাতি হইতে অনেকাংশে উচ্চশ্রেণীর এবং অনেকটা মনুষ্যজাতির নিকটবর্ত্তী।'[৯৩] এই মন্তব্যে কোথাও একটা নিরুদ্ধ বেদনা অপেক্ষা করে আছে,

কিংবা রয়েছে আত্মগ্লানি; কিন্তু বিষবৎ ক্ষোভে তা ফেটে পড়েনি। কেরানিকুলের বৈশিষ্ট্য হিসাবে লেখকের মত হল,—

এক. মানুষের মতোই কেরানিরা হাসে, কাঁদে, খায়-দায়, গান গায়, কর্মকাজ করে এবং 'ঘুমায় ও মরে।'

দুই. বনে-জঙ্গলে নয়, এঁরা বাস করেন মূলত সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে যে যেস্থানে অর্থাৎ নগর-সভ্যতার কাছাকাছি।

তিন. কলকাতার রাস্তায় সকাল নয়টা থেকে দশটার ভিতর এঁদের দেখা পাওয়া যায়। অন্যসময় এঁরা বাড়ির বৈঠকখানায় কিংবা 'রকে' বসে আড্ডা মারে অথবা ঘুরে বেড়ায়। তবে নিয়মিত সময়ে কর্মস্থলে হাজির হতেই হয়।

চার. কেরানিরা গৃহে স্ত্রীর কাছে পুরুষ, কর্মস্থলে প্রভুর কাছে স্ত্রীলোকের ন্যায়। প্রয়োজনে প্রভুর লাথিঝাঁটা অবলীলায় হজম করে।

পাঁচ. কেরানিবাবুদের প্রভুভক্তি অতুলনীয়। সাহেব-প্রভুদের ভর্ৎসনায় এঁরা রুদ্ধবাক্ থাকেন, আবার সাহেব একটু হেসে কথা বললে, এঁরা বিগলিত হন এবং দীর্ঘদিন ধরে এই গল্প আত্মীয়পরিজন, বন্ধুবান্ধবের কাছে বলে চলেন। এঁদের মধ্যে আবার যাঁরা ভাগ্যবান, লেখকের ভাষায়,'গোদা', তাঁরা বুদ্ধিগুণে প্রভুর প্রিয় হয়ে ওঠেন এবং তাতেই লাভ হয়।

ছয়. মাত্র ২০/৩ টাকাতেই এঁরা মুখ বুঝে প্রাণপাত করেন।

সাত. কারোর কারোর 'আদমরা গোচের খোঁড়া এবং ''পিঁড়ে'' ও ''বারকোষ'' যোড়া গাড়ি আছে।'

আট. মরণকালের কাছাকাছি সময়ে প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ কেউ কেউ টাইটেল বা উপাধি লাভ করে।

নয়. কেরানিদের মধ্যে 'মুচ্ছুদ্দি' বাবুরা একটু অবস্থাপন্ন (লক্ষণীয়, আগেকার মতো মুৎসুদ্দিরা আর আর্থিক ক্ষমতাবলে অভিজাত বাবু শ্রেণিভুক্ত নয়, তাঁদের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে কেরানিবাবুর শ্রেণিতে)।

দশ. কেরানিরা তাঁদের সন্তানকেও সযত্নে কেরানিবাবুতেই পরিণত হবার শিক্ষা দেয়।

ঈষৎ ব্যাঙ্গের সঙ্গে লেখক কেরানিবাবুদের মর্মান্তিক জীবন-সত্যকে উদ্‌ঘাটন করেছেন। নতুন অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাসে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের যে নিতান্ত সামাজিক মর্যাদাটুকুও নেই, কেরানিবাবুদের জীবনচিত্র তারই প্রমাণবাহী। যদিও সমাজতাত্ত্বিক বিনয় ঘোষ কেরানিদের প্রসঙ্গে গ্রিফিনের ১৮৪০-এ লেখা সাক্ষ্য উদ্ধার করে জানিয়েছেন, উনিশ শতকে কোম্পানি আমলে বাঙালি কেরানিদের পদমর্যাদা ও সম্মান কম ছিল না।[১৪] এঁরা ছিলেন ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম কর্মসহায়ক শ্রেণি। তবে ১৮৪০-এর দিকে গ্রিফিনের সূত্র অনুযায়ী বাঙালি কেরানিদের বেতন যেখানে ছিল ৪ থেকে দশ, কোথাও আট থেকে কুড়ি; সেখানে ইউরোপীয় কেরানিরা পেতেন ৬০ থেকে ১০০ টাকা। বিনয় ঘোষের মতে,[১৫] বেতনের এই দু'টি ক্রম সম্ভবত' 'লোয়ার' ও 'আপার' এই দুই ক্ষেত্রের কেরানিদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে কেরানিবাবুদের মর্যাদা কমতে থাকে সন্দেহ নেই। বেতন হারও যে বাড়েনি আদৌ, তার প্রমাণ, ১৮৮৭ সালে কেরানিদের বেতন ২০ থেকে ৩০ টাকার মধ্যে।[১৬] বাঙালি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুরা তবুও যে কেরানি হবার আশা রাখতেন, পরবর্তী প্রজন্মকেও কেরানি হবার জন্য উৎসাহ দিতেন, এর দরুন প্রমাণিত হয়, বাঙালি মধ্যশ্রেণি যতই পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শ লাভ করুন না কেন, পরমুখাপেক্ষী এবং

পরাশ্রিত থাকাটাই তাঁদের মনোগত অভিপ্রায়। শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হতে বাঙালি শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের যে প্রায় দেড়শো বছর লেগে গিয়েছিল, তার মূলেও এই পরাশ্রিত মানসিকতা।

অবশ্য সাহেবদের কাছে যতই লাঞ্ছনা-গঞ্জনা জুটুক না কেন, সাহেব সাজা বাঙালিবাবুরা স্বদেশীয়দের কাছে আদবকায়দার বাড়াবাড়ি এবং বাগাড়ম্বরের প্রাবল্য দেখিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতেন। 'বাঙালি সাহেব' রচনার 'নেকড়া চণ্ডী' সাহেব হয়ে আসার পর 'রূপান্তর প্রাপ্ত' হয়েছেন— 'টিপে টিপে কথা তাও আবার ঈষৎ এড়ো এড়ো ঈষৎ গম্ভীর; ও ঈষৎ ফিক্ করে হাসি, আবার এক চোখে পরকলার ভিতর হইতে কাকাতুয়া পাখির মতন ''চাহনি''।'[৯৭] লালমুখো মাতব্বর গোছের সাহেবের সঙ্গে সকলে তিনি দেশীয় লোককে অগ্রাহ্য করতে দ্বিধা করেন না। আবার লুকিয়ে 'জঘন্য গলি'তে ক্লায়েন্টের কাছেও যেতে বাধে না এঁদের। তাঁদের মনোভাব হল, 'ব্রহ্মশাপে আমরা জাতিতে বাঙ্গালী; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, অর্থাৎ যদি বুঝে ও ঠাউরে দেখ, আমরা সাহেব।'[৯৮] মামলা-মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে এঁরা প্রয়োজনে বাদী প্রতিবাদীর রুধির শোষণ করেন। আবার শিক্ষিত বিলেত ফেরত বলে সভায় সভাপতিত্ব করা এবং বক্তৃতা দেওয়াও এই বাবুদের সবিশেষ শখ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এঁরা কতদূর প্রকৃত শিক্ষিত সে বিষয়ে লেখক সন্দিহান, কারণ, এঁরা দেশের কোনো উপকারে আসেন না। লেখক বলেছেন,

'যিনি সাহেব হইয়া আসেন তিনিই ভাবেন যে আমি সভ্য জগতের অধিবাসী। আমি উক্ত শ্রেণীর জীব, অমি কি করিয়া তৈলচর্ব্বিত কৃষ্ণকায় বাঙ্গালীবাবুর সহিত সমশ্রেণীভুক্ত হইব।'[৯৯]

এই কারণে বিলেত ফেরত সাহেব-বাঙালিবাবুর দ্বারা দেশের ও জাতির কোনো উপকার সম্ভব নয়। দেশীয় জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি শ্রেণি হিসাবে বাঙালি সাহেববাবুরা আপন অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন, এখনও রাখেন। কিন্তু আপামর দেশ এঁদের দেশের অঙ্গ বলে স্বীকার করেন কি না সে বিষয়ে এঁরা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বঙ্কিমচন্দ্রও 'লোকরহস্যে' এই শ্রেণির বাবুদের নিদারুণ ব্যঙ্গ করেছিলেন। 'বিটকেলের দপ্তরে'র লেখকও সদৃশভাব প্রকাশ করে, বাঙালি সাহেববাবুদের মানসিক অ্যালিয়েশনকে 'অসার' প্রতিপন্ন করেছেন।

'বিসর্গ' নামক রচনায় দালাল-বাবুদের সহাস্য চিত্র উপস্থিত করেছেন লেখক। এঁদের সংখ্যা বাঙালি জীবনে সুপ্রচুর। এই বাবুরা যেন সর্বঘটে কাঁঠালি কলা; আশ্চর্য উপায়ে সব মুশকিল আসান করাই এঁদের কাজ। কুরূপ ও কুশিক্ষিত ছেলের বিবাহই হোক কিংবা সম্পাদক হিসাবে অসার বক্তৃতার প্রশংসাসূচক সমালোচনাই হোক, এঁদের জুড়ি মেলা ভার। মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনে ভোট জোগাড় করা, নামযশপ্রত্যাশী অর্থবান অথচ গুণহীন বাবুকে সংবাদপত্রের কল্যাণে প্রতিষ্ঠা দেওয়া, সাধারণ ডাক্তারের মিথ্যা সুখ্যাতির বর্ণনা করে পসার জমিয়ে দেওয়া। এই শ্রেণির 'বিসর্গ' বাবুদের একমাত্র কাজ। অবশ্য এসব কাজের বিনিময়ে তাঁদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহও হত। লেখক বারংবার প্রকারান্তরে সংবাদপত্রের সম্পাদককে মিথ্যাচারী, তোষামুদে বলে সুযোগসন্ধানী মুশকিল আসান দালাল বাবুদের স্বগোত্রে স্থাপন করেছেন, তা চোখে পড়ার মতো।

সুমিত সরকার দেখিয়েছেন,[১০০] উনিশ শতকের শেষদিকে কলকারখানা ছিল হাতে গোনা, যেটুকু ছিল তাতেও উচ্চপদগুলি নির্দিষ্ট ছিল ইউরোপীয়দের জন্য এবং শ্রমিক হিসাবে পছন্দ ছিল অবাঙালি ভিনরাজ্য থেকে আসা মানুষেরা, কারণ কঠোর পরিশ্রমের কাজে বাঙালির বিশেষ দক্ষতা ছিল না। যাকে বলে Capitalist farming তার কোনো অস্তিত্বই ছিল না তখনও পর্যন্ত, সৈন্যদলেও সামান্য কিছু বাঙালিই

ছিলেন। এমতাবস্থায় সরকারি এবং বিশেষ করে বেসরকারি ফার্মে উচ্চ ও নিম্নপদে বাঙালি মূলত কেরানি হিসাবে কাজ করতেন। কিন্তু এই পদগুলির সম্মান কিছু ছিল না, বেতনও ছিল কম। ফলে আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল বাঙালি মূলত ঝুঁকেছিলেন ওকালতি, ব্যারিস্টারি কিংবা ডাক্তারি পড়ার দিকে। সামান্য কিছু সংখ্যক এখন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার দিকে যেতেন, কারণ দেশে ভারী যন্ত্রশিল্প বা তৎসম্পর্কিত শিল্পের ভবিষ্যৎ তখনও ছিল সংশয়াচ্ছন্ন। ইংরেজ সরকার এদেশকে মূলত কাঁচামালের জোগানদারে পরিণত করার পরিকল্পনা নেওয়ায়, এদেশের শিল্পস্থাপনে তাঁদের বিশেষ উৎসাহ চোখে পড়েনি। স্বাধীন ব্যাবসা কিংবা পেশা হিসাবে ওকালতি ও ডাক্তারি ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ব্যারিস্টারি পড়ার সঙ্গে বিলেতযাত্রার সম্পর্ক থাকায় তা ছিল মুষ্টিমেয় অর্থবান কিছু মানুষের সামর্থ্যের আওতায়। বাদবাকি সাধারণ স্বচ্ছল মধ্যশ্রেণি ওকালতি ও ডাক্তারি পেশায় ঝুঁকেছিলেন। পরিবর্তনশীল সামাজিক জীবনে সম্পর্কের অবনতি, পারিবারিক ভাঙন কিংবা সামাজিক বিপর্যয়জনিত কারণে মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা বেড়েই চলেছিল। এও আসলে অর্থনৈতিক দুর্দশাগ্রস্ত কোনো সমাজের মানসিক অসহিষ্ণুতারই লক্ষণ। পাশাপাশি এদেশে জনস্বাস্থ্যের ব্যাপারটি অবহেলিত হওয়ায় ডাক্তারের চাহিদাও ছিল। উকিলরা ক্রমশই স্বতন্ত্র শ্রেণি হিসাবে সমাজের চোখে প্রতিভাত হতে থাকেন। বলা বাহুল্য, সেই দৃষ্টিকোণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল নঞর্থক। এই পেশায় নিযুক্ত মানুষদের মক্কেলদের স্বার্থরক্ষা করাই বিধেয়। তা করতে গিয়ে অসতের পক্ষে মামলায় সওয়াল জবাব করতে গিয়ে এঁরা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। এভাবেই উকিলবাবুদের সঙ্গে অসততার প্রসঙ্গটি একাকার হয়ে গেছে। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির এই  অংশের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি একইসঙ্গে ভয় ও অশ্রদ্ধার।

'বিটকেলের দপ্তরে'র  লেখক 'উকিলবাবু' শীর্ষক রচনায় এঁদের সমুদ্রমন্থনে উত্থিত গরলের চেয়েও ভয়ানক আখ্যা দিয়েছেন।[১০১] অতঃপর সূত্রাকারে তিনি উকিলবাবুদের চরিত্র-মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন,—

এক. সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উকিলবাবুদেরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে, কারণ লোকের সুখ-দুঃখ দুই-ই বেড়েছে একালে।

দুই. উকিলবাবু আর্থিক দিক থেকে বেশ সংগতিপন্ন, অতএব 'বড়লোক'। তবে 'উকিলবাবুর সহিত আলাপ খুবই ভাল কিন্তু কারবার অতি খারাপ।'[১০১]

তিন. আইন বিষয়ে অজ্ঞ লোকদের পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে ইনি ব্যাবসায় লাভের মুখ দেখেন, যদিও বাদী-প্রতিবাদীর ক্ষেত্রে 'পরিণামে প্রায়ই অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়'।

চার. উকিলবাবুদের মন রবারের মতো 'স্থিতিস্থাপক'। সৎ-অসতের বিচার না করে এঁরা কেবল অর্থপ্রাপ্তির উপায়টুকু ভাবেন।

পাঁচ. লোকের বিপদে উকিলবাবু আহ্লাদিত হন, কিন্তু বিপদ না হলে তাঁর দুঃখের অন্ত থাকে না।

ছয়. উকিলবাবুদের মধ্যেও দু'টি শ্রেণি— যাঁদের পসার ভালো (কারণ তাঁরা মামলায় সহজেই জয় এনে দিতে পারেন) এবং যাঁদের পসার অতি সাধারণ (এঁরা মামলায় জয়লাভের ব্যাপারে তেমন কৃতবিদ্য নন)। যাঁরা পায়ে হেঁটে, বগলে পাগড়ি নিয়ে আদালতে আসেন, তাঁদের অবস্থা লেখকের মতে, 'বিল সরকারের কাছাকাছি অতি শোচনীয়।'

সাত. মামলার ক্ষুধা, অর্থের ক্ষুধা, পসার জমানোর ক্ষুধা এঁদের নিত্যসঙ্গী।

আট. কোনো কোনো উকিলবাবু পসার জমিয়ে নাম করতে পারলে মুন্সেফ কিংবা অনুবাদকের কর্মে নিযুক্ত হন।

নয়. সামান্য মামলা উপলক্ষ্যে এঁরা বাদী-প্রতিবাদীদের লক্ষ লক্ষ টাকা নয়ছয় করতে উৎসাহ দেন। সে টাকার সিংহভাগ এঁদেরই করায়ত্ত হয়।

দশ. বড়ো উকিলের অধীনে ছোটো উকিলরা কাজ করেন এবং বড়ো উকিলদের কাছ থেকে 'শিকার ধরবার' শিক্ষা নেন। এবং

এবং এগারো. 'ব্যাবসায়ের অনুরোধে উকিলবাবুর তর্কশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করা চাই; বাক্যশাস্ত্র ইনাদের অন্ধের যষ্টি।'[১০৩] কথা বেচেই এঁরা জীবিকা নির্বাহ করেন।

উনিশ শতকের শেষদিকে অর্থ-বিত্ত-প্রতিপত্তিতে উকিলবাবুরা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের 'এলিট' শ্রেণিভুক্ত। কিন্তু তাঁদের পসার-প্রতিপত্তি সত্ত্বেও সাধারণের বিচারে তাঁরা খুব সম্মানীয় ব্যক্তি নন বোঝা যাচ্ছে। কেউ কেউ মনে করেন, 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত চাপে ব্যবহারজীবীদের প্রতিষ্ঠা উন্নতই ছিলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নব্যসংস্কৃতি সম্পন্ন ব্যক্তিদের এই বৃত্তির উপর আকর্ষণ সৃষ্টি করে। ফলে কেরানিগিরির মতো ওকালতীতেও নব্য সংস্কৃতিবান্‌দের অনেকে ঝুঁকেছিলেন। তাই এই বৃত্তির মধ্যেও কেরানিগিরির মতো দুর্দশার সৃষ্টি হয়েছে।'[১০৪] কিন্তু কেবল সংখ্যাবৃদ্ধির ফলেই কেরানিদের মতো উকিলবাবুরা দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছেন, এমনটি নয়। ওকালতি স্বাধীন ব্যাবসা এবং ব্যক্তিগত দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করে এই পেশায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। পসারওলা উকিলরা বহুমূল্য দক্ষিণা নেবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সাধারণ উকিলবাবুরাও ব্যক্তিগত দক্ষতা না থাকা সত্ত্বেও অল্প সময়ে অধিক মক্কেল এবং অধিক মক্কেল মানেই অধিক উপার্জন, এই ধারণার যাবতীয় কু-কর্ম ও অসত্য ভাষণ থেকে তাঁদের বিরত রাখা যায়নি। অর্থের লোভেই এঁদের চারিত্রিক বিকার ঘটে। বিপদে পড়ে মানুষ এই শ্রেণির উকিলবাবুদের শরণাপন্ন হলেও সামাজিক সম্মানদৃষ্টি থেকে এঁরা বঞ্চিতই থেকে যান। চারিত্রিক অসদাচারের কারণে অপাঙ্‌ক্তেয় উকিলবাবুরা স্থানে-অস্থানে সমালোচিত হয়েছেন। বিটকেলের দৃষ্টিতে যে অশ্রদ্ধা উকিলবাবুদের প্রতি নির্দিষ্ট হয়েছে, তাকে শুধু হাস্যরসের দৃষ্টিকোণে দেখলে হবে না, এ দৃষ্টিভঙ্গি নিছক ব্যক্তিগতও নয়, তাবৎ সমাজের বড়ো অংশই সেদিন এবং আজও উকিলবাবুদের অসম্মানজনক দৃষ্টিতেই দেখেন।

কলকাতার গঠনযুগে সামগ্রিকভাবে নগরের জনস্বাস্থ্য ছিল ভয়াবহ। ১৮২৩ সালে কলকাতায় আগত বিশপ হেববার কলকাতার জনস্বাস্থ্য ও আবহাওয়া সম্পর্কে যে চিত্র উপস্থিত করেন, তা পূতিগন্ধময় নরক বলেই মনে হতে পারে।[১০৫] শাসকেরা নিজেদের সুবিধার্থে প্রাথমিকভাবে কিছু ইউরোপীয়দের দ্বারা পরিচালিত ইউরোপীয়দের জন্য হাসপাতাল স্থাপন করেন। কিন্তু দেশীয় মানুষের ওইসব হাসপাতালে চিকিৎসার অধিকার ছিল না। কিন্ত দেশীয়দের প্রতি এই বঞ্চনা দীর্ঘদিন চালানো সম্ভব হল না। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর কলুটোলার ফৌজদারি বালাখানায় নেটিভ হাসপাতালের কাজ শুরু হয়, যদিও প্রয়োজনের তুলনায় এই উদ্যোগের আয়তন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এইসব হাসপাতালের ডাক্তাররা ছিলেন প্রায় ইউরোপীয়। কিন্তু স্বাস্থ্য ও সুষ্ঠুতার তাগিদে বাঙালিরা এই পেশা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারলেন না। ১৮৩৬ সালের ১০ জানুয়ারি পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত প্রথম বাঙালি হিসাবে শব-ব্যবচ্ছেদ করে এই পেশা সম্পর্কে বাঙালিদের ভয়-ভীতি-সংস্কার দূর করতে সাহায্য করেন। অন্যদিকে ১৮৪৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর

‘মেডিক্যাল কলেজ হসপিটাল’-এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন লর্ড ডালহৌসি। নতুন দিনের আহ্বান করতে পেয়েছিলেন শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুরা। এইসময় থেকেই বাঙালিদের মধ্যে ডাক্তারি পেশাটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে থাকে। দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৩৬-এই মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের বৃত্তি দেবার কথা ঘোষণা করেন। এই অনুযায়ী চারজন ছাত্র, ভোলানাথ বসু, দ্বারকানাথ বসু, গোপালচন্দ্র শীল এবং সুরজিৎকুমার চক্রবর্তী ডাক্তারিতে উচ্চ শিক্ষার কারণে ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। শিক্ষিত বাঙালি মধ্যশ্রেণি অতঃপর যাবতীয় সংস্কার ত্যাগ করে ১৮৪৮ সালের দিক থেকে এই পেশায় দ্বিধাজড়িত পদক্ষেপে প্রবেশ করেন। ‘ডাক্তারবাবু’দের সেই সময় থেকেই শ্রদ্ধার চোখে, বিস্ময়ের চোখে দেখা হত। কিন্তু ক্রমশ ওকালতির মতো ডাক্তারিতেও প্রতিযোগীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং পসার জমা ও না-জমা ডাক্তারদের মধ্যে বিভাজন তৈরি হয়। সেবা-ধর্মের চেয়ে আর্থিক দিকটিই ডাক্তারবাবুদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাঁদের আচার-আচরণও যায় বদলে। উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকেই ডাক্তারবাবুরা সমাজজীবনে প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃত হলেও, তাঁদের আত্মকেন্দ্রিকতা, অর্থকরী বিষয়ে উৎকট মানসিকতা, দাম্ভিকতা ইত্যাদি নানান কারণে শ্রদ্ধার আসনটি দ্রুত হারাতে থাকেন। বঙ্কিমের আমলেই অর্থাৎ ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দেই এই রূপান্তর স্পষ্ট হয়েছে, ফলে ‘বাবু’তে বিষ্ণুর নবদশঅবতার প্রসঙ্গে ডাক্তারবাবুর প্রসঙ্গটিও আসে। বলা বাহুল্য, সে উল্লেখে নিছক ব্যঙ্গবিদ্রূপ নয়, উপহাস নয়, করুণাসিক্ত ক্ষমাহীন অন্তর্জ্বালাও আছে।

‘বিটকেলের দপ্তরে’র লেখক ‘ডাক্তারবাবু’ শীর্ষক রচনায় ডাক্তারবাবুকে দেখেছেন কিছু মিঠে-কড়া উপহাসের রঙিন চশমায়। তাঁর চোখে আপাতভাবে ডাক্তারবাবু ‘বেশ লোক’, তবে ‘স্বভাবত’ তাঁকে ‘বেশ লোক’[১০৬] বলা যায় না। তবে, ‘ব্যাবসায়ের অনুরোধে তাঁকে সামাজিক হইতে হইবে, দু’টো বাজে কথা কইতে হইবে আর আয় বৃদ্ধির জন্য অনেকরকম ‘‘চাল’’ শিখিতে হইবে তাহা না হইলে সব মাটি হইয়া যাইবে।’[১০৭] যে পাড়ায় একজন ডাক্তারবাবুর একাধিপত্য, সে পাড়ার ডাক্তারবাবুর মনে ঘুম থাকলেও, যেখানে সংখ্যাটি বেশি, সেখানে ডাক্তারবাবুরাও স্বভাবতই অসুখী। কারণ উনিশ শতকের শেষার্ধে পৌঁছে ডাক্তারি আর সেবামূলক কাজ নয়, পেশা। আর পেশা ক্রমেই ‘ব্যাবসায়ে’ পরিণত। লেখকের মতে, ‘বিদ্যা অর্থকরী হইলে অনেকসময় সে বিদ্যার দর কমিয়া যায়।’[১০৮] ডাক্তারি পেশার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। যাঁদের দু’চার পয়সা আর্থিক সম্বল আছে, তাঁরা নিজেরাই ব্যয় করে ডাক্তারখানা খুলে রোগীর অপেক্ষায় পথ চেয়ে থাকেন। বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়বর্গের সহায়তায় ‘ক্রমে ক্রমে দশ জনের নজরে’ পড়লে ডাক্তারেরও পসার আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়। ডাক্তারদের প্রসঙ্গে বারবার অর্থকরী প্রসঙ্গ তোলায় এবং অর্থকরী প্রয়োজনেই এই পেশার অবনমন ঘটার কথা বলায় বেশ বোঝা যাচ্ছে, নতুন যুগে বাবুর বাবুত্ব মূলত ‘অর্থকরী’ লাভালাভের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এর সঙ্গে মানসিক রুচি-স্বাতন্ত্র্য কিংবা বংশানুক্রমিক আভিজাত্যের কোনো সম্পর্ক নেই। বাবুরাও আর্থিক মাপকাঠির দ্বারা চিহ্নিত হচ্ছেন এবং উক্ত মাপকাঠিতেই তাঁদের পদমর্যাদা নির্দিষ্ট করছে সমাজ। সেবাধর্মের প্রতি এই শ্রেণির আনুগত্য ও একনিষ্ঠতা না থাকলেও, কী করে অর্থের আগমন ঘটে, সে বিষয়ে তাঁরা আত্মসচেতন।

আর্থিক লাভালাভের কারণেই তাঁরা সুচিন্তিত উপায়ে ‘ভেক’ ধরতে অপারগ নন। কাটা কাপড়ের স্যুট-বুট, থানধুতি, দরজায় দাঁড়ান ঘোড়া ও ঘোড়ার গাড়ি— এসবই লাগে নতুন কালের ডাক্তারবাবুদের, নইলে ভেকহীন ডাক্তারবাবুদের সহজে ভিক্ষা তথা রোগী মেলে না। লেখক সহাস্যে মন্তব্য করেছেন, ‘বাবু বলিলেই বাঙালির একটু কেমন মান্য করা হয়। কিন্তু ডাক্তারবাবুরা সে সুখে বঞ্চিত।’[১০৯] উনিশ শতকের

শেষ দিক থেকেই ডাক্তারবাবুরা আর ভীতি মিশ্রিত শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র নন। তাঁরা নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে service দিচ্ছেন, এর মধ্যে কোনো মহানুভবতা নেই তার ফলে। তাঁদের নৈতিক চরিত্রেও এ জাতীয় মহানুভবতা দেখা যায় না। সম্ভবত তাঁদের fees আদায়ে তাঁরা যেমন গলদ্‌ঘর্ম হতেন, তেমনি ডাক্তারদের fees জোগাতে জোগাতে কোনো কোনো বিপদগ্রস্ত রোগী যে সর্বস্বান্ত হতেন, সে প্রমাণ রচনার মধ্যেই আছে।[১১০] লেখক ক্রূর-কুটিল মন্তব্য করেছেন, 'ডাক্তারবাবুরা ডাক্তার হইবার পূর্ব্বে মানুষ থাকেন কিন্তু ডাক্তার হইলেই না দেবত্ব নয় পিশাচত্ব লাভ করেন।'[১১১] সাধারণ সামাজিকের ডাক্তারবাবুদের প্রতি অবিমিশ্র শ্রদ্ধাবোধ অটুট থাকেনি, তা আমরা বুঝতে পারছি। বঙ্কিম এ কারণেই আধুনিক বাবুদের গোত্র-বৈচিত্র্য উল্লেখ করতে গিয়ে ডাক্তারবাবুদেরও 'বাবুত্বে'র কোঠায় এনে উপস্থিত করেছেন। 'বিটকেলের দপ্তরে' উক্ত ডাক্তারবাবুরা নানান ভাবেই সমালোচিত হয়েছেন লেখকের দৃষ্টিতে।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কলিকাতা কমলালয়ে' উনিশ শতকের প্রথম দিকের 'বিষয়ি ভদ্রলোক' বলতে দালাল, মুৎসুদ্দি, বেনিয়ান, পুঁজিপতি ইত্যাদিকে প্রথম থাকের বাবু বলে চিহ্নিত করেছিলেন। এঁরা বিদ্যার জোরে না হলেও বুদ্ধি ও উপযুক্ত পরিশ্রমের দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। নবকৃষ্ণ তো পলাশির যুদ্ধের পর সিরাজের কোষাগার লুণ্ঠনের ভাগ হিসাবে যথেষ্ট অর্থ ও সম্পদ লাভ করেন। পরবর্তীকালে অর্থ-বিত্ত-সম্পদ বৃদ্ধি করতে এঁদের যে খুব কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে এমনটি সম্ভবত নয়। শাসকের অনুগ্রহপুষ্ট হিসাবে এঁরা অতি সহজেই টাকার কুমীরে পরিণত হন। দুপুরে দিবানিদ্রার পর কাজে বেরিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে আসার যে ফিরিস্তি দাখিল করেন ভবানীচরণ,[১১২] তাতে কঠোর পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজকর্মের ইঙ্গিত মেলে না। কেউ কেউ এঁদের 'ক্যাপিটালিস্ট' তথা ধনিকশ্রেণি না বলে 'উচ্চ-মধ্যবিত্ত' অর্থাৎ upper-middle-class বলতে চেয়েছেন।[১১৩] কিন্তু মনে রাখতে হবে ভবানীচরণ এঁদের শ্রেণিকে 'ধনাঢ্য' বলে অর্থাৎ বিত্তপতি বলে উল্লেখ করছেন; অন্যদিকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় থাকের 'বিষয়ি ভদ্রলোকদের' যে জীবনযাপনের পরিচয় দেন, তার মধ্যে উচ্চ ও নিম্ন-মধ্যবিত্তের আদলটাই স্পষ্ট হয়। অর্থাৎ আমরা প্রথম থাকের বাবুদের upper-middle-class শ্রেণিভুক্ত করতে অপারগ। এঁরা স্বাভাবিকভাবেই উচ্চবিত্ত শ্রেণি। কাজেকর্মে ইংরেজ শাসকের দোসর। এঁদের কাউকে কাউকে 'হাফ-বাবু' বললে বলা যেতে পারে, তবে এঁদের পরবর্তী প্রজন্ম অর্থ-বিত্ত-সম্পদের প্রাচুর্যের মধ্যে বসে 'ফুলবাবু' হয়ে উঠতে দ্বিধা করেনি। অন্যদিকে শিক্ষা, শ্রমের উপযুক্ত কর্মী, নাগরিক জীবনে নানান পেশার ক্ষেত্রে চাহিদা ইত্যাদির জন্যই মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক বিভিন্ন দেশে। বিদ্যা এঁদের অস্ত্র, বুদ্ধি এঁদের দুর্বলতা। এঁরা মানসিকতায় কতখানি বাবু, সে সম্পর্কে সন্দেহ থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু আর্থিক ক্ষমতা প্রদর্শনে এবং সমাজে আত্ম-প্রতিষ্ঠার কামনায় এঁরা যে 'বাবুত্ব'কে promote করেছেন, সেকথা বলা যেতেই পারে। কিন্তু উৎকট খামখেয়ালিপনা এবং লাম্পট্য থাকলে এবং তার প্রদর্শনযোগ্য অর্থ ব্যয় করলে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে 'বাবু' নামের অধিকারী হওয়া যেত সহজেই। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যাকে upper ও lower class মধ্যবিত্ত বলতে চাইছি আমরা, তাঁদের জীবনযাপন আক্ষরিক অর্থেই দুষ্কর। ভবানীচরণের 'বিষয়ি ভদ্রলোকে'রা কর্ম করতে পারলেই অর্থ-বিত্তের শিখরচূড়ায় অবস্থান করতে পারতেন। কিন্তু উনিশ শতকের শেষদিকে এই অবস্থাটা বদলে গেল। কর্মেচ্ছুক মধ্যবিত্ত বাবুদের সংখ্যাবৃদ্ধি হলেও কর্মের অপ্রতুলতায় বাবুজন্ম ছিল প্রায় অধরা। প্রথম দিকের স্থিরীকৃত বাবুত্বের সাধারণ লক্ষণগুলিও পরিবর্তিত হয়ে গেল আর্থিক অক্ষমতার কারণেই। মধ্যবিত্ত বাবুদের সাধ-স্বপ্ন তথা

বাবুত্ব অনেক বেশি সংকীর্ণ, অনেক বেশি মানসিক দ্বিধাবোধ-সংযুক্ত। মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে যাঁরা ভাগ্যগুণে এবং কর্মগুণে কিঞ্চিৎ বেশি অর্থবান, তাঁরা বাবুত্ব করলে করতে পারেন, কিন্তু তাঁদের সেই বাবুয়ানায় বিগত কালের মতো উচ্ছৃঙ্খলতা নেই, পাগলামো নেই, নেই অর্থ-বিত্ত-সম্পদের বিলি-বিনিময়ে সার্বিক সমাজকে যুক্ত ও একইসঙ্গে মুগ্ধ বা বিস্ময়াভিভূত করার মানসিকতা; একালের বাবুদের বাবুত্ব নিছক ব্যক্তিগত, আত্মসুখের নামান্তরমাত্র। সমষ্টিকে নিয়ে যে ব্যক্তিগত সুখ ভোগের ইচ্ছা, যা ছিল বিগত কালের বাবুদের লক্ষণ, তা একালে দেখা যায় না। অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন বাঙালিবাবুদের বাবুয়ানার ঐতিহ্যেও ভয়ানক থাবা বসিয়েছিল, এতকালের চেনা ছক দিয়ে তাঁদের আর বাবু বলে আলাদা করে চেনার উপায় ছিল না।

'বিটকেলের দপ্তরে'র লেখক 'বাবু (শ্রীল শ্রীযুক্ত)' নামক রম্যপ্রবন্ধে সেকাল ও একালের বাবুত্ব যে স্বভাবগত ভাবেই পৃথক সে কথা সরাসরি বলেছেন।[১১৪]

'এক্ষণে বাবু বিলক্ষণ দেখিতেছেন যে খাঁটি বাবুয়ানা বর্তমান সমাজে ''কলকে'' পায় না। তালি তুলি দিইলেও কিছু হইবার জো-টি নাই। আগাগোড়া বদল দরকার। উনিশ শতাব্দীর সভ্যতা এবং বাবুয়ানার সভ্যতা কাংস্য পাত্র ও মৃন্ময় পাত্রের ন্যায় পাশাপাশি ভাসিতেছে। খুব বড় বাবুর শরীরে কোনো গুণ থাক আর না থাক, খান কতক গাড়ী গোটাকতক ঘোড়া ও পোষাক পরা চাকর আর কিঞ্চিৎ পৈতৃক বিষয় থাকিলেই চুকিয়া গেল।'

অর্থাৎ লেখকের মতে, খাঁটি বাবুয়ানা বর্তমান সময়ে প্রায় বিলুপ্ত। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার ও বদলের ফলে বাবুয়ানা অমার্জিত ঠুনকো বলে পরিত্যাজ্য। উনিশ শতকের শেষ দিকের সংস্কৃতির সঙ্গে বাবুয়ানার সংস্কৃতি মেলে না একেবারেই। তা সত্ত্বেও, নতুন যুগের বাবুরা আর্থিক দিক থেকে বিগত কালের বাবুদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে থাকলেও, সংকীর্ণ অর্থেই 'বাবু' নামে আখ্যাত হচ্ছেন। গাড়ি-ঘোড়া-উর্দি পরা চাকর ও পৈতৃক কিছু সম্পত্তি থাকলেই এ যুগে 'বাবু' নামে আখ্যাত হওয়া যায়। খাঁটি বাবুত্বের সঙ্গে বিলাস-বৈভবের মাত্রাতিরিক্ত আড়ম্বর, প্রদর্শন ও ব্যয়ের যে সম্পর্ক ছিল, একালের মধ্যশ্রেণির বাবুদের পক্ষে তা নিতান্ত অসম্ভব। ফলে উক্ত লক্ষণগুলি আর একালের বাবুত্বের সাধারণ ধর্ম বলে বিবেচিত হচ্ছে না। লেখক একালের মধ্যশ্রেণির বাবুদের কতকগুলি সাধারণ ধর্ম চিহ্নিত করেছেন, যা একালের কিছু নিষ্কর্মা, পৈতৃক ধনে ধনী উচ্চমধ্যশ্রেণির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। লেখকের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী—[১১৫]

ক. বাবুরা শরীরচর্চার ঘোর বিরোধী, কারণ তাহলেই শরীরকে নাড়াচাড়া করতে হবে, তা করতে এঁরা অপারগ।

খ. 'কষ্টসহিষ্ণু' ব্যক্তিকে কখনো বাবু বলা যায় না। বাবুরা শারীরিক বা মানসিক কোনো কষ্টই সহ্য করতে পারেন না।

গ. 'বাবু' সমস্ত কাজ যতদূর সম্ভব 'মারফতে' চালান। এমনকী তামাক খাবার সময় মুখ থেকে নল পড়ে গেলেও বাবুরা নিজেরা তা তুলে মুখে নেবেন না। চাকররাই সে কাজটি করবে।

ঘ. রোদে বার হওয়া বাবুদের ক্ষেত্রে একেবারেই নিষিদ্ধ যদি-বা বার হন তো চাকর মাথার উপর ছাতা ধরে না থাকলে বাবুদের 'মানহানি' ঘটতে পারে।

ঙ. দ্রুতবেগে চলা বাবুর পক্ষে সম্ভব নয়। শারীরিক বা মানসিক কোনোভাবেই তা সম্ভব নয়। কারণ বাবুরা 'নয় ভয়ানক মোটা নয় রোগা।' দু'টি হাত কোনোরকমে কাঁধ থেকে ঝুলছে, পা দু'টি যেন

দেহের ভার অতিকষ্টে বহন করছে, চোখ দু'টি সাধ্যমতো দেখার কাজ করছে। এ অবস্থায় শারীরিকভাবেই বাবু দৌড়াতে অক্ষম, পলকা হাড় ভেঙে যেতে পারে। অন্যদিকে মানসিকভাবেও 'বাবুর দৌড়াইবার অধিকার নাই তাহা হইলে লোকে অসভ্য বলিবে'।

চ. বাবুরা নিদ্রাদেবীর উপাসক। ভোরে ওঠা বাবুত্বের লক্ষণ নয়।

ছ. বাবুদের দু'একখানা ব্যারাম থাকতেই হবে, নইলে তাঁর এবং ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানের কাজ ও মান— দুই-ই কমে।

জ. সুযোগ পেলে যদিও বাবুদের হাত-পা খোলার কথা শোনা যায় কখনো কখনো, সাধারণভাবে বাবুরা কারণে-অকারণে অপমানিত হলেও প্রত্যাঘাত করেন না, নির্বিবাদে কেটে পড়েন।

লক্ষণীয়, বাবুর এই আচরণগত সাধারণ ধর্মের মধ্যে কোথাও তাঁর আর্থিক আড়ম্বরমূলক আচরণের কথা নেই। সংগতভাবেই বোঝা যায়, বিগতকালের বাবুরা অর্থের অপরিমিত ব্যয়ে সামাজিক সাধারণের মধ্যে যে কৌতূহল ও আকর্ষণের সঞ্চার করেছিলেন, একালে আর তা সম্ভব হচ্ছে না। বৃহত্তর জনসাধারণের সঙ্গে বিগতকালের বাবুদের যেন নাড়ির যোগ গড়ে উঠত, কিন্তু একালের বাবুদের আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে সেই সংযোগ গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়নি। ফলে তাঁরা সাধারণের সমীহ, ভালোবাসা কিংবা ঔৎসুক্যের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত। অন্যদিকে, কোনো নাড়ির যোগ গড়ে না ওঠায় একালের বাবুদের ব্যাপারে সাধারণের দৃষ্টি নিরাসক্তের কিংবা ব্যঙ্গবিদ্রূপের।

বর্তমানকালে 'বাবু' শব্দটির যে 'নানার্থ' আছে এ বিষয়ে তিনি একমত। সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লেখ করে তিনি এ বিষয়ে বঙ্কিমের 'অনেক কথা'র পর আর বেশি কিছু বলতে চাননি। তবে উল্লেখ করতে ভোলেননি, 'চাকরের বাবু সম্বোধন মিষ্ট, স্থানবিশেষে মিষ্টতর, কিন্তু সাহেব যখন বাবু বলিয়া ডাকেন, তখন একেবারে অধঃপতন, বিশেষ যদি সাহেবের রং কালো হয়'[১১৬]। অর্থাৎ সামাজিক অবস্থানে 'শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু'দের অবস্থান দেশীয় বাঙালি সাহেববাবুদেরও অধঃস্থানে। পৈতৃক ধনে ধনী, সাধারণ শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত, চাকরিজীবী 'শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু'দের দিন যে বিগত, সেকথা স্পষ্ট অনুভূত হয় এই চিত্র থেকে। নতুন আর্থিক পরিস্থিতিতে নতুন যুগের বাবুদের কাছে 'অন্নচিন্তা চমৎকারা'ই বড়ো সত্য হয়ে উঠেছে, এ অনুমান নিতান্ত অসংগত নয়।

হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের হাত ধরে ব্রাহ্মবাবুদের কটাক্ষপাত উনিশ শতকের রঙ্গ-ব্যঙ্গের লেখকদের সাধারণ বিষয় হয়ে উঠেছিল। 'বিটকেলের দপ্তরে'ও তার ব্যতিক্রম নেই। 'হংসসভা' নামক রচনায় ব্রাহ্মবাবুদের ঈষৎ বক্র-কটাক্ষযুক্ত উপহাস করেছেন লেখক। অন্য রচনাগুলিতে সরাসরি নির্দিষ্ট শ্রেণিকে সম্বোধন করলেও আলোচ্য রচনার ব্রাহ্মবাবুদের বোঝাতে লেখক হংসের রূপক গ্রহণ করেছেন এবং ব্রাহ্মসভাকে 'হংসসভা' নামে নির্দেশ করেছেন। মূলত ব্রাহ্মদের সভার কার্যকলাপ এবং অন্তঃসারশূন্যতাকে কটাক্ষ করা হয়েছে এখানে। ঢাকার 'হংসসভা' অর্থাৎ ব্রাহ্মসভার উল্লেখ করা হয়েছে, সেইসঙ্গেই বাল্যবিবাহ রোধ এবং বিধবাবিবাহ প্রচলনের ব্যাপারে তাঁদের সহানুভূতিশীল উদ্যোগের প্রসঙ্গ তুলে কিঞ্চিৎ বক্র উপহাস করেছেন লেখক। মনে রাখতে হবে, ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ সদস্যের অধিকাংশই ছিলেন পূর্ববঙ্গাগত এবং ব্রাহ্মধর্মের প্রসারে কলকাতার পরেই ঢাকার স্থান ছিল।[১১৭] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর ব্রজসুন্দর মিত্রের উদ্যোগে ঢাকার ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে হিন্দুসমাজের ভয়ে গোপনে সভার কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হলেও, ক্রমে বহু পদস্থ

ব্যক্তিরা এই সভার সদস্য হন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঢাকা ব্রাহ্মসমাজকে স্মরণীয় বিস্তৃতি ও জনপ্রিয়তা এনে দিতে সক্ষম হন। পরবর্তীকালে অবশ্য প্রাথমিক আবেগ ও উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে এলে ব্রাহ্মসভার সদস্যদের মধ্যে শ্রেণিবিভাগ গড়ে ওঠে। ১৮৬৯ সালের ২৮ মার্চ প্রেরিত পত্রে দেখা যায়,[১১৮] সাধারণভাবে তিনটি শ্রেণি গড়ে ওঠে—

ক. বিত্তবান পরিণতবয়স্ক উচ্চপদাধিকারী সভ্য, যাঁরা নিয়মিত আসেন না, কখনো কখনো অর্থ সাহায্য করেন মাত্র;

খ. 'বিদ্বান, প্রখর, বুদ্ধিবিশিষ্ট যুবক' সভ্য, যাঁরা সংখ্যায় অধিক এবং এঁরাই 'এ দেশকে পুনরুদ্ধার করবেন' বলে সাধারণভাবে মনে করা হলেও বাস্তবে 'এইসকল কর্ম্মী বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা যতদূর মঙ্গল সাধন করিতে পারেন তাহার অতি অল্পই করিয়া থাকেন। ক্রমে ইঁহাদের ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রতি উৎসাহ হ্রাস হইয়া আসিতেছে।'[১১৯]

গ. দরিদ্র, নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের অল্পবয়সি বালক সভ্য, যাঁরা প্রকৃত উৎসাহী, কিন্তু এঁরাই সমাজে ব্রাত্য, অবহেলিত। সম্ভবত এই জাতীয় শ্রেণিবিভাজনের কারণেই এবং হিন্দুসমাজের প্রবল প্রতিরোধের সামনে পড়ে পূর্ববঙ্গের ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের কার্যকলাপ স্তিমিত হয়ে আসে। যদিও সাধারণ শিক্ষা, অন্তঃপুরের স্ত্রী-শিক্ষা, কুলীন কন্যা উদ্ধার, বিধবা বিবাহে উৎসাহ দান ইত্যাদি প্রসঙ্গে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায়, 'They (The Pacca Samaj) discarded idolaty, abolished caste, and went about rescuing young hindu widows and other helpless young women from lives of misery, and making room for them in their own families. Many of these women have quietly settled down in married life in after-years and are now mothers of happy homes.'[১২০] নবাবি আমলের গৌরবসূর্য অস্তমিত হবার পর কলকাতার তুলনায় ঢাকা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকা তখন মফস্সল। হিন্দু রক্ষণশীলদের কাছে ঢাকা-সমাজের এ জাতীয় কার্যকলাপ অসহ্য বোধ হয়। আশঙ্কা থেকে 'হিন্দুহিতৈষিণী'র মতো পত্রিকায় প্রকাশ করেন তাঁরা। ঢাকা-সমাজের কার্যকলাপ নিয়ে কলকাতাতে আলোড়ন তৈরি হয়। সম্ভবত এ কারণেই 'বিটকেলের দপ্তরে'র লেখক বিপিনবিহারী বসু ব্যঙ্গের লক্ষ্য হিসাবে ব্রাহ্মবাবু এবং ঢাকার ব্রাহ্মসমাজকে বেছে নিয়েছেন।

ব্রাহ্মসমাজের সভায় সম্পাদক হংস যখন বিগত বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব পাঠ করেন, তখন সেই হিসাব দাখিলের মধ্যে ব্রাহ্মবাবুদের মানসিক ও আচরণগত স্বভাবও স্পষ্ট হয়। এই হিসাব অনুযায়ী আয় ৫০০০ টাকা। এর মধ্যে থেকে বই ছাপাতে, চাকর-বাকরদের বেতন দিতে এবং অন্যান্য নানান খুচরো খরচে ২০০০ টাকা ব্যয় হয়। বাকি টাকা জনৈক রাজ-প্রতিনিধির ইংল্যান্ডে ফিরে যাবার কারণে ব্যয় হয়। সভার প্রস্তাব অনুযায়ী, উক্ত 'ইংরেজ-মহাত্মা'কে দেশে ফিরে যাবার পূর্বে যথোচিত সম্মান-প্রদর্শন এবং তাঁর একটি স্মরণচিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাব নেওয়া হয়। তবে কাগজের নিশান, ফুল, 'ফুঁকো শিশি' ও 'সেম্পিন' কেনবার জন্য টাকা শেষ হয়ে যাওয়ায় স্মরণচিহ্ন আর স্থাপন করা হবে কি না, সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে।[১২১]

ব্রাহ্মবাবুদের প্রতি হিন্দু রক্ষণশীলদের প্রচলিত অভিযোগগুলিকেই মান্যতা দেয় এই হিসাব। এঁরা যতটা না স্বদেশীয়, তার চেয়েও বেশি বিজাতীয়। শাসকের নীতি-যুক্তি-ধর্মকে মান্যতা দেয় এমন এক শ্রেণি হলেন ব্রাহ্মবাবুরা। ফলত, দেশের মঙ্গলের জন্য অর্থ ব্যয়িত না হয়ে শাসকের প্রয়োজনে তুচ্ছ ব্যাপারে

এই অর্থ ব্যয় করেন সমাজের সভ্যরা। এঁদের আদর্শ নিতান্ত কেতাবি, ভাবমূলক। বাস্তব সংসারের মঙ্গলের সঙ্গে, দেশের বৃহত্তর হিতের সঙ্গে ব্রাহ্মবাবুদের কোনো যোগ ছিল না বলেই হিন্দু রক্ষণশীলদের অভিযোগ। উপরন্তু শাসককে খুশি করতে চেয়ে বাল্যবিবাহরোধ, স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা করা কিংবা বিধবা বিবাহের উদ্যোগকে হিন্দু রক্ষণশীলরা কোনোদিনই মেনে নিতে পারেননি। মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত বাবুদের একটি বৃহৎ অংশই ছিলেন ব্রাহ্ম। এই কারণেই বঙ্কিম থেকে শুরু করে 'বিটকেলের দপ্তরে'র প্রায় অবজ্ঞাত লেখক শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবু (তথা ব্রাহ্মবাবু)-দের প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রূপ-উপহাসের তূণীর নিক্ষেপ করেছেন। মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের প্রতি উনিশ শতকের বাবু-সাহিত্যে এ কারণেই এত ঘৃণা, অবজ্ঞা, অপমান। ব্রাহ্মবাবুদের তথা শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের একটি বৃহৎ অংশকে বাগাড়ম্বরসর্বস্ব, সভাপ্রিয়, শাসকের পদলেহী, দেশের মঙ্গল বিষয়ে রুদ্ধবাক্-অনাগ্রহী হিসাবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন বর্তমান লেখক। তাঁর এই প্রচেষ্টা এবং মনোভাব অবশ্য শিক্ষিত ব্রাহ্ম 'ভদ্রলোক'বাবুদের প্রতি সমাজের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গিকেই তুলে ধরে।

স্ত্রীস্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা এবং সংসারে স্ত্রী-প্রাধান্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে মেনে নেওয়া খুবই দুষ্কর ছিল। ব্রাহ্মবাবুরা এগুলির প্রচলন করে সামাজিক সুস্থিতি নষ্ট করছে বলে বিরোধী পক্ষের যে অভিযোগ, তার আড়ালে গোপন আছে আসলে পুরুষদের নিজেদের প্রাধান্য বিনষ্ট হওয়ার ভীতি ও আশঙ্কা আর এ কারণেই মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের স্ত্রীশিক্ষা বা স্ত্রীস্বাধীনতার প্রসঙ্গটিকে বারেবারেই ব্যঙ্গবিদ্রূপের লক্ষ্য করা হয়েছে। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'পঞ্চানন্দ' প্রথম খণ্ডে (১৩০৫ বঙ্গাব্দ) সংকলিত 'নফরবাবু'তে প্রতীকী অর্থে নয়, সরাসরিই শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোকবাবু'কে স্ত্রীর 'নফর' শ্রেণিভুক্ত বলে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। ইনি পল্লীগ্রামে জন্মালেও, বর্তমানে কলকাতায় সস্ত্রীক থাকেন। একশো টাকা বেতনে কলেজে অধ্যাপনা করেন। 'নফরবাবু কলিকাতায় ইংরেজী পড়িয়া, পাশ করিয়া, সুশিক্ষিত হইয়াছেন'[১২২], অতএব সেই সুশিক্ষার কারণেই পল্লীগ্রাম থেকে নিজের বৃদ্ধা মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তিনি ব্রাহ্মদের মতোই মৃত্যুকে আনন্দজনক এবং সংসারকে মায়া ভেবে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। উপরন্তু স্ত্রীর মুখে নিজের মা ভালো রান্না করতে পারতেন শুনে মা-কে জীবিতাবস্থায় কলকাতায় এনে রাঁধুনিগিরির কাজে ঢুকিয়ে দিলে মাসে মাসে দশ টাকা করে বছরে একশো কুড়ি টাকা হত এবং তা দিয়ে স্ত্রীর উৎকৃষ্ট 'ডায়মনকাটা মল' হত বলে আক্ষেপ করেছেন। এই বাবুই আবার স্ত্রীর মায়ের যায় যায় অবস্থা শুনে কান্নায় ভেঙে পড়ে মূর্ছা গেছেন। লেখক ব্যঙ্গ করে বলেছেন, 'কেহ কেহ বলেন, সেই সময় কলিকাতার সেই খণ্ডে ভূকম্পন হইয়াছিল।'[১২৩]

বলা বাহুল্য, নফরবাবুরা শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের নিম্নবিত্তের প্রতিনিধি। এ কারণেই বাৎসরিক একশো কুড়ি টাকার লোভে নিজের জন্মদাত্রীকে রাঁধুনিগিরির কাজে লাগানোর মানসিকতা দেখা যায়। অভিজাত কিংবা উচ্চবিত্ত মধ্যশ্রেণির ভাবনা এতটা নিম্নগামী হতে পারত না। স্ত্রীর শখ-আহ্লাদ মেটাবার মতো সামর্থ্য তাঁদের ছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক দুরাবস্থার প্রকোপে পড়ে নিম্নশ্রেণির মধ্যবিত্তরা তাঁদের শখ-আহ্লাদের স্বপ্ন হয় শিকেয় তুলে রাখতেন, নচেৎ নিজ পেশার সমান্তরাল অতিরিক্ত কোনো জীবিকা কিংবা নিজ পেশা থেকেই উপরি আয়ের পথ খুঁজতেন। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের নৈতিক অধঃপতনের এটিও একটি গুরুতর কারণ। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় তাঁর 'আত্মজীবনচরিতে' লিখেছেন, 'তৎকালীন সকল লোকের মনেই, উৎকোচ পাপ বলিয়া প্রতীত ছিল না। এ কারণে প্রভুরা

ভাবিতেন, কর্ম্মচারীদের বেতন যতই কেন অধিক হউক না, তাহারা উৎকোচ গ্রহণে কখনই বিরত হইবে না। তবে বেতন বৃদ্ধি করিয়া অধিক টাকা ব্যয় করিবার প্রয়োজন কি?'[১২৪] অর্থাৎ অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার অভাব একদিকে যেমন শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের অনৈতিক ভাব ও কাজে আকৃষ্ট করেছিল, তেমনি বাবুত্বের মূল ধর্ম অহেতুক অতিব্যয় ও বিলাসিতার লাগামও টেনে ধরেছিল। বস্তুত এই সময় থেকেই সাধারণ মধ্যশ্রেণির হাত ধরে 'ব্যবহারিক বাবুত্বের' দিন শেষ হল বলা চলে। মানসিক বাবুত্ব অর্থাৎ নিশ্চেষ্টতা, অলসতা, পরশ্রীকাতরতা, মদ্যপান ও ধূমপানের প্রতি আসক্তি, লাম্পট্য, কার্যক্ষেত্রে ভীরুতা, বাগাড়ম্বর ইত্যাদি বাঙালি মধ্যশ্রেণির মানসিক চরিত্রধর্ম হিসাবে চিরস্থায়ী হয়ে যায়।

প্রত্যক্ষভাবে 'বাবু'কে কেন্দ্রে রেখে লেখা রম্যরচনা ও প্রবন্ধ ছাড়াও উনিশ শতকের কালসীমায় রচিত স্মৃতিমূলক নানান রচনায় প্রসঙ্গক্রমে বিক্ষিপ্তভাবে 'বাবু'দের কথা এসেছে; কখনো-বা সেকালের পট-পরিবেশটি তুলে ধরতেও বাবু কালচারের একটি রূপরেখা উপস্থিত করা হয়েছে। হতে পারে এগুলি প্রত্যেকটি বাবুকেন্দ্রিক কোনো সামগ্রিক রচনা নয়, কিন্তু বাবুদের সামগ্রিক ইতিহাস রচনা করতে গেলে এগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া এই আত্মস্মৃতিগুলিও নিজেরাই বাঙালি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির হয়ে ওঠার ইতিহাস এবং একইসঙ্গে মানসিক রূপ-রূপান্তরের আদলটিও বুঝতে সাহায্য করে। ইতিহাসের সেই ক্ষীণ সূত্রগুলিকে এক জায়গায় জড়ো করে দেখে নেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। অবশ্য একথা সত্য যে, ইতিপূর্বেই যুগ ও জীবন প্রসঙ্গে, বাবু-র রূপান্তর প্রসঙ্গে কিংবা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে এই সূত্রগুলি আমরা যৎকিঞ্চিৎ ব্যবহার করেছি। তবে এখানে উক্ত প্রসঙ্গ বা সূত্রগুলির পর্যালোচনাই আমাদের উদ্দিষ্ট।

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একাল' গ্রন্থটি এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ওই গ্রন্থে রাজনারায়ণ পূর্ববর্তী কালের সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক কালের একটি প্রতিতুলনাত্মক চিত্র উপস্থিত করে সমকালের আলো ও অন্ধকারের রূপটি স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। রাজনারায়ণের জন্ম ১৮২৬-এর ৭ সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ নববাবুদের যুগ তখন প্রায় অস্তমিত। কিন্তু যেমন সূর্য অস্ত গেলেও তার অস্তরাগ আরও অনেকক্ষণ লেগে থাকে আকাশের গায়ে, তেমনি নববাবুদের যুগ বিগত হলেও সে যুগের অস্তরাগ তখনও জেগে ছিল সমাজের বুকে। ইংরেজি শিক্ষিত নব্যবাবুরা এর মধ্যে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে পালাবদলের সুরটিও শুনিয়ে দিয়েছেন। এসবের মধ্যেই রাজনারায়ণ পুষ্টিগ্রহণ করেছেন, বিগত কালের অবশেষ নতুন ও কালের সামগ্রিকটুকু তাঁর মনন-ভাবনাকে অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ করেছে। সেই অভিজ্ঞতা ও ভাবগ্রহণের সূত্র ধরেই লেখক 'সেকাল আর একাল'-কে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান করতে চেয়েছেন।

সে কালের কথা বলতে গিয়ে লেখক সেকালের 'প্রধান প্রধান শ্রেণীর লোকের কথা' বলেছেন সর্বাগ্রে। আর সে সূত্রেই সর্বাগ্রে সাহেবদের কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ, লেখকের মতো, 'সাহেবরা আমাদিগের রাজা। রাজার সম্মান অগ্রে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।'[১২৫] অতএব লেখক সেকালে সাহেবরা 'অর্দ্ধেক হিন্দু' ছিলেন এই বলে সদাশয় ইংরেজদের কথা ফলাও করে বর্ণনা করেছেন। শাসকশ্রেণির প্রতি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির, বিশেষ করে ব্রাহ্মবাবুদের অতি আনুগত্য রক্ষণশীল হিন্দুরা কখনোই ভালো চোখে দেখেননি। তাঁদের চোখে, ব্রাহ্মরা ছিলেন শাসকশ্রেণির তল্পিবাহক। অবশ্য ব্রাহ্মবাবুদের অনেকেই তখন উচ্চশিক্ষা লাভ করে রাজকর্মচারী হিসাবে কাজ করায় প্রত্যক্ষভাবে শাসকশ্রেণির বিপক্ষে কিছু বলাও সম্ভব ছিল না। তথাপি মনে-প্রাণে যে তাঁরা ইংরেজিবিহীন ভারতবর্ষের আশু কল্পনা করেছিলেন, অন্তত উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে তা বলা যায় না। রাজনারায়ণ বসুর উদ্ধৃত মন্তব্য তারই প্রমাণ দেয়।

এরপর রাজনারায়ণ ক্রমানুযায়ী গুরুমশাই, আখন্‌জী (মুসলমান পারসি ভাষা শিক্ষক), ভট্টাচার্য— এই তিন শ্রেণির শিক্ষকবৃত্তিজীবীদের কথা উল্লেখ করেছেন (অর্থনৈতিক ও মানসিক বিচারে যাঁরা কোনোভাবেই বাবু শ্রেণিভুক্ত নন)। এঁদের শিক্ষাপ্রণালী যে সেরকম উৎকর্ষব্যঞ্জক কিছু ছিল না, একথাটিও উল্লেখ করতে ভোলেননি। অতঃপর তিনি এসেছেন রাজকর্মচারী এবং ধনী ব্যক্তিদের প্রসঙ্গে। তিনি জানিয়েছেন, ইংরেজ প্রথম দিকে দেওয়ান প্রমুখ 'আমলা'দের প্রবল প্রতিপত্তি ছিল। তাঁদের উপর বহু কাজের ভার দিয়ে কোম্পানি বাহাদুর নিশ্চিন্ত থাকতেন। দেওয়ানেরা প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন এবং এই পদ দীর্ঘদিন পর্যন্ত বংশানুক্রমিক ছিল। প্রসঙ্গক্রমে তিনি রামকমল সেনের মৃত্যুর পর তাঁর তিন পুত্রের ক্রমান্বয়ে টাঁকশালের দেওয়ানি পদ প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করেছেন।[১২৬] এঁরা এবং এঁদের প্রভুরা 'উৎকোচ' গ্রহণ করতেন। আমরা ইতিপূর্বেই এ প্রসঙ্গে দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের সাক্ষ্য উপস্থিত করেছি। বিশেষ করে নিমক-এর দেওয়ানি ছিল সবচেয়ে লাভজনক। আসল এবং উপরি দুই মিলে অল্পদিনেই প্রভূত লাভবান হওয়া যেত। সেকালের আরেক বিখ্যাত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথমে আইন-শিক্ষা, নীল ও রেশমের রপ্তানির কাজ করলেও প্লাউডেন সাহেবের অধীনে নিমকের দেওয়ানি পদে অধিষ্ঠিত হয়েই অতি অল্পদিনে অমিত বিত্ত সঞ্চয় করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী জানিয়েছেন, 'তখন নিমক মহলের দেওয়ানি লইলেই লোকে দুইদিনে ধনী হইয়া উঠিত। এইরূপে শহরের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি ধনী হইয়াছিলেন।'[১২৭] আফিমের দেওয়ানিও ছিল বিস্তর লাভজনক। রাজনারায়ণ বসু বৃত্তিজীবী ধনীদের বোধ হয় পৃথক শ্রেণিতে ভাগ করেছিলেন। কারণ, পৃথক আর একটি শ্রেণি হিসাবে তিনি ধনী লোকদের তথা rich baboo-দের কথা বলেছেন। বিনয় ঘোষ হয়তো এ কারণেই এই শ্রেণিকে upper-middle-class বলেছেন। কিন্তু বৃত্তিজীবী ধনীরা পরিশ্রমসাপেক্ষে অর্থ উপার্জন করলেও, তাঁদের ভাবনাচিন্তা, জীবনচর্যা এতদূর রূপান্তরিত ছিল যে, তাকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আওতায় এনে ফেলা যায় না।

পিতৃপুরুষের অর্থে কিংবা বংশপরম্পরায় ধনী ব্যক্তিরা রাজনারায়ণ বসুর মতে, অত্যন্ত বদান্য ছিলেন। পুকুর-প্রতিষ্ঠা, সন্ন্যাসী ও দরিদ্রদের দান, অতিথি-সেবা, গুণী ব্যক্তির সম্মান ও প্রতিপালন, ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ গায়কদের নিয়মিত অর্থ সাহায্য ইত্যাদি কাজ তাঁদের চরিত্রগুণকে সমৃদ্ধ করেছিল। এঁরা 'জীবনোপায়ের সুলভতা প্রযুক্ত... দলাদলি, ক্রীড়াকৌতুক ও কথকতা শ্রবণে কালযাপন করতেন।'[১২৮] ধর্মের প্রতি এঁদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল, পাঁচালির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। (এ প্রসঙ্গে ইতিপূর্বেই আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছি)। লেখক বলেছেন, 'এক্ষণে যেমন দালানে পূজা হইতেছে, বৈঠকখানায় মদ্যপান ও উইলসনের দোকানের খানা চলিতেছে, অন্তরে দেব-দেবীতে বিশ্বাস নাই, কিন্তু সম্ভ্রম রক্ষার জন্য বাহ্য ঠাট বজায় রাখিতে হইবে। সে কালে এবম্ভূত ব্যাপার দৃষ্ট হইত না।'[১২৯]

কিন্তু নব্যবাবুরা, বিশেষ করে, হিন্দু কলেজ থেকে পাশ করে বেরোনো বাবুরা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুধর্ম ও সংস্কারে অনাস্থা প্রকাশ করতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ ডিরোজিওর প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন, সেইসঙ্গে রামমোহন সংস্থাপিত 'ব্রাহ্মসমাজ'-এর প্রভাবও। কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে গিয়ে তাঁরা অবশ্য সংকীর্ণ সংস্কারেই নিজেদের বেঁধে ফেলেছিলেন। লেখক জানিয়েছেন, 'তখনকার সময়গুণে ডিরোজিওর যুবকশিষ্যদিগের এমনি সংস্কার হইয়াছিল যে, মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া সুসংস্কৃত ও জ্ঞানালোকসম্পন্ন মনের কার্য।[১৩০] অবশ্য বিদ্যাশিক্ষার চর্চায় তাঁরা অনেকে যে সুশিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, এই সত্যকেও অস্বীকার করা যায় না।

রাজনারায়ণ তাঁর সমকালীন যুগে নব্য ও মধ্যশ্রেণির বাবুদের ক্ষেত্রে দেখেছেন কিছু অবনতি ও উন্নতির চিহ্ন, যে উন্নতিকে প্রগতির চিহ্নও বলা চলে সহজেই। অবনতি হিসাবে তাঁর মতে, একালের নব্য ও মধ্যশ্রেণির বাবুদের [১৩১]—

এক. শারীরিক বলবীর্যের অভাব ও শরীরচর্চায় অনাগ্রহ;

দুই. অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমবিমুখ জীবনচর্যায় অভ্যস্ত হওয়ায় দশটা-চারটের কাজে অস্বস্তি;

তিন. শীতপ্রধান দেশের পক্ষে উপযুক্ত কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পক্ষে অনুপযুক্ত খাদ্য, যেমন— গোমাংস ভক্ষণের প্রতি  আসক্তি এবং তা থেকে নানান রোগের প্রাদুর্ভাব। লেখকের মতে, সাহেবদের অনুকরণ করাতেই এই বিপত্তি।

চার. পানদোষের প্রাবল্য; লেখকের মতে, এই এক দোষেই বিগত ত্রিশ বছরে বহু সম্ভাবনাময় বাবু অকালে চলে গেছেন।

পাঁচ. পূর্বের চেয়ে বেশি সুখপ্রিয় ও বিলাসী; কিন্তু আর্থিক সীমাবদ্ধ হওয়ায় সাধ থাকলেও ইচ্ছাপূরণের সাধ্য ছিল না।

ছয়. 'বাবুগিরির বৃদ্ধি'; লেখকের মতে, 'সে কালে এতদ্দেশে দু-একটি বাবু ছিল; এক্ষণে সকলেই বাবু। পূর্ব্বে মোটা চালচলন সাধারণ ছিল; এক্ষণে বাবুয়ানা চালচলন সাধারণ ও মোটা চালচলন বিরল। এক্ষণে কি ভদ্র, কি ইতর লোক, উপার্জ্জনশীল হইলেই গাড়ি পাল্‌কি ব্যতীত এক পাও চলিতে পারে না। পূর্ব্বকার অধিকাংশ ভদ্রলোকও এরূপ শারীরিক পরিশ্রম বিমুখ ছিলেন না।' অর্থাৎ, ব্যবহারিক বাবুত্বের সাধ্য না থাকলেও, মানসিক বাবুগিরিতে নব্য ও মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুরা পারঙ্গম ছিলেন।

সাত. উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার অভাবে ইংরেজি শিক্ষার ফলেও বাঙালিবাবুদের মানসিক জড়তা ও অশিক্ষা দূরীভূত করা সম্ভব হয়নি। নীতি-শিক্ষার অভাবেও একালের বাবুরা অনেক বেশি দুর্বিনীত এবং সহানুভূতিহীন।

আট. ইংরেজি শিক্ষা কেবল বৃত্তিমুখী, তা জ্ঞানমুখী হতে পারেনি বলেই অধিকাংশ বাঙালি 'শিক্ষিত' বাবুরা আসলে অশিক্ষিত এবং গ্রন্থচর্চাহীন।

নয়. প্রবীণের প্রতি অসম্মান, এমনকী জন্মদাতা পিতা-মাতার প্রতি অসম্মানজনক মনোভাবের প্রাদুর্ভাব। লেখক জানিয়েছেন, 'নিজ কর্ম্মস্থলে বৃদ্ধ পিতা আসিলে তাঁহাকে পিতা বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দিতে বাবু লজ্জিত হতেন ও কোন কোন বাবু বাবার পরিবার অর্থাৎ মাকে খেতে দিতে হয় বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করেন।'[১৩২] সেকালের প্রহসন ও নকশায় এই বিষয় নিয়ে বাবুরা নিন্দিত ও ধিক্কৃত হয়েছেন, এ আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি।

দশ. ইংরেজদের অতিরিক্ত অনুকরণ ও অনুসরণে এঁদের জাতিসত্তা বিকশিত হয়নি। কিন্তু ভাবভঙ্গি রীতি-নীতির অনুকরণ করলেও, মানসিকভাবে এঁরা হীনবল এবং আত্মস্বাতন্ত্র্যের বোধহীন।

এগারো. খলতা, অসরলতা এবং স্বার্থপরতা বর্তমান বাবুদের চরিত্রের অন্যতম সাধারণ লক্ষণ।

বারো. একালের বাবুরা কৃতজ্ঞতাশূন্য;

তেরো. শারীরিক পরিশ্রম বিমুখ নব্য ও মধ্যশ্রেণির বাবুদের 'লেখাপড়া শিখিলেই কেবল বাবু হইবার চেষ্টা।'[১৩৩] অবশ্য এ কালের বাবুদের চরিত্র কেবল কলঙ্কময় নয়। রাজনারায়ণ বসু এ প্রসঙ্গে নব্য ও মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত বাবুদের চরিত্রে অন্তত দু'টি গুণ দেখতে পেয়েছেন— এক. উৎকোচ গ্রহণে বিরতি, দুই.

স্বদেশপ্রিয়তা। প্রথমটি কতখানি দূর হয়েছিল, সে বিষয়ে আমরা সন্দিহান। দ্বিতীয়টি যে নিতান্ত হুজুগ ছিল, ইতিপূর্বেই পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে বারংবার তা আলোচিত হয়েছে।

কিন্তু সব মিলিয়ে লেখক মনে করেছেন যে, এ কালের বাঙালি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির চরিত্র এবং তার ফলে 'সমাজ ক্রমে অবনতি প্রাপ্ত' হচ্ছে। ইংরেজদের অসদ্‌গুণগুলি বাবুরা অবলীলায় অনুকরণ করে সাহেব সাজার চেষ্টা করছেন, অথচ সদ্‌গুণগুলি আয়ত্ত করে সদাশয় হয়ে ওঠবার বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ নেই তাঁদের। ধর্মবোধহীনতা এবং আত্মশাসনের অভাবকে এর জন্য দায়ী করেছেন লেখক। বাঙালিবাবুরা শাসকের গুণগান করছেন এটা না ভেবেই যে, এককালে এই শাসক এ দেশের উন্নতির জন্য যে পরিমাণ আন্তরিক ছিলেন, বর্তমানে তার কিছুমাত্র নয়। শাসনের মূল উদ্দেশ্য শোষণ। অথচ সে সত্য পদে পদে উপলব্ধি করেও বর্তমান শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুরা শাসকের পরিকল্পিত, শাসকের দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং শাসকের অনুকূলে অনুষ্ঠিত জাতীয়তাবাদের চর্চাতেই সন্তুষ্ট। তাৎক্ষণিক এই আবেগের ফলে বাবুদের দ্বারা দেশ ও জাতির কিছুমাত্র উন্নতি সম্ভব নয়। সভা-সমিতিতে শাসকের দিকটি বজায় রেখেই শাসকের নির্বিষ সমালোচনা, শাসকের স্বার্থরক্ষা, মৌখিক বাক্‌চাতুরীর দ্বারা শাসক-ভজনা এ কালের বাবুদের চরিত্রধর্ম।

রাজনারায়ণ বসুকে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব হিসাবে মেনে নিলে এবং তাঁকে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক' শ্রেণিভুক্ত করলে একথা বলাই যায়, রচনার শুরুতে ইংরেজ ভজনা দিয়ে শুরু হলেও, পরাধীনতার গ্লানি ইংরেজ শাসন সম্পর্কে তাঁর মনে বিরূপতা এনে দিয়েছে। একইসঙ্গে এ দেশের উন্নতি যে ইংরেজদের মূল লক্ষ্য নয়, মূল লক্ষ্য শাসকের শোষণ-সহায়ক অনুকূল পরিস্থিতিকে সুনিশ্চিত করা, এ সত্য উপলব্ধি করে ইংরেজ শাসন সম্পর্কে তাঁর যে মোহভঙ্গ ঘটেছে, একথা স্পষ্ট বোঝা যায়। তিনি স্পষ্টই জানিয়েছেন, বাবুরা যতদিন না প্রকৃত শিক্ষিত এবং স্বদেশানুরাগে আন্তরিক হবেন এবং ধীরে ধীরে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মশাসনের মধ্য দিয়ে পরাধীন জাতিসত্তাকে মুক্ত করবেন, ততদিন তাঁদেরও উপহাস ও নিন্দার লক্ষ্য হতে হবে। উনিশ শতক শেষের দোরগোড়ায় পৌঁছে ইংরেজ শাসন সম্পর্কে বাঙালি শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের যে মোহভঙ্গ ঘটেছে, তা উপলব্ধি করতে পারা যায়। একইসঙ্গে বিশ শতকের প্রারম্ভ থেকেই 'বোতাম আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান' বাঙালিবাবুরা হঠাৎ কেন সশস্ত্র আন্দোলনের জন্ম দেন, তার উত্তর হয়তো এই অসহিষ্ণুতা ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনার মধ্যেই লুকিয়ে আছে।

কার্তিকেয়চন্দ্র রায় (১৮২০-১৮৮৫) ছিলেন কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্রের দেওয়ান। তাঁর পূর্বপুরুষেরাও অনেকেই কৃষ্ণনগর রাজবংশে দেওয়ানি করেছেন। ইনি রামতনু লাহিড়ীর সুহৃদ ছিলেন এবং অন্যতম ডিরোজিয়ান মাধবচন্দ্র মল্লিক এঁকে স্নেহ করতেন। কৃষ্ণনগরে এঁর বাল্যশিক্ষা হলেও যৌবন অতিবাহিত হয় কলকাতায়। উচ্চশিক্ষাও লাভ করেন কলকাতাতেই। পরে কৃষ্ণনগরে শ্রীশচন্দ্রের দেওয়ান হিসাবে আমৃত্যু কার্যভার সামলান। ১৩০৩ বঙ্গাব্দে 'সাহিত্য' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'আত্মজীবনী'তে কার্তিকেয়চন্দ্র বিক্ষিপ্তভাবে সেকালে বাবুদের স্বভাবচরিত্র সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন। একটি কথা স্পষ্ট যে, কলকাতা থেকে সুদূর মফস্সলেও ধীরে ধীরে অনৈতিক বাবুগিরির ঢেউ এসে পৌঁছেছিল। সাধারণভাবে, বাঙালি মধ্যশ্রেণি তখনও পর্যন্ত অর্থকরী ফারসি ভাষা শিক্ষা করতেন, পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষারও চল হয়। পরে ইংরেজ শাসক সরকারি গেজেটে এদেশের সমস্ত কাজ দেশীয় ভাষায় চলবে এই ঘোষণা করায়, ফারসি ভাষা শিক্ষার প্রচলন প্রায় উঠে যায়, তার পরিবর্তে ইংরেজি

ভাষা শিক্ষার প্রাবল্য বৃদ্ধি পায় বাঙালিবাবুদের মধ্যে। মফস্সলের যেসব বাবুরা ইংরেজি বিদ্যায় পারদর্শী হতেন, তাঁদের বেশিরভাগই কলকাতাতেই কাজকর্ম করতেন এবং থাকতেনও।[১৩৪] কেরানিবৃত্তিধারী বাবুরা তেমন ভালো ইংরেজি জানতেন না। নীচু ক্লাসের ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক পড়ে, যাতে হাতের লেখা সুন্দর হয়, সেই চেষ্টা করতেন।[১৩৫] বেশ্যাগমন সচরাচর 'অতীব অধর্ম্ম' বলে বিবেচিত হত। সম্ভ্রান্ত প্রাচীন বাবুরা সচরাচর বেশ্যাগমনে আসক্তি প্রকাশ করতেন না। পরবর্তীকালে এই লক্ষণ ব্যাপকতা লাভ করে। কৃষ্ণনগরের আমিনবাজারে একটি বেশ্যালয় ছিল, যা মূলত গড়ে ওঠে সরকারি আমলা, উকিল বা মোক্তারের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবেই। লেখক বলেছেন, 'তৎকালে বিদেশে পরিবার সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রথা অপ্রচলিত থাকাতে, প্রায় সকল আমলা, উকিল বা মোক্তারের এক একটী উপপত্নী আবশ্যক হইত। সুতরাং তাঁহাদের বাসস্থানের সন্নিহিত স্থানে স্থানে গণিকালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল। পূর্বে গ্রীস দেশে যেমন পণ্ডিত সকলও বেশ্যালয়ে একত্রিত হইয়া সদালাপ করিতেন সেইরূপ প্রথা এখানেও প্রচলিত হইয়া উঠিল। যাঁহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত নহেন, তাঁহারাও আমোদের ও পরস্পর সাক্ষাতের নিমিত্ত এই সকল গণিকালয়ে যাইতেন। সন্ধ্যার পর রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্যন্ত বেশ্যালয় লোকে পরিপূর্ণ থাকিত। বিশেষত পর্ব্বোপলক্ষে তথায় লোকের স্থান হইয়া উঠিত না।'[১৩৬] এই চিত্র মফস্সলের বাবুদের নৈতিক অবস্থার ইঙ্গিত দিলে, একাধিক বেশ্যালয় এবং বেশ্যাযুক্ত কলকাতার বাবুদের নৈতিক চরিত্র কেমন ছিল তার ছবিটিও অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না।

বাবুদের মধ্যে সংগীতানুরাগী যেমন ছিলেন, তেমনি সংগীতের চর্চাও ব্যাপকতা লাভ করেছিল। কার্তিকেয়চন্দ্র নিজেই সেকালের একজন প্রসিদ্ধ খেয়ালগায়ক ছিলেন। ডাক্তারি বিদ্যা সম্পর্কেও বাঙালিবাবুদের আগ্রহের কথা জানা যায়। লেখক স্বয়ং কিছুদিন মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি বিদ্যা শিক্ষা করেন। মদ্যপান প্রথমদিকে একপ্রকার সামাজিক প্রেজুডিস ছিল। লেখক জানিয়েছেন, 'হিন্দু কলেজের সুশিক্ষিত ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহারা এ দেশের সমাজ সংস্কার করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সুরাপান করিতেন।'[১৩৭] কার্তিকেয়চন্দ্রও ডিরোজিয়ান মাধবচন্দ্র মল্লিকের সংস্পর্শে এসে মদ্যপানকে সংস্কারবশত গ্রহণ করেন এবং এর দ্বারা সামাজিক মান বৃদ্ধি হয়, এমন মনে করতেন। যদিও মদ্যাসক্তি বৃদ্ধি পাওয়াতে মনের জোরে তিনি মদ্যপান ত্যাগ করেন। তবে শিক্ষিত বাবুরা সকলেই যে এমন করতেন, তা নয়। বঙ্গদেশে উনিশ শতকে মদ্যপানের ব্যাপকতা আবার একইসঙ্গে মদ্যপানবিরোধী আন্দোলনের প্রসারও লক্ষ করা যায়। রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচরিতে' (১৯০৯) গোলদিঘির পাড়ে মদ খেয়ে তাঁর একদা 'টুপভুজঙ্গ' হয়ে বাড়ি ফেরার কথা বলেছেন, পরবর্তীকালে তিনিই ১৮৬১ সালে মেদিনীপুরে বঙ্গ দেশের প্রথম 'সুরাপান নিবারণী সভা' স্থাপন করেন। এই প্রসঙ্গেই রাধাকান্ত দেবের পৌত্র মেদিনীপুরের তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুরের কথা উল্লেখ করেছেন রাজনারায়ণ।[১৩৮] ব্রজেন্দ্রনারায়ণ অত্যন্ত মাতাল ছিলেন এবং স্ত্রীর অনুরোধে মদ ছাড়ার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় এলেই তিনি মদ্যপান করতেন এবং পরবর্তীকালে রাজনারায়ণ বসুর বক্তব্য অনুযায়ী 'মাতাল ও দুরাচার' হন। পরবর্তীকালে নানান আন্দোলনের ফলে প্রকাশ্যে এর ব্যাপকতা কমে এলেও, প্রকৃতপক্ষে মদ্যপান শিক্ষিত বাঙালি মধ্যশ্রেণির সামাজিক সংস্কারে পরিণত হয়ে আজও দিব্যি টিকে রয়েছে।

সেকালে এই মদ্যপানের ব্যাপকতা তথা সংস্কার অনেক শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুর পতনের কারণ। 'হিন্দু প্যাট্রিয়টে'র স্বনামধন্য সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই মদ্যপানজনিত কারণেই অকালে

মৃত্যুবরণ করেন। মনোমোহন বসুর ডায়েরিতে পাওয়া যায়,[১৩৯] মির্জাপুর নিবাসী এক ব্রাহ্মণ যুবা পাগলের কথা, যিনি 'বেশ ইংরেজি জানেন' এবং স্পষ্ট নির্ভুল ইংরেজিতেই মনোমোহনকে জানান যে, তিনি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, ফার্স্ট আর্টস্ 'ফেইল' হয়েছিলেন এবং 'কুসঙ্গে পড়িয়া মদ খাইয়া পাগল হইয়াছি।' পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষা থেকে মদ্যপানজনিত দোষটি অতি সহজেই বাঙালিবাবুরা আত্মস্থ করেছিলেন; সাহেব সাজার সবচেয়ে সহজ পন্থাই ছিল হ্যাট-বুট-কোট পরা এবং সুরাপান। বাঙালিবাবুরা এই বাহ্যিক প্রবণতাকে চরম বলে মনে করায় পাশ্চাত্য সভ্যতার সদ্‌গুণগুলি তাঁদের চির অধরাই থেকে গেল।

উনিশ শতকে 'বাবু'বিষয়ক প্রবন্ধ, রম্যরচনা প্রভৃতি সংখ্যায় প্রচুর না হলেও নিতান্ত অবহেলা যোগ্যও নয়। মনে রাখতে হবে, এই শতকের গোড়ার দিকেই ভবানীচরণ 'কলিকাতা কমলালয়' লিখে 'বাবু'দের ঐতিহাসিক মর্যাদা দান করেছিলেন। বাবু চরিত্রের ভালো-মন্দ, গুণ, দোষ সব কিছুকেই সামাজিক দৃষ্টিসাপেক্ষে দেখিয়ে, সেই সেই বিষয়ে আপন ব্যক্তিমত তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন কিংবা করবার চেষ্টা করেছেন। উনিশ শতকে বাবুসমাজের ইতিহাস অঙ্কনে এই গ্রন্থের অবদান অসামান্য। ভবানীচরণের গ্রন্থ রচনার সমকালেই বঙ্গদেশ থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকায় বাবু-বিষয়ক নানা সংবাদ ও রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। বিশেষ করে মিশনারিদের সম্পাদিত 'সমাচার দর্পণে' বাবু ও তাঁদের রুচিবিগর্হিত আচার-আচরণ-বিলাসিতা কঠোর সমালোচনার মধ্যে পড়ে। ইতিমধ্যেই ইংরেজি শিক্ষার হাত ধরে নব্যবাবুরা আত্মপ্রকাশ করলে রক্ষণশীল সামাজিকদের দল এদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন। সেকালের সব সংবাদপত্রের সমস্ত ফাইল পাওয়া সম্ভব হলে, এ বিষয়ে মনোজ্ঞ এবং পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা সম্ভবপর হত। নব্যবাবুরা অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের ভিড়ে মিশে গেলেন। সমকালীন পত্রপত্রিকায় যে কারণে নব্যবাবু ও মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের মধ্যে তেমন তফাত করা হয়নি। যদিও মধ্যশ্রেণির বাবুদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানান কারণে যে পিছুটান ছিল, নব্যবাবুর সেই পিছুটানকে অস্বীকার করতে পেরেছিলেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই মধ্যশ্রেণির ভদ্রলোকবাবুদের সাহেব প্রীতি এবং বিলিতি জীবনযাপন যেমন সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছে, তেমনি মধ্যশ্রেণির একটি বড়ো অংশের প্রতিনিধি ব্রাহ্মবাবুরাও নিন্দা-মন্দ ব্যঙ্গবিদ্রূপের শিকার হয়েছেন। সিপাহি বিদ্রোহের অব্যহিত পরে শাসকের ভয়ংকর মুখ হিতসাধনের মুখোশ ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছিল। মোহভঙ্গ হতে শুরু করেছিল রক্ষণশীল হিন্দু এবং প্রগতিপন্থী ব্রাহ্মদের মধ্যে। এইসময় থেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষায় স্নাতক বাঙালি মধ্য শ্রেণিরাও বেরিয়ে আসছেন। জীবন ও জীবিকার টানাপোড়েনে জন্ম নিচ্ছে এবং নতুন শ্রেণিচেতনা। দেখা দিচ্ছে নানান ধরনের বিচিত্রবাবুরা। পেশাগত পরিচয় বাবুরা আখ্যাত হচ্ছেন এবং তাঁদের বাবুয়ানার রূপ ও স্বরূপও বদলে বদলে যাচ্ছে। প্রায় একশো বছরের বাবুর ইতিহাস ও তার রূপবদলের অতি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা রম্যরচনার মোড়কে পরিবেশন করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর 'বাবু' নামক রচনাটি এ বিষয়ে উনিশ শতকের অন্যতম ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ রচনা। এই রচনাতেই নববাবু, নব্যবাবু এবং বাঙালি মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের ক্রমপরম্পরা প্রথম আবিষ্কৃত হল বলা চলে। হাসির চাল রচনাটির বহিরঙ্গ গুণ, অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে বঙ্কিমচন্দ্রই সম্ভবত প্রথম বাবু-ইতিহাসের একটি ধারাবাহিক সূত্র তুলে দিলেন আমাদের হাতে। পাশাপাশি রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ সে যুগের প্রধান প্রধান শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'কুলও আলোচনা-সমালোচনার মধ্য দিয়ে, কেউ-বা স্মৃতি-চর্বনার মাধ্যমে ধরিয়ে দিলেন বাবু তথা বাঙালি পুরুষের মানসিক এবং চারিত্রিক জগৎটিকে। এ এক অভাবনীয় কাজ!

ইতিপূর্বে বাবু কেবল প্রহসন ও নকশার বিষয়বস্তু হিসাবে বঙ্গসাহিত্যকে মুখর ও স্থানবিশেষে আবিল করে তুলেছিলেন। প্রবন্ধ-নিবন্ধ-রম্যরচনা বাবুকে নিছক হাস্য-উপহাসের বিষয় হিসাবে না দেখে, গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে অনুধাবনের চেষ্টা করতে চেয়েছে বাবুর হয়ে ওঠার কার্যকারণ, রূপ-রূপান্তরের চরিত্র ও পরিণতিকে। বস্তুত, প্রবন্ধ-নিবন্ধের সূত্রেই 'বাবু' ক্রমশ সিরিয়াস বিষয় হিসাবে গৃহীত হয় এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও বাবু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। এসব আলোচনা থেকেই উপলব্ধ হতে থাকে, 'বাবু' কোনো ছন্নছাড়া ভুঁইফোঁড় শ্রেণিবিশেষ নয়, বাংলার সমাজ ও ইতিহাসের অস্থিরতা ও সম্মিলনের গর্ভ থেকে উঠে আসা বাঙালি পুরুষের এক অনিবার্য ছাঁচ। নানান রূপ-রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে যা মানসিক ও ব্যবহারিক আচরণের অঙ্গীভূত হয়ে বাঙালি পুরুষকে পুষ্ট করেছে। 'বাবু'র ইতিহাস তাই বিচ্ছিন্ন শ্রেণি বা ব্যক্তির ইতিহাস নয়, বাবুর ইতিহাস বাঙালি পুরুষেরই হয়ে ওঠার ইতিহাস। উনিশ শতকের যাবতীয় ভাঙা- গড়ার চিহ্ন যদি কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়, তা এই ইতিহাসের মধ্যেই পাওয়া যাবে।

### টীকা ও সূত্রনির্দেশ


১. সেন, সুকুমার, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ৩য় খণ্ড, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ১৪০১ বঙ্গাব্দ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ৩।

২. তুঙ্গ, ড. সুধাংশুশেখর সম্পা., 'বাংলার বাইরে বাংলা গদ্যের চর্চাঃ ষোড়শ — অষ্টাদশ শতক, ১৯৮৫, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পৃ. ৩।

৩. শ্রীপান্থ, 'তলোয়ার বনাম কলমঃ প্রথম শতবর্ষে'; বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত, 'দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন', প্রথম সংস্করণ ১৯৮১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ.-১২৯।

৪. Acharya, Poromesh ,'Education in Old Calcutta'; Chaudhuri, Sukanta Edi, 'Calcutta the Living City', vol.1, Fifth Impression 2011, Oxford University Press, New Delhi, p. 90.

৫. রায় দেবেশ, 'উপনিবেশের সমাজ ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য', প্রথম সংস্করণ ১৯৯০, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেসের পক্ষে প্যাপিরাস, কলকাতা, পৃ. ২৭।

৬. রায়, ছন্দা, 'বাংলা সাহিত্য ও সংবাদ-সাময়িকপত্রের দর্পণে কলকাতা (১৮০০-১৮৭২)', প্রথম সংস্করণ ২০০৩, পুস্তক-বিপণি, কলকাতা, পৃ. ২৭৪-৭৫।

৭. 'বাবুর উপাখ্যান'; দ্র. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত ও সম্পাদিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', প্রথম খণ্ড, চতুর্থ মুদ্রণ ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃ. ১০৮।

৮. নাগ, অরুণ সম্পাদিত, 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', দ্বিতীয় পরিমার্জিত সং ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, সুবর্ণরেখা, কলিকাতা, পৃ. ২৯।

৯. 'বাবুর উপাখ্যান; প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

১০. তদেব, পৃ.১০৮।

১১. তদেব, পৃ. ১০৮।

১২. তদেব, পৃ. ১০৯-১১০।

১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত ও সম্পাদিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', প্রথম খণ্ড, চতুর্থ মুদ্রণ ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃ. ৯।

১৪. তদেব, পৃ. ১২।

১৫. তদেব, পৃ. ১১৫।

১৬. নাগ, অরুণ সম্পা., 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫।

১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত ও সম্পাদিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', প্রথম খণ্ড, পৃ. ১১৯-২২ দ্র.

১৮. তদেব, পৃ. ১২৩-১২৪।

১৯. তদেব, পৃ. ১২৪।

২০. তদেব, পৃ. ১২৮।

২১. তদেব, পৃ. ১৩১।

২২. তদেব, পৃ. ১৩৫।

২৩. তদেব, পৃ. ১৩৫।

২৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, 'কলিকাতা কমলালয়', 'রসরচনাসমগ্র', প্রথম নবপত্র সং ১৯৮৭, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ২১।

২৫. তদেব, পৃ. ৭-৮।

২৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত ও সম্পাদিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪-৯৫।

২৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, 'কলিকাতা কমলালয়', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

২৮. তদেব, পৃ. ১৭।

২৯. বসু, রাজনারায়ণ, 'সেকাল আর একাল', 'নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ', ঘোষ, বারিদবরণ সম্পা., প্রথম সং ১৪০২ বঙ্গাব্দ, কলেজস্ট্রিট পাবলিকেশন প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ৩০৪।

৩০. তদেব, পৃ. ১৯।

৩১. ঘোষ, লোকনাথ, 'কলকাতার বাবু বৃত্তান্ত'। সেন, শুদ্ধোদন অনূদিত, প্রথম সং ১৯৮৩, অয়ন, কলকাতা, পৃ. ১৯।

৩২. Mukherjee, S.N, 'Bhadralok and their Dals– Politics of Social Factions in Calcutta'; Sinha, Pradip Edi, 'The Urban Experience : Calcutta', 1st Raddhi Edi 1987, Riddhi-India, Kolkata, p. 49.

৩৩. তদেব, পৃ. ৫০।

৩৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, 'কলিকাতা কমলালয়', প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

৩৫. ঘোষ, বিনয়, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', ৪র্থ খণ্ড, পাঠভবন সংস্করণ ১৯৬৬, পাঠভবন, কলকাতা, পৃ. ২৫।

৩৬. তদেব, পৃ. ২১১।

৩৭. তদেব, পৃ. ২১২।
৩৮. তদেব, পৃ. ২৯৬।
৩৯. তদেব, পৃ. ২৯৬।
৪০. তদেব, পৃ. ২৯৬।
৪১. তদেব, পৃ. ২৬২।
৪২. তদেব, পৃ. ২৫৬-২৫৯ দ্র.।
৪৩. তদেব, পৃ. ২৫৭।
৪৪. তদেব, পৃ. ২৫৭।
৪৫. তদেব, পৃ. ২৫৯।
৪৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলিত ও সম্পাদিত, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯।
৪৭. দ্র. ঘোষ, জ্যোতির্ময় (ভাস্কর)-এর প্রবন্ধ; মিত্র, সতীশচন্দ্র, 'হুগলি জেলার ইতিহাস' প্রথম খণ্ড গ্রন্থে উল্লিখিত।
৪৮. সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র, 'বঙ্কিমচন্দ্র', দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৪, এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ১৩৪।
৪৯. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, 'ইংরাজস্তোত্র', লোকরহস্য';
বাগল, যোগেশচন্দ্র সম্পা., 'বঙ্কিম রচনাবলী', ২য় খণ্ড, নবম মুদ্রণ ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ৯-১০।
৫০. তদেব, পৃ. ১০।
৫১. তদেব, পৃ. ১০।
৫২. তদেব, পৃ. ১০।
৫৩. তদেব, পৃ. ১০।
৫৪. সুলভ সমাচার, ১ জানুয়ারি, ১৮৭১; ৮ পৌষ ১২৭৭।
৫৫. তদেব।
৫৬. দ্র. গোস্বামী ড. জয়ন্ত, 'সমাজচিত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন', প্রথম সং ১৩৮১, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, পৃ. ৫১৯।
৫৭. Majumdar, Biman Behari, 'History of Indian Social and Political Ideas', Second Edi, Reprint 1996, Firma KLM Private LTD, KolKata, p. 266.
৫৮. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, 'গর্দ্দভ', 'লোকরহস্য'। বঙ্কিম-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।
৫৯. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, 'বাবু', 'লোকরহস্য'। বঙ্কিম-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।
৬০. তদেব, পৃ. ১১।
৬১. ঘোষ, বিনয়, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৬।
৬২. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, 'বাবু', প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।
৬৩. তদেব, পৃ. ১১।

৬৪. Shil, Anil, 'The Emergence of Indian Nationalism Competition and Colaboration in the latter Nineteenth century, Cambridge, 1968. দ্র. Appendix.
৬৫. ত্রিপাঠী, অমলেশ, ‘স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস’, ষষ্ঠ মুদ্রণ ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ৩১।
৬৬. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, ‘হনূমদ্বাবুসংবাদ’, ‘লোকরহস্য’; বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।
৬৭. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, ‘পলিটিক্স’, ‘কমলাকান্ত’, বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২-৯৪ দ্র.।
৬৮. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, ‘হনূমদ্বাবুসংবাদ’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।
৬৯. ‘বাবু’, ঢাকাপ্রকাশ, ২ আষাঢ় ১২৮০ বঙ্গাব্দ; ১৫ জুন, ১৮৭৩;
দ্র. মামুন, মুনতাসীর, ‘উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র’, ৩য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৮, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ১২৭।
৭০. তদেব, পৃ. ১২৮।
৭১. তদেব, পৃ. ১২৯।
৭২. তদেব, পৃ. ১২৯।
৭৩. তদেব, পৃ. ১২৮।
৭৪. তদেব, পৃ. ১৩০।
৭৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ‘বাংলা সাময়িকপত্র’, ২য় খণ্ড, তৃতীয় মুদ্রণ, পুনর্মুদ্রণ ১৪১১ বঙ্গাব্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃ. ৩৪।
৭৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন সম্পা., ‘ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী’, ১ম খণ্ড, প্রথম দীপ সংস্করণ ২০০৭, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ২৯৫।
৭৭. তদেব, পৃ. ২৯৮।
৭৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, ‘কলিকাতা কমলালয়’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।
৭৯. ‘জাতিভেদ’; ‘ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী’, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০।
৮০. তদেব, পৃ. ৩০০।
৮১. তদেব, পৃ. ৩০১।
৮২. পাল, বিপিনচন্দ্র, ‘সত্তর বৎসর’, কল্পন সং ২০০৫, কল্পন, কলকাতা, পৃ. ১৪৪।
৮৩. তদেব, পৃ. ১৪৫।
৮৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন সম্পা., ‘ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী’, ২য় খণ্ড, প্রথম দীপ সংস্করণ ২০০৭, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ১৪৪।
৮৫. তদেব, পৃ. ১৪৬।
৮৬. তদেব, পৃ. ১৪৭।
৮৭. তদেব, পৃ. ১৪৮।
৮৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ, ‘বড় লোকের ছেলে মানুষ করিবার প্রকরণ’; ‘ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী’, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০-৪১।
৮৯. দ্র. রায়, সুপ্রকাশ, ‘ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম’, প্রথম সংস্করণ ১৯৭২, কলকাতা, পৃ. ১০৭-১০৮ দ্র.।

৯০. Naik, J.P & Nurullah, S, 'A students' History of Education in India', Macmillan Company of India LTD, 1974, p. 44-47.
৯১. সংকলয়িতা যদিও গ্রন্থটিকে 'নকশা' বলে উল্লেখ করেছেন, তবুও সাধারণ গুণ বিচার করেই বলা যায়, এটিকে 'নকশা' না বলে রম্যরচনা বলাই সংগত। আমরা 'রম্যরচনা' হিসাবে গ্রহণ করেই গ্রন্থটির আলোচনা এই অধ্যায়ে করেছি।
দ্র. বসু, বিপিনবিহারী, 'বিটকেলের দপ্তর'; সাহা, অর্ণব সম্পা., 'দুষ্প্রাপ্য বাংলা সাহিত্য' ৩য় খণ্ড, প্রথম সং ২০১৩, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ৪৭৪।
৯২. তদেব, পৃ. ৪৭৭।
৯৩. তদেব, পৃ. ৪৭৭।
৯৪. ঘোষ, বিনয়, 'কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত', ২য় খণ্ড, তৃতীয় সং ১৯৯৭, বাক্-সাহিত্য প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ১১৮-১২০।
৯৫. তদেব, পৃ. ১১৯।
৯৬. বসু, বিপিনবিহারী, 'বিটকেলের দপ্তর'; সাহা, অর্ণব সম্পা., 'দুষ্প্রাপ্য বাংলা সাহিত্য' ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৮।
৯৭. তদেব, পৃ. ৪৭৯।
৯৮. তদেব, পৃ. ৪৮১।
৯৯. তদেব, পৃ. ৪৮০।
১০০. Sarkar, Sumit, 'The City Imagined : Calcutta of the Nineteenth and Early Twentieth Centuries', 'Writing Social History', Eighth Impression 2008, Oxford University Press, New Delhi, p.190.
১০১. 'উকিলবাবু', 'বিটকেলের দপ্তর'; প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯০।
১০২. তদেব, পৃ. ৪৯০।
১০৩. তদেব, পৃ. ৪৯২।
১০৪. গোস্বামী, ড. জয়ন্ত, 'সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন', প্রথম সং ১৩৮১ বঙ্গাব্দ, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, পৃ. ৬২০।
১০৫. দ্র. Nair, P. Thankappan edi, 'Calcutta in the 19th century', 1st edi 1989, Firma KLM Pri. LTD, Kolkata, p. 353-354.
১০৬. 'বিটকেলের দপ্তর', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৩।
১০৭. তদেব, পৃ. ৪৯৩।
১০৮. তদেব, পৃ. ৪৯৪।
১০৯. তদেব, পৃ. ৪৯৪।
১১০. তদেব, পৃ. ৪৯৬।
১১১. তদেব, পৃ. ৪৯০।
১১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, 'কলিকাতা কমলালয়', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

১১৩. ঘোষ, বিনয়, ‘কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত’, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।
১১৪. ‘বিটকেলের দপ্তর’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০০।
১১৫. ‘বিটকেলের দপ্তর’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০১।
১১৬. তদেব, পৃ. ৫০০।
১১৭. ঘোষ, বারিদবরণ, ‘ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস’, প্রথম সং ১৯৯০, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, পৃ. ৮৪।
১১৮. কর, বঙ্কবিহারী, ‘পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত’, পুনর্মুদ্রণ ২০০৩, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলকাতা, পৃ. ৬১।
১১৯. তদেব, পৃ. ৬১।
১২০. Sastri, Sivanath, 'History of the Brahmo Samaj', Reprint 1993, Sadharan Brahmo Samaj, Kolkata, p. 398.
১২১. ‘বিটকেলের দপ্তর’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০২-৫০৩।
১২২. দাশ, ড. নির্মল সম্পা., ‘যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু রচনাবলী’ ২য় খণ্ড, প্রথম সং ১৯৮২, গ্রন্থমেলা, কলকাতা, পৃ. প ১৫।
১২৩. তদেব, পৃ. প ১৭।
১২৪. পাল, নিমাইচন্দ্র সম্পা., ‘দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনচরিত’, প্রথম সদেশ সং ২০০৫, সদেশ, কলকাতা, পৃ. ৮১।
১২৫. বসু, রাজনারায়ণ, ‘সেকাল আর একাল’;
ঘোষ, বারিদবরণ সম্পা., ‘রাজনারায়ণ বসু নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ’, প্রথম সং ১৪০২ বঙ্গাব্দ, কলেজস্ট্রিট পাবলিকেশন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ২৮৮।
১২৬. দ্র. পাদটীকা, তদেব, পৃ. ২৯২।
১২৭. শাস্ত্রী, শিবনাথ, ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’, ঘোষ, বারিদবরণ সম্পা., দ্বিতীয় সংশোধিত নিউ এজ সং ২০০৭, নিউ এজ, কলকাতা, পৃ. ৪৪।
১২৮. ‘সেকাল আর এ কাল’, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩।
১২৯. তদেব, পৃ. ২৯৪।
১৩০. তদেব, পৃ. ৩০৩।
১৩১. তদেব, পৃ. ৩০৫।
১৩২. তদেব, পৃ. ৩২৫।
১৩৩. তদেব, পৃ. ৩২৯।
১৩৪. ‘দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনচরিত’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।
১৩৫. তদেব, পৃ. ৩৫।
১৩৬. তদেব, পৃ. ৩৭-৩৮।
১৩৭. তদেব, পৃ. ৮৭।
১৩৮. বসু, রাজনারায়ণ, ‘আত্মচরিত’, নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৫৮।
১৩৯. দাস, সুনীল সম্পা., ‘মনোমোহন বসুর অপ্রকাশিত ডায়েরি’, প্রথম সংস্করণ ১৯৮১, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃ. ৫১-৫২।

## নবম অধ্যায়:

# বাবু-সাহিত্যের সাহিত্যিক ও সামাজিক ফল

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, উনিশ শতকের সমাজ ও সাহিত্য বাবুদের থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। অবশ্য, তা বোধ হয় সম্ভবও ছিল না। কারণ, উনিশ শতকের বাঙালি জীবনে বাবুদের ভূমিকা কেবল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুপ্রেরণা হিসাবে নয়, ধারকবাহক-চালকেরও। অর্থাৎ বাবুরা নিজেরা কেবল বিষয়ই নয়, বিষয়ীও বটে। আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়েছি যে, আর্থ-সামাজিক নানান কারণে নানাবিধ রূপ-রূপান্তরের মধ্য দিয়ে বাবু একটি নির্দিষ্ট সামাজিক রূপ লাভ করে উনিশ শতকের শেষ দিকে পৌঁছে। বাবু-সম্বন্ধীয় এই সামাজিক রূপ আসলে একটি ধারণা, যে ধারণার মধ্যে মিশে আছে আদি, নব, নব্য এবং শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের নানান বাহ্যিক ও মানসিক প্রবণতা, আচারবিচার, ধ্যানধারণার মতো বিষয়গুলি। ইতিহাসের অনিবার্য প্রভাবে বাঙালিবাবুরা উনিশ শতকের গোড়া থেকেই এক বিচিত্র সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিকের মতে[১], নবকৃষ্ণ প্রমুখের 'তালুকদারি কালচার' তথা আদিবাবুদের সামন্তযুগীয় কালচার, বণিকদের মিশ্রিত 'মার্কান্টাইল কালচার', তৃতীয় শ্রেণির ইংরেজ 'হঠাৎ নবাবদের' কালচার এবং হিন্দু ধনিক ও মধ্যবিত্তদের মিশ্র সামন্ততান্ত্রিক কালচার— এ সমস্তই সংমিশ্রিত হয়ে 'কলকাতা কালচারে'র সৃষ্টি হয়েছে, যার ধারকবাহক হলেন 'বাবু'রা। কিন্তু এর সঙ্গে মিশেছিল আদি কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রচলিত প্রাচীন কালচার, ভিন রাজ্য থেকে কাজের সন্ধানে আসা মানুষের কালচার, শাসক ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয়দের কালচার। এইসব বহুবিচিত্র সংস্কৃতির মধ্যেই বাবুরা পুষ্ট হয়ে উঠছিলেন। অন্দরমহলে নারীদের জীবনে প্রথম দিকে বিশেষ পরিবর্তন আসেনি, কারণ, বাইরের জগতে মেলামেশার বিচিত্র সুযোগ তাঁদের ছিল না। মনে রাখতে হবে, এঁদের সমান্তরালে ছিলেন বাংলার বৃহত্তর নিম্নবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণি, তাঁদেরকে আমরা 'বাবু'দের গোত্রভুক্ত করতে পারি না। অর্থ-বিত্ত বা অন্য কোনো উপায়ে এই শ্রেণির কেউ যদি উঠে আসতে পারেন উচ্চবিত্ত বা উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণিতে এবং তাঁদের রুচি-দীক্ষা-সংস্কৃতি যদি 'বাবু-কালচারে'র শর্ত পূরণ করে, তবেই তাঁদেরকে 'বাবু' দলের পর্যায়ভুক্ত করা যায়। প্রথম দিকে সামাজিক বাধায় এমন 'হয়ে' ওঠাটা সহজ ছিল না। কিন্তু শাসকের কৃপাদৃষ্টি থাকলে ব্রাহ্মণ্যশাসিত বাংলার সমাজে নবকৃষ্ণের মতো সাধারণ কায়স্থও গোষ্ঠীপ্রধান হিসাবে আদিবাবু হয়ে ওঠেন, কান্তমুদি হয়ে ওঠেন কেওকেটা; যবন-রমণী সংসর্গ করেও রামদুলাল দে-র টাকার জোরে কালীপ্রসাদ আবার স্বজাতিতে ফিরে আসতে পারেন। কিন্তু এ সবই বিচ্ছিন্ন ঘটনা। সাধারণের বাবু হয়ে উঠতে অপেক্ষা করতে হয়েছিল আরও অনেকদিন, যতদিন না শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হয়ে একশ্রেণির বিত্তহীন কিন্তু শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির জন্ম হল। এঁদের হাত ধরেই বিত্তনির্ভর বাবুত্ব থেকে ভরকেন্দ্র সরে এল শিক্ষিত চাকরিজীবী কিংবা চাকরিপ্রার্থী বাবুদের দিকে। অল্প বেতনের ইংরেজি স্কুল কিংবা ফ্রি-স্কুল চালু হলে নিম্নবিত্তরাও শিক্ষার সুযোগ পেল। একইসঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায় হিসাবে তাঁদের জন্যও খুলে গেল বাবুত্বের লোভনীয় দ্বার। সেদিন থেকেই বাবুত্ব আর বিশেষ কোনো class-এর নয়, বিশেষ বিশেষ মানসিক লক্ষণ বা প্রবণতা থাকলেই, বিত্তবান বা বিত্তহীন যে কেউই উক্ত আখ্যায় ভূষিত হতে পারেন। বাবুত্বের এই সাধারণীকরণে তার পূর্বগৌরব যে বিনষ্ট হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

আদি ও নববাবুদের যুগে (অর্থাৎ প্রায় ১৭৫০-১৮৩০) বাবুদের প্রতি সমাজের যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় বিচ্ছিন্নভাবে[২], তাতে ঈষৎ ব্যঙ্গ থাকলেও, তার চেয়ে বেশি আছে কৌতুক-কৌতূহল এবং সমবেদনা। এ যুগের দেশীয় সংবাদপত্রগুলি যদি পাওয়া সম্ভব হত, তবে বোঝা সহজ হত উনিশ শতকের

প্রথম দু-তিন দশকে আদি ও নব্যবাবুদের প্রতি দেশীয়দের সঠিক মনোভাব কী ছিল। কিন্তু ইংরেজ ঘোষিত বা মিশনারিদের কাগজে বাবুরা যেভাবে উপস্থিত, তাকে বাবু বিষয়ে শাসকের মনোভাবেরই প্রতিফলন হিসাবে দেখতে হবে। আদিবাবুদের সঙ্গে আঠারো শতকের শেষ দিকে ইংরেজ শাসকের যে মধুচন্দ্রিমার পর্ব চলেছিল, নববাবুদের সময়েই তা তলানিতে এসে ঠেকে। নিজেদের তাগিদেই শিক্ষিত ভিন্নরুচির এবং পাশ্চাত্যমুখীন বাবুদের চেয়েছিলেন শাসকেরা, নববাবুদের পক্ষে সেই আত্ম-রূপান্তর প্রায় অসম্ভব ছিল। তাঁদের জীবনযাত্রা ও কার্যকলাপ কোনোটিই শাসকের শোষণ সহায়ক ছিল না, ছিল একান্তভাবেই ব্যক্তিগত, আত্মরুচির পরিপোষক। বণিকতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের পক্ষে তা অস্বস্তিকর। কারণ তারা জানে, ব্যক্তির আত্মন-কে যদি ক্রয় না করা যায়, তবে তা বণিকতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের পক্ষে গভীর বিপদ। নববাবুদের ক্ষেত্রে তা সম্ভব ছিল না, কারণ তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত আত্মম্ভরি, অর্থ-বিত্ত-আভিজাত্যে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে নিঃসংশয়চিত্ত। নিজের আত্মনকে কোনো বিক্রয়মূল্যেই তাঁরা শাসকের কুক্ষিগত করতে দিতে রাজি হতেন না। আদিবাবুদের তথা পিতৃপুরুষের আমলেই এঁদের অনেকের আভিজাত্য অর্জিত হয়েছিল এবং উক্ত আভিজাত্য ছিল বংশানুক্রমিক। সেইসঙ্গেই বিত্ত-সম্পত্তির বিপুলতা তাঁদের দিয়েছিল তাৎক্ষণিক নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা। এই বিত্ত-সম্পত্তি অর্জনের কারণেই শাসকের সঙ্গে আদিবাবুদের ছিল প্রত্যক্ষ সম্পর্ক; সেই সম্পর্ককে বজায় রাখা ছিল শাসক ও শাসিত উভয় পক্ষেরই তাগিদ। কিন্তু নববাবুরা, ভবানীচরণের ভাষায় যাঁরা 'ভাগ্যবান লোক'[৩], তাঁরা যেহেতু পিতৃপুরুষের সঞ্চিত অর্থে বাবুয়ানা করতেন, নিজেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ কোনো কর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, অতএব শাসকের সঙ্গে সুসম্পর্কের দায় কিংবা শাসকের অনুগত হয়ে ওঠার তেমন কোনো তাগিদ তাঁদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে দেখা যায়নি। নিজেদের নিয়েই এঁরা ব্যস্ত থাকতেন বেশি। অতএব ধনতন্ত্র ও বণিকতন্ত্র এঁদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এমন এক বিশেষ শ্রেণির আকাঙক্ষা করেছিল, যাঁরা তাদের শাসন ও শোষণসহায়ক হবে। ১৮১৭-র হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর কাজটি অনেক সহজ হয়ে গেল, যদিও আসল সত্যটি হল, কাজ সহজ হবে বলেই হিন্দু কলেজ গড়ে উঠেছিল। ইতিপূর্বেই অবশ্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন প্রমুখ কিছু উচ্চ ও উচ্চমধ্যবিত্ত 'বাবু'রা সাহেবি স্কুলে পড়ে শাসক সহায়ক বাবু হিসাবে ইংরেজ মহল ও সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জন করেন। ইয়ং বেঙ্গল তথা নব্যবাবুদের যদি নববাবুর পরবর্তী প্রজন্মের বাবু হিসাবে দেখা হয়, তবে প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখেরা নব ও নব্যের মধ্যবর্তী মিসিং লিংক। ইয়ং বেঙ্গলদের মতোই তাঁরা ছিলেন শাসকের অনুগত শ্রেণি, তবে ইংরেজি শিক্ষিত হয়েও তাঁরা সাহেব-বাঙালি হয়ে ওঠেননি। এঁদের জীবনযাপন নব্যবাবুদের মতো সাহেবি অনুকরণে, আত্মপরিচয়হীন উদভ্রান্তির শিকার হয়নি। আবার নববাবুদের মতন এঁরা মদ-বেশ্যা-বিলাসিতায় তনু-মন-প্রাণ ঢেলে দেননি। শিক্ষা ও রুচির মানদন্ডটি এঁদের সময় থেকেই গড়ে উঠতে থাকে। নব্যবাবুরা দেশীয় যা কিছুকে বর্জন করেছিলেন বা করতে চেয়েছিলেন। নব ও নব্যের মধ্যবর্তী শ্রেণি ইংরেজি শিক্ষিত হয়েও দেশীয় ও বিজাতীয় সংস্কৃতির মধ্যে একটা আপোশমুখী সমন্বয়ের সংস্কৃতিতেই বিশ্বাসী ছিলেন। নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কারের ব্যাপারে এঁরা ছিলেন রক্ষণশীল, নব্যবাবুদের মতো এসবকে অস্বীকার করার মানসিকতা তাঁরা কোনোদিনই দেখাননি। এঁদের প্রতি সমাজের দৃষ্টি ছিল শ্রদ্ধার। বস্তুত, নববাবু এবং নব ও নব্যের মধ্যবর্তী বাবুদের কাল পর্যন্ত বাবুত্বের কিছু বিশেষ প্রবণতা নিন্দিত হলেও, সাধারণের চোখে 'বাবু'রা তখনও সমাজ-শত্রু বা ঘৃণ্য বলে বিবেচিত হননি। নিজ স্বার্থের প্রতিকূল বলে শাসকশ্রেণি তাঁদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেও, দেশীয় সমাজ তাঁদেরকে মান্যতা দিতেন, এমনকী 'বাবুত্ব' যে গুণ বলে বিবেচিত হত, ভবানীচরণের 'কলিকাতা কমলালয়'ই তার প্রমাণ।

কলকাতার নাগরিক রূপে আত্মপ্রকাশের আগে পর্যন্ত এখানে অনুসৃত হত প্রচলিত হিন্দু গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারাটি। বর্ণাশ্রমভিত্তিক সেই কাঠামো ছিল রক্ষণশীল, কোনোপ্রকার সংমিশ্রণের সুযোগ সচরাচর ছিল না। যাবনিক অধিকারের কালে বাঙালির এই রক্ষণশীলতা আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু নগর হিসাবে কলকাতার উত্থান রক্ষণশীল চিরাচরিত ধ্যানধারণাকে পালটে দিল। সাহেবদের হাতে বন কেটে বসত হয়ে ওঠা, গ্রাম থেকে শহরে রূপান্তরিত কলকাতায় মিশ্রিত সংস্কৃতির উত্থান ঘটল। সাধারণের জীবনে এই মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব ক্ষীণরেখ হলেও, উচ্চবিত্ত ও অভিজাত সম্প্রদায় এই প্রভাবকে ততটাই স্বীকার করে নিল, যতটা স্বীকার করলে ধর্মীয় সংস্কার বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে বলেছেন, 'দুইটি বিভিন্ন সভ্যতা বঙ্গদেশকে দুই দিক হইতে যখন এইরূপ সজোরে আঘাত করিতেছিল, আমরা ঠিক সেই সময়ে জন্মিয়া দুই রকমই দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। পূর্বে পোশাক ছিল চোগা, চাপকান, কাবা, পাগড়ি; এখন হ্যাট, কোট, ওয়েস্টকোট এবং পেন্টুলন। ভাষায় পূর্বে ফারসি আরবি শব্দেরই আধিক্য ছিল, এখন হইয়াছে ইংরেজি। বড়োমান্‌ষি আহার তখন ছিল কালিয়া পোলাও কোর্মা কোপ্তা কাবাব প্রভৃতি মোগলাই রকমের, এখন ইংরেজি মতে চপ কাটলেট পুডিং রোস্ট প্রভৃতি হইয়াছে। গৃহসজ্জাও তদ্রূপ,...। কিন্তু বেশ দেখা যাইতেছে কোনোটিই একাধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। প্রত্যেক সভ্যতাই আমাদের হিন্দু-সভ্যতার উপর এবং এক-একটা পলি বা স্তর রাখিয়া গিয়াছে মাত্র। কাজেই হিন্দু মুসলমানি এবং ইংরেজি এই তিন সভ্যতার উপাদান একত্র হইয়াছে, আঘাত না করিয়া ভাব করিয়াছে এবং যুদ্ধ না করিয়া সন্ধি করিয়াছে।'[৪] তবে সাধারণের কালচারে এই সাংস্কৃতিক সমন্বয় বিশেষ সুলভ ছিল না, এ একান্তভাবেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাষায়, 'বড়োমান্‌ষি' কালচার। আদিবাবুদের সময়ে, বিশেষ করে উৎসবাদি উপলক্ষ্যে এই কালচার বাঙালি অভিজাত বাবুদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক বলয়ে ঢুকে পড়ে। নবকৃষ্ণ, বারাণসী ঘোষ, দর্পনারায়ণ ঠাকুর প্রমুখ আদিবাবুদের বাড়ির দুর্গোৎসবে স্বয়ং বড়োলাট, ছোটোলাট সহ বিভিন্ন পদমর্যাদার সাহেবরা যোগ দিতেন।[৫] তাঁদের আপ্যায়নের জন্য সাধারণ হিন্দু গৃহে অভক্ষ্য ও অপেয় আহার্যেরও ব্যবস্থা করা হত। ১৭৯২ সালে রাজা সুখময়ের বাড়ির দুর্গোৎসবে 'হিন্দুস্তানি গানের সঙ্গে ইংরেজি সুর মিশিয়ে পরিবেশন' করা হয়।[৬] নবকৃষ্ণের দুর্গোৎসবে প্রথম দিন থেকেই বাইনাচের প্রবর্তন হয়েছিল এবং তা দেখবার জন্য শহরের বড়ো বড়ো সাহেব-সুবোরা আমন্ত্রিত হতেন এবং চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সহ আপ্যায়িত হতেন।[৭] নববাবুদের আমলেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। কোথাও তার জাঁক আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। নববাবুরা অভক্ষ্য-অপেয় উপভোগ করলেও দোল-দুর্গোৎসব-মন্দির প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির দ্বারা হিন্দুদের প্রচলিত ধর্মের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করতেন। অর্থ বিত্তের জোরে কৃতকর্মের দরুন প্রায়শ্চিত্ত করাও সুকঠিন ছিল না। তা ছাড়া তাঁদের আমোদ-বিলাস-খামখেয়ালিপনার সঙ্গে সাধারণ জনজীবনের একটি প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। উৎসব-পার্বণের সময় সাধারণের জন্যও এঁরা অকাতর অর্থব্যয় করতেন। দানশীলতার প্রশংসা পাওয়ার লোভেই হোক কিংবা দানশীল বলেই হোক, আদি ও নববাবুদের খ্যাতি ছিল সর্বজনবিদিত।[৮] এঁদের যে সামাজিক দলগুলি ছিল, তাঁদের ব্যয়ভারও এঁরা নির্বাহ করতেন। সব মিলিয়ে লাম্পট্য, বেশ্যাগমন বা পানদোষের মতো নিন্দনীয় দিকগুলি ঢাকা পড়ে যেত দানধ্যান-পুণ্যকর্ম-ধর্মীয় আনুগত্যের দরুন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা নিয়মিত মাসোহারা পেতেন বলে বাবুর দিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁরা নিদান দিতেন। ফলে বাবু-কৃত অপরাধগুলির পিছনে একপ্রকার ধর্মীয় সমর্থন বা যুক্তি থাকত। সমাজে সাধারণের চোখে আদি ও নববাবুরা ছিলেন বিস্ময়ের প্রতীক, তাঁদের নিন্দনীয় কাজগুলিও

কিঞ্চিৎ লঘু হিসাবেই দেখা হত বা দেখানো হত। ঘৃণা বা বিদ্রূপের চেয়ে উপহাস ও প্রশ্রয় বেশি ছিল তাঁদের প্রতি সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গিতে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই মিশনারিদের প্রকাশিত বাংলা কাগজে বাবুদের কীর্তিকলাপের নিন্দনীয় দিকগুলি সমালোচিত হতে থাকে। ইতিপূর্বে 'ক্যালকাটা জার্নালে'র মতো সাহেবি কাগজগুলিতেও বাবুদের আচার-আচরণ-জীবনযাত্রা, উৎসবাদি উপলক্ষ্যে দূষণীয় আমোদপ্রমোদের ব্যাপারটি ভর্ৎসিত হয়। বাবুদের প্রতি যুগের মানসিকতা যে বদলাচ্ছিল, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় এ সব থেকেই। তা ছাড়া পঞ্চাশ-ষাট বৎসর ধরে অকাতরে অর্থব্যয় করে আদি ও নববাবুদের অনেকেরই ভাঁড়ারে তখন মা ভবানী। এঁদের উত্তর প্রজন্ম জীবিকার সন্ধানে তখন শাসকের মুখাপেক্ষী। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে ইংরেজি শিক্ষার দিকে ঝুঁকেছেন মধ্যশ্রেণিও। পুরাতন রুচি-সংস্কার, ধ্যানধারণার মাঝে আর আটকা পড়ে থাকতে চাইছেন না এঁরা। আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে অকারণ বিলাসিতা, অপব্যয় ও বহুব্যয় কোনোটিই আর সম্ভবপর ছিল না এঁদের পক্ষে। প্রচলিত বাবুয়ানার ছাঁচটির বিরুদ্ধে একটা চাপা অসহিষ্ণুতা এইসময় থেকেই দেখা দিতে থাকে। আদি ও নববাবুদের সেই অন্তিম লগ্নে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩), 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫), 'দূতীবিলাস' (১৮২৫) এবং 'নববিবিবিলাস' (১৮৩১) লিখে এ জাতীয় বাবুদের প্রতি করুণ সমবেদনা জানালেন, পাশাপাশি সুপরামর্শ দিলেন, বিষয়-বাসনা-বিলাসিতা ত্যাগ করে ঈশ্বর চিন্তায় মন দিতে, পাপের পথ পরিত্যাগ করলে আখেরে যেমন ঐহিক জীবনে সুখী হওয়া যায়, পরকালেও তেমন সুখী হওয়া যাবে।[৯] কালের অমোঘ লিখন পড়তে পেরেছিলেন ভবানীচরণ। সে কারণেই বাবু কালচারের আদি ও নবপর্বের যেন এপিটাফ লিখে গেলেন তিনি। যদিও তখনও স্বল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত সাধারণ জনগণ বাবুদের বুলবুল লড়াই, বেড়ালের বে', দুর্গাপূজার জাঁকজমক এসব নিয়ে মুগ্ধ। সঙ্গে জমেছে আখড়াই, হাফ আখড়াই-এর তরজা, বাবুদের নতুন বিলাস রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা ও নাটক অভিনয়ের শখ। কিন্তু তাও কাল যে বদলাচ্ছিল, তাকেও অস্বীকার করতে পারেনি কেউ। ১৮১৫-য় 'আত্মীয়সভা' ও ব্রাহ্মধর্ম এবং ১৮২৯-এ সতীদাহ প্রথা রদ বিষয়ক আন্দোলনের মুখ হিসাবে এলিট বাঙালি 'বাবু' রামমোহন রায় কালের সেই দৃষ্টি বদলের ইঙ্গিত দিলেন। ১৮১৭-য় 'হিন্দু কলেজে'র প্রতিষ্ঠা এবং ১৮২৬-এ ওই কলেজের শিক্ষকরূপে ডিরোজিওর যোগদান নব্যবাবুদের আগমন সুনিশ্চিত করল। ইংরেজি শিক্ষার হাত ধরে উচ্চ ও মিশ্র উভয় শ্রেণির ছাত্ররাই বেকন, হিউম, বার্কলে, লক, স্টুয়ার্ট প্রমুখের চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হল এবং পুরোনো সমাজ কাঠামোর প্রেক্ষিতে নিজেদের ভাবতে শিখল বিপ্লবী ধরনে।[১০] অতএব 'বিচারবিবেচনাহীন ধ্রুব বিশ্বাসের স্থান করে নিল যুক্তি', সেইসঙ্গেই রুচিহীন নবাবি চালের বিলাসিতার প্রতি দেখা দিল ঘৃণা। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি প্রীতি থেকেই জন্ম নিলেন নব্যবাবুরা, যাঁরা চলনে-বলনে-ভাবনায়-বিশ্বাসে আদ্যান্ত সাহেব।

নব্যবাবুদের আচার-আচরণ সমাজের চোখে তেমন নিন্দনীয় বা অভিনব ব্যাপার বলে মনে হত না, যদি না তাঁরা প্রচলিত সমাজ-সংস্কার, এমনকী হিন্দু ধর্মের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করতেন। তৎকালীন কলেজের কেরানি হরমোহন চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'The principles and practices of the Hindu religion were openly ridiculed and condemned, and angry disputes were held on moral subjects; the sentiments of Hume had been widely diffused and warmly patronized... The most glowing harangues were made at debating clubs, then very numerous. The Hindu Religion was

denounced as vile and corrupt and unworthy of the regard of national beings. The degraded state of the Hindus formed the topic of many debates; their ignorance and superstition were declared to be the causes of such a state, and it was then resolved that nothing but a liberal education could enfranchise the minds of the people. The degradation of the female mind was viewed with indignation;...'[১১] পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু কলেজের কিছু ছাত্রের প্রচলিত সমাজ সংস্কার ধর্মকে অস্বীকার করার মনোভাব ক্রমশ অন্য ছাত্র-যুবাদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়। অন্যতম ডিরোজিয়ান প্যারীচাঁদ মিত্র উত্তরকালে স্বীকার করেছেন যে, 'তাঁহার (ডিরোজিও) শিক্ষার এই ফল দর্শিল যে ছাত্রেরা ধর্মজ্ঞান বিষয়ে অনেক উন্নতি লাভ করিল। কিন্তু হিন্দু ধর্মের প্রতি তাহাদিগের বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অখাদ্য ভোজন, অপেয় পান আর হিন্দু ধর্মে নিন্দা ও বিদ্রূপ অনেক পরিবারে প্রকাশ পাইল।'[১২] প্রচলিত হিন্দু ধর্মের প্রতি আঘাত এবং স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ, নারীস্বাধীনতার স্বপক্ষে কথা বলে এই নব্যবাবুরা দ্রুত রক্ষণশীল সমাজের বিরাগভাজন হয়ে উঠলেন। ইতিমধ্যে ১৮৩০ সালে রামমোহন তাঁর নবনির্মিত ভবনে ব্রাহ্মসভা স্থাপন করে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে আহ্বান করলেন একত্রে পরমেশ্বরের উপাসনা করতে, সেইসঙ্গেই এখানে কোনোপ্রকার দেব-দেবীর পূজা হবে না বলা হল।[১৩] এই ঘটনাও অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিল। নব্যবাবুরা প্রচলিত হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোয় রক্ষণশীলরা তাঁদের সমাজ-শত্রু হিসাবে দেখতে লাগলেন। সাধারণ হিন্দুসমাজও নব্যবাবুদের প্রতি রুষ্ট হয়ে উঠল। বলা যায়, এই সময় থেকেই বাবুদের বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিরোধের প্রবণতা দেখা দিতে থাকে।

নব্যবাবুরা ছিলেন সুশিক্ষিত, পাশ্চাত্য আদবকায়দায় অভ্যস্ত এবং শাসকদের বশংবদ গোষ্ঠী। ধর্ম ও ঈশ্বরকে তাঁরা অস্বীকার করেননি দু-একজন ছাড়া; কিন্তু সে ঈশ্বর হিন্দুর ঈশ্বর নন, সে ধর্মও হিন্দুধর্ম নয়। মূলত খ্রিস্ট ও তাঁর প্রচারিত ধর্মমতকেই এঁরা মান্যতা দিলেন। শাসকপ্রীতিও যে তাঁদের কতকটা প্রভাবিত করেছিল সন্দেহ নেই। নব্যবাবুরা হিন্দুধর্মের বিলুপ্তির কারণ হতে পারে ভেবে রক্ষণশীল গোষ্ঠী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। রাধাকান্ত দেবের 'ধর্মসভা' এবং ভবানীচরণের 'সমাচার চন্দ্রিকা' নব্যবাবুদের কার্যকলাপকে মোটেই সুনজরে দেখেননি এবং স্বাভাবিকভাবেই নিন্দা-মন্দ-সমালোচনা করেছিলেন। অন্যদিকে, নব্যবাবুদের নিজস্ব পত্রিকাগুলি প্রচলিত ধর্ম সংস্কারকে আঘাত করে নব্যবাবুদের চিন্তা ও মুক্ত ভাবনাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' এবং গৌরীশংকর ভট্টাচার্যের ('গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য') 'সম্বাদ ভাস্কর' নব্যবাবুদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গবিদ্রূপ শাণিত করেন। গৌরীশংকর অবশ্য যতদিন ব্রহ্মসভার বিরোধী ধর্মসভার নন্দলাল ঠাকুরের অনুগত ছিলেন, ততদিনই 'সম্বাদ ভাস্কর' নব্যবাবুদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শাণায়। পরে অন্যতম 'ইয়ং বেঙ্গল' দক্ষিণানন্দন (দক্ষিণারঞ্জন) মুখোপাধ্যায়ের অনুগ্রহ লাভ করেন এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে যায়। 'জ্ঞানান্বেষণ', 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া', 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রমুখ সংবাদপত্রগুলিও নব্যবাবুদের সমর্থনে তাঁদের বক্তব্যকে তুলে ধরেন এবং জনমত গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তখনও শিক্ষার আলো সমাজের বৃহত্তর জনসাধারণের ভাবনা ও মুক্তচিন্তাকে আলোকিত করে তুলতে পারেনি। ফলে, তাঁদের কাছে ব্রাহ্মণ্য নির্ধারিত সমাজ কাঠামোই ছিল সত্য। ফলে নব্যবাবুদের যাবতীয় উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বৃহত্তর জনসাধারণ তাঁদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আদি ও নব্যবাবুদের প্রতি যে শ্রদ্ধামিশ্রিত

সহমর্মিতার বোধ ছিল সাধারণের মনে, তার জায়গায় নব্যবাবুদের জন্য এল শঙ্কা-ভয়, ঘৃণা ও বিদ্বেষ। বাবু বিষয়ে সামাজিক প্রতিরোধ এই সময় থেকে একটু একটু করে বাড়তে থাকে।

নব্যবাবুদের মূল প্রবণতাগুলি ছিল শাসকনির্ভর এবং শাসকমুখী। তাঁরা জীবনযাপনে ভাবনায়-চিন্তায় সাহেব হয়ে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। পরবর্তীকালের সুবিখ্যাত 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' এঁদেরই মানস-প্রবণতার শ্রেষ্ঠ ফল। অন্যদিকে স্বধর্ম ত্যাগ করে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মানুষদের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ সমকালে সমাজে ঝড় তোলে। এই জাতীয় ঘটনায় রক্ষণশীলরা আরও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। এই সময়েই একের পর এক মেডিক্যাল কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ, হুগলি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, ফিরিঙ্গি স্কুলের পাশাপাশি অবৈতনিক ইংরেজি শিক্ষার স্কুলও গড়ে ওঠে একের পর এক। চাকরি লাভের আশায় সাধারণ মধ্যবিত্তরাও সেসব শিক্ষাকেন্দ্রে ভিড় জমাতে থাকেন। নব্যবাবুরা এই সময় স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রসঙ্গে মেতে ছিলেন। ১৮৪৯ সালে বেথুন স্কুলের দরজা খুলে যায় মেয়েদের শিক্ষার আলো দেবার জন্য। তা নিয়েও রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ আলোড়িত হতে থাকে। নব্যবাবুদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি আরও ঘোরতর হয়ে ওঠে।

শিক্ষায় চেতনায় নব্যবাবুরা পূর্ববর্তী বাবুদের তুলনায় গৌরবজনক স্থানলাভের যোগ্য হলেও, তাঁদের প্রধান দুর্বলতা ছিল মদ্যপান। তাঁরা অবশ্য এটিকে দুর্বলতা ভাবতেন না, ভাবতেন সভ্যতারই একটি আবশ্যকীয় অঙ্গ। শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, 'সে সময়কার সংস্কার পথে অগ্রসর ব্যক্তিগণ সুরাপানকে হীন চক্ষে দেখিতেন না।'[১৪] রামমোহন রায়ের প্রাত্যহিক পরিমিত মদ্যপানের দৃষ্টান্তও নব্যবাবুদের উৎসাহিত করে। রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচরিতে' জানিয়েছেন যে, ১৮৪৪ সালের প্রথমে তিনি হিন্দু কলেজ ছাড়তে বাধ্য হন, যার প্রধান কারণ, অপরিমিত মদ্যপান। তিনি বলেছেন, 'তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে, মদ্যপান করা সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই। তখনকার কলেজের ছোকরারা মদ্যপায়ী ছিলেন বটে, কিন্তু বেশ্যাসক্ত ছিলেন না। তাঁহাদিগের এক পুরুষ পূর্বে যুবকেরা মদ্যপান করিত না— কিন্তু অত্যন্ত বেশ্যাসক্ত ছিল; গাঁজা, চরস খাইত, বুলবুলের লড়াই দেখিত, বাজি রাখিয়া ঘুড়ি উড়াইত ও বাবরি রাখিয়া মস্ত পাড়ওয়ালা ঢাকাই ধুতি পরিত। কলেজের ছোকরারা এই সকল রীতি একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কখনোই পানাসক্ত হইতেন না, যদ্যপি তাহা সভ্যতার চিহ্ন এমন মনে না করিতেন।'[১৫] ক্রমশ ইংরেজি শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত নব্যবাবুদের মধ্যে মদ্যপান ব্যাপকতা লাভ করে। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও গোপনে অনেকে বেশ্যাসক্তও ছিলেন, যদিও পূর্ববর্তী বাবুদের তুলনায় যথেষ্ট কম। সমসাময়িক সংবাদপত্রগুলিতে নব্যবাবুদের বিরুদ্ধে মদ্যপান ও প্রগতিশীলতার নামে হিন্দুসমাজের মূল ভিতটি ধ্বংস করবার চক্রান্তের যত অভিযোগই থাক না কেন, বেশ্যাসক্তির তেমন কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে। তবে মদ্যপানের সূত্রে নব্যবাবুদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ সমালোচনা এই সময় থেকেই শুরু হয়। 'বাবু' নামটির প্রতি মোহও ধীরে ধীরে কমতে থাকে সাধারণের মন থেকে।

নব্যবাবুদের প্রায় সমকালেই মধ্যশ্রেণিও দ্রুত উঠে আসতে থাকে পাদপ্রদীপের আলোয়। রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্মসভাকে কেন্দ্র করে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত একই ধ্যানধারণার ছত্রছায়ায় এসে উপস্থিত হয়। স্কুলশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, ইংরেজি শিক্ষা প্রভৃতির হাত ধরে মধ্যশ্রেণি দ্রুত উঠে আসতে থাকেন এবং চাকরির ক্ষেত্রে নব্যবাবুদের প্রতিস্পর্ধী হয়ে দাঁড়ান। ১৮৫৭-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পর এঁদের সংখ্যার দ্রুত প্রসার ঘটে। এঁদের একটি বড়ো অংশ ব্রাহ্মধর্মের সংস্পর্শে এসে প্রাথমিকভাবে ওই ধর্মে

আস্থা স্থাপন করেন, কিন্তু পরবর্তীকালে সংশয়বাদীতে পরিণত হন এবং কেউ পুনরায় প্রচলিত হিন্দুধর্মে ফিরে যান। একইসঙ্গে মধ্যশ্রেণিও নব্যবাবুদের দেখাদেখি মদ্যপানকে 'সভ্যতার চিহ্ন' বলে ভেবে বসেন এবং সমাজে এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় অক্ষয়কুমার দত্ত 'নব্য সম্প্রদায়ী প্রায় তাবৎ বিদ্বান ও ধনী যুবক'কে মদ্যপান দোষে দুষ্ট দেখে দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশা জ্ঞাপন করেছেন।[১৬] কয়েক বছরের মধ্যেই 'নব্যসম্প্রদায়ী'দের সঙ্গে সঙ্গে 'কলিকাতাস্থ অনেকানেক ভদ্রলোকের' মধ্যেই এই 'অভদ্ররীতি' দেখে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী : 'তাঁহারা (''ভদ্রলোক''বাবুরা) মাদক সেবন ও তাহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য পাপাচরণ করিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি অথবা তাহার অধিক ভাগ জাগরণ করেন, দিবসের প্রথম ভাগ নিদ্রায় ক্ষেপণ করিয়া স্নানভোজনাদি প্রকৃতিসিদ্ধ কর্ম্ম সকল সাধন করেন, পরে কেহ কেহ অল্পায়াস-সাধ্য সামান্য প্রকার বিষয়কার্য্য সম্পাদন, কেহ কেহ-বা নিরর্থক অলীক ক্রিয়াতে কিঞ্চিৎ কাল হরণ করিয়া রজনীর আগমন প্রত্যাশায় প্রত্যাশ্যাপন্ন থাকেন, এবং রজনী উপস্থিত হইলেই পুনর্বার মোহ-হ্রদে মগ্ন হইয়া পাপ-পঙ্কে লুণ্ঠিত হইতে থাকেন। এই তাঁহারদের প্রচলিত রীতি, ইহাই তাঁহারদের নিত্য কৃত্য, এইরূপে তাঁহারদের জীবন-যাপন হইতেছে, ইহাতে তাঁহারা অবিলম্বে অকর্মণ্য হইয়া উঠেন।... তাঁহারদের সন্তানসন্ততিরাও তদনুরূপ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া সংসারের পাপ-প্রবাহ প্রবল করিতে থাকে। এইরূপ কত শত সুপ্রসিদ্ধ সদ্বংশ কলুষ-কলঙ্গে কলঙ্কিত হইয়া একেবারে উচ্ছিন্ন যাইতেছে। মহানগরী কলিকাতা এই সমস্ত পাপের আকর স্থান। কলিকাতা রূপ পাপ-সমুদ্র হইতে যে তরঙ্গ উত্থিত হয়, তদ্বারা পার্শ্ববর্ত্তি গ্রাম সমুদায় অবিলম্বে প্লাবণ হইতে থাকে।'[১৭] অক্ষয়কুমার দত্তের এই বিবরণ পড়লে মনে হবে যেন নববাবুদের কথা পড়ছি, ভবানীচরণ কথিত 'বিষয়ি ভদ্রলোকের ধারা'র 'ভাগ্যবানবাবুরা' এভাবেই দিন-রাত অতিবাহিত করতেন। কিন্তু নববাবু নন এঁরা। বেশ্যাবাজির ব্যয়ভার নির্বাহ করার মতো আর্থিক সামর্থ্য নেই মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের। অতএব মদ্যপানকেই এঁরা পাখির চোখ দেখলেন। একইসঙ্গে সভ্য ও প্রগতিশীল হওয়ার এহেন সহজ পন্থা আর হতে পারে না। এমনকী টুপভুজঙ্গ হয়ে ব্রাহ্মসভার উপাচার্যের সমাজে আগমন এবং মাতাল হয়ে লুটিয়ে পড়ার ঘটনাও জানতে পারা যায়।[১৮]

মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের মধ্যে পানদোষের এই ব্যাপকতার কারণেই প্যারীচরণ সরকার, কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা মদ্যপান নিবারণী আন্দোলনে সামিল হন। যদিও সেসব আন্দোলনের ফলে এই প্রবণতা খুব যে হ্রাস পেয়েছিল এমন নয়। বরং কলকাতা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে মদ্যপানের ব্যাপকতা নিম্নবিত্তদের মধ্যেও মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়ে। উনিশ শতকের শেষদিকে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি জাতীয় কংগ্রেসের হয়ে প্রচারের কাজে বেরিয়ে এই মদ্যপানজনিত দুরাবস্থা দেখে তার প্রতিকারের বিষয়ে উদ্যোগী হন।[১৯] সমসাময়িক পত্রপত্রিকা, বটতলার প্রহসন ও ব্যঙ্গ রচনায় নব্যবাবু ও মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের পানদোষ অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। মধ্যশ্রেণির 'ব্রাহ্ম'বাবুরা এ বিষয়ে অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠেন। পানদোষকে কেন্দ্র করে যে সামাজিক আন্দোলনগুলি দেখা দেয়, তার প্রভাবে বাবুশ্রেণি নিন্দিত-ধিক্কৃত সম্প্রদায় হিসাবে গণ্য হতে থাকেন। 'বাবু' বলতেই অলস, কর্মবিমুখ, হতোদ্যম, অহংকারী, শিক্ষাভিমানী, মদ্যপ ব্যক্তিবিশেষ বোঝাতে থাকে। নিন্দার্থে শব্দটি প্রযুক্ত হওয়ায় পরবর্তীকালে ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই 'Mr'-এর পরিবর্তে 'বাবু' শব্দটি ব্যবহারে রুষ্ট ও অপমানিত হতেন।

একথা যথার্থ যে, মধ্যশ্রেণির ‘ভদ্রলোক’বাবুরা যে প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং বৈচিত্র্য সঞ্চার করেছেন আলোচ্য শব্দটিতে, তেমনটি সম্ভব হয়নি, আদি-নব-নব্য— কোনো বাবুদের ক্ষেত্রে। তার কারণ, মধ্যবিত্তবাবুরা যে পরিমাণ মানসিক দ্বন্দ্বের শিকার, অন্য বাবুরা তেমনটি নয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির আলোচনায় আমরা দেখেছি, একইসঙ্গে স্বদেশের প্রতি অনুরাগ এবং শাসকের প্রতি আনুগত্য, পরাধীনতার জন্য ক্ষোভ এবং ইংরেজ শাসকের ছত্রছায়ায় কাজ করার আকুতি, স্বদেশ-স্বজাতির ধর্মসংস্কৃতির প্রতি পিছুটান এবং পাশ্চাত্যের আকর্ষণের কারণে ছুটে চলা— এ সমস্তই মধ্যশ্রেণির ‘ভদ্রলোক’বাবুদের মধ্যে মানসিক Conflict-এর জন্ম দিয়েছিল। ‘হিন্দুমেলা’র হাত ধরে যে স্বাজাত্যবোধের উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল, অলস-কর্মবিমুখ-বাগাড়ম্বরপ্রিয় বাঙালি মধ্যশ্রেণির ভিতর তা প্রাথমিকভাবে আবেগ সঞ্চার করলেও, অচিরেই তা উপলব্ধিহীন অনুকরণে পরিণত হয়। একে স্বদেশচেতনা না বলে, স্বাদেশিকতার ‘হুজুগ’ বলে দেখাই সংগত। নানারকম অলীক কল্পনায় ভারতবর্ষের শৃঙ্খলমোচনের চেষ্টা, পত্রপত্রিকা প্রকাশ, সভা-সমিতিতে বক্তৃতাদানের মাধ্যমে দেশোদ্ধারের স্বপ্ন দেখা, কাজের চেয়ে কথায় দক্ষতা বেশি দেখানো, স্বায়ত্তশাসনের নামে আবেদন-নিবেদন ও কৃপাভিক্ষার রাজনীতি মধ্যশ্রেণির ‘ভদ্রলোক’বাবুদের হাস্যাস্পদ শ্রেণিতে পরিণত করেছিল। পূর্ববর্তী বাবুরা যতটুকু সম্মান-শ্রদ্ধা ও আভিজাত্যের প্রাপক ছিলেন, মধ্যশ্রেণির ‘ভদ্রলোক’বাবুরা তার কিছুই পেলেন না। তাঁদের জন্য সমাজ নির্দিষ্ট করল অবজ্ঞা,! উপহাস ও অপমান। উনিশ শতকের বাবু-সাহিত্যের সিংহভাগই এই মধ্যশ্রেণির ‘ভদ্রলোক’বাবুদের মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও তার পরিণামের চিত্র। ইতিহাসের অনিবার্য তাগিদে মধ্যশ্রেণি একইসঙ্গে পেয়েছিলেন নব এবং নব্য উভয়বাবুদের গুণ ও দোষ। ব্যক্তিগত জীবনের আর্থিক দূরবস্থা কিংবা সীমাবদ্ধতার কারণে এঁরা অনেকেই সেদিন লাম্পট্য ও পানদোষের ব্যাপারে আপোশকামী ছিলেন। আবার একই কারণে মধ্যবিত্তসুলভ পাপবোধ থেকেও তাঁরা পুরোপুরি মুক্ত ছিলেন না। নব ও নব্যবাবুদের এ ব্যাপারে কোনো পাপবোধের দংশন ছিল না। নববাবুরা পাপবোধ-অনুশোচনা এসব ব্যাপারকে বিন্দুমাত্র আমল দিতেন না, নব্যবাবুরা তো লাম্পট্যকে পরিহার করে চললেও মদ্যপানকে ‘সভ্যতার অঙ্গস্বরূপ’ অবশ্য পালনীয় রীতি বলে মান্য করতেন। কিন্তু মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত ‘ভদ্রলোক’বাবুরা দেশি ও বিদেশি রীতি-সংস্কারের মধ্যে আপোশ করতে বাধ্য হলেও, অন্তর্লীন দ্বিধায় তাঁরা পীড়িতও হতেন। নব ও নব্যবাবুদের এ জাতীয় পীড়াবোধ ছিল না বলেই তাঁদের আচার-আচরণের মধ্যে কোনো গোপনীয়তা ছিল না, তাঁরা যা করতেন, প্রকাশ্যে করতেন। সমাজের প্রতিক্রিয়া, নিন্দামন্দ বা সমালোচনাতেও তাঁরা বিচলিত হতেন না। মধ্যশ্রেণির ‘ভদ্রলোক’বাবুরা অভ্যন্তরীণ পীড়াবোধের কারণেই প্রকাশ্য আচরণের সাহস দেখাতে পারেননি, আবার ওইসব ব্যাপারে আকর্ষণও তাঁদের কম ছিল না। ফলে এই সময় থেকে মধ্যশ্রেণির ‘ভদ্রলোক’বাবুদের হাত ধরে এ জাতীয় আচরণের ক্ষেত্রে এক ধরনের গোপনীয়তা দেখা দিল। পূর্বেকার কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির বিষয়টি উন্মুক্ত ছিল বলে তার অভিঘাত জনমানসে তুলনামূলকভাবে কম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করত। কিন্তু বর্তমানে কেচ্ছার বিষয়টি গোপনীয়তা থেকে হঠাৎ জনসমক্ষে এসে পড়ায় জনমানসে তার অভিঘাত এবং প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই বেশি হল। মধ্যশ্রেণির ‘ভদ্রলোক’বাবুদের দ্বিচারিতা, গোপন কর্মকাণ্ড, মানসিক অস্থিরতা, কথায় ও কাজে দূরতর ফারাক, বিশ্বাসহীনতা— সমস্তই সেদিন বাবু-সাহিত্যের হাত ধরে ধিক্কৃত, নিন্দিত ও সমালোচিত হল। প্যারীচাঁদের রচনায় বাবুকুলের নির্ভরযোগ্য চিত্র উপস্থিত করা হলেও, হুতোমই সর্বপ্রথম তাঁর নকশার বাবুদের সব শ্রেণির বিরুদ্ধে

সামাজিক অসহিষ্ণুতার কথা শোনালেন। এরপর সমসাময়িক বটতলা সাহিত্যে বাবু-সাহিত্যের জোয়ার আসে। এইসব সাহিত্যের মূল অবলম্বন ছিল বাবুদের সমসাময়িক বাস্তব নানান কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি, মদ্যপান-পরস্ত্রীগমন-লাম্পট্যের মতো চরিত্রদোষ, উন্মার্গেগামী মানসিকতা, শিক্ষাভিমান, স্ত্রীস্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে বাবুর অতি-উদ্যম ও পরিণাম, সাহেবি চালচলন, শূন্যগর্ভ আস্ফালন, টাইটেল-প্রীতি, অমিতব্যয়ের কারণে দুরবস্থা ইত্যাদি এবং লক্ষ্য ছিল 'বাবু' ও তার চালচলন বিষয়ে সামাজিক অসহিষ্ণুতা জ্ঞাপন ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা। বস্তুত, বটতলার বাবু-সাহিত্য বাবুদের বিরুদ্ধে সমাজের একটি ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে, যা এঁদের ব্যাপারে সমাজে প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়; মূলধারার তথাকথিত শিষ্ট রচনাতেও বাবুদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠে। বাবুত্ব যে অনুকরণীয় কোনো স্বভাব নয়, 'বাবু' হয়ে ওঠা আদৌ যে প্রশংসনীয় কোনো ব্যাপার নয়, এ ব্যাপারে সমাজ মানসকে গড়ে তোলা এবং 'বাবু'দের বিরুদ্ধে সমাজের এক বৃহৎ অংশের নঞর্থক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ব্যাপারে বাবু-সাহিত্যই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বাবুদের মদ্যপান, লাম্পট্য ইত্যাদি মানসিকতার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলনের ব্যাপারেও বাবু-সাহিত্যই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে কখনো কখনো। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের পর লর্ড ডালহৌসির আমলে ডাক-ব্যবস্থার প্রবর্তন হওয়ায় এবং রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা শুরু হওয়ায়, শহর ও মফস্সলের দূরত্ব কমে আসে। পত্রপত্রিকা বা পুস্তিকা মফস্সলেও সহজলভ্য হয়। যার দরুন 'বাবু'দের বিরুদ্ধে জনমানসের প্রতিরোধ কেবল কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, সুদূর মফস্সলেও জনমত গঠিত হয়েছিল। একথা ঠিক যে, বাবুদের জীবনযাপনের কথা ওয়াকিবহাল হয়ে মফস্সলের থেকে কেউ কেউ ছুটে আসে শহর-কলকাতায় 'বাবু জন্মাভিলাসী' হতে, কিন্তু বৃহত্তর জনপ্রতিরোধের তুলনায় সে সংখ্যা নেহাতই কম। একইসঙ্গে এ কথাও ঠিক যে, বাবু-সাহিত্যের প্রভাবে সামাজিক আন্দোলনের সূচনা হলে প্রত্যক্ষভাবে বাবুয়ানার আচরণ কম হয়ে এলেও, গুপ্তভাবে এই আচরণ বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়া আচরণ বাহ্যিকভাবে কমে এলেও অলসতা, বাগাড়ম্বর, কর্মবিমুখতা, অলীক চিন্তা ইত্যাদির মতো মানসিক লক্ষণগুলি বাঙালিবাবুদের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য হিসাবে রয়েই যায়। তবুও বলা চলে, বাবু বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে, সামাজিক আন্দোলনের পরিবেশও সৃষ্টি হয়, যার ফলে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই বাহ্যত 'বাবু'র দল সমাজ থেকে দ্রুত অদৃশ্য হতে শুরু করেন।

কিন্তু, বাবু-সাহিত্যের এই সামাজিক গুরুত্বের তুলনায় তার সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। বস্তুত, সমাজের একটি বিশেষ মানসিক প্রবণতাযুক্ত শ্রেণিকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর আর কোনো প্রান্তে ভদ্র-ইতর হরেকরকম গ্রন্থ ও পুস্তিকা রচিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। বাবু-বিষয়ক প্রায় পাঁচশতর অধিক গল্প উপন্যাস, নকশা, প্রহসনে-নাটক, কাব্য-কবিতা, প্রবন্ধ-রম্যরচনার অধিকাংশরই আজ আর অস্তিত্ব না থাকলেও, গ্রন্থাদির সংখ্যার দ্বারাই প্রমাণিত হয়, সমাজ কতটা সিরিয়াস ছিল বাবু ও তাঁর বাবুত্বের ব্যাপারে। এইসব সামাজিক চিন্তাই সংহত হয়ে সামাজিক আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল যেমন, তেমনি নানানভাবে বাঙালি কৃষ্টি-সংস্কৃতিকেও সমৃদ্ধ করেছে। শুধু সাহিত্য নয়, বাংলায় নিজস্ব চিত্রশৈলী, স্থাপত্য ও সাংস্কৃতিক দিকগুলিকেও পুষ্ট হতে প্রভাবিত করেছেন বাবুরা। এ এক অভাবনীয় ব্যাপার।

বাবু-সাহিত্যের প্রভাব প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে এসে পড়ে বটতলার বইয়ের কথা। এর সূচনা আনুমানিক উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষভাগে, কিন্তু এর স্বর্ণযুগ কারোর করোর মতে,[২০] ১৮৪০ থেকে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। যদিও উনিশ শতকের শেষভাগ তো বটেই, বিংশ শতকের প্রথমদিকে বটতলার বইয়ের

বেসাতি যে বেশ ভালো ছিল, তা-ও জানা যায় অন্য সূত্র থেকে।[২১] ১৮০০ সালে শ্রীরামপুরের মিশনারিদের বাংলা ছাপাখানার কথা মাথায় রেখে বলা চলে, প্রাথমিক ও বুনিয়াদি শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালিরা নিজস্ব ছাপাখানা স্থাপনের জন্য লালায়িত হয়। ১৮২০ সালের মধ্যে বাংলা ছাপার প্রেসগুলির মধ্যে দেশি প্রেস লঙের মতে ছিল চারটি[২২]— হিন্দুস্থানি প্রেস, সংস্কৃত প্রেস, হরচন্দ্র রায়ের 'বাঙালি' প্রেস এবং বটতলার বিশ্বনাথ দেবের প্রেস। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যেরও নিজস্ব একখানা প্রেস ছিল, তবে সে প্রসঙ্গে লঙ নীরব। বলা বাহুল্য, লঙের তালিকা অনুযায়ী, প্রাথমিকভাবে ছাপা পুস্তকগুলির মধ্যে ছিল রামায়ণ, মহাভারত, নানান ধর্মগ্রন্থ, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ও অন্নদামঙ্গল কাব্য ইত্যাদি। তখনও নাটক-নভেল পাঠের প্রবণতা তেমন দেখা দেয়নি, কারণ শিক্ষিতের হার ছিল লক্ষণীয়ভাবে কম। আদিরস-রতিমঞ্জরী কিংবা বিদ্যাসন্দুর উৎসাহী পাঠক ছিলেন আদি ও নববাবুরা, তা জানা যায় ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে সংবাদপত্রের জনৈক অজ্ঞাতনামা পত্রলেখকের সৌজন্যে— 'বাবুদিগের নিকটে আগতমাত্র সমাদর পুরঃসরে মূল্যপ্রদানপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া দিবারাত্রি তদামোদে আমোদিত হইয়া থাকেন।'[২৩] বলা বাহুল্য, নববাবুদের মূল লক্ষ্য ছিল, পঞ্চমোক্ষের একটির সহায়ক হিসাবে কামদীপিকারূপে বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ পাঠ। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যেও যে ধীরে ধীরে শিক্ষার প্রসার ও চেতনা বৃদ্ধির কারণে গ্রন্থপাঠের চাহিদা বাড়ছে, তা বোঝা যায় ১৮২৩ থেকে ১৮৩১-এর মধ্যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়', 'নববাবুবিলাস', 'দূতীবিলাস' কিংবা 'নববিবিবিলাস' প্রকাশের দৃষ্টান্ত থেকে। লঙের ১৮৫২, ১৮৫৫ ও ১৮৫৭ সালের প্রস্তুত গ্রন্থতালিকা থেকে বোঝা যায়, মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই বাংলা বইয়ের এক বিশাল বাজার গড়ে ওঠে। এইসময় বটতলার ছাপাখানার বার্ষিক উৎপাদন কোনো কোনো মতে[২৪], আট থেকে সাতচল্লিশ হাজার পর্যন্ত ছুঁয়েছিল। আর ১৮৫৭ সালে শুধুমাত্র কলকাতাতেই প্রেস ছিল ৪৬টি; দুই দশকেই তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬১টি; অন্যদিকে মফসসলে প্রেসের সংখ্যা ছিল ১৬টি।[২৫]

এই বিপুল সংখ্যক প্রেস থেকে শুধুমাত্র বাবু-বিষয়ক কিংবা মনোরঞ্জন মূলক বই ছাপা হত এমন নয়। বিনয় ঘোষের বক্তব্য অনুযায়ী,[২৬] মোটের উপর পাঁচ ধরনের পুস্তক প্রকাশিত হত, যথা— ১) ধর্মগ্রন্থ, ২) যাদুবিদ্যা, তন্ত্রমন্ত্র, জ্যোতিষ ইত্যাদি গ্রন্থ, ৩) বিচিত্র শিক্ষা বিষয়ক— চিকিৎসা থেকে কৃষি, ইংরেজি ভাষা থেকে সংগীত শিক্ষা পর্যন্ত বিষয়-কেন্দ্রিক গ্রন্থ, ৪) উপন্যাস এবং ৫) নাটক ও প্রহসন। এর বাইরেও কিন্তু বটতলার প্রকাশকেরা প্রকাশ করতেন স্কুলপাঠ্য পুস্তক, সংগীত সংকলন গ্রন্থ, ছবিসহ কামোদ্দীপক রতিশাস্ত্র, দর্শন বিষয়ক বই, ইসলামি পুঁথি ইত্যাদি। তবে এতৎসত্ত্বেও বলা চলে, ১৮৬৫-র পরবর্তীকালে ১৯২০-র মাঝামাঝি পর্যন্ত অন্যান্য বইয়ের তুলনায় মনোরঞ্জক বই যথা, নাটক-প্রহসন, নভেল-নকশা জাতীয় গ্রন্থের প্রকাশ ও বিক্রিই ছিল বেশি। ১৮৭৪ সালের সরকারি বার্ষিক রিপোর্টে প্রকাশ যে বটতলার বইয়ের মধ্যে ১১২টি শিক্ষামূলক, বাকি ৭৮২টি মনোরঞ্জনকারী।[২৭] বলা বাহুল্য, সমাজে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধিই এর কারণ। অবশ্য এই সময় সংস্কৃত প্রেস, তত্ত্ববোধিনীর নিজস্ব প্রেস ইত্যাদি থেকে বিশুদ্ধ কাব্য-কবিতা, দার্শনিক ও শাস্ত্র আলোচনামূলক গ্রন্থ ইত্যাদিও প্রকাশিত হচ্ছিল; কিন্তু বটতলার বইয়ের বিক্রি ছিল সর্বাধিক। এর পাঠক-পরিসরও ছিল বেশি— উচ্চশিক্ষিত থেকে স্বল্পশিক্ষিত, নাগরিক থেকে মফসসলী পাঠক পর্যন্ত। বিষয় বৈচিত্র্যও ছিল বেশি; নাটক-নভেল থেকে নকশা পর্যন্ত। তথাকথিত শিক্ষিতদের ঔদাসীন্যে হাজার-দেড়হাজার টাইটেলের প্রায় অধিকাংশই আজ বিলুপ্ত। তবু যা আছে, উনিশ শতকের সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে তা অতি মূল্যবান। বটতলা-প্রকাশিত গ্রন্থগুলির প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত

কিন্তু অনুমিত গ্রন্থবিষয় থেকে জানা যায়, সমসাময়িক নানান সামাজিক বিষয় এবং বাঙালিবাবু-বিবিদের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারিই ছিল এগুলির মূল উপজীব্য। 'বাবু'দের প্রসঙ্গ কখনো এসেছে প্রত্যক্ষ বিষয় হিসাবে, কখনো স্ত্রীশিক্ষা কিংবা স্ত্রীস্বাধীনতার প্রসঙ্গে বাবুরা উপস্থিত, আবার ধর্ম বা সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি প্রসঙ্গের সূত্র ধরেও বাবুদের মূর্খামি, উন্মার্গগামিতা, অধঃপতনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, নন্দরাম দত্ত, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়— এঁরা ছিলেন বটতলার প্রতিষ্ঠিত ও ধারাবাহিক লেখক। রচনার ভাষা ছিল প্রায় কথ্যভাষার অনুসারী, কখনো কখনো সাধুভাষার চালে লেখা হলেও সংলাপ বা কথোপকথনের ক্ষেত্রে বটতলা সর্বদা কথ্যভাষাকেই প্রাধান্য দিয়েছে। প্রচলিত 'কলকাতাইয়া বাংলা', যা ছিল ককনি-সংযুক্ত,তা নির্দ্ধিধায় ব্যবহার করেছেন বটতলার লেখকেরা। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় এর তুলনায় বিশুদ্ধতর আদিরূপ আছে। পরবর্তীকালে খিস্তি-খেউড় ও সাধারণ মুখের ভাষায় বাধাহীন প্রয়োগে বটতলার বইগুলি হয়ে উঠেছিল মাটিঘেঁষা মানুষের কাছাকাছি।

কলকাতার বাবুদের নানান কীর্তিকলাপ প্রসঙ্গে খোদ কলকাতায় তো বটেই, মফস্সল কিংবা গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যেও কৌতূহল ছিল চরম। বটতলার বাবু-সাহিত্য সেই কৌতূহল অনেকটাই মিটিয়েছিল সন্দেহ নেই। সাধারণ মুখের ভাষায় গ্রন্থগুলি রচিত হওয়ায় পাণ্ডিত্যের দূরবগাহ ভার থেকে গ্রন্থগুলি ছিল আশ্চর্যভাবে মুক্ত। রসসাহিত্য হিসাবে এগুলির মূল্য ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু বাংলা বইয়ের পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এবং বাবু-সাহিত্যের সূত্রে নগর-মফস্সলের পাঠকদের একসূত্রে বাঁধার ক্ষেত্রে এগুলির অবদান ছিল অপরিসীম। গ্রন্থগুলির ভাষা সংস্কৃতিতায়িত না হওয়ায় সাধারণ পাঠক ও এগুলির প্রতি আকর্ষণ বোধ করতেন। এগুলির ক্রয়মূল্যও বেশি ছিল না। এক টাকা থেকে দু টাকা কিংবা তারও কম— দু আনা, তিন আনা, চার আনা ইত্যাদি। কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি বিষয়ক এইসব পুস্তিকা আয়তনেও দীর্ঘ ছিল না। কোনোটি এক ফর্মা, কোনেটি দু-ফর্মা, বড়োজোর চার ফর্মা পর্যন্ত। এর অধিক ফর্মাযুক্ত গ্রন্থগুলি আসলে বিচ্ছিন্ন কেচ্ছা বা কাহিনির সংগ্রহ, যা সাপ্তাহিক হিসাবে এক এক ফর্মা করে ছাপা হত। ১৮৭৩ থেকে ১৮৯৯-এর মধ্যে বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকানুসারে নাটক প্রকাশিত হয়েছে মোট ১৬৭৫টি এবং আখ্যান (কেচ্ছা, নকশা, উপন্যাস বা নভেল) ও প্রহসনের সংখ্যা মোট ১৯৪২টি।[২৮] শিক্ষাসংক্রান্ত বই প্রকাশিত হয়েছে যেখানে মোট ৮৫৬৮টি, শিক্ষা-বহির্ভূত বইয়ের সংখ্যা ২০,৬০৭টি। এই বিপুল সংখ্যক বইয়ের সবগুলিই তথাকথিত 'বটতলা'র বই ছিল না, যাকে 'শিষ্ট সাহিত্য' বলা হয় সচরাচর, তা-ও এই হিসাবের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু বলতেই হবে, বটতলা প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা অনেক বেশি। তার সেসব বইয়ের অনেকটাই বাবু-বিবির কেচ্ছা।

বটতলার সাহিত্যে 'বাবু'দের প্রভাব-প্রতিপত্তির অন্যতর একটি কারণ দেখানোর চেষ্টা করেছেন কেউ কেউ।[২৯] তাঁদের মতে, 'বটতলা তখন কলকাতা কালচারের একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং সেখানে একটা আটচালা ঘরে আজকালকার নানা কৃষ্টিচক্রের বৈঠকের মতন নিয়মিত বৈঠকও বসত। সেই বৈঠকে ও আড্ডায় কলকাতার ফুলবাবু ও হাফ বাবুরা অনেকেই যোগ দিতেন, নিধুবাবু, হরু ঠাকুরের মতন কবিগায়করাও তার পাণ্ডা ছিলেন। এই ধরনের একটা কালচারাল আড্ডা অন্তত প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে যে বটতলায় চলেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।' এই জাতীয় আড্ডায়, অনুমান করা অসংগত নয় যে, এক বাবু অন্যান্য বাবু ও সম্ভ্রান্ত লোকদের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি শুনতে চাইবেন। পরচর্চার মতো মুখরোচক বিনোদন আর নেই। কবিয়ালরা তো সুযোগ পেলেই আধ্যাত্মিক বিষয়ের মধ্যেও সমসাময়িক কেচ্ছার উপাদান ঢুকিয়ে

দিতেন। এক বটতলার আড্ডার বিষয় আর এক বটতলার আড্ডায় পৌঁছোত লোকবাহিত হয়ে। অতএব এই বটতলাগুলিকে কেন্দ্র করে যখন বইয়ের হাট বসল, তখন স্বাভাবিকভাবেই বুদ্ধিমান প্রকাশকেরা বুঝেছিলেন, ব্যবসা বৃদ্ধি করতে হলে শুধুমাত্র শিক্ষাগ্রন্থ, ধর্মকর্ম বা গুপ্তবিদ্যার পুঁথি ছাপলে চলবে না, হাতে গরম কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির বিবরণ আখ্যান বা নাটক-প্রহসনের মোড়কে মুড়ে পরিবেশন করলে পাঠকের অভাব হবে না। কার্যক্ষেত্রে যে তাই হয়েছিল, এ জাতীয় গ্রন্থের ক্রমবর্ধমান সংখ্যাই তার প্রমাণ বহন করে। এ জাতীয় গ্রন্থের বিষয়গত ও ভাষাগত অশ্লীলতার প্রসঙ্গ তুলে তথাকথিত শিষ্ট সমাজ বটতলার বাবু-সাহিত্যকে ‘অশ্লীল, নীতিবিগর্হিত’ পুস্তক বলতে চান। শিক্ষিতবাবুরা সেদিন বটতলার বাবু-সাহিত্য নিয়ে রীতিমতো দ্বিধাবিভক্ত। ‘বঙ্গদর্শনে’র দ্বিতীয় বর্ষের নবম সংখ্যায় (১২৮০ পৌষ; ১৮৭৩ ডিসেম্বর) ‘অশ্লীলতা’ নামক সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রেরই লেখা প্রবন্ধে লেখক বেশ কঠোর ভাবেই মন্তব্য করেছেন যে, ‘অশ্লীলতা, বঙ্গদেশীয়দিগের জাতীয় দোষ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ... এখন, এমন অনেক সম্বাদপত্র ও পুস্তক দেখিতে পাই যে, তাদৃশ অশ্লীল পত্র বা পুস্তক পাঁচ সাত বৎসর পূর্বে কোথাও দেখা যাইত না। এ সকল পত্র বা পুস্তক অবশ্য অনেকের দ্বারা পঠিত হয়, নচেৎ লুপ্ত হইত। অতএব অশ্লীলতাপ্রিয় পাঠকদের সংখ্যা যে দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে সংশয় নাই। এক্ষণকার কতকগুলি পুস্তক ও পত্রের যে ভয়ানক অবস্থা তাহাতে আমরা তাঁহাদিগের রুচির সঙ্গে পূর্বকালের কবিওয়ালা ও পাঁচালিওয়ালাদিগের কোন প্রভেদ দেখিতে পাই না। প্রভেদের মধ্যে এই যে এখন দণ্ডবিধির আইনে অশ্লীলতার দণ্ডের জন্য একটি ধারা আছে, পূর্বে সেরূপ বিধান ছিল না। সুতরাং এক্ষণকার অশ্লীলতা কিছু অস্পষ্ট, পূর্বকার অশ্লীলতা স্পষ্ট। ভাবের কদর্যতা একই প্রকার।’[৩০] প্রবন্ধটি থেকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বটতলার সমৃদ্ধির নির্ণয় করা যায়। প্রবন্ধটি প্রকাশের (১৮৭৩) পাঁচ-সাত বৎসর পূর্বে বলতে ১৮৬৫-৬৬ খ্রিস্টাব্দের দিক বোঝায়। ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’ প্রকাশের (প্রথম ভাগ ১৮৬২; প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের সম্মিলিত প্রকাশ ১৮৬৪ খ্রি.) পরবর্তীকালেই যে বটতলার বাবু-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি, নাটক-নকশা-প্রহসনে ‘বাবু’দের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারিই যে একমেবাদ্বিতীয়ম্, সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, এই জাতীয় বাবু-সাহিত্যের পাঠক যে সুপ্রচুর ছিল, তাও স্পষ্ট হয়। তৃতীয়ত, কবিগান ও পাঁচালির সমগোত্রীয় রচনাগুলিতে অশ্লীলতা ‘কিছু অস্পষ্ট’, তবে ‘ভাবের কদর্যতা’ একইরকম। এখন প্রকাশগত দিক থেকে যে বাবু-সাহিত্যের লেখকেরা যে অশ্লীলতাকে রেখে-ঢেকে প্রকাশ করেন, সে ব্যাপারে লেখক একমত। তাঁর আপত্তি বাবু- সাহিত্যের ‘ভাবের কদর্যতা’ প্রসঙ্গে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, বাবু-বিবিদের যেসব উন্মার্গগামিতা, লাম্পট্য, ভণ্ডামি সে দিনের সমাজ দেখেছিল, বাবু-সাহিত্যে তারই একটা রূপ ধরে রাখতে চেয়েছেন লেখকেরা। ভিক্টোরিয় ইংল্যান্ডে যেমন আপাত শুচিবায়ুতার আড়ালে চলেছিল উচ্ছৃঙ্খল যৌনতার অবাধ লীলা এবং সমধর্মী পুস্তক-পুস্তিকার হাজারো আয়োজন, সমকালের কলকাতাতে ততটা না হলেও আপাত রক্ষণশীলতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে নানান শ্রেণির বাবুরা অনৈতিক জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বটতলার লেখকেরা বাবু-সাহিত্যে সেই বাস্তবতার চিত্রই প্রদর্শন করতে চেয়েছেন। একালের সমালোচকের ভাষায়, ‘বটতলার আসল বাহাদুরি বোধ হয় সমাজ-আলেখ্য রচনায়। প্রচলিত অর্থে হয়তো লেখকেরা সবাই যথেষ্ট “শিক্ষিত” ছিলেন না, অনেকের কলম হয়তো প্রায়শ অসংস্কৃত, কিন্তু সন্দেহ নেই সমাজচিত্র রচনায় সেদিনের বটতলার লেখকরা ছিলেন মাটির অনেক কাছাকাছি। তাঁরা এই সমান্তরাল সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন বলেই আজ আমরা জানি সমাজ ও সংস্কৃতির অন্য চেহারা কী ছিল। সাধারণের চিন্তাভাবনাই বা কোন খাতে বইছিল।’[৩১] অতএব, ‘ঘটনা-

সংস্থানে ও পরিবেশ রচনায়' আপাত অশ্লীলতা যদি চোখেও পড়ে, তবে তা বাস্তবতার মাত্রা রক্ষা করতে গিয়ে; অন্যথায়, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বটতলার বাবু-সাহিত্যের লেখকেরা 'পর্ণোগ্রাফি'র মতো অনুপুঙ্খ বিবরণের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত সংযম রক্ষা করেছেন।

প্রকরণের দিক দিয়ে বটতলা থেকে বাবু-কাহিনি সবচেয়ে বেশি গৃহীত হয়েছে প্রহসন, নকশা ও গুপ্তকথায়। ড. জয়ন্ত গোস্বামী তাঁর 'সমাজচিত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন' নামক মূল্যবান গ্রন্থের (১৩৮১ বঙ্গাব্দ) পরিবিশিষ্ট প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সূত্র থেকে প্রাপ্ত সমাজচিত্রমূলক প্রহসনের যে তালিকা উপস্থিত করেছেন, তদনুযায়ী ১৮৫৪ থেকে ১৮৯৯ পর্যন্ত প্রহসনের সংখ্যা আনুমানিক ৫০৫টি। বলা বাহুল্য, এর সবগুলির বিষয়ই যে বাবুকেন্দ্রিক এমনটি নয়, তবে অধিকাংশ প্রহসন থেকেই বাবু ও তৎকালীন সমাজের চরিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'ভাবগত অশ্লীলতা'র প্রসঙ্গ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় প্রহসনগুলির বিষয়বস্তু ফোতো নবাবি বা বাবুয়ানা, পানদোষ, লাম্পট্য ও বেশ্যাগমন, টাইটেল বা খেতাবের জন্য অর্থব্যয়, ব্যভিচার, নব্য সভ্যতার অনাচার ও ভণ্ডামি, ব্রাহ্মসমাজের দ্বিচারিতা ও হাস্যকর আচার-আচরণ, যৌন দুর্নীতি, বাবুয়ানার মোহে সর্বস্বান্ত হওয়া ইত্যাদি। সমাজে এগুলির অস্তিত্ব ছিল পুরোমাত্রায়, তাতে সন্দেহ নেই। পূর্বোল্লিখিত 'অশ্লীলতা' প্রবন্ধেও লেখক সমাজে আচরণগত ও ভাবগত অশ্লীলতা বৃদ্ধি যে হয়েছে তা কার্যত স্বীকার করে নিয়ে এর দু'টি কারণ নির্দেশ করেছেন[৩২]—

এক. 'মদ্যাদি মাদকে বাঙালির আসক্তি বৃদ্ধি';

দুই. 'নিষ্পাপ আমোদের হ্রাস'।

অতএব, বটতলার বাবু-সাহিত্যের লেখককুল যদি ভাবগত ও পরিবেশগত অশ্লীলতা নিয়ে প্রহসন-নকশা ইত্যাদি লিখে থাকেন, তাকে সামাজিক বাস্তবতার অনিবার্য ফলস্বরূপ গণ্য করতে হবে। অমৃতলাল বসু অবশ্য তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে বটতলার বাবু-সাহিত্য প্রসঙ্গে বঙ্কিমী উন্নাসিকতাকে হেলায় উড়িয়ে দিয়ে এ জাতীয় পুস্তকের সামাজিক মূল্য স্বীকার করে নিয়েছেন।[৩৩] বাঙালির কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে, তাঁর মতে, বটতলার বাবু-সাহিত্যের অবদান নিতান্ত কম নয়। 'কি মজার শনিবার', 'কি মজার রবিবার', 'কি দুঃখের সোমবার', 'ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ', 'অসৈরণ সইতে নারি' প্রভৃতি এক-দু'পয়সা মূল্যের 'চটি বই'গুলির যে উল্লেখ অমৃতলাল বসু করেছেন, তার অনেকগুলিই গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত রঙ্গ-রচনা, কোনো কোনোটি মামুলি প্রহসন। কিন্তু অমৃতলালের মতে, এগুলি উচ্চাঙ্গের রস-সাহিত্য না হতে পারে, 'কিন্তু সেই সব বইয়ে একটা ভাষা ভাব ছন্দ রস ছিল যা তার নিজস্ব।'[৩৪] প্রথম দিকের নাটক-প্রহসন-নকশা ইত্যাদির ভাব ও ভাষার মধ্যে গ্রাম্যতা থাকলেও তাঁর মতে, অশ্লীলতা ছিল না। কিন্তু সম্ভবত উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের প্রথম দু'এক দশকে 'গ্রাম্য রসিকতার ভিতর কুৎসিত উলঙ্গ অশ্লীলতার অবতারণা করে' অক্ষম অনুসরণকারীরা 'একটা বেশ মুখরোচক জিনিস একেবারে নষ্ট করে দিলে।'[৩৫] অর্থাৎ, বটতলার বাবু-সাহিত্যে শ্লীলতা বা তথাকথিত রুচির অবক্ষয় অনেক পরের ঘটনা এবং এইসব গ্রন্থের লেখকেরা কেউই বটতলার নিয়মিত লেখক নন। একইসঙ্গে লেখক জানিয়ে দিয়েছেন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, যথা—বটতলার বাবু-সাহিত্যের প্রসার ক্রমশ তার ভৌগোলিক সীমানা বাড়িয়ে নেয়। বাগবাজারে এর সূত্রপাত হলেও ক্রমশ বউবাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকাতেও এ জাতীয় রচনা ক্রমপ্রসারিত হয়। দ্বিতীয়ত, উচ্চশিক্ষিত বাবুরাও অনেকে কেবল বাবু-সাহিত্য ক্রয় করে নয়, বেনামে নিজেরাও গ্রন্থ লিখে দিয়ে বটতলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। অর্থাৎ ওপর ওপর শ্লীল-অশ্লীলের ধারণা বলবৎ করে আড়ালে

উক্ত সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণবশতই বাবুরা এ জাতীয় সাহিত্যের পোষ্টা হয়েছেন। এর একটা মনস্তত্ত্বগত দিকও আছে। নামে বা বেনামে এক বাবু অন্য বাবুর কেচ্ছা বা কেলেঙ্কারি, পানদোষ, লাম্পট্য, ব্যভিচার ইত্যাদির কথা ফলাও করে লিখলে সামাজিকভাবে উক্তবাবুর পদমর্যাদা হ্রাস পাবে, তুলনায় প্রকারান্তরে নিজের সামাজিক মর্যাদা দ্বিগুণ-তিনগুণ বৃদ্ধি পাবে। যদিও কার্যক্ষেত্রে তা হত না। কারণ, যে বাবুরা ছিলেন আক্রমণের প্রাথমিক লক্ষ্য, সেই বাবুরাই কবিগানের চাপান-উতোরের মতো তাঁদের বিরুদ্ধে নিন্দামন্দের যথোচিত জবাব দিতে প্রত্যুত্তরমূলক গ্রন্থ লিখতেন। বাবুর পৃষ্ঠপোষকতা এবং লেখকের সামর্থ্য অনুযায়ী এ জাতীয় উক্তি-প্রতুক্তিমূলক কেচ্ছা-কেলেংকারির ধারাবাহিক বর্ণনা বটতলার বাবু-সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন— হুতোমের নকশা প্রকাশিত হলে তার প্রত্যুত্তরে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় লেখেন 'আপনার মুখ আপুনি দেখ'; এর প্রত্যুত্তরে হুতোম-পক্ষীয় লেখক প্রকাশ করের 'বুঝলে কি না?'; তার প্রত্যুত্তরে লেখা হয় 'কিছু কিছু বুঝি'। বটতলার বাবু-সাহিত্যে এ জাতীয় ঘটনা নিতান্ত বিরল নয়। শুধু তাই নয়, এ জাতীয় বাদ-প্রতিবাদমূলক কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি সম্বলিত রচনা বাবু-সাহিত্যের নিবিষ্ট পাঠকের মনোরঞ্জন করতে পেরেছিল এবং কৌতূহলকে জিইয়ে রেখেছিল বলেই, বটতলা থেকে একের পর এক প্রকাশিত হয়ে চলেছিল বাবু-বৃত্তান্ত। সেসব পুস্তকের কয়েক আনা অলীক কল্পনা ও অতিরঞ্জন দিয়ে পূর্ণ হলেও, ষোলো আনাই মিথ্যে নয়।

বটতলা প্রকাশিত বাবু-সাহিত্যের এই বিপুল জনপ্রিয়তার মূলে ছিল কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ। প্রথমত, বটতলার বইগুলির অবলম্বন ছিল সমসাময়িক বাস্তব সামাজিক ঘটনাসমূহ তথা বাবু-বিবিদের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি। ফলে, খাস কলকাতার সাধারণ পাঠক তো বটেই, মফস্সলের পাঠকেরাও এ জাতীয় কেচ্ছা কেলেঙ্কারির বিবরণ পাঠের জন্য মুখিয়ে থাকতেন। বাবু মহলের কেচ্ছার আবহে কলকাতার সামাজিক পরিস্থিতির আঁচ মিলত সহজেই। দ্বিতীয়ত, পরিবেশ বর্ণনা ও ঘটনা সংস্থানে আদিরসের উপস্থিতি অল্পশিক্ষিত ও সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের পক্ষে উপাদেয় বিবেচিত হত। তবে আদিরসের ব্যবহার তথাকথিত 'অশ্লীলতা'র সীমা স্পর্শ করত না সরকার। তৃতীয়ত, কাহিনির ব্যঙ্গ ও উপহাস উচ্চকিত হয়ে পাঠকের মনে যেমন অসংগতিমূলক হাস্যরসের উদ্রেক করে, তেমনি সামাজিক সমস্যার সার সত্যটিকেও সহজেই ধরে দেয়। চতুর্থত, রচনার ভাষা না অতি চটুল, না অতি গম্ভীর, পরন্ত সরল, অলংকারবিহীন, ব্যঙ্গরসপ্রধান। সাধু গদ্যের চাল পরিত্যাগ করে বাবু-সাহিত্য তাৎপর্যপূর্ণভাবে কথ্য বাংলার মৌখিক ভাষাচালকে গ্রহণ করায় তা সাধারণ পাঠকের উপলব্ধির সীমানায় সহজেই ধরা পড়ে। পঞ্চমত, রচনা প্রায়শই কথোপকথনমূলক হওয়ায় একটি নাটকীয় রস বাবু-সাহিত্যের ভিতর থেকে উঠে আসে। বর্ণনার অতিরেক বর্জন করে সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ সংলাপ ও কাহিনিগ্রন্থনে বাবু-সাহিত্য হয়ে উঠেছিল যথার্থ আকর্ষণীয়। বিবৃতিহীন প্রত্যক্ষ বাক্যের ব্যবহারে এক ধরনের চিত্রধর্মী গুণের সঞ্চার হয় এ জাতীয় রচনায়, যা সহজেই পাঠক আকর্ষণ করতে সক্ষম হত। ষষ্ঠত, পাণ্ডিত্য নয়, সহজতাই ছিল বাবু-সাহিত্যের প্রধান গুণ। সপ্তমত, প্রয়োজনে ব্যঙ্গ-ঠাট্টা-উপহাসের পরিপূরক রূপে তথাকথিত অশ্লীল খিস্তি-খেউড় ব্যবহৃত হত না, এমন নয়। কিন্তু তা করা হত বর্ণিতব্য বিষয়কে আকর্ষণীয় করে পরিবেশন করার তাগিদে। তা ছাড়া জনৈক সমালোচকের ভাষায়, 'এই বটতলা সাহিত্যের ভাষার অশ্লীলতার কথা বলে কিছু কিছু লোক যাঁরা এখনও নাক সিটকোন তাঁদের জানা দরকার যে সাহিত্য সৃষ্টিতে বক্তব্যের সঙ্গে ভাষার সামঞ্জস্য একটা প্রধান কথা। অগম্যাগমন, মদ্যপান ইত্যাদিকে গালাগালি দিতে হলে সেটা গীতার অষ্টম অধ্যায়ের

ভাষা ব্যবহার করে লেখা যায় না। অতএব বটতলার নকশার তথাকথিত অশ্লীল ভাষা লোকের কুবুদ্ধিকে প্ররোচনা দেওয়ার জন্যে ব্যবহার করা হয়নি। তা করা হয়েছিল নকশার বক্তব্যকে জোরালোভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য।’[৩৬] শুধুমাত্র নকশার কথা উল্লিখিত হলেও, সমালোচকের এই বক্তব্য বাবু-সাহিত্যের সকল ধারার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। অষ্টমত, একথা ঠিক যে, বটতলার বাবু-সাহিত্য পাপের কথা যেমন ফলাও করে বলে, সেকালের বাবুদের পূণ্যের কথা আদৌ নয়। এর স্বপক্ষে বলা যায়, বাবু-সাহিত্যের লেখকদের মূল লক্ষ্য, অনৈতিক বাবুয়ানার প্রসার রোধ। বাবুদের পূণ্যকর্ম মানেই সমাজের মঙ্গল, অতএব সে প্রসঙ্গে বাবু-সাহিত্যের জ্ঞাত-অজ্ঞাত লেখকেরা আদৌ ভাবিত নয়। কিন্তু যা পাপ, যা ক্লেদ, যা অমঙ্গলজনক, তার দরুন সমাজ দূষণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা এবং তৎকালে সমাজে সেটাই ঘটে চলেছিল। মনে রাখতে হবে, ‘পাপের প্রসার’ নয়, তার আশু পরিসমাপ্তিই কাম্য ছিল লেখকদের। বাবুদের কৃতকর্মের পরিণাম ও অনুশোচনার ছবি এঁকে এই শ্রেণি সম্পর্কে সামাজিক সাধারণের মনে ভয় উৎপাদন করতে চেয়েছিলেন লেখকেরা, যাতে আর কেউ আকৃষ্ট না হয়ে ওই পথে চলে যেতে পারে। একইসঙ্গে ‘মমেতি চ, মমেতি নঃ’-এর দৃষ্টান্ত মেনে সচেতন পাঠকের তুচ্ছ ও আপাত ‘সুখে’র প্রত্যাশায় পাপের পথ বেছে নিতে কুণ্ঠিত হয়। এর দ্বারাই সমাজের প্রকৃত মঙ্গল। এই মঙ্গলজনক দৃষ্টান্ত স্থাপন করাই ছিল বাবু-সাহিত্যের লেখকদের মূল অভিপ্রায়। সেই কারণে আকর্ষণীয় কাহিনি কিংবা ঘটনাসংস্থানের গুণে পাঠককে আকৃষ্ট করে পাপের পথ ও তার পরিণামস্বরূপ বাবুয়ানার রূপ ও পরিণাম দেখিয়ে এক বৃহত্তর সামাজিক মঙ্গলের উদ্‌যোগ করেছিলেন বটতলার ‘বাবু-সাহিত্যে’র জ্ঞাত-অজ্ঞাত লেখকেরা। বাবুদের সম্পর্কে সমাজে যে ঘৃণা ও অবজ্ঞার মনোভাব স্ফুরিত হয়েছিল উনিশ শতকের শেষদিকে, বটতলার ‘বাবু-সাহিত্যে’র বিপুল সংখ্যক বই ও তার ধারাবাহিক প্রসার সেই ব্যাপারে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করে। বস্তুত, সাধারণ জনমানসে এই সাহিত্যের প্রভাব ও পরিণামস্বরূপই বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই ‘বাবু’ নিন্দাজনক একটি আখ্যা ও গোত্র হিসাবে সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে পড়ে এবং বাহ্যিকভাবে বাঙালি জীবন ‘বাবু’দের থেকে আপাতভাবে হলেও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

বটতলার বাবু-সাহিত্য সবচেয়ে বেশি স্ফূর্তি পায় নকশা ও প্রহসন-এর আঙ্গিকে। এর পরেই রয়েছে ব্যঙ্গকাব্য, নভেল ও গুপ্তকথার স্থান। উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে বিত্তবান বাবুরা মেতে উঠেছিলেন শখের নাট্যচর্চায়। বাংলাভাষায় নাটকের অভাব দেখে, প্রথম দিকে সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থ কিংবা বিদ্যাসুন্দর কাহিনির নাট্যরূপ অভিনীত হত এই সব শখের রঙ্গালয়ে। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শুরুতেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির শিক্ষিত ‘ভদ্রলোক’বাবুরা এ বিষয়ে প্রতিযোগিতার আহ্বান করেন এবং রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘নব-নাটক’ পুরস্কৃত ও অভিনয় হয়। কিছু পরে দীনবন্ধু মিত্র ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের হাত ধরে শীলিত, যথাযথ বাংলা নাটক লেখা হলে, রঙ্গালয় স্থাপন ও অভিনয়ের প্রতি বাবুদের পাশাপাশি সাধারণের আগ্রহও বাড়তে থাকে, যার পরিণতি ১৮৭২-এর ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপনে প্রতিফলিত হয়। বাবুদের শখের নাট্যচর্চায় সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না, তা ছিল একান্তভাবেই নিজস্ব আমোদের বিষয়। আমন্ত্রিত সদস্যদের সামনেই অভিনয় অনুষ্ঠিত হত এবং বাবু তদ্দর্শনে আহ্লাদিত হতেন, আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। বটতলার স্বল্পশিক্ষিত লেখকেরা সাধারণের রুচি ও আগ্রহ দেখে স্বল্পসময়ে অভিনয় করা যায়, স্বল্প আয়াসে ও ব্যয়ে এমন নাটক ও প্রহসন রচনা করলেন। নাটকের চেয়ে তাঁদের টান প্রহসনের প্রতিই বেশি; কারণ যথাযথ ব্যঙ্গের সুতীক্ষ্ণ শরে, উপহাসের অনাবিল উৎসারণে

প্রহসনই সাধারণের চিত্তবিনোদনে সক্ষম এবং একই সঙ্গে সামাজিক মঙ্গল সাধনের অব্যর্থ ওষুধ। তা ছাড়া, যে বাবুরা নাট্যচর্চার শখের আসরে সাধারণের প্রবেশাধিকার নিরুদ্ধ করে দিয়েছিলেন, বটতলার সাধারণ লেখকেরা সাধারণের জন্য লেখা প্রহসনে উক্ত বাবুদেরই বিষয় করে তুলে মধুর-তিক্ত প্রতিশোধ নিলেন যেন। তা ছাড়া আগেই বলা হয়েছে, বিষয় হিসাবে বাবুদের বৈধ-অবৈধ কীর্তিকলাপ তখনকার সাধারণ পাঠকদের অতীব রুচিকর ছিল। তা নইলে, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রথম নাটক লিখতে বসে 'বাবু নাটক' লেখেন (যে নাটকের সন্ধান মেলে না, মিললে বাবু-সাহিত্যের ক্রমপরম্পরা আরও স্পষ্ট হত)। বিষয়টি কিন্তু খুব তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলা নাটকের আদি দশায় নাটক লিখতে বসে বিষয় হিসাবে 'বাবু'কে বেছে নেওয়া প্রমাণ করে সমকালের শিক্ষিত মানসে 'বাবু' চর্চার বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং বাবুদের কার্যকলাপ সমালোচিত নিন্দিত হচ্ছে, অর্থাৎ এ ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত, উল্লেখিত, সমালোচিত এবং পরোক্ষভাবে বিজ্ঞাপনে দৃষ্ট কিংবা অপ্রত্যক্ষ উল্লেখ থেকে অনুমিত বটতলা থেকে প্রকাশিত প্রহসনের আনুমানিক সংখ্যা প্রায় হাজারখানেক। এর পর আছে শত খানেক নকশা এবং অন্যূন হাজার দেড়েক ব্যঙ্গকাব্য-গুপ্তকথা-নভেল ইত্যাদি। শিক্ষার সেই ক্রমবিকাশের দিনে বাঙালি যেভাবে বটতলার বাবু-সাহিত্য নিয়ে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে, তা ভাবা যায় না। এইসব টাইটেলের অতি সামান্যমাত্রই লভ্য (সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা ব্যক্তিগত সংগ্রহ এবং গ্রন্থাগারে রক্ষিত সংগ্রহের হিসাব ধরলে হাজারখানেকও হবে না); রসের দীনতা হেতু এগুলি প্রকাশিত হত বটে কিন্তু প্রসবের কিছুদিন পরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করত, একথা বলে যাঁরা বাবু-সাহিত্যের হীনতা প্রমাণ করতে চান, তাঁদের বলা যায়, বাবু-সাহিত্যের জ্ঞাত-অজ্ঞাত লেখকেরা কেউ রস সাহিত্যের সেবা করার জন্য কলম ধরেননি। তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল, সমাজ পরিশোধন এবং বাবুয়ানার মূলোচ্ছেদ। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের স্ত্রৈণ-স্বভাবকে ব্যঙ্গ করে লেখা 'মাগ সর্বস্ব' (১৮৭০) প্রহসনের ভূমিকার লেখক হরিমোহন রায় (কর্মকার) লেখেন, 'প্রহসনাভিনয়ে যে সামাজিক দোষের কথঞ্চিৎ সংশোধন হয়, ইহা সর্বতোভাবে সম্ভব, কিন্তু বঙ্গদেশে প্রহসনের সংখ্যা অতি অল্প প্রযুক্তই যে সামাজিক দোষের বৃদ্ধি হইতেছে এমত নহে। তবে প্রহসনের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি কিঞ্চিৎ দোষেরও সংশোধন হয়, তাহাই পরম লাভ'।[৩৭] অর্থাৎ 'কিঞ্চিৎ দোষ সংশোধন'ই ছিল প্রহসন ও নকশার মধ্য দিয়ে তাঁরা যে সাধারণের মনকে বাবুয়ানার বিরুদ্ধে প্রস্তুত করে তুলতে পেরেছিলেন, তা অস্বীকার করা যায় না।

বাংলা ভাষার তথাকথিত মূল ধারার শিষ্ট সাহিত্যের লেখকেরা প্রহসনকে, নকশাকে সযত্নে এড়িয়ে গেছেন দেখা যায়। তার কারণ কী বটতলার বাবু-সাহিত্যের এই বিপুল প্রহসন-সেবা? এ জাতীয় রচনার বিরুদ্ধে শিষ্ট লেখকদের উন্নাসিক, নাক উঁচু ভাব? যদিও গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'পঞ্চরং' জাতীয় রচনাগুলি আদতে প্রহসনই। এবং সমসাময়িক সমাজ বাস্তবতামূলক এই রচনাগুলির অধিকাংশেরই বিষয় বাবুসমাজের উদ্ভ্রান্তি, ভণ্ডামি, কপটতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, ক্ষমাহীন পরিণাম। ইতিপূর্বে মধুসূদনও তাঁর প্রহসন রচনা করতে বসে বিষয় হিসাবে বেছে নেন— নব্যবাবুদের সভা-সমিতির নামে অনাচার, ভণ্ডামি, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং পলিত কেশ বৃদ্ধ, বাবুর পরস্ত্রী লোলুপতা তথা লাম্পট্য। এ ব্যাপারটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। পরবর্তীকালের বটতলার বিপুল প্রহসন-সাহিত্য এই Patternটিরই অনুসরণ করেছিল। শিষ্ট ধারার সাহিত্য সেবকদের মধ্যে অমৃতলাল বসুই অবশ্য প্রথম লেখক, যিনি অনেকগুলি বাবুকেন্দ্রিক প্রহসন রচনা করে বাবু-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। একইসঙ্গে এ জাতীয় সাহিত্য সম্পর্কে উন্নাসিকদের নাক

উঁচু ভাবকে সদম্ভে অস্বীকার করেছিলেন।[৩৮] তবে, সাধারণভাবে, বাবু বিষয়ক রচনাকে নিকৃষ্ট পর্যায়ভুক্ত মনে করে শিষ্ট সাহিত্য যে তথাকথিত সাহিত্যিক-শুচিতা রক্ষা করে চলত বটতলার সমান্তরালভাবে, এ সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সাধারণ পাঠক সমাজে তার প্রভাব বিশেষ পড়েনি। কোনো কোনো গবেষক বলেছেন, 'বটতলায় ছাপা বইগুলির নির্দিষ্ট মুদ্রণসংখ্যা ২০০০ কপির নিচে নয়। বিক্রিবাটা ভালো হলে সংখ্যাটা ৪০০০-এও পৌঁছাত।'[৩৯] এর দ্বারাই বোঝা যায়, বটতলার কিস্সা বা কেচ্ছা জাতীয় বইয়ের কাটতি কেমন ছিল। প্রহসন ও নকশা ছিল মূলত এই কিসসা বা কেচ্ছার আকর বিশেষ। মনে রাখতে হবে, তথাকথিত Elite literature-এর বাইরে ছিল এক বৃহত্তর লোকসমাজ, যাঁদের ছিল মৌখিক ও পুঁথিভিত্তিক লিখিত সংস্কৃতির জগৎ। প্রত্যক্ষ সমসাময়িক বিষয় নিয়ে লেখা গান-ছড়া-প্রবচনের এক সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার বহন করে চলত এই সাধারণ সমাজ। উনিশ শতকে মুদ্রণের সংস্কৃতি পল্লবিত হওয়ার সুযোগে এই মৌখিক কিন্তু বৃহত্তর সাধারণের চেতনার জগৎ ও ছাপার প্রশ্রয়ে উন্মোচিত হতে থাকে। বটতলার বই সেই বৃহত্তর সাধারণের চেতনাকেই লালন-পালন-পরিবর্ধনের সুযোগ করে দিয়েছিল। এক একটি বইয়ের এই বিপুল মুদ্রণ সংখ্যা প্রমাণ করে, বাবু-বৃত্তান্ত জানবার খিদেটা জনসাধারণের মধ্যে কেমন ছিল। আর বাবু-সাহিত্যে প্রহসনের জনপ্রিয়তার কারণ, তার সরাসরি বিষয় আশ্রয়ী রচনাকৌশল। নভেল বা নকশার মতো অতিকথনের বা অযথা বিস্তারের সুযোগ এখানে অল্প, পাঠক সহজেই বিষয়ের মধ্যে উপস্থিত হন। এ জাতীয় প্রহসনে প্রায়শই প্রথম অঙ্কেই বা প্রথম দৃশ্যেই মূল সমস্যাটি উত্থিত আলোচিত কিংবা সমালোচিত হয়। প্রহসনগুলি প্রায়শই ৭ থেকে ৫০ পৃষ্ঠার মধ্যে শেষ হত, ফলে দ্রুত পাঠ শেষ হত। উৎক্ষিপ্ত অম্লমধুর তিক্ত-কষায় রসও সমানভাবে উপভোগ করা সম্ভব হত মিতকথনের কারণে। ঈষৎ আদিরসের ছোঁয়া থাকত বিষয়বস্তুতে, কথনে নয়। সবমিলিয়ে সাধারণ পাঠকের অবকাশকে রঙ্গে-ব্যঙ্গে আনন্দে মুখর করে তুলতে প্রহসনের কোনো বিকল্প ছিল না। খুব স্বাভাবিকভাবেই বাবুরা নিত্য নৈমিত্তিক খামখেয়ালিপনার উদ্ভ্রান্তির ভণ্ডামির মধ্যে দিয়ে অতি সহজেই প্রহসনের উপাদান জোগান দিতেন। শিষ্ট সাহিত্যের পাশাপাশি তথাকথিত অমার্জিত সাহিত্যের লেখকেরা এভাবে বাবু-সাহিত্যের মাধ্যমে যেমন সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জনের জোগান দিয়েছিলেন, সমসাময়িক বাবুকুলের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সাধারণের মনে অসন্তোষ ঘনিয়ে তুলেছিলেন 'বাবুয়ানার' প্রতি তেমনি উনিশ শতকের সমাজ ইতিহাসের উপাদান এবং তৎসম্পর্কে সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনন-চেতনার পরিচয়ও চিরকালের জন্য ধরে রেখেছেন। পরোক্ষভাবে বাবু-সাহিত্য হয়ে উঠেছে উনিশ শতকের সমাজ ইতিহাসের চলমান দলিল।

একই কথা 'নকশা'গুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ইতিপূর্বের নকশা শীর্ষক আলোচনায় আমরা উল্লেখ করেছি যে, বাংলায় প্রহসনের চেয়ে নকশার ইতিহাস প্রাচীন। 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত 'বাবুর উপাখ্যান' (২৪.০২.১৮২১ এবং ০৯.০৬.১৮২১ সংখ্যায় প্রকাশিত) নকশা ছাড়া আর কিছু নয়। সেকালের সংবাদপত্রে বাবুদের বিষয়ে যেসব সংবাদ প্রকাশিত হত, তা রচিত হত নকশারই আদলে। প্রহসনকার কেবল দোষ-ত্রুটিটুকুই প্রদর্শন করে পরিণামে 'বিবেক-বাক্য' শোনাতে পারেন। নকশাকার কিন্তু দোষ-ত্রুটি সমাজের চেহারা দেখাতে দেখাতে যান, একইসঙ্গে তাঁর নিজস্ব সমালোচনা বিবৃতিও আমরা পেতে থাকি। নকশায় তাই দু'টি তল সৃষ্টি হয়। একটি তল নির্মমভাবে প্রত্যক্ষ সমাজকে দেখায়, অন্যতল ওই দেখা উপলক্ষ্যে লেখকের মনকে প্রকাশ করতে করতে যায় বা বলা চলে, লেখক স্বয়ং কথা বলেন। ব্যঙ্গবিদ্রূপ-উপহাস-ক্ষমাহীন ক্রোধ এসবই নকশাকারের থাকতে পারে, কিন্তু যেটি অবশ্যই থাকবে, তা হল,

নকশাকারের সমাজ-পরিশুদ্ধির প্রতি গোপন সমর্থন। প্রহসনের লক্ষ্য সমাজ-প্রদর্শন হলে, নকশাকারের লক্ষ্য প্রত্যক্ষভাবেই সমাজ পরিশোধন। উনিশ শতকে যে কিছু নকশা লেখা হয়েছে, তার বেশিরভাগই বাবুদের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি এবং তৎ-সম্পর্কিত সমাজের কথা নিয়ে। প্রহসনের রচনারীতি যেখানে সাধু-চলিত মিশ্রিত রীতি, নকশার অধিকাংশই সেখানে চলিত বাংলায় (অর্থাৎ মৌখিকভাবে ব্যবহৃত বাংলায়) লেখা। মৌখিক ক্ষেত্রে প্রচলিত খিস্তি-খেউড় থেকে শুরু করে সংস্কৃতায়িত শব্দ নির্দ্ধিধায় পাশাপাশি ব্যবহার করেন নকশাকারেরা। লঘু বিষয় প্রকাশ করতে গিয়ে কখনো কখনো সংস্কৃতায়িত গুরুগম্ভীর গদ্যরীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন নকশাকারেরা। এই বৈপরীত্য সহজেই হাস্যরসের জোগান দিয়েছে, যদিও সে হাসির আড়ালে হুল আছে।

প্রহসন বা গুপ্তকথার পাঠক স্বল্পশিক্ষিত হলে অসুবিধা নেই, নকশার পাঠককে তুলনায় অধিক শিক্ষিত হতে হয়। নাহলে নকশাকারের হাসির আড়ালে ঘৃণার অগ্নিদাহকে পুরোপুরি উপলব্ধি করা সহজ হয় না। একথা ঠিক যে, হুতোমের আগেই, নিশ্চয়ই বটতলা থেকে নকশা বেরিয়েছিল এবং যার উপজীব্য ছিল বাবু ও সমসাময়িক সমাজের নানান ভুলভ্রান্তি, পাপাচার, কপটতা। কিন্তু হুতোমের নকশার সম্পূর্ণ সংস্করণটি প্রকাশের (১৮৬৪) পরই বটতলা থেকে নকশা জাতীয় সাহিত্যের জোয়ার আসে। যদিও হুতোমের গ্রন্থের বিষয় বিগত একশো বছরের বাবু-বৃত্তান্ত, তার ঐতিহাসিকতার সুলুক-সন্ধান; সেইসঙ্গেই সমকালের কলকাতা ও নাগরিক বাঙালির জীবন ও সময়ও তাঁর গ্রন্থ থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। কিন্তু পরবর্তী নকশাকারেরা তাঁদের রচনায় প্রাধান্য দিলেন মূলত বাবু-জীবন, তাঁদের লাম্পট্য, ভণ্ডামি ইত্যাদিকে। নববাবু থেকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক' বাবু সকলেই ছিলেন পরবর্তীকালের নকশাকারদের আলোচ্য বিষয়। বাবুয়ানার নানান কীর্তি তুলে ধরেছেন পরবর্তীকালের নকশার লেখকেরা, যদিও প্রত্যক্ষ সমাজের ছবি ক্রমশ বিরল হয়ে আসে শেষের দিকে। বাবুদের লাম্পট্য ও পানদোষই প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়। সেইসঙ্গেই বাবু ও বাবুয়ানার হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই প্রচলিত নকশার আদল ও অবলম্বিত বিষয়— দুই-ই বদলে যায়। একথা যথার্থ যে, বাবুদের কেন্দ্র করেই উনিশ শতকের নকশার উদ্ভব ও সংসারযাপন, ক্রমশ ব্যবহারিক জীবনে নানান আর্থ-সামাজিক কারণে প্রত্যক্ষ বাবুয়ানার দিন শেষ হয়েছিল বলে, প্রচলিত রীতির নকশা দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায়।

নকশার পরই আর যে রীতিটি বাবু-সাহিত্যের হাত ধরে উনিশ শতকে বিকাশ লাভ করেছিল, যার পরিণতি রহস্য-রোমাঞ্চ-ক্রাইম কাহিনিতে সেটি হল 'গুপ্তকথা'। ঔপনিবেশিক বাংলার এলিট-সাহিত্যে অনিবার্যভাবে যখন ইউরোপীয় সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সহবাস চলছে, তখন বটতলার লেখকেরাও জর্জ রেনল্ড্স-এর (১৮১৪-১৮৭৯) 'দি মিস্ট্রিজ অব লন্ডন' (১৮৪৪) এবং 'দি মিস্ট্রিজ অব দি কোর্ট অব লন্ডন' (১৮৪৮-৫৬) এই দু'টি সিরিজের আদলে 'গুপ্তকথা'র ধারাটি বইয়ে দেন সাধারণ পাঠকের অভিমুখে। এটি মূলত এলিট নভেলের সমান্তরাল এক বুনন। গুপ্তকথার লক্ষ্য মূলত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পাঠককুল। বিষয়ও প্রায় নির্দিষ্ট— অন্তঃপুরের বাবু-বিবিদের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি-যৌন অপরাধের ঈষৎ অসংযমী বর্ণনা। বটতলার অসংখ্য প্রহসন-নকশাকার ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'গুপ্তকথা'র ভগীরথ। তাঁর হাত ধরেই রেনল্ড্স-এর রচনার বঙ্গীয়করণ শুরু হয় এবং ক্রমশ অনেক মৌলিক 'গুপ্তকথা'ও প্রকাশিত হতে থাকে। ইতিপূর্বে 'সম্বাদ রসরাজ' যৌনতাগন্ধী অবৈধ জীবনযাপনের ধারাবাহিক ছবি প্রকাশ করতেন। ভুবনচন্দ্রের আগে সেগুলিকেই যথার্থ গুপ্তকথার শিরোপা দেওয়া যায়। বাবু-বিবিদের অন্ধকার যৌন

জীবনের ছবিই মূলত গুপ্তকথার পুঁজি। সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসে চোর, ভণ্ড সন্ন্যাসী, প্রতারক, কুচক্রী আত্মীয়, কামনালোলুপ স্বজনবান্ধব, অনৈতিক সম্পর্কে আগ্রহী চরিত্ররা। রুচির দিক থেকে তথাকথিত অশ্লীলতা 'গুপ্তকথা'র অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে, তথাকথিত অভিজাত সমাজের যেসব লাম্পট্যভণ্ডামি ও অনাচারের ছবি শিষ্ট লেখকদের পক্ষে প্রকাশ করায় রুচিগত ও অন্যান্য নানান কারণে সহজ ছিল না, 'গুপ্তকথা'র পরিধিতে এলিট বাবুদের সেইসব অনাচার বটতলার লেখকেরা তারিয়ে তারিয়ে বর্ণনা করেছেন। জনৈক সমালোচকের ভাষায়, 'বনেদি পরিবারের অন্তঃপুরের ক্লিন্ন ছবি যেসব আরশিতে ধরা হয়েছে, তার কোনোটি স্বচ্ছ, কোনোটি ঝাপসা। তাদের সাহিত্যমূল্য সর্ব্বে স্বীকৃত না হলেও, সমাজের অনালোকিত একটি পরিসরকে বৃহৎ জগতে নিয়ে এসে সেকালের অনেক সামাজিক ব্যাধির শেকড়ের সন্ধান দেয় এই গুপ্তকথার ভাণ্ডার।'[৪০]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, নববাবুদের লাম্পট্য ও যৌন-জীবনে তথাকথিত আড়াল-আবডাল ছিল না। তা ছিল সাধারণের কাছে প্রত্যক্ষ সত্য হিসাবেই কেচ্ছার উপাদান। সাধারণভাবে স্বল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত আপাত রুচিহীন নববাবুদের পক্ষে এ জাতীয় আচরণ আদৌ অপ্রত্যাশিত ছিল না, অতএব 'গুপ্তকথা'র পরিবেশ তখনও তৈরি হয়নি। কিন্তু ক্রমশ পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নব্যবাবুরা যে রুচির পরাকাষ্ঠা গড়ে তুলেছিলেন, তার ফলে লাম্পট্য ও রুচিহীন যৌন বিকার কিছুদিনের জন্য হলেও সমাজের বুক থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হ্রাস পেয়েছিল। চাকরিজীবী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাবুরা আশা করা গিয়েছিল শিক্ষার গুণে এ জাতীয় লাম্পট্য-দোষ থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারবেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয়নি। রাজনারায়ণ বসু নির্দ্ধিধায় বলেছেন, 'এক্ষণকার লোক পানাসক্ত ও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেশ্যাসক্ত।... সেকালে লোকে প্রকাশ্যরূপে বেশ্যা রাখিত। বেশ্যা রাখা বাবুগিরির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত; এক্ষণে তাহা প্রচ্ছন্নভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু সেই প্রচ্ছন্নভাবে তাহা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।'[৪১] আবার, মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুরা সভা-সমিতি, দেশোদ্ধার ইত্যাদি হুজুগে ব্যস্ত থাকতেন, ফলে অন্তঃপুরে পরিবার প্রায়শই উপেক্ষিত হত। এই সুযোগে কাপ্তেনবাবুরা যেমন পৌঁছে যেত অন্দরমহলে, তেমনি বাড়ির আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে, এমনকী নিকট সম্পর্কের ব্যক্তির সঙ্গেও অনেক ক্ষেত্রে ব্যভিচার-সহবাসে লিপ্ত হতেন বাড়ির মেয়েরা। এই উভয়বিধ ঘটনাই সেকালে সুলভ ছিল। আমাদের স্মরণে জাগতে পারে, রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়'-এর ভূপতির কথা। তার দেশোদ্ধার, সংবাদপত্র সেবা— এসব হুজুগে চারুর জীবনে যে অবহেলার শূন্যতা তৈরি হয়, সেই ফাঁক দিয়েই প্রবেশ করে অমল। উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের এও এক গুপ্তকথা, যদিও তা বলা হয়েছে পরিশীলিত ভাবে এবং যথার্থ সাহিত্যরসসিক্ত করেই।

অতএব অভিজাত ও সাধারণ মধ্যশ্রেণি— উভয়ের জীবনের গোপন-ক্লেদাক্ত মানসিকতার বাস্তব ছবিটি অমার্জিত ভাবেই তুলে ধরেছেন 'গুপ্তকথা'র লেখকেরা। তবে গুপ্তকথার অভিমুখ বারে বারে ছুঁয়ে যায় নারীর ব্যভিচারের প্রসঙ্গটিতে। আধুনিক সভ্যতার হাত ধরে নব্যবাবুরা যে স্ত্রীশিক্ষা ও নারীস্বাধীনতার প্রসঙ্গে অনমনীয়তা দেখিয়েছিলেন এবং ব্রাহ্মবাবুরা কর্মে প্রচেষ্টায় যাকে অনেকাংশে সফল করে তুলেছিলেন, তার বিরুদ্ধে সমাজের রক্ষণশীল গোষ্ঠী ক্রমশ আশঙ্কিত হচ্ছিলেন। নারীস্বাধীনতা মানেই ব্যভিচার, লাম্পট্য গুপ্ত প্রণয়, শেষে পরিবার ধ্বংস— এমনই একটা বোধ বা চেতনা তাঁরা সঞ্চার করে দিতে চাইছিলেন এ জাতীয় প্রকরণের মধ্য দিয়ে। বাবু-সাহিত্যের হাত ধরে এভাবেই শুরু হয়েছিল

শুচিবায়ুগ্রস্ত, রক্ষণশীলদের পুনরুত্থানের প্রচেষ্টা। প্রহসন-নকশা-গুপ্তকথা আসলে সেই একই মনোভাবের প্রকরণগত বৈচিত্র্য মাত্র।

বস্তুত, উনিশ শতকে বাবু নামক শ্রেণিবিশেষ এভাবেই বাংলা সাহিত্যের তথাকথিত নীচুতলার মহলে প্রহসন-নকশা, গুপ্তকথার প্রসার ও সম্ভাবনার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছিল। বাবুদের আচার-আচরণ, স্বভাব-মনোভাব, জীবনযাপন, কথা ও কর্মের মধ্যে সীমাহীন ব্যবধান ও বৈপরীত্য বটতলার লেখককুলকে উদ্‌বেজিত করেছিল, ফলে উনিশ শতকের সমান্তরাল সাহিত্যে এ জাতীয় গ্রন্থের প্রসার সীমাহীন। উচ্চরসবোধহীন এ জাতীয় সাহিত্যের কোনো মূল্য আছে কি না, এ প্রশ্ন জাগা সংগত। আমাদের বিচারে, বটতলার হাত ধরে প্রহসন-নকশা-গুপ্তকথার এই অবাধ বিস্তার সাধারণ পাঠকদের মধ্যে হয়তো তথাকথিত অশ্লীল ও রুচিবিগর্হিত বিষয়ের রমরমা বৃদ্ধি করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বাস্তবে এ জাতীয় ঘটনার প্রাদুর্ভাব না থাকলে, শুধুমাত্র কল্পনার অতিরেক দিয়ে সাধারণ পাঠকের মনোযোগ ধরে রাখা দীর্ঘদিন সম্ভব ছিল না। এ জাতীয় গ্রন্থগুলির সামাজিক মূল্য তো স্বীকার করে নিতেই হবে। সাহিত্যমূল্য সম্পর্কে আমরা প্রমথ চৌধুরীর স্মরণাপন্ন হতে পারি। 'আধুনিক বঙ্গ সাহিত্য' প্রবন্ধে অসার কিন্তু অধিক রচনার প্রসঙ্গে তিনি এর দু'টি উপযোগিতার কথা বলেন— [৪২]

এক. 'এত বেশি লোক যে এত বেশি লেখা লিখছে, তাতে আনন্দিত হবার অপর কারণও আছে। এই অজস্র রচনা এই সত্যের পরিচয় দেয় যে, বাঙালি জাতি এ যুগে আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।'

দুই. 'আমরা আর কিছু করি আর না করি ভাবী গুণীর জন্য আসর জমিয়ে রাখছি। পাঠকসমাজকে ঘুমিয়ে পড়তে না দেওয়াটাও একটা কম কাজ নয়।'

একই কথা, বটতলার সুপ্রচুর বাবু কেন্দ্রিক সাহিত্যের পক্ষেও খাটে। শুধুমাত্র পাঠকসমাজের মনোরঞ্জনই নয়, সমাজবোধ জাগ্রত করা, সামাজিক মঙ্গল সংক্রান্ত ধারণা সঞ্চারিত করা, আত্ম-বিশ্লেষণের মাধ্যমে চারিত্রিক শুদ্ধতার দীক্ষাদান— এসব উপযোগিতা অপ্রত্যক্ষই থেকে যায় আমাদের কাছে। কিন্তু বাঙালি পুরুষের 'বাবুত্ব'কে দূর করে তাঁদের মানুষ হয়ে ওঠবার একটা পথ দেখাতে চেয়েছিল এ জাতীয় সাহিত্য, তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। তথাকথিত ইতর সাহিত্যের তকমা পরেও এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব যে পালন করেছিল বাবু-সাহিত্য, তার মূল্য অপরিসীম।

কিন্তু কেবল বিষয় প্রকরণের বৈচিত্র্যে এবং গ্রন্থসংখ্যার বিচারেই নয়, উনিশ শতকের বাবুদের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় একদিকে যেমন গ্রন্থচিত্রণে জোয়ার এসেছিল, তেমনি বাংলার নিজস্ব চিত্রশৈলীরও বিকাশ ঘটেছিল। জনৈক আলোচকের ভাষায়, 'বাবু-কালচারের দ্বিতীয় পরোক্ষ সুফল হল কালিঘাটের পট, চিৎপুরের রঙিন লিথোগ্রাফ আর হাতে রং করা বটতলার উডকাট যেগুলোর মধ্যে দিয়ে বাবু-বিবিদের জীবনকে প্রতিফলিত করা হয়েছে।'[৪৩] সাধারণভাবে, উনিশ শতকে বাংলা গ্রন্থ-প্রকাশনার প্রথম থেকেই গ্রন্থচিত্রণের দিকে ঝোঁক লক্ষ করা যায়। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বাঙালি প্রকাশক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ফেরিস কোম্পানির ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত 'অন্নদামঙ্গলে' ছ'খানা উডকাট ছবি দিয়ে সাজিয়েছিলেন। মুদ্রিত ছবি ছ'টির দু'টিতে (সুন্দরের বর্ধমান যাত্রা এবং সুন্দরের বর্ধমান পুর প্রবেশ) বাঙালি খোদাই শিল্পী রামচাঁদ রায়ের নাম আছে। যদিও ছবিগুলিতে 'অশিক্ষিত পটুত্ব' থাকলেও 'যথার্থ শিল্পী মনের পরিচয় নেই' বলে কোনো কোনো সমালোচক অভিযোগ করেছেন[৪৪], তথাপি বাংলা গ্রন্থকে বিপণনযোগ্য করে তুলতে লেখার সঙ্গে রেখা সংযোজিত করার এই ভাবনা যে যথেষ্ট আধুনিক, তা স্বীকার করে নিতেই হবে।

সমকালে প্রকাশিত পঞ্জিকাগুলিতেও খোদাই ছবির অলংকরণ থাকত। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে জন লসন সচিত্র মাসিক 'পশ্বাবলী' প্রকাশ করেন, যার এনগ্রেভিংগুলি তাঁর এবং তৎকর্তৃক ট্রেনিংপ্রাপ্ত এদেশীয় শিল্পীদের করা। বস্তুত উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে ১৮৫৫র ভিতর একাধিক সচিত্র পুস্তক প্রকাশিত হয় বাঙালির নিজস্ব ছাপাখানা থেকে, যেমন —সঙ্গীততরঙ্গ (১৮১৮), গৌরীবিলাস (১৮২৪; ২ খানি কাঠ-খোদাই, ৪ খানি লাইন এনগ্রেভিং[৪৫]), বত্রিশ সিংহাসন (১৮২৪), গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী (১৮২৪), কালী কৈবল্যদায়িনী (১৮৩৬), ভাগবদগীতা (১৮৩৬), হরপার্বতীমঙ্গল (১৮৫১) ইত্যাদি। এগুলি তো ছিল ধর্মীয় পুস্তক, পৌরাণিক ও প্রচলিত দেশীয় আখ্যানের সচিত্র গ্রন্থরূপ; কিন্তু এর বাইরেও আরও একশ্রেণির গ্রন্থ এইসময় প্রকাশিত হয়, লঙের ভাষায়, 'On Erotic subject there are various books which have passed through many editions in prose and poetry and have a wide circulation',[৪৬] সেইসব গ্রন্থ অর্থাৎ আদিরস, বেশ্যা-রহস্য, চারুচিত্ত রহস্য, হেমলতা-রতিকান্ত, কামশাস্ত্র, লক্ষ্মীজনার্দনবিলাস, প্রেমবিলাস, প্রেমতরঙ্গ, শ্রীনগর তিলক, স্ত্রী-চরিত্র, রস-মঞ্জরি, রসসাগর, প্রেমনাটক, রস সাগর, রতিকালী, রসরত্নাকর, রমণীরঞ্জন ইত্যাদি এবং 'সম্ভোগ-রত্নাকর', লঙের ভাষায় 'with 16 filthy plates'।[৪৭] চিত্র সম্বলিত এ জাতীয় গ্রন্থ আরও ছিল, যাকে লং ভিক্টোরীয় শুচিতার দৃষ্টিকোণ থেকে অশ্লীল ফরাসি চিত্রের সমতুল্য বলে মনে করেছেন। সন্দেহ নেই, এ জাতীয় গ্রন্থ আরও অনেক ছিল, লঙের তালিকার বাইরে; কারণ লং এই জাতীয় গ্রন্থগুলির অসম্পূর্ণ তালিকা দাখিল করেছেন। উত্তরকালে গবেষকদের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অবশ্য ধরা পড়েছে, ছবিগুলির রুচিশীল 'পরিচ্ছন্নতা'; প্রায় সবই 'মধ্যবিত্ত ঘরের বাবু ও বিবির প্রতিকৃতি। সবই সুবেশ, সুসজ্জিত। যেন ফোটোগ্রাফারের সামনে বসেছেন বা দাঁড়িয়ে আছেন। অশ্লীলতার লেশমাত্র নেই কোথাও।'[৪৮]

উনিশ শতকের গ্রন্থচিত্রীদের প্রাথমিক অনুপ্রেরণা অবশ্যই সাহেবদের কাছ থেকে পাওয়া। ১৭৭৭-৭৮ অব্দে কলকাতায় ছাপাখানা প্রচলনের পর ১৭৯৯ পর্যন্ত মোট ১৭টি ছাপাখানা থেকে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে কমপক্ষে ৩৬৮টি।[৪৯] এর মধ্যে বেশ কিছু গ্রন্থ ছিল সচিত্র। মূলত ধাতুখোদাই ছবিই ছিল বেশি, কারণ কাঠখোদাই ছবির চেয়ে তা অনেক কম ব্যয়সাপেক্ষ এবং ইউরোপ থেকে প্রয়োজনমতো আমদানি করা যায়। তবে কাঠখোদাই ছবিও ছিল কিছু। এই সময়েই কলকাতার সাহেবি ছাপাখানা থেকে ডানিয়েল, উইলিয়ম বেইলি, রবার্ট মাবন, সলভিন্‌স প্রভৃতি চিত্রশিল্পীদের কলিকাতা ও হিন্দু জীবনভিত্তিক ছবির বই ছাপা হয়। মাবনের বইটিকে তো ভারতবর্ষের প্রথম সস্তা ছবির বই বলা হয়েছে।[৫০] অষ্টাদশ শতকে ইংরেজ পরিচালিত ছাপাখানাগুলিতে স্থানীয় লোকদের শিক্ষিত করে তুলে ব্যবহার করা হত।[৫১] এসবের মাঝেই শ্রীরামপুর মিশনের হাত ধরে উঠে আসেন পঞ্চানন কর্মকার। উনিশ শতকের প্রথম যুগের কাঠ খোদাই শিল্পীদের মধ্যে যাঁকে সর্বোত্তম ধরা হয়। দেশীয় কাঠ-খোদাই চিত্রীদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রামচাঁদ রায় ও রামধন স্বর্ণকার; এরা ধাতুর উপর লাইন এনগ্রেভিং-এও দক্ষ ছিলেন।[৫২] বলা বাহুল্য, উত্তরকালে এই জাতীয় খোদাই-শিল্পীর প্রয়োজন অনুভব করতে থাকেন বটতলার ও অন্যান্য প্রকাশকেরা। একাধিক চিত্রশিল্পীও উঠে আসতে থাকেন, যেমন— নৃত্যলাল দত্ত, মাধবচন্দ্র দাস, গঙ্গানারায়ণ ঘোষ, কার্তিকচন্দ্র বসাক, হীরালাল কর্মকার, গঙ্গাচরণ স্বর্ণকার ইত্যাদি। এ জাতীয় শিল্পীর চাহিদা লক্ষ্য করে, ১৮৫৪ সালে ইঙ্গ-ভারতীয় 'শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভা'র উদ্যোগে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় Society for the promotion of Industrial Art, , ১৮৬৪-তে যা রূপান্তরিত হয় সরকারি আর্ট স্কুলে। লিথোগ্রাফ ও

উডকাট চিত্রপদ্ধতি শেখানো হত এই স্কুলে। পরবর্তীকালে এই শিক্ষার সাহায্যে একাধিক আর্ট স্টুডিয়ো গড়ে ওঠে, যেমন— কাঁসারিপাড়া আর্ট স্টুডিয়ো, চোরাবাগান আর্ট স্টুডিয়ো, ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিয়ো, চিত্রশিল্পী কোম্পানি ইত্যাদি। উনিশ শতকের শেষদিকে প্রকাশক চণ্ডীচরণ বসাক সংযম শিক্ষার বই 'যৌবন পথে' ১৩৮ খানি চিত্রসহ প্রকাশ করার দুঃসাহস দেখান এইসব চিত্রশিল্পীদের সাহায্যেই।

বলা বাহুল্য, বাবুরা ছিলেন চিত্রশোভিত গ্রন্থের বাঁধাধরা ক্রেতা। অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত বাবুরা অপরের মুখে (বাবুর পারিষদবর্গের মধ্যে কেউ) গ্রন্থবিষয় পাঠ করতেন, আবার স্বয়ং চিত্র দেখে ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা প্রশমিত করার চেষ্টা করতেন। অবরোধবাসিনী রমণীদের তখন যত্রতত্র দেখা পাওয়া সম্ভব ছিল না, অতএব ছবিই সই। জনৈক সমাজতান্ত্রিক-গবেষক মন্তব্য করেছেন, 'বটতলার প্রকাশহারা যদি ক্রমে আদিরসের দিকে বেশি নজর দিয়ে থাকেন তাহলে তার জন্য কলকাতার নব্যবাবুদের (এটি নববাবু এবং অর্ধশিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবু বলাই সংগত) 'বিদ্যাসুন্দর' ও 'খেউড়' কালচারকেই দায়ী করতে হয় বেশি, প্রকাশকদের নয়। হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা কলকাতার নব্যবাবুদের বিকৃত রুচির খোরাক জোগাতে বাধ্য হয়েছেন বটতলার প্রকাশকরা, তার বেশি তাঁরা কিছু করেননি।'[৫৩] তবে, বাবুদের কাছে যা ছিল সম্ভোগ-প্রবৃত্তির সহায়ক, সাধারণের কাছে তাই ছিল 'বড় ঘরের বড় কথা'। এই সকল গ্রন্থের প্রায় অধিকাংশই শিক্ষিত অভিজাত বাবু-বিবিদের উপলক্ষ্য করে রচিত। ছবিগুলি দেখলে বোঝা যায় রসমঞ্জরি বা সম্ভোগ-রত্নাকরের নায়ক-নায়িকা আর যাই হোক, গরিব গুর্বো জনসাধারণ থেকে উঠে আসেননি। ভিক্টোরিয় আসবাবপত্রে শোভিত পটভূমিতে টেবিল-চেয়ারে বসে অলংকৃত বস্ত্র-অলংকারে সুসজ্জিত হয়ে তাঁরা আহার-বিহার করেন, হিন্দুস্তানি ধরনের শাড়ি পরে বিবিরা আলবোলায় টান দেন, 'সচিত্র রতিশাস্ত্রে'র (১৩১৫ বঙ্গাব্দ) নায়ক তো আর কোট-পেন্টুলুন, ব্লেজার ওয়েস্ট-কোট সমেত বাঙালি সাহেব-বাবু। অতএব, সাধারণেরা এর মধ্যে পেত বড়ো ঘরের বাবু-বিবিদের গোপন যৌন-জীবন এবং আধুনিক জীবনযাত্রার আনুমানিক চেহারাটুকু। লং সহ আরও অনেকেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, এ জাতীয় পুস্তকের চাহিদা ছিল সবচেয়ে বেশি। সংস্করণও হত অনেকবার এবং একেকবারে হাজার দু'হাজার কপি ছাপাও হত। বাবু-কালচার যে কীভাবে নাগরিক সংস্কৃতি থেকে আপামর বাঙালি পুরুষের মধ্যেই চারিয়ে গেল, এ জাতীয় পুস্তকের বিবরণ ও ছবির ভাষ্য তার পিছনের অন্যতম কারণ হলে অবাক হবার কিছু নেই।

রাজনারায়ণ বসুর বক্তব্য উদ্ধার করে আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়েছি যে, শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পানদোষ ও বেশ্যাগমনের রীতি বন্ধ হলেও, 'প্রচ্ছন্নভাবে' তা শতগুণ বেড়ে গিয়েছিল। নববাবুরা পাশ্চাত্য সুরুচির শিক্ষায় সুশিক্ষিত ছিলেন না। তাঁদের নীতিবোধ ছিল শিথিল। এ ব্যাপারে সাধারণত তাঁরা চিন্তামুক্ত ছিলেন এই ভেবে যে, বিত্ত ও প্রতিপত্তির যে সুষম অধিষ্ঠানে তাঁরা অধিষ্ঠিত, তার সাহায্যে নৈতিকতা-অনৈতিকতার প্রসঙ্গটি আপাত নিরর্থক করে দেবার ক্ষমতা তাঁরা রাখেন; রামদুলাল দে-র মতো তাঁরাও বলতে পারেন, 'জাত তো আমার সিন্দুকের মধ্যে।' অনৈতিক আচরণের ফলে স্বভাবতই কোনোরকম পাপবোধের ভারে তাঁরা পীড়িত হতেন না। কিন্তু শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের ক্ষেত্রে প্রসঙ্গটি ছিল ভিন্ন। যে পাশ্চাত্যের সুরুচির ধ্বজা তাঁদের মনের আকাশে উড্ডীয়মান ছিল, সেই পাশ্চাত্য শিক্ষা থেকেই পানদোষ না হোক, বেশ্যাগম যে অনৈতিক, তা তাঁরা জানতেন। একধরনের সচেতন পাপবোধ এ জাতীয় আচরণের সঙ্গে সঙ্গেই উৎক্ষিপ্ত হত। আবার, এ জাতীয় অনৈতিক ফলের আস্বাদ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষাও কম ছিল না। ফলে এক জাতীয় মানসিক দ্বন্দ্বের শিকার হয়েছিলেন তাঁরা।

সেইসঙ্গে ছিল চাকরিজীবী হওয়ায় আর্থিক সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতার জন্য সংকোচ ও আক্ষেপ। এই অপারগতাই নানারকম চিত্রশোভিত আদি-রসাত্মক গ্রন্থপাঠে ঠেলে দিয়েছিল তাঁদের। গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ছবিগুলি একরকম বাবুদের 'দর্শকাম' মনোভাবের পরিপোষণ করত। শুধুমাত্র ছবির আকর্ষণেও যে বই বিকোত, তাতে সন্দেহ নেই। বটতলার প্রকাশক কর্তৃক নিযুক্ত ক্যানভাসাররা ঝাঁকাভর্তি বই নিয়ে ফিরি করে বেড়াতেন চিত্র সম্বলিত বাবু-বিবির কেচ্ছা বা কিস্‌সা, আর এভাবেই নাগরিক শিক্ষিত অভিজাত বাবুদের সংস্কৃতি বেঁধে ফেলত সুদূর মফস্সল, এমনকী গ্রামীণ পুরুষের মনোভাব ও জীবনযাপনকেও।

মফস্সলের শহর ও প্রধান প্রধান গ্রামগুলিতে বই বিক্রির সুবিধার জন্য গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যই প্রথম এজেন্ট নিযুক্ত করেন। জনৈক আলোচক জানিয়েছেন, 'প্রথম ৫০/৬০ বছর দোকানের চেয়েও বই বিক্রির জোরালো ব্যবস্থা ছিল ফিরিওলার মারফৎ বাড়ী বাড়ী বই পাঠানো। বিশেষ করে বটতলার প্রকাশকরা ফিরিওয়ালার উপরই বই বিক্রির জন্য প্রধানতঃ নির্ভর করতেন।... বর্তমান শতকের (বিশ শতক) প্রথম দিকেও বইয়ের ফিরিওয়ালা ছিল।'[৫৪] এঁরা যেমন বটতলার বই ফিরি করে বেড়াতেন, তেমনি নানারকম পটের ছবি, প্রেসে ছাপা রঙিন লিথোগ্রাফ কিংবা কালিঘাটের পটের ছাপাচিত্রও ফিরি করতেন ফিরিওয়ালারা। অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতিকথায় গুরুচরণ নামে এইরকম এক ছবি ফিরিওয়ালার কথা জানিয়েছেন, যে ঘটি তোলার পাশাপাশি ছবিও বিক্রি করত। তাঁর কথায়, 'তখন রাম-রাবণের যুদ্ধ, অশোকবনে সীতা, কালীয় দমন, নরনারীকুঞ্জর, কদমতলায় রাধাকৃষ্ণ এই রকম নানা পৌরাণিক ছবি বটতলায় লিথোগ্রাফে ছাপা হত। কতক কতক ছবিতে আবার রং দেওয়াও হত; গরিব লোকেরা সেই ছবি কিনে আপনাদের ঘরের দেয়ালে আটা দিয়ে লাগিয়ে রাখত, কেউ কেউ বা বাঁধিয়েও রাখত, গৃহস্থ বাড়ীতেও সেসব ছবি রাখা নিন্দার কথা ছিল না।'[৫৫] অমৃতলাল যা বলতে দ্বিধাবোধ করেছেন, কিন্তু গৃহস্থ বাড়িতে 'ছবি রেখে' নিন্দা না হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাতে অনুমিত হয়, সেসব ছবি ছিল বটতলার গ্রন্থে ও পৃথকভাবে মুদ্রিত বাবু-বিবির নানান ধরনের ছবি। বস্তুত গরিব মানুষের ক্রয়সাধ্য এইসব ছবির মাধ্যমে বাবু-সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট সামাজিক ধারণা বলবৎ হচ্ছিল এবং এইসব ছবির নিরিখে 'বাবু' শব্দটির সঙ্গে অগম্যাগমন, লাম্পট্য, পানদোষের পাশাপাশি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের হীনমন্যতা, স্ত্রী-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হওয়ার নীচতা, পিতা-মাতাকে অবহেলা করা বা নফর-চাকররূপে রাখার মানসিকতাও সাধারণ চরিত্র-বৈশিষ্ট্য হিসাবে নির্ধারিত হয়েছিল। উনিশ শতকের শেষার্ধে, স্ত্রীশিক্ষা ধীরে ধীরে প্রসারিত হওয়ার উপক্রম করলে রক্ষণশীল বাঙালিরা আশঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং বটতলার পুস্তিকাগুলির মারফত শিক্ষিতা পত্নী থাকলে মধ্যবিত্ত বাবুদের কী কী দুর্দশা হতে পারে, তার একটা অনুমান বা আশঙ্কাভিত্তিক চিত্র উপস্থিত করেন। 'পাশ করা মাগে'র মতো গ্রন্থে শিক্ষিতা স্ত্রীর বহুগামিতা, অবৈধ প্রণয়ের ফলে বাবুটির দুর্গতি দেখানো হয় চিত্রসহযোগে। সেকালে এ জাতীয় গ্রন্থের সংখ্যা বিশেষ কম ছিল না, যেমন— হুড়কো বউয়ের বিষম জ্বালা, মডেল ভগিনী, লাল পল্টন, তিন বন্ধু, কলির বউ হাড় জ্বালানি ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ বাবুদের রূপ-রূপান্তরের এবং মানসিক চরিত্রবদলের একটি ধারাবাহিক চিত্র বটতলার বাবু-সাহিত্যে সহজলভ্য ছিল। গ্রন্থ চিত্রণের মধ্য দিয়ে সেই রূপটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল বটতলা। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি এগুলিকে কখনো উন্নাসিক দৃষ্টিতে অবহেলা করতে চেয়েছে, কখনো 'ইতর শ্রেণির বই' বলে নাসিকা কুঞ্চন করেছে, কিন্তু অস্বীকার করতে পারেনি। ড. সুকুমার সেন এ জাতীয় একটি 'ইতর শ্রেণির বই'-এর কথা বলেছেন[৫৬], নাম—

'হনুমানের বস্ত্রহরণ', বেচুলাল বেনিয়ার নামে প্রকাশিত (ড. সেন অনুমান করেছেন, ইনি ছিলেন বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়), যাতে চারটি ছবি আছে যা লিথোয় ছাপা। তাঁর মতে, 'লিথো ছবির বটতলায় আসতে অনেক বিলম্ব হয়েছিল। বেশি চালুও হয়নি।'[৫৭] আমরা দেখেছি, লিথো ছাপার শিক্ষা চালু হয় ১৮৫৪-তে, এবং দশ বছরের ভিতরেই বেশ কয়েকজন লিথোশিল্পী শিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এ কাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। অতএব ১৮৭০-এর পর ধীরে ধীরে বটতলার বইয়ে লিথোছবি ছাপা হতে থাকে, মনে করাই সংগত। তবে সাধারণত লিথোছবি গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রহসন-ছড়া-কবিতা নির্ভর বাবু-সাহিত্যে ছাপার রেওয়াজ ছিল না, এগুলি ছাপা হত পুরাণ ও নানাপ্রকার ধর্মগ্রন্থে। কারণটি সহজেই অনুমেয়। লিথোছবি ছাপা হলে গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি হত, অতি অল্পমূল্যে বাবু-সাহিত্য আর বৃহত্তর পাঠক সাধারণের কাছে পৌঁছোনো সম্ভব হত না। অন্যদিকে ধর্মগ্রন্থ বা পুরাণ লিথোছবি সংযুক্ত হলে দামে বৃদ্ধি পেত ঠিকই, তবে ধর্মীয় কৃত্যভেবেই বেশি দাম দিয়েও মানুষ ওই জাতীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করতেন। ছাপানো ছবিগুলি তাঁদের ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে, এই বিশ্বাসেই দামের কথা তাঁরা ভাবতেন না। অন্যদিকে বটতলার বাবু-সাহিত্য ছিল তাৎক্ষণিক সাহিত্য, কোনো অমরত্বের প্রত্যাশায় এগুলি রচিত হত, ভাবাটা অন্যায় হবে। পাঠক এগুলি পাঠ করে সাময়িক আনন্দ ও উত্তেজনা উপভোগ করবেন, বাবুদের রূপ ও স্বরূপ দেখে নিজেরা আত্মসচেতন হবেন, এমন প্রত্যাশাতেই বাবু-সাহিত্যের জন্ম। অতএব সাদা-কালো উডকাট ছবি ব্যবহার করেই বাবু-সাহিত্য তার লক্ষ্য পূরণ করে।

সুকুমার সেন এই জাতীয় ছবিগুলির থেকে সমকালীন বাঙালি স্ত্রী-পুরুষের বেশভূষার আদলটি লক্ষ করেছেন। তাঁর মতে, এগুলিতে 'সম্ভ্রান্ত ভদ্র পুরুষের সাজ সেকালের অনুমিত দরবারি পোশাকের মতো। আঁট কুর্তি, ঘাঘরা, মাথায় পাগড়ি, পায়ে নাগরা জুতো। তবে ব্রাহ্মণপণ্ডিত, বৈষ্ণব ও সাধারণ মানুষের বেশভূষা স্বাভাবিক। ...অন্তঃপুরের ছবিগুলিতে সেকালের মেয়েদের সামাজিক আচরণের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়।'[৫৮] আচার্য সেন 'অন্নদামঙ্গলের মতো' কিছু বই দেখে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। আমাদের বিচারে, উক্ত গ্রন্থে বা গ্রন্থগুলিতে সম্ভ্রান্ত শ্রেণির সাজপোশাকের যে নমুনা চিত্রিত হয়েছে, তার সঙ্গে মিল পাওয়া যায় আদি ও নববাবুদের দরবারি পোশাকের। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে এ জাতীয় পোশাককেই সম্ভ্রান্ত বাবুদের বাইরের পোশাক বলে বর্ণনা করেছেন।[৫৯] সাধারণ মানুষের পোশাক অবশ্য দীর্ঘদিন পর্যন্ত একইরকম ছিল। কিন্তু বিত্তবান বাবুদের পাশাপাশি, চাকরিজীবী মধ্যশ্রেণির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের মধ্যবর্তী সময়ে এ দেশের মানুষ এবং তাদের রীতি-নীতি-উৎসব-সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে মাদাম বেলান্স যে প্রায় ২০০টি ছবি এঁকে মুদ্রিত করেন, তার একটিতে নিম্নবিত্ত হিন্দুর রান্নাঘরে কালীঘাটের পট ঝুলতে দেখি। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না, স্বল্পমূল্যের এই পটগুলি তখন থেকেই সাধারণ নিম্ন ও মধ্যবিত্তের ঘরের শোভা বৃদ্ধি করছে, হয়তো-বা ধর্মকৃত্যতেও সাহায্য করছে। কিন্তু এ ছবি দেব-দেবীর বা পুরাণ প্রসঙ্গের। বাবু-বৃত্তান্ত, তার কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি বটতলার ছবিতে জাঁকিয়ে বসল সম্ভবত দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিক থেকেই। প্রথমে অল্প আঁকা হলেও ক্রমশ জনপ্রিয়তার কারণে এই ছবিই বেশি আঁকা হতে থাকে এবং আর্চার কথিত চতুর্থ পর্বে এ জাতীয় ছবির চাহিদানির্ভর অক্ষম অনুকরণই হতে থাকে মূলত।

কালীঘাটের পটে বাবু-বৃত্তান্ত দু'রকম ভাবে উপস্থিত হয়েছে,—

এক. প্রতিকৃতি নির্ভর (Profile) ছবি;

দুই. সমসাময়িক বিষয় নির্ভর কাহিনি ভিত্তিক (story-telling picture) ছবি।

প্রতিকৃতি নির্ভর ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে বাবুদের একাধিক প্রতিকৃতি, ফুলবাবু থেকে শুরু করে নব্যবাবু, কাপ্তেনবাবু, মধ্যশ্রেণির ভদ্রলোকবাবু; বাবু তাঁর রক্ষিতাকে মদ্যপান করাচ্ছেন কিংবা স্বয়ং মদ্যপান করছেন, রক্ষিতার পদতলে পড়ে বাবু রক্ষিতার মানভঞ্জন করছেন, বাবুর হাতে ঝোলানো একঝাঁক গলদা চিংড়ি ও চাঁদামাছ, বাবু বিবির বাজানো বেহালা শুনছেন; মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত বাবু নারীস্বাধীনতার দুর্দশায় স্ত্রীকে কাঁধে চড়িয়ে হাঁটছেন সঙ্গে বৃদ্ধা মা হেঁটে চলেছেন, তাঁর গলায় চেন বাঁধা, সে চেন ধরে রেখেছেন বাবুটি স্বয়ং; বাবু ও তার পাশ্চাত্য-পোশাক পরিহিত বিবি, আলবেলা-সেবন রত বাবু ইত্যাদি। এগুলি থেকে বাবু-বিবিদের সাধারণ চরিত্র এবং তাঁদের প্রতি সমকালের দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচিত হয়। ছবিগুলি অলংকারবিহীন, প্রায়শ, নিছক রেখার দ্বারা অঙ্কিত, কোথাও কোথাও পোশাক-আশাকের রেখাঙ্কনে ঈষৎ বিদেশি ছায়া। পাশাপাশি উনিশ শতকের মন্দির-টেরাকোটা এবং বাংলার ব্রোঞ্জ ভাস্কর্যের প্রভাবও রয়েছে।[৭২]

দ্বিতীয় শ্রেণির ছবিগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত তারকেশ্বরের এলোকেশী মোহন্তের ঘটনা। ১৮৭৩ সালে তারকেশ্বরের দোর্দণ্ড-প্রতাপ মোহন্ত মাধব গিরির সঙ্গে গ্রামের মেয়ে এলোকেশীর অবৈধ প্রণয়ের ফল, শহরে কাজ করা এলোকেশীর স্বামী নবীনমাধবের হাতে এলোকেশীর হত্যা। সমকালে আলোড়ন তোলা এই ঘটনায় নবীনমাধব খুনের দায়ে দ্বীপান্তরিত হয়েছিল আর ব্যভিচারের দায়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয় মোহন্ত মাধব গিরি। জনৈক গবেষকের দাখিল করা হিসাব অনুযায়ী,[৭৩] এই ঘটনা নিয়ে শুধুমাত্র বটতলা থেকেই ১৮৭৬-এর মধ্যে ৩৪টি প্রহসন রচিত হয়। সঙ্গে অসংখ্য গান, সেইসঙ্গেই ১৮৭৩ থেকে ১৮৮৫-র মধ্যে আঁকা কালীঘাটের পটের প্রায় শতখানেক ছবি। সম্ভবত, মোহন্ত-এলোকেশীর ঘটনা নিয়ে কালীঘাটের পটুয়ারা সবচেয়ে বেশি উত্তেজনার উপাদান খুঁজে পেয়েছিলেন। এর পাশাপাশি বিবির বেলুনে চড়ার দৃশ্য, বাবুদের বেলুনে চড়ার দৃশ্য সমকালের প্রেক্ষাপট থেকেই ছবির বিষয় হয়ে এসেছে। ১৮৩৬ সালের ১৬ মার্চ প্রথমবার কলকাতার মুচিখোলার মাঠ থেকে জনৈক রবার্টসন বেলুনে উঠে কিছু পরেই নেমে আসতে বাধ্য হন। তবে সার্থকভাবে কলকাতার আকাশে বেলুন নিয়ে ওড়েন কাইট সাহেব। ১৮৫০-এর ৫ নভেম্বর বেলুনে চড়ে দমদম হয়ে জাগুলিয়ার কোটরা গ্রামে অবতরণ করেন। এই ঘটনার ঈশ্বর গুপ্ত সহ কলকাতার সম্ভ্রান্ত বাঙালি মহলে সাড়া পড়ে যায়। প্রথম বাঙালিবাবু হিসাবে কলকাতার আকাশে ওড়েন 'ইন্ডিয়ান সার্কাসে'র রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৮৮৯-এর ১০ এপ্রিল। ওই বৎসরেরই ৪ মে একককভাবে রামচন্দ্র পুনর্বার আকাশে ওড়েন এবং সফলভাবে অবতরণ করতে সমর্থ হন। রামচন্দ্রের কন্যাও পিতার মতোই দুঃসাহসী ছিলেন এবং কয়েকবার পিতার সঙ্গে বেলুনে উড়েছিলেন।[৭৪] সমকালের কালীঘাটের পটে বাঙালিবাবুদের এই অসমসাহসিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ে আঁকা হয়েছিল বেশ কিছু পট। এমনকী নৃত্যলাল শীল প্রকাশিত ১২৯৭-এর পঞ্জিকাতেও এইরকম ছবি মুদ্রণের কথা জানা যায়।[৭৫] এ ছাড়াও বাঙালি যুবা শ্যামাকান্তর খালি হাতে বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ের দৃশ্যও জনপ্রিয় হয়। বস্তুত, কালীঘাটের পটুয়ারা বাবু-বিবিদের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির নানান ঘটনামূলক ছবিকে যে পটের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন, তার কারণ নিহিত আছে সমাজ-মানসের চাহিদার মধ্যেই। ইতিপূর্বেই আমরা বলেছি যে, উনিশ শতকের বৃহত্তর সাধারণের আগ্রহ ছিল বাবু-বিবিদের নিত্যনতুন কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি ঘটনার প্রতি। কিছুটা কৌতূহল, অনেকটাই বাবুদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখবার সামাজিক কৌশল হিসাবে এ জাতীয় ছবির চাহিদা ছিল প্রচুর। এ জাতীয় ছবিগুলি হয়ে উঠেছিল দৃষ্টান্ত, যা দেখে বাবুদের অনৈতিক জীবনের আভাস বা সংবাদ তাঁরা পেতেন এবং সচেতনভাবে ব্যঙ্গ ও ঘৃণার দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়গুলিকে তাঁরা দেখতেন।

সেইসঙ্গেই তাৎক্ষণিক উত্তেজনা ও উপহাসের ভাবটিও যে ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। কালীঘাটের প্রাপ্ত পটচিত্রের মধ্যে দেব-দেবীর চিত্রের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। পশুপাখি এবং সামাজিক বিষয় নির্ভর অর্থাৎ বাবু, বিবি, গণিকা, নর্তকী, সাহেব ইত্যাদি প্রসঙ্গেই কালীঘাটের পটুয়ারা বেশি উজ্জীবিত দেখা যায়। মানতেই হবে, এ জাতীয় পটের নিশ্চয়ই চাহিদা ছিল বেশি, ফলে এ জাতীয় ছবির সংখ্যাও তুলনায় বেশি। বাবু-বিবিদের প্রতি আত্যন্তিক কৌতূহল ও ব্যঙ্গ থেকে সমাজের সাধারণ মানুষ যে ক্রমশ সমাজ সচেতন হয়ে উঠছিলেন, সে কথাটিকে নিতান্ত অস্বীকার করা যায় না।

কালীঘাটের পট যে তার এহেন সামাজিক বিষয় নিয়ে বটতলার গ্রন্থচিত্রণকে প্রভাবিত করেছিল সন্দেহ নেই। পূর্বতন মোহন্ত-এলোকেশীর ঘটনা নির্ভর ছবিগুলির কোনো কোনোটিতে থিয়েটারের ঢঙে পটভূমির চারপাশে ড্রপসিনের বাঁধা অংশ দেখতে পাওয়া যায়। জনৈক সমালোচক বিষয়টিকে দেখেছেন এইভাবে : 'In numerous hand printed Kalighat pats and Battala woodcuts one can see at the top of the frame the furled up theatre curtains that the artist used to frame his picture with. The Europeacisms that infiltrated the Battala woodcuts came from (i) the hybrid mix characteristic of the Babu culture of the time and (ii) from their urge to mock, albelt cautiously, the sressures the artistsfelt, coming into the hybrid culture of the babus (the world of Moliene's "bourgeois gentlemen") from the more wholesome rural environment where they still had their roots.'[৭৬] আধা সাহেবি-আধা বাঙালি সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধের বাঙালিবাবুরা যেমন কালীঘাটের বটতলার ছবিকে প্রভাবিত করেছে, তেমনি প্রেক্ষাপটে থিয়েট্রিকাল ধরনে ড্রপ সিনের উপস্থিতি বিলিতি ছবির কালচার থেকে নয়, এসেছে সমকালীন বাঙালি জীবনের ঘটনা থেকেই। দেখা যাবে, মোহন্ত-এলোকেশীর ঘটনা নির্ভর ছবির ক্ষেত্রেই বেশিরভাগ পোশাকে এক ধরনের সাধারণীকরণ ঘটে, ইতিপূর্বেই পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে নানান প্রসঙ্গে তা দেখানো হয়েছে। বটতলার সচিত্র বাবু-সাহিত্যে প্রাথমিকভাবে ভবানীচরণ বর্ণিত ফুলবাবুর সাজপোশাকেই বাবুদের সাক্ষাৎ মেলে। উনিশ শতকের শেষ দিকের গ্রন্থচিত্রে আবার কোঁচানো কালোপেড়ে ধুতি, জুতা, চাপকান-এর পাশাপাশি হ্যাট-কোট-বুট শোভিত বাবুদের দেখা মেলে হামেশাই। অর্থাৎ বটতলার গ্রন্থচিত্র আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে বাবুদের দশকভিত্তিক সাজপোশাক, আদবকায়দার ধারাবাহিক রূপান্তরের ছবিটিকে ধরে রেখেছে; কোনো একটি বিশেষ কালপর্বের ধারণাতেই আটকে থাকেনি। এদিক থেকে দেখলে, বটতলার গ্রন্থচিত্র সমাজের সজীব-সচল শিল্পরূপ বললে ভুল হবে না। সেইসঙ্গে একথাও ঠিক যে, পরবর্তীকালের বটতলার পুস্তক-প্রকাশকেরা বেনামে পুরাতন গ্রন্থের ছবি আত্মসাৎ করে নতুন ছবির সঙ্গে কখনো সংযুক্ত করে দিতেন।[৮০] প্রথম দিকের গ্রন্থচিত্রে বিষয়কে জমির মাঝখানে রেখে চারিপাশের অংশকে খালি ছেড়ে দেওয়া হত কিংবা অতি অল্প উপাদান সংযোজিত হত; এর ফলে, বিষয় হিসাবে বাবু বা বিবির গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠত। পরবর্তীকালে গ্রন্থচিত্রে বিষয়ের চারিপাশের খালি জমির (space) অলংকরণে অধিক গুরুত্ব দেওয়ায়, বিষয় হিসাবে বাবু-বিবির গুরুত্ব যে হ্রাস পেয়েছে, অন্তত শিল্পগত দিক থেকে, তা বলাই যায়। তবে, সামগ্রিকভাবে বাঙালি 'বাবু' শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ বটতলার প্রকাশক ও শিল্পীদের উদ্বোধিত করেছিল এবং তার নিদর্শন ছড়িয়ে পড়েছিল একাধিক গ্রন্থচিত্রণের মাধ্যমে, এই সত্যকে কোনোমতেই অস্বীকার করা যাবে না।

গ্রন্থচিত্রণ ছাড়া বাবুদের প্রত্যক্ষ অবদান পরিপুষ্ট করেছিল উনিশ শতকের কালীঘাটের পটশিল্পকে। বস্তুত, বিষয় হিসাবে একটি বিশেষ সামাজিক শ্রেণির প্রভাবে চিত্রশিল্পের এক বিশেষ ঘরানার সৃষ্টি,

বিশ্বসংস্কৃতির ইতিহাসে প্রায় বিরল। সাধারণভাবে 'পট' ভারতের অতি প্রাচীন শিল্পপ্রকরণ। 'যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা'য় (১/৩১৯) লেখা বা ছবি আঁকার জন্য প্রস্তুত কার্পাস-নির্মিত বস্ত্রখণ্ডকে পট বলা হয়েছে [৬১]; কেউ কেউ তামিল 'পডস', যার অর্থ ছবি, তা থেকে 'পট' শব্দের উৎপত্তি মনে করেন [৬২]; প্রাচীনকাল থেকে পুঁথির পাটায় আঁকা চিত্রকেও পটের আদিরূপ বলে ধরা যায়। মোটের উপর, এই দেশীয় শিল্পধারা প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল এবং এই বৃত্তি ক্রমে বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে এবং চিত্রকর অর্থে 'পটুয়া' নামক একটি বিশেষ শ্রেণিকে বোঝাতে থাকে। চিত্ররচনাপদ্ধতির প্রাপ্ত প্রাচীনতম গ্রন্থ, গুপ্ত রাজাদের সময়ে লেখা 'বিষ্ণুধর্মোত্তরম' গ্রন্থে কাপড়, কাঠ, দেওয়াল ইত্যাদির উপর চিত্ররচনাপদ্ধতির উল্লেখ আছে। তবে তখন কাগজের চল ছিল না বলে পট আঁকা হত বিশেষভাবে প্রস্তুত কাপড়ের উপর, যা গুটিয়ে রাখা (Role) হত। বাংলার ভূ-সংস্থানগত কারণে এখানে পটচিত্রের প্রসার ঘটে এবং মোগল আমলেও পটচিত্র তার অস্তিত্ব ভালোভাবেই বজায় রাখে। মুসলমান চিত্রশিল্পীরাও পটচিত্র অঙ্কনে সামিল হন। কোনো কোনো গবেষকের মতে [৬৩], বাংলায় সাধারণ দুই শ্রেণির শিল্পীরা ছিলেন — আচার্য এবং পাল। এঁদের মধ্যে পালেরা লক্ষ্মীসরা, পুতুল ও দেব-দেবীর মূর্তিতে নির্মাণ ও রংদানের কাজ করেন; অন্যদিকে আচার্যরাই সাধারণভাবে চালচিত্র, কুলো, পিঁড়ি, সর্বোপরি জড়ানো পট এঁকে থাকেন। এই ধরনেরই একদল পটুয়া বা পটিদার গ্রামবাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আঠারো-উনিশ শতকের সন্ধিক্ষণে এসে জড়ো হয়েছিলেন কালীঘাট-মন্দিরে আশেপাশে। এঁদের একটি বড়ো অংশই মূলত দক্ষিণবঙ্গের বাসিন্দা, বিশেষ করে মেদিনীপুর অঞ্চল থেকে আগত। ইতিপূর্বে এঁরা গ্রামে বাস করতেন, এঁদের পোষ্টা ছিলেন গ্রামীণ ভূস্বামী, বিত্তবান জমিদার শ্রেণি। কিন্তু বিট্রিশ যুগে ধীরে ধীরে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামো বিপর্যস্ত হয়ে পড়লে নতুন পৃষ্ঠপোষকের সন্ধানে এবং রুজি-রোজগারের আশায় এঁরা মূলত ভিড় জমান কালিঘাট মন্দিরের সন্নিহিত অঞ্চলে।[৬৪] কেউ কেউ এঁদের পুনর্বাসনের দৃষ্টান্ত হিসাবে আরও দু'টি অঞ্চলের নাম করতে চান— মধ্য কলকাতার পটুয়াটোলা এবং বরিশালের পটুয়াখালি।[৬৫] তবে উত্তরকালের বিশেষ অঙ্কন বৈশিষ্ট্যসহ পটগুলি মিলেছে কালীঘাট অঞ্চল থেকেই, ফলে অনুমিত হয়, কালীঘাটের পটুয়াদের বিশেষ চিত্ররীতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠায়, অন্যান্য অঞ্চলের পটশিল্পীরা গুরুত্ব হারান এবং লুপ্ত হন, অথবা কালীঘাটের পটুয়াদের অনুসৃত চিত্রশৈলীতে আত্মসমর্পণ করে বৈশিষ্ট্য হারান।

পটের ছবি মাত্রেই রেখাধর্মী, উজ্জ্বল রং দ্বারা রঞ্জিত, ছন্দময় এবং সরল। জনৈক সমালোচকের ভাষায়, 'পটের প্রাণই হচ্ছে সরলতা— ভাবের, রচনাভঙ্গির, বর্ণ-বিন্যাসের, কল্পনার সরলতা। পটের আসল রসই সেখানে।'[৬৬] প্রথম দিকে কালীঘাটের পট প্রথাগতভাবে পটচিত্রের এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি মান্য করে চলত অনুমান করা যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য প্রভাব এড়িয়ে চলা সম্ভব হয়নি। এর তাগিদটা এসেছিল সম্ভবত বিপণনের অর্থনীতির কথা ভেবেই। সপ্তদশ-অষ্টদশ শতাব্দী থেকেই কালীঘাট হিন্দুদের একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র হিসাবে জনপ্রিয় হতে থাকে। কেউ কেউ অবশ্য নানান যুক্তি দেখিয়ে বুদ্ধের তিরোভাবের পর কালীঘাটের কালীপীঠের প্রকাশ এবং দশম শতাব্দী থেকেই উক্তস্থানকে কেন্দ্র করে জনপদ গড়ে ওঠবার কথা বলেন।[৬৭] তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই কালীঘাট ও তার সংলগ্ন এলাকা তীর্থযাত্রীদের ভিড়ে যে জমজমাট হয়ে উঠত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানা উৎস থেকেই তার সমর্থন মেলে। দূর-দূরান্ত থেকে যাঁরা তীর্থ করতে আসতেন, ফিরে যাবার সময় তীর্থক্ষেত্রের স্মারক হিসাবে অন্যান্য অনেক কিছুর মতো পট, পুতুল ইত্যাদিও কিনে নিয়ে যেতেন।[৬৮] কালীঘাটের পটুয়ারা সম্ভবত

প্রথম থেকেই এই চাহিদা পূরণের জন্য প্রথাগত ভাবেই ছোটো ছোটো পট আঁকতেন, বড়ো পট তেমন আঁকতেন না নিয়ে যাবার অসুবিধার কথা মাথায় রেখেই। গ্রামবাংলায় এই সেদিন পর্যন্ত পটচিত্রের পূজা প্রচলিত ছিল এবং সরার উপর অঙ্কিত পটের পূজা এখনও প্রচলিত আছে। প্রথম দিকে অনুমান করা যায়, পটুয়ারা সবচেয়ে বেশি এঁকেছেন অতি প্রচলিত দেব-দেবীর ছবি। পরবর্তীকালে তাঁরা সামাজিক ছবির দিকে ঝুঁকতে থাকেন। তীর্থক্ষেত্র হিসাবে কালীঘাটের জনপ্রিয়তা যত বৃদ্ধি পেতে থাকে, লোকসমাগমও তত বেশি হয়। ফলে স্বল্পসময়ে অধিক পট আঁকবার প্রয়োজনীয়তা পড়ে। বিশেষভাবে প্রস্তুত কাপড়ের জায়গায় কাগজের উপর পট আঁকা হতে থাকে। প্রাকৃতিক রঙের জায়গা দখল করে বিলিতি রং। টেম্পেরার স্থানে জলরঙের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বিষয়কে এঁকেই শিল্পীরা ক্ষান্ত হন, পটভূমিকে অলংকারহীনভাবে ছেড়ে দেন তাঁরা; পূর্বে পটভূমি অলংকৃত না করা হলেও রং দ্বারা ভরাট করা হত। ছবিতে ঘনত্ব আনতে পশ্চিমী রীতিতে ছায়াপাত করা হল। সেইসঙ্গেই রূপাদর্শেও বদল ঘটল, মুখের পার্শ্বমাত্র (Profile) আঁকার বদলে আঁকা হল তিন-চতুর্থাংশ মুখাকার।[৬৯] সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তন এল বোধ হয়, লিথোর ব্যবহারে। লিথোর ছবির বহির্রেখা আবছা করে ছাপিয়ে তার উপর কাগজে রঙের প্রলেপ দেওয়া হত। উইলিয়াম আর্চারের মতে,[৭০] কালীঘাটের শিল্পীরা লিথোর ব্যবহার করতে থাকেন ১৮৪০-১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে। ক্রমে এটাই দস্তুর হয়ে যায়।

কালীঘাটের পটে বিষয়বস্তু হিসাবে বাবু-বিবির অনুপ্রবেশ ও জনপ্রিয়তায় ক্রমশ দেব-দেবীর ছবিকে পিছনে ফেলে দেওয়ার ব্যাপারটি সম্ভবত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কোনো সময়ে ঘটে থাকবে। আর্চার কালীঘাটের ছবিকে কালের দিক থেকে চারভাগে ভাগ করেছেন— ১) ১৮০০-৫০ খ্রিস্টাব্দ, ২) ১৮৫০-১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ; ৩) ১৮৭০-১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ; ৪) ১৮৮৫-১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ। ১৮৩৬ থেকে ১৮৪২-এর এই প্রবণতা চোখে পড়ে। তার কারণ, তখন শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির কতিপয় বাবুরা বাঙালি জীবনে পাবলিক থিয়েটারের উন্মাদনা জাগিয়ে তুলেছেন। ১৮৭২-এর পর বাঙালি বাবু-কালচার অনেকটাই থিয়েটার ও অভিনয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত। মোহন্ত-এলোকেশীর ঘটনা নিয়ে উদ্‌বেলিত বঙ্গসমাজে সেদিন অজস্র প্রহসনই রচিত হয়নি কেবল, মঞ্চসফল নাটক হিসাবে বাঙালি দর্শকদের থিয়েটারে টেনে এনেছিল। মাইকেলের 'মায়াকানন' দিয়ে যা করা সম্ভব হয়নি, এলেকেশীর বিষয়নির্ভর নাটক তাই করে দেখাল। অমৃতলাল বসুর ভাষায় : 'এমন সময় মোহন্ত-এলোকেশীর ব্যাপার লইয়া দেশময় তুমুল আন্দোলন হইল; পথে-ঘাটে সর্ব্বত্রই লোকের মুখে ঐ বিষয়ের আলোচনা চলিতে লাগিল। বেঙ্গল থিয়েটার সময় বুঝিয়া "উঃ মোহান্তের এই কী কাজ!" নামে একখানা নাটক স্টেজে খাড়া করিলেন। সমস্ত দেশের লোক যেন সেদিন বেঙ্গল থিয়েটারে ভাঙিয়া পড়িল। থিয়েটারের কপাল ফিরিয়া গেল।'[৭১] কালীঘাটের তৎসম্পর্কিত ছবিতে এই থিয়েটারের প্রভাব পড়ে থাকবে। কালীঘাটের এই সিরিজের ছবিগুলি থেকে নবীন ও তার বন্ধুবান্ধবদের পোশাক-আশাক, আদবকায়দা সম্পর্কে একটি সজীব ধারণা গড়ে ওঠে, যার মধ্যে দিয়ে সেকালের মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত বাবুদের জীবনযাপনের একটা প্রত্যক্ষ আভাস পাওয়া যায়। দুধ-সাদা কালোপেড়ে ধুতি, পাঞ্জাবি, চাদর, কালো Palm-shoe, তেল দিয়ে মাঝখানে সিঁথি কেটে মাথার দু-পাশে পাতানো চুল, লম্বা গোঁফ— মোটামুটিভাবে বটতলার বাবুদের চেহারার এই হচ্ছে সাধারণ লক্ষণ। কোনো কোনো ছবিতে অবশ্য হ্যাট-কোট-বুট পরিহিত সাহেব-সাজা বাঙালিবাবুর দেখা মেলে, তবে সে নিতান্ত কম। কোনো কোনো ছবিতে বাবুদের সঙ্গে কাকাতুয়া, পায়রার উপস্থিতি বাবুদের শখ-আহ্লাদের

বিশেষত্বের পরিচয় বহন করে। উনিশ শতকে, এমনকী বিশ শতকের প্রথমার্ধেও শিক্ষিত বাবুরাও যে পাখি পুষতেন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে তার বিস্তারিত আলোচনা আমরা করেছি। কালীঘাটের পটে সেই শখের প্রত্যক্ষ আভাস মেলে।

কোনো কোনো আলোচক বাবুদের এই বিশেষ মূর্তিকল্প নির্মাণে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জয়নগরের মৃৎশিল্পীদের প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকার কথা বলেছেন।[৭৮] কিন্তু এই মত পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুত, বাবুর আদলের পূর্বরূপ খুঁজতে হবে, কালীঘাটের পটশৈলীর গোড়ার দিককার কিংবা অষ্টাদশ শতকের প্রাপ্ত পটচিত্রের অন্তর্গত সপরিবার দুর্গার ছবির মধ্যে। আমরা যদি এই ধরনের ছবির কার্তিকের গড়ন (রূপকল্প) লক্ষ করি, তবে উনিশ শতকের বাবুদের মূর্তিকল্প নির্মাণের সদৃশ আদল খুঁজে পান। উনিশ শতকের শেষের দিকে তো কার্তিক আর নববাবুর (বা ফুলবাবু) মধ্যে নির্মাণগত পার্থক্য বিশেষ ছিল না। মাথায় ছাতাধারী নবকৃষ্ণের সঙ্গে, কিংবা সেকালের আরও অনেক মসীবর্ণ ছত্রধর বাবুদের সঙ্গে পটের ছত্রধারী মসীবর্ণ বলরাম অভিন্ন হয়ে যান। এমনকি রামের ছবিতেও রাম দেখা দিয়েছেন সেকালের সম্ভ্রান্ত বাবুদের সাজপোশাকে। এও এক কৌতূহলের বস্তু সন্দেহ নেই। এই সদৃশতা গবেষকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। মনে রাখতে হবে, পটচিত্রে যে দেব-দেবীর গড়ন আঁকা হয়, তার বাস্তব ভিত্তি ছিল চারপাশের সমাজ। দেব-দেবীর মূর্তিকল্প নির্মাণেও বাস্তবতার এই ছায়াভাস ঘটেছে। উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই সম্ভ্রান্তবাবুদের চেহারা, পোশাক-আশাক, আদবকায়দার একটি স্পষ্ট ধারণা পটুয়াদের মনে তৈরি হয়েছিল। কার্তিকের রূপই হোক বা উত্তরকালে বাবুদের রূপনির্মাণেই হোক, এই সাধারণ ধারণা থেকেই তাঁরা উভয় প্রকাশের ছবিগুলি এঁকেছিলেন। উত্তরকালে বাবুদের সাজপোশাক ও আদবকায়দার রূপান্তরের যেটুকু পার্থক্য তাঁদের চোখে পড়েছে, পটুয়ারা তা গ্রহণ করেছেন নির্দ্বিধায়। কিন্তু বাবুর সাধারণ রূপকল্পের ধারণা একই থেকে গেছে প্রায়। সব মিলিয়ে কালীঘাটের পট যে বাবুদের চেহারা-চরিত্রের প্রায় Photographic Identification হয়ে উঠেছে, তা বলাই বাহুল্য।

কালীঘাটের পট কেবল বাবু-বিবিদের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি বা জীবনযাপনের কথা বলতে চায়নি, তার গভীরে ছিল উদ্ভ্রান্ত বাবু-বিবিদের প্রতি তীব্র শ্লেষ, ব্যঙ্গ, কঠোর ভর্ৎসনা। পটুয়ারা সেদিক থেকে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজেরই প্রতিনিধি। বাবু-বিবিদের বেলেল্লাপনা, পানদোষ যেমন তাঁদের ছবির বিষয় হিসাবে উঠে আসে, তেমনি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের অতিরিক্ত পত্নীপ্রীতি এবং স্ত্রীশিক্ষার কুফল সম্পর্কে সামাজিক আশঙ্কার কথাও তাঁরা ছবির ভিতর দিয়ে জানিয়ে দেন। কেউ কেউ এসব ছবিকে 'কার্টুন' বা ব্যঙ্গচিত্রের পর্যায়ে ফেলতে চান। তাঁদের মতে, 'কালীঘাটের পটে ঠাকুর-দেবতার ছবি থাকলেও, সাহেবদের খুশি করার জন্য সমসাময়িক সমাজকে ব্যঙ্গ করেও পট আঁকা হত। দেশি শিল্পীদের কার্টুন চেতনার উন্মেষকাল হিসাবে কালীঘাট পটের এই বিবর্তনকে চিহ্নিত করা যায়।'[৭৯] সচেতনভাবে না হলেও, দেশি শিল্পীরা এইসব ছবিকে ব্যঙ্গ প্রকাশের উপায় হিসাবে দেখেছেন, তা মেনে নেওয়াই যায়। আসলে এইসব ছবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সে যুগের সাধারণ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি। অভিজাত, শিক্ষিত 'এলিট' বাবুরা তখন সংগ্রহ করছেন বিলিতি ছবির নকল কিংবা আর্ট স্কুল ফেরত শিল্পীকে দিয়ে আঁকিয়ে নিচ্ছেন দেব-দেবীর তৈলচিত্র।[৮০] দেশি শিল্পীদের পটের লক্ষ্য ছিল এঁদেরই জীবনযাপন না কর্ম-কেলেঙ্কারির সমালোচনা, ব্যঙ্গবিদ্রূপ, উপহাস। অতএব এ জাতীয় ছবির পেট্রন যে তাঁরা হবেন না তা বলাই বাহুল্য। দেশি পটুয়ারা কালীঘাটের পটচিত্রে ব্যঙ্গবিদ্রূপ, উপহাসের তেমন জগৎটাই সৃষ্টি করলেন, অতএব, যা তাঁদের পৃষ্ঠপোষক নিম্ন ও সাধারণ

মধ্যবিত্তের অভিপ্রেত। মনে রাখতে হবে, শেকড় ছিঁড়ে এলেও পুরাতন কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে লালিতপালিত পটুয়ারা সামাজিক প্রগতির নামে সব কিছুকে এত সহজে মেনে নেবেন, এমনটি আশা করাও অন্যায়। তা ছাড়া আমরা দেখেছি, সমাজের বৃহত্তর সাধারণ মানুষ বাবু তথা সমাজের 'এলিট' শ্রেণির পুরুষদের চিরকালই ক্ষমা-ঘেন্নার চোখে দেখে এসেছেন। উনিশ শতকের শেষার্ধে হিন্দু সমাজের প্রচলিত গড়ন ভেঙে যাবে এই আশঙ্কায় এই সাধারণ শ্রেণি আতঙ্কিত ছিলেন। কালীঘাটের পটে উক্ত আশঙ্কারই প্রতিফলন ঘটেছে বলা যায়। জনৈক আলোচকের ভাষায় : 'কালীঘাটের পট শুধু বিশেষ কালের চিত্রকলা নয়, সমকালের দর্পণ। তার সমান্তরাল ধারা রয়েছে বটতলার সাহিত্যে। পটের ছবি দেখতে দেখতে বার বার মনে পড়বে— 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', 'আলালের ঘরের দুলাল', 'নববাবুবিলাস', 'নববিবিবিলাস', 'আপনার মুখ আপনি দেখ' শ্রেণির বইগুলোকে। মনে পড়বে বটতলা থেকে প্রকাশিত রাশি রাশি প্রহসনকে। ওঁরা যখন কলমে কালের বিবৃতিকে তুলে ধরতে চাইছেন, কালীঘাটের পটুয়া তখন ঘোরকলিকে চিহ্নিত করে তুলেছেন তুলিতে। এও যেন তুলিতে আপনার মুখ আপনি দেখ।'[৮১] বস্তুত, কালীঘাটের পট এবং বটতলার গ্রন্থ ও গ্রন্থচিত্রণ একযোগে শিষ্ঠসাহিত্যের সমান্তরালে সাধারণের মুখের ভাষায়, মনের আদলে সাহিত্য ও ছবির সমৃদ্ধ ফসল ফলিয়েছিল, যার মূলে রয়েছেন উনিশ শতকের বাবুকুল। আদিবাবু থেকে নববাবু, নব্যবাবু হয়ে মধ্যশ্রেণির ভদ্রলোকবাবুদের সকলেই বটতলার ছবিতে এবং কালীঘাটের পটে প্রাণ পেয়েছেন, কেবল কোথাও যেন কেরানিবাবু অর্থাৎ 'ভদ্রলোক'বাবুদের অন্ত্যদশাই কেবল আপঙ্‌ক্তেয় থেকে গেছে বটতলা ও কালীঘাটের ছবির জগতে।

বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে বাবু-কালচারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দান অবিস্মরণীয়। জনৈক আলোচকের মতে,[৮২] এই দান 'বাঙালিদের পুরোনো পোশাক-আশাক, কেতা-কায়দা, বনেদি ভদ্রতা, বাংলা খাবারের অপূর্ব বৈচিত্র্য আর সূক্ষ্মতা' এবং 'সাহিত্য ও শিল্প আর প্রত্যক্ষভাবে স্থাপত্যের কীর্তি'র মধ্যে প্রতিফলিত। সাহিত্য ও শিল্পের কথা ইতিপূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি। পোশাক-আশাক, কেতা-কায়দা, বনেদি ভদ্রতা, খাবার-দাবার ইত্যাদি প্রসঙ্গের সূত্রে আমরা বলতে পারি, এসবের ভিতর লক্ষ করা যায় কালান্তরের মেলবন্ধন। বাঙালির নিজস্ব দেশজ সংস্কৃতির সঙ্গে দীর্ঘকাল প্রত্যক্ষভাবে মোগল অধিকার থাকার দরুন মিশেছিল মোগল রীতিনীতি-খাদ্যাখাদ্যের নানান সংস্কার, ভদ্র বাঙালির পোশাক-আশাকেও পড়েছিল মোগল দরবারি সংস্কৃতির ছাপ। ইংরেজের প্রত্যক্ষ অধিকারে আসার পর এর সঙ্গে মিশে গেল বিলিতি সংস্কৃতির ছাপ। বাঙালির জীবনযাপন, রুচি-সংস্কৃতিতে পরিবর্তন ঘটল ব্যাপক অর্থেই। তখন যেহেতু নারীরা বৃহত্তরভাবে অন্দরমহলের বাইরে পা বাড়াননি, ফলে বাঙালিবাবুদের গৃহসংস্কৃতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাবুর নিজের রুচি ও চাহিদার উপর নির্ভরশীল ছিল। ঔপনিবেশিক নগর-সংস্কৃতিতে বাবুর চোখের সামনে মোগল-দেশজ-বিলিতি সংস্কৃতির এক মিশ্ররূপ সক্রিয় ছিল। শাসিত হিসাবে শাসকের সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না বাবুদের পক্ষে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ খুব সুন্দরভাবেই বলেছেন, 'তখন মোগলাই সভ্যতার সঙ্গে ইংরেজি সভ্যতার একটা যুঝাযুঝি চলিতেছিল— দেখা যাইতেছে, জয়ী হইয়াছে ইংরেজি সভ্যতা। বৈঠকখানা হইতে সে গদিপাতা বিছানা উঠিয়া গিয়াছে, তাহার স্থানে আসিয়াছে Drawing Room-এ কৌচ কেদারা। তখনকার aristocracy-র ভাবটা গিয়া এখন (সাম্যের যুগে) democracy-র spirit-টাই প্রবল হইয়াছে। এরূপ aristrocracy যে শুধু আমাদের বাড়িতেই নিবদ্ধ ছিল, তাহা নহে,— তখনকার সমস্ত বড়োলোকদের ঘরেই এই একইরকমের প্রথা

ছিল।'[৮৩] অর্থাৎ অভিজাতবাবুরা আদিতে নবাবি আদবকায়দাতেই অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু ঔপনিবেশিক প্রভুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে তা ক্রমশ সাহেবি-কালচারের অনুকরণ বা অনুসরণে পরিণত হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেশজ কালচার যে কোনো অবস্থাতেই হারিয়ে যায়নি, তাও স্পষ্ট করে জানিয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ : ইংরেজরা 'বাবু'দের ক্রমে অত্যন্ত অবহেলা, ঘৃণা ও অনাদর করলেন বলে 'বাবু' অদৃশ্য হয়ে গিয়ে Mr বা Esqr-এর ব্যবহার চালু হল বটে, তবে 'অন্যান্য বিষয়ে বেশ ত্র্যহস্পর্শ ঘটিয়াছে। এখন ভালো ভোজ দিতে গেলে, হিন্দুমতে শাক-শুকতানি, মোগলাই মতে কালিয়া-পোলাও, এবং ইংরেজি মতে চপ কাটলেট কলার-এর আয়োজন করিতে হয়। পোশাকেও তাই— ধুতি, চাদর, চাপকান এবং মোজা কলার (Collar)। বর্তমান বাংলা ভাষারও তাই— সংস্কৃত, বাংলা, ফারসি, আরবি এবং ইংরেজি সকলেই বাঙালির ভাষায় কিছু না কিছু স্থান অধিকার করিয়া আছেন।'[৮৪] অর্থাৎ নাগরিক বাবু-সংস্কৃতি আসলে একটি মিশ্র-কালচার, যা বিভিন্ন জাতি সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে আত্ম-প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করে, হয়তো-বা বাধ্য হয়েই, গ্রহণের উদারতা দেখিয়েছিল।

যদিও এই উদারতার পিছনের বাস্তব প্রেক্ষিতটিকে ধরতে চেয়েছেন কেউ কেউ, বিশেষভাবে মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিকেরা। শিক্ষার ক্রমবিস্তার সত্ত্বেও এবং বিত্তহীন-চাকরিলব্ধ আয়ের সীমিত সাধ্যযুক্ত বাঙালি মধ্যশ্রেণিও যে জ্ঞানে-অজ্ঞানে 'বাবু' কালচারেরই অঙ্গীভূত হয়ে গেলেন, তার কারণ, উদ্বৃত্ত অর্থ জমি ছাড়া আর অন্য কোনো উপায় খাটানোর কোনো সুযোগই বেনিয়া ইংরেজ দেশীয় বিত্তবানদের জন্য খোলা রাখেননি। মার্ক্স-এর আশঙ্কাকে সত্য করে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল। নতুন বাণিজ্যের চালক ও বাহক ছিলেন শাসক ইংরেজই। কর্মহীন শ্রমিকেরা কৃষিজীবীতে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজ শাসকের কৌশল এবং জমিদারের অবহেলায় কৃষির বৃদ্ধি তেমন বাড়েনি, নতুন কৃষিজমির এলাকা বাড়েনি, অথচ চাহিদা বেড়েছে। এমতাবস্থায় জীবন ও জীবিকার সন্ধানে নগরমুখীন হলেন যাঁরা এবং শিক্ষার সুযোগ লাভ করে কোনোরকমে উঠে এলেন মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্তের শ্রেণিতে, তাঁদের কাছে অনিবার্য ছিল সংস্কৃত,বাংলা, ফারসি ছেড়ে ইংরেজি শিক্ষা। গোপাল হালদার বলেছেন, 'এত বড় দেশ বিলাতী কেরানিতে চলিবে না; তাই মেকলে না বলিলেও সৃষ্টি করিতে হইত নতুন বাঙালি কেরানি। অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষার দুয়ার এই মধ্যবিত্ত ভাগ্যান্বেষীদের জন্য উন্মুক্ত হইল। অন্যদিকে যেভাবে ইংরেজের প্রথম প্রসাদপ্রার্থীরা কলিকাতায় ''বাবু'' রূপে জাঁকিয়া বসিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়াই দেশের ভাগ্যান্বেষীরা বুঝিতে পারিলেন— উন্নতির পথ ইংরেজের কুঠি ও কাছারির আনাচেকানাচে; উন্নতির উপায় যে করিয়াই হউক ইংরেজের প্রসাদলাভ, আর উহার একটা সহায় ইংরেজি বাৎ, ইংরেজি কায়দা।'[৮৫] অর্থাৎ, বাঙালি 'বাবু'রা ছিলেন দৃষ্টান্ত। ঔপনিবেশিক শাসকের সঙ্গে আপোশরফার মধ্যে দিয়ে যে মিশ্র সংস্কৃতিকে তাঁরা 'নিজের সংস্কৃতি'তে পরিণত করেছিলেন এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপায়ে 'ভুঁইফোঁড়' হঠাৎ-নবাবরূপে নাগরিক কলকাতায় বেশ জাঁকিয়ে বসেছিলেন, নতুন ভাগ্যান্বেষী মধ্যশ্রেণির বাবুরা ওই পথই অনুসরণ করতে চাইলেন। এ কারণেই, হুতোমের নকশার সামান্য দশ টাকার কেরানি, সেরুড কোম্পানির বাড়ির মেটমিস্তিরি গুরুদাস গুঁই মাহেশের স্নানযাত্রার আমোদে মত্ত হতে সাধ্যমত ব্যবস্থা করেন;[৮৬] মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের নিয়ে শত শত প্রহসন, নভেল, নকশা লেখা হয়, যার মূল বিষয় লাম্পট্য ও বাবুগিরি। আসলে প্রায় হাজার বছর ধরে শাসিত হতে হতে বিজিত বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির শেকড় আলগা হয়ে পড়েছিল। নবাবি আমলে বাধ্য হয়েই বাঙালিকে মোগল সংস্কৃতির সঙ্গে আপোশ করতে হয়েছিল, ঔপনিবেশিক আমলে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির সঙ্গে। তার খাবারদাবার, রীতিনীতি,

আদবকায়দা, শিল্প-স্থাপত্য এই বিমিশ্রিত সংস্কৃতিরই রূপ। অবশ্য এই বিমিশ্রণের উপাদানগুলি নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাবুদের ব্যক্তিগত অভিরুচিগুলির মধ্যে যখন সাধারণ লক্ষণ আবিষ্কার করা যায়, তখন কোথাও যেন সমষ্টিগতভাবে এসব 'বাবু-কালচারে'র নিজস্ব সংস্কৃতি হিসাবে মান্যতা পেতে থাকে।

ইংরেজ আসার পূর্বে বাঙালির নগর-স্থাপত্য সম্পর্কে ধারণা গড়ে উঠেছিল মূলত ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের নবাবি-কালচারের অধীনে, সেইসঙ্গেই অবাঙালি রাজার রুচিতে গড়ে ওঠা বর্ধমান নগরের কথাও অস্বীকার করা যায় না। ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর আখ্যানে বর্ধমানের নাগরিক সংস্কৃতি ও স্থাপত্যের যে পরিচয় দেয়,[৮৭] তার থেকে সে পরিকল্পনায় নবাবি সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাবই অনুভূত হয়। ইংরেজের হাতে বর্ধিষ্ণু গ্রাম কলকাতা, গোবিন্দপুর, সুতানুটির নগর হিসাবে রূপায়ণের গোড়ার দিকে যেসব দেশীয় ভাগ্যান্বেষণে এবং ইংরেজের সঙ্গে কর্মসূত্রে এলেন, তাঁদের অনেকের মনেই গৃহস্থাপত্যের ধারণা বলতে ছিল মুর্শিদাবাদী নগরের আদর্শ। ইতিমধ্যেই ইংরেজদের হাতে পাশ্চাত্যের আদর্শে যে নিও প্যালাভিয়ান বা নিও ক্লাসিকাল স্থাপত্যগুলি কলকাতার বুকে মাথা তুলেছিল, বাবুদের কাছে তা-ও আকর্ষণীয় এবং একইসঙ্গে শাসকের অনুসৃত রীতি হিসাবে অনুসরণযোগ্য মনে হয়েছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকেও কলকাতার মাটির বাড়ি ও পাকা বাড়ির সহাবস্থান ছিল। অট্টালিকা ছিল হাতে গোনা। চার্ণকের সময়ে অট্টালিকা বলতে যা বোঝায়, তার সংখ্যা ছিল একটি, তা ছিল আদতে জমিদারের কাছারিবাড়ি। তখনও পর্যন্ত 'ব্ল্যাক টাউন' ও সাহেব-পাড়ার সীমানা ছিল চৌরঙ্গি অঞ্চল। 'বুড়াবাজার' বা বড়োবাজার অঞ্চলে প্রথম এদেশীয়দের দোকান ও বাসাবাড়ি গড়ে ওঠে। কিন্তু দেশীয় আভিজাতদের বাড়ি গড়ে ওঠে মারাঠা আক্রমণের পূর্ব থেকেই। বর্তমান চিৎপুর রোড ও বউবাজার স্ট্রিটের আশেপাশে 'কোম্পানির ধনী ব্যবসায়ী ও ধনী দেশীয় বণিকদিগের বাগানবাড়ির সংখ্যা বেড়েই চলেছিল।[৮৮] লালদিঘির উত্তরদিকে প্রথম দেশীয় হিসাবে বাগানবাড়ি গড়ে তোলেন কোম্পানির অন্যতম সুহৃদ উমিচাঁদ, এবং কবরখানার পশ্চিমে রাসবিহারী শেঠ ও রামকিষেন শেঠের বাগানবাড়ি স্থাপিত হয়। অনেক পরের আঁকা পুরোনো লিথোচিত্রে লালদিঘি ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের অট্টালিকার যে গড়ন পাওয়া যায়, তাতে ইউরোপিয়ান নিও-প্যালাভিয়ান বা গ্রিক-রোমান স্থাপত্যের অনুসরণ সুস্পষ্ট। ১৭২০ থেকে ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গোবিন্দরাম মিত্র ছিলেন কলিকাতার 'সহর কোতোয়াল' বা 'ব্ল্যাক জমিদার'। এঁর সময়ে কলকাতার আদিবাবুদের মধ্যে যে কয়জনের বৃহৎ অট্টালিকা ছিল, তাঁদের প্রধান হলেন বনমালী সরকার। বাংলার প্রবাদে আমিরচাঁদের দাড়ি, হুজুরিমলের কড়ি, গোবিন্দরাম মিত্রের ছড়ির পাশাপাশি বিখ্যাত হয়ে রয়েছে বনমালী সরকারের বাড়ির খ্যাতি। কথিত যে, এঁর বাড়িটি নির্মিত হয় বড়োলাট ভবনের (বর্তমান রাজভবন) হুবহু অনুকরণে এবং তার দরুন ইংরেজরা বিরক্ত হন এবং এই মর্মে আপোশরফা হয়, বনমালী সরকারের বাড়ির চারটি গেটের মধ্যে একটি বন্ধ থাকবে।[৮৯] বোঝা যাচ্ছে, সেকাল থেকেই বাবুদের বসতবাটি নির্মাণের আদর্শ ছিল গ্রিক-রোমান স্থাপত্যের কিংবা নিও-প্যালাভিয়ান রীতি। উনিশ শতকের বাবুদের বসতবাটি নির্মাণে এরই জের চলেছে। বনমালী সরকারের সমসময়ে বা তার কিঞ্চিৎ পরে কলকাতায় বৃহৎ অট্টালিকা গড়ে খ্যাতি পান মদনমোহন দত্ত, বারাণসী ঘোষ, বলরাম ঘোষ প্রমুখেরা।[৯০] উনিশ শতকের গোড়ার দিকেই পাথুরিয়াঘাটা, জোড়াসাঁকো, শোভাবাজার প্রভৃতি স্থানে নবকৃষ্ণ দেব পরিবার, ঠাকুর পরিবার, সুখময় রায় পরিবার, সিংহ পরিবার প্রভৃতিদের বসতবাটি গড়ে ওঠে।

এই বাড়িগুলি মূলত বর্গাকার। উঁচু খিলানের উপর বাংলার প্রাচীন স্থাপত্যরীতির অনুসরণে চারিদিকে ছিল সারিবদ্ধ ঘর, সম্মুখে প্রশস্ত বারান্দা। বাড়িগুলি ছিল দ্বিতল বা ত্রিতল। উভয়তলের সাধারণ গড়ন এক ছিল। বর্গাকার বসতবাটির মাঝের অংশ থাকত উন্মুক্ত। প্রায়শই বাড়ির সংলগ্ন মন্দিরটির চাতাল বা দালানের কাজ করত এটি। দুর্গোৎসব বাবুদের কৃত্যকর্মের মধ্যে আবশ্যকীয় ছিল এবং এই উপলক্ষ্যে অনেক লোকসমাগম হতে হতে এটির নাম দুর্গাদালান হয়ে গেছে। বাড়ির প্রবেশদ্বার গথিক রীতির সঙ্গে মোগল রীতির মিশ্রণে উচ্চ ও অলংকরণযুক্ত হত। বারান্দাগুলি বেষ্টন করে থাকত রোমান-স্থাপত্যের মতো মোটা থাম দ্বারা। পরবর্তীকালে কোনো কোনো বাবুরা তাঁদের অট্টালিকার সামনে ইউরোপীয় ধরনে পোর্টিকো নির্মাণ করে নিয়েছেন দেখা যায়। বাড়িগুলির বৈঠকখানা ছিল প্রশস্ত এবং প্রায়শই নানাবিধ দেশি-বিদেশি আসবাবপত্র ও ছবিতে পূর্ণ। কিন্তু অন্দরমহলগুলি আয়তনে প্রশস্ত হলেও অন্ধকার। ছাদগুলি ছিল কড়ি-বরগাযুক্ত এবং মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে স্থাপিত। অধিকাংশ বনেদি বাড়িতেই বিদেশ থেকে আনা ঝাড়বাতি, দেশীয় দেওয়ালগিরির অপূর্ব সহাবস্থান ছিল। ১৮২৭-২৮-এর মধ্যে জনৈকা মিসেস ফেনটন জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত মল্লিক পরিবারের গৌরচরণ মল্লিকের কনিষ্ঠপুত্র রূপলাল মল্লিকের আহ্বানে একটি নাচের উৎসবে যোগদান করেন। শ্রীমতী ফেনটন রূপলাল মল্লিকের গৃহসংস্থান সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন তা উদ্ধার করলেই বাবুদের অনুসৃত স্থাপত্য-রীতির বৈশিষ্ট্য বোঝা যাবে; তিনি লিখেছেন : 'These houses are generally narrow buildings surrounding a square, which on these gala nights is canopied by scarlet curwah, so that on entering what is only an open court, you might suppose it a vast and lofty apartment. Well! After driving furiously to different houses all lit up in the same sytle, as fast as horses could take us on, the glare of lamps, the rapid motion of the multitudes moving round us almost bewildered my brain.' [৯১], সন্দেহ নেই, শ্রীমতী ফেনটন ছিলেন 'নেটিভ' সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাহীন, ভালোবাসাহীন। কিন্তু এদেশের বাবুদের স্থাপত্য সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, তার সারবত্তা অস্বীকার করা যায় না।

অধিকাংশ বাড়িতেই বিদেশি দোকান থেকে কেনা আসবাব, বিদেশ থেকে আনানো ভিনিসীয় আয়না ও মার্বেলের নগ্ন-নগ্নিকামূর্তি রাখা হত। বারান্দার খিলানগুলি সবসময়েই অলংকরণযুক্ত হত। প্রধান প্রবেশদ্বারের মাথায় অনেক সময় ব্রিটিশরাজের প্রতি আনুগত্যের চিহ্নস্বরূপ ঔপনিবেশিক শাসকদের চিহ্ন সিংহমূর্তি নির্মিত হত। অট্টালিকার মাথার উপরেও কখনো কখনো এই মূর্তি স্থাপিত হত। অট্টালিকার ছাদের বহির্সীমানায় ইংল্যান্ডের বনেদি বাড়িগুলির অনুসরণে গম্বুজাকৃতি স্তম্ভ (urns) স্থাপিত হত। বাড়ির মেঝে হত মার্বেল পাথরের, চকমিলান।

কিন্তু বাবুদের স্থাপত্য-রীতির প্রভাব কেবল পরবর্তীকালের অভিজাত বাঙালির গৃহনির্মাণেই ছাপ ফেলেনি, বাঙালি হিন্দুর মন্দির স্থাপত্য-রীতিতেও প্রভাব ফেলেছিল। সাধারণভাবে কলকাতার আদি ও নববাবুরা বাংলার মন্দির স্থাপত্যের রীতি মেনে পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, জোড়বাংলা কিংবা ওড়িশার পীড়াদেউল রীতির মন্দির স্থাপন করেছিলেন। এগুলি প্রথা মেনেই নির্মিত হয়েছিল। পূর্বকথিত গোবিন্দরাম মিত্রের পঞ্চরত্ন (প্রবাদ অনুযায়ী 'নবরত্ন') মন্দিরটি অষ্টাদশ শতকের কলকাতার দর্শনীয় স্থাপত্যের মধ্যে একটি ছিল। ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দের ইতিহাসখ্যাত ঘূর্ণিঝড় ও প্রবল ভূমিকম্পে মন্দিরটির চূড়া ভেঙে পড়ে এবং

ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার বনমালী সরকার প্রতিষ্ঠিত বাণেশ্বর শিবের মন্দিরদালানগুলিতে লক্ষণীয় পরিবর্তন আসে আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে যথা[১২]—

এক. বহু মন্দিরের সামনের ত্রি-খিলান দালান অংশে ব্যবহৃত হয়েছে সারিবদ্ধ স্তম্ভ; যাকে দেশীয় নামে বলা হয় 'কলাগেছে থাম';

দুই. আয়োনিয়ান-ডোরিক-কোরিনথিয়ান স্তম্ভশৈলীর অনুকরণেও মন্দিরের থাম নির্মিত হয়েছে;

তিন. প্রথাসিদ্ধ অর্ধগোলাকৃতি খিলানের পরিবর্তে গথিক খিলান-শৈলী দেখা যায়;

চার. কোনো কোনো দালানমন্দিরে প্রবেশপথ বা গবাক্ষের উপরের খিলানে ব্যবহৃত হয়েছে ইউরোপীয় ভাবধারার 'ফ্যানলাইট';

পাঁচ. মন্দির-অলংকরণে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে ফেস্টুন, পেনডান্ট, শিল্ড, রোজেট প্রভৃতি পঙ্খসজ্জা;

ছয়. সাবেকি দেব-দেবীর মূর্তি ও দেশীয় সাধারণের জীবনচর্যার পাশাপাশি মন্দির-গাত্রের অলংকরণে এসেছে সাহেবদের জীবনও;

সাত. কোনো কোনো মন্দিরের চূড়া গির্জাসদৃশ (চোরবাগানের মল্লিক পরিবারের জগন্নাথ মন্দির; ১৮২১), পাশ্চাত্যধর্মী গম্বুজাকৃতি (ভূকৈলাসের সত্যচরণ ঘোষালের সমাধিমন্দির), কোথাও ইসলামি স্থাপত্যের আদলে নির্মিত গম্বুজসদৃশ (কার্তিক বসু লেনের সংসারেশ্বর শিবমন্দির)।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, সাহেব শাসকদের প্রতি বাবুদের প্রীতি তাঁদের দৈনন্দিন ধর্মীয় কৃত্যেও লক্ষণীয় পরিবর্তন এনেছিল। মন্দির স্থাপত্যের ক্ষেত্রে বিদেশি প্রভাব, বিশেষত ইউরোপীয় প্রভাব গ্রহণ করে বাবুর বাংলার মন্দির স্থাপত্যে একপ্রকার সাংস্কৃতিক মিশ্রণের শুভারম্ভ করেছিলেন। উত্তরকালের বাবুদের গৃহস্থাপত্য ও মন্দির-স্থাপত্য উপরে আলোচিত বৈশিষ্ট্যগুলিকেই হুবহু অনুসরণ করেছে দেখা যায়। অর্থাৎ, ঔপনিবেশিক রুচি-সংস্কৃতির অভিঘাতে এবং আর্থ-সামাজিক তাগিদ থেকেই আদি ও নববাবুরা একপ্রকার সমন্বয়ধর্মী স্থাপত্য-রীতির জন্ম দেন, পরবর্তীকালে যা বাংলার উঠতি ও নতুন সমস্ত অভিজাত বাবুরা অনুসরণ করতে থাকেন। বাংলার স্থাপত্য-সংস্কৃতিতে অতএব বাবুদের এই বিশেষ দান সহজে ভোলার নয়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, বটতলার গ্রন্থসজ্জায় দেব-দেবীদের যে মূর্তি নির্মিত হয়েছে কিংবা রথ বা মন্দিরের ছবি মুদ্রিত আছে, তার মধ্যেও এই সমন্বয়ধর্মী বিদেশি প্রভাব লক্ষ করা যায়। জগন্নাথের রথ কিংবা সপরিবার দুর্গাসহ দুর্গাবাটির ছবিতে ভিক্টোরিয়ার চিহ্নযুক্ত পতাকা, ইউনিকর্ন, গির্জাসদৃশ ত্রিকোণাকৃতি চূড়া দেখা যায়। প্রেক্ষাপটে পাশ্চাত্যের পরী এবং কিউপিডের মূর্তিও খোদাই করা আছে কোথাও কোথাও। দেবীর মাথায় ইংল্যান্ডের রানির মতো Crown বা মুকুট, হাতে রাজদণ্ড লক্ষ করা যায়। দেব-দেবীর পোশাক-আশাকে কখনো কখনো বিলিতি গ্রাউনের আসল আঁকা হয়েছে। প্রাচীন বেশকিছু পটচিত্রে দুর্গা ও অন্যান্য দেবীমূর্তির মাথায় একই প্রকার মুকুট এবং বিলিতি গ্রাউনের প্রভাবযুক্ত পোশাক লক্ষ করা যায়। আবার ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত 'দশ অবতার' গ্রন্থে সংকলিত লিথোচিত্রগুলিতে বিষ্ণুর দশ অবতারের রূপনির্মাণে ও অবয়ব সংস্থানে পাশ্চাত্য প্রভাব সর্বাত্মক। তার একটি কারণ হয়তো, এই লিথোগুলির এচিং বিলেত থেকে তৈরি হয়ে এখানে আসে। কিন্তু ধর্মীয় পুস্তকে বিদেশি অবয়বসংস্থানযুক্ত দেব-দেবীর চিত্র মুদ্রণে প্রকাশক দ্বিধাগ্রস্ত হলেন না, পাঠকও আপত্তি

জানালেন না, এর থেকে প্রমাণিত হয়, বাবু-কালচারের হাত ধরে যে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি গোপনে প্রায় সর্বগ্রাসী মূর্তি ধারণ করেছিল, উনিশ শতকের শেষে ধর্মীয় স্থাপত্য নির্মাণেই হোক বা গ্রন্থচিত্রণে, তার সেই আগ্রাসী প্রভাব থেকে মুক্তি পায়নি কোনোটিই। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে যে বাবু-সংস্কৃতির মধ্যে 'মোগল-বিলিতি ও দেশীয়' রীতির মিশ্রণ দেখেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, উনিশ শতকের মধ্যপর্বে তা চরমে ওঠে, তারপরই শাসকের কৃষ্টি-সংস্কৃতি পাশ্চাত্য শিক্ষার হাত ধরে বাঙালিবাবুর সংস্কৃতিকে ক্রমশ সাহেবি করে তোলে। উনিশ শতকের শেষদিকের বাবু-সংস্কৃতি তার ফলে বিশেষত্ব বর্জিত, পাশ্চাত্যের অনুকরণমাত্র।

একথা ঠিক, উনিশ শতকের বাবুরা সবচেয়ে বেশি হতমান, নিন্দনীয় হয়েও, সাধারণের কাছে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। বাবুদের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারিতে বটতলা সুবাসিত। এমনকী শিষ্ট সাহিত্যও বটতলার মতনই বাবুদের পুরোপুরি এড়িয়ে থাকতে পারেনি। তা বোধ হয় অসম্ভবও ছিল। অমৃতলাল বসু তো স্পষ্টই জানিয়েছেন, 'তখনকার অনেক উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকও নাম গোপন রেখে শখ করে ঐ রকম এক একখানা বই বটতলার পাবলিসারদের লিখে দিতেন।'[৯৩] বটতলার বইয়ের কাটতির মূলেই ছিল বাবু-বিবিদের হরেকরকম কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির লোভনীয় বিবরণ। এ জাতীয় পুস্তক-পুস্তিকার কাটতি সম্পর্কে কোনো সরকারি হিসাব পাওয়া যায় না। যদিও ইতিপূর্বে উদ্ধৃত লঙের বক্তব্য সত্য বলে গ্রহণ করলে এ জাতীয় পুস্তকের বিক্রি ছিল বেশ ভালো। মনে রাখতে হবে উচ্চশিক্ষিত বাঙালি সেকালে সচরাচর বাংলা বই পড়তেন না, বাংলা বইয়ের মূল পাঠক ছিল প্রান্তিক মধ্যবিত্ত। শিষ্ট সাহিত্যের ভাব-ভাষা তাঁদের পক্ষেও সবসময় গ্রহণ করা সম্ভব হত না। তা ছাড়া সাধারণ মধ্যশ্রেণি এবং বিপুল পরিমাণে স্বল্পশিক্ষিত বাঙালি তাৎক্ষণিক আনন্দ ও কৌতূহলের উপাদান খুঁজতেন এইসব বইয়ের উপাদানের মধ্যে। মনে রাখতে হবে, চণ্ডীমণ্ডপ কালচার তখন অস্তমিত প্রায়। শিক্ষিত-অল্পশিক্ষিত বাঙালির সান্ধ্য-বিনোদন জুড়ে বসে আছে বৈঠকখানা ও তার 'বৈঠকী আড্ডা।' বাবু-বিবিদের কেচ্ছার নানান খবরাখবর ছিল সেই আড্ডার অন্যতম প্রধান বিষয়। কলকাতার বাবু-বৃত্তান্ত মফস্সল ও বড়ো গ্রামগঞ্জগুলিতেও আগ্রহ-উন্মাদনা তৈরি করেছিল। বটতলার বাবু-কাহিনির এক একটি মুদ্রণ ২ হাজার থেকে ৪ হাজার কপি পর্যন্ত হত। এক একটি বইয়ের মুদ্রণও তিন-চার বা তার বেশি হত। একটি হিসাব মতে, বিক্রির জন্য বাংলা বই ১৮৫৩ সালে ছিল ৩ লাখ কপির কিছু বেশি, ১৮৫৭-তে তা গিয়ে দাঁড়ায় পৌনে ৬ লাখ কপিতে।[৯৪] ১৮৭০-এর পরবর্তীকালে এই সংখ্যা দ্বিগুণ-তিনগুণে পৌঁছোয়। অর্থাৎ সহজেই অনুমেয়, এর একটি বড়ো অংশ ছিল সাধারণের জন্য লেখা নাটক-প্রহসন, নকশা-কেচ্ছা ইত্যাদি, যার একটি প্রধান অবলম্বন ছিল বাবুদের নানান রকম উদ্ভ্রান্তি ও কেচ্ছা। স্বীকার করতেই হবে যে, পরোক্ষভাবে হলেও বাবুরা বটতলার এ জাতীয় গ্রন্থের প্রসার ও জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ এবং শুধুমাত্র বাবু-বিবিদের কেচ্ছা পড়ার তাগিদ থেকেও একশ্রেণির স্বল্পশিক্ষিত মানুষের মধ্যে পুস্তকপাঠের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সন্দেহ নেই, ভাব ও বিষয়ের দিক থেকে প্রায়শই বাবুদের ইন্দ্রিয়জ কামনা-বাসনার বিশেষ কিছু দিকেই ঘোরাফেরা করেছে বাবু-সাহিত্য। বাবুদের লাম্পট্য, ভণ্ডামি, দেখানেপনার বাইরে তাঁদের চরিত্রের যে কিছু আলোকিত দিকও ছিল, এ সত্যকে বটতলার বাবু-সাহিত্য যেন সজ্ঞানেই এড়িয়ে গেছে। তবে এ প্রসঙ্গে আমরা পূর্বেই বলেছি, বাবু-সাহিত্যের অশ্লীলতা তার ভাব বা বিষয়ে, বর্ণনায় নয়। উত্তরকালে বিশেষ করে উনিশ শতকের শেষদিকে, বাবু-সাহিত্যের অবক্ষয়ের যুগে কিছু গ্রন্থ হয়তো প্রকাশিত হয়েছে যার চিত্র ও বর্ণনা অশ্লীল বা ইতরতার মাত্রা স্পর্শ করেছে; কিন্তু এগুলিকে বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম হিসাবেই দেখতে হবে।

সামগ্রিকভাবে, বটতলার বাবু-সাহিত্য বাস্তবের বাবুরা যে কল্পনা ও বাস্তবের এক অপূর্ব রোমাঞ্চকর এবং আকর্ষণীয় জগৎ তৈরিতে অনুপ্রেরণাস্বরূপ, সে সত্যকে স্বীকার করতেই হবে। বাবুরা বাংলা সাহিত্যের রূপগত (form) এবং বিষয়গত (content) নানান বৈচিত্র্যের জন্ম দিয়েছেন। বটতলার বিপুল বাবু-সাহিত্যের জন্ম দিয়েছেন— কখনো সরাসরি, কখনো অনুপ্রেরণা হিসাবে। তাঁদের হাত ধরেই লেখ্যভাষায় কলকাতাইয়া ককনি সহ মুখের বুলি, সামাজিক চিত্র ও চরিত্র, সেকালের বাবুদের সাধারণ অধ্যাস বটতলাবাহিত হয়ে একালে এসে পৌঁছেছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাবু ইতিহাস তো মূলত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের হয়ে ওঠার ইতিহাস। বাবু-সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় সাধারণ পাঠকের মনে শিষ্ট সাহিত্যের চোখে তুলনায় নিকৃষ্ট হলেও যে গ্রন্থপাঠের রুচি গড়ে উঠেছিল, সে সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। উনিশ শতকের শেষ দিকে অবশ্য বাবু-সাহিত্য তার পূর্বেকার জৌলুস ও সম্মোহিনী ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। গতানুগতিক বিষয়ের চর্বিতচর্বনেই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। তার একটা কারণ অবশ্যই তথাকথিত বাবুদের রুচির পরিবর্তন এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির বদলের ফলে, নিন্দাজনক বলে প্রত্যক্ষভাবে বাবুগিরির হ্রাস। তা ছাড়া এই সময় বাঙালি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল স্বাজাত্যবোধের উদ্বোধনে, দেশ সম্বন্ধে চিন্তা ও চর্চায়। দেশের পরাধীনতা ও তা মোচনের উপায় অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছিল নতুন কালের শিক্ষিত-সচেতন বাবুদের কাছে। অবশ্য টানাপোড়েনও ছিল। মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুরা একদিকে ইংরেজ শাসনের প্রতি অসন্তোষ, অন্যদিকে আনুগত্যের অবিচলিত আদর্শে স্থিত ছিলেন। পাশ্চাত্যের মোহে তাঁরা মুগ্ধ ছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর আত্মজীবনী 'সত্তর বৎসরে' জানিয়েছেন, 'তখনও ইংরেজ প্রভুশক্তির সঙ্গে আমাদের বিরোধ বাধে নাই। ইংরাজী শিখিয়া ইংরেজকেই আমরা আমাদের নূতন সাধনার দীক্ষাগুরুরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলাম। ইংরেজ-শাসন আমাদের এই নূতন স্বাধীনতার সহায়ই ছিল, অন্তরায় হয় নাই।'[৯৫] তা ছাড়া, তথাকথিত 'বাবু'দের মধ্যেও অর্থনৈতিক কারণেই নানান স্তরভেদ দেখা দিয়েছিল। প্রাচীন আমলাতান্ত্রিক ভদ্রলোক ও সংঘবদ্ধ বণিকগোষ্ঠী, যাঁরা ছিলেন ব্রিটিশ রাজত্বের সবচেয়ে সুবিধাভোগী,[৯৬] তাঁরা এই শতকের শেষার্ধে তাঁদের রক্ষণশীল আভিজাত্যের খোলসে আবদ্ধ রইলেন। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির উচ্চ বেতনের চাকরিজীবী 'ভদ্রলোক'বাবুরা অনেকেই নিলামে জমি কিনে বা পত্তনি প্রথায় জমি ব্যবস্থা নিয়ে [৯৭] ভূমধ্যকারীতে পরিণত হয়েছিল। অন্যান্য কম বেতনের পদধারী কিংবা শিক্ষিত অথচ বেকার মধ্যশ্রেণির বাবুরা অর্থনৈতিক কারণেই প্রায়শই বৈশিষ্ট্যবর্জিত শ্রেণিতে পরিণত হয়েছিল। এই সার্বিক পরিস্থিতিতে বটতলার বাবু-সাহিত্য আর ব্যঙ্গ ও উপহাসের উচ্চকিত বাদ্য বাজাতে পারেনি, বেহালার করুণ মূর্ছনাই তখন বাস্তববাবুদের উপযুক্ত। অতএব ব্রাহ্মবাবুদের কিছুকাল গালি দিয়ে, হিন্দু ছুটকো বাবুদের প্রতি সতর্ক সাবধানবাণী জ্ঞাপন করে বটতলার বাবু-সাহিত্য উনিশ শতক ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই নিষ্প্রভ হতে হতে অবশেষে নিভে গেল।

### টীকা ও সূত্রনির্দেশ


১. ঘোষ, বিনয়, 'কলকাতা কালচার', 'কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত', প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৯, বাক্‌সাহিত্য প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ২৭৫।

২. বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার কথা স্মরণে রেখেই আমরা বলতে চেয়েছি, তবে 'সমাচার দর্পণে'র ভাষ্য বাবু বিষয়ে শাসকের বদলে যাওয়া মানসিকতারই প্রতিফলন, তার মধ্যে দেশীয় সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় না থাকাই স্বাভাবিক।

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, 'কলিকাতা কমলালয়', 'রসরচনা সমগ্র', প্রথম নবপত্র প্রকাশ ১৯৮৭, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ৭।

৪. চট্টোপাধ্যায়, বসন্তকুমার, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি', পাল, প্রশান্তকুমার সম্পা., প্রথম সুবর্ণরেখা সংস্করণ ২০০৯, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, পৃ. ২২।

৫. ঘোষ, বিনয়, 'কলকাতা কালচার', 'কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১।

৬. তদেব, পৃ. ৩১১।

৭. দত্ত, প্রাণকৃষ্ণ, 'কলিকাতার ইতিবৃত্ত', বসু, দেবাশিস সম্পা., প্রথম সং ১৯৯১, পুস্তক-বিপণি, কলকাতা; পৃ. ১৪৬।

৮. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ, 'কলিকাতা দুইশত বৎসর পূর্বে;'
দ্র. চৌধুরী, সত্যজিৎ ও সেনগুপ্ত, নিখিলেশ সম্পা., 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ', ৪র্থ খণ্ড, প্রথম সং ১৯৮৯, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, পৃ. ৭২।

৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, 'নববাবুবিলাস', 'রসরচনা সমগ্র', প্রথম নবপত্র সংস্করণ ১৯৮৭, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ৫৭।

১০. পত্রী, পূর্ণেন্দু, 'বাবু কালচারের জন্ম ও মৃত্যু', সরকার, পবিত্র ও দাশগুপ্ত, প্রশান্তকুমার সম্পা., 'কলকাতা ৩০০: সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরম্পরা', প্রথম সং ১৯৯৪, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, পৃ. ১৯৬।

১১. Edwards, Thomas, 'Henry Derozio', Radiance Publication 2003, Radiance, Kolkata, p. 50-51.

১২. মিত্র, প্যারীচাঁদ, 'ডেভিড হেয়ারের জীবন-চরিত';
দ্র. মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ সম্পা., প্যারীচাঁদ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রথম সং ২০০৩, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৪০৮।

১৩. শাস্ত্রী, শিবনাথ, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', সম্পা., ঘোষ, বারিদবরণ; দ্বিতীয় সংশোধিত নিউ এজ সং ২০০৭, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ৭২।

১৪. তদেব, পৃ. ৬০।

১৫. বসু, রাজনারায়ণ, 'আত্মচরিত';
ঘোষ, বারিদবরণ সম্পা. নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ, প্রথম কলেজ স্ট্রিট সংস্করণ ১৪০২, কলেজ স্ট্রিট পাবলিকেশন্স, প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ৩০-৩১।

১৬. দত্ত, অক্ষয়কুমার 'পানদোষ';
বসু, স্বপন সম্পাদিত, 'অক্ষয়কুমার দত্ত রচনাসংগ্রহ' প্রথম খণ্ড, প্রথম সং ২০০৮, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, পৃ. ৬০৯।

১৭. দত্ত, অক্ষয়কুমার, 'পানদোষ', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৭।
১৮. শাস্ত্রী, প্রিয়নাথ সম্পা., 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী', কলিকাতা ১৯০৯, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ পৃ. ৭।
১৯. Banerjea, Sir Surendranath, 'A Nation in Making', Akademi Edition 1998, Paschimbanga Bangla Akademi, Kolkata, p. 87-89 দ্র.।
২০. সেন, সুকুমার, 'বটতলার ছাপা ও ছবি', দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সং ২০০৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি. কলকাতা, পৃ. ৪৫।
২১. দ্র. ঘোষ, বিনয়, 'বটতলার সাহিত্য', 'কলকাতা কালচার', কলিকাতা শহরের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সং ১৯৯৯, বাক্‌সাহিত্য প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ৩৪৮-৩৬৫।
২২. দ্র. লঙের তালিকা:- Long, J, A Descriptive Catalogue of Bengali Works, Sanders, Cones & Co, 1855.
সংকলিত:- সেন, দীনেশচন্দ্র, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পা., বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ সং, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯১, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, পৃ. ৮২৮।
২৩. সেন, সুকুমার, 'বটতলার ছাপা ও ছবি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।
২৪. ঘোষ, অনিন্দিতা, 'বটতলার বইবাজার ও তার সামাজিক ইতিহাস', আচার্য, অনিল সম্পা., 'অনুষ্টুপ', বর্ষ ৪৫, ৪র্থ সংখ্যা ২০১১, কলকাতা, পৃ. ৯।
২৫. Quarterly Report of the Bengal Library 1877, পূর্ববর্তী সূত্র দ্র. পৃ. ৯।
২৬. ঘোষ, বিনয়, 'বটতলার সাহিত্য', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২।
২৭. Reports on Publications Issued and Registered in the Several Provinces of British India During the year 1874, Selections from the records of the Government of India, Home Department, vol. CXXiii, Calcutta 1877, p.1. দ্র. ঘোষ, অনিন্দিতা, প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, পৃ.১০।
২৮. দ্র. পরিশিষ্ট : ১; খাস্তগীর, আশিস, 'বটতলার বইয়ের বাজার', আচার্য, অনিল সম্পা., অনুষ্টুপ, বটতলা সংখ্যা, বর্ষ ৪৫, ৪র্থ সংখ্যা, ২০১১, কলকাতা, পৃ. ৫৬।
২৯. ঘোষ, বিনয়, 'বটতলার সাহিত্য', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭।
৩০. 'অশ্লীলতা', 'বঙ্গদর্শন', ১২৮০ পৌষ, ১৮৭৩ ডিসেম্বর;
দ্র. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, 'বঙ্কিমচন্দ্রজীবনী', প্রথম সং ১৯৯১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ২৭৬।
৩১. শ্রীপান্থ, 'এই এক নূতন! আমার গুপ্তকথা!! অতি আশ্চর্য!!', 'বটতলা', প্রথম সংস্করণ ১৯৯৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ৬১।
৩২. 'অশ্লীলতা', বঙ্গদর্শন, ১২৮০ পৌষ, ১৮৭৩ ডিসেম্বর; প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭।
৩৩. মিত্র, ড. অরুণকুমার সম্পা., অমৃতলাল বসুর স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি', প্রথম সং ১৯৮২, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃ. ১১৭।

৩৪. তদেব, পৃ. ১১৭।

৩৫. তদেব, পৃ. ১১৮।

৩৬. গুপ্ত, রাধাপ্রসাদ, 'বাবু-বৃত্তান্ত', 'বিষয় কলকাতা', প্রথম সং ১৯৯৩, জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, কলকাতা, পৃ. ৩৬-৩৭।

৩৭. রায়, হরিমোহন, 'মাগ সর্বস্ব' (১৮৭০);
উদ্ধৃত:- গোস্বামী, ড. জয়ন্ত, 'সমাজচিত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন', প্রথম সং ১৩৮১ বঙ্গাব্দ, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, পৃ. ২১।

৩৮. দ্র. পাদটিকা ৩৩।

৩৯. খাস্তগীর, আশিস, 'বটতলার বইয়ের বাজার', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

৪০. ঘোষাল, চন্দ্রিকাপ্রসাদ, 'বটতলার গুপ্তকথা : কেচ্ছার ভাঁড়ার না অন্তঃপুরের আরশি', আচার্য, অনিল সম্পা., 'অনুষ্টুপ' ৪৫ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ২০১১, কলকাতা, পৃ. ১৭৪।

৪১. বসু, রাজনারায়ণ, 'সেকাল আর একাল';
দ্র. ঘোষ, বারিদবরণ সম্পা., 'রাজনারায়ণ বসু নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ', ১ম সং ১৪০২, কলেজ স্ট্রিট পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ.৩২৭।

৪২. চৌধুরী, প্রমথ, 'প্রবন্ধ-সংগ্রহ', পুনর্মুদ্রণ ২০১৩, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ. ১৩৩-৩৪।

৪৩. গুপ্ত, রাধাপ্রসাদ, 'বাবু বৃত্তান্ত', প্রগুক্ত, পৃ. ৩৭।

৪৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, 'খোদাই চিত্রে বাঙালি', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩১৬;
দ্র. ঘোষ, দীপঙ্কর সংকলিত এবং ভট্টাচার্য, মিহির ও ঘোষ, দীপঙ্কর সম্পাদিত, 'বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়', প্রথম সং ২০০৪, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতা, পৃ. ১৮৮।

৪৫. তদেব, পৃ. ১৮৯।

৪৬. Long, J, 'A Descriptive Catalogue of Bengali works', 1855.
দ্র.সেন, দীনেশচন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২৮।

৪৭. তদেব, পৃ. ৮২৮।

৪৮. শ্রীপান্থ, 'এই এক নূতন! আমার গুপ্তকথা!! অতি আশ্চর্য!!', 'বটতলা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

৪৯. দ্র. Shaw, Graham, 'Printing in Calcutta to 1800, 1st Edi 1981, The Bibliographical Society, London.

৫০. তদেব, পৃ. ২১।

৫১. শ্রীপান্থ, 'এইরকম হরেক ছবি কলিকাতায় ছাপা হইতেছে...', 'বটতলা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

৫২. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্র, 'খোদাই চিত্রে বাঙালি', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭।

৫৩. ঘোষ, বিনয়, 'বটতলার সাহিত্য', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১।

৫৪. রায়, গোপালচন্দ্র, 'বাংলা বইয়ের ব্যবসা', বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন সম্পা., 'দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন', প্রথম সং ১৯৮১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ৩৫৫।

৫৫. মিত্র, ড. অরুণকুমার সম্পা., ‘অমৃতলাল বসুর স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি’, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।
৫৬. সেন, সুকুমার, ‘বটতলার বইয়ে ছবি’, ‘বটতলার ছাপা ও ছবি’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।
৫৭. তদেব, পৃ. ৪০।
৫৮. তদেব, পৃ. ৪২।
৫৯. চট্টোপাধ্যায়, বসন্তকুমার, ‘জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি’, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩।
৬০. সেন, সুকুমার, ‘বটতলার বইয়ে ছবি,’ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।
৬১. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’, ২য় খণ্ড, সাহিত্য অকাদেমি সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ ১৯৯৬, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, পৃ. ১২৫৫।
৬২. দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন, ‘বাঙ্গালা ভাষার অভিধান’, ২য় ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ ১৯৯৪, সাহিত্য-সংসদ, কলকাতা, পৃ. ১২৫২।
৬৩. মুখোপাধ্যায়, অজিতকুমার, ‘বঙ্গের পটচিত্র’, প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪১।
দ্র. ভট্টাচার্য, মিহির ও ঘোষ, দীপঙ্কর সম্পা., ‘বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়’, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৯।
৬৪. Bhattacharya, Asok K. 'Calcutta Paintings', 1st edi 1994, Department of Information and cultural Affairs, Govt. of West Bengal. p. 35.
৬৫. Ghosh, Prodyot, 'Kalighat Pats: Annals and Appraisal', 1373 Bengali Year, Shilpayan Artists Society, Kolkata, p.8.
৬৬. সেন, অমূল্যগোপাল, ‘বাংলার পট’, ‘বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়’, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮।
৬৭. চট্টোপাধ্যায়, সূর্যকুমার, ‘কালীক্ষেত্র-দীপিকা’, ১৮৯১; ভৌমিক হরিপদ সম্পা., প্রথম শশধর সংস্করণ ২০০৮, শশধর প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৪১-৪৩ দ্র.।
৬৮. সেন, অমূল্যগোপাল, ‘বাংলার পট’, বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়’, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯।
৬৯. শ্রীপান্থ, এই রকম হরেক ছবি কলিকাতায় ছাপা হইতেছে ...’, ‘বটতলা’, প্রাগুক্ত, প ৮১।
৭০. Archer, W.G, Kalighat Drawings, 1st edi 1971, Victoria-Albert Musiam London, p.7.
৭১. Archer, W.G, Bazar Paintings of Calcutta, 1st edi 1953, London, P. 18-20.
৭২. শ্রীপান্থ, এই রকম হরেক ছবি কলিকাতার ছাপা হইতেছে ...’, ‘বটতলা’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।
৭৩. পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য দ্র:- শ্রীপান্থ, ‘মোহন্ত-এলোকেশী সম্বাদ’, প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা নামক গ্রন্থটি।
৭৪. ঘোষ, সিদ্ধার্থ, ‘বেলুনে বিবি, বাঙালি ও সাহেব ভায়া’, ‘কলের শহর কলকাতা’, প্রথম সং ১৯৯১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ১০৭।
৭৫. তদেব, পৃ. ১০৭।
৭৬. Pattrea, Purnendu,'The Continuity of the Battala Tradition'; Paul, Ashit Ed., 'Woodcut Prints of Nineteenth Century Calcutta,' 1983, Seagull Books, Kolkata, p. 76.

৭৭. গুপ্ত, বিপিনবিহারী, 'পুরাতন প্রসঙ্গ', বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার সম্পাদিত, প্রথম পুস্তক-বিপণি সংস্করণ ১৯৮৯, পুস্তক-বিপণি, কলকাতা, পৃ. ২২৭।
৭৮. Bhattacharya, Asok K. 'Calcutta Paintings', Ibid, p. 38 দ্র.।
৭৯. লাহিড়ী, চণ্ডী, 'কার্টুনের ইতিবৃত্ত', প্রথম সংস্করণ ১৯৯৫, গণমাধ্যম কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ২৭।
৮০. বসু, রমেশ, 'বাংলার প্রাচীন চিত্র ও পট', বিচিত্রা, শ্রাবণ ১৩৩৪।
দ্র. ভট্টাচার্য, মিহির ও ঘোষ, দীপঙ্কর সম্পা., 'বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১।
৮১. শ্রীপান্থ, 'এই রকম হরেক ছবি কলিকাতায় ছাপা হইতেছে...', 'বটতলা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।
৮২. গুপ্ত, রাধাপ্রসাদ, 'বাবু বৃত্তান্ত', 'প্রসঙ্গ কলকাতা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।
৮৩. চট্টোপাধ্যায়, বসন্তকুমার, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি', প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।
৮৪. তদেব, পৃ. ২৩।
৮৫. হালদার, গোপাল, 'সংস্কৃতির রূপান্তর', 'সংস্কৃতির বিশ্বরূপ', প্রথম প্রকাশ ভবন সংস্করণ ২০১৪, প্রকাশ-ভবন, কলকাতা, পৃ. ১৩৮।
৮৬. নাগ, অরুণ সম্পা., 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৪০০ বঙ্গাব্দ, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, পৃ. ২২৪-২৩০ দ্র.।
৮৭. দ্র. বর্ধমানের নগর বর্ণনা; বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত সম্পা., 'ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী', পঞ্চম সংস্করণ ১৪১৯ বঙ্গাব্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ. ২০৭-২১৫।
৮৮. রায়, এ. কে. 'কলিকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', সেন, শুদ্ধোদন অনূদিত, প্রথম সং ১৯৮২, ঋদ্ধি-ইন্ডিয়া, কলকাতা, পৃ. ১০৮-১০৯ দ্র.।
৮৯. রায়, রাধারমণ, 'কলিকাতা বিচিত্রা', পুনর্মুদ্রণ ২০১১, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ২৭
৯০. দত্ত বর্মা, ললিতাপ্রসাদ, 'গোবিন্দরাম', কায়স্থ পত্রিকা, আশ্বিন ১৩২৬।
রায়, নিশীরঞ্জন ও উপাধ্যায়, অশোক সম্পা., 'প্রাচীন কলকাতা', প্রথম সং ১৩৯০ বঙ্গাব্দ, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃ. ২৩৩।
৯১. দ্র. Nair, P. Thankappan edi,'Calcutta in the 19th Century', 1st edi 1989, Firma KLM Pri LTD, Kolkata, p. 469.
৯২. দ্র. সাঁতরা, তারাপদ, 'কলিকাতার মন্দির স্থাপত্য', বসু, দেবাশিস সম্পা., 'কলকাতার পুরাকথা', প্রথম সং ১৯৯০, পুস্তক-বিপণি, কলকাতা, পৃ. ৮৩-৮৪। উল্লিখিত সকল বৈশিষ্ট্যগুলিই এই প্রবন্ধ থেকে সরাসরি গৃহীত, কোনো পরিবর্তন বা মতান্তরের অবকাশ না রেখেই।
৯৩. মিত্র, অরুণকুমার সম্পা., 'অমৃতলাল বসুর স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি', প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭-১১৮।
৯৪. খাস্তগীর, আশিস, 'বটতলার বইয়ের বাজার', অনুষ্টুপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।
৯৫. পাল, বিপিনচন্দ্র, 'সত্তর বৎসর' কল্পন সং ২০০৫, কল্পন, কলিকাতা, পৃ. ১২৭।
৯৬. ত্রিপাঠী, অমলেশ, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)', ষষ্ঠ মুদ্রণ ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ২৮।
৯৭. তদেব. পৃ. ২৮।

দশম অধ্যায়ঃ

# বাবু : ইংরেজ ও অপরাপর বিদেশি লেখকদের চোখে

এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, ইংরেজ প্রাথমিকভাবে ভারতে ব্যাবসাবাণিজ্যের অভিপ্রায়ে এলেও তৎকালীন কেন্দ্রীয় শাসনের নানাবিধ ত্রুটি ও দুর্বলতা তাদেরকে সাম্রাজ্য-স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণে দৃঢ়নিশ্চয় করে। ১৬২২-এ সুরাট, ১৬৩৯-এ মাদ্রাজে যথাক্রমে কুঠি ও দুর্গ স্থাপনের পর বাণিজ্যগত নানান বিরোধ এবং মোগল শাসকের সঙ্গে সম্পর্কের সাময়িক অবনতির ফলে ইংরেজ বণিকেরা বাধ্য হয় পূর্ব-ভারতে সরে আসতে। প্রথমে বালেশ্বর, ১৬৫১-য় হুগলিতে ইংরেজ-কুঠি স্থাপিত হয়। অবশ্য ১৬৯০-এর ২৪ আগস্ট তৃতীয়বারের জন্য চার্ণকের সুতানুটিতে আগমন এবং কুঠি-স্থাপনের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষে প্রায় তিনশো বছরের ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল বলা যায়। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে তার জন্য ১৭৫৭-র পলাশি যুদ্ধ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। প্রথমদিকে ব্যাবসার তাগিদেই কোম্পানির কর্মকর্তারা স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সখ্যতার সম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। নানান বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই সখ্যতার ভাব আপাতভাবে বজায় ছিল বলা যায়। ইংরেজের তরফ থেকে এই প্রাথমিক সখ্যতার তাগিদ ছিল বহুবিধ। প্রথমত, কোম্পানির ব্যাবসাবাণিজ্যের প্রধান ঘাঁটি হিসাবে পূর্ব-উপকূলভাগের এই অঞ্চলকে পাখির চোখ হিসাবে দেখেছিলেন কর্মকর্তারা, বন্দর হিসাবে হুগলির সুবিধাজনক অবস্থান এবং বস্ত্রবয়ন শিল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হওয়ায় এই স্থানকে ছেড়ে যাওয়া তাঁদের মনঃপূত ছিল না আদৌ। সম্পূর্ণ নতুন জায়গায় এসে ব্যাবসাবাণিজ্যে থিতু হতে চাইলে স্থানীয়দের সাহায্য ছিল অত্যাবশ্যক। অতএব এ অঞ্চলের শেঠ-বসাক সহ অনভিজাত মানুষদের সঙ্গেও কোম্পানি ব্যাবসার খাতিরেই সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, পূর্ব-উপকূলভাগ অঞ্চলে তাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী পর্তুগীজদের হঠানো আশু প্রয়োজন ছিল। পর্তুগীজদের অত্যাচারে বাংলার সাধারণ মানুষ তিতিবিরক্ত হয়েই ছিলেন। ইংরেজদের বাড়ানো সখ্যতার হাত (আদতে যা ছিল গোপন ব্যাবসায়িক তাগিদ) ধরতে তাঁরাও দ্বিধা করেননি। ফলস্বরূপ, পর্তুগীজদের কোণঠাসা হয়ে প্রায় ব্যাবসা গুটিয়ে সরে পড়তে হয়েছিল। তৃতীয়ত, কাঁচামাল সংগ্রহ, পণ্য ওঠানো-নামানোর শ্রমিক জোগাড় ইত্যাদি কারণে স্থানীয় প্রভাবশালী মাতব্বরদের সঙ্গে কোম্পানির একটা আপোষরফার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তা ছাড়া, এইসময় কেন্দ্রীয় মোগল শাসনের প্রতি ক্ষোভও জনসাধারণের মনে তলে তলে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল। মোগল শাসকদের কাছে বাংলা হয়ে উঠেছিল কোষাগার পুরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবকমাত্র। মোগল শাসনের প্রত্যক্ষ সুফললাভে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের বাংলা ছিল অনেকখানিই বঞ্চিত। স্থানীয় শাসকেরা প্রায় স্বাধীন নবাবের মতোই হয়ে উঠেছিলেন। মুর্শিদাবাদে বাংলার শাসক নবাবের অবস্থা দরবারি এবং পারিবারিক অবিশ্বাস ও বিরোধের পটভূমিকায় ছিল নড়বড়ে। এই অবস্থায় ধীরে ধীরে স্থানীয় প্রভাবশালীদের সঙ্গে সখ্যতার সম্পর্ক গড়ে তুলে মুর্শিদাবাদের নবাবকে হঠিয়ে বকলমে নিজেই নবাব হয়ে বসতে চেয়েছিল কোম্পানি, যার পরিণতি পলাশির যুদ্ধ এবং বণিকের মানদন্ডের রাজদণ্ডে পরিবর্তন। মনে রাখতে হবে, পলাশির যুদ্ধে নবাবের পতন কখনোই সম্ভব হত না, যদি না স্থানীয় অভিজাতবর্গ এবং জমিদার ও যুদ্ধরত সেনাদের একাংশের বিশ্বাসঘাতকতার চক্র না গড়ে উঠত।[১]

কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই সখ্যতা ছিল সাময়িক এবং ব্যাবসায়িক প্রয়োজনমাত্র। বউবাজার ও লোয়ার সার্কুলার রোডের মধ্যবর্তী কোনো স্থানে বটগাছের তলায় বাঁধানো স্থানে বসে হুঁকা হাতে চার্ণক দেশি-বিদেশি বণিক-অভিজাতদের সঙ্গে মিলিত হতেন বলে যে মিথ প্রচলিত[২], তাকে সত্য বলে গ্রহণ করলে বলা যায়, এ ছিল চার্ণকের ধুরন্ধর ব্যাবসায়িক বুদ্ধি ছাড়া আর কিছুই না। সে সময়ে এইসব অঞ্চল

ছিল ঝোপঝাড়, ঘন জঙ্গলে আকীর্ণ, ডাকাতি হত হামেশাই। এ কারণেই বণিকেরা এই স্থানে আলাপ-আলোচনা ও ব্যাবসায়িক লেনদেনের জন্য একত্রে সম্মিলিত হতেন,[৩] ধুরন্ধর চার্ণক তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে যেমন ব্যাবসাবাণিজ্যের হাল-হকিকত বুঝতেন, সেইসঙ্গেই ব্যাবসায়িক সখ্যতাও গড়ে তুলতেন, যা পরে কোম্পানির কাজে লেগেছিল। জনৈক ক্যাপ্টেন হ্যামিলটনের বক্তব্য অনুসরণে ডব্লিউ. এইচ. কেরী জানিয়েছেন, দেশীয় সাধারণের সঙ্গে চার্ণক খুব নির্দয়, রূঢ় ব্যবহার ('harsh in the extreme in his treatment of the Natives') করতেন।[৪] যদিও কেরীর বক্তব্য, চার্ণক মোটেও 'সব নেটিভ'দের ('All Natives') সঙ্গে এরকম ব্যবহার করতেন না।[৫] সম্ভবত, 'সব নেটিভ' বলতে প্রভাবশালী, অভিজাত, মাতব্বর নেটিভদের বোঝানো হয়েছে। বুদ্ধিমান চার্ণক অভিজাত ও প্রভাবশালী নেটিভদের একাসনে বসাননি এবং ব্যাবসার খাতিরেই, বাণিজ্য কুঠির নিশ্চয়তার জন্যও বটে স্থানীয় প্রভাবশালীদের সঙ্গে তাঁর বকলমে কোম্পানির সখ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। যদিও চার্ণক ছিলেন হঠকারী এবং তাঁর এই হঠকারী স্বভাবের জন্য কোম্পানিকে অনেকসময় নানান দুর্ভোগের মুখেও পড়তে হয়েছিল,[৭] তথাপি কোম্পানির প্রাথমিক প্রতিষ্ঠার যুগে চার্ণকের দূরদর্শিতা এদেশীয় প্রভাবশালী বণিক, উদ্যোগপতিদের সঙ্গে কোম্পানির সম্পর্ক স্থাপনের ভিতটি গড়ে তুলেছিল, সন্দেহ নেই।

দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ১৬৯৩-এর জানুয়ারিতে চার্ণকের মৃত্যু হয়, ফলে ১৬৯৮-এর কোম্পানির কলকাতা-সুতানুটি-গোবিন্দপুরের জমিদারি লাভ তিনি দেখে যেতে পারেননি। তবে স্থানীয়দের সঙ্গে সখ্যতার যে ব্যাবসায়িক প্রয়োজনভিত্তিক প্রকল্প তিনি গড়ে তোলেন, উত্তরকালে কোম্পানির পরিচালকবর্গ কম-বেশি তা অনুসরণ করে চলতেন। সাধারণভাবে, ১৬৯০ থেকে ১৭২৫ পর্যন্ত ইংরেজরা ছিলেন আইন মোতাবেক খাজনাদায়ী প্রজামাত্র। কিন্তু নবাবের মৌন সম্মতিতে মৌরসী অধিকার পেয়ে ১৬৯৬-তে ইংরেজরা দুর্গ নির্মাণ শুরু করেন এবং একইসঙ্গে স্থানীয় ভূস্বামীগণ যেমন বসন্ত রায়, রাজা রায় প্রমুখদের কাছ থেকে জমি ক্রয় করতে থাকেন। সেকালে মৌরসী অধিকার ছাড়া পাকা অট্টালিকা নির্মাণের অধিকার কারোর ছিল না।[৮] উইলসনের বয়ান অনুযায়ী[৯], সে সময় স্থানটিতে ছিল খড়ে ছাওয়া মাটির বাড়ির প্রাধান্য, পাকা বাড়ি ছিল হাতে গোনা। ধরে নেওয়া অসম্ভব নয়, এই বাড়িগুলি ছিল অবস্থাপন্ন জমিদার, বণিক বা স্বচ্ছল পুঁজিপতিদের। চার্ণক এইরকম একটি পাকাবাড়ি, সম্ভবত ক্রয় করেই (কারণ 'দখল' করলে অন্য সমস্যা হত, স্থানীয় মাতব্বরেরা চটে যেতে পারতেন) কোম্পানির প্রাথমিক কুঠি স্থাপন করেন। অবশ্য তিনি উপযুক্ত মূল্যে ভাড়াও নিয়ে থাকতে পারেন। শেঠ-বসাকরাই ছিলেন তখন সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যবসায়ী। তাঁদের কারও ভবনও হতে পারে। মোটের উপর, কোম্পানি চার্ণকের যুগ থেকে এদেশীয়দের কাছ থেকে যে সুযোগ-সহযোগিতা পেয়ে এসেছে, তা কোম্পানির ব্যাবসার এবং উত্তরকালের শাসনের ভিতকে পোক্ত করেছে। সাধারণ দেশীয়দের সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য প্রয়োজন ছিল সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর যাঁরা মাথা, সেইসব জমিদার পুঁজিপতিদের সাহায্য। কোম্পানি ১৭০০-এর গোড়ার দিক থেকেই স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখে, প্রত্যক্ষত তাঁদের সহযোগিতায় ধীরে ধীরে এই তিনটি অঞ্চল— সুতানুটি-কলকাতা-গোবিন্দপুরের প্রায় স্বাধীন শাসকে পরিণত হয়।

কিন্তু দেশীয়দের স্বার্থরক্ষার কোনো তাগিদ বা উন্নতির পরিকল্পনা কোম্পানির ছিল না উনিশ শতকের তিনেক দশক পর্যন্তও। প্রথম থেকেই রাস্তাঘাট নির্মাণ, হাসপাতাল স্থাপন, পরিস্রুত পানীয় জলের পরিকল্পনা ইত্যকার যা কিছু হয়েছে, তা কেবল সাহেবদের নিজেদের জন্যই। কলকাতার নগর পরিকল্পনার

প্রাক্-যুগেই তাই গড়ে উঠেছিল ধর্মতলা-চৌরঙ্গিকে কেন্দ্র করে সাদা শহর এবং এর বাইরে ব্ল্যাক-টাউন বা কালো শহর। কলকাতার প্রথম সেন্সাস-রিপোর্ট অনুযায়ী,[১০] ১৭২৬ থেকে ১৭৩৭-এর মধ্যে চৌরঙ্গি অঞ্চলটি ইংরেজদের শহর হিসাবে গণ্য হতে থাকে এবং এর বাইরে বর্তমান চিৎপুর রোড ও বউবাজারের সন্নিহিত অঞ্চলটিতে কোম্পানির ধনী ব্যাবসায়ী ও ধনী দেশীয় ব্যবসায়ীদের অট্টালিকা ক্রমে বেড়েই চলতে থাকে। সাধারণভাবে, ঔপনিবেশিক শহরগুলির বিকাশে, পৃথিবীর প্রায় সব উপনিবেশেই লক্ষ করা যায়, একপ্রকার চরিত্রগত দ্বৈততা থাকে। ঔপনিবেশিক প্রভুদের নিজ বসতির উন্নয়ন ও পরিকল্পনার হার স্থানীয় 'অপর'দের (others) বসতির উন্নয়ন ও পরিকল্পনার হারের সমানুপাতিক হয় না। কলকাতার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। সাহেব-পাড়া (White Town) বিভক্ত ছিল ব্যাবসায়িক ক্ষেত্র ও বসবাসের ক্ষেত্রে। অঞ্চলগুলি ছিল সুরক্ষিত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। বৃহত্তর কলকাতার এলাকার তুলনায় সাহেব-পাড়ার পরিধি সংক্ষিপ্ত হলেও আধুনিক স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের সব সুবিধাই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল এখানে। দেশীয় যেসব রাজন্যবর্গ তথা পুঁজিপতি, ব্যবসায়ী, মুতসুদ্দি সাহেব-পাড়ার গা ঘেঁষে অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন, তাঁদের ভাগ্যে সাহেব-পাড়ার সুযোগসুবিধা যে জুটত এমনটি নয়। তবে ইংরেজদের কর্ম-সহায়ক হিসাবেই, কখনো কখনো অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও এঁরা সাহেব-পাড়ার গা ঘেঁষে থাকবার সুযোগ লাভ করেন। সেইসঙ্গেই দুধওয়ালা, ভিস্তিওয়ালা, ঝাড়ুদার, চাকর-বাকর এইসব নিম্নবর্গও প্রভুদের নিজস্ব স্বার্থেই ধীরে ধীরে সাহেব-পাড়ার নিকটবর্তী অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে।[১১] কিন্তু এইসব মানুষদের সঙ্গে শাসকের ছিল প্রয়োজনের সম্পর্ক; এমনকী পুঁজিপতি, ব্যবসায়ী যেসব দেশীয়দের সঙ্গে কোম্পানির ছিল ব্যাবসায়িক সম্পর্ক, তাঁদের প্রতিও সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং অশ্রদ্ধাবোধের মনোভাবই সচরাচর লক্ষ করা যায়। আদিবাবুদের অনেকেই, যাঁরা কর্মসূত্রে ছিলেন শাসকের ঘনিষ্ঠ কিংবা বেনিয়ান-মুৎসুদ্দি বা সরকার, তাঁদের অনেকেরই কপালে জুটেছিল অপরাধীর তকমা— তহবিল তছরূপ, বিশ্বাসঘাতকতা, উৎকোচ গ্রহণ ইত্যাদির অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলেন তাঁরা। অথচ কোম্পানির নীতি -নৈতিকতাহীন, উৎকোচ-প্রিয়, অসৎ কর্মচারীদের অভিযোগ সত্ত্বেও শাস্তি হয়নি প্রায়শই।

সেকালে কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন উকিলরা, এঁরা মাসিক বেতন পেতেন, সঙ্গে অতিরিক্ত নানান সুযোগসুবিধা, খরচাপাতি। অনেকেই কোম্পানির কাছ থেকে শিরোপা পেতেন।[১২] পরবর্তীকালের অনেক নব ও নব্যবাবুদের আদিপুরুষ এঁরাই। যেমন, কলকাতার মল্লিকবাড়ির আদিপুরুষ সন্তোষ মল্লিক, পাটনায় কর্মরত উকিল রূপচাঁদ, কিংবা বাবু-বংশের বিখ্যাত সদস্য রাজারাম মল্লিক— এঁরা পেশায় ছিলেন কোম্পানি নিযুক্ত উকিল। সেই কাজ করেই কারোর নামে কলকাতায় মস্ত বাজার, কারোর বা চোখ ধাঁধানো অট্টালিকা, নানান জমি-জিরেত, একাধিক বাড়ি ইত্যাদি। এঁদেরই দোসর হলেন, কোম্পানি নিযুক্ত 'কালা জমিদার' বর্গ। কোম্পানির আমলে 'ব্ল্যাক টাউনে'র এঁরাই ছিলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এঁরাই হলেন খাতায় কলমে সেকেলে কলকাতার আদিবাবু। এই দলে আছেন নন্দরাম সেন, জগৎদাস, রামভদ্র চৌধুরী (?) এবং ইতিহাস হয়ে ওঠা গোবিন্দরাম মিত্র। এঁদের কাজ ছিল 'কালা টাউনে'র থেকে নির্ধারিত খাজনা আদায় করা, আইনশৃঙ্খলার সুবন্দোবস্ত করা, কোম্পানির স্বার্থানুযায়ী নানান কাজের তদবির-তদারক করা, সর্বোপরি 'কালা টাউন'কে কেন্দ্র করে উত্তিষ্ঠিত এক নতুন মিশ্র নাগরিক জীবনের নিয়ন্ত্রণ এবং নতুন গড়ে ওঠা বাঙালি সমাজের পত্তন করা।[১৩] নন্দরাম সেন ১৭০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রল্‌ফ সেলডন্ সাহেবের অধীনে 'ব্ল্যাক জমিদারে'র কাজ করতেন[১৪],

কিন্তু বাউচার সাহেব কালেক্টর হলে তহবিল তছরূপ, অসাধুতা, উৎকোচ গ্রহণ ইত্যাদির অপরাধে নন্দরাম কর্মচ্যুত হন এবং জগৎদাস 'কালা জমিদারে'র পদে বসেন। কিন্তু ১৭১১ সাল নাগাদ কোম্পানির সঙ্গে তঞ্চকতা করার অপরাধে তাঁর জেল-জরিমানা ও কর্মচ্যুতি ঘটে। এরপর রামভদ্র এবং তাঁর পর জনৈক সাহেব কালা জমিদারের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। কিন্তু অসাধুতা ও অন্যান্য নানান কারণে তাঁদের কর্মচ্যুতি ঘটে। এরপরই কলকাতার আদিবাবুদের অন্যতম গোবিন্দরাম মিত্র সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের জন্য, ১৭২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 'কালা জমিদারে'র দায়িত্ব পালন করেন।[১৫] এরপর সরকারি হিসাব অনুযায়ী কোনো দেশীয় বা বিদেশি এই পদে নিযুক্ত হননি।

গোবিন্দরাম আদিবাবুদের মধ্যে পরাক্রমের দিক থেকে প্রবাদপ্রতিম ছিলেন। 'গোবিন্দরামের ছড়ি'র উল্লেখ করেছেন কটন সাহেবও।[১৬] তাঁর প্রতিষ্ঠিত নবরত্ন (মতান্তরে, পঞ্চরত্ন) মন্দির, হালসীবাগানের বৃহৎ বাগিচা ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। তৎসত্ত্বেও হলওয়েলের আমলে ক্যাশ ভাঙার অপরাধে তাঁর চাকরি যায়। অবশ্য তিন হাজার তিনশো সাতানব্বই টাকা জমা দিয়ে আবার চাকরি ফিরে পান তিনি, তবে তাঁর প্রতিপত্তি কিছুটা কমে আসে সন্দেহ নেই।[১৭] গোবিন্দরামই প্রথম দোল-দুর্গোৎসবে সাহেব আমন্ত্রণের প্রথা চালু করেন, দেশি-বিলিতি পানীয় ও হিন্দুস্থানি নাচ সহযোগে আপ্যায়নের রীতিটিও তাঁরই মস্তিষ্ক প্রসূত। উত্তরকালেও যে দেশীয় সমাজে তাঁর নামের মহিমা ও পরাক্রম কমেনি তা বোঝা যায়, ১৮৬৬ সালে প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত তাঁর পুত্র রাধাচরণ মিত্রের ফাঁসির হুকুম হলে, এই ফাঁসি মকুবের আবেদন জানিয়ে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার বেনিয়ান, পুঁজিপতি ও কলকাতার বিশিষ্ট মোট ৯৫ জন ব্যক্তি আবেদন জানান এবং আবেদন গৃহীত হয়।[১৮] দেশীয় সমাজে গোবিন্দরামের প্রতিপত্তি যে কতদূর ছিল, এই ঘটনাই তার প্রমাণ।

নন্দরাম সেন থেকে গোবিন্দরাম মিত্র— 'কালা জমিদার'দের জীবনপ্রবাহের বিশ্লেষণে কিছু সত্য সামনে উঠে আসে। লক্ষণীয়, এঁদের প্রত্যেকেরই কর্মচ্যুতি ঘটেছে পোষ্টা সাহেব বদলানোর সঙ্গে সঙ্গেই। কোম্পানির আর্থিক ক্ষতি ও তহবিল-তছরুপ, কর ফাঁকি ইত্যাদি নানান অভিযোগে এঁদের নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে। অপরাধ করলে তার শাস্তিবিধান হবে এ তো সহজ সত্য। কিন্তু, এঁদের বিরুদ্ধে শুধু তো এই অভিযোগই ছিল না। দেশীয় জনসাধারণের সম্মিলিত আবেদন ছিল নন্দরাম এবং গোবিন্দরামের অত্যাচার, শোষণ এবং জোর জবরদস্তির ব্যাপারে। কোম্পানি কিন্তু সেই অভিযোগ সম্পর্কে নিস্পৃহ ভাব দেখিয়েছে। গোবিন্দরামের বিরুদ্ধে বসা তিন সদস্যের কাউন্সিল তো দেশীয়দের এই অভিযোগ অসত্য বলে উড়িয়েই দিয়েছিল। নন্দরামের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছিল। এর কারণ কী? বোঝা যাচ্ছে, এই অভিযোগের সত্যতা মেনে নিলে, দায়ভাগ কেবল অভিযুক্তদেরই থাকে না, কোম্পানির উপরও বর্তায়। কারণ, 'কালা জমিদার'-এর কাজ ছিল 'কালা টাউন' থেকে নির্দিষ্ট কর যেনতেনপ্রকারণে সংগ্রহ করে কোম্পানির তহবিল পূর্ণ করা। এ কাজে অত্যাচার- উৎপীড়ন তো করতেই হত। ফলে মুখে স্বীকার না করলেও স্বার্থবাহী কোম্পানির প্রত্যক্ষ মদত ছিল এই অত্যাচার ও শোষণের ব্যাপারে। অভিযোগ করলেই অন্য অভিযোগ এনে অভিযুক্তকে সরিয়ে দিয়েছে কোম্পানি। তাহলে, ইতিপূর্বে কোম্পানি এইসব অত্যাচার বা উৎপীড়নের সংবাদ পায়নি কেন। সদ্যবিকশিত শহরের আয়তন এত বিশাল ছিল না যে, সংবাদ সংগ্রহে প্রশাসন অপারগ হতে পারে। অতএব হয় প্রশাসন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় উপযুক্ত নজরদারি গ্রহণ করতে পারেনি, নয়তো এই সংবাদ পেয়েও নিজেদের স্বার্থের কথা ভেবে তাঁরা চুপ ছিলেন। কারণ,

এভাবে খাজনা আদায় না করলে তাঁদের লোভের ভাঁড়ার পূর্ণ হবে না। অতএব, এ জাতীয় অপরাধের কথা জেনেও তাঁরা অন্ধ, মূক ও বধির।

দেশীয় পাড়ার জন্য কোম্পানির কোনো উন্নতি বিষয়ক পরিকল্পনার কথা জানা যায় না অষ্টাদশ শতকে। শতকের শেষ দিকে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হতে থাকে এবং উনিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে এই পরিকল্পনা ধীরে ধীরে কিছুটা হলেও রূপ নেয়। সাধারণভাবে, দেশীয় পাড়ার (Black-Town) উন্নতি সম্পর্কে কোম্পানি ছিল উদাসীন। 'কালা জমিদারে'রাই আধা-সামন্ততান্ত্রিক কায়দায় প্রজা বসাতেন, বসতি গড়তেন, প্রতিপালন ও গলাধঃকরণের দায়িত্বও বহন করতেন। মন্দির-স্থাপন, ঘাট-নির্মাণ, জলাশয়-খনন ইত্যাদি উদ্যোগও নিজ ব্যয়ে তাঁরাই করতেন। অর্থাৎ কোম্পানির বাৎসরিক টাকায় ইজারা নেওয়া গ্রাম তিনটির গ্রামীণ চরিত্র বিন্দুমাত্র বদলায়নি, যা বদলেছিল তা হল, মিশ্র সামাজিক চরিত্র এবং ডিহি কলকাতার ছোট্ট অঞ্চল জুড়ে সাহেব-পাড়ার উজ্জ্বল নগরায়ন। দেশীয় সমাজের প্রতি এবং আদিবাবু গোবিন্দরাম মিত্র প্রমুখদের প্রতি কোম্পানির অভিযোগ এবং তার পরিণাম লক্ষ করলে বোঝা যায়, নিজ প্রয়োজনে সৃষ্ট বাবুদের প্রয়োজন পড়লে ছুঁড়ে ফেলে দিতে কোম্পানি দ্বিধাবোধ করত না।

১৭৫৭-র অব্যবহিত আগে থেকেই কোম্পানির মতিগতির বদল হতে থাকে এবং মুর্শিদাবাদের তক্ত থেকে সিরাজকে হটিয়ে সুবে-বাংলার নিয়ন্ত্রক ও প্রধান বাণিজ্যকারী হিসাবে কোম্পানি উঠে আসতে চায়। এইসময়ই একদল অবাঙালি দেশীয় বিত্তপতি এবং বাঙালি বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, দালাল কোম্পানির সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং উত্তরকালের নববাবুদের অনেকেরই পিতৃ-পিতামহ বস্তুত এঁরাই। নবকৃষ্ণ, কান্তমুদি প্রমুখেরা এই সুবিধাভোগী আদিবাবুদের প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পলাশির ষড়যন্ত্রে এঁদের ভূমিকা কী ছিল সে স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ, কিন্তু এই ষড়যন্ত্র উপলক্ষ্যেই যে তাঁরা পরবর্তীকালে সুবিধাভোগী উচ্চবিত্ত বাবুদের শ্রেণিতে উন্নীত হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। সেইসঙ্গে 'কালা টাউনে'র সামাজিক বিন্যাসের অলিখিত নিয়ন্তা হয়ে উঠেছিলেন এঁদেরই কেউ কেউ। এক হিসাবে এঁরাই হয়ে উঠেছিলেন 'কালা জমিদার', গোবিন্দরাম মিত্রের উত্তরসূরি।

পলাশির ষড়যন্ত্রে নবকৃষ্ণের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কর্ণেল ক্লাইভের সময় তিনি প্রায় বিদেশ সচিবের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন।[১৯] নানা সময়ে কোম্পানির স্বার্থরক্ষায় কখনো দৌত্যকার্য, কখনো মুনশিগিরি, কখনো মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় তাঁকে অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। এর পাশাপাশি পলাশির ষড়যন্ত্রে তাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকা এবং কর্ণেল অ্যাডামসের সহকারী হিসাবে সিরাজের বিরুদ্ধে তাঁর পরিকল্পনা সফল হয়। এসব কারণেই সিরাজের কোষাগার লুণ্ঠনের ভাগ ছাড়াও কোম্পানির তরফে বহুমূল্য উপহার ও 'খেলাৎ' লাভ করেন। কোম্পানির প্রতি তাঁর মূল্যবান সেবার পুরস্কার স্বরূপ ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁকে সুতানুটির চিরস্থায়ী তালুকদারি অর্পণ করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি কোম্পানির বেনিয়ান, মুনশি দপ্তরের আধিকারিক, আর্জবেগী দপ্তরের প্রধান, জাতিমালা কাছারির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান ব্যবস্থাপক, মাল গুদাম ও তহশিল দপ্তরের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। লর্ড মার্লোর বর্ণনা মতে, ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে বেতন ও রাজনৈতিক প্রভাবের দিক থেকে নবকৃষ্ণের স্থান ছিল মহম্মদ রেজা খাঁর পরেই।[২০] পরবর্তীকালে তাঁর ইংরেজভক্তি সেবা এবং সহযোগিতার কথা কোম্পানির তরফে স্বীকৃত হয়েছে বারবার। লেডি ক্লাইভ, জন নট এবং স্ট্যাচি পরিবারের তাঁকে লেখা চিঠিতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার ভাব দেখানো হয়েছে অকুণ্ঠভাবেই।

কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, নবকৃষ্ণের প্রতি কোম্পানির এই প্রীতিমূলক মনোভাব আসলে স্বার্থসিদ্ধির প্রতিদান ছাড়া আর কিছু নয়। দেশীয় বাবুদের মধ্যে নবকৃষ্ণের নিকট থেকে যে সাহায্য ও সেবা কোম্পানি লাভ করেছিল, তা না করলে প্রকারান্তরে পলাশির যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে বাংলা জয় করা সম্ভব ছিল না কোম্পানির পক্ষে। উত্তরকালেও কোম্পানির স্বার্থ যাতে সুরক্ষিত থাকে, গোষ্ঠিপতি হয়ে উঠতে গেলে শাসকশ্রেণির আস্থাভাজন হয়ে উঠতে হবে এবং সুযোগসন্ধানীর মতো ঝোপ বুঝে কোপ মারতে হবে। তাঁর আমলে কোম্পানির বড়ো-মেজো-ছোটো কর্তাদের সঙ্গে বাবুদের সখ্যতা বাড়তে থাকে। গোবিন্দরাম মিত্রও দোল-দুর্গোৎসবে সাহেব-প্রভুদের আমন্ত্রণ করতেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সাহেবদের চোখে তিনি নিতান্ত বেতনভুক 'কালা জমিদার' ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু নবকৃষ্ণ আদিবাবুদের মধ্যে সম্ভবত প্রথম, যিনি ইংরেজদের সুহৃদ হিসাবে বিবেচ্য হতেন। তাঁর সময় থেকেই নববাবুদের সময়কাল পর্যন্ত কোম্পানির শাসকদের সঙ্গে বাবুদের আচার-ব্যবহারের কয়েকটি নির্দিষ্ট নীতি-নিয়ম প্রবর্তিত হতে দেখা যায়। প্রথমত, দোল-দুর্গোৎসবে সাহেবদের আমন্ত্রিত ও আপ্যায়িত করা। দ্বিতীয়ত, এই উপলক্ষ্যে সাধারণ হিন্দুর পূজা-আচারে গৃহীত নয় এমন খাদ্য-পানীয় পৃথকভাবে পরিবেশনের এলাহি আয়োজন হত। তৃতীয়ত, বিলিতি বাদ্যযন্ত্র সহকারে হিন্দুস্থানি নৃত্য-সংগীতের বিমিশ্রণ (fusion) সাহেবদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে অনেকেই এই নাচের গুণগ্রাহী হয়ে ওঠেন, কেউ কেউ আবার নিছক কৌতূহলেই এই প্রকার নৃত্য-গীত দেখবার বাসনা ব্যক্ত করেছেন। চতুর্থত, ইংরেজদের বলরুম ডান্সের মতো শুধুমাত্র নাচ-গানের এবং পানীয় উপভোগের আসরেও দেশি বাবু ও সাহেব-প্রভুরা মিলিত হতেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময়কাল পর্যন্ত এ জাতীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সাহেব ও দিশিবাবুরা একসঙ্গে মত বিনিময় এবং উপভোগ করতেন দেখা যায়। পঞ্চমত, কোম্পানির সাহেবদের অনেকেই বাবুর বাড়ির বিবাহ, জাতধর্ম ইত্যাদি উপলক্ষ্যেও মিলিত হতেন। অর্থাৎ উৎসবকে কেন্দ্র করে কিংবা প্রথানির্দিষ্ট উৎসব ছাড়াই সাহেব ও দেশি বাবুরা কাছাকাছি আসতেন। এভাবে যেমন, হিন্দু বাড়িতে পোশাক-পরিচ্ছদ, গৃহসজ্জা, খাদ্যাখাদ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে সাহেবি রীতিনীতি অনুপ্রবিষ্ট হয়, তেমনি দেশীয় খাদ্যাখাদ্য, সংস্কার অনেকসময়ই সাহেবদের প্রভাবিত করেছিল।

ফ্যানি পার্কস যেমন। ইনি ১৮২২ সালে কলকাতায় আসেন এবং ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত এখানেই কাটান। মাঝে কিছুদিনের জন্য অন্যত্র গেলেও কলকাতার জীবন, বাঙালিবাবুদের রীতিনীতি সংস্কার এঁকে খুবই আকৃষ্ট করেছিল। ১৮২৩ সালের ১৩ অক্টোবর জনৈক ধনীবাবুর ('a wealthy Baboo') বাড়িতে দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে আহূত হন এবং উৎসবের খুঁটিনাটি বর্ণনা ধরে রাখেন ডায়েরির পাতায়।[২১] বিদেশি অভ্যাগতদের জন্য সজ্জিত হলঘরের একদিকে সুন্দর আয়োজন হয়েছিল নৈশভোজের। পুরোপুরি বিদেশি ধরনে, খাদ্য সরবরাহের দায়িত্বে ছিলেন গুন্টার অ্যান্ড হুপার। বরফ এবং ফরাসি সুরার ছিল অঢেল আয়োজন। ঘরের অন্যপ্রান্তে একদল বাইজি নাচ ও গান করছিলেন। ইউরোপীয় সাহেব এবং দেশীয় ভদ্রজনেরা (বাবুরা) বিলিতি সোফা অথবা চেয়ারে বসে হিন্দুস্থানি সংগীত ও নৃত্যরস উপভোগ করছিলেন। এই উপলক্ষ্যে বাবুরা যে অঢেল অর্থ ব্যয় করতেন সে কথাও জানিয়েছেন পার্কস। এই সুযোগে বাবুদের অন্দরমহলে গিয়ে 'জেনানা'দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য লাভ করেন ফ্যানি। তবে, সাক্ষাৎ আনন্দদায়ক হয়নি তেমন। জেনানাদের অবস্থা, পোশাক-আশাক ফ্যানিকে বলতে বাধ্য করেছে, 'I was glad to have seen a zenana, but much disappointed : the women were not ladylike.'[২২]

এদেশে থাকতে থাকতে গণেশপূজা, বাটি চালানো, ফকির ইত্যাদির প্রতি ফ্যানির বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা দেখা গেলেও কলকাতার স্বাস্থ্য এবং বাবুদের রুচি দুই-ই তাঁর চোখে 'বিশ্রী' ঠেকেছে। কালীঘাটের কালীমূর্তি দর্শন করতে গিয়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রদত্ত রত্নখচিত কালীর মুকুট দেখে তাঁর অকরুণ মন্তব্য: 'The Design was in the excess of bad taste, and such as only a Baboo would have approved.' [২৩] বোঝা যায়, ফ্যানির মতো আপাত সহৃদয় ভদ্রমহিলাও বাবুদের মনন ও রুচির প্রতি তেমন শ্রদ্ধাশীল হতে পারছেন না। বাবুদের ব্যক্তিগত জীবনাচরণ এবং গার্হস্থ্য জীবনযাত্রার মানও তাঁর চোখে 'কুশ্রী' ঠেকেছে। 'বাবু'দের কথা বলতে গিয়ে প্রায়শই যে তিনি 'wealthy' শব্দটি জুড়ে দেন, তার কারণ সম্ভবত আর্থিক কৌলীন্য বোঝানোর জন্য, নতুবা আচার-ব্যবহার কিংবা জীবনযাত্রার মানের দিক থেকে বাবুরা যে আদৌ presentable , সম্ভবত এমনটি তাঁর মনেও হয়নি।

১৮২৪-এ কলকাতায় আসা হাগিন্‌স তো আবার এদেশে কাজের সূত্রে আসা তরুণ সাহেবদের যাবতীয় অধঃপতনের জন্য দায়ী করেন ধনীবাবুদের[২৪] (Wealthy Baboo)। প্রভূত পরিমাণে অর্থ ধার দিয়ে এঁরাই নাকি 'অবোধ' সাহেবদের মাথা ঘুরিয়ে দেন, চারিত্রিক কলঙ্ক সৃষ্টির পথ পরিষ্কার করেন। আত্মদোষস্খলনের এ এক অদ্ভুত সুন্দর যুক্তি! অষ্টাদশ-উনিশ শতকের কালপর্বে অনেক ইউরোপীয় এসেই ভিড় জমাতেন উপনিবেশের নতুন গন্তব্য কলকাতায়, প্রায় কর্পদকশূন্য অবস্থায়, কোনোরকম পুঁজি ছাড়াই। তারপর ধনী বাবুদের বদান্যতায় ধারকর্জ করে কিংবা তাঁদেরই সঙ্গে কোনো পুঁজি বিনিয়োগ ছাড়াই অংশীদারিতে ব্যাবসাবাণিজ্য করে ফুলে ফেঁপে উঠতেন। এঁদের চারিত্রিক নীতি-নৈতিকতার দায় কোনোভাবেই Wealthy বাবুদের উপর বর্তায় না। এঁদের অধিকাংশই কোনো পূত চরিত্রের ছিলেন না। উপনিবেশের কলকাতায় সেদিন নানান সামর্থ্যের, নানান মানসিকতার সাহেব-সুবোদের ভিড়। এঁদের একটি বড়ো অংশের কোনো বংশগত কৌলীন্য বা সামাজিক আভিজাত্য ছিল না স্বদেশেই। হ্যারল্ড ফিসারের দাখিল করা সাহেব-বর্গের পিরামিডে[২৫] স্পষ্টই দেখা যায়, সেদিনের কলকাতায় আধা-সরকারি, বেসরকারি নানান পেশার ইউরোপীয়দের ভিড়; তার সঙ্গে নাবিক, শ্রমিক, যুদ্ধবাজ সৈনিক তো আছেই; উপরন্তু রয়েছেন প্রান্তিক সফেদ মানুষেরা (White subalterns)। ভ্যাগাবন্ড, ভিখারি, উদ্বাস্তু, পাগল, লুম্পেন, প্রতারক, চোর ইত্যাদি নানান চরিত্র এবং সেইসঙ্গেই প্রান্তেবাসী 'যুরেশিয়ান'দের একটা বিপুল সংখ্যায় সেদিনের শহর জমজমাট। এঁদের সম্মিলিত সংখ্যা ক্রমশ ছাড়িয়ে গেছে আপাত শিক্ষিত সরকারি পেশায় নিযুক্ত সাহেবদের সংখ্যাকে। মনে রাখতে হবে, উনিশ শতকের নতুন প্রাণধর্মের অগ্রদূত ডিরোজিও-ও কিন্তু 'ইউরেশিয়ান'। মোটের উপর, আগত ইংরেজদের আভিজাত্য-বংশকৌলীন্য এবং চারিত্রিক 'শুদ্ধতা'র স্বরূপ বুঝতে দেরি হয় না আমাদের।

'বাবু'দের যদি আমরা দেশীয় সুবিধাভোগী শ্রেণি হিসাবে দেখি, অন্তত উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, তবে বলতেই হবে, তাঁদের প্রতিই ঔপনিবেশিক প্রভুদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আদতে তাচ্ছিল্যের, অমর্যাদার, উপেক্ষার। অতএব বাকি দেশীয়দের প্রতি ইংরেজ-প্রভুদের মনোভাব কেমন ছিল তা সহজেই অনুমেয়। এই মনোভাব অবশ্য ইংরেজ ঔপনিবেশিকতার সাধারণ চরিত্রধর্ম। ষোড়শ শতকে আয়ার্ল্যান্ড জয়ের পর পরই বাকি পৃথিবীতে 'সভ্যতার আলো' ছড়ানোর মহান দায়িত্ব গ্রহণ করে ইংরেজরা। ১৭৮৩-র প্যারিসের শান্তিচুক্তির পর তাদের চোখ পড়ে এশিয়া ও আফ্রিকার দিকে। বলা বাহুল্য, এই 'সভ্যতার আলো' ছড়ানোর আপাত প্রকল্পটি ছিল আসলে সাম্রাজ্য বিস্তারের মুখোশমাত্র। এর মূলে ছিল 'সামরিক

একনায়কতন্ত্র, ক্রমোচ্চতা এবং জাতিগত তাচ্ছিল্যের রক্ষণশীল মূল্যবোধ।'[২৬] বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্য বিস্তারের অহমিকা এই সময় থেকে ইংরেজদের মনে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রবল দেশানুরাগের জন্ম দেয়। মনে রাখতে হবে, আদতে ইংরেজ কোনোদিনই দেশীয় সুবিধাভোগী শ্রেণিদের শ্রদ্ধা বা সম্মানের চোখে দেখেনি। প্রাথমিক পর্বের বন্ধুতা ছিল ব্যাবসায়িক ভানমাত্র। সমাজের সুবিধাভোগী ও প্রভাবশালী পুঁজিপতি, বিত্তপতি ও গোষ্ঠীপতিদের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া বাণিজ্যের মানদন্ড কোনোভাবেই ক্ষমতার রাজদণ্ডে পরিণত হতে পারত না। পলাশির যুদ্ধ নামক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরবর্তীকালে ইংরেজ তাই সুকৌশলে নৈতিক-অনৈতিক সুবিধা, খেতাব, সরকারি মানমর্যাদা পাইয়ে দিয়ে, উৎসব-পার্বণে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে বাবুদের সঙ্গে সখ্যতার সম্পর্ক বজায় রেখে বশংবদ শাসকের ধামাধরা 'বাবু'দের সাহায্যে দেশীয় বৃহত্তর সাধারণ মানুষের উপর অপ্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। কর্ণওয়ালিসের ভূমি-সংস্কার এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নতুন এক বশংবদ 'বাবু'দের জন্ম দেয়, যাঁদের না আছে বংশগত কৌলীন্য, না আছে চারিত্রিক আদর্শ। কিন্তু এই ভুঁইফোঁড় 'বাবু'দের মারফতই কোম্পানির বাৎসরিক খাজনার প্রাপ্তির অঙ্কটা সুনিশ্চিত করা যায়। একইসঙ্গে নতুন এই 'বাবু'দের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় 'প্রাচ্য প্রকল্প'; যা বলে, অতীতে এক সুমহান সভ্যতা ও ঐতিহ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আমরা তা বিস্মৃত হয়েছি এবং পরম-বন্ধু ইংরেজের সহায়তায় আবার তার স্বরূপ চিনে নিয়ে নিজেদের অতীতকে উপলব্ধি করতে পারব। অতএব ইংরেজের এই বদান্যতা, উদারতার প্রশংসা না করে তো পারবেনই না শিক্ষিত নব্যবাবু থেকে মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুরা। ইংরেজের এই প্রকল্প বাবুদের প্রাথমিকভাবে দীর্ঘদিনের জন্য আবিষ্ট করে রেখেছে। প্রাচ্যদেশীয় সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোকে এইসব নতুন বাবুরা ইংরেজ-প্রভুদের দেখানো পথেই 'স্বৈরাচারী' বলে ভাবতে শুরু করেন।[২৭] একইসঙ্গে ইংরেজের 'পিতৃসুলভ খবরদারি'কেও ন্যায়সংগত বলে প্রচার করতে থাকেন। এমনকী উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তথাকথিত ব্রাহ্মরা নির্দ্ধিধায় ইংরেজকে শাসক হিসাবে কামনা করেছেন। এতৎসত্ত্বেও 'বাবু'দের প্রতি ঔপনিবেশিক প্রভুদের দৃষ্টি কখনো উদার, উন্নত ও শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠতে পারেনি।

'বাবু'রা অবশ্য দলমতনির্বিশেষে প্রায় সকলেই সেদিন সাহেব-প্রভুদের কৃপাভিক্ষু। প্রথম দিকে অনেকদিন পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একজন 'ভারতীয় শাসকে'র মতো শাসন করেছে;— তারা মোগল সম্রাটের কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছে, মুদ্রায় মোগল সম্রাটের নামই ব্যবহার করেছে এবং প্রশাসনে ফারসি ভাষায় কাজ চালানোর প্রথাও মান্য করেছে। ক্লাইভের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালুর সময়ও আদালতে হিন্দুদের জন্য হিন্দু আইন এবং মুসলমানদের জন্য ইসলামি আইন প্রয়োগ করে মামলার কাজ করা হত। দ্বৈত শাসন ব্যবস্থাতেই বলা হল, বিচার এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নবাবের আধিকারিকদের, দেওয়ানি ও রাজস্ব আদায় কোম্পানির। এই সূত্রেই সাধারণ দেশীয় মানুষের সঙ্গে কোম্পানির কর্মকর্তাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। প্রথম থেকেই, ইংরেজরা স্থানীয় বিত্তপতি প্রভাবশালীদের এক বড়ো অংশের সমর্থন ও সহযোগিতা যেভাবে পেয়ে এসেছে, তা থেকে অনুমান করা যায় যে, নবাবি শাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ মানুষ শেষপর্যন্ত ইংরেজদের ভরসায় জোটবদ্ধ হয়েছিলেন। এ কারণেই সিরাজের পরাজয় ও হত্যার পর কোনো বড়ো ধরনের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ বাংলার কোনো প্রান্তেই দেখা যায়নি তেমন। নবাবদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক কতটা তলানিতে ঠেকেছিল, এটাই তার প্রমাণ। অন্যদিকে পলাশির যুদ্ধের পর একপ্রকার কাল্পনিক সুশাসন এবং জীবিকা ও জীবনের নিরাপত্তার স্বপ্নে দলে দলে

মানুষ গ্রাম ছেড়ে নগরমুখী হতে শুরু করে। ইংরেজকে তাঁরা ত্রাতা মনে করতে থাকেন এবং ইংরেজের সঙ্গে নানাপ্রকার সুবিধাজনক ব্যাবসায়িক সম্পর্ক বা পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্ক গড়ে তুলে রাতারাতি কেউ কেউ ভুঁইফোঁড় বাবু হয়ে বসেন। ইংরেজদের এঁরা এইসময় থেকেই 'প্রভু' ভাবতে শুরু করেন, যদিও ১৮৫৭-র আগে আনুষ্ঠানিকভাবে মোগল সাম্রাজ্যের অস্তগমন হয়নি। নানাভাবে ইংরেজ-তোষণের প্রক্রিয়াটি এইসময় থেকেই জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। ইংরেজের তরফে খুব কৌশলে 'ইংরেজ রাজার জাত' এই মিথ্যেটা সত্য বলে চালানো হতে থাকে। ভিক্টোরিয়াকে প্রায় সমগ্র বিশ্বের অধিশ্বরী হিসাবে তুলে ধরা হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা থেকে হারাণচন্দ্র রক্ষিতের সাহিত্যের ইতিহাস ভিক্টোরিয়া এবং গোটা ইংরেজ জাতকেই রাজগৌরবে অভিষিক্ত করে। উনিশ শতকের শেষদিকে শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যেও এই মিথ কীভাবে ছড়িয়ে পড়ে, হারাণচন্দ্র রক্ষিতের গ্রন্থের 'মঙ্গলাচরণ' দেখলে তা স্পষ্ট হয় : 'যে প্রাতঃস্মরণীয়া স্বর্গীয়া রাজরাজেশ্বরীর পুণ্যস্মৃতি অবলম্বনে এই প্রবন্ধ প্রকটিত হইতেছে, তাঁহার সমসময়ে, তাঁহার শান্তিময় রাজত্বকালে, আমার এই মাতৃস্থানীয় মাতৃভাষার মোহন-বিকাশ। মাতৃস্তনদুগ্ধ পানের সহিত আমরা যে নাম শুনিয়া আসিতেছি এবং আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও পিতা-পিতামহও যে পবিত্র নাম শুনিয়া আসিয়াছেন,— সেই মূর্তিমতী করুণা— দয়াময়ী ভিক্টোরিয়ার পুণ্যপ্রভাব,— আমার ভাষার বর্ণে বর্ণে সুচিত্রিত হইয়াছে এবং চিরদিন হইবে। আমার ভাষাও যেমন করুণাময়ী, আমার ভাষার পালনকর্ত্রী— জননী ভিক্টোরিয়াও তেমনি করুণাময়ী।'[২৮] উনিশ শতকের শেষে পৌঁছে এই যদি হয় শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের মনোভাব, তবে আঠারো শতকের শেষে কিংবা উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজদের প্রতি সমাজপতি 'বাবু'দের মনোভাব কেমন ছিল সহজেই অনুমেয়। তা ছাড়া মনে রাখতে হবে, ইংরেজ শাসনের প্রতি উনিশ শতকে অন্তত কোনো প্রতিবাদ বা প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। ১৮৫৭-র বিদ্রোহ ছিল ধর্মীয় সংস্কারে ঘা লাগার ফলশ্রুতি, ইংরেজ শাসনের প্রতি মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত বাবুরা তখনও যে মোহগ্রস্ত, তা অনুমান করা যায়, বাঙালি মধ্যশ্রেণির বিদ্রোহ উপলক্ষ্যে প্রতিক্রিয়াবিহীন ভাব দেখে। বিপিনচন্দ্র পাল তো উত্তরকালে আত্মস্মৃতিতে স্বীকারই করেছেন যে, ইংরেজ ও সুশাসন প্রায় তুল্যমূল্য ছিল এবং ইংরেজই ছিল বাঙালি মধ্যশ্রেণির ভদ্রলোকদের 'নূতন সাধনার দীক্ষা-গুরু'।[২৯] ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিক থেকে তাই বাঙালিবাবুরা শাসকের কৃপাভিক্ষু ও মনতুষ্টিতে নিবেদিত প্রাণ।

বিশপ হেবার ১৮২৩-এর বড়োদিনে বাঙালিবাবুদের কাছ থেকে ফল, মূল, শাকসবজি, মাছ-মাংসসহ নানানরকম উপহার পাওয়ার কথা জানান, একইসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, বাড়ির প্রধান চাকর (head-servants) থেকে শুরু করে গরিব বেয়ারা পর্যন্ত তার সাধ্যমতো উপহার তুলে দিয়ে প্রীত হয়েছে।[৩০] কিন্তু, তার বিনিময়ে 'বকশিস' (Buckshish) স্বরূপ সামান্য পরিমাণ হলেও অর্থই দিতে হয়েছে তাদের সবাইকে, কারণ তারা অন্য কিছু চায় না। অন্তরালবর্তী উপেক্ষার ভাষা ও আত্মগরিমার ভাবটি আঁচ করা যায়। হেবার লেডি আর্মহার্স্ট প্রদত্ত ভোজসভায় অনেক 'Wealthy Natives'-এর সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। হরিমোহন ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব প্রমুখেরা সকলেই তাঁকে মুসলমান আমলের চেয়ে সভ্য ও শিক্ষিত ইংরেজ শাসনের প্রশংসা করেছেন, এমনকী নারীর সুরক্ষার ব্যাপারটি যে অনেক সুনিশ্চিত হয়েছে, এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। হেবার তাঁদের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিয়েছেন বলে তাঁরা আনন্দিত, বা বলা বাহুল্য কৃতার্থ হয়েছেন বোঝা যায়।[৩১] বাবুদের এহেন আচরণকেই অকরুণ ব্যঙ্গে উপেক্ষা করেন শ্রীমতী ফেনটন। রূপলাল মল্লিকের বাড়িতে নাচের আসরে আমন্ত্রিত হয়ে শ্রীমতী ফেনটন অসহিষ্ণুতার সঙ্গে

একঘেয়ে অন্দরসজ্জা, রুচিহীন আসবাবপত্রের বাড়াবাড়ি রকমের সমারোহ, অসহ্য রকমের নাচ ও গান, বাইজিদের পাগলিদের মতো পোশাক-আশাক দেখেছেন, আর বাবুদের রুচি সম্পর্কে ততই তাঁর বীতরাগ প্রগাঢ় হয়েছে। এহেন ক্লান্তিকর আসরে সাহেব-সুবোদের কেন টেনে আনার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চলে তা তাঁর অগোচরে থাকেনি। কিন্তু আমন্ত্রিত অভ্যাগত হিসাবে শ্রীমতী ফেনটনের প্রতিক্রিয়া রূঢ়তম : 'I ought to remind you that it is on these occasions the natives delight to display their wealth, and they consider it a great addition to their importance to have European guests. The poor animal who exists on rice and ghee all the year, contented with the mat for his bed, here may be seen playing the liberal entertainer.'[৩২] শুনতে কদর্য লাগলেও এই হল বাবুদের প্রতি উনিশ শতকের প্রথম দিকের শাসকপক্ষের মনোভাব। অথচ রূপলাল মল্লিক যেমন-তেমন কেউ নন। বড়োবাজারের সম্ভ্রান্ত সুবর্ণবণিক এই পরিবারের উত্তরপুরুষ বনমালি মল্লিক আকবরের আমলে ত্রিবেণীতীরস্থ সপ্তগ্রামের যথেষ্ট সংগতিসম্পন্ন ব্যবসায়ী। মল্লিক পরিবারের নাচের আসরে আমন্ত্রণের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হত। বিত্তবান, অভিজাত সেই বাবুদের প্রতি শাসকের কী অপরিসীম ঘৃণা ও উপেক্ষার মনোভাব!

অথচ শাসকের অনুগ্রহ লাভের জন্য সেদিন ইংরেজি শিক্ষার হুড়োহুড়ি এবং বদান্যতা পাবার প্রতিযোগিতার অন্ত ছিল না তথাকথিত বাবুদের মধ্যে। জনৈক সাহেব তো[৩৩] সাধারণ শিক্ষিত বাবুদের ইংরেজি জ্ঞান এবং চারিত্রিক সাধুতা প্রসঙ্গে ব্যঙ্গ ও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। আর নব্যবাবুদের রমরমার যুগে আরেক সাহেব লে’ সান্ধ্যকালীন এসপ্ল্যানেডের (Esplanade) বর্ণনায়, সান্ধ্যবায়ুভক্ষণরত 'Wealthy Baboo', যাঁর অর্থ তিনি করেছেন 'merchant native', তাঁদের প্রসঙ্গে ব্যঙ্গ করে বলেছেন, তাঁরা 'Trying to "do the English",[৩৪] পঞ্চাননতলা স্ট্রিটের রামচরণ বুলাকি দাসের নাচের আসরে আমন্ত্রিত হয়ে ধনীবাবুদের হাস্যকর রুচি এবং সাহেব সাজার ব্যর্থ প্রয়াস চোখ এড়ায়নি লে’র।[৩৫] বর্ণনা করতে গিয়ে উপহাস তার কটাক্ষে আবিল হয়ে ওঠেন তিনি।

অষ্টাদশ শতকের শেষদিক থেকেই মূলত ব্যক্তিগত উদ্যোগে একের পর এক ইংরেজি শিক্ষার স্কুল স্থাপিত হয়েছে ‘নেটিভ’দের জন্য। ১৮৩০-এর পর থেকে কী সম্ভ্রান্ত, কী মধ্যবিত্ত, সব বাঙালিবাবুরাই ইংরেজি শিখে সাহেব হয়ে উঠতে চাইলেন। এমত অবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল অবশ্য আগে থেকেই। ডিরোজিও এলেন এবং সকল বাঙালিবাবুরা তাঁর প্রভাবে সংস্কারমুক্ত হয়ে ইংরেজি শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়লেন এবং নব্যবাবুরা দেখা দিলেন— এই ভাবনা অতি সরলীকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। আঠারো শতকের শেষ দিক থেকেই ব্রিটেনে ইউটেলিটেরিয়ান ভাবাদর্শ ও খ্রিস্টীয় ইভানজেলিকাল ভাবাদর্শ একযোগে ব্রিটিশের ভারত জয়কে ‘পাপ’ বলে মনে করতে থাকে এবং সেই পাপস্খলনের জন্য ভারতের প্রভুত্ব ছেড়ে দেবার পরিবর্তে দেশীয় মানুষের মানসিক সংস্কার সাধনের কাজটিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে থাকেন। এ কাজের যোগ্য সংগতকাররা ছিলেন খ্রিস্টান মিশনারিরা। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের একাধিক পুস্তিকায় হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মের তুলনায় খ্রিস্টধর্মের মহিমা ও উদারতার কথা প্রকাশিত হয়। সুকৌশলে বাঙালি লেখকদের দল তৈরি করে সুসংস্কৃত করার প্রচেষ্টাও চলতে থাকে। সভ্যতার আদর্শরূপে ইংরেজের এই আত্মপ্রতিষ্ঠার ছলনা দীর্ঘকাল বাঙালি বাবুদের আচ্ছন্ন করেছিল, সম্ভবত এখনও তা আছে। তবে এদেশীয়দের ইংরেজি শিক্ষাদানের কোনো সরকারি উদ্যোগ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বিশেষ চোখে পড়ে না। হিন্দু কলেজে কেবল সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ইংরেজি শিক্ষার বিষয়টি

গুরুত্ব পেত। অন্যত্র সরকারি কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না তেমন। উনিশ শতকের প্রথম পর্বে বিজিত ভারতীয়দের প্রতি উদারতা ও অনুকম্পার এক বিশেষ মিশেল শাসক প্রভুদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ফুটে ওঠে। লর্ড মেকলে, সি. ই. ট্রিভেলিয়ান, লর্ড বেন্টিঙ্ক— এই সময় পর্বে এঁদের উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি একদিকে যেমন এদেশীয়দের মুক্তমনে দেখবার-ভাববার অবকাশ তৈরি করেছিল, তেমনি অবশ্য নিহিত ছিল আত্মবিস্মৃত, একপ্রকার 'অসভ্য' জাতিকে সভ্য করে তোলা এবং আনুগত্য আদায়ের নিহিত মনোভাবটিও। ট্রিভেলিয়ান যখন বলেন,[৩৬] ইংরেজদের শিক্ষার গুণে, 'ইনটেলেকচুয়াল পলিটিকাল ইনস্টিটিউসনের' প্রভাবে ভারতবাসী প্রকৃত গুণসম্পন্ন হয়েছে, স্বাবলম্বী হওয়ার দক্ষতা অর্জন করেছে, সুখের সন্ধান পেয়েছে, তখন সেই দৃষ্টিভঙ্গির পিছনে কাজ করে 'অশিক্ষিত, অসংস্কৃত' একটি জাতিকে 'সুউন্নত' করে তোলার গর্ববোধ। 'ব্রিটিশ সদিচ্ছা'র শোষণের মুখটি সেই বক্তব্যে অনুচ্চারিতই থেকে যায়। বেন্থাম মানুষের মঙ্গল সাধনই মানুষের কর্তব্য বলে মনে করতেন এবং এজন্য আইনের শাসনের কথা বলতেন। কারণ, তাঁর মতে, যথোচিত আইন, দক্ষ প্রশাসন এবং জ্ঞানদীপ্ত বিচারব্যবস্থাই উন্নয়নশীল সভ্য জাতির বিকাশ সম্ভব করে তুলতে পারে। এই ইউটেলিটেরিয়ান তত্ত্ব বা উপযোগিতাবাদ জেম্‌স মিলের হাত ধরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লন্ডন কার্যালয়ে এসে পৌঁছোয় এবং উক্ত কোম্পানির কর্মী হিসাবে মিল ভারতের উদ্দেশ্যে গৃহীত কোম্পানির নীতিগুলিকে 'আপাতভাবে' হিতবাদী ভাবধারার নিরিখে গ্রহণ করতে প্রভাবিত করেন। অনেকটা সফলও হয়তো হন। কিন্তু একইসময়ে মিল কোম্পানির শোষণকারীর ভূমিকাকে পাশে সরিয়ে রেখে কেবল আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ভারতবর্ষে সুশাসনের কথা বলেছেন। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য ও অর্থের বহির্মুখী স্রোত সম্পর্কেও তিনি নীরব। মূলত, মিলেরই উদ্যোগে যদিও লর্ড মেকলে ১৮৩৩-এ আইন কমিশন গঠন করেন, যে কমিশন ১৮৩৫-এ ভারতীয় দণ্ডবিধি বা পেনাল কোড রচনা করেন; যদিও ১৮৬০-এর আগে তা আইনে পরিবর্তিত হয়নি। একইসঙ্গে ১৮৩৫-এ তাঁর বিখ্যাত 'Education Minute'-এ মেকলে ভারতীয়দের ইংরেজি শিক্ষাদানের ব্যাপারে জোর দেন এবং এর দ্বারা যে ব্রিটিশ ভারতের উপযুক্ত (বস্তুত, বশংবদ) কর্মচারীকুলের সৃষ্টি হবে, এ কথাও প্রকারান্তরে বলেন।

অবশ্য ইংরেজি শিক্ষার বিষয়টি নিয়ে মিল ও বেন্টিঙ্ক দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। তাঁরা উভয়েই মনে করতেন, ইংরেজির তুলনায় দেশীয় শিক্ষাই ভারতীয়দের উন্নতিসাধনের প্রকৃত পথ। তা ছাড়া ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির প্রতিও বেন্টিঙ্কের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল শ্রদ্ধার। ভারতীয়দের যথার্থ ধর্মকে যাবতীয় সংস্কারের আবিলতা থেকে মুক্ত করে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাও ছিল তাঁর স্বপ্ন। হরচন্দ্র ঘোষের মতো সৎ-উদার-কর্তব্যনিষ্ঠ দেশীয় বাঙালিকে বেন্টিঙ্কই প্রথম প্রশাসনের কাজে নিয়োগ করেন। উত্তরকালে হরচন্দ্র স্মল কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়ে তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা ও সুউন্নত মানসিকতার প্রমাণ দেন। কিন্তু বেন্টিঙ্ক ছিলেন ব্যতিক্রম। মেকলে ইংরেজি শিক্ষার বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট ভাবিত ছিলেন এবং এর সুষ্ঠু রূপায়ণের ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন। ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমেই ভারতীয়রা প্রকৃত উন্নতির পথ খুঁজে পাবে এবং সুসভ্য হয়ে উঠবে, এই ছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। অবশ্য, ভারতীয়দের প্রকারান্তরে ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে মোহ ও মায়ায় বিভ্রান্ত করে ইংরেজের জন্য সুচিরস্থায়ী নিশ্চিন্ত শাসন ব্যবস্থা কায়েম করাও তাঁর লক্ষ্য ছিল। এ কারণেই ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহী নব্যবাবু এবং রামমোহনপন্থী ব্রাহ্মবাবুরা মেকলের নীতিকে প্রথম পর্বে সাদরে বরণ করে নিয়েছিলেন। সেইসঙ্গেই ছিল খ্রিস্টান মিশনারিদের সক্রিয় সমর্থন ও উদ্যোগ। বাঙালিবাবুদের মধ্যে যাঁরা মেকলের স্বপ্নকে পরিপুষ্ট করার পথ বাছলেন, তাঁরা অচিরেই সামাজিক শ্রেণি হিসাবে উঠে এলেন

পাদপ্রদীপের আলোয়, অন্যথায় প্রাচীন রক্ষণশীল অভিজাত অনেক বাবুই অস্তগামী হলেন নতুন এই নীতির বিরুদ্ধতা করে। বিনয় ঘোষ উনিশ শতকের প্রথম পর্বের এইসব বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী বাবুদেরকে ইংরেজদের বিনির্মাণ হিসাবেই দেখেছেন; তাঁর মতে, 'The Principles of wealth and achievement were becoming the ruling criteria of selecting elites in Bengali Society. The Great majority of the Bengali intellectuals came from well-to-do upper middle class families, working their way up from the lower middle-class.

'They had raised their economic status by trade and commerce and their intellectual status by new English education.' [৩৭] ডিরোজিওপন্থী নব্যবাবুরা, রামমোহনপন্থী ব্রাহ্মবাবুরা ছাড়াও এই ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ নিতে তৎপর হলেন নতুন ভুঁইফোঁড় জমিদারশ্রেণি, খেটে খাওয়া মধ্যবিত্ত, দালাল, এমনকী পুঁজিপতিরাও। বাঙালিবাবুরা সেদিন ইংরেজি শিক্ষার হাত ধরে ভাগ্যবান হওয়ার পথ খুঁজতে ব্যাকুল। অথচ এই ইংরেজি শিক্ষার আড়ালে তাঁদের প্রতি কী প্রকার তাচ্ছিল্য ও দয়া লুকিয়ে ছিল, সেকথা তাঁরা বুঝতে পারেননি। আর পারেননি বলেই, সেইসঙ্গে অর্থনৈতিক সুস্থিতির প্রয়োজনে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহে বাঙালি বুদ্ধিজীবীবাবুরা কিন্তু নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা এই মহাবিদ্রোহে শাসকশ্রেণির পক্ষই অবলম্বন করেন। বাঙালি মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুরা ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে ইউরোপ ও ইংল্যান্ডের মধ্যবিত্তদের অনুসরণে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সংস্কার ও অধীনতামূলক শক্তিবৃদ্ধির স্বপ্ন দেখতে থাকেন।[৩৮]

মনে রাখতে হবে, ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ দিয়ে সুসভ্য-সুশিক্ষিত জাতি হিসাবে ভারতীয়দের পঠনের কথা বললেও, ইংরেজি শিক্ষিত এদেশীয়দের সমগোত্রীয় ভাবতে নারাজ ছিলেন শাসককুল। ফলে, শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সহায়ক কর্মী হিসাবে এদেশীয় বুদ্ধিজীবীরা নিযুক্ত হতেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ শাসকতান্ত্রিক সংস্কারে তাঁরা যুক্ত হতে পারতেন না। সে অধিকার তাঁদের ছিল না, এমনকী আই.সি. এস-এর মতো পরীক্ষাতেও ভারতীয় উচ্চশিক্ষিতদের নিয়োগের বিরোধিতা করা হয় এবং বিলেতে গিয়ে পরীক্ষা দেবার নিয়ম চালু করে 'সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না'র নীতি প্রযুক্ত করা হয়। এই সুযোগ গ্রহণে অধিকাংশ ভারতীয়ই যে অপারগ, এ সত্যে তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন। তবে ১৮৫৭-র পরে নানান ঘটনা পরম্পরায় শাসকশ্রেণির হিতবাদীতার মুখোশ খুলে পড়তে থাকে। মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের মধ্যে নানান জিজ্ঞাসা ও স্বাধীনতার স্পৃহা জেগে উঠতে থাকে। ১৮৫৭-য় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রথম পনেরো বছরে ১৪৯৫ জন এফ.এ পরীক্ষায়, ৫৪৮ জন বি.এ পরীক্ষায় এবং ১১২ জন এম.এ পরীক্ষায় কৃতকার্য হন; পরের দশ বছরে সংখ্যাটি অনেক বেড়ে যায়— ২৬৬৬ জন এফ.এ পরীক্ষায়, ১০৩৭ জন বি.এ পরীক্ষায় এবং ২৮৪ জন এম.এ পরীক্ষায় কৃতকার্য হন।[৩৯] উদারনৈতিক ব্রিটিশ শাসন, যার মূল মন্ত্র, হিতবাদ— ভারতীয়দের ক্রমমুক্তির মধ্যে দিয়ে সুশিক্ষিত, সুসংস্কৃত এবং সুসভ্য করে তোলা, শিক্ষার এহেন প্রসার দেখে আনন্দিত ও গর্বিত হবার বদলে তাঁদের আশঙ্কা ও ভীতি আর গোপন থাকে না। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী বাঙালিবাবুদের ক্রমবর্ধমান হার শাসকশ্রেণিকে বিব্রত ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। স্যার রিচার্ড টেম্পল তাঁর শিক্ষাবিষয়ক notes-এ আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, শিক্ষিত 'নেটিভ'রা ক্রমশ স্ব-শাসনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। তাঁদের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে এক অন্য ধরনের আকাঙ্ক্ষা— সে আকাঙ্ক্ষার নাম স্বাধীনতাস্পৃহা; রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তাঁরা ছড়িয়ে দিতে

চাইছেন জাতীয়তাবাদী ভাবধারা। টেম্পলের এই আশঙ্কার কোনোটিই সম্পূর্ণ অসত্য নয়। কিন্তু মনে তো রাখতে হবে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী বাবুদের উত্থানের পিছনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান ছিল শাসককুলেরই। জাতীয়তাবাদী ভাবধারা, ইউরোপীয় মডেলের স্বাধীন 'দেশ' নামক প্রত্যয় কিংবা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দাবিদাওয়া আদায়ের কৌশল সমস্তই শাসক প্রবর্তিত শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় 'ভদ্রলোক'বাবুরা লাভ করেছিলেন। কিন্তু শাসকের গোপন ইচ্ছানুযায়ী এসবের বিনিময়ে শর্তাধীন আনুগত্য দেখাতে ধীরে ধীরে ভদ্রলোক 'বাবু'রা অস্বীকৃত হচ্ছিলেন এবং একইসঙ্গে প্রভাবিত করছিলেন, বাকি সকলকে। তা ছাড়া সামাজিক অত্যাবশ্যকীয় নানান সামগ্রী ও সুরক্ষা দিতে শাসকশ্রেণি অনেকাংশেই ব্যর্থ হয়েছিলেন। উন্নত শ্রেণির শাসনের পরেও ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা, অস্থির বাজারি অর্থনীতি, প্রজাশোষণ, সীমাহীন দারিদ্র্য চোখে আঙুল দিয়ে সেদিন শিক্ষিত বাবুদের দেখিয়ে দিয়েছিল ব্রিটিশ শাসনের ফাঁক ও ফাঁকি। সেইসঙ্গে 'মঙ্গলময় প্রজাশাসনে'র পশ্চাতে লুকিয়ে থাকা স্বার্থমগ্ন রূপটিও ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়ে গিয়েছিল উনিশ শতকের উপান্তে পৌঁছে, শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' শ্রেণির কাছে। অতএব, একে একে গড়ে উঠছিল নানাপ্রকার রাজনৈতিক সভা-সমিতি, বিপ্লবী গুপ্তসংঘ, সেইসঙ্গেই জনমানসজোড়া ক্ষোভ। স্যার টেম্পল আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে : 'There is danger of discontent being engendered in the minds of educated Naives, if adequate and suitable employment does not offer itself to them in various directions. As all the arts and sciences which have helped to make England what she is, are offered for, even pressed on the acceptance of, the Natives, it must be expected that those who do accept these advantages will be animated by hopes and stirred by emotions, to which they were previously strangers. They will evince an increasing jealousy of any monopoly of advantage in any respect being tained in favour of Europeans. They are already raising a cry, louder and louder, louder, the purport of which is "India for Indians".' [৪০] অর্থাৎ শ্রীমতী ফেনটনের দুধ-ঘি খাওয়া 'poor Animal' বাবুরা শিক্ষার আলোয় রূপান্তরিত হয়ে আর শাসক-ভজনা করতে প্রস্তুত নন; বরং নিজেদের প্রাপ্য আদায়ে তাঁরা অনেক বেশি সচেতন, অনেক বেশি তৎপর। আর সে কারণেই নিছক দয়া, অনুকম্পা বা ঘৃণা দিয়েও এই পরিবর্তিত বাবুদের বিচার করা সম্ভব হচ্ছে না; বরং সংশয়, সন্দেহ আর অবিশ্বাস বাবুদের সম্বন্ধে নতুন ভাবে ভাবতে শেখাচ্ছে ঔপনিবেশিক প্রভুদের।

যদিও সাধারণভাবে, শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুরা তাঁদের আনুগত্য ও আত্মবঞ্চনায় উনিশ শতকের শেষ দিকেও ততটা প্রকাশোন্মুখ নয়,[৪১] তথাপি কলকাতার 'প্রভাবশালী নেটিভ বাবুদের দল' (influential Native Community) সরকারের প্রশাসনিক কাজকর্মের ত্রুটি নির্দেশ করতে কিংবা বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিজেদের মতামত জানাতে এ সময় আর দ্বিধাবোধ করছেন না তেমন। এবং যদিও 'Such is the Paternal Government now ruling India, that the people are not even to complain when they are hurt! But indications are life in England that this Inperialism has been doomed.' [৪২] ১৮৭০-এর পর থেকেই একের পর এক ছাত্র-সংঘ স্থাপিত হতে দেখা যায়, যেখানে তরুণ শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' মধ্যশ্রেণি শাসকের বিরুদ্ধে আবেদন-নিবেদন এবং প্রয়োজনে 'ছিনিয়ে' আনার

কথাও শোনায়।[৪৩] এমনকী শিবনাথ শাস্ত্রী এবং আনন্দমোহন বসু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে 'ছাত্রসমাজ' গঠন করেন, যার ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল 'স্কুল-কলেজে ধর্মশিক্ষাবিহীন শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই অভাব কিয়ৎপরিমাণে দূর করা'[৪৪], কিন্তু ক্রমে 'ছাত্রসমাজে'র শাখা-সংগঠনগুলি নানান সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে, যা শাসকপক্ষ সংগত কারণেই ভালো চোখে দেখেননি।

উনিশ শতকের শেষদিকে শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের উত্থান এবং জাতীয় রাজনীতিতে তাঁদের ক্রমপ্রসারী প্রভাব শাসকপক্ষকে উদ্‌বেগে রেখেছিল। এই সময়েই ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেওয়া সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে তুচ্ছ কারণ দেখিয়ে বরখাস্ত করেন সাহেব-প্রভুরা। যদিও আসল কারণ ছিল, নিজস্ব পরিমণ্ডলে 'নেটিভ' বাঙালিবাবুর যোগদান এবং চোখে পড়ার মতো দক্ষতার কারণে জাত স্বভাবসুলভ ঈর্ষাবোধ। ১৮৭৫-এ রাজনীতিতে যোগ দিলেন সুরেন্দ্রনাথ এবং ১৮৭৬-এর জুলাই মাসে গড়ে তুললেন 'ভারতসভা'— যার ছত্রছায়ায় সম্মিলিত হলেন কেমব্রিজের প্রথম ভারতীয় র‍্যাংলার আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ক্রমশ 'ভারতসভা' হয়ে উঠল শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' শ্রেণির প্রতিবাদ ও দাবি আদায়ের উপযুক্ত মঞ্চ। এঁদের সম্মিলিত প্রতিবাদ ছিল—

এক. সিভিল সার্ভিসে নানাপ্রকার বাধানিষেধের মাধ্যমে উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগ বিষয়ে শাসকের আপত্তি ও উষ্মার বিরুদ্ধে;

দুই. দুর্ভিক্ষ-তহবিলের টাকা আফগান যুদ্ধে খরচ করার বিরুদ্ধে (১৮৭৮);

তিন. 'সংবাদপত্র আইন' (১৮৭৮) দ্বারা জনগণের স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে;

চার. ভারতীয় প্রশাসকের হাতে ইউরোপীয়দের বিচার করার ক্ষমতা দান করা হলে (১৮৮২), সে বিষয়ে ইউরোপীয়রা প্রতিবাদ জানাতে থাকলে, উক্ত প্রতিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখেরা 'ভদ্রলোক' শ্রেণির বাবুদের একটি বিশিষ্ট শ্রেণি হিসাবে পরিগণিত হতে থাকেন ('এলিট শ্রেণী')।

ভারতীয়দের হাতে ইউরোপীয়দের বিচারের অধিকার দান বিষয়ক ঘটনায় ইউরোপীয়দের সম্মিলিত প্রতিবাদ শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের প্রতি বিদেশি প্রভুদের একটি বড়ো অংশের বিতৃষ্ণ মনোভাবকেই প্রকাশ করে। ১৮৮৩ সালে হিউমের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন' ১৮৮৫ সালে বোম্বাইয়ে সভার মধ্য দিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের ভিত্তি স্থাপন করলে, সেদিনও শিক্ষিত বাঙালি মধ্যশ্রেণিরই ছিল প্রধান ভূমিকা। কিন্তু এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় শাসকশ্রেণি বাঙালিবাবুদের প্রতি আরও ক্ষুব্ধ হতে থাকেন। ১১২২ সালে ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করার পিছনে শিক্ষিত বাঙালিবাবুদের প্রতি শাসকের যে অসন্তোষ ও অসহিষ্ণুতা কাজ করছিল, তার বীজভূমি ছিল ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর আগে থেকে ঘটে চলা শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'এলিট' অংশের নানাবিধ কার্যকলাপ। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর নিজের চাকরি জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা প্রসঙ্গে সরাসরিই বলেছেন যে, 'If I were not an Indian, I would not have been put to all these trouble, and that the head and front of my offence was that I entered the sacred preserves of the Indian Civil Service, which so far had been jealously guarded against invasion by the children of the soil.'[৪৫] শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির প্রতি শাসকের এই আন্তরিক বিতৃষ্ণা ও প্রতিরোধের একটি গভীরতর প্রভাব পড়েছিল

বাঙালিবাবুদের ক্ষেত্রে। ইতিপূর্বে নানান প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে যে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই মূলত ইংরেজ শাসনের প্রতি ধীরে ধীরে বাঙালি শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের মোহভঙ্গ হতে থাকে। নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ না বাড়া এবং সরকারি কাজেকর্মে বিশেষত উচ্চপদে নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষিত বাবুদের প্রতি শাসকশ্রেণির বিরূপতা একদিকে হতাশ করে তোলে শিক্ষিত শ্রেণিকে। অন্যদিকে, জীবন অতিবাহিত করার তাগিদেই বাঙালি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির একটি বড়ো অংশ বেসরকারি বা আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে সামান্য বেতনের বিনিময়ে কেরানির কাজ নিতে বাধ্য হন। এর ফলে শিক্ষিত বাবুদের মনে সংগত কারণেই শাসক-প্রভুদের প্রতি গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। বিশ শতকের প্রথম থেকেই একাধিক বিপ্লবী আন্দোলন এইসব ক্ষত থেকেই সৃষ্ট বা প্রভাবিত।

আসলে, বাঙালিবাবুদের সঙ্গে সাহেব-প্রভুদের যে উনিশ শতকীয় কালযাপন, তাতে দেখা যায় বিচ্ছিন্ন কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া 'বাবু'দের প্রতি শাসকশ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি আদতে বদলায়নি। উনিশ শতকের প্রথমদিকে 'বাবু' বলতে তাঁরা বুঝতেন অর্থবান, অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত, চারিত্রিক দিক থেকে হীন, উচ্ছৃঙ্খল কিছুকে, ফেনটনের ভাষায় 'poor animal'-কে। এ সময় নিজেদের স্বার্থেই তাঁরা সখ্যতা রক্ষা করেছেন, পুঁজি ও বিশ্বাসহীন আনুগত্যের ক্ষেত্রে প্রথম পর্বের নববাবুদের জুড়ি মেলা ভার ছিল। সাহেব-প্রভুরা সেই সুযোগ নিয়ে তাঁদের ধন্য করতে চেয়েছেন। যদিও নববাবুদের এই 'প্রভু-তোষণ' যা আসলে বড়োসড়ো investment, সে সত্যটা যদি শাসক-প্রভুরা জানতেন, তবে তাঁদের আত্মপ্রসাদ শোভা পায় না। আবার, যদি এ সত্যটি তাঁদের অগোচর থাকে, তবে বলতেই হবে, নববাবুরা স্বার্থসিদ্ধির কৌশলে শাসক-প্রভুদের নির্বোধ প্রতিপন্ন করিয়েছেন।

শাসক-প্রভুদের কাছে 'বাবু'রা যেটুকু সম্মান পেয়েছেন তা নব্যবাবুদের সূত্রে। এঁরা ছিলেন শিক্ষিত এবং শাসকের প্রতি অনুগত, দায়হীন বশ্যতায় ধন্য, মনে-প্রাণে সাহেব। এঁদের মুগ্ধ চৈতন্য শাসকশ্রেণির কোনোরূপ অপরাধ স্বীকার করতে অপারগ ছিল, বরং শাসকের পক্ষে সহায়ক হয়, এমন কাজকর্মেই এঁরা নিয়োজিত রাখতেন নিজেদের। ফলে এঁদের দিক থেকে কোনোরূপ আশঙ্কা দেখা দেয়নি শাসকের মনে। বরং শিক্ষিত, মার্জিত, জীবনযাপনে সাহেবি নব্যবাবুরা কিছুটা হলেও বাবুদের প্রতি শাসকশ্রেণির তুচ্ছতার মনোভাব দূর করতে সহায়তা করেছিলেন। আর নব্যবাবুদের দলভুক্ত না হয়েও রামমোহন রায় তাঁর ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্যের গুণে আপামর শাসক-প্রভুর শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠেছিলেন।

কিন্তু শিক্ষাদীক্ষার ক্রমপ্রসারের সুযোগ নিয়ে প্রথমত, ব্রাহ্মবাবুদের হাত ধরে যখন শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুরা এসে উপস্থিত হলেন এবং সরাসরি রাজদ্বারে চাকরি-বাকরি ও জীবনযাপনের অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা রাষ্ট্রের কাছে দাবি করলেন, তখন সাহেব-প্রভুদের মনের ঔপনিবেশিক মনোভাবের গোপন সুখটি আর অপ্রকাশ্য থাকল না। কোনো কোনো মতে,[৪৬] উনিশ শতকের শিক্ষার চালচিত্র মোটামুটিভাবে তিন শ্রেণিতে বা যুগে বিভক্ত। প্রথম যুগে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় কাজ চালানো গোছের ইংরেজি চালু ছিল। দ্বিতীয় যুগে ইংরেজি ভাষাশিক্ষার স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-মেডিক্যাল কলেজ-ল' কলেজ ইত্যাদি গড়ে ওঠে। তৃতীয় যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়। এবং 'উচ্চসম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারই ছিল প্রথম দুই পর্বে গবর্ণমেন্ট ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তিদের মুখ্য উদ্দেশ্য।... আধুনিক শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণি বলতে আমরা যাদের বুঝি সেই শ্রেণীর বিকাশ হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে।'[৪৭] কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের দরুন মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের

বৃত্তিগত পরিচয় খুব উচ্চশ্রেণির হয়ে ওঠেনি। হান্টারের হিসাব অনুযায়ী,[৪৮] ১৮৭০-৭৩ সালের মধ্যে কলকাতা ও চব্বিশ পরগনায় সরকারি কেরানির সংখ্যা ১৫২২ এবং বেসরকারি কেরানির সংখ্যা ১৬,২৪৭ জন। ১৮৮১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে, আইন ও বিচার বিভাগে কর্মরত দেশীয় যেখানে মাত্র ১৬৭ জন, সেখানে কেরানির সংখ্যা ১৬,৩১৪ জন।[৪৯] এই ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত কেরানিকুলের প্রতি শাসকের মনোভাব যে আদৌ অনুকূল ছিল না, তা বলাই বাহুল্য। স্বল্প বেতনের চাকরি শিক্ষিত কেরানিবাবুদের সাধ ও সাধ্যের ক্ষেত্রে বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। বাঙালিবাবুদের হীনমন্যতাবোধ, আত্মপ্রবঞ্চনার কারণও এই সবের মধ্যে নিহিত। শাসককুল উচ্চ সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে নানাপ্রকার বিধিনিষেধ ও অস্থিরতার আমদানি করে সম্ভবত বাঙালি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুদের উচ্চাশা ও আকাঙক্ষার গতিরোধ করতে চেয়েছিলেন সম্ভবত। অন্যদিকে বাঙালি মধ্যশ্রেণির তথাকথিত এলিট অংশকে এবং এক শ্রেণির ভূমধ্যাকারীকে রাজাবাহাদুর, রায়বাহাদুর, বাবুবাহাদুর ইত্যাদি 'খেতাব' দান করে স্বতন্ত্র আর একটি উপশ্রেণির জন্ম দিয়েছিলেন তাঁরা, যার পিছনে ছিল সুকৌশলী রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে' দেখিয়েছেন খেতাব-প্রাপ্তির হাস্যকর দিক। অবশ্য এমন ভাবা ভুল যে, খেতাব দানের মাধ্যমে বাঙালিবাবুদের মুষ্টিমেয় অংশকে শাসককুল প্রচলিত সমাজের চোখে শ্রদ্ধার্হ করে তুলতে পেরেছিলেন। সমসাময়িক নকশা ও প্রহসনে তার বিপরীত মনোভাবেরই চিত্র পাওয়া যায়।

বস্তুত, শাসনযন্ত্রের পরিচালনার সূত্রে এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে বিদেশি শাসককুল বাঙালিবাবুদের ব্যবহার করেছিলেন মাত্র, কোনো শ্রদ্ধা-সম্প্রীতি বা সহমর্মিতার লেশমাত্র ছিল না তাঁদের চোখে। বাবুদের তাঁরা অলস, কর্মবিমুখ, নতজানু একদল 'জীব' হিসাবেই ভেবে এসেছেন। বিচ্ছিন্ন কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এই দৃষ্টিভঙ্গির ব্যত্যয় হয়নি। তার ফলেই উনিশ শতকের উপান্তে পৌঁছে সাহেবদের কলমে 'বাবু'র নতুন সংজ্ঞায় বলা হয় : 'The pliable, plastic, receptive Baboo of Bengal eagerly avails himself of this system, (of English education) partly from a servile wish to please the sahib logue, and partly from a desire to obtain a Government appointment.'[৫০] এই হল 'বাবু'দের প্রতি ঔপনিবেশিক শাসকদের চরম সিদ্ধান্ত।

## টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. দ্র. রায়, রজতকান্ত, 'পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ'; আনন্দ সংস্করণ ২০০৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।

২. এই মিথের কথা অনেকেই উল্লেখ করেছেন (দ্র. Cotton, W.E.A, সংকেত সূত্র-৩), যদিও W.H. Carey তাঁর 'Good old Days of John Company' গ্রন্থে জনৈক ক্যাপ্টেন হ্যামিলটনের সাক্ষ্য উদ্ধার করে বলেছেন যে, চার্ণক স্থানীয় মানুষদের উপর প্রভূত অত্যাচার করতেন, তবে কিছু প্রভাবশালী মানুষ ও বণিক ছাড়া। তবে এই সাক্ষ্য কতটা নির্ভরযোগ্য সে বিষয়ে তর্কের অবকাশ থেকেই যায়; কারণ, স্থানীয় মানুষের উপর প্রবল অত্যাচার করলে চার্ণককে বেশিদিন টিকতে হত না এখানে। (দ্র. Carey, Good old Days of John Company, Riddhi edi 1980, p. 34 )।

৩. Cotton, H.E.A, 'Calcutta Old and New', Ist edi 1909, Revised edi 1980, General Printers and Publishers Pvt.Ltd, Kolkata, p.7.
৪. Carey, W.H, 'The Good Old Days of John Company', First Pub 1887, Riddhi Edi 1980, Riddhi-India, Kolkata, p. 34.
৫. তদেব, পৃ. ৩৪।
৬. রায়, এ. কে, 'কলিকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'; সেন, শুদ্ধোদন অনূদিত, প্রথম সংস্করণ ১৯৮২, ঋদ্ধি ইন্ডিয়া, কলকাতা, পৃ. ৬১।
৭. দ্র. Hamilton; Nair, P. Thankappan edi, 'Calcutta in the 18th Century'; 1st edi 1984, Firma KLM Private LTD, KolKata, p. 4-5.
৮. রায়, এ.কে, 'কলিকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।
৯. Wilson's Early Annals 1 উদ্ধৃত রায়:- এ.কে, 'কলিকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫।
১০. রায়, এ.কে. তদেব, পৃ. ১০৭-১০৮।
১১. Sinna, Pradip, 'Calcutta in Urban History', First edi 1978, Firma KLM Pri Ltd, Calcutta, p. 9.
১২. দত্ত, নারায়ণ, 'জন কোম্পানির বাঙালি কর্মচারী', প্রথম সং ১৯৭৬, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ১২।
১৩. তদেব, পৃ. ১৩।
১৪. দত্তবর্ম্মা, ললিতাপ্রসাদ, 'গোবিন্দরাম', 'কায়স্থ পত্রিকা', আশ্বিন ১৩২৬;
দ্র. রায়, নিশীথরঞ্জন ও উপাধ্যায়, অশোক সম্পাদিত, 'প্রাচীন কলিকাতা', প্রথম সং ১৩৯০, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃ. ২৩৩ কিন্তু নারায়ণ দত্ত প্রাগুক্ত গ্রন্থে জানিয়েছেন, নন্দরাম ১৭০৫-এর মধ্যেই কর্মচ্যুত হন এবং ওই বৎসর উক্তপদে জগৎদাসকে নিযুক্ত করা হয় (দ্র. পৃ.৫১)।
১৫. তদেব, পৃ. ২৩২।
১৬. Cotton, W.H, 'Calcutta old and New' প্রাগুক্ত, পৃ.
১৭. দত্ত, নারায়ণ, 'জন কোম্পানির বাঙালি কর্মচারী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।
১৮. 840 Pelition of Natives of Calcutta against hanging a man for forgery (Proceedings January 29), Rev. J. Long, 'Unpublished Records of Govt.'. উদ্ধৃত:- সান্যাল, অবন্তীকুমার, 'বাবু', প্রথম সং ১৯৮৭, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন্স, প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ৬৪।
১৯. ঘোষ, লোকনাথ, 'কলকাতার বাবু-বৃত্তান্ত'; সেন, শুদ্ধোদন অনূদিত, প্রথম সং ১৯৮৩, অয়ন, কলকাতা, পৃ. ৭৩।
২০. তদেব, পৃ. ৭৫।
২১. Parks, Fanny, 'Wanderings of a Pilgrim, in Search of the Picturesque'.
দ্র. Nair, P. Thankappan, 'Calcutta in the 19th Century', 1st edi 1989, Firma KLM Pv. LTD, KolKata, p. 258-259.

২২. তদেব, পৃ. ২৮০।

২৩. তদেব, পৃ. ২৯৪।

২৪. Huggins, 'Calcutta in 1824'; Nair, P.T. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৬।

২৫. Fisches-Tine, Harald, 'Low and Licentious Europeans Race, Class and 'White Subalternity in Colonial India', 1st edi 2009, Orient Blackswan, New Delhi, p. 59.

২৬. Marshall, P.J, 'The First British Empire', 'The Oxford History of British Empire,' vol.5, Historiography, ed. Winks, R.W, Oxford University Press, oxford, New York, p. 43-53. উদ্ধৃত:- বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, 'পলাশি থেকে পার্টিশান', প্রথম ওরিয়েন্ট-ব্ল্যাকসোয়ান সং ২০০৯, পুনর্মুদ্রণ ২০১০, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, পৃ. ৭৯।

২৭. তদেব, পৃ. ৮২।

২৮. রক্ষিত, হারাণচন্দ্র, 'ভিক্টোরিয়া-যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য', চট্টোপাধ্যায়, অরুণা সম্পাদিত, প্রথম পারুল সং ২০০৯, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৫।

২৯. পাল, বিপিনচন্দ্র, 'সত্তর বৎসর', প্রথম কল্পন সংস্করণ ২০০৫, কল্পন, কলকাতা, পৃ. ১২৭।

৩০. Heber, Bishop, 'Calcutta in 1823-1824', Nair, P. Thankappan, 'Calcutta in the 19th Century; Ibid, p. 373.

৩১. তদেব, পৃ. ৩৯২।

৩২. Mrs. Fenton, 'Calcutta in 1827-28'; Nair, P.T edi, Ibid, p. 469.

৩৩. Nau Fragus, 'Calcutta in 1827', Niar, 'Calcutta in the 19th Century', Ibid, p. 436-437.

৩৪. Leigh, 'Calcutta in 1838'; Nair, 'Calcutta in the 19th Century', Ibid, p. 627.

৩৫. তদেব, পৃ. ৬৪২-৬৪৭।

৩৬. Stokes, E, 'The English Utilitarians and India', 1st edi 1959, Clarenndon Press, Oxford, p. 49.

৩৭. Ghose, Benay, 'The Bengali Intelligentsia And the Revolt,' Joshi, P.C. edi, 'Rebellion 1857'; 2nd Reprint 2009, National Book Trust of India, New Delhi, p.123.

৩৮. তদেব, পৃ. ১২৭।

৩৯. রিপোর্ট অফ দি ইন্ডিয়ান এডুকেশন কমিশন ১৮৮২, পৃ. ২৬৯।
উদ্ধৃত:- Majumder, Biman Behari, 'History of Indian Social Political Ideas', Reprint 1996, Firma KLM Pri LTD, KolKata, p. 150.

৪০. Temple, Sir Richard, India in 1880.
উদ্ধৃত:- Majumder, Biman Behari প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

৪১. Chattopadhyay, Kanailal edi, 'Selections from the Indian Mirror', 1st edi 2005, Papyrus, Kolkata, p. 82.

৪২. তদেব, পৃ. ৮৩।

৪৩. তদেব, পৃ. ৫০।

৪৪. শাস্ত্রী, শিবনাথ, 'আত্মচরিত', প্রথম দে'জ সাং ২০০৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ১৬৮।

৪৫. Banerjea, Sir Surendranath, 'A Nation in Making', 1st akademi edi 1998, Paschimbanga Bangla Akademi, Kolkata, p. 27.

৪৬. ঘোষ, বিনয়, 'বাংলার নবজাগৃতি', চতুর্থ মুদ্রণ ১৪০২, ওরিয়েন্ট-লংম্যান প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৬৬।

৪৭. তদেব, পৃ. ৬৬।

৪৮. Hunter, W.H, 'Statistical Account of Bengal (vol.1)'; উদ্ধৃত:- ঘোষ, বিনয়, 'বাংলার নবজাগৃতি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

৪৯. Census Reports (cal 1871, 1881); প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

৫০. Yule, Henry and Burnell, A.C, 'Hobson-Jobson', Fifth Rupa Impression 2007, Rupa and Co. New Delhi, p. 44.

একাদশ অধ্যায়ঃ

# উপসংহার

উনিশ শতকীয় বাংলার সমাজ-ইতিহাস এবং বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ‘বাবু’র রূপ-রূপান্তরের সুলুকসন্ধান অবশেষে সমাপ্ত হল। আঠারো ও উনিশ শতকের সন্ধিলগ্নে সময়ের উপজাত হিসাবে ‘বাবু’দের দল প্রথমত নাগরিক জীবনে দেখা দিয়েছিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বিমিশ্র নাগরিক সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে তাঁরা নিজেরাই হয়ে উঠলেন ইতিহাস। বস্তুত, উনিশ শতকে যাঁরা হয়ে উঠেছিলেন আলোচনা-সমালোচনার লক্ষ্যস্থল, যুগপৎ কৌতূহল ও বিতৃষ্ণায় প্রালোড়িত হতে হতে যাঁরা মিশে গিয়েছিলেন বাঙালি সংস্কৃতি, বিশেষত বাঙালি পুরুষের মননে, চিন্তনে, অস্থিমজ্জায়, সেই ‘বাবু’রা তাঁদের কৃতকর্মের জন্য সমাজে ও সাহিত্যে কখনো কখনো যেমন অভিনন্দিত হয়েছেন, তেমনি অনেকসময়ই হয়ে উঠেছেন ব্যঙ্গবিদ্রূপ-উপহাসের অভিমুখ। নতুন বিমিশ্র নাগরিক সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে সাধারণ জনগণ বাবুদের যেমন অবিমিশ্রভাবে গ্রহণে অপারগ ছিল, তেমনি তাঁদের পুরোপুরি বর্জন করাও অসম্ভব ছিল তাদের পক্ষে। সাহিত্য যদি সমাজ-মানসের প্রতিবিম্বন হয়, তবে বলতেই হবে যে, ‘বাবু’দের কেন্দ্র করে সমাজ ও সাহিত্যের এই টানাপোড়েন অব্যাহত ছিল উনিশ শতকের শেষেও। এমনকী বিংশ শতকেও ‘বাবু’রা বারে বারেই কৌতূহল উদ্রিক্ত করেছেন অনুভবী পাঠক ও গভীর চিন্তকদের মনে। ইতিহাসের অনিবার্য ধারায় এক শতাব্দীর মধ্যেই আবির্ভূত হয়ে ‘বাবু’রা হয়ে উঠলেন এমন এক ‘মিথ’, বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাসে যা কেবল অভিনব শুধু নয়, অদৃষ্টপূর্বও বটে।

অষ্টাদশ শতকের গোড়া থেকেই কলকাতাকে কেন্দ্র করে ইংরেজরা পরিকল্পিতভাবে এমন এক বিমিশ্র সমাজ কাঠামো গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়, যার কেন্দ্রে রয়েছেন শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা, আর তার চারপাশে নানা স্তরভুক্ত দেশীয় মানুষেরা। সাধারণভাবে এই কাঠামো দ্বি-স্তরীয় মনে হলেও, দেশীয় মানুষদের মধ্যে ছিল বহুস্তর। মূলত পুঁজির স্বত্ব ও নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করেই এই স্তরবৈচিত্র্য গড়ে উঠেছিল এবং বলা বাহুল্য, দেশীয় পুঁজিপতি (Banker) এবং বিত্তবান (Rich) ছিলেন এই স্তরের সর্বোচ্চ শ্রেণির অধিকারভোগী। বিত্তকৌলীন্যের জন্য এঁরা শ্বেতাঙ্গ প্রভুদেরও আস্থাভাজন হয়ে উঠেছিলেন। পলাশির যুদ্ধ নামক প্রহসনের পিছনে এঁদের অনেকেরই ভূমিকা ছিল বিতর্কিত এবং সন্দেহজনক। যুদ্ধ-পরবর্তীকালে বদলে যাওয়া কলকাতার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এঁদেরই কেউ কেউ দলপতি হয়ে দেখা দিলেন, যার আড়ালে ছিল দেশীয় সাধারণের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে চাওয়া শ্বেতাঙ্গ-প্রভুদের ধুরন্ধর কৌশল এবং প্রত্যক্ষ মদত। নতুন নাগরিক জীবনে দেশীয় সমাজের উপর অতএব এঁদের কেউ কেউ প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা গ্রহণ করলেন এবং আদিবাবুদের জন্মও হল এঁদেরই সূত্রে।

অষ্টাদশ শতকের গোড়া থেকে উনিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত নগর কলকাতায় প্রচলিত ছিল দু’ধরনের সাংস্কৃতিক কাঠামো— শ্বেতাঙ্গ সমাজে প্রচলিত ছিল ইউরোপীয় জীবনছন্দ, অন্যদিকে দেশীয় সমাজে (Black-Town) প্রচলিত ছিল আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-ধনতান্ত্রিক রীতিনীতি। পলাশির যুদ্ধের পর বাড়তে থাকা নতুন নগর কলকাতায় যাঁরা ক্রমশ ভিড় জমাচ্ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিত্তবান শ্রেণিদের উপর নিজস্বার্থেই শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা সদয় ছিলেন। বসবাসের জন্য জমির ব্যবস্থা থেকে শুরু করে, তাঁদের রুজিরোজগার ও জীবনযাপনের নিরাপত্তা বিধান করে শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা সহজেই তাঁদের মন জয় করেছিলেন। বিনিময়ে বেনিয়া বুদ্ধিতে দেশীয় বিত্তপতিদের পুঁজি প্রাথমিকভাবে লগ্নি হয়েছিল শাসকের নানান প্রকল্পে, কলে-কারখানায়, খামারে। এইসব দেশীয় সুবিধাভোগীদের মনে বহমান ছিল বিগত সামন্ততান্ত্রিকতার স্মৃতি, মূলত কৃষিভিত্তিক ও গ্রামকেন্দ্রিক সংস্কৃতির অভিজ্ঞতায় যা ছিল পুষ্ট। বিত্তহীন

বৃত্তিভোগীদের মধ্যেও সামন্ততান্ত্রিকতার স্মৃতি মুছে যায়নি। পূর্বতন গ্রামীণ সংস্কৃতিতে স্থানীয় স্তরে জমিদাররাই ছিলেন শাসক এবং জমিদার ও প্রজার মধ্যে পরস্পরসাপেক্ষ এক সম্পর্কবিন্যাস গড়ে উঠত। জমিদার তাঁর নির্দিষ্ট অঞ্চলেই শাসন করতেন বলে উক্ত অঞ্চলের প্রজাদের কাছে আড়ম্বর-সর্বস্ব পৃথক সম্মান প্রতিষ্ঠার কোনো প্রয়োজন হত না। তা ছিল বংশানুক্রমিক এবং স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু নাগরিক কলকাতায় এঁরা ছিলেন প্রায় সকলেই বহিরাগত এবং ভুঁইফোঁড় 'হঠাৎ নবাব'। ফলে অর্থসর্বস্ব আড়ম্বর আয়োজনের মাধ্যমে সাধারণ নাগরিকের মনে বিস্ময় ও কৌতূহলের সৃষ্টি করে নতুন সংস্কৃতির বৃত্তে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নামতে হল এঁদের। যাঁর যত বিত্ত, তিনি তত বড়ো বাবু নন। যিনি হেলায় সেই বিত্তকে উড়িয়ে-ফুরিয়ে দেন, ব্যয়িত বিত্তের সাবকাশে জড়িয়ে নেন নাগরিক দেশীয় সাধারণদের অনেককেই, তিনিই প্রকৃত 'বাবু'। বিত্তবান, জনগণের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে বিমিশ্র নাগরিক সংস্কৃতিতে দলপতি বা প্রায় প্রভু হয়ে ওঠার কারণেই তাঁরা প্রথমত 'বাবু' হিসাবে আখ্যাত হলেন। পরবর্তীকালের 'বাবু'রা ভিন্ন ভিন্ন রুচি ও স্বভাবধর্মে পৃথকীকৃত হয়ে গেলেও দেশীয় সাধারণের জীবনে এবং মননে সর্বদাই তাঁদের একটি বিশিষ্ট স্থান বজায় থেকেছে— কখনো সদর্থক, কখনো-বা নঞর্থক ভূমিকায়।

ইতিহাসের ধারাক্রম অনুসরণ করলে, ভিন্ন রুচি ও স্বভাবধর্মের বিভিন্নতায় বাবুরা মূলত তিনটি প্রধান দলে বিভক্ত— আদি, নব এবং নব্য। আদিবাবুদের কাল মূলত অষ্টাদশ শতকের শেষদিক থেকে উনিশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত এবং এঁরা মুখ্যত সামন্ততান্ত্রিকতার প্রতিভূ। নববাবুরা এঁদেরই দ্বিতীয় প্রজন্ম কিংবা ভুঁইফোঁড় বিত্তবানদের মধ্যে থেকে উঠে আসা। আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-ধনতান্ত্রিকতার সংস্কৃতিতে পুষ্ট নববাবুরা অনেক পরিমাণে অনিয়ন্ত্রিত এবং আত্মসুখীপরায়ণ। ধনগৌরব এবং খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা এঁদের মধ্যে প্রবল; আবার এ কারণেই অর্থ-বিত্ত দানধ্যানের সূত্রে এঁরা জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তবে নাগরিক বিমিশ্র সমাজে আদিবাবুদের যে প্রবল নিয়ন্ত্রণ ছিল এঁদের আমলে তা প্রায় বিনষ্ট কিংবা অনেকটাই শিথিল। নববাবুরা তাই প্রশ্রয়মূলক উপহাসের দৃষ্টিতে সমালোচিত। এঁদেরই ধারাবাহী তৃতীয় প্রজন্মের দু'একজন এবং মূলত প্রতিষ্ঠাকামী ইংরেজি শিক্ষিত উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় 'নব্যবাবু' হিসাবে উনিশ শতকের চারের দশক থেকে শতক-শেষ পর্যন্ত বাবু বংশের ইতিহাসকে বয়ে নিয়ে চললেন। এই তিনদল বাবুদের মধ্যে নব্যবাবুদেরই রূপভেদগত বৈচিত্র্য রয়েছে; — এঁদের মধ্যে যাঁরা উগ্র পাশ্চাত্যমুখী জীবনদর্শনের সমর্থক ও অনুসরণকারী, তাঁরা বিশুদ্ধ 'নব্যবাবু'; যাঁদের জীবনচর্যায় পাশ্চাত্যের জ্ঞান ও জীবনাদর্শ এবং প্রাচ্যের সংস্কার মোটামুটি সুসাম্য বজায় রেখেছে তাঁরা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবু; আর যাঁদের আকাঙ্ক্ষা থাকলেও উপযুক্ত শিক্ষা কিংবা সুযোগের অভাবে পাশ্চাত্যের জীবনানুকরণ অসম্ভব ছিল, আবার দেশীয় সংস্কার গ্রহণ করতে বাধ্য হলেও তার প্রতি আনুগত্য অবিতর্কিত ছিল না, তাঁরাই শতকশেষের 'কেরানিবাবু'। পরবর্তী শতকে এই 'কেরানিবাবু'রাই মূলধারার বাঙালি সংস্কৃতির ধারকবাহক-পরিচালক। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের মধ্যে আবার যাঁরা উচ্চশিক্ষিত, বিত্ত ও সামাজিক সম্মানে, রাজনৈতিক বোধে-চিন্তায় অগ্রগণ্য, তাঁরা 'এলিট' ভদ্রলোক শ্রেণি, যাঁরা সাধারণ শিক্ষিত, রুচিশীল এবং অগ্রগণ্যদের দ্বারা মূলত নিয়ন্ত্রিত তাঁরা 'প্রান্তিক' মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক' শ্রেণিভুক্ত। ব্রাহ্ম-মতাবলম্বীরা যেহেতু বাঙালিদের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির হাত ধরে প্রগতির পথের প্রথম পথিক, ফলে উনিশ শতকের প্রায় শেষ দশক পর্যন্ত 'এলিট' ও 'প্রান্তিক' উভয় প্রকার 'ভদ্রলোক'বাবুদের সঙ্গে ব্রাহ্মবাবুরা ছিলেন অভিন্নার্থক। কেরানিবাবুদের

কালে অবশ্য বিত্ত বা শিক্ষা 'বাবুত্বে'র মাপকাঠি ছিল না, তা একান্তভাবেই বৃত্তিগত অর্থেই বিশেষত ব্যবহৃত হতে থাকে।

সাধারণ মানস-প্রবণতা ও আচরণগত সুসাম্য অনুযায়ী বাবুদের আবার— (ক) কুলীন বা classical বাবু এবং (খ) অকুলীন বা Intellect Class বাবু এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে প্রায় ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কুলীন বা classical বাবুদের কাল বলা যায়। পূর্ববর্ণিত আদি ও নববাবুরা এই শ্রেণিভুক্ত। সাধারণ লক্ষণ হিসাবে এঁদের মধ্যে— আধা ফিউডাল-আধা ক্যাপিটালিস্ট মনোভাব, নবাবি যুগের অবক্ষয়িত সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ, আপাত রক্ষণশীলতা, বহুব্যয়, পঞ্চ ম-কারের প্রতি আসক্তি, যশ-গৌরব এবং তার জন্য দানধ্যান বাবুয়ানা, নাগরিক বিমিশ্র সমাজে স্ব স্ব প্রভাব বিস্তারের আকাঙক্ষা ইত্যাদি দেখা যায়। এঁরা ইংরেজদের প্রতি অনুগত, নির্ভরশীল কিন্তু অনুসরণকারী নন। এঁদের প্রতিষ্ঠার পশ্চাৎ-এ যেমন শাসকশ্রেণির ভূমিকা ছিল, তেমনি প্রাথমিক পর্বে শাসকের শাসন প্রক্রিয়ার নির্ভার স্থায়িত্বের পিছনে কুলীনবাবুদের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। দানধ্যানে-উৎসব-পার্বণে বিমিশ্র সমাজের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ প্রভৃতির মাধ্যমে সাধারণ জনগণের সঙ্গে এঁদের এমন আত্মিক যোগ গড়ে ওঠে যে, প্রকাশ্যে রক্ষিতাবিলাস, লাম্পট্য, মদ্যাসক্তির মতো আচরণগুলি করলেও, সমসাময়িক কালের বিমিশ্র নাগরিক সমাজে এঁরা অনুযোগমিশ্রিত পরোক্ষ প্রশ্রয়মূলক সমর্থন পেয়ে এসেছেন। সমকালের চোখে এঁরা ছিলেন শ্রদ্ধা, বিস্ময়, আভিজাত্যের প্রতীক। বাবুকেন্দ্রিক মিথের এঁরাই প্রকৃত জন্মদাতা। সামন্ততান্ত্রিক সমাজকাঠামোর অতীত স্মৃতি এঁদের মধ্যে বহমান ছিল। শাসকের প্রতি আনুগত্য বা আকর্ষণ এঁদের জীবনচর্যা থেকে কেন্দ্রীয় সংস্কারের নির্মোক মোচন করতে পারেনি। পরবর্তীকালের চোখে অশিক্ষিত লম্পট, রুচিহীন, অপরিণামদর্শী এই বাবুরা তাঁদের জীবৎকালেই বাবুয়ানির জন্য হয়ে উঠেছিলেন কিংবদন্তী।

অন্যদিকে অকুলীন বা intellect class বাবুদের রূপান্তর ও বৈচিত্র্য বহুস্তরীয়। নব্যবাবু, মধ্যশ্রেণির ভদ্রলোক বাবু, কেরানিবাবু— সকলেই এই শ্রেণিভুক্ত এবং রূপান্তরিত বাবুদের স্তরভেদ। সাধারণ লক্ষণ বিচারে— এঁরা উচ্চমধ্য বা সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণির, আর্থিক কৌলীন্য না থাকলেও শিক্ষাদীক্ষার কৌলীন্যই এঁদের গৌরবের কারণ, মার্জিত এবং আপাত নিয়ন্ত্রিত রুচি ও জীবনদর্শন, প্রথাগত সংস্কার থেকে মুক্ত এবং একইসঙ্গে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বিমিশ্র সংস্কৃতির অনুসরণকারী; চাকুরিজীবী শ্রেণি ফলে আর্থিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ; শাসকদের প্রতি আনুগত্য, জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন সংস্কারমুখী, মদ্যাসক্ত। এঁদের জীবনচর্যায় দ্বিচারিতা প্রকট। কুলীনবাবুদের নানান দোষ-গুণের প্রতি এঁরা আসক্ত, কিন্তু আর্থিক সামর্থ্য দৃঢ় না হওয়ায়, মানসিক সংক্ষোভে এঁরা আপোষকামী। অনৈতিক প্রকাশ্য আচরণগুলি এই বাবুদের কাল থেকে রুচির বদলেও পরিবর্তিত হয়নি, তবে প্রকাশ্য থেকে অপ্রকাশ্য বা গুপ্ত বিলাসিতায় পর্যবসিত হয়েছে মাত্র। আচরিত লক্ষণ হয়েই রইল না, তা হয়ে উঠল অর্জিত গুণ; তখন থেকেই অর্থসম্পদ আর বাবুয়ানার অন্যতম কারণ হয়ে থাকল না, তা হয়ে পড়ল মানসিক আকাঙক্ষার বিশেষ ধরন। ছদ্ম-বাবুয়ানাও অকুলীনবাবুদের মারফত সুলভ হয়ে পড়ল। অকুলীনবাবুরা ছিলেন অর্থনৈতিক কারণেই শাসকশ্রেণির অনুগত, নির্ভরশীল এবং স্বার্থবাহী। একইসঙ্গে গোষ্ঠীগত আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বাতন্ত্রবাদী মনোভাব এঁদের জনমানসের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। আবার আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণেই এঁরা মিতব্যয়ী, একইসঙ্গে রুচিশীল সামান্যতায় অভ্যস্ত। কুলীনবাবুদের উৎকট,

অমার্জিত আত্মকেন্দ্রিকতার থেকে সরে এসে সমষ্টিগতভাবে রুচিশীল বাবুত্বের ভাষা তৈরি করেন এঁরা। কুলীনবাবুরা সমাজে ছিলেন ব্যক্তিনির্দিষ্ট বিচ্ছিন্ন বাবুত্বের ধারক, অকুলীন তথা intellect class বাবুরা সম্মিলিতভাবে একক সমাজের অংশ। বাবুত্বের ব্যক্তিগত আচরণকে এঁরাই সমষ্টিগত নৈর্ব্যক্তিক রুচিধর্মে রূপান্তরিত হতে সাহায্য করেন। যাবতীয় দৃষ্টিভঙ্গিগত সংকীর্ণতা, পক্ষপাতিত্ব এবং স্বাতন্ত্র্যমূলক গোষ্ঠীগত অহমিকা সত্ত্বেও এঁদের সদিচ্ছা, প্রচেষ্টা এবং আন্তরিকতায় ক্ষান্তি ছিল না। আবার এই একই কারণে এঁরা সমসাময়িক সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন। আদি ও নববাবু তথা কুলীনবাবুদের প্রকাশ্য গর্হিত, রুচিহীন বাবুয়ানা যে প্রসন্ন সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিল, অকুলীনবাবুদের জন্য তা আর দেখা যায় না। তীব্র নিন্দা, উৎকট ব্যঙ্গ এবং কুরুচিকর উপহাসের মুখোমুখি হয়েছেন এঁরা। তৎসত্ত্বেও শতাব্দী-কালের বাবুয়ানার কলঙ্ক-মোচন এঁদের পক্ষেই করা সম্ভব হয়েছিল অনেকটাই।

বিশেষ অর্থে 'বাবু' শব্দটির প্রয়োগ নিতান্ত অর্বাচীন। সম্ভবত উনিশ শতকের তিনের দশক থেকে লোকপরম্পরায় মানী ব্যক্তিমাত্রেই 'বাবু' নামে আখ্যাত হতে থাকেন। ইতিপূর্বে অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে বিত্তবান ভূমধ্যকারীদের 'বাবু' নামে চিহ্নিত করার রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। তবে সে সময় কুলীন বা অকুলীন বাবুদের লক্ষণগুলি এই শব্দের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। উনিশ শতকের মধ্যভাগে এটি একাধারে ক. ধনী ব্যক্তিদের উপাধি এবং খ. সুখভোগী বা সুখাসক্ত হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এইসময় সাধারণ বিলাসীরাও যেমন 'বাবু' নামে আখ্যাত হচ্ছিলেন, মান্য ব্যক্তিরাও শিক্ষা, রুচি, স্বাতন্ত্র্যের কারণে 'বাবু' নামে আখ্যাত হতে থাকেন। তবে উনিশ শতকের শেষ দিকে 'এলিট' ভদ্রলোকবাবুরা এই সম্বোধনের পরিবর্তে 'Mr' শব্দটি প্রয়োগেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে থাকেন। সাধারণ কেরানি বা চাকরিজীবী অর্থে এবং নিন্দার্থেও 'বাবু' শব্দটির ব্যবহার হওয়ায় 'এলিট' ভদ্রলোকবাবুরা সম্ভবত আর বাবুত্বের ভার বহন করতে রাজি ছিলেন না। মাত্র একশো বছরের মধ্যেই 'বাবু' তার সম্ভ্রমসূচক আভিজাত্যের আসন ছেড়ে নেমে এসেছিল রাজপথে, সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকবাবুদের পায়ে পায়ে। বাবুত্বের কৌলীন্যও এই সময় থেকেই অস্তমিত হয় সম্পূর্ণভাবেই।

সদর্থে বা কদর্থে— যেভাবেই 'বাবু'দের লক্ষণগুলিকে আমরা দেখি না কেন, একথা অনস্বীকার্য যে, উনিশ শতকে 'বাবু'রা বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতির উজ্জীবক হিসাবে দেখা দিয়েছিলেন। একদিকে যেমন টপ্পা, আখড়াই, হাফ আখড়াইয়ের মতো সাংস্কৃতিক রূপকল্পগুলি বাবুদের হাত ধরেই বাঙালির সংস্কৃতিতে চিরকালীন হয়ে যায়, তেমনি আবার ব্যঙ্গকবিতা, নকশা, নভেল, সাধারণ ও সাংবাদিক গদ্যরচনা, এমনকী লোককবির যাত্রা, পাঁচালি, ছড়া গানেও বাবুদের চিরস্থায়ী প্রভাব লক্ষ করা যায়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ছড়া, গান, পাঁচালি এবং ভবানীচরণের নকশা, কাব্য ইত্যাদি রচনার মাধ্যমে আদি ও নববাবুদের দল ইতিহাসের দৃষ্টিতে বাঙালির সমাজ বিবর্তনের ধারায় মান্যতা অর্জন করেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নকশা, প্রহসন, নাটক, নভেল ইত্যাদির হাত ধরে বাবুর সাংস্কৃতিক বৃত্ত নির্মাণের কাজটি সম্পূর্ণতা পায়। বটতলার অসংখ্য গ্রন্থে, কালীঘাটের পটে, বাবুদের নিজস্ব চাহিদামূলক স্থাপত্যে, বাইজি ও বেশ্যাসংগীতে দ্বিতীয়ার্ধের বহুবিচিত্র বাবুরা চিরন্তন হয়ে ওঠেন। বস্তুত বাঙালি পুরুষের যাবতীয় রূপ-রূপান্তরের আখ্যানের কিছুটা অন্তত বাবু-প্রসঙ্গ ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করলে জানতে পারি। সেইসঙ্গেই একশো বছর ধরে 'বাবু'দের কেমনভাবেই বা দেখলেন সহৃদয় সামাজিক, তারও খতিয়ান মেলে এসব থেকেই।

তা ছাড়া উনিশ শতকের বাঙালি সংস্কৃতি বারবার বাবু-বৃত্তান্ত থেকে রস ও রসদ সংগ্রহ করে পৃথগত্ব লাভ করেছে, সে কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই।

বাঙালি প্রবাদ-প্রবচনে, কবিগানে, এমনকী অমার্জিত ও তথাকথিত শিষ্ট সাহিত্যে কাব্যে-কবিতায় বাবুদের বহুমুখী উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, সমসাময়িক বাঙালি জীবনে বাবুদের কী অপরিসীম প্রভাব ছিল। নিন্দা-মন্দ, খ্যাতি-প্রশংসা সব কিছু নিয়েই বাবুরা ছিলেন এই শতকের বাঙালি জীবনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। উনিশ শতকের প্রথমদিকের কবিদের কাছে 'বাবু' নামটি ছিল মনতোষক। বাবুদের নানান দৃষ্টান্তমূলক চরিত্র 'মহিমা'র কথা বাঁকাভাবে উল্লেখ করলেও তাঁদের সহানুভূতি ও প্রশ্রয়ের প্রসাদ থেকে বঞ্চিত করেননি এই কবিরা। মহিমান্বিত ও বিস্ময়কর বাবুত্বের মিথ নির্মাণে উনিশ শতকের প্রথম দিকের কবিরাও অনেকাংশেই দায়ী। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জনরুচির সামগ্রিক পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তিগত সভাকবির দ্বারা রচিত বাবু- সংকীর্তনের যুগ শেষ হয়। স্বাধীন কবিদের স্বাধীন দৃষ্টিকোণে 'বাবু' হয়ে ওঠেন নিন্দা, ভর্ৎসনা, ব্যঙ্গবিদ্রূপের লক্ষ্য। গুপ্ত কবির ছড়ায়, বটতলার কাব্য-কবিতায় নব্য ও 'ভদ্রলোক' মধ্যশ্রেণির বাবুরা রূঢ়তার সঙ্গে ভর্ৎসিত হলেন। প্রসঙ্গত দেশীয় সংস্কার ও রীতিনীতির প্রতি অন্ধ আনুগত্যের ফলে রক্ষণশীলরা নব্য ও 'ভদ্রলোক'বাবুদের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মকেই বিরুদ্ধতার দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা করেছেন। প্রথমদিকে 'ভদ্রলোক'বাবুরা একপ্রকার ক্ষমাসুন্দর উন্নাসিকতা ও উপেক্ষার মনোভাব নিয়ে এই প্রকার বিরুদ্ধতার বিরুদ্ধে নিশ্চুপ ছিলেন। কিন্তু ক্রমশ তাঁদের মধ্যেই যখন 'এলিট' ও 'প্রান্তিক' দু'টি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে এবং বিশেষ করে 'এলিট' ভদ্রলোকেরা সাধারণ জনগণ তো বটেই, এমনকী 'প্রান্তিক' ভদ্রলোকদের থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে একপ্রকার 'মানসিক অ্যালিয়েনেশন'-এর বলয় গড়ে তুললেও, তখন শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাকি অংশে ক্ষোভ ও আত্মধিক্কার দেখা দেয়। উত্তরকালে এঁদের বড়ো অংশই কাব্যে-কবিতায়, গানে, ছড়ায় পদে পদে বিব্রত, বিপর্যস্ত করে তুলেছেন নিজ শ্রেণিকেই। উনিশ শতকের শেষ দু'টি দশক যেন মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের আত্মদর্শন ও আত্মধিক্কারের দশক। কাব্যে-কবিতায়, গানে তারই চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

প্রথমার্ধে উনিশ শতকের কবিরা পৃষ্ঠপোষক বাবুর কিঞ্চিৎ অনুযোগমিশ্রিত প্রশংসা এবং অন্যান্য বাবুদের প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রূপের হুল ফোটালেও, কোথাও বাবুদের সামাজিক সম্ভ্রমের বিষয়টিও সাধারণভাবে রক্ষিত হত এঁদের রচনায়। প্রত্যক্ষতা ও বাস্তবতা বোধ ছিল এঁদের কবিতা-গানের মূল চালিকাশক্তি। কিন্তু উনিশ শতকের শেষার্ধে মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের প্রতি রক্ষণশীল কবিকুলের আক্রমণ শুধুমাত্র অসম্মান-অপমানেই থেমে থাকেনি, কোথাও কোথাও শালীনতার সাধারণ সীমা অতিক্রম করেছে। অন্যদিকে আত্মসমালোচনায় নিজ শ্রেণির ভণ্ডামি, দ্বিধা ও দোষ-ত্রুটিকে গোপন করেননি শতক শেষের কবিরা। ব্যক্তিনির্দিষ্ট নিন্দা-প্রশংসার পরিবর্তে সমষ্টিগত নিজ শ্রেণির আত্মধ্বংসের চিত্র তুলে ধরে, সার্বিক উত্তরণের পথও নির্দেশ করেছেন কেউ কেউ। বাবুত্বকে তার সামাজিক কলুষতা মুক্ত হতেই হবে, এই অভিপ্রায়ও গোপন থাকে না। যথার্থ Committed শিল্পী হিসাবে বাবুদের দোষ-ত্রুটি মুক্ত আদর্শ পুরুষে পরিণত করার আকাঙ্ক্ষাতেই শতকের শেষদিকের কাব্য-কবিতায় এত ব্যঙ্গ, এত উপহাস।

আমাদের আলোচ্য সীমায়, বাবু-কথা সবচেয়ে বেশি মান্যতা পেয়েছে নকশায় এবং প্রহসনে-নাটকে। সাহিত্যের এই বিশেষ ধারাগুলি উনিশ শতকের সমাজ-মানসের যথার্থ প্রতিফলন হয়ে উঠেছে এবং বিশেষ করে বাবুদের রূপ-রূপান্তরের পর্বগুলি ধরে রেখেছে নৈপুণ্যের সঙ্গে। প্রত্যক্ষ সমাজ-বাস্তবতাই এ

জাতীয় সাহিত্য সংরূপের প্রাণস্বরূপ। যথার্থভাবে অনুসরণ করলে বোঝা যায়, উনিশ শতকের বাবুরা প্রথমদিকে নাগরিক বিমিশ্র সমাজে বিস্ময় ও রোমাঞ্চের সৃষ্টি করলেও, ক্রমে যতই নাগরিক জীবনে পরিশীলন ও রুচির বদল ঘটেছে, ততই বাবুরা তাঁদের নানাপ্রকার দোষ-গুণ, ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে নিন্দাপঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছেন। প্রথমপর্বে ভবানীচরণের উদ্যোগটি বাদ দিলে, উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বের তাবৎ নকশা, প্রহসন ইত্যাদির বাবুকেন্দ্রিক ধারণা ব্যঙ্গমূলক এবং নঞর্থক। শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাবুদের প্রগতিমূলক নানান আন্দোলন ও সংস্কার, এমনকী স্ত্রীশিক্ষা-বিধবা বিবাহের মতো উদ্যোগও রক্ষণশীল, সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমেই উপস্থাপিত। বাবুদের চরিত্রের অন্ধকার দিকের সন্ধান যতটা মেলে, তাঁদের আলোময় প্রাণের আভাস ততটা পাওয়া যায় না।

আসলে, এই শতকে, সমাজের বিশেষ একটি শ্রেণির মধ্যেই শিক্ষা-সংস্কৃতির যথার্থ সম্প্রসারণে জ্ঞান ও চৈতন্যের একটি পৃথক রুচিমান গড়ে উঠেছিল। একে যুগের প্রেক্ষিতে সীমাবদ্ধ রেনেসাঁস বলা যায়। অথচ সমাজের বাকি অংশের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার অভাবে জ্ঞান ও চৈতন্যের সমকেন্দ্রিক ঊর্ধ্বায়ন সম্ভব হয়নি। ফলে এই শ্রেণির কাছে বাবুদের প্রগতিমূলক আচরণ ঐতিহ্যবিরোধী এবং প্রচলিত সামাজিক নীতি-নিয়মের ধ্বংসকামী হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। প্রহসন ও নকশার সিংহভাগ রক্ষণশীলদের তরফে রচিত বলে, বিশেষ করে প্রগতিপন্থী নব্য ও 'ভদ্রলোক'বাবুরা বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রসঙ্গটি সর্বাধিক আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল রক্ষণশীলদের মনে। শিক্ষিতবাবুরা, বিশেষত ব্রাহ্মবাবুরা এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশি উদ্যোগী ছিলেন বলে প্রহসন ও নকশায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা খল, দুষ্ট, ভণ্ড, অধার্মিক হিসাবে চিহ্নিত। একইসঙ্গে সাহেবিয়ানার প্রতি অনুরক্ত বাঙালিবাবুদেরও নাটকে, প্রহসনে, নকশায় তীব্র ব্যঙ্গের অভিমুখ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই সাহেবিয়ানার প্রসঙ্গটিও আবার স্ত্রীস্বাধীনতার সঙ্গে অনেক- সময়েই যুক্ত। এমনও নয় যে, অন্ধ প্রগতিবাদীদের কেউ কেউ সাহেবিয়ানা ও স্ত্রীস্বাধীনতার নামে অনাচার ও উৎকেন্দ্রিকতার পরিচয় রাখেননি। কিন্তু সেই সব ভণ্ড, উগ্র, ছদ্ম-প্রগতিশীল বাবুদের পাশাপাশি প্রকৃত অর্থেই প্রগতিবাদী, উদার মুক্তচিন্তার অধিকারী বাবুরাও যে ছিলেন, রক্ষণশীল সাহিত্যিক কুল নাটক ও প্রহসন লিখতে বসে, নকশার চশমা এঁটে বাবুদের কার্যকলাপের খতিয়ান পেশ করতে গিয়ে সেইসব যথার্থ প্রগতিশীল বাবুদের ইচ্ছাকৃতভাবেই ভুলে থেকেছেন। ফলে এই শতকে সাহিত্যের দর্পণে প্রতিফলিত সমাজের চিত্র পূর্ণ নয়, খণ্ডিত, বহুদর্শী নয়, একদেশদর্শী।

তবে, একথাও ঠিক যে, এই শতকের সাহিত্যসৃষ্টি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্যমূলক। বৃহত্তর অর্থে সামাজিক মঙ্গলসাধনই ছিল মুখ্য। ছদ্ম-প্রগতিশীল বাবুদের ভণ্ডামি, দেখানেপনা, সভ্যতার নামে স্বেচ্ছাচার, সামাজিকতার নামে মদ্যাসক্তি ও বহুগামিতার স্বরূপ তুলে ধরে তাঁরা হয়তো সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয়ই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। এ জাতীয় ভণ্ড-বাবুদের কলুষমুক্ত সমাজের প্রত্যাশা কোনো কোনো নকশা, নাটক, প্রহসনে সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে। কোথাও আবার মেকি বাবুদের কৃতকর্মের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিবিধান করে পাঠকদের এ জাতীয় আচরণ থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুদের প্রতি তাঁদের অভিযোগ এই যে, তাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে দেশীয় আদর্শ, দেশীয় সংস্কৃতিকে হেয়জ্ঞান করছেন এবং একইসঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার নামে অন্দরজীবনের বিশুদ্ধতাকে বিনষ্ট করছেন। বিমিশ্র নাগরিক সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে নারীর 'সতীত্বের' ধারণা ও চারিত্রিক বিশুদ্ধতার প্রসঙ্গটি বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে এবং এর বিপরীত অবস্থানে বাবুদের ভূমিকাকে স্থাপন করে

শ্লেষতিক্ত আক্রমণ শাণিত হয়েছে। রক্ষণশীলদের আশঙ্কা অনেক ক্ষেত্রেই অতিরঞ্জিতভাবে বাবুদের কার্যকলাপকে চিত্রিত করেছে, যা দেখে সাধারণ মানুষ আর বাবুদের দৃষ্টান্ত অনুসরণযোগ্য বলে মনে না করতে পারে। যদিও বাস্তবে, তারপরেও সাধারণ আর্থিক অবস্থানে চিহ্নিত বাঙালি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তরা বাবুদের অমোঘ প্রভাব এড়িয়ে চলতে পারেনি। এই সংকট যতই তীব্র হয়েছে, বাবুদের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলদের প্রতিরোধ ততই উদগ্র হয়ে উঠেছে।

শতকের সূচনায় মদ্যাসক্তি কিংবা বেশ্যাগমনের মতো কার্যকলাপকে বাবুদের 'শখ' বা খেয়ালমাত্র মনে করা হলেও, দ্বিতীয়ার্ধে পৌঁছে ক্রমশ 'নেশা' হয়ে ওঠা এ জাতীয় কৃত্যগুলিকে 'পাপজনক' মনে করে উক্ত আচরণকারী বাবুদেরকে নিন্দিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বাস্তবেও শিক্ষা ও রুচির পরিশীলনের সঙ্গে সঙ্গে বাবুদের আচরণ থেকে এ জাতীয় লক্ষণগুলি বিলুপ্ত হবে বলে আশা করা গেলেও, তা হয়নি। রাজনারায়ণ বসুর মতো কৃতীমানুষের সাক্ষ্য উদ্ধার করে আমরা দেখিয়েছি যে, 'প্রচ্ছন্নভাবে' এ জাতীয় আচরণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অনিবার্যভাবেই, সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নে লেখকেরা এ জাতীয় আচরণকে সমর্থন করতে পারেননি, অতএব খড়্গহস্ত হয়েছেন; আবার যৌন-রোগ নিয়ন্ত্রক 'বেশ্যা-দমন আইন' চালু হলে বাবুরাও মানসিক রোগমুক্ত হবেন, এই সম্ভাবনায় উল্লসিত হয়েছেন। দেখা যাচ্ছে, নকশাকার-প্রহসনকারদের মতে, বিদেশি শাসক বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতির যত না শত্রু, তার চেয়েও বেশি শত্রু হিসাবে 'বাবু'দের চিহ্নিত করা হয়েছে। ইংরেজদের অনুকরণে সংবাদপত্র প্রকাশ, নাটক-নভেল রচনা, সভা-সমিতি গঠন কিংবা স্বাদেশিকতার ধুয়া তুললেই যে প্রগতিশীল, আধুনিক হওয়া যায় না, এ বক্তব্য কেবল নকশা ও প্রহসনকারদেরই নয়, নভেল ও সাধারণ গদ্য লেখকদের লেখাতেও সুপ্রচুর। এমনকী ব্যক্তিগত জীবনে এ জাতীয় আচরণে অভ্যস্ত হুতোমও তাঁর নকশায় সমমনস্ক ও আচরণকারী বাবুদের কটাক্ষ করতে ছাড়েননি এবং 'সাপের মতো ভয়ানক'ও বলেছেন। সাধারণভাবে, শাসকের প্রতি অনুগত থেকেও, শাসক প্রদত্ত টাইটেল বা খেতাবের প্রতি বাবুদের অপরিমেয় মোহ ও প্রতিযোগিতা ভালোভাবে মেনে নিতে পারেনি সমাজ। টাইটেল বা খেতাবের প্রাসঙ্গিকতাকে ক্ষীণভাবে মেনে নিয়েও এ জাতীয় খেতাব লাভের পদ্ধতি ও খেতাব-প্রাপ্তদের যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো এই শতকের সবচেয়ে শক্তিশালী লেখকও জানাতে ভোলেন না যে, উনিশ শতকের মধ্যপর্ব থেকে বাবুত্বের অন্যতম মাপকাঠি এই খেতাব আসলে কার্যকারণ সম্পর্কবিহীন, পরিস্থিতিগত ফলমাত্র। তা ছাড়া, অর্থব্যয়ের গোপন মধ্যস্থতায় কিংবা শাসকের শর্তপূরণের সম্মতিতেও প্রায়শই খেতাব জুটত বাবুদের। হিন্দুসমাজের জাতিভিত্তিক কাঠামোয় প্রান্তিক অবস্থানে চিহ্নিত নিম্নবর্গের মানুষেরাও এই উপায়ে 'বাবুত্ব' লাভ করতেন। বর্ণগৌরবী রক্ষণশীলদের দল 'বাবুত্বে'র এই বিমিশ্রণ আদৌ মেনে নিতে পারেননি। খেতাবিবাবুদের প্রতি তথাকথিত শিষ্ট এবং জনপ্রিয় সাহিত্যেও ব্যঙ্গবিদ্রূপ উচ্চকিত।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাবুদের প্রতি এই অসহিষ্ণুতা রক্ষণশীল বর্ণহিন্দুদের মানসিক প্রতিরোধের ফল। আর্থিক অবস্থানভিত্তিক নতুন সমাজ কাঠামোয় মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'বাবুদের উত্থান কিছুতেই মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না তাঁদের পক্ষে। শিক্ষা ও রুচির হাত ধরে পূর্বতন সামাজিক বিন্যাসের যেকোনো অবস্থানের মানুষ উঠে আসবেন 'বাবুত্বে'র কোঠায়, চালনা করবেন সামাজিক প্রগতির অভিমুখটিকে, এ কঠিন সত্য নিজ গৌরবে মদমত্ত বর্ণহিন্দুদের পক্ষে মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে, 'বাবু'দের চিরচেনা ধরনটিকে প্রতিহত করা প্রায় অসম্ভব জেনে, 'বাবু'দের অস্বীকার করেই বসলেন তাঁরা। শতাব্দী শেষে

পৌঁছে যদিও ভবানীচরণ কথিত ‘নবধা’ লক্ষণ, কখনো ‘অষ্টধা’, কখনো-বা দু’টি-তিনটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যেই এসে ঠেকেছিল এবং বাবুরাও রূপান্তরিত হতে হতে আর্থিক সামর্থ্যের উপযুক্ত বাবুত্বের মাপকাঠিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু রক্ষণশীলদের সম্মিলিত আক্রমণে যখন নির্বিচারে ‘বাবু’ মাত্রেই নিন্দিত হতে শুরু করলেন, তখন শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির বাবুরাও ‘বাবু’ শব্দের দ্বারা আখ্যাত হতে বিব্রত বোধ করতে থাকেন এবং শতক শেষে 'Mr' শব্দ ব্যবহার আসলে নিজেদের সম্মানজনক স্বাতন্ত্র্য সুচিহ্নিত করার অভিপ্রায়েই। তবু, বাঙালি সংস্কৃতিতে ‘বাবু’ ও তাঁর ‘বাবুত্ব’ টিকেই রইল— ভদ্রলোকবাবুদের আচার-আচরণে এবং বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে। শুধু তাই নয়, বাবুত্বের কিছু সাধারণ লক্ষণ— অলসতা, বাগাড়ম্বরসর্বস্বতা, পরজীবীতা ইত্যাদি আপামর বাঙালি পুরুষেরই মানসিক লক্ষণ হিসাবে সুনির্দিষ্ট হয়ে গেল। এভাবে একদল মানুষের আচরণের স্বাতন্ত্র্য, মানসিকতার ভিন্নতা গোটা জাতির সাধারণ ধর্মে পরিণত হওয়ার ঘটনা আধুনিককালে সত্যিই বিরল। ‘বাবু’দের এই সর্বাতিশায়ী গুরুত্বের ব্যাপারটি বাঙালি সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে কোনোভাবেই অস্বীকার করবার উপায় নেই।

নকশা, প্রহসন বা নাটকে বাবুদের প্রতি যেমন ব্যঙ্গবিদ্রূপ, উপহাস-নিন্দার দৃষ্টিকোণ দেখা যায়, নভেল বা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ‘বাবু’কেন্দ্রিক উপন্যাস কিংবা বাংলা উপন্যাসের বাবুরা বাস্তব ও কল্পবাস্তবের প্রকল্পতেই গৃহীত। বাঙালি পুরুষের জীবনযাপনের একটি পৃথক type উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। নানা রূপ-রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে তা প্রবাহিত হয়েছিল উনিশ শতকের শেষেও। ব্যক্তিগত জীবনে শিথিল কিন্তু সাধারণ সামাজিক দৃষ্টিকোণে আদর্শবাদী বা রক্ষণশীল এমন দৃষ্টান্ত সমাজে দুর্লভ ছিল না। প্রগতি ও রক্ষণশীলতা, নৈতিকতা ও কদাচার, আদর্শ ও ভ্রষ্টাচার— মানস-দ্বন্দ্বের এই রূপ নব থেকে নব্য, ভদ্রলোক থেকে কেরানিবাবু, প্রায় সব স্তরেই সমানভাবে লভ্য। নভেল ও উপন্যাসের কথকরা উনিশ শতকে বাবুদের এই দ্বান্দ্বিকতার স্বরূপ উদ্ঘাটনেই বেশি মনোনিবেশ করেছেন এ হেন দ্বন্দ্বের কার্যকারণ বিশ্লেষণ করেননি। প্যারীচাঁদ ‘আলালের ঘরের দুলালে’ নব ও নব্যবাবুদের সৃষ্টি করে বাবুত্বের রূপান্তরগত চালচিত্রটি ধরতে চেয়েছিলেন। তাঁর দেখার মধ্যে সমালোচনার সঙ্গে ছিল সহৃদয়তা। পরবর্তীকালের নভেল-লেখকেরা অনেক বেশি নির্মম, আদর্শবাদী। অতএব একদিকে সামাজিক বাবুদের দ্বিচারী মানসিকতার স্বরূপ প্রকাশ, অন্যদিকে আদর্শবাদী বাঙালি পুরুষের নির্মাণ— বাবুকেন্দ্রিক উপন্যাস এই প্রকল্পেই অগ্রসর হয়েছে। বিশেষ করে লেখকেরা সকলেই ছিলেন রক্ষণশীল হিন্দু, ফলে ব্রাহ্মবাবুরা, যাঁরা ছিলেন প্রগতিপন্থী বাবুদের সিংহভাগ, তাঁরাই হয়ে উঠেছেন ব্যঙ্গবিদ্রূপ সমালোচনার মূল লক্ষ্য। উপন্যাসের প্রেক্ষিতেও প্রগতিশীল বাবুরা কেবল নিন্দিত হয়েছেন, তাঁদের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন ইচ্ছাকৃতভাবেই উপেক্ষিত হয়েছে। ব্যতিক্রম, রমেশচন্দ্র দত্তের মতো দু’একজন যাঁরা এত অন্ধকারের মধ্যেও বাবুদের আলোময় বাস্তবের সন্ধান এনে দিয়েছেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই আদি ও নববাবুদের আপাত রুচিহীন জীবনযাপন সম্পর্কে শাসকশ্রেণির একটি অংশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন দেখা যায় এবং মোটামুটি রকমের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির মধ্যেও বাবু ও তাঁর বাবুয়ানা বড়োসড়ো প্রশ্নের জন্ম দেয়। মিশনারিদের দ্বারা প্রকাশিত পত্রপত্রিকায় ‘বাবু’ বিষয়ক সংবাদে এই অসহিষ্ণুতা গোপন থাকেনি এবং বিশেষত নববাবুদের রুচিহীনতার সংস্কৃতি শিক্ষিত সামাজিকের মনে প্রতিরোধ ও প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিচ্ছে, তা বেশ বোঝা যায়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘কলিকাতা কমলালয়ে’ আপাতভাবে ‘বাবু’দের স্বপক্ষে বিবৃতি দিলেও কড়চা জাতীয় এই গ্রন্থের

প্রশ্নাবলীর মধ্যেই এই অসহিষ্ণুতার ইতিহাস ধরা আছে। নববাবুদের সময়কালের শেষ দিকে তাঁদের জীবনযাপনের মধ্যে ঐতিহ্যাশ্রয়ী সংস্কার ও ধর্মবোধ শিথিল হয়ে পড়েছে দেখা যায়। সম্ভবত তা না হলে, তাঁদের অসংযমের বিলাস সুগম হয়ে উঠত না। ধর্মীয় কৃত্যাদি বা অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখানেপনা উৎকটভাবে বজায় থাকলেও, বিশ্বাসের ভিত্তি আদতে শিথিল ছিল। রক্ষণশীলদের পক্ষ থেকে নববাবুদের প্রতি যতই কেননা সমর্থন জ্ঞাপন করা হোক, তাঁদের প্রতি উত্থিত অভিযোগগুলিকে বাস্তবে পুরোপুরি খণ্ডন করা সম্ভব হয়নি ভবানীচরণের মতো লেখকের পক্ষেও। প্রথম পর্বের প্রবন্ধ, গদ্য-নিবন্ধ, সাংবাদিক প্রতিবেদনের মধ্যে বাবুদের ক্রিয়াকর্মের বিরূপ সমালোচনাও চোখে পড়ত। যদিও বিত্তবান বাবুদের সামাজিক সৎকাজ প্রশংসা ও সমর্থনও পেয়েছে অবিমিশ্রভাবে।

তবে, নব্যবাবুদের প্রতি রক্ষণশীলদের প্রতিক্রিয়া ও বিরূপতার ভাষা ছিল অত্যন্ত তীব্র। সামাজিক অধিকারের প্রশ্নে এই প্রতিক্রিয়া অনিবার্য ছিল। নববাবুদের কাল পর্যন্ত কিছু বনেদি, ভুঁইফোঁড় বিত্তবান কলকাতার বিমিশ্র সমাজের দেশীয় নিয়ন্ত্রক ছিলেন। এক একটি বৃহৎ গোষ্ঠীর উপর তাঁদের প্রভাব নিরঙ্কুশ ছিল। কিন্তু নব্যবাবুদের আবির্ভাবের পরে নাগরিক জীবন-পরিচালনার প্রতি স্তরে যেমন, তেমনি শাসকশ্রেণির শাসন-পরিচালনার ক্ষেত্রেও নব্যবাবুদের অনুপ্রবেশ অনিবার্য সত্য হয়ে উঠেছিল। ইংরেজি-শিক্ষিত নব্যবাবুদের একটি বড়ো অংশই ছিলেন উচ্চমধ্যবিত্ত কিংবা সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে আগত; ফলে তাঁদের বিত্তসম্পত্তিও ছিল নির্দিষ্ট। এই সময় থেকেই নগরকলকাতার বড়ো অংশের উপর রক্ষণশীলদের যাবতীয় প্রতিরোধ সত্ত্বেও নববাবুদের প্রভাব তথা মধ্যশ্রেণির প্রভাব বাড়তে থাকে। নববাবুদের প্রতি সাধারণ সামাজিকের শ্রদ্ধা ও আস্থা শিথিল না হলে যা এত সহজে ঘটা সম্ভব ছিল না। অতএব, সাধারণ সামাজিকের একটি অংশের প্রত্যক্ষ কিংবা প্রচ্ছন্ন সমর্থনে উনিশ শতকীয় কলকাতার বিমিশ্র সমাজে মধ্যশ্রেণির অধিকার সুচিহ্নিত হয়ে পড়ে। উনিশ শতকের শেষপর্যন্ত রক্ষণশীলদের মোড়কে বনেদিবাবুরা এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফলও হন, কিন্তু শেষপর্যন্ত বিশ শতক আসতে না আসতেই মধ্যশ্রেণির বাবুদের নিরঙ্কুশ অধিকার বাঙালির সামাজিক জীবনের প্রতিষ্ঠিত সত্যে পরিণত হয়। তবে একইসঙ্গে নব্যবাবুদের দৃষ্টান্তে উঠে আসা শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের উৎকট সাহেবিয়ানা, অনাচার, লাম্পট্য (যেসব গুণ প্রকৃত নব্যবাবুদের মধ্যে আশা করা যেত না, কেবল সাহেবিয়ানার প্রতি মোহ ছাড়া) ইত্যাদিকে বারংবার তুলে ধরে রক্ষণশীলদের প্রতিরোধ ও সমালোচনাও অব্যাহত থাকে। উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে প্রহসন, নাটক, গল্প, উপন্যাসের মতো রম্যরচনা, গদ্য, নিবন্ধেও যার ফলে নব্যবাবু এবং শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের প্রতি বিদ্রূপ-কটাক্ষ, তির্যক পরিহাসের প্রাচুর্য। তবে, রাজনারায়ণ বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখদের রচনায় আপাত তারল্যের আড়ালে 'বাবু' ক্রমশই সিরিয়াস বিষয় হিসাবে উঠে আসছে এবং 'বাবু' হয়ে উঠছেন বাঙালি পুরুষের প্রায় সমার্থক একটি গোত্র। উনিশ শতকের শেষপর্বে এবং বিশ শতকের সূচনায় 'বাবু' বিষয়ে সিরিয়াস নিবন্ধ লিখে তাঁদের জীবনাচরণের নানাদিকে যেমন আলো ফেলে দেখা হচ্ছে, তেমনি সমাজজীবনে তাঁদের ভূমিকা ও প্রভাবের পুনর্মূল্যায়নও হচ্ছে দেখা যায়। এমনকী বাঙালিবাবুদের শেষ পরিণতি যে কেরানি-জীবন, তা-ও গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে দেখা যায়। সেইসঙ্গে, বিশেষ করে, জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভূমিকায় মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক' বাবুদের ভূমিকার সবচেয়ে বেশি সমালোচনা ও পর্যালোচনার আধিক্যও চোখে পড়ে। সমর্থনের চেয়ে বিরূপতা সেই

আলোচনায় বেশি, ভণ্ডামি, অসততার দিকটিও উঠে এসেছে, কিন্তু সামাজিক গঠনমূলক কাজের দিকটি হয় ইচ্ছাকৃতভাবেই অনালোচিত থেকে গেছে, নয় নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখানো হয়েছে। রক্ষণশীল লেখকদের এই দৃষ্টিই প্রমাণ করে তাঁদের আশঙ্কার ব্যাপকতাকে এবং একইসঙ্গে মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের ভূমিকার সবচেয়ে বেশি সমালোচনা ও পর্যালোচনার আধিক্যও চোখে পড়ে। সমর্থনের চেয়ে বিরূপতা সেই আলোচনায় বেশি, ভণ্ডামি, অসততার দিকটিও উঠে এসেছে, কিন্তু সামাজিক গঠনমূলক কাজের দিকটি হয় ইচ্ছাকৃতভাবেই অনালোচিত থেকে গেছে, নয় নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখানো হয়েছে। রক্ষণশীল লেখকদের এই দৃষ্টিই প্রমাণ করে তাঁদের আশঙ্কার ব্যাপকতাকে এবং একইসঙ্গে মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের নির্বিচার প্রসারতাকে। সময়ের অনিবার্য প্রভাবে মধ্যশ্রেণির মধ্যে 'এলিট' ও 'প্রান্তিক' দুই উপবিভাগ গড়ে উঠলে পরস্পরের প্রতি অসূয়া ও বিরূপতার ছবিও সহজলভ্য হয়। আবার মধ্যশ্রেণির বাবুদের মধ্যে আত্মসমালোচনার ছবিটিও দুর্লভ নয় তেমন। হুতোম যেমন ক্ষয়িষ্ণু নববাবুত্ব এবং দিগ্‌ভ্রান্ত নব্যবাবুত্বের ছবি উপস্থিত করে আত্মসমালোচনায় মুখর হন, সমসাময়িক নকশা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা ইত্যাদিতেও এ জাতীয় মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশ ব্যাপকতা লাভ করে। এরই অবকাশে হিন্দু পুনরুত্থানবাদ জাতীয়তাকামী, আদর্শ পুরুষ চরিত্র উপস্থিত করে সুকৌশলে 'ভদ্রলোক'বাবুদের আদর্শায়িত ধারণার বলয়ের বাসিন্দা হতে প্রলুব্ধ করে। এই আদর্শায়িত ধারণার প্রভাবেই বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই বাঙালি শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'বাবুরা চরমপন্থার উদ্ভ্রান্ত আদর্শ নিয়ে শাসকশ্রেণির প্রতি সংগ্রামে লিপ্ত হন। যদিও অলস, কর্মবিমুখ, কল্পনাবিলাসী, নিশ্চেষ্ট, পরিণামবোধহীন বাবুদের এই চরমপন্থী ভূমিকা শেষপর্যন্ত দিবাস্বপ্নে পরিণত হয়েছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে, মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের মধ্যে যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল, উৎকট সাহেবিয়ানার সঙ্গে দেশীয় সংস্কৃতি ও সংস্কারের যে হাস্যকর বিমিশ্রণ সম্ভব করে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন তাঁরা, সেটাই শেষপর্যন্ত তাঁদের উপহাসিত করেছিল। বাবুদের এই ভূমিকার প্রভাবেই কালিঘাটের পট কিংবা বাইজিপাড়ার গানেও বাবুদের এই আলো-আঁধারি কখনো বঙ্কিম কটাক্ষে, কখনো ক্ষমাহীন তির্যকতায় উপস্থাপিত হয়েছে। বাঙালির উনিশ শতকীয় সংস্কৃতির প্রায় এমন কোনো ক্ষেত্র অনুপস্থিত, যেখানে বাবুদের প্রভাব পড়েনি। এমনকী, বাবুদের অট্টালিকা, গৃহসজ্জা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও দেশজ সংস্কৃতির সঙ্গে ইউরোপীয় সংস্কৃতির মেলবন্ধন এক বিশেষ স্থাপত্যরীতি ও জীবনযাপনের সূচনা করেছিল, স্বীকার করতেই হবে। আখড়াই, হাফ-আখড়াই কিংবা টপ্পাগানেও বাবুসংস্কৃতির সেই অনিবার্য আত্মপ্রকাশ। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, আপাত ধর্মজ্ঞানহীন, শিথিল চরিত্র বাবুদের প্রভাবেই ধর্মকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যসংস্কৃতি ব্যক্তিগত হৃদয়ের তাপ-উত্তাপের কথায় সরে এসেছিল। উনিশ শতকের গীতিকাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাবের কথা বলা হয়, অথচ নিধুবাবুর টপ্পায়, হাফ আখড়াইদের ব্যক্তিগত কথনে গীতিকাব্যের দেশীয় বীজভূমি যে আগেই প্রস্তুত ছিল, এবং তার পিছনে 'হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল' বাবুদের ভূমিকা কম ছিল না, এ সত্যটি স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি 'বাবু'দের প্রতি সমালোচনায় মুখর হয়েও তাই 'বাবু'দের প্রভাবকে আদৌ এড়িয়ে যেতে পারেনি। গানে-গল্পে, চিত্রে-কবিতায়, প্রহসন, নকশায় সতত সেই প্রভাব প্রত্যক্ষগোচর।

বাবুদের প্রতি শাসকশ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উপযোগিতাবাদমূলক। নিজ স্বার্থেই তাঁরা বাবুদের নানান রূপ-রূপান্তরকে গ্রহণ, পরিমার্জন ও সমর্থন করেছেন। কিন্তু বাবুদের গ্রহণ করলেও, 'বাবুত্বের' প্রতি বা

'বাবুয়ানা'র প্রতি তাঁদের যে মোহ ও শ্রদ্ধা ছিল না, এ সত্য অনস্বীকার্য। কিছু বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম ছাড়া রুচিহীন জীবনদর্শন, উৎকট দেখানেপনা ও অশিক্ষিত 'বাবুত্বে'র প্রতি শিক্ষিত-সম্ভ্রান্ত শাসককুলের বিতৃষ্ণা ও বক্রোক্তির পরিচয় সহজলভ্য। অন্তত প্রথম পর্বে সাহেব সাজতে চাওয়া দেশীয় বাবুদের প্রতি শাসককুলের গোপন ঘৃণা প্রায়শই প্রত্যক্ষ। ইতিহাসও বলে, শিক্ষিত বাঙালি 'ভদ্রলোক'বাবুদেরও সিভিল সার্ভিসে যোগদানের অধিকার দিতে, সরকারের উচ্চপদে নিয়োগের ক্ষেত্রে দ্বিধা ও বিরুদ্ধতা উনিশ শতকের শেষ পর্যন্তও শাসকশ্রেণির মধ্যে বর্তমান ছিল। বাবুদের জন্য শিক্ষার সুযোগকে পরিকল্পিতভাবে সম্প্রসারিত করার মূল লক্ষ্য মানসিক চেতনার মুক্তি কিংবা সামাজিক কল্যাণসাধন নয়, নিতান্তই পরাশ্রয়ী, অনুকরণপ্রিয়, অনুগত কেরানির চাহিদাপুরণ, এ গোপন সত্য শাসককুলের আচার-আচরণ-বক্তব্যে বারবার প্রকাশিত হয়েছে। ফলে নিজ স্বার্থেই, কম মজুরিতে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদাপূরণের লক্ষ্যেই মেকলের অভিসন্ধিমূলক শিক্ষানীতি বাঙালি বাবুদের নতজানু কেরানিতে পর্যবসিত করেছিল। বাঙালির মানসিক সংস্কৃতির ইতিহাসে 'বাবু'দের রূপ-রূপান্তরের গুরুত্ব অনস্বীকার্য হলেও, সাহেব-প্রভুদের কাছে বাঙালিবাবুরা বৈশিষ্ট্যহীন, আপাততুচ্ছ হিসাবেই বিবেচ্য থেকে গেছেন। 'বাবু'দের জন্য title বা খেতাব-দান তাঁদের প্রতি শাসকের শ্রদ্ধা বা সমর্থনের ফল নয়, শাসকের প্রতি আনুগত্যকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দান এবং সেইসঙ্গেই আত্মাভিমানী শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের মধ্যে আবার 'খেতাবধারী' এলিট বাবুদের উপবিভাগ গড়ে তুলে তাঁদের ভিতর মানসিক বিচ্ছিন্নতার বীজ বপন। উনিশ ও বিশ শতকে বাঙালিবাবুদের নানান আন্দোলনে এইরকম এলিট বাবুত্ব ও মানসিক বিচ্ছিন্নতাই আন্দোলনের সাফল্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমন পরিবেশে সংগতভাবেই শাসক- বিরুদ্ধ আন্দোলন গোড়া থেকেই পঙ্গু হয়ে গেছে এবং একইসঙ্গে পারস্পরিক তিক্ততায় মত্তবাবুদের বুদ্ধিহীনতার সুযোগে শাসকের পক্ষে ঔপনিবেশিক শোষণের কাজটি দ্রুত ও ফলপ্রসূ হতে পেরেছে।

উনিশ শতকের প্রারম্ভে বাবুদের ইতিহাস নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছিলেন ভবানীচরণ, তাঁর 'কলিকাতা কমলালয়' ও 'নববাবুবিলাস' গ্রন্থের মাধ্যমে, মধ্যপর্বে হুতোম তাঁর নকশায় বাবুত্বের প্রায় শতাব্দীকালের বিবর্তন, রূপ- রূপান্তরকে ধরে রাখলেন এবং শতকের উপান্তে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ক্ষুদ্র অথচ তাৎপর্যপূর্ণ 'বাবু' নিবন্ধের মাধ্যমে বাঙালিবাবুদের রূপান্তরের ক্ল্যাসিক আদল ও নব্য পরিণতির কথা বলে এই ইতিহাস রচনায় আপাত সমাপতন টেনেছেন। বাবুদের এই ইতিহাস আপাতভাবে নিরপেক্ষ নয়। লেখকেরা প্রায়শই রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের প্রতিনিধি। ফলে বাবুদের অসংযত বাবুয়ানার প্রতিও তাঁদের ক্ষোভ, তেমনি ব্রাহ্মবাবুদের ধর্মীয় সমানুভূতির তত্ত্বও তাঁদের কাছে নিন্দনীয়। এহেন একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাবুদের ইতিহাস নির্মাণ ও পর্যালোচনা আদৌ সংগত নয়। তবে আশার কথা এই যে, বাদপ্রতিবাদমূলক রচনাগুলির বিশ্লেষণে, স্মৃতিকথা-ইতিহাস ও চিঠিপত্রাদির মারফতে উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতিতে বাবুদের অবদান ও প্রভাব যে বিস্ময়কর, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। বৃহত্তর অর্থে, বাঙালি পুরুষের মানসিকভাবে 'হয়ে ওঠা'র আখ্যান বাবুকেন্দ্রিক এই ইতিহাসের প্রেক্ষাপটেই লভ্য। তবে সে 'পুরুষ' সামাজিক সুবিধাভোগী পুরুষ, সাধারণ 'আম-জনতা' নয়। বিত্তের হাত ধরে, শিক্ষার হাত ধরে, রুচিমানতায় সাধারণের মধ্যে 'বিশেষ' হয়ে ওঠা পুরুষ 'বাবু'। বিত্ত বাবুত্বের পথকে মসৃণ করে সত্য, কিন্তু বিত্ত থাকলেই বাবুত্বকে অর্জন করা যায় না, বাবুত্ব এক ধরনের মানসিকতা, যা কাজে-কর্মে, আচার-আচরণে নিজেকে তুলে ধরতে চায়, সাধারণের চোখে নিজের আত্মভোগকে প্রতিষ্ঠা দিতে চায় এবং

সাধারণ সামাজিকের গতানুগতিক জীবনযাপনের ছকের বাইরে গিয়ে স্বতন্ত্র জীবনাচরণের অভ্যাস গড়ে তোলে। হতে পারে সেই আত্মভোগ বা জীবনাচরণের অভ্যাস সাধারণের চোখে কদাচার ও নঞর্থক জীবনসত্যের বহিঃপ্রকাশ অথবা গতানুগতিক প্রথাবদ্ধতার বিরুদ্ধ কিছু, কিন্তু বাবুত্বনামক 'বিশেষ' মানসিকতার গুণ যিনি অর্জন করেছেন, সেই 'বাবু'র কাছে সাধারণের সমালোচনা বা দৃষ্টিভঙ্গির ইতর-বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। 'বাবু' কেবল নিজেকে দেখতে চান, নিজেকে নিয়ে ভাবতে চান এবং অবশ্যই সাধারণের সামনে 'নিজে'কে নিরঙ্কুশভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। এক ধরনের আত্মরতি ও অহমিকা ফলত বাবুদের মানসিক গড়নের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। উনিশ শতকের কলকাতায় ভিড় জমানো অসংখ্য সাধারণ মানুষের মধ্যে একদল মানুষ আর্থ-সামাজিক পরিবেশ পরিস্থিতির সুযোগে 'বাবুত্ব' নামক উল্লিখিত মানসিকতার অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন অথবা অর্জন করেছিলেন। প্রান্তেবাসী মানুষেরা এঁদের তাই বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখেছে, দলস্থ হয়েও বাবুত্ব যাঁদের কাছে অধরাই থেকে গেছে তাঁরা এঁদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত বা সমালোচনায় কঠোর হয়ে উঠেছেন, আর 'বাবুরা' আপন আপন অভ্যাসের গড়ে তোলা বলয়ে নিশ্চিন্ত থেকেছেন। আত্মগ্লানি জন্মেছে কারোর কারোর মধ্যে, কেউ-বা তার দরুন দলছুট হয়েছেন, কেউ ঈষৎ অস্বস্তিতে বদলে ফেলেছেন বলয়ের বাহ্যগড়ন, কিন্তু যা বস্তুত 'মানসিকতা' বিশেষ, তা মুছে যায়নি কখনোই। নিত্য নতুন উপায়ে, ভিন্ন স্বাতন্ত্র্যে তা নিজেকে প্রকাশ করেছে। বস্তুত, 'বাবুত্ব' বাঙালির এমন এক অর্জন, যা মানসিক সংস্কারের মতো কেবল উনিশ শতকের কোঠাতেই আটকে থাকেনি, বাঙালি পুরুষের বিশেষ মানস-লক্ষণ হিসাবে চিরস্থায়িত্ব অর্জন করেছে। 'বাবু'রা তার দরুন নিছক অষ্টাদশ-উনিশ শতকের উপজাত হিসাবেই নয়, বাঙালি  মনন ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবেও উত্তরকালে অধিগৃহীত।

আমাদের সংক্ষিপ্ত গবেষণায় আমরা দেখতে চেয়েছিলাম, উনিশ শতকের 'বাবু' ও তাঁর বাবুত্ব বিশেষ কিছু কর্মকেন্দ্রিক গোত্রবিশেষ, না কি এক ধরনের বিশেষ মানসিকতা, উত্তরকালের বাঙালি মানসে যা পরিগৃহীত ও লালিতপালিত হয়েছে। উনিশ শতকের সমাজ ও সাহিত্যের সাক্ষ্যে আমরা বলতে পারি, 'বাবু'রা দেখা দিয়েছিলেন 'বিশেষ' হিসাবে, কিন্তু তাঁদের অর্জিত 'বাবুত্ব' নির্বিশেষ মানসিকতার রূপে বাঙালি-মননের চিরস্থায়ী লক্ষণবিশেষ হয়ে উঠেছে। কালের বিচারে উনিশ শতকের ঐতিহাসিক 'বাবু'দের দল না থাকলেও, 'বাবুত্বে'র অনুধ্যান বাঙালি মধ্যশ্রেণির 'ভদ্রলোক'বাবুদের মধ্যে আজও বহমান; সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কেবলমাত্র যার বাহ্য রূপটির পরিমার্জন ও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটেছে, নচেৎ উনিশ শতকের 'বাবু'রা বেঁচে আছেন আজকের বাঙালির জীবনযাপনে ও মানসিকতায়।

# পরিশিষ্ট

**অ-আ**

- অজ্ঞাত [হরনাথ ভঞ্জ?]— 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়', ১ম খণ্ড, রায়, অলোক সম্পা., গ্রন্থন সংস্করণ, পুনঃপ্রকাশ ১৯৭৯, গ্রন্থন, কলকাতা।
- আত্‌হার আলি, এস.— আওরঙ্গজেবের সময়ে মুঘল অভিজাত শ্রেণি, অনু: দে, অরুণ কুমার, পুনর্মুদ্রণ ২০১২, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোং, কলকাতা।
- চৌধুরী, আবুল আহসান— 'কাঙাল হরিনাথ মজুমদার নির্বাচিত রচনা', প্রথম সংস্করণ ১৯৯৮, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

**ও-ঔ**

- ওদুদ, কাজী আবদুল— 'ব্যবহারিক শব্দকোষ', তৃতীয় সংস্করণ ২০০৯, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, কলকাতা।

**ক-খ**

- কর, বঙ্কবিহারী— পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত, পুনর্মুদ্রণ ২০০৩, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলকাতা।
- কবিরাজ, নরহরি— 'বাংলার জাগরণ ও ভদ্রলোক', উনিশ শতকের বাংলার জাগরণ, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৯, কে. পি বাগচী অ্যান্ড কোং।
- কুমার, শ্রীমদনমোহন— ভারত মার্কিন বাণিজ্যের পথিকৃৎ রামদুলাল দে, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা।

**গ**

- গঙ্গোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র, 'গিরিশচন্দ্র'; মজুমদার, স্বপন সম্পাদিত, দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
- গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র— 'বাংলার নারী-জাগরণ', পুনর্মুর্দ্রণ ১৯৯৭, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলকাতা।
- গঙ্গোপাধ্যায়, মোহনলাল, 'দক্ষিণের বারান্দা', পুনর্মুদ্রণ ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, বিশ্বভারতী, কলকাতা।
- গুপ্ত. ক্ষেত্র— মধুসূদন রচনাবলী, একাদশ মুদ্রণ ১৯৯০, সাহিত্য সংবাদ, কলকাতা।
- গুপ্ত, ক্ষেত্র ও গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ সম্পা., 'অমৃতলাল বসুর শ্রেষ্ঠ প্রহসন', পুঁথি প্রকাশনা ১৯৯৪, কলকাতা।
- গুপ্ত, বিপিনবিহারী, 'পুরাতন প্রসঙ্গ',বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার সম্পা., প্রথম পুস্তক বিপণি সংস্করণ ১৯৮৯, পুস্তকবিপণি, কলকাতা।
- গুপ্ত, রাধাপ্রসাদ—'বাবু-বৃত্তান্ত', 'বিষয় কলকাতা', প্রথম সং ১৯৯৩, জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, কলকাতা।
- গুহ, নিখিলেশ এবং পাল, রাজনারায়ণ— যদুনাথ সরকার রচনা সম্ভার, প্রথম সংস্করণ ২০১১, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।
- গোস্বামী, ড. জয়ন্ত—'সমাজচিত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন', প্রথম সংস্করণ ১৩৮১ বঙ্গাব্দ, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা।

**ঘ**

- ঘোষ, দীপঙ্কর ও ভট্টাচার্য, মিহির এবং ঘোষ, দীপঙ্কর সম্পাদিত, 'বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়', প্রথম সংস্করণ ২০০৪, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতা।
- ঘোষ, বারিদবরণ— ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, প্রথম সংস্করণ ১৯৯০, জিজ্ঞাসা, কলকাতা।
- ঘোষ, নবকৃষ্ণ— প্যারীচরণ সরকার ও চট্টোপাধ্যায়, সুদিন সম্পাদিত, ভারতী দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০২, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা।
- ঘোষ, বিনয়— 'কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত', ২য় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, বাক্ সাহিত্য, কলকাতা।
- ঘোষ, বিনয়— বাংলার নবজাগৃতি, চতুর্থ মুদ্রণ ১৪০২ বঙ্গাব্দ, ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।
- ঘোষ, বিনয়— বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, ২য় সংস্করণ ২০০৭, প্রকাশ ভবন, কলকাতা।
- ঘোষ, বিনয়— সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১ম খণ্ড, বর্ধিত ও মার্জিত সংস্করণ ১৯৭৮, প্যাপিরাস, কলকাতা।
- ঘোষ, বিনয় সংকলিত, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', ২য় খণ্ড, বর্ধিত ও মার্জিত সংস্করণ ১৯৭৮, প্যাপিরাস, কলকাতা।

- ঘোষ, বিনয়—'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', ৩য় খণ্ড, প্যাপিরাস সংস্করণ ১৯৮০, প্যাপিরাস, কলকাতা।
- ঘোষ, বিনয়—'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', ৪র্থ খণ্ড, পাঠভবন সংস্করণ ১৯৬৬, পাঠভবন, কলকাতা।
- ঘোষ, বিনয়— 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', ৫ম খণ্ড, প্যাপিরাস সংস্করণ ১৯৮১, প্যাপিরাস, কলকাতা।
- ঘোষ, বিনয়— 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', ৬ষ্ঠ খণ্ড, প্যাপিরাস সংস্করণ ১৯৮৩, প্যাপিরাস, কলকাতা।
- ঘোষ, বিনয়— 'টাউন কলকাতার কড়চা'; কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৯, বাক্ সাহিত্য প্রাঃ লিঃ কলকাতা।
- ঘোষ, মন্মথনাথ— মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্রথম পারুল সংস্করণ ২০০৮, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা।
- ঘোষ, লোকনাথ— 'কলকাতার বাবু-বৃত্তান্ত'; সেন, শুদ্ধোদন অনূদিত, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৩, অয়ন, কলকাতা।
- ঘোষ, সিদ্ধার্থ— 'বেলুনে বিবি, বাঙালি ও সাহেব ভায়া', কলের শহর কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।


### চ-জ


- চক্রবর্তী, ঘনরাম— শ্রীধর্ম্মমঙ্গল; মহাপাত্র, পীযূষকান্তি সম্পাদিত ২০১২, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।
- চক্রবর্তী, নিরঞ্জন— 'উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য', ১ম সংস্করণ ১৮৮০ শকাব্দ, কলকাতা।
- ???
- চক্রবর্তী, রমাকান্ত— 'নিধুবাবু ও তাঁর টপ্পা', প্রথম পুনশ্চ সংস্করণ ২০০১, পুনশ্চ, কলকাতা।
- চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ— 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত', তৃতীয় দে'জ সংস্করণ ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ, দে'জ, কলকাতা।
- চট্টোপাধ্যায়, বটকৃষ্ণ— ব্রাহ্মগণ হিন্দু কি না?, ১২/১ নং রামকিষণ দাসের লেন কলিকাতা নিউ আর্টিস্টিক প্রেস হইতে শ্রী শরৎকালী রায় দ্বারা মুদ্রিত ও ১৭ নং ভুবনমোহন সরকারের লেন হইতে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত।
- চট্টোপাধ্যায়, বসন্তকুমার— 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি', পাল, প্রশান্তকুমার সম্পা,. প্রথম সুবর্ণরেখা সংস্করণ ২০০২, সুবর্ণরেখা, কলকাতা।
- চট্টোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রকুমার— 'স্মৃতিতে সেকাল', মুখোপাধ্যায়, প্রবীর সম্পা., প্রথম সংস্করণ ২০০৯, চর্চাপদ, কলকাতা।
- চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার— 'পরিচ্ছদের ইতিহাস আলোচনা', সাংস্কৃতিকী', চতুর্থ খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
- চট্টোপাধ্যায়, সূর্যকুমার— 'কালীক্ষেত্র-দীপিকা'; ভৌমিক, হরিপদ সম্পাদিত, প্রথম শশধর সংস্করণ ২০০৮, শশধর প্রকাশনী, কলকাতা।
- চৌধুরী, প্রথম— প্রবন্ধ সংগ্রহ, পুনর্মুর্দ্রণ ২০১৩, বিশ্বভারতী, কলকাতা।
- চৌধুরি, সত্যজিৎ এবং সেনগুপ্ত, নিখিলেশ সম্পাদিত— হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাসংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৯, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।
- চৌধুরী, সুশীল— 'নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদ', প্রথম সংস্করণ ২০০৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।


### ট-ঠ


- ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ— ঘরোয়া; অবনীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, প্রকাশ ভবন, কলকাতা।
- ঠাকুর, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী, অফবিট দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ ২০০৫, অফবিট পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৭৪-৭৫।
- ঠাকুর, টেকচাঁদ (জুনিয়ার)— 'কলকাতার নুকোচুরি', বসু, কাঞ্চন সম্পাদিত, 'দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ', প্রথম খণ্ড, পঞ্চম মুদ্রণ ২০০১, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা।
- ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ— 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী', আমেদ, অসীম, স্পাদিত, ৪র্থ চ্যারিয়ট সংস্করণ ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, চ্যারিয়ট ইন্টারন্যাশনাল, কলকাতা।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ— 'আত্মশক্তি', রবীন্দ্র-রচনাবলী ২য় খণ্ড, সুলভ সং, পুনর্মুর্দ্রণ ১৪০২ বঙ্গাব্দ, বিশ্বভারতী, কলকাতা।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ— 'জীবনস্মৃতি', রবীন্দ্রনাথ-রচনাবলী ৯ম খণ্ড, সুলভ সং, পুনর্মুর্দ্রণ ১৪০২ বঙ্গাব্দ, বিশ্বভারতী কলকাতা।

- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ— 'মানসী', রবীন্দ্র-রচনাবলী ১ম খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ১৪০২ বঙ্গাব্দ, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

ড

- ডি'রোজ, জি এ উইলসন— 'অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সমাজের রাজনৈতিক উৎপত্তি'; 'বিষয় কলকাতা', প্রথম সংস্করণ ১৯৯৩, জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, কলকাতা।

ত

- তুঙ্গ, ড. সুধাংশুশেখর— সম্পা., 'বাংলার বাইরে বাংলা গদ্যের চর্চাঃ ষোড়শ-অষ্টাদশ শতক, ১৯৮৫, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।
- ত্রিপাঠী, অমলেশ— স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭), ষষ্ঠ মুদ্রণ ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।

দ

- দত্ত, কল্যাণী— থোড় বড়ি খাড়া, চতুর্থ মুদ্রণ ২০০৪, থীমা, কলকাতা।
- দত্ত, নারায়ণ— জন কোম্পানির বাঙালি কর্মচারী, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৬, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা।
- দত্ত, প্রাণকৃষ্ণ— কলিকাতার ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য রচনা; বসু, দেবাশিস সম্পা., পুস্তক বিপণি প্রথম সংস্করণ ১৯৯১, পুস্তক-বিপণি, কলকাতা।
- দত্ত, বিজিতকুমার এবং দত্ত, সুনন্দা সম্পাদিত— 'মানিকরাম গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল', ২০০৯ মুদ্রণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
- দত্ত, ভবতোষ সম্পাদিত— ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী, আকাদেমি সংস্করণ ১৯৯৮, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।
- দত্ত, মহেন্দ্রনাথ— কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা, চতুর্থ মুদ্রণ ১৯৮৩, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, কলকাতা।
- দত্ত, যতীন্দ্রমোহন— যমদত্তের ডায়ারী ও অন্যান্য রচনা; ভট্টাচার্য, কৃশানু সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ২০০৬, রীতা প্রকাশনী, কলকাতা।
- দত্ত, রমেশচন্দ্র— 'রমেশ রচনাবলী' বাগল, যোগেশচন্দ্র সম্পাদিত, পঞ্চম মুদ্রণ ১৯৯০, সাহিত্য-সংসদ, কলকাতা।
- দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন— 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান', ২য় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ ১৯৯৪, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।
- দাশ, ড. নির্মল সম্পাদিত— যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু রচনাবলী, ২য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ১৯৮২, গ্রন্থমেলা, কলকাতা।
- দাস, সুনীল সম্পাদিত— মনোমোহন বসুর অপ্রকাশিত ডায়েরি, প্রথম সংস্করণ ১৯৮১, সাহিত্যলোক, কলকাতা।
- দাস, প্রফুল্লকুমার সম্পা., 'বর্তমান সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্য', 'শিবনাথ শাস্ত্রীর অপ্রকাশিত বক্তৃতা ও স্মারকলিপি', কলকাতা, ব্রাহ্মসমাজ, ১৯৭৫ দ্র.।
- দাস, স্বপনকুমার— ''কলকাতার পাখি''; 'বিষয় কলকাতা', জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৩, কলকাতা।
- দেববাহাদুর, রাজা বিনয়কৃষ্ণ— 'কলিকাতার ইতিহাস'; অনুবাদ— মিত্র, সুবলচন্দ্র, তৃতীয় সংস্করণ ২০০১, চক্রবর্তী অ্যান্ড চ্যাটার্জি কোং, কলকাতা।
- দেবী, সৌদামিনী— পিতৃস্মৃতি, প্রথম দে'জ সংস্করণ ২০১১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
- দাসগুপ্ত, জয়ন্তকুমার সম্পাদিত— 'বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ', পুনর্মুদ্রণ ২০০৯, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

ধ

- ধর, জহরলাল, 'সচিত্র কলিকাতা রহস্য', প্রথম পরশপাথর সংস্করণ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, পরশপাথর প্রকাশন, কলকাতা।

ন

- নন্দী, সোমনাথ— 'বুলবুল লড়াইয়ের সেকাল-একাল', প্রথম সংস্করণ ১৯৯৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।
- নাগ, অরুণ সম্পাদিত— সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, সুবর্ণরেখা, কলকাতা।

- নস্কর, সনৎকুমার ও মুখোপাধ্যায়, কস্তুরী সম্পাদিত— 'রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিশতবর্ষের আলোয়', ১ম সংস্করণ ২০১৩, রত্নাবলী, কলকাতা।
- নিয়োগী, গৌতম— ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, বাংলা ও বাঙালি: আদিপর্ব; বসু, স্বপন ও চৌধুরী, ইন্দ্রিজিৎ সম্পাদিত, উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, প্রথম সংস্করণ ২০০৩, পুস্তক বিপণী, কলকাতা।

## প

- পত্রী, পূর্ণেন্দু— পুরোনো কলকাতার কথাচিত্র, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
- পত্রী, পূর্ণেন্দু— 'বাবু কালচারের জন্ম ও মৃত্যু', সরকার, পবিত্র ও দাশগুপ্ত, প্রশান্তকুমার সম্পাদিত, 'কলকাতা ৩০০: সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরম্পরা', প্রথম সং ১৯৯৪, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।
- পাল, কানাইলাল— সত্যনিষ্ঠ রসিককৃষ্ণ মল্লিক মহাশয়ের জীবনচরিত, আখ্যাপত্র বিনষ্ট।
- পাল, ড. প্রফুল্লচন্দ্র সম্পাদিত— 'প্রাচীন কবিওয়ালার গান', পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৪, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা।
- পাল, নিমাইচন্দ্র সম্পাদিত— 'দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনচরিত', প্রথম সদেশ সংস্করণ ২০০৫, সদেশ, কলকাতা।
- পাল, বিপিনচন্দ্র— 'নবযুগের বাংলা', প্রথম চিরায়ত সংস্করণ ২০১২, চিরায়ত প্রকাশন প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।
- পাল, বিপিনচন্দ্র— 'সত্তর বৎসর' প্রথম কল্পন সং ২০০৫, কল্পন, কলিকাতা।
- পালিত, চিত্তব্রত— 'কলকাতা নগরায়ন', 'বাংলার চালচিত্রে কলকাতা', প্রথম এবং মুশায়েরা সংস্করণ ২০০৮, এবং মুশায়েরা, কলকাতা।

## ব

- বক্‌সী, সন্ধ্যা সম্পাদিত— 'রামনারায়ণ তর্করত্ন রচনাবলী', প্রথম সংস্করণ ১৯৯১, সাহিত্যলোক, কলকাতা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার— বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংস্করণ ১৯৮৫, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ— ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী, ১ম ও ২য় খণ্ড; বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন সম্পাদিত, প্রথম দীপ সংস্করণ ২০০৭, দীপ প্রকাশন, কলকাতা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন— 'বাঙ্গালার ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী) নবাবি আমল', প্রথম দে'জ সংস্করণ ২০০৩, সম্পাদনা : চৌধুরি, কমল, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ— দু'খানি ছবি, ১৮৮৮ (১২৯৫ বঙ্গাব্দ), কলকাতা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র— 'রবি-রশ্মি', ১ম খণ্ড, চতুর্থ কলেজ স্ট্রিট সংস্করণ, ১৪১০ বঙ্গাব্দ, কলেজ স্ট্রিট পাবলিকেশন প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রসাদ— '৩০০ বছরের কলকাতায় শিক্ষা ও শিক্ষক', 'বিষয় কলকাতা' প্রথম সং ১৯৯৩, জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, কলকাতা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত— দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন, প্রথম সংস্করণ ১৯৮১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজিত সম্পাদিত— 'বেশ্যাসংগীত বাইজিসংগীত', প্রথম সংস্করণ ২০০১, সুবর্ণরেখা, কলকাতা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজিত সম্পাদিত— 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র', ১ম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ২০০২, সাহিত্য-সংসদ, কলকাতা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি— 'পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী', বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ্বর— বাংলাদেশের সংস্করণ প্রসঙ্গে, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৬, মনীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ— 'খোদাই চিত্রে বাঙালি', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩১৬ বঙ্গাব্দ; ঘোষ, দীপঙ্কর সঙ্কলিত এবং ভট্টাচার্য, মিহির ও ঘোষ, দীপঙ্কর সম্পাদিত, 'বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়', প্রথম সং ২০০৪, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ— ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক চরিতমালা-৪, ষষ্ঠ মুদ্রণ ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা।

- বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত সম্পাদিত— 'ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী', পঞ্চম সংস্করণ ১৪১৯ বঙ্গাব্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত সম্পাদিত— 'হুতোম প্যাঁচার নকশা, সমাজ কুচিত্র, পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব', নতুন সংস্করণ ১৩৫৫, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪২১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত সম্পাদিত— 'আলালের ঘরের দুলাল', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, তৃতীয় সংস্করণ ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ— 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', ষষ্ঠ সংস্করণ ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ— 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ১ম খণ্ড, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ— 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, পঞ্চম মুদ্রণ ১৪০১ বঙ্গাব্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ— রসরচনাসমগ্র, গুপ্ত, সনৎকুমার সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৭, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল— 'কলিকাতা কল্পলতা', রায়, নিশীথরঞ্জন এবং দাস, সুনীল সম্পাদিত, 'পুরনো কলকাতার কথা', প্রথম সংস্করণ ১৯৮৯, জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স, কলকাতা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার এবং চৌধুরী, বিশ্বপতি সম্পাদিত— কবিকঙ্কন চণ্ডী, ২০১১, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার সম্পাদিত— 'ইন্দ্রনাথ-গ্রন্থাবলী', প্রথম খণ্ড, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, সেকাল ও একাল, কলকাতা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার সম্পাদিত— ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, সেকাল ও একাল, কলকাতা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর— 'পলাশি থেকে পার্টিশান আধুনিক ভারতের ইতিহাস', রায়, কৃষ্ণেন্দু সম্পাদিত, পুনর্মুদ্রণ ২০১০, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত— 'উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান', প্রথম সংস্করণ ২০০৮, অনুষ্টুপ, কলকাতা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুরেশচন্দ্র এবং চক্রবর্তী, ড. ছন্দা অনূদিত ও সম্পাদিত— 'ভরত নাট্যশাস্ত্র', প্রথম খণ্ড, ভূমিকা, তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৯৭; নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুরেশচন্দ্র এবং চক্রবর্তী, ড. ছন্দা অনূদিত ও সম্পাদিত— 'ভরত নাট্যশাস্ত্র', তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৬, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ— 'বঙ্গীয় শব্দকোষ', ২য় খণ্ড, চতুর্থ মুদ্রণ ১৯৯৬, সাহিত্য আকাদেমি, নতুন দিল্লী।
- বসু, অমৃতলাল— 'অমৃত-গ্রন্থাবলী', ৩য় ভাগ, সংস্করণ কাল অনুল্লিখিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা।
- বসু, কাঞ্চন সম্পাদিত— 'দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ', ১ম খণ্ড, পঞ্চম মুদ্রণ ২০০১, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা।
- বসু, কাঞ্চন সম্পাদিত— 'দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ' ২য় খণ্ড, পঞ্চম মুদ্রণ ২০০১, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা।
- বসু, কাঞ্চন সম্পাদিত— দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ, ৩য় খণ্ড, পঞ্চম মুদ্রণ ২০০১, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা।
- বসু, গিরিশচন্দ্র— 'সেকালের দারোগার কাহিনি'; বসু, কাঞ্চন সম্পাদিত, 'দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ', ৩য় খণ্ড, পঞ্চম মুদ্রণ ২০০১, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা।
- বসু, ঝরা— 'কেশবচন্দ্র সেন ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', প্রথম সংস্করণ ১৪০১ বঙ্গাব্দ, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা।
- বসু, দেবকুমার সম্পাদিত— বিদ্যাসাগর রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ১৯৬৯, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা।
- বসু, দেবাশিস সম্পাদিত— 'কলকাতার পুরাকথা', প্রথম সংস্করণ ১৯৯০, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
- বসু, দেবাশিস সম্পাদিত— প্রোফেসর বোসের অপূর্ব্ব ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, কারিগর সংস্করণ ২০১৩, কারিগর, কলকাতা।
- বসু, নগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত— 'বিশ্বকোষ', ১২ ভাগ, পুনর্মুদ্রণ ১৯৮৮, বি. আর. পাবলিশিং কর্পোরেশন, দিল্লী।
- বসু, প্রদীপ— সাময়িকী, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।
- বসু, রমেশ— 'বাংলার প্রাচীন চিত্র ও পট'; বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়, ভট্টাচার্য, মিহির ও ঘোষ, দীপঙ্কর সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ২০০৪, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা।

- বসু, রাজনারায়ণ— 'আত্মচরিত', রাজনারায়ণ বসু নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ, ঘোষ, বারিদবরণ সম্পাদিত, প্রথম কলেজ স্ট্রিট সংস্করণ, কলেজ স্ট্রীট পাবলিকেশনস্, কলকাতা।
- বসু, রাজনারায়ণ— সেকাল আর একাল; ঘোষ, বারিদবরণ সম্পাদিত, রাজনারায়ণ বসু নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ, প্রথম কলেজ স্ট্রিট সংস্করণ ১৪০২ বঙ্গাব্দ, কলেজ স্ট্রীট পাবলিকেশনস্, কলকাতা।
- বসু, রাজনারায়ণ— হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত; ঘোষ, বারিদবরণ সম্পাদিত, রাজনারায়ণ বসু নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ, প্রথম কলেজ স্ট্রিট সংস্করণ, কলকাতা।
- বসু, যূথিকা— 'বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ রচনা উনিশ শতক', প্রথম সংস্করণ ১৯৮২, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান।
- বসু, স্বপন সম্পাদিত— অক্ষয়কুমার দত্ত রচনাসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ২০০৮, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।
- বসু, স্বপন ও চৌধুরী, ইন্দ্রজিৎ সম্পাদিত— উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, প্রথম সংস্করণ ২০০৩, পুস্তক-বিপণি, কলকাতা।
- বসু, স্বপন— বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৩, পুস্তক-বিপণি, কলকাতা।
- বসু, স্বপন সংকলিত— সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ, ২য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ২০০৩, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।
- বাগল, যোগেশচন্দ্র— ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, প্রথম বিবেকানন্দ বুক সেন্টার সংস্করণ ২০১১, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, কলকাতা।
- বাগল, যোগেশচন্দ্র— কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র, প্রথম সংস্করণ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলকাতা।
- বাগল, যোগেশচন্দ্র সম্পাদিত— বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, দশম প্রকাশ ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, সাহিত্য-সংসদ, কলকাতা।
- বাগল, যোগেশচন্দ্র সম্পাদিত— বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য-সংসদ সংস্করণ, নবম মুদ্রণ ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।
- বাগল, যোগেশচন্দ্র— হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত, মৈত্রী সংস্করণ ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ, মৈত্রী, কলকাতা।
- বাৎসায়ন, ড. কপিলা— 'ভারতের নাট্য-ঐতিহ্য বিচিত্র প্রবাহ'; অনুবাদ: চৌধুরী, নারায়ণ, সংস্করণ অনুল্লিখিত ১৯৯৫, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়াদিল্লি।
- বিদ্যানিধি, যোগেশচন্দ্র— 'বাঙ্গালা শব্দকোষ', ভূর্জপত্র সংস্করণ, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ, ভূর্জপত্র, কলকাতা।
- বিদ্যার্ণব, শিবচন্দ্র— 'তন্ত্রতত্ত্ব', প্রথম নবভারত সংস্করণ ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা।
- বিশ্বাস, অদ্রীশ সম্পাদিত— 'বটতলার বই ১', প্রথম সংস্করণ ২০১১, গাঙচিল, কলকাতা।
- বিশ্বাস, অদ্রীশ সম্পাদিত— 'বটতলার বই ২', প্রথম সংস্করণ ২০১১, গাঙচিল, কলকাতা।
- বিশ্বাস, তারকনাথ— তারকনাথ-গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা।
- বিশ্বাস, হার্দিকব্রত সংকলিত ও সম্পাদিত— 'প্রহসনে কলিকালের বঙ্গমহিলা (১৮৬০-১৯০৯)', প্রথম সংস্করণ ২০১১, চর্চাপদ, কলকাতা।
- বেদান্ত বিদ্যাসাগর, গঙ্গাচরণ অনূদিত— 'বাৎস্যায়ণের কামসূত্র', প্রথম প্রকাশ ১৩১৩ বঙ্গাব্দ, নবপত্র দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৮৬, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা।
- বেদান্ত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য, গঙ্গাচরণ— 'হাফ আখড়াই সঙ্গীত সংগ্রামের ইতিহাস', প্রথম সংস্করণ ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

**ভ**

- ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন— 'বঙ্কিমচন্দ্রজীবনী', প্রথম সংস্করণ ১৯৯১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।
- ভট্টাচার্য, আশুতোষ সম্পাদিত— 'বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা', পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।
- ভট্টাচার্য, দেবীপদ— উপন্যাসের কথা, দে'জ সংস্করণ ২০০৩, দে'জ, কলকাতা।
- ভট্টাচার্য, দেবীপদ এবং রায়, রথীন্দ্রনাথ সম্পাদিত— গিরিশ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, ৩য় মুদ্রণ ১৯৯১, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

- ভট্টাচার্য, দেবীপদ সম্পাদিত— 'গিরিশচন্দ্র রচনাবলী', ৩য় খণ্ড, তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৯২, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।
- ভট্টাচার্য, দেবীপ্রসাদ সম্পাদিত— গিরিশ রচনাবলী, ২য় খণ্ড, তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৯৫, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।
- ভট্টাচার্য, ধীরেশ— ভারতের বহির্বাণিজ্য ও বৈদেশিক লেনদেন, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
- ভট্টাচার্য, মৌ সম্পাদিত— 'বেশ্যাপাড়ার পাঁচটি দুর্লভ সংগ্রহ', প্রথম সংস্করণ ২০১১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
- ভাঁড়—'সচিত্র গুলজারনগর'; বসু, কাঞ্চন সম্পাদিত, 'দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ', ৩য়, পঞ্চম মুদ্রণ ২০০১, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা।
- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর— ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির সংস্করণ, নবম সংস্করণ ১৯৯৭, বসুমতি সাহিত্য মন্দির, কলকাতা।
- ভৌমিক, নির্মলেন্দু সম্পাদিত— উনিশ শতকের বাংলা নকশা, ১ম সংস্করণ ১৯৮৪, কলকাতা।

**ম**

- মজুমদার, করুণাময়— 'চন্দ্রনাথ বসু : জীবন ও সাহিত্য', প্রথম সংস্করণ ১৯৮৪, কলকাতা।
- মণিরুজ্জামান, মোহাম্মদ সম্পাদিত— 'প্যারীচাঁদ রচনাবলী', প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ২০০৩, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
- মল্লিক, প্রমথনাথ— কলিকাতার কথা (আদিকাণ্ড), তৃতীয় সংস্করণ ২০০১, পুঁথি পরিবেশক, পুস্তক বিণি, কলকাতা।
- মল্লিক, প্রমথনাথ— 'কলিকাতার কথা', মধ্যকাণ্ড; গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ সম্পাদিত, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৯, মল্লিক, শ্রীঅরিজিৎ প্রকাশিত, পুঁথি, কলকাতা।
- মামুন, মুনতাসির— উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র, ২য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৮, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
- মামুন, মুনতাসীর— 'উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র', তৃতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৮, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
- মামুন, মুনতাসির— উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র, নবম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ২০০৩, বাংলা একাডেমি ঢাকা।
- মামুন, মুনতাসির— 'উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র', দশম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ২০০৬, অনন্যা, ঢাকা।
- মামুন মুনতাসির— 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালি সমাজ', পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ ২০০২, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
- মিত্র, উদয়ন— 'কোম্পানির চিঠিপত্রে কলকাতার নগরায়ন', বসু, দেবাশিস সম্পাদিত, 'কলকাতার পুরকথা', প্রথম সংস্করণ ১৯৯০, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
- মিত্র, কিশোরীচাঁদ— 'দ্বারকানাথ ঠাকুর', নাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল অনূদিত, সম্বোধি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা ১, দাশগুপ্ত, দাশগুপ্ত, কল্যাণকুমার, সম্বোধি পাবলিকেশন্স প্রাঃ লিঃ, ১ম সংস্করণ, ১৯৬২, কলকাতা।
- মিত্র, দীনবন্ধু— 'দীনবন্ধু রচনাবলী', গুপ্ত, ক্ষেত্র সম্পাদিত, চতুর্থ মুদ্রণ ১৯৯২, সাহিত্য-সংসদ, কলকাতা।
- মিত্র, প্যারীচাঁদ— রামকমল সেন; গুপ্ত, সুশীলকুমার অনূদিত; বাগল, যোগেশচন্দ্র সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৯৬৪, সম্বোধি পাবলিকেশনস প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।
- মিত্র, প্যারীচাঁদ— 'প্যারীচাঁদ রচনাবলী', মোহাম্মদ মণিরুজ্জামান সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ২০০৩, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
- মিত্র, ড. অরুণকুমার সম্পাদিত— 'অমৃতলাল বসুর স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি', প্রথম সংস্করণ ১৯৮২, সাহিত্যলোক, কলকাতা।
- মিত্র, সুধীরকুমার— 'হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ', প্রথম খণ্ড, প্রথম মণ্ডল বুক হাউস সংস্করণ ১৯৯১, কলিকাতা।
- মিত্র, রাধারমণ— কলিকাতা দর্পণ, প্রথম পর্ব, চতুর্থ মুদ্রণ ১৯৯৭, সুবর্ণরেখা, কলকাতা
- মুখোপাধ্যায়, অজিতকুমার— 'বঙ্গের পটচিত্র', বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়, ভট্টাচার্য, মিহির ও ঘোষ দীপঙ্কর সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ২০০৪, লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা।
- মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ— 'উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি', প্রথম সংস্করণ ১৯৭১, কলকাতা।
- মুখোপাধ্যায়, অরুণ সম্পাদিত— 'দারোগার দপ্তর', ২য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ২০০৪, পুনশ্চ, কলকাতা।

- মুখোপাধ্যায়, তারাপদ সম্পাদিত— 'গোপীচন্দ্র নাটক', প্রথম সংস্করণ ১৯৭০, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।
- মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ— 'কঙ্কাবতী', 'ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী, প্রথম সাহিত্যম সংস্করণ ২০০৫, সাহিত্যম, কলকাতা।
- মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ— সেকেলে বড়লোকদের খেয়ালখুশি, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯২, বিদ্যামন্দির, কলকাতা।
- মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ— 'আপনার মুখ আপুনি দেখ', বসু, কাঞ্চন সম্পাদিত, দুষ্প্রাপ্য রচনা সংগ্রহ, পঞ্চম মুদ্রণ, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশনস্‌, কলকাতা।
- মুখোপাধ্যায়, মীনাক্ষী— 'উপন্যাসে অতীত : ইতিহাস ও কল্প-ইতিহাস', প্রথম সংস্করণ ২০০৩, থীমা, কলকাতা।
- মুখোপাধ্যায়, সুখময়— 'প্রাক্‌-চার্ণক কলিকাতা', বসু, দেবাশিস সম্পা., কলকাতার পুরাকথা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯০, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
- মুখোপাধ্যায়, সুবোধকুমার— বাংলার আর্থিক ইতিহাস (ঊনবিংশ শতাব্দী), প্রথম সংস্করণ ১৯৮৭, কে. পি বাগচী অ্যান্ড কোং, কলকাতা।
- মুখোপাধ্যায়, হরিসাধন— কলিকাতা সেকালের ও একালের, তৃতীয় সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ ১৯৯১, পি.এম. বাক্‌চি অ্যান্ড কো. প্রা.লি. কলকাতা, পৃ. ৪৪৩।

**র**

- রক্ষিত, হারাণচন্দ্র— 'ভিক্টোরিয়া-যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য', চট্টোপাধ্যায়, অরুণা সম্পাদিত, প্রথম পারুল সংস্করণ ২০০৯, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা।
- রায়, অতুলকৃষ্ণ— 'কলিকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', অনুবাদ— সেন, শুদ্ধোদন, ঋদ্ধি-ইন্ডিয়া, প্রথম সংস্করণ ১৯৮২, কলকাতা।
- রায়, অর্ধেন্দুশেখর সম্পাদিত— 'দাশরথি রায়ের পাঁচালী, প্রথম মহেশ সংস্করণ ১৯৯৭, মহেশ লাইব্রেরি, কলকাতা।
- লাহিড়ী, দুর্গাদাস সম্পা— বাঙালির গান; বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার সম্পাদিত, প্রথম পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সংস্করণ ২০০১, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।
- রায়, অলোক এবং নিয়োগী, গৌতম সম্পাদিত— 'উনিশ শতকের বাংলা', প্রথম সংস্করণ ২০১২, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা।
- রায়, গোপালচন্দ্র— 'বাংলা বইয়ের ব্যবসা', দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন, বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৯৮১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।
- রায়, দুর্গাচরণ— দেবগণের মর্ত্যে আগমন, দে'জ সংস্করণ ২০০১, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা।
- রায় দেবেশ— 'উপনিবেশের সমাজ ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য', প্রথম সংস্করণ ১৯৯০, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেসের পক্ষে প্যাপিরাস, কলকাতা।
- রায়, নিশীথরঞ্জন এবং উপাধ্যায়, অশোক সম্পাদিত— প্রাচীন কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৩৯০ বঙ্গাব্দ, সাহিত্যলোক, কলকাতা।
- রায়, বিনয়ভূষণ— 'নেটিভ হাসপাতাল থেকে ফিভার হাসপাতাল'; বসু, দেবাশিস সম্পাদিত, কলকাতার পুরাকথা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯০, পুস্তক-বিপণি, কলকাতা।
- রায়, রজতকান্ত— 'পলাশির ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ', দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।
- রায় কর্মকার, কেশবচন্দ্র— 'শব্দার্থ প্রকাশিকা', প্রথম সংস্করণ ১৮৬১, নূতন তুলি-কলম সংস্করণ ২০০৪, পাল, নিমাইচন্দ্র সম্পাদিত, তুলি-কলম, কলকাতা।

**ল**

- লাহিড়ী, চণ্ডী সম্পাদিত ও সংকলিত— বসন্তক, প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংস্করণ (অনুল্লিখিত), নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।
- লাহিড়ী, দুর্গাদাস— আদর্শ চরিত কৃষ্ণমোহন, নস্কর, মানবেন্দ্র সম্পাদিত, প্রথম সূত্রধর সংস্করণ ২০১৩, সূত্রধর, কলকাতা।
- লাহিড়ী, দুর্গাদাস— 'বাঙালির গান'; বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, প্রথম পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সংস্করণ ২০০১, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।

**শ**

- শ্রীপান্থ— 'কেয়াবাৎ মেয়ে', দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৮, আনন্দ পাবলিশার্স অ্যান্ড প্রা. লি, কলকাতা।
- শহীদুল্লাহ, ড. মুহম্মদ সম্পাদিত— বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
- শরর, আবদুল হালিম— 'পুরনো লখনউ', পুনমুর্দ্রণ, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়াদিল্লি।
- শাস্ত্রী, শিবনাথ— আত্মচরিত, প্রথম দে'জ সংস্করণ ২০০৩, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা।
- শাস্ত্রী, শিবনাথ— রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, দ্বিতীয় সংশোধিত নিউএজ সংস্করণ ২০০৭, নিউএজ, কলকাতা।
- শাস্ত্রী, প্রিয়নাথ— মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী, প্রথম সংস্করণ ১৯০৯, ব্রাহ্ম সমাজ, কলকাতা।
- শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ— 'কলিকাতা দুইশত বৎসর পূর্ব্বে', চৌধুরি, সত্যজিৎ ও সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর সম্পাদিত, 'হরপ্রসাদ রচনাবলী', প্রথম সংস্করণ ১৯৮৯, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।
- শাস্ত্রী, সত্যচরণ— 'মহারাজ নন্দকুমার চরিত', প্রথম পুঁথিপত্র সংস্করণ ২০০৩, পুঁথিপত্র, কলকাতা।
- শেঠ, হরিহর—'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়— কথায় ও চিত্রে', প্রথম সংস্করণ ১৯৫২, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা।
- শ্রীপান্থ— 'কলকাতা', প্রথম সংস্করণ ১৯৯৯, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
- শ্রীপান্থ— 'তলোয়ার বনাম কলম: প্রথম শতবর্ষে', বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত, 'দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন', প্রথম সংস্করণ ১৯৮১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।
- শ্রীপান্থ— 'বটতলা', প্রথম সংস্করণ ১৯৯৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।
- শ্রীপান্থ— 'মোহন্ত-এলোকেশী সম্বাদ', প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।
- শ্রীপান্থ— শ্রীপান্থের নানারকম, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৪, ডি এম লাইব্রেরি, কলকাতা।
- শ্রীম কথিত— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, প্রথম ভাগ, চতুর্দশ পুনর্মুদ্রণ ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, শ্রীম ঠাকুরবাটী, কলকাতা।
- শ্রীমানী, সৌমিত্র— 'বাজারের শহর: অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ', 'বিষয় কলকাতা', জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৩, কলকাতা।

**র**

- রায়, ছন্দা— 'বাংলা সাহিত্য ও সংবাদ সাময়িকপত্রের দর্পণে কলকাতা (১৮০০-১৮৭২)', প্রথম সংস্করণ ২০০৩, পুস্তক-বিপণি, কলকাতা।
- রায়, অনুরাধা— 'বাঙালি বুদ্ধিজীবীর চোখে ব্রিটিশ শাসন'; বসু, স্বপন ও চৌধরী, ইন্দ্রজিৎ সম্পাদিত, 'উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি', প্রথম সংস্করণ ২০০৩, পুস্তক-বিপণি, কলকাতা।
- রায়, সুপ্রকাশ— 'ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম', র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, প্রথম সংস্করণ ১৯৭২, কলকাতা।

**ল**

- লাহিড়ী, চণ্ডী— কার্টুনের ইতিবৃত্ত, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৫, গণমাধ্যম কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ

**স**

- সর, রমেনকুমার সম্পাদিত— 'ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসংগ্রহ', প্রথম সংস্করণ ২০১৩, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা।
- সরকার, পবিত্র এবং দাশগুপ্ত, প্রশান্ত সম্পাদিত— 'কলকাতা ৩০০: সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরম্পরা', প্রথম সংস্করণ ১৯৯৪, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।
- সরদার, আবদুর রফিক সম্পাদিত— বাংলা দর্পণ নাটক সংগ্রহ, প্রথম সংস্করণ ২০০৪, সাহিত্যলোক, কলকাতা।
- সান্যাল, অবন্তীকুমার— বাবু, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৭, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।
- সান্যাল, অবন্তীকুমার— 'ভিক্‌তর জাকমঁর রোজনামচায় কলিকাতা'; দ্র. 'বিষয় কলকাতা', প্রথম সংস্করণ ১৯৯৩, জাতীয় গ্রন্থাকার কর্মী সমিতি, কলকাতা।
- সান্যাল, হিতেশরঞ্জন— 'বাঙ্গালা কীর্তনের ইতিহাস', ২য় মুদ্রণ ২০১২, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা।

- সাহা, অর্ণব সম্পাদিত— দুষ্প্রাপ্য বাংলা সাহিত্য প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ২০১০, সপ্তর্ষি প্রকাশন, শ্রীরামপুর, হুগলি।
- সাহা, অর্ণব— 'দুষ্প্রাপ্য বাংলা সাহিত্য', ৩য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ ২০১৩, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা।
- সাহা, অর্ণব— 'ভগ্নাংশের যৌনটোপিয়া'; আচার্য, অনিল ও সাহা, অর্ণব সম্পাদিত, 'যৌনতা ও বাঙালি', প্রথম সংস্করণ ২০০৯, অনুষ্টুপ, কলকাতা।
- সাঁতরা, তারাপদ— 'কলকাতার মন্দির মসজিদ', প্রথম সংস্করণ ২০০২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।
- সাঁতরা, তারাপদ— 'কলকাতার মন্দির স্থাপত্য'; বসু, দেবাশিস সম্পাদিত, কলকাতার পুরাকথা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯০, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
- সুর, অতুল— 'কলকাতা' (এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস), প্রথম সংস্করণ ১৯৮১, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।
- সুর, অতুল— সে আর এক কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৭, সাহিত্যলোক, কলকাতা।
- সেন, অমূল্যগোপাল— 'বাংলার পাট', বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়; ভট্টাচার্য, মিহির ও ঘোষ, দীপঙ্কর সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ২০০৪, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা।
- সেন, দীনেশচন্দ্র— বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড, বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯১, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ, কলকাতা।
- সেন, বিজয়রাম— 'তীর্থ-মঙ্গল', পরশপাথর সংস্করণ ২০০৯, পরশপাথর প্রকাশন, কলকাতা।
- সেন, সুকুমার— 'বটতলার ছাপা ও ছবি', দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সং ২০০৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি. কলকাতা।
- সেন, সুকুমার— 'বুৎপত্তি-সিদ্ধার্থ বাংলাকোষ', প্রথম সংস্করণ ২০০৩, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।
- সেন, সুকুমার— বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১৪০১ বঙ্গাব্দ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।
- সেন, সুকুমার— 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য', প্রথম আনন্দ সংস্করণ ১৯৯৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।
- সেন দাস, শ্রীজয়ন্তীচন্দ্র— শ্রীনন্দরাম সেনের জীবনোপাখ্যান, শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এন্ড কোং, ১২৭৩ সাল, কলকাতা।
- সেনগুপ্ত, গৌরাঙ্গগোপাল— 'হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও হিন্দু পেট্রিয়ট', প্রথম সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।
- সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র— 'বঙ্কিমচন্দ্র', দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৪, এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।
- সোম, নগেন্দ্রনাথ— 'মধুস্মৃতি', দীপ সংস্করণ ১৯৯৮, দীপ প্রকাশন, কলকাতা।

## হ

- হক, কাজী রফিকুল— 'বাংলাভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দ্দু শব্দের অভিধান', প্রথম সংস্করণ ২০০৪, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
- হাই, মুহম্মদ আবদুল ও পাশা, আনোয়ার সম্পাদিত— 'ঈশ্বরগুপ্তের কবিতাসংগ্রহ', চতুর্থ মুদ্রণ ২০১০, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, বাংলাদেশ।
- হালদার, গোপাল— 'সংস্কৃতির রূপান্তর', 'সংস্কৃতির বিশ্বরূপ', প্রথম প্রকাশ ভবন সংস্করণ ২০১৪, প্রকাশ-ভবন, কলকাতা।
- হাসান, ড. বদরুল— 'উনিশ শতক: নবজাগরণ ও বাঙ্‌লা উপন্যাস', প্রথম সংস্করণ ১৯৯০, জগৎমাতা পাবলিশার্স, কলকাতা।

## পত্র-পত্রিকা


- খাস্তগীর, আশিস— 'বটতলার বইয়ের বাজার', অনুষ্টুপ, বর্ষ ৪৫, ৪র্থ সংখ্যা, ২০১১।
- ঘোষ, অনিন্দিতা— 'বটতলার বইবাজার ও তার সামাজিক ইতিহাস', অনুষ্টুপ, বর্ষ ৪৫, ৪র্থ সংখ্যা ২০১১।
- ঘোষ, বিনয়— 'বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা ও ভারতবোধ', দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৪।
- ঘোষ, যতীন্দ্রমোহন— 'বঙ্গসাহিত্যে নক্‌শা', পঞ্চপুষ্প, আশ্বিন ১৩৩৭।
- ঘোষাল, চন্দ্রিকাপ্রসাদ— 'বটতলার গুপ্তকথা : কেচ্ছার ভাঁড়ার না অন্তঃপুরের আরশি', অনুষ্টুপ, ৪৫ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ২০১১।
- চৌধুরী, সর্বানন্দ— 'প্রেমসিন্ধুনীরে', বিভাব, শীত-বর্ষা সংখ্যা, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ।
- তত্ত্ববোধিনী, শ্রাবণ ১৭৭১ শক।
- দত্ত, নারায়ণ— 'বাঙালি বাবু', অমৃত, ১৪ মে ১৯৭৮।
- দেশ, বিনোদন সংখ্যা ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ।
- পঞ্চপুষ্প ১৩৩৬, কার্তিক।
- পঞ্চপুষ্প, আশ্বিন, ১৩৩৭ সন।
- বান্ধব, চৈত্র ১২৮০ সাল।
- রায়, সিদ্ধেশ্বর— 'বঙ্গসাহিত্যে নাটক সৃষ্টি', নব্যভারত, পৌষ ১২৯৬ সাল।
- 'সভ্যতার অত্যাচার', কল্পনা, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ।
- সর্ব্বাধীকারী, দেবপ্রসাদ— 'স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র', কায়স্থ পত্রিকা, ২৮ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।
- সুলভ সমাচার, ১ জানুয়ারি ১৮৭১।
- সাহা, অর্ণব— 'পশুপতি-বৃত্তান্ত', অবভাস, এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০০৫, কলকাতা।

## A

- Ahmed, A.F. Salahuddin— Social Ideas and Social change in Bengal 1818-1835, Papyrus edition 2003, Papyrus, KolKata.
- Archer, W.G— Bazar Paintings of Calcutta, 1st edi 1953, Victoria-Albart Musium, London.
- Archer, W.G— Kalighat Drawings, 1st edi 1971, Victoria-Albert Musiam, London.

## B

- Baldick, Chris— The Oxford Dictionary of Literary Terms, 3rd edi 2008, Oxford University Press, New York.
- Banerjee, Sumanta— The Parlour and the Streets, Seagull Books 1989, Kolkata.
- Banerjee, Surendranath— A Nation in Making, Paschimbanga Bangla Akademi edi 1998, Paschimbanga Bangla Akademi, Kolkata.
- Bathachet, Kenneth— Race, Sex and Class under the Raj, Imperial attitudes and policies and their crities 1793-1905, 1st edi 1979, Vikash Publishing House Pvt Ltd, New Delhi.
- Bhattacharya, Asok K— Calcutta Paintings, 1st edi 1994, Department of Information and cultural Affairs, Govt. of West Bengal.
- Brereton, Geoffrey— A short History of French Literature, Penguine edi 1956, Penguine Books, London.
- Busteed, H.E— Echoes from Old Calcutta, Rupa & Co, edi not mentioned, Rupa, New Delhi.

## C

- Carey, W.H— The Good Old Days of Honorable John Company, edi by Ray, Nisith R., Riddhi 1980, Riddhi India, Kolkata.
- Chattopadhyaya, Bankimchandra— 'The confession of a Young Bengal', Bagal, Jogesh Chandra edi, 'Bankim Rachanavali, vol. 3, 3rd print 1998, Sahitya-sansad, Kolkata.
- Chattopadhay, Kanailal— 'Selections from The Indian Mirror', First edi 2005, Papyrus, Kolkata.
- Chatterjee, Suniti Kumar— "The Eighteenth Century in India", 'Muhammad Shahidullah Felicitation Volume,' edi. by Haq, Muhammed Enamul Haq, Dacca 1966, Bangladesh.
- Chatterjee, Partha— 'The Nation and Its Fragments'; Colonial and Post-Colonial Histories, New Delhi, 1993.
- Chaudhuri, Dr. S – 'The Myth of the English East India Company Trading privilages in Bengal, 1651-1668', Bengal Past and Present, Sir J.N. Sarkar Centenary Vol, 1970, Kolkata.
- Collet, Sophia Dobson— 'The Life and Letters of Raja Rammohan Ray', edi by Biswas, Dilip Kumar and Ganguli, Prabhat Kumar, Sadharan Brahmo Samaj, Fourth edi 1988, Kolkata.
- Cotton, H.E.A— 'Calcutta Old and New', Ist edi 1909, Revised edi 1980, General Printers and Publishers Pvt. Ltd, Kolkata.
- Cuddon, J.A— 'Literary Terms and Literary Theory', Fourth edi, Penguin edi 1999, Penguin Books, London, England.

## D

- Das, Jogananda— "The Brahmo Samaj", Studies in the Bengal Renaissance, 3rd revised edi 2002, National Council of Education. Bengal, Kolkata.
- Das, Satyajit— 'Selections from The Indian Journals', vol. II, First Edi 1965, Firma K.L. Mukhopadhyay Pvt. Ltd., Kolkata.
- Datta, K.K— Alivardi and his Times, 2nd edi 1963, Calcutta.
- Dutta, R.C— "The Bengal Zamindar and Ryot", Bengal Magazine, vol. II, December 1873.

## E

- Edwards, Thomas— 'Henry Derozio', 1st Radiance Publication 2003, Radiance, Kolkata.
- Elliott, Robert C— 'The Power of Satire', 1st edi 1966, Princeton.

## F

- Fulcher, James— 'Capitalism', 1st edi 2004, Oxford University Press, New York, United States.
- Fischer-Tine, Harald— Law and Licentious Europeans Race, Class and White Subalternity in Colonial India, Ist Imp 2009, Orient Blackswan Private Ltd, New Delhi, India.

## G

- Ghosh, Benoy— "The Bengali Intelligentsia and the Revolt"; Joshi, P.C edi, 'Rebellion 1857', Second Reprint 2009, National Book Trust of India, New Delhi.
- Ghosh, Grish Chunder— 'Selections From the writings of Girish Chunder Ghose', 1st edi 1912, Papyrus edi, Papyrus, Kolkata.
- Ghosh, Gouri Prasad edi— 'Everyman's Dictionary', Reprint 2005, Ramkrishna Pustakalaya. Kolkata.
- Ghosh, N.N— 'Memoirs of Maharaja Nubkissen Bahadur, 1st edition 1901, Kolkata.
- Ghosh, Prodyot— Kalighat Pats: Annals and Appraisal', 1373 Bengali Year, Shilpayan Artists Society, Kolkata.
- Gray, Martin— A Dictionary of Literary Terms, 2nd impression 2009, Pearson Education, New Delhi.
- Guha, Ranjit— An Indian Histriognaphy of India, A Nineteenth Century Agenda and Its Implica-tions; S. G. Devuskar Lectures on Indian History, K.P. Bagchi and Co. 1987, Centre for Studies in Social Science, Calcutta.

## H

- Holzman, J.N— The Nabbobs in England, 1926, New York.

## K

- Karim, Abdul— Murshid Kuli and His Times, 1st edi 1965, Dacca, Bangladesh.

## L

- Long, J.— A Descriptive Catalogue of Bengali Works, Sanders Cones and Co., 1855.
  সংকলিত— সেন, দীনেশচন্দ্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ২য় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।
- Lawson, P.– The East India Company : A History, 1st edi 1993, London & New York Longman, London.

## M

- Majumder, Biman Behari— 'History of Indian Social And Political Ideas', 2nd edi 1967, Reprint 1996, Firma KLM Private Limited, Kolkata.
- Marshall, P.J— 'The First British Empire', The Oxford History of British Empire, vol.5, Historiography, edi Winks, R.W, Oxford University Press, oxford, New York.
- Marx, Karl— Dispatches for The New York Tribune, 1st edi 2007, Penguin Books, England.
- Mitra, Kissory Chand— Memoir of Dwarakanath Tagore 1870, 1st Parul edi 2011, Parul, Kolkata.
- Misra, B. B— The Indian Middle Class, Re-print 1978, India.
- Mitra, Rajendralal— History of the Society; Centenary Review of the Asiatic Society 1784-1884, Reprinted 1986, The Asiatic Society, Kolkata.
- Mukherjee, S.N— 'Bhadralok and their Dals— Politics of Social Factions in Calcutta, c. 1820-1856, TheUrban Experience Calcutta, edi by Sinha, Pradip, 1st edi 1987, Riddhi Edi, Kolkata.

## N

- Naik, J.P & Nurullah, S— A students' History of Education in India, Macmillan Company of India Ltd, 1974, New Delhi.
- Nair, P. Thankappan edi— Calcutta in the 18th Century, 1st edi 1984, Firma KLM Pvt Ltd, KolKata.
- Nain, P. Thankappan edi— Calcutta in the 19th Century, 1st edi 1988, Firma KLM Pvt Ltd, Kolkata.
- Nicoll, A— Dramatic Theory, আখ্যাপত্র বিনষ্ট।

## P

- Pal, Bipin Chandra— Swadeshi and Swaraj, 1954, Kolkata.
- Pattrea, Purnendu— The Continuity of the Battala Tradition; Paul, Asit edi, Woodcut Prints of Nineteenth Century Calcutta, 1st edi 1983, Seagull Books, Kolkata.
- Polland, A.F— Factors of Modern History, 1932, আখ্যাপত্র বিনষ্ট।

## R

- Raha, Kironmoy— 'Calcutta Theatre 1835-1944'; Chaudhuri, Sukanta edi, 'Calcutta The Living City' vol. I, 5th Impression 2011, Oxford University Press, New Delhi.
- Ray, Alok edi— Calcutta keepsake, 1st edi 1978, Riddhi-India, Kolkata.

## S

- Sanyal, Rajat— Voluntary Associations and the Urban Public life in Bengal (1815-1876), 1st edi 1980, Riddhi-India, Kolkata.
- Sarkar, Jadunath edi— The University of Dacca, vol. II, The University of Dacca, 4th Impression, 2006, Dacca, Bangladesh.
- Sarkar, Sumit— Writing Social History, 8th Impression 2004, Oxford University Press, New Delhi.
- Sarkar, Susobhan— Conflict within the Bengal Renaissance, On the Bengal Renaissance, 3rd edi 2002, Papyrus, Kolkata.
- Sastri, Sivanath— History of the Brahmo Samaj, 2nd edi 1974, reprint 1993, Sadharan Brahmo Samaj, Kolkata.
- Sen, Amiya P— Hindu Revivalism in Bengal (1872-1905), 1st edi 1993, Delhi.
- Sen, Priyoranjan— Western influence in Bengali Novel, 1st edi 1931, Firma KLM Pvt. Ltd., Kolkata.
- Shaw, Graham— Printing in Calcutta to 1800, 1st edi 1981, The Bibliographical Society, London.
- Shil, Amit— The Emergence of Indian Nationalism Competition and Colaboration in the Latter, Nineteenth Century, Cambridge University 1968, Cambridge.
- Sinha, Pradip– Calcutta in Urban History, 1st edi 1978, Firma KLM Pvt. Ltd., Kolkata.
- Stokes, E— The English Utilitarians and India, 1st edi 1959, Clarenndon Press, Oxford.

## Y

- Yule, Henery & Burnell, A. C— Hobson-Jobson, 5th Rupa Impression 2007, Rupa & Co., New Delhi.

## চিত্রঋণ


ঘোষ, সিদ্ধার্থ, কলের শহর কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।

শ্রীপান্থ, মোহন্ত এলোকেশী সম্বাদ, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।

সেন, সুকুমার, বটতলার ছাপা ও ছবি, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সং ২০০৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।

Jain, Jyotindra, Kalighat Painting images from a Changing World, 1st edi 1999, Mapin Publishing Pvt. Ltd., Ahmedabad, India.

Paul, Ashit edi, Woodcut Prints of Nineteenth Centrury Calcutta, 1st Edition 1983, Seagull Books, Calcutta.

Sinha, Suhashini & Panda, Professor C., Kalighat Paintings, 1st edi 2011, Victoria and Albert Museum, V & A Publishing in association of Mapin Publishing, Ahmedabad, India.